পারে। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন, ইউরোপীয় অংশটির উপর বর্ত্তমানে যে জোর দেওয়া হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা আর চলিবে না। যে সকল স্বার্থ ন্যায্য এবং জাতির পক্ষে ক্ষতিকর নহে সেগুলি রক্ষা করা হইবে এবং বাজেয়াপ্ত করা হইলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ করা হইবে। সামন্ত নৃপতিগণের সম্বন্ধে মহাত্মাজীর বক্তব্য এই যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জাতীয় পরিষদে যোগদান করিতে পারিবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে নয়, জাতির প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। মহাত্মাজীর এই যে দাবী ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ সহজে মানিয়া লইবেন—এ মনোবৃত্তি দেখা যাইতেছে না। এদিকে জিন্না সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষ-নিষ্পত্তির আশাও দূর হইয়াছে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—"আমার নিকট মিঃ জিন্না যে পত্র দিয়াছেন, তাহার ফলে জাতীয় স্বার্থের ঘোর বিরোধী এক অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে। মিঃ জিন্না একাধিক ভারত সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন, আর কংগ্রেসের আদর্শ হইল এক অখণ্ড ভারতবর্ষ।" কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, "মূল প্রশ্ন মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ বাহিরেই রহিবেন।"

দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর আপোষ-নিষ্পত্তির আশা-নিরাশাকে কেন্দ্র করিয়া যে ডামাডোল অবস্থাটা ছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। এখন প্রয়োজন কর্ম্ম-প্রণালীর। সমগ্র দেশ স্বাধীনতার সাধনায় বলিষ্ঠ কর্ম্ম-প্রণালীর প্রতীক্ষা করিতেছে।

চতুর্ব্বিধ সর্ব্বনাশ—

"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে শুধু যে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং ভারতবর্ষকে আর্থিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক হইতেও ধ্বংস করিয়াছে"—স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্যে এই কথাটি আছে। এই কথায় এক শ্রেণীর ইংরেজ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কথাগুলির মধ্যে তাঁহারা হিংসার বীজ পাইয়াছেন। মহাত্মাজী 'হরিজন' পত্রে ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন,—"এই সত্য কি প্রকৃতপক্ষে লোকের চক্ষে পড়ে না? হিউম, ডিলাবী, দাদাভাই, ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি বহু বিখ্যাত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে লোককে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা দেশের সমুদয় সম্পদ শোষণ করিয়া কৃষকদিগকে পথের ভিক্ষুক বানাইয়াছে। রাজনৈতিক অধীনতা অতি স্পষ্ট। ব্রিটিশ শাসনের আমলে কৃষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক অধীনতা যেরূপ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, ইতিহাসে আর কখনও তেমন হয় নাই। স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়াই তাহার নীচতা কম নহে বা তাহা কম মর্ম্মান্তিক নহে। বিজিত যখন বন্ধন-শৃঙ্খলকে আলিঙ্গন করে এবং বিজেতার রীতিনীতি অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার পরাজয় সম্পূর্ণ হয়। অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী যে, মাতৃভাষায় মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না এবং প্রিয়জনের নিকটও যে তাহাদিগকে ইংরেজী ভাষায় পত্র লিখিতে হয়, ইহাতে ইংরেজদের গর্ব্ববোধ করা উচিত কি?"

পরাধীনতায় যে দেশের এবং জাতির অনিষ্ট হয়, টীকা-টিপ্পনী বা ভাষ্যের দ্বারা কোন বুদ্ধিমান লোককে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয় না। বিজেতা জাতি সদিচ্ছাপূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু সেই যে সদিচ্ছা—তাহারও একটা গণ্ডী আছে। নিষ্কামভাবে অকৈতব প্রেম বিলাইবার জন্য কেহ পরের রাজ্যে যায় নাই। ইংরেজ জাতিও ভারতবর্ষে তেমন উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছিল না। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার জয়নসন হিক্স ওরফে লর্ড ব্রেণ্টফোর্ড স্পষ্ট করিয়া সে কথাটা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইংরেজ জাতি নিষ্কামভাবে ভারতবর্ষে যায় নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের বাজার সৃষ্টি করা তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ডিন-ইঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজদের আকস্মিক উন্নতির কারণ এবং তজ্জনিত সামাজিক বিপর্য্যয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"বাঙলাদেশ লুণ্ঠনের দ্বারাই ইংলণ্ডে বাণিজ্যগত বিপ্লব প্রথম প্রেরণা লাভ করে, ক্লাইভের বিজয়লাভের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অর্থস্রোত ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে থাকে। এই অন্যায়ে উপার্জ্জিত অর্থ ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার কার্য্যে ১৮৭০ সালে ফরাসী দেশ হইতে ৫ মিলিয়ার্ড জোর করিয়া আদায় করিবার পর জার্ম্মাণদের ব্যবসা-বাণিজ্যে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল সেইরূপ সাহায্য করে।

এ তো গেল একটা দিক; অন্য দিকটা অধিকতর মারাত্মক। অধীনতা যদি সদিচ্ছাপূর্ণও হয়, তাহাতেও জাতির উপর তাহার প্রভাবের অনিষ্টকারিতা কমে না বরং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। পরের নির্ভরতায় জাতি আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া ফেলে এবং আত্মপ্রত্যয় যাহার থাকে না, তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দাস মনোবৃত্তি তাঁহার মানবোচিত কৃষ্টি বা সংস্কৃতি আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে অসহায়ত্বের অন্ধতম স্তরে লইয়া যায়। সে ভীরু হইয়া পড়ে, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বলতার পাপের অনিবার্য্য যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা তাহাকে ভোগ করিতে হয়। দুর্ব্বলের সংস্পর্শের দোষই এই যে, সদিচ্ছাপূর্ণ প্রবলও সে সংস্পর্শে তাহার স্বাভাবিক গুণধর্ম্মকে হারাইয়া ফেলে এবং প্রবলের মধ্যেও মানবোচিত গুণবুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়। তাহাদের ইতরস্বার্থের আসক্তি বড় হইয়া উঠে। ইহাতে দুর্ব্বলের সংস্পর্শে প্রবলেরও পতন ঘটিয়া থাকে; ফলে যে পরাধীন সে জগতেরই কণ্টকস্বরূপ এবং তাহার অস্তিত্ব জগতে অনর্থের কারণ সৃষ্টি করে; পরাধীন ভারত এইভাবে জগতের অনর্থের অনেক কারণ সৃষ্টি করিতেছে। স্বাধীন ভারত জগতের শান্তি এবং মৈত্রীরই সহায়ক হইবে। পক্ষান্তরে পরাধীন ভারতের সর্ব্বনাশকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা প্রভুত্বপর বিজেতৃশক্তির নাই। কারণ, সে সর্ব্বনাশ হইতে ভারতের রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় শুধু তাহার নিজের উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহা হইল স্বাধীনতা অর্জ্জন করা।

দেশপ্রেমই যথেষ্ট নয়—

কটকের র‍্যাভেনসা কলেজের স্মৃতি উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন,—"আমরা গত পঁচিশ বৎসর একটি শব্দ শুনিতেছি, উহা হইল জাতীয়তা। জাতীয়তার সংজ্ঞা অতি সঙ্কীর্ণ। দেশপ্রেমিক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আমরা হইতে চাহি। ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য আমরা পৃথিবীর মানচিত্রখানি বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

সমগ্র মানবজাতির প্রতি সমদর্শন খুবই ভাল জিনিষ সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখা উচিত, ঐ আদর্শটা যেন দেশের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করিবার পক্ষে কিংবা দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবার কুণ্ঠার একটা অজুহাত হইয়া না পড়ে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সমগ্র মানব-সমাজের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিতা, ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু যাহারা তরুণ বয়স্ক যুবক, তাহারা এই আদর্শকে কতটা সত্যরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে ইহাই হইতেছে ভাবিবার বিষয়। ভারতের নিজের দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্র্যের অবধি নাই। আমাদের মতে দেশসেবার আদর্শের উপরই যুবকদের চিত্তকে প্রধানত আকৃষ্ট করা কর্ত্তব্য; পরিশেষে সেবার অন্তর্নিহিত আনন্দের সূত্র-সংযোগে তাহারা বৃহত্তর মানবতার আদর্শকে হয়ত উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। নহিলে দেশসেবার আদর্শ, জাতীয়তার আদর্শ সঙ্কীর্ণ—এই সব কথা যদি তাহারা এই বয়স হইতেই শুনে, তবে তরুণোচিত স্বাভাবিক পথে চিত্তবৃত্তির প্রসারতার উদ্দীপনা তো তাহারা পাইবেই না বরং বৃহৎ আদর্শের ফাঁকা কথার ভ্রান্তিতে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য ত্যাগ প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতেই তাহারা বঞ্চিত হইবে। ভারতের উন্নতির জন্য পৃথিবীর মানচিত্রখানা সামনে রাখিতে আপত্তি কিছুই থাকিতে পারে না, বরং তাহাই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীর সেই মানচিত্র পর্য্যালোচনার লক্ষ্য থাকা দরকার ভারতের উন্নতি এবং তাহা হইলে পৃথিবীর মানচিত্র পর্য্যালোচনার অপেক্ষা ভারতের মানচিত্রখানা সদাসর্ব্বদা চোখের সম্মুখে বেশী করিয়া খুলিয়া রাখা প্রয়োজন। দেশের লোকের দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে পরিচয় নাই, অথচ বিদেশী পাণ্ডিত্যের বড়াই জাতিকে বাঁচাইতে পারে না। আগে জাতিকে বাঁচাইতে হইবে, পরে বিশ্বের সেবা; সুতরাং জাতীয়তার সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ হইলেও অসঙ্কীর্ণ উদার আদর্শে উঠিবার বাস্তব পথ একমাত্র উহাই। সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ হইলেও পরাধীন জাতির পক্ষে দৃষ্টির সম্প্রসারণ-শক্তির সম্ভাব্যতা রহিয়াছে সেই জাতীয়তারই ভিতর। দেশের সেবা, জাতির সেবা—অন্য বড় কথা ছাড়িয়া আপাতত কিছুকাল তরুণদিগকে এই মন্ত্রে দীক্ষা দান করাই প্রথম প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় কথা তাহাদের বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি না করে।

[সাম্প্রদা]য়িক সমস্যায় হক সাহেব—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। অনেকেই বলিতেছেন, খুব ভাল উদ্যম। আমরাও বলি, খুব ভাল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় ইহা কে না চায়? হক সাহেব বলিতেছেন, বাঙলার সমস্যার মীমাংসার জন্য তিনি ১৫ জন হিন্দু ও ১৫ জন মুসলমানকে লইয়া ১০ই ফেব্রুয়ারী একটি বৈঠক করিবেন। হিন্দুদের মধ্যে শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চাটুজ্যে, শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে এবং শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ইঁহারা আমন্ত্রিত হইয়াছেন। হক সাহেব বলিতেছেন—ভারতের ইতিহাসের এই সঙ্কট সন্ধিস্থলে তাঁহার পক্ষে ব্যর্থতা বরণ করা উচিত নয়। আমার মত এই যে, কোন সম্প্রদায় বা কোন প্রতিষ্ঠানের ভারতের অগ্রগতি রোধ করিবার অধিকার নাই। অতএব দেশের বৃহত্তম স্বার্থের দিক হইতে বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর করা বাঞ্ছনীয় এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক দলগুলির এবং দলগুলির পরস্পরের মধ্যে অবিলম্বে আপোষ-রফা হওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু এই যে আপোষ-রফা ইহার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা না, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগের ফলে যে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ঘুচাইয়া দিয়া আপাতত এই সঙ্কটকালে ব্রিটিশ জাতির দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করা। মৌলবী ফজলুল হক এই সমস্যা সমাধানের জন্য মিশ্রিত মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। জিন্না সাহেব এই প্রস্তাব আগেই করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা নূতন কিছু নয়। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতাকেই বড় করা হইয়াছে। সমস্যা সমাধানের পথ ইহা নয়। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন এবং বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রথা তুলিয়া দিয়া যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। হক সাহেব কৃপা করিয়া কংগ্রেসীদের তিনজনকে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলে লইতে চাহিয়াছেন; আমরা এই কৃপালব্ধ অধিকার চাহি না, আমরা বুঝি দেশবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিতে অধিকার। হক সাহেব যদি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা এবং বাঁটোয়ারা বাতিল করিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে মন্ত্রিগিরি লভ্য হউক বা না হউক, বাঙলার সমগ্র জাতীয় দল সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ পুষিয়া রাখিতে জাতীয়তাবাদীরা রাজী নয়। যে পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা বিদ্যমান থাকিবে এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিষক্রিয়া চলিবে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া সে পর্য্যন্ত প্রেম-মৈত্রীর এই সব জোড়াপট্টিতে পাকা কাজ কিছুই হইবে না।

গণ-পরিষদের তাৎপর্য্য—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেদিন বলিয়াছেন, বিপ্লব না হইলেও গণ-পরিষদ গঠিত হইতে পারে এবং ব্রিটিশ জাতির অধীনতার আওতায় বা তাঁহাদের মাতব্বরীতেও গণ-পরিষদ আহূত হইতে পারে। গত সোমবার কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে ছাত্রদের এক বিতর্ক-সভায়

'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'র সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ সেন এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ডাক্তার সেন বলেন—"জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে ভারতের জনগণের মধ্যে বিপ্লব আনিতে হইবে; সেই বিপ্লব যদি সম্পূর্ণ কার্য্যকরভাবে ঘটাইতে হয়, তবে গণ-পরিষদ এই ধ্বনি তুলিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা হইবে। যখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান হইবে এবং শাসনতন্ত্র রচনার সময় আসিবে, তখনই প্রকৃত গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন রচিত হইবে। গণ-পরিষদের দাবীটা বর্ত্তমানে বিপ্লবাত্মক ধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে; তাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আওতায় গণ-পরিষদ আহ্বানের কথাটা বলা যথাযথ বা নির্ভুল নহে। আবার গণ-পরিষদের দাবী ভারতের স্বাধীনতা আসিলেই করা উচিত—একথা বলাও ঠিক নয়। বর্ত্তমানে গণ-পরিষদের যে দাবী করা হইতেছে, তাহা ভারতের সকল ক্ষমতা হস্তগত করিতে সংগ্রামের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই।"

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আওতায় কয়েকজন নেতা মিলিয়া গণ-পরিষদ করিবেন, আমরা ইহার অর্থ বুঝি না। জনগণ সংগ্রামের ভিতর দিয়াই নিজেরা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সম্বন্ধে যেন সচেতন হয়, তেমনই সে অধিকারকে আয়ত্ত করিয়া থাকে এবং সেই অধিকারের অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া-পথেই গণ-পরিষদ প্রকৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং জনগণের দ্বারা বাস্তবিকভাবে শাসনতন্ত্র নির্ণয় সম্ভব হয়। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আওতায় কয়েকজন লোককে ডাকিয়া জুটাইয়া আনিয়া গোষ্ঠী-পরিষদ হইতে পারে, গণ-পরিষদ হয় না। সংগ্রামের ভিতর দিয়া গণ-শক্তির স্ফুরণের পথে গণ-পরিষদ গড়িয়া উঠিতে পারে. ডাক্তার সেনের এই অভিমতকে আমরাও সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সংগ্রাম এড়াইয়া গণ-পরিষদ গঠিত হইতে পারে না, ইহাই আমাদেরও স্থির বিশ্বাস।

মোস্লেম লীগের অভিযান—

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি মোস্লেম লীগের দাবী না শুনেন, তাহা হইলে জিন্না সাহেব একটা শাসন সঙ্কট সৃষ্টি করিবেন বলিয়া যে হুমকি দেখাইতেছিলেন তাহাতে আমরা একরকম হতভম্ব হইয়াই পড়িয়াছিলাম এবং একদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টি, অন্যদিকে শাসন-সঙ্কট সৃষ্টি—এই দুই কর্ম্ম যে লীগের কর্ত্তারা কি কৌশলে যুগপৎভাবে সিদ্ধ করিয়া নিজেদের কাজ বাগাইবে তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহলপূর্ণভাবে অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখন সে কৌতূহলের নিরসন হইয়াছে। বড়লাট জানাইয়া দিয়াছেন যে, লীগের সম্মতি ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা চলিবে না,—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এমন সর্ত্ত মানিয়া চলিতে পারেন না এবং কোন শাসনতন্ত্র নাকচ করিয়া দিবার ক্ষমতা যে লীগের থাকিবে ইহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইবেন না। বড়লাটের এই জবাব পাইবার পর লীগ স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে শাসন সঙ্কট সৃষ্টি না করিয়া তাঁহারা এক ডেপুটেশনে একেবারে ইংলণ্ডে হাজির হইবেন এবং সে ডেপুটেশনে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক, পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান, বাঙলার স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন এবং লীগের ধনুর্দ্ধর পুরুষ চৌধুরী খালিকুজ্জমান ইঁহারা থাকিবেন। লীগের সিংহ ব্যাঘ্রগণ যে ভারতে বীর বিক্রম না দেখাইয়া ইংলণ্ডে গিয়া নিজেদের বীর বিক্রম দেখাইবেন স্থির করিয়াছেন, ইহাতে ভারতবাসীরা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।

সদ্দৃষ্টান্ত—

(১) রাণাঘাটের জমিদার শ্রীযুত রণজিৎ পাল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বৃত্তির ব্যবস্থার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে বিদেশের উপযুক্ত অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করা হইবে এবং তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশক্রমে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিবেন। (২) ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী উৎকৃষ্ট ধরণের তুলা উৎপাদনের জন্য ময়মনসিংহ জেলার কৃষকদের মধ্যে যথাক্রমে ১ শত, ৫০ এবং ২৫ টাকার তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ঐ তুলা অন্ততঃ ২৫ টাকা মণ দরে ক্রয় করা হইবে।

শ্রীযুত পাল চৌধুরী যে মহৎ কার্য্যের জন্য অর্থদানে উদ্যোগী হইয়াছেন, শুধু বাঙলাদেশ কেন সমগ্র ভারতবাসী সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট ধরণা ভারতের বাহিরের লোকের আছে, এই ব্যবস্থায় তাহার প্রতীকার হইবে। শুধু সংস্কৃতির দিক হইতেই যে ইহার একটা বড় মূল্য রহিয়াছে তাহা নয়, ইহার রাজনীতিক গুরুত্বও বিশেষভাবে রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার বিরোধিগণ জগতে দেখাইতে চাহে যে, ভারতবাসীরা কতকটা অসভ্যগোছের জীব, সাদা চামড়াওয়ালাদের সুদীর্ঘকাল সেবার সৌভাগ্যে যদি তাহারা কোন দিন মানুষ হয়। এই প্রচারকার্য্যকে ব্যর্থ করিবার কাজও এই উদ্যমের ভিতর দিয়া অনেকটা হইবে।

মহারাজা শশিকান্তের পুরস্কার ঘোষণার ফলে ময়মনসিংহ জেলার যে সব অঞ্চলে তুলার চাষের উপযুক্ত জমি আছে, সেই সব জায়গায় তুলার চাষ করিবার জন্য কৃষকরা উৎসাহ লাভ করিবে এবং ময়মনসিংহে যে তেমন জমি আছে —পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ময়মনসিংহে তুলার চাষে যদি সাফল্য লাভ হয়, তাহা হইলে বাঙালীর নিজেদের বস্ত্রের জন্য বাহির হইতে আমদানী তুলার উপর নির্ভর করার অসহায় অবস্থা অনেকটা কাটিয়া যাইবে। বস্ত্রশিল্পের দিক হইতে বাঙালীর স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং সে ক্ষমতাও বাঙলার আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, প্রয়োজন শুধু কর্ম্মসাধনার।

গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার

আর এক প্রস্থ দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেল। আড়াই ঘণ্টাকাল গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের আলোচনাও হইয়া গেল, ফলও যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার বোম্বাইয়ের বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, অধিকন্তু যে অছিলা ভারতের অধিকার দিবার বেলায় ব্রিটিশ রাজনীতিকদিগের মুখে বরাবর শুনা গিয়াছে, সেই অছিলা বড়লাট বাহাদুর এ ক্ষেত্রেও দেখাইয়াছেন অর্থাৎ ভারতবর্ষকে যদি এখনও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ভারত রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি হইবে? ইংরেজের জঙ্গী বলের আওতায় না থাকিলে অসহায় ভারতবাসীরা বিদেশীর আক্রমণে রক্ষা পাইবে কেমন করিয়া সুতরাং ইত্যাদি; যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সহজে পাইবার পথ, যুদ্ধের পর সেই জিনিষটা পাইয়া ভারত কৃতার্থ হইবে, ইহাও বড়লাটের উক্তির ক্ষেত্রে পরোক্ষ তাৎপর্য্য!

ওয়ার্দ্ধা হইতে আপোষের আগ্রহে ছুটিয়া গিয়া মহাত্মাজী যদি নূতন কথা কিছু শুনিয়া থাকেন তাহা এই যে, যুদ্ধের পর এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না পাওয়া পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী ভারতের মানিয়া লওয়া উচিত। যে যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর বিরুদ্ধতা করিয়াছে, সমস্ত ভারত বড়লাট সেই যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীরই বরাত দিয়াছেন। অতিবড় নৈরাশ্যবাদীরাও বোধ হয় এমনটা কল্পনা করেন নাই; কিন্তু আমরা জানিতাম, কোন ব্রতের কি ফল!

মহাত্মা গান্ধীর যে জবাব দিবার তিনি দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, বড়লাট যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের দাবী ষোল আনা মিটে না। ফলে যুদ্ধ ঘোষণার পর এই পঞ্চম দফা আলোচনাও ফাঁসিয়া গিয়াছে। আলোচনা তো ফাঁসিয়া গেল, এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এখন দেশের নিকট কি কর্ম্মপন্থা উপস্থিত করিবেন, তাঁহারা কি চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কাল-বারিধির লহরী গুণিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন, না, স্বাধীনতার সাধনায় অধিকতর কার্য্যকর প্রণালী দেশকে প্রদান করিবেন? সমগ্র দেশ আজ আকুলভাবে তাহাই প্রতীক্ষা করিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটি যদি দেশের ভাব ধারার সহিত সংযোগসূত্র বজায় রাখিতে সময়োচিত সাহস প্রদর্শন না করেন তবে তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্যই লঙ্ঘন করিবেন এবং দেশবাসীরাও সে ক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইতে দ্বিধা করিবে না।

পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় সহকারী ভারত-সচিব প্রথম দফায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতে শাসনতান্ত্রিক বিষয় লইয়া কতকগুলি বৈঠকের পর সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; কিন্তু গত ১লা ফেব্রুয়ারী একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু সোমবারে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বড়লাট বাহাদুরের সাক্ষাৎকারের কথাই উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উহা ব্যতীত ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে তাঁহার আর কিছু বক্তব্য নাই। প্রথমতঃ মনে করা গিয়াছিল, এবার বুঝি বড়লাটের দেখা সাক্ষাৎটা শুধু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেই হইবে এবং তেমন মনে করার মধ্যেও এমন আশাও কেহ কেহ অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের ধুয়া ধরিয়া ভারতের জাতীয় দাবীর বিরোধিতা যাঁহারা করিতেছেন, এবার বুঝি তাঁহারা সত্যই ঘটনার চাপে পড়িয়া তাঁহাদের সেই বিভ্রম কাটাইয়া ভারতের অধিকাংশের মতই মানিয়া লইতে একটু আন্তরিক আগ্রহান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু পরে দেখা গেল, কেবল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নয়, জিন্না সাহেবও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন এবং মঙ্গলবার দিন জিন্না সাহেবের সঙ্গেও বড়লাট দেখা সাক্ষাৎ করেন। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবও গিয়া মোলাকাৎ করেন। সুতরাং সকল দলের সম্মত সিদ্ধান্ত বাহির করিবার বুদ্ধির চক্র যে কর্ত্তারা কাটিয়া উঠিয়াছেন বা তেমন যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবার মত মানসিক অবস্থায় এখনও আসিয়াছেন, ইহা মনে করা কঠিন।

বড়লাটের বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী সমস্যার সমাধানের বীজের সন্ধান পান। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ঐ সূক্ষ্ম বীজটি ধরা পড়িবে না ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে দক্ষিণমার্গী ব্যবহারবিদগণের ভাষ্যেরও অপেক্ষা করিতেছিলাম। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিংবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভাষ্য অবশ্য এখন পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই; কিন্তু অন্য অঞ্চল হইতে ভাষ্য পাওয়া যায়। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার বোম্বাইয়ের বক্তৃতার এক অংশে বলেন,—"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিভিন্ন বিবৃতিতে আমার মারফতে এবং পার্লামেণ্টের ভিতর দিয়া এ কথাটা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ওয়েষ্টমিনষ্টারী প্যাটার্ণের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভরতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহাদের লক্ষ্য।' কতদিন পরে, এই ধরণের সমানাধিকার লাভ করিবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, মধ্যবর্ত্তী সময়কে কার্য্যকরভাবে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

যতটা সম্ভব 'সময় সংক্ষেপ' করিবার এই যে ইচ্ছার কথাটা বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতার ভিতর রহিয়াছে, মহাত্মাজী ইহার মধ্যেই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের শাসনাধিকার সম্প্রসারণের আন্তরিকতার আভাষ পান। ইংরেজ ভারতের সম্বন্ধে যেমন নীতিই অবলম্বন করুক না কেন, তাহাদের অন্তরের শুভ বুদ্ধির উপর মহাত্মাজীর আত্যন্তিক একটা বিশ্বাস আছে। প্রকৃতপক্ষে আত্যন্তিক এই শুভ বুদ্ধিকে স্বীকৃতির উপরই বিশুদ্ধ সত্যাগ্রহের দার্শনিকতা বিধৃত; কথা এই যে, এত দিনের কাম লোভ প্রভৃতি ময়লায় যে আত্যন্তিক শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছে শুধু কথায় বা আলোচনাতেই কি তাহা পরিষ্কার হইবে, না সে জন্য ভারতের পক্ষ হইতে দুঃখ-কষ্ট ত্যাগ বরণের দ্বারা উত্তাপ দেওয়া কিছু প্রয়োজন হইবে? মহাত্মাজী দুঃখ-কষ্ট বরণের পথে দেশকে লইয়া যাইতে চাহেন না; সুতরাং

কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হইলেও 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট; প্রশ্নটা শুধু কতটা সত্বর সেই জিনিষ পাওয়া যাইবে, মহাত্মার নিকট ইহাই। শুধু এই প্রশ্নই যদি মহাত্মাজীর নিকট প্রশ্ন না হইত, অর্থাৎ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের প্রশ্নেই যদি তাঁহার আপত্তি থাকিত তাহা হইলে মহাত্মাজী বড়লাটের বোম্বাই বক্তৃতার মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির বীজ দেখিতে পাইতেন না; কারণ বড়লাট বাহাদুর সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া-দিয়াছেন যে, ভারতবাসীদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদান করাই ব্রিটিশ নীতির মূল লক্ষ্য।

বড়লাট বাহাদুর এই যে, লক্ষ্যের কথা বলিয়াছিলেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই; কারণ, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অধিকারের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি প্রদান তো দূরের কথা কয়েক বৎসর আগে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব হিসাবে স্যার স্যামুয়েল হোর এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' আবার দিব কি? আমরা তো ভারতবাসীদিগকে ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস দিয়াই ফেলিয়াছি এবং ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস সেখানে দস্তুর মত চালু হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং সে দিক দিয়া বড়লাটের কথায় নূতনত্ব নাই—নূতনত্ব ছিল অন্য দিকে এবং সাধারণ লোকে তাহা সহজে বুঝিবে না, শুধু তত্ত্বদর্শীরাই অনুভব করিবেন। 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' জিনিষটা তো কতকটা অলক্ষ্য এবং অনির্দ্দেশ্য, তাহা অনেক রকমই হইতে পারে। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার বোম্বাই বক্তৃতায় ভারতের জন্য বৃটিশ জাতির এই দানের বিশিষ্ট রূপের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, 'ওয়েষ্ট মিনষ্টারী' ধরণের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভারতবাসীদিগকে দান করা হইবে। এই যে ওয়েষ্টমিনষ্টারী মাপের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন —আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতবাসীদের পক্ষে ইহা একটা ফাঁকা—ভূয়া বস্তু মাত্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশসমূহের পক্ষে এই বস্তু স্বাধীনতার সার বস্তু হইতে পারে; কারণ উপনিবেশ-সমূহের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির যে সম্পর্ক ভারত-বাসীদের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নাই। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের সঙ্গে যোগ-সাজসে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে শোষণ এবং দলন করাই ঐ সব দেশে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মূলসূত্র। প্রেমের দৃষ্টির প্রগাঢ়তাবশে ব্রিটিশ জাতির ও ভারতবাসীর মধ্যে সেরূপ সম্পর্ক কল্পনা করিলেও ব্যবহারিক দিক হইতে তাহা সত্য হইতে পারে না—জেতা এবং বিজিতের মনোভাব থাকিয়াই যাইবে এবং কার্যত নীতিও নিয়ন্ত্রিত হইতে চাহিবে সেই মনোভাবের ভিতর দিয়াই। একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং তেমন স্বাধীনতাই ব্রিটিশ জাতি ও ভারতবাসীদের মধ্যে স্থায়ী সদ্ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের অন্য পথ নাই।

এই তো গেল স্বায়ত্ত-শাসনের 'ওয়েষ্ট মিনষ্টারী' সংস্করণের স্বরূপ, তাহার পরের কথা হইল এই যে, সেই যে বস্তু তাহাই বা লাভ হইবে কতদিনে? ব্যবধানকাল কার্য্যকরভাবে যতটা সম্ভব সংক্ষেপ করা হইবে; এই সংক্ষেপ করার কথা শুনিয়াই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবার আমরা কোন কারণ দেখি না; কারণ ঐ কথাটির আগে 'কার্য্যকর' যে কথাটি রহিয়াছে তাহার গূঢ়ার্থও কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে হইবে। এই কার্য্যকর করিতে করিতে মহারাণীর ঘোষণার পর যেমন বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তেমনই আরও কয়েক যুগ কাটিয়া যাইতে পারে। কারণ কর্ত্তারা এ পর্য্যন্ত কার্য্যকারিতার কোন গরজই যখন দেখান নাই—তখন এখন কার্য্যকর নহে, এ অজুহাত তো থাকিবেই এবং সেদিনের আর ক'দিন বাকী এ প্রশ্নেরও সহজে নিরসন হইবে না। প্রবল যখন কোন অধিকার নিজের হাত হইতে অনুগ্রহ হিসাবে দিতে চায়, তখন প্রার্থীর অযোগ্যতার ওজনটা স্বার্থের দিক হইতে তাহার কাছে সর্ব্বদাই বড় হয়। পক্ষান্তরে অধিকার আদায় করিয়া লইবার প্রক্রিয়া-পথে অযোগ্যতা কাটাইয়া জাতি সত্বরেই যোগ্য হইয়া উঠে; রাজ-নীতির ইহাই হইতেছে সনাতন সত্য।

আমরা এই আলোচনার ফলাফলের জন্য ততটা উৎকণ্ঠিত ছিলাম না। কারণ কি ব্রতের কি ফল হইতে পারে, ব্রিটিশ নীতির বিগত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের তাহা কিছু জানা ছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্বাধীনতা কোন জাতি কোন জাতিকে দিতে পারে না, তাহা অর্জ্জন করিতে হয়, সুতরাং স্বাধীনতা পাওয়া না পাওয়া আমাদের নিজেদের উদ্যমের মধ্যে যতটা নির্ভর করিতেছে, বড়লাট-গান্ধীজীর আলোচনার ফলাফলের মধ্যে ততটা নয়। স্বাধীনতা যদি সত্যই আমাদের কাম্য হয়, তবে কর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে,—নির্ব্বিঘ্নে, নিরাপদে মুড়ি-মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে আমরা কোন দিনই তাহা পাইব না। আলোচনায় এই সত্যটি সুনিশ্চিত হইয়া গেল; অনুগ্রহ-প্রত্যাশীদের মনের অবচেতন স্তর হইতে পর্য্যন্ত সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল এবং ইহাই হইল এই পরিচ্ছেদের প্রাপ্য বস্তু। বর্ত্তমান অবস্থায় এ জিনিষটি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

চলতি ভারত

বোম্বাই

পরাণুকরণপ্রিয়তার অভিশাপ

"বন্দীর পরাজয় তখনই সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে যখন সে আদর ক'রতে আরম্ভ করে সেই শিকলকে যা তাকে বেঁধে রেখেছে, তাকে যে বন্দী ক'রে রেখেছে তারই আচরণ এবং ভাবভঙ্গীকে সে অনুকরণ করতে সুরু করে।" মহাত্মা উপরের কথাগুলি লিখেছেন "হরিজনের" একটি প্রবন্ধে আমাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতির প্রমাণ দিতে গিয়ে। তিনি উল্লেখ করেছেন ভাষার এবং বেশভূষার দিক থেকে আমাদের পরাণুকরণ-প্রিয়তার। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ নর-নারীর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ যে ঘুচে গেছে তার একটা প্রধান কারণ বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা লাভ। আমাদের নিজেদের বাসভূমিতে আমরা যখন মুখে অনর্গল ইংরেজী বুলি কপচাই এবং ইংরেজের হ্যাট-কোট পরিধান করি—তখন একই সঙ্গে আমরা যে কতবড়ো হাস্যরসের এবং করুণরসের অবতারণা করি—তা কেবল রসিকজনেরই উপভোগ্য। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজীর খিচুরী না পাকিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারিনে এবং এই অদ্ভুত ভাষার জন্য মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করে থাকি। আমরা যখন এই খিচুরির ভাষায় কথা বলি আমাদের স্বদেশবাসী জনসাধারণ কি ভাষায় আমরা কথা বলছি বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ইংরেজী শিক্ষা সেক্সপীয়ারের এবং ডারইউনের ভাবধারার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছে কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের এবং আমাদের মধ্যে রচনা করেছে অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান। হ্যাটকোটের মোহ আমরা অনেকটা ছেড়েছি কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজী বুলির ছিটে-ফোটা দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষাকে আভিজাত্য দান করবার মোহ এখনও আমাদের পরাণুকরণপ্রিয় দাসসুলভ চিত্তকে ঘিরে রেখেছে। অথচ এই ইংরেজী বুলি বলবার প্রবৃত্তি যে আমাদের কত বড়ো আধ্যাত্মিক দৈন্যের পরিচয়—এ কথা আমাদের বোঝাবে কে? পরাধীনতা যে আমাদের সব দিক দিয়ে দেউলে ক'রে ফেলেছে—বিদেশীর ভাষাকে এবং বেশভূষাকে অনুকরণ করবার এই সর্ব্বনেশে মোহই তার একটা প্রকান্ড প্রমাণ।

মাদ্রাজ

বন্দিনী নারী

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় মহীশূরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমাদের পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যা মূল্যবান এবং সময়োপযোগী। তিনি বলেছেন, "বিয়ে এখন মেয়েদের পক্ষে একটা বন্ধনরজ্জু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষ যখন থেকে তাকে নিজের ব'লে দাবী করেছে তখন থেকেই তার স্বাধীনতার পালা শেষ হয়েছে। ভারতের গৃহে গৃহে শান্তির এবং প্রেমের প্রতিষ্ঠা হবে সেইদিন থেকে যখন নারী আর পুরুষ পরস্পরকে ভাবতে শিখবে শ্রদ্ধেয় সঙ্গী ব'লে, কেউ কাউকে নিজের চেয়ে ছোট ব'লে মনে করবে না, একজন আর একজনের কাছে অন্তরের সব কথা খুলে বলবে, পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্বামী স্ত্রী সংসারের কার্য্য পরিচালনা করবে।" আমাদের বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটা দুর্ভাগ্য হচ্ছে, মেয়েদের সম্মান করতে আমরা ভুলে গেছি। নারীকে আমরা মানুষের পর্য্যায় থেকে নামিয়ে যন্ত্রের পর্য্যায়ে ফেলেছি। আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য পুরুষ যে অধিকার দাবী করেছে নিজের জন্য—সে অধিকার নারীকে দেবার বেলায় তার কার্পণ্যের অবধি নেই। হাজার হাজার নারী তাই আজও পর্দ্দার আড়ালে যাপন করছে বন্দিনীর কারারুদ্ধ জীবন; তার অধিকার নেই জ্ঞানের আলোয়, তার অধিকার নেই নিজের পথে চলবার। সে প্রতিধ্বনি, সে ছায়া। পুরুষ তাকে ব্যবহার ক'রে আসছে তার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। তাই নারীর প্রকৃত মঙ্গল যেখানে সেখানে তার দৃষ্টি আদৌ পৌঁছায়নি। নারীর মঙ্গলকে আঘাত করতে গিয়ে পুরুষ আপনার গৃহজীবনের আব-হাওয়াকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে, নারীর আনন্দকে বিনষ্ট ক'রে পুরুষ আপনার পারিবারিক জীবনের আনন্দকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে। নীড়ের পরিবর্ত্তে যা সে রচনা ক'রেছে সে হ'চ্ছে নরক। পারিবারিক জীবনে পুরুষ যদি আনতে চায় মাধুর্য্য—তাকে নারীকে দান করতে হবে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা; নারীকে যন্ত্রের পর্য্যায় থেকে উন্নত করতে হবে মানুষের পর্য্যায়ে; তাকে ভালোবাসতে হবে এবং শ্রদ্ধা করতে হবে। ভালোবাসা যে মুহূর্ত্তে সত্য হয়ে দাঁড়াবে সে মুহূর্ত্ত থেকে নারীর মঙ্গল পুরুষের কাছে আর উপেক্ষার বস্তু হ'য়ে থাকবে না। মেয়েদের মুখে যে মুহূর্ত্ত থেকে হাসি ফুটতে আরম্ভ করলো—সে মুহূর্ত্ত থেকে সংসারে আরম্ভ হলো কল্যাণের জয়যাত্রা। কবে আমরা মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখ নিয়ে দেখতে শিখবো? কবে আমাদের সংসারের নির্ব্বাপিত মঙ্গলদীপগুলি শুভ্র দীপ্তিতে আবার জ্বলে উঠবে?

নির্ব্বুদ্ধিতা কার?

ব্যাঙ্গালোরে ডাঃ মিলিকান বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিজ্ঞান লক্ষ্মীর যেমন গুণবর্ণনা করেছেন—সাম্যবাদকেও তেমনি মন্দ বলেছেন। সোস্যালিজমকে তিনি নির্ব্বোধের প্রলাপ বলতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। বিজ্ঞানের গুণবর্ণনা করতে আমাদের কোনো কুণ্ঠা নেই—যাঁরা প্রকৃতির দুর্ভেদ্য অন্তঃপুর থেকে নূতন নূতন তত্ত্ব আহরণ ক'রে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন তাঁদেরও কাছে আমাদের প্রণাম পৌঁছে দিতে কোনো কুণ্ঠা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের চমকপ্রদ উন্নতি সত্ত্বেও পৃথিবী আজ দারিদ্র্যে, রোগে, যুদ্ধে এত অভিশপ্ত কেন—ডাঃ মিলিকান কি সে কথা ভেবে দেখেছেন? বিজ্ঞান-লক্ষ্মী সম্পদের প্রাচুর্য্য এনেছে কিন্তু সে প্রাচুর্য্যে কোটী কোটী বুভুক্ষু মানুষের

সংগে নিত্য দেখাশুনা হয়, আপনি তাদের মতো নন্—সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।...তাই আপনার সংগে ফর্ম্মালিটি করতে মনে বাধে।...

এ কথায় বিমলকান্তির বুকের মধ্যে যেন বিদ্যুতের কাঁপন জেগে উঠলো! অলকার মতো কিশোরী...অনেকের সংগে যে মেলামেশা করেছে, অনেককে যে দেখেছে...এ যুগের একজন অগ্রবর্ত্তিনী কিশোরী...সে তার মধ্যে পেয়েছে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়! এই স্বাতন্ত্র্যের কথায় যে ইংগিত... দেশীবিদেশী নাটক, নভেল পড়ে' বিমলকান্তি সে ইংগিতের অর্থ বোঝে! এ বয়সে কিশোরীর মুখে এত বড় সার্টিফিকেট পেয়ে বিমলকান্তি অনেকখানি গর্ব্ব ও সুখ অনুভব করলো।

অলকার কথায় সে বললে,—আপনি যদি ধন্যবাদ দিতেন, তাহলে আপনার সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলে যেতো!... ধন্যবাদ কথাটাকে আমি lip-deep বলে' জানি...ওর শিকড় বুকে থাকে না!

অলকা খুশী হলো; এবং কথায় কথায় দুজনে এলো চৌরংগী প্লেসের মোড়ে।

ট্রামের পর ট্রাম চলেছে...বাসের পর বাস...সে-সবে ভীষণ ভিড়! দুজনে দাঁড়িয়ে ছবির আলোচনা করছিল।

বিমলকান্তি বললে—ওদের জীবনটাই হলো জীবন। ও-জীবন নিয়ে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে ভয় হয় না। এরোপ্লেনের প্যারাশুট্ ধরে লাফাতে বুক কাঁপে না! ও-জীবন নিয়ে সারা পৃথিবীকে যেন ওরা ফুটবলের মতো পায়ে-পায়ে মারতে মারতে চলেছে! আমরা তো মরে আছি—ইট-কাঠ-পাথরের মতো...

অলকা বললে—মডার্নিজমের স্রোতে আমাদের জীবন জাগতে সুরু করেছে...এবার আমাদের পংগুতা যাবে!

বিমলকান্তি বললে—অসম্ভব! আমাদের এ পংগুতা ভাংগতে প্রচন্ড আঘাতের দরকার এবং সে আঘাত দিতে হবে খুব সাবধানে। বেহুঁশিয়ার আনাড়ির মতো আঘাত দিতে গেলে ওপরকার পংগু আবরণটা ভাংগার সংগে ভিতরের আসল বস্তুটুকু না ভেংগে গুঁড়িয়ে যায়!

—তার মানে?

বিমলকান্তি বললে—এ স্রোতে ময়লা-মাটী কাটছে, ভাবছেন? এ-স্রোতে যে ময়লা ভেসে আসছে তাতে ভয় হয়, 'মরালিটি'-বস্তুটি তার শুচিতা হারিয়ে 'ইমরালিটি' হয়ে না দাঁড়ায়! ওদের জীবনের উদ্দামতাটুকু নিলেই তো চলবে না...

বলতে বলতে চলন্ত ট্রামের দিকে নজর পড়লো। বিমলকান্তি বললে—ইস্, ট্রামে এখনো এত ভিড়! যাবেন কি করে?

হতাশকন্ঠে অলকা বললে—তাই দেখছি!...

বিমল বললে,—একখানা গাড়ী নিই...আমাকে নামিয়ে দিয়ে তারপর—

অলকা তীব্র প্রতিবাদ তুলে বললে,—না—না—অনর্থক কেন ট্যাক্সি ভাড়া দেবেন! পয়সাটাকে খুব শস্তা ভাবেন?

এ কথায় যে দরদ, বিমলকান্তি তাতে সুখী হলো। কিন্তু বেচারী অলকা! বিমলের জন্য পথে সে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে? সে পুরুষ-মানুষ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে...অলকারও না জানি কত বেশী কষ্ট হচ্ছে! তবু গাড়ীর কথা তুলতে বাধলো।

বিমলকান্তি বললে,—বাড়ী যাবেন কি করে শুনি?

অলকা বললে,—আরো খানিকক্ষণ দেখি...কিম্বা আপনার যদি কষ্ট না হয়, তাহ'লে পায়ে পায়ে চলুন, আপনাকে না হয় থিয়েটার রোডের মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিই—ততক্ষণে খানিক হাল্‌কা হবে'খন...লেডিস্ সীট একটা অন্তত খালি পাবো।

বিমলকান্তি বললে—আমার পা ধ'রে গেছে—দাঁড়াতে পারছি না,—আমি যদি একখানা ফিটন ভাড়া করি...যদি সে ফিটনে চড়তে আপনার আপত্তি না থাকে, তাহ'লে ভাবছি, আপনাকে আপনার বাড়ীতে পেঁছে, সে ফিটন নিয়ে আমি আমার হোটেলে যাই...

অলকা বললে—আপনার কথার কত প্রতিবাদ করি, বলুন? তাই করুন, বেশ!

ফিটন নেওয়া হলো। ফিটনওয়ালার সংগে ভাড়া ঠিক করলো অলকা...অলকাকে রসা রোডের ফ্ল্যাটে পেঁছে—পার্ক সার্কাসে বেংগল হোটেল,—দেড় টাকা।

অলকাকে ফিটনে তুলে বিমলকান্তি বসলো সামনের শীটে।

সসঙ্কোচে অলকা বললে—ওকি...না, না...ও-শীটে কেন?

বিমলকান্তি বললে—ঠিক আছি। আপনি চুপ ক'রে বসুন তো!

অলকা আর কোনো কথা বললো না...

গাড়ীতে দুজনে বড় একটা কথাবার্ত্তা হলো না। শুধু মামুলি-গোছের নিস্তব্ধতা ভংগ ক'রে অতি সাধারণ কথা। বিমলকান্তি বললে—এখানে ট্রামে কি ভীড়! এত লোক এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় ছিল? কি করছিল?

অলকা বললে—এক একদিন এমন হয়, রাত দশটাতেও ট্রাম এমনি লোক-ঠাসা! পাদানীতে পর্য্যন্ত ভিড়! সে ভীড় ঠেলে ট্রামে উঠতে পারি না!...তবু বাস নিতে পারি না। হোক দেশী ইন্ডাষ্ট্রী! শিখ ড্রাইভার আর কন্ডাক্টারগুলোকে আমি কেমন সইতে পারি না।

৫

ফিটন এসে দাঁড়ালো রসা রোডে অলকার চারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ীর সামনে। অলকা নামলো। নেমে বিমলের পানে চেয়ে বললে,—আসি...থ্যাঙ্কস দেবো না...আপনি বলেছেন, ও ফর্ম্মালিটি খুব বিশ্রী হবে। তবে মনের মধ্যে ঐ কথাটাই জাগছে—বদ অভ্যাসের দোষে!

বিমল বললে—মনে এলেও মুখে প্রকাশ করবেন না। সাবধান!

বলতে বলতে সেও নেমে পড়লো। বললে,—আলাপ হলো—আপনাকে একেবারে যদি আপনার ঘরে পেঁছে দিয়ে যাই, আপনার আপত্তি হবে?

সস্মিত কণ্ঠে অলকা বললে আপত্তি! কি যে বলেন...

আমি তাহলে খুব খুশী হবো।...খুব ভালো হবে...গাড়ীটা বরং ছেড়ে দিন। এখান থেকে অনেক গাড়ী মিলবে।

দরদস্তুর করে' ফিটনওয়ালাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারপর ফ্ল্যাটটার দিকে তাকিয়ে বিমলকান্তি বললে—এই পুরীতে আপনি থাকেন! উঃ এ যেন নোয়ার আর্ক!...বোধ হয় ট্রাম-ভর্ত্তি ঐ সব লোক এই পুরীতে বাস করে।...কত লোক থাকে, বলুন তো? বিশ-পঁচিশ হাজার?

হেসে অলকা বললে—বিশ-পঁচিশ হাজার না হলেও দেড়শো দুশো লোক তো বটেই!

বিমল শিউরে উঠলো; বললে—এতেও যদি সোশ্যালিজম্ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে তার দাঁড়াবার আর কোনো আশা থাকবে না।...কিন্তু আমি ভাবছি, এই ভিড়...এর মধ্য থেকে আপনি নিজের ঘর ঠিক খুঁজে নিতে পারেন! এ ভিড়ে কোনোদিন হারিয়ে যান্ না, আপনার বাহাদুরী আছে, বলবো।

অলকা বললে—আপনি এ-বাড়ীতে থাকলে হারিয়ে যেতেন বোধ হয়?

বিমল বললে—নিশ্চয়। তাছাড়া নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে কতবার যে অপরের ঘরে ঢুকে গলাধাক্কা খেতুম, সে আর কহতব্য নয়!

অলকা বললে—যাক, সে-ভয় আপনার নেই। কারণ এ-বাড়ীতে আপনি বাস করেন না এবং কোনো দিনই বাস করবেন না!...এ-বাড়ী হলো আমাদের মতো পায়রা-শ্রেণী লোকদের খোপ্!

বিমল বললে আমার কিন্তু ভারী কৌতূহল হচ্ছে। ভাবছি, এর মধ্য থেকে আপনার নিজের ঘরটি খুঁজে কি করে' আপনি সে-ঘরে প্রবেশ করবেন...

—এখনি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন'খন। আসুন......

অলকা ফটকের মধ্যে প্রবেশ করলো, বিমলকান্তি ঢুকলো তার পশ্চাতে। ফটকের পর একটা ল্যাণ্ডিং। সেই ল্যাণ্ডিংয়ের একপ্রান্তে সিঁড়ি।

অলকা বললে—কষ্ট হবে আপনার। আমি থাকি একেবারে সেই চারতলায়।

বিমল বললে—স্বর্গের একেবারে কাছাকাছি তাহলে... বলুন!

হেসে অলকা বললে—একরকম তাই।...এখন দেখুন, এ স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারবেন তো?

বিমল বললে—স্বর্গ সুনিশ্চিত পাবো জেনে সিঁড়ি ভাঙ্গার কষ্ট গায়ে লাগবে না, মনে হচ্ছে।

দুজনে সিঁড়িতে এলো। অলকা বললে,—এ সিঁড়ি রোজ কতবার যে ওঠা-নামা করি...

বিমলকান্তি বললে—লিফ্ট্ নেই?

অলকা বললে—আছে...সে শুধু ঐ নামেই। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন লিফ্ট্ অচল থাকে...আমরা খুব চেঁচামেচি করলে মিস্ত্রী আসে...লিফ্ট্ আবার চলে। দুদিন চলে' আবার বন্ধ হয়।

বিমলকান্তি বললে—বাড়ীওয়ালা তাহলে খুব বিচক্ষণ!... আপনারা ধর্ম্মঘট করেন না কেন?

হেসে অলকা বললে—ধর্ম্মঘট করে' ওপরে ওঠা বন্ধ করবো? না, নীচে নামা বন্ধ করবো?...বলুন...

বিমলকান্তি বললে,—ধর্ম্মঘট করে' সকলে এ-ফ্ল্যাট ছেড়ে দিন।

অলকা বললে—বাড়ীর যে দুর্দ্দশা শহরে...মানে, ভাড়া খুব বেশী। তার তুলনায় ফ্ল্যাট বেশ শস্তা।...সামনে ট্রাম... বাজার, পোষ্ট-অফিস সব একেবারে হাতের নাগালে।

কথায় কথায় দুজনে প্রায় তেতলার মাঝামাঝি এসে পৌঁচেছে ততক্ষণে...দুজনেই হাঁফাচ্ছে...

বিমল বললে,— একটু দাঁড়ান...দম নিন্।...ভগবান যখন বুকের মধ্যে প্রাণ পুরে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি এ-সব ফ্ল্যাট-বাড়ীর কল্পনাও করেন নি! কাজেই প্রাণ এ-দুর্ভোগ সইতে সহজে নারাজ হবে!

শান্তস্বরে অলকা বললে—হাঁফিয়ে পড়েছেন?

বিমল বললে—হাঁফানোয় অপরাধ কি, বলুন?...ভগবানের দেওয়া দমের পুঁজি চোদ্দ-আনা-ভাগ যদি আপনারা এই সিঁড়ি ওঠা-নামায় নষ্ট করেন, তাহলে বাকী দু'আনা দম নিয়ে কদ্দিন বাঁচবেন, ভাবেন?

অলকা বললে—সে-কথা ভাববার সময় কৈ?

বিমল বললে—আশ্চর্য্য স্বভাব করে' ফেলেছেন তো!... বোধ হয় স্বর্গের কাছাকাছি বাস করেন বলে' পার্থিব-প্রাণের ভাবনা বা ভয় প্রাণে জাগে না!

ওপর থেকে এক দল নর-নারী প্রচণ্ড দুপদাপ শব্দে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বয়ে নীচে নামছিল .যেন আল্পস্-পর্ব্বতের গা বেয়ে নীচের দিকে সবেগে গড়িয়ে আসছে আভালান্সের মতো! তাদের মধ্যে আছে ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী...

তারা চলে গেলে বিমল বললে—এ দেখছি হল্ অফ্ অল্ নেশন্স্...ইংরেজ আছে?

—না...

বিমল বললে,—সারা ভারতবর্ষের এপিটোম...ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস!...সেই গানটা বোধ হয় এই ফ্ল্যাট-বাড়ীতে বসে কিম্বা এ ফ্ল্যাট-বাড়ী দেখে লেখা হয়েছিল...গুর্জ্জর-পাঞ্জাব-মদ্র-কলিঙ্গ-উৎকল-বঙ্গ-বম্বই-রাজপুতান...নমো হিন্দু-স্থান!

অলকা উচ্চ-হাস্যে যেন ফেটে পড়লো, বললে—যা বলেছেন! একতলার বাইরের দিকে ক'জন কাবলীওয়ালা আছে আর রসারোডের দিকে আছে ইশলামিয়া হোটেল একটা!

বিমল বললে—এ খবরটা দিকে দিকে প্রচারিত হওয়া দরকার। ফ্ল্যাটের তাতে আর্থিক উন্নতি হবে। মানে, আমেরিকান টুরিষ্টরা তাহলে ভারত পর্য্যটনে এসে ওয়াইল্ড-গুজ্-চেজ না করে' একেবারে এই ফ্ল্যাটে এসে ভারতের বিভিন্ন জাতের পরিচয় নিতে পারবে! তাতে তাদের বহু পয়সা ও সময় বাঁচবে।

সিঁড়িতে খানিক দাঁড়িয়ে পাগুলোকে স্বচ্ছন্দ করে' এবং

বেদম বুকে আবার দম নিয়ে দুজনে বাকী সিঁড়ি পার হয়ে এলো চার-তলায়।

উপরে উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা দালান সুদীর্ঘ প্রসারিত এবং এ-দালানের পূব-পশ্চিম—দু'দিকে সার-সার কামরা। এক-প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তে চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন থিয়েটারের শীনে আঁকা রাজপথ...

অলকা বললে,—আমার ঘর একেবারে ও-প্রান্তে...দক্ষিণে। অর্থাৎ দক্ষিণ-দ্বার বলে' কথা আছে না? সেই দক্ষিণ-দ্বার পার হলেই পরলোক—আমার ঘর হলো সেই দক্ষিণ দ্বারে।

দুজনে চললো দালান মাড়িয়ে। দু'ধারের ঘরগুলোয় কি মিশ্র কলরব! ডান দিকের ঘরে ছেলেমেয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, বাঁ-দিকের ঘরে চলেছে বেতারের নাট্যাভিনয়! কোনো কামরায় দিনান্তে মিলিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী যে ভাষায় বাক্যালাপ করছে, শুনলে হৃৎকম্প হয়। একটা ঘরে একটি ছেলে মোটা গলায় হিষ্ট্রী মুখস্থ করছে—And William the Conqueror landed in England in 1066. বিমলের মনে হলো, উইলিয়াম দী কঙ্কারারের স্বর্গীয় প্রেতাত্মা যেখানেই থাকুক, এ নামকীর্ত্তনে নিশ্চয় তিনি হাতে লাল পেন্সিল তুলেছেন এগজামিনেশন-পেপারে ছেলেটিকে ফুল-মার্ক দেবার জন্য!

এমনি বিচিত্র কলরব শুনতে শুনতে দুজনে উপনীত হলো অলকার কামরার দ্বারে। হাতব্যাগ খুলে চাবির রিং বার করে' অলকা ঘরের চাবি খুললো, বিমলের পানে তাকিয়ে বললে—দাঁড়ান, আগে আমি ঘরে আলো জ্বালি।

ঘরে ঢুকে অলকা সুইচ টিপে আলো জেবলে দিলে, দিয়ে বিমলকে ডাকলো,—আসুন.........

বিমল এলো ঘরের মধ্যে; অলকা বন্ধ সার্শি-খড়খড়ি খুলতে লাগলো।

বিমল দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে চাইলো।

ছোট ঘর। ছোট হলেও অল্প-স্বল্প আসবাব-পত্রে সজ্জিত। এক ধারে দক্ষিণের ছোট খড়খড়ির গা ঘেঁষে ছোট একখানি স্প্রিংয়ের খাট; খাটে শুভ্র শয্যা। শয্যায় একটা মাথার ও একটা পায়ের বালিশ এবং শয্যার প্রান্তে একখানি নক্সাদার সুজনি। খাটের ছৎরীতে নেটের ফর্শা মশারী। কোণে ছোট একটি টেবিল; তার সামনে কুশনে-ঢাকা একখানি ছোট চেয়ার। আর এক কোণে ছোট টেব্‌ল্‌হার্ম্মোনিয়ম—তার সামনে চৌকোণা একটা টুল। একদিকে ছোট ড্রেশিংটেব্‌ল্‌—তার উপরে ব্রাশ-চিরুণী, সেন্ট, পাউডারের কৌটা, নেইল-ব্রাশ্, রুজ, লিপষ্টিক্ পর্য্যন্ত...অর্থাৎ আপ্-টু-ডেট সর্ব্ববিধ প্রসাধনী!

খাটের পাশে ছোট র‍্যাক্—র‍্যাকে সাদা ও রঙীন কখানা শাড়ী, সেমিজ, ব্লাউশ, পেটিকোট—র‍্যাকের পায়ায় তিন-চারটে জুতোর বাক্স, এক জোড়া লাল-রঙের চটি। দেওয়ালে কখানা ছবি,—ফটোগ্রাফ। ফটো ক'জন সৌখীন নর-নারীর এবং ফিল্ম-ষ্টারের। এ-ঘরের পাশে আর একখানি ঘর। দু'ঘরের মাঝে দরজা—দরজায় পর্দ্দা। কাজেই ও-ঘরে কি আছে, দেখা যায় না।

বিমল বললে—কখানা ঘর?

অলকা বললে,—এইখানি আর পাশে একখানি। ও-ঘরের গায়ে একদিকে বাথরুম, আর-দিকে ছোট একটা ঘর। সে-ঘরে বাক্স-তোরঙ্গ রাখি। সেটাকে ঘর বলা চলে না।

বিমল বললে—রান্নাবান্না?

অলকা বললে—পাঁচতলার ছাদে।...আমি পাশের বাড়ীর সঙ্গে ভাগে খাই।

—তার মানে?

অলকা বললে,—ওঁদের বামুন আমার জন্য রাঁধে। সেজন্য আমি ওঁদের মাসে বারো টাকা করে দিই।

বিমল ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে,—ওঁরা যদি কোনোদিন শাক-চচ্চড়ি খান্, আপনাকেও তাই খেতে হবে? আর ওঁদের যেদিন কালিয়া-পোলাও খাবার সখ হবে, আপনার ভাগ্যেও সেদিন জুটবে ভালো খানা!...এ ব্যবস্থা ভালো নয়। তার কারণ, নিত্য দিনের আহার-সম্বন্ধে নিজের রুচি মেনে চলতে না পারলে খাওয়াটা হয় বিড়ম্বনা!

এ-কথায় ম্লান-দৃষ্টিতে অলকা চাইলো বিমলের পানে; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,— এ-ব্যবস্থা ছাড়া অন্য ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে যে সম্ভব নয়।

কথায় বেদনার আভাস! সে আভাসে বিমলের বুকের কোথায় যেন একটু চাড় পড়লো।

বিমল বললে—আপনার মা? বাবা?

নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে—তাঁরা কেউ নেই।

—ভাইবোন?

—ছিল না কোনোদিন।

এই হাস্যময়ী কিশোরীর জীবনের অন্তরালে নিঃসঙ্গতার কি প্রচন্ড ট্রাজেডি!

বিমল কোনো কথা বললে না...চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

অলকা বললে,—একটা কথা শুনুন তো...

—বলুন।

অলকা বললে—দয়া করে' বাথরুমে যান...আমি আলো জেবলে দিচ্ছি...সেখানে জল আছে, সাবান আছে, তোয়ালে আছে...মুখ-হাত ধুয়ে আসুন।...গায়ের চাদরখানা এখনো খোলেন নি!

অলকা নিজের হাতে বিমলকান্তির গায়ের উপর থেকে চাদরখানা টেনে নিয়ে তার র‍্যাকে রেখে দিলে—নিজের শাড়ীর পাশে। তারপর বললে,—যান্!...আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না! আমি আপনার চায়ের ব্যবস্থা করি।

বিমল বললে—তার চেয়ে বাড়ী যাই...আপনার ঘর তো দেখা হলো।

অলকা বললে—তা হবে না। দয়া করে' যখন পায়ের ধুলো দেছেন...সামান্য পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করতে দিন। আসুন আমার সঙ্গে...বাথরুমে আলো জেবলে দি...পাশের ঘরে আমি চা তৈরী করি, আপনি যান মুখ-হাত ধুতে।

(ক্রমশ)

সঙ্গীতের পীঠস্থান গোয়ালিয়র

[বরেন্দ্রনাথ বসু]

চম্বল নদী যখন পার হলুম, তখন আমার সহযাত্রীটি বললেন, "এইখান থেকে গোয়ালিয়রের এলাকা সুরু হল।"

গোয়ালিয়রের মাটীর ওপর দিয়ে যখন আমাদের ট্রেন হু-হু করে ছুটে চলেছে, তখন বার বার মনে হচ্ছিল, এই সেই গোয়ালিয়র—যেখানে তানসেন দিনের পর দিন এরই ধুলো-মাটী অঙ্গে নিয়ে তাঁর সাধনার পথে এগিয়েছিলেন। সেই তানসেন—যিনি আজ মূর্তিমান সঙ্গীতরূপে আমাদের মনে বিরাজ করছেন—

তানসেনের সমাধি মন্দির

যাঁকে আদর্শ করে আজও কতশত লোক সঙ্গীতের সাধনায় জীবন ঢেলে দিয়েছে, সেই তানসেনের লীলাভূমি এই গোয়ালিয়র।

গোয়ালিয়র ষ্টেশনে নেমে দেখলুম আমার বন্ধুটি যিনি ওখানে গান শিখছেন তিনি আমার জন্যে প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছেন। প্রথমেই তাঁর কাছে সন্ধান করলুম, তানসেনের সমাধি-মন্দির কতদূর।

বন্ধুবর বললেন, "খুব বেশী দূরে নয়—নিকটেই—একখানা টাঙ্গা নিলে আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছান যাবে"—

কিন্তু দীর্ঘ দিনের রেল ভ্রমণের ক্লান্তির জন্যে বন্ধু সেদিন আর আমাদের যেতে দিলেন না।

পরদিন ভোর বেলা আমরা তানসেনের সমাধি মন্দিরের দিকে রওনা হলুম। পথে আমার বন্ধুবর নানারকম জ্ঞাতব্য তথ্য আমায় বলতে বলতে চললেন। তার মধ্যে প্রধান কথা তানসেনের সমাধি মন্দিরটি সম্বন্ধে। তাঁর মনে সবচেয়ে বড় আঘাত লেগেছে—সমাধি মন্দিরটি অত সাধারণ হওয়ায়।

দূরে থেকে যখন দেখা গেল—তখন বন্ধুবর বললেন, "ওই—ওইটি তানসেনের সমাধি মন্দির—সাধে কি আমি বলছিলুম। গৌস মহম্মদ হতে পারেন তানসেনের ধর্মগুরু—হতে পারেন আকবর বাদশার ধর্মগুরু—কিন্তু তানসেনের মত একজন গুণীর সমাধি মন্দির এত সাধারণ করাটা যে কি করে বাদশা নবাবদের বা রাজা মহারাজাদের রুচি সম্মত হ'ল বুঝতে পারি না। আমার মতে তানসেনের সমাধি মন্দির তাজমহলের চেয়েও বিরাট-বিশাল হওয়া উচিত ছিল।"

আমরা জুতো খুলে মাটিতে রেখে মন্দিরে গিয়ে উঠলুম। দেখলুম দুগ্ধ-শুভ্র অতি ছোট্ট একটি মন্দির। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বারো ফুট করে হবে। তারই মাঝখানে তানসেনের কবর—তার ওপর একখানি সাধারণ কাপড় ঢাকা দেওয়া রয়েছে। চারিদিক খোলা—আর তিন ফুট আন্দাজ উঁচু পর্যন্ত অতি সস্তা জাফরির কাজ করা। কোথাও মণি-মাণিক্যের ঘটা নেই। আর ওরই দু' হাত পাশে একটা কোণের দিকে রয়েছে তাঁর প্রিয় শিষ্যের কবর। ওখানকার লোকেরা একটি নাম বলেছিলেন বটে—কিন্তু সে নামটি আমার স্মরণ নেই। মেঝেতে মার্বল পাথর বসান সাদা-সিধে-ভাবে।

আমরা গিয়ে বসলুম ওর ভেতরে। চুপ করে বসে ভাবছিলুম সাধারণ মন্দিরটির কথা।—যে মন্দিরে তানসেনের আত্মিক শক্তি সঞ্জীবিত রয়েছে। বিশাল অর্থব্যয়ে মণি-মাণিক্যের চাকচিক্যে বিরাট একটা দেউল রচনা করলে তার মধ্যে এই গুণীটির আত্মার স্পর্শ এমনভাবে পেতুম না; তার মধ্যে থেকে আমাদের মানস তানসেনকে এমনভাবে খুঁজে পেতুম না। তাই বোধহয় বার বার মনে মনে বলেছিলুম, "হে গুণী, হে জ্ঞানি, হে কবি, হে প্রেমিক তোমার যোগ্য আসন এই-ই। অর্থ আর জৌলুষ দিয়ে তোমায় এরা যে কলুষিত করেনি—তার জন্যে এদের অশেষ ধন্যবাদ।"

তারপর বন্ধুবরের কাছে শুনলুম যে প্রতি বৎসর ওই মন্দির প্রাঙ্গণে তানসেনের মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিন মহারাজের তরফ থেকে সমস্ত বড় বড় ওস্তাদদের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র যায়—ওই দিনটিকে সার্থক করে তুলবার জন্যে। সেইদিন সমস্ত ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় গুণী এসে গানের সুরে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি তানসেনের বেদী-পীঠে অর্পণ করে যান। ওই দিনটিকে ওখানকার লোকেরা তানসেনউরস্ বলে। ওইদিন বোধহয় বিশ ত্রিশ হাজার লোক ওখানে জমায়েত হয়।

তানসেনের সমাধি

গোয়ালিয়র আজ যে শুধু সঙ্গীতের পীঠস্থান হয়ে রয়েছে তা নয়, গোয়ালিয়র আজও সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র। আজও ওখানে যে সব বড় বড় ওস্তাদ রয়েছেন—তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষের গুণী সমাজে বিশেষ সমাদর পেয়ে থাকেন। একথা অনায়াসে বলা চলতে পারে যে শাস্ত্রোক্ত ও ব্যাকরণসম্মত সঙ্গীতের এরাই

শিরোমণি। তাই আজও গোয়ালিয়রে প্রতি বৎসর তিন চারশ' ছাত্র ভারতবর্ষের নানা দেশ থেকে গান শিখতে আসে।

ওখানে দুটি গানের স্কুল রয়েছে। একটি ষ্টেটের ও একটি পণ্ডিতশঙ্কর রাও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। আধুনা তাঁর সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত কৃষ্ণ রাও এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ষ্টেটের স্কুলকে গোর্কি বলা হয়; প্রতি বৎসর চার পাঁচশ' ছাত্রকে বিনা বেতনে এখানে গান ও বাজনা শেখান হয়। এই স্কুলের শিক্ষা-কাল পাঁচ বছর। এই স্কুলের জন্যে বিরাট এক প্রাসাদ মহারাজের তরফ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 'পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে ও লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের পরিচালনাধীনে ওই স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা। ওখান থেকে পঞ্চম বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে অধ্যাপক পদবী দেওয়া হয় আর একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

আর শঙ্কর গন্ধর্ব বিদ্যালয়—একটি প্রাইভেট স্কুল। ওখানকার ছাত্রসংখ্যা মাত্র শ'খানেক—মাসিক মাহিনা তিন টাকা—গান বাজনা দুই-ই শেখানো হয়। ওখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা গন্ধর্ব মতে ও পণ্ডিত কৃষ্ণ রাওয়ের মতে। ওই স্কুলের ছাত্রদের জন্যে আলাদা বই পণ্ডিতজী নিজে লিখেছেন। ওখানকার শিক্ষাকাল সাড়ে তিন বছর। খেতাব সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম না থাকলেও পণ্ডিতজী নিজে কৃতি ছাত্রদের সার্টিফিকেট দেন। তবে একটা জিনিষ দেখা যায় যে পাঁচ বছর গোর্কি স্কুলে নিয়মিত পড়ে ছাত্ররা যা শেখে—পণ্ডিতজীর স্কুলের ছাত্ররা সাড়ে তিন বছরে তার চেয়ে যথেষ্ট বেশী শেখে।

গোর্কি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল রাজাভাইয়া

শঙ্কর গন্ধর্ব বিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষত্ব পণ্ডিতজী নিজে এর তত্ত্বাবধান করেন—আর প্রতি ছাত্রের ওপর তিনি নিজে নজর রাখেন। আর এই স্কুলে গোর্কি স্কুলের চেয়ে যথেষ্ট বেশী রাগ-রাগিণীর তালিম দেওয়া হয়। আমি যতদূর দুটি স্কুলের ছাত্রদেরই দেখেছি—তাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে প্রকৃত যদি কেউ গুণী হতে চান তা হলে পণ্ডিতজীর স্কুলেই শিক্ষা নেওয়া ভাল। তাতে বনেদ অনেক পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া একটি বিশুদ্ধ জিনিষের শিক্ষালাভ করার পথে কোন অন্তরায় নেই, তার কারণ পণ্ডিতজী ও-বিষয়ে ভয়ানক সতর্ক। তাছাড়া ছাত্রদের ভাল ভাল গান শুনতে দেওয়ার জন্যে প্রতি বৃহস্পতিবার স্কুলের হলে আসর বসে—আর প্রতি আসরে উনি নিজে তিন চারটি করে গান গেয়ে শোনান। তার ওপর বাইরে থেকে কোন ওস্তাদ এলেই উনি নিজে তাঁদের ডেকে এনে ছাত্রদের ভাল গান শোনবার সমস্ত রকম সুবিধা দেন।

গোয়ালিয়র আগে ধ্রুপদ সঙ্গীতের জন্যেই বিশেষ খ্যাত ছিল। কিন্তু আজকাল ধ্রুপদের অস্তিত্ব ওখানে নেই বললেই হয়। ওঁরা খেয়াল সঙ্গীতের চর্চা করেন এবং ওইটাই ওখানকার সঙ্গীত বলা চলতে পারে। ঠুংরীর চর্চা ওখানে মোটেই নেই।

ওখানকার গান শুনে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে বোল তান, তান ও তালের ওপর ওঁদের নজর খুব বেশী। আলাপ যদিও কিঞ্চিৎ করেন- কিন্তু বোল আলাপটা ওঁরা একেবারে এড়িয়ে চলেন। তার কারণ ওঁরা মনে করেন বোল আলাপ করলে ঠুংরীর ভাব এসে পড়বে। সেইজন্যে ওঁদের গানে মিষ্টতা বড় কম। আর ওখানকার গানের মধ্যে আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাজটি সত্যিই অপূর্ব। ওখানকার সবচেয়ে প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে নিখুঁত স্বর-জ্ঞান।

গোয়ালিয়রের গান সম্বন্ধে আমার মতামত হিসেবে বলতে পারি যে আমাকে সবচেয়ে বেশী হতাশ করেছে ওখানকার বেশীর ভাগ গাইয়ের কণ্ঠস্বর। সে কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি প্রাণ-হীন। তবে পণ্ডিতজীর গলা মন্দ নয়—যদিও ওগলাকে ভাল বলা চলতে পারে না। ওখানকার গানকে পাণ্ডিত্যের দিক থেকে বা টেকনিকের দিক থেকে স্বীকার করতে হবে অতি উচ্চ স্তরের। কিন্তু ওখানকার গাইয়েদের আমি আর্টিষ্ট বলতে পারি না। ওদের গান শুনলে মনে হয় না যে গান ওদের প্রাণের জিনিষ। যদিও গানের মধ্যে সুক্ষ্মতম কাজের অভাব নেই, স্বরবোধের অভাব নেই, অভাব কেবল দরদের। রসবোধটা ওখানকার বেশীর ভাগ গাইয়েদের মধ্যে একেবারেই নেই। কত লম্বা লম্বা তান লাগাতে পারেন। তেলেনা ধরে তবলচির গান ওঁরা বংশানুক্রমে শেখেন আর আসরে দেখান কে কত বেশী শিখেছেন, কে কত রেওয়াজ করেছেন, তালে কে কত পাকা আর কার সাঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন। তবলচী র‍্যালা দিয়ে চলেছে আর গায়ক লয় বাড়িয়ে চলেছেন। মোটের ওপর বলতেই হবে যে আসর জমাবার ক্ষমতা ওঁদের অসাধারণ। যতক্ষণ গান চলবে ততক্ষণ শ্রোতার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই, প্রতি ইন্দ্রিয়টি উদগ্র সজাগ হয়ে আছে কখন সমে এসে পড়ে।

গোয়ালিয়রের অনেক গাইয়ের গান শোনবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। তাঁদের নামের ফিরিস্তি দিয়ে কোন লাভ নেই। এখন গোয়ালিয়র মাত্র দুটি গাইয়েকে নিয়ে তাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পণ্ডিত কৃষ্ণ রাওয়ের—তারপর গোর্কি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল রাজাভাইয়ার। আজও গোয়ালিয়র পরদেশীদের সমানে বুক ফুলিয়ে বলে, "আমা-দের পণ্ডিতজী আছেন।"

আজকাল গাইয়ে মহলে শুনতে পাওয়া যায় যে সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা লোপ পেয়েছে। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার সুযোগ খুবই কম। তবুও আমার মনে হয়—পণ্ডিতজীর গান শুনলে আশ্বস্ত হওয়া যাবে যে যদিও সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা প্রায় লুপ্ত কিন্তু একেবারে লোপ পায় নি। তার একমাত্র প্রমাণ পণ্ডিতজী।

বাঙলাদেশে প্রতি বছর দুটি তিনটি করে কনফারেন্স হচ্ছে। কিন্তু গোয়ালিয়রের কণ্ঠসঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য শ্রোতাদের ঘটে না। বাঙলাদেশের শ্রোতারা যদি পণ্ডিতজীর গান শোনেন—তা হলে একথা তাঁরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করবেন যে এতদিন তাঁরা বিশেষ একটি সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

মাদুলী

(গল্প)

শ্রীঅজিতকুমার রায় চৌধুরী

হরিচরণের ঐ প্রধান রোগ। লোকে ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বলে পাগল। কেও কেও বলে, কিসের, ওটা একটা বদমাস। লোকের কাছে সাধু সাজবার জন্যে ঐ রকম করে বেড়ায়। লোকের কথায় কি আসে যায়? বেশ আছে হরিচরণ, গ্রামের কোন কাজে হরিচরণ বাদ পড়লেই সব পণ্ড হয়ে যায়। সেদিনও কেশব মিত্তির কলকাতায় যাবার সময় হরিচরণকে নগদ দশটা টাকা দিয়ে গেলেন মিষ্টি খেতে। কিন্তু মিষ্টি খাওয়া হোল কোথায়? ভিন্ গাঁয়ের ছেলেরা মিলে ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো করল, হরিচরণ তাতে দিয়ে বসল দু'টাকা চাঁদা। আর না দিয়েই বা করে কি, হাজার হোক হরিচরণ একটা গণ্যমান্য লোক। বউ রাগ করল, বয়ে গেল। বউরা অমন রাগ করেই থাকে তাতে কি হয়? বউরা রাগ করে বলেই ত তাদের আরও ভাল লাগে। তারপর সেই টাকা আরও কি রকমভাবে যেন খরচ হয়ে গেল, বউয়ের সে কি রাগারাগি।

হরিচরণদের পূর্ব্বপুরুষদের অবস্থা ভালই ছিল। হরিচরণের বাবারই তেজারতির কারবার ছিল, সে সব নষ্ট হয়ে গেছে। আর হবেই বা না কেন, হরিচরণের বয়স যখন সাত তখন ওর বাবা মারা যায়। ওর মা ওকে মানুষ করে, তখনও ওদের অবস্থা বেশ। ওর মা মারা যায়, যখন ওর বয়স ষোল। মা ত মারা গেল, কিন্তু যাবার সময় গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেল সাত বছরের কামিনীকে। তারপর দেখতে দেখতে দেড় কুড়ি বছর পার হয়ে গেল। সুখে দুঃখে কামিনীকে নিয়ে কাটল হরিচরণের। সংসারে অন্য প্রাণীর বালাই ছিল না, ছেলে-পুলেও হয়নি। সংসার যে কিভাবে চলে তার খোঁজ হরিচরণ রাখে না। নিজের একখানা মুদীখানার দোকান ছিল গ্রামের বাজারের ভেতর। হরিচরণের দেখবার সময় হয় না বলে সেখানা শ্রীদাম দেখে। দোকানখানার আয় বেশ। অন্তত কামিনীর তাই মত। শ্রীদাম মাস গেলে দশটি টাকা ঠিকমত হরিচরণকে দিয়ে খালাস হত, বাকীটা তার থাকত।

কামিনী এক একসময় হরিচরণকে এমন সব কথা বলত যাতে অন্য কেও হলে খুনাখুনি হয়ে যেত। হরিচরণ কিন্তু শুনে হাসত, কিছু বলত না। কামিনী এমনকি নিজের বৈধব্যও কামনা করত। হরিচরণ শুনে হেসে বলত, 'তা'হলে কে খাওয়াবে তোকে?'

'কেন, আমার ভাইরা কি সব মরেছে?'

'বালাই ষাট, কিন্তু একবারও ত খোঁজ নেয় না যে বোনটা মল না বেঁচে আছে!'

'তাদের নিজেদেরই মরবার সময় নেই তারা নেবে আবার অপরের খবর।'

'কামিনী, তোর সব দুঃখু আমি ঘুচিয়ে দেব, দাঁড়া।'

'আমি যখন চিতেয় শোব তখন সব দুঃখু ঘুচবে, তার আগে নয়।'

'শোন, ঘোষবাবু এসেই কলকাতায় নিয়ে যাবে তেনার দোকানে, মাস গেলে পনের টাকা মাইনে খোরপোষ বাদে।'

'সে ত আজ বিশ বছর ধরে শুনে আসছি।'

'অমনি বিশ বছর হয়ে গেল? ঘোষবাবু দোকান দিলে ত সেদিনে, সেই যেবার কলকাতা থেকে যাত্তার দল এয়েছিল।'

'হয়েছে হয়েছে, এখন খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়ি যাও, বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছে সে হুঁস আছে।'

'বড্ড মনে করিয়ে দিয়েছিস, ঐ আমার রোগ গল্প পেলে সব ভুলে যাই।'

'দেখ, যদি কোথায় যেতে বলে, তবে জলখাবার পয়সা গাড়ী ভাড়া সব চেয়ে নিও।'

'সে আর তোকে বলতে হবে না, আমি কচি খোকাটি নই।'

হরিচরণ যে কচি খোকাটি নয় তার সপ্রমাণ দিল বড়বাবুর কাছে। বড়বাবু ওকে বল্‌লেন পাঁচ্চর যেতে। পাঁচ্চর গ্রামটা হরিচরণের বাড়ী থেকে সাত ক্রোশ রাস্তা, মধ্যে দু'তিনটে নদী পড়ে। বড়বাবু ওকে জানিয়েছিলেন পয়সা দরকার হলে নিতে। হরিচরণ বললে, 'না না, পয়সার কি দরকার? পাঁচ্চর ত ঘরের কোণে, সকালে যাব বেলাবেলির ভেতরই ফিরব।'

বাড়ী যেতেই কামিনী জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে গো?'

'কত সব দামী কথা, তা তোর সে সব শুনে কি হবে? বুঝবি কিছু?' ভারিক্কি চালে হরিচরণ বলল।

'না হয় নাই বুঝলাম, শুনতে দোষ কি?'

'বড়বাবু এক জায়গায় যেতে বললেন।'

'কোথায়?' ভ্রু কুঁচকে কামিনী জিজ্ঞেস করল যেন হরিচরণ যা উত্তর দেবে আগে থেকেই সেটা মিথ্যে বলে বুঝতে পেরেছে।'

বারকয়েক মাথা চুলকে হরিচরণ বলল, 'ঐ যে, কি বলে না, দূর ছাই মনেও থাকে না, ঐ যে রে......।'

'কি মনে থাকে না?'

'ঐ যে, ক্ষান্ত পিসীর শ্বশুরবাড়ী যেন কোন গাঁয়ে...।'

'কেন, টেপাখোলায়।'

'হ্যাঁ টেপাখোলায়, ঐ তার পাশের গাঁটা যেন কি...চোদ্দরসি, না। ঐ চোদ্দরসিতে যেতে হবে, বাবুর কে আছে আপনার জন তাকে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলে আসতে হবে। পয়সা আর চাইলুম না কামিনী, কি বলিস্? চোদ্দরসি ত আর দু'দিনের পথ নয়, ঘণ্টাখানেক লাগে যেতে আসতে। তুই হলে ঠিক পয়সা আদায় না করে ছাড়তিস্ না এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

'তোমার হাতে ওটা কি?'

'এ একটা দরকারি জিনিষ, বাবুর সব চিঠিপত্তর তাকে দিতে হবে।'

বাইরে থেকে কে যেন বললে, 'মোড়লের পো আছ।'

'কে বটে আপুনি?'

'আমি জগদীশ চক্কোত্তির ছেলে, সিদ্ধেশ্বর।'

'কে, দা ঠাকুর, ধর দেখি কামিনী এই পোঁটলাটা। খবরদার

পোঁটলা ঘরে ফেলে কোথাও যাস্ না, বিস্তর টাকা আছে ওতে, কাল সকালে উঠে ওগুলা পোঁছে দিতে হবে পাঁচ্চরে। যাই, দা'ঠাকুর।

হরিচরণ সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা বলে যখন ঘরে ঢুকল তখনও কামিনী সেই পোঁট্লাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হরিচরণের বৌয়ের এ ধরণের মূর্ত্তির সঙ্গেও পরিচয় ছিল। কাজেই ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ বাদে হেসে ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার জন্যে বললে, 'আবার আর একটা কাজ জুটে গেল। পাঁচ্চর থেকে আবার উমেতপুর যেতে হবে দা'ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ী। মর শালা তুই, সবাই যেন আমায় কি ভেবেছে। যেদিন না বলব সেদিন বাছাধনেরা সব মজা টের পাবে।'

'কাল সকালে তোমায় কোথাও যেতে হবে না, যদি যাও তবে আমি অনথ বাধাব বলে রাখছি।'

কামিনী এর আগে 'অনথ' বাধাবার কথা বহুবার উল্লেখ করেছে।

'বলিস কি কামিনী, ভদ্দরলোকদের সব বললাম এখন না গেলে চলে?'

'চল, দেখি সব কেমন ভদ্দরলোকের বেটা! একটা মানুষকে সব মেরে ফেলবার জোগাড় করেছে।'

'মেরে ফেলবে কোন শালা? যা দেখি ভিন গাঁয়ে, হরিচরণ মোন্ডলের নাম সব্বাইর মুখে মুখে দেখবি।'

'অমন নামের মুখে আগুন। নিজের সংসার উচ্ছন্নে গেল, পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, উনি অপরের উবকার করে বেড়াচ্ছেন। ঘরে মরে পচে থাকলেও কেও ফিরে দেখে তোমায়? সব যে যার নিজের সাথ দেখে।'

'আমি বাবা ভোলানাথ কামিনী, তাই সবায় আমায় ডাকে। নে ভাত দে।' হাসতে হাসতে হরিচরণ বলল।

কামিনী হরিচরণকে আর একটু কম সরল হতে, ধূর্ত্ত হতে উপদেশ দেয়। ঐ দেওয়াই সার, ফল হয় না। কামিনীর উপদেশ শুনতে শুনতে হরিচরণ হাসে, বলে, 'লোকে যদি একটু উপকার পায় আমার কাছ থেকে তাতে ক্ষেতি কি?'

'ক্ষেতি নেই, শরীলটা একবার দেখেছ আরসিতে?'

'আর শরীল, কার জন্যে ঘর সংসারে মন দেই বলত কামিনী? একটা ছেলে পুলেও ঘরে নেই যার মুখের দিক চেয়ে খাটব।' কামিনী এ কথায় লজ্জিত হয়ে ওঠে, সত্যিই ভবিষ্যতের ভাবনা তাদের কিসের? দুটা পেট এরকমভাবে কেটেই যাবে।

'শোন, সেই যে সেদিন বলছিলাম কে একজন ফকীর এয়েছে, শুনছ, অমনি ঘুমিয়ে পড়লে, এতও ঘুমাতে পার।'

'না না, কই ঘুমিয়েছি, তুই বলনা।'

'সেই ফকীরের কাছে যাবে কাল?'

'কাল কি করে যাই সেখানে?'

'কেন, দত্তপাড়া ত উমেতপুরের রাস্তায়।'

'হ্যাঁ, অতটা খেটে আবার দত্তপাড়ায় ফকীরের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি। ভগবান যখন দেবে আপনা থেকেই আসবে।'

'বেশ বেশ, তোমার বক্তিমে থামাও দেখি, হয়েছে, আমার অপরাধ হয়েছে। এমন ঘরে কখনও নারায়ণ আসে?'

'কামিনী শোন, আজ একটু ঘুমাই কাল সকালে উঠে আবার যেতে হবে, ফিরে এসে যা হয় হবে। আর জানিস ত মাদুলি করাতে গেলে খরচা আছে, দু'চারজন বামুন খাওয়াতে হয়, অত পয়সা কোথায়? তারপর ধর যদি ছেলেপুলে হয়, তাদের খরচা আসবে কোত্থেকে, তার চেয়ে বেশ আছি তোতে আর আমাতে।'

'গরীবের ঘরে ছেলেপুলে বুঝি আর হয় না, না? সবতাতেই আদিখেতা।'

পাঁচ্চর আর উমেতপুর ঘুরে তিনদিন বাদে হরিচরণ ঘরে এল। বড়বাবু ওর কাজ দেখে খুব খুশী হলেন। হরিচরণ আপনা থেকেই বলল, 'লোক বটে তেনারা, কিছুতেই আসতে দিলে না। না, বলে খেয়ে যাও এখেনে। খেতেদেতেই বেলা গড়িয়ে গেল তারপর আবার চক্কোত্তি ঠাকুরের কাজে উমেতপুর যেতে হল সেখানেও থাকতে হল একদিন। কি করি, বামুন মানুষ তেনারা, দেবতা। বাড়ীর জন্যে মনটা ছট্ফট্ করছিল, কামিনী ছাড়া বাড়ীতে অন্য কেও নেই, হাজার হোক্, কামিনী মেয়েছেলে। মানুষের আপদ বিপদের কথা বলা যায় না।'

বড়বাবু রসিকতা করেই হয়ত বললেন, 'কামিনী তোমার চুরি যাবে না হরিচরণ, ভয় নেই।'

'তা শুনবনি বাবু, দেখান দেখি এ জেলার মধ্যে আমাদের ছোট জাতের ঘরে কামিনীর মতন চেহারা।'

বড়বাবুর মেয়ের ঘরে যে ছেলে তাকে নিয়ে এল একজন ঝি। ছেলেটির চেহারা বেশ। হরিচরণ ছেলেটিকে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়ালে ছেলেটি এল।

'বা বেশ ছেলেটি ত। ইটিই বড়দিদিমণির পরথম ছেলে না, বড়বাবু?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ দেখতে, ঠিক যেন কার্ত্তিক ঠাকুরটি, অনেকটা আমার শালার মুখের আদল আসে।'

'হরি, এই টাকাটা রাখ, মিষ্টি কিনে খেও।' বড়বাবু একটা টাকা হরিচরণের দিকে ধরলেন।

'রাম বল, কি দরকার বাবু। যখন দরকার হবে আপনা থেকেই চেয়ে নেব। তার চেয়ে খোকাটিকে আমি নিয়ে যাই, আবার দিয়ে যাব খানিকক্ষণ বাদে।'

খোকা কিন্তু কামিনীর কোলে কিছুতেই যেতে চাইল না। হরিচরণ বলল, 'দেখলি কামিনী, ওনারা দেবতা কিনা তাই জানতে পারে মনের ভাব। আমার বাপদাদারা কত বড় লোক ছিল তাই খোকা আমার কোলে এয়েছেন।'

'বাপদাদারা বড়লোক ছিল তবে আর কি, সেই নাম ধুয়ে জল খাও। আয়রে খোকা, ওর কাছে থাকতে নেই।' খোকাকে একরকম জোর করেই কামিনী হরিচরণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জায়গায় সরে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক ধরে কামিনীর কোন পাত্তা নেই। গেল কোথায়, তার ওপর পরের ছেলে রয়েছে সঙ্গে। কামিনীর খোঁজ মিলল, এতক্ষণ সে রান্নাঘরের পেছনে বসে ছেলেটিকে সাজিয়েছে। কামিনীর আদরের ঠেলায় ছেলের প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়, সারা মুখখানা কাজল কালিতে ভর্ত্তি হয়ে গেছে।

'এ্কি করেছিস কামিনী, ছেলেটাকে যে একেবারে ভূত সাজিয়েছিস্? বড়বাবু দেখলে কিন্তু রাগ করবে, ওরা কি আমাদের মতন নোংরা। দে ওকে দিয়ে আসি, আর আমার ভাত বেড়ে রাখ।'

বড়বাবু নাতীর চেহারা দেখে বাইরে হাসলেও মনে মনে খুব চটে গিয়েছিলেন কিন্তু কিছু বললেন না। ছেলের মা কৃষ্ণা কিন্তু ছেলের দুরবস্থা দেখে আগুন হয়ে হরিচরণকে কড়া কথা বলল। হরিচরণ মুখ নীচু করে অপরাধীর মতন দাঁড়িয়ে রইল। বড়বাবু কৃষ্ণাকে থামিয়ে হরিচরণকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। হরিচরণ গম্ভীরমুখে বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

বাড়ী যেতেই কামিনী জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে শুনি তারা, আমায় খুব গাল দিলে ত? ইস্ তা আর হয় না, কেমন বলেছিলাম না, আমি যা সাজাব তার ওপর কারুর ওস্তাদি চলবে না।'

'নে থাম্, ভাত দিবি চল।'

'কি হল, অত রেগে গেলে কেন হঠাৎ?'

'না রাগব না, আমি রাগি বা না রাগি তাতে তোর কি?'

'বারে, এত আচ্ছা লোক গা। আমার কথায় তোমার গায়ে এত জ্বলুনি ধরে কেন বলত?'

'না ধরবে না, ওর কথায় যেন মধু মেশান আছে? আমায় রাগাসনি কামিনী।'

'ও ভারী আমার নাটসাহেব এলেন, কেন রাগালে কি হবে?'

'দেখবি কি হবে, দেখ।' হরিচরণ ঠাস করে এক চড় মারল কামিনীকে, দেড় কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম অভাবনীয় কান্ড ঘটল।

'হারামজাদীর ইদিক নেই ওদিক আছে। পরের ছেলেকে ভূত সাজিয়ে দেবে, গালমন্দ খেয়ে মর শালা তুই। বারণ করলুম অত করে, কাজল দিস্ না, তা যদি খেয়ালে গেল।' হরিচরণ গজগজ করতে করতে বাইরে গেল।

মার খেয়ে কামিনী হতভম্ব হয়ে গেল। যে মানুষটা সাত চড়ে কথা বলে না, সে যদি হঠাৎ কিছু একটা করে বসে ঝোঁকের মাথায় তবে তাতে বিস্মিত হতে হয় খুব।

খানিকক্ষণ বাদে ঘুরে এসে হরিচরণ এদিক ওদিক দেখে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে দেখে মেঝেতে কামিনী আঁচল পেতে শুয়ে আছে, বোধ হয় ঘুমাচ্ছে। হরিচরণ আস্তে আস্তে মুখটা নীচু করে ভাল করে দেখল কামিনী ঘুমাচ্ছে কিনা। চোখের পাতা দুটা তখনও ভিজে বলে মনে হল হরিচরণের, গালের নীচে কাপড়খানা ভিজে গেছে। সত্যি, ভারি অন্যায় হয়েছে কামিনীর গায়ে হাত তোলা। যে নারী হয়ে মাতৃত্বের দাবী করতে পারে না তার দুঃখের সীমা নেই। হরিচরণের চোখ দুটাও জলে ভরে এল সহানুভূতিতে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ধরা গলায় হরিচরণ ডাকল, 'অ কামিনী, ওঠ, অবেলায় ঘুমাতে নেই।'

কামিনী ঘুমের মধ্যে বার দুয়েক 'উঁ' করল। হরিচরণ খানিকক্ষণ আরও ডাকতে কামিনী উঠে বসল। হরিচরণকে সামনে দেখে মুখ ফিরিয়ে বসল।

'শোন কামিনী, রাগ করিস না। যদি থাকতিস্ তখন বড়বাবুর মেয়ের সামনে, তবে বুঝতিস্ তার কথার তেজ কত। শোন, সামনের মাসেই আমি তোকে মাদুলী এনে দেব। ওঠ খাবি চল।'

কামিনী গম্ভীর মুখে উঠে চলে গেল।

শত চেষ্টা করেও হরিচরণ কয়েকটা টাকা জোগাড় করতে পারল না। আর আশ্চর্য্য, আজকাল কেও পয়সা নেবার জন্যে একবারও বলে না। চাইলে পরে, দু'পাঁচ দিন পরে দেবার কথা বলে। কামিনীকে রোজ হরিচরণ আশ্বাস দেয় মাদুলী সে শীঘ্রই এনে দেবে। মাদুলী আনতে গেলে খরচা আছে কিছু, সেই খরচার অভাবেই কিছু হচ্ছে না। আর খরচাই বা এমন কি, জোড়া পাঁঠা লাগে, আর দক্ষিণা-টক্ষিণা পুজো-আর্চ্চা দিয়ে মোট দুয়েক টাকা। আহা, কেশব মিত্তিরের টাকাটা যদি তখন থাকত, তাহলে আজ আর এমন বিপদে পড়তে হত না। দোকানটাও নষ্ট হয়ে গেছে, শ্রীদামই দোকানটা খেলে। কি দরকার ছিল শ্রীদামের হাতে দোকান দেবার? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার ফল হরিচরণ হাতে হাতে পাচ্ছে। অপরের উপকার করে বেড়িয়ে নিজের এই সর্ব্বনাশ। এখন কেও ডেকেও জিজ্ঞেস করে না। ভাগ্যিস্ কামিনী বড়বাবুর বাড়ীতে একটা কাজ পেয়েছে। বড়বাবু লোক ভাল কামিনীকে খোরপোষ বাদে তিনটে টাকা দেন। কে দেয় পাড়াগাঁয়ে ঝি চাকরকে আজকাল এত মাইনে। কিন্তু কামিনী কি, ঝি? ছি ছি শিবনারায়ণের ছেলের বৌ শেষকালে ঝি হয়েছে। অদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

সেবার রথের সময় বড়বাবু লোচনগঞ্জের হাটে পাঠালেন হরিচরণকে জিনিষপত্তর কিনতে। তাইতে হরিচরণ আটখানা পয়সা পেয়েছিল। পয়সা নিতে হরিচরণের বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। কারণ, কৃষ্ণার ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়েছিল, ছেলেটি ওর ভারী বাধ্য, ওকে 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাকে। ঐটুকু ছেলের সামনে হরিচরণ নিজেকে অতখানি হীন ভাবতে পারে না। কিন্তু নিতেই হল বাধ্য হয়ে। জানলার পাশ থেকে কামিনী ইসারায় তাকে আরও বেশী করে পয়সা আদায় করবার জন্যে শিখিয়ে দিল।

রাত্তিরের খাওয়া দাওয়া সেরে হরিচরণ আস্তে আস্তে কামিনীর সামনে কতকগুলো খেলনা রাখলে।

'এগুলো কি হবে?'

'কেন, খেলা করবে।'

'কে তুমি? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে?'

'দূর, আমি কেন, ছোট ছোট ছেলেরা বুঝি খেলনা নিয়ে

খেলে না। দেখ, এইটে দু'পয়সা। এটা এ জেলায় মেলে না, সেই জাপুন আছে না, সেখানকার। এই দেখ এত বড় একটা বল মোটে দু'আনায়।'

'পয়সাগুলা বুঝি উড়িয়ে এলে?'

'না না, এই দেখনা, এখেনেই ত দু'পয়সা, ওটা দু'আনা, ওটা বুঝি ছ'পয়সা, তাহলে তোর হল গিয়ে দু আনা আর দু পয়সা দশ পয়সা, আর ছ পয়সা চার আনা। আর দু আনা দিয়ে বড়দিদিমণির ছেলেকে একটা বল দিইছি, আর দু আনা খেয়েছি।'

অত্যন্ত পরিষ্কার হিসেব সন্দেহ নাই, কিন্তু কামিনী রেগে ওঠে, হরিচরণ অপরাধীর মতন মাথা চুলকায়।

হরিচরণ দুঃখিত হল কৃষ্ণার ছেলেকে দেওয়া সেই বলের দুর্দ্দশা দেখে। কৃষ্ণা নাকি বলটা ছেলের হাত থেকে কেড়ে ফেলে দিয়েছে। বোধ হয়, গরীবের দেওয়া জিনিষের মর্য্যাদা নেই ভেবে। হরিচরণ বলটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছেলেটিকে দিল।

কামিনী ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। জ্বরটা বোধ হয় খারাপ ধরণের। বিড়বিড় করে যেন কি বলে। দু'একদিন জোরে জোরে চেঁচিয়েছিল, তাতে হরিচরণ শুনেছিল, কামিনী বলছে, 'কোথায় মাদুলী আনলে না', 'এখনও দত্তপাড়ায় যাওনি'।

হরিচরণের শরীরও ভাল না, ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, রোজ জ্বর হয়। তাছাড়া, গলা দিয়ে কাসির সঙ্গে রক্ত পড়াও দেখা দিয়েছে। কামিনীর ভাল চিকিৎসা হচ্ছে না, হবে কোত্থেকে। বড়বাবু দয়া ক'রে হরিচরণকে দু'বেলা ভাত দেন তাই যথেষ্ট। জ্বর গায়ে নিয়েই হরিচরণ খায়, উপায় নেই।

একটা কথা হরিচরণের মনে জেগেছে, কামিনী বোধ হয় আর বাঁচবে না। আহা, বেচারা! মা হবার কি ইচ্ছেই ছিল। মাদুলী একটা গড়াবারও ক্ষমতা হরিচরণের হল না। আর কিই বা হবে, নিজেরাই খেতে পারে না, তা অপরের খোরাক জোটাবে কোথা হতে। দরকার নেই ছেলেপুলের।

কয়েকদিন ধরে কামিনী খুব ভুল বকছে। যা বলে, তার মধ্যে 'মাদুলীর কথা', 'দত্তপাড়ায় যাবার কথা', 'ওর অনাগত ছেলের কথা'। হরিচরণ বড়বাবুর কাছে পাঁচটা টাকা চেয়েছিল।

'কি করবি টাকা নিয়ে হরিচরণ, বৌয়ের চিকিৎসা করবি। কেন সরকারী ডাক্তারখানাই আছে, সবই অমনিতে হবে।'

'না বাবু চিকিচ্ছে নয়, একটা মাদুলী গড়াব।' অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ বাদে হরিচরণ শেষের কথাটা বলেছিল। বড়বাবু টাকা দেন নাই, উল্টে গরীবের সন্তান আকাঙ্ক্ষা যে কতখানি বিপদকে ডেকে আনা তার উপদেশ দিয়েছিলেন।

মাইল পাঁচেক দূরের একটা গ্রামে ভীষণ ডাকাতি হয়ে গেল। ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় দশ বারজন ছিল। একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। ডাকাতরা নগদ টাকা বেশী না নিতে পারলেও সোনার গয়না নিয়েছে প্রায় সত্তর আশী ভরির।

তিনদিন বাদে হরিচরণ বাড়ী ফিরল। বড়বাবুকে বলে গিয়েছিল, সে শালাকে বউয়ের অসুখের সংবাদ দিতে যাচ্ছে। তিনদিন বাদে হরিচরণ বাড়ী ফিরল বটে কিন্তু মনে হল বয়স তার আরও তিরিশ বছর এগিয়ে গেছে। চোখে মুখে ভয়ের সশঙ্কিত দৃষ্টি, বড়বাবুর সামনে মাথা নীচু করে কোনরকমে কয়েক কথা বলে পালাল।

হরিচরণ ঘরে ঢুকল, সঙ্গে একটা পোঁটলা। মতি গয়লানী কামিনীর মাথার ধারে ছিল, হরিচরণকে দেখে বাইরে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পোঁটলা খুলে একটা ছোট্ট টিনের বাক্স থেকে সোনার একটা মাদুলী বার করে ঘুমন্ত কামিনীর ডান হাতে বেঁধে দিল। পোঁটলায় তার অনেকগুলো গয়না আর দামী কাপড় চোপড় ছিল।

সমস্ত গ্রামবাসী অবাক হয়ে গেল। আর হবেই বা না কেন। এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য; হরিচরণ ডাকাত, কয়েকদিন আগে ভিন্ গাঁয়ে যে ডাকাতি হয়েছে হরিচরণ নাকি সেই দলে ছিল। পুলিশ হরিচরণের ঘর থেকে চোরাই মাল কিছু বার করল, তারপর হাত কড়া পরিয়ে হরিচরণকে থানায় নিয়ে চলল।

হরিচরণের বাড়ীর উঠান লোকে লোকারণ্য, সবাই হতভম্ব। ঘরের মধ্যে বিকারের ঘোরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে কামিনী, ডান হাতে তার মাদুলী বাঁধা। দাওয়ার নীচে নেমে হরিচরণ শুধু পিছনের দিকে তাকিয়ে পাগলের মতন বলে উঠ্ল, 'চললাম কামিনী, মাদুলী খুলে ফেলিস্ না হাত থেকে, ছেলে হলে খবর দিস্।'

আজো

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ

আজো হেরি মানুষের মনের গুহায়
আদিম আরণ্য পশু মায়ানিদ্রা যায়।
কপট কুটিল সেই হিংসা মূর্ত্তিমান
ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্ত হয়ে নিজ মূর্ত্তিখান
প্রকট করিয়া তুলে নরের ছায়ায়।
উদ্দাম উন্মত্ত নর আজো তাই ধায়
দুই চক্ষে জ্বালি তার জিঘাংসা অনল
সমর অঙ্গন পানে। পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল—
তূর্ণ তার স্রোতাবেগে ভেসে যায় সব
জ্ঞান, ধর্ম্ম, কৃষ্টি আর যা' কিছু বৈভব
নরের নরত্ব। শুধু চলে অনুক্ষণ
সভ্যতার বক্ষে বসি বক্ষ বিদারণ।
উৎসারিত রক্তধারে রাঙা তাই রবি,
পূর্ব্ব দিগঙ্গনে আজো তারি নগ্ন ছবি!

মধু-শিল্প

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

আজকাল মধুমক্ষিকা পালনের কথা সময়ে সময়ে সংবাদ-পত্রে আলোচিত হইতে দেখা যায় এবং ব্যবসায়িক হিসাবে মধু উৎপাদনের চেষ্টাও স্থানে স্থানে হইতেছে। পাশ্চাত্যে মধু উৎপাদন বা সংগ্রহ এবং তাহা খাদ্যোপযুক্ত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা একটি বিশিষ্ট শিল্প। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে, মার্কিনে, কিউবা, চাইনা প্রভৃতি দেশে প্রভূত পরিমাণে মধু উৎপাদিত হইয়া জগতের বাজারে প্রেরিত হয়। মধু ব্যবসায়ে অনেক লোক যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে।

মধু উৎপাদনের সম্ভবপর ক্ষেত্ররূপে ভারত কোন দেশ অপেক্ষা হীন নহে। এতদ্দেশে বনে গ্রামে, পাহাড় উপত্যকায় স্বভাবত কয়েক জাতীয় মধুমক্ষিকা বাস করে। সেরূপ বন্য মধু চক্র হইতে অল্পবিস্তর পরিমাণে মধু সংগৃহীত হয়। ভারতের নানাস্থানে, বিশেষত উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ঔষধের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। মধু খাদ্যরূপে যতদিন না জনপ্রিয় হইতে পারে ততদিন উহার কাটতি যে বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তাহা বোধ হয় না। তবে আজকাল জনসাধারণ খাদ্যদ্রব্যাদির গুণাগুণ বিচার করিতে শিখিতেছে; তাহা হইতে আশা করিতে পারা যায় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট মধু অধিকদিন অনাদৃত থাকিবে না।

উৎপত্তি ও খাদ্য মূল্য

কীটকুল নানাপ্রকারে মানুষের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে; কিন্তু কতকগুলি কীট আবার আমাদের বিশেষ হিতকারী; মধুমক্ষিকা তন্মধ্যে অন্যতম। ইহা হইতে আমরা দুই প্রকারে উপকৃত হই। প্রথমত ইহা দ্বারা সংগৃহীত মধু আমাদিগের লোভনীয় খাদ্য এবং দ্বিতীয়ত ইহার মধু সংগ্রহ প্রবৃত্তিবশত ফুলে ফুলে বিচরণের ফলে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় ফসল
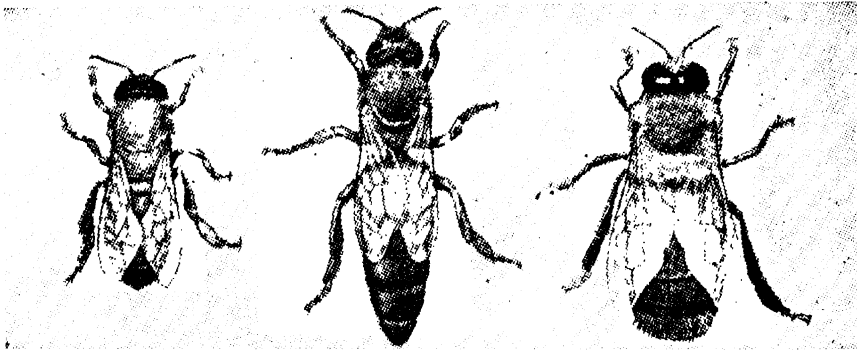
কর্ম্মী মৌমাছি — রাণী মৌমাছি — পুরুষ মৌমাছি

পুরাতন প্রথায় মধুমক্ষিকা পালন বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মধু উৎপাদন এ দেশে কখনই সুসংগঠিত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেইজন্য ভারতে যে কি পরিমাণ মধু ও মধুমোম বৎসরে উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। প্রাদেশিক বন-বিভাগসমূহের বার্ষিক বিবরণীতে গৌণ অরণ্য ফসলরূপে মধুর উল্লেখ অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু তাহা হইতে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এরূপ বিবরণী হইতে এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, কতিপয় অরণ্যাঞ্চলে, যথা সুন্দর বনে, বৃহদায়তন মধু-শিল্প প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

পল্লী-উন্নয়ন ও গ্রাম্য শিল্প পরিপুষ্টি পরিকল্পনায় মধু-শিল্পের যে বিশিষ্ট স্থান আছে তাহা [illegible] কলসীর [illegible] যায় না। উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে মধুক্ষিটি ছিদ্র [illegible] ধনাগমের একটি আনুসঙ্গিক উপায় হইতে [illegible] মৌমাছি প্রবে[illegible]শিচত। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি বিষয় বিবেচনানে চাক নিশ্চাত্যে মধুর বহুল কাটতির অন্যতম কারণ এই যে, উহা [illegible] খাদ্যরূপে পরিগণিত হয়; মধু অনেক সময় দৈনন্দিন আহার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে মধুর চলন হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, হয়ত এতদ্দেশে এক সময়ে মধু প্রকৃষ্ট খাদ্যরূপে গণ্য হইত। কিন্তু এখন ইহা সাধারণ খাদ্যের মধ্যে স্থান পায় না। ঔষধার্থেই মধুর প্রচলন অধিক। এমন কি, এতদ্দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধু যথা কাশ্মীরের পদ্ম মধু ও শ্রীহট্ট এবং খাসিয়া পাহড়ের কমলা মধু প্রধানত কোন কোন রোগোপশমে তথাকথিত উপযোগিতার জন্য উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। আর্থিক হিসাবে কোন দ্রব্যের খাদ্য ও ঔষধরূপে কাটতির

আমরা পাইয়া থাকি। সপুষ্পক উদ্ভিদের কতকগুলি জাতি যেমন স্বয়ং পরাগনিষেক সক্ষম (self-fertilised), তেমনি অন্য কতকগুলি নিষেক ক্রিয়ার জন্য বায়ু অথবা কীটপতঙ্গাদির সাহায্য প্রয়োজন হয়। কীট দ্বারা এক ফুলের পরাগ সমজাতীয় অন্য ফুলের গর্ভ চিহ্নে (Stigma) সংযোজিত হইলে গর্ভ উৎপাদন সম্ভবপর হয়। মধুমক্ষিকা মধু অন্বেষণের সময় অতর্কিতভাবে সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

প্রস্ফুটিত পুষ্পে পাঁপড়ি অথবা স্রকের তলদেশে ভবিষ্যৎ বীজের পরিপোষণ উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক স্থলীতে (nectar gland) শর্করা সঞ্চিত থাকে। কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদের ফুলে শর্করা সঞ্চয়ের মাত্রা এত অধিক যে, কৌষিক চাপের সমতা রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ শর্করা স্বতঃই নিসৃত হয়। মধুমক্ষিকা এইরূপ ফুল হইতে শর্করা সংগ্রহ করিয়া মধুতে পরিবর্ত্তিত করে।

শর্করাসমূহকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়— Saccharose, Dextrose ও Laevulose। প্রথমটি সাধারণত ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত শর্করা ইহা হইতে দ্বিতীয়টি দেড় গুণ ও তৃতীয়টি তিন গুণ মিষ্টতর। মধু দ্বিতীয় ও সমাধিক মাত্রায় তৃতীয় শ্রেণীর শর্করা দ্বারা গঠিত। ফুলে সময় সময় ইক্ষু শর্করা বিদ্যমান থাকিলেও মধুমক্ষিকা দ্বারা শোষিত হওয়ার পর তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মনুষ্যের পাকস্থলীতে ইক্ষু শর্করা পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইলে পর শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে পারে। সেই হিসাবে মধুকে পূর্ব্ব হইতে কতক পরিমাণে হজম

করা (Predigested) খাদ্য বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহাতে কতকগুলি Enzyme থাকায় পরিপাকক্রিয়ার আরও সহায়তা হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ও জীর্ণ শক্তিক্ষীণ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে ইহা উপযুক্ত খাদ্য। এতদ্ভিন্ন আরও একটি বিষয় এস্থলে বিবেচ্য। ইক্ষু শর্করা খাইতে খাইতে শর্করা ভক্ষণ অভ্যাস বাড়িয়া যায় (habit forming); অতিরিক্ত ভুক্ত শর্করা অবাঞ্ছিত চর্ব্বি সৃষ্টি করে। মধুতে সেরূপ কোন ভয় নাই; কারণ ইহা আবশ্যকাধিক পরিমাণে খাওয়া যায় না।

বিভিন্ন স্থানের মধুর মধ্যে স্বাদ ও গন্ধের যে পার্থক্য আছে তাহা অবশ্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যে জাতীয় ফুল হইতে মধু সংগৃহীত হয়, তাহার প্রকৃতি অনুসারেই এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। খাদ্যরূপে মধু ব্যবহার করিবার সময় মধু বিষাক্ত হইতে পারে বলিয়া অনেকে ভয় করেন। কিন্তু তাহা অহেতুক। মধুর বিষক্রিয়াঘটিত মৃত্যুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, তাপ বৃদ্ধি হয়ত কোন প্রকার মধু ভক্ষণে প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু তাহা মারাত্মক হয় না। কোন প্রকার মধু তিক্ত অথবা বিকৃত স্বাদযুক্ত হইলে তাহা পরিহার করাই কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র সেই রকম মধুই অনিষ্টকর হওয়া সম্ভব।

ভারতের মৌমাছি

ভারতে তিনটি প্রধান জাতীয় মধুমক্ষিকা দৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহাদিগের উল্লেখ করা গেলঃ—১। পাহাড়ে মাছি, Rock Bees Apis dorsata। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা সুলভ; কিন্তু অধিক উচ্চতায় ইহারা যায় না। গিরিগাত্রে, উচ্চ তরুশাখায় কিম্বা বাড়ীর কার্নিসের গায়ও ইহারা চাক তৈয়ারী করে। চাকগুলি বৃহদাকার; বড় চাক ৩ হইতে ৫ ফুট লম্বা ও ২ ফুটেরও অধিক গভীর হইতে পারে। এই জাতীয় মৌমাছি রুক্ষ প্রকৃতির, সহজেই উত্তেজিত হইয়া আক্রমণ করে। ২। ছোট বা ফুল মৌমাছি Apis florea। আকারে ইহা প্রায় সাধারণ মাছির সমতুল্য। বঙ্গ ও আসামে গ্রাম্য কুঞ্জে, নদীর ধারে, ছোট গাছে, গাছের কোটরে কিম্বা কদাচিৎ গৃহের বহির্ভাগে ইহাদের বিলম্বিত ক্ষুদ্র চাক দৃষ্ট হয়। ছোট মাছির স্বভাবও মোলায়েম নহে; ইহাদিগকে পোষ মানান যায় না। ৩। দেশী বা অর্দ্ধপালিত মাছি Apis indica। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র, সমতলে ও পর্ব্বতাঞ্চলে ৯০০০ ফুট উচ্চতা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। সাধারণত আবৃত স্থানে ইহারা চাক নির্ম্মাণ করে। গৃহের পরিত্যক্ত কামরায় দেওয়ালের ফাটলে, গাছের কোটরে, শুষ্ক কূপ কিম্বা মৃত্তিকা গহ্বরে এমন কি পুরাতন বাক্স ও টিন প্রভৃতির মধ্যেও ইহাদের চাক দেখা যায়। পালনের জন্যই সর্ব্বত্র এই জাতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ভারতে গৃহপালিত বা সম্পূর্ণরূপে পোষমানা কোন মধুমক্ষিকা জাতি নাই। A indica-ই অর্দ্ধপালিত মাছি বলিয়া পরিগণিত হয়।

মৌমাছির স্বভাব

পিপীলিকার ন্যায় মধুমক্ষিকাও সামাজিক কীট, অর্থাৎ ইহারা বহু সংখ্যায় একত্র বাস করে এবং ইহাদের মধ্যে সমাজ গঠন ও শ্রম বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মৌচাকে রাণী ব্যতীত কতকগুলি অপরিণত স্ত্রী ও কতকগুলি পুরুষ থাকে। ইহারা চাক গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি উপনিবেশের যাবতীয় আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া থাকে। রাণীর কার্য্য কেবলমাত্র সন্তানোৎপাদন। বংশ বৃদ্ধি হইয়া কোন চাকে অত্যধিক সংখ্যক

মৌচাকে মৌমাছি

মৌমাছি হইলে কতকগুলি মাছি ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া গিয়া নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে (Swarming)।

মৌমাছিরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে খুব ভাল বাসে। তাহাদের চাকে আবর্জ্জনা যেখানে সেখানে ছড়ান থাকে না। সংগৃহীত মধু [illegible] তাহারা কোন প্রকারে দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে আসিতে [illegible] মক্ষিকার শরীরাভ্যন্তরস্থিত একটি বিশেষ গহ্বরে [illegible] তথা হইতে চাকে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় [illegible] অবলম্বিত হয় যে, উহাতে কোনরূপ দুষ্ট বীজা[illegible] করিতে পারে না।

মৌমাছির ঝাঁক দ্বারা সময়ে সময়ে সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জব্বলপুরে প্রসিদ্ধ মার্ব্বেল পাহাড়ে এইরূপ দুর্ঘটনা দুই একবার ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সেখানে পাহাড়ে জাতীয় মৌমাছিই বাস করে। স্বভাবত তাহারা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এবং তদুপরি তাহাদিগকে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিরক্ত করিলে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণ মৌমাছির মেজাজ তত রুক্ষ নয়। আস্তে আস্তে চাক নাড়াচাড়া করিলে দলবদ্ধ মৌমাছি দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় ততটা নাই। মৌমাছিপালকগণের এ বিষয়টি বিশেষরূপে স্মরণ রাখা দরকার। ভীত ও ত্রস্ত হইলে স্বভাবজ বা কৃত্রিম কোনরূপ

চাকেই হস্তক্ষেপ করা চলে না। তাপের মাত্রার সহিতও মৌমাছির কোপের কতকটা সম্বন্ধ আছে। প্রত্যূষে ও প্রদোষে ইহারা অনেকটা শান্ত থাকে। প্রখর রৌদ্রের সময় কিন্তু ইহারা সহজে বিচলিত হইয়া উঠে। চাকে হাত দিলে যদি দেখা যায় যে, মৌমাছি পাখা মেলিয়া আছে ও উদরদেশ ইতস্তত সঞ্চালিত করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহাদের মেজাজ ভাল নাই। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এরূপ সময় দুই চারিটি মাছি স্বীয় দেহ হইতে এক প্রকার উদ্বায়ী পদার্থ নিঃসরণ করে, যাহার গন্ধ

মৌচাক

অনেকটা পক্ক কদলীর অনুরূপ। উহা চাকের মৌমাছিগণকে শত্রু আগমন জ্ঞাপনের সঙ্কেত বিশেষ।

পালন প্রথা

কোন স্থানের এক ক্রোশের মধ্যে যথেষ্ট ফুল পাওয়া গেলে তথায় মধুমক্ষিকা পালন চলিতে পারে। ফুল ফলের বাগান, বিশেষ জাতীয় শস্যের ক্ষেত্র কিম্বা বন্য উদ্ভিদ সমষ্টি যে সময় প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রসব করে, তখন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা স্বতঃই আসিয়া দেখা দেয় এবং নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানে চাক নির্ম্মাণ করে। সাধারণত যেরূপ স্থানে চাক দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তদ্ভিন্ন মানব বহু উপায়ে মৌমাছিকে নিজের সুবিধা মত স্থানে চাক তৈয়ারী করিতে প্রলুব্ধ করে। ভারতের নানা স্থানে এই রূপে মৌমাছি পালন বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাশ্মীর, কুমায়ুন, খাসিয়া পর্ব্বত ইত্যাদি অঞ্চলের মৌমাছি পালন ও মধু-শিল্প অনেক পুরাতন।

সাধারণত মৌমাছি আকৃষ্ট করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। গাছের গুঁড়ির কিয়দংশ কাটিয়া উহার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা করিয়া লওয়া হয়। পরে ঘরের বহির্ভাগে কোন আচ্ছাদিত স্থানে উহা রাখিয়া দিলে মৌমাছির ঝাঁক আসিয়া প্রায়ই উহাতে বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করে। অন্য উপায় হইতেছে, ঘরের দেওয়ালে কোন প্রকারে কলসী আটকাইয়া দেওয়া। আচ্ছাদনযুক্ত কলসীর মুখ দেওয়ালের ভিতর দিকে থাকে এবং তলায় একটি ছিদ্র করিয়া নিম্নাংশ বাহির দিকে রাখা হয়। এই পথ দিয়াই মৌমাছি প্রবেশ করে এবং কলসীর ভিতর প্রশস্ত স্থান পাইয়া সেখানে চাক নির্ম্মাণ করে। ফলত, যে প্রকারে ও যে স্থানেই চাক নির্ম্মিত হউক না কেন, পুরাতন প্রথায় মধু নিষ্কাষণের সময় মধুমক্ষিকাগুলিকে ধুম প্রদান দ্বারা বিতাড়িত করা হয় এবং সমস্ত চাকটিকে পেষণ করিয়া মধু বাহির করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য এই রূপে মধু নিষ্কাষণ করিলে মধুর সহিত পিষ্ট ডিম্ব, কীড়া প্রভৃতির রসও কতক পরিমাণে মক্ষিকার দেহাংশ মধুর সহিত চলিয়া আসে। তাহাতে শুধুই মধুর যে স্বাদের হানি হয় তাহা নহে, উহার সহিত জৈব পদার্থ (organic matter) মিশ্রিত থাকায় উহা অল্প সময়ের মধ্যে বিকৃত হইয়া যায়।

আধুনিক প্রথা

সকল সভ্যদেশেই উক্ত পুরাতন প্রথা পরিত্যক্ত হইয়া মধু-মক্ষিকা পালনের জন্য কৃত্রিম চাক সংযুক্ত বিশেষ প্রকারের আধার প্রস্তুত হইয়াছে। এই আধার বা বাক্সে কাঠের ফ্রেমে এক একটি মোম-নির্ম্মিত চাক রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক চাকে উপর্য্যুপরি অবস্থিত দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকে। মৌমাছি সহজ বুদ্ধিবশত ফ্রেম সংলগ্ন নীচের প্রকোষ্ঠে ডিম্ব, কীড়াদি রাখিয়া উপরের প্রকোষ্ঠে মধু সঞ্চয় করে। মধু সংগ্রহের সময় ফ্রেমটি বাহির করিয়া উপরের প্রকোষ্ঠটি তুলিয়া লওয়া হয়। সামান্য ঝাঁকি দিলেই মৌমাছিগুলি সরিয়া যায়। তখন Centrifuge নামক নিষ্কাষণ যন্ত্র দ্বারা মধু বাহির করা হইয়া থাকে। তৎপরে প্রকোষ্ঠটি আবার যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ নিষ্কাষণ প্রক্রিয়ায় প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি হয় না এবং মৌমাছিরা পূর্ব্বের ন্যায় আবার মধু সঞ্চয় করিতে থাকে। নিম্নের প্রকোষ্ঠটিও দরকার হইলে সমভাবে বাহির করিয়া লইয়া চাকের সাধারণ অবস্থা পরীক্ষা করা চলে।

আধুনিক প্রথায় মৌমাছি পালন সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা-লাভ করিতে পারিলেই ভাল হয়। কিন্তু তাহা যে একান্ত আবশ্যক সে কথা বলা যায় না। পুস্তক-পত্রিকাদির সাহায্যেও আমরা দুই চারিজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিচক্ষণ মৌমাছি পালক হইতে দেখিয়াছি। অবশ্য আধুনিক প্রথায় কতকগুলি যন্ত্র আবশ্যক। ফ্রেম, চাক ও Dummy Board-যুক্ত পালনের বাক্স তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়। ফ্রেম ও চাক রাখিবার আধার, সাধারণ ছুরী, কোষাবরা (cell cap) কাটিবার ছুরী, হ্যাট ও মুখাবরণ, ১ জোড়া দস্তানা, ধূম প্রদান যন্ত্র, মধু নিষ্কাষণ যন্ত্র, চাক ঝাড়িবার জন্য ব্রুস বা মোটা ঝাড়ন, মৌমাছির ঝাঁক ধরিবার জাল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, পালনের বাক্সের চারিটি পায়া জলপূর্ণ

ফুলের উপর মৌমাছি

মাটির গামলার উপর বসাইয়া রাখা ভাল। তাহাতে পিঁপড়া বা অন্যান্য কীট বাক্সে প্রবেশ করিয়া চাকের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যন্ত্রপাতির খরচ সর্ব্বশুদ্ধ ৩০।৩৫ টাকার অধিক পড়ে না। প্রথমত ২।১টি বিলাতী যন্ত্রের প্রয়োজন হ'তে পারে; কিন্তু বিলাতীর আদর্শে দেশী যন্ত্র অনায়াসে ও কম মূল্যে তৈয়ারী করাইয়া লওয়া যায়।

সর্ব্বশেষে মধু উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহা প্রধানত ফুলের মরসুম ও প্রাচুর্য্যতার উপর নির্ভর করে। স্বভাবত মৌচাকের ফলন সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আকৃতি অনুসারে একটি চাক হইতে ৫ হইতে ২০ সের মধু ও ১ হইতে ৫ সের মধুখ পাওয়া যাইতে পারে। কৃত্রিম পালন বাক্সের চাকগুলি ছোট; এরূপ ১০।১২টি চাক হইতে মোট মধু উৎপাদনের পরিমাণ ২ হইতে ৫ সের। অবশ্য বাক্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অভিলাষানুযায়ী যে কোন পরিমাণে মধু উৎপাদন করিতে পারা যায়।

বোকা

(গল্প)

শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

একটি শিক্ষিত যুবকের পক্ষে যাহা লজ্জাকর, পরিচিত অপরিচিতের নিকট যাহা ঈর্ষা এবং শ্লেষ-বিজড়িত কানাঘুষার কারণ, অনুপম এতদিন পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া আসিল; অথচ তাহাতে যে নিজের বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিল, এমন নয়। বেশ তো না-হয় একটু বড়মানুষ-ঘেষা হইলি, তাই বলিয়া তুই কী এতই নির্ব্বোধ যে নিজের ভালটা বুঝিতে শিখিলি না! এমন ছেলেকে লোকেই বা কী বলিবে, আর সে-ই বা লোককে কী বলিবে!

মা প্রায়ই বলেন, "পাশ্‌টাশ্‌ ক'রলি—এত বড় বড় লোকের সঙ্গে ঘুরিস্‌-ফিরিস্‌, আর একটা চাকরী যোগাড় ক'রতে পারিস্‌ না! শুধু টো-টো করলে কী কখনো পেট্‌ ভরে?"

অনুপম যেন কী! বলে, "যা বাজার পড়েছে—চাক্‌রি সব ফুরিয়ে গেছে! টো-টো ছাড়া তো আর কোন উপায়ই দেখিনে।"

মা বলেন, "কেন, এই তো সেদিন ও-বাড়ীর রাধিকার বেশ একটা চাক্‌রি হ'লো! ছেলে তো দিগ্‌গজ, পেটে ডুবুরী নামালে 'ক' বেরোয় না!"

অনুপমের সেই কথার ছিরি!—"ঐ জন্যেই তো অফিসে ডুবুরীর কাজ ক'রতে ওদের ডাক পড়ে। তোমার ছেলের পেটে বিদ্যের ভার এত বেশী যে, তলায় ডুব্‌তে পারে না—ওপরে ভেসে থাকে! তার ওপর"—

মা বলেন, "কেবল কথাই শিখেছিস্‌ বইতো নয়—মুরুব্বির জোর থাক্‌লে আবার চাক্‌রি হয় না! বল ইচ্ছে নেই, তাই। বোস সাহেবের বাড়ীতে যাস্‌, তাঁকে ব'লতে পারিস্‌ না?"

অনুপম যেন মুহূর্ত্তে কেমন হইয়া যায়, বলে, "এখনো বলিনি—বলবো'খন। তবে হ'বে বলে তো আশা নেই!"

মা হতাশভাবে বলেন, "হা, আমার কপাল! বলিস্‌নি এখনো? তবে যে তুই সেদিন যেন বললি, বলেছিলাম?"

অনুপম মাথা চুলকাইয়া বলে, "হাঁ—না—বলেছিলাম তো! তবে কী জান এই যখন হবার হ'বে, খাম্‌কা!"

ছেলের অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া মা বলেন, "তা তো ঠিকই, তবে দু'পাঁচজনকে বলে রাখা ভাল—কিসে কী হয় বলা তো যায় না! বোস সাহেবের মত লোক, একদিন সব কথা গুছিয়ে বলিস্‌ না! দেখ্‌ছিস্‌ তো অবস্থা চোখের উপর, এমন করে আর কদ্দিন চলবে! লজ্জা কী, বলিস্‌ না!"

লজ্জা যে কী এবং কোথায় অনুপম নিজেই ঠিক জানে না, প্রকাশও করিতে পারে না। বোস সাহেব ইচ্ছা করিলে একটা চাক্‌রি জোগাড় করিয়া দিতে পারেন, তা অনুপম জানে। কিন্তু ব্যাপারটি এমনই ব্যক্তিগত যে, ভাবিলে অনুপম কেমনধারা হইয়া যায়। বোস পরিবারে তাহার পরিচয়ের সূত্রটি যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে পুনর্ব্বার বাহিরের ঘরে প্রতীক্ষমান উমেদারের আসনে টানিয়া আনা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। অথচ অসম্ভব যে কেন, সে নিজে বুঝিলেও আর কাহাকেও বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। আর ইহারাও সব ঠিক করিয়াছে যে, অনুপমের মনের কথাটি কিছুতেই বুঝিতে চেষ্টা করিবে না। ইহার অধিক মুস্কিলে যে মানুষ কখনো পড়িতে পারে, অনুপম কল্পনাও করিতে পারে না।

এদিকে বন্ধুবান্ধবেরা যেভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছে, শুনিলে মনে মনে হাসি পাইলেও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা হয় না। জানে, করিয়াও কোন লাভ নাই। সে যে কোনরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কাহারো সহিত মেশে না, একথা বলিলেও ইহারা বিশ্বাস করে না, বরং ঠোঁট বেঁকাইয়া পরস্পর ইসারা করে।

সবচেয়ে অসহ্য লাগে ঐ সোমেশ্বরের কথাগুলি। দেখা হইলে-ই মৃদু-বক্র-হাস্যে জিজ্ঞাসা করিবেই করিবে—"তারপর, কদ্দুর? কিছু গিঁথ্‌লো-টিঁথ্‌লো?"

অনুপমের আপাদমস্তক এই ইতর ইঙ্গিতে জ্বলিয়া ওঠে, চোখ-মুখ থম্‌-থম করে। "আজকাল তো দেখি, খুব ঘন ঘন বোস সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে মোটরে মার্কেটে যাওয়া হয়! হেঁ হেঁ confidential নাকি হে?"

হঠাৎ অনুপমের কী যে খেয়াল হয়, সে-ই জানে! চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া টানিয়া টানিয়া কহে, "আর বুঝি জান না, পরশু লিলির সঙ্গে একা চন্দননগর বেড়িয়ে এলুম। যাই বল, ওখানকার মদ খুব সস্তা!"

সোমেশ্বর কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারে না। চোখ কপালে তুলিয়া কহে, "লিলি মানে? কে, বোস সাহেবের ছোট মেয়েটি নাকি? বেশ, বেশ তা' হ'লে দেখ্‌ছি অনেকখানি এগিয়ে পড়েছো? হ'বে, হ'বে তোমার ঠিক হবে—But you must stick to it!"

যেন আপনা হইতে অনুপমের মুখটি আল্‌গা হইয়া যায়। বলে, "কাল কিছুতেই যাবো না, ওঁরাও ছাড়বেন না—লিলির তো মুখ হাঁড়ি, শেষে কী আর করি, গেলুম এক সঙ্গে সিনেমা দেখ্‌তে! ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে তো!—মাইরি, আশ্চর্য্য ঐ মেয়েগুলো!"

সোমেশ্বর সাবধান করিয়া দিবার ভঙ্গিতে বলে, "যাচ্ছো যাও, কিন্তু খবরদার বেশী মিশো না, তা' হ'লেই গেছো! তবে ওরি মধ্যে বুঝলে কিনা!—কিন্তু colour একেবারে ছাড়বে না!"

—"পাগল! আমাকে সেই ছেলে পেয়েছো আর কী!"

ফাঁকা সম্মানবোধের আত্মপ্রসাদ যতই থাক্‌ না কেন, কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া অনুপমের দেহমনে ইহার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। বিরক্তি আর গ্লানিতে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

সকলেই আশ্চর্য্য হয় বৈকি! হাতের কাছে পাওয়া

এমন একটা সুযোগকে এরূপভাবে সিনেমা মটর আর মার্কেটে বৃথা অপব্যবহার করার কী মানে হয়? আর যাহার ঘরে নিত্য এত অভাব, তাহার মিথ্যা এ সম্মানবোধ কেন?

মনটা খারাপ হয় বেশী মায়ের কথাগুলি শুনিলে। অনুপম না বলিতেও তিনি বড় আশা করিয়া আছেন; তাঁহার সে আশা যখন ভাঙিবে, তিনি কী তাহা সহ্য করিতে পারিবেন? অথচ এই লুকোচুরির কথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া জানানও যায় না। বড়লোকের বন্ধুত্ব যে সব সময় আন্তরিকতা নয়, তা-ই বা তাঁকে কে বোঝাইবে! আর এ কথা কী কখনও বোঝান যায়? অনুপমের সময় সময় কান্না পায়। ইচ্ছা হয়, কালই সে বোস সাহেবকে সব কথা বুঝাইয়া বলিবে,—অনুরোধ করিতে এতটুকু ইতস্তত করিবে না। লজ্জা কী?

কিন্তু সেখানে গিয়া সব সংকল্প ঘুরিয়া যায়। প্রথম দর্শনে লিলি মুখর আপ্যায়নে জিজ্ঞাসা করে, "রোজ বুঝি আস্‌লে মান যায়, তাই আসেন না? এত হিসেব করে'ও চল্‌তে পারেন আপনারা, বাব্বাঃ!"

অনুপম ম্লান হাসিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লিলি পুনরায় প্রশ্ন করে, "আজ যে বড় গম্ভীর? কী হ'ল আবার? গম্ভীর হ'লে আপনাকে কিন্তু মোটেই মানায় না!"

অনুপম আলগোছা বলে, "রোজ হাসা যায় না কি? মাঝে মাঝে গম্ভীর না হ'লে হাসিটা সহজ হয় না।"

চোখ ঘুরাইয়া লিলি বলে, "তাই নাকি?" তারপর হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়ে, তারপর বোস সাহেবের স্ত্রী, তারপর বোস সাহেব নিজে। খানিক্ষণ নিষ্পাপ হাসাহাসি চলে। বোস সাহেব সহসা চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই বলেন, "আহা-হা, বুঝ্‌ছো না—ছেলেছোক্‌রা! সবই মনের ব্যাপার! উঁহুঁ, ওকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কর না, shock পেতে পারে। কী বল অনুপম?"

অনুপম আর কী বলিবে? মস্ত কৌতুকের ব্যাপার হিসাবে সেও ইঁহাদের হাসিতে যোগ দেয়।.........

একদিন নয়, দুদিন নয়, এমন করিয়া প্রায় বছর কাটিতে চলিল, অনুপম কতবার বলি বলি করিয়াও কিছুই বলিতে পারিল না। আশা করিয়াছিল, একদিন সময় মত বলিবে। কিন্তু সময় আসিল কই?

এই আত্মপ্রবঞ্চনায় শেষে নিজের উপর বিরক্তি আসিল অনুপমের। অভিমান করিবার কোন হেতু না থাকিলেও সে সবার উপর অভিমান করিয়া বসিল। শেষে এমন একটি নিস্পৃহ এবং নিষ্ক্রীয় ভাব সে আয়ত্ত করিল যে, তাহা দুষ্টক্ষতের মত কিছুতেই নিরাময় হইতে চাহিল না। অথচ নিজেকে নিরর্থক বিষাক্ত করিয়া যে কোনই লাভ নাই, বুঝিলেও কিছু করিতে পারিল না।

সামান্য কারণেই মায়ের সঙ্গে রাগারাগি হইয়া যায়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ অস্বস্তিকর মনে হয়, আবার বেশীক্ষণ একলা থাকিলেও হাঁপাইয়া ওঠে। বোস সাহেবের ওখানে কিছুক্ষণ বসিলে বিরক্ত লাগে। সময় সময় আপন ব্যবহারের নিমিত্ত লজ্জার শেষ থাকে না অনুপমের।

অনুপম সব বুঝিতে পারে, তবু নিজেকে সংশোধন করিতে পারে না। সে ক্ষমতাও তাহার নাই।

সেদিন দুপুরে বেলা খাইতে বসিয়া অনুপম লাফাইয়া উঠিল। কিছুতেই সংযত করিতে পারিল না সে নিজেকে। সমান বিরক্তি আর আত্মগ্লানিতে সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "এই দিয়ে কোন ভদ্রলোক খেতে পারে? কী ছাই যে রোজ রাঁধ তোমরা? গরু-ছাগল পেয়েছো নাকি?"

মা অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা ছেলের রূঢ় অভিযোগে শিহরিয়া উঠিলেন। মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "কী করবো বাবা, এর বেশী ত আর কিছুতেই হয় না! দেখ্‌ছোই ত সব!"

কথাটি তিরস্কারের মত শোনায়। অনুপম ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে,—"কেন যায় না শুনি? তোমরা খেতে পার, আমি পারি না।—কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল, নেই—নেই—নেই! সর্ব্বস্ব খেয়ে রাখ্‌লে থাক্‌বে কোত্থেকে শুনি?"

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া অনুপম এতটুকু হইয়া যায়। নিজের কানে কেমন তিক্ত লাগে। একি বলিতেছে সে? সে কী এতই অবুঝ?

কিন্তু নিজেকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সংযত করিতে পারে না। মা কিছু বলিবার জন্য ইতস্তত করিতেই অনুপম বলে, "থাক্ থাক্ তোমরা কী বলবে তা জানি, চাকরি এই ত? যত সব স্বার্থ! কিন্তু চাকরি আস্‌বে কোত্থেকে শুনি? যেমন বংশে জন্ম, তার ফল ভোগ করতে হ'বে ত! বংশ পরিচয় দিতে আমার লজ্জা করে—একটা পরিচয়-ই নেই, ছি ছি!"

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর হইতে রুগ্ন বাপের কাশির শব্দ আসে। কাশির মাঝেই তিনি জড়াইয়া বলেন, "আঃ ওর খাবারটি একটু আলাদা কর না কেন? সত্যিই যা' তা' দিয়ে মানুষে খায় কী করে? না, তোমাকে বলে বলে আর পারলুম না—কী সঙ-এর মত দাঁড়িয়ে থাক।"

অনুপম একেবারে থালার সঙ্গে মিশিয়া যায় যেন। মনে হয় কে যেন সজোরে তাহার গালে চড় মারিতেছে। সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না সংসারে কেবল ইঁহাদের কাছে এত বড় একটা অকর্ম্মণ্য ছেলের এত মূল্য কেন। এটি শুধু স্বার্থ না, আরও কিছু? সে রাগ করিলে, রূঢ় ভাষায় গালাগালি করিলে ইঁহারা গায়েই মাখেন না;—অভিযোগ করিলে কিছুক্ষণের জন্য মুখ ভার করিয়াও থাকিতে জানে না, আঘাতটি বারে বারেই কিন্তু সে ইঁহাদেরই দিবে। কিন্তু কেন?

কোনরূপে অপরাধীর মত আহার শেষ করিয়া অনুপম উঠিয়া পড়িল। লজ্জায় সে কাহারও মুখে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। ঘরে বসিয়া বসিয়া তাহার অপরাধী মনটি দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষমা চাহিবার পথটিও ইঁহারা গোড়া হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখন অনুপম কী করে?

এক সময় চুপিসাড়ে গায়ে জামা গলাইয়া অনুপম রাস্তায় নামিয়া পড়িল। চোখের সামনে চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ পিচ্-ঢালা

রাস্তাটি যেন অবসাদে ঝিমাইতেছে।—মাঝে মাঝে শুষ্ক বায়ু-তাড়িত আগুনের হলকায় তাহার অন্তর্নিহিত বিষাক্ত, ক্রুদ্ধ অভিযোগ বায়ুমণ্ডল ভরিয়া দিতেছে। একটানা অসন্তোষ আর বিরক্তির মত মোটরের কারখানা হইতে হাতুড়ীর শব্দ উঠিতেছে। পায়ের তলায় অতিক্ষীণ কণ্ঠে মাটির শত স্তর ভেদ করিয়া গোঙানির শব্দ মাথা কুটিতেছে যেন। হাতুড়ীর আঘাতে লোহার পাত উত্যক্ত নির্জীব পশুর মত বিলাপ করিতেছে।

সারাদিন এখান-ওখান ঘুরিয়া ঠিক সন্ধ্যাবেলায় অনুপম বোস সাহেবের বাড়ীর দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে ঢুকিতে গিয়া বার কয়েক ইতস্তত করিল। না, সঙ্কল্প তাহার ঠিক-ই আছে। না, সে একটুও বিচলিত হইবে না। আর তাহার লজ্জা কী?

অনুপম কোন দিকে না-চাহিয়া সোজা সিঁড়ি বাহিয়া বোস সাহেবের পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। আবছা অন্ধকারে জানালার দিকে মাথা করিয়া বোস সাহেব তখন ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন। অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া অনুপম এদিক ওদিক দেখিয়া জানালার কাছটিতে 'টিপয়ের' কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বোস সাহেব কিছুই টের পাইলেন না।

অনুপমের মাথার মধ্যে তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, কানে তালা ধরিয়া গিয়াছে—পায়ের তলায় সব যেন ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া 'টিপয়'টিকে সজোরে নাড়াইয়া দিল। বোস সাহেব চোখ তুলিয়া চাহিলেন—"ও তুমি! কখন এলে? আলোটি জেলে দাও দেখি, বড্ড অন্ধকার—কিছু দেখা যাচ্ছে না!"

অনুপম তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিল। বোস সাহেব আবার পড়ায় মন দিলেন। না, অনুপম আজ সব বলিবেই, —না, না তাহার কিছু লজ্জা নাই! লজ্জা কিসের? সে ত ভিক্ষা করিতেছে না! না, না।

বোস সাহেবের পাশের চেয়ারে অনুপম নিজেকে আল্গা-ভাবে ছাড়িয়া দিল। দু'হাতের দশটি আঙুল দিয়া সজোরে মাথাটি টিপিয়া ধরিল। তবুও বোস সাহেবের কোন সাড়া নাই, তিনি আপন মনেই পড়িয়া চলিয়াছেন।

না, এ সুযোগ সে কিছুতেই হারাইবে না। ঘরে কেউ নেই,—লিলি নেই;—লিলির মা নেই, কেউ নেই! কিছুতে সে এ সুযোগ হারাইবে না।

হঠাৎ মাথাটি ছাড়িয়া দিয়া অনুপম জোরে কাশিয়া উঠিল। বোস সাহেব পাশ ফিরিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হ'ল তোমার! কিছু বলবে না কি?"

অনুপম আম্‌তো আম্‌তো করিয়া অনেক কথাই বলিয়া গেল। বোস সাহেব স্থিরভাবে সবই শুনিলেন, মাঝে একটিও কথা বলিলেন না। অনুপম যখন শেষ করিল, তখন তিনি বলিলেন, "বোকা ছেলে! আমায় এদ্দিন বলনি কেন? দু'তিনজন বাইরের লোকের চাকরি হ'য়ে গেল! সত্যিই ত চাকরি না হ'লে চলেই বা কী করে? আচ্ছা এবার আমি চেষ্টা করব! Cheer up Boy! এতে আর লজ্জা কী?"

মাথাটি তাহার কখন আপনা হইতে নুইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না অনুপমের। সহসা চোখ তুলিয়া চাহিতে সে দেখিল, ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে লিলি টেবিলটির একটি কোণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

লিলি আজ চমৎকার সাজিয়াছে—তাহাকে মানাইয়াছে অপূর্ব্ব!

আমরা এসেছি দাসখৎ লিখে

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

আমরা এসেছি দাসখৎ লিখে চির জীবনের মত,
গোলাম সাজিয়া মানিয়া নিয়াছি তোমাদের সর্দ্দারি;
তোমরা শুধুই পলে পলে হায় করিয়াছ' বিক্ষত
নিপীড়িত এই শুষ্ক জীবন শত ব্যথা সঞ্চারি'।

আমরা যেন গো স্রোতের জোয়ারে ভাসিয়া চ'লেছি ভেলা,
সে ভেলা বাহিয়া তোমরা ক'রেছ আপন যাত্রা সুরু;
শঙ্কিত চিতে বঞ্চনা নিয়ে কাটে যে মোদের বেলা,
তোমাদের ভারে নিত্য মোদের বুক করে দুরু দুরু।

আমরা যেন গো আকাশের বুকে কালো মেঘ ভেসে যাই,
তোমরা তাহাতে বিজুলী ছটায় হাসিছ' অট্টহাসি;
আমাদের লাগি' তোমাদের প্রাণে এতটুকু মায়া নাই,
তোমরা কেবলি রক্ত চুষিয়া চ'লেছ সর্ব্বগ্রাসী।

দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের লাগি' করি মোরা হাহাকার,
তোমরা চলেছ' মোটর হাকা'য়ে 'ইভিনিং পার্টি'তে';
আমাদের বেলা তোমরা ক'রেছ' নিয়ম চমৎকার,
কড়া ও ক্রান্তি হয়নাকো ভুল হিসাব মিলা'য়ে নিতে।

সুধু ক'ষে ক'ষে নিঙ্‌ড়ে নিয়েছ' আমাদের আত্মারে,
ঘাড় ধ'রে টেনে নিয়েছ' সরোষে যূপকাষ্ঠের তলে;
বুক ভেঙে ভেঙে নীরবে আমরা কাঁদি যে অন্ধকারে,
তোমাদের প্রাণ ভেজে নাকো তবু আমাদের আঁখিজলে।

আমরা এসেছি দাসখৎ লিখে চির জীবনের মত,
হুকুম তামিল করিয়া চ'লেছি নিত্য যে তোমাদের;
শত নিপীড়নে তোমরা মোদের করি' শুধু বিক্ষত
দর্পিত বেশে হুঙ্কারি' চল' গর্ব্বিত সমাজের॥

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

(ভ্রমণ কাহিনী পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আট

ভাজার গিরি মন্দির

কার্লি হইতে ভজ বা ভাজা (Bhaja)র দিকে আমাদের গাড়ী চলিল। আমরা যখন রওনা হইলাম, তখন বেলা প্রায় দেড়টা হইবে। রৌদ্রের তেজ সামান্য একটু প্রখর হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু মৃদুমধুর বাতাসের চঞ্চল গতি আর বিস্তৃত প্রান্তরের বুক দিয়া যাইতে অপূর্ব্ব শান্তি বোধ করিতেছিলাম। একদল যাত্রীভরা বাস আমাদের পাশ দিয়া বেগে ছুটিয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে তরুণ যাত্রীর দল, সঙ্গে দুইজন শিক্ষক। বয়স্কাউটের দল। প্রফুল্ল হাসিমুখে, সবল সতেজ দেহ, তাহারা জয়োল্লাসে চারিদিক মুখরিত করিয়া চলিয়াছে কার্লির গিরি মন্দির দেখিতে। একদিন যাহা ছিল আরাধ্য দেবতার পরম পবিত্র দেবনিকেতন, আজ তাহা নীরব, বিজন ও লোকের কাছে সুধু একটা দর্শনীয় স্থান মাত্র,গবেষণার ক্ষেত্র। অনর্গলভাবে বলিয়া যাইতেছিলেন। একটা গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া পুণার দিকে চলিয়া গেল।

আমরা এইবার ভাজা পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া চলিলাম। পথটি বাঁকিয়া পাহাড়ের নীচ দিয়া চলিয়াছে। খাড়া পাহাড়, ছোট ছোট গাছ ও ছোট বড় কালো কালো পাথরগুলি দেখা যাইতেছে। উপরের কতকটা সমতলভাগ দেখা যাইতেছে। গরু ছাগল ও মহিষ অক্লেশে পাহাড়ের অনেকটা দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া ঘাস ও সতেজ গাছপালা খাইতেছে। কার্লি হইতে এস্থানের দূরত্ব আড়াই মাইল বা তিন মাইলের বেশী হইবে না। কার্লি হইতে ভাজা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। আমাদের গাড়ীখানি দুই তিনটি ছোট বড় পাহাড়ের নীচের পথ ধরিয়া একটি গ্রামের কাছে আসিল। গ্রামটির একরূপ চারিদিক ঘিরিয়াই পাহাড়। আমাদের গাড়ী একটি গাছের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। পথটি ভাজা গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পথের দুইধারে কয়েকখানি

সাঁচীর স্তূপের সাধারণ দৃশ্য

আমরা ভাজার দিকে চলিলাম। গাড়ী হইতে ছোট ছোট বাড়ী সব দেখা যাইতেছিল। লোনাবলা ষ্টেশনের সীমানা পার হইবার পথ বা Crossingএর কাছে, ছোট একটি চায়ের দোকান। বাসনকোসন সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একেবারে চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মিঃ চৌধুরী বলিলেন, এখানকার চা মন্দ নহে! কি বলেন?—ভালরে ভাল, দু' দিনের পরিচয়েও কি মিঃ চৌধুরী আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন! আমি ধীর গম্ভীরভাবে বলিলাম, আপনি যদি ইচ্ছা করেন!

শ্রীমতী প্রতিভা হাসিয়া কহিল, বাবা আর লজ্জা করো না! গাড়ী থামিয়া গেল, আবার মনের আনন্দে চা পান করিতে লাগিলাম। মহিষের উষ্ণ স্বাদু টাট্‌কা দুধে তৈরী চা ভাল না লাগার ত কথা নয়।

শ্রীযুক্ত চন্ডীবাবু গাড়ীতে বসিয়া শ্রীমতী প্রতিভার নিকট উপনিষদের গভীর তত্ত্ব, ঈশ্বরোপলব্ধি, গীতায় ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে বাড়ী ও দোকান ঘর। এখানেও মাড়োয়ারীদের কারবার চলে। তাহাদের দোকানই বেশী দেখিলাম। যে পথটি গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সে পথটি একেবারেই ভাল নহে, ছোট বড় সব পাথর পথের মধ্যে পড়িয়া আছে। আমরা একটু পরেই ঠিক্ ভাজা পাহাড়ের নীচে আসিলাম। পাহাড়ের উপর হইতে একটি ঝরণা হইতে অজস্র ধারে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে। একটি স্থানে জল জমিয়া বেশ বড় গর্ত্তের মত হওয়ায় পল্লীর রমণীরা কাপড় কাচিতেছে, বাসন মাজিতেছে, কলসী ভরিয়া জল লইতেছে, স্নান করিতেছে। কোন কোন বালিকা ও তরুণী উৎসুক নয়নে এই সব পথিকের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহাদের মনে এই ভাব—'ওগো! তোমরা কে কোন্ দেশের লোক!'

ঝর্ণার পাড় ঘেঁষিয়া পথটি চলিয়া গিয়াছে ঊর্দ্ধ দিকে ভাজা গিরি মন্দিরের কাছে। এখানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—তিনদিকে শ্যামল সুন্দর বনশ্রী, ঢেউয়ের মত স্তরে স্তরে উপরে উঠিয়াছে।

আর দেখা যাইতেছে এই পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চ চূড়ে প্রাচীন ইসাপুর গিরিদুর্গ (Isapur Hill fort)।

পণ্ডিতদের মতে—"The oldest cave probably in western India is the small Vihara excavated at Bhaja. It possesses all the characteristics of the very early Viharas. * * * the principal ornaments are the Dagoba, Chaitya, arch, and rail pattern; the Jambs of the doors sloped slightly outwards towards the floor; there are stone-benches or beds in the cell, a stone bench along one side of the hall, and a stone seat in the verandah, and there is no shrine nor image of the Buddha."
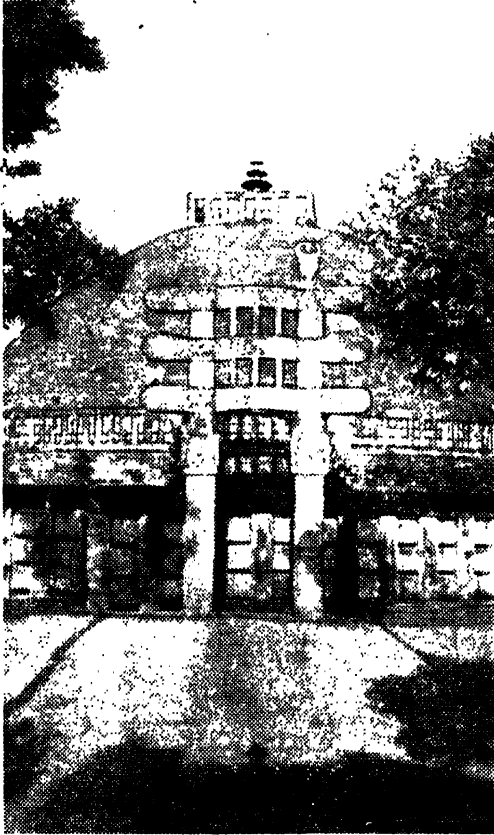
সাঁচীর বৃহৎ স্তূপ

পশ্চিম ভারতের গিরি মন্দিরগুলির মধ্যে ভাজা গিরি মন্দিরই সবচেয়ে প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। সেই অতি আদি যুগের বিহারের সব রকমের সুস্পষ্ট নিদর্শন এখানে আছে। দাগোবা, চৈত্য, খিলান, রেল নমুনা, দরজার চৌকাঠগুলি একটু মেজের বাহিরের দিকে হেলান। প্রস্তর শয্যা আছে অনেক, বুদ্ধদেবের কোন মূর্ত্তি নাই।

এই ভাজা গিরিমন্দিরের কথা ছিল লোকের অজানা। চারিদিকে বনজঙ্গলে ঢাকা সেকালের দুর্গম গিরিশ্রেণীর আড়ালে একটি নিভৃত গিরি গুহায় কে গড়িয়া রাখিয়াছে এমন অপূর্ব্ব মন্দির কে তাহা জানিত। ভারতবাসী আমরা নিন্দায় সহস্র মুখ, কিন্তু এই যেসব ভারতের কীর্ত্তি—মন্দির তাহার আবিষ্কার গৌরব আমরা কয়জনে করিতে পারি?—সে অনেক দিন আগে লর্ড ভেলেনটিয়া (Lord Valentia) তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে সর্ব্বপ্রথম এই গিরিমন্দিরের উল্লেখ করেন।* তিনি নিজে কিন্তু এই গিরি মন্দিরটি দেখেন নাই। তাঁহার সঙ্গী ইউরোপীয়গণও কেহ ঐস্থানে যান নাই।

ভাজা গিরিমন্দিরগুলি পশ্চিম মুখো। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে আঠারোটি গুহামন্দির আছে। এখানকার বৃহত্তম গুহামন্দিরটি পণ্ডিতদের মতে একটি স্বাভাবিক গুহাকেই বড় করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ত্রিশ ফিটের কিছু বেশী হইবে। তাছাড়া অনেকগুলি বিহার রহিয়াছে। এখানকার চৈত্যটি সম্পর্কে স্থাপত্যবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই অতি প্রথম সময়ে কিভাবে চৈত্য মন্দির নির্ম্মিত হইত তাহা এখানকার চৈত্যটি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এখানকার চৈত্য মন্দির ও বিহার-গুলির নির্ম্মাণকাল সম্পর্কে পণ্ডিতেরা বিভিন্নরূপ মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন,—

"They are certainly * * as early or earlier than 200 B.C. and neither can claim to have been excavated before the time of Asoka, B.C. 250."

আমরা এ বিষয়ে পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। মহানুভব নৃপতি অশোকের পূর্ব্বে ভারতের কোনও গিরিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল কিনা বলা কঠিন।

ভাজা গিরিমন্দিরের স্থাপত্য রীতি দেখিয়া অনেকে এইরূপ বলেন যে, যাঁহারা এই গিরিমন্দিরগুলি গড়িয়াছিলেন তাঁহারা পূর্ব্বে কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন। সেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ বা মন্দিরের আদর্শেই এই গিরিমন্দিরগুলিও গঠিত হইয়াছে।

ভাজা গিরিমন্দিরের চৈত্যটি ২৬ ফিট ৮ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ৫৯ ফিট দীর্ঘ এবং পশ্চাতের দিকটা অর্দ্ধ বৃত্তাকারে গঠিত। আর এ স্থানের দাগোবাটির নীচের দিকের পরিধি হইবে ১১ ফিট, উচ্চে ৪ ফিট, গর্ভ বা গম্বুজটি প্রায় ছয় ফিট হইবে। চৈত্য মন্দিরের কয়েকটি স্তম্ভের গায়ে মূর্ত্তি খোদিত আছে। কোথাও বা ত্রিশূল, কোথাও বা পুষ্প এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মূর্ত্তি প্রভৃতির নানারূপ কারু-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। এখানকার একটি নারী মূর্ত্তির শিল্প-চাতুর্য্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বিশেষভাবে সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ভাজার গিরিমন্দিরের এই চৈত্য গুহাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণ খৃষ্ট জন্মের ২০০ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এখানেও একটি দাগোবা আছে। ভাজার গিরিমন্দির সহিত যে বিহারগুলি ছিল তাহাও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। এই যে গুহামন্দিরগুলি তাহার কতকগুলি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, স্বাভাবিক পার্ব্বত্য গুহাকে বর্দ্ধিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, আবার কতকগুলি গিরিমন্দির শিল্পিগণ উপযুক্ত পর্ব্বত খুঁজিয়া বাহির করিয়া এবং তাহার মধ্যেও একটি নিভৃত স্থান বাহির করিয়া তবে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সব গিরিমন্দির গঠনে শিল্পিগণ যে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না। এমন একদিন ছিল, যে দিন সমগ্র এশিয়ার অধিবাসীরা বৌদ্ধ ভারতের দিকে চাহিয়া থাকিত জ্ঞানের ও শিল্পের নবীন প্রেরণা লাভ করিবার জন্য। বৌদ্ধ যুগকে এজন্য ভারতের স্বর্ণযুগ বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৌদ্ধ শিল্প সিংহল, যবদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, খোটান, তিব্বত, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও এই সব দেশে ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ ও বৌদ্ধ শিল্পিগণের চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের শত শত চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে

* [Lord Valentia's Travels, Vol. II, pp. 165—166.]

তিব্বত দেশীয় ঐতিহাসিক তারনাথ বলিয়াছিলেন,—
"Where ever Buddhism prevailed skilful religious artists were found."
এই সব গিরিমন্দির দেখিলে তারনাথের কথা যে কত বড় সত্য তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধদের নির্ম্মিত স্তূপ ভারতের নানাস্থানে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অহিনপোষ (জালালাবাদের নিকটবর্ত্তী), আলি মসজিদ (খাইবার), চাহারবাগ (জালালাবাদ), চকদরা (সোয়াট), সুলতানপুর, তোপদারুরা, মাণিক্যআলা (পাঞ্জাব), পেশোয়ার (কনিষ্ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত), উত্তর-পশ্চিম ভারত ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে যে বৌদ্ধ স্তূপগুলি আছে তাহা জগৎ
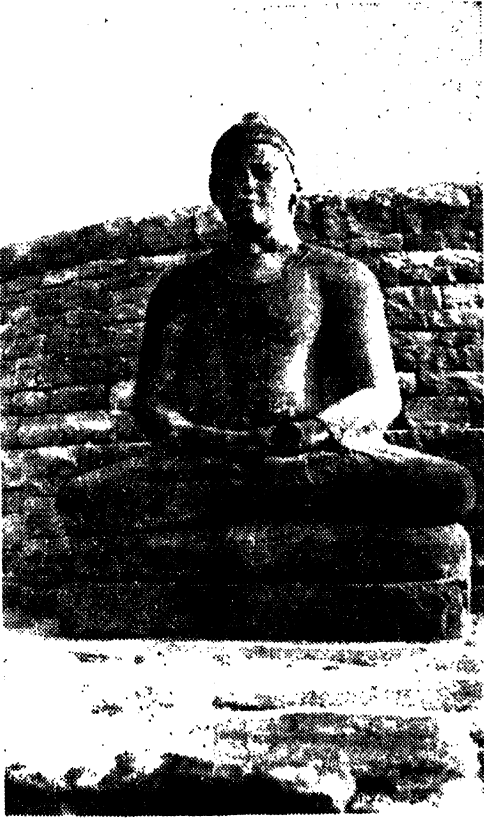
বুদ্ধদেবের জ্ঞানমুদ্রা বিশিষ্ট মূর্ত্তি—সাঁচী

প্রসিদ্ধ; যেমন—অমরাবতী, ভারহুট, ভট্টিপ্রোলু, ভিলসা, সাঁচী, বোধগয়া (সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত), ঘাটিশালা গিরিয়েক, যজ্ঞাপেটা, কেশরীয়া, সারনাথ-ধামেক, সোপারা এবং ঘলরুখন (দৌতলপুর) প্রভৃতি স্তূপগুলি দেখিলে বৌদ্ধ শিল্পিগণের শিল্প মাহাত্ম্য অনুভূত হয়।

বৌদ্ধ গিরিমন্দিরের কথা বলিতে গেলে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, রাজগৃহের রাজগিরের (বিহার) নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গুহা অতি প্রাচীন, বৌদ্ধদের পরে উহা জৈন এবং আজীবক সম্প্রদায় দখল করেন। গয়ার বরাবর গুহাটি মহারাজা অশোকের সমকালীন। তাহা ছাড়া বিহারের অন্যান্য গিরিমন্দিরগুলি অশোকের পরবর্ত্তী কালের। বোম্বে প্রেসিডেন্সীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গিরিমন্দির সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পশ্চিম ভারতের গিরিমন্দিরগুলি সম্পর্কে বার্ণেট বলেন,—

The chief are those at Bhaja and Kondane (about 200 B.C.), Bedsa, Nasik, and Pitalkhora (all about the second century B.C.), Karle (first century B.C.), Ajanta (the caves of perhaps the first century B.C., others much later).

অজন্তা, বাগ, বেদশা, ভাজা, ধাবনার, ইলোরা, কানহেরি, কার্লি, কোন্দানে, নাসিক এবং পিতলখোরা নামক স্থানের গিরিমন্দিরে 'বিহার'ও আছে। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত ঔরঙ্গাবাদের নিকটেও পর্ব্বতগাত্রে খোদিত কয়েকটি গিরিমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সমুদয় গিরিমন্দিরে যে সকল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে নানারূপ মুদ্রা সংযুক্ত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলি কেবল অমনি না দেখিয়া সামান্যভাবে একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই উহাদের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। যে সকল বুদ্ধ মূর্ত্তি ধর্ম্মচক্র মুদ্রাবিশিষ্ট তাহা এইরূপ হইবে, বুদ্ধদেব সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সিংহাসনের দুইদিকে এক একটি সিংহের মূর্ত্তি। বিকশিত শতদলোপরি বুদ্ধের চরণ স্থাপিত। বুদ্ধদেব এইরূপ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া করযুগল বক্ষের উপর স্থাপন করিয়াছেন। এই মুদ্রার নাম হইতেছে ধর্ম্মচক্র মুদ্রা। আর একটি বুদ্ধ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার এক হস্ত অপর হস্তের উপর স্থাপিত এবং করতল তদুপরি রক্ষিত। ইহা হইতেছে জ্ঞানমুদ্রা। এই মূর্ত্তি অনেকটা জৈন তীর্থঙ্করদের অনুরূপ।

আমরা এইখানে বৌদ্ধদের স্তূপ বলিতে কি বুঝায় তাহা পাঠকদিগকে বুঝাইবার জন্য সাঁচির বিখ্যাত স্তূপের ছবি এবং মুদ্রা বুঝাইবার জন্য সাঁচির জ্ঞানমুদ্রা বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিলাম।

আমরা ভাজা গ্রামখানি ছাড়িয়া যখন পুণার পথে রওয়ানা হইলাম, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। একটু বেশ শীত বোধ হইতেছে। পাহাড়ের পায়ের তলা দিয়া যে আঁকা-বাঁকা পথটি—সে পথ দিয়া গাড়ী চলিল। পাহাড়ের নীচে বহুদূর বিস্তৃত শ্যামল মাঠ—মাঝে মাঝে জলের রেখা। উলঙ্গ প্রায় মারাঠি কৃষাণ বালকেরা কেহ কেহ তাহাদের মহিষের পাল ছাড়িয়া দিয়া গাড়ীর পাশে ছুটিয়া আসিয়াছে। এই পাহাড়ের নীচে কয়েকটি বেশ বড়বাড়ী দেখিলাম, শুনিলাম যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত রোগীরা অনেকে এখানে হাওয়া বদল করিতে আসে। অনেক পার্শী ধনীর দানে নির্ম্মিত College আছে, যেখানে শুধু পার্শী মহিলারা এবং পুরুষেরাই বাস করিতে পারেন। মারোয়াড়ীদের দোকানে কেনা-বেচা চলিতেছে। ফিরিবার পথে আবার সেই Railway Crossing পড়িল। কি আর করি, মিঃ সুধাংশু চৌধুরী মহাশয় গাড়ী হইতে নামিয়া চায়ের দোকানে গেলেন, আবার চা-পান করিয়া শরীর সবল করিয়া লইলাম।

সবুজ সুন্দর ছায়াশীতল পথ দিয়া গাড়ী পুণার দিকে ছুটিয়া চলিল। এখন আমরা সারাদিনের ক্লান্তিতে সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। গাড়ী ৪০ মাইল বেগে চলিতেছে, তবু মনে হইতেছিল, আর একটু তাড়াতাড়ি গেলে বেশ হইত! দাক্ষিণাত্যের মালভূমির একটা অনবদ্য রূপ আছে। নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে শ্যামল পর্ব্বতশ্রেণী, শস্যভরা দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, অপূর্ব্ব নীরবতা চিত্তকে মুগ্ধ করে এবং মনে করিয়ে দেয়, কি

(শেষাংশ ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হিন্দু সমাজের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(৪)

সমাজের সর্ব্বপ্রধান শক্তি—সংহতিশক্তি বা সংঘশক্তি। এই শক্তিবলেই সমাজ বিধৃত হইয়া থাকে এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। সংহতিশক্তির প্রধান লক্ষণ সকলকে একত্র করা, বৈষম্যের মধ্য হইতে সাম্যের ভিত্তিতে সকলকে কেন্দ্রীভূত করা। যে সমাজে এই শক্তি যত বেশী বিকাশপ্রাপ্ত হয়, সে-সমাজ তত বেশী জীবন্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুসমাজে ইহার বিপরীত লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। এ সমাজে বিকর্ষণী শক্তিই প্রবল, ইহা সকলকে এক সাম্যের সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, পৃথক্ করিয়া দিবার জন্যই যেন ব্যস্ত। পুরুভুজের দেহের মত হিন্দুসমাজ নিজেকে কেবলই ভাগ করিতেছে এবং সেই সব পৃথক পৃথক ভাগ হইতে এক একটা স্বতন্ত্র উপসমাজের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাদের কাহারও সঙ্গে কাহারও যেন যোগ নাই। অন্য একটা উপমা দিয়া বলিতে পারা যায়, হিন্দুসমাজ যেন একটা ভাসমান দ্বীপপুঞ্জ;—অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ইহার মধ্যে আছে, কিন্তু তাহাদের কাহারও সঙ্গে কাহারও ঘনিষ্ঠ বন্ধন নাই। অনেক সময় ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয়, এতকাল ধরিয়া বিকর্ষণী-শক্তিপ্রধান এই সমাজ কিরূপে টিকিয়া আছে! কিন্তু এই জরাজীর্ণ প্রাচীন সমাজের চারিদিকে যেমন ফাটল ধরিয়াছে, বৈষম্য-নীতি যেমন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ মনে হয় না। অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তথাকথিত "নিম্নজাতিরাও" পরস্পরকে হীন ও ক্ষুদ্র মনে করে এবং একে অন্যকে "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" বলিয়া গণ্য করে। "শুদ্ধি ও সংগঠন" আন্দোলন যাঁহারা পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আছে। একজন সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ হয়ত মুচি, মেথর বা ডোমের হাতে জল খাইবে, কিন্তু মুচি, মেথর বা ডোম কেহই পরস্পরের হাতের জল খাইবে না, এক পঙক্তিতে বসিয়া ভোজন করা তো দূরের কথা। এজন্য দায়ী তাহারা নহে—দায়ী উচ্চ জাতীয়েরাই। উচ্চ জাতীয়েরা যে বৈষম্যের মন্ত্র নিম্ন জাতিদের কানে দিয়াছে, এ তাহারই পরিণাম। চেলারা এখন গুরুদের ছাড়াইয়া গিয়াছে। আজ যে বৃটিশ শাসকেরা নিম্ন জাতিদের লইয়া একটা কৃত্রিম তপশীলী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন এবং এই 'তপশীলীরা' নিজেদের সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া ভাবিতে শিখিতেছে এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতেছে,—এ-ও উচ্চ জাতীয়দের বৈষম্যনীতি-রূপ পাপের ফল।

বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে কেবল যে অসংখ্য জাতি, উপজাতি, শাখাজাতি প্রভৃতিরই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নহে; হিন্দুসমাজে বহুলোক অন্যান্য নানাভাবেও হীন, পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের ফলে বহু বৌদ্ধ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু যাহারা ফিরিয়া আসে নাই, তাহারা হীন ও পতিত বলিয়া গণ্য হইল। এমন কি ২।৩ পুরুষ পরে উহাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ফিরিয়া আসিল, তাহাদেরও পাতিত্য-দোষ সম্পূর্ণ ঘুচিল না; সমাজের নিম্নস্তরে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় হইয়াই তাহারা রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙলাদেশে হিন্দু ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় একটু বিলম্বে হইয়াছিল। রাজা বল্লাল সেনের পরেও ২।৩ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহুলোক বৌদ্ধাচার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমাজে তাহারা উচ্চস্থান পায় নাই। এই জাতিভেদপ্রপীড়িত দেশে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করাও সব সময়ে নিরাপদ নয়, লোকের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা আছে। তৎসত্ত্বেও দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। যে 'ডোম' জাতি এখন অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য, তাহারা এককালে বৌদ্ধ ছিল—তাহাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধাচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্যও করিত। সেদিন পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রধানত এই 'ডোম' পুরোহিতেরাই করিয়াছে। 'যোগী' সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা যে বৌদ্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। ইতিহাস পাঠকেরা জানেন, সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ বল্লাল সেনের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিল। সেইজন্যই পরবর্ত্তী কালে হিন্দু সমাজে তাহারা তাহাদের প্রাপ্য উচ্চস্থান পায় নাই। অথচ সুবর্ণ বণিকেরা হিন্দুসমাজের কোন তথাকথিত উচ্চ জাতির চেয়েই কোন দিক দিয়া নিকৃষ্ট নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সুবর্ণ বণিকদের সম্বন্ধে রাজা বল্লাল সেনের যে সব গল্প প্রচলিত আছে, তাহা ঐতিহাসিক তথ্য নয়, নিছক কল্পনামাত্র।

নবজাগরিত হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ ও বৌদ্ধাচারসম্প্রদায়দিগকে কেবল যে হীন ও পতিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা নহে, তাহাদের উপর বহু নির্য্যাতন ও অত্যাচারও করিয়াছিল। ফলে, অনেকে দেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে পলাইয়াছিল, যাহারা ছিল তাহারা হিন্দু সমাজে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল অথবা আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং ইসলাম ধর্ম্ম তাহার সাম্যের বাণী লইয়া যখন এদেশে দেখা দিল, তখন এই সব নির্য্যাতিত বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধাচারীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ইসলাম বিজেতা শাসকদের ধর্ম্ম হওয়াতে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কার্য্য আরও সহজ হইল। প্রলোভনের অভাব ছিল না। বাঙলা দেশে নিম্ন জাতীয়দের মধ্যেই বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী ছিল, সুতরাং ইহারাই বেশীর ভাগ মুসলমান হইল।

ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজ ইসলাম ধর্ম্মের এই প্রবল আক্রমণ রোধ করিবার জন্য ভ্রান্তপথে অগ্রসর হইল। অধিকতর সাম্যভাব বা উদারতর নীতি অবলম্বন করা দূরে থাকুক, হিন্দুসমাজ নিজের চারিদিকে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিল; জাতিভেদের কঠোরতা আরও বর্দ্ধিত হইল, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা আরও বেশী আরও প্রবল হইল। ইহার ফলে কোনরূপ "যবন সংস্পর্শ" ঘটিলেই তাহা পাতিত্যের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে" রূপ-সনাতন ও সুবুদ্ধি রায়ের যে কাহিনী আছে, তাহা হইতে এই "যবন সংস্পর্শজনিত" পাতিত্য দোষের স্বরূপ বেশ বুঝা যায়। রূপ সনাতন দুই ভ্রাতা গৌড়ের বাদশাহের প্রধান অমাত্য ছিলেন। অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে রাজকার্য্য ব্যপদেশে বাদশাহের ভবনেই থাকিতে হইত, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাও করিতে হইত। সম্ভবতঃ "আহার্য্য দোষও" কিছু ঘটিয়া থাকিবে। তাঁহারা ছিলেন মূলতঃ কানাড়ী ব্রাহ্মণ—তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করাতে তাঁহারা বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজেই মিশিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ের বাদশাহের ঘনিষ্ঠ-সংস্পর্শে আসাতে ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে "পতিত" বলিয়া গণ্য করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় ইঁহারা উভয়েই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হন এবং বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারা বাদশাহের মন্ত্রীরূপে কেবল যে রাজকার্য্যে বিচক্ষণ ছিলেন তাহা নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিতও ছিলেন। তাঁহারা যে সব বৈষ্ণব দর্শনের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় সুপ্রকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারে তাঁহারাই অগ্রণী, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথ

সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এই দুই ভ্রাতাকেই তদানীন্তন ব্রাহ্মণসমাজ 'পতিত' বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।

সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন, পরে মুসলমান মন্ত্রীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় রাজ্যচ্যুত হন। এই মুসলমান মন্ত্রীই পরে বাদশাহ হন এবং তাঁহারই ছলনাতেই একবার সুবুদ্ধি রায় কোন "অখাদ্য"এর ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অনিচ্ছাকৃত মহা অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন, তাঁহাকে "তুষানল প্রায়শ্চিত্ত" করিতে হইবে। অর্থাৎ তুষের আগুনে ধীরে ধীরে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় অবশেষে তিনি এই আত্মহত্যার দায় হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং একজন ঈশ্বরভক্ত পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠেন।

বাঙলাদেশে "পীরালি" ব্রাহ্মণদের ইতিহাসও ঠিক এই শ্রেণীর ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট। এই "পীরালি" ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে কোনরূপ "যবন সংস্পর্শ" দোষেই যে তাঁহারা "পীরালিত্ব" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নাই। সম্ভবত এই "পীরালিদের" পূর্ব্বপুরুষ রূপ সনাতনের মতই কোন মুসলমান নবাব বা বাদশাহের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন অথবা সুবুদ্ধি রায়ের মত "অখাদ্যের" ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন একজন মুসলমান পীরের ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যে কারণই সত্য হউক, কোনরূপ "যবন সংস্পর্শ"ই যে ইঁহাদের পাতিত্যের কারণ, ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। এই "অপরাধে"র জন্য পুরুষপরম্পরায়ক্রমে ইহারা হিন্দুসমাজে কোণ-ঠাসা হইয়া আছেন। আধুনিককালে যদিও "পীরালি" ঠাকুর বংশের বংশধরগণ নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভায় বাঙালী হিন্দুসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের সেই "মালিন্য" তিরোহিত হয় নাই। হিন্দুসমাজের এই আত্মহত্যাকর নীতির দ্বারা তাহার যে কি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। (ক্রমশ)

মহারাষ্ট্র দেশের যাত্রী

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষুদ্র এই মানব জীবন! মানুষ কতটুকুই জানে, আর কতটুকুই সে এই বিশাল জগতের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে! আমার মনে পড়িতেছিল হাফিজের একটি সুন্দর কবিতা:—

"Tell me, gentle traveller, thou
Who hast wondered far and wide,
Seen the sweetest roses blow,
And the brightest river glide;
Say, of all thine eyes have seen,
Which the fairest land has been?"
"Lady, shall I tell thee where,
Nature seems most blest and fair,
Far above all climes beside?
"T is where these we love abide:
And that little sport is best,
Which the loved one's foot hath pressed."

অতি সত্য কথা! আমাদের বাঙলা দেশের নদী-তীরবর্ত্তী গৃহ, তার চেয়ে কি আর প্রিয় আছে?

আমাদের পুণা ফিরিয়া আসিতে প্রায় চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল। সন্তান স্নেহাতুরা জননী মিসেস চৌধুরী বাড়ীর বারান্দায় পুত্র দুইটির প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন। সজল ও কাজল গাড়ী হইতে নামিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল।

আমাদের গাড়ীর হর্ন শুনিয়াই শিপ্রা গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া মা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রতিভা তাহাকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইল। শিপ্রা মাকে পাইয়া তাহার বাবার কাছে নালিশ করিবার কথাটা বুঝি বা ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে পড়িল আমার মায়ের কথা, এমনি ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কত না আগ্রহের সহিতই না আমাকে প্রবাস হইতে আসিলে গ্রহণ করিতেন। রজত পলের সহিত খেলা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। পল পাশের বাড়ীর মিঃ চিত্রের পৌত্র। তাহার মা ইংরেজ রমণী। ছেলেটি বড়ই দুর্দ্দান্ত—পাখী মারিতে, ছুটাছুটি করিতে তার জোড়া মেলা ভার। রজত হইতেছে তাহার খেলার সাথী। তাহারা তখন বল খেলিতেছিল। রজত ও পলের খুব ভাব, আমাদের দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল। আমরা স্নান সারিয়া পরমানন্দে ভোজন-কার্য্য শেষ করিয়া আশ্রয় লইলাম।

কাল ৭-১৫ মিনিটের গাড়ীতে আমি বোম্বে যাইব, সেজন্য পূর্ব্বেই জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম। রাত্রিতে নানা-জনের সহিত গল্প-গুজবে সময় কাটিয়া গেল।

৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার। আজ সকাল ৭-১৫ মিনিটের পুণা এক্সপ্রেসের গাড়ীতে বোম্বে রওনা হইলাম।* (ক্রমশ)

* এই প্রবন্ধে প্রকাশিত ফটো কয়খানি বোম্বাই প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আজ-কাল

গান্ধী-বড়লাট আলোচনা

৫ই তারিখে নয়াদিল্লীতে গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আপাতত কংগ্রেসকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের সোপান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে উপদেশ দেন এবং বলেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেওয়া তাঁদের অভিপ্রায়, তবে সে সব সমস্যা যুদ্ধের পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু গান্ধীজীর মতে "বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে কংগ্রেসের পূর্ণ দাবী পূরণ হয় না।"

এই বৈঠকের আগেই নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলেছিল। অনেকেই বলেছিল, একটা আপোষ অবধারিত। এখন বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরেও অনেকে বল্‌ছে, আবার শীগ্‌গিরই আলোচনা হবে। আলোচনার ব্যর্থতা সম্বন্ধে একজন সংবাদদাতা বল্‌ছেন যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রবর্ত্তনের সময় নির্দ্ধারণ নিয়েই আসলে গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে মত-বিরোধ হয়, অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ গোলমাল হয় নি।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার বলেছেন যে, ওয়েষ্টমিনষ্টার ষ্ট্যাটিউট অনুযায়ী ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন; ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাওয়ার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা এক রকম অসম্ভ হবে; কারণ কোনও না কোনও প্রদেশ আপত্তি করবে, শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা চল্‌বে না বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মারফৎ একটা বিধানও জুড়ে দেওয়া হতে পারে। আর ষ্ট্যাটিউট অব ওয়েষ্টমিনষ্টার বাতিল করবার ক্ষমতা কোনও ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টের নেই, বৃটিশ পার্লামেণ্টই এ বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের তরফ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের অধিকার স্বীকার করেও নেন, তা হলেও কার্য্যত তা সম্ভব হবে না; কারণ ভারতের গবণমেণ্ট অবিমিশ্র না হওয়ায় দেশীয় নৃপতিরা সব সময়ই স্বাধীনতার দাবীতে বাধা দিতে পারবেন।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কংগ্রেস নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় শ্রীভুলাভাই দেশাই স্পষ্টই সে কথা বলেছেন।

বাঙলা কংগ্রেস

রাজেন্দ্রপ্রসাদের ঘোষণায় বাঙলা কংগ্রেসের সব যুক্তি ও আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায় গত ৩১শে জানুয়ারী বি-পি-সি-সি'র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এক জরুরী বৈঠকে আবার কংগ্রেস নেতৃ দলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার সর্ব্বত্র 'বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস' অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দেন। জনসভায় বাঙলার কংগ্রেসের প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির অবৈধ ও অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদ করা ঐ দিবস-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বাঙলায় দমননীতি ও গণ-সংগ্রামের আসন্নতার কারণে বর্ত্তমান বৎসরে কংগ্রেস নির্ব্বাচন স্থগিত রাখতে নির্দ্দেশ দেন। এ দিক দিয়েও তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটি নিযুক্ত "এড হক" কমিটির অপ্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বাঙলার সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ঐ কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে যে তার করেছিলেন, তার উত্তরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ-আই-সি-সি'র কাছে এ বিষয়ে আবেদন করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। শরৎবাবু তার জবাবে বলেছিলেন যে, এ-আই-সি-সি'র অধিকাংশ সদস্য তাঁদের হাতের লোক, সুতরাং সেখানে আবেদন করে কোনো লাভ নেই। এতে রাজেন্দ্রবাবু ভয়ানক চটে গিয়ে বলেন যে, এ-আই-সি-সি'র সদস্যেরা অবৈধভাবে নির্ব্বাচিত হয়েছেন, এ রকম ইঙ্গিত করা শরৎবাবুর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত। তার জবাবে শরৎবাবু বিহার "হিংসা তদন্ত কমিটি"র রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাজেন্দ্রবাবুর নিজের প্রদেশেই গত নির্ব্বাচনে যে অসাধুতা, যে অন্যায়, যে হিংসার আশ্রয় নিয়ে দক্ষিণপন্থী দলের সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়েছে তার তুলনা আর কোথাও নেই। বাঙলা কংগ্রেস সম্বন্ধে গণভোটের যে দাবী রাজেন্দ্রপ্রসাদ অশ্রুতপূর্ব্ব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, শরৎবাবু তার বৈধতাও নজির দিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি এ পর্য্যন্ত এ বিবৃতির কোনও উত্তর দেন নি।

গত ৩১শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও কলকাতায় এক বিরাট জনসভায় কংগ্রেস নেতৃদলের সংগ্রাম-বিমুখতা এবং বাঙলা কংগ্রেস তথা বামপন্থীদের দলননীতি ব্যাখ্যা করেন। এ সভায় তিনি বিপুল অভিনন্দন পান।

আমেদাবাদে আসন্ন ধর্ম্মঘট

আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পে একটা সাধারণ ধর্ম্মঘট আসন্ন হয়ে উঠেছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মিটমাট করবার জন্যে যিনি সালিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্ত শ্রমিক সমিতি মেনে নেয়; কিন্তু মালিক সমিতি মানে নি। মালিকরা বল্‌ছে, সালিশ নির্দ্ধারিত বর্দ্ধিত মজুরী ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য শ্রমিকদের দিতে হলে তাদের বছরে এক কোটি টাকা বেশী ব্যয় করতে হবে; এত টাকা খরচ করতে তাঁরা রাজী নয়। এর পর কাপড় কলের মজুর সমিতির প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। ৫০০ প্রতিনিধি একবাক্যে সাধারণ ধর্ম্মঘট করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তবে নিয়ম অনুসারে ধর্ম্মঘটের আগে সমস্ত শ্রমিকের ভোট নেওয়া হবে। গান্ধীজীকেও অবস্থা জানান হবে। কয়েকটা মিলে ইতিমধ্যেই ধর্ম্মঘট হয়েছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে বলেছেন যে, আইন অনুসারে তাঁরা শীগ্‌গিরই এই বিরোধ সম্পর্কে একটা সালিশ বোর্ড নিযুক্ত করবেন। এই বোর্ডে শ্রমিকদের দাবীর নোটিশ দিতে হইবে। দাবীর নোটিশ না দিয়ে এবং বোর্ডের কাজ চল্‌বার সময় ধর্ম্মঘট কর্‌লে শ্রমিকদের শাস্তি হবে।

মুনাফা কর বিলে বিক্ষোভ

ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য্য করবার সংকল্প করায় ভারতের ব্যবসায়ী ও মালিক মহলে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার, ইণ্ডিয়ান চেম্বার, মুসলিম চেম্বার, মারোয়াড়ী চেম্বার, বেঙ্গল মিল-ওনার্স এসোসিয়েশন, মারোয়াড়ী এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান কলিয়ারি এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড পেপার মিলস্ এসোসিয়েশন প্রমুখ মালিক সমিতি ও বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এই বিলের প্রতিবাদ ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, অন্য কোন ডোমিনিয়নে এ রকম ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় নি; ভারতবর্ষে এ রকম আইন কর্‌লে শিল্পের প্রসার একেবারে বন্ধ হয় যাবে

* * * * *

গত ৩১শে জানুয়ারী এলাহাবাদে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়েছে। 'অনুসন্ধান কমিটি' সমাজ সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন, সম্মেলনে তা গৃহীত হয়। এই দিন সম্মেলনে অবিলম্বে নারীদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দানের জন্য দাবী জানান হয়। পূর্ব্বদিন যুদ্ধ সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সমর্থন করে ১৫ বৎসর বয়স্কা মিস্ কাজী শা নাওয়াজ এক চমৎকার বক্তৃতা করেন। তিনি বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতির নির্ম্মম সমালোচনা করেন।

* * * * *

সীমান্ত প্রদেশে উপজাতীয় হাঙ্গামা এখনও কমে নি, উপরন্তু কোহাট জেলায় বিস্তৃত হয়েছে। সীমান্ত রক্ষীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট অভিপ্রায় করেছেন।

ইউরোপ

ফিন্‌ল্যাণ্ড

ইউরোপের সামরিক ঘটনার মধ্যে ফিন্‌ল্যাণ্ডই এ সপ্তাহে কিছু উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট বিমানবহর বহু ফিনিশ সহরের উপর বোমা বর্ষণ করে; ভিবর্গ ও অন্য কয়েকটি সহর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাল ফৌজ ম্যানারহাইম লাইন ভেদের জন্যে কারেলিয়াতে এবং লাইন বেড় করে যাবার জন্যে লাডোগা হ্রদের উত্তরে ভীষণ আক্রমণ চালায়। ফিনরা বলে যে, প্রথমে লাল ফৌজ ফিনিশ লাইনের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে পড়েছিল (বলা বাহুল্য এ ঘটনা যখন ঘটেছিল তখনও সোভিয়েটের পরাজয়ের সংবাদই পাওয়া গিয়েছিল), কিন্তু এখন ফিনরা লাল ফৌজকে হটিয়ে দিয়েছে। ফিনরা ক্রোনষ্টাড, ডাগো ও ওজেলে সোভিয়েট ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করেছে বলে দাবী করে। সোভিয়েটের এক ইস্তাহারে ঐ দাবী অস্বীকার করে বলা হয় যে, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা ও সুইডেনের কাছ থেকে আধুনিক বিমানপোত পাওয়ার পরও ফিনরা সোভিয়েটের কোন ঘাঁটিতে হানা দিতে পারে নি ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে, ইদানীং লাল ফৌজ ফিনল্যাণ্ডে বড় বা ছোট কোন অভিযানই চালায় নি; মাঝে মাঝে শুধু স্থানীয় সংঘর্ষ হচ্ছে।

বল্কান আঁতাঁৎ

বেলগ্রেডে বল্কান আঁতাঁৎ-এর (রুমেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক) বৈঠক হয়ে গেল। আলোচনার বিবরণ অবশ্য প্রকাশ পায় নি; তবে এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, ঐ চারটি রাষ্ট্র নিজের নিজের দেশকে যুদ্ধের বাইবে রাখবার সংকল্প করেছে। তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অর্থাৎ সোভিয়েট, জার্ম্মানী ও ইতালীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখ্‌বারও সিদ্ধান্ত করেছে।

বৃটেন বনাম জার্ম্মানী

নাৎসী দলের ক্ষমতা অধিকার উপলক্ষে যে বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়, এবার সেই অনুষ্ঠানে হিটলার তাঁর বক্তৃতায় জার্ম্মানীর সাম্রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বৃটেন ও ফ্রান্স এত বড় সাম্রাজ্য দখল করে বসে থাকবে, আর জার্ম্মানীর কোন উপনিবেশ থাকবে না, এ চলতে পারে না। পক্ষান্তরে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ঐ দিনই কমন্স-সভায় বলেন, ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাদের উদ্যম ও পরিশ্রমে যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে' গেছে বৃটিশ নৌ-বহর সে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবে।

কতকগুলো বৃটিশ জাহাজ শত্রু আক্রমণে নিমজ্জিত হয়েছে। জার্ম্মানরা দাবী করেছে যে, তাদের বিমান-বহর উত্তর সাগরে বৃটেনের একটা মাইন অপসারক জাহাজ, চারটি রক্ষী জাহাজ ও নয়টি বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলেছেন, "স্ফিংক্স" নামে তাহাদের একটি মাইন অপসারক জাহাজ দুর্ঘটনার ফলে নিমজ্জিত হয়েছে।

আফ্রিকা

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে তার অবসান করা হোক, এই মর্ম্মে দক্ষিণ আফ্রিকা পার্লামেণ্টে জেনারেল হার্টজগ আনীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পর তিনি ও ডাঃ মালান এক সম্মিলিত দল গঠন করেছেন। এই দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ রাজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণতন্ত্র স্থাপন।

কানাডা

ওণ্টারিওর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কানাডা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় আন্তরিকতাহীনতার অভিযোগ করায় গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়ার জন্যে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে নির্ব্বাচন হবে।

৫-২-৪০—— ওয়াকিবহাল

পুস্তক পরিচয়

বিচিত্র এই সৃষ্টি—বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রণীত। ইণ্ডিয়ান বুক ষ্টোর্স, ৯১।১ এফ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

পুস্তকের নাম হইতেই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। বিশ্ব ও পৃথিবী, পৃথিবীর জন্ম ও শৈশব, মৃত্তিকা সৃষ্টি, প্রাণের আবির্ভাব, ক্রম বিবর্ত্তনবাদ, আর্য্য ঋষিগণের দৃষ্টিতে সৃষ্টি, উদ্ভিদ সৃষ্টি, প্রাণী সৃষ্টি, মৎস্য, সরীসৃপ ও খেচর, স্তন্যপায়ী, এই কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ের নাম শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, বইখানি নীরস এবং শুষ্ক। ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা এই বই, খেলা এমন সরস এবং চিত্তাকর্ষক যে, ছোট ছেলেমেয়েরা বইখানা পাইলে তো ছাড়িবেই না, ছেলেদের অভিভাবকেরা পর্য্যন্ত অনেকেই বইখানা পড়িলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। এই সব বিষয় লইয়া ছেলেমেয়েদের জন্য এমন সুন্দর করিয়া এবং এতটা যত্ন লইয়া এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বই—ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় অনেক আছে, কিন্তু এদেশে এমন বই আমরা খুব কমই দেখিয়াছি বলিতে হইবে। সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি দ্বারা বিষয়গুলি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশদ করা হইয়াছে। বইখানা বাঙলার শিশু সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের আদর হওয়া উচিত এবং বিদ্যালয়গুলিতে বইখানা পাঠ্য করিলে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল নিবৃত্তির পথে বিজ্ঞানের অনেক বিষয়বস্তু বুঝিয়া লইবার সুবিধা হইবে। বইখানা দেখিয়া এবং পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি।

বিদ্রোহীর স্বপ্ন—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। মূল্য বার আনা। শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১০।১বি, আর জি কর রোড, নবজীবন-সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত।

বিজয়লালের 'বিদ্রোহীর স্বপ্নে'র ছন্দ মনোরাজ্যে একটা বলিষ্ঠ মূর্চ্ছনার সঞ্চার করিয়া মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তোলে। বিজয়লালের ভাষার জোর আছে, বৃহৎ প্রাণের প্রবল অনুভূতি আছে, এবং সে অনুভূতি অগ্নিময় প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করিয়া ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠিবার আগ্রহই আনিয়া দেয়। বিদ্রোহীর স্বপ্নের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই মনোরম।

চোখের জল নয়, রক্ত

মুনিঋষিদের বরে কেউ কেউ কল্পনার অতীত বস্তুরও সন্ধান পেয়েছে আবার তাদের রোষানলে পড়ে কত প্রতাপান্বিত রাজার রাজত্বও ধ্বংস হয়েছে। সামান্য কারণ তাদের যে ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিয়েছে তার ফল মুনিবরের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেও মানবতার দিক থেকে তা অধিকাংশ সময়েই সমর্থন যোগ্য নয়। কোন কোন ক্ষমতাশালী ঋষি কারণে এবং অকারণে রুষ্ট হ'য়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপে নাকি যে রোষানলের সৃষ্টি করতেন তার বহ্নিতে ধ্বংস অনিবার্য্য ছিল। এসব আমাদের শোনা কথা, চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি; তবে এটা সত্য যে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা প্রভাব বিদ্যমান আছে যা স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে প্রযুক্ত হ'য়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তার দাহ্য শক্তি সে পরিমাণ না হ'লেও অনেক সময় বর্ত্তমান

শৃঙ্গযুক্ত গিরগিটির চক্ষু থেকে নির্গত রক্ত

জগতে বহু অনর্থ ঘটিয়েছে। মুনিঋষিদের মত এ যুগের বহু শক্তিশালী মানুষ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চক্ষু থেকে অগ্নিশিখা সৃষ্টি করতে না পারলেও এক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা বলে চক্ষুর সাহায্যে সাধারণকে সম্মোহন করতে অথবা কোন এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে স্বপক্ষের মতের প্রভাব অপর পক্ষের মধ্যে বিস্তার করতে সমর্থ হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাব স্বীকার্য্য এবং ভাল মন্দের বিচার ভুলে সাধারণে এই বৃহত্তর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পড়ে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকেই কেবল এ গুণে ভূষিত করেন নি; নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের শক্তি শ্রেণী ভেদে এবং প্রয়োজন বোধে সমভাবে বিদ্যমান। এবং জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব তুলনায় নিম্নশ্রেণীর জীবের ব্যক্তিগত প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হয়। তবে এ প্রভাব কেবলমাত্র আহার্য্য সংগ্রহে এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে এ প্রভাব কিরূপে ভাবে বিস্তারিত তা গবেষণা দ্বারা জানবার চেষ্টায় আছেন। সম্প্রতি তাঁরা শৃঙ্গযুক্ত একশ্রেণীর গিরগিটি পরীক্ষা করে বলে-ছেন এদের আচার ব্যবহার এবং জাতিগত প্রভাব অদ্ভুত। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি সেকালে ঋষিরা কোন কারণে রুষ্ট হ'লে চক্ষু থেকে নাকি অগ্নি নির্গত করে ভস্ম করতেন। এ জাতীয় গির-গিটিকে কোনরূপে বিরক্ত করলে দুই চক্ষুর কোণ থেকে ঠিক পিচকারীর মত তাজা রক্ত নির্গত করতে দেখা যায়। এরূপ নিঃসৃত রক্তের গতি চার ফিট দূরবর্ত্তী স্থানের উপরও পৌঁছায়। মানুষকে ভস্ম না করলেও এ রক্ত যে কারও পক্ষে শান্তিজল নয় তা বৈজ্ঞানিকেরা মত দিয়েছেন। প্রকৃতির এই রহস্যময় ভাণ্ডারে এ রকম কত যে মুনিঋষির চেলা আত্মগোপন করে আছে তা ক্রমশ প্রকাশ্য!

যুদ্ধ-বীর জিরাফ্‌জাতি

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার পশুশালায় জিরাফ্ দম্পতির এবং তাদের একমাত্র বংশধরের অকাল মৃত্যুতে আমরা নীরবে শোক প্রকাশ করেছি। তাদের বিস্তৃত বাসভূমির চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দর্শকের নীরব জিজ্ঞাসু চাহনি আমাদের বার বার মৃত জিরাফ্ তিনটির কথা মনে করিয়ে দেয়। পশুশালায় পশু দেখতে গিয়ে অনেকেই অনেকের কথা ভুলে যেতেন, কিন্তু এ সুখী পরিবারের খবর না নিয়ে কেউ খুশী মনে বাড়ী ফিরতে পারতেন না।

দর্শকদের উচ্ছ্বসিত আনন্দ ধ্বনি এবং চতুর্দ্দিকের ব্যাকুল আহ্বান চির বধির জিরাফ্ জাতির কর্ণকুহরে প্রবেশ না ক'রলেও পশুশালার জিরাফ্ দম্পতি যেন দর্শকদের এ আহ্বান বুঝতে পারত, সুদীর্ঘ গ্রীবা সঞ্চালনে দর্শকদের অভিবাদন জানাত এবং প্রত্যেকেরই আনন্দের ভাগ গ্রহণ করে দর্শকদের খুশী ক'রত। এই অতিকায় জিরাফ্ জাতি গত মহাযুদ্ধের সময় কিরূপভাবে বিনষ্ট হ'য়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের পথে অগ্রসর হ'য়েছিল তা সে সময়ের ঘটনা থেকে জানা যায়। মহাযুদ্ধ চলেছিল মানুষে মানুষে। এমন সময় মধ্য আফ্রিকার জিরাফ্ জাতি সদলবলে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রলে; তাদের সে বিরাট সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখে পড়ে যুদ্ধের খবরাখবর সরবরাহের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে

জিরাফ সৈন্যদলের সমবেত আক্রমণ

গেল। সংবাদ প্রেরণের সমস্ত পথ বন্ধ হ'ল। আবার নতুন করে তার লাগান হ'ল, কিন্তু জিরাফ্ সৈন্যের প্রবল আক্রমণের ফলে তারগুলিকে রক্ষা করা গেল না। শেষে জার্ম্মান এবং ইংরেজ সৈন্যরা জিরাফ্ পালকে গুলী ক'রে মেরে ফেলবার আদেশ পেল।

কলকাতার জিরাফ্‌ত্রয়ের মৃত্যুর কারণ নাকি বিশেষজ্ঞদের মতে ক্যালসিয়ামের অভাব। আমরা কিন্তু ভাবি তা নয়! ইউ-রোপে যুদ্ধ লেগেছে—জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে। যুদ্ধপ্রিয় জিরাফ্‌ত্রয় স্বদেশের কথা ভেবেছিল—যুদ্ধে যোগদান করতে পারলো না—শোকে পশুশালার মধ্যেই প্রাণ হারাল। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সাগর মুভীটনের নূতন চিত্র কুম্‌কুম্‌

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী শনিবার রূপবাণী চিত্রগৃহে সাগর মুভীটনের নব অবদান 'কুম্‌কুম্‌'-এর শুভ উদ্বোধন হইবে। ইহার গল্পাংশ জোগাইয়াছেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুত মন্মথ রায় এবং ইহার চিত্ররূপ পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত মধু বোস।

আধুনিক সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলির ছাপ থাকায় ছবিটি জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা আছে খুবই।

এই ছবিতে আমরা দেখিতে পাই, ধনী জগদীশপ্রসাদকে ধনসাম্যবাদী নেতারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। অথচ এই জগদীশপ্রসাদই কি না ছিল, এক বন্ধুর আশ্রয়ে লালিত পরিবর্দ্ধিত। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এবং ক্রূরবুদ্ধির দীপ্তিতে সে আশ্রয়দাতা বন্ধুর বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া হইল ধনী, আর যে ছিল সত্যিকারের শ্রমিক দরদী, দেশ-প্রেমিক দেশসেবার মূল্য জোগাইতে গিয়া সেই সূর্য্যশঙ্কর হইল কারাগারে অবরুদ্ধ।

এক নারী জড়াইয়া পড়িল এই ঘটনা-স্রোতের আবর্ত্তে। সে হইল 'কুম্‌কুম্‌'। কুম্‌কুমকে প্রথমে আমরা পাদপ্রদীপের সম্মুখে দেখিতে পাইব সখীসঙ্ঘের একজন-রূপে, কিন্তু নিয়তির গূঢ় ইচ্ছায় তাহাকে একরাত্রে নায়িকা সাজিতে হইল এবং তাহার ভীরু চিত্ত এই দায়িত্ব প্রতিপালনে যে ভুল করিল তাহাই আশীর্ব্বাদ হইয়া জগদীশ-প্রসাদের প্রতিষ্ঠালাভের হইল সহায়।

এখানেই ঘটনাস্রোতের মোড় গেল ঘুরিয়া —নাট্যমঞ্চের নায়িকা কুম্‌কুম্‌—প্রবঞ্চক জগদীশপ্রসাদের সত্য পরিচয় লাভ করিয়া বঞ্চিত, হৃতসর্ব্বস্ব দরিদ্র ফেরারী পিতার হাত ধরিয়া রঙ্গমঞ্চের বাহির হইয়া আসিল প্রতিহিংসাপরায়ণা নায়িকারূপে জীবন নাট্যের নূতন ভূমিকায়।

জগদীশপ্রসাদের পুত্র চন্দন ঝুঁকিয়া পড়িল কুম্‌কুম্‌-এর দিকে প্রগাঢ় প্রেম নিয়ে অন্ধের মত। কুম্‌কুম্‌ও রাজী হইল এই দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে, কিন্তু প্রেমের প্রেরণায় নয়, প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রয়োজনে। সে হইল জগদীশপ্রসাদের পুত্রবধু।

আরম্ভ হইল নারীর জীবনে হৃদয় রহস্যের উদ্ঘাটন। প্রতিহিংসার কামনা দিয়া জীবনের চিরন্তন সত্য প্রেম অস্বীকার করিবার প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত হইল ব্যর্থ—হৃদয়ের প্রকৃত রূপ বিচিত্র সংঘাতের মধ্যে মুক্তিলাভ করিল। কুম্‌কুম্‌ চন্দনের কাছে গেল আত্মোৎসর্গ করিতে কিন্তু তখন চন্দনের মন হীন সন্দেহে ভারাক্রান্ত। চরিত্রের সততায় সন্দিহান চন্দন উন্মুখ আকুল কুম্‌কুমকে করিল বিমুখ—কুম্‌কুমের জীবন আবার নূতন পাকে জড়াইয়া গেল—বিপরীত ঘটনার স্রোতে আবার সে ভাসিয়া চলিল।

এই অসাধারণ চরিত্রটির প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন শ্রীমতী সাধনা বোস।

'কুমকুম' চিত্রে নাম ভূমিকায় শ্রীমতী সাধনা বোস্‌

জগদীশপ্রসাদ, চন্দন, সূর্য্যশঙ্কর, প্রদীপ, তিলোত্তমা, সিপ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে রবি রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ভুজঙ্গ রায়, প্রীতিকুমার, লাবণ্য দাস, পদ্মাদেবী প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সুর সংযোগ করিয়াছেন স্বনামধন্য তিমিরবরণ।

মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস্

মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি মহাসমারোহে মার্কাস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্রায় সকল মহিলা কলেজের ছাত্রীগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে অধিকসংখ্যক ছাত্রী যোগদান করায় প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। আপাদ লম্বিত শাড়ী পরিহিতার সংখ্যা যোগদানকারিণী মহিলা এ্যাথলীটগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই ছিল। অধিকাংশ মহিলা এ্যাথলীট অভিনব ফ্রগ্ পরিহিতা অবস্থায় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। মুসলমান ছাত্রীগণ যাঁহারা সদাসর্ব্বদা পর্দ্দা পরিবেষ্টিত গাড়ীর সাহায্যে কলেজে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কয়েকজনও এই অনুষ্ঠানে পায়জামা পরিহিতা অবস্থায় যোগদান করেন। বিভিন্ন মহিলা কলেজের প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রী অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত

মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের ১০০ মিটার দৌড়ের আরম্ভের দৃশ্য।

থাকিয়া যোগদানকারিণী এ্যাথলীটগণকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেন। মাত্র পাঁচ বৎসর হইল এই অনুষ্ঠানের যে ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা বুঝিবার কোনরূপ উপায় ছিল না। অনুষ্ঠানের ক্রীড়াক্ষেত্রটি হাস্যময়ী, সজীব, উৎসাহী উচ্চশিক্ষিতাদের বিরাট সমাবেশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। চিরকাল গৃহকোণে আবদ্ধ বাঙালী নারী সমাজ হঠাৎ সজীবতার সন্ধান পাইয়া কিরূপে বিপুল সাড়া দিল ইহাই হইয়াছিল অনুষ্ঠানের সময় অনেকের আলোচনার বিষয়। সমাজ পরিচালকগণের আপত্তি, সংকীর্ণচেতা সাংবাদিকগণের কটূক্তি, কু-সংস্কারাচ্ছন্নদের অপবাদ উপেক্ষা করিয়া বাঙলার উচ্চশিক্ষিতাগণ ব্যায়াম ক্রীড়াক্ষেত্রে দলে দলে যোগদান করিতেছেন, ইহাই হইয়াছিল অনেকের বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু অনুষ্ঠানটি আমাদের কোনরূপ আশ্চর্য্যান্বিত করে নাই। মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে প্রতি বৎসরই অধিক সংখ্যক ছাত্রী যোগদান করিবেন ইহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম। সকল সম্প্রদায়ের সহানুভূতিও যে এই অনুষ্ঠান পাইবে ইহাও আমরা প্রথম বৎসরের অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের অনুষ্ঠানের পরেই উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমরা তখন লিখিয়াছিলাম "বিভিন্ন সমাজের পরিচালকগণ যাঁহারা প্রাচীন ভাবাপন্ন, যাঁহারা বর্ত্তমানে বালিকাগণের ব্যায়াম চর্চ্চার বিষয় ঘৃণাসূচক মন্তব্য করিয়া থাকেন, কয়েক বৎসর পরে আর তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তখন তাঁহাদের মুখ হইতে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে, উৎসাহবাণী শোনা যাইবে। আমাদের এই উক্তি বর্ত্তমানে অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব সম্ভব হইবে। সকল সম্প্রদায়ের বালিকাগণকে বিপুল উৎসাহে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেখা যাইবে।" আপাদলম্বিত শাড়ী পরিহিতা হইয়া স্পোর্টস্ করা চলে না। ইহাতে অনেক অসুবিধা আছে ইহার উল্লেখ করিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তথায় উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এই বিষয়ের পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে এখন হইতে কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা উচিত হইবে না। মহিলা এ্যাথলীটগণ নিজেরাই শাড়ী ত্যাগ করিয়া ফ্রগ্ বা অনুরূপ কোন পরিচ্ছদ বাছিয়া লইবেন। আমাদের সেই উক্তিও বর্ত্তমানে সত্য হইতে চলিয়াছে। অসুবিধায় পড়িয়া মহিলাগণ ফ্রগ্ পরিধানের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত যে কয়েকজন মহিলাদের শাড়ী পরিহিতা অবস্থায় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেখা যাইতেছে তাঁহাদেরও ফ্রগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এই বিষয়েও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এ্যাথলেটিকসের সাফল্য অনেকখানি সাবলীল হস্তপদ চালনার উপর নির্ভর করে। শাড়ী পরিধানে তাহা সম্ভব হয় না। এই উপলব্ধি মহিলা এ্যাথলীটগণের মধ্যে যেদিন হইবে সেইদিনই তাঁহারা সকলে শাড়ী ত্যাগ করিবেন।

শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন

মহিলাদের এ্যাথলেটিকস বিষয় বিপুল উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উৎসাহ উদ্দীপনা চিরস্থায়ী করিতে হইলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই বিষয় মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। তাহার প্রমাণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সময় এ্যাথলীটগণের কার্য্যকলাপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি পরিচালকগণ আগামী বৎসর হইতে এই বিষয় বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

সমর-বার্ত্তা

৩১শে জানুয়ারী——

ফিনল্যাণ্ডের ল্যাডোগা রণাঙ্গনে লালফৌজ বেপরোয়া সংগ্রাম চালায়। যুদ্ধারম্ভের পর রাশিয়া এই সর্ব্বপ্রথম ল্যাডোগা রণাঙ্গনে বাছা বাছা সৈন্য প্রেরণ করিল। ইহাদের উপর্য্যুপরি অতর্কিত আক্রমণে ফিনিশ-বাহিনী ফ্যাসাদে পড়িয়াছে। মধ্য-ফিনল্যাণ্ডের কুমনেইমির উত্তর দিকবর্ত্তী নূতন রণাঙ্গনে ফিন-সৈন্যেরা অনুমান ২২ সহস্র সোভিয়েট সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছে।

"জিরাল্ডা" (২১৭৮ টন) নামক আরও একটি বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে উভয়পক্ষের গোলন্দাজ-বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

শেটল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মান যুদ্ধ বিমানসমূহ ১২টি বোমা নিক্ষেপ করে; কিন্তু সব কয়টি বোমাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া সমুদ্রের মধ্যে পতিত হয়। জার্ম্মান বোমারু বিমানসমূহ বৃটেনের দরিয়ায় একটি অরক্ষিত জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করে।

১লা ফেব্রুয়ারী——

ফিনিশ পার্লামেণ্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ক্যালিও ঘোষণা করেন যে, ফিনল্যাণ্ড সম্মানজনক শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত আছে। প্রেসিডেণ্ট ক্যালিও দাবী করেন যে, সোভিয়েটের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল ধ্বংস হইয়াছে এবং ফিনিশ সৈন্যগণ ইতিমধ্যেই শত্রুবাহিনীর এক অংশকে পূর্ব্ব সীমান্তের অপর পারে হঠাইয়া দিয়াছে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী এডমিরাল ইয়েনাই উচ্চ পরিষদে বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, "চীনের ব্যাপারের একটা সমাধান" করিতে এবং ইউরোপীয় সংঘর্ষে জড়াইয়া না পড়িতে গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন।

২রা ফেব্রুয়ারী——

জার্ম্মান বেতারে আরও দুইটি জাহাজ জলমগ্ন করার দাবী করা হইয়াছে। একটি হইতেছে বৃটিশ জাহাজ "ওরিগন" (৬০০০ টন); জাহাজটি টর্পেডোর আঘাতে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অপরটি সুইডিস জাহাজ "ফ্রাম" (২০০০ টন); বৃটিশ উপকূলের অদূরে এক বিস্ফোরণের ফলে জাহাজটি জলমগ্ন হয়।

ফিনদের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৪০০ সোভিয়েট বিমান ফিনল্যাণ্ডের ২০টি শহরের উপর বোমাবর্ষণ করে। ফলে ২০জন নিহত ও ৩০জন আহত হইয়াছে।

বেলগ্রেডে বল্কান আঁতাৎ-এর (গ্রীস, রুমানিয়া তুরস্ক ও যুগোশ্লাভিয়া) বৈঠক আরম্ভ হয়।

ফিনল্যাণ্ডের ক্যারেলিয়ান যোজকে উভয় পক্ষের গোলন্দাজ-বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী——

ফিনরা দাবী করে যে, ফিনল্যাণ্ডের ল্যাডোগা হ্রদের উত্তর-পূর্ব্বে তাহারা শত্রুপক্ষের কয়েকটি ঘাঁটি দখল করিয়াছে। দুই-শত রাশিয়ান নিহত হইয়াছে। সতরজন বন্দী এবং পঁচিশটি ট্যাঙ্ক, তিনটি কামান ফিনদের হস্তগত হইয়াছে। ল্যাডোগা তীরে সংগ্রামের সময় ফিনরা এগারটি ট্যাঙ্ক, তিনটি কামান ধ্বংস করে। প্রচুর সমর সম্ভার ফিনদের হস্তগত হয়। সাল্লা রণাঙ্গনেও রাশিয়ানদের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং শত্রুপক্ষ ২০০ মৃতদেহ ফেলিয়া রণস্থল ত্যাগ করে।

বৃটেনের উপকূলে কতিপয় শত্রুপক্ষীয় বিমান হানা দেয় এবং জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। বৃটিশ বিমানের সহিত জার্ম্মান বিমানের সংঘর্ষ হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী——

ক্যারেলিয়ান যোজকে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে; সেখানে রুশবাহিনী ম্যানারহাইম লাইন ভেদ করার জন্য উপর্য্যুপরি আক্রমণ চালাইতেছে। হেলসিঙ্কির এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সুম্মা রণাঙ্গনে রুশবাহিনী চারবার আক্রমণ চালায়, কিন্তু সব কয়টি আক্রমণই ব্যর্থ করা হইয়াছে।

গতকল্য উত্তর সাগরে জার্ম্মান বিমান আক্রমণের সময় চৌদ্দটি জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মানীরা দাবী করে। লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল তাহা 'অযৌক্তিক' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কোপেনহেগেন বেতার সংবাদে প্রকাশ যে, বল্কান আঁতাৎ-এর বৈঠকের পর একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়া বলা হয় যে, বল্কান আঁতাৎভুক্ত চারিটি রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়ে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সম্মত হইয়াছেনঃ—(১) আঁতাৎভুক্ত রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা; (২) বল্কানে ইউরোপীয় যুদ্ধ বিস্তৃত হইতে না দিবার নীতির অনুসরণ; (৩) আঁতাৎভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখা; (৪) প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠা; (৫) আঁতাৎভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর করা, (৬) সাত বৎসরের জন্য বল্কান চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা।

৫ই ফেব্রুয়ারী——

সোভিয়েট-বাহিনী বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়িয়া ফিনল্যাণ্ডের উপর অধিকতর ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায়। সোভিয়েট-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য মস্কো ও দক্ষিণ রাশিয়া হইতে ফিনিশ রণাঙ্গনে আরও সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। হেলসিঙ্কির ইস্তাহারে প্রকাশ যে, অদ্য সোভিয়েট বোমারু বিমানবহর ফিনল্যাণ্ডস্থিত সুইডিস এম্বুলেন্সসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। এম্বুলেন্সসমূহে রোগী ছিল, কিন্তু কেহই হতাহত হয় নাই।

বৃটিশ মাইনধ্বংসী জাহাজ "স্ফিংক্স" দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ জলমগ্ন হয়। কম্যাণ্ডিং অফিসার জে আর এন টেলার ও চারজন নৌ-সৈনিক নিহত হইয়াছে। ৪জন অফিসার ও ৪৫জন নৌ-সৈনিক নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহারা জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

ইউনান এবং ফরাসী ইন্দো-চীনের হাইফং-এর মধ্যবর্ত্তী ফরাসী পরিচালিত রেল লাইনের একটি ট্রেনের উপর জাপ বিমানের বোমাবর্ষনের ফলে ১১০জন নরনারী নিহত হইয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী——

বৃটিশ মালবাহী জাহাজ 'বিভার বারিন' (৯৮৭৪ টন) জার্ম্মান সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

হেলসিঙ্কির এক সংবাদে প্রকাশ, ফিনরা আর একটি বড় রকমের সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ল্যাডোগা হ্রদের উত্তর-পূর্ব্বে কিটেলাতে অষ্টাদশ সোভিয়েট ডিভিসনকে এক সপ্তাহের অধিককাল পূর্ব্বে ফিনিশরা ঘেরাও করিয়া ফেলে; বর্ত্তমানে উক্ত সৈন্যদল কার্য্যত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ১৫ হাজার হইতে ২০ হাজার সৈন্য নিহত কিম্বা বন্দী হইয়াছে। ক্ষুধা এবং অত্যধিক শীতের জন্যও ইহাদের অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

জাপ প্রতিনিধি পরিষদে জাপ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ আরিতা বলেন যে, জাপ রাজধানীর নিকট সংঘটিত "আসামা মারু" ঘটনায় জাপানে গভীর বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়; বৃটেন ঐ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, বৃটেন "আসামা মারু" হইতে অপসারিত ২১জন জার্ম্মানের মধ্যে ৯ জনকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছে।

আনকারায় ঘোষণা করা হইয়াছে, বল্কান আঁতাৎ-এর বৈঠকে বুলগেরিয়া সরকারীভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, সে বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ থাকিবে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

৩১শে জানুয়ারী——

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক "এড হক" কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ "এড হক" কমিটি নিয়োগ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র-বিরোধী, অন্যায় ও অহেতুক বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং সমস্ত জেলা, মহকুমা ও প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিকে "এড হক" কমিটির সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা না করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী "বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস" হিসাবে প্রতিপালন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাবের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। সত্য ও অহিংসার নামে গান্ধীপন্থীরা যে মিথ্যা ও হিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীযুক্ত বসু বলেন বাঙলার সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে মতভেদ চলিয়াছে, তাহাকে প্রাদেশিক ব্যাপার মনে করা ভুল। সমস্ত প্রদেশেই ছলে, বলে, কৌশলে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই প্রচেষ্টার পরিণতি বাঙলা দেশে "এড হক" কমিটিরূপে দেখা দিয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী——

বাঙলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে লইয়া অবিলম্বে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের অনুরোধ করিয়া বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত বি সি চ্যাটার্জ্জি এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

বাঙলা গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা বর্ত্তমান বৎসরের পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

২রা ফেব্রুয়ারী——

'ফিনল্যাণ্ড' এবং 'সমর ও শ্রমিক সম্প্রদায়' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের জন্য জরুরী মুদ্রাযন্ত্র আইনে বোম্বাই-এর শ্রমিক নেতা মিঃ এস এ ডাঙ্গেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে বোম্বাইয়ের 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' পত্রিকার পুনঃ প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রবল কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি থানায় ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী——

মহাত্মা গান্ধী এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সভাপতিত্বের পক্ষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি আশা করেন যে, মৌলানা আজাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।

কলিকাতা স্বাস্থ্য সপ্তাহ কমিটির উদ্যোগে "নগর পরিষ্কার আন্দোলন" আরম্ভ হইয়াছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী——

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসার জন্য আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার কলিকাতা ভবনে ১৫জন হিন্দু ও ১৫জন মুসলমানের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর মতে দেশের কল্যাণের জন্য বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সমাধান করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক দলসমূহের এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে অবিলম্বে একটা আপোষ মীমাংসা হওয়া দরকার। সেজন্য তিনি তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীতে কংগ্রেসওয়ালা-দিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী——

দিল্লীতে গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার হয় এবং আড়াই ঘণ্টাকাল উভয়ের মধ্যে ভারতের রাজনীতিক সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়। বড়লাট কতকটা বিস্তৃতভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ও প্রস্তাব বিবৃত করেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে "যথাশীঘ্র সম্ভব" ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস অর্পণ করিতে ইচ্ছুক, বড়লাট প্রথমত এই কথার উপর বিশেষ জোর দেন। তৎসম্পর্কে যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, তন্মধ্যে দেশরক্ষা বিষয়টির দিকে তিনি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট জানাইয়াছেন যে, সময় উপস্থিত হইলেই বিভিন্ন দল ও স্বার্থের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। বড়লাট আরও জানান যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস শীঘ্র অর্জ্জিত হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী এই সমস্ত প্রস্তাবের উত্তরে জানান যে, বড়লাটের এই মনোভাব প্রসংশনীয়, কিন্তু ইহা দ্বারা কংগ্রেসের দাবী পূর্ণ হয় না। গান্ধী-বড়লাট আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

দিল্লীতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট মুসলিম ভারতের দাবী জানাইবার জন্য তাঁহারা একটি প্রতিনিধি দলকে বিলাত পাঠাইবেন।

শক্কর জেলায় হিন্দু নির্য্যাতন সম্পর্কে কংগ্রেসী দল সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে গবর্ণমেণ্টের নিন্দাসূচক এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স শক্কর ঘটনাকে কলঙ্ককর বলিয়া অভিহিত করেন এবং শক্কর জেলার অরাজকতা সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। কংগ্রেস দল প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট দাবী করেন নাই, ফলে উহা আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী——

মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের দাবী ও বৃটিশ সরকারের প্রস্তাবে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। বৃটিশ সরকার চাহিতেছেন, তাঁহারাই ভারতের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং কংগ্রেস চাহিতেছে বাহিরের হস্তক্ষেপ ব্যতীত ভারতবাসীরাই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। গান্ধীজী বলেন যে, বৃটিশ সরকারের এই মনোভাবের যতদিন পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক আপোষের কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি আরও বলেন যে, বৃটেনের সহিত ভারতের দাবী সম্পর্কে মীমাংসা হইলে দেশরক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ, রাজন্যবর্গ ও ইউরোপীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলিরও মীমাংসা হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে অতিরিক্ত লাভকর বিলই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান পরিষদে এই বিলটি উত্থাপন করেন এবং উহা আলোচনার্থ সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন দলের সদস্যগণ বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসী দলের সদস্যগণ পরিষদে অনুপস্থিত ছিলেন।

অতিরিক্ত লাভকর বিলের প্রতিবাদে কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরের শেয়ার মার্কেট ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ছিল।

মিঃ জিন্না আজ দিল্লীতে বড়লাটের সহিত দেখা করেন; উভয়ের মধ্যে এক ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। মিঃ জিন্নার আবেদনের উত্তরে বড়লাট তাঁহাকে এই আশ্বাস দান করেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সম্যক অবহিত আছেন, উহদের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা করা হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

দেশ—৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা

—অ—

—আ—

—ই—

—ঈ—

—উ—

—এ—

—ক—

—খ—

—গ—

—চ—

—ছ—

—জ—

—ত—

—দ—

—ধ—

—ন—

—প—

—ফ—

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

আগামী ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০, রবিবারে এলাহাবাদের বাঙালীগণের পক্ষ হইতে যুগ-প্রবর্ত্তক অপরাজেয় কথাশিল্পী 'শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লীর স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি ১৫০ লাইনের অধিক দীর্ঘ নাহওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ প্রেরক প্রবন্ধটি নিজ নিজ স্কুল বা কলেজের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত করাইয়া, নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া এবং প্রবন্ধের নকল রাখিয়া ইং ১২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা ১ম ও ২য় এবং ছাত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাদিগকে একটি করিয়া রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হইবে না এবং যে প্রবন্ধগুলি পুরস্কার লাভ করিবে সেগুলি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে; কিন্তু সে জন্য কোন স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না। বিচারকগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিচারক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী এম-এ ও শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ (এঙ্গলো-বেঙ্গলী কলেজ), শ্রীযুক্ত হরিপদ গুপ্ত এম-এ (সি এ ভি হাই-স্কুল), শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ রায় এম-এ (কর্ণেলগঞ্জ হাই-স্কুল), শ্রীমতী পরিমল সেন এম-এ (ক্রস্থওয়েট গার্লস কলেজ) এবং শ্রীমতী লতিকা ঘোষ বি-এ (জগত্তারণ গার্লস হাই স্কুল)।

ছাত্রগণের প্রবন্ধের বিষয়—"বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান"।

ছাত্রীগণের প্রবন্ধের বিষয়—"শরৎ সাহিত্যে নারীর স্থান"।

প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানাঃ—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমকৃষ্ণ দে, সম্পাদক, শরৎ বার্ষিক স্মৃতিসভা। ৭০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ।

বর্দ্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত—
রচনা প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী :—

(১) এই প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র বর্দ্ধমান জেলার ছাত্রছাত্রীরাই যোগদান করিতে পারিবে।

(২) রচনা বাঙলায় ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে।

(৩) ছাত্র ফেডারেশনের অনুমোদিত ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী, প্রেসিডেণ্ট অথবা প্রতিযোগীর নিজের স্কুলের হেড-মাষ্টার বা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের কার্য্যকরী সমিতির কোন সভ্যের সার্টিফিকেট রচনার সহিত পাঠাইতে হইবে।

(৪) এই প্রতিযোগিতায় কোনরূপ প্রবেশ মূল্য নাই।

(৫) রচনা ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ছাত্র ফেডারে-শনের কৃষ্টি সম্পাদকের নামে নিম্নের ঠিকানায় পেঁছান চাই। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হইবে।

রচনার বিষয় :—

(ক) **ছাত্র আন্দোলন** (কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রদের জন্য)

(খ) **নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রদের কাজ** (কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্রদের জন্য)

(গ) **বাঙলায় নারীশিক্ষা** (কেবলমাত্র স্কুল কলেজের ছাত্রীদের জন্য।)

পুরস্কার :—

(১) কলেজের ছাত্রদের প্রথম পুরস্কার **সুকুমার স্মৃতিপদক** (রৌপ্য)।

(২) স্কুলের ছাত্রদের প্রথম পুরস্কার **রকিব স্মৃতিপদক** (রৌপ্য)।

(৩) স্কুল কলেজের ছাত্রীদের প্রথম পুরস্কার **অদ্বৈত স্মৃতি-পদক** (রৌপ্য)।

(৪) স্কুলের ছাত্রদের দ্বিতীয় পুরস্কার **মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিপদক** (রৌপ্য)।

শান্তশীল মজুমদার
কৃষ্টি ও সংগঠন সম্পাদক,
বর্দ্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশন।

"দেশ"এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক **"দেশ"** প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মফঃস্বলের কাগজ ঐ দিন ডাকে দেওয়া হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাশুল সহ ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

(৩) ভিঃ পিঃ-তে লইলে যতদিন পর্য্যন্ত ভিঃ পিঃ-র টাকা আসিয়া না পেঁছায় ততদিন পর্য্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভিঃ পিঃ খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মণিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড **"দেশ"** নগদ ৵০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মণিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে **"দেশ"** কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ :—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	১ মাস	এক সংখ্যার জন্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে মধ্যে **"আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে"** পেঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মণিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে **'দেশ'** কথাটি উল্লেখ করিবেন।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকেট দেওয়া না থাকিলে কোন মতেই ফেরৎ দেওয়া হয় না।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০,০০০ দোকানদার আবশ্যক, ১০,০০,০০০ আনা মূল্যের 'অ্যাস্‌প্রো' বিনামূল্যে বিতরণ ক'রে যাঁরা লাভবান হ'তে চান

ব্যবসায়ীদের পড়া উচিত

যে ওষুধের পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাটতি —**"অ্যাস্‌প্রো"**—তার প্রস্তুত-কারকেরা, **"অ্যাস্‌প্রো"** লিমিটেড্‌ কোম্পানী, তাঁদের **"অ্যাস্‌প্রো"র** জ্বর ও যন্ত্রণার নিবারণ-শক্তিতে এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁরা এই অঞ্চলের দোকানদারদের সহযোগিতায় দশ লক্ষ আনা মূল্যের **"অ্যাস্‌প্রো"** ট্যাব্‌লেট্‌ জনসাধারণের ভিতর বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করছেন।

"অ্যাস্‌প্রো" লিমিটেড্‌ বিশ্বাস করেন যে সহযোগিতার উচিত মূল্য প্রয়োজন এবং সেই হেতু তাঁরা এই বিরাট **"অ্যাস্‌প্রো"** বিতরণে সাহায্য করবার জন্য **দোকানদারদের নিম্নলিখিতভাবে পুরস্কৃত করবেন ঃ**

ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে বৃহদাকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে এবং প্রতি বিজ্ঞাপনে একটি করে কুপন থাকবে। জনসাধারণ এই কুপন নিয়ে দোকানে উপস্থিত হ'লে দোকানদার এই কুপনের পরিবর্ত্তে তাঁকে এক প্যাকেট **"অ্যাস্‌প্রো"** বিনামূল্যে দেবেন। দোকানদারকে কুপন প্রতি এক প্যাকেট বিনামূল্যে **"অ্যাস্‌প্রো"** ও উপরন্তু এক পাই পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

এই বিতরণের ফলে জনসাধারণ নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে **"অ্যাস্‌প্রো"র** কার্য্যকরীশক্তি অসাধারণ, তা না হ'লে **"অ্যাস্‌প্রো"**র মালিকেরা কেন শুধু শুধু এত টাকার মাল বিনামূল্যে দিচ্ছেন। এই বিতরণের দ্বারায় ডাক্তার, ব্যবসায়ী, জনসাধারণের প্রত্যেকে **"অ্যাস্‌প্রো"** লিমিটেডের খরচায় **"অ্যাস্‌প্রো"** পরীক্ষা করবার সুযোগ পাবেন। **"অ্যাস্‌প্রো"** লিমিটেড ছাড়া কেহই কোন ক্ষতি স্বীকার কচ্ছেন না। বস্তুতঃ **"অ্যাস্‌প্রো"**রও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই কারণ পৃথিবীর সর্ব্বদেশে প্রমাণিত হ'য়েছে যে একবার এই বিখ্যাত ওষুধটি ব্যবহার করলে এ নিত্যব্যবহারের সামগ্রী হ'বে। আবাল-বৃদ্ধ নির্ব্বিচারে **"অ্যাসপ্রো"**র কল্যাণে মাথাধরা, সর্দ্দি, জ্বর, বাত, দাঁত ও স্নায়ু বেদনা, অনিদ্রা, স্ত্রীরোগজনিত বেদনা প্রভৃতি বহু রোগ হ'তে নিস্তার পাবেন।

"অ্যাস্‌প্রো" সম্বন্ধে আর একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হ'চ্ছে ইহার জলীয়বাষ্প-নিরোধক, স্বাস্থ্যসম্মত "সিলটাইট্‌" প্যাকেট্‌। এই অদ্ভুত প্যাকেটে প্রতি ট্যাব্‌লেট্‌ আলাদা আলাদা খোপে সিল্‌ করা থাকে। বছরের পর বছর **"অ্যাস্‌প্রো"** এই জন্য টাট্‌কা থাকে। কিন্তু সাধারণ খামে আলগা প্যাক করা ট্যাব্‌লেট্‌ শীঘ্রই নষ্ট হ'য়ে যায়।

মেসার্স জে, এল্‌, মরিসন্‌, সন্‌ এণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড পোঃ বঃ ৩৮৭, কলিকাতা। টেলিফোন—ক্যাল্‌ ৭৯৬,—এই ওষুধের এজেণ্টঃ তারা সমস্ত দোকানদারদের অনুরোধ করছেন যে দোকানদারেরা যেন অতিশীঘ্র বিতরণের উদ্দেশ্যে মালের জন্য লেখেন এবং সেই সঙ্গে দোকানের সামনে টাঙ্গাবার জন্য একটি পোষ্টার এবং লিফ্‌লেট্‌ চেয়ে পাঠান।

আমেদাবাদে একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে খুচ্‌রো দোকানগুলিতে দশ দিনে দশ হাজার লোক কুপন্‌ ভাঙ্গিয়েছিল।

বোম্বাই প্রদেশে এখন এই বিতরণ জোর চল্‌ছে এবং আশা করা যায় পাঁচ লক্ষ লোক সেখানে কুপন ভাঙ্গাবে, এবং ইতিমধ্যেই বোম্বাইতে **"অ্যাস্‌প্রো"**র বিক্রয় অসম্ভব বেড়ে গেছে।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে মরিসন্‌, সন্‌ এণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের নিকট অবিলম্বে খবর নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারগণ নিম্ন ঠিকানায় পরিপূর্ণ বিবরণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

জে, এল্‌, মরিসন্‌ সন্‌ এণ্ড জোন্স্‌ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, পোঃ বঃ ৩৮৭, মিশন্‌ রো এক্‌স্‌টেনসন্‌, কলিকাতা।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৩৪৬ সাল। Saturday, 3rd February, 1940. [১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ—

স্বামীজীর জন্মোৎসব গত বুধবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে হইয়া গেল। বহুদিন পরে ভারতভূমি মানুষের মত একজন মানুষ পাইয়াছিল স্বামীজীর মধ্যে। পরাধীন ভারতের অবসাদকর আবহাওয়ায় এমন বীর সন্ন্যাসীর আবির্ভাব বাস্তবিকই বিস্ময়কর। স্বামীজীর বাণী শক্তিময়ী বাণী। তিনি এই শক্তির উদ্দীপনা-স্পর্শ অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন সকলের অন্তরে যিনি অবস্থান করিতেছেন 'ভূরিস্থাত্রা'রূপে তাঁহারই উপলব্ধিতে। তিনি দেখিয়াছিলেন দেবতাকে, অনুমানে প্রত্যয়ে বা বুদ্ধির প্রকর্ষ পরিকল্পনায় নয়—জীবন্ত এবং জাগ্রতভাবে এ দেশের জনগণের মধ্যে। এ দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় তিনি মায়ের ক্লিন্ন রূপ দেখিয়াছিলেন এবং উত্তাপ পাইয়াছিলেন চরম আত্মাবদানে শক্তিময়ীর সেবায়। স্বামীজীর সে সাধনা ব্যর্থ হয় নাই—সন্ন্যাসী যিনি, তিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হয় না। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী আজও ভারতের আকাশে বাতাসে উদ্দীপনার প্রবাহ ছুটাইতেছে এবং নানা অন্তরায়ের ভিতর দিয়া অমোঘভাবে ভারতবাসীদের অন্তরে মানবতাকে জাগাইয়া তুলিতেছে। 'আগামী এক বৎসরকাল জননী জন্মভূমিই আমাদের একমাত্র উপাস্যা হউন' বীর সন্ন্যাসীর এই বাণী ভারতবাসীর পক্ষে মহামন্ত্রস্বরূপ। এই মন্ত্রের জপ করিতে হইবে, চিন্তায় এবং কাজে এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবকে আকার দিতে হইবে। আমরা যদি এই কাজটি করিতে পারি, মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইবে। জাতির দুঃখ-দৈন্যের অনুভূতির উত্তপ্ততার ভিতরে জাতির মুক্তি নির্ভর করিতেছে, পরের অনুগ্রহের উপর নয়। স্বামীজীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া যদি এই সত্যটি আমরা অন্তরে অন্তরে একান্তভাবে উপলব্ধি করি, এবং ত্যাগের পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত প্রেরণা পাই তাঁহার মহৎ চরিত্রের অনুধ্যানে, তবেই তাঁহার স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে। বীর সন্ন্যাসীর অনুপ্রেরণা আজ ভারতকে ইতর আসক্তির অবীর্য্য হইতে উদ্ধার করুক।

ডোমিনিয়নের পথে—

দেখিতে দেখিতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পড়িল, এই ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বড় বড় ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া শুনিতেছি। গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে আলোচনার ফলস্বরূপেই এই সব বড় বড় ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া বুদ্ধিমানদের বিবেচনা। ইহার আভাষ আমরা বিলাতের কমন্স সভায় সহকারী ভারতসচিব স্যার হিউ ও'-নীলের বক্তৃতা হইতেই পাইয়াছিলাম। তিনি বলেন, "আমরা সকলেই আশা করিতেছি যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতে শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে যে কয়েকটি বৈঠক হইবে, তাহার ফলে এখনই হউক, কিংবা কয়েকদিন পরেই হউক, ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে এবং ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-পরিবারে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনাধিকারলব্ধ ডোমিনিয়নের স্থান অধিকার করিবে।" কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর উপর এই আলোচনা চালাইবার ভার দিয়াছেন। মহাত্মাজী এজন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন—: তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সংগ্রাম এড়াইবার জন্য তিনি আকুলভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি মোটামুটি আজকাল এই কথাই বলিতেছেন যে, চরকা এবং খদ্দরের কথা ছাড়া ভারতব্যাপী অন্য কোন আন্দোলন চালান বর্ত্তমানে তিনি আতঙ্ককর মনে করেন; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে সংগ্রামের সম্ভাব্যতারও তিনি নিরসনই কামনা করেন; এরূপ স্থলে আপোষ-নিষ্পত্তি ছাড়া মহাত্মাজীর পক্ষে অন্য কোন পথ থাকিতে পারে না। বোধ হয়, ইহা বুঝিয়াই মহাত্মাজী

অন্যতম অন্তরঙ্গ চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল আচারী কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, মন্ত্রিত্বের ঘোড়া হইতে আমরা আপাতত নামিয়াছি বটে; কিন্তু ঘোড়ার লাগাম এখনও ছাড়িয়া দেই নাই। দরকার হইলেই আবার চড়িয়া বসিব। বড়লাটের সহিত মহাত্মাজীর এই আলোচনার ফলে সেই সুযোগ আসিতেছে মনে করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আবার সাজিয়া গুজিয়া তৈরী হইতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সবই জলের মত পরিষ্কার, বুঝিবার পক্ষে গোল কিছুই নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল পূর্ণ স্বাধীনতা 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের' ঘোলে সেই দুধের পিপাসা মিটিবে কি? যা কিছু হাতে আসে তাহাই লাভ, এমন মনোবৃত্তি হয়ত উহাই বলিবে; কিন্তু 'পরিপূর্ণতার লাগি' অতন্দ্রিত সাধনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহাদের চিত্ত এই বিদেশীর উচ্ছিষ্ট প্রসাদে তুষ্ট হইতে পারিবে কি? ভারতের যে সব বীর সন্তান স্বদেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সাধনায় অম্লান বদনে নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মা ইহাতে পরিতৃপ্ত হইবে কি? দেশবাসীরাই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।

সাম্রাজ্যবাদীদের আশা—

জন কোটম্যানের নাম ভারতের অনেকের নিকট পরিচিত। ইনি কিছুদিন ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। ইনি সম্প্রতি "ভারতের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলিতেছেন, এক পক্ষে সামন্ত নৃপতিগণ এবং মুসলমান সম্প্রদায় এতদুভয়ের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির মত একটা কিছু করা এখনও সম্ভব হইতে পারে। একবার যদি কংগ্রেসের দাবীগুলি যুক্তির পথে ও সঙ্গতভাবে মিটান যায়, তাহা হইলে কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে একটি সংরক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

কোটম্যান সাহেব কূটনীতির কৌশলের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, বড়লাট-গান্ধীজীর এই আলোচনামুখে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা ভারতের স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। ভারতের গণতান্ত্রিকতার যাঁহারা বরাবর বিরোধ করিয়া আসিতেছেন সেই সব সামন্ত নৃপতিগণ এবং কংগ্রেসের দাবীর বিরোধী, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদী, মুসলমানদের মধ্যে আদর্শ বজায় রাখিয়া কংগ্রেসের মিলন যদি সম্ভব হয়, আমাদের আপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু মিলনের আধ্যাত্মিক আকুলতায় কিংবা সংগ্রাম এড়াইবার ঐশ প্রেরণার ভাবরসে গলিয়া কংগ্রেস নিজের প্রকৃত আদর্শ না হারায় এবং কংগ্রেস একটি সংরক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া ভারতের সকল প্রগতিমূলক আন্দোলনের পরিপন্থী না হইয়া পড়ে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই আশাই করিতেছেন, কোটম্যানের উক্তিতেই সে পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

কংগ্রেসকে যদি এই কায়দার ভিতর আনা যায়, তাহা হইলে ফল কি দাঁড়াইবে, কোটম্যান সাহেব তাহাও বলিতেছেন। তাঁহার অভিমত এই যে,—কংগ্রেসকে এমন আপোষ-নিষ্পত্তির মধ্যে আনা গেলে বৈপ্লবিক আদর্শ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যতই প্রসারিত হইবে ততই কংগ্রেসের অধিকাংশ কর্ত্তারা দক্ষিণপন্থী হইয়া পড়িবেন এবং সেই অবস্থা সুস্পষ্টভাবেই কংগ্রেস এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান ও সামন্তবর্গের মধ্যে প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত করিবে; যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে।

কংগ্রেসকে সকল প্রকার প্রগতি-বিরোধী গোঁড়া সংরক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার এই ফাঁদে কংগ্রেস যাহাতে না গিয়া পড়ে দেশবাসীকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। আপোষের নামে আদর্শহানির দৈন্য এবং গ্লানি যদি জাতির আত্মাকে অবসন্ন করে, তবে কংগ্রেসের সুদীর্ঘ সংগ্রাম এবং সাধনা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

কুর্নিশের মহিমা—

"সাম্রাজ্যবাদ সহজে মরে না" মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রের বিগত সংখ্যায় এই শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"গত ১৬ই তারিখে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণরের হাতে যাঁহারা খেতাবের সনন্দ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা গবর্ণরকে কিভাবে কুর্নিশ করিয়াছেন, সেই বিধানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিধানগুলি এইরূপঃ "সেক্রেটারী কর্ত্তৃক যখন আপনার নাম পঠিত হইবে, আপনি দয়া করিয়া গালিচার ধারে আগাইয়া যাইবেন এবং গবর্ণর বাহাদুরকে পহেলী কুর্নিশ করিবেন। তারপর গালিচার মাঝখানে যাইবেন এবং আবার কুর্নিশ ঠুকিবেন। তারপর, বেদীর পাদমূলে অগ্রসর হইবেন। বেদীর উপর গবর্ণর বাহাদুর দণ্ডায়মান, আপনি তাঁহাকে আবার কুর্নিশ করিবেন। তারপর গবর্ণর বাহাদুর আপনাকে সনন্দে ভূষিত করিবেন এবং আপনার করকম্পন করিবেন। তখন আপনার কর্ত্তব্য হইবে কুর্নিশ করা। ইহার পর চার পা হটিয়া গিয়া পুনরায় কুর্নিশ করিবেন। ইহার পর মোড় ঘুরিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিবেন।

কর্ম্মচারিগণ এবং সেনা ও পুলিশের শিরস্ত্রাণ-পরিহিত থাকিবে, তাহারা সেলাম করিবে কিন্তু কুর্নিশ করিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—সামনের দিকে শুধু মাথা নোয়াইয়া কুর্নিশ করিতে হইবে, কোমর পর্যন্ত বাঁকা করিতে হইবে না।"

মহাত্মাজী মনে করেন, এমন সব অবমাননাকর প্রক্রিয়ায় মানুষের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং উত্তেজনার ভাব দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমরা মহাত্মাজীকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছি, তাঁহার সে আশঙ্কার কোন কারণই নাই; দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে এ দেশের মেরুদণ্ড এমনই বাঁকিয়া গিয়াছে যে, এমন পঞ্চাঙ্গ কুর্নিশে তাহাদের পঞ্চপ্রাণ পুষ্ট হইয়াই উঠে—ভারতের প্রতি পরম কৃপাবান প্রভুরা তাই এহেন পঞ্চাঙ্গ কুর্নিশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'কালচার ও ধর্ম্ম'—

কালচার ও ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্ক কি, সম্প্রতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বক্তৃতায় শ্রীযুত আর এস পণ্ডিত সে সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন। বক্তা বলেন, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির একটা উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে, এই উদ্যমে সায় দিতেছে একদল লোক এই বলিয়া যে, ভারতবর্ষে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কালচার রহিয়াছে। একটি হিন্দু কালচার, অপরটি মুসলমান কালচার। সুতরাং ভারতীয় কালচার বা সংস্কৃতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই। মিঃ পণ্ডিত এই যুক্তিহীনতা ভিত্তিহীনতায় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ইউরোপের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "ধর্ম্মের সঙ্গে কালচার বা সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নাই। ইউরোপীয়দের ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এশিয়ায়। তাহারা সকলেই খৃষ্টান; কিন্তু তথাপি ইংরেজ, জার্ম্মান, ফরাসী, ইংলণ্ডের প্রত্যেক জাতির কালচার বিভিন্ন। ভারতবর্ষের মধ্যেও বাঙলাদেশের মুসলমান এবং সীমান্ত প্রদেশের মুসলমনেরা এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের কালচার বা সংস্কৃতি কোনদিক হইতেই এক নয়। ভারতের মুসলমানেরা যখন হজ করিতে মক্কায় যান, মক্কার লোকদের ধর্ম্ম এবং তাহাদের ধর্ম্ম এক যদিও তবু সংস্কৃতির পার্থক্য তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারেন। নিজেদের দেশের লোকের সঙ্গে সাম্যের এই যে অনুভূতি এবং বিদেশী সমধর্ম্মীদের মধ্যেও এই যে পার্থক্য, ইহাই হইতেছে ভারতীয় সংস্কৃতি।"

কালচারের সঙ্গে ধর্ম্মকে মিশাইবার ধুয়া যাঁহারা তুলিয়াছেন, তাঁহারা এই জিনিষটা না বুঝেন এমন নয়, কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে, কালচারের জন্য গরজ তাঁহাদের মোটেই নাই। নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করাই তাঁহাদের মতলব। ইঁহাদের কালচার হইল দাস-মনোবৃত্তির প্রভাব। দাস-মনোবৃত্তির প্রভাবে পড়িয়া এবং বিদেশীর পদসেবা করিয়া নিজেদের কাজ বাগাইয়া লইবার মতলবেই ইহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের কাজে কালচারের এমন অভাব রহিয়াছে, কালচারের সম্বন্ধে তাহাদের কোন কথাকে মূল্য দান না করাই উচিত।

ছাত্রদের মনোভাব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে আহূত নিখিল ভারত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ আশুতোষ ট্রফি লাভ করিয়াছেন, ইহা আশার কথা। বাগ্মিতার সম্পদ একটা বড় সম্পদ, বাঙলা দেশে এই সম্পদের সত্যই অভাব ঘটিতে বসিয়াছে। এই ধরণের প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া বাগ্মিতার বিকাশ হইতে পারে। 'বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ ঠিকই হইয়াছে' এইটি ছিল বিতর্কের বিষয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মোট ৩৫ জন ছাত্র এই বিতর্কে যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের শ্রীযুত সাধন গুপ্ত এবং শ্রীযুত সুব্রত সেন গুপ্ত আশুতোষ ট্রফি লাভ করেন। যে কলেজের ছাত্রদ্বয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হন সেই কলেজকেই ট্রফি দেওয়া হয়। প্রতি কলেজের দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতিযোগিতা করেন, একজন থাকেন বিষয়বস্তুর পক্ষে, অপর জন বিপক্ষে। স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে, বিতর্কে তিনি দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম বিষয়টি হইতেছে, প্রতিযোগীদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তীব্র আগ্রহ, দ্বিতীয়ত ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা সম্বন্ধে প্রতিযোগীদের গভীর অবিশ্বাস। উচ্চ আদর্শের প্রেরণা সহজেই তরুণদের মনকে স্পর্শ করে। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য ছাত্রদের মনে তীব্র আগ্রহ থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক; তবে এদেশের আড়ষ্টকর আবহাওয়ার মধ্যেও সে আগ্রহ যে রহিয়াছে, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কারণের মূলও রহিয়াছে ঐ স্বাধীনতার প্রেরণায় এবং সেজন্য ছাত্রদিগকে দোষীও করা যায় না। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট হিসাবে লর্ড লিটন নিজেই বলিয়াছেন,—ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা ভারাতবাসীদিগকে এ পর্য্যন্ত যত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেগুলি কোনদিনই রক্ষিত হয় নাই। ইতিহাসের এই শিক্ষা সত্ত্বেও ছাত্রদের মতিগতি যদি অন্যরূপ হইত তবেই আশ্চর্য্য হইবার বিষয় ছিল।

দোষী কাহারা?—

সিন্ধু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট চৈতরাম গিদোয়ানী এবং সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা অধ্যাপক ঘনশ্যাম জেঠানন্দ শক্করের দাঙ্গার সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে তাঁহারা বলেন,—"প্রথমত দাঙ্গার সম্পর্কে যেভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই ধারণা জন্মে যে, বড় একটা ডাকাতের দল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লুট-তরাজ চালাইতেছে এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার সেরূপ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সেই অঞ্চলের মুসলমানেরা এই সব নৃশংস অত্যাচার হিন্দুদের উপর করিয়াছে।"

তাঁহারা আরও বলেন,—"কাহারও কাহারও মনে এইরূপ ধারণা হয়ত জন্মে যে, অর্থলোভেই কতকগুলি লোক এইরূপ ডাকাতি, নরহত্যা, গৃহদাহ, লুট প্রভৃতি চালাইয়াছে। আমাদের মতে এই মত সমর্থনযোগ্য নহে। মুসলমানদের দ্বারা গ্রাম অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন এবং তজ্জনিত উত্তেজনার ফলেই এই সব ব্যাপার ঘটিয়াছিল।"

অবশেষে তাঁহারা বলেন,—"আমাদের বিশ্বাস এই যে, মুশ্লীম লীগের কোন কোন নেতা এই সব ঘৃণিত নরহত্যা, গৃহদাহ, লুট প্রভৃতির দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। ইঁহারাই আল্লাবক্স মন্ত্রিমণ্ডলকে ধ্বংস করিয়া রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মঞ্জিলগড়ের ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মুসলমান জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের

পতন ঘটানটা ইঁহাদের নিকট যত বড় প্রশ্ন "আল্লা দরগাহকে মুক্ত" করিবার জন্য তাঁহারা যে জিগীর তুলিয়াছিলেন, সে প্রশ্ন তত বড় নয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,—মুসলীম জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা জাগাইয়া তাহার ফলে এই প্রদেশের সে সর্ব্বনাশ হইবে, সে ভাবনায় তাঁহাদের কোন মাথাব্যথাই হয় নাই।"

সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের উপর একান্তভাবে নজর দিলে প্রকৃতপক্ষে কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থই এদেশের বর্ত্তমান এই বিদেশীর অধীন অবস্থায় সিদ্ধ হইতে পারে না, আমাদের এইরকম বিশ্বাস; তবু সম্প্রদায়ের যাহাতে প্রকৃত হিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করার মূলে যুক্তি একটা থাকিতে পারে; কিন্তু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জিগীর ছাড়িয়া যাহারা দেশে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তুলিতেছে, তাহাদের দুষ্কৃতির নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে—জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে এবং সর্ব্বোপরি নিজেদের সম্প্রদায়েরই সর্ব্বনাশ করিতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

বাঙালীর সমস্যা—

বড়দিনের বন্ধে লক্ষ্ণৌ শহরে নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হয়। বাঙলা ভাষা শাখারও একটি অধিবেশন সম্মেলনে হয়। এই শাখার সম্পাদক শ্রীযুত বিনয়কুমার লাহিড়ী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—

"প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে স্থানে স্থানে উৎকট প্রাদেশিকতার বিষময় ক্রিয়ায় বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর পক্ষে তাহার ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় যে সব অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, সেইগুলির প্রতি আমাদের উদাসীন থাকিলে চলিবে না।"

সভাপতি রায় সাহেব শ্রীযুত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার অভিভাষণে এই সংকটের ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন,—

"কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যুক্তপ্রদেশের প্রবাসী বাঙালীরা যেরূপ নিঃশংকভাবে বসবাস করিয়াছেন বর্ত্তমানে সেইরূপভাবের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি।" সম্মেলন এই দাবী করিতেছেন—(১) এই প্রদেশের যে সকল বিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইতে পারে সেই সব বিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রছাত্রীদিগকে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে; (২) হিন্দী ও উর্দ্দুর ন্যায় বাঙলা ভাষাকেও পরীক্ষার বাহন বলিয়া গণ্য করা হউক; (৩) ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহেও বাঙলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হউক। আমরা আশা করি, যুক্তপ্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙালী সমাজের এই ন্যায্য দাবী পূর্ণ করিবেন।

পরলোকে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

দেশমাতৃকার অন্যতম সেবক কাশীপুর বরাহনগরের কংগ্রেসকর্ম্মী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৩ই জানুয়ারী, ২৮শে পৌষ, শনিবার নিজ বাসভবনে মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। খগেন্দ্রবাবুর ন্যায় সুসন্তানের অকাল তিরোধানে বঙ্গমাতার অপূরণীয় ক্ষতি হইল—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

খগেন্দ্রবাবু বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য কথা-পাণ্ডিত-প্রবর ৺তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। ছাত্রাবস্থা হইতেই খগেন্দ্রবাবু দেশসেবায় ব্রতী হয়েন, ও তজ্জন্য বলিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র যুবকগণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চ্চা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রপ্রচার করেন ও অন্যান্য দেশসেবকের ন্যায় ইনিও যথেষ্ট নির্য্যাতন অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করেন। নির্জ্জন অন্তরীণ বাস, হাসামুখে কারাবরণ, ভারতের বিভিন্ন কারাগার ও বন্দিনিবাসে ইনি জীবনের দীর্ঘ বহুমূল্য সময় অতিবাহিত করেন। লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া ইনিই প্রথম কারাবরণ করেন। চিরকুমার, সর্ব্বত্যাগী খগেন্দ্রনাথকে সংসারের কোনও আকর্ষণ সাধনার পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির আদর্শই ছিল ইঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। ইনি সুভাষচন্দ্র গঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ও অন্যান্য নানাবিধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খগেন্দ্রবাবুর ন্যায় বিনয়ী, অমায়িক ও সদালাপী ব্যক্তি সত্যই অল্প দেখা যায়, তাঁহার সুমিষ্ট স্বভাব ও লোকরঞ্জনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সকলেই অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিত; তাঁহার বাহিরের ভাব দেখিয়া কেহই তাঁহার অন্তরের গাম্ভীর্য্যের সন্ধান পাইত না—তাঁহার অকাল তিরোধানে দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

প্রাণ-হিন্দোল

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অম্বরে মেঘ গম্ভীর বাজে, বায়ু বহে খর বেগে,
নর্ত্তন সারা বর্ষণধারা স্পর্শন তার লেগে।
গুরু মৃদঙ্গ বোলে
উৎসব কোলাহলে
নদী তরঙ্গ বনানী অঙ্গে হিল্লোল ওঠে জেগে।
পূরব পবনে বিশ্বভবনে দুয়ার আজিকে খোলা,
সে দুয়ারপথে লাগে দূর হ'তে কোন খেয়ালীর দোলা।
তারি যাদুমন্তরে
অন্তরে অন্তরে
দোলে ক্ষণে ক্ষণে ঘন কম্পনে জীবনের হিন্দোলা।
তটিনী আজিকে কুলপ্লাবী হল অকুলের উদ্দেশে,
চঞ্চলা হবে গতিমন্থরা মহাসাগরের দেশে!
কুলু কুলু কলভাষা
সকল ব্যর্থ আশা
সার্থকতার সান্ত্বনা পাবে সিন্ধুর উল্লোলে,
লাগুক সে দোলা তরল প্রাণের তরঙ্গ হিল্লোলে॥

সম্মুখে সুদীর্ঘ সংগ্রাম

ব্রুস সি হুপার জানুয়ারী সংখ্যার 'ফরেন এফেয়ার্স' পত্রে লিখিয়াছেন,—"ইতিমধ্যে পূর্ব্ব ইউরোপে যে ভাগাভাগি হইয়াছে, তাহাতে রুষিয়া পূর্ব্ব বাল্টিকে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে এবং বল্কানে সে প্রভাব বিস্তার করিবে এমন আশা করিতেছে। রুষিয়া মধ্য ইউরোপের ভারকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। প্রবলতর শক্তির কাছে ছাড়া ষ্ট্যালিন নিজের এই প্রতিপত্তি ছাড়িবেন না। পশ্চিম রণাঙ্গনে ইংরেজ ও ফরাসীর জয়ে যদি রুষিয়ার এই প্রভুত্ব খর্ব্ব হইয়া আতঙ্ক দেখা দেয়, তাহা হইলে রুষিয়া কি করিবে? ধনিকবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করাই রুষিয়ার নীতি। ঘরবন্দী হইবার ফলে জার্ম্মানী যদি দায়ে পড়িয়া নাৎসী-নীতি ছাড়িয়া বোলশেভিকদের দলে ভিড়ে, তাহা হইলে রুষিয়া সম্ভবত নিজের ঘরোয়া স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াও দীর্ঘদিনের মেয়াদে জার্ম্মানীকে ধারে মাল দিতে রাজী হইবে। এই দুই শক্তির মধ্যে সামরিক চুক্তি ইউরোপের বিভীষিকাস্বরূপ রহিয়াছে। রুষিয়া জার্ম্মানীকে কতটা সাহায্য করিবে, ইহা সর্ত্তসাপেক্ষ। জার্ম্মানী নাৎসীবাদ যতদিন পর্য্যন্ত বোলশেভিকদের নীতির রঙ্ না ধরিয়া উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রুষিয়া প্রভুত্ব স্বার্থত্যাগে রাজী হইবে না।" রুষ-জার্ম্মানীর মধ্যে মিলনের স্বর্ণসূত্র কখনই ছিন্ন হইবে না বলিয়া সম্প্রতি মস্কো হইতে যে একটি বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছে, সেই বার্ত্তার মর্ম্মকথা বুঝিবার পক্ষে উল্লিখিত মন্তব্য বিশেষ সহায়ক হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই স্বর্ণসূত্রের দৃঢ়তা ঘোষণা করা এতটা যে দরকার হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায় যে, সূত্র যে ছিন্ন হইতে পারে, এ সম্বন্ধেও আতঙ্কের কারণ ঘটিয়াছে।

আগামী বসন্তকালে যুদ্ধ শেষ হইবে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এখন দেখা যাইতেছে যুদ্ধের গতি বিপরীত পথেই চলিতেছে। স্যার নেভিল হেণ্ডারসন ইংলণ্ডের একজন পররাষ্ট্রনীতিতে ওয়াকিবহাল রাজনীতিক, তিনি লণ্ডনের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক দিক হইতে ইংরেজের সুবিধা জার্ম্মানদের চেয়ে বেশী আছে, ইহা ঠিক; কিন্তু জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও সহজে এলাইয়া পড়িবে না।

ফরাসীর সমর-বিভাগ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে বেতার-বার্ত্তাযোগে জার্ম্মানদিগকে শুনান হইয়াছে— কোন্ পক্ষের কি মতলব আছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা ধরা পড়িবে, আমাদের শত্রুপক্ষের আক্রমণের অপেক্ষায় আমরা চিরকাল বসিয়া থাকিব, এমন মনে করা ভুল। বসন্তকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, হিটলার বিগ্রহ যখন বাধাইয়া দিয়াছেন, ইহার ফল ভোগও তাঁহাকে করিতেই হইবে।

এ ত গেল এ পক্ষের মতলব, হিটলারের মতলবটা কি? শুনা যাইতেছে, হিটলার সত্বরই তেলের টানাটানির মধ্যে পড়িবেন, রুমেনিয়া হইতে জার্ম্মানী কিছু তেল পাইতেছিল, ফিনল্যাণ্ডের লড়াইয়ের জন্য রুশ অধিকৃত পোল্যাণ্ডের পথে রুশিয়া নাকি সেই তেলে ভাগ বসাইতেছে। জার্ম্মানী এখন রুমেনিয়ার উপর নিজের চাপ দিবার চেষ্টা চলিতেছে এমন কথা অনেকদিন হইতেই শুনা যাইতেছে, ইহার মূলে কতটা সত্য আছে, বুঝা কঠিন। ফরাসীদের সূত্রে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মানীর সেনাদল রুমেনিয়ার সীমান্তে কিছু পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এমন কিছু অধিক নয়। 'টাইমস' পত্রের কাইরো শহরের সংবাদদাতা সম্প্রতি এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিয়াছেন যে, রুশিয়ার আক্রমণের আতঙ্ক এড়াইবার জন্য আফগানিস্থান, ইরাক, ইরান—ইহারা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছে এবং মিশরকেও সেই দলে লইবার চেষ্টা হইতেছে। ফ্রান্সের সংবাদপত্রসমূহেও এমন আতঙ্কের কথা সমর্থিত হইয়াছে। লা অর্ডার' পত্র বলিতেছেন যে, জার্ম্মানেরা ককেসাস, ইরাক, পারস্য এবং আরবের লড়াইয়ের গণ্ডী সম্প্রসারিত করিবার মতলবে আছে। তেলের অভাব মেটানই ইহার প্রধান কারণ।

এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এশিয়ার দিকে জার্ম্মানীর ঝুঁকিবার যদি কোন মতলবও থাকে, তাহা হইলে রুশিয়ার সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্ভব হইবে না। রুশিয়া কি সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিবে? রুশিয়া এখনও ইংরেজ এবং ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, একথা সত্য; কিন্তু রুশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত রুশিয়ার সম্বন্ধে ইংরেজ-ফরাসীর মনোভাব যেমন ছিল, এখন যে তেমন নাই, চার্চ্চিল সাহেবের গরম গরম বক্তৃতা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। আমেরিকা ফিনল্যাণ্ড আক্রান্ত হইবার পর হইতে স্পষ্টভাবেই রুশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে হইলে জার্ম্মানীকে তেলের অভাব মিটাইতে হইবে। এই অভাব মিটাইতে হইলে, বলকান এবং ককেসাসের দিকে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার প্রয়োজন; কিন্তু ইহার কোনটিই রুশিয়ার সাহায্য ব্যতীরেকে বর্ত্তমানে তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। রুশিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবে?

প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে, জার্ম্মানী বর্ত্তমানে উভয় সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইয়াছে। বল্টিকে রুশিয়ার প্রভাব বর্দ্ধিত হয়, জার্ম্মানী নিশ্চয়ই ইহা চাহে না। বলকানে রুশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হওয়াও তাহার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু জার্ম্মানীকে দায়ে পড়িয়া রুশিয়ার নীতিতে সায় দিয়া চলিতে হইয়াছে এবং এইভাবে সায় দিতে গিয়া অন্যদিকে অপর একটি অনর্থ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। রুশিয়ার ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধিতে ইটালী চটিয়া উঠিয়াছে এবং জার্ম্মানীর সহিত মৈত্রীবন্ধ মুসোলিনী বিগড়াইতে বসিয়াছেন। জার্ম্মানীর সঙ্গে রুশিয়ার সন্ধির পর হইতে ইটালী সমস্ত ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করে;

পাঠিয়ে দেওয়া যাক। খৃষ্টের মৃত্যুর পরে তাঁর ১২ জন শিষ্য —দুর্জ্জয় বিশ্বাস নিয়ে গেলো রোমে। পকেটে তাদের কপর্দ্দকও ছিল না—কিন্তু অন্তরে ছিলো বিশ্বাসের আগুন। তারা লেখাপড়াও জানতো না। কিন্তু বারোজন মানুষের জ্বলন্ত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বহুমানবের মনে সঞ্চারিত হ'য়ে রোম সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিলো;—মারামারি কাটাকাটির মধ্যে তারা নিয়ে এলো প্রেমের বাণী। সেদিন বারোজন মানুষ যা সম্ভব করেছিলো, তাদের জ্ঞানের শোচনীয় অল্পতা নিয়ে—আজ হাজার হাজার মানুষ অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে তা করতে পারবে না কেন? গান্ধীজী বেশ বুঝতে পারছেন, অহিংসায় বিশ্বাস দিনে দিনে বেড়ে চলেছে—স্বাধীনতার জন্য সঙ্কল্পও দিনে দিনে দুর্জ্জয় হ'য়ে উঠছে। মানুষ নিরস্ত্র হয়েও শক্তিমান হতে পারে—এ বিশ্বাস গান্ধীজীর আছে। সুতরাং স্বরাজ যে অদূরভবিষ্যতে সম্ভব এ বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। যারা শক্তিকে কামান-বোমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত ক'রে দেখছে—তারা তো গান্ধীজীর দৃষ্টি নিয়ে দেখছে না—সেইজন্যই স্বরাজের তাড়াতাড়ি আবির্ভাব সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস এত কম।

যুক্তপ্রদেশ

নারী ও রাজনীতি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এলাহাবাদের নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে বলেছেন,—"সম্মেলনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকবে না—এমন কথা উঠেছে। কেমন ক'রে মেয়েরা নিজেদের সত্তাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করতে পারে—আমি জানিনে। মানুষের সমস্ত কর্ম্মধারাই পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। আপনারা কোনো রাজনৈতিক সঙ্ঘ নন—একথা আমাকে ব'লে লাভ কি?" পণ্ডিত জওহরলাল ঠিক কথাই বলেছেন। অন্যায় সর্ব্বত্রই অন্যায়। ঘরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো, সাহিত্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো —কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে যত কিছু অন্যায় হোক, সব মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাবো—এমন কথা কোনো সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ মানুষের মুখ থেকে বেরুতে পারে না। যে মানুষের মনে ন্যায়ের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ জেগেছে—অন্যায় দেখলেই সে প্রতিবাদ করবে। কোনো ভয়েই সে চুপ ক'রে যাবে না। আত্মপ্রকাশের পথে কি কেবল পুরুষের ক্ষমতাপ্রিয়তাই অন্তরায়? রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা শাসনদণ্ড নিষ্ঠুরভাবে পরিচালিত ক'রে মানুষকে তার বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে—তারাও কি আত্মপ্রকাশের পথে ঘোর অন্তরায় হয়ে নেই? সুতরাং ন্যায়ের জন্য দাবী যদি আন্তরিক হয়, তবে পুরুষের অত্যাচার থেকে যেমন মুক্তির জন্য কান্না উঠ্‌বে —তেমনি সাম্রাজ্যবাদের নিগড় থেকেও মুক্তির জন্য কান্না উঠ্‌বে।

বাঙলা

কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্মেলনে শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ মল্ল্যবান্ কতকগুলি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে শিক্ষকগণকে দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা—কারণ তারাই হচ্ছে দেশময় নূতন আদর্শকে ছড়িয়ে দেবার বাহন।" একথা খুবই সত্য যে, ভবিষ্যতের নূতন সমাজকে গ'ড়ে তুলবার বিশেষ দায়িত্ব তাদেরই হাতে—যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জড়িত। আজ যারা ছোট ছোট ছাত্র আর ছাত্রী হয়ে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে, কাল তারাই হবে নাগরিক—তাদেরই আচরণের উপরে নির্ভর করবে জাতির কল্যাণ। আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে আদর্শ। বালক-বালিকার মনে নূতন আদর্শকে সৃষ্টি করবার দায়িত্ব বিশেষ ক'রে শিক্ষকদের হাতে। সেই শিক্ষকেরা যেখানে অবহেলার মধ্যে দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত— সেখানে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে গ'ড়ে তুলবার দিকে তাদের দৃষ্টি কখনো প্রখর থাকতে পারে না। সুতরাং যেরকম শিক্ষা পেলে ছেলেমেয়েদের পক্ষে আদর্শ-নাগরিক হবার সম্ভাবনা থাকে—সে শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। দেশের পক্ষে এ যে কত বড়ো দুর্ভাগ্য—সেকথা বলা বাহুল্য। তাই প্রত্যেক কর্পোরেশনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের আর্থিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। সেই দৃষ্টি যেখানে নেই, সেখানকার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

(৩)

সারা দিনটা পিসিমার কাছে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে বিমলকান্তি হোটেলে ফিরছিল। চৌরঙ্গীর প্রান্তে ট্রামখানা পেঁাছুলে মন চীৎকার ক'রে উঠল,—কাশানোভা—কাশানোভা।

...এক পেয়ালা চা, দু'খানা টোষ্ট, একখানা কেক্, সেই সঙ্গে সুরের লহর! ললিতা দেবীর মোটর-ড্রাইভে সায় না দিলেই হ'লো!...জীবনকে একটু চান্‌কে নেওয়া।

কে যেন তার অজ্ঞাতে তাকে কাশানোভার দ্বারে টেনে নিয়ে এলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। কাজেই...

ভিতরে যেন স্বপ্নরাজ্য! হাসি-খুশী আমোদ-প্রমোদের ধারা বয়ে চলেছে। সে-ধারায় বাইরের অভাব-দৈন্য, ব্যথা-বেদনা তিষ্ঠোতে পারে না!

বেয়ারা এলো...চা, টোষ্ট, কেক্ এলো...

অর্কেষ্ট্রা বাজছে, তার সুরে সুরে জীবন-তরঙ্গে লহর-লীলা!

চুপ চাপ্ ব'সে বিমলকান্তি দেখতে লাগলো হিল্লোলিত জীবনের লীলা-রঙ্গ!

সহসা মলিন-মুখী এক কিশোরী তার সামনে...কিশোরীর মুখে-চোখে দারুণ উৎকণ্ঠা! কিশোরী মিনতি-ভরে বললে,—একটা কথা—

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর দু'হাত কৃতাঞ্জলিপুট......

বিমলকান্তি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো, বললে—বসুন...

কিশোরী বললে—বসবো না।...মানে, আমার পার্শ চুরি গেছে না হয়, ট্রামে ফেলে এসেছি!

কিশোরীর স্বর অসহায়তার বাষ্পে আর্দ্র, রুদ্ধপ্রায়।

বিমলকান্তির প্রাণে আবার সেই চমক! এখানে যে কিশোরী আসে, তারি দৃষ্টি কি অপরের পার্শের দিকে!

কিশোরী বললে—দু' টাকা...লোন্...একদিনের জন্য।...আপনার কার্ড দিন, কাল সকালেই আমি পেঁাছে দেবো।

বিমলকান্তি কোনো জবাব দিল না; স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কিশোরীর পানে।

কিশোরী বললে,—আগে জানতে পারিনি। এখানে দেড় টাকার বিল হয়েছে...টাকা দিতে গিয়ে দেখি, পার্শ নেই।

কিশোরীর হাতে ছিল ভ্যানিটি-ব্যাগ। সে-ব্যাগ খুলে বিমলকান্তির সামনে কিশোরী মেলে ধরলো।

বিমলকান্তি দেখলো, তার মধ্যে আছে ছোট একখানি আয়না, একটা ছোট কৌটো, একটা পাফ, ছোট একখানি চিরুণী...

কিশোরীর কম্পিত অধর...মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টি...বিমলকান্তির মন চীৎকার করে উঠলো,—ওরে কাপুরুষ!

পার্শ খুলে বিমলকান্তি দুটি টাকা নিতে গেলো...খুচরো টাকা নেই!...নোট্ রয়েছে। পাঁচ টাকার একখানা নোট্ তুলে সেটি সে দিলে কিশোরীর হাতে। কিশোরীর মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি...

নোট্ নিয়ে কিশোরী বললে,—থ্যাঙ্কস্!

বলে' সে এক-নিমেষ দাঁড়ালো না। বিমলকান্তি হত-ভম্বের মতো তার পানে চেয়ে রইলো।

ঐ চলেছে...সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা...কাশানোভার বেয়ারার হাতে দিল নোট...চেঞ্জ...সে-চেঞ্জ নিয়ে...

ফিরে এসে কিশোরী বললে,—নিন্।

বিমলকান্তির হাতে কিশোরী দিল তিনটি টাকা।

বিমলকান্তি বললে,—যদি আপনার দরকার থাকে, এ তিনটে টাকা না হয় রেখে দিন্...

—না, না, না...দু' টাকারই দরকার। কেন মিছে...

বিমলকান্তি খুশী হলো। সব মেয়েই ললিতা নয়! টাকা তিনটে নিয়ে বিমলকান্তি পার্শে রাখলো।

কিশোরী বললে—আপনার কার্ড?

—কার্ড নেই।

—নাম-ঠিকানা?

বিমলকান্তির কৌতূহল হলো। সেই সঙ্গে...তরুণ বয়সের একটু মোহ হয়তো! কিশোরীর স্নিগ্ধ লাবণ্যজ্যোতি ...ডাগর দুটি চোখে স্নিগ্ধ সারল্য...

বিমলকান্তি বললে—কি দরকার নাম-ঠিকানায়?

—না, না, না,—আমাকে ঋণী রাখবেন না।...যেভাবে আজ আমার মান রক্ষা করেছেন...এ দয়ার কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না।... বাঙালী ভদ্রলোক এখানে আরো রয়েছেন,—

তাদের কারো কাছে দয়ার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবার সাহস পাইনি। ...বিপন্ন হয়ে চারিদিকে চাইছিলুম—এমন সময় আপনাকে দেখলুম। সকলের কাছ থেকে দূরে...একেবারে আলাদা রকমের মানুষ—দেখেই মনে হলো, উপায় যদি মেলে তো সে-উপায় মিলবে আপনার কাছে!

এ স্তুতিবাদে বিমলকান্তির মন গৌরবে-গর্ব্বে দুলে উঠলো! সে এদের কারো মতো নয়...এদের অনেক উর্দ্ধে তার স্থান!...

কিশোরী বললে—নাম-ঠিকানা বলতেই হবে আপনাকে।

বিমলকান্তি নাম বললে,—বিমলকান্তি মজুমদার... বেঙ্গল হোটেল।

ব্যাগে ছিল ছোট পেন্সিল...ক্যাশ মেমোর পিঠে সে পেন্সিল দিয়ে বিমলকান্তির নাম-ঠিকানা লিখে কিশোরী বললে,—ধন্যবাদ!...কাল সকালে নিজে না পারি, লোক দিয়ে টাকা দুটো পাঠিয়ে দেবো। দয়া করে' ফেরৎ দিয়ে আমাকে লজ্জিত করবেন না।

চমৎকার কথাগুলি! নাটক-নভেলে কিশোরীদের মুখে যেমন মিষ্ট-মধুর নম্র বচন পড়া যায়, তেমনি!

বিমলকান্তির মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মুখে সে কোনো কথা বলতে পারলো না।

কিশোরী হাসলো, হেসে বললে,—যে লোক আপনার দয়ায় আজ মান রক্ষা করেছে, সে-লোক যত তুচ্ছ হোক, তার নাম-ঠিকানা আপনি না জানতে চাইলেও তার তা বলা উচিত।......আমার নাম অলকা সেন। আমি থাকি রসা রোড, কালীঘাট।...কালীঘাট ট্রাম ডিপোর দক্ষিণে চারতলা মস্ত লম্বা ফ্ল্যাট...সেই ফ্ল্যাটের একেবারে চারতলায়।...তাহলে ঐ কথা রইলো, কাল সকালে বেঙ্গল হোটেল...

কিশোরী চলে যাচ্ছিল...বিমলকান্তির মনে হলো, বিদায়-ক্ষণ উপস্থিত...হয়তো এ বিদায়...কি তার মনে হলো ...বিমলকান্তি বললে,—শুনেচেন?

কিশোরী ফিরলো, বললে—আমাকে বলচেন?

—হ্যাঁ।

—বলুন...

ব্যাগ খুলে পাফ বার করে কিশোরী সেটা একবার কপালে গালে বুলিয়ে নিলে...

একটি মিষ্ট সুরভি! বিমলকান্তির সমস্ত মনটার উপর দিয়ে বয়ে গেল যেন বসন্ত-বাতাস।

কোনো মতে স্খলিত কম্পিত স্বরে বিমলকান্তি বললে, —ওটা হোটেল...যদি কোনো কারণে সে সময় আমি হোটেলে না থাকি...আপনার লোক যাবে...তাই ভাবছিলুম...

কথাটা কিভাবে বলা যায়, বিমলকান্তি নির্দ্ধারণ করতে পারছিল না! কি করলে সংক্ষেপে কাজের কথাটুকু বলা যায়, অথচ সে কথার অন্তরালে মনের গোপন বাসনাটুকু প্রকাশ না পায়!

কিশোরী কেমন একটু কৌতুক অনুভব করলে। কিন্তু সে-ভাব সম্বরণ করে' অচপল শান্ত স্বরে অলকা বললে,—বলুন......

বিমলকান্তি বললে,—তার চেয়ে—মানে, আমি রোজ সন্ধ্যার সময় কাশানোভায় আসি তো...মানে, যদি আপনার অসুবিধা না হয়, কাল যদি আপনি এই কাশানোভায় আসেন......

—কাল?......অলকা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলে......কি ভাবছিল......

বিমলকান্তি তাড়াতাড়ি বলে' উঠলো—মানে, আপনার যদি অসুবিধা না হয়......অবশ্য......

অলকা বললে—অসুবিধা নয়। তবে কাল......তা কটায় বলুন তো? এই সময়ে?

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বিমলকান্তি বললে—হ্যাঁ......

তার সারা মন উদগ্র হয়ে রইলো অলকার উত্তরের প্রত্যাশায়।

অলকা বললে,—মানে, একটু কাজ ছিল। তা হোক, আসবো।......আপনার দয়ার পরিচয়ই পেলুম আর কোনো পরিচয় তো পেলুম না।......তবে যদি পনেরো-কুড়ি মিনিট দেরী হয়?

খুশী-মনে বিমলকান্তি বললে,—তা হোক......এক ঘণ্টা দেরী হলেও আমাকে এখানে পাবেন। ......আপাতত এখানে আমার কোনো কাজকর্ম্ম নেই তো......

স্মিতহাস্যে মিষ্টকণ্ঠে অলকা বললে,—আসবো। নিশ্চয় আসবো।......না, পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশী দেরী আমার কখ্খনো হবে না।

বিমলকান্তির মন থেকে সমস্ত দ্বিধা-সংশয় গেল মিলিয়ে। সে বললে,—আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করছি কাল......এখানে......চায়ের নেমন্তন্ন!

বিগলিত কণ্ঠে অলকা বললে,—So kind of you! থ্যাঙ্কস্!

সারাদিনটা কাটলো শুধু কল্পনা-জল্পনায়! বিমলকান্তি কোথাও বেরুলো না। কাছে দু'চারখানা বই ছিল,—পেঙ্গুইন-সিরিজের সদ্য-কেনা নভেল। সেগুলো পড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু একটি ছত্রেও মন বসতে চায় না। বইয়ের পাতার পানে চোখের দৃষ্টি সবলে নিবদ্ধ রাখলেও মন ছুটে চলেছে অলকা সেনের উদ্দেশে!

অজস্র প্রশ্ন জলবিম্বের মতো মনে ভেসে ওঠে, আবার তখনি মিলিয়ে যায়! কে এই অলকা সেন? কথাবার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে বুঝতে দেরী হয় না, শিক্ষিতা; এবং শিক্ষার সঙ্গে ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো যে অহঙ্কার মেয়েদের মনে সেঁটে থাকে, সে অহঙ্কারের বিন্দু-বাষ্প অলকা সেনের আচারে বা কথায় কোথাও নেই! এ'র পাশে সেই ললিতা দেবীকে এনে সে বার-বার দাঁড় করাতে লাগলা! কিসে আর কিসে...নাচে এম্পায়ার-বিজয়ী প্রতিভা নিয়েও ললিতা দেবী এই অলকা সেনের পাশে দাঁড়াতে পারে না। ললিতার মনে যেমন অহঙ্কার, তেমনি কেমন যেন একটা সর্ব্বগ্রাসী লোলুপতা! চাঁদের আলোয় ট্যাক্সিতে চড়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়ায় বিন্দুমাত্র দোষ হয় না, যদি সে বেড়ানোর ট্যাক্সি-ভাড়াটা পরস্মৈপদী চালাবার প্রবৃত্তি না থাকে!

অলকার উদ্দেশে বিমলকান্তির মন বলতে লাগলো, চমৎকার! চমৎকার!

কিন্তু কি এ'র পরিচয়? মা-বাপ? ঘর-বাড়ী?...একা এসেছেন কাশানোভায়...ল্যাণ্ড-বোট সঙ্গে নেই! দামী মোটরে আসেন নি, ট্যাক্সিতে আসেন নি...বললেন, ট্রাম!...বড়মানুষীর ছোট একটা ইঙ্গিতও দ্যান্‌নি...আগাগোড়া বিনয়ে নত!

বিভাবরী...? মন বলে উঠলো, না না, বিভাবরীর সঙ্গে কারো তুলনা করা চলে না। পথ চলতে পথে কত লোকের নানা সুন্দর ছাঁদের বাড়ী পড়ে চোখে,—সে সব বাড়ীর পানে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন আরাম পায়,—তবু বিরাম-সুখের জন্য পথিক নিজের জীর্ণ ঘরটির মায়ায় আকুল! এ'ও তেমনি! অলকার মতো মেয়ের সঙ্গে কথা কয়ে আরাম পাওয়া যায়,—তাকে দেখতে ভালো লাগে, তার সান্নিধ্য ভালো লাগে! তবু বিভাবরী বিভাবরী...এবং অলকা অলকা! এ দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তুলনা করবে, মন তা চায় না। বিভাবরী তাকে ভালোবাসে, সেও বিভাবরীকে ভালোবাসে—দুজনের জীবন একদিন একই গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমগ্রতায় ভরে উঠবে! দুজনের এ ভালোবাসা কোনোদিন উদ্দাম-উচ্ছ্বাসে মুখর বা প্রগল্ভ হয়নি...সংযত গৌরবে আপন মর্য্যাদায় সে ভালোবাসা এক অপরূপ সম্পদ!

তা নয়। অলকার কথায় বিভাবরীর কথা কেন আসবে? অলকা ক্ষণেকের অতিথি......অবসর-যাপনে দুদণ্ডের সাথী...বন্ধু!...জীবনের পথে এমন অতিথির দেখা তার আজ-পর্য্যন্ত মেলেনি! মিললে জীবনের পথ যে স্নিগ্ধ-রমণীয় হয়, তাতে সংশয় নেই।

অলকার মতো অতিথির সমাগমে যেমন অভিনবত্ব, এ-সমাগম তেমনি অপরূপ!

এমনি নানা কল্পনা-জল্পনার মধ্যে ঘরের ঘড়িটা মাঝে মাঝে কেমন সচকিত করে তোলে!...এবং বাজতে-বাজতে ঘড়ি দুটো-তিনটে বাজিয়ে আপন-মনে পেণ্ডুলাম দুলিয়ে চারটের ঘরের দিকে ছোট কাঁটাটা এগিয়ে নিয়ে চললো।

কাশানোভায় উনি কেন আসেন? ঐ গন্ধ-গান-আলো-হাসির উৎসবে...প্রমোদ-মেলার মাঝখানে? একা আসেন!...

বিমল নিজে কেন কাশানোভায় চলেছে?...সে একা...সঙ্গীহীন...তাই। হয়তো বিমলকান্তির মতো উনিও একা...সঙ্গীহীন।

চারটে বাজলো। মন অধীর হয়ে বলতে লাগলো, আর কেন? সাজো...সাজো। এখনি সাড়ে চারটে বাজবে...তার পর পাঁচটা!

বিমলকান্তি চললো স্নান করতে। একবারের জায়গায় দুবার মুখে-গায়ে সাবান মাখলো...তার পর বেশভূষা! বেশ-ভূষায় আজ মনোযোগ একটু বেশী...সেণ্ট, ফর্শা রুমাল...পার্শে নোটের তাড়া...চেঞ্জ...

সাড়ে পাঁচটায় বিমলকান্তি বেরুলো বেঙ্গল হোটেল থেকে। মন বললে— ট্যাক্সি নাও...ট্যাক্সি...সেলুন-বডি!

কাশানোভায় এলো। ভিতরে অর্কেষ্ট্রা বাজছে...ইংরেজী নাচ চলেছে। ও-সুরে মন সত্যই নেচে ওঠে! চারিদিকে হাস্য-কলরব...জীবন-যুদ্ধের দামামা-রব এখানকার বাতাসে শোনা যায় না। এখানে শুধুই বিলাস! তাছাড়া জীবনে যেন কামনার সামগ্রী আর কিছু নেই!

কিন্তু কোথায় তিনি...? নবীন অতিথি অলকা সেন?

একখানা চেয়ারে বসলো...অর্কেষ্ট্রার সুরে নিঃসঙ্গ সঙ্গীকে চেয়ে মন আর্ত্ত-আকুল হয়ে উঠলো!

...চারিদিকে চাইতে চাইতে চোখ পড়লো...ঐ যে...

বিমলকান্তি এলো অলকার কাছে, দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে বললে—নমস্কার!

হাসির বিদ্যুৎ-চমকে মুখচোখ প্রদীপ্ত করে অলকা সেন উঠে দাঁড়ালো,...চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি পুটবদ্ধ করে নমস্কার জানিয়ে বললে—আপনার একটু দেরী হয়েছে—

দেরী! বিমলকান্তি আরাম বোধ করলো! এ সাক্ষাতের জন্য মনের অধীরতা ধরা পড়েনি বলে আরাম!

সে বললে—হ্যাঁ। মানে, একটু কাজ ছিল।

তার কণ্ঠ কেন চেপে ধরলো...অকারণ এ মিথ্যা নাই বলতে! মন বললে, পুরুষের মর্য্যাদা বাঁচলোঃ

অলকা বললে,—বসুন।

—আপনি বসুন।

দুজনেই বসলো—দুখানি চেয়ারে সামনা-সামনি।

অলকার দৃষ্টি যেন উদাস।...বিমলকান্তির মনে ছোট একটু আঘাত। ওঁর মন কি তবে আর কোথাও বিচরণ করছে...আর কারো সঙ্গ কামনা করে?

কোন মতে সাহসে ভর করে অন্তরঙ্গতা-সাধনের চেষ্টায় বিমলকান্তি বললে—আপনাকে আজ কেমন উন্মনা দেখছি!

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে—ও...হ্যাঁ! মানে, ঐ সুরটা আমাকে কেমন উদাস করে' দ্যায়?...আপনার ভালো লাগছে না?...ওটা হলো ব্লু-ড্যানিউবের সুর। শুনলে মনে হয়...আঃ...

বলতে বলতে বিমুগ্ধ চিত্তে অলকা দু'চোখ মুদ্রিত করলো।

বিমলকান্তির মনে যেমন বিস্ময়, তেমনি শ্রদ্ধা!...এ'র মন এতখানি রসিক!

বিমলকান্তি বললে—চমৎকার সুর...মনকে উদাস করে দায় সত্যি!

সহসা চমকে শশব্যস্তে অলকা হাতব্যাগ খুললো, খুলে দুটি টাকা বার করে বললে,—এ দুটো রাখুন তো!...দেনা-পাওনার ব্যাপার চুকে যাক! মন হালকা হবে।

শুষ্ক হাস্যে বিমলকান্তি টাকা দুটি নিয়ে পার্শে রাখলো তারপর চাইলো অলকার পানে। অলকা তারি পানে চেয়েছিল...দু'চোখের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ-মাধুর্য্য!

অলকা বললে,—দেনা-পাওনা বাইরে চুকলেও মনের খাতায় যে-দেনা লেখা রইলো, তা কোনদিন শোধ হবে না!

কথাটা বিমলকান্তির স্পষ্ট বোধগম্য হলো না। সে চেয়ে রইলো অলকার পানে—চোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে!

অলকা বললে—There are moments in life... মহাভারত পড়েছেন নিশ্চয়। কুরুসভায় দ্রৌপদীর উপর যখন

পীড়ন চলেছে, পঞ্চ পাণ্ডব-স্বামী নিঃশব্দে সভায় বসে আছেন ...দ্রৌপদী তখন ডেকেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে,—আমার লজ্জা নিবারণ করো। সে-বিপদে শ্রীকৃষ্ণ করলেন দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের সে করুণার কথা দ্রৌপদী কোনদিন ভুলতে পারেন নি...ভোলবার নয়! দ্রৌপদীর মন তাই সারা জীবন শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়েছিল।...কাল এখানে আমার দশাও হয়েছিল কুরুসভায় দ্রৌপদীর মতো। মনে ভক্তি নেই বলে ঠিক শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিনি...তবে মন খুঁজছিল শ্রীকৃষ্ণের মতো তেমনি দয়ালু জনকে।

এ-কথায় বিমলকান্তি একেবারে চমৎকৃত...তার গায়ে রোমাঞ্চ-রেখা...

অলকা চুপ করলো, তারপর মৃদু হেসে বললে,—আপনিও কাল সেই কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণের মতো এই কাশানোভায় আমার লজ্জা রক্ষা করেছেন...

মনের সমস্ত আবেগ জড়ো করে উৎকর্ণ হয়ে বিমলকান্তি শুনলো অলকার কথা...চোখের দৃষ্টি অলকার মুখে নিবদ্ধঃ

অলকা একটা নিশ্বাস ফেললো, নিশ্বাস ফেলে বললে—জীবনে হয়তো আপনার সঙ্গে পরে আর কখনো দেখা হবে না। না হলেও কালকের সেই ক্ষণটুকু আমি জীবনে ভুলবো না।

সামান্য ব্যাপার! তাকে এমন নাটকের মতো গড়ে তোলা হাস্যকর হলেও বিমলকান্তি বিমুগ্ধ হলো। ভাবলো, অলকা সেন খুব সেণ্টিমেণ্টাল, তাতে ভুল নেই!...হয়তো জীবনে ইনি......

কথা শেষ করে অলকা মাথা নীচু করে বসেছিল এবং তাকে ঘিরে সহস্র প্রশ্ন বিমলকান্তির মনে নীরবে বিপুল ঘূর্ণীচক্র রচনা করে তুললো!

পাঁচ মিনিটকাল দুজনের কারো মুখে কথা নেই! বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল...হঠাৎ তার পানে বিমলকান্তির চোখ পড়লো।

বিমল বললে—চা-টা দিতে বলি...

অলকা বললে—চা আমি খাবো না...বেশী চা আমি সহ্য করতে পারি না। আজ সারাদিন এত চা খেয়েছি...আমাকে এক পেয়ালা কফি দিতে বলুন বরং...

বিমল বললে—তাহলে আপনি ওকে ফরমাশ করুন... কি-কি চাই। আমার অনুরোধ—

অলকা প্রতিবাদ-উদ্যত হলো...কিন্তু বিমলকান্তির চোখের দৃষ্টিতে মিনতি! সে বললে,—আচ্ছা...

খেতে খেতে বিমলকান্তি চেয়ে দেখছিল আশেপাশে... লোকজনের পানে।...চোখ পড়লো একটু দূরে টেবিল ঘিরে সবুজ শিল্কের শাড়ী পরা এক তরুণীর পানে—তরুণীর সঙ্গে সাহেবী পোষাকপরা তিনজন তরুণ বাঙালী। তরুণী উল্লাসে প্রমত্ত, লজ্জা-সরম ভুলে গেছে এবং তরুণ তিনজন প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ঘর প্রকম্পিত করে তুলেছে।

বিশ্রী লাগলো! বাঙালীর মেয়ে এখানে এতখানি স্বেচ্ছাচারে মত্ত হয়েছেন!

অলকার পানে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো—ওঁকে চেনেন?

অলকা সেন বললে—ওর নাম প্রতিভা গুপ্ত। ওর বাবা ছিলেন বড় ব্যারিষ্টার। পুরো-দস্তুর সাহেব...এক পয়সা সঞ্চয় রেখে যাননি...বিস্তর দেনা! মেয়েকে মানুষ করেছিলেন অসম্ভব ষ্টাইলে! প্রতিভা এখন সিনেমায় নামচে।

—সিনেমা!

বিমলকান্তি চমকে উঠলো। তার আজন্মের সংস্কারে আঘাত লাগলো। মনে হলো, বাঙলা দেশটা দু'বছরে কী রকম যে বদলে গেছে...দেশ যেন ছ' পেনি দামের বিলিতি নভেলের পটভূমি! এবং বাঙালী তরুণ-তরণী...ঠিক সেই সব নভেলের পাত্র-পাত্রীর মতো!

অলকা বললে—আমোদ করে' বেড়ায়।...বিস্তর বন্ধু-বান্ধব—তাদের সঙ্গে এমন হল্লা!

বিমলকান্তির মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। শাসন-নিষেধ না মানার মানে বুঝি এই...এ দুটো এক্সট্রিমের মধ্যে কি কোনো পথ নেই?...

বিমলকান্তি বললে—সিনেমা করে?

ম্লান হাস্যে অলকা বললে—পয়সার অভাবে।...অসহায়... আর কি করবে, বলুন?

—আর কোনো উপায় ছিল না?

অলকা বললে—আপনি বলবেন, টীচারী, গানের মাষ্টারী, সেলাই শেখানো...না হয় সিক-নার্শ? তাতে কতই বা পাবে? এক জোড়া জুতো, পথে বেরুবার মত শাড়ী-সেমিজ-ব্লাউশ, টয়লেট—এ সবের খরচ কি কম?...বাঁচার মতো যে বাঁচতে চায়—তার অত কম-পয়সায় চলবে কেন?

বিমলকান্তি কি বলতে যাচ্ছিল, অলকা বুঝলো, বুঝে বললে,—ওকালতি করবে? উপায় নেই! পুরুষ-উকিলেই খেতে পায় না।...ডাক্তারী? তা করতে গেলে যে শিক্ষা-সাধনার দরকার, তার অভাব, কিম্বা তাতে রুচি নেই। কাজেই এই সহজ পথ...! এতে পয়সা মেলে অনেক। প্রতিভা পায় এক-একখানা ছবিতে নামবার জন্য প্রায় হাজার টাকা।... তবে উড়নচণ্ডী...পয়সা রাখতে পারে না...রাখতে শেখেনি।

বিমলকান্তি বললে—তা বুঝতে পারছি। কিন্তু...

কথাটা বাধলো, বলতে পারলো না।

অলকা বললে—বলুন, কি বলছিলেন।

বিমলকান্তি বললে—পয়সা রোজগার করতে হয়, করুন। তা বলে এমন হল্লা করে' বেড়ানো...আপনার বিশ্রী লাগে না?

প্রশ্নটা অলকার মনে বিঁধলো কাটার মতো। একটা উদ্যত নিশ্বাস...সে-নিশ্বাস রোধ করে' অলকা বললে—যার যেমন রুচি!...আপনাদের মধ্যেও তো অনেকে এমন হল্লা করে' বেড়ান্...আবার কেউ বা খুব শান্ত; হল্লা করে বেড়ানো দেখতে পারেন না!

বিমলাকান্তির মনে হলো, ঠিক! ভাবলো, বলে,—পুরুষের ইমরালিটি দোষের হলেও মেয়েদের ইমরালিটির মতো শকিং নয়।

বলা হলোনা...অলকা হয়তো বলবে—ওটা আপনার সংস্কার!...

(শেষাংশ ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিমান যুদ্ধের কৌশল

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধে যে সকল বিমান ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে সাধারণত ্ন পর্য্যায়ে ফেলা যায়—পর্য্যবেক্ষক, বোমারু এবং ফাইটার। ্রুপক্ষের গতিবিধি, সামরিক ঘাঁটি, সৈন্যসমাবেশ প্রভৃতির খোঁজ ্বর লইবার জন্য পর্য্যবেক্ষক বিমানগুলি উড়িয়া বেড়ায়। এই ্কল বিমানে অতি উৎকৃষ্ট ক্যামেরা রাখা হয়। ঐ ক্যামেরা ্াহায্যে বিপক্ষের গুপ্তস্থানগুলির ফটো অতি কৌশলে গ্রহণ ্রা হয়। সেই সকল ফটো দেখিয়াই সমর-নায়কগণ শত্রুপক্ষের ্তিবিধি বুঝিয়া লন এবং তদনুসারে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ্বস্থা করেন। সম্প্রতি বৃটেন এই ফটো গ্রহণের আর একটি ্মৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। সে এক প্রকার বিমান প্রস্তুত ্রিয়াছে, যেগুলি হইতে টেলিভিশনে ছবি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। ্রুর কামানের গোলার আয়ত্তের বাহিরে থাকিয়া বহু ঊর্দ্ধে ্ক্ষত দেহে উড়িয়া উড়িয়া এই বিমানগুলি টেলিভিশনযন্ত্র সাহায্যে স্বপক্ষের শিবিরে চলিয়া যায়। এই আধুনিক টেলিভিশন যন্ত্র সমরায়োজনের অনেক গুপ্ত রহস্য ফাঁস করিয়া দিবে।

এইবার বোমারু-বিমান এবং ফাইটার সম্বন্ধে কিছু বলিব। গত মহাযুদ্ধে বোমারু-বিমানগুলি হইতে বোমা ফেলা হইত এবং সেইগুলিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত ফাইটার বিমান-গুলি; কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার পর দেখা গিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রেই শুধু বোমারু-বিমানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সঙ্গে কোন ফাইটার বিমান আসে নাই। ইহার কারণ কি?

কারণ অবশ্যই একটা আছে। একটু ভাঙ্গিয়া না বলিলে কারণটা ঠিক বুঝা যাইবে না। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রথমদিকে দেখা গিয়াছিল, দূরত্বের পাল্লায় বোমারু বা ফাইটার কেহই কাহারও অপেক্ষা কম নয়। ধরুন, ফ্রান্সের বিমানঘাঁটি হইতে একখানি বোমারু-বিমান জার্ম্মানীর যতদূর যাইয়া বোমা ফেলিয়া আসিতে পারিত একখানি ফাইটারেরও ততখানি যাইয়া ফিরিয়া আসিতে কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু যুদ্ধের শেষদিকে দেখা গেল, এমন এক শ্রেণীর বোমারু-বিমান প্রস্তুত হইয়াছে, যেগুলি ইংলণ্ড হইতে জার্ম্মানীতে যাইয়া বহুদূরে বোমা ফেলিয়া আসিতে পারে, কিন্তু কোনও ফাইটারের ততদূর যাইয়া ফিরিয়া আসা কঠিন। জার্ম্মানীর অভ্যন্তরস্থ অস্ত্রের কারখানাগুলি ধ্বংস করিবার জন্যই ঐরূপ লম্বা পাল্লার বোমারু-বিমান প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয় এবং তখন হইতেই চেষ্টা হয়, কি করিয়া বোমারু-বিমানগুলিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা যায় ও ফাইটার বিমানের সাহায্য ব্যতীতই ঐগুলি শত্রুর আক্রমণ হইতে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।
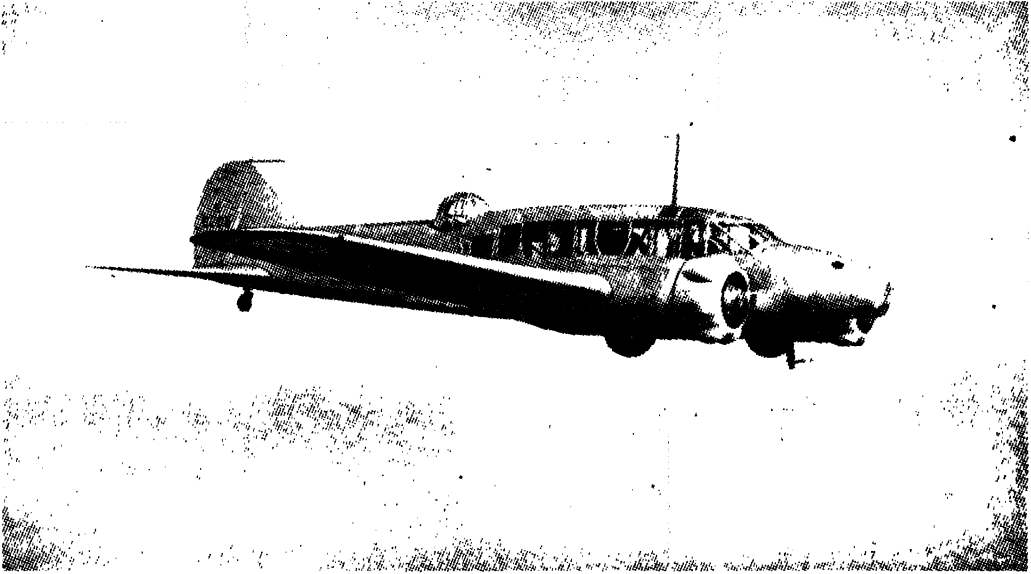
বৃটিশ পর্য্যবেক্ষক বিমান। বৃটেনের উপকূলে উড়িয়া উড়িয়া এইগুলি পাহারা দেয়।

্রুর সমস্ত আয়োজনের সবিশদ ও সুস্পষ্ট চিত্র মুহূর্ত্তে সহস্র ্াইল দূরে অবস্থিত স্বপক্ষের শিবিরে অনায়াসে চালান করিয়া ্দতে পারিবে। উড়ন্ত বিমানপোতে দূরবীক্ষণী লেন্স বসান ্টেলিভিশন ক্যামেরার মারফৎ অধঃস্থ ভূভাগের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ্রিবার চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বিমানের শ্যেন-্দৃষ্টি হইতে শত্রুপক্ষের গুপ্ত শিবির বা অস্ত্রের ঘাঁটিগুলির রক্ষা ্াই; টেলিভিশন ক্যামেরায় সেগুলির ছবি ধরা দিবে।

সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে বিমান হইতে শত্রুর ঘাঁটির ছবি ্াওয়া সময়সাপেক্ষ, কারণ ছবি তুলিয়া ফিরিয়া আসিতে সময় লাগে। ্আর তাছাড়া সেইভাবে ছবি তুলিতে যাওয়ায় বিপদও যথেষ্টই ্আছে। ছবি তুলিবার জন্য বিমানকে নীচে নামিয়া শত্রুপক্ষের ্বিমানধ্বংসী কামানের পাল্লার মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয়। কামানের ্গোলার আঘাতে বিমান ধরাশায়ী হইলে প্রাণ ত হারাইতে হয়ই, ্গৃহীত চিত্রগুলিও শত্রুর হস্তগত হয়। কিন্তু নবোদ্ভাবিত ্টেলিভিশনযন্ত্র সাহায্যে বিমান হইতে চিত্র প্রেরণে সেই বিপদের ্আশঙ্কা নাই। বিমান শত্রুর কবলগ্রস্ত হইলেও চিত্রপ্রেরণে কোন ্ব্যাঘাত হয় না, কারণ ভূতলে পড়িবার পূর্ব্বেই ছবিটি তাহার

গত মহাযুদ্ধের শেষভাগে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল হইতে বার্লিনে পৌঁছিবার জন্য যে বিশেষ ধরণের বিমান প্রস্তুত হয়, সেগুলির নাম 'হ্যাণ্ডলী পেজ'। ঐগুলি ছিল চার এঞ্জিনযুক্ত। বিপক্ষের বিমান আক্রমণের সরাসরি পাল্টা জবাব দিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে এই বিমানগুলিরই পশ্চাৎদিকে কামান লইয়া একটি লোক বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বে যে সকল বোমারু-বিমান প্রস্তুত হইত, সেগুলির মধ্যভাগে থাকিত মেশিনগান বা কামান,

পশ্চাৎদিক হইতে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিলে ঐ কামান সাহায্যে পাল্টা জবাব দেওয়া চলিত না। সেক্ষেত্রে সঙ্গে যদি ফাইটার বিমান না থাকিত, তবে বোমারু-বিমানকে ঘায়েল হইতেই হইত। কাজেই বোমারু-বিমান যাহাতে আক্রমণ হইতে নিজেকে নিজেই রক্ষা করিতে পারে তজ্জন্য তাহার পশ্চাৎদিকে বসান হইল কামান।

চার এঞ্জিনযুক্ত 'হ্যান্ডলী পেজ' বিমানগুলি প্রস্তুত হইল সত্য, কিন্তু কার্য্যত সেগুলি ব্যবহার হইল না। পরবর্ত্তীকালে ইহা লইয়া যাহারা মাথা ঘামাইয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, আত্মরক্ষার জন্য ঐ ধরণের বোমারু-বিমানগুলিতে ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা পর্য্যাপ্ত নয়; ঐগুলির সঙ্গে লম্বা পাল্লার ফাইটার বিমানও থাকা প্রয়োজন। অবশ্য ইহা লইয়া জগতের বিভিন্ন দেশে প্রবল মতদ্বৈধ রহিয়াছে। একদল মনে করেন, বড় বোমারু-বিমানে প্রচুর কামান বন্দুক লইয়া গেলে উহার সঙ্গে আর ফাইটার বিমান না রাখিলেও চলে। আবার যাহারা আধুনিক টুইন-মোটর ফাইটার প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, ঐসকল ফাইটারে এত পেট্রল ধরে যাহাতে যেকোন লম্বা পাল্লার বোমারু-বিমানের সহিত ঐগুলি বহুদূর ঘুরিয়া আসিতে পারে। গতির দিক দিয়া ঐগুলি বোমারু-বিমানকে ছাড়াইয়া যায়। অতিকায় বোমারু-বিমান প্রস্তুতের যাঁহারা বিরোধী তাহারা মনে করেন, দ্রুতগামী আধুনিক টুইন-মোটর ফাইটারের পাল্লায় পড়িলে ঐসকল বোমারু-বিমানের রক্ষা পাওয়া কঠিন।

বোমারু বিমান বোমা ফেলিবার সময় এইভাবে "ডাইভ" করিয়া নীচে নামিয়া আসে।

বোমারু-বিমান কত বেগে কতখানি যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর—গোলাগুলী এবং তেল। ঐ দুইটি জিনিষের ওজন ও পরিমাণ অনুসারেই বিমানের গতিবিধির তারতম্য হয়। আত্মরক্ষার জন্য বোমারু-বিমানগুলির সাধারণতই পর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ লইয়া যাওয়া উচিত। সঙ্গে ফাইটার বিমান থাকিলেও আবহাওয়া এমন হইতে পারে, যাহাতে একের অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া কিছুই অসম্ভব নয়। অথবা শত্রুপক্ষের বিমানের সহিত ফাইটারগুলিকে এমনভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইতে পারে যে, স্বপক্ষের বোমারু-বিমানগুলির নিরাপত্তার দিকে নজর দিবার আর সেগুলির সময়ও না থাকিতে পারে। কাজেই সে অবস্থায় বোমারু-বিমানের পশ্চাৎদিক রক্ষার জন্য যদি ব্যবস্থা না রাখা হয়, তবে বোমারু-বিমানের ধ্বংস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অতএব ফাইটার বিমান সঙ্গে থাকিলেও বোমারু-বিমানগুলির নিরাপত্তার জন্য পশ্চাৎ-দিক হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বোমারু-বিমানে সাধারণত একজন পাইলট, একজন নেভি-গেটর ও একজন বোমা নিক্ষেপক থাকে। আর পশ্চাৎদিকে থাকে একজন গোলন্দাজ বৈমানিক। এ ব্যবস্থা আধুনিক। কেহ কেহ বলেন, বোমারু-বিমান অত বড় না করিয়া ছোট করাই ভাল। ছোট বিমানে থাকিবে মাত্র দুইটি লোক, তাহারা উভয়েই হইবে একাধারে পটু বিমানচালক এবং নিপুণ গোলন্দাজ সৈন্য। বোমা ফেলা, মেশিনগান দাগা, বিমানচালনা—সবই তাহারা করিবে। এই মতের যাহারা পরিপোষক তাঁহারা বলেন, অল্প দূরে বোমা ফেলিয়া আসিবার পক্ষে এই ধরণের ক্ষুদ্র বোমারু-বিমানগুলিই হইল সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কেহ কেহ আবার ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া যান। তাঁহারা বলেন, একজন লোক একটি বিমান এবং একটি বোমা এই যথেষ্ট, ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। যতগুলি বোমারু-বিমান যাইবে, সঙ্গে থাকিবে ঠিক ততসংখ্যক ফাইটার। যেখানে যাতায়াতে পনর শত মাইলের বেশী হয়না, সেখানে বিমান-আক্রমণ চালাইবার পক্ষে এই ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইহারা মনে করেন। ইহাদের যুক্তি হইল এই, শত্রুপক্ষের গুলীর ঘায়ে

বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও দুর্ভেদ্য ফাইটার বিমান "স্পিটফায়ার"। ইহাতে মাত্র একজন লোক বসিতে পারে।

যদি কোন বড় বোমারু-বিমান বিধ্বস্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রচুর গোলা-বারুদ ত নষ্ট হয়ই, তাছাড়া চার পাঁচজন লোকের জীবনও সেখানে বিপন্ন হয়। তাহা না করিয়া ছোট ছোট বোমারু-বিমান করিলে শত্রুপক্ষের গুলীতে একখানি বোমারু-বিমান বিধ্বস্ত হইলেও আর একখানি বাঁচিতে পারে। ইহাতে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনাও থাকে কম এবং একবারে অনেকগুলি বোমাও হারাইতে হয় না। অতএব ছোট ছোট বোমারু-বিমান সাহায্যেই আক্রমণ চালান বুদ্ধিমানের কাজ, ইহাই হইল একদল লোকের বিশ্বাস।

বিমানধ্বংসী কামান দাগিতে যাহারা ওস্তাদ, তাহারা কিন্তু আবার বলেন,—মন্দ কি! ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু-বিমান যদি আসেই আমরাও সেগুলিকে পাখীর ঝাঁকের মতই শিকার করিব; বেশী কষ্ট করিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে না, ঝাঁকের মধ্যে গুলী মারিলে একটা না একটা পড়িবেই। আর এক দল বলেন,—বড়

শত্রুপক্ষের বিমানের শব্দ ধরা পড়িল শব্দগ্রাহী যন্ত্রে। তাহার পরই ফেলা হইল সার্চ্চ লাইট। টেলিফোনে দেওয়া হইল সঙ্কেত, অমনি ছুটিল স্বপক্ষের ফাইটারসমূহ সংগ্রামে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চলিল বিমান-ধ্বংসী কামান হইতে মুহুর্মুহু গুলী। শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানকে ঘায়েল করিবার ব্যাপক আয়োজন এই চিত্রে একসঙ্গে দেখান হইয়াছে।

বোমারু-বিমান যদি আসে, তবে কয়েকটা কামান হইতে একযোগে একটার দিকে গুলী ছাড়া চলিবে, পাঁচটার দিকে আর নজর দিতে হইবে না। এক গুলীতে না পড়ে, আর এক গুলীতে পড়িবেই। তাহাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা কি?

বিমানযুদ্ধ লইয়া এতদিন যে মতদ্বৈধ চলিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ সংক্ষেপে তাহাই বলিলাম। এইবার বলিব, বোমারু ও ফাইটারের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাহার কলা-কৌশলের কথা।

প্রথমেই ধরা যাক, কোনও বোমারুকে যদি কোনও ফাইটারের আক্রমণ করিতে হয়, তবে ফাইটার কিরূপ অবস্থান হইতে আক্রমণ চালাইবে? সামনাসামনি? পাশাপাশি? না পিছন দিক হইতে? এখানে বলিয়া রাখা ভাল, বোমারু-বিমানগুলি হইতে বোমা ফেলিবার সময় ঐগুলি লক্ষ্যস্থলের দিকে উপর হইতে বাজ পাখীর মত শোঁ করিয়া নীচে ছুটিয়া আসে এবং টুপ করিয়া বোমা ফেলিয়াই আবার উপরে উঠিয়া যায়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে 'ডাইভ' করা।

মনে করুন, শত্রুপক্ষের বোমারু-বিমান বোমা ফেলিবার জন্য আসিতেছে। টের পাইয়া তখন সেই বোমারু-বিমানখানিকে বাধা দিবার জন্য উঠিল ফাইটার। প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হইতেছে বিপক্ষের বোমারু এবং তাহাকে ঘায়েল করিবার জন্য ছুটিয়াছে ক্ষিপ্রগতিতে ফাইটার। সেক্ষেত্রে একটি অপরটি দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইতেছে। সেই প্রচণ্ড গতির মধ্যে তাল সামলাইয়া আক্রমণ করা যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটু বেহুঁস হইলে দুইটিতে টক্কর লাগিয়া দুইটিই চুরমার হইয়া যাইবে; আর একটু বে-হিসাবী হইলে গুলী লক্ষ্যচ্যুত হইবে। কাজেই মুখামুখি দুই বিমানে যুদ্ধ বড় একটা হয় না। কেন হয় না, আর একটু হিসাব দিলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হইবে। একটি বোমারু এবং একটি ফাইটার যদি পরস্পরের দিকে ঘণ্টায় যথাক্রমে আড়াই শত এবং তিন শত মাইল বেগে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে হিসাব করিয়া দেখা যায়, তাহারা একে অন্যের দিকে ঘণ্টায় পাঁচ শত পঞ্চাশ মাইল এবং প্রতি সেকেণ্ডে ২৬৮ গজের অধিক অগ্রসর হইতে থাকে। বিমানে সাধারণত যে-সকল ছোট মেশিনগান ব্যবহৃত হয়, সেগুলির পাল্লা এক শত গজের বেশী নয়। তবেই বুঝুন, অত দ্রুতগতিতে পরস্পরের প্রতি ধাবমান দুইটি বিমানের মাত্র এক শত গজের মধ্যে যাওয়া কত বড় মারাত্মক ব্যাপার। দুইটিতে সঙ্ঘর্ষ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, আর তাহা না হইলেও ঐ অবস্থায় অত চুলচেরা হিসাব করিয়া গুলী ছাড়া কঠিন। কাজেই যেখানে আক্রমণ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনাই বেশী, সেখানে অতবড় বিপদের মধ্যে আর যায় কে? এইজন্যই, বোমারু-বিমানকে বাধা দিবার জন্য কোন ফাইটার মুখামুখি অগ্রসর হয় না। সঙ্ঘর্ষ হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও গুলী লক্ষ্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকায় ঠিক একই কারণে পাশ হইতে আক্রমণ করিবার নীতিও অবলম্বিত হয় না।

বিপক্ষের বোমারুকে ঘায়েল করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা

হইল পশ্চাৎদিক হইতে যাইয়া আক্রমণ করা। এইজন্যই শত্রুপক্ষের বোমারুর সন্ধান পাইলেই ফাইটারগুলি ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাইয়া বিপক্ষের বোমারুর পশ্চাদ্ধাবন করে। ফাইটারগুলি আকাশে ঘোরা-ফিরা করিতে পারে সহজে এবং উঠানামা করিতেও সেগুলির সুবিধা; কিন্তু বোমারু বিমানগুলির নানাকারণে সে সুবিধা নাই এবং আত্মরক্ষার জন্য সেগুলিকে এমনভাবে নিজেদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, যাহাতে ফাইটারগুলি সহজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুবিধাজনক স্থান লইবার সুযোগ পায়। ফাইটার-গুলি আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতে ঠিক আড়া-আড়িভাবে বোমারু-বিমানের উপর আক্রমণ চালায়।

পশ্চাৎদিক হইতে বোমারুর উপর আক্রমণ চালাইতে বিপদ না আছে এমন নয়। বোমারুর পশ্চাৎদিকে এক বা একাধিক কামান থাকে। সেই কামানের গুলী হইতে ফাইটারের নিষ্কৃতি পাওয়া অনেক সময় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কোনও বোমারুর পশ্চাৎদিকে থাকে উপরে একটি কামান, আবার কোনটির থাকে উপরে নীচে দুইটি কামান। অধুনা বিমানে ঘূর্ণায়মান চাকার উপর এমনভাবে কামান বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, যাহাতে কামানটিকে ঘুরাইয়া
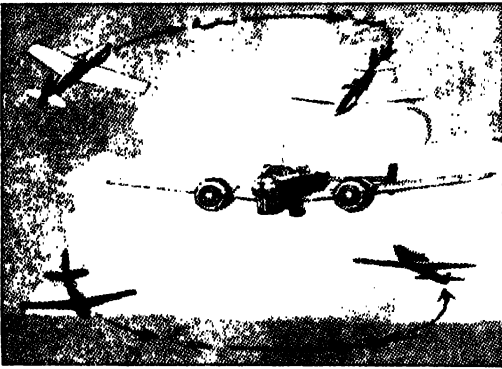
চক্রাকারে ঘুরিয়া ফাইটার কিভাবে বোমারুকে আক্রমণ করে চিত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে।

ফিরাইয়া গুলী ছাড়া যায়, লক্ষ্যস্থির করিবার জন্য সমস্ত বিমান-খানিকে না ঘুরাইলেও চলে।

বলাই বাহুল্য, দ্রুতগতিতে চলন্ত অবস্থায় যেখানে গুলী ছাড়িতে হয়, সেখানে প্রতি পদে পদেই গুলী লক্ষ্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্যই যাহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি গুলী ছাড়া যায়, তজ্জন্য ফাইটারগুলিতে একাধিক মেশিনগান বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ফাইটারে আটটি পর্য্যন্ত মেশিনগান থাকে। চালকের কাছেই থাকে একটি বোতাম, সেইটি টিপিলেই একসঙ্গে মেশিনগানগুলি হইতে ছোটে গুলী। সেই ছড়রা গুলীর মুখে পড়িলে কোনও বিমানের অব্যাহতি পাওয়া সত্যই একটু কঠিন।

একসঙ্গে গুলী ছাড়িবার ত ব্যবস্থা হইল; কিন্তু কথা হইল, ছোট মেশিনগানের গুলী কঠিন ধাতুনির্ম্মিত আধুনিক বোমারু বিমানগুলির দেহ যদি ভেদ না করিতে পারে? সমস্যা ত বটেই, আধুনিক বিমানগুলিকে দুর্ভেদ্য করিবার জন্য চেষ্টার কিছু ত্রুটি হয় নাই। কাজেই সেগুলিকে ভেদ করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে এমন কামানের, যেগুলি হইতে শক্তিশালী গোলা ছাড়া যায়। আজকাল সাধারণ মেশিনগানের সঙ্গে বিমানে ঐ শ্রেণীর কামানও রাখা হয়। এমন মারাত্মক বিস্ফোরক পদার্থে এসকল কামানের গোলা প্রস্তুত হয়, যেগুলির আঘাতে বিমানের অতি কঠিন আবরণও ভেদ হইয়া যায়।

বিমানে কামান-বন্দুক রাখা লইয়াও দ্বিমত আছে। একদল বলেন,—ফাইটারে কতকগুলি মেশিনগান রাখাই ভাল; কারণ একসঙ্গে অনেকগুলি গুলী ছাড়িয়া শত্রুপক্ষকে কাবু করা যায়। আবার আর একদল বলেন,—একাধিক মেশিনগান না রাখিয়া একটি বড় কামান রাখাই ভাল। মেশিনগান রাখার যাহারা পক্ষপাতী, তাহারা বলেন,—একসঙ্গে অনেকগুলি গুলী ছাড়িয়া বিপক্ষের বোমারু বা ফাইটারকে জখম করিতে যে সুবিধা, একটা কামান দাগিয়া কি সেই সুবিধা পাওয়া যায়? কামান রাখার পক্ষপাতীরা বলেন,—কতটুকু দূর হইতেই বা মেশিনগান ছাড়া যায়? কামান দাগা যায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দূর হইতে। কাজেই কামানের কাছে মেশিনগান দাঁড়াইতেই পারে না। বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—যে-সকল ফাইটারে মাত্র একজনের বসিবার ব্যবস্থা আছে, তেমন দুইখানি ফাইটারের একখানিতে যদি থাকে আটটি মেশিনগান এবং আর একটিতে যদি থাকে একটি বড় কামান এবং ঐ দুইখানি ফাইটারে যদি বাধে সংগ্রাম, তবে সেক্ষেত্রে মেশিনগানওয়ালা ফাইটার-খানিরই জিতিবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কিন্তু চার এঞ্জিনযুক্ত বড় বোমারু বা কোনও বড় সীপ্লেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে কামান-ওয়ালা ফাইটার লইয়া যুদ্ধ করিতেই সুবিধা, কারণ সেক্ষেত্রে লক্ষ্য বড় বলিয়া সন্ধান ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে কম। আধুনিক বিমানসজ্জায় এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা হইয়াছে। মাত্র একজন বসিবার মত এক এঞ্জিনযুক্ত ফাইটার প্রস্তুত কমাইয়া দিয়া দুই এঞ্জিনযুক্ত ফাইটার প্রস্তুতের দিকে অধিক ঝোঁক পড়িয়াছে। শেষোক্ত ফাইটারগুলিতে একাধিক লোক বসিতে পারে এবং কামান বন্দুক দুই-ই রাখা চলে।

সম্প্রতি বৃটেনে 'স্পিটফায়ার' নামে একশ্রেণীর ফাইটার প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে। জগতে এইগুলিই নাকি বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এবং দুর্ভেদ্য ফাইটার। এই ফাইটারগুলি মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। দুই পাশের দুইটি ডানার এক একটিতে চারটি করিয়া মোট আটটি মেশিনগান বসান থাকে। ঐগুলি হইতে প্রতি মিনিটে ৯৮০০ রাউন্ড গুলী ছাড়া যায়। সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, এই ফাইটারগুলি ঘণ্টায় ৩৬২ মাইল যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এইগুলির গতি আরও ঢের বেশী; এমনকি ঘণ্টায় ৫০০ মাইল পর্য্যন্তও নাকি ছুটিতে পারে। 'স্পিটফায়ারের' পরেই স্থান পায় বৃটেনের 'হকার হারিকেন' ফাইটারগুলি। ঘণ্টায় এইগুলি ৩৩৫ মাইল যাইতে পারে, সরকারীভাবেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এইগুলি প্রায় ৭ মাইল উপরে উঠিতে পারে এবং যাতায়াতে একবারে ১২০০ মাইল উড়িতে এইগুলির কোন অসুবিধা হয় না। প্রতিটি 'হকার হারিকেন' ফাইটারে আটটি করিয়া ব্রাউনিং গান (একপ্রকার কলের কামান) বসান থাকে; ঐগুলি হইতে দশ সেকেন্ডে আড়াই শত রাউন্ড গুলী ছাড়া যায়। যে বিমান চালায়, সে-ই কামান দাগে। বৃটেনে 'ডিফায়ান্ট' নামে আর একশ্রেণীর ফাইটার প্রস্তুত হইতেছে, যেগুলি 'স্পিটফায়ার'কেও ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। এই নূতন ধরণের ফাইটারগুলিতে দুইজনের বসিবার ব্যবস্থা থাকিবে। বিমান জগতে আরও কত বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হইবে কে জানে!

রাঁধুনী

(গল্প)

শ্রীসুকুমার মজুমদার

নিঃশব্দে বসিয়া আহার করিতেছিলাম।

মা নাই, অতএব তত্ত্বাবধান করিবার আসল মানুষটির াব ছিল। অন্তত আমি ইহা মর্ম্মান্তিকরূপেই অনুভব ।।

বিবাহ করি নাই, সুতরাং 'এটা খাও', 'ওটা খাও' 'কিচ্ছু য়া হলো না', 'এ কোরে শরীর টিঁকবে কেন, পেট ভরে ও নয়তো আমার মাথা খাও' ইত্যাদি বলিবার ও অনুযোগ বার লোকটির অভাব নিঃসন্দেহেই ছিল।

নিঃশব্দে খাইতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম এবং দুই একবার নিঃশ্বাস মোচন করিয়া মনের ভিতর খুঁজিয়া বেড়াইতে-াম, জগতে এমন কেহ দরদী আছে কিনা যে অন্তরের কু মমতা দিয়া আমাকে খাওয়াইতে পারে, আর আমি ভরা পরিতৃপ্তির সহিত বলিতে পারি—"খাওয়ার ভিতর এতো আনন্দ আছে সে আমি আগে জানতাম না, রমা!"

খুঁজিয়া দেখিলাম।

কিন্তু 'রমা-জাতীয়' তেমন কোন নারীর সন্ধান পাইলাম বিস্ময় জাগিল—মিথ্যা বলিলাম, অন্তরে আঘাত পাইলাম, মনে ক্ষুব্ধ হইলাম।

ছোট সংসার। তাও এ সংসার আমার নয়, দাদার। া থাকেন বিদেশে, চাকরী করেন। সঙ্গে আছেন বৌদি। ম তাঁহার হইয়া বাড়ী পাহারা দিই, ছোট ছোট মা-বাপহারা -বোনদের তত্ত্বাবধান করি।

নিজেকে এমনি করিয়া যখন বিচার করি, মনে গ্লানি জন্মে, য় মতো কোনো কোনো দিন অত্যন্ত ক্ষেপিয়া গিয়া চিঠিতে র্য্যয় বাধাইতাম। দাদাকে লিখিতাম—আমি আর পারি তুমি এ সংসারের দায়িত্ব বৌদিকে বুঝাইয়া এখানে পাঠাইয়া ।। আমি এসব হইতে মুক্তি চাই।

উত্তরে আমি মুক্তি যে পাইতাম না, বলাই বাহুল্য।

সে যাই হোক নিঃশব্দে আহার করিতেছিলাম। পরি-ন করিতেছিল সনাতনী ঠাকুর—জাতে উড়িয়া। লোকটা া করে ঠিক কিন্তু তার আন্তরিক দুঃখ এই জলের সহিত া কেন মিশে না, ঝোল আর মসলাই বা কেন এক হয় না! ণটা আমিও আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

পারিলে নিশ্চয়ই ঠাকুরকে জবাব দিতাম। বলিতে হইবে, রেই বরাত ভালো!

পূর্ব্বে পেটুক বলিয়া দুর্নাম ছিল, এখন অল্প খাই য়া দুর্নাম কমিয়া ছোট বোনের অনুযোগ বাড়িয়াছে। াকে বুঝাই। সে বোঝে।

বেচারা ঠাকুর—রসুয়ে বামুন রান্নার চাতুর্য্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা াক পরিমানে লাঘব করিয়া দিয়াছে। তবে তাহাতে দুঃখ খরচ না কমিয়া জিনিষপত্র নষ্ট হইতেছে।

নিঃশব্দে আহার করিতেছিলাম এবং স্তিমিত উৎসাহে ার হস্তের অসামান্য রান্নার অতুলনীয় আস্বাদ গ্রহণ করিয়া াই. বোধ করি প্রাণ হইতেই হইতেছিলাম!

অনুপায়!

ভাত লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছি এমন সময় শুনিলাম পাশের বাড়ী হইতে অরুণা বেড়াইতে আসিয়াছে।

অরুণা আসিয়াছে, কিছুক্ষণ অনর্গল বকিয়া যাইবে। অত্যন্ত বেশী কথা সে বলিতে পারে। উৎসাহ হইল কিনা জানিতে গিয়া যদি কেহ উৎসাহিত হন, নিরাশ হইবেন।

আমার উৎসাহ হয় নাই।

অরুণা আসে, প্রতিদিন আসে। প্রতিদিনকার মতো আজো আসিয়াছে, কালও আসিবে, আগামী দিনগুলির মধ্যেও আসিবে। কিন্তু আমার উৎসাহ হয় নাই, আজো হয় নাই, কালও হইবে না, কোনদিনই হইবে না জানিতাম।

কারণ অরুণাকে আমার ভাল লাগে নাই।

ভাল লাগে নাই তার কারণ এই নয় যে অরুণা সুন্দরী নয়। পাড়ার ছেলেরা বলে, শুনিতে পাই, অরুণা ভোরের শুকতারা। উজ্জ্বল, জ্বলজ্বলে। একটা স্বপ্নাতুর আচ্ছন্নতা তার দেহে নিঃশব্দে লাগিয়া আছে, কখন উহা ভাঙিয়া যাইবে এজন্য তার যৌবন যেন উচ্চকিত, ত্রস্ত।

কথাটা তাহারা বলে, আমি বিশ্বাস করি না। কেননা এতটা কবিত্ব আমার নাই। আমাকে অনুকম্পা করা উচিত।

তবু সত্য কথা অরুণাকে আমার ভাল লাগে নাই। কোন-দিন ভাল লাগিবে সে ভরসাও খুবই অল্প!

আমি নিঃশব্দে খাইতে লাগিলাম।

অরুণার অহঙ্কার ছিল সে কলেজে পড়ে। আমার দুর্ব্বলতা ছিল আমি নাকি লিখিতে পারি।

তবে একটা বড় কথা এই অরুণা আমার লেখা বোধ করি সর্ব্বাগ্রেই সাগ্রহে পড়ে। এ কথাটা জানিতাম—অরুণাই এক-দিন আমাকে বলিয়াছিল।

মনে মনে ধরিয়া লইয়াছিলাম অরুণা আমাকে অনুকম্পা করে।

অরুণা রান্নাঘরে ঢুকিল।

কহিল—এতো বেলা অবধি খাননি, এখন যে আড়াই-টে বেজেছে!

বলিলাম—ঘড়ির স্বভাব বড় চঞ্চল, কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি আবার একটু ধীর। তাই ঘড়িতে যতটা বেজেছে ততটা তাগাদা আমার নেই।

অরুণা কহিল—এ ঠাকুরকে প্রমোশন দিন। অর্থাৎ এ বাড়ীর কাজে সে হাই ক্লাশ নম্বর পেয়েছে। এবার এখান থেকে অন্যত্র যাওয়াই আবশ্যক। এখানে তার আর থাকবার স্থান নেই।

হাসিয়া বলিলাম—কেন, তার রান্নার স্বাদ নিয়েছ বুঝি!

—হ্যাঁ।

—তা' হলে এস্থলে ঠাকুরকে তোমাদের বাড়ীর প্রবেশপত্রই দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

—ওসব ক্লাশিক্যাল ঠাকুরে বড় বিপদ। বাড়ীর কর্ত্তারা হঠাৎ হস্তের সক্রিয়তা প্রমাণ করবার জন্যে হয় তো অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন। জানেন, আমি হলে ওকে অ্যাদ্দিনে

রাস্তা বাতলিয়ে দিতুম। মাগো! এই নাকি রান্না! না হয়েছে স্বাদ, না হয়েছে নুন, না দিয়েছে কিছু। আপনারা কি করে ওসব ছাইভস্ম গেলেন!

—যেমন করে আজ গিলছি।

—না, না ওকে তাড়ান আপনি।

—বেশ, তুমি না হয় একদিন আমাকে রেঁধে খাইয়ে দিও। তখন বুঝতে পারবো কার হাতের রান্না ভালো। সে অনুযায়ী লোক বিশেষকে তাড়ানো যাবে, আমার আপত্তি হবে না।

হাসিয়া অরুণা কহিল—বেশ। কিন্তু আমারটা ভাল হলে আমাকে যেন আবার রাঁধুনী করে রাখতে যাবেন না। সে আমি পারবো না আগেই বলে রাখছি।

হাসিলাম।

বলিলাম—সে চেষ্টা যদি করি তখন তুমি না হয় নাকচ করে দিও। তবে তুমি রাঁধুনী হলে আমার সুবিধে হতো।

অরুণা কথাটার কি অর্থ করিল, জানি না। সে লজ্জানুরাগে আরক্ত হইয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইল।

এটুকু আমার চোখে নেহাৎ মন্দ ঠেকিল না।

উপভোগ করিলাম।

তবে পরিহাসটুকু যে মাত্রাসংগত হয় নাই, পর মুহূর্ত্তে স্পষ্টই উপলব্ধি করিলাম। কথাটার যে অর্থ করা যায়, বলা বাহুল্য অরুণা সেটা করিয়াই পলায়নপর হইয়াছে, আমি তাহা ভাবিয়া বলি নাই।

এবার লজ্জাতিশয্যে আমিও ভাঙিয়া পড়িলাম।

বিকালে অরুণার অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতে গেলাম। ঘরে ঢুকিতেই অরুণার মা হাসিয়া বলিলেন,—এসো সুনীত, কিন্তু তার আগে বাবা, অমনি রান্নাঘরটা একবার দেখে এসো।

সোৎসুকে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। দেখিলাম অরুণা একটা অখণ্ড রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়া বসিয়াছে।

সবে বাটনা ও কুটনার পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে, আর তারই মধ্যস্থলে বসিয়া অরুণা কাজের তদ্বির করিতেছে। একটা বড় পিত্তলের পাত্রের মধ্যে সে একহাতে মসলাসহ কাঁচা মাংস মাখিয়া দুরস্ত করিতেছিল।

বুকের উপর হইতে কাপড়টা ঘুরাইয়া জড়াইয়া কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া সে কাজে ব্যস্ত। মাথার একরাশ কালো চুলের আলগা খোপা ঘাড়ে এলাইয়া পড়িয়াছে।

সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি, অরুণা?

অরুণা মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—আপনার ক্লাসিক্যাল রসুয়ে বামুনকে তাড়াবার উদ্যোগপর্ব্ব।

হাসিয়া বলিলাম—এতোটার প্রয়োজন ছিল না। ওকে তাড়ানো সমূহ সম্ভব না হলেও সেটা অপরিহার্য্য। কিন্তু তুমি আজ নিজের হস্তের রান্না আমাকে খাইয়ে শেষে কি ফ্যাসাদ বাধাবে! মানে, তোমার হাতের রান্না, আমি না খেয়েই জোর গলায় বলছি অরুণা, হবে মার্ভালাস্। এ জন্যে হয়তো তোমাকে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে।

হাসিয়া অরুণা কহিল—তবু আমি প্রমাণ করবোই উড়িয়া ঠাকুরের চাইতে আমি ঢের ভালো রাঁধতে পারি। আপনি এখন কোথাও বেরুবেন না যেন। আমার রান্না শেষ হতে ঠিক তিন ঘণ্টা লাগবে।

—তার মানে এ তিন ঘণ্টা বসে বসে আমি মনে মনেই স্থির করে ফেলি অরুণা রাঁধতে পারে চমৎকার। তারপর সেটা খেলে হয়তো দিল্লীর লাড্ডুও হতে পারে।

মুচকি হাস্যে অরুণা কহিল,—ইস্ তাই যেন হতে যাবে। আচ্ছা তবে যান, বেড়িয়ে আসুনগে। কিন্তু সাবধান, আটটার ভিতর না ফিরলে কিন্তু মহা হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধাবো।

হাসিয়া বলিলাম—সে বাধিয়ো। কিন্তু আমি আটটার আগেই ফিরবো। সুতরাং সে সুযোগ তোমার হবে না।

রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

অরুণা আজ আমাকে প্রেরণা দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এমন আনন্দ আর কখনো পাই নাই। কেহ আমাকে খাওয়াইয়া সুখী হয়, এ সংবাদটা আমার জানা ছিল না। আজ জানিলাম। জানিয়া অনায়াসে অরুণার উপর হইতে আমার বিতৃষ্ণাটুকু নিঃসংকোচে তুলিয়া লইলাম।

আজ সত্যই অরুণাকে আমার ভালো লাগিয়াছে।

হাঁটিতে কতক্ষণ সময় গেল জানি না, সহসা চৌরাস্তার মোড়ে দেখা গেল বাল্যবন্ধু হরেন্দ্রের সহিত। জনতার ভিড়ে তাহাকে আমি লক্ষ্য করি নাই সেই আমাকে আবিষ্কার করিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গ্যাস লাইটগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

হরেন্দ্র আমার পিঠে হাত রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে পেছন হইতে ডাকিল—সুনীত!

চম্‌কিয়া ফিরিয়া তাকাইলাম।

তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ছোটবেলায় যাহাদের সহিত আমার অন্তরের মিল হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা তেমন বেশী নয়। কিন্তু এ হরেন্দ্রই ছিল তন্মধ্যে অন্যতম। তাহার সহিত আমার সর্ব্বাপেক্ষা বনিবনা হইয়াছিল।

তরপর কর্ম্মজগতে আসিয়া আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম। কেহ কাহারো খোঁজ রাখিলাম না। সে-ও আজ বহু দিন।

এ বহুদিনের পরেই আজ যখন তাহার দেখা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপেই পাইলাম, তখন এ অপ্রত্যাশার মূল্যে বুকভরা আনন্দের বিনিময়েই প্রত্যার্পণ করিলাম।

সানন্দে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—হরেন্দ্র, তুই! হঠাৎ ভুঁই ফুড়ে এলি নাকি!

হরেন্দ্র হাসিল। কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, ওইটুকু হাসিতে প্রাণ ছিল না—যেন অত্যন্ত কষ্ট করিয়া টানিয়া সে হাসিয়াছে।

তাহার একটি হস্ত ঈষৎ নিপীড়ন করিয়া চলিতে চলিতে বলিলাম—ইউ লুক স্যাড—রাদার গ্লুমি! কেমন আছিস?

হরেন্দ্র স্বল্প হাস্য করিল। কহিল—আমি ভালোই আছি, সুনীত। কিন্তু আমাকে কেন্দ্র করে যে একটা বৃত্ত গড়েছে তার জন্যে মাইণ্ড বড় ডিপ্রেসড্ হয়ে আছে, ভাই। জানিস তো বৃত্ত হলেই তার পরিধি থাকা চাই, এরও তাই আছে। অবিশ্যি এ কোনো রৈখিক পরিধি নয়, এটা হল সামাজিকতার নিয়ম-কানুন।

সে মৃদু হাস্য করিল।

কথাটা আমার কাছে প্রহেলিকার মতই বোধ হইল। ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

হরেন্দ্র বলিল—কথাটা তোকে খুলেই বলি। কিন্তু তোর কি সময় হবে?

বলিলাম—খুউব।

—তরুকে বিয়ে করেছি। এ বিয়েতে পিতা-মাতার মত হয়নি। তার কারণ আমি ব্রাহ্মণ তরু কায়স্থ। কিন্তু সুনীত, তরুকে ভালোবেসে যেমন বুঝলুম তরুকেই আমার প্রয়োজন, তার সামাজিক ধর্ম্মকে নয়—অমনি পিতা-মাতার কাছে এ প্রস্তাব পেশ করে হলুম তিরস্কৃত। কথাটা তরুর কাছে গোপন রাখলুম, তাদের আশ্বাস দিলুম বাবা-মাকে সম্মত করাতে আমার মোটেই বেগ পেতে হবে না। তরুকেও তাই বুঝালুম। কিন্তু হালে জল কতটুকু জানতুম। তাই চেষ্টা করে চাকুরী জুটিয়ে নিলুম এক সদাগর অপিসে। বাবার অর্থ আছে, এ বিয়েতে তার আশা ছাড়তে হবে বলেই নিজের সংস্থান করে তরুকে করলুম বিয়ে। বিয়ের রাত্রি পর্য্যন্ত তরুকে ও তার বাপ-মাকে মিথ্যে বুঝালুম, আমার বাবা -মার মত হয়েছে। বাবা বৃদ্ধ তাই তিনি আসতে পারলেন না। আর যারা আমার বিয়েতে গিয়েছিল, তার কেউ সমাজ-সংস্কারের পান্ডা, উৎসাহী এবং আমার বন্ধু, তারা পরিচয় দিলে আমার আত্মীয় বলেই। কিন্তু মিথ্যা গোপন রইল না। তরু এখানে ভিন্ন বাড়ীতে এসে সেটা বুঝতে পারলে। তাই থেকেই আমাদের দু'জনের মতান্তর আর তীব্র অশান্তি চলেছে এতকাল।

হরেন্দ্র চুপ করিল।

বলিলাম—এ খন্ড কাব্য কত দিনে গড়েছিস?

—দু'বছর।

—বিয়ে হয়েছে কতদিন?

—ছ'মাস।

এবার হাসিয়া বলিলাম—তাহলে সেটা খুব মারাত্মক নয়, হরেন্দ্র। ধীরে-সুস্থে বৃত্তের পরিধি বাড়বে, আকারও বাড়বে -সঙ্গে। কিন্তু কেন্দ্র থাকবে স্থির। তোকে টলায় সাধ্য র। শ্রীমতী তরুলতা এরই ভিতর ঘুরপাক খাবেন, কিন্তু কেন্দ্রচ্যুত যে হবেন না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।

হরেন্দ্র মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তরু বাইরের ভদ্রতা বজায় রেখেছে, কিন্তু মনকে করেছে কঠিন, তাই তাতে আমার আশা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

এমনি কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ একস্থানে হরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এই সামনেই গলির মধ্যে আমার বাড়ী। আয় না। তরু তোর একজন ভক্ত পাঠিকা। তোর সঙ্গে আলাপ হলে খুশী হবে সে।

বিনা প্রতিবাদে সম্মতি জানাইয়া হরেন্দ্রের সহিত তাহার বাড়ীতে আসিলাম।

আমার আটপৌরে এবং পোষাকী পরিচয় পাইয়া বন্ধু-পত্নী তরুলতা খুশী হইল। পুরাদস্তুর অভ্যর্থনা জানাইয়া আমাকে সে সানন্দেই বসিতে বলিল।

আমিও খুশী হইলাম।

ছোট বাড়ী, ছোট সংসার—মাত্র দুইটি লোকের বাস। কোলাহল নাই, চাঞ্চল্য নাই। নিৰ্জ্জন বনের বুক-চেরা একটা শান্ত নির্ঝরিণীর মতো ইহাদের দিনগুলি।

বলিলাম—হরেন্দ্র আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, আপনি তার সহধর্ম্মিনী। সুতরাং আপনিও আমার বন্ধু। অন্তত এ দাবী আমি আইনত করতে পারি কি বলেন?

তরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে বন্ধুভাবে পাওয়ার গৌরব আমার একেলার বস্তু। সুতরাং এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহও আমার বড় কম নয়। অতএব আপনি আজ আমাদের অতিথি হলেন।

স্বচ্ছন্দ চিত্তে বলিলাম—সানন্দে।

সেই রাত্রে তরুর ভরাট আদর-আপ্যায়নের অপরিমিত তৃপ্তিটুকু লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ভ্রমণের পথে অরুণা মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ফিরিবার পথে তরু সেস্থান পূর্ণ দখল করিয়া লইল। বস্তুত অরুণার কথা তখন আমার একটুও মনে ছিল না। তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, নিমন্ত্রণের কথাও স্মরণ ছিল না।

বিভ্রান্ত স্মৃতিশক্তি এমন করিয়াই পথের মধ্যপথে আমাকে এক সময় অত্যন্ত সচকিত করিয়া তুলিল।

বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, দশটা বাজিয়া গেছে। মুহূর্ত্তে সর্ব্বশরীরে তীব্র অবসাদ অনুভব করিলাম। তরুর অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া আজ অনায়াসে যাহার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলাম তাহার উৎসাহের সম্পূর্ণ আয়োজন অবহেলায় নষ্ট করিয়া দিলাম, তাহার জন্য এক্ষণে আমার মনে তীব্র লজ্জা বোধ হইল।

সারা রাস্তা ভাবিয়া চলিলাম, যে করিয়াই হোক আজ রাত্রেই অরুণার নিকট এ দুষ্কৃতি স্খালন করিতেই হইবে।

অরুণা যে এতক্ষণে অনুরাগ ছাড়িয়া বিরাগ সাধনায় চটিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে আমার কষ্ট হইল না।

সত্যই তাহার জন্য দুঃখও হইল, লজ্জাও হইল। মনে মনে উপায়-উদ্ভাবনের জন্য নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিয়া চলিলাম।

চট্ করিয়া একটা উপায় স্থির করিয়া ফেলিলাম। কতকটা নিজের মনেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—

—ইউরেকা! দ্যায়ার দ্যায়ার ইট ইজ! ইউরেকা!

একটা লোককে আনন্দাতিশয্যে ধাক্কা দিয়া একরূপ ভূতলশায়ী করিলাম। নিজের আবেগের ওজনটুকু বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অন্যের উপর দিয়া তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাইয়া লজ্জিত হইলাম।

দুঃখ জানাইয়া সবিনয়ে কহিলাম—বেগড্ টু বি পার্ডনড্ স্যার। হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, তাই ধাক্কাটা অসাবধানে লেগে গেছে, কিছু মনে করবেন না আপনি।

লোকটি ততক্ষণে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মৃদু হাসিয়া বলিল—হোয়েন টু পিগ্‌সে ক্ল্যাস—আপনি সামলে নিয়েছেন, আমি পারিনি। তাই পড়ে গেছি। কিন্তু অন্য-

মনস্ক আমিও হয়েছিলাম। সুতরাং দোষটা উভয়ত।

হাসিয়া আগাইয়া গেলাম।

বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সুরেন ডাক্তারের ঔষধালয়ে প্রবেশ করিলাম। রাত হইয়াছিল, এদিকটা নির্জ্জন। ডাক্তারের বসিবার ঘরটি অন্ধকার। ডাকাডাকি করিয়া সুরেনের নাগাল পাইলাম।

লোকটা যুবক, নূতন বিবাহ করিয়াছে। এ সময়ে ডাকিয়া ভালো করি নাই। কিন্তু অনুপায়ের বিচারজ্ঞান লইয়া চলিলে হইবে কেন।

তাহার হাতে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিলাম—তাড়াতাড়ি মাথায় একটা খুব ভালো করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিন। যাতে করে এই বোঝা যাবে, আমি মাথায় শক্ত আঘাত পেয়েছি।

সুরেন বিস্মিত হইল। ইহা যে আমার নিতান্তই ক্ষ্যাপামী ছাড়া অন্য কিছু নয়, তাহা সে যেন স্পষ্ট বুঝিল। তবু ওই দুইটি টাকাই যথেষ্ট। আমার এ পাগলামীকে সে প্রশ্রয় দিল।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চমৎকার হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিবার যো নাই যে, আমি সত্যিকারের আঘাত পাই নাই।

মনে মনে হাসিলাম।

এবার একটা পাকা অভিনয়ের জন্য মনকে স্থির করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম।

বরাবর অরুণাদের বাড়ীর ছোট আঙিনায় প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলাম অরুণার মা বলিতেছেন,—আর কতক্ষণ দেরী করবি। সুনীত তো বাড়ীতেও ফেরেনি। তুই যা, যা' হয় চারটে খেয়ে আয়গে। সুনীত হয়ত কোন সভা সমিতিতে আটক পড়েছে। আজ রাত্তিরে সে আসবে না হয়তো।

অরুণা উত্তেজিত সুরে বলিল—আমি তোমাকে বলে দিলুম মা, ওকে আর কক্ষণো এ বাড়ীতে ডাকতে পাবে না। সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত যার নেই, তার সঙ্গে আমাদের কোন বন্ধুত্ব নেই। ছিঃ! ছিঃ! এই কি মানুষ! সভা সমিতি না হাতী! তুমি জানো না মা, ওসব ওর ফাঁকি—হুঃ—বেশ—

শেষের দিকে অরুণা কথার তাল রাখিতে পারিল না, কণ্ঠস্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলাম—অরুণা!

অরুণা চকিতে বাহির হইয়া আসিল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমি নিঃশব্দে বাঁধান রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িলাম।

অরুণা আমাকে দেখিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল—মা, মা শীগগির এসো।

মা ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি আর্ত্তস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

ক্ষীণ সুরে বলিলাম—আজকের এ ব্যাপারের জন্য আমার দোষ ছিল না, অরুণা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

ব্যাকুল হইয়া অরুণা কহিল—কি করে এমন হল? কিন্তু এখানে নয়, চল ঘরে যাবে। বলিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার ঘরে আমাকে লইয়া আসিল।

কাৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

অরুণা আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়ে ছিল, গাড়ীর তলে পড়েছিলে?

উত্তর দিলাম—অন্যমনস্ক হয়ে চলেছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে একটা মোটর—বেশী চোট পাইনি। মাথায় আঘাত পেয়েছি। হসপিটাল-এ গিয়ে আমার মনে সান্ত্বনা ছিল না শুধু ভাবছিলাম আমার বিলম্ব দেখে তুমি আমাকে ভুল ন বোঝ। তাই যতটা তাড়াতাড়ি পেরেছি চলে এসেছি।

অরুণার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বলিলাম—জল।

অরুণার মা জল আনিতে প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম—বলো তুমি রাগ করোনি?

অরুণা নুইয়া প্রায় আমার মুখের কাছে মুখ আনিয় বলিল—এ জেনেও রাগ করবো, এতোই কি পাষাণ আমি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

বলিলাম—তুমি নিশ্চয়ই খাওনি।

চোখের জল চাপিয়া অরুণা বলিল—না।

বলিলাম—তা হলে খেয়ে এসো।

—তুমি? আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে?

—ব্যর্থ হবে না, অরুণা। এক ভাত ছাড়া অন্য তরকার এখানেই এনে দাও—উঃ! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম

অরুণার মা জল আনিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে মাথায় কি খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে সুনীত?

বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম—খুব বেশীই হচ্ছে।

তিনি বলিলেন,—তবে আজ রাত্রে কিছু না খেলে।

বলিলাম—যদি অরুণা কিছু মনে না করে মাসিমা, তাহ না খেলেই আমার পক্ষে ভালো।

অরুণা বলিল—তবে থাক।

আমি বাঁচিয়া গেলাম।

পরদিন এ মিথ্যা গোপন করিবার জন্য শহর ছাড়িয়া দাদার কাছে উধাও হইলাম। বলিয়া গেলাম জরুরী কাজ।

সেখানে দশ বারো দিন থাকিয়া আজ ফিরিয়া আসিয়াছি আসিয়াই অরুণার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

সঙ্গোপনে ডাকিয়া বলিলাম—দাদার কড়া হুকুম বামুন ঠাকুর বদলাতেই হবে। কেননা, বৌদি আসছেন, তাঁর আবা একজন সঙ্গী দরকার। সুতরাং তোমার কথাই বলি, কি বলো?

অরুণা চোখে-মুখে হাসির বন্যা ডাকিয়া চকিতে উ আমার উপর প্রবল বর্ষণ করিয়াও সকৌতুক লজ্জার ঝর বহাইয়া একটা অপরূপ রূপের প্লাবনের মধ্য দিয়া নিমি অন্যত্র অন্তর্হিত হইল।

পুলকিত অন্তরে ওই শিহরণের দোলাটুকু বহন করি আমিও তার পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম।

তাহার নিকট আসিতেই আমাকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিব পূর্ব্বে অরুণা গভীর লজ্জানুরাগে ফিক্ করিয়া হাসি ফেলিল।

আজ স্বীকার করিলাম, অরুণা অপরূপ, চমৎকার!

মাইনরিটি স্বার্থ ও মুসলিম স্বার্থ

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

মিষ্টার জিন্নাপ্রমুখে সাম্প্রদায়িক নেতারা মাইনরিটি স্বার্থ-রক্ষার নামে সকল প্রকার জাতীয় প্রগতির পথে কণ্টক সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহাদের বিবেচনায় মাইনরিটি স্বার্থ ও মুসলিম স্বার্থ এক ও অভিন্ন। জিন্না সাহেব প্রথমে মুসলিম স্বার্থেরই ধুয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে দেখিলেন, ইহাতে কাজ হাসিল হইবে না। মুসলমান ব্যতীত আরও অনেক সম্প্রদায় আছে তাহারাও সংখ্যায় মাইনরিটি। তাহাদের ভাগ্যের সহিত মুসলমানের ভাগ্যকে একসূত্রে জড়াইবার জন্য এখন তিনি সমগ্র মাইনরিটির পক্ষ হইয়া বিশেষ সুবিধার দাবী করিতে লাগিলেন; কিন্তু জিন্না সাহেব মুসলমানকে অন্যান্য মাইনরিটিদের সহিত একসঙ্গে জড়াইয়া হিসাবে একটি মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়াছেন। সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমান মাইনরিটি বটে, কিন্তু প্রাদেশিক হিসাবে মুসলমান সকল স্থানে মাইনরিটি নহে। কোথাও তাহারা মাইনরিটি আবার কোথাও তাহারা মেজরিটি। সুতরাং মাইনরিটি স্বার্থ বলিতে যদি মুসলিম স্বার্থকেও বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে যেখানে তাহারা মেজরিটি সেখানে মাইনরিটিদের সহিত তাহাদের সম্পর্কটা কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা আমরা প্রত্যেক মুসলমানকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি। মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা করা দরকার—বেশ ভালকথা। কিন্তু ন্যায় নীতির খাতিরে সমস্ত মাইনরিটি সম্প্রদায়ের জন্য একই রকম সুব্যবস্থা হওয়া দরকার। সীমান্ত, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙলা—এই চারিটি প্রদেশে মুসলমান মেজরিটি এবং অপরাপর প্রদেশে তাহারা মাইনরিটি। যেখানে মুসলমান মাইনরিটি সেখানে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেমন বিশেষ ব্যবস্থার দরকার, সেইরূপ যেখানে অ-মুসলমানগণ মাইনরিটি সেখানেও ত তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হইবে। এই চারিটি প্রদেশে বিশেষ ব্যবস্থার দাবীদার দু'একটি সম্প্রদায় নয়। সেখানে আছে হিন্দু, অনুন্নত হিন্দু, অ-হিন্দু, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদল, তদুপরি আছে জমিদার ও কলওয়ালা। এত সব মাইনরিটিকে সুবিধা দিতে গেলে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়া যাইবে, অথবা যদি কিছু থাকে তাহা কার্য্যকরী হইবে না। মুসলমান নিজের সংখ্যার জোরে গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিবে না। তাহাকে অবাঞ্ছিত দলের আশ্রয় লইতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাতটি প্রদেশে বিশেষ সুবিধা লইতে গিয়া মুসলমান চারিটি প্রদেশে পঙ্গু হইয়া যাইতেছে। বিশেষ সুবিধার কথা না উঠিলে এই চারিটি প্রদেশে মুসলমান অনন্যনির্ভর হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিত। সুতরাং বিশেষ স্বার্থ মুসলমানের কল্যাণের কারণ না হইয়া অকল্যাণেরই কারণ হইয়াছে।

সেইজন্য আমরা জোর গলায় বলিতেছি যে, মাইনরিটি সমস্যা প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের সমস্যা নহে এবং মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা হইলেই যে মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা হইবে এমন কোন কথা নাই। সমগ্র ভারতের চারিটি প্রদেশে মুসলমানের স্বার্থ মাইনরিটি স্বার্থ নহে। সমগ্র ভারতের যাহা সমস্যা এখানে মুসলমানেরও সেই সমস্যা। রাষ্ট্রীয় অধিকারই এখানে মুসলমানের মূল সমস্যা। এখানে তাহারা যেরূপ প্রবলভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার কার্যকরী করিতে পারিবে, অন্যত্র হয়ত সেরূপ পাইবে না; সুতরাং যত অধিক রাষ্ট্রীয় অধিকার ভারতবাসী পাইবে, ততই তাহারা লাভবান হইবে। কিন্তু মাইনরিটি সমস্যার ধুয়া তুলিয়া জিন্না সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটি প্রদেশের মুসলমানের সর্বকর্তৃত্ব পাইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। যদি দেশের কোথাও কোন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে অবস্থাটা কিরূপ হইত একবার ভাবিয়া দেখা যাক। অন্যান্য প্রদেশের কথা পরে আলোচনা করিব। যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেও এই চারিটি প্রদেশের আইন-সভায় মুসলমান প্রাধান্যই হইত। অথচ ইহা সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য হইত না। জাতীয় আদর্শে নির্বাচিত হইয়া সদস্যগণ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিতেন। মুসলিম প্রধান প্রদেশে মুসলমানের কর্তৃত্বাধীনে যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা মুসলমানের জন্য কোনও-রূপ অকল্যাণের কারণ হইত না। দেশের অধিকাংশ লোক মুটে-মজুর, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের আগে ইহাদেরই কল্যাণ করিত। এইভাবে দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতা ত দূর হইয়া যাইত, তাছাড়া সকল সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার ফলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারিত; কিন্তু সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উপর অহেতুক জোর দিয়া জনাব জিন্না সাহেব মুসলমানের মূল স্বার্থকে পদদলিত করিলেন। যদি কাহারও জন্য কোনওরূপ বিশেষ স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু প্রধান প্রদেশে মুসলমানের অবস্থা কিরূপ হইত তাহা আলোচনা করা যাক। ইহা খুবই সত্য যে, এই সব প্রদেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইবে। কিন্তু যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন হইবে বলিয়া হিন্দু সদস্যগণ মুসলমানের নিকট নানারূপ বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ থাকিবে। এই সব প্রদেশের ক্যাবিনেটে হিন্দু প্রাধান্য থাকিলেও তাহা হইবে নিছক জাতীয় ক্যাবিনেট। যেমন বাঙলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি মুসলমান প্রধান প্রদেশে মুসলিম প্রাধান্য থাকিবে, কিন্তু আসলে তাহা হইবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট, ঠিক সেইরূপ অবশিষ্ট সাতটি প্রদেশের ক্যাবিনেটের বাহ্যিক আকার হিন্দু রঙ্গে রঞ্জিত হইলেও তাহা হইবে মূলত জাতীয় ক্যাবিনেট। এই সাতটি প্রদেশে মুসলমান মাইনরিটি বটে, কিন্তু তাহারা এরূপ সজাগ ও প্রবল যে, কেহই তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশে প্রকৃত জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে বাধা দিয়াছে মাইনরিটিদের জন্য বিশেষ স্বার্থের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মুসলমানের উপকার ত করেই নাই বরং তাহাদের সর্বত্র পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, মাইনরিটি স্বার্থের সহিত মুসলমান স্বার্থকে জড়াইয়া জিন্না সাহেব নিতান্ত ভুল করিয়াছেন।

কি মুসলমান প্রধান প্রদেশে, কি হিন্দু প্রধান প্রদেশে, সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় অধিকার বলিতে জনসাধারণের অধিকার বুঝায়। রাষ্ট্রীয় অধিকার যতই সম্প্রসারিত হইবে, জনসাধারণের ততই লাভ হইবে। আর মুসলিম জনসাধারণ এই লাভের অংশ হইতে কোনও দিন বঞ্চিত হইবে না ভুলক্রমেও না। তাই বলিতেছিলাম যে, মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষা হইলে মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা হইবে না এবং মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে মাইনরিটি স্বার্থের কথা একদম ভুলিয়া যাইতে হইবে। বরং সমস্ত শক্তি দিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। শত প্রকার বিশেষ স্বার্থের প্রলোভন আসিলেও তাহাতে বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না। এই যে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার মুহূর্তেই আমাদের ব্রিটিশ সরকারগণ কেবল মাইনরিটি স্বার্থের ধুয়া তুলেন, তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি এখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই? মাইনরিটি সমস্যা ত আমাদের শাসকদের খেলার বস্তু! তাঁহাদের কথায় ভুলিয়া আমরা কেন নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিতে যাইব? বিগত দেড়শত বৎসর ধরিয়া যে ভেদ-নীতি আমাদের নাগরিক জীবনকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে, আজিও কি আমরা তাহার প্রভাবে পড়িয়া থাকিব? মাইনরিটি স্বার্থের অজুহাতে যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকিবে না। মাইনরিটি স্বার্থ পাইবার জন্য আমরা যতই চীৎকার করিতে থাকিব, ততই আমরা সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে জড়ীভূত হইয়া যাইব। সময় আসিয়াছে—জোর গলায় বলিতে হইবে আমরা কোনওরূপ বিশেষ স্বার্থ চাহি না। সমস্ত বিশেষ স্বার্থে পদাঘাত করিয়া অকুতোভয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।

সুখের সংসার

(গল্প)

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, এম-এস-সি

একটি সাধারণ গ্রামের সাধারণ ছোট একটি পরিবার।

সুখের সংসার তেমন নয় বটে, তবে দুঃখেরও নয়। স্বামী, স্ত্রী ও দুইটি ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া সংসার।

ছোট বাড়ী; তবে অভাব অভিযোগও কম। কাজেই একরকম ভালই চলিয়া যায়।

স্বামী কোন্ এক শহরে কি এক চাকুরী করে। সামান্য মাহিয়ানা। নিজের খরচ পোষাইয়া যাহা সে পাঠায়, তাহাতেই এই গ্রামের ঘরে চলিয়া যায়। উদ্বৃত্ত হয় না, তবে অপচয়ও নাই।

পূজার বন্ধে কয়েক দিন এবং বড়দিনের বন্ধে স্বামী বাড়ী আসে। সেই কয়দিনই সরমার বিশেষ আনন্দের দিন। অন্য সময়ে ছেলে মেয়েকে আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া, শাসন করিয়াই তার দিন কাটে।

পাড়ার লোকে বলে, এমন মেয়ে, দেমাকে তার পা' মাটীতে পড়ে না, তবু তো তার স্বামী সাধারণই একজন চাকুরে। এখনো তো দশ হাত সাড়ী ছাড়া এগারো হাত সাড়ী কোমরে উঠিল না। ইত্যাদি রকমের অনেক কথা।

সরমা সেগুলি শুনিয়াও শোনে না। তাহাতে তাহার অহঙ্কারের খ্যাতিটাই শুধু বাড়িয়া যায়। যায় যাক্, তার যে এই সোনার চাঁদ ছেলে আর হীরের টুক্রো মেয়ে—এই তো তার সব।

পাড়ার লোক ইহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করে। বলে, "আহা হা, অমন ছেলে মেয়ে যেন কারুর নেই—তবু তো কালো ছেলে আর কটা মেয়ে!"

সরমা শুনিয়া হাসে। সে স্বামী আসিলে বলে এই সব কথা। কমল শুনিয়া খুব জোরে হাসিয়া উঠে—বলে, "বলুক ওদের যা' খুসী—এই কালো ছেলেই একদিন এই গাঁয়ের মুখ আলো কর্‌বে।"

ভবিষ্যতের একটা রঙীন স্বপ্ন কমল আর সরমার মনে ছায়া ফেলিয়া যায়।

খোকন যেন বড় হইয়াছে। কত লেখা-পড়া সে শিখিয়াছে। দেশ বিদেশে তার নাম, যশঃ, খ্যাতি। তাহারা তখন এই পাড়াগাঁয়ে আর থাকিবে না। কলিকাতা বা ঐ রকম একটা শহরে মস্ত বড় বাড়ী তাদের। গাড়ী, ঘোড়া, চাকর চাকরাণীর কিছুরই অন্ত নাই।

সরমা খোকনকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া এই সব কথা ভাবে।

কমল একটু পরে বলে, "খোকনকে নিয়ে থাক্‌লেই আর কি হবে? এ জগতে আরও তো প্রাণী আছে। তারাও—"

সরমা অপ্রস্তুত হয়। লজ্জায় সে লাল হইয়া ওঠে।

সত্যিই তো! কমল কত দিন পরে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিয়াছে। সেখানে কত অসুবিধার মধ্যে কত কষ্টে সে তাহাদের জন্যই টাকা রোজগার করে। এখানে আসিয়াছে, এখন একটু আদর যত্ন না করিলে কি হয়? সে খোকনকে কমলের কোলে দিয়া কি যেন এক কাজে যায়।

কমল এক সময়ে বলে—"খোকন আর একটু বড় হলেই তোমাদের আমার ওখানে নিয়ে যাব। একটা ছোট দেখে বাসা কর্‌ব। কষ্টে সৃষ্টে ওতেই আমাদের চলে যাবে।"

সরমা ভাবে এ ব্যবস্থা বুঝি শুধু সরমার জন্যেই—সরমা এখানে অসুবিধাতে আছে মনে করিয়াই বুঝি কমল শহরে বাসা করার কথা বলিতেছে। সরমা লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া বলে—"না, না, সে কি, বেশ আছি আমরা এখানে। আমাদের কোনো অসুবিধে নেই তো।"

কমল বলে, "খোকনের লেখা-পড়া করতে হবে তো? তার পর, মিনুও বড় হয়ে এলো—এক-আধটু লেখা-পড়া, গান-বাজনা না জান্‌লে তো হবে না।"

সরমা একটু মলিনভাবে বলে, "ও, তাই তো।"

সরমা চলিয়া গেলে মিনু বাবার কাছে আসিয়া বলে, "আমায় একটা গ্রামোফোন্ কিনে দেবে, বাবা?"

গ্রামোফোন?—অবিনাশ চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় থাকে। পূজার সময়ে সে গ্রামোফোন্ সহ এই গ্রামে আসিয়া পূজার কয়দিন গ্রামবাসীদিগকে গ্রামোফোন্ শুনাইয়া যায়। কমল মিনুকে একটা চুমা খাইয়া বলে, "হ্যাঁ—সব পাবে তুমি।"

মিনু খুসীতে উৎফুল্ল হইয়া খোকনকে যাইয়া বলে, এবার তারা সত্যিকারের চুঙ্গীওয়ালা বড় সবুজ রং-এর গ্রামোফোন্ পাইবে। কল ঘুরাইয়া দিলেই সে কত রকম গান। কাঁঠাল পাতার তৈরী গ্রামোফোন্ তখন তাহারা ফেলিয়া দিবে। সত্যিকারের ভালো ভালো গান—'আমারে ভালবেসে আমারি লাগিয়া সয়েছ কত ব্যথা অপমান'—মিনতি আনন্দের আতিশয্যে খোকনের কাছে এই লাইনটি গাহিয়াই ফেলিল!

সকাল বেলাটা মিনু বিশেষ সময় করিয়া উঠিতে পারে না। বৎসর ছয়েকের মেয়ে অবশ্য—তবু, মাকে যা' দুই একটু সাহায্য করিতে পারে তাহাতেই সরমার অনেকখানি কাজের লাঘব হয়।

দুই একটা ছোট-খাট ফরমায়েস্। যেমন, ঐ ঘরে মাচার উপরে যে সেরটি রহিয়াছে—উহা আনিতে হইবে—দাইলের বড়ি ঐ যে ছায়াতে পড়িয়া গিয়াছে তাহা রোদে ঠেলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই জায়গাতে একটুখানি দাঁড়া—বিড়ালে মাছ খাইয়া ফেলিবে।

এই রকম নানা রকম ফরমায়েসেই সকাল বেলা কাটে। বৈকালটা কাটে পাড়ায় সমবয়স্কীদের সঙ্গে গল্প করিয়া। কোন্ পুতুলটি ভাল—কোন্ পুতুলের কবে বিবাহ দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন—গলার কাঁটা হইয়া রহিয়াছে—এই সব নানা দরকারী আলোচনা।

কিন্তু দুপুর বেলাটি একেবারেই কোনো কাজ থাকে না। সরমা সংসারের কাজ করিয়া একটুখানি সময়ের জন্য গড়াইয়া

নেয়। দুপুরের রোদ—পাড়াতে যাওয়া ভীষণভাবে নিষেধ। কাজেই ঘরে বসিয়া খেলিতে হয়।

লোকে একে খেলাই বলে। কিন্তু এটাও কম বড় কাজ নয়। পুতুলটা হয়তো সেই সকাল হইতে না খাইয়া শুধু ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতেছে। ইহা দেখা কি প্রয়োজন নয়? কাহারো হয়তো অসুখ হইয়াছে। উহার মাথা ধোওয়ানো আছে, ডাক্তার আসিবে—ঔষধ খাওয়ানো—পথ্য দেওয়া—সে সব অনেক হাঙ্গামা। মিনতির সারাটি দুপুর এই সব কাজে চলিয়া যায়;—এ পুতুল ছাড়িয়া ও পুতুল—একে কোলে লইলে ও কাঁদে—অনেক রকম মুস্কিল।

খোকন মিনতির পাশে বসিয়া থাকে। সে তার দিদির পুতুল খেলাতে সাহায্য করে। দুই এক সময়ে দুই একটা পুতুলকে কিছুক্ষণের জন্য ধরা—দুই একটা পুতুল খুব কাঁদাকাটি করিলে কোলেও নিতে হয়। অবশ্য সে এই সব কাজে মোটেই দক্ষ নয়, তবু মিনতির কথামত সে তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে।

কোনো কোনো সময়ে খোকন নিজেই জীবন্ত পুতুলের অভিনয় করে। হয়তো খোকনের জ্বর হয়। পাশের গ্রাম হইতে প্রবল ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিবে। মিনতি তারই পার্ট অভিনয় করে।

প্রবল ডাক্তার মোটা। মাথায় টাক। পকেটে ঘড়ি, জামার বোতামে তারই রূপার চেন। নীচের পকেটে ষ্টেথো-স্কোপের খানিকটা অংশ দেখা যায়। হাতে একটা ঔষধের ছোট বাক্স। ঘোড়ায় চড়িয়া রোগী বাড়ী যায়। লোকটি ভাল, বেশ হাতযশ আছে। টাকা পয়সা তেমন নেয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বিনা পয়সাতেও চিকিৎসা করেন।

একবার এই প্রবল ডাক্তারই সরমার কি একটা অসুখের সময় যেন আসিয়াছিল। মিনতি তখন বড়ই। সে এই প্রবল ডাক্তারের পার্টই অভিনয় করে।

খোকন শুইয়া থাকে; মিনু তার কোমরে কাপড় জড়াইয়া ভুঁড়ি দোলাইয়া হাঁটিবার ভঙ্গীতে পিঠ বাঁকা করিয়া হাঁটিয়া ধীরে ধীরে খোকনের কাছে আসে। মিনু খোকনের কপালে হাত দেয়, বুকে হাত দেয়, একটা যে-কোনো কাঠি খোকনের বগলে দেয়। মিনু খোকনকে দুই একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করে—যেমন খোকন এখন কেমন আছে, শীত করে কি না—ইত্যাদি। তার পর খোকনকে সে ঔষধ খাইতে দেয়। মাটীর ঔষধ, কাঁঠালপাতা পথ্য;—খোকন ভাল হইয়া ওঠে, এবং এ খেলা শেষ হয়।

এমনি তাদের জীবন। পুতুল খেলাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যস্ত থাকে খোকন ও মিনু; ইহাদিগকে লইয়া দিন কাটায় সরমা; এবং তাহাদের সকলকে লইয়া কমল শহরের এক ক্ষুদ্র অন্ধকার-প্রায় কামরায় বসিয়া বসিয়া সুখ-স্বপ্ন রচনা করে।

খোকন বড় হইয়া কি করিবে, তাহাদের অবস্থার আরও কত উন্নতি হইবে, মিনুকে কত ভাল ঘরে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইবে—অদূর ভবিষ্যতেই তাহারা কত সুখী হইয়া পড়িবে। তাহারা শীঘ্রই শহরে বাসা করিবে, এবং সবাই মিলিয়া খুবই সুখে থাকিবে। কমল এই সকল কথা ভাবে;—সে আরও ভাবে, মেসে থাকা কি রকম কষ্টকর, সরমার হাতের রান্না যে একবার খাইয়াছে, সে কি কখনো মেসে উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণের রান্নাতে তৃপ্ত হইতে পারে? সরমার আদর, সরমার স্নেহ, তার প্রীতি, ভালোবাসা যে একবার উপলব্ধি করিয়াছে, সে কি কখনো তাহাকে ছাড়িয়া সুখী হইতে পারে?

মাসে তিনখানা করিয়া সরমার চিঠি আসে। কমল কত আগ্রহ লইয়া সেই চিঠিগুলি পড়িয়া থাকে। চিঠি পড়াতে যে এত আনন্দ, এত সুখ তাহা কমল তো পূর্ব্বে মোটেই জানিত না। কি করিয়া কি হইল? কেন এমন হয়? সে জানিত না সংসার এতই সুখের।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসে দিন সাতেকের ছুটি লইয়া কমল বাড়ী আসিল। সরমা যাওয়ার সময় বারবার করিয়া বলিয়া দিল, এবার পূজার পরেই উহারা সকলে শহরে চলিয়া যাইবে; ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত। কমলও তাহাতে গররাজী নয়। ছোট দেখিয়া একখানা বাসা, দুইজন মানুষের তাহাতেই চলিয়া যাইবে, খুব হিসাব করিয়া চলিলে কমলের অল্প মাহিনাতেও কোন অসুবিধা হইবে না।

জ্যৈষ্ঠের পরে আষাঢ় চলিয়া গেল; শ্রাবণও যায় যায়। কিন্তু কমলের চিঠি প্রায় মাস দেড়েক সরমা পাইতেছে না। মাঝে মাঝে সরমার মন তাহাতে একটু চিন্তিত হইয়া পড়ে; সত্যই তো, এত দেরী তো বড় একটা হয় না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ভাবে, এটা নিশ্চয়ই কমলের দুষ্টুমি; আরও কয়েকবার কমল দুইমাস পর্য্যন্ত চিঠি না দিয়া সরমাকে কত চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই সব সময়, সরমাই প্রথমে চিঠি লিখিয়াছে—কত অনুযোগ দিয়া, কত অভিমান করিয়া চিঠি দিয়াছে।

সরমা ভাবে, এবারও হয়তো কমল তেমন দুষ্টুমিই করিতেছে; বাস্তবিকই পুরুষদের মন এমন ভালোবাসার জন্য কাঙ্গাল। তার দীনতা যেন ঘোচে না, স্ত্রীর ভালোবাসা কত-ভাবে পাইয়াও তার মনের ক্ষুধা মেটে না; সে যে স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে, তার স্ত্রী যে তার একান্ত আপনার, এই কথা সে বারে বারে পরীক্ষা করিয়া দেখে।

অমনি সরমার মনেও একটা দুষ্টুমির চিন্তা খেলিয়া যায়। সে মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলে, এবার আর সে আগে চিঠি দিবে না। প্রত্যেক বারই শুধু একটা লোক এমন চুপ করিয়া থাকিবে, আর প্রত্যেকবারই সরমা চিঠি দিবে? কিন্তু, কেন? এবার সরমা নিশ্চয়ই প্রথম চিঠি দিবে না, সে-ও এবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, কমলের সে কতখানি। যেমন দুষ্টু তেমনি তার সাজা।.........

ছোট সংসারটির কাজকর্ম্ম যখন শেষ হয়, সে সময় সরমা কমলের জন্য মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তাও যে না করে, তেমন নয়। কমল ভাল আছে তো? শহর—বিদেশ—বিভুঁই। কোনো অসুখ, বিসুখ, কিম্বা কোনোরকমের বিপদ, অ্যাক্-সিডেণ্ট? সরমার মন চম্‌কিয়া উঠে। না, না, সে কি কখনো হয়? তার স্বামী—তার কমল, সে কি কখনো—?

অনেক চেষ্টা করিয়া সে মনকে শান্ত করে। সে ভাবে, না, আর অপেক্ষা করিয়া কোনো কাজ নাই। চিঠি না হয় সে-ই প্রথমে লিখিবে। তাতে কি? সে তো স্ত্রী—সে তো কমলের চেয়ে কত ছোট, আর কমল যে তাকে ভালোবাসে না এমন তো নয়—তবে মিছামিছি চুপ করিয়া থাকিয়া লাভ কি? কিন্তু, পরক্ষণেই তার মনের সেই দুষ্টুমির ভাবটি সজাগ হইয়া পড়ে, —সে স্ত্রী, তাই কি? সে-ই শুধু একটা লোকের কথা সব সময় ভাবিবে, আর সেই লোকটা শুধু শহরে নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবে, এবং দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলে জলের মত মিথ্যা কথা বলিয়া যাইবে যে সে তাহাকে ভালোবাসে, আর তাহাদের কথা খুব ভাবে? তাই যেন হইল আর কি!

যে মন ভালোবাসে, সেই মনের এই অভিমানের দিকটা সরমাকে আর চিঠি লিখিতে দেয় না। অনেক রাত্রিতে, সবাই যখন ঘুমায়, সমস্ত পাড়াটি যখন নিস্তব্ধ, যখন আকাশের শুধু তারারাই জাগিয়া থাকে, সরমার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সেই সময়ে কমলের কথা তার মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই মানুষটি কত সুন্দর—কত ভাল—কেমন ছেলেমানুষ। আরও মনে পড়ে তার কত পাগলামির কথা, কত ভালোবাসার খুনসুটির কথা। ছেলে-মেয়েদের গায়ে সরমা খুব স্নেহের সাথে হাত বুলাইয়া দেয়, ছেলেটিকে বুকের কাছে আরও জোরে চাপিয়া ধরে। কত কি যে তার মনে হয়।......

মিনতি আর খোকন অঘোরে ঘুমায়, ওরা কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না, নিস্তব্ধ রজনীর এই সব চঞ্চলতার কথা। সরমা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরে, তার ছোটো গালে গাল রাখিয়া চোখ বুজিয়া থাকে। তার সমস্ত মন কমলের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, কবে সে আসিবে।.........সরমা ভাবে—তাহারা শহরে চলিয়া যাইবে, এই পূজার পরই। ছোট এক-খানা বাড়ীর স্বপ্ন সে দেখে—দুইখানা কি তিনখানা ঘর, একটা পাকের ঘর, জলের কল, বাথরুম। দোতালা বাসা—পূব দিকটা খোলা। বেশ ভাল। সেই বাসাতে তাদের কোনো অভাব নাই, অভিযোগ নাই—কত সুখেই যে তাহাদের দিন-গুলি সেখানে কাটিয়া যাইবে......

এমনি নানা রকম সুখের চিন্তা আর রঙীন কল্পনার মধ্য দিয়া শ্রাবণের সবগুলি দিনই চলিয়া গেল। আকাশে মেঘ করিয়া আসে, আর মানুষের মনে কত রকমের চিন্তা দল বাঁধিয়া আসে,—কত কি সে ভাবে। অবিশ্রান্ত বর্ষণের এক-টানা সুরের সাথে সুর মিলাইয়া মানুষের মন ব্যথার গান রচনা করে,—সমস্ত মন নিঃস্ব হইয়া প্রিয়তমের সঙ্গ কামনা করে—তার কথাই সে শুধু ভাবে—কবে সে আসিবে।

কিন্তু, পয়েলা ভাদ্র সরমার কাছে খবর আসিল যে চল্লিশ দিন একটানা রোগভোগের পর গত বাইশে শ্রাবণ কমল হাস-পাতালে মারা গিয়াছে।

রাঙামাটীর পথ

(৪৬৬ পৃষ্ঠার পর)

সে চুপ করে বসে রইলো।

আশেপাশে আরো এমনি প্রমোদের তুফান-বন্যা। বিদেশী বিদেশিনীদের লাস্য-ভাষ্য...বাঙালীও আজ ওদের সঙ্গে খাসা পাল্লা রেখে চলেছে।

পান-ভোজন শেষ হলে বেয়ারাকে দাম চুকিয়ে বিমলকান্তি বললে—আমাকে ক্ষমা করুন...এখানকার এ গোলমাল আমার ভালো লাগছে না...

—কি করবেন?

—সিনেমায় ভালো ছবি নেই?

—যাবেন?

—চলুন।

কাশানোভা ছেড়ে দুজনে বাইরে এলো।

বিমলকান্তি বললে—কাল গিয়েছিলুম এম্পায়ারে...

অলকা বললে—তাহলে আজ চলুন এলফিনষ্টোনে... একখানা জাঙ্গল পিক্‌চার আছে...বেশ wild romance...মন্দ লাগবে না...pleasant diversion হবে।

—চলুন।

দুজনে এলো এলফিনষ্টোনে। অলকা যাচ্ছিল টিকিট কিনতে, বিমলাকান্তি বললে—না। আমি টিকিট কিনবো... আমি হোষ্ট্‌, আপনি আমার গেষ্ট।

মৃদু হেসে অলকা বললে,—বেশ!

বায়োস্কোপ ভাঙলে দুজনে বেরিয়ে এলো। বিমল-কান্তি বললে,—ছবি দেখে আনন্দ হয়! কিন্তু বাস্‌রে, ঐ বদ্ধঘরে ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ থাকা...মাথা যা ধরেছে,—ওঃ!

কথাটা বলে সে চাইলো অলকার পানে; বললে—আপনারো মাথা ধরেছে নিশ্চয়?

অলকা বললে,—না।

বিমলাকান্তি বললে,—আমি বনদেশে থাকি, দেখা অভ্যাস নেই! বুনো মাথা...সহরের বাতাসে মাথা ঠিক সুস্থ থাকে না!

হেসে অলকা বললে—আমার মাথাও একদিন ভয়ঙ্কর অসুস্থ হতো...প্রথম-প্রথম! এখন ঠিক হয়ে গেছে। বদ্ধ-অন্ধকার বলুন, আর ড্যাজ্‌লিং-ব্রাইট আলো বলুন, সব সয়।

(ক্রমশ)

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

(ভ্রমণ কাহিনী পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

—সাত—

পশ্চিম ভারতের গিরি-মন্দির কার্লি

ভারতবর্ষের গুহা-মন্দিরগুলির বিশেষত্ব সম্বন্ধে এবং ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলা সহজ নহে এবং অনেকটা সময়েরও প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বহু গিরি-মন্দির রহিয়াছে, সে সমুদয়ের বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। আমি পশ্চিম ভারতের যে কয়েকটি গুহা-মন্দির দেখিয়াছি, একে একে তাহাদের কথাই বলিব। এই যে গিরি-মন্দিরগুলি, এ সমুদয়ই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উত্থান ও পতনের সমসাময়িক বলিয়া এইগুলির ইতিহাস বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যমুনির কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যাঁহার বংশগৌরব, তেজোদীপ্ত কামকান্তি, অসাধারণ বাগ্মিতা, সংযম ও কঠোর তপস্যা দেখিয়া ভারতের অসংখ্য নর-নারী বৌদ্ধ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিল, আশ্রয় করিয়া তাহারা ধন্য হইয়াছিল। কেন তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কারণও সুস্পষ্ট।
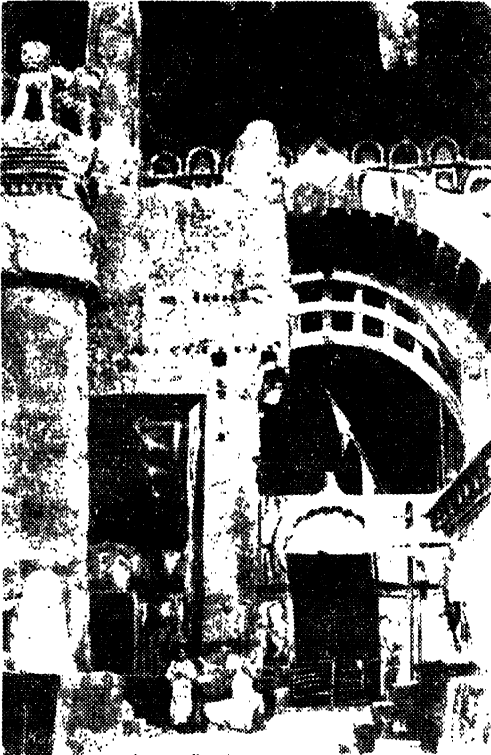
কার্লি চৈত মন্দিরের সম্মুখভাগ—পার্শ্বে সিংহস্তম্ভ

বৈদিক যুগে কর্ম্ম-বিভাগ অনুযায়ী যে বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনরূপ সংকীর্ণতা বা অনুদারতা ছিল না, কিন্তু ক্রমশ আর্য্যাদিগের অনাড়ম্বর দেব-পূজার মধ্যে ব্রাহ্মণ রচনার কাল হইতে বিবিধ জটিলতার বৃদ্ধি পাইল। সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণ, অনার্য্য বর্ণের উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পাইল। এমনকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পূজার আড়ম্বর, বিবিধ যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি, এমনকি নরবলি পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হইল। সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার যখন বিশেষভাবে জন-সমাজকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল, তখন ভারতের নানা স্থানে বিবিধ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল এবং তাহারা ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দেবতার নামে জীব হত্যা, এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান অনেকের প্রাণে বেদনার সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে ভারতবর্ষে জৈন ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর জনগণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত জাতি-ভেদের নিপীড়নে নিতান্ত নিরুপায় ও ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রধান হইয়া উঠিতে থাকে। এই দুই সম্প্রদায়ই অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং বিশ্বজনীন প্রেমের মহাবাণী ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোর বিধানকে ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কঠোর সংযম এবং অনশন ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক শাক্যমুনি দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই মহাসাধক স্ত্রী, পুত্র, পরিবার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব-মানবের কল্যাণ কামনায় সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে তিনি বুদ্ধ-গয়ার নিকটবর্ত্তী একটি অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে সমাধিস্থ হন এবং তদবস্থায় তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ শব্দ বুধ্ ধাতু হইতে উদ্ভূত। বুধ্=জ্ঞান।

পন্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা বলিতে যাইয়া বলেন,—বেদান্ত ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রেষ্ঠ সাধনার পর স্বর্গ লাভ করিবার পর আত্মা পুনরায় জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম মানুষকে এই যে 'জন্ম বারেবার' সেই মহাদুঃখ হইতে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে, নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া দিয়া থাকে। বুদ্ধদেব জাতি-ভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মফল বিনাশপ্রাপ্ত হয়; সেজন্য কায়, মন ও বাক্যের পবিত্রতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কেননা কর্ম্মফল ভোগ করা মানব মাত্রেরই ধর্ম্ম। কর্ম্মফল দ্বারা মানুষ পাপ শূন্য হইলেই সর্ব্বপ্রকার পাপ মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। মানুষ মাত্রেই নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী। সেখানে জাতি বা বর্ণের কোনও ভেদ নাই। বুদ্ধদেব উপবাসাদি কঠোর ব্রত সাধন নিষেধ করিয়াছেন এবং আলস্য, আমোদ-প্রমোদ বা ভোগ-বিলাসেরও বিরোধী ছিলেন। এই মধ্যবর্ত্তী পথই তাঁহার মতে অবলম্বনীয় ছিল। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বাণীই তাঁহার ধর্ম্মের মূলসূত্র।

জৈন ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিকট ঋণী। উভয় ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুঃখবাদ অর্থাৎ জীবন ধারণ দুঃখের কারণ এই সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদকে মানিয়া লইয়াছেন। বৌদ্ধ এবং জৈন সন্ন্যাস-জীবনের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরিব্রাজগণের আশ্রম-জীবনের সামঞ্জস্যও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের অনেক পরে মৌর্য্য বংশের তৃতীয় নৃপতি অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে বৌদ্ধ শ্রমণদের নির্জ্জন স্থানে বাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল। যাহাতে জনসাধারণের সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া নিশ্চিন্তভাবে তপস্যা করিতে পারেন, সেজন্য মহানুভব নৃপতি অশোক পর্ব্বত দেহ খোদিত করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট অশোক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই সমুদয় গিরি-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে যে সকল লিপি বা অনুশাসন খোদিত করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুশাসন-লিপি অতি প্রয়োজনীয় এবং ইতিহাস রচনার দিক্ দিয়া অতিশয় মূল্যবান। অনুশাসন পাঠে আমরা সেকালের লোকের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিতে পারি। এখানে আর একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে। জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমসাময়িক, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জৈন ধর্ম্ম ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপর তেমন প্রভাব

বিস্তার করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের পর বা সমকালে উহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরাই সকলের আগে গুহা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এজন্য আমরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বৌদ্ধদের নির্ম্মিত গুহা-মন্দিরের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাই।

কবি, সম্রাট অশোকের কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হইতে জলধি শেষ!" ইহা অত্যুক্তি নহে। মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিক বঙ্গ—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজের নেলোর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোথায় কোন্ সুদূর উত্তর-পশ্চিমে হেলমুন্দ নদী, কোথায় দক্ষিণে পেন্নার নদী, উত্তরে হিমালয় এবং উত্তর-পূর্ব্বে করতোয়া পর্য্যন্ত অশোকের বিরাট সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি কয়েকটি তামিল রাজ্য ব্যতীত একরূপ সমগ্র ভারতবর্ষই অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

অশোকের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। পাটলীপুত্রের কিছু দূরে সর্ব্বপ্রথম কয়েকটি গিরি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিহার প্রদেশের বারাবার, রাজগৃহ বা রাজগির; উড়িষ্যার কটক জেলার গিরি-মন্দিরগুলিও মহারাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পশ্চিম ভারতের গুহা-মন্দিরের সংখ্যা এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত সমুদয় গিরি-মন্দিরের সংখ্যা নির্ণীত হইলে এক পশ্চিম ভারতেই গিরি-মন্দিরের সংখ্যা প্রায় এক সহস্র পরিমাণ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

পশ্চিম ভারতের এই সমুদয় গিরি-মন্দির-গাত্রে প্রাচীন ভারতের শিল্প, রীতি-নীতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে জানিতে পারা যায়। সে সময়ে ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও জৈন ধর্ম্ম এই তিন ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল। এই সমুদয় গিরি-মন্দিরের গাত্রের লিপি পাঠে তিনটি ধর্ম্মেরই উত্থান ও পতনের ইতিহাস জানিতে পারি। এক সময়ে বৌদ্ধ পতাকা কিরূপে দেশে-বিদেশে উড়িল, কি করিয়া সমগ্র ভারতব্যাপিয়া ইহা প্রধান ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং আবার কেমন করিয়া উহার মধ্যে পৌত্তলিকতা আসিয়া প্রবেশ করিল, এই সকল অনুশাসন আজ সেই কথাই বলিতেছে। কি করিয়া ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের ও জৈন ধর্ম্মের সম্মিলিত সংঘর্ষে পড়িয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাইতে আরম্ভ করিল, আজ এই সব গিরি-মন্দির সে গোপন কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছে। অতীতের কথা আর গোপন নাই, অতীত এই গিরি-মন্দির-গাত্রে খোদিত লিপির মধ্য দিয়া সকল কথাই বলিতেছে।

ঐতিহাসিক কিথ্ [A. Berriedale Keith D. C. L. D. Litt.] বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার সম্পর্কে অশোকের যে কত বড় কৃতিত্ব ছিল, সে কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন:—

"It would be idle to deny the great impetus given to Buddhism by his patronage, which enriched the order and encouraged it to spread and develop its activities. ....all credit is due to Asoka for his encouragement of the missionary efforts of the Buddhists, for as fate had it Buddhism was to find out India a permanence of popularity denied to it in its own home."

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৬ অব্দে অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতে কোনও গিরি-মন্দির ছিল বলিয়া জানা যায় না। অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লইয়া একটি বিরাট সভার আহ্বান করেন। সেই সময় একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা হইল ও ধর্ম্মমত নির্দ্ধারিত হইল, তেমনি অশোক বৌদ্ধধর্ম্মমত দেশে দেশে প্রচার করিবার জন্য কাশ্মীর, কান্দাহার, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, মণিমণ্ডল বা কঙ্কণ, দাক্ষিণাত্য, হিমবন্ত বা নেপাল, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন, এমনকি তিনি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে কতিপয় সঙ্গিনীসহ বোধিদ্রুমের একটি শাখাসহ সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অশোকের প্রচারকগণের প্রভাবে পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে গিরি-মন্দির গড়িয়া উঠিল। কাথিয়াবাড় বা প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে, কন্হেরি প্রদেশে, পুনা জেলার অন্তর্গত জুনার তালুকে, পুনা জেলার অন্তর্গত মাডাল নামক তালুকে, কার্লির পূর্ব্বভাগে ভজ নামক স্থানে, কঙ্কণ প্রদেশের পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্র ও পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থান,—কুড়া, নিবার, চিপলেন নামক স্থানে প্রায় আশীটি গুহা-মন্দির আছে। নাসিকের গুহা-মন্দিরও বিশেষ বিখ্যাত। বোম্বাই প্রদেশের সীমান্তে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত অজন্তা ও ইলোরায় অনেক গুহা-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

এইবার আমরা পুনরায় কার্লির গুহা-মন্দিরের কথা বলিতেছি।

কার্লির গুহা-মন্দিরগুলির নানাস্থানে বহু খোদিত লিপি পাওয়া যায়। এই গুহা-মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, এখানকার এই মন্দিরগুলি নানাজনের অর্থ সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বারেন্দার বামদিকের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, বৈজয়ন্তী নিবাসী শেঠ ভূতপাল নামক এক ব্যক্তি জম্বুদ্বীপের অর্থাৎ ভারতবর্ষের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গিরি-মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'বৈজয়িন্তী' নামটি জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য তাম্রশাসনেও পাওয়া যায়, সম্ভবত বৈজয়িন্তী নামধেয় এই নগরীটি মহীশূরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কোথাও অবস্থিত ছিল। ভূতপাল শেঠ যেমন এই গিরি-মন্দিরটি নির্ম্মাণের জন্য বেশীর ভাগ টাকাকড়ি দিয়াছিলেন, তেমনি অনেক ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও ইহার নির্ম্মাণকল্পে যথাশক্তি অর্থ সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। সেই সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আপনাদের নাম-পরিচয় দরজার গায়ে, মূর্ত্তির গায়ে, ভিতরে ও বাহিরে সযত্নে খোদিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। প্রত্যেকে কে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাও খোদিত রহিয়াছে। বারান্দার দক্ষিণ দিকে যে হাতীটি আছে তাহার গায়ে খোদিত লিপিটি হইতে জানিতে পারি যে, ধেনুককাতি (Dhenukkati) নগরবাসী ইন্দ্রদেব নামক একজন গন্ধবণিক ও ভিক্ষুগণের অর্থ সাহায্যে কিছু কিছু অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কোন একটি অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, ভদাশম নামধারী একজন শ্রমণও এই মন্দিরের কোন একটি ক্ষুদ্র অংশ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

সিংহস্তম্ভটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন অগ্নিমিত্র নামক একজন মহারথী। চৈত্য-মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের বাঁ দিকের বা উত্তর দিকের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভটি ধেনুককাতা নিবাসী একজন যবনের অর্থ সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। পঞ্চম স্তম্ভটি সাতীমিত্র নামক একজন বৌদ্ধ প্রচারকের অর্থ সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। সাতীমিত্র সোপারক (soparaka) বা বর্ত্তমান সুপারার অধিবাসী ছিলেন। সুপারা বর্ত্তমান সময়ে বেসিন হইতে অল্প কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। চৈত্য-মন্দিরের সপ্তম স্তম্ভটিও ধেনুককাতা নগরবাসী একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইভাবে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী বহু দানশীল ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে এই অপূর্ব্ব গিরি-মন্দিরটির স্তম্ভ, অলিন্দ, মূর্ত্তি, রেলিং, দ্বারদেশ, বিহার, চৈত্য, দাগোবা সব গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল দাতার মধ্যে অধিকাংশেরই বাসস্থান—ধেনুককাতা। ইহার দ্বারা কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কার্লি হইতে ধেনুক-

কাতা বহু দূরবর্ত্তী স্থান নহে। জেনারেল কানিংহামের মতে—ধেনুককাতা কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী একটি প্রাচীন নগরী। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনৎ সাং বা ইউ-য়ান-চাং নামক বিখ্যাত চৈনিক পর্য্যটক যখন এদিকে আসিয়াছিলেন, সম্ভবত সে সময়ে তিনি এই ধেনুককাতা নগরীতেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইউ-য়ান-চাং তাঁহার ভ্রমণ বিবরণীতে এই নগরীকে Kie-tse-kia (Dhanakataka) বা ধনকটক নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নগরীর নামটির পালি উচ্চারণ হইতেছে ধমনকটক। ধেনুককাতা নামের সহিত সাদৃশ্য বড় অল্প। ক্যানিংহাম বলেনঃ—

"Equivalent to Dhamnakataka—sanskrit Dhanyakataka—the city of wealth or of the wealthy—Daulatabad."

এই চৈত্য-মন্দিরটি নির্ম্মিত হইবার পর, অনেককাল পর্য্যন্ত যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমরা সঠিকভাবে জানিতে পারি। আর বিহারগুলি সব কয়টিই হীনযান সম্প্রদায়ের একদল সংঘ বা শ্রমণগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা মহারাজারা এই সংঘের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ
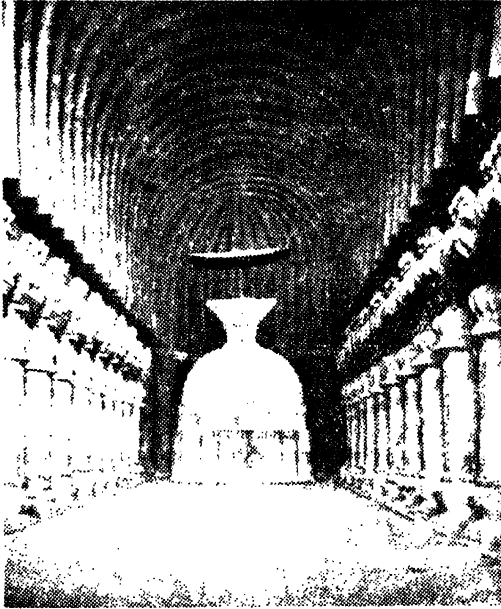
কার্লির চৈত্য মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ

সাহায্য করিতেন, গ্রাম দান করিতেন যেন এই সংঘের অধিবাসী শ্রমণগণ নিরাপদে নির্ব্বিঘ্ন মনে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া জগতের কল্যাণ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, দেশে দেশে মহদ্ধর্ম্মের পুণ্যবার্ত্তা প্রচার করিতে পারেন। কার্লি পাহাড়ের নীচে বিহার-গাঁও নামে একটি গ্রাম আছে, এই গ্রামটি অনেককাল হইতেই এই গিরি-মন্দিরবাসী ভিক্ষুগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর কি ভাবে উহা হস্তান্তরিত হইল, সেই ইতিহাস বলা কঠিন—ঐতিহাসিকদের মতেঃ—"Of which we have no record."

কার্লির একটি লিপি হইতে জানিতে পারি, নাহপানের জামাতা ঊষাভদত্ত [Usabhadata] করজিকা [Karajika] নামক একখানি গ্রাম এই সংঘে দান করিলেন। ঐ গ্রামের উপসত্ত্ব হইতে যেন শ্রমণগণ বর্ষাকালে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া নিরাপদে এই গিরি-মন্দিরে ও বিহারে বাস করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারেন।

বিহার গুহগুলির উপরে ও নীচে অনেক খোদিত লিপি রহিয়াছে, কোনটি এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে, কোনটি একেবারে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নীচের দিকের একটি বিহারের গায়ের খোদিত লিপির যেখানে দাতা—নৃপতির নাম ছিল, সেই নামটি একেবারে অবলিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই নৃপতি আর কেহই নহেন, বশিষ্ঠ পুত্র পুলমায়ী [Vasistha putra Pulamayi] তাঁহার লিপি হইতে জানা যায় যে, নৃপতি বশিষ্ঠ পুত্র পুলমায়ী তাঁহার রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষ বয়সে কার্লির মহাসংঘকার শ্রমণগণকে করজিকা গ্রামখানির স্বত্ব দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন। সম্ভবত করজিকা গ্রামটি বেদশা গিরি-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সেকালের কোনও একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ছিল।

অন্ধ্রনৃপতি বশিষ্ঠ পুত্র পুলামায়ীর আর একটি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি করজিকা ব্যতীত আর একটি সমৃদ্ধ পল্লী এখানকার মহাসংঘিকার অন্তর্ভুক্ত ভিক্ষুগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছেন। অন্ধ্র সাতবাহন বংশের নৃপতিরা জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না বরং সেই ধর্ম্মের পোষকতা করিতেন। বশিষ্ঠ পুত্র পুলুমায়ীর কার্লি গিরি-মন্দিরের অনুশাসন হইতে সে কথা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

চৈত্য-মন্দিরটির সম্মুখ ভাগে কাঠের কাজ, দরজার উচ্চতা ও গঠন-নৈপুণ্য, স্তম্ভ, স্তম্ভের কারুকার্য্য, প্রস্তরবেদী সমুদয়ই শিল্পীর শিল্পজ্ঞান ও কলা-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। এই মন্দিরের মূর্ত্তিসমূহ, কি স্তম্ভের পুরোভাগে, কি দ্বার পার্শ্বে, কি অলিন্দের গায়ে, কি দেওয়ালের গায়ে সর্ব্বত্রই একটা বৈশিষ্ট্য সহকারে বিদ্যমান। এই মন্দিরের প্রাচীনকালের মূর্ত্তি ইত্যাদি সমুদয়ই শিল্পীর কৃতিত্ব পরিচায়ক।

কার্লির কয়েকটি বিহারের অবস্থা একেবারেই ভাল নহে—পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ভাষায়ঃ—"Some of the Vihars at Karle are much ruined, the best being preserved the upper storeys." একটি বিহার দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের বাঁকে অবস্থিত—সেখানে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নহে। এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগও সতর্ক করিয়া বিজ্ঞাপনী দিয়াছেন।

বারান্দার প্রত্যেকটি স্তম্ভ ২ ফিট ৮ ইঞ্চি পরিমিত বৃত্তাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্ধ্রনৃপতি পুলুমায়ী আনুমানিক খৃষ্টির দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করেন, কাজেই কার্লির গিরি-মন্দিরের কয়েকটি ১৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কিথ্ সাহেব কার্লির চৈত্য-মন্দিরটির বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেনঃ—

"Like the still earlier ascetics, the early mendicant Buddhists found shelter in the rainy season in the natural caves which later they elaborate into monasteries with shrines and temples. The finest of these is at Karli in the Western Ghats. It has a well-proportioned nave about the size of the choir of Norwich Cathedral, with massive pillars separating it from an enclosing aisle. The roof is of teak and of the same age as the temple. Under the dome of the apse, so set that the light falls on it from the great stone window over the entrance, is a solid, rock-hewn stupa symbolising the Buddha."

এই চৈত্য-মন্দির পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নাই। হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ প্রাচীন গুহা-মন্দিরে যে সকল

(শেষাংশ ৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হিন্দু সমাজের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(৩)

এই জাতিভেদের আবির্ভাবের ফলে ভারতের হিন্দু সমাজের দেহ যে এককালে বহুল পরিমাণে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আর্য্যেরা প্রথমত বিজিত ও অনুন্নত অনার্যদিগকে শূদ্ররূপে সমাজদেহে স্থান দিয়া যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ণভেদ এবং উহার অনিষ্টকর পরিণাম জাতিভেদের জন্য তাঁহাদের সেই মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল,—হিন্দুসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী হওয়া দূরে থাকুক, উহার মধ্যে নানাবিধ ভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হইল। জাতিভেদের এই অনিষ্টকর পরিণামকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা হয় সর্ব্বপ্রথম জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষ হইতে। এই দুই ধর্ম্মের মূল নীতিই সাম্য ও মৈত্রী। জাতিভেদের বিরুদ্ধে, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ইহারা উভয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষভাবে এই কার্যসাধন করে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৪ শতক হইতে খৃষ্টাব্দ প্রায় ৮ শতক পর্যন্ত প্রায় ১২০০ শত বৎসর-কাল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল; —ঐ প্লাবনে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, জাতিভেদের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আরও নানাভাবে হিন্দু সমাজ তথা ভারতের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সমস্ত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সনাতন ধর্ম্ম বা 'সদ্ধর্ম্ম' বৌদ্ধ ধর্ম্মের তুলনায় তখন ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, দ্বিজাতি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব প্রতাপ ও প্রভুত্ব আর ছিল না,—জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে একটা সাম্যের আদর্শও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্তু খৃষ্টাব্দ ৮ শতক হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে এবং হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান বা নব অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। ইহার কারণ একদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন এবং বৌদ্ধসঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, —অন্যদিকে হিন্দুসমাজে শঙ্করাচার্য্য, কুমারিলভট্ট প্রভৃতি অশেষ প্রতিভাশালী ধর্ম্মাচার্য্য-গণের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনোন্মুখ সৌধে ইঁহারা যে প্রবল আঘাত করিতে লাগিলেন, উহা প্রতিহত করিবার শক্তি ঐ জরাজীর্ণ ধর্ম্ম ও সমাজের ছিল না। অবশ্য এই কার্য্য ২।৪ বৎসরে হয় নাই, উহা সম্পন্ন করিতে ২।৩ শতাব্দী লাগিয়াছিল। তীক্ষ্নবুদ্ধি ধীরমস্তিষ্ক ব্রাহ্মণ মনীষী ও ধর্ম্মাচার্য্যেরা অপূর্ব্ব কৌশলে বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ দেবদেবীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত করা হইল; বৌদ্ধ মন্দির হিন্দু মন্দিরের মধ্যে আত্মগোপন করিল; বৌদ্ধ আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতি নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া হিন্দু পূজা-পার্ব্বণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মিশিয়া গেল। এমন কি হিন্দু দার্শনিকেরা বৌদ্ধ দর্শন ও মতবাদ পর্যন্ত বেমালুম হজম করিয়া ফেলিলেন।

বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সময় লাগিয়াছিল। কেননা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এত বেশী আধিপত্য বিস্তার করে নাই। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্মের নবজাগরণ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হইয়াছিল, কিন্তু বাঙলাদেশে একাদশ এমন কি দ্বাদশ শতাব্দীরও কিয়দংশ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশের সনাতনপন্থী হিন্দুরা বৌদ্ধাচার-প্লাবিত বাঙলাদেশকে রীতিমত অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। বাঙলাদেশের একাধিক হিন্দুরাজা বৈদিক যজ্ঞ-হোমাদি অনুষ্ঠান করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, কেননা বাঙলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন না; —এইরূপ জনশ্রুতি ইতিহাসের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। বাঙলাদেশের তখনকার অবস্থা বিবেচনা করিলে এই জনশ্রুতি অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বাঙলাদেশের পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সেন রাজগণের সময়েই প্রথম হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয় এবং যতদূর জানা যায়, রাজা বল্লাল সেনের সময়েই হিন্দু ধর্ম্মের পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরিয়া আসে। রাজা বল্লাল সেন নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাতেও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বল্লাল সেন তাঁহাদের সহযোগিতায় হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করেন এবং নূতন করিয়া জাতিভেদের পত্তন করেন। আমরা বলিয়াছি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্মের পুন-প্রতিষ্ঠা তাহার দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ঐসব প্রদেশেও সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, কি বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধাচারের অবসানের ফলে প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে জাতিভেদ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রবলাকার ধারণ করিল। বৃত্তিভেদ অনুসারে নানা নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইল, উচ্চ-নীচ ভেদ আরও আত্যন্তিক হইল। প্রাচীন বর্ণাশ্রমের ধারা বহুপূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তাহার স্থানে হিন্দু সমাজে দেখা দিল অসংখ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন জাতি উপজাতি শাখাজাতি। রাজা বল্লাল সেন বাঙলাদেশে যখন নূতন করিয়া হিন্দু সমাজ বন্ধন করিলেন, তখন তিনি নাকি ছত্রিশটি জাতিতে সমাজকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল,—ভাগ-উপভোগ, শাখা-প্রশাখা ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

বল্লাল সেনের কয়েক শতাব্দী পরে ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা-দেশে নূতন করিয়া আবার সমাজ-বন্ধন করিলেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। তখন বোধ হয় ছত্রিশ জাতিতে কুলাইতেছিল না, উহার সংখ্যা কমপক্ষে ২৩৬-এ গিয়া পৌঁছিয়াছিল। বর্ত্তমানে ডাঃ ভগবান দাসের হিসাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত জাতি, উপজাতি, শাখা জাতি প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। অবস্থাভিজ্ঞমাত্রেই বলিবেন, ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। এক বাঙলাদেশেই যত রকম সম্ভব অসম্ভব বৃত্তি আছে, তত রকমের জাতিও আছে। যথা ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালী, স্বর্ণকার, গোপ, কুম্ভকার, কাংস্যকার, তন্তুবায়, শঙ্খকার (শাঁখারি), লৌহকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, মোদক, ধীবর ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তিলি, সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি তো আছেই। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আবার শাখা প্রশাখা আছে। বাঙলাদেশে এক ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই প্রায় শতাধিক শাখা প্রশাখা আছে। (মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' দ্রষ্টব্য)। অদ্ভুত উপায়ে কি এইসব শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ৩।৪ পুরুষ পূর্ব্বেও যাহারা একই জাতি ছিল, তাহারা বৃত্তি-ভেদে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার নানা দৃষ্টান্ত এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে। ৫০।৬০ বা একশত বৎসর পূর্ব্বেও যাহাদের মধ্যে আহার ব্যবহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিত, তাহারা এখন পরস্পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি—কেহ কাহারও স্পৃষ্ট অন্ন খায় না, বিবাহাদি তো পরস্পরের মধ্যে হয়-ই না। বাঙলার কোন এক জাতির পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্যজীবী ছিল, আর কতক ছিল

চাষী। ইহারাই কালক্রমে দুইভাগ হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। চাষীরা এখন মৎস্যজীবীদের নিজেদের চেয়ে ছোট জাতি মনে করে, তাহাদের সঙ্গে কোন জ্ঞাতিত্বই স্বীকার করে না। আর একটা জাতির পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ কাপড় বুনিত, আর কতক বা সেই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবসা করিত। কালক্রমে উহারা এখন দুইটি পৃথক জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ দুধের ব্যবসা করিত এবং কেহ কেহ বা চাষ করিত, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ দুইটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে। 'চাষা-ধোপা' নামে যে একটা স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও ঠিক এই প্রণালীতে। হিন্দু সমাজে কিরূপ অদ্ভুত উপায়ে নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হয়, তাহার একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এখানে উল্লেখ করিব। উড়িষ্যায় নাপিতদের মধ্যে দুইটি শাখা আছে—'চাম-মুটীয়া' এবং 'কণা-মুটীয়া'। প্রাচীনকাল হইতে উড়িষ্যার সমস্ত নাপিতেরাই 'কণামুটীয়া' ছিল ' অর্থাৎ তাহারা কাপড়ের 'ভাঁড়' ব্যবহার করিত। কিন্তু আধুনিককালে জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে চামড়ার 'ভাঁড়ের' আমদানী হওয়াতে কতকগুলি প্রগতিপন্থী নাপিত ঐ চামড়ার 'ভাঁড়' কিনিয়া ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহাতে প্রাচীনপন্থী নাপিতেরা চটিয়া গিয়া চামড়ার ভাঁড় ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিল। ফলে 'কণা-মুটীয়া' এবং 'চাম-মুটীয়া' এই দুইটি স্বতন্ত্র নাপিত জাতির সৃষ্টি হইল। এই দুই নাপিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আহার-ব্যবহার, বৈবাহিক আদান প্রদান নাই। (ক্রমশ)

মহারাষ্ট্র দেশের যাত্রী

(৪৮১ পৃষ্ঠার পর)

স্মৃতিবেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সকলের উপরিভাগ সমতল ও চিহ্ন বর্জ্জিত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিলেন। কার্লি চৈত্য-মন্দিরে ও বিহারগুলিতেও পরবর্ত্তীকালে মহাযানপন্থীদের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল—এ বিষয়ে বার্জেস বলেনঃ—

"The hall to the south of the Chaitya has originally been 21 half feet deep............has been afterwards enlarged to 33 feet, and by the Mahayana sect, for it has an image of Buddha on the back wall. This, and the later sculptures of the same character on the screen wall of the Chaitya, show that when the Hinayana school either died out or lost the favour of degenerating age, the more sensuous and less morally strict followers of the Mahayun school got possession of these cave temples and used them for their own services." [James Burgess LL. D. F.R.G.S.]

সম্ভবত চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শতাব্দী কালে এই গিরি-মন্দির-গুলি মহাযানপন্থীদের হাতে আসে। চৈত্য-মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ তিনটি পাষাণগাত্র খোদিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন এবং সেই অনুমান অসত্যও নহে, চৈত্য-মন্দিরের স্তম্ভের উপর এবং ইতস্তত সকল হস্তী ও মনুষ্য মূর্ত্তি নর-নারীর যুগল চিত্র ইত্যাদি খোদিত দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বে হীনযানপন্থীদের সমকালে ছিল না। উহা পরবর্ত্তী কালে মহাযান-পন্থীদের সময়কার শিল্প—

"The elaborate carvings of elephants and human beings and the railing on its face are much later."

কার্লি পাহাড়টির উপরে উঠিলে অর্থাৎ আরও প্রায় পাঁচ ছয় শত ফিট উপরে উঠিলে ইন্দ্রায়ণী নদীর উৎসমুখে টাটার water power of Hydro-Electric Scheme দেখা যায়। এই জল-শক্তি উদ্ভূত তাড়িৎশক্তির দ্বারা বোম্বের কলকারখানা পরিচালিত হইয়া থাকে।

আমরা প্রায় দুই তিন ঘণ্টাকাল কার্লির চৈত্য মন্দির, বিহার ইত্যাদি দেখিলাম। এই সকল দর্শনীয় স্থান আমরা যেরূপভাবে দেখি, তাহাতে সব দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া দেখা সম্ভবপর নহে। বিশেষজ্ঞেরা দিনের পর দিন গভীর গবেষণা করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া, ছবি আঁকিয়া মাপ জোক লইয়া যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। আমাদের দেশের লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে অসাধারণ শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা আমাদের কাছে বরণীয় হইয়া থাকিবেন।

কার্লি গিরি মন্দিরের উপর হইতে যখন আমরা নামিলাম, তখন সূর্য্যদেবের তেজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোনও অসহ্য উত্তাপ ছিল না। আমি মিঃ সুধাংশু চৌধুরীকে বলিলাম, বইতে পড়িয়াছি, কার্লির কাছেই ভজগুহা মন্দির। আপনি দেখিয়াছেন কি? মিঃ চৌধুরী বলিলেন না! "তবে চলুন না দেখিয়া আসি! ভদ্রলোক আর 'না' বলিতে পারেন না। গাড়ী ভজাগিরি মন্দিরের পথে ছুটিয়া চলিল। (ক্রমশ)

স্মৃতি

শ্রীহিরণকুমার হাজরা

ছন্দ-গাঁথা বাণী যবে ধীরে ধীরে মিলায় হাওয়ায়,
স্মৃতি-পটে কাঁপে না কি গান?
বাঁধে না কি সুরভি সে হিয়া সনে স্মরণের ডোরে,
ফুল যবে হ'য়ে আসে ম্লান?

গোলাপেরই ঝরাপাতা দেয় স্থান আপনার কোলে
দয়িতের ক্ষীণ তনুখানি—
তুমি যবে যাবে চলি', স্মৃতি তব নিতি রবে সাথে
মোর প্রেম বক্ষে ল'য়ে টানি'। *

* শেলীর "Music, when soft voices die"—কবিতাটির অনুবাদ।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রের নিদর্শন

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

কলিকাতার কলা পরিষদ কয়েক বছর হ'তে নিজেদের বার্ষিক প্রদর্শনীর সাহায্যে চিত্রজগতে এক অভাবনীয় উৎসাহ সঞ্চার করেছে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতের ভাবধারা' একটা বিরাট সিন্ধু প্রবাহে নিজেদের সংহত ও সম্মিলিত করতে এতদিন সক্ষম হয়নি। কাজেই শিল্পীদের সাধনা হয়ে পড়েছিল ভঙ্গুর ও তরল। নিজেদের কৃত্যের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা প্রয়োজন—রসজ্ঞ ও অর্থবান লোক তা' দান না করলে কাজ অগ্রসর হয়না। এজন্য অনেক প্রতিভা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে।

কলকাতার এই পরিষদ একটা বিশ্ব-ভারতীয় কেন্দ্র সৃষ্টি করেছে শিল্পকলার। ভারতের স্বাধীন রাজন্যগণের যৎসামান্য স্পর্শ একে মর্য্যাদা দান করেছে। এর সাহায্যে যে কোন নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে তা' নয় তবে বার্ষিকভাবে ভারতের সব শিল্পীর রচনা এক জায়গায় উপস্থিত করা একটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। কারণ এই রকমের সংগ্রহে বহুমুখী সাধনার একটা প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিত হালদারের নিরুপাধি (abstract) রচনা, নারায়ণ রাওয়ের প্রাচীর চিত্রপদ্ধতি প্রভৃতি দেখবার সুবিধাও এই পাঁচমিশেলী সমবায়ে সম্ভব হয়েছে।

প্রায় চার শতের অধিক রচনায় প্রস্ফুট হয়েছে সংখ্যাহীন শিল্পীর ভাবকোরক। হাস্য, কৌতুক, অভিনয়, বিষাদ প্রভৃতি নানা মানসিক অবস্থার একটা প্রতিরূপ এই সংগ্রহে মুখর হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় শিল্পীর কঠিন রূপবন্ধন ও ভারতীয় শিল্পীর শিথিল সংস্কার পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে অতি বিচিত্রভাবে। প্রাচ্য কলার রূপকেলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে বস্তুতন্ত্র রচনার অচলায়তনে। দুঃখের বিষয় প্রতীচ্য রস সাধনার আধুনিক মর্ম্মের কোন বাণী এতে নেই। আধুনিক জগতের স্বাধীন রূপবাদ অতিবাস্তব জগৎকে নিয়েও মশগুল হয়েছে। মনের নিভৃত অন্তঃপুরের বিশ্লেষণ (psycho-analysis) অতি অপরূপ মনোবিহারের উপর হতে যবনিকা দূর করেছে। তার ফল দেখা যায় Chirico, Ernst ও Dali প্রভৃতি শিল্পীর রচনায়। এ শ্রেণীর কোন শিল্পীর সামান্য ঊষার আলো এ শিল্প সংগ্রহে নেই। প্রাচীনতার গন্ধমাদন নিয়ে এ যুগ ক্রীড়া করতে চায় না। নবযুগের উপাদান ও নব্য দর্শন ও উপলব্ধির ভিতর এক অপূর্ব্ব অজানা শতদল রচনা করেছে। সে বাণী পূর্ব্ব প্রাচ্যে প্রবেশ করেছে কিন্তু ভারতের শিল্পীরা এখনও ইউরোপের মধ্যযুগের সংগ্রহ বা প্রাচ্যের হাজার বছর আগেকার রস বিজ্ঞানের জালে আটকে গেছে।

দিলীপকুমার দাসগুপ্তের "মলয় কুমারী" অপেক্ষাও মাখনলাল দত্তগুপ্তের "পল্লী সুন্দরী" অধিক লোভনীয় হয়েছে। এই উভয় তরুণ শিল্পী অভিনন্দনের যোগ্য। দিলীপকুমার স্বর্ণপদক পেয়েছে নিজাম বাহাদুরের। দ্বিতীয় শিল্পীও একটি পদক পেয়েছে। গুর্জ্জরের "সাথী" চিত্রে বর্ণের কুহকের সহিত একটি রস সম্পর্ককে মজুত করা হয়েছে। খাঁচার ভিতরকার পাখীর সঙ্গে আত্মীয়তাতে একটা অপরূপ কৌতুক ও উৎসাহ আছে, যা শিল্পীর রেখাবিজ্ঞান সহসা জাগ্রত করে' তুলেছে। কে ভট্টাচার্য্যের তামাকু সেবনে শক্তি সঞ্চয় একটা প্রাচীন দৃশ্যের নব্য পরিকল্পনা।

পোট্রেট্—শিল্পী অতুল বসু।

শিল্পীর প্রচুর সাহস আছে। মিসেস এডমণ্ডসন কলিকাতার প্রদর্শনীতে প্রায়ই পুরস্কার পেয়ে থাকেন, এবারও একটা প্রতিচিত্র এ'কে তিনি পদক পেয়েছেন। শৈল চক্রবর্ত্তীর দেবমূর্ত্তিতে যতটা আড়ম্বর আছে ততটা রহস্য বা যাদু নেই। রমেন চক্রবর্ত্তী প্রতিভাবান শিল্পী—ইদানীং এই শিল্পী ইউরোপ হ'তে ফিরে এসে অতি উপাদেয় সৃষ্টির সাহায্যে প্রশংসা অর্জ্জন করছে। শিল্পীর বহু চিত্রের ভিতর "The growing city" একখানি ভাল ছবি। জৈনল আবেদিনের 'প্রেমের নীড়' ও পি টি বেভিব "বৈরীতা" ভাল রচনা। ডি এন ওয়ালির "ডাল হ্রদের" সূক্ষ্ম রেখাকম্প প্রশংসারযোগ্য। সুবোধ রায়ের' 'প্রেমাবেশ' চিত্রে শিল্পী বহিরঙ্গ দিক স্পষ্ট করে তুলেছে। সতীশ সিংহের প্রতিচিত্রগুলি বেশ ভাল হয়েছে।

শাদাকালো (Black and White) রচনা বিভাগে Mrs.

R. B. Maxwell-এর কখানি ভাল রচনা আছে। বিমল দের 'রেখা' একখানি উৎকৃষ্ট রচনা। জল রঙের (water colour) রচনায় প্রতীচ্য ও প্রাচ্য প্রথার চিত্র সংগ্রহ আছে। প্রাচ্য রচনায় রমেন চক্রবর্ত্তীর সীতা উৎকৃষ্ট হয়েছে। রণদা উকিলের দুর্গা চিত্রগুলির বৈচিত্র্য লোভনীয়। সত্যরঞ্জন মজুমদারের 'ষ্টীমার' বাঙ্গালীর সুপরিচিত অবস্থার প্রতিফলক। রাণীচন্দের 'রাধার প্রতীক্ষা'

সাথী—শিল্পী ভি এস গুর্জর।

চিত্র স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। নীহাররঞ্জন সেনের 'মন্দির দ্বারে' চমৎকার হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের বটগাছ স্ত্রী-পুরুষ ও মন্দির যে এক সুরম্য রূপবীথিকা সৃষ্টি করে' সকলের চিত্তহরণ করে তারই একটা স্নিগ্ধ ছায়া এ ছবিতে সুস্পষ্ট হয়েছে। S. R. Mazumder-এর 'বধূ' একখানি ভাল রচনা। যোগেশ দের 'মাতা' একখানি উচ্চশ্রেণীর চিত্র। তাতে প্রাচীন ভাবের একটা নূতন ডালি আছে। প্রাচ্য চিত্রবিভাগে বি জি গুইর 'লক্ষ্মীর জন্ম' একটা রেখার বিচিত্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। ক্ষিতীন্দ্র মজুমদারের 'শ্রীকৃষ্ণ' একখানা ভাল ছবি। আশু বন্দ্যোপাধ্যায় 'উর্ব্বশীর জন্ম' চিত্রে কাজের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কে আর ঠাকুরের 'নদীর তীর' একটা রমনীয় দৃশ্যপট উপস্থিত করেছে। শ্রীমতী সবিতা ঠাকুরের 'অর্ঘ্য' প্রাচ্য-চিত্রকলার অন্যতম নমুনা।

ভাস্কর্য্যে এম মহাপাত্রের হরগৌরীনৃত্য একখানি নিপুণ রচনা। শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সকলকে অবাক করে দেয়। প্রাচ্য মূর্ত্তির আতিশয্য ও আলঙ্কারিক অত্যুক্তিতে মূর্ত্তিখানি পূর্ণ। সব কিছুই এক অপূর্ব্ব ছন্দে গ্রথিত—যেন একটি তরঙ্গায়িত রূপবার্ত্তা সাগরবেলায় ফেনিয়ে পড়ছে। অন্যান্য

হরগৌরী নৃত্য—শিল্পী এস মহাপাত্র।

শিল্পীদের ভিতর লক্ষ্য মূর্ত্তিখানিতে শিল্পী কালশশী নিজের প্রতিভা দেখিয়েছে।

বস্তুত এবারকার প্রদর্শনীতে বহু নূতন শিল্পীর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা যথেচ্ছভাবে চারিদিকে ছুটে চলে গেছে। কোন সংহত উদ্দেশ্য বা ভাবমূলক বিপ্লব এর ভিতর দেখা যায় না। নব্য ভারতের অগ্রগতি সূচনা করার দীপ এর ভিতর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে একটা ভাবের মন্থন হচ্ছে সন্দেহ নেই—সকলেই একটা চেষ্টা নিয়ে মাতোয়ারা হয়েছে। চিত্রকলাও যে একটা উত্তরোত্তর নূতন সৃষ্টি দিয়ে জাতির নব-জাগ্রত চিত্তের রসসুধায় তৃপ্তি সাধনের অধিকারী তা' সব শিল্পীই বহু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

নিযুক্ত করায় দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি মিঃ নুরুদ্দিন বিহারী পদত্যাগ করেছেন।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচনে পাঞ্জাব কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের মনোনীত প্রার্থীকে (প্রথমে সর্দ্দার প্যাটেল এ মনোনয়ন অনুমোদন করেন) বাতিল করে' নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী কমিটি অন্য প্রার্থী মনোনয়ন করায় পাঞ্জাব কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব পদত্যাগ করেছেন।

সিন্ধুর সমস্যা

আল্লাবক্স মন্ত্রিসভা সিন্ধুর হিন্দুদের ধন-প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ বলে' সিন্ধুর দুইজন হিন্দু মন্ত্রী—শ্রীনিকলদাস ভাজিরাণী এবং দেওয়ান দিয়ালমল দৌলতরাম পদত্যাগ করেছেন। মঞ্জিলগড় এবং শক্কর দাঙ্গার জের হিসেবেই মন্ত্রিসভায় এই ভাঙন লাগে। হিন্দু-দল পরিষদে একটা অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন। মুসলিম লীগ চুপচাপ ঘটনা লক্ষ্য করছে। কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্ট নয়। সুতরাং আল্লাবক্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়।

বান্নু জেলায় পাঠান উপজাতিদের হানা এখনও চলছে। এই কারণে বান্নুর উত্তর অঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে।

* * * * *

গত ২৫শে জানুয়ারী এলাহাবাদে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভানেত্রী বেগম হামিদ আলি তাঁর অভিভাষণে মেয়েদের সমান অধিকার ও দাবীর কথা বিশেষভাবে বলেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও পণ্ডিত জওহরলাল এই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

* * * * *

যুদ্ধের অবস্থার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে অতিরিক্ত লাভ হবে, তার উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করে' ভারত গবর্ণমেণ্ট এক বিল রচনা করেছেন। ১৯৩৯-এর ১লা এপ্রিল থেকে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসেব এই বিলের আওতায় পড়বে।

ইউরোপ

এ সপ্তাহে খবর পাওয়া যায় যে, উত্তর জার্ম্মানীতে এলবে ও ওডার নদীর মধ্যে বহু সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। সুইডেন চড়াও করা এই সৈন্য সমাবেশের উদ্দেশ্য বলে' আশংকা করা হয়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু ঘটে নি।

ফিনল্যাণ্ডে যুদ্ধ এখন প্রধানত ল্যাডোগা হ্রদের উত্তরে কেন্দ্রীভূত; ফিনরা বলছে, এ অঞ্চলে সোভিয়েটের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে।

জার্ম্মানী আবার সরকারীভাবে ফিনিশ সংঘর্ষে তার পূর্ণ নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছে। মস্কোর বেতারে বলা হয়েছে, সোভিয়েট-জার্ম্মান মৈত্রীতে কোনো ফাঁক নেই, পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে পরিষ্কার বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

রুমেনিয়া গবর্ণমেণ্ট সমগ্র তৈল-শিল্প নিজের হাতে নিয়েছেন। রুমেনিয়ার তৈল ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে ভিতরে ভিতরে জার্ম্মানী ও মিত্রশক্তির মধ্যে বেশ একটা কূটনৈতিক লড়াই চলছে।

পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানী ক্যাথলিকদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করছে বলে' পোপের রাজ্য থেকে যে সংবাদ প্রচার করা হয়, ভ্যাটিকানে জার্ম্মান দূত তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এদিকে জার্ম্মানীর সমস্ত বৃত্তি-শিক্ষালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষা নিষিদ্ধ করে' দেওয়া হয়েছে।

২৯।১।৪০ —ওয়াকিবহাল

ইম্পিরিয়ালিজমের মর্ম্মকথা

(শেষাংশ ৪৮৬ পৃষ্ঠার পর)

আফ্রিকার ইতিহাসে 'নেটিভ'দের সংগে শ্বেতকায়দের এত যে যুদ্ধ-বিগ্রহ—এ সকলের মূলে রয়েছে আদিম অধিবাসীদের জমি ও গোধন কেড়ে নেওয়ার এবং পরে তাহাদিগকে কলের কুলিতে পরিণত করবার উৎকট আগ্রহ। জমি ও গোধনের উপরে হস্তক্ষেপ করবার ফলে শ্বেতকায় ধনিকেরা 'নেটিভ'দের কাছ থেকে পেয়েছে বাধা। অমনি চারিদিকে 'সাজ' 'সাজ' রব প'ড়ে গেছে। বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করবার জন্য সৈন্যদল প্রেরিত হয়েছে—যুদ্ধের বন্দী কাফ্রীরা জমি হারিয়ে, গোধন হারিয়ে, স্বাধীনতা হারিয়ে পরিণত হয়েছে কলের মজুরে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বেচুয়ানাল্যাণ্ডে যে বিদ্রোহ ঘটে সেই বিদ্রোহের ইতিহাস পড়লেই ভালো করে জানা যাবে—জমির মানুষ কলের মজুরে কেমন ক'রে পর্য্যবসিত হয়। একজন মাতব্বর-গোছের নেটিভের মাতলামির ফলে একটা ছোট-খাটো দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। কয়েকশো সশস্ত্র কাফ্রী সেই দাঙ্গায় যোগ দেয়। দাঙ্গা সহজেই থামিয়ে দেওয়া হয় সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে। কাফ্রীদের কাজটাকে আখ্যা দেওয়া হোলো 'বিদ্রোহ' এবং বিদ্রোহ-দমনের অজুহাত দেখিয়ে ৮০০০ নেটিভকে উৎখাত করা হোলো তাদের পিতা-পিতামহের জমি থেকে। তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হোলো রাজ-সরকারে। আরও ত্রিশ হাজার নেটিভকে অন্যত্র খারাপ জমি দিয়ে তাদের ভালো জমিটুকু শ্বেতকায় ধনিকেরা গ্রাস ক'রে নিলো। কাফ্রীদের জমি ছিলো বড়ো উর্ব্বর। বিতাড়িত কাফ্রীদের সেই জমিকে ভাগ করে নেবার একান্তই প্রয়োজন ছিলো। বিদ্রোহ দমনের সুযোগ নিয়ে পাশ্চাত্যের লোকেরা নেটিভদের ভালো ভালো জমি বেমালুম হজম ক'রে ফেললো। কিন্তু কেবল জমি নিলে হবে না, মজুর পাওয়ারও দরকার। যারা জমি ছেড়ে পালিয়ে গেছে তারা যে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলো—একথা বলতে রাজ্য লোভীদের একটুও কুণ্ঠার উদ্রেক হোলো না। তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? তাদের বলা হোলো, হয় পাঁচ বছরের কড়ারে শ্বেতকায়দের জমিতে নামমাত্র পারিশ্রমিকে মজুরের কাজ করতে হবে, নয় বিদ্রোহ করার নিষ্ঠুর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আদালতে বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হবার ভয়ে ৫৮৪ জন 'নেটিভ' স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নামমাত্র পারিশ্রমিকে শ্বেতকায়দের জমিতে পরিশ্রম করতে সম্মত হোলো। শ্রীযুক্ত জে এ হবসন তাঁর Imperialism বইতে এই ঘটনার উপরে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন,

Thus did Covetores colonials kill two birds with one stone, obtaining the land and the labour of the Bechuana "rebels".

যেখানে শাসনদণ্ড র'য়েছে নেটিভদের হাতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীরাই হ'চ্ছে সর্ব্বেসর্ব্বা সেখানে ছোটো-খাটো কারণে সংঘর্ষ অনিবার্য্য আর সংঘর্ষ বাধলে নেটিভরাই যে দোষী এতে কি কোনো সন্দেহ আছে? একটা ছোট দাঙ্গাকে কঠোর হস্তে দমন করতে গিয়ে তাকে বিদ্রোহে পরিণত করতে কতক্ষণ? বাস্! যেই লোকগুলি বিদ্রোহী আখ্যায় আখ্যায়িত হোলো অমনি আরম্ভ হোলো জমি কেড়ে নেওয়ার পালা! ভিটা-ছাড়া বিদ্রোহীদিগকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মজুরে পরিণত করা একেবারেই কঠিন নয়। সংক্ষেপে এই হ'চ্ছে সাম্রাজ্যবাদের মর্ম্মকথা।

নিউ থিয়েটার্সের 'জিন্দগী'

চলচ্চিত্র জগতে পরিচালনায় প্রমথেশ বড়ুয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনবিদিত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম রসসৃষ্টির নৈপুণ্যে তাঁহার ছবিগুলি উজ্জ্বল ও জীবন্ত; অবান্তর ও অসংগত দৃশ্যভারে তাহাদের সহজ গতি যাহাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে পরিচালকের সচেতন দৃষ্টির পরিচয় প্রত্যেক ছবিতেই দেখি। গল্প নির্ব্বাচনে প্রমথেশবাবুর বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। বাঙালীর ভাবপ্রবণতার সুযোগ লইয়া মামুলী গল্প অবলম্বনে ছবি খাড়া করার মোহ তাঁহার নাই, পরিবর্ত্তনশীল সমাজের নূতন চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন গল্প নির্ব্বাচনে তিনি সর্ব্বদাই সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। 'রজত-জয়ন্তী' দেখিয়া সেই নূতনত্বের আভাষ পাইয়াছি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী চিত্র 'জিন্দগী'তেও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও টেকনিকের নূতনত্বে তিনি আরও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। 'জিন্দগী'র গল্পাংশ বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীদের অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালের 'প্রিয়বান্ধবী' উপন্যাস হইতে গৃহীত। গল্পের বিষয়-বস্তুর মধ্যে মৌলিকত্ব আছে এবং আধুনিক সমাজের নারী ও পুরুষের একটি জটিল সমস্যাকে এই চিত্রে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

বিবাহিত জীবনে স্ত্রী তাহার নারীত্বের প্রাপ্য সম্মানে বঞ্চিত হইলে সে যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? এক স্ত্রী বর্ত্তমানে, স্বামী যদি পুনরায় বিবাহ করিয়া তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি অবহেলা অপমান ও দুর্ব্ব্যবহার করে, তবে সে নিপীড়নের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য নারীর স্বাধীন জীবন গ্রহণ করিবার অধিকার আছে কিনা—এবং গ্রহণ করিলে সমাজ তাহাকে স্বীকার করিবে কিনা—জিন্দগী চিত্রে এই সমস্যাই গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে। নারীত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়াও অনাত্মীয় পুরুষ যে যুবতী নারীর বন্ধু ও সহায় হইতে পারে—এই চিত্রে তাহারই একটি দিক অপূর্ব্ব দরদের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

চার্লি চ্যাপলিনের নূতন চিত্র

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্ব্বাক যুগের গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত যে মানুষটি তাহার একজোড়া গোঁপ, ঢিলা প্যান্টলুন, নৌকার মত লম্বা জুতা ও ছড়ি লইয়া অদ্ভুত অভিনয় ও অপূর্ব্ব অভিব্যঞ্জনার দ্বারা হাস্যরসের মধ্য দিয়া দর্শকদের কাঁদাইয়াছেন, সেই বিশ্ববিশ্রুত অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনকে পুনরায় দেখা যাইবে একটি নূতন ধরণের চিত্রে; ছবির নাম তিনি এখনও প্রকাশ করেন নাই এবং সেই কারণেই এই ছবি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বেশী। চার্লি চ্যাপলিনের পূর্ব্ববর্ত্তী ছবি 'মডার্ণ টাইমস্'-এ দেখিয়াছি আগাগোড়া হাসির মধ্য দিয়া তিনি যন্ত্রসভ্যতার ভীষণতাকে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন। সুতরাং এই ছবিটিতেও বর্ত্তমানের সাম্রাজ্যলিপ্সু দেশসমূহের মধ্যে হিংসার যে উন্মত্ততা দেখা দিয়াছে এবং এই হিংসা-প্রবৃত্তির মূলে যাহাদের দস্যুবৃত্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধাইয়া জগতকে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিয়াছে, তাহাদের লইয়াই এই চিত্রের সূত্রপাত। যুদ্ধের বিভৎস ভীষণ পরিণামকে তিনি হয়ত ব্যাঙ্গ অভিনয়ের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন; হাস্যরসের অন্তরালে যে গভীর ট্রাজেডী, তাহা হয়ত হাসি ও অশ্রুর মধ্য দিয়াই আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে। অবশ্য ইহা এখনও আমাদের অনুমান মাত্র।

'জিন্দগী চিত্রে ধ্রুবেন রায় ও যমুনা

এই ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের এই অনুমানের কারণ, ইহাকে এখনও 'প্রোডাকশন নং—৬' বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। তবে এই অজানিত রহস্যের খানিকটা সন্ধান পাওয়া যায় ইহার বিষয়বস্তু হইতে এবং তাহা হইতেছে, হিটলারের চরিত্রের প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গানুবৃত্তি। পলেট গর্ডাডকে দেখা যাইবে একটি ঠিকা চাকরাণীর ভূমিকায়। জ্যাক ওকী আরেকটি ডিক্টেটারের ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছেন এবং হেনরী ড্যানিয়েল গোয়েরিং-এর চরিত্র রূপ দান করিবেন। চার্লিকে দেখা যাইবে দুইটি ভূমিকায়, একটি হিটলার, অপরটি জনৈক ইহুদী নাপিত।

ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেড

ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেড একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান এবং ইহার প্রথম চিত্র 'শুকতারা'র চিত্রগ্রহণ নির্ব্বিঘ্নেই চলিয়াছে। ছবিটি পরিচালনা করিতেছেন শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল। বাঙালী চিত্র পরিচালকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পাল প্রবীণ ও অভিজ্ঞ, তাঁহার দক্ষতা ও পারদর্শিতার গুণে চিত্রটি প্রসিদ্ধি লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। একটি অতি আধুনিক সামাজিক কাহিনীকে লইয়াই এই চিত্রের বিষয়বস্তু। চন্দ্রাবতী ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে এই চিত্রের প্রধান ভূমিকায় দেখা যাইবে। ছবিটি প্রায় সমাপ্তির পথে।

খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতা

কষ্টসাধ্য শক্তিপূর্ণ ব্যায়াম কৌশল ত্যাগ করিয়া অনায়াস-লভ্য সাবলীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার ব্যায়াম আয়ত্বের দিকে বাঙলা দেশের বালক ও বালিকাগণের যে উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ এই বৎসরের গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন পরিচালিত খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতা হইতেই উপলব্ধি করা গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় গত বৎসর অপেক্ষা অধিকসংখ্যক দল যোগদান করে। সিনিয়ার, জুনিয়ার ও বালিকা-বিভাগের কোনটিতেই দলের অভাব অনুভূত হয় নাই। অপ্রত্যাশিত-ভাবে যোগদানকারী দলসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রতিদিনই এই অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য বিপুল জন-সমাগম পরিলক্ষিত হয়। এই সকল দর্শকগণের মধ্যে বহু ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও ব্যায়াম শিক্ষকগণকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, আগামী বৎসরে গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের পরিচালকগণকে শক্তিশালী স্বাধীন জাতিসমূহের অনুষ্ঠানের চিত্রসমূহ দর্শন করিয়া ও সংবাদ পাঠ করিয়া উৎসাহ লাভ করে। ১৯৩১ সালে সর্ব্বপ্রথম মাত্র ৩০।৪০টি যুবক ও বালক লইয়া এই ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার পর তাঁহাদের একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, অক্লান্ত পরিশ্রম, হাওড়ার সকল ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানকে এইরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে বাধ্য করে। পাঁচ বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর ১৯৩৬ সালে সর্ব্বপ্রথম হাওড়ার সকল স্কুল, ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান এইরূপ সম্মিলিত ব্যায়াম অনুষ্ঠানে একত্র হইবার জন্য একটি সঙ্ঘ বা ফেডারেশন গঠন করে। কিন্তু এই ফেডারেশন ১৯৩৭ সালের পূর্ব্বে ইহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না। এই ফেডারেশনের কার্য্যকলাপের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যায়াম পরিচালক এই-রূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার জন্য অগ্রসর হন। তিনি তাঁহার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য খালি হাতে ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য একটি ব্যায়াম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক ঐ সময়েই স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারের পরিচালকগণ এইরূপ একটি
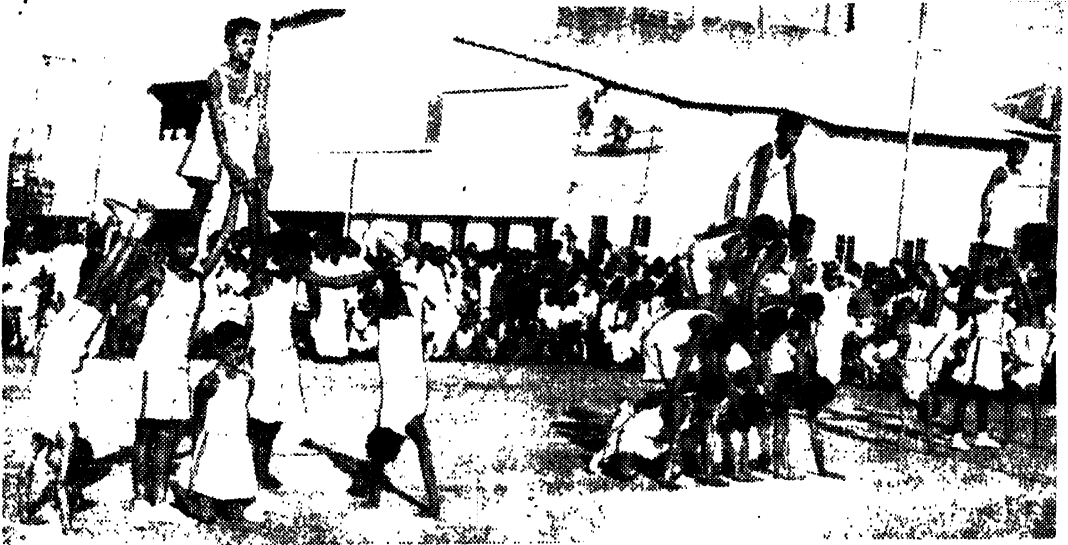
গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের পরিচালিত খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় হাওড়া তরুণ সাধনা সমিতির সভ্যগণের প্রদর্শিত "পিরামিডের" একটি দৃশ্য।

উক্ত প্রতিযোগিতার জন্য দুই তিন সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উৎসাহ বৃদ্ধির কারণ

খালি হাতে ব্যায়ামের প্রতি বাঙলার ব্যায়াম উৎসাহীদের বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত করিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া-ছেন, কিন্তু আমরা হই নাই। এইরূপ উৎসাহ যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহার আভাষ আমরা গত বৎসরের গণপতি মেমোরিয়াল এসো-সিয়েশনের খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতার শেষেই উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই উৎসাহ খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার জন্য হয় নাই, হইয়াছে সম্মিলিত ব্যায়াম ব্যবস্থার জন্য। এই ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম বাঙলা দেশে কয়েকটি উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় হাওড়ায় প্রকাশ লাভ করে। এই সকল যুবক বৈদেশিক ব্যায়াম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুইটি ব্যায়াম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা দেশের কতকগুলি স্কুলের ও ব্যায়ামাগারের ব্যায়াম শিক্ষক আধুনিক খালি হাতে ব্যায়াম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা অবলোকন করিয়া কলিকাতার ওয়াই এম সি এ'র পরিচালকগণও অনুরূপ ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের ব্যায়াম কেন্দ্রের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে আর নাই। ওয়াই এম সি এ'তে এখনও বর্ত্তমান আছে। হাওড়ার ফেডারেশনের পরিচালকগণ সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য গত বৎসর হইতে একটি ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্র খুলিয়াছেন। উপরোক্ত সকল ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত খালি হাতে ব্যায়ামের প্রকৃত কৌশল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না হইয়া থাকিলেও খালি হাতে ব্যায়ামের উৎসাহ

বৃদ্ধির পথ নির্দ্দেশ যে করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের পরিচালিত খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলসমূহ যে প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাও যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার ফলস্বরূপ, ইহাও অস্বীকার করা চলে না। গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অভাব দূর করিয়াছেন, সেইটি হইতেছে—খালি হাতে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের একটি স্থান করিয়া দিয়া। এইরূপ একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হইত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বিচারকগণের আপত্তি

খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় গত দুই বৎসর বিচারকগণকে একটি বিষয়ে আপত্তি করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের কয়েকজনের মতে প্রত্যেক দলকে নিজ ইচ্ছামত কৌশল প্রদর্শন করিতে দিয়া গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ নাকি অন্যায় করিয়াছেন। একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম তালিকার ব্যায়াম সকল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেই নাকি ঠিক হইত। কিন্তু আমরা গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা সকল ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে নব নব কৌশল প্রদর্শনের সুবিধা দিয়াছেন। নব নব কৌশল প্রদর্শন করিতে হইলেই ব্যায়াম শিক্ষকগণকে নব নব কৌশল শিক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক ব্যায়াম শিক্ষকদের পুস্তকাদি পাঠ করিতে হইবে। ফলে হইবে এই যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম কৌশল কি, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহারা পাইয়া যাইবেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রদর্শিত ব্যায়াম কৌশলের মধ্যে, পরিচালনার মধ্যে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা অপসারিত হইবে। বাঙলা দেশে তথা ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম কৌশলের একটি আদর্শ কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইউরোপ বা আমেরিকার কোন ব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্রের তখন সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যে এইরূপ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইতেছেন না তাহাই বা কে বলিতে পারে? তাঁহাদের প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

এই বৎসরের খালি হাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সিনিয়ার-বিভাগ

বিজয়ী:—তরুণ সাধনা সমিতি (হাওড়া)।
রানার্স আপ:—গোবর জিমন্যাসিয়াম।

জুনিয়ার-বিভাগ

বিজয়ী:—সিটি কলেজ স্কুল।
(গত বৎসরেও ইহারা এই বিভাগে বিজয়ী হইয়াছিলেন)
রানার্স আপ:—তরুণ সাধনা সমিতি (হাওড়া)

বালিকা-বিভাগ

বিজয়ী:—জাতীয় যুব-সঙ্ঘ
রানার্স আপ:—শ্রদ্ধানন্দ পার্ক যুব-সঙ্ঘ

শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম পরিচালক
শ্রীঅমিয়কুমার হালদার
(সিটি কলেজ স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক)

বোম্বাই অলিম্পিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতার "মার্চ্চ পাষ্টে"র একটি দৃশ্য।

বেতার যন্ত্রের নূতন দান

সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হয়নি, এরূপ জীবের সংখ্যা খুবই অল্প। স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদে সঙ্গীত পীড়াদায়ক হলেও যথাযোগ্য স্থানে এর সংলাপ সকলেরই মন হরণ করে। কেবল জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ মানব নয়, নিকৃষ্ট জীব-জন্তুদের অনেকেই সঙ্গীতের অনুরাগী। মুরগী এবং হাঁসের মধ্যে সঙ্গীত কতখানি অধিকার বিস্তার করে তা গবেষণা দ্বারা

মুরগী এবং হাঁসের বাস গৃহের সম্মুখে বেতার যন্ত্র

পাশ্চাত্য দেশের 'পোলট্রি ফার্ম্মে'র মালিকেরা সে বিষয়ে নূতন আলোক সম্পাত করেছেন। সঙ্গীত শ্রবণে নাকি মুরগী এবং হাঁস প্রচুর পরিমাণে ডিম প্রসবে অভ্যস্ত হয় এই বিশ্বাসে সেখানে মুরগী এবং হাঁসের বাসস্থানের সন্নিকটে বেতার যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এরূপ ব্যবস্থার ফল যে খুবই লাভজনক, তা পরীক্ষার ফলে জানা গেছে। জ্ঞান রাজ্যের প্রসারতা লাভে স্বাধীন দেশে বেতার যন্ত্র যথেষ্ট সহায়তা করে। হাঁস মুরগীর কথা বাদ দিয়ে ভাবি, আমরা কোথায়?

বামন অবতার

বামনের উপস্থিতিতে হাসবেন না। কিছুদিন আগে কলকাতার রাস্তায় বামন ভ্রাতৃদ্বয় যে কাণ্ড করে গেছে, তাতে তাদের বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না। কলকাতায় তারা নূতন এসেছে; এই বিরাট শহরের ভীড়ে তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু বুদ্ধি হারায় নি। বিনা পয়সায় খবরের কাগজে ছবি তুলে বিজ্ঞাপন দিলে; পথে ঘাটে হেসে খেলে পয়সা রোজগার করলে। আশ্চর্য্যের কিছু নেই। পাঁচ হাজারের বইয়েতে যা বিস্তারিত, তা আজকাল একশতে সমাপ্ত। স্কুল কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্যও বামন অবতারের দিকে অর্থাৎ সর্টকাট, ডাইজেস্ট, একঘণ্টার মামলা, এমনি আরও কত কি! বৈজ্ঞানিকেরাও চুপ করে বসে নেই। তাঁদের দৃষ্টি পড়েছে বামন-উদ্ভিদের উপর। আমরা মাত্র কয়েক জাতীয় কলমে-গাছের সঙ্গে পরিচিত। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন ফলের কলমে-গাছ আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। আবিষ্কৃত গাছের উচ্চতা মাত্র দশ ইঞ্চি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে, গাছের আকার ছোট হলেও, এরা সাধারণ

কলমে-নেবুগাছ। উচ্চতায় মাত্র দশ ইঞ্চি

আকারের গাছের মতই ফুল, ফল প্রভৃতি সমভাবে ধারণ করে। ড্রইংরুমের ফুলদানীতে, চায়ের কাপ প্রভৃতিতে নেবু কিম্বা আম গাছ স্বচ্ছন্দে দশ থেকে পনের বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচতে পারে। ডগলাস ফায়ারস জাতীয় যে একশত ফুট আকারের গাছ তা সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মাত্র এক ফুট উচ্চতায় সীমাবদ্ধ হয়েছে।

অভিনব উপায়ে আলোক-চিত্র গ্রহণ

পাঁচশত ফিট উচু থেকে নীচের আলোক চিত্র এক অভিনব উপায়ে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ীতে বিশেষভাবে তৈয়ারী এক তিনকোণা বক্স ঘুড়ির উপর অল্প দামী ছোট ক্যামেরা সাহায্যে সুন্দর সুন্দর ছবি তোলা যায়। ঘুড়িটিকে আকাশে তুলবার পূর্ব্বে ঠিক সময়ে যাতে সাটারটিকে মুক্ত করে বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলতে সক্ষম করে, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ছবি তোলা শেষ হয়েছে এর নিদর্শনস্বরূপ একটি ছোট পতাকা ক্যামেরা থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ঘুড়িটিকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ক'রে যে যে অংশের ছবি তোলার প্রয়োজন বোধ হয়, তাও নির্দ্দিষ্ট করা যায়। এরূপভাবে তোলা ছবি দেখতে নিখুঁত এবং মনোরম। অবসর সময়ে আমেরিকার ছেলে-বুড়ো সকলেই এভাবে ছবি তুলে আমোদ পায়।

সমর-বার্ত্তা

২৪শে জানুয়ারী

বৃটিশ ক্রুজার "এক্সমাউথ" (১,৪৭৫ টন) মাইন কিংবা টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়ানদের বিরাট আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। ক্যারেলিয়ান যোজকে সোভিয়েট বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। ল্যাডোগা হ্রদের উত্তর তীরে ফিনিশ ঘাঁটিসমূহ ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে উপর্য্যুপরি দলে দলে সোভিয়েট সৈন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু তাহাদের অভিযান ব্যর্থ হয়। রাশিয়ানরা পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিয়া ম্যানারহাইম লাইন ভেদ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সমূহ ক্ষতি হয়। গতকল্য ফিনল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েটের বিমান আক্রমণের ফলে ৩০ জন নিহত হইয়াছে। ফিনরা নয়টি সোভিয়েট বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে বলিয়া দাবী করে।

'পেটিট প্যারিসিয়েন' পত্রিকায় প্রকাশ যে, বার্লিন হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, হের হিটলার সিনর মুসোলিনীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া জার্ম্মানীর বিনা প্রতিরোধিতায় কোন সময়েই ইতালী ও হাঙ্গেরীর স্বার্থ সংশিলষ্ট এলাকার সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

বল্টিক উপকূলে রুমানিয়ান সীমান্তে এবং পশ্চিম সীমান্তে কোরেনৎস হইতে উত্তরসাগর পর্য্যন্ত স্থানে জার্ম্মান সৈন্য সমাবেশের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বল্টিক উপকূলে এলব ও ওডারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সৈন্য সমাবেশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্কাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করিয়া সুইডেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যেই ঐ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে!

মার্শাল চিয়াং কাইশেক "মৈত্রীভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির" উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, শান্তি আলোচনা সম্পর্কে জাপান ও জেনারেল ওয়াং চিং ওয়েই-এর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জাপান তাহার রাজ্যজয়ের নীতি ত্যাগ করে নাই। মার্শাল চিয়াং কাইশেক মৈত্রীভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলিকে চীনকে কার্য্যকরীভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

২৫শে জানুয়ারী

ফরাসী সামরিক মহল অদ্য এই মর্ম্মে এক সতর্কবাণী দিয়াছেন যে, এখন হইতে দেড়মাসের মধ্যে যে কোন সময় জার্ম্মানরা ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিতে পারে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনের বর্ত্তমান অচল অবস্থা দেখিয়া একথা মনে করিলে চলিবে না যে, একটা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিবে।

জর্ম্মান বেতারের এক সংবাদে প্রকাশ, হের হিটলার অদ্য বার্লিনে সৈন্য ও বিমান বিভাগের শিক্ষার্থী অফিসারদের সম্মুখে এক বক্তৃতা দেন। মিউনিক বোমা বিস্ফোরণের পর ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা "ফ্রেডারিক দি গ্রেট"-এর আদর্শ অনুসরণ করিতে বলেন।

ম্যানারহাইম ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য ল্যাডোগা হ্রদের উত্তরে বরফে আবৃত জলাভূমির উপর দিয়া এবং জঙ্গলের ভিতর দিয়া অতি কষ্টে সোভিয়েটবাহিনী এক ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

২৬শে জানুয়ারী

মস্কো বেতারে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার ঐক্য বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাকারী বলেন যে, দুই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন। কোন ক্ষেত্রেই কোন বৈষম্য নাই এবং জার্ম্মানী ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়ার কার্য্য পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছে।

২৭শে জানুয়ারী

বার্লিনের নিরপেক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, হিটলার আগামী সপ্তাহে বল্কানে একটি বড় রকমের 'পাল্টা কূটনৈতিক অভিযান' চালাইবেন বলিয়া মনে করা হইতেছে। বার্লিনের সাম্প্রতিক বৈঠকে বেলগ্রেড, সোফিয়া, এথেন্স এবং বুখারেষ্টের জার্ম্মান রাষ্ট্রদূতগণকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বলা হইয়াছে যে, বল্কান আঁতাত-এর আগামী বৈঠকে হের হিটলার চারটি উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার সমস্ত প্রভাব নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য চারিটি হইতেছে (১) তুরস্ককে বৃটেনের বন্ধুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করা; (২) বল্কানে বৃটিশ প্রভাবের হ্রাস করা; (৩) বল্কান রাষ্ট্রগুলিকে এককভাবে নিরপেক্ষ রাখা এবং জার্ম্মানীর সহিত তাহাদের বাণিজ্য অক্ষুন্ন রাখা এবং (৪) জার্ম্মান সমর্থক হিসাবে বুলগেরিয়াকে বল্কান আঁতাত-এর অন্তর্ভুক্ত করা। জার্ম্মান পত্রিকাসমূহে ইতিমধ্যেই এই কূটনৈতিক অভিযানের আভাষ পাওয়া গিয়াছে।

হেলসিঙ্কির এক তারে প্রকাশ, ফিনরা ল্যাডোগা রণক্ষেত্রে প্রায় এক শত ট্যাঙ্ক ও কয়েকটি মেসিনগান হস্তগত করিয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী

হেলসিঙ্কির সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তর ফিনিশ রণাঙ্গনে বর্ত্তমানে যে সব সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বের সৈন্যগণ অপেক্ষা সুশিক্ষিত। এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, সাল্লা রণাঙ্গনে ৫০ হাজার সোভিয়েট সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। পেটসামো রণক্ষেত্রের উত্তর সীমান্তে ফিনিশদের অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে; জেনারেল ষ্টার্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করায় সেখানে রাশিয়ানদের সমর পরিচালনার উন্নতি হইয়াছে। 'রয়টারের' সামরিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মার্শাল ভোরোশিলভের ফিনিশ রণক্ষেত্রে যাত্রা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সৈন্যদল, নৌবহর এবং বিমান-বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হিসাবে মার্শাল ভোরোশিলভ লেনিনগ্রেডে যাইবেন।

২৯শে জানুয়ারী

জার্ম্মান বিমানবহর অদ্য বৃটিশ জাহাজের উপর উপর্য্যুপরি দুঃসাহসিক আক্রমণ চালায়—ইতিপূর্ব্বে এরূপ আক্রমণ আর চালায় নাই। উপকূলভাগের উত্তরে টাইন নদীর মোহনা হইতে দক্ষিণে কেণ্টের উপকূল পর্য্যন্ত চারিশতাধিক মাইলব্যাপী দরিয়ার বিভিন্ন স্থানে এই আক্রমণ চলে। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ জঙ্গী বিমান বহর ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া শত্রুপক্ষীয় বিমানের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে শত্রুপক্ষীয় বিমানকে বিতাড়িত করে।

ডেনিশ ষ্টীমার "ইংল্যাণ্ড" (২,৭৬৭ টন) এবং নরওয়ে জাহাজ "হোসাঙ্গার" (১,৫৯১ টন) ইউবোটের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী

ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে জাহাজের উপর শত্রুপক্ষীয় বিমান-সমূহ আবার আক্রমণ চালায়। একখানি শত্রুপক্ষীয় বিমান পূর্ব্ব উপকূলের অদূরে বৃটিশ বিমান বহরের একখানি জঙ্গী বিমানের গুলীতে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে।

ভয়ানক তুষারপাতের দরুণ পশ্চিম রণাঙ্গনে পদাতিক বাহিনীর কার্য্য একরূপ বন্ধ হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট বিমান বাহিনী ব্যাপক বিমান আক্রমণ চালায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বৃটেনের হতাহতের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। মোট ৭৫৮ জন হতাহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭১৯ জন মারা গিয়াছে।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

২৪শে জানুয়ারী

কম্যুনিজম ও যুদ্ধবিরোধী পুস্তিকার সন্ধানে পুলিশ ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে কলিকাতা ও হাওড়ায় ব্যাপক খানাতল্লাস করে। কলিকাতা ও হাওড়ার শতাধিক স্থানে খানাতল্লাসী করা হয় এবং কলিকাতার ৩৩জনকে লর্ড সিংহ রোডস্থ গোয়েন্দা অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদের মধ্যে ২১জনকে পুলিশ হেপাজতে রাখিয়া বাকী সকলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাঁহাদিগকে গোয়েন্দা অফিসে নেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ মুজাফর আহম্মদ, মিঃ সোমনাথ লাহিড়ী, মিঃ কে এম আহম্মদ প্রভৃতি কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রনেতা ছিলেন। কংগ্রেস কমিটি, কিষাণ সভা, শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্রসংঘ, বোর্ডিং, কলেজ হোস্টেল, ছাত্রদের মেস, বসতবাড়ী এবং ছাপাখানায় খানাতল্লাসী হয়।

২৫শে জানুয়ারী

গতকল্য কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সে যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, অদ্য তাঁহাদের ১৬জনকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাদিগকে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জেল হাজতবাসের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানেও ভারতরক্ষা আইনানুসারে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সেক্রেটারী শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বান্নুতে উপজাতীয় দস্যুদল ও গ্রামবাসীদের মধ্যে লড়াইয়ের ফলে ৫জন লোক মারা গিয়াছে। বান্নুতে পুনরায় তিনজন হিন্দু অপহৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক।

সিন্ধু পরিষদের স্বতন্ত্র হিন্দু সদস্যদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এই দল মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করিবে।

২৬শে জানুয়ারী

ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হয়। এইবারকার স্বাধীনতা দিবসের বৈশিষ্ট্য এই যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতা সংকল্পবাক্যের চরকা ও খাদি সম্পর্কিত অংশটি অনেকেই আবৃত্তি করেন নাই।

সিন্ধুর দুইজন হিন্দু মন্ত্রী শ্রীযুত নিছল দাস ভাজিরাণী এবং দেওয়ান দৌলতরাম হিন্দু স্বতন্ত্র দলের নির্দ্দেশানুযায়ী পদত্যাগ করিয়াছেন। শক্কর দাঙ্গা এবং হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্টের অক্ষমতার দরুণই তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মাদ্রাজের 'টেকাসীর' একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মুসলিম লীগের কয়েকজন সদস্য স্থানীয় কংগ্রেস অফিস হইতে জাতীয় পতাকা সরাইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

২৭শে জানুয়ারী

যুদ্ধের দরুণ ব্যবসায়ীদের যে অতিরিক্ত লাভ হইবে, তাহার উপর শতকরা ৫০৲ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিবার জন্য ভারত সরকারের "অতিরিক্ত লাভকর বিল" প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী বিলটি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেস করা হইবে।

এলাহাবাদে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বেগম হামিদ আলী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

রেঙ্গুনে হিন্দু-মুসলমানে এক দাঙ্গার ফলে একজন নিহত ও ৪৬জন আহত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার "হরিজন" পত্রে "অহিংসা ও আচরণ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার মতে হিংসার সাহায্যে সর্ব্বহারার দল ক্ষমতা লাভ করিলেও পরিণামে তাহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। হিংসার সাহায্যে যে শক্তি লাভ হইবে অধিকতর শক্তিমানের হিংসার নিকট তাহা হারাইতে হইবে।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান সদস্য কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস চট্টগ্রাম কেন্দ্র হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী

কংগ্রেস সভাপতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বাঙলার নূতন নির্ব্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন করিয়াছেনঃ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত (চেয়ারম্যান), শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার দে ও শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকিশোর বসু এডভোকেট।

পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস্ পাম্পিং ষ্টেশনে (ব্যারাকপুরের নিকটে) কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ একটি নূতন লেবরেটরী খুলিয়াছেন; শহরে যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার গুণাগুণ পরীক্ষার জন্যই লেবরেটরীটি খোলা হইয়াছে। মেয়র শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন অদ্য নূতন লেবরেটরীটি উদ্বোধন করেন।

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী এবং অক্লান্ত দেশসেবক উৎসবচন্দ্র রাউথ কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে বসন্ত রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারেল হার্টজগ ও ডাঃ মালানের পার্লামেণ্টারী দলের মধ্যে এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। চুক্তির উদ্দেশ্য হইল বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপন।

২৯শে জানুয়ারী

বঙ্গীয় কংগ্রেসের ব্যাপার সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম। "এড হক" কমিটিই নির্ব্বাচন পরিচালনা করিবেন।"

রেঙ্গুনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এতাবৎ ছয়জন মারা গিয়াছে এবং ১০৭ জন আহত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল দূরে ২৪ পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া গ্রামে নফরচন্দ্র গাইন প্রসূতি ভবন এবং শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। বাঙলা গবর্ণরের পত্নী লেডী মেরী হার্ব্বার্ট প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় নফরচন্দ্র গাইন মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার পুত্রগণ প্রায় ৭২ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানটি নির্ম্মাণ করিয়া উহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সিন্ধু মন্ত্রিসভার সঙ্কট আসন্ন। সিন্ধু পরিষদের মোট ৬০ জন সদস্যের মোট ২৯ জন সরকারবিরোধী দলে যোগদান করিয়াছেন।

৩০শে জানুয়ারী

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মহাজাতি সদনের লাইব্রেরী হল, রুম ও ব্যায়ামাগার নির্ম্মাণের জন্য কর্পোরেশন এককালীন এক লক্ষ টাকা দিবেন। মহাজাতি সদন কমিটির হাতে টাকাটা দেওয়া হইবে। এক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাবের পক্ষে ৪১ ও বিপক্ষে ৩৮ জন কাউন্সিলার ভোট দেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ সদস্যগণ উক্ত প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন।

আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকারের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ১৩ই মাঘ ১৩৪৬ সাল। Saturday, 27th January 1940. [১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আপোষ-উদ্যমে মহাত্মা—

ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীকে বড়লাটের বোম্বাইয়ের বক্তৃতাকে ভিত্তি করিয়া বড়লাটের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা চালাইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করা গিয়াছিল। মহাত্মাজী ২০শে জানুয়ারী 'হরিজন' পত্রে সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন। তিন বলেন,—যুদ্ধের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব নই। মহাত্মাজী যে-যুদ্ধের নিয়ামক হইবেন, সে-যুদ্ধ অবশ্যই অহিংস হইবে এবং কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থায় নিরুপদ্রব অহিংসাই যুদ্ধের একমাত্র অস্ত্র; কিন্তু মহাত্মাজী তেমন যুদ্ধও চাহেন না বরং তিনি আপোষই চাহেন; এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, যেখানে যুদ্ধই নাই—সেখানে আবার আপোষ কি? কিন্তু মহাত্মাজী যুদ্ধে না আসিয়াও আপোষ চাহেন, অর্থাৎ অপরপক্ষের সঙ্গে মতের যেটুকু অমিল বাহ্যত আছে, সেটুকুও দূর করিবার জন্য তিনি আগাইয়া যাইতে উৎসুক হইয়া আছেন এবং তাঁহার মনের এই অনুভূতিটি সাড়া পায় বড়লাটের বোম্বাইয়ের বক্তৃতা হইতে। তিনি বলিতেছেন,—লর্ড লিনলিথগোর সর্ব্বশেষ ঘোষণা আমার ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার আন্তরিকতায় আমি বিশ্বাস করি। সে বক্তৃতায় আপত্তিকর অংশ আছে সন্দেহ নাই; উহার পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; কিন্তু ইহার মধ্যে উভয় জাতির পক্ষে সম্মানজনক মীমাংসার বীজ রহিয়াছে। মহাত্মাজী সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিক। তিনি বড়লাটের বক্তৃতায় সম্মানজনক আপোষ-নিষ্পত্তির বীজ দেখিতে পাইয়াছেন; আমরা তেমন কিছুই দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সে বিষয়টা বড় নহে—বড় হইল সম্মানজনক আপোষ-নিষ্পত্তি। এই সম্মানজনকতার মাত্রা বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে সব এবং সে মাত্রা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও অপেক্ষা করে আদর্শের তীব্র নিষ্ঠা এবং অনুরাগের উপর। মহাত্মাজীর আদর্শনিষ্ঠার উপর সন্দেহ কাহারও কিছুমাত্র থাকিতে পারে না ইহা সত্য এবং এই সত্যকে যখনই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তখনই সম্মানজনক আপোষ-নিষ্পত্তির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সুস্পষ্টই সন্দেহ আসে। এবং আমাদের মনের কথা যদি খুলিয়া বলিতে হয়, তবে আমাদিগকে একথা বলিতেই হয় যে, কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতিক আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপোষ সম্ভব নয়, এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। মহাত্মাজী প্রতিপক্ষকে তাহাদের দৌড় যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে দেন—ইহাই তাঁহার নীতি। এক্ষেত্রে হয়ত সেই নীতির দিকে তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতিই বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর বক্তৃতার মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির সূক্ষ্ম বীজের সন্ধান লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলের পরিণতি কি? অর্থাৎ আপোষ-নিষ্পত্তি যদি সম্মানজনকভাবে না হয়, হইবে না যে, ইহা তো নিশ্চিত, তখন কোন্ পন্থা মহাত্মাজী অবলম্বন করিবেন? এ সম্বন্ধে মহাত্মাজী নিশ্চিত নহেন, তিনি বলিতেছেন, আমার সম্মুখে সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা নাই। সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা নাই, ইহাও বিশেষ নৈরাশ্যের কারণ নহে। আদর্শের তীব্র সংবেদনাই কর্ম্মপন্থাকে প্রস্ফুট করিয়া দেয়; সমস্ত প্রতিকূলতা এবং অন্তরায়কে উপেক্ষা করিয়া অভীষ্টসিদ্ধিতে অব্যর্থ গতিবেগ উদ্দীপিত করিয়া তোলে। সেখানে ভয়ের প্রশ্ন থাকে না, সংশয়ের অবসর থাকে না। এ পথ ভাবের পথ, এমন ভাবের বৈভব তুচ্ছ ভয়-ভীতির অনেক উপরে। মহাত্মাজী এই ভাবের প্লাবন বহাইয়া অঘটন ঘটাইয়াছিলেন, সশস্ত্র বল-বাহন সাম্রাজ্যশক্তিকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। নৈরাশ্যের কারণ এই যে, মহাত্মাজী সেই উদ্দীপনা অন্তরে আর তেমন করিয়া অনুভব করিতেছেন না, পক্ষান্তরে ভয়ের বিচারই আজ তাঁহার পক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চারিদিকে ভয়ই দেখিতেছেন—হিংসার ভয়, অরাজকতার ভয়, শৃঙ্খলাহানির ভয়। একমাত্র চরকা ছাড়া অহিংসার একান্ত আশ্রয় তিনি আর কিছুই দেখিতেছেন না। শ্রমিকেরা কর্ম্মত্যাগ করিলে তাঁহার অরাজকতার ভয়, ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছাড়িলে তাঁহার মনে শৃঙ্খলাহানির ভয় এবং এসব কাজের

মধ্যে মহাত্মাজীর মতে হিংসা ও তাহার ফলে সর্ব্বনাশের ভয়। তিনি চাহেন, শুধু নীতিগত অহিংসা নয়, মনে-প্রাণে অহিংসা। এমন অহিংসা, যেখানে সেখানে হিংস অহিংস কোন সংগ্রামই থাকে না, আর সংগ্রাম করিবার কেহও থাকে না। মহাত্মাজী যদি দেশকে তেমন অবস্থায় লইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তবে সংগ্রামের কর্ম্মপন্থার আর কোন প্রয়োজনই নাই—শুধু এখন নাই তাহা নহে, কোনদিনই নাই; কিন্তু বিদেশীর অধীনতায় প্রপীড়িত ভারত আশু জীবন-সংগ্রামে কিভাবে টিকিয়া থাকিবে ইহাই হইতেছে আমাদের প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নই স্বাধীনতার সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে প্ররোচিত করিতেছে। এ প্রশ্নের সমাধান করিবে কাহারা? দেশ তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

অহিংস সৈনিকের আদর্শ—

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সম্প্রতি একজন বিপ্লববাদীর কথাবার্ত্তা হয়, শ্রীযুত মহাদেব দেশাই "হরিজন" পত্রে এই বার্ত্তালাপ প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মাজীর অহিংস সৈনিকের আদর্শ কি হওয়া দরকার মহাত্মাজী এই কথাবার্ত্তায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাত্মাজী বলেন—"আমি অনেক বারই এই কথা বলিয়াছি যে, যদি একজন খাঁটি সত্যাগ্রহী পাওয়া যায়, তবেই যথেষ্ট হইবে। আমি নিজে তেমন খাঁটী সত্যাগ্রহী হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। আদর্শ যে সত্যাগ্রহী তাঁহার কোন চিন্তাই ব্যর্থ হইবে না। আমি জানি, আমার অনেক চিন্তা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আমি ইহাও জানি যে, আমি খাদির সম্বন্ধে যত চিন্তা করিয়াছি এবং যে সব কথা বলিয়াছি, সে সব সফল হয় নাই। ইহার কারণও আমি জানি। আমি হিংসায় পরিপূর্ণ। আমি আমার ক্রোধ চাপিয়া রাখি কিন্তু ইহা সত্য যে, আমি ক্রোধের অতীত হইতে পারি নাই। আমি যদি নির্ব্বিকার অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে যদি কোন একটা বিষয় চিন্তা করিতে হইত, অমনই কাজে তাহা হইয়া যাইত।"

মহাত্মাজী যদি সে অবস্থায়ই উঠিতে পারেন, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাষায় যদি তিনি সত্য-সঙ্কল্প হইতে পারেন, তাহা হইলে স্বরাজ-সাধনার জন্য চরকারও কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি চিন্তা করিলেই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু মহাত্মাজী নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি সে অবস্থায় উঠিতে পারেন নাই। যিনি নিজেই আদর্শ সত্যাগ্রহী হইতে পারেন নাই, তিনি নিজে কেমন করিয়া নির্ব্বিকার সত্যাগ্রহী গড়িয়া তুলিবেন—যিনি স্বয়ং অসিদ্ধ তিনি অপরকে সাধক করিবেন, কি উপায়ে ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্ন করা বৃথা। মহাত্মাজী দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন—"আমাদের যদি লড়াই করিতেই হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহা শেষ লড়াই হইবে। এ সংগ্রাম সর্ব্বতোভাবেই শেষ-সংগ্রাম হইবে এবং সেই জন্যই শুদ্ধ অহিংসভাবে এই অগ্নিপরীক্ষায় আমার বাহিনী উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা যতদিন না লাভ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহা আরম্ভ না করাই আমার পক্ষে বেশী দরকার হইয়া পড়িয়াছে।" সঙ্কল্প মাত্রেই যে সাধনায় কার্য্যসিদ্ধি হইবে সেখানে সংগ্রামের ভাবনা অবশ্য কোনদিনই নাই, সুতরাং সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। নির্ব্বিকার সেই অবস্থায় অন্নময় কোষকে অতিক্রম করিয়া মানুষ অপ্রমেয় আনন্দ আস্বাদন করিবে; কিন্তু অন্ন-চিন্তায় ভারতের ত্রিশ কোটী লোকের সে স্বপ্নে বিভোর হইবার অবকাশ কোথায়?

রুশিয়া সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রুশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। "ন্যাশনাল হেরাল্ড" পত্রে 'রুশিয়া এখন ব্যাপার কি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন, "রুশ-জার্ম্মান সন্ধির অর্থ তবু বুঝা যায় এবং বাল্টিক রাজ্যসমূহের সম্বন্ধে রুশিয়ার নীতির মূলেও যুক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে রুশিয়া পররাষ্ট্রাপহারী শক্তিবর্গের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য সমবেদনা থাকা—আমরা ভারতবাসী—আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু দেখিতে হইবে, বর্ত্তমানে ফিনল্যাণ্ডে যাহারা তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদের স্বরূপ কি? এই গবর্ণমেণ্ট ফিনল্যাণ্ডের জনগণের দ্বারা সমর্থিত নহে, কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা সমর্থিত। এই গবর্ণমেণ্ট জবরদস্তিতে দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার পিষ্ট করিতেছে এবং আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের জোরেই এই গবর্ণমেণ্টের প্রধান জোর। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ফিনল্যাণ্ডকে কব্জার মধ্যে রাখিয়া রুশিয়ার আদর্শ বা নীতির উপর চরম আঘাত করিবার জন্য আকুল হইয়া রহিয়াছে। ফ্যাসিষ্টদের ভলাণ্টিয়ার দল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিয়া যেমন স্পেন হইতে গণতন্ত্রের উৎখাত করিয়াছিল, আজ ফিনল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিকতাকে উৎখাত করিবার জন্য সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেই অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা এতকাল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আবিসিনিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার সর্ব্বনাশ সাধনই করিয়াছে, দুর্ব্বলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অঙ্গুলিমাত্র উত্তোলন করে নাই, এক রুশিয়া ছাড়া, কেহ স্বপক্ষে জোর করিয়া কথাটা পর্য্যন্ত বলে নাই, আজ তাহাদের চোখে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য প্লাবন বহিতেছে। সাম্যবাদের আদর্শ হইতে সাম্রাজ্য-স্বার্থ এবং শোষণ-স্বার্থকে নিরাপদ রাখার জন্যই যে এই ব্যাকুলতা, পণ্ডিত জওহরলালের দৃষ্টি এমন সুস্পষ্ট সত্যকে এড়াইয়া যাইতেছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা—

গত ৭ই মাঘ, রবিবার হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে দেবানন্দপুরে যে মহতী সভার অধিবেশন হয়, তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী। সভার উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—'ইট কাঠের প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ

করিলে তাঁহার যথার্থ স্মৃতিরক্ষা করা হইবে না। তার চাইতে নিরাশ্রয়া বিধবা ও নিপীড়িতাদিগকে স্বাবলম্বিনী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যবস্থা করিলে, শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা হইবে।' সত্যেন্দ্রবাবু হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু সে দিক দিয়া আমরা তাঁহার প্রস্তাবের বিচার করিতেছি না, তিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সংবেদনার সূত্রটি ধরিতে পারিয়াছেন, এই জন্যই আমরা তাঁহার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ও প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া সেই কথাই বলেন। তিনি বলেন, হিন্দু-সমাজের নারীর দুঃখ-দুর্গতি এমন প্রাণ দিয়া কেহ অনুভব করে নাই। শরৎচন্দ্রের নামে হুগলী অথবা দেবানন্দপুরে অনাথা নারীদের জন্য যদি একটি আশ্রম নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের যথার্থ স্মৃতিরক্ষা করা হইবে। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীও তাঁহার অভিভাষণে শরৎচন্দ্রের সাধনার এই দিকটা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণের উপসংহার-ভাগে তিনি বলেন,—"শরৎচন্দ্র খাঁটি বাঙালী ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন, সর্ব্বকালের সকল দেশের নারী জাতি প্রেমের জন্য এবং মাতৃত্বের মর্য্যাদায় তার সমস্ত কিছুই অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে। নারী-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা-বোধ অকৃত্রিম। তাই তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলি বাঙলা সাহিত্যে আজ উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হয়ে আছে। শরৎ-সাহিত্য বাঙলার নারী-সমাজে আত্মচেতনা ও আত্মসম্ভ্রম জাগিয়ে দিয়েছে, বাঙলা দেশের সমাজ-সংস্কারকেও অনেক দূরে এগিয়ে দিয়েছে।"

শরৎচন্দ্র বাঙলা দেশকে যাহা দান করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যে তাহার বিনিময় হয় না। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিলেও তাঁহার সাধনাই তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। সে দিক দিয়া স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নয়, প্রয়োজনীয়তা হইল জাতির কর্ত্তব্যের দিক হইতে। আমরা আশা করি, দেশবাসীরা শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্যমকে অর্থসাহায্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সফল করিবেন এবং শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া নিজেরা ধন্য হইবেন।

শিক্ষকদের দুর্দ্দশা—

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কর্পোরেশন শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। শিক্ষার প্রচার যে সকলের আগে দরকার, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই, কলিকাতা কর্পোরেশন এদিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। কলিকাতার ৩২টি ওয়ার্ডের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত মাত্র একটি ওয়ার্ডে বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ডাক্তার শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ দেশের শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—'এই দুর্ভাগ্য দেশে শিক্ষকতা, চাকুরীপ্রার্থী যুবকগণের শেষ আশ্রয়স্থল। যাঁহারা আর কোথাও চাকুরী পাইলেন না, তাঁহারাই শিক্ষকের কাজ পাইলেন। এরূপ হইবার প্রধান কারণ, শিক্ষকদের বেতনের হার। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একজন মজুর যাহা রোজগার করে, একজন শিক্ষক তাহার চেয়ে কম বেতন পান। অথচ এই শিক্ষকদের হাতেই আমরা জাতির ভবিষ্যৎ বাঙলার বংশধর-দিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি।' ডাক্তার বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ও বলেন,—শিক্ষকগণকে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা অভাবের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে উচ্চ হারে বেতন দিতে হইবে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন,—"শিক্ষকদের যোগ্যতার অবনতির ফল পাঁচ বৎসর, দশ বৎসর অথবা পনের বৎসরের মধ্যে অনুভূত না হইলেও অবশেষে ইহা জাতিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিবেই।" শিক্ষার বলেই মানুষ মানুষ, জাতি জীবন্ত জাতিতে পরিণত হয়; কিন্তু এ দেশের ব্যবস্থা সৃষ্টি ছাড়া। জাতি গঠনের জবর ওস্তাদ ইংরেজদের অভি-ভাবকত্বে থাকিয়া আজও এ দেশের শতকরা সাত-আটজনের বেশী বর্ণজ্ঞানশূন্য নহে। দোষ দিব কাহাকে, পরাধীনতার পাপের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত!

জিন্নার স্বীকৃতি—

'মুক্তি দিবসের' ব্যাপারে মুসলমান ছাড়া সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্যান্য সম্প্রদায়কে যোগ দিতে আহ্বান করিয়া জিন্না সাহেব প্রত্যক্ষভাবে না হউক, অন্তত পরোক্ষভাবে নিছক মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িয়া জাতীয়তার দিকে ঘেঁসিয়াছেন—মহাত্মাজী এই ভাব ব্যক্ত করিয়া 'হরিজনে' একটি প্রবন্ধ লিখেন। বহু দোষের ভিতর দিয়াও ব্যক্তির গুণকে দেখা মহত্তমের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু জিন্না সাহেব মহাত্মাজীর এই ঔদার্য্যে উত্তেজিত হইয়াছেন এবং চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মহাত্মাজীকে অসঙ্গত ভাষায় খোঁচা দিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি জাতীয়তা মানেন না, বুঝেন না, ভারতবাসীদের জাতীয়তাকে তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "ভারতবাসীরা জাতি তো নয়ই, ভারতবর্ষ একটা দেশও নয়। মুসলমান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সহিত আন্তরিক ঐক্যের সম্ভাবনাকেও তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, দুঃখে-কষ্টে পড়িলে পরও সঙ্গী হয়; এবং কতকটা সমান স্বার্থের দায়েই মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ঐক্য ঘটিতে পারে। এ বিষয়ে আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি পুনরায় কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, ভারতবাসীরা একটা জাতি নহে, কিংবা ভারতবর্ষ একটা দেশও নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়কে লইয়া গঠিত এই ভারতবর্ষ—এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান দুইটি প্রধান।" জিন্না সাহেবের সোজা কথা এই যে, আমি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থই বুঝি, অন্য কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ স্বীকার করি না কিংবা সমস্বার্থের বৃহত্তর অনুভূতির একান্ততাও মানি না। ভারতের ভেদ-বিভেদই যাহাদের ভরসা তাহারা এমন লোককে বড় করিয়া তুলিতে কসুর করিবে না; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা বা ভারতবাসী-দের সংহতিবদ্ধ শক্তিতে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদের উচিত সর্ব্বতোভাবে এমন ব্যক্তির সম্পর্ক বর্জ্জন করা—উপদেশ সব

ক্ষেত্রে সুফল ফলে না বরং অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে। বিষ্ণুশর্ম্মার এই নীতিবাক্যটি স্মরণ রাখিয়া কাজ করা আপোষ-প্রবণ প্রবীণদের পক্ষে আজ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

বড়দিনের অবকাশে রেঙ্গুণে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বৈদেশিক রাজনীতিক ভেদমূলক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে; কিন্তু আমরা বাঙালীরা এই ভেদকে বড় করিয়া দেখি না। এ ভেদ কৃত্রিম, ব্রহ্মের সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গের এবং সমগ্রভাবে এই ভারতবর্ষের অচ্ছেদ্য ভাব-ধারার একটা সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা এই আশা করি, ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের সাধনায় এই ভাবের বন্ধন প্রগাঢ়তর হইয়াই উঠিবে। বিদেশীয় রাজনীতিক ব্যবস্থা বাহিরে ভেদ গড়িয়া তুলিতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের সাধনা, সংস্কৃতির সাধনা ভাবগত—সে সাধনা সজীবিত রাখিলে বাহিরের রাজ-নীতিক ব্যবস্থাগত ভেদ ব্যর্থ হইবে। ডাক্তার বাগচী ব্রহ্ম-প্রবাসী সাহিত্যিকদিগকেও সেইদিকে জোর দিতে বলিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত অভিভাষণে তিনি বলেন,—“এই প্রবাসে এই নূতন আবহাওয়া ও নূতন প্রকৃতির ক্রোড়ে বাঙালীকে এই দেশের মাটির রস আহরণ করা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রাকৃতিক শোভা, নদ-নদী ও পর্ব্বতমালাকে অবলম্বন ক'রে বেড়ে উঠতে হবে। সুতরাং এদেশের জাতির সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে এবং এদেশের সংস্কৃতি হ'তে নিজেদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তাকে নূতন সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির পথ খুঁজে বের করতে হবে। কারণ বাঙালী জাতির সংস্কৃতি বিস্তৃতিলাভ করবে, বাঙালী-মনের সৃষ্টির পট-ভূমিকা পরিসরপ্রাপ্ত হবে।”

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তৃগণ কর্ম্মী ব্যক্তি। তাঁহারা প্রবাসে থাকিয়া বঙ্গবাণীর সেবা-সূত্রে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রসার সাধন করিতেছেন, জাতিকে বড় করিতেছেন, এজন্য তাঁহারা বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

বাঙলা কংগ্রেসের অপরাধ—

ওয়ার্কিং কমিটির সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কিছুকাল হইতে সঙ্ঘর্ষ চলিয়াছে। শ্রীযুত শরৎ-চন্দ্র বসু মহাশয় ওয়ার্কিং কমিটির বিগত অধিবেশনে এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বক্তব্য উপস্থিত করেন, ইহার পর তিনি ঐ বক্তব্য স্মারকলিপির আকারে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট দাখিল করিয়াছেন। বসু মহাশয় তাঁহার এই বিবৃতিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সব কথা খুলিয়া বলিয়াছেন এবং সমিতির বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে নিতান্ত ভ্রান্তধারণা-প্রসূত ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র যে সব তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন ওয়ার্কিং কমিটি যদি সে সব জানিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে এতদূর যাইতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। যাঁহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে ঐ সব অভিযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা সেগুলি চাপিয়া গিয়াছেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে বর্ত্তমানে বাঙলা দেশের যে দুইজন প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা এসব কথা কমিটির গোচরে আনেন নাই। এমনটা দাঁড়াইবার কারণ কি, শরৎচন্দ্র সে কথাটা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক সুভাষচন্দ্র দণ্ডিত ও অপসারিত হইবার পরও বাঙলা কংগ্রেস তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতেছে—ক্ষোভের প্রকৃত কারণ হইল ইহাই। বাঙলা দেশের কংগ্রেস-নিষ্ঠায় যাহারা সন্দেহ করে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের নিজেদের মনের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে। সুভাষচন্দ্র তাঁহার প্রেমপরিনিষ্ঠ স্বদেশ সেবায় এবং অত্যু-জ্জ্বল দানের প্রভাবে সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জ্জন করিয়াছেন, স্বাধীনতার সাধনায় সুতীব্র ত্যাগের পথে চিরদিন বিশ্বাসী বাঙালী জাতি আজ যদি তাঁহাকে অস্পৃশ্য পর্য্যায়ে ফেলিতে রাজী না হয়, সে আপশোষ করিয়া লাভ নাই। প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের কর্ত্তব্য হইল সংকীর্ণতা প্রসূত এই অন্ধ আক্রোশকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া দেশ সেবার সাধনায় নিষ্ঠাপর থাকা। আমরা এখনও আশা করি যে, ওয়ার্কিং কমিটি এখনও তাঁহাদের অন্তর হইতে অবাঞ্ছনীয়রূপে এবং অনুদারভাবে আরোপিত সংস্কারকে দূর করিয়া বাঙলার মর্য্যাদাকে স্বীকার করিয়া লইবেন এবং কংগ্রেসের শক্তিকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিবেন।

পুণ্যাত্মা ও স্বাধীনতা—

শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—“পুণ্যাত্মাগণের সংখ্যার উপরেই যদি কোন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তাহা হইলে ভারত-বর্ষের বহু পূর্ব্বেই স্বাধীন হওয়া উচিত ছিল। কার্য্যত ব্যাপার এইরূপ হইলে ভারতবর্ষ কোন দিনই পরাধীন হইত না।” রায় মহাশয় কাহাদিগকে পুণ্যাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন জানি না। তবে চরকা অবলম্বন করিলেই যে পুণ্যাত্মা হওয়া যায়, খাদি পরিলেই পুণ্যাত্মা হওয়া যায়, মিলের কাপড় পরিলে যে পুণ্যাত্মা থাকা যায় না, অস্ত্র স্পর্শ করিলেই বা বলপ্রয়োগ করিলেই যে সকলে অসদাত্মা হইয়া পড়ে আমরা একথা বিশ্বাস করি না। স্বার্থত্যাগ এবং পরার্থপরতা—অন্তরের ঔদার্য্য এবং প্রসারতাতেই আমাদের মতে পুণ্যাত্মা-দের পরিচয় এবং এমন পুণ্যাত্মাদের উপর সব দেশের রাজ-নৈতিক স্বাধীনতাই ন্যূনাধিক পরিমাণে নির্ভর করে; এমন পুণ্যাত্মাদের একান্ত অভাবেই ভারত পরাধীন হইয়াছে। ভারতে চরকার প্রাচুর্য্য ছিল কিন্তু পুণ্যাত্মার ছিল অভাব এবং এখনও চরকার প্রাচুর্য্য হইলেই পুণ্যাত্মাদের প্রচুর প্রাদুর্ভাব ঘটিবে না। দেশের স্বার্থ,—জাতির বৃহত্তর স্বার্থ উপলব্ধি করিবার লোক যদি ভারতে বেশী থাকিত, তবে ভারত পরাধীন হইত না এবং যাহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া সেই বৃহত্তর স্বার্থকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই—পুণ্যাত্মা।

স্বাধীনতার সঙ্কল্প

দুর্য্যোগ-ঘন আঁধার রাত্রিতে যাত্রীদল বাহির হইয়াছিল। ১১ বৎসর পূর্ব্বে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা মনে পড়ে। উত্তর ভারতের প্রবল শীতের সেই প্রচণ্ড বাতাস শরীর কাঁপাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু অন্তরে অন্তরে অসীম আবেগ—মহৎ আদর্শের উদ্দীপনা। সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সঙ্কল্পের সাধন করিতে হইবে বীর্য্যের এই সংবেদনা সেদিন স্বদেশপ্রেমিক-দিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইরাবতী নদীতীরে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেদিন ঘোষণা করিলেন,—"ভারতের স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ প্রভুত্ব হইতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে ভারত-বাসীদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতবাসীরা বিশ্ব-জগতের সহযোগিতা সর্ব্বপ্রকারে অভিনন্দিত করিয়া লইবে এবং এমন কি বৃহত্তর সমষ্টির স্বার্থের জন্য নিজের স্বাধীনতারও কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত হইবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

পণ্ডিত জওহরলাল বলিলেন সুস্পষ্ট ভাষায়—"আপনারা যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, আসল কথা হইল শক্তির প্রতিষ্ঠা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কোন অধিকার ভারতবর্ষকে প্রকৃত শক্তির অধিকারী করিবে এ বিশ্বাস আমি করি না। এই শক্তির প্রকৃত পরীক্ষা হইল বিদেশীর সৈন্যশক্তির প্রভুত্ব এবং অর্থনৈতিক কর্ত্তৃত্বের সম্পূর্ণ অপসারণ। আসুন, আমরা সর্ব্বতোভাবে এই বিষয়ের উপর আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করি, আর সব সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।"

ইহার পর ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র পূর্ণ-স্বরাজ দিবস প্রতিপালিত হয় এবং জাতি স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করে। ঐ সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার পর হয় সংগ্রামের আরম্ভ। ভারতের সে সংগ্রাম রক্তপাত-বহুল না হইতে পারে কিন্তু সে সংগ্রামের তীব্রতা সামান্য হয় নাই। স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার লেলিহান শিখায় সাগ্নিকের দল সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়াছে এবং আত্মনিবেদনের অমোঘ প্রভাবে ভারতবাসীদের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে আত্যান্তিকতাকে উপলব্ধি করিয়াছে সমগ্র জগৎ। কংগ্রেসের ভিতর দিয়া জাগ্রত ভারতের সমগ্র শক্তি আকার ধরিয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসীদিগকে পুত্তলিকার মত পরিচালিত করিয়া নিজেদের সাম্রাজ্যস্বার্থ সিদ্ধ করিবার স্বপ্নে যাহারা বিভোর ছিল তাহাদের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে কংগ্রেস। স্বার্থ-কলুষিত যুক্তি-তর্কের সহস্র দোহাই দিয়াও কংগ্রেসের শক্তিকে অস্বীকার করিবার শক্তি বা সাহস আজ আর সাম্রাজ্য-বাদীদের নাই।

অভীষ্ট আমাদের লাভ হয় নাই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু অভীষ্ট লাভ না হইলেও যে শক্তির পথে আমাদের অভীষ্ট লাভ হইতে পারে কংগ্রেসের সুদীর্ঘ সাধনা সমগ্র জাতির সম্মুখে আজ তাহা সুস্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছে। স্বাধীনতা অপরের অনুগ্রহে মিলে না, তাহা নিজের প্রাণপাতী সাধনায় অর্জ্জন করিতে হয়, এ সম্বন্ধে জাতির অন্তরে আর কোন সংশয় নাই এবং সেই সংশয় নাই বলিয়াই পরনির্ভরতায় প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষ স্পর্শ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে যে নীতির সঙ্গে স্বাধীনতাকামী ভারতের চিত্ত তাহার প্রসঙ্গ মাত্রে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কংগ্রেসের দুস্তর সাধনা ভারতকে এই শক্তির এই সত্যকার সংবিদ আনিয়া দিয়াছে বলিয়াই নেতাদের কোন-রূপ দুর্ব্বলতা ভারতের সমষ্টির আত্মাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। জনগণের অন্তরে অবস্থান করেন যে নারায়ণ, কংগ্রেসের সাধনায় আজ তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন এবং শক্তির সম্বিদের বিজ্ঞানে জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন। কোন নেতার ব্যক্তিগত বিচারের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি-কার্পণ্য আজ আর জাতিকে অভিভূত করিতে পারে না। ব্যক্তির অন্ধ আনুগত্য হইতে সমষ্টির সেবার মধ্যে ভারতের সত্যকার শক্তিকে কংগ্রেস সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কংগ্রেসের এই যে অবদান ইহা অভূতপূর্ব্ব এবং অসীম, শুধু তাহাই নহে যুগান্তকারী।

একাদশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পরিবর্ত্তন কি ঘটিয়াছে? আমরা বলিব পরিবর্ত্তন অনেক কিছুই ঘটিয়াছে, অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতি যে শক্তি উপচিত হয়, তাহার স্থূল রূপ প্রচণ্ড আকারে সব সময় ফুটিয়া উঠিতে না পারে, কিন্তু সংবেদনার মধ্যে সে প্রচণ্ডতা সম্পুটিত থাকে এবং প্রতিকূলতার স্পর্শে তাহার স্বরূপ প্রকটিত হয়। ভারতের সমষ্টির অন্তরে স্বাধীনতার এই স্পৃহা যে একান্ত এবং উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে, এসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার অবসর নাই। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের সংস্কার অন্তরে লইয়া এই সংবেদনাকে অনেক সময় উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, বৃহত্তর আদর্শের উদ্দীপনায় কতকটা অসতর্কভাবে এই শক্তি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে।

কংগ্রেস ভারতকে সমষ্টি-স্বার্থে সংহত করিয়াছে, ইহা সত্য; ক্ষুদ্র স্বার্থবাদীদের কৃত্রিম আন্দোলন সত্য নহে; সংবেদনার দিক হইতে আত্যান্তিক বা একান্ত নহে—গভীর নয়। গভীরতা থাকে ছন্দে, ভাষার কসরতে নয়। কংগ্রেস ত্যাগের পথে আত্ম-নিবেদনের পথে, সেবার পথে সমষ্টির অন্তরে যে ছন্দকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ঐক্যের সুর ধরিবার যে অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, ইতর স্বার্থবাদীদের ভাষার কসরতের সাধ্য নাই যে তাহা ক্ষুন্ন করে।

সত্য আছে স্থির—ওরে ভীরু, ওরে মূঢ় তোল তোল শির, ২৬শে জানুয়ারীতে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য এই অভয় বাণীতে আমাদিগকে দৃপ্ত করিয়া তুলুক। আমরা যেন আমাদের ব্রতে স্থির থাকিতে পারি। শুধু তাহাই নয়, অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দীপনা আজ আমাদের মধ্যে উগ্র হইয়া উঠিয়া অনুদার সকল কার্পণ্যকে যেন অপসারিত করিয়া দেয়। স্বাধীনতা অনুগ্রহের দান নহে, অপরের ভরসায় তাহা পাওয়া যায় না, আত্মাবদানের পথে তাহা অর্জ্জন করিতে হয় এই আজ আমরা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি।

আজ আবার ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের কথা উঠিয়াছে এবং তাহার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য লইয়া অতিবুদ্ধিমানের দলের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আমরা ভাষ্য বা ব্যাখ্যার এই বিভ্রাটের কোন বিতর্কের গুরুত্বকে স্বীকার করি না। সম্পূর্ণ পরকীয় প্রভাব-বিনির্ম্মুক্ত রাষ্ট্রীয় যে অধিকার, আমরা স্বাধীনতা বলিতে তাহাই বুঝি এবং লাহোরের কংগ্রেসে সেই পূর্ণস্বাধীনতাই জাতির সাধ্য এবং সাধনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কিছুই ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার আদর্শ বা লক্ষ্য হইতে পারে না।

আপোষ-নিষ্পত্তি হইতে পারে শুধু সেই সর্ত্তেই—অর্থাৎ যদি ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় তবে। কথার কারসাজীতে ভুলিবার আর সময় নাই। সে খেলা অনেক কিছুই হইয়াছে এবং এই যে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস ইহাও আমরা নূতন শুনিতেছি না—কাজে ভারতবাসীদের হাতে রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্ব আজ দিতে হইবে, কোন মীমাংসা যদি হয়, তবে সেই পথে হইতে পারে অন্য কিছুতে নয়।

জগতে আজ একটা সঙ্কট সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে, আমরা ইহা না বুঝি ইহা নয়; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, একমাত্র স্বাধীন ভারতই এই সঙ্কট সমস্যার সমাধানে সত্যকার সাহায্য করিতে পারে। ভারতবাসীদিগকে সেই স্বাধীনতা দান করিতে ব্রিটিশ জাতির কর্ণধারগণ কথায় নহে, কার্য্যত কতখানি প্রস্তুত আছেন, আমরা আজ তাহাই জানিতে চাই।

বড়লাট বোম্বাইতে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং সে বক্তৃতায় ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা এই যে, বড়লাটের সে বক্তৃতায় সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। ১৯৩০ সালে তৎকালীন বড়লাটের মুখে আমরা ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে যতটা সম্ভব ঐক্যের পথে ভারতকে অধিকার দানের কথা শুনিয়াছিলাম, এখন শুনিতেছি এই যে, আগে ভারতের সকল দল এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হউক তবে ভারতকে রাজনীতিক অধিকার দেওয়া হইবে। এই কথার ইঙ্গিত কি, তাৎপর্য্য কি, অস্পষ্ট কিছুই নয়, ভারতকে অধিকার না দিবারই কথা এবং ভারতের জনমতের অস্বীকৃতির ঔদ্ধত্যই এমন উক্তিতে অন্তর্নিহিত। কথায় আমরা সন্তুষ্ট নহি—রাজনীতিকক্ষেত্রে কথার মূল্য কিছুই নাই; বলশালী যাহারা, যাহারা স্বাধীন তাহাদের কাছেই নাই,—দুর্ব্বল যাহারা, অধীন যাহারা তাহাদের কাছে দেওয়া কথা বা জাঁকালো ভাষার প্রতিশ্রুতির কিছুমাত্র মূল্য থাকিতেই তো পারে না। নিজদের সুবিধা পাইবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সুবিধা বুঝিলেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা—পাশ্চাত্য রাজনীতির এই রীতি, আমাদের পক্ষেও তাহার অন্যথা ঘটিতে পারে না,—কোনদিন ঘটেও নাই। রাজনীতিতে মূল্য আছে একমাত্র জিনিষের, সে জিনিষ হইল শক্তি। যাহার শক্তি আছে, তাহার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিই গুরুত্ব লাভ করে এবং তাহার কথাই—যুক্ত-বুদ্ধি সে কথার মূলে থাকুক আর নাই থাকুক, মর্য্যাদা লাভ করে। *অদ্যকার এই পবিত্র তিথিতে আমরা যেন এই সত্যটি বিস্মৃত না হই। এই তিথির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ভারতের যে সব বীর সন্তান আত্মদান করিয়াছেন, দুঃখ-কষ্ট, নির্য্যাতন-লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইয়াছেন—তাঁহাদের স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমরা যেন কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে পরপ্রত্যাশার এবং পরের অনুগ্রহের অপেক্ষার প্রচ্ছন্ন পাপের স্পর্শেও নিজেদের চিত্তকে কলুষিত না করি।* ব্রত যতই কঠিন হউক না কেন, পরীক্ষা যেমনই কঠোর হউক না কেন, উন্নতমস্তকে সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই যেন আমরা অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে, আমাদের ধমনীতে শোণিতবিন্দু বহমান থাকিতে যেন কোন উদ্ধত হস্তই তাহাকে অবনমিত করিতে সাহসী না হয়।

স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাণী সব কথার কুহেলী জাল হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভে একান্ত করিয়া তুলুক। ভারতের জনশক্তি জাগিয়াছে, তাহারা আর ঘুমাইয়া নাই। ভেদ-বিভেদের বিভীষিকা যত সব মিথ্যা; সমষ্টি স্বার্থের সংবেদনা ইহাই সত্য এবং সেই সমষ্টি স্বার্থের সংবেদনার স্পর্শমাত্রে যত ভেদ-বিভেদের বিভীষিকা বিলীন হইয়া যাইবে; সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের যত বাজে অন্তরায় টানিয়া বুনিয়া আনা হইতেছে কোথায় ভাসিয়া যাইবে—এই আত্মপ্রত্যয় যেন আমাদের অভীষ্ট সাধনায় বল-বীর্য্যের উদ্বোধন করে, তখন বুঝিব বাহিরের যত অন্তরায়, যত বিভীষিকা সবই কৃত্রিম, সত্য স্থির আছে এবং সেই সত্যের প্রতিষ্ঠাই আমাদের রাষ্ট্রীয় সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

চলতি ভারত

পাঞ্জাব

ধর্ম্ম ও রাজনীতি

অধ্যাপক প্রিতম সিং 'ট্রিবিউন' কাগজে 'গুরুগোবিন্দ সিংএর সাধনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, আর সেই প্রবন্ধে শিখেদের কাছে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতাকে পরিহার করতে। ধর্ম্মের নাম ক'রে বিশেষ অধিকারের দাবী করাকে তিনি শিখধর্ম্মের বিরোধী ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন। কারণ, তাঁর মতে শিখ-ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী হচ্ছে সকলের সঙ্গে ঐক্যের উপলব্ধি। আমি শিখ-হিন্দু থেকে পৃথক, মুসলমান থেকে পৃথক, আমার জন্য বিশেষ অধিকার চাই চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে—এই পার্থক্যের অনুভূতি ঐক্যের অনুভূতির বিরোধী এবং সেই জন্যই ধর্ম্মসঙ্গত নয়। অধ্যাপক প্রিতম সিং যে কথা বলেছেন শিখদের লক্ষ্য ক'রে, শ্রীযুত জিন্না যদি সেই কথা বলতে পারতেন মুসলমানদের লক্ষ্য ক'রে, সব ব্যবধান লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে এই শতধাবিভক্ত জাতি আজ একটা অখণ্ড মহাজাতিতে পরিণত হোতো। কিন্তু আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ধর্ম্মের মর্ম্মকথাটি ভুলে গিয়ে—নিজেদের একান্তভাবে এক একটা পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের লোক মনে ক'রে। হিন্দু, শিখ, জৈন এবং খৃষ্টানদের মতো মুসলমান একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলমান হিসাবে তাঁরা নিজেদের ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতির মর্য্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন। কংগ্রেস তো সে দাবীকে মেনেই নিয়েছে। কিন্তু যেখানে রাজনীতির ব্যাপার, সেখানে তো মুসলমান হিসাবে করবার কিছুই নেই—সেখানে ধর্ম্মের প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবাসী হিসাবে পরিচয় হোলো সব চেয়ে বড় পরিচয়—সেখানে দলের সঙ্গে দলের সংঘর্ষ হওয়া উচিত কি ধর্ম্ম মত পোষণ করি তা নিয়ে নয়, কি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত পোষণ করি তাই নিয়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের যোগ দেওয়া উচিত মডারেট, উদারনৈতিক, গান্ধীপন্থী অথবা মার্কসপন্থী হিসাবে। সেখানে মুসলমান অথবা হিন্দু হিসাবে যোগ দেওয়া একেবারেই অর্থহীন। জাতির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির পথে কোনো সংখ্যালঘিষ্ঠ দলেরই বাধা সৃষ্টি করবার অধিকার নেই—যদি কেউ সে বাধা উপস্থিত করে, তাকে নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা ক'রতে হবে। ধর্ম্মে আর রাজনীতির সংঘর্ষ হচ্ছে মানুষের মধ্য যুগের সংঘর্ষ। আমরা মধ্য যুগকে পেরিয়ে এসেছি বিংশ শতাব্দীর যুগে। এ যুগে পুরুত আর মোল্লা আর পাদরীদের কোনো অধিকার নেই রাজনীতির ক্ষেত্রে অনর্থক হস্তক্ষেপ করবার।

যুক্তপ্রদেশ

পুরানো সেই খেলা

"বৃটেন যদি ভারতবর্ষকে অনুমতি না দেয় নিজের ইচ্ছা এবং বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ ক'রে ভাগ্যকে গ'ড়ে তুলতে—তবে স্পষ্ট বোঝা যাবে, সে বেরিয়েছে জগতকে গণতন্ত্রের অনুকূল করবার জন্য নয়, নিজের এবং নিজের সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের স্বার্থের অনুকূল করতে। এর অনিবার্য্য পরিণতি হ'চ্ছে ভার্সাই সন্ধিপত্রের পুনরাবৃত্তিতে। এখনকার চেয়ে বৃহত্তর সর্ব্বনাশের মধ্যে এর অবসান।" কথাগুলি আচার্য্য কৃপালনীর আর এর মধ্যে সার আছে যথেষ্ট। গত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ অনেক টাকা আর অনেক অর্থ ঢেলেছিল জগতটাকে গণতন্ত্রের মন্দিরে পরিণত করবার জন্য। সবই ভস্মে ঘৃত ঢালা হ'য়েছে—কারণ, সেদিন যারা গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি ক'রে বলেছিল, যুদ্ধকে চিরদিনের জন্য শেষ ক'রতে তারা লড়ায়ে নেমেছে, তাদের মন আর মুখ এক ছিল না। ভার্সাই সন্ধিপত্র তাই রচিত হয়েছিলো গণতন্ত্রের নিশানকে উড্ডীন রাখবার জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থকে ষোল আনা বজায় রাখবার জন্য। এবারও যারা গণতন্ত্রের জয়-ধ্বনি দিয়ে ভারতকে ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য ডাকছে, তারা যে সত্যি সত্যি সাম্যের এবং স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে মানবসভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার প্রমাণ কোথায়? তাদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হতো—যদি তারা গণভোটের দ্বারা ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার ক'রে নিতো। ভারতবর্ষের বেলায় যারা গণতন্ত্রের আদর্শকে স্বীকার করতে অক্ষম—তাদের গণতন্ত্রপ্রীতি কতখানি আন্তরিক, তাহা সহজেই বোধগম্য। এরকম একটা অবস্থায় যারা মনে ক'রেছে, যুদ্ধ শেষে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কুরুক্ষেত্রের রক্তসাগরে ফুটে উঠবে গণতন্ত্রের শ্বেত শতদল—তাদের আশাবাদী মনের কল্পনা-শক্তি সত্যি সত্যিই বিস্ময়কর। আমরা দেখছি সেই পুরানো খেলা ঠিক আগের মতোই চলেছে। সাম্রাজ্যবাদের মুখে গণতন্ত্রের মুখোস পূর্ব্বের মতোই শোভা পাচ্ছে। কেবল সময়ের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে! কুকুরের লেজ কবে সোজা হবে—কে জানে!

জাতির ভাগ্য নারীর হাতে

নিখিল ভারত ছাত্রী সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতায় নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে—তা অতীব মূল্যবান। জনসভায় বড়ো বড়ো প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে এবং লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কতখানি ফলবতী হবে—সন্দেহের কথা। বিদ্বেষের শিকড় জাতির মজ্জা পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে। এই শিকড়কে উৎপাটিত করতে হ'লে

মানুষের বয়স যখন খুব কাঁচা থাকে, তখন থেকেই তার মনের জমিতে প্রেমের বীজ বপন করতে হবে। ছেলেবেলায় মানুষের অন্তরে যে আদর্শ শিকড় গেড়ে বসে, সেই আদর্শই তার জীবনের ছোট-বড় আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। অথচ এই ছেলেবেলাটাকে আমরা কত রকমেই না উপেক্ষা ক'রে থাকি। তাই শ্রীযুক্তা নাইডু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উপরে বিশেষ ক'রে জোর দিয়েছেন। ছেলেবয়সের শিক্ষার ভার নেবার যোগ্যতা মেয়েদেরই সব চেয়ে বেশী, কারণ শিশুরা মেয়েদেরই কোলেপিঠে মানুষ হয়। জীবনের সেই প্রত্যুষে মেয়েরা যে আদর্শকে শিশুর মনে প্রতিষ্ঠিত করবে—তারই আলোয় সে চিনে নেবে কোন্ আচরণ ভালো, আর কোন্ আচরণ মন্দ। তাই একথা খুবই সত্য—মানুষের ইতিহাসের ধারা মঙ্গলের পথে চলবে, না অমঙ্গলের পথে চলবে—তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার উপরে—কারণ তারাই ভবিষ্যতের নাগরিক; আর শিশুরা হিটলার হবে, না গান্ধী হবে—তা নির্ভর করছে শিশুদের মায়েরা কোন্ আদর্শে তাদের গড়ে তুলবে, তারই উপরে। নারীকে যারা উপেক্ষার চোখে দেখে, তাদের নির্ব্বুদ্ধিতার সত্য সত্যই কোনো সীমা নেই।

যুদ্ধ ও খাদি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু খদ্দরের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ক'রে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলিতে যে ইস্তাহার প্রেরণ করেছেন, তার মধ্যে একটা কথা বিশেষ ক'রে ভাববার আছে। তিনি বলেছেন, "ইয়ুরোপে যুদ্ধ বাধার জন্য ভারতে বিদেশী কাপড়ের আমদানী বন্ধ হ'তে বাধ্য। ফলে কাপড়ের অল্পতার সুযোগ নিয়ে ভারতের কলগুলি বস্ত্রের মূল্য যে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়ে দেবে—এতেও কোনো সন্দেহ নেই। যদি যথেষ্ট পরিমাণে খদ্দর উৎপন্ন হয়, তবে শুধু যে জনসাধারণের আর্থিক মঙ্গল হবে, তা নয়—খদ্দরের পরিমাণ-বৃদ্ধি কাপড়ের দামকে বাড়তে দেবে না।" গত মহাযুদ্ধের সময় কাপড়ের অগ্নিমূল্যের কথা আমরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইনি। সেই দুর্দ্দিন আবার এসেছে ভারতবর্ষে। এবারেও বিদেশ থেকে কাপড় আমদানী বন্ধ হ'তে বাধ্য এবং এবারেও ভারতের কাপড়ের কলের মালিকেরা সময় বুঝে দাঁও মারবার চেষ্টা করবে—এতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমরা যদি ঘরে ঘরে চরকা চালিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী ক'রে নিতে পারি—আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোনো ধনকুবের আপনার তহবিলকে স্ফীত করতে পারবে না। খদ্দর পরবার অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে জওহরলালের যুক্তিও যে অন্যতম—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভালো।

মাদ্রাজ

বক্তৃতা ও কাজ

ডাঃ আরেণ্ডেল মাদ্রাজের এক বক্তৃতায় ছেলেদের সভা-সমিতিতে যাওয়া বন্ধ ক'রে কেবল নীরবে কাজ ক'রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে খুব খানিক হৈ চৈ করাটাই যে দেশাত্মবোধের পরিচয় নয়—একথা সত্য। মানুষ সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কি না—তার পরিচয় ফুটে ওঠে সেবার মধ্যে। যারা বক্তৃতা করে, তারা যে সব সময় যুক্তিকে অনুসরণ করে—একথাও সত্য নয়। অনেক বক্তা এমন অনেক কথা ব'লে থাকেন, যার ফলে ভাবপ্রবণ যুবকেরা ভ্রান্ত পথের পথিক হয়। কিন্তু তাই বলে ডাক্তার আরেণ্ডেলের প্রতিধ্বনি করে একথা আমরা কখনোই বলবো না যে, রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়া ছাত্রদের পক্ষে অনুচিত। কর্ম্মীরা যেমন নিঃশব্দ সেবার দ্বারা দেশকে মঙ্গলের পথে আগিয়ে দেন, বাগ্মীপুরুষেরাও তেমনি অগ্নি-গর্ভ বাণীর দ্বারা দেশের জনসাধারণকে চরম ত্যাগের জন্য অনুপ্রাণিত ক'রে তোলেন। আমরা অন্তরে যাকে সত্য ব'লে অনুভব করি, তাকে অন্যের কাছে ব্যক্ত করা আমাদের কর্ত্তব্য। বক্তৃতার অথবা লেখনীর সাহায্যে আমাদের আদর্শকে আমরা সকলের মাঝে ব্যাপ্ত করবার সুযোগ পাই। বক্তৃতা শুনবার সুযোগ থেকে ছেলেদের বঞ্চিত করলে, তাদের পক্ষে সত্যকে জানার পথ কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে উঠবে। বক্তার বাণীকে আশ্রয় ক'রে ইতিহাসে আসে যুগান্তর। রুসোর লেখার সঙ্গে ড্যানটনের বাগ্মিতা না মিশলে ফরাসী বিপ্লব দেশব্যাপী দাবানল জ্বালতে সমর্থ হোতো না। নন-কো-অপারেশনের আগুনকে ছড়িয়ে দেবার জন্য ইয়ং ইণ্ডিয়ায় গান্ধীজীর লেখার যতখানি প্রয়োজন ছিল, সহস্র সহস্র জনাকীর্ণ সভায় বক্তৃতা করবার জন্য তাঁর কণ্ঠেরও তেমনি প্রয়োজন ছিল। বাগ্মী বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠধ্বনি ভারতের নব-জাগরণে কতখানি সাহায্য করেছে, ভাষায় তার পরিমাণ করা চলে না। যে দেশে বাগ্মীর অভাব, সে দেশ সত্য সত্যই দুর্ভাগা। সুতরাং কর্ম্মের উপরে অত্যন্ত জোর দিতে গিয়ে বক্তৃতার মর্য্যাদাকে ম্লান করা কোনোক্রমেই ঠিক নয়।

১

বিমলকান্তি গিয়েছিল বর্ম্মায়। শুনেছিল, বর্ম্মার মাটীতে নাকি সোনা ফলে! সেখানে মাথার দাম আছে এবং বাঙালীর মাথা যদি বর্ম্মার বাণিজ্য-বাজারে একবার খেলবার সুযোগ পায়, তাহলে ভিড়ের মধ্য থেকে মা-লক্ষ্মী সেই মাথাটিকেই না কি বিজয়-মুকুটে বিভূষিত করেন! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বহু মাথাওয়ালা বাঙালীর নামের মালা আর্ট-গ্যালারির চিত্রাবলীর মত তার মানস-নয়নে দোদুল্যমান ছিল।

কিন্তু বর্ম্মায় দেড় বছর বাস ক'রে সে বুঝে নিল দুটি বাঙলা প্রবচনের সার্থকতা। এক নম্বরের প্রবচন, "তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে"; এবং দু' নম্বরের প্রবচন, "দূর হতে সে বড় ভালো!" কাজেই অবসন্ন দেহ-মন এবং খানিকটা লোকসানের অঙ্ক নিয়ে সে ফিরে এল।

বয়সে তরুণ। বিমলকান্তির বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে রাঁচী শহরে। বাবা অয়স্কান্তি ওকালতি করতেন এবং বিমলকান্তি তাঁর একটিমাত্র সন্তান। ওকালতিতে অয়স্কান্তি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন, কিন্তু ছেলের ও-ব্যবসার দিকে তিলমাত্র আকর্ষণ নেই দেখে ছেলের অবলম্বনস্বরূপ তিনি একটি কারবার গ'ড়ে যেতে চেষ্টিত ছিলেন; মা-লক্ষ্মী তাঁর এ নিষ্ঠা-ভঙ্গে বোধ হয় রাগে বিমুখ হলেন, কাজেই অয়স্কান্তি ব্যবসার অজানা পথে কণ্টকশরে জর্জ্জরিত হয়ে বেদনাবশে ইহজীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে একদিন বিদায় নিলেন। বিমলকান্তি তখন পড়ে ফোর্থ-ইয়ারে।

অজস্রতার মাঝে এতদিন সে বিভোর ছিল বিচিত্র স্বপ্ন-বিভ্রম-রচনায়। এখন বাপের মৃত্যুতে মাথার উপরে ঋণভার গোবর্দ্ধন গিরির মত সমুদ্যত দেখে তার সে স্বপ্ন ভেঙে গেল এবং পরামর্শদাতাদের চক্রপর্ব্বে দুলে কোনমতে ঋণভার সরিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে সে ভাবলো, গতানুগতিক পথে চলে জীবনকে এদেশে খুব খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না—তখন ইতিহাস এবং কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সে বর্ম্মায় ছুটেছিল।

আজ বর্ম্মার স্বপ্নভঙ্গে রেঙ্গুন-মেলে চ'ড়ে সে এসে নেমেছে ক'লকাতা শহরে।

বাবার বন্ধু ছিলেন প্রিয়শঙ্কর রায়। মস্ত কারবারী লোক। বিমলকান্তি তার জন্মাবধি দেখে আসছে প্রিয়শঙ্করের উপর মা-লক্ষ্মীর কৃপা নিত্যদিন স্বর্ণধারে বর্ষিত। রাঁচীতে তাঁর ব্যাঙ্ক আছে, বহু গোলা আছে;—তাছাড়া হাজারিবাগ, গয়া, কাশী, ঢাকা, ক'লকাতা, বোম্বাই সর্ব্বত্রই একটা-না-একটা বিজয়স্তম্ভ প্রিয়শঙ্করের বাণিজ্য-সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ মাথা তুলে বিদ্যমান!

এই প্রিয়শঙ্করের গৃহে তার গতি চিরদিনই অবাধ এবং প্রিয়শঙ্করের একমাত্র কন্যা বিভাবরী...কিন্তু সে-কথা ক্রমশ-প্রকাশ্য।

বর্ম্মা থেকে ক'লকাতায় ফিরে বিমল উঠল গিয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে বেঙ্গল হোটেলে। জাহাজে একজন সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। এ হোটেলের নাম-ঠিকানাটা তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত। এখানে আস্তানা নেবার আর একটি হেতু, নির্জ্জনে বর্ম্মার নিষ্ফল-অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ক'রে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ।

বিকেলে বিমলকান্তি বেরিয়েছিল—কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প নিয়ে নয়। এবং ঘুরতে ঘুরতে এক সময় নিজের অজ্ঞাতেই চৌরঙ্গীপাড়ায় একটা সিনেমা-হাউসের সামনে এসে পড়লো। এসে দেখে, হাউসের সামনে প্রকাণ্ড ভিড়। গাড়ী চ'ড়ে এবং পায়ে হেঁটে লোকের পর লোক এসে হাউসে ঢুকছে। তারা যেন প্রমত্ত! সে-ভাব দেখলে মনে হয়, এ ছবি না দেখলে জীবনটা যেন মিথ্যা হয়ে যাবে! বিমলকান্তিরও নেশা লাগলো। টিকিট কিনে সে ঢুকে পড়লো এম্পায়ারে।

ভিতরে লোক একেবারে গিশ্‌গিশ্‌ করছে। নরশিরের সাগর যেন!...বিমলকান্তি ভাবলে, বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে ধরবার জন্য নানা জনে নানাবিধ ফাঁদ রচনা করছে সত্য, কিন্তু সিনেমার ফাঁদটাই বুঝি অমোঘ এবং অব্যর্থ! কোথায় আমেরিকার কোন্ প্রান্তে ছোট্ট হলিউড......সেখানে যন্ত্রপাতি, লোকজন নিয়ে যে ছবি তৈরী হচ্ছে, সে-ছবির জন্য এখানে লোকের মনে এতখানি আকুল আগ্রহ......খরচের হিসাব কারো মনকে স্পর্শ করতে জানে না...

এমনি চিন্তার মধ্যে বিরাট গৃহের আলো গেল নিবে'—

মিশ কালো অন্ধকার এবং সে-অন্ধকারে আলোর ছোট রেখায় ফুটল ছবি! ছবি মাত্র! কিন্তু ও-ছবির রেখায়-রেখায় মানব-মনের কি বিচিত্র কাহিনী যে মঞ্জরিত হয়ে উঠল! টুকরো-টুকরো হাসি-কান্না মিলিয়ে হিল্লোলিত মানব-জীবনের সমগ্র পরিচয়!

ছবি দেখে বিমলকান্তি বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত......।

তারপর সে-বিভ্রম ফাঁসিয়ে পর্দ্দার ছবি কোথায় মিলিয়ে গেল! যে-অন্ধকারে নিজেকে একান্তভাবে উপভোগ-অনুভূতির মধ্যে নিঃশেষিত ক'রে দিয়েছিল, সে-অন্ধকারকে ফাঁসিয়ে ঘর হ'ল আলোয় আলো! স্বপ্ন-বিভ্রমকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিপর্য্যস্ত ক'রে জেগে উঠল আশে-পাশে চারিদিকে তীব্র উন্মত্ত বর্ব্বর কলরব-কোলাহল!

ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্ন দেখছে!...সুখের স্বপ্ন! এমন সময়ে ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙালে সে যেমন প্রথমটা হক্‌চকিয়ে থাকে, ভেবে পায় না, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা স্বপ্ন! ইণ্টারভালে আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের উগ্র কলরবে বিমলকান্তিও তেমনি হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল! বিমূঢ়ের মত সে কেমন স্তম্ভিত হয়ে রইল। মনে হচ্ছিল, সব কলরব সরিয়ে জীবনে জেগেছিল একটিমাত্র সুর...সে-সুরে কি আলো, কতখানি বিহ্বলতা! সে-সুর জমাট বাঁধবার আগে এমন ক'রে ছিন্ন হয়ে গেল!...ছবির পর্দ্দায় ঐ যে ছায়ার নর-নারীরা চলাফেরা করছিল, হাসি-কান্নার দোলায় ভেসে...তাদের কথা তাদের হাসি-ব্যথা বিমলকান্তিকে যেন একেবারে তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল...চকিতে তাদের সঙ্গে প্রাণের কি অন্তরঙ্গতাই না স্থাপিত হয়েছিল!...আর কি ঐ ছায়ার নর-নারীদের প্রাণের পরশ এমন ক'রে সে কোনোদিন পাবে?

দু' বছরের মধ্যে বিমলকান্তি সিনেমা দ্যাখেনি। দু' বছর আগে যা দেখেছে, তাও কালেভদ্রে! সে-ছবি তাকে এমন অভিভূত করতে পারেনি!...আজ......

হঠাৎ পিছনদিক থেকে জামা ধরে কে টানলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিঠে পড়লো চড়! বিমলকান্তি চম্‌কে ফিরে তাকালো। বললে,—রজত!

রজত বল্‌লে,—তুই হঠাৎ!...আকাশ থেকে নেমে এসেছিস?

বিমল বললে,—না। রেঙ্গুন-মেল থেকে নেমেছি আজ! তুই...?

রজত বললে,—আমি তো ক'লকাতায় আছি আজ দু' বছর। ...শুনেছিলুম বটে পরেশের কাছে—সে মধ্যে এসেছিল একবার —শুনেছিলুম, তুই বর্ম্মায় গেছিস ব্যবসা করতে।

হেসে বিমল বললে,—গিয়েছিলুম এবং ফিরে এসেছি আজ!

—কি করছিস্ সেখানে?

বিমলকান্তি বললে,—করেছিলুম অনেক কিছুই। কাঠের কারবার করেছি, তারপর আরো নানা ব্যবসা......বর্ম্মার মাটীতে দু'চার হাজার টাকা রেখে শেষে ফিরে আসতে হ'লো ভাই।

রজত বললে,—এখানে কোথায় এসে উঠেছিস?

—বেঙ্গল হোটেলে।

—রাঁচী ফিরবি? না, এইখানেই থাকবি?

বিমলকান্তি বললে,—দু'চার দিন এখানে থাকবো, তারপর রাঁচী ফিরবো।

রজত বললে,—বেশ, সিনেমা ভাঙলে চট্ করে পালাস নি। এতকাল পরে দেখা—আমার সঙ্গে দেখা করবি, বুঝলি?

বিমলকান্তি বললে,—আচ্ছা।

ঘণ্টার কাঁপানো-সুরের সঙ্গে আলো নিবলো এবং ছবির পর্দ্দায় ছায়ার নর-নারীরা আবার সেই দুঃখ-সুখের ঝরণা রচনা ক'রে তুললো।

ছবি শেষ হ'লে রজত এসে দাঁড়ালো বিমলের পাশে, বললে—হোটেলে ফিরবি? না, কোনো কাজ আছে? বিমলকান্তি বললে,—কাজ আর কি থাকবে! "হেলাফেলা সারা বেলা শুধু খেলা আপন মনে!"

—তাহলে আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—প্রথমে কাশানোভা। মানে, একটু পান-ভোজন। তারপর there would be many more ships to carry us to other pleasure-islands.

বিমলকান্তি প্রতিবাদ তুললো না, রজতের সঙ্গে এলো কাশানোভায়।

জীবনে এ এক নতুন অনুভূতি! চিরাচরিত পথে বিমলের আজ কোনো আকর্ষণ নেই, লোভ নেই। আজ সদ্য ছবি দেখে তার মনে জেগেছে দুর্জ্জয় সাহস! কলেজে পড়তে পড়তে অনেকদিন তার মনে হয়েছে, বাঙালীর জীবন নিষেধ-শাসনের চাপে চেপ্টা থেঁতো হয়ে যাচ্ছে,—ও নিষেধ-শাসনের উপর পর্দ্দা ঢেকে দিতে হবে! তারপর বর্ম্মায় কারবার ক'রে ফিরছে দেহ-মনে বিরাট অবসাদ আর ক্লান্তি নিয়ে! মনকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে হবে এখন! কাশানোভা? দেখা যাক, সে কেমন জায়গা।

কাশানোভায় আবার নতুন আবহাওয়া! মনে হ'লো ছবির ঐ ছায়ার নর-নারীরা এখানে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! সেই আলো, গান, হাসি, হল্লা...দিল্‌খোলা আনন্দ!

রজত বললে,—কি খাবি? হুইস্কি? না, বীয়ার?

বিমলকান্তি বললে,—দুটোর কোনটাই খাব না...অভিজ্ঞতার অভাব, তাছাড়া ওতে রুচি নেই!

রজত অবাক! বললে,—দু' বছর বর্ম্মায় ব'সে কি করলি তবে?

বিমলকান্তি বললে,—যা করেছি, তার জন্য দারুণ মর্ম্ম-বেদনা ভোগ করছি!...তা না ক'রে যদি বীয়ার-হুইস্কি অভ্যাস করতুম, তাহলে বোধ হয় এতখানি লোকসানের দাহ ভোগ করতে হ'তো না!

হুইস্কি ফরমাস ক'রে রজত বললে,—নিশ্চয় নয়।

হুইস্কি এলো। রজত বললে,—সন্ধ্যার দিকে দু'চার পেগ্ না হলে চলে না।

বিমল বললে,—অনেকখানি এগিয়ে গেছিস তো! এ-রেটে চল্‌লে পথ যে ফুরিয়ে যাবে রজত চট্ ক'রে!

রজত সে-কথা কানে তুললো না, বললে,—নানাদিকে মাথা খেলাচ্ছি রে!...অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য ঐ ব্যবসা!...কিন্তু লোহা-লক্কড়, কোলিয়ারী, কিম্বা পাট-গালা—ওসবে নানা ফ্যাসাদ! অনেক টাকা মূলধন চাই...তেমন পয়সার জোর তো নেই!...মূলধনের মধ্যে আছে শুধু এই মাথা!...বুঝেছিস, শুধু আইডিয়া! এই মাথা আর আইডিয়া নিয়ে কখনো এম্পায়ারে প্লে প্রোডিউস করছি, কখনো কোনো নাচিয়ে-আর্টিষ্ট ধ'রে ষ্টেজে নামাচ্ছি! অর্থাৎ পাবলিক এণ্টারটেন্‌মেণ্ট......that's my line!

বিমল চম্‌কে উঠলো। বললে,—সারাজীবন এই নিয়ে থাকবি, রজত! অনিশ্চিতের উপর ভিৎ গড়বি!—আমোদের নেশা ক'জন মানুষের হয়? হ'লেও সে কতক্ষণের জন্যই বা? দেশে এই বিপুল অর্থসমস্যা...দেশ নিরন্ন, মানুষ বিপন্ন!

পেগ্‌টা নিঃশেষ ক'রে হেসে রজত বললে,—নিরন্ন বিপন্ন দেশকে দেখলি তো আজ ঐ এম্পায়ারের ম্যাটিনি শো'তে!...ও ছবিটা আমি দেখেছি তিনবার, আজকেরটা হ'লো ফোর্থ-টাইম!...ছবির চলেছে থার্ড উইক শো। আরও তিন উইক যদি চলে, এমনি লোকারণ্য দেখবি। তার প্রমাণ, সাড়ে ন'টার শো'তে চল্, দেখবি কাতারে কাতারে লোক ঢুকছে এম্পায়ারে। দেখে শুনে সার বুঝেছি, মুদির দোকানে চাল-ডাল কিনতে যদি বা পয়সা না জোটে আমাদের, সিনেমা কিম্বা নাচের টিকিট কেনবার বেলায় পয়সা জোটে ঠিক!...একালের এ যে কি নেশা... ঐ নেশার advantage নিয়ে আমি ব্যবসা করতে চাই!

রজত তার প্রমোদ-বাণিজ্যের বৃত্তান্ত বিবৃত করতে লাগলো—বিমলকান্তির বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছিল। নিবিষ্টমনে শহরের লোকের "আর্টিষ্টিক-টেম্পারামেণ্টের" পরিচয় সংগ্রহ করছিল, এমন সময় তরুণী-কণ্ঠে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হ'লো—রেজাত্ বাবু...

সে গুঞ্জন-রবে রজত একেবারে লাফিয়ে উঠলো। বল্‌লে,—হ্যালো, ললিতা দেবী......

কমলা-রঙের মিহি জর্জ্জেটের আবরণে পল্লব-তনু দুলিয়ে এক তরুণী! দেখে সলজ্জ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বিমলকান্তি উঠে দাঁড়ালো।

রজত তার হাত ধ'রে তাকে বসিয়ে দিলে, বললে,—বোস্ বিমল...আরো চেয়ার রয়েছে, তোকে ওয়ালটার র‍্যালে হ'তে হবে না!

একখানা চেয়ার দেখিয়ে তরুণীকে বললে,—বসুন ললিতা দেবী...

তরুণী বসলো চেয়ারে।

রজত বললে,— আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন শ্রীমতী ললিতা দেবী...নিউ এম্পায়ারে সম্প্রতি নাচের আসর জমিয়ে সারা শহরের সেলাম আদায় করেছেন...নাচে এমন যাদু আর কেউ এ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি, বিশেষ ওরিয়েণ্টাল-নাচে। তিন নাইট নেমেছিলেন,—দর্শনী আদায় করেছেন আট হাজার টাকা! এবারে টুরে বেরুচ্ছেন...প্রথমেই যাবেন বম্বে। আমরা বলি খুব ভালো, বম্বে থেকে যদি বিশ পঁচিশ হাজার টাকা আদায় ক'রে আনতে পারেন, বাঙালীর আমেদাবাদী-মিলের লজ্জা তাহলে কতক ঘুচবে!

বিমলকান্তির সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত হচ্ছিল।

রজত বললে,—আর ইনি আমার বাল্যবন্ধু বিমলকান্তি মজুমদার। নিবাস রাঁচী, বাবা ছিলেন ওখানকার মস্ত উকিল, কাজেই ছেলের জন্য টাকার পাহাড় তৈরী ক'রে গেছেন!......নাচের আর্টে কোন রুচি নেই...ব্যবসা-বাণিজ্যে তনুমনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন...কাঠের ব্যবসা, চামড়া নিয়ে বাণিজ্য-বেসাতি!

সঙ্কোচে বিমলকান্তি যেন এতটুকু হয়ে পড়েছিল। এই ফ্যাশানেবল-সান্নিধ্য...রসশাস্ত্রে নিজের বিমূঢ়তা স্মরণ ক'রে মনে মনে লজ্জাবোধ করছিল...ভাবছিল, এখানে বসবার যোগ্যতা তার নেই...সে এ কাশানোভায় ট্রেসপাসার!

ললিতা দেবী হেসে বললে,—ওঁর যে-আর্টে রুচি নেই, তা থেকে বোঝা যায় উনি লাকি!

রজত বললে,—তার মানে?

ললিতা বললে,—জানেন তো, "যে জন সেবিবে ও চরণযুগ, সেই সে দরিদ্র হবে!"...আর্ট ভালো, মানি। কিন্তু এই আর্ট নিয়ে যাকে পয়সা রোজগার করতে হয়, তার দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তা কতখানি, ভাবুন তো! আর্টে রুচি আর প্রীতি এক জিনিষ,—সে-আর্ট নিয়ে ব্যবসায় নামা আর এক জিনিষ!...এক একটা শো'এর সময় কি সংশয়ে, কি ভয়ে মন ভ'রে ওঠে! মনে হয়, এর চেয়ে নিত্যদিনের প্রথা মেনে বিয়ে ক'রে একজন স্বামীর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেওয়ায় ঢের আরাম ছিল!

রজত যেন আকাশ থেকে পড়েছে—মুখে-চোখে তেমনি সচকিত ভাব...

রজত বললে,—না, না...এ-কথা আর যে-কেউ বলুক, আপনার মুখে সাজে না...ব'লে সিগারেটের টিনটা ললিতার দিকে এগিয়ে দিলে। ললিতা একটা সিগারেট তুলে মুখে দিলে; রজত ধরলো সে-সিগারেটের মুখে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি। বিমলের মনে হলো, বুকের মধ্য থেকে তার প্রাণটা বুঝি ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে!...ভদ্র-শিক্ষিতা-কালচার্ড-ঘরের তরুণী মহিলা এমন অসঙ্কোচে সিগারেট টানতে শিখেছেন!

ললিতা বললে,—কেন সাজে না রেজাত্ বাবু?

রজত বললে,—You are born to rule a million hearts...

মৃদু একটা নিশ্বাস ললিতার বুক থেকে মর্ম্মরিত হয়ে উঠলো। ললিতা বললে,—তা নয় রেজাত্ বাবু...যা দেখছি, মনে হয়, শুধু rolling down and down...

সেদিন আলাপ-পরিচয়ের পর কাশানোভা থেকে বিমলকান্তি বা'র হ'লো...সঙ্গে রজত আর ললিতা।

ললিতা বললে,—বাঃ, কি সুন্দর চাঁদের আলো, রেজাত্-বাবু!...যদি মাইণ্ড না করেন, একবার ষ্ট্রাণ্ডটা ঘুরে না হয়...

রজত বললে,—নো হার্ম্ম!

ট্যাক্সি চল্‌লো রজতের ইঙ্গিতে গঙ্গার ধারে।

ফেরবার সময় ললিতাকে রিচি রোডে এবং রজতকে ওয়েলিংটন লেনে নামিয়ে বিমলকান্তি এল বেঙ্গল হোটেলে...

রাত তখন একটা বেজেছে। ট্যাক্সির মিটারে ভাড়া উঠেছিল এগার টাকা চোদ্দ আনা।

এ ভাড়া দিল বিমলকান্তি।

২

পরের দিন বেলা সাড়ে সাতটা। বিমলকান্তি তখন বিছানায় পড়ে আছে, আলস্যভরে দেহ-মন বিজড়িত; দুপ্-দাপ্ শব্দে তার ঘরে এসে ঢুকলো রজত।

রজত বললে—এ কিরে, এখনো বিছানায় পড়ে আছিস! আমার চান-টান কখন সারা হয়ে গেছে!

বিমলকান্তি বললে—অত রাত্রে ফিরেছি!

উচ্চ হাস্যে ঘর প্রকম্পিত করে রজত বললে—এখনো এমন নাবালক! রাত একটা-দেড়টায় শোওয়া......ও তো আমাদের নর্ম্মাল টাইম!

রাত্রের ট্যাক্সি-ভাড়ার ব্যথাটা তখন বিমলের বুকে টন্‌টন্ করছিল। একটা নিশ্বাস সে রোধ করতে পারলো না! নিশ্বাস ফেলে বিমলকান্তি বললে,—হতে পারে। সবার ধাত সমান নয়।

রজত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো; বসে বললে,—ট্যাক্সি-ভাড়া দিলি কত?

বিমলকান্তির মনে আশার মৃদু উচ্ছ্বাস! ভাবলে, রজত বোধ হয় সে ভাড়ার টাকাটা দিতে এসেছে! বললে, তা বেশ ভালোই দিয়েছি। এগারো টাকা চোদ্দ আনা।

রজত বললে,—মিটারে উঠেছিল কত?

—এগার টাকা চোদ্দ আনা। মিটার দেখে ভাড়া দিয়েছি।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে রজত বললে,—ঠকেছিস্। তুই ত এখানকার কায়দা-কানুন জানিস না!

বিমলকান্তির বিস্ময়! ঠকেছে? তার মানে, মিটারে কোনো কারসাজি ছিল না কি?

সে বললে,—এর আবার কায়দা-কানুন আছে না কি?

উৎসাহ-সহকারে রজত বললে,—নিশ্চয়। মানে, মিটারে যে ভাড়া ওঠে, তা থেকে টাকায় চার আনা হিসেবে টোয়েণ্টি-ফাইভ পারসেণ্ট বাদ দিলেও ওরা খুশী-মনে ভাড়া ন্যায়। তাই দস্তুর! মানে, সর্ব্বত্রই ষ্ট্রাগ্‌ল্ চলেছে! তোর মিটারে কত ভাড়া উঠেছিল বললি?

বিমল বললে,—এগারো টাকা চোদ্দ আনা!

—তাহ'লে টোয়েণ্টি-ফাইভ পারসেণ্ট বাদ দে ও থেকে। এগারো টাকায় বাদ যাবে এগার সিকে, আর চোদ্দ আনায় সাড়ে তিন আনা, ... টোটাল হ'ল দু'টাকা বার আনা প্লাস সাড়ে তিন আনা, দু'টাকা সাড়ে পনেরো আনা। তোর দেওয়া উচিত ছিল আট টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা। তুই বেশী দিয়েছিস দু' টাকা সাড়ে পনের আনা। ...... আমার বলে' দেওয়া উচিত ছিল।

বিমলকান্তি উঠে বসল আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে......রজত বুঝি এখনি এ-টাকাটা দিয়ে দেবে! কিন্তু সেদিকে রজতের কোনো প্রয়াস দেখা গেল না। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে রজত বললে,—নে, উঠে পড়্—মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে নে। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

ভাবলো বুঝি সেই ললিতা দেবীর কাছে। ভয় হ'লো, সদ্য আলাপে নগদ এগার টাকা চোদ্দ আনা খশে' গেছে পকেট থেকে!

মনকে আক্রোশ-ভরে সে শাসন করলো,—খবর্দ্দার! অজানা তরুণীর সঙ্গ-লোভে যেমন লোলুপতা...

রজত বললে,—ওঠ্ রে......

বিমলকান্তি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে শেভ্ করে স্নান সেরে নিলে। বেয়ারা এল চা, টোষ্ট নিয়ে। রজত বললে—দুটো এগ্‌পোচ্ করে আমায় দিতে বল্। কখন্ ফিরবো, তার কিছু ঠিক নেই।

এগ্‌পোচ্ এল। রজত বললে—তুই তৈরী হ।

বিমলকান্তি বললে,—কেন?

রজত বললে,—ম্যাড্রাস থেকে একজন ডান্সার এসেছে শ্রীরঙ্গম্ পিলে......সঙ্গে আছে দু'জন ফিমেল আর্টিষ্ট লছমী আর পদ্মা। তাদের সঙ্গে দেখা করে, মানে ফিক্স করা......

বিমলকান্তির বুকখানা যেন ধ্বশে' দু'হাত নেমে যাবার জো! সে বললে,—তা আমি কি করবো তোর সঙ্গে গিয়ে?

রজত বললে,—একা যাবো, তাই আর কি! তুইও হাল-চাল দেখবি, চ'না। মানে, যদি মনে হয়, আমার সঙ্গে বখরায়...

বিমলকান্তি মাথা নেড়ে বললে,—না ভাই, ও-সবে আমার সখ নেই! তা ছাড়া যার কিছু বুঝি না...

রজত বললে,—ব্যবসা রে ব্যবসা! এমন ব্যবসা আর নেই। ওরা খেটেখুটে নাচবে, আমরা স্রেফ্ নাচের দড়িটি ধরে থাকবো। টাকা দেবো টিকিট বিক্রীর পার্শেণ্টেজ-বেসিশে। পাবলিসিটির খরচ? কতই বা? বড় জোর এক হাজার টাকা। তেমনি রিটার্ণে পাওয়া যাবে কত! বিনা মূলধনে এমন লাভের কারবার আর নেই রে......একবার নেমে দ্যাখ, আমার সঙ্গে......তখন রসের স্বাদ পাবি!

বিমলকান্তি মনকে চকিতে সুদৃঢ় করে ফেলেছে! সে বললে,—না ভাই, ও-সবে আমি নেই। আমি এখানে আছি আর দু'চার দিন। তারপর রাঁচী ফিরছি। আমাকে মাপ কর্। তা ছাড়া আমাকে বেরুতে হবে বেলা দশটায়। যাবো একবার আমার পিসিমার বাড়ী......ভবানীপুরে। পাঁচ বছর দেখা নেই। আমার বর্ম্মা যাবার আগে অনেকবার চিঠি লিখেছিলেন, একবার আয়...যাওয়া হয় নি। সেই যখন কলকাতায় এসেছি, এবারে দেখা করে আসি। আবার কবে আসবো...আসবো কি না—

রজত অনেক অনুরোধ করলো—বিমলকান্তি কিন্তু অটল, অবিচল! কাজেই রজতকে ফিরতে হ'লো নিরাশচিত্তে।

বিমলকান্তি বসে রইলো চুপচাপ একা। কাশানোভার স্মৃতি মনের মধ্যে লক্ষ বাহু মেলে দাঁড়ালো। বসে সময় কাটাবার পক্ষে চমৎকার জায়গা! কত রকমের লোক আসছে যাচ্ছে.........যেন আলোর প্রসেশন চলেছে!

কিন্তু না......ও চিন্তা নয়। কাজ আছে। বর্ম্মা থেকে

(শেষাংশ ৪৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইম্পিরিয়ালিজমের রূপ

শ্রীযুক্ত জে এ হবসনের Imperialism, A Study বইখানি সাম্রাজ্যবাদের উপর একটা নূতন আলোকপাত করেছে। প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি ছিলো দুটো জিনিষের উপরেঃ (১) সম্পদের জন্য লালসা, (২) দাস ব্যবসায়। সোনা, রূপো, হীরে, মণি-মুক্তো—এগুলোর স্থায়িত্ব যেমন বেশী, এগুলোকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল থেকে যারা লোক ঠকিয়ে, গায়ের জোরে অথবা ভাগ্যের জোরে রাতারাতি বড়লোক হবার চেষ্টা করেছে তারা সোনা-রূপো, মণি-মুক্তোর সন্ধানেই ধাওয়া করেছে দিকে দিকে। কালোদের দেশে শ্বেতকায় জাতিগুলির যে শুভাগমন—সেও এই সোনা-রূপা মণি-মুক্তারই লোভে। ফুলের মধু যেমন ভোমরাকে প্রলুব্ধ করে ডেকে আনে ফুলবনে তেমনি ক'রেই স্বর্ণ আর হীরকের চাকচিক্য ইউরোপের মানুষগুলিকে প্রলুব্ধ ক'রে নিয়ে গেছে দূর দূরান্তে। গোলোকোন্ডা থেকে কিম্বার্লি—যেখানে যেখানে স্বর্ণ-রৌপ্যের, হীরা-মুক্তার অস্তিত্ব সেখানে সেখানে ভীড় জমিয়েছে তারাই যাদের চামড়ার রং শাদা। কৃষ্ণকায় জাতি-গুলির উপরে শ্বেকায়দের যে আধিপত্য—এই আধিপত্যের ভিত্তি হ'চ্ছে সোনা আর রূপো, হীরে আর মুক্তোর প্রতি মানুষের লালসায়। পরবর্ত্তী যুগে সোনা আর রূপো সঙ্গে টিন আর তামা। এখন তো যন্ত্রযুগের আধিপত্য। যন্ত্র-যুগে লোহা আর কয়লা হীরে আর মুক্তোর মতোই সভ্য জাতিগুলির লোভের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সোনার আধিপত্যকে খর্ব্ব করতে পারেনি টিনের আর তামার, লোহার আর কয়লার আবির্ভাব। সোনা আজও অম্লান গরিমায় বিরাজ করছে কেন্দ্রে আর আপনার মোহিনী শক্তি দিয়ে প্রলুব্ধ করছে সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির লোভাতুর হৃদয়কে।

একদিকে সম্পদের লালসা আর একদিকে সস্তায় ক্রীতদাস পাওয়ার বাসনা—এই দুটো কামনা থেকে সাম্রাজ্য-বাদের উদ্ভব। দুটো কামনাই সাম্রাজ্যবাদকে সৃষ্টি করেছে সত্য—কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে সোনার আকর্ষণের চেয়ে ক্রীতদাসের আকর্ষণই সাম্রাজ্যবাদীকে প্রলুব্ধ ক'রেছে বেশী ক'রে। শ্রীযুক্ত হবসন লিখছেন,—

The earliest, the most widely prevalent and the most profitable trade in the history of the world has been the slave trade.

দাস ব্যবসায় হ'চ্ছে জগতের ইতিহাসে আদিম ব্যবসায়, এমন বহু বিস্তৃত এবং লাভজনক ব্যবসায়ও আর নেই। সাম্রাজ্য-বাদের প্রাচীন রূপের মধ্যে আমরা দেখেছি পরদেশগুলির উপরে চিরস্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নয়; তার মধ্যে দেখেছি পরাজিত রাজ্যের মানুষগুলিকে বন্দী ক'রে বিজয়ী-দের দেশে প্রেরণ করবার উদ্যমের প্রকাশ। প্রাচীন সাম্রাজ্য-বাদীরা বিজিত দেশকে শাসন করবার উপরে জোর দেয়নি, তারা জোর দিয়েছে বিজিত দেশের মানুষগুলিকে ক্রীতদাস-রূপে স্বদেশে আমদানী করবার উপরে। গ্রীক আর রোমের প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দাসব্যবসায়েরই কদর্য্য রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। গ্রীক আর রোমকেরা বর্ব্বরদের মধ্যে চিরস্থায়ী উপনিবেশ গড়বার দিকে তেমন মন দেয়নি। তাদের দেশে সৈন্যবাহিনী এবং একটা শাসন ব্যবস্থা খাড়া রেখেছে শুধু শৃঙ্খলা রক্ষার এবং খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য। গ্রীক আর রোমকেরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেছে আর সেখান থেকে দলে দলে ক্রীতদাস এনেছে ইটালিতে আর গ্রীসে তাদের দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে নিজেরা বড়লোক হবার জন্য। গ্রীকদের সহরগুলোর অধিকাংশই ছিলো শিল্পপ্রধান, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র আর সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর। তারা 'থেস'দেশ এবং অন্যান্য দেশ থেকে হাজারে হাজারে ক্রীতদাস সংগ্রহ ক'রে আনতো। সেই ক্রীতদাসদের তারা খাটাতো জাহাজ আর 'ডক' বানাবার কাজে, খনিতে এবং সহরে কুলিমজুরের কাজ করবার জন্যও তারা ব্যবহৃত হোতো। রোম ছিলো কৃষি-প্রধানদেশের রাজধানী। রোম তার ক্রীতদাস সম্প্রদায়কে ব্যবহার করতো বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে চাষের কাজ চালানোর জন্য। ইটালির কৃষকেরা এই ক্রীতদাস আমদানির ফলে জমি ছেড়ে শহরে আশ্রয় নিতে লাগলো—মাটির সঙ্গে তাদের পুরুষপরম্পরার যোগ লুপ্ত হ'য়ে গেল। গ্রামে যারা স্বাবলম্বী কৃষকের স্বাধীন জীবনযাপন করতো—তারা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হ'য়ে রোমে এসে যাপন করতে লাগলো ভিখারীর অভিশপ্ত জীবন। বিদেশ থেকে যে রাজ-কর আসতো—সেই রাজস্ব থেকে তাদের জীবিকানির্ব্বাহের খরচ চালানো হোতো। প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ আর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ—এ দুয়ের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আজও এক-রকমেরই আছে। দাস-ব্যবসায় আজও সেদিনের মতোই সাম্রাজ্য-বাদের বৈশিষ্ট্য হ'য়ে আছে। শ্বেতকায় মানুষগুলি যেখানেই দেখতে পেয়েছে নিম্নস্তরের জাতিগুলি অবাধে ভোগ করছে খনিজ অথবা ভূমিজ সম্পদের অধিকার, অমনি তাদের জিহ্বায় এসেছে জল, পরধনকে হস্তগত করবার লোভে চিত্ত হয়েছে চঞ্চল। তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে অনুন্নত জাতিগুলির ঘাড়ে, তাদের সুস্থকায় অধিবাসীদিগকে বাধ্য করেছে পরিশ্রম করতে নিজেদের সুবিধার জন্য। পারিশ্রমিকের বেলায় দিয়েছে নামমাত্র মজুরী কিন্তু খাটাবার বেলায় খাটিয়ে নিয়েছে ভূতের মতো। কখনো কখনো চালান দিয়েছে অন্য দেশে যেখানে খাটিয়ে নিলে পয়সা পাওয়া যায় প্রচুর। অনুন্নত জাতি-গুলিকে তথাকথিত উন্নত জাতিগুলির সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করার জন্য রাজশক্তির প্রয়োগ হ'চ্ছে সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার কথা। আধুনিক যুগে চীন হ'চ্ছে এই সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চীনের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করবার, চীনে রেলপথ গড়বার, খনি খুঁড়বার অধিকারগুলি পাশ্চাত্যের সর্ব্বভুক জাতিগুলি কেমন ক'রে হস্তগত করেছে—তার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে।

বিজিতদেশের মানুষগুলিকে বন্দী ক'রে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিদেশে প্রেরণের প্রথা এখন নিবারিত হয়েছে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাসব্যবসায়ের রূপেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। পূর্ব্বের ক্রীতদাস এখন রূপান্তরিত হয়েছে দিন-মজুরে। আর একটা কথা। আগে অনুন্নত জাতির মানুষগুলিকে বিজয়ীরা চালান দিতো নিজেদের দেশে ক্রীতদাসদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে আশ্রয় ক'রে ঐশ্বর্য্যশালী

হবার জন্য। এখনকার সাম্রাজ্যবাদীরাও দিনমজুরদের দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে নেয় নিজেদের তহবিলকে স্ফীত করবার উদ্দেশ্যে কিন্তু তারা অনুন্নত দেশের লোকগুলিকে এখন আর জাহাজে ক'রে স্বদেশে আমদানি করে না, তাদের নিযুক্ত করে তাদের নিজেদের দেশে সম্পদ সৃষ্টির কাজে—অবশ্য সে সম্পদ তারা নিজেরা ভোগ করতে পায় না—ভোগ করে শ্বেতকায় মানুষগুলি।

প্রাচীনকালে মালিকেরা নিজেদের দেশ ছেড়ে লিবিয়ান অথবা সিথিয়ানদের (Scythians) দেশে গিয়ে থাকতো না কুলি খাটিয়ে পয়সা রোজগারের জন্য। একবার বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলে ঘরে ফিরে আসা কঠিন ব্যাপার ছিলো। বিদেশে তাদের ভোগ করতে হ'তো নির্ব্বাসিতের জীবন। তারপর আর একটা কারণেও বিদেশে কুলি খাটানোর কাজে তারা ব্রতী হ'তে চাইতো না। বিজয়ীর দেশে ক্রীতদাসেরা ভয়ে কেঁচো হ'য়ে থাকতো ব'লে তাদের স্বদেশেও যে তারা মুখ বুঁজে সব সহ্য করতে রাজী হোতো—এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ক্রীতদাসেরা নিজেদের দেশে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে যদি একবার বেঁকে বসে তবে সর্ব্বনাশ! বিদেশী গবর্ণমেণ্ট হাজার শক্তিশালী হোক—নিজের দেশে ক্রীতদাসদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া কত সোজা। সব সময়ে সকলকে তো চোখে চোখে রাখা যায় না। নানা কারণে আগেকার সাম্রাজ্যবাদীরা বিজিতদেশে গিয়ে সেখানে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন ক'রে ক্রীতদাসদের দারিদ্র্যের উপরে নিজেদের ঐশ্বর্য্য গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রকাশ করেনি। সে যুগে আর এ যুগে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এরোপ্লেনে পৃথিবী ঘুরে আসতে এখন আর বেশীক্ষণ লাগে না। ভারতবর্ষ বিলেতের খিড়কির দরজায় এসে পড়েছে—রোমকেরা আর গ্রীকেরা বিদেশে নির্ব্বাসিত যক্ষের যে বিরহ-বেদনা ভোগ করতো—এখনকার দিনে বিজ্ঞানকর্ম্মীর কৃপায় প্রবাসী শ্বেতকায়দের সে মনঃকষ্ট আর ভোগ করতে হয় না। সুতরাং বিদেশে যেতে এবং বিদেশে থাকতে তারা এখন আর কোনো কুণ্ঠাই অনুভব করে না। তা ছাড়া শ্বেতকায় জাতিরা বিজ্ঞানের শক্তিকে হস্তগত ক'রে এমন সব মারণাস্ত্র তৈরী করেছে—যাদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করা অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এখনকার দিনে সাম্রাজ্যবাদী রথী-মহারথীরা আর অনুন্নত জাতির মানুষগুলিকে স্বদেশে আমদানি করে না কুলির কাজ করবার জন্য। ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার লোক যদি বিলেতে কুলি হয়ে যায় ম্যাঞ্চেষ্টারে আর বার্ম্মিং-হামে কাজ করবার জন্য—তবে বিলেতের শ্রমিকেরা ক্রোধান্ধ হয়ে পার্লামেণ্ট-গৃহ ধূলায় লুটিয়ে দেবে। তারপর সে ক্রোধও যদি কোনো রকমে প্রশমিত করা যায়—বিলেতের কনকনে ঠাণ্ডা তো কমানো যাবে না। সেই ঠাণ্ডায় গ্রীষ্ম-প্রধানদেশের মানুষদের পক্ষে দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাকা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং The whole economic conditions are in favour of working the coloured man in his own home.

তবে একটা কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। ইউরোপের লোকেরা আফ্রিকা থেকে, এসিয়া থেকে, পলিনিশিয়া থেকে লণ্ডনে, প্যারিসে অথবা বার্লিনে কুলি আমদানি করে না সত্য—(করলে স্বদেশে অন্তর্বিপ্লব অনিবার্য্য) কিন্তু সাম্রাজ্যের এক অংশ থেকে আর এক অংশে কুলি পাঠানোর বিরাম নেই। বৃটিশ উপনিবেশ কুইন্সল্যাণ্ডে আর ফরাসী নিউ কালিদোনিয়ায় যেসব কুলির কাজ করে তারা সব পলিনিশিয়ার লোক। দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি সম্পদকে পুষ্ট করেছে ভারতের কুলি। বার্ম্মায়, বোর্ণিওতে, নিউগিনিতে, অষ্ট্রেলিয়ার, আমেরিকার ও আফ্রিকার স্থানে স্থানে চীনা কুলির আমদানির ব্যাপার সর্ব্বজনবিদিত। তবুও একথা সত্য যে শ্বেতকায় মালিকদের আধুনিক ঝোঁক হচ্ছে কৃষ্ণকায় লোকদের খাটানো তাদের নিজেদেরই দেশে। কৃষ্ণকায় লোকদিগকে তাদের স্বদেশেই নিযুক্ত করবার প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছে শ্বেতকায় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে—তারপর আধুনিক কলকারখানা বহুল রাষ্ট্রগুলিতে মূলধনের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। সেই মূলধন ফেঁপে উঠবার জন্য জগতময় খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই সব দেশ যেখানে প্রকৃতিদত্ত সম্পদ সুপ্রচুর আর মজুরও খুব সস্তা।

প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদীরা অনুন্নত জাতির লোকগুলিকে ধ'রে নিয়ে আসতো নিজেদের দেশে—কারণ গ্রীক আর রোমকদের প্রয়োজন ছিলো ক্রীতদাসদের শুধু পরিশ্রমে, তাদের জমির বিশেষ মূল্য ছিল না বিজয়ীদের কাছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীদের কথা স্বতন্ত্র। তারা চায় অনুন্নত জাতিগুলি তাদের নিজেদের জমিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করুক আর সেই পরিশ্রমে তাদের নিজেদের স্বার্থ পুষ্ট হ'য়ে উঠুক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভূমিজ সম্পদগুলির চাহিদা আজ দিকে দিকে। চাল, চা, চিনি, কফি, রবার—যত বেশী উৎপন্ন করতে পারো ততো বেশী টাকা আসবে ঘরে। সুতরাং পশ্চিমের জাতিগুলি খনিজ আর ভূমিজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে।

পাশ্চাত্যের শিল্পপ্রধান জাতিগুলির সঙ্গে শিল্প বিজ্ঞানের দিক থেকে অনুন্নত জাতিগুলির প্রথম পরিচয় বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম প্রথম এসেছে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ব্যবসায়ীর বেশে। ব্যবসায় করতে এসে জায়গায় জায়গায় কুঠি বানিয়েছে। আফ্রিকার স্বর্ণ-উপকূলের সঙ্গে বৃটেনের প্রথম পরিচয় ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে রয়াল আফ্রিকা কোম্পানীর মারফৎ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে বার্বাদসের লণ্ডন কোম্পানীর মারফৎ, আমেরিকার সঙ্গে London and Plymouth Companiesএর মারফৎ আর ভারতের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফৎ। উষ্ট্র আগে কোম্পানীর নাসিকা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে তাম্বুর মধ্যে তারপর তাঁবুর মধ্যে সমস্ত শরীরটা নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ আসন গেড়েছে কোম্পানীর বাণিজ্যকে আশ্রয় ক'রে। বণিকের দল জমি নিয়ে, খনি নিয়ে বড়ো রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে আর তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যগত স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য সৈন্যসামন্তসহ রাজশক্তির আবির্ভাব হয়েছে—কুঠি দুর্গের রূপ ধারণ করেছে—মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। ইহাই সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস।

সেতু

(গল্প)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

দরজার পর্দ্দার ওপোর থেকে কঙ্কার শুভ্র হাতখানা ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছিল; নির্ম্মল ডাকলে—"শোনো"—

কঙ্কা ফিরলো; তার হাতে তখনও নির্ম্মলের খাওয়া চা-শূন্য কাপ্-ডিস্,—আধখানা মামলেট।

পর্দ্দা সরিয়ে কঙ্কা এসে দাঁড়ালো নির্ব্বাকে, নির্ব্বাকেই তাকালো নির্ম্মলের দিকে;

নির্ম্মল একবার তার মুখের দিকে, আর একবার খোলা জানালা দিয়ে সকালের আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন নতুন ক'রেই সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করলে, "এখন হাতে কাজ আছে কোনও?"

"কাজ! না; ঠাকুর রান্না চড়িয়েছে, ব্যবস্থাও সব ক'রে দিয়ে এসেছি, কাজ কিছু নেই।"

"ব'সবে একটু?"

নির্ম্মলের তরফ থেকে এ প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত কিম্বা এ অনুরোধ লাভ করা কঙ্কার পক্ষে অসম্ভব সেকথা ভেবে দেখবার মত অবকাশ কঙ্কার হ'লোনা, ব'সে প'ড়লো।

পাশাপাশি পাতা খানকয়েক চেয়ার, ওপাশে একটা ছোট টেবিল; তার ওপোর গাদা করা কতকগুলো বই, নোটের খাতা; ওরই ওপাশের কলমদানিতে আধখানা লাল-নীল রুলপেন্সিল, একটা ফাউণ্টেন পেন, তাও সস্তা দামের। এগুলির অধিকারী ঐ—নির্ম্মল।

যে লোকটি পা তুলে ঐ পালিশ ওঠা, একটু বা ভাঙ্গা কাঠের চেয়ারখানায় ব'সে আছে, ওর মাথার চুলগুলো ছোট ক'রে ছাঁটা, কানের পাশের চুলে সাদা ছোপ ধ'রেছে।

নির্ম্মল কঙ্কার মুখের দিকে চেয়ে সামান্য একটু হাসলো; সে হাসিতে যেন আনন্দের আভাস নেই, আছে একটা বিষণ্ণ-ঔদাস্য। ব'ললেঃ—"মানুষে যা ভাবে, হয় হয়তো ঠিক তার বিপরীত; তার সাক্ষী দেখ না তুমি আর আমি! তুমি হ'চ্ছো বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, আর আমি! আমি একজন সামান্য গৃহস্থের ছেলে; লোকের কাছে সহানুভূতি, সাহায্য ভিক্ষা নিয়ে নিয়ে আজ খেটে খাবার সামর্থ্য লাভ ক'রেছি। তাও সকাল দশটায় দুটো ভাত ডাল কোনরকমে মুখে দিয়ে বাড়ীর বার হই,—ফিরে আসি বেলা গেলে। ছেলে ঠেঙ্গানো কাজ, বাড়ী এসে তোমার সঙ্গে আর ব'কতেও ইচ্ছা করে না, গল্প তো দূরের কথা। তাই বলছিলাম তোমারও বড় কষ্ট হয়, না?......

নির্ম্মল বুঝি কি ব'লতে চায়। কিন্তু সেকথা বলার আগেই কঙ্কা ব'ললে—কষ্ট! না, কষ্ট কিসের? ঠাকুর আছে, চাকর আছে—

নির্ম্মল ব'ললে—"ঐ দেখো এক ফ্যাসাদ। থাকি তো মাত্র দুটি মানুষ, তার জন্যে চাকরটা নয় র'ইল, কিন্তু ঠাকুর—

কঙ্কা বাধা দিলেঃ—"বলোতো আমিই রাঁধতে পারি।"

নির্ম্মল যেন একথাটা শুনবার আশা করেনি,—তাই কঙ্কার এ উত্তর শুনে একটু চ'মকে উঠেই থেমে গেল। ব'ললেঃ—"তোমায়? রাঁধতে? কই,—না, আমি রাঁধতে ব'লেছি ব'লেতো মনে পড়ে না।" ব'লতে ব'লতে ওর চোখ-দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে ব'লে মনে হ'তেই কঙ্কার হাসি পেলো, কিন্তু এমন খোলাখুলিভাবে হাসতে তার লজ্জা করে।

আজ শুধু নির্ম্মলের সম্মুখে কেন, আজ এই আঠারো ঊনিশ বছর বয়েসের মধ্যে কারো সম্মুখে এমন ক'রে হেসেছে ব'লে তার মনে পড়ে না। কথাও সে বলে অল্প।

তাই নির্ম্মলের মুখের অবস্থা দেখে হাসি পেলেও সে হাসি সে চেপে গেল, হাসলো না। ব'ললেঃ—"তুমি ব'লেছো, এমন কথাতো আমি ব'লছি না, তবে বলছি যে, যদি শুধু দুটো মানুষের জন্যেই এত লোক রাখা বাজে খরচ ব'লে তোমার মনে হয়,—তাহলে এখনি তো সে খরচ কমানো যায়।"

মাথা চুলকিয়ে নির্ম্মল প্রশ্ন ক'রলেঃ—"অর্থাৎ, তুমি নিজে রাঁধবে?

"ক্ষতি কি? মেয়েমানুষ জাত, রাঁধলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না, বরঞ্চ লোকে ভালোই ব'লবে তাতে।"

বিস্ময়ে, ভাবনায় অবাক হ'য়ে গিয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নির্ম্মল শুধু মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলো। একটু পরে, আবার বার কয়েক ঢোক গিলে আরম্ভ ক'রলেঃ—আমি ব'লছিলাম কি—

"কি?........."

"অনেকদিন আগে এই বাড়ীতেই একটি গরীব লোক তার মেয়ে নিয়ে ভাড়া থাকতে আসে, পরে লোকটি মারা যায়,—মেয়েটিরও বিয়ে হ'য়ে যায়। তার সঙ্গে সেদিন পথে দেখা—একটি ছেলে তার, ব'ললে বড় কষ্ট, যদি কোনও একটা উপায় হয়; তাই ভাবছি তাকে যদি রাঁধবার কি অন্য কাজ কর্ম্মের জন্যে নিয়ে আসি, কি বল।........"

কঙ্কা উত্তর দিলঃ—"বেশ তো।"

সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু! কঙ্কা উচ্চারণও করলে বেশ হাসি-মুখেই; কিন্তু নির্ম্মলের মনে হ'লো—ওর ঐ কথা বলার সুরে কি একটা অসমাপ্ত প্রশ্ন যেন প্রকাশের পথ খুঁজছে, ব্যক্ত হতে পারছে না।

নির্ম্মল ওর সম্মতি পেয়েও অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে রইল কঙ্কার মুখের দিকে; কঙ্কা বললেঃ—"বেশতো, আন না তাকে; আমিও দিনরাত মুখ বুজে ব'সে না থেকে দু'দণ্ড কথা ক'য়ে বাঁচবো। কবে আনবে তাকে?

নির্ম্মল ব'ললেঃ—"কালও আনতে পারি?"

"কালই?"

এত তাড়াতাড়ি আনবার কল্পনা যেন কঙ্কা করে নাই,—তাই একটু চমকে উঠে ব'ললেঃ—"তিনি কাছাকাছিই থাকেন বুঝি?"

নির্ম্মল ওর অগোছালো টেবিলটা পরিষ্কারে হঠাৎ হাত আর মন দুইই লাগিয়ে ফেলেছিল,—বইয়ের মলাটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ব'ললেঃ—"হ্যাঁ।"

পরের দিন;

কঙ্কার সারাদিনের উৎকণ্ঠা কাটিয়ে সে এলো বিকেলে, নির্ম্মলের ছুটির পরে, তারই সঙ্গে।

লালপাড় শাড়ী-সেমিজ পরা,—নীচের হাতে দু'গাছা সোনার রুলী, কপালে সিঁদুর। বয়স বেশী নয়, সুন্দরীও সে নয়, তবু কেমন যেন একটা শান্তশ্রী তার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওটুকু না থাকলে তাকে যেন ঠিক মানাত না। ছেলের হাত ধরে সে গাড়ী থেকে নীচে নামলো; ছেলের বয়স হয়তো বছর দশেক হবে, নাম মণীন্দ্র, ডাক নাম মনু; বেশ গোলগাল নধর চেহারা, দেখলে তাকে গরীবের ছেলে ব'লে মনে হয় না, বরঞ্চ বড়লোকের ছেলে ব'লেই ভুল হয়।

গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এসে নির্ম্মল নবাগতার সঙ্গে কঙ্কার পরিচয় করিয়ে দিলে;—মনুকে ব'ললে—"প্রণাম কর্ মনু—তোর গুরুজন—!"

মনু প্রণাম ক'রলে। নবাগতা ব'ললেঃ—"তোমায় কিন্তু আমি নাম ধ'রেই ডাকবো ভাই, কারণ তুমি আমার চেয়ে ঢের ছোট।"

হাসিমুখে কঙ্কা এ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলেঃ—"বেশ তো, তাই ব'লেই ডেকো, আমিও তোমায় দিদি ব'লে ডাকবো।"

ওদের পরস্পরের আলাপ পরিচয়ের অবকাশে নির্ম্মল পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলো;

কঙ্কা যখন ঘরে এলো তখন তার পোষাক বদল, হাত-মুখ ধোয়া হ'য়ে গেছে।

অন্যদিন কঙ্কা তার জলখাবার নিজের হাতে নিয়ে আসে, আজ তার আনবার দেরীতে ঠাকুর নিজেই সমাধা ক'রেছে দেখে সে লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। ব'ললেঃ—"আমায় ডাকনি তো!"

সহাস্যে নির্ম্মল জবাব দিলে, "কি দরকার? যার দরকার, তাতো মিটেই গেছে।"

কঙ্কা দেখলে নির্ম্মলের খাবার ডিস প্রায় শূন্য হ'য়ে এসেছে; ব'ললেঃ—"আর দু'খানা লুচি এনে দেব, খাবে?"

"দেবে, দাও—আজ যেন খিদেটাও হঠাৎ দারুণ বেড়ে উঠেছে ব'লে মনে হচ্ছে—"

নির্ম্মল আজ যেন হঠাৎ মন খুলে হেসে ফেললে।......

কঙ্কার নবপরিচিত দিদি কমলা যেন একে একে কেমন করে সংসারের সমস্ত কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে লাগলো।

কঙ্কা বুঝলে—হয়তো এটা অন্যায়; নিজের দিক দিয়েই হোক, আর ঐ হঠাৎ আসা মেয়েটির দিক দিয়েই হোক, কিন্তু তার উপায় নেই।

সামান্য এতটুকুর জন্যে কথা কাটাকাটি করা, কিম্বা কাজ নিয়ে কাড়াকাড়ি করা সে পারে না, কখনো কারো সঙ্গে করেও নি; আজও পারলে না।

কমলা ব'ললেঃ—"আমি তো শুধুহাতেই দিনরাত ব'সে আছি ভাই, করি না কেন কাজগুলো—;"

বাধা দেবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা ক'রতে গিয়ে কঙ্কা থেমে গেল। হাসিমুখে ব'ললেঃ—"শুনেছি এমন এক একজনের অভ্যাস আছে, যারা কাজ না ক'রলে থাকতে পারে না;—অস্বস্তি বোধ করে; দিদিরও বোধ হয় সেই অভ্যাস আছে।"

প্রত্যুত্তরে কমলাও হাসলোঃ—"যা ব'লেছো ভাই; এ অভ্যাসে হয়তো লোকে শুধু সুখ্যাতি লাভ করে, কিন্তু আমার এমন কপাল যে, আমায় অখ্যাতিও কুড়াতে হ'য়েছে যথেষ্ট, তবু এর মোহ কাটাতে পারি নি।"

কঙ্কা আর বাধা দিতে পারে না, তবু কুণ্ঠিত হয় যথেষ্ট।

সকাল সাড়ে নয়টায় খাওয়া দাওয়া সেরে নির্ম্মলকে স্কুলে যেতে হয়। কাজ তার অনেক। ছাত্রদের নাকি আবার সামনেই পরীক্ষা আসছে, তাই তার খাটুনী বেড়েছে প্রচুর।

খাওয়া দাওয়া সেরে, কোট গায় দিয়ে বোতাম আঁটতে আঁটতে সে দেখলে, কঙ্কা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার একটা কৌটা।

হয়তো এ সময় তার খুবই তাড়াতাড়ি, তবু কথা না কইলে ভালো দেখায় না ব'লেই প্রশ্ন ক'রে ব'সলোঃ—"হাতে ওটা কি?"

কঙ্কার হাসি এলো। ব'ললে—

"এখনও যে পান খাওনি, মনে নেই! ওটা পান।"

"পান? ওঃ—"

ডিবে খুলে গোটা দুই পানের খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা ক'রলেঃ—"মনু কই? মনু—মনু!—"

মনু কমলার ছেলে। বড় দুষ্টু ছেলে সে, কিছুতেই স্কুলে যেতে চায় না, তাই নির্ম্মল নিজেই তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় স্কুলে, আবার সঙ্গে ক'রে নিয়েও আসে।

কঙ্কা ব'ললেঃ—"কি জানি, হয়তো কোথাও খেলছে—"

"খেলছে! এখনও? এদিকে ঘড়িতে যে দশটা বাজে, স্কুলে যেতে হবে খেয়াল নেই? আর তোমরাও এমন হ'য়েছ যে, তা'কে তাড়া দিতে পারেনি।" নির্ম্মলের মুখের ওপোরে বিরক্তির ছায়া স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

কঙ্কা ব'ললেঃ—"আহা ছেলেমানুষ!"

"ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষকেই গড়িয়ে পিটিয়ে বুড়ো ক'রে তুলতে হয়, জানো সে কথা!—"

নির্ম্মলের তীক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে কঙ্কার কাজের কোথায় একটু গলদ ধরা পড়'তেই সে যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়'লো। তার দিকে আর না দৃষ্টিপাত ক'রে, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতেই এঘর ওঘর দৌড়াদৌড়ি ক'রে নির্ম্মল যখন এক কোণ্ থেকে মনুকে আবিষ্কার ক'রে নিয়ে এলো তখন তার কঠোর হাতের স্পর্শে মনুর কর্ণমূল লোহিত বর্ণ হ'য়ে উঠেছে, চোখে জল।

নির্ম্মল চীৎকার ক'রে উঠলোঃ—"কোথায় ছিলি হতভাগা, ছিলি কোথায়? ইস্কুলে যাওয়ার কথা মনে ছিল না? এক্ষুনি তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, গুছিয়ে নে তোর বই শ্লেট,—নে—ব'লছি—।"

কঙ্কা ব'লতে গেলঃ—"কিন্তু ও এখনও ভাত খায়নি যে—"

নির্ম্মল ব'ললেঃ—"না খাক, তবু ওকে যেতে হবে, এখানে সারাদিন খেলা ক'রে বেড়াতে আমি দেব না,—কিছুতেই নয়।"

দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর—; কঙ্কার আর বাধা দেবার ভরসা হ'লো না; মণ্টুও বইশ্লেট গুছিয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'তে নির্ম্মল ওর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে ধ'রে টেনে নিয়ে চ'ললো, যেন ছাড়া পেলে ও এখনি পালিয়ে যাবে। নির্ম্মল মনুকে নিয়ে চ'লে গেল; কিন্তু ছেলেকে মারা, বা না খাইয়ে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কঙ্কা যেন এতটুকু বিষাদের ছায়াও কমলার মুখে চোখে ভাসতে দেখলে না, বরঞ্চ—একটু আনন্দিত ব'লেই মনে হ'লো তাকে।......

এ রকম ঘটনা ঘ'টতে লাগলো প্রায়ই;

মনুর কপালে প্রায়ই জুটতে লাগলো অর্দ্ধাহার, অনাহারও; বড় জোর টিফিনের সময়ে ছুটি; কিন্তু তাতে তার মার পক্ষ থেকে একটুও অনুযোগ না পাওয়াটা কঙ্কার দৃষ্টিতে যেন অস্বাভাবিক ব'লে ঠেকলো; মুখ ফুটে প্রশ্ন ক'রে ফেললেঃ—"আচ্ছা দিদি, এই যে, ছেলেটা প্রায় সারাদিন না খেয়ে ইস্কুলে কাটায়, তাতে তোমার মন কেমন করে না?—

"মন?—না।"

কমলা বেশ সপ্রতিভভাবেই জবাব দিলে; কঙ্কা এতে কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হ'তে পারলো না। নিজের মনেই যেন ব'ললেঃ—

"আমি হ'লে কিন্তু—"

"কিন্তু কি? বরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে?—"

সে হেসে উঠলো। কঙ্কা ব'ললেঃ—"তা একটু আধটু বাক-বিতণ্ডা হ'তো বৈকি! কিন্তু নিজে খেতে পারতুম না।"

কমলা হঠাৎ একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল। ব'ললেঃ—"আমি কিন্তু স্বামীর কাজে বাধা দিতে শিখিনি।"

"স্বামী!"

কঙ্কা একটু চ'মকে উঠলোঃ—"ঠিক বটে। এতদিন এসেছো দিদি, কপালে তোমার সিঁদুর, হাতেও নোয়া দেখছি রোজই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিনি কোনও কথাই। আজ তোমার শ্বশুরবাড়ী-বাপেরবাড়ীর কথা ব'লতে হবে দিদি!"

কণ্ঠে যেন তার একটু অনুরোধের সুর।

কমলা সে সুর অগ্রাহ্য ক'রে ফেরাতে পারলে না, আদেশের মতই কঠিন রূপে গ্রহণ ক'রে ধীরে ধীরে ব'লে চ'ললোঃ—আমি বড় গরীবের মেয়ে ছিলাম কঙ্কা, এই কলকাতারই এক বাসায় সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরের ম'ধ্যে আমার বিয়ে হয়—কিন্তু স্বামী আমায় স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রলেও কোনও দিন তাঁর কাছে নিয়ে যাননি শুনেছি, আমার মত গরীব অখ্যাত বংশের কুরূপা মেয়েকে স্ত্রী ব'লে সাধারণে পরিচয় দিতে তাঁর কুল মর্য্যাদা, পদমর্য্যাদায় বাধে।"

"ও—মস্ত বড় অজুহাত বটে; কিন্তু তোমার চলবে কেমন করে?"

"যা কিছু কাজ ক'রে।"

কমলার কথার সঙ্গে নির্ম্মলের আগের কথাগুলো মনে প'ড়ে যেতে এবার যেন সত্যই কঙ্কার সমস্ত অন্তরটা ওর জ'ন্যে সহানুভূতিতে নুইয়ে প'ড়লো; ব'ললে—"সত্যিই, তোমার কপাল বড় দুঃখের, কিন্তু দিদি, যখন তোমার যা দরকার হবে আমার কাছ থেকে অসঙ্কোচে ছোট বোন ব'লে চেয়ে নিও, লজ্জা কোরো না যেন; নেবে তো!—"

কমলা ব'ললে—"নেব।"

কঙ্কার বাবা এসেছিলেন মেয়েকে দেখতে।

অনেক দিন সে পিত্রালয়ে যায় নি; যাবার কথা হ'লেই ভাবেভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়—একে তার সংসারে আপন ব'লতে কেউ নেই, তার ওপোর নির্ম্মল যা আগোছালো, যা আপন ভোলা মানুষ, কখোন কি ক'রতে কি ক'রে বসবে, সুতরাং তার এ বাড়ীতে না থাকলে কি একদণ্ড চলে।"

মেয়ে বয়স্থা, তার সংসারের শুভ-অশুভ সে বোঝে; আর বোঝে বোলেই তার ওপোর জোর করা চলে না। বাবা অনেকবার ফিরে গেছেন, এবারও ফিরে যাবেন হয়তো সেই আশা নিয়েই—।

কঙ্কা তার বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লতে ব্যস্ত,—এমন সময়ে প্রবেশ ক'রলো নির্ম্মল। সেই সবে সে স্কুল থেকে ফিরেছে, তখনও পোষাক বদ'লায়নি, তাই শুধু মাত্র কুশল প্রশ্ন ক'রেই সে ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার পাশে পাশে সশঙ্কিত মনুকে চ'লতে দেখে কঙ্কার বাবা প্রশ্ন করলেন, "এটি আবার কে রে কঙ্কা?"

কঙ্কা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই দিলে নির্ম্মল নিজে; তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলোঃ—"ও আমার, আমারই এখানে থাকে ও,—সেইজন্যে—" ব'লতে ব'লতে মনুর হাত ধরেই সে অদৃশ্য হলো। যেন কঙ্কার বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখ থেকে শুধু নিজে নয়,—মনুকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

এরই পরদিনের বিকেল;

শরীরটা খারাপ ক'রেছিল ব'লে অবেলায় শুতেই কেমন যেন একটু তন্দ্রার ধারা চোখে এসেছিল। তন্দ্রা কাটতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কঙ্কা দেখলে পাঁচটা প্রায় বাজে। তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে সে থমকে দাঁড়ালো—শুনলো, পাশের ঘরে ব'সে খাবার খেতে খেতে নির্ম্মল বলছে—"ছেলেটা বড় পাজী হয়ে উঠেছে—"

প্রত্যুত্তরে কমলা ব'লছেঃ—সে দোষ তো আমার নয়, তোমার, তুমি যদি ছেলেকে মানুষের মত মানুষ তৈরী হবার শিক্ষা না দাও, যদি—"

কঙ্কা আর দাঁড়িয়ে শুনতে পারলে না,—ধীরে ধীরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে প'ড়লো—!

রাত্রে নির্ম্মলকে প্রশ্ন করলোঃ—"একটা কথার উত্তর দেবে?"

নির্ম্মল শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল ;—ব'ললেঃ—"কি কথা ?"

"বলছি, কিন্তু বল তার সত্যি জবাব দেবে ?"

"সত্যি জবাব না দিয়ে মিথ্যে জবাব কোনওদিন দিয়েছি ব'লে তো আমার মনে পড়ে না।"

কঙ্কা ব'ললেঃ—"না, তা নয় ;—তবে—"

"তবে আবার কি, বলে ফেল—তাড়াতাড়ি—"

"ব'লছি—"

কঙ্কা সোজা হ'য়ে ব'সে—নির্ম্মলের দিকে তাকালো পূর্ণ দৃষ্টিতে "ব'লতে পারো,—কমলা তোমার কে হয় ?—"

নির্ম্মল চ'মকে উঠলোঃ—"বলেছি তো—"

"না, তুমি ব'লোনি, একদিনও সত্যি কথা বলোনি—"

কঙ্কা যেন আজ এই বিবাহিত জীবনের মধ্যে প্রথম চীৎকার করে কথা বললে। "দিব্যি করতে পার তুমি ?"

"দিব্যি—! কিসের ?—"

"মনুর মাথায় হাত দিয়ে—"

নির্ম্মল আবার চ'মকে উঠলো, এবার যেন অতিরিক্ত রকম। বিছানা ছেড়ে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো—; নিকটে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো—"কঙ্কা—"

এ যেন নতুন আহ্বান! নতুন কণ্ঠস্বর! এ কণ্ঠস্বর এর আগে কোনওদিন শুনেছে বলে কঙ্কার মনে পড়লো না ; তবু জোর দিয়ে বললেঃ—

"না, কিছু শুনতে চাইনে,—মনুর মাথায় হাত রেখে তোমায় দিব্যি করতে হবে—!"

নির্ম্মলের চোখদুটো যেন একবার জ্বলে উঠলো বলে মনে হ'লো, তারপরে সে তেমনি ধীর পায়ে বার হ'য়ে গেল ঘর ছেড়ে।

একা কঙ্কা জেগে ব'সে রইল খাটের ওপোর।

পরের দিনের সকাল, সবেমাত্র রোদ উঠেছে।

ঘরের দরজা খুলেই কমলা দেখলে কঙ্কার জিনিষপত্র, বাক্স সুটকেশ ইত্যাদি ট্যাক্সিতে উঠছে—। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সেইদিকে তাকিয়ে কমলা জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাচ্ছ কঙ্কা—?"

কঙ্কা একটু হাসলো মাত্র, কোনও উত্তর দিলে না ; তারপরে গিয়ে উঠে ব'সলো ট্যাক্সিতে ; মুহূর্ত্তে সে দৃষ্টির বার হ'য়ে গেল— ; দাঁড়িয়ে রইল একা কমলা।

এরপরে দীর্ঘদিন কেটে গেছে, প্রায় বছর দুইয়েক। এর মধ্যে কঙ্কা আর নির্ম্মলের কাছে ফিরে আসেনি বটে ; কিন্তু তার পত্র আসে মাঝে মাঝে, তবে তাও সংক্ষিপ্ত, নির্ম্মলের পত্রের উত্তর, আর সে উত্তরে থাকে শুভাশুভের কথা।

কমলা ভাবেঃ—কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল ; কার সাজানো সংসার সে যেন হঠাৎ এসে ভেঙ্গে দিলে—আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে তার অধিকার !—কঙ্কার কথা তার মনে আছে ; দুপুর রাত্রে মনুকে বুকের কাছে শুইয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে সে হঠাৎ জেগে ওঠে,—মনে হয়—কঙ্কা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কঙ্কা যেন অভিসম্পাত দিচ্ছে তার ছেলেকে,—তার মনুকে। সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সে।

জেগে উঠে মনু জিজ্ঞাসা করে—"কি মা ?—"

কমলা বলে "কিছু নয় রে—কিছু নয়,—ঘুমো।"

আবার একদিনের সকাল, হেমন্তের শিশিরসিক্ত সকাল ; চারিদিক সবেমাত্র রৌদ্রের আভায় লাল হয়ে উঠছে।

ঘুম ভেঙ্গেছিল অনেকক্ষণ, তবু কঙ্কা উঠছিলনা বিছানা থেকে ; উঠেই-বা সে কি করবে ? কাজ কোথায় ?—অখন্ড অবসর তার, এ অবসর তার পূর্ণ হবে কি দিয়ে ...

বন্ধ দরোজায় করাঘাত ক'রে বাইরে থেকে দাসী ডাকলো "দিদিমনি,—অ—দিদিমনি, দরোজা খোলো না গো—।"

"কেন রে ?—"

বিছানা ছেড়ে সে উঠে এসে দরজা খুলে সামনেই যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চ'মকে উঠলো সে নির্ম্মল। নির্ম্মলের দেহ কৃশ, চোখ বসে গেছে, মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো এসে পড়েছে কপালে, মুখে, চোখে।—

নির্ম্মল বললে—"আমি, আমায় চিনতে পারছো না, আমি নির্ম্মল।"

কঙ্কা এর আগেই মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছিল, এখন ঘাড় নেড়ে জানালে—চিনতে সে পেরেছে অনেক আগেই।

নির্ম্মল একটু হাসলো ; ব'ললে—"কেন এসেছি জানো ?—"

কঙ্কা উত্তর দিলে, "না—"

নির্ম্মল ব'ললে—"একদিন না পরিচয় জানতে চেয়েছিলে ?"

কঙ্কা নীরব। নির্ম্মল বললে—"এতদিন আসিনি, কিন্তু আজ এসেছি শুধু আসবার সময় হয়েছে বলে ;—শোনো কঙ্কা, তোমায় বিয়ে করবার আগে ঢের আগে যাকে বিয়ে করেছিলাম—সে ঐ মনুর মা, —কমলা। আর তারই ঐ ছেলে,—সেই হয়েছিল আমার একমাত্র বংশধর ; কিন্তু সে আজ নেই,—তার মাথায় হাত দিয়ে তুমি আমায় দিব্যি করতে বলেছিলে—বলেই সে হয়তো এতটা গোপনতা সইলো না, তার মরণাপন্ন মাকে শুধু আমারই ভরসায় ফেলে রেখে চ'লে গেছে,—যেখান থেকে তাকে আর ফেরানো যাবে না—।"

যন্ত্রণার একটু হাসির রেখা নির্ম্মলের ঠোঁটের উপোরে ভেসে উঠলো—তারপরে আবার তেমনি ধীরে ধীরেই গেল মিলিয়ে।

বললেঃ—"চলে যাচ্ছি এদেশ ছেড়ে,—তাই তোমায় জানিয়ে গেলাম পরিচয়টা।" সে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো।

সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে কঙ্কা ডাকলে "শোনো—"

চ'লতে চ'লতেই মুখ ফিরিয়ে নির্ম্মল ব'ললে—"বল—"

অনেক কুণ্ঠা, অনেক সঙ্কোচের বাঁধন ছিঁড়েই যেন কঙ্কা বলে উঠলোঃ—"একটু দাঁড়াও, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।"

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

(ভ্রমণ কাহিনী পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(ছয়)

কার্লি দেখিবার জন্য আমার অনেক দিন হইতেই প্রাণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কতদিন সে কত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের প্রধান প্রধান গুহামন্দিরগুলি দেখিব বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ এতদিনে তাহা সার্থক হইল। তাই আমি প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। রাজগীরের সপ্তপর্ণী গুহার মন্দিরের কাছে দাঁড়াইলে যেমন দেখা যায় সম্মুখে চক্রবাল রেখায় যাইয়া আকাশ ও পৃথিবীর মিলন হইয়াছে —পীতশস্য সমৃদ্ধ সমতল ভূমির অপূর্ব্ব শোভা, এখানে দাঁড়াইয়া তেমনি দেখিলাম মুক্ত গগনতলে মুক্ত প্রান্তর, উপরে অনন্ত নীল আকাশ অপার ও উদার, নিম্নে মনোমোহিনী বসুন্ধরা জননী হাস্যময়ী স্নেহময়ী ও কল্যাণকামীরূপে বিরাজমানা। দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এই নিভৃত পর্ব্বতবক্ষে যাহারা এমন করিয়া গুহাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কত বড় সাধক ছিলেন তাহা দেখিলেই অনুভব করা যায়।

সম্মুখে প্রশস্ত সমতল ভূমি। তাহার পরে শ্রেণীবদ্ধভাবে গিরিগুহাগুলি একটির পর একটি সার বাঁধিয়া অবস্থিত। বেশী দিনের কথা নয় মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সরকারি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কার্লি গিরি মন্দির সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে এই স্থান ছিল জঙ্গলাকীর্ণ বন্য জন্তুর আশ্রয় নিকেতন। গ্রামের লোকেরা কাষ্ঠ আহরণ করিতে কিংবা পশুচারণ করিতে আসিয়া গিরিমন্দিরের অনেক মূর্ত্তি ইত্যাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

কার্লির কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে এ সমুদয় গিরি-মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব, তাহা হইলে পাঠকগণ সহজেই এ সমুদয় গিরিমন্দিরের ইতিহাস জানিতে পারিবেন।

এই কার্লি গিরিমন্দিরটি বোম্বে হইতে ৫০ মাইল পূর্ব্বে এবং জুন্নারের ৪২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পণ্ডিতগণের মতে কার্লি হইতেছে "one of the finest Buddhist cave Temples in India." কার্লির চারি-দিকের কুড়ি মাইল মাত্র বেষ্টনীর মধ্যে আরও প্রায় ৬০টি গিরি-মন্দির রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ৯১৫টি গিরি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৭২০টি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের নির্ম্মিত (Buddhist excavations), ব্রাহ্মণগণ ১৬০টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আর ৩৫টি জৈনদিগের প্রতি-ষ্ঠিত। গুহাগুলির বেশীর ভাগই পশ্চিম ভারতে বিশেষ করিয়া বোম্বাই প্রদেশ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। বৌদ্ধ গিরিমন্দিরগুলিকে মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) কতকগুলি খৃঃ পূর্ব্ব শতাব্দীতে বা প্রথম খৃষ্টীয় শতকে, [Before the Cristian era or during the first century] (২) এবং কতকগুলি খৃষ্ট জন্মের পরবর্ত্তী শতকে নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধদের গিরিমন্দিরগুলির মধ্যে স্তূপ, কারুকার্য্যখচিত রেলিং, বোধিতরু, মন্দির, স্তম্ভ বা লাট, চৈত্য-গৃহ, বিহার, ভিক্ষুগৃহ এবং পোলিক বা পয়ঃপ্রণালী সংযুক্ত হইয়া থাকে। কার্লি গিরিমন্দিরের নাম,—পাহাড়ের পদতলে অবস্থিত কার্লি নামক গ্রাম হইতে হইয়াছে।

আমরা সকলের আগে কার্লির প্রধান চৈত্যটির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশপথের সম্মুখেই কালীর মন্দির। যিনি একদিন আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হইয়া-ছিলেন, যাঁহার অহিংসা পরম ধর্ম্ম নীতি দেশে দেশে প্রচারিত হইয়া-ছিল যিনি যজ্ঞভূমে পশু বধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, আজকালের এমনি প্রভাব যে সেই বুদ্ধদেবের স্মরণীয় পবিত্র গিরিমন্দিরের সম্মুখেই কালী মন্দির অবস্থিত। আমাদের বন্ধু তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় হিন্দু, শৈবমতাবলম্বী এবং কালীর উপাসক। তিনি বলিলেন—আপনারা যদি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিতেন, তাহা হইলে এখানকার প্রসিদ্ধ মেলা দেখিতে পারিতেন। নৃমুণ্ডমালিনী কালীকে দর্শন করিবার জন্য হাজার হাজার লোক এখানে সমবেত হয়। শত শত ছাগ বলি হয়, রুধিরের ধারা প্রবাহিত হইয়া এই স্থানটিতে রক্ত নদীর সৃষ্টি হয়। আমি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! কি অদ্ভুত কালের প্রভাব। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় জাতিতে পরভু, আমাদের দেশের কায়স্থ জাতীয়। তিনি আমাকে বলিলেন—এই কালী মন্দির অতি প্রাচীন, অন্তত এই বৌদ্ধ মন্দিরগুলির পূর্ব্বে। আমি নীরব হইলাম। তর্ক চলে না। কালী মন্দির যে অনেক পরবর্ত্তী কালের সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমার কন্যারা দেবী দর্শনে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমার মন কেমন হইয়া গিয়াছিল। আমি আর কালীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম না।

আমরা প্রথমেই কার্লির বিখ্যাত চৈত্য গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চৈত্য গুহা একটি বিস্তৃত কক্ষ। প্রবেশ পথের দুই দিকে দুইটি লাট বা স্তম্ভ অবস্থিত। তাহার উপরে সিংহ মূর্ত্তি। এই সিংহ মূর্ত্তি দেখিয়া সারনাথের বিখ্যাত সিংহচূড় স্তম্ভের কথা মনে পড়িল। দুই দিকে উর্দ্ধে ও পার্শে নানারূপ মূর্ত্তি—সেগুলি decorative artএর অন্তর্ভুক্ত।

এই চৈত্য গৃহটি দেখিলে সেকালের স্থাপত্য বিদ্যা যে কত-দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। চৈত্য শব্দটি সম্ভবত 'চিন্তা' শব্দ হইতে উদ্ভূত। কাজেই চৈত্য বলিতে সমাধি-বেদী বুঝাইয়া থাকে। এই সকল চৈত্যগৃহের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোনও বিখ্যাত স্থবিরের বা উপদেষ্টার চিতাভস্ম রক্ষা করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল। চৈত্যগৃহগুলি সাধারণত আরাধনার জন্যই নির্ম্মিত হইত। এইখানে শ্রমণগণ মিলিত হইয়া আরাধনা করিতেন। এই গৃহে কোন ভিক্ষুর বাসের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক বৌদ্ধ গিরি-মন্দিরেই চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। কার্লি ও ইলোরার চৈত্য মন্দিরের নাম করা যাইতে পারে। ভারতের বৌদ্ধ গুহা মন্দিরের মধ্যে কার্লির চৈত্যটি যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর।

আমরা প্রশস্ত প্রবেশপথ দিয়া চৈত্য মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মধ্যস্থলে বিস্তৃত 'হল', হলের দুই পাশে সারি সারি স্তম্ভ। স্তম্ভের উভয় পার্শ্বে নাতি প্রশস্ত স্থান। প্রবেশপথের উপরে যে কাঠের কাজ আছে তাহাও অতি প্রাচীন। উহা নষ্ট হইতে বসিয়াছিল কিন্তু পুরাতত্ত্ব বিভাগ সংস্কৃত করিয়াছেন। কাঠের সামান্যও ক্ষতি হয় নাই। এইখানকার খিলানের নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে মনে হয়—একবার যদি আমরা সেই সব শিল্পীকে ফিরিয়া পাইতাম, তাহা হইলে বুঝিবা ভারতের অপূর্ব্ব খিলান-নির্ম্মাণ কৌশল সব দেশের লোককে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিত।

আমরা বেশ ভাল করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। এই চৈত্য মন্দিরের দুই দিকের স্তম্ভের সংখ্যা ত্রিশটি। প্রতি পার্শ্বে পনেরটি করিয়া স্তম্ভ রহিয়াছে। উপরের দিকটা octagonal বা অষ্টকোণ বিশিষ্ট।

মন্দিরের শেষ প্রান্তে একটি দাগোবা আছে। দাগোবা বলিতে গুম্বজাকৃতি বেদী বা স্মৃতিস্তম্ভকে বুঝাইয়া থাকে। উহার নিম্নভাগ বৃত্তাকার। উপরের দিকটা গুম্বজের ন্যায়।

গর্ভ বলে। হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ প্রাচীন গুহামন্দির-সমূহে যে সকল স্মৃতিবেদী বা দাগোবা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উপরিভাগ ছিল সমতল ও তাহাতে কোনরূপ চিহ্ন ছিল না। পরবর্ত্তীকালে ইলোর ও অজন্তা গুহার মধ্যে যে সমাধিস্তম্ভ আছে তাহার শীর্ষদেশে মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। গম্বুজের উপরের দিকে একটি চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত বাক্সের মত রহিয়াছে, তাহাকে তি' বলে। এই মঞ্জুষাগুলির চারিদিকে ছোট ছোট পাথরের

কার্লির একটি গিরি মন্দির

টুক্‌রা পাতার মত করিয়া সাজান দেখা যায়। আর সকলের উপরে একটি ছত্র থাকে। ছত্রটি প্রসারিতভাবে থাকে। কার্লির চৈত্য মন্দিরের এই ছত্রটি বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

এই চৈত্যটি যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর। ফার্গুসন সাহেবের মতে স্থাপত্যের দিক্ দিয়া এই চৈত্য মন্দিরটি—

"Was excavated in a time when the style was in its greatest purity. In it, all the architectural defects of the previous examples are removed; the pillars of the nave are quite perpendicular. The original screen is superseded by one in stone ornamented with sculpture—its first appearance apparently in such a position—and the architectural style had reached a position that was never afterwards surpassed."

কার্লির চৈত্য মন্দিরটি দেখিলে অনুভব করা যায় যে, ভারতের গিরিমন্দির যাহারা খনন করিয়াছিল সেই সকল শিল্পী কত বড় সুদক্ষ ব্যক্তি ছিল। শিল্পদেবতা যেন তাহাদিগকে আপনার সমুদয় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল।

এই চৈত্য মন্দিরের দ্বারের পাশে এবং অন্যান্য গুহা মন্দিরের সম্মুখে আজিও আমাদের স্বর্গত বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত—মুদ্রিত সব বিজ্ঞাপনী রহিয়াছে। দেখিয়া প্রাণ ব্যথিত হইল, মানুষের জীবন কত ক্ষণস্থায়ী! কার্লির এই চৈত্য মন্দিরটি এস্থানের বিবিধ খোদিত লিপি দেখিয়া অনুমিত হয় যে—১২০ খৃষ্টাব্দে এই গিরিমন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কার্লির চৈত্য মন্দিরের স্তম্ভগুলির উপরিভাগে দুই দুইটি করিয়া হস্তী নতজানু হইয়া বসিয়াছে আর তাহার উপর একজন পুরুষ ও একজন নারীর মূর্ত্তি। কোনও স্তম্ভের শীর্ষদেশে আবার দুইজন করিয়া নারীমূর্ত্তিও রহিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি স্তম্ভের উপরের দিকে একটি গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। উহা চৌকোণা হইবে এবং ১০ ইঞ্চির কম নহে, গর্ত্তের গভীরতাও ৪ ইঞ্চির কম হইবে না। সম্ভবত এক সময়ে ঐ স্থানে কোনও relic সংরক্ষিত ছিল, এখন আর তাহা নাই। চৈত্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার মূল দরজাটি ছাড়া আরও দুইটি প্রবেশ-পথ দুই পাশে রহিয়াছে। এই ঘরটি বেশ ্যালোকোজ্জ্বল। চৈত্য মন্দিরের অভ্যন্তরভাগের 'হলের' দৈর্ঘ্য ১২৪ ফিট ৩ ইঞ্চি পরিমিত হইবে। প্রস্থে হইবে ৪৫ ফিট ৬ ইঞ্চি। মন্দিরের উচ্চতা মেজ হইতে ৪৬ ফিট পরিমিত হইবে। মন্দিরের বাহিরের দিকটা প্রায় ৫২ ফিট চওড়া হইবে। কার্লি'র চৈত্য মন্দিরের 'সিংহস্তম্ভ' দুইটি দেখিবার মত বটে। চারিটি সিংহ শীর্ষদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমরা চৈত্য মন্দিরটি দেখিয়া তাহার পার্শ্বস্থিত বিহার কয়টি দেখিলাম। সেই ছোট বড় গুহামন্দিরগুলির কাছে একটি জলের কুণ্ড আছে। উপরে কয়েকটি গুহা মন্দির আছে। দ্বিতলে উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। পূর্ব্বের সিঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন করিয়া উঠিবার জন্য সিঁড়ি তৈরী করা হইয়াছে। দ্বিতলের বৃহৎ কক্ষের মেজেটি অসমতল। তাহার পাশে পাশে ভিক্ষুদের বিশ্রাম করিবার প্রস্তর শয্যা (stone-beds) আছে। নীচে একটি প্রশস্ত ভিত্তিভূমিতে ছোট বড় অনেক গর্ত্ত দেখা যায়। এই সব গর্ত্ত কিসের বলা কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐসব স্থানে ভিক্ষুরা রান্না বান্না করিতেন এবং জল রাখিবার পাত্র ইত্যাদি রক্ষা করিতেন ঘষিলে প্রস্তরও ক্ষয় পায়, তাই কালাবশে এসবও ক্ষয় পাইয়া গর্ত্তের আকার ধারণ করিয়াছে।

আমরা এইখানে যে টেবিল ও চেয়ারপাতা ছিল, তাহাতে বসিয়া চা পান ও বেশ ভাল করিয়া এক পর্ব্ব ভোজন শেষ করিলাম। তারপর সমুদয় গুহা মন্দিরগুলি দেখিলাম। একটি গুহা মন্দির এমন স্থানে অবস্থিত যে, সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক। নোটিশ-বোর্ডে সতর্কবাণী লেখা আছে। যদি কেহ ঐখানে যান তাহা হইলে তিনি নিজ দায়িত্বে যাইতে পারেন। স্থানটি অতি ভয়ঙ্কর। দুপেয়ে পথ আর নিম্নে ভীষণ খাড়া পাহাড়, একবার পদস্খলন হইলে প্রায় ছয় শত ফিট নীচে পড়িয়া ভবলীলা সংবরণ করিতে হইবে। সব বুনো ঘাস নীরস ও বিবর্ণ গুচ্ছে গুচ্ছে দাঁড়াইয়া আছে।

চৈত্য মন্দিরের দক্ষিণ দিকে কতকগুলি ছোট বড় গুহা মন্দির রহিয়াছে। একটি অসম্পূর্ণ গুহা মন্দিরের আয়তন ৩০½ ফিট ×১৫½ ফিট হইবে। এই মন্দিরটির ভিতরের দিকেও একটি ছোট কক্ষ রহিয়াছে। পথেই ঘরের পেছনে বুদ্ধদেবের একটি মূর্ত্তি রহিয়াছে ইহার সম্মুখে আর একটি জল প্রণালী। তাহার অপর দিকের বিহারটি প্রায় ৩৩ ফিট হইবে। উহার উচ্চতা হইবে ৯ ফিট, ৫ ইঞ্চি। এখানে কোনও প্রস্তর শয্যা নাই। পশ্চাৎ দিকের প্রাচীরের মধ্যভাগে বুদ্ধদেবের একটি সুন্দর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বুদ্ধদেব পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাহার নীচে দুই দিকে দুইটি মৃগ, মধ্যে ধর্ম্মচক্র। তার পশ্চাতে দুইটি উপাসক মূর্ত্তি। প্রতি পার্শ্বে রহিয়াছে চামরধারী ব্যক্তি। একজন তাহার দক্ষিণ হস্তে পদ্মের মৃণাল ধারণ করিয়া আছে, আর তাহার মাথার উপরে বিদ্যাধরগণ শোভমান।

আমাদের সবগুলি বিহার দেখিতে বেশ সময় লাগিল। প্রায় প্রত্যেক বিহার বা মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রেই খোদিত লিপি দেখিয়াছি। পরে সে সব বিষয়ে আলোচনা করিব।

(ক্রমশ)

রাঙ্গামাটীর পথ

(৪২৬ পৃষ্ঠার পর)

বেরুবার সময় বিভাবরী চিঠি লিখেছিল, সে চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি। ...বিভাবরীর জীবনের সঙ্গে তার জীবনের সংযোগ সম্বন্ধে যে সুমধুর সম্ভাবনা......

লেটার-প্যাড বার করে সে চিঠি লিখতে বসলো। লিখলে,—

বিভা,

আমি কোলকাতায় এসে পেঁ'চেছি। বর্ম্মা ছাড়বার দিন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম। জাহাজে চিঠি লেখা হয়নি। এখন লিখছি।

আমি ভালো আছি। এখানে আর চার-পাঁচ দিন থাকবো, ভাবছি। তারপরেই রাঁচী।

বর্ম্মায় কি রকম বাণিজ্য করলুম—সে খপর জানতে চেয়েছো। দেখা হলে বলবো। বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করতে পারিনি। যা ছিল, কেড়ে-কুড়ে গলা ধরে তিনি আমাকে বর্ম্মা থেকে বিদায় করে দেছেন—হয়তো ভালোই করেছেন!

ব্যর্থতার সঙ্গে বর্ম্মার কিছু স্মৃতি নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে—সিল্ক, কাপড়ের রকমারী ফুল, নানারকম পুতুল, টুকিটাকি Curios, আর তোমার বাবার জন্যে Lacquer-এর জিনিষ।

আশা করি, তোমরা ভালো আছে। আমাকে যে ভোলোনি, সেজন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে বার-বার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি

বিমল

(ক্রমশ)

একদিন

(গল্প)

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দীনু চক্রবর্ত্তীর সারা গ্রামেই একটা ভয়ানক অখ্যাতি আছে। ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলে মুখের উপর কিছু বলে না, আবার না বলিয়াও পারে না। ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার বৃদ্ধ; রূঢ় কথা শোনান' সত্যই বিসদৃশ ব্যাপার। রোগা, কালো, লম্বা চেহারা; বুকের পাঁজর ক'খানিকে দূরে হইতেই গণনা করা যায়। তৈলাভাবে রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বুকের উপর সর্যাপ্ত লোম—অতি পরিচিত মূর্তি। সামনের গোটাকয়েক দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। হাসিবার সময় গালের দু'পাশের মাংস কুঁচকাইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফোক্লা দাঁতের ফাঁক দিয়া মুখের ভিতরের অনেকখানি চোখে পড়ে। সাদা পৈতার গোছায় ছোট-বড় অনেকগুলি চাবি ঝুলিতেছে।

কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া হরি কৈবর্ত খাতির করিল না, তারস্বরে বলিল, "বলি হ্যাঁগা ঠাকুর, তোমার কি লজ্জা-সরমের বালাই নেই?"

দীনু নির্লজ্জের মত হাসিয়া বলিল, "ক্যান্ রে, কি কি ক'র্নু তোর?"

ঝাঁঝালো সুরে হরি বলিল, "ছি ছি, একি বামুনের মত ব্যাভার! কাল কাঁঠালখানা দেখে এইছি বাগানে, আর রাত্তিরের মধ্যেই চুরি ক'রে এনেছো? ভগবান ভাল করবে তোমার? আমার কাচ্চাবাচ্ছার মুখ থেকে কেড়ে খ'ও! নোলা খ'সে যাবে না?" লোকের ভিড় জমিয়া গেল, সকলেই কৌতুক দেখিতে রাস্তার ধারে জড় হইল। দীনু বিপন্নের মত চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আর মর্, আমি তোর কাঁঠালের কি জানি?"

হরি গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুমি জানো না, বটে! ফণেকে সন্ধ্যে বেলায় কে আমার গাছের কাঁঠাল বেচে এসেছে?" দীনু ধরা পড়িয়া গেল। সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তোর কাঁঠালের খবর রাখি? এ্যাঁ, আমি চুরি ক'রেছি! তুই যে দিনকে রাত কর্লি হরে; এখনো চন্দ্র-সূয্যি উঠ্ছেরে, অত টাকার গরম সইবে না, বুঝেছিস? বামুনকে সবার সামনে অপমান! এই আমি ব'লে গেনু, বমুনের কথা মিথ্যে হবে না—তোর ঘরে যেন আগুন লাগে!" বলিয়াই হন্ হন্ করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। হরি একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল, "ওঃ ভারি আমার বামুন! যে চোর, তার শাপ-শাপান্ত খাটে নাকি?"

একে একে লোকজন সরিয়া পড়িতে লাগিল। ও-পাড়ার চাটুয্যে বলিলেন, "হ্যাঁরে হরে, কি হ'য়েছিল? হরি সমস্ত ঘটনা বলিয়া গিয়া সক্রোধে কহিল, "বলুন তো ঠাকুর, ওর ভাল হবে? বামুন মনিষ্যি, ছোট লোকের মত ব্যাভার; ছি, ছি!"

চাটুয্যে বলিলেন, "একখানা কাঁঠাল, এই তো? তাই ব'লে ব্রাহ্মণকে অত গালিগালাজ করা ঠিক হয়নি।" হরি স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, "তা কি ক'র্ব বলুন, কত ক'রে বমু, বল্লেই তো হ'তো, 'আমি নাইছি',—তাহ'লে আমি কি ঠ্যাঙা নিয়ে মারতে যেতুম? তা' ঠ্যাকার দেখুন না, চুরিও ক'রবেন আবার চোখ-রাঙানিও আছে!"

চাটুয্যে মনে মনে বলিলেন, "নাঃ, দীনুটাকে নিয়ে আর পারা গেল না; এমন কর্লে ছোট লোকদের কাছে ব্রাহ্মণের মানসম্ভ্রম থাকে কি ক'রে?"

মুদির দোকানে গিয়া দীনু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; সত্য, কাজটা বড় কাঁচা হইয়া গিয়াছে, অত করিয়া ফণীকে বলিয়া আসিয়াছে, তবু হতভাগা সব ফাঁস করিয়া দিল। কাহাকেও আর বিশ্বাস করা চলে না।

"কি চাই ঠাকুর?"

দীনু চমকাইয়া উঠিল, বলিল, "দে তো পেঁচো নুন এক পয়সার? ওকি, অতটুকু নুন এক পয়সায়! তোরা যে দিনকে রাত কর্লি পেঁচো, এ্যাঁ।"

পাঁচু খামচা কাটিয়া আর একটু লবণ দিয়া বলিল, "সে আর হবে না ঠাকুর, যুদ্ধ বেধেছে, নুন চালান যাচ্ছে, নড়াইতে নুন খুব দরকার।"

"তা ব'লে অতটুকু দিবি?"

সে হাসিয়া বলিল, "তা কি ক'রব, আমরা কি নুন গড়াই, যে ফাউ দেবো?" গলা একটু খাটো করিয়া নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছিল চক্কোত্তি মশাই, হরে অত গাল দিচ্ছিলো কেন?" পিছনদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীনু গর্জ্জিয়া উঠিল, "ওর ভাল হবে? বামুনকে খামোকা অপমান লোকের সামনে! কাঁঠাল চুরি গেছে আর অমনি আমায় গালাগালি।" একটু দম লইয়া পুনরায় বলিল, "এই আমি ব'লে রাখলুম পেঁচো, তোরা দেখে নিস্, যে মিথ্যে কথা বলে অপমান করলে, পরমেশ্বর তার দুটি চক্ষের মাথা খাবেন!"

রুষ্ট হইয়া পাঁচু বলিল, "কি, অমনি এক মুঠো সরষে তুলে নিয়েছ! ধন্যি বাবা হাত সাফাই,—রাখো!" নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সরিষাগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া দীনু বাহির হইল বাড়ীর দিকে।

এক সময় হয়তো বাড়ীটি বড়ই ছিল। কিন্তু সংস্কার অভাবে চুণ-বালি খসিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। পুত্র শ্রীবিলাস কলিকাতায় থাকে, বৎসরে একবার করিয়া আসে, কখনো বা একা, কখনো সপরিবারে। পিতার নামে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেয়; একটা মানুষ, পল্লীগ্রামে ইহার বেশী খরচ হয় না। বলা বাহুল্য, দীনু ইহার এক পয়সাও খরচ করে না।

তামাক টানিতে টানিতে দীনু ভাবিতেছিল। ছি ছি, অপমানের একশেষ; কি-ই বা দরকার? শ্রীবিলাস মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইতে খরচ করিলে এত দুর্নাম ভোগ করিতে হয় না। এইবার এ দুষ্কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে। বয়স তো হইল ষাটের কাছাকাছি, মরণ আগাইয়া আসিতেছে—এ সময় ধর্ম্ম চর্চা করা ভাল।

"দাদু!" পাশের বাড়ীর রায়দের ছোট মেয়ে মালতী হাজির হইল, বলিল, "এই দেখ, কেমন সরের নাড়ু, মামা

এনেছে ক'ল্‌কাতা থেকে। মা বারণ ক'র্‌ছিল, ব'ল্‌ছিল, 'ওখানে যাসনে, বুড়োটা এখুনি চুরি করে নেবে।' হ্যাঁ দাদু, তুমি চুরি ক'রে নেবে?" বলিয়া দীনুর গলা জড়াইয়া ধরিল।

বাঃ, চমৎকার তো সরের নাড়ু! কলিকাতার, ভাল হইবে বৈ কি; কেমন ছোট এলাচের গন্ধ। লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে দীনু প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ দিদি, খুব মিষ্টি?"

"হ্যাঁ, খু—ব!" এই বলিয়া সে একটু ভাঙিয়া গালে ফেলিয়া দিল। দীনুর চোখ দুইটি লোভে ঝলসিয়া উঠিল, বলিল, "কই, দেখি দিদি, কেমন—না না, খাব না, হাতে ক'রে দেখব।"

"খাবে নাতো?"

"নারে না, পাগল আর কি!" সরের নাড়ু হাতে লইয়া কৌশলে খানিকটা ভাঙিয়া লইল। মালতী ছয় বৎসরের হইলেও বুদ্ধি কম নয়, নাকে কাঁদিয়া বলিল, "এ্যা, অতটুকু আমার বুঝি, এ—ত বড় নাড়ু!"

দীনু হাসিয়া বলিল, "দূর, তুই তো খেয়ে ফেললি খেলে বুঝি যেমনকার নাড়ু তেমনি থাকে?" মালতী কথা না বাড়াইয়া বাকী অংশটুকু মুখে ফেলিয়া দিল। সে চলিয়া গেলে দীনু মনে মনে হাসিয়া বলিতে লাগিল, "আজ-কালকার ছেলেপিলে কি চালাক রে বাবা; একটু ভেঙে নিয়েছি, ঠিক টের পেয়েছে তো?" বলিয়াই ভাঙা সরের নাড়ু চাখিয়া দেখিল, "বাঃ চমৎকার!"

চাটুয্যে বলিলেন, "দেখ চক্কোত্তি, বয়েস তো হচ্ছে, শেষের দিনের কথা ভাবো? ওকাজ ছেড়ে দাও।"

দীনু প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না দাদা, মাইরি, কোন্ শালা মিথ্যে কথা বলে! বুড়ো হ'য়ে গেনু, এখন ক'রব এই কাজ? ছি ছি, তার আগে গলায় দড়ি জুটবে না!" চাটুয্যে তিক্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "থামো না, যে না জানে, তার কাছে বুজরুকি ক'রো, আর গাঁয়ে জানে নাই বা কে? তুমি বামুনের ছেলে, বুড়ো মানুষ, ছেলে চাকরী ক'রছে, নাতি-পুতি হয়েছে, এখনও ছিঁচকে চুরি! তোমার গলায় দড়ি দেওয়াই উচিত, বুঝেছ দীনু?"

সে কিন্তু অপ্রতিভ হইল না, সমান জোরে তর্ক করিয়া বলিল, "তুমি মাইরি কোন শালার ভাঙচিতে ভুলেছ। এখনও ত্রিসন্ধ্যে না ক'রে জল খাই না, আর আমি করব চুরি! থু থু!" চাটুয্যে ধমক দিয়া বলিলেন, "যাও যাও, ন্যাকামো রাখ, কে না জানে তোমার গুণের কথা? আজ সকালে হরে ক্যাওট যে অপমানটা ক'রলে তাতেও কি লজ্জা হয় না?" যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "যাই হোক, ওকাজ ছাড়ো—তোমার কিসের দরকার শুনি? অমন যার ছেলে-বউ, তার আবার চুরি! এসব কথা শুনলে শ্রীবিলাস কিন্তু ভয়ানক দুঃখ পাবে, ছেলের কাছে আর ও মুখ পুড়িয়ো না।"

চাটুয্যে চলিয়া গেলে সত্যই অনুতাপ হইল। ঘরে-পরে আর এ লাঞ্ছনা সহ্য হয় না। শ্রীবিলাস কি পুত্রবধূ কল্যাণী যদি এসব জানিতে পারে, তবে লজ্জার আর সীমা থাকিবে না। ভাগ্যে ছেলে ঘন-ঘন যাতায়াত করে না! অন্তত তাহাদের মুখ চাহিয়াও একাজে ইস্তফা দিতে হইবে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, মিটমিটে ভাঙা লণ্ঠন জ্বালিয়া তামাক খাইতে খাইতে দীনু এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

শ্রীবিলাস চিঠি লিখিয়াছে, পূজার ছুটিতে সে সপরিবারে বাড়ী আসিবে। দীনু পোষ্ট কার্ডখানি হাতে লইয়া সারা পাড়া ঘুরিয়া আসিল; পাড়া-প্রতিবেশী এমন কি ছোট ছেলে-মেয়েরাও জানিল, শ্রীবিলাস বাড়ী আসিতেছে। তাহাকে সকলেই ভালবাসে, লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া সম্ভ্রম করে।

অতঃপর একদিন সন্ধ্যায় গরুরগাড়ী করিয়া শ্রীবিলাস, কল্যাণী ও চারি বৎসরে কন্যা মিনতি হাজির হইল। বুড়া দীনু কোথায় রাখিবে, কি করিবে—ঠিক করিতেই পারিল না। কল্যাণী পদধূলি লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনি ব্যস্ত হবে না বাবা, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

দীনু আনন্দে বার বার মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কি হয় মা, গাড়ীর ধকলে শরীর যে খারাপ হয়ে গেছে।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি গরুরগাড়ী হইতে বাক্সগুলি নামাইতে লাগিল। লজ্জিত হইয়া শ্রীবিলাস বলিল, "ও থাক বাবা, আমার চাকর আসছে, ওই নামাবে।"

দীনু খুসী হইয়া নাতনী মিনতিকে কোলে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে শালী, চিনতে পারিস?" প্রত্যুত্তরে মিনতি তাহার কচি হাত দিয়া দীনুর পক্ককালবর্দ্ধিত খোঁচা খোঁচা গোঁপ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দীনু হাসিতে হাসিতে বলিল, "আরে ই-কি, গোঁপ নেবার সখ হয়েছে দিদি? তা বড় হও, নাত-জামাই আসুক, তার গোঁপ নিয়ে খেলা করো!"

মিনতি একগাল হাসিয়া বলিল, "কবে নাত-জামাই আসবে দাদু?" কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিল।

ক্রমে পাড়ায় সমস্ত খবরটা ছড়াইয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইলেও একে একে অনেকে হাজির হইল। ছেলেরা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলিয়া বড় বড় বাক্সগুলি দেখিতে লাগিল।

তারপর দিন শ্রীবিলাস পাড়ার সকলের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। বস্তুতঃ দীনুকে সকলে যেমন হীন চক্ষে দেখে, শ্রীবিলাসকে তেমনি ভালবাসে। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠরা নহে, ছোট ছেলেরাও তাহাকে অতরঙ্গভাবে গ্রহণ করে এবং আবদারের সীমা থাকে না।

চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ বাবা?"

শ্রীবিলাস পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি জ্যাঠামশাই।" নানা কথাবার্ত্তা হইল; শেষে তিনি বলিলেন, "দেখ বাবা, টাকা-পয়সা সাবধানে রেখো, জান তো সব।" শ্রীবিলাস লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

যখন বাড়ী ফিরিল তখন সোরগোল উঠিয়াছে। মিনতির হারছড়া চুরি গিয়াছে। চাকরবাকর সঙ্গে লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কিন্তু হারের সন্ধান পাওয়া গেল না।

দীনু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এ্যাঁ, আমার বাড়ী চুরি! দেখে লেবো, সাত লম্বর ফৌজদারী ঠুকে নাজেহাল করে দেবো!"

নির্জ্জনে পাইয়া কল্যাণী মেয়েকে জেরা করিতে আরম্ভ করিল, "কে হার নিয়েছে রে মিনু, রামশরণ?" রামশরণ চাকরের নাম।

মিনতি সবেগে মাথা নাড়াইয়া বলিল, "না, দাদুগো, যেই হার কেটে নিয়েছে, আর আমিও টের পেয়েছি, হি হি।" কল্যাণী ধমক দিয়া বলিল, "দুষ্টু মেয়ে, দাদু? মেরে হাড় ভেঙে দেবো না!" মিনতি কাঁদিয়া বলিল, "বারে আমি কি জানি? দাদু কাঁচি দিয়ে হার কেটে নিলে যে!" গালে ঠাস করিয়া এক চড় কসাইয়া দিয়া কল্যাণী তর্জ্জন করিয়া বলিল, "ফের মিথ্যে কথা?"

পিছন হইতে গম্ভীর গলায় শ্রীবিলাস বলিল, "মেরো না ওকে।"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল।

শ্রীবিলাস সামনে আসিল হাসিয়া বলিল, "চোর খুঁজে পেলে না বলে মেয়ের ওপর রাগ পড়লো নাকি?"

রুষ্টমুখে কল্যাণী উত্তর দিল, "কি মেয়ে বল দেখি কখন চুরি গেছে টেরও পেলে না!"

"না পাওয়াই তো স্বাভাবিক। অন্তত চোর যদি বেশ পরিপক্ক হয়।"

কল্যাণী রাগের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল।

রাত্রিতে সেই কথাই হইতেছিল। কল্যাণী দুঃখ করিয়া বলিতেছিল, "তাই তো, তিন ভরির হারছড়া, আজকাল সোনার দাম কত চড়া।" শ্রীবিলাস আলো নিভাইয়া দিয়া বলিল, "সেতো জানি, কিন্তু কি করব বল, চোর যে এমন বেরসিক, তা কি করে জানব!" কল্যাণী হাসিল, তারপরে মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, তোমার কাকে সন্দেহ হয়, রামশরণ?"

"না," বলিয়া সে কল্যাণীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি বলিল। সে অভিভূত হইয়া গেল, সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "ছি ছি, তাও কখনো হয়, উনি কি এ কাজ করতে পারেন?" শ্রীবিলাস হাসিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। কল্যাণীর যেন বিশ্বাসই হইতেছে না, পুনরায় সেই কথাই বলিল, "উনি কি একাজ করতে পারেন?" হাজার হলেও মানুষ তো, নাতনীর হার চুরি করেছেন এ বিশ্বাস তোমার হল কি করে?"

শ্রীবিলাস একটু গম্ভীর হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার চেয়ে আমার বাবাকে আমি ভালভাবে জানি কল্যাণী!"

ইহার উপর কিছু বলা অপ্রীতিকর। সে চুপ করিয়া গেল।

অনেক রাত্রি। খুট্ করিয়া কি একটা শব্দ হইল, আবার। শ্রীবিলাসের ঘুম ভাঙিয়া গেল, কান পাতিয়া শুনিল। সুট-কেশের কাছেই আবার শব্দ হইল, খুট্...। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, অন্ধকারে চোখ মেলিয়া দেখিল—কে একজন মানুষই হইবে, সুটকেশের কাছে ঝুঁকিয়া বসিয়া কি করিতেছে আর শব্দ হইতেছে, খুট্...খুট্...। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, চোর—ডাকাত! কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকা উচিত হইবে না, উহার মধ্যে অনেকগুলি টাকা আছে।

গম্ভীর গলায় বলিল, "কে!" বলিয়াই ফস্ করিয়া আলো জ্বালিয়া ফেলিল।

বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দীনু হাঁটু গাড়িয়া সুট-কেশটার পাশে বসিয়া হাতুড়ি দিয়া খুট্ খুট্ করিয়া তালা ঠুকিতেছে, কিন্তু ভাঙিতে পারে নাই।

কল্যাণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

দীনু শ্রীবিলাসের দিকে অদ্ভুতভাবে চাহিয়া রহিল, গলা দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

শ্রীবিলাস হাসিল, বলিল, "ও তালা খুলতে পারবেন না তো বাবা, জার্ম্মানীর কিনা, ভারী মজবুত!"

দীনু তালার উপর হইতে হাত উঠাইতে চায়, কিন্তু কে যেন তাহার হাতখানাকে তালার সঙ্গে শত গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিয়াছে।

অমৃতস্য পুত্রঃ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দিনে মশা, রেতে মাছি; রসুই-ধোঁয়া-ই
সাঁজের বেলার ধূপ; প্রভাত-অনিলে
'ধাপা মেল্' রেখে যায় বাস; দূরে বিলে
গানের "দাদুরী" ঝোলে সাপের গলায়।
এ-হেন মুল্লুকে আঁখি প্রথম মেলিলে
(দু' পা না চলিতে হের তিন জোড়া চোর,
লাখ দুই মিছে কথা শোনো দিন-ভোর্)
ষোড়শ বর্ষের হেথা খোলস ফেলিলে!
কিন্তু সে অধিকার কেও ত কাড়ে নি
উর্দ্ধ আকাশে দু'টি আঁখি তুলিবার,
আস্তাকুঁড়ে পা তোমার—সেটি ভুলিবারঃ
—মুকুলায়মান তব বাহু কি বাড়ে নি?
রাতে প্রাতে জ্যোতিঃ-সেতু হের নিতি নব
শতেক-শরত-শেষে যাহে গতি তব॥

রহস্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

তোমারে করিনি ধন্য তোমায় ভালবেসে,
আমারে বেসেছ ভাল মর্ত্তে নেমে এসে,
সেও নহে অহঙ্কার বিরাট বিস্ময়,
সীমাহীন প্রেম তব নাহিক সংশয়।
তারি স্রোতে উঠে তৃণ প্রাণে মর্ম্মরিয়া,
ফুটে ফুল, অলিদল ছুটে গুঞ্জরিয়া।
কর্ম্মের প্রবাহ চলে সৃষ্টি মহোৎসবে,
অব্যক্ত সহজ ছন্দে গোপনে নীরবে।
বিমূঢ় কল্পনা মোর ওগো মায়াবিনী;
কেমনে ভুলিনু আমি তোমারি রাগিণী।
ঝঙ্কারিছ নিত্য যাহা চিত্ত বেদীমূলে
স্মৃতি যার ডাকে মোরে অকূলেরি কূলে।
করুণা রহস্য তব, চাই উন্মোচিতে,
বুদ্ধির বিচারে নহে, হৃদয় সম্বিতে।

নক্ষত্র চেনা

(মাঘের আকাশ)

অধ্যাপক কামিনীকুমার দে এম-এস-সি

অন্ধকার রাত্রে, নগরের কৃত্রিম আলোকযন্ত্র পরিস্থিতির বাহিরে গিয়া একবার নির্মল আকাশের দিকে তাকাইলে তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় না, এমন লোক বিরল। মাঘ মাসে পূর্বাকাশের যে গরিমা তাহার তুলনা নাই। সমগ্র আকাশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল কালপুরুষমণ্ডল পূর্বাকাশের মাঝামাঝি শোভা পায়, ইহাতে দুইটি প্রথমশ্রেণীর উজ্জ্বল *নক্ষত্র আছে। ইহা আবার এই শ্রেণীর কয়েকটি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত। এবৎসর পশ্চিমাকাশে সমগ্র আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদ্বয়, শুক্র ও বৃহস্পতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যে উজ্জ্বল 'সাঁঝের তারা' দেখা যায়, তাহা শুক্র গ্রহ, শুক্রের উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় তাহারই মত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি বৃহস্পতি। বৃহস্পতির কিছু উত্তর-পূর্বে 'লোহিতাঙ্গ' মঙ্গল এবং আরও পূর্বদিকে শনি, সূর্যাস্তের পর আকাশে কোন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিবার আগে এই সকল গ্রহ দেখা দেয়।

১ নং চিত্র
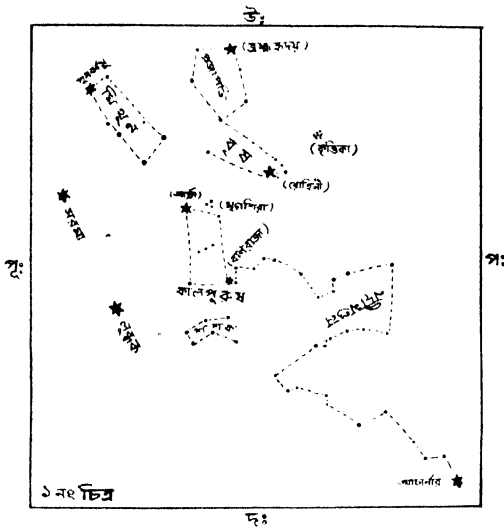
১৪ই পৌষের 'দেশ' পত্রিকায়, পৌষ মাসের আকাশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যদিও বর্তমান প্রবন্ধ পূর্ব প্রবন্ধ নিরপেক্ষ করিবার চেষ্টা হইবে, তথাপি উহা একবার পাঠ করিয়া লইতে পারিলে সুবিধা হইবে এবং এবিষয়ে আগ্রহ বর্ধিত হইবে। উহাতে নক্ষত্রমণ্ডল বলিতে কি বুঝায়—একই সময়ে বিভিন্ন মাসে এবং একই রাত্রে বিভিন্ন সময়ে নক্ষত্রের অবস্থান কি নিয়মে পরিবর্তিত হয়, এই সমস্ত আলোচিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রহগণের অবস্থিতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা জানি বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য যথাক্রমে মেষ, বৃষ প্রভৃতি বারটি রাশি বা মণ্ডলে থাকে এবং এক বৎসর পরে তাহাকে আবার পূর্ব স্থানে দেখা যায়। চন্দ্র এই রাশিগুলি ভ্রমণ করিয়া ২৭ দিন পরে পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসে। নক্ষত্রগুলি এক এক মণ্ডলে বা রাশিতে একই স্থানে অবস্থান করে কিন্তু গ্রহগুলি প্রত্যেকে দ্বাদশ রাশির ভিতর দিয়া বিভিন্ন গতিতে এদিকে-ওদিকে ভ্রমণ করে। পৌষ মাসের প্রথম-ভাগে আমরা মঙ্গলকে বৃহস্পতির পশ্চিমদিকে দেখিয়াছিলাম আর এখন দেখি পূর্বদিকে। ইহার কারণ বৃহস্পতি প্রায় এক বৎসর ধরিয়া একই রাশিতে অবস্থান করে আর মঙ্গল দুই মাসেরও কম সময়ে একটি রাশি ভ্রমণ শেষ করে। যাহারা দিনের পর দিন শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে দেখিয়া আসিতেছেন লক্ষ্য করিয়াছেন বৃহস্পতি ও মঙ্গলের দূরত্ব কিরূপে কমিয়া পৌষের শেষভাগে একদিন দুই গ্রহ উত্তর-দক্ষিণ ব্যাপী একই রেখার উপর আসিয়াছিল, তারপর মঙ্গল বৃহস্পতি হইতে পূর্বদিকে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। শনির গতি আরও মৃদু, ইহা এক রাশিতে প্রায় আড়াই বৎসর অবস্থান করে। বর্তমানে বৃহস্পতি ও মঙ্গল মীন রাশিতে, শনি মেষে এবং শুক্র কুম্ভে আছে। ২৩শে মাঘ শুক্র মীন রাশিতে এবং মঙ্গল মেষে প্রবেশ করিবে।

পৌষ মাসের আকাশের পরিচয় দিবার সময়, আমরা ক্যাসিও-পিয়া মণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবার কালপুরুষমণ্ডল হইতে আরম্ভ করাই সুবিধাজনক হইবে। এই মণ্ডল অনেকের নিকটেই পরিচিত।(*) চারিটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের একটি আয়তক্ষেত্রের প্রায় মাঝখানে আড়াআড়িভাবে তিনটি নক্ষত্র আছে। ইহার নক্ষত্রগুলিকে লইয়া একটি মানুষের মূর্তি কল্পনা করা যায়। উত্তরদিকে এক জায়গায় তিনটি ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্র এই পুরুষের মস্তক; পূর্বোল্লিখিত আড়াআড়ি তিনটি নক্ষত্র তাহার কোমর। আবার ঝাপ্‌সা আলোর ভিতর কয়টি তারা কটিদেশ হইতে
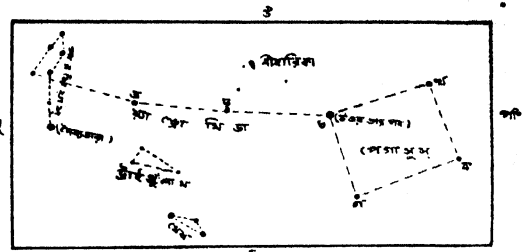
২নং চিত্র

বিলম্বিত তরবারির মত দেখায়, ঝাপ্‌সা আলোর মত যাহা দেখায়, উহা কালপুরুষমণ্ডলে অবস্থিত নীহারিকা। আকাশে পাতলা উজ্জ্বল মেঘের মত কোন কোন স্থানে দেখা যায়, ইহাদের সাধারণ নাম নীহারিকা। ইহারা প্রধানত দুই রকমের, পূর্ব প্রবন্ধে এক-রকমের কথা আমরা বলিয়াছি; তাহারা দূরের বহু কোটি নক্ষত্র সমন্বিত আমাদের নক্ষত্র জগতের মত পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্র জগৎ। আর একরকম নীহারিকা মহাশূন্যে বিস্তৃত উজ্জ্বল গ্যাস ও বস্তুকণা লইয়া গঠিত। কালপুরুষের নীহারিকা এই শেষোক্ত শ্রেণীর। কালপুরুষমণ্ডলে লাল উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আর্দ্রা এবং কোণাকোণি বিপরীত দিকেরটি বাণরাজা (Rigel); এই দুইটিই প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র, কালপুরুষমণ্ডলের পশ্চিম-উত্তরে বৃষমণ্ডল এবং পূর্ব-উত্তরে মিথুন মণ্ডল। বৃষের উত্তরে প্রজাপতি মণ্ডল, বৃষমণ্ডলের প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র রোহিণী (Aldebaran) প্রায় মঙ্গলের মত লাল বলিয়া ইহাকে চেনা সহজ। ইহার কিছু

---

*বেশী উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি চিত্রে * চিহ্ন দ্বারা দেখান হইবে এবং এইগুলিকে আমরা প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র বলিব। সমগ্র আকাশে এরকম ২০টি নক্ষত্র আছে; ইহারা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(*) এক একটা নক্ষত্রমণ্ডলকে চিনিবার সুবিধার জন্য, উহার বিশেষত্ব, কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল নক্ষত্রকে রেখা দ্বারা যোগ করিয়া চিত্র দেওয়া হইয়াছে। চিত্রগুলি উল্টাইয়া পূঃ, পঃ প্রভৃতি যথাক্রমে পূর্ব পশ্চিম দিকে রাখিয়া আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলগুলি চিনিতে হয়।

দূরে পশ্চিমদিকে ছয় সাতটি তারার জটলা দেখা যায়; তাহা সর্বজন পরিচিত সাতভাই কৃত্তিকা। দূরবীণে এখানে আরও অনেক নক্ষত্র দেখা যায়; বাইনকিউলার দিয়া দেখিলেও এখানে প্রায় ২০টি নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। মিথুনের পুনর্বসুদ্বয় এবং প্রজাপতি-মণ্ডলের ব্রহ্মহৃদয় তাহাদের উজ্জ্বলতার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিথুন রাশির পূর্বদিকে এক জায়গায় ঝাপ্‌সা আলোর মত দেখা যায়—মনে হয় যেন একখানা মৌচাক। ইহা কতকগুলি নক্ষত্রের জটলা; নাম প্রিসিপ (Praesepe) নক্ষত্র-পুঞ্জ। বাইনকিউলার দিয়া দেখিলে ইহার নক্ষত্রগুলি বড়ই সুন্দর
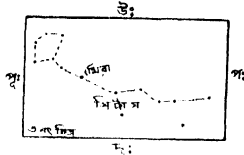
দেখায়, ইহা কর্কট মণ্ডলের অন্তর্গত। এই মণ্ডলের অন্য বিশেষত্ব কিছু নাই। কালপুরুষের পূর্বদিকে কিছু দক্ষিণে আকাশের সর্বোজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধক (Sirius) এবং উত্তর-পূর্বদিকে আর একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র প্রভাস বা সরমা (Procyon) রহিয়াছে। লুব্ধক তারা মৃগব্যাধ (Canis Major) মণ্ডলের অন্তর্গত এবং সরমা ছোটকুকুরমণ্ডলের (Canis Minor) অন্তর্গত। আর্দ্রা, সরমা ও লুব্ধককে লইয়া একটি সমবাহু ত্রিভুজ কল্পনা করা যায়। পূর্বাকাশের নক্ষত্রগুলি দেখিবার সময়, পরিলক্ষিত হইবে যে উত্তরে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র ব্রহ্মহৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া লাল রঙএর রোহিণী এবং পর পর বাণরাজা, লুব্ধক, সরমা, পুনর্বসুদ্বয়—এই প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি একটা বৃত্তাভাসের (ellipse) উপর রহিয়াছে। এবং আকাশের এই অংশের ভিতরেই বৃষ, প্রজাপতি (Anriga), মিথুন ও কাল-
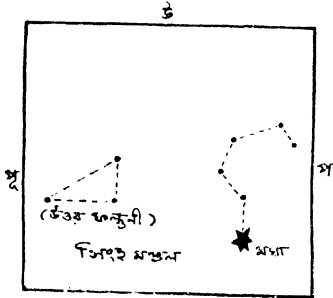
৪নং চিত্র

পুরুষমণ্ডল। কালপুরুষের দক্ষিণদিকে শশক (Lepus) মণ্ডল। লুব্ধকের বহু দক্ষিণে সমগ্র আকাশের দ্বিতীয় উজ্জ্বল নক্ষত্র অগস্ত্য (Canopus) এখনও দিগন্তরেখার বেশী উপরে উঠে নাই। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় সোজা দক্ষিণদিকে ইহাকে উজ্জ্বল রূপে দেখা যাইবে। অগস্ত্য আর্গোনেভিস্ নামক এক বড় মণ্ডলের অন্তর্গত। কালপুরুষের পায়ের নিকট হইতে নদীমণ্ডল (Eridanus) বাহির হইয়া নানা বক্রগতিতে দক্ষিণ-দিকে সর্বনিম্নে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র আচার্নারে গিয়া শেষ হইয়াছে [১নং চিত্র]।

পশ্চিমাকাশের মাঝামাঝি চারিটি তারা বেশ দূরে দূরে রহিয়া একটি সমচতুর্ভুজের মত দেখায়। ২নং চিত্রে ইহাকে ক, খ, চ, গ চতুর্ভুজরূপে দেখান হইয়াছে। ক (পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র), খ এবং গ (গোপদ তারা) পেগাসুস নামক মণ্ডলের অন্তর্গত। চিত্রের চ, ছ, জ নক্ষত্রগুলি অ্যান্ড্রোমিডা মণ্ডলের অন্তর্গত এবং শেষের দিকের নক্ষত্রগুলি পার্সিয়াস মণ্ডলে। এই তিনটি মণ্ডল পূর্ব প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। চিত্রে পার্সিয়াসের দৈত্যতারার অবস্থান দেখান হইয়াছে। দৈত্যতারার দক্ষিণ-পশ্চিমে ট্রায়াঙ্গুলাম্ এবং তাহার দক্ষিণে তিনটি তারা মিলিয়া মেষমণ্ডলের একটি অংশ। পেগাসুসের দক্ষিণে পাঁচটি স্বল্পোজ্জ্বল নক্ষত্র মিলিয়া একটি ছোট পঞ্চভুজ ক্ষেত্র করিয়াছে, ইহা মীনরাশির একটি অংশ। দেখিতে কতকটা কুম্ভের মত কুম্ভ-রাশি সন্ধ্যার কিছু পরেই পশ্চিমে অস্তমিত হইবে। আকাশের
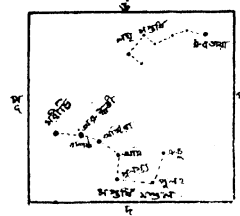
৫নং চিত্র

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্রটি ফমালহাউট —ইহা দক্ষিণ মীনমণ্ডলের অন্তর্গত। উত্তর-পশ্চিম কোণায় উত্তরক্রুশের প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র ডেনেবকে দেখা যাইবে। উত্তর-ক্রুশের অবশিষ্ট অংশ এখন আর দৃষ্টিগোচর নয়। পৌষমাসে এই মণ্ডলকে আমরা চিনিয়াছিলাম।

পেগাসুস চতুর্ভুজের পূর্বদিকের দুইটি তারাকে একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করিয়া, রেখাটিকে দক্ষিণদিকে বাড়াইয়া দিলে, উহা একটি মাঝারি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পাশ দিয়া যায়। এই নক্ষত্রটি সিটাস্ মণ্ডলের অন্তর্গত। এই মণ্ডলের অন্য নক্ষত্র-গুলি ক্ষীণোজ্জ্বল; ইহাতে মিরা (Mira) নামে একটি আশ্চর্য নক্ষত্র আছে। প্রায় এগার মাস পরে ইহা একবার উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তারপর ক্রমে ইহার উজ্জ্বলতা এত কমিয়া যায় যে
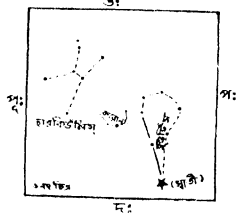
খালি চোখে ইহাকে মোটেই দেখা যায় না। বর্তমানে ইহা খালি চোখের গোচর নয়, চিত্রে ইহার অবস্থান দেখান হইল [৩নং চিত্র]।

উত্তরদিকে পাঁচটি তারা লইয়া Mএর মত ক্যাসিওপিয়া এখন পশ্চিমাকাশে, ইহার নীচে সিফিয়াস্ মণ্ডলকে এখন পাঁচটি তারা লইয়া একটি কাত করা গির্জা বা শিব মন্দিরের মত দেখায়। সোজা উত্তরদিকে সর্বনিম্নে যে মাঝারি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, তাহা ধ্রুবতারা। সিফিয়াসের চূড়ার নক্ষত্রটি ধ্রুবতারা হইতে বেশী দূরে নহে।

সন্ধ্যা ৭টার পর পূর্বাকাশে সিংহমণ্ডলের দর্শন মিলিবে। রাত্রি একটু অধিক হইলে সমগ্র সিংহমণ্ডলকে ভালরূপে দেখা যাইবে। সিংহের মঘা একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইহাও একটি সুন্দর মণ্ডল। ইহার দুই অংশ; পশ্চিমদিকের অংশ ছয়টি তারা লইয়া একটি কাস্তের মত দেখায়—আর পূর্ব-দিকের অংশটি তিনটি তারা লইয়া একটি সমকোণী ত্রিভুজ [৪নং চিত্র]। সমস্ত নক্ষত্রগুলি লইয়া কেহ কেহ একটা সিংহের আকৃতিও কল্পনা করেন। দ্বাদশ রাশির কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ,

মিথুন ও কর্কটরাশি এই মাসের সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই মাসে পূর্ণিমার চন্দ্রকে মঘানক্ষত্রের কাছে দেখা যায়; এইজন্যই মাসের নাম মাঘ। ছায়াপথ ক্যাসিওপিয়া, পার্সিয়াস্, প্রজাপতি, বৃষ, মিথুন, কালপুরুষ, মৃগব্যাধ, আর্গোনেভিস্ প্রভৃতি মণ্ডলের উপর দিয়া গিয়াছে।

শুনা যায়, এমন উৎসাহী নক্ষত্রদর্শক সব আছেন, যাঁহারা প্রথম পরিচয়ের সময়, সমস্ত রাত এক একটি মণ্ডলের উদয় দেখার জন্য কাটাইয়া দেন। ইহার একটি সুবিধা এই যে, সূর্য্যের কাছের কয়েকটি মণ্ডল ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলই দুই একদিনের মধ্যে চিনিয়া লইতে পারা যায়। আবার শীতকালের রাত্রি দীর্ঘ বলিয়া, এই উদ্দেশ্যে শীতকাল অধিকতর উপযোগী। শেষ রাত্রে একবার উঠিতে পারিলেও কতকগুলি মণ্ডল দেখার সুবিধা হয়। আজকাল সন্ধ্যায় সপ্তর্ষিকে সম্পূর্ণ দেখা যায় না—শেষ রাত্রে উত্তরদিকে একবার তাকাইলে সাতটি তারা লইয়া প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত এই উজ্জ্বল মণ্ডল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই সুন্দর মণ্ডলটি যেন মানবের কাছে তাহার চিরন্তন অমীমাংসিত প্রশ্নেরই প্রতীক। এই মণ্ডল আকাশে উদিত থাকিলে ধ্রুবতারার অবস্থান বুঝা খুবই সহজ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের চিত্রে তাহার সাতটি তারার নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার পুলহ ও ক্রতু যোগ করিয়া একটি সরল রেখা কল্পনা করিলে তাহা উত্তরদিকে যে মাঝারি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পাশ দিয়া যায় উহাই ধ্রুবতারা [৫নং চিত্র]।

সন্ধ্যার পূর্বদিকে যে নক্ষত্র উদিত হইতেছিল, শেষ রাত্রে তাহা পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছে। এখন পশ্চিমদিকে সিংহকে দেখা যাইবে তাহার পূর্বদিকে কন্যা রাশি; এই রাশিতে একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, নাম চিত্রা। প্রায় মাথার উপর বুওটিস্‌মণ্ডল—ইহাতে স্বাতী একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র। কন্যার পূর্বদিকে তুলা রাশি এবং তাহার পূর্বে (পূর্বাকাশে) দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিছার মত বৃশ্চিক রাশিকে দেখা যাইবে। ইহার জ্যেষ্ঠা একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র। দক্ষিণ ক্রশের সর্বোজ্জ্বল নক্ষত্র দক্ষিণাকাশে সর্বনিম্নে তাহার কিছু পূর্বদিকে সেণ্টরাসমণ্ডলে দুইটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র আছে। এই দুইটির পূর্বদিকের নাম আলফা সেণ্টাউরি (Centauri)—আগে ইহাই আমাদের নিকটতম নক্ষত্র বলিয়া জানা ছিল; কিন্তু এখন দূরবীণে ইহার একটি সংগী নক্ষত্র ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাই আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। তবে এই নিকটতম নক্ষত্র হইতে আমাদের কাছে আলো পেঁছিতে চার বৎসরেরও অধিক সময় লাগে—আর আলোক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। দক্ষিণ ক্রশ-মণ্ডল এবং সেণ্টারাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র দুটি ৩০° ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরস্থ স্থানসমূহ হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। বুওটিসমণ্ডলের পূর্বদিকে মুকুট বা করোনামণ্ডল এবং তাহার পূর্বদিকে হারকিউলিসমণ্ডল [৬নং চিত্র]। দক্ষিণদিকে পশ্চিমাকাশে জল-সর্পমণ্ডল (Hydra) একটি লম্বা সাপের মত রহিয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর ২০টি নক্ষত্রের মধ্যে, সন্ধ্যায় পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশের বিভিন্ন অংশে ডেনের, ফমাল হাউট, আচার্ণার, রোহিণী, ব্রহ্মহৃদয়, বাণরাজা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, লুব্ধক, সরমা, অগস্ত্য—এই এগারটিকে আমরা দেখি; সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় মঘাকে দেখি, চিত্রা, স্বাতী, দক্ষিণ ক্রশের সর্বোজ্জ্বল নক্ষত্র, সেণ্টরাসের উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয়, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা ও অভিজিৎ—এই শ্রেণীর অবশিষ্ট নক্ষত্র।

প্রতিদিন একই সময়ে নক্ষত্রমণ্ডল বিভিন্ন স্থানে দর্শন দিয়া দিনের পর দিন যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া চলে, তাহা দেখার একটা চমক ও আনন্দ আছে। চৈত্র মাসের 'দেশ' পত্রিকায় আর একবার নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যার যা 'তার তা'

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

১

কাননের ফুল হয়ে
ফুটেছিনু একা
জ্যোছনায় ভরা এক রাতে,
আদরেতে নিলে তুলি
চুমো দিয়ে মোরে
বাঁধি নিলে কবরীর সাথে।

২

মলিন দেখিয়া পরে
ফেলি' দিলে দূরে,—
চাহিলে না মুখ তুলে আর;
পথিক-সে চ'লে গেল
অবহেলে চেয়ে,
ভ্রমরের হ'ল মুখ ভার।

৩

পবন আসিল ধেয়ে
নিমেষের মাঝে
সাথী করি' নিয়ে গেল তুলি
তটিনীর বুকে নাচি
ঢেউগুলি সাথে
হরষেতে চ'লেছিনু ভুলি'।

৪

দেবতার পূজা লাগি'
দেবদাসী একা
ফুলহীন সাজি নিয়ে ফিরে,
দেখিয়া আমায় জলে,—
তুলি সযতনে
মন্দিরে এলো ধীরে ধীরে।

৫

দেবতায় দিল সঁপি'
নোয়াইয়া শির
ভক্তেরা এলো সবে ভীড়ে;
রাখি' দিল বুকে ধরি'
দেবের আশীষ্
দলগুলি যতনেতে ছিঁড়ে।

হিন্দু সমাজের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(২)

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, ডাঃ ভগবান দাসের মতে জাতিভেদই হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির মূল কারণ। যাহা পূর্ব্বে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" ছিল, তাহাই কালক্রমে বিকৃত হইয়া এই ঘোর অনিষ্টকর জাতি-ভেদ প্রথায় পরিণত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং আরও কোন কোন মনীষী এই শ্রেণীর কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন। কথাটা অনেকটা সত্য হইলেও, ইহার সবখানি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে কোন এক সময়ে বর্ণাশ্রম বা কর্ম্মবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু 'জাতিভেদ' যে একেবারেই ছিল না এমন কথা বলা যায় না। জাতি-ভেদের আরম্ভ হইয়াছিল সেই কালে, যে কালে দ্বিজাতি ও শূদ্র এই দুই বৃহৎ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। দ্বিজাতি বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 'বর্ণ'কে বুঝাইত। ই'হারা সকলেই ছিলেন আর্য্য। এই তিন বর্ণের মধ্যে আহার ব্যবহারে, বিবাহের আদান-প্রদানে বিশেষ কোন ভেদ ছিল না। ইহার পরেই একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য গণ্ডী টানিয়া দেওয়া হইয়াছিল—আর সেই গণ্ডীর অপর পারে ছিল শূদ্রেরা। শূদ্র বলিতে 'অনার্য্যদের' বুঝাইত। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া আদিম অধিবাসী অনার্য্যদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কতকাংশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। যে সব অনার্য্য আর্য্যদের শরণাপন্ন হইল, তাঁহাদের দাস বা অনুগত হইয়া বাস করিতে সম্মত হইল, তাহারাই আখ্যা পাইল শূদ্র ('মূল' শব্দ 'ক্ষুদ্র')। তাহারা আর্য্যদের পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাদের সমাজের আওতায় কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে লাগিল (পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং)। কিন্তু শুধু পরিচর্য্যার অধিকারটুকুই তাহারা পাইল,—আর্য্যেরা তাহাদের সঙ্গে আহার-ব্যবহার মেলা-মেশা করিতেন না, বৈবাহিক আদান-প্রদান তো দূরের কথা। 'অস্পৃশ্যতা' ও 'অনাচরণীয়তার' সূচনা হইল এইখানেই।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। শূদ্রদের মধ্যেও আবার একটা গণ্ডী টানা হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত হীন, অধম বা বর্ব্বর বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহারা হইল 'অন্ত্যজ'। ইহারা আর্য্যদের অধ্যুষিত গ্রামে বা নগরে থাকিতে পারিত না, উহার বাহিরে প্রান্তসীমায় থাকিতে বাধ্য হইত। শূদ্রেরা চতুর্থবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আর এই অন্ত্যজদের বলা হইত 'পঞ্চম-বর্ণ'। ভারতের সকল প্রদেশেই এই পঞ্চমবর্ণের অস্তিত্ব এককালে ছিল। এখনও দক্ষিণ ভারতে বিশেষত মাদ্রাজে তাহার জীবন্ত নিদর্শন বিদ্যমান। এই পঞ্চমবর্ণীয়েরা এমনই 'হীন ও অধম' যে তাহারা গ্রাম বা সহরের এলাকার বাহিরে বাস করিতে বাধ্য হয়, রাজপথ দিয়া হাঁটিতে পারে না। সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপ হইতে জল তুলিতে পারে না। ব্রাহ্মণ দেখিলে পলায়ন করে, পাছে তাহার গায়ের বাতাস লাগিয়া ব্রাহ্মণ অশুচি হয়। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও 'অন্ত্যজদের' বংশীয়েরা আছে, কিন্তু তাহাদের এতটা সামাজিক নির্য্যাতন বা দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় না।

এই যে দ্বিজাতি, শূদ্র এবং অন্ত্যজ—ইহাই হিন্দু সমাজে প্রথম জাতিভেদ। আর্য্যেরা অবশ্য নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধি তথা সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার ফলে যে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে বর্দ্ধিত ও শাখা-প্রশাখা সমন্বিত হইয়া সহস্রশীর্ষ জাতিভেদরূপে প্রকট হইল।

হিন্দু সমাজে যে 'অস্পৃশ্যতারূপ' ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও সূচনা পূর্ব্বোক্ত আর্য্য-অনার্য্য ভেদের উপর। দ্বিজাতিরা শূদ্র ও অন্ত্যজদের স্পর্শ করিতেন না, করিলে 'ধর্ম্মহানি' হইত, তাহাদের প্রস্তুত বা পৃষ্ট আহার্য্য-পানীয় গ্রহণ করা দূরের কথা। কালক্রমে পরিচর্য্যার গুণে শূদ্রদের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিজাতিদের স্পৃশ্য ও আচরণীয় হইল বটে, কিন্তু অনেকে পূর্ব্ববৎ অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়ই রহিয়া গেল। অন্ত্যজদের তো কাহারও ভাগ্যের উন্নতি হইলই না। বাঙ্গলা দেশের হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় উভয়ই আছে। কতকগুলি জাতি 'অনাচরণীয়' (যাহাদের জল 'চল' নহে) কিন্তু অস্পৃশ্য নহে,—অপর কতকগুলি উভয়ই। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া কাহারও বিরাগভাজন হইতে চাই না।

সুতরাং ডাক্তার ভগবান দাস যে বলিয়াছেন, প্রাচীনকালে হিন্দু-সমাজে বর্ণাশ্রম ছিল, জাতিভেদ ছিল না, তাহার মধ্যে এইটুকু সত্য যে, আর্য্য 'দ্বিজাতিদের' মধ্যে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) জাতিভেদ ছিল না,—আহার-ব্যবহার, বৈবাহিক আদান-প্রদান পরস্পরের মধ্যে চলিত। একের বংশধরেরা অন্যের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ "বিশুদ্ধ" বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা খুব বেশীদিন অব্যাহত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতের যুগেও দেখি,—দ্বিজাতিদের মধ্যে বৃত্তি অনেকটা বংশানুক্রমিক হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম জাতিভেদের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বংশধরেরা ব্রাহ্মণের বৃত্তিই অবলম্বন করিত, কেহ কদাচিৎ ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিত, ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও কেহ কদাচিৎ ব্রাহ্মণ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনকারীরা "ক্ষত্রিয়" বলিয়া গণ্য হইতেন না, ব্রাহ্মণই থাকিয়া যাইতেন। যথা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি। পরশুরামের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বৈশ্য অধিরথ-পুত্র কর্ণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিলেও ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হন নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান চলিত বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত খুবই অল্প। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায়, মহাভারতের যুগেই দ্বিজাতিদের মধ্যে জাতিভেদ বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল এবং অনেকটা পাকাপাকিভাবেই 'বৃত্তি' বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ঘটিল—যাহাতে জাতিভেদের কাঠামো আরও বেশী দৃঢ়তর হইল। আর্য্য সমাজের প্রথমাবস্থায় দ্বিজাতিদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ বিশেষ ছিল না, সকলেরই মর্য্যাদা সমান ছিল। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে ব্রাহ্মণদের মর্য্যাদা খুব বাড়িয়া গেল, তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা ব্রাহ্মণের পরে এবং বৈশ্যের মর্য্যাদা ক্ষত্রিয়ের পরে নির্দ্দিষ্ট হইল। ফলে, পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহার, বৈবাহিক আদান-প্রদান ক্রমশ লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের চেয়ে বেশী মানী হন, তাঁহার বাড়ীতে অন্নগ্রহণ না করেন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করিবেন কিরূপে? ক্ষত্রিয়ই বা ব্রাহ্মণকন্যার পাণি-পীড়নের সাহস সঞ্চয় করিবেন কিরূপে? মহাভারতে যে সমাজের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে এই সব প্রথা তখনই যে অনেকটা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এইভাবে দ্বিজাতিদের মধ্যে জাতিভেদ যখন বেশ পাকা রকম হইয়া দাঁড়াইল, তখন আর একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইল। বর্ণবিভাগকে গণ্ডী টানিয়া জাতিভেদে পরিণত করা যায়, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করা যায় না। এক্ষেত্রে জীব-প্রকৃতি মানুষের সকল বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ শাসনের অনভিপ্রেত কাণ্ড করিয়া বসে। সুতরাং বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বৈবাহিক মিলন ঘটিতে লাগিল। ফলে, এই যে সব সংকরজাতির

(শেষাংশ ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রবাসী বাঙালীর বাঙলা বুলি

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে শিক্ষা-মন্ত্রী এই নিয়ম জারী করিয়াছেন যে, বাঙলা ভাষা পরীক্ষার মাধ্যম (medium) হইতে পারিবে না এবং বাঙালীর পক্ষে বাঙলা ভাষা স্কুলে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হইবে না। এই প্রদেশের যাঁহারা অধিবাসী তাঁহাদের সকলকেই স্কুলে হিন্দি এবং উর্দু পড়িতে হইবে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন-পত্রের উত্তর হিন্দি বা উর্দুতেই লিখিতে হইবে, তবে স্থান এবং অবস্থা বিশেষে দরখাস্ত দ্বারা ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি মিলিতে পারে।

এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা যাচাই করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা আহিমাচল কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের গণ-দেবতাকে বৃহৎ হাঁ করাইয়া তাহার মুখবিবর হইতে একটা ভাষাই নির্গত করাইতে চান—সে ভাষা হিন্দি বা হিন্দুস্থানী। তাঁহাদের নিশ্চিত বিশ্বাস একই ভাষায় কথা কহিতে না পারিলে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয় না। অতএব সে সম্বন্ধেও আপাতত সন্দেহ প্রকাশ করিব না। আমার নালিশ কেবল সেই সকল বাঙালীর বিরুদ্ধে যাঁহারা এই সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করিয়া লইয়া বলিতেছেন, ঠিকই ত, যুক্তপ্রদেশে থাকিব অথচ হিন্দি বা উর্দু শিখিব না, এ আবার কেমন কথা! তাহা হইলে চাকরি পাওয়ার জন্য পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা-প্রতিযোগিতায় আমরা টিঁকিব কেমন করিয়া? আর বাঙলা—সে আমাদের মাতৃভাষা—স্কুলে যদি পড়ানও না-ই হয়, তবে না হয় বাড়ীতেই একটু পড়িয়া লইব।

পরীক্ষা-প্রতিযোগিতায় সফল হইয়া যাঁহারা চাকরি পাওয়ার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদের সে স্বপ্ন আমি ভাঙিয়া দিতে চাহি না, বরঞ্চ প্রার্থনা করিব সে স্বপ্ন যেন সত্য হয়, কিন্তু বাড়ীতে একটুখানি পড়িয়া লইলেই যে বাঙলা শেখা যায় না সেই কথাটাই আজ সবিনয়ে নিবেদন করিব। ঈশ্বরের প্রসাদে বাঙলা আজ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা—তাহার সাহিত্য কবিতা, গীতি-কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি বিচিত্র সম্ভারে আজ বহুমুখী হইয়া উঠিয়াছে, কেবলমাত্র বাড়ীতে একটুখানি পড়িয়া লইলেই তাহার রস-গ্রহণ করা যায় না। সে ভাষা এবং সাহিত্যের সহিত জীবন্ত যোগ না থাকিলে তাহার প্রাণ-শক্তিকে (genius) ধরা যাইবে না। সে আজ আর কেবলমাত্র অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের বস্তু নাই।

আমার কথাটা যাঁহারা বিশ্বাস না করিবেন তাঁহাদের অবগতির জন্য কিছু উদাহরণ দিব। বাঙালীরা একদা জীবিকা-সমস্যা সমাধানের জন্যই যে বাঙলা দেশের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিলেন এ কথা সকলেরই জানা। তাঁহাদের সে সমস্যার কতকটা সমাধানও হইয়াছিল, অনেকে প্রবাসে বড় বড় পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত জীবনে এই ব্যবস্থার কুফলও ফলিয়াছিল বড় কম নয়। যাঁহারা বড় চাকরি করিতেন, নিজেদের আভিজাত্য দ্বারা তাঁহারা স্বতন্ত্র ছিলেন; কিন্তু সাধারণ বাঙালী প্রবাসীরা তাঁহাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোন গৌরবই বোধ করিতেন না, সুতরাং তাঁহারা তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফলে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁহারা এই ভাষা এবং সংস্কৃতিকে কতক পরিমাণে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সেজন্য দুঃখ বোধ করেন নাই। কেননা তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধের মত ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, যে প্রদেশ তাঁহাদের রুটি দিতেছে তাহার ভাষা এবং সংস্কৃতি নিশ্চয়ই বাঙলা দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহার মধ্যে নিজেদের ভাষা এবং কাল্‌চারকে বিসর্জন দিলে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

শ্রেষ্ঠ নয় এমন কথাও বলিতেছি না। প্রাদেশিকতার বিষকে তীব্রতর এবং উজ্জ্বলতর করিবার ইচ্ছা বিন্দুমাত্র আমার নাই। আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এইটুকু যে, বাঙালীর ভাষা এবং কাল্‌চার একটি বিশিষ্ট বস্তু—তাহার সাধনার এবং ঐতিহ্যের অনিবার্য প্রকাশ—তাহাকে বাঁচাইয়া রাখার মধ্যেই বাঙালী জাতির কল্যাণ।

কিন্তু সজ্ঞানে ধরিয়া থাকিতে না চাহিলে যে এই বস্তু একদিন হাত ফস্‌কাইয়া পলায়ন করে, সেই কথাটা বলিবার জন্যই আমার এত উপক্রমণিকা, প্রবাসী বাঙালীর মধ্যেও যে একদিন তাহাই ঘটিয়াছিল এবং তাহারই নির্ভুল প্রমাণ যে এখনও তাহার কথাবার্তার মধ্যে আবিষ্কার করা যায়, তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। যাহাতে কেহ মনে না করেন যে, কথাগুলি আমার স্বকপোল-কল্পিত, সেই কারণে যে ঘটনা সম্পর্কে কথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল তাহারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কিছু দিব। তাহাতে ঘটনা-সংস্থান পরিষ্কার বোঝা গেলে কথাগুলির প্রকৃত প্রয়োগ-মূল্য (force) বুঝিবার সুবিধা হইবে।

এক বাঙালী ভদ্রলোকের বৃদ্ধা শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছিল। বলা বাহুল্য পরিচয় পাওয়ার পূর্বে এই জামাতা বাবাজীবনকে আমি বাঙালী বলিয়া চিনিতে পারি নাই। কাপড়টা লুঙীর মত করিয়া পরা, মাথায় একটা সাদা টুপি। শোকের সময় মৃতা শাশুড়ীর গুণ বর্ণনা করিলে জামাতা হয় ত কিঞ্চিৎ খুশী হইবেন মনে করিয়া আমি বলিলাম, আপনার শাশুড়ী এ পাড়ার মধ্যে একজন গুণবতী মহিলা ছিলেন, সকলের আপদে-বিপদে দেখ্‌তেন। জামাতা শবানুগমন করিতে করিতে বলিলেন, হাঁ, তাঁর **পাশী চামার** জ্ঞান ছিল না। পাশী বলিয়া যুক্তপ্রদেশে যে একটি জাতি আছে, সেটা আমার জানা ছিল না। পরে বুঝিলাম, আমরা বাঙলায় কাহারও উদারতার পরিচয় দিতে হইলে যেমন বলি, তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কোন তফাৎ ছিল না, জামাতা বাবাজীউ অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। পথ চলিতে চলিতে ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ শ্বশুরের উল্লেখ করিয়া বলিলাম, স্ত্রী চলে গেলেন, এইবার ওঁর বড় কষ্ট হবে। জামাতা মুখের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত না করিয়া বলিলেন, হাঁ, উনি আর **চারদিন** আছেন। চারদিন আছেন? বলে কি? হাত গুণিতে জানে নাকি? অনুধাবন করিয়া বুঝিলাম, তা' নয়; আমরা যেমন বলি, শ্বশুর মশায় আর বেশীদিন বাঁচবেন না, দু'চার মাসের মধ্যে উনিও যাবেন, জামাতা বাবাজীর মনের ভাবখানা তাই। কথোপকথন চালাইবার বৃথা চেষ্টা তবু ছাড়িলাম না। নিঃশব্দে কিছু পথ অতিবাহনের পর বলিলাম, আপনার শ্বশুর মশায়ের খুব কষ্ট হয়ত হবে না। তাঁর পুত্রবধূ আছেন, তাঁরা শ্বশুরের যত্ন করবেন। জামাতা বাবাজীর মুখের রেখা বিকৃত হইয়া উঠিল; বলিলেন, আরে মশাই, আজকালকার দিনে **নাউছাটিয়া** নিয়ে চালান বড় শক্ত। কথাটার সম্যক অর্থগ্রহণ করিতে পারিলাম না। হতাশ ভাবে পার্শ্বচারী এক বন্ধুর দিকে তাকাইলাম। ইনি বহুদিন প্রবাসে আছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, বুঝ্‌তে পারলেন না? নাউছাটিয়া মানে হচ্ছে নতুন লোক, যেমন আজ কালকার নতুন বৌ-ঝি, তাঁরা ত পুরান লোকের দরকার-অদরকার তেমন বোঝেন না। হাল ছাড়িলাম। বুঝিলাম আমার মত সীমাবদ্ধ বাঙলার জ্ঞান লইয়া জামাতা বাবাজীবনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। একটু পরে জামাতা বাবাজী শব-বাহকদের পথের নির্দেশ দিলেন, এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে ডানদিকে **মুড়ে** যাবেন এবং নিজের সন্ততিকে সতর্ক করিয়া দিলেন, **দুবুড়ি**, তুমি কাল্লু কাকার সঙ্গে থাক্‌বে। উচ্চারণটাও কানে বাজিল। কাল্লু কাকা! আমরা বাঙলায় বড় জোর কালু কাকা বলিতাম, হিন্দির অনুকরণে দিত্ব করিতাম না। অনেকক্ষণ আমার তূষ্ণীম্ভাব লক্ষ্য করিয়া জামাতা বাবাজী এইবার কথা কহিতে অগ্রসর হইলেন, সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ হ'ল। ছুটি পেলেই আমার বাসায় **আসা করবেন**। কৃতার্থ বোধ করিলাম। ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। শ্মশানে মৃতদেহ নামাইয়া দিয়া একজন বলিলেন, একেবারে **থকে গেছি** এবং ধপ্ করিয়া নদীতীরে বসিয়া পড়িলেন।
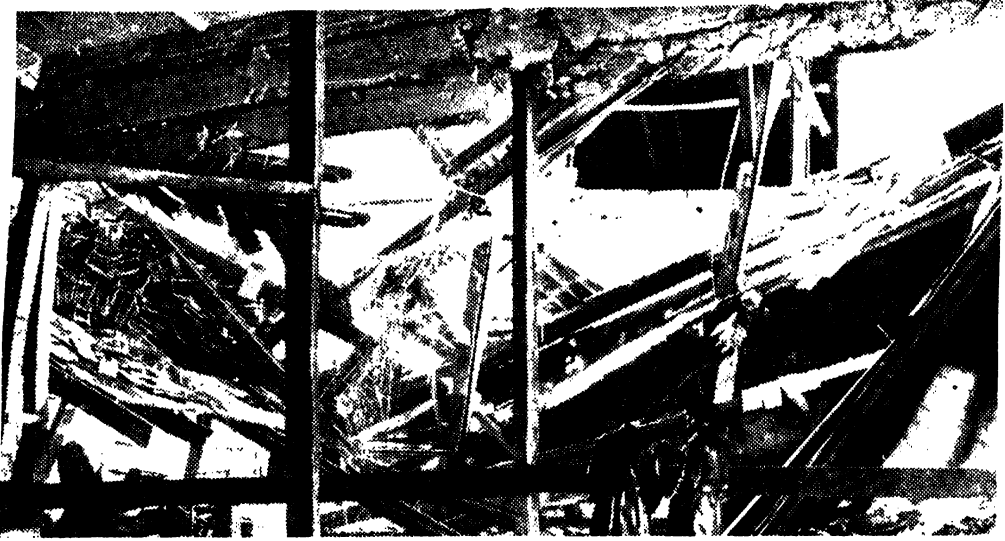
মিউনিকের পানশালা বিয়ারসেলারে হের হিটলারের বক্তৃতা দিয়া চলিয়া যাইবার মিনিট দশেক পর সেখানে বিস্ফোরণ হয়, ইহা তাহারই দৃশ্য। এই ঘটনায় বহুলোক হতাহত হয়। এই ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য প্রকাশের জন্য এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অনুসন্ধান দিবার জন্য পাঁচ লক্ষ মার্ক ঘোষণা করা হইয়াছে। জার্ম্মাণী মনে করে ইহা শত্রুপক্ষের কারসাজি। আবার ফ্রান্স মনে করে রাইখষ্ট্যাগে একবার যেমন অগ্নিকাণ্ড নাৎসিগণ নিজেরাই করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ এই বিস্ফোরণও কোনো মতলবে জার্ম্মাণী নিজেই করিয়াছে।

জার্ম্মানীর বৃহৎ কামানগুলিকে শত্রুর দৃষ্টি হইতে গোপন রাখিবার জন্য ডালপালা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। ম্যাজিনো লাইনের দেয়ালের দিকে লক্ষ্য করিয়া কামানের মুখগুলি বসানো হইয়াছে।

আজ-কাল

গান্ধীজীর আপোষ

বোম্বাইতে বড়লাটের নূতন ঘোষণার পর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'সাফ জবাব' সত্ত্বেও আমাদের মনে যে আশঙ্কা জেগেছিল, তা সত্যি হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল, এই ফাঁক পেয়ে কংগ্রেস আবার বুঝি স্বাধীনতার হুমকী ছেড়ে আপোষের পথ ধরল; বাস্তবিকই আপোষের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে।

২০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন'এ কথাটা খোলাখুলি বলেছেন। 'হরিজন'এর প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, ব্রিটেনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নষ্ট হয় নি, বড়লাটের শেষ বিবৃতিটা তাঁর পছন্দ হয়েছে, অবশ্য বড়লাটের বক্তৃতায় কিছু কিছু ফাঁক আছে; কিন্তু তাতে উভয় পক্ষের একটা সম্মানজনক মিটমাটের বীজ রয়েছে।

গান্ধীজী এই সঙ্গে আরও কতকগুলো স্পষ্ট কথা বলেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, তিনি সংগ্রামে ইচ্ছুক নন, আর চরকা খদ্দরে অবিশ্বাসীদের নিয়ে তিনি সংগ্রাম করতে রাজীও নন। সমাজতন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেছেন যে, স্বাধীনতা দিবসে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ-গৃহ ত্যাগ করা এবং শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করা তিনি শৃঙ্খলাহানি বলে মনে করেন। এবার আন্দোলন আরম্ভ হলে ভীষণ সাড়া পাওয়া যাবে, কারণ শ্রমিক ও কৃষকেরা ধর্ম্মঘট সুরু করবে, এই সম্ভাবনার কথা জেনে গান্ধীজী আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছেন।

আর এক প্রবন্ধে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সংগ্রামের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবসের কোনো সম্পর্ক নেই। বাঙলায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমন নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করার প্রস্তাবও গান্ধীজী অনুমোদন করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ভারতরক্ষা আইনের সাধারণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন

গান্ধীজীর উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার দিন চার পাঁচ আগেই খবর পাওয়া যায় যে, গান্ধী-লিনলিথগো আলোচনা শীঘ্রই আরম্ভ হবে এবং ইতিমধ্যেই বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজী পত্রালাপ করছেন। ২০শে তারিখে ওয়ার্দ্ধা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজীর অভিপ্রায় সমর্থনই করা হয়েছে; কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ছয় ঘণ্টা আলোচনা করার পর ওয়ার্কিং কমিটি কোনো প্রস্তাব গ্রহণ না করেই এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানের জন্যে গান্ধীজীর উচিত বড়লাটের বিবৃতি সম্পর্কে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা চালানো। এই সঙ্গে আবার শোনা যায় যে, মহাত্মা ও বড়লাটের মধ্যে ইতিমধ্যেই পত্রালাপ সুরু হয়ে গেছে।

বাঙলার ব্যাপার

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী ওয়ার্দ্ধায় গিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে বাঙলা কংগ্রেসের ব্যাপার সম্বন্ধে বাঙলা কংগ্রেস কমিটির বক্তব্য জানান। 'এড হক' কমিটির নিয়োগ পুনর্ব্বিবেচনার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে বি-পি-সি-সি যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, শরৎবাবু আড়াই ঘণ্টা ধরে তার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দেন। সব কথা শোনার পর ওয়ার্কিং কমিটি সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর এক বিবৃতি দেবার ভার দিয়ে দিয়েছেন। তবে শোনা যাচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্ত্তন করবেন না।

বাঙলার কংগ্রেস ফাণ্ড সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাহাতে তিনি বলেছেন যে, দুই কারণে ওয়ার্কিং কমিটি এই রকম উগ্র ব্যবস্থা দেন--(১) বি-পি-সি-সি থেকে ফরোয়ার্ড ব্লক কোনো অর্থ-সাহায্য পায় কিনা তার সন্ধান করা; (২) কংগ্রেস নেতৃদলের প্রতি বি-পি-সি-সি অন্ধভাবে অনুরক্ত নয় বলে তাকে জব্দ করবার একটা ছুতো বার করা। প্রথমটা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি সম্পূর্ণ ভুল খবর দ্বারা চালিত হয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যাপারটা শুধু বাঙলা নয়, যেখানেই বামপন্থীদের শক্তি দেখা যাচ্ছে সেখানেই চলছে। সুভাষচন্দ্র আরো বলেছেন যে, বিহারে বামপন্থীরা কয়েকবৎসর ধরে চেষ্টা করেও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস কর্ত্তাদের কাছ থেকে বার্ষিক হিসাব বার করতে পারছেন না। সুভাষচন্দ্র রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তাঁর নিজের দেশের গলদ দূর করতে এবং 'হিংসা তদন্ত কমিটি'র রিপোর্টটা প্রকাশ করতে বলেছেন।

মধ্যপ্রদেশের শ্রমিক

সম্প্রতি নাগপুরে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক সভা হয়। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকরা শতকরা ৩৫ টাকা যুদ্ধকালীন ভাতা চেয়েছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও মালিকরা সে সম্বন্ধে কিছু না করায় সভা মালিকদের এবং গবর্ণমেণ্টকে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেন যে, যদি মালিকরা এবং গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের দাবী পূরণ না করেন তা'হলে এক মাস পরে মধ্যপ্রদেশের শ্রমশিল্প মজুররা সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করবে। এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করবার জন্যে একটা কমিটি গঠিত হয়েছে।

সিন্ধুর অবস্থা

শক্কর দাঙ্গা সম্বন্ধে সরকারী বিবরণীতে জানা গেল, দাঙ্গার ফলে মোট ১৬১ জন হিন্দু নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়। ১৪ জন মুসলমান নিহত ও ১২ জন আহত হয়। ১৬৪টি বাড়ী ভস্মীভূত হয়; অধিকাংশ বাড়ীই হিন্দুর। ৪৬৭টি বাড়ী লুঠ হয়। এর ফলে মোট ৮০১০০০ টাকার ক্ষতি হয়।

মঞ্জিলগড় ভবন গবর্ণমেণ্টের দখলে রয়েছে এবং এখনো সেখানে সামরিক পাহারা মোতায়েন আছে। সিন্ধুর কংগ্রেস দাবী করেছে যে, মঞ্জিলগড় বাস্তবিক মসজিদ কিনা তা নির্দ্ধারণ করার জন্যে একটা নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল নিয়োগ করা হোক।

সিন্ধুর কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাতে চায়, প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের এই অভিযোগ সিন্ধুর কংগ্রেস নেতারা অস্বীকার করেছেন; তাঁরা বলেছেন যে, সিন্ধুতে কংগ্রেস কখনো মুসলিম লীগের মন্ত্রি-সভা হতে দেবেন না।

ইউরোপের আবর্ত্ত

পশ্চিমের যুদ্ধ

এই সপ্তাহে ইউরোপে বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নি। জার্ম্মানীর সৈন্য সমাবেশে হল্যাণ্ডে ও বেলজিয়ামে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল তার উপশম হয়েছে। দুই সপ্তাহে জার্ম্মান মাইন ও টর্পেডোর আঘাতে অনেকগুলো জাহাজডুবি হয়েছে। তিনটে ব্রিটিশ সাবমেরিন হেলিগোল্যাণ্ডের কাছে ঘায়েল হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব্বের অবস্থা

ফিনল্যাণ্ডের খবর মন্দা; তবুও হেলসিঙ্কি থেকে জয়-সংবাদ কিছু কিছু আসে। সোভিয়েট ঘাঁটি ক্রোনষ্টাড ও বল্টিস্কিতে ফিনিশ বিমানপোতের বোমা বর্ষণের সংবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু এস্তোনিয়া কর্ত্তৃপক্ষ শেষের সংবাদটা অস্বীকার করেছেন। সোভিয়েট বিমান নরওয়ে ও সুইডেনের সীমান্ত লঙ্ঘন করায় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চার্চ্চিলের বক্তৃতা

বৃটিশ নৌ-সচিব মিঃ চার্চ্চিল এক বেতার-বক্তৃতায় নিরপেক্ষ দেশগুলোকে মিত্রশক্তির অভিভাবকত্বে সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। এতে নিরপেক্ষ দেশে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, কারণ মিঃ চার্চ্চিলের পরামর্শ নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিকূল বলে তারা মনে করছে। ইটালীয় রাজনীতিক মহল কড়া মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বৃটেন ও ফ্রান্স সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধ বিস্তার করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, এই অভিযোগ মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় প্রমাণিত হয়।

হোর বেলিশা

বৃটিশ সমর-সচিব মিঃ হোর বেলিশার পদত্যাগ সম্পর্কে মিঃ চেম্বারলেন এবং স্বয়ং মিঃ হোর বেলিশা কমন্স সভায় সুদীর্ঘ দুটি বিবৃতি দেন। কিন্তু এই বিবৃতি পাঠের পরেও বোঝা গেল না, কি জন্যে মিঃ হোর বেলিশা পদত্যাগ করেছেন।

হিন্দু সমাজের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

(৪৪২ পৃষ্ঠার পর)

লাগিল। বলা বাহুল্য, এই প্রাকৃতিক নিয়মে অনার্য শূদ্রেরাও বাদ গেল না—যাহাদের যুবক যুবতীদের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈবাহিক মিলন ঘটিতে লাগিল। ফলে, এই যে সব সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইল, তাহাদিগকে সমাজের কোথায় স্থান দেওয়া হইবে, ইহা এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এই সমস্যার বিপুলতা ও জটিলতার প্রমাণ 'মনুসংহিতা' পড়িলেই পাওয়া যায়। 'গীতায়' অর্জ্জুনও বলিয়াছেন, 'সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নাণাং কুলস্যচ'। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "বর্ণসঙ্কর"দের কিছুতেই অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা গেল না সমাজে তাহাদিগকে স্থান দিতেই হইল; চারি বর্ণ বা চারি জাতি ভাঙ্গিয়া বহু বর্ণ বহু জাতিতে পরিণত হইল। জাতিভেদ বেশ জাঁকালো রকমে বহু বিচিত্র মূর্ত্তিতে হিন্দুসমাজে তাহার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিল।

(ক্রমশ)

রঙমহলে "বিশ বছর আগে"

রঙমহলে শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাটক 'বিশ বছর আগে' দেখিয়া আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, বিষয়বস্তুর সহিত ভাবের গভীরতা না থাকিলেও কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক রোমাঞ্চকর ঘটনার সন্নিবেশে ও স্নিগ্ধমধুর সাহিত্যরসপূর্ণ সংলাপের গুণে অনেক নাটকই যে অতি অনায়াসে দর্শকদের হাসি-কান্নায় আনন্দ উল্লাসে ভুলাইয়া রাখিতে পারে 'বিশ বছর আগে' তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নাটকটির বিষয়বস্তুর মধ্যে নাট্যকার অভিনবত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং টেকনিকেও বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। তবে 'মাটির ঘরে' নাট্যকারের যে দুর্লভ সংযমগুণ সত্যকার রসস্রষ্টার যে দুরূহ নিরপেক্ষতা এবং সাধনালব্ধ সুদূর নিরাশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম, 'বিশ বছর আগে' তাহার অভাব স্থানে স্থানে দেখিয়াছি; হয়ত নাট্যকার entertainment-এর দিকে বেশী ঝোঁক দিতে গিয়া রসসৃষ্টির দিকে কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

নাটকের দৃশ্যমান উজ্জ্বল চিত্রটি হইতেছে এই যে, অভিনেতা দীপক তাহার বন্ধু জমিদার তনয় প্রদীপকে খুনের অপরাধে বিশ বছর আন্দামান জীবনযাপন করিয়া ফিরিয়া আসিল জমিদারের জীর্ণ ভগ্নপ্রায় বাগানবাড়ীতে। দীপক জানিত সে তাহার বন্ধুকে হত্যা করে নাই। কিন্তু কে হত্যা করিয়াছে সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই সে কারাদণ্ড ভোগের পরও ফিরিয়া আসিয়াছে। এই ঘটনা দিয়া নাটকের আরম্ভ। তাহার পরই সুরু হইল বিশ বছর আগের ঘটনা এবং কৌতূহলপূর্ণ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া নাটকীয় পরিসমাপ্তির মধ্যেই নাট্যকার আমাদের সেই হত্যা রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন। অদ্ভুত নাটকীয় সংঘাতে কয়েকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে অনাবিল অফুরন্ত হাস্য ও অন্তর্মুখী বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা দর্শকদের উপভোগ্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অভিনেতা অভিনেতৃদের আমরা দেখি রঙ্গমঞ্চে, কেহ রাজার বেশে—কেহ সেনাপতির ভূমিকায়। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে তাহাদেরও সুখ দুঃখ আশা আনন্দের জীবন রহিয়াছে—যে জীবনের সহিত আমাদের কোন পরিচয়ই নাই নাট্যকার তাহার নিপুণ লেখনীতে তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে অভিনেতা দীপক। মাতৃপরিত্যক্ত মাতাল, সহায়-সম্বলহীন এই মানুষটির বেদনা-দগ্ধ জীবনের প্রতি সহানুভূতি জাগে। এই চরিত্রটি যেমন কঠিন, তেমনই জটিল। দুর্গাদাসকে এই ভূমিকায় পাইলে দীপক চরিত্রটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হইত সন্দেহ নাই; তবে প্রভাত সিংহ আমাদের নিরাশ করেন নাই। এই নাটকের শ্রেষ্ঠাভিনয়ের সম্মান মনোরঞ্জনবাবুর প্রাপ্য। অভিজ্ঞ জমিদার-ম্যানেজার দুঃখ দহনের চরিত্রটি যদিও প্রাধান্য লাভ করিবার কথা নহে, তথাপি মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয়গুণে এই চরিত্রটি আমাদের স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। বনেদী জমিদারের চরিত্রহীন বখাটে পুত্রের চরিত্রটি যেমন হওয়া উচিত ভূমেন রায় কৃতিত্বের সহিত তাহা দেখাইয়াছেন—ইহার চেয়ে ভালো অভিনয় করার সুযোগ তাহার নাই। নায়িকারূপে শান্তি গুপ্তার সংযত অভিনয় ভালই লাগিয়াছে; তবে আড়ষ্টতা কাটাইয়া উঠিলে আরোও উপভোগ্য হইত।

বোম্বে টকিজের 'কঙ্কন' চিত্রে লীলা চিৎনিস্

অভিনেত্রী তন্বী চরিত্রটি নাট্যকারের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং উষা দেবী এই স্নিগ্ধ করুণ চরিত্রটিকে মহিমান্বিত করিয়াছেন তাঁহার অল্প কথার সংযত অভিনয়ে। মণীষার ভূমিকায় পদ্মা একদিকে ভগ্নীর প্রতি স্নেহ, মমতা অপর দিকে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কঠোরতা এই দুই দিকই কৃতিত্বের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাবেকী আমলের বৃদ্ধ জমিদার যদুপতি চরিত্রটি আমাদের আনন্দ দিয়াছে। শেষের দিকে অভিনয় সূত্রটি ঢিলা হইয়া পড়িবার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করিয়াছে যদুপতি ও তাহার ভৃত্য। নাটকের গানগুলির্তে সুর দিয়াছেন সুরশিল্পী অনিল বাক্‌চী। সুরের বৈচিত্র্যে গানগুলি উপভোগ্য হইয়াছে। মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্য পরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘ

গত ২২শে জানুয়ারী, সোমবার বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সংঘের বাৎসরিক সাধারণ সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ। সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবকী বসু সংঘের বাৎসরিক বিবরণীতে সংঘের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আগামী ইষ্টারের ছুটিতে কলিকাতায় ভারতীয় চলচ্চিত্র কংগ্রেসের অধিবেশনে সকলকে ঐকান্তিকভাবে সহযোগিতার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু চলচ্চিত্র কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

১৯৪০ সালের জন্য সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি—শ্রীঅনাদিনাথ বসু; সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র; যুগ্ম-সম্পাদক—মিঃ কে এল চ্যাটার্জ্জি, মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তী; কোষাধ্যক্ষ—মিঃ বি এন সরকার; ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ—মিঃ পি এন গাঙ্গুলী, মিঃ এম জে কাবরা, মিঃ এস আর হেমাড্, মিঃ মনোরঞ্জন ঘোষ, মিঃ এইচ ব্যানার্জ্জি, মিঃ কে সি ঘোষ, মিঃ নিতীন বসু, মিঃ মধু শীল, মিঃ জি সি সাহা, মিঃ পাহাড়ী সান্যাল, মিঃ অহীন্দ্র চৌধুরী, মিঃ এস সান্যাল, ডাঃ বি এন দে।

"পরাজয়" চিত্রে অনীতার ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালা

সিনেমা-সাংবাদিক সঙ্ঘের জন্য একটি আসন খালি রাখা হইয়াছে। কারণ, সাংবাদিক সঙ্ঘের নিকট হইতে তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধির নাম এখনও আসে নাই। সভার কার্য্যাবলী শেষ হইলে পর অতিথিবৃন্দকে চা-পান ও সঙ্গীতাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

নিউ থিয়েটার্সের "পরাজয়"

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দুস্থানী চিত্র—'জোয়ানী-কী-রীৎ' সম্প্রতি ভারতের সর্ব্বত্রই বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে। নিউ থিয়েটার্সের 'পরাজয়' তাহারই বাঙলা সংস্করণ।

যে সব শিল্পীদের প্রতিভার সমন্বয়ে এই চিত্রখানি গঠিত—তাহাদের অভিনয় ও গীতি-নৈপুণ্যের খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। পরিচালক হেমচন্দ্র ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। সভ্য মানবের তথাকথিত অগ্রগতির সহিত সমাজের শান্তি ও কল্যাণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্যে সেই নূতন দিকের ইঙ্গিত এই চিত্রে আত্মগোপন করিয়া আছে। বিলাসের প্রাচুর্য্য এবং অভাবের রিক্ততা—উভয়ের সংঘাতে, জীবনের নানা রঙ-এ চিত্রিত এই হাসি ও অশ্রুর কাহিনী তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া পর্দ্দার বুকে আত্মপ্রকাশ করিবে। এই চিত্রে প্রধান দুইটি চরিত্রে রহিয়াছেন খ্যাতনামা চিত্রাভিনেত্রী কাননবালা ও সুদর্শন ও সুকণ্ঠ অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবিখ্যাত শিল্পী অমর মল্লিক ও শৈলেন চৌধুরী দুইটি টাইপ চরিত্রে অবতরণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ইন্দু মুখার্জ্জি, জীবেন বসু, জ্যোতি, রাজলক্ষ্মী, বিনয় গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীদের দেখা যাইবে।

রণজি ক্রিকেটের পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলা পুণায় গত ২৩শে জানুয়ারী শেষ হইয়াছে। এই খেলার ফলাফল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এক নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে। এই একটি খেলায় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তিনটি নূতন রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছে। নিজস্ব রাণসংখ্যা, মোট রাণসংখ্যা ও নবম উইকেটের জুটির রাণসংখ্যার রেকর্ড ভঙ্গ হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দলের তরুণ উদীয়মান ক্রিকেট খেলোয়াড় ভি এস হাজারী ৩১৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকিয়া নিজস্ব রাণসংখ্যার নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৭ সালে সৈয়দ উজীর আলী রণজি ক্রিকেট খেলায় একা ২২২ রাণ করিয়া নিজস্ব রাণ-সংখ্যার রেকর্ড করেন। হাজারী সেই রেকর্ড ৯৪ রাণে ভঙ্গ করিয়াছেন। এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উজীর আলী যে রেকর্ড করেন তাহাও পুণার জিমখানার মাঠে, হাজারী যে মাঠে খেলিয়াছেন, সেই মাঠ ১৯৩৭ সালে স্থাপিত হইয়াছিল। এই বৎসর রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্র দল, পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৫৪০ রাণ করিয়া মোট রাণসংখ্যার রেকর্ড করেন। মহারাষ্ট্র পুনরায় পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় ৯ উইকেটে ৬৫০ রাণ করায় পূর্ব্বের সেই রেকর্ড ১১০ রাণে ভঙ্গ হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দলের হাজারী ও এন নাগরওয়ালা নবম উইকেটের খেলায় একত্রে ২৪৫ রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোন খেলায় নবম উইকেটের খেলায় এত অধিক রাণ হয় নাই। মহারাষ্ট্র দলের এই কৃতিত্ব রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

হাজারীর কৃতিত্ব

হাজারী মহারাষ্ট্র দলের পক্ষে খেলিয়া ৩৮৭ মিনিটে ৩১৬ রাণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত রাণসংখ্যার মধ্যে ৩৭টি বাউণ্ডারী করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ সময়ের খেলার মধ্যে কোন সময়েই মারের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। অধিকাংশ রাণই তিনি পায়ের দিকে বল ঘুরাইয়া করিয়াছেন। তাঁহার খেলায় অপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও তৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হাজারীর ব্যাটিংয়ের অসাধারণ কৃতিত্ব ভারতীয় ক্রিকেটে হাজারী সুনাম বৃদ্ধি করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাজারীর ক্রিকেট খেলার শিক্ষাদাতা মেজর সি কে নাইডুর গৌরব বৃদ্ধি পাইল। হাজারী অদূর ভবিষ্যতে ব্যাটিংয়ে অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া "ভারতের ব্রাডম্যান" নামে অভিহিত হউন ইহাই আমরা কামনা করি।

এম এম নাইডুর কৃতিত্ব

বরোদা রাজ্য দল পরাজিত হইলেও তরুণ খেলোয়াড় এম এম নাইডু তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১২০ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। তিনি ৫০ মিনিটে ৫০ রাণ, ১২৫ মিনিটে ১০০ রাণ ও ১৬৪ মিনিটে ১২০ রাণ করিয়া আউট হন। দলের সুনিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও এম এম নাইডু দৃঢ়তার ও স্বচ্ছন্দতার সহিত খেলিয়া প্রকৃত খেলোয়াড় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পরেই বরোদা রাজ্য দলের আরও দুইটি তরুণ খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একজন হইতেছে এইচ আর অধিকারী ও অপর জন আর বি নিম্বলকার। এই বৎসরের অন্তঃ-বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় ব্যাটিংয়ে ইহারা দুইজনেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় তাহাদের পূর্ব্ব অর্জ্জিত গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আর বি নিম্বলকার বরোদা রাজ্য দলের প্রথম ইনিংসে ৬৩ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৮ রাণ করেন। উভয় ইনিংসের খেলায় দ্রুত রাণ তুলিয়া দর্শকগণকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন। এইচ অধিকারী প্রথম ইনিংসে ৬৮ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। উভয় ইনিংসের খেলায় দৃঢ়তার ও একাগ্রতার পরিচয় তিনি দিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে ইঁহারা ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের অভাব পূরণ করিতে পারিবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

রঙ্গনেকার ও এন নাগরওয়ালা

মহারাষ্ট্র দলের কে এম রঙ্গনেকার ও এন পি নাগরওয়ালা ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কে এম রঙ্গনেকার ৫১ রাণ ও নাগরওয়ালা ৯৮ রাণ করেন। ভবিষ্যতে ইহারা ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের মধ্যে স্থান পাইবেন তাহারই নিদর্শন তাঁহারা দিয়াছেন।

সি এস নাইডুর নৈরাশ্যজনক খেলা

সি এস নাইডু পশ্চিমাঞ্চলের সেমি ফাইনাল খেলায় ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহাতে সকলে আশা করিয়াছিলেন, পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় সি, এস, নাইডু পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু সকলকে হতাস হইতে হইয়াছে। কি ব্যাটিং, কি বোলিং কোন বিষয়েই তিনি আশানুরূপ খেলিতে পারেন নাই। বরোদা রাজ্য দলের অধিনায়ক ডবলিউ ঘোরপদেও সেইরূপ আশা মনে পোষণ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য মহারাষ্ট্র দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬৬ ওভার বল করিতে দেন। ফলে হয় সি এস নাইডু ২৬১ রাণ দিয়া মাত্র ৪টি উইকেট দখল করেন। ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে ২৮ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬ রাণ করিয়া সি এস নাইডু আউট হন। খেলার সাফল্য বা অসাফল্য অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সি এস নাইডুর এই অসাফল্য নৈরাশ্যজনক হইলেও আশ্চর্য্যের কিছুই নহে।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বরোদা রাজ্য দল প্রথমে ব্যাট করেন। প্রথম দিনের শেষে বরোদা দলের প্রথম ইনিংস ৩০৩ রাণে শেষ হয়। তখনও খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৪৫ মিনিট বাকী থাকায় মহারাষ্ট্র দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। দিনের শেষে কেহ আউট না হইয়া ১৯ রাণ হয়। দ্বিতীয় দিনে সমস্ত দিন মহারাষ্ট্র দল খেলেন ও আট উইকেটে ৫১০ রাণ করিতে সমর্থ হন। হাজারী ১৬৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র দল মধ্যাহ্ন ভোজ পর্য্যন্ত খেলে ও নয় উইকেটে ৬৫০ রাণ করিতে সমর্থ হয়। ভি হাজারী ৩১৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পরে বরোদা রাজ্য দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮৩ রাণ করিতে সমর্থ হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

বরোদা রাজ্য দল—প্রথম ইনিংস ৩০৩ রাণ

(এম জাগদেল ৩৮, এইচ অধিকারী ৬৮, সি এস নাইডু ২৮, আর নিম্বলকার ৬৩, ডবলিউ ঘোরপদে ৩৫; হাজারী ৪৮ রাণে ২টি, পট্টবর্দ্ধন ১০৩ রাণে ৬টি, সোহনী ৭৬ রাণে ১টি, জাঠের রাজা ৩৬ রাণে ১টি উইকেট পান।)

মহারাষ্ট্র দল—প্রথম ইনিংস (৯ উইকেটে) ৬৫০ রাণ

(কে ভাণ্ডারকার ৭৭, ভি এস হাজারী নট আউট ৩১৬, কে রঙ্গনেকার ৫১, এন নাগরওয়ালা ৯৮; খাণ্ডেরাও ১৩২ রাণে ২টি, সি এস নাইডু ২৬১ রাণে ৪টি, জাগদেল ৮০ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন।)

বরোদা রাজ্য দল—দ্বিতীয় ইনিংস (৫ উইকেটে) ২৮৩ রাণ

(এম এম নাইডু ১২০, আর নিম্বলকার ৭৮, অধিকারী নট আউট ২৩, বি নিম্বলকার ২২ নট আউট।)

পুস্তক-পরিচয়

সাহসীর জয়যাত্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। দাম এক টাকা। এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২নং নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা।

যোগেশবাবুর 'সাহসীর জয়যাত্রার' দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। প্রথম সংস্করণ হয় গত বৎসরে, এক বৎসরের মধ্যেই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাঙলা ভাষায় লিখিত কোন পুস্তকের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়। ইহাতেই বুঝা যায় বইখানা কতটা লোকপ্রিয় হইয়াছে। ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেন, লেনিন, মাসারিক, কামাল পাশা, মুসোলিনী, হিটলার, ডি ভ্যালেরা, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র—জগতের এই কয়েকজন কর্ম্মবীরের জীবনী লইয়া ছেলেমেয়েদের জন্য এই বইখানা লিখিত; এমন বই পড়িলে ছেলেমেয়েরা মহৎ কর্ম্মের অনুপ্রেরণায় নিজেদের জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবে, সাহসীর জয়যাত্রার লোকপ্রিয়তা এবং বহুল প্রচারের মধ্যে ইহাই হইল আশার কথা।

সমাজের বিকাশ:—কামাখ্যাপ্রসাদ ভৌমিক—মূল্য তিন আনা। শ্যামলাল বুক এজেন্সি, ৭২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাম্যবাদের দর্শন, নীতি এবং তাহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ধারণা দিবার উদ্দেশ্যে কমরেড রেবতী বর্ম্মণের সম্পাদনায় ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান পুস্তিকাখানা সেই সিরিজের প্রথম খণ্ড। কমরেড রেবতী বর্ম্মণ বাঙলাদেশে সুপরিচিত। তাঁহার ইংরেজী পুস্তিকাখানার অনুবাদ করিয়াছেন ভৌমিক মহাশয়। অনুবাদ সহজ এবং প্রাঞ্জল। সাম্যবাদের দর্শনের অনেক দুরূহ কথা সরল করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

'নূতন দীঘির জমিদারবধূ:—শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানি 'অবিশ্বাসী' এই নামে 'দেশ' পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হয়, তখনই এখানার উপর সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙলাদেশের আধুনিক কথা সাহিত্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, রামপদবাবু তাঁহাদের অন্যতম। রামপদবাবুর লেখার একটা বিশিষ্টতা আছে। তাহা এই যে, রামপদবাবুর লেখার মধ্যে রস আছে, সে রস চটুল নয়, তাহা বিগাঢ়। সে রস সাময়িক ভাবপ্রবণতা, স্থূল আসঙ্গ বা আসক্তির মধ্যে চিত্তকে নিবদ্ধ রাখে না, সে রস ব্যক্তির একান্ত অনুভূতির মধ্যে চিত্তকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করে। কামনার স্তর অতিক্রম করিয়া ত্যাগপারনিষ্ঠিত প্রেমের রাজ্যে মানুষের মন ও বুদ্ধিকে উন্নীত করে। রামপদবাবুর লেখা পড়িয়া বোধ হয়, বাস্তবকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহার বাস্তব স্থূলে ভোগাসক্তি মাত্র নয়, যে রসে সত্যকার সবল জীবন অসংমূঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত সে রসকে আয়ত্ত করিবার ভিতরে সে বাস্তব বিধৃত। রতন দীঘির জমিদারবধূর ভিতরে রামপদবাবুর এই অনুভূতি রূপ পাইয়াছে।

আত্মনিবেদনই রসের পরম পরিণতি; কিন্তু আরম্ভ কোথা হইতে? যে রস, সত্যকার রস, যে রস এই পরম পরিণতির স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তাহার আরম্ভ হয় স্নেহ হইতে। মমতার যে স্পর্শ চিত্ত লাভ করে, মনের অবচেতন স্তরে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়া—তাহাই তাহাকে গোটা মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। রামপদবাবুর আলোচ্য এই গ্রন্থখানিতে আমরা এমন কয়েকজন গোটা মানুষ এবং নারীর পরিচয় পাই। আলোচ্য গ্রন্থের মহামায়া, রেণু, অনীতা এবং মাণিক, আলোকনাথের ভিতর দিয়া রামপদবাবু মানবের গূঢ় মনোধর্ম্মের আলোক সম্পাত করিয়াছেন। মানবের অন্তরের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জীবন-রসের উৎস কোথায় তাহা দেখাইয়াছেন। আলোকনাথের মুখে তিনি বলিয়াছেন—"আমার মতটা কিছু অদ্ভুত শোনাবে। হয়ত তোমার রুচিকর হবে না। যদিও আমি তরুণ, সাহিত্যে সর্ব্ব বাধা মুক্তির প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়া থাকি, তথাপি এই পচা পুরান জিনিষগুলির উপর আমার মমতার অন্ত নেই। পুরান মাত্রই ভাল, এ বিশ্বাস আমার না থাকলেও পুরান মাত্রই যে পরিত্যাজ্য একথা আমি মানি না। কাল ধর্ম্ম, পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তার বিরুদ্ধে কুতর্ক করা মূর্খতা। তবু দুর্ব্বল বাঁধনগুলার উপর চোখ না রাঙিয়ে মমতাময় স্পর্শে যদি এর জটিল গ্রন্থিগুলো আমরা খুলতে চেষ্টা করি তা অনেক অনাবশ্যক অশান্তি থেকে দূরে থাকতে পারি।" দেশের লোককে কুসংস্কারগ্রস্ত বলিয়া ঘৃণা নয়, প্রেমের স্পর্শ দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়াই আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে। রামপদবাবু এই ত্যাগময় বলিষ্ঠ জীবনের উপরই জোর দিয়াছেন। স্বদেশ প্রেমের একটা প্রচণ্ডদীপ্তি এবং দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্তদের প্রতি প্রবল প্রীতির দীপ্তি তাঁহার লেখার মধ্যে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাঁহার আদর্শ শুধু অনুমানের মধ্যে তিনি রাখেন নাই, অনুষ্ঠানের উগ্রতায় তিনি তাহাকে আকার দান করিয়াছেন। "নূতন দীঘির জমিদারবধূ" বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য-সংবাদ

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

শান্তিপুরস্থিত বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের বার্ষিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (১) শিক্ষায় প্রাচীন ভারত ও তাহার আদর্শ এবং বর্ত্তমান শিক্ষা ও আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা, (২) স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের ভারতীয় পদ্ধতি, (৩) সেবায় মানব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিকাশ, এই তিনটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য সাধারণে ঘোষণা করা হইয়াছে। যে কোন স্থানের নরনারী, বাঙলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী ও অসমীয়া এই কয়টি ভাষার যে কোন ভাষায় ও তিনটি প্রবন্ধের যে কোন একটি বা ততোধিক প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন। আগামী ১৫ই মাঘ ১৩৪৬ (ইং ২৯শে জানুয়ারী ১৯৪০) তারিখের মধ্যে পরিষদের সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা বিস্তারিত বিবরণ জানিয়া, আবেদনপত্র পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ ৩০শে চৈত্র (ইং ১২ই এপ্রিল) তারিখের মধ্যে পরিষদের পরীক্ষক সঙ্ঘের নিকট পেশ করিবার জন্য পরিষদ সম্পাদকের নিকট অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিতায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকগণকে আটখানি রৌপ্য পদক ও প্রশংসা-পত্র দেওয়া হইবে। স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণকে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনে পরিষদের সহিত সহযোগিতা করিতে একান্তভাবে আহ্বান করা যাইতেছে।

বারাসত ছাত্র ইউনিয়ন
রচনা প্রতিযোগিতা

রচনা বিষয়ঃ—ভারতের উন্নতিসাধনে ছাত্রের কর্ত্তব্য

নিয়মাবলী—বারাসত মহকুমার যে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারে। কোন প্রবেশমূল্য নাই। সুযোগ্য বিচারকমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত যে প্রবন্ধ দুইটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে তাহার প্রণেতাদ্বয়কে দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রত্যেক প্রবন্ধে ১০০০-এর অধিক শব্দ ব্যবহার করা চলিবে না। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারী।

প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানাঃ—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, বারাসত ছাত্র ইউনিয়ন, ২৪ পরগণা।

প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১২ ও ১৯শে আগষ্ট, ৩৯।৪০শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় আমাদের 'প্রভাত' পত্রিকার মারফৎ যে প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) প্রবন্ধে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন,—কুমারী সবিতা হাজরা, মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুল, নিউ দিল্লী।

(২) গল্পে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন,—শ্রীশান্তি সেন, ঢাকা সেণ্টগ্রেগরী স্কুল।

৩০শে জানুয়ারীর (৪০) মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে পুরস্কার লইয়া যাইতে পারা যাইবে। নচেৎ ঐ তারিখের পর পুরস্কারের পদকগুলি পুরস্কার প্রাপ্তগণের নিকট পাঠান হইবে। ইতিমধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে অতি সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ঠিকানাঃ—শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য, (সম্পাদক, 'প্রভাত'), C/o শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, লালাবাবুর সায়ার রোড, পোঃ বেলুড়মঠ, বেলুড়, (হাওড়া)।

সমর-বার্ত্তা

১৭ই জানুয়ারী—

প্রবল শীতের দরুণ ইউরোপের সমস্ত রণাঙ্গনেই যুদ্ধ এক প্রকার বন্ধ থাকে। পশ্চিম রণাঙ্গনে উভয়পক্ষের স্থল ও বিমান-বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা স্থগিত ছিল। ফিনল্যাণ্ডের বিভিন্ন রণাঙ্গনে সংগ্রাম চলে। ফিনদের ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, ফিনরা স্যালণ্টে দুইদল রাশিয়ান সৈন্যকে ধ্বংস করিয়াছে এবং লাডোগা হ্রদের উত্তর দিকবর্ত্তী কিটেলা নামক স্থানের নিকট বিরাট সাফল্যলাভ করিয়াছে। সাল্লার নিকট ফিনরা সোভিয়েটবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে এবং পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। ফিনিস-বাহিনী কুরসু শহর পুনরায় দখল করিয়াছে। সম্প্রতি প্রত্যহ তিন চারিশত সোভিয়েট বোমারু-বিমান ফিনল্যাণ্ডের উপর হানা দিতেছে।

বাল্টিক সাগরে জার্ম্মানরা সুইডিস জাহাজ 'রিগার জারফকে' আটক করিয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে শত্রু-পক্ষ মোট ১২টি বৃটিশ জাহাজ এবং ৪টি নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ জলমগ্ন করিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বৃটেন ৩৩৬৪ টন বে-আইনী পণ্য আটক করিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর এ পর্য্যন্ত মোট ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টন বে-আইনী পণ্য আটক করা হইয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী—

উত্তর সাগরে মাইনের আঘাতে "জোসিফিন কার্লোট (৩০০০ টন) নামক বেলজিয়ান জাহাজ ও 'ক্যাইরনরস' (৫৪১৪ টন) নামক বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হয়।

টর্পেডোর আক্রমণে "ফেগারসিয়েন" ও "এলির্ডে" নামক দুইটি নরওয়ে জাহাজ জলমগ্ন হয়। জার্ম্মান ষ্টীমার 'অগষ্ট থাইলিন' (২৩৪২ টন) বোথনিয়া উপসাগরে একটি সুইডিস মাইনের আঘাতে ঘায়েল হয়।

জার্ম্মান সীপ্লেন ঘাঁটি সিল্টের দক্ষিণ অংশ হইতে বিমান-ধ্বংসী কামানের জোর আওয়াজ শোনা যায়। হেলিগোল্যাণ্ড অঞ্চলে সংগ্রামরত যুদ্ধ জাহাজ হইতেই সম্ভবত এই গোলাবর্ষণ হয়।

১৯শে জানুয়ারী—

একটি ফিনিশ ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ক্যারেলিয়ান যোজকে রাশিয়ানরা এখনও শীত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করিয়া তাহার ভিতর আশ্রয় লইতেছে। ল্যাডোগা হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে ফিনগণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে এবং পাঁচখানি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। মার্ভিজার্ভিতে সমস্ত দিন তুমুল সংগ্রাম চলে। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্ত্তী দুর্গশ্রেণীর উপর সোভিয়েট বিমান হইতে প্রবলভাবে আক্রমণ চালান হয়। আবো দ্বীপের উপর ও উহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের উপরও বিমান হইতে বোমা বর্ষিত হয়। ক্যারে-লিয়ান যোজকেই আড়াই শত সোভিয়েট বিমান একে একে গণনা করা হয়। আর সমগ্র ফিনল্যাণ্ড অভিযানে সাড়ে চারিশত সোভি-য়েট বিমানের সমাবেশ করা হইয়াছে।

২০শে জানুয়ারী—

জার্ম্মানীর এক ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, মোজেল ও পালাতিনেৎফোরের মধ্যে জার্ম্মান রক্ষীবাহিনীর লোকজন ফরাসী রক্ষীবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে কয়েকজনকে বন্দী করিয়াছে। ফরাসী সীমান্তের একটি অঞ্চলে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইবার সময় জার্ম্মান বিমানবহরের একটি বিমান বিধ্বংস হইয়াছে।

ডেনিশ জাহাজ কানাডিয়ান রিফার (১৮৩১ টন) ফিনিষ্টের অন্তরীপের অদূরে জলমগ্ন হইয়াছে। সুইডিস জাহাজ পাজালা (৬৮৭৩ টন) টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

মস্কোর একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, পেট্রো-জাভোওস্ক অঞ্চলে রুশ সৈন্যেরা একটি ফিনিস ব্যাটেলিয়ান সৈন্যকে ধ্বংস করিয়াছে।

ফিনরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা যুদ্ধের সাত সপ্তাহে ২০৫টি সোভিয়েট বিমান ভূপাতিত করিয়াছে। প্রকাশ, ফিনিশ রক্ষীগণ সাল্লা রণাঙ্গনে একটি সোভিয়েট ডিভিশনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মার্ভিজার্ভির চতুর্দ্দিকে তুমুল সংগ্রাম চলি-তেছে; সেখানে রাশিয়ানদের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

ফিনিশ ইস্তাহারে সুইডিস স্বেচ্ছাসেবকদের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সুইডিস বৈমানিকগণ ক্যাম্পে এবং চলমান রুশ সৈন্যের উপর সাফল্যের সহিত বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

২১শে জানুয়ারী—

বৃটিশ নৌ-বহরে ডেষ্ট্রয়ার 'গ্রেনভিল' (ক্যাপ্টেন জি ই ক্রেসী) উত্তর সাগরে মাইন অথবা টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে। ডেষ্ট্রয়ারের ৮ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং নিরুদ্দিষ্ট ৭৩ জনের প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

২২শে জানুয়ারী—

উত্তর সাগরে টহলদারী বৃটিশ বিমানের উপর ৪খানি জার্ম্মান রণতরী গোলাবর্ষণ করে। বৃটিশ বিমান হইতে পাল্টা বোমাবর্ষণ করা হয়।

বৃটেনের পশ্চিম উপকূলে 'প্রোটেসিলাউস' (৯০০০ টন) নামক এবং উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে 'ফেরিহিল' (১০০০ টন) নামক দুইটি বৃটিশ জাহাজ মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরে বৃটিশ রণতরী 'আসামা মারু' নামক এক জাপানী জাহাজকে আটক করিয়াছে। প্রকাশ যে, যুদ্ধে যোগ-দানের উপযুক্ত বয়সের কয়েকজন জার্ম্মানকে এই জাহাজে জার্ম্মানীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই সকল জার্ম্মানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফ্রান্সের উপকূলে তুলঁর নিকট সমুদ্রে ইটালীয় জাহাজ "ওরাজিও"তে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। জাহাজটিতে ৬০০ যাত্রী ছিল। ৫৩৯ জন যাত্রীকে সমুদ্রবক্ষ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৬৮ জন নাবিক সহ ১০৭ জনের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চুংকিং-এর সংবাদে প্রকাশ যে, ইয়াংসি নদীতে একটি ষ্টীমার ও অপর একটি জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ায় ২৫০ জনের প্রাণহানি হইয়াছে।

পাঁচ হাজার ইটালীয় স্বেচ্ছাসৈন্য হেলসিঙ্কি যাত্রা করিয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী—

দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে জেনারেল হার্টজগ "জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধকালীন অবস্থার অবসান করিয়া পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে" বলিয়া এক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মাটস এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, পার্লামেণ্ট জার্ম্মানীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত এক্ষণেও অনুমোদন করিতেছেন এবং তাহাই মানিয়া চলিবেন।

গতকল্য সিনর মুসোলিনীর সভাপতিত্ব ইটালীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইটালীর সমরায়োজনকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

হল্যাণ্ডে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অদ্য হল্যাণ্ডের উপর যে বিদেশী বিমানটি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা একটি জার্ম্মান বিমান।

ফিনিশ সংগ্রামে জার্ম্মানীর সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে সোভি-য়েট অধিকৃত পোল্যাণ্ডের প্যালেসিয়ার তৈল খনিগুলি জার্ম্মানীর হস্তে সমর্পণ করা হইবে বলিয়া রাশিয়া এবং জার্ম্মানীর মধ্যে একটি চুক্তি হইয়াছে, এই মর্ম্মে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে, সর-কারী জার্ম্মান নিউজ এজেন্সী তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

জাপানীরা হ্যাংচাও-এর পশ্চিমে এক নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে। জাপানীরা বিনা বাধায় সিয়েনতাং নদী পার হইয়া সিয়াওসান শহর রক্ষায় নিযুক্ত ৫০ হাজার চীনা সৈন্যকে ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

১৭ই জানুয়ারী—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুক হক গত ১৫ই জানুয়ারী মাদারীপুরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"বাঙলার বাতাসে টাকা উড়িয়া বেড়াইতেছে। যাহারা টাকা আয় করিতে পারে না, তাহারা বোকা, মূর্খ। লোকে বলে যে, আমি ডাল ভাতের মন্ত্রী—আমি ডাল ভাতের ব্যবস্থা করি না কেন? ডাল ভাতের অর্থ তাহারা কি বুঝেন, আমি জানি না। আমি বাবুর্চ্চি নই যে, আমাকে ডাল-ভাত পরিবেষণ করিতে হইবে।" কি ভাবে টাকা আয় করিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া তিনি বলেন,—"আমার কলিকাতার বাসায় একটি কদু (লাউ) গাছ হইয়াছিল। এই গাছের কদু চৈত মাস পর্য্যন্ত খাইয়াও ১৭৲ টাকা বিক্রয় করিয়াছিলাম। আমি নিজে মোরগ এবং হাঁস পালন করি। তাহার আণ্ডা খাই ও বিক্রয় করি। তাহাতে আমার কোন লজ্জা নাই।"

কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থায়ীভাবে বাঙালী যুবকদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বাঙলা কংগ্রেসের উপর 'এড হক' কমিটি আরোপ বিধি-বহির্ভূত হইয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী—

মণিপুরে দরবারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া যে জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল, পুলিশ তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে গেলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ ঘটে এবং তাহার ফলে অনেক লোক আহত হয়। জনতার মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিল।

কমন্স সভায় ভারত-ব্রহ্ম শাসন আইন সংশোধন বিলটি দ্বিতীয় দফা আলোচনার পর বিনা ডিভিশনে পাশ হয়।

১৯শে জানুয়ারী—

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধীর সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। উড়িষ্যা কংগ্রেসের ব্যাপার সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইলেকশন ট্রাইবুনাল আগামী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচন কার্য্য চালাইবেন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পুরাতন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই কাজ চালাইতে থাকিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী বিল যে আকারে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা সামান্য সংশোধনের পর অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। তৎপর ব্যবস্থাপক সভায় বর্ত্তমান অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাঙলা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় জানাইয়াছেন যে, 'স্বাধীনতা দিবস' সম্পর্কে যে সভা সমিতি হইবে, তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করার প্রয়োজন হইবে না।

২০শে জানুয়ারী—

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান সম্ভবপর কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বড়লাট যাহাতে তাঁহার বোম্বাই বক্তৃতার কোন কোন অংশের তাৎপর্য্য অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন, তজ্জন্য মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে অনুরোধ করিবেন। এ বিষয়ে যথারীতি কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, মহাত্মা বড়লাটকে তাঁহার বোম্বাই বক্তৃতার কতকগুলি অংশের তাৎপর্য্য স্পষ্টতর করিবার অনুরোধ জানাইবেন। ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীঘ্রই দিল্লীতে গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার হইবে বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস।

অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধে বড়লাটের সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। মহাত্মাজীর মতে বড়লাটের বক্তৃতায় অনেক ফাঁক আছে, সন্দেহ নাই—তথাপি উহাতে একটা সম্মানজনক মীমাংসার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

আগামী ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতা সঙ্কল্পবাক্যের সূত্রে কাটা সম্পর্কিত অংশের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সংকল্পবাক্যটি সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার পক্ষে কাহারও কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

সিন্ধুর ব্যাপার সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী এবং প্রফেসার ঘনশ্যাম দাসের নিকট সমুদয় অবস্থা অবগত হন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা সিন্ধু পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদিগকে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২১শে জানুয়ারী—

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সমস্যা লইয়া আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক 'এড হক' কমিটি নিয়োগের অযৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তব্য শুনিবার পর ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলা সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতিকে এক বিবৃতি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। শীঘ্রই কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতি বাহির হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশনে প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে সম্মেলন কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে সমস্ত ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ জানান।

কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে তিলজলায় পিকনিক গার্ডেন রোডে ঈদ উপলক্ষে এক হাঙ্গামা হয়; ফলে অনুমান ১৩জন সামান্য আহত হয়।

বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী পরলোকগত ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে একটি স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

২২শে জানুয়ারী—

হরিজনে একটি প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপনের সহিত সত্যাগ্রহের কোন সম্পর্ক নাই। গান্ধীজী স্বাধীনতা দিবসে ছাত্র ও শ্রমিকগণকে ধর্ম্মঘট করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বিহার সমাজতন্ত্রী দলের সমর-পরিষদের এক অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সমাজতন্ত্রী দল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের সর্ত্তে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ করিতে রাজী নহে।

বোম্বাই শহর হইতে রামগড় কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। ২৫জন সদস্যের মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা ১৫টি এবং বামপন্থীরা ১০টি আসন পাইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের বস্তি জেলার বেলহার নামক গ্রামে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুলিশের গুলী চালনায় ৫জন লোক মারা গিয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির হিসাব সম্বন্ধে প্রদত্ত হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্ট সম্পর্কে নিযুক্ত সাব কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, অদ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় তাহা গৃহীত হয়।

৭ম বর্ষ]   শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৪৬, Saturday, 20th January, 1940   [১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নোয়াখালির ব্যাপার—

শ্রীযুত ললিতমোহন দাস সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নোয়াখালি জেলার হিন্দু উৎপীড়নের সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ১৪০টি হিন্দু পরিবারের ধান্য লুণ্ঠনের কথার উল্লেখ আছে। হিন্দুর ধান থাকিলেই মুসলমান তাহা লুট করিবে প্রধান মন্ত্রী এই বলিয়া রসিকতা করিয়াছেন, কিন্তু রসিকতার জোরেই অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না; এবং স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিম-উদ্দীনও দেখা যাইতেছে, অভিযোগগুলি একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তিনি শুধু অভিযোগগুলি এই কথা বলিয়া এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার মতে নোয়াখালিতে তেমন উদ্বিগ্ন হইবার মত কিছুই ঘটে নাই। কিন্তু ইহা হইল ব্যক্তিগত মতের কথা। মন্ত্রীদের মতে নোয়াখালিতে উদ্বিগ্ন হইবার মত কিছু ঘটিয়াছে ইহা যদি তাঁহারা মনে করিতেন তাহা হইলে হিন্দুর ধান থাকিলেই মুসলমান তাহা কাটিয়া লইবে বলিয়া রসিকতা ফুটান বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক হইত না। এ স্থলে বিবেচ্য তাঁহাদের মত নয়, অভিযোগ তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে এবং সে অভিযোগ ইহাই যে, নোয়াখালির ব্যাপারের সম্বন্ধে তাঁহারা যে মত অবলম্বন করিয়াছেন, ন্যায়ের দিক হইতে তাহা ঠিক মত নয়। অভিযোগ যাঁহাদের বিরুদ্ধে বিচারক তাঁহারা হইতে পারেন না। নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের জোরে অভিযোগের বিচারকে তাঁহারা এড়াইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে অভিযোগের খণ্ডন হয় না। মন্ত্রিমণ্ডল যদি অভিযোগের সম্বন্ধে সাধারণ তদন্তের সম্মুখীন হইতেন এবং তেমন তদন্তের ভিতর দিয়া অভিযোগ খণ্ডিত হইবার সুযোগ দিতেন তবেই তাঁহাদের সাহস, সমীচীনতা এবং নীতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইত; কিন্তু দেখা গেল সে সাহস তাঁহাদের নাই।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস—

বোম্বাইয়ের ওরিয়েণ্ট ক্লাবের বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড লিনলিথগো তিনটি বাক্য বলিয়াছেন এবং সেই তিনটি বাক্য লইয়া ভারতের রাজনীতিক মহলে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সেই তিনটি বাক্য হইল এই—(১) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। (২) ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস যতদিন না দেওয়া যায়, ততদিনের জন্য ভারতের জনমতানুকূলভাবে তাঁহারা ১৯৩৫ সালের সংস্কার বিধির রদবদল করিতে প্রস্তুত আছেন। (৩) প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালনে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি মীমাংসাসূত্রে ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বড়লাটের শাসন পরিষদকে সম্প্রসারিত করিয়া তাহাতে কয়েকজন রাজনীতিক নেতাকে লইতে প্রস্তুত আছেন। ভাষ্যকারেরা অনেকেই এই আক্ষেপ করিতেছেন যে, বড়লাটের এই বক্তৃতায় নূতন কথা কিছুই নাই; কিন্তু আমরা শুধু তাহাই বলিব না, আমরা বলিব, নূতন কথা কিছু যে নাই, বা থাকিতে পারে না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় হইল এই যে, বড়লাটের এই বক্তৃতায় ভারতের দাবীকে অগ্রাহ্য করিবার একটা দৃঢ়তা রহিয়াছে। প্রথম কথা এই যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস এই কথাটি মুষ্টিমেয় মডারেটদের কাছে যতই মধুময় হউক না কেন, ভারতবাসীদের দাবী উহা নয়, ভারতবাসীরা

পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। দ্বিতীয়ত ভারতবাসীদের সহযোগিতায় শাসন-সংস্কার আইনের রদবদল। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, যুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই, তাহার পরে হইবে, সে সম্বন্ধে বিবেচনা এবং সে বিবেচনারও কর্ত্তা থাকিবেন প্রভুরা। ভারতবাসীদের কাজ হইবে শুধু তাঁহাদিগকে সাহায্য করা। তৃতীয় প্রস্তাব হইল, প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে লইয়া প্রদেশসমূহে মিশ্র-মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করা যদি সম্ভব হয়, তবে সেই সর্ত্তে বড়লাটের শাসন পরিষদে জনকয়েক রাজনীতিক নেতাকে গ্রহণ করা। এ প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত মর্ম্ম হইল এই যে, মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইলে সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে মীমাংসা করিয়া—কয়জন হিন্দু, কয়জন মুসলমান মন্ত্রী হইবেন, এ সম্বন্ধে যুক্তি হইবে সে মীমাংসার স্বরূপ। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে গণতান্ত্রিকতার স্থানে প্রদেশসমূহের মন্ত্রিমণ্ডলের নিয়ামক হইবে সাম্প্রদায়িকতার নীতি। অর্থাৎ জিন্না সাহেব যাহা চাহিতেছেন, বড়লাট বাহাদুর একটু মোলায়েম ভাষায় সেই দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে বড়লাটের এই বক্তৃতা সম্বন্ধে বিবেচনা হইবে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ প্রয়াসী দলের মত কি হইবে আমরা জানি না; আমাদের সোজা কথা এই যে, বড়লাটের তিনটী বাক্যের কোনটিই এ দেশের জনমতের দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ ভারতের জনমতকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করাই হইল এই তিন মহাবাক্যের অভিধেয় এবং উদ্দেশ্য। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দোহাইতে রহিয়াছে, যেমন ভারতের জনগণের মত এবং অধিকারের অস্বীকৃতি, সেইরূপ দ্বিতীয় প্রস্তাবে অর্থাৎ ভারতবাসীদের সাহায্য লইয়া শাসন-সংস্কার আইনের রদবদলের প্রস্তাবের মধ্যেও রহিয়াছে জনমতের প্রতি অবমাননা-কর সেই ইঙ্গিত এবং গণ-পরিষদের দ্বারা ভারতের শাসন-তন্ত্র গঠনের দাবীতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ অস্বীকৃতি; তৃতীয় প্রস্তাবে জনমতকে দমন করিয়া প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রশাসনে সাম্প্রদায়িকতাকে পত্তন করিবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে প্রাদেশিক শাসনে গণতান্ত্রিকতার গন্ধ যেটুকু ছিল তাহাও থাকিবে না। মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে এবং মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি নির্দ্ধারণে জনমতের পরিবর্ত্তনে সাম্প্রদায়িক নেতাদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। বড়লাটের বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় নূতন কথা নাই, ইহাই বড় কথা নয়, সে বক্তৃতায় অনিষ্টকর কথা আছে এবং সে বক্তৃতার আগাগোড়া ভারতের জনমতের দাবীকে অস্বীকার করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই ভারতের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্ণায়ক এই কথাই বলা হইয়াছে, আত্মমর্য্যাদায় জাগ্রত ভারত সে বক্তৃতার সকল প্রস্তাবকেই সমভাবে উপেক্ষা করিবে।

মহাত্মাজীর সর্ত্ত—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা রাজনীতি ক্রমশ সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার সূত্র ধরিয়া এমন অতীন্দ্রিয় স্তরে গিয়া পৌঁছিতেছে যেখান হইতে বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে আসন্ন সম্পর্কে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, এবং কোন দিন যে বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব হইবে ইহাও সন্দেহের বিষয়। মহাত্মাজী 'হরিজন' পত্রে "চরকা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক, অথবা অন্য যে কেহ এমন কি, ইংরেজই হউক না কেন, তাহাকে এবং অবশেষে জগদ্বাসীকে অহিংস মন্ত্রে দীক্ষা দান করাই আমার জীবনের ব্রত।" মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য হইল অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে যেখানে কলের কাপড় থাকিবে না, প্রত্যেকে চরকা কাটিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে, সূতা কাটিয়া লজ্জা নিবারণ করিবে। সে সমাজে হিংসা থাকিবে না, শুধু থাকিবে প্রেম এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। গান্ধীজীর এই আদর্শকেই তিনি কংগ্রেসের আদর্শ করিতে চাহেন এবং তাঁহার পথে চলিতে হইলে ভারতের প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীকে এই বৈরাগ্যযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু বাহ্য আচারে গ্রহণ করিলেই গান্ধীজী সন্তুষ্ট নহেন, মন ও মুখ এই আধ্যাত্মিকতত্ত্বে এক করিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস কর্ম্মীরা তেমন অবস্থায় না উঠিবেন ততদিন পর্য্যন্ত গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলনে অবতীর্ণ হইবেন না। মানব-সভ্যতার বিকাশ হইতে মহাপুরুষগণও অপ্রতীকার এবং অহিংসার যে আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজ কোটি কোটি লোক সহসা সেই আদর্শে উঠিবে কেমন করিয়া? কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে দিতে মহাত্মাজী রাজী নহেন। হয় তাঁহার কথা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে, নহিলে তাঁহার নীতি-প্রভাবিত কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে। প্রেমের দিগ্বিজয় তিনি চালাইবেনই; তাঁহার প্রেম যেমন পুষ্পের মত কোমল, তেমনই লৌহের মত কঠিন। মহাত্মাজীর প্রেমের এই ধর্ম্মকে আমরাও অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু তাঁহারা এ হেন প্রেমের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ বিকাশের অসম্ভবতাই আমাদিগকে অবসন্ন করে—প্রশ্ন উঠে কতদিনের জন্য এই প্রতীক্ষা—প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত কি?

মণিপুরে প্রজা-আন্দোলন—

বহুদিন পরে মণিপুর রাজ্যেও প্রজা-আন্দোলনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কালের গতিকে কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। পরে সেই মণিপুর রাজ্যেও প্রজা-আন্দোলনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কালের গতিকে কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। এই মণিপুর দরবারের আদেশেই নাগা রাণী গুইদালো কারারুদ্ধা আছেন। মণিপুরের বর্ত্তমানের প্রজা-আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, এই আন্দোলনে নারীরাই অগ্রণী হইয়াছেন। মণিপুর গরীব দেশ। মণিপুর রাজ্য হইতে ধান্য রপ্তানীর বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। ১০ জন নারী ইতিমধ্যেই কারা-রুদ্ধা হইয়াছেন এবং আরও কতিপয় নারী ধৃত হইয়া হাজত বাস করিতেছেন। মণিপুর রাজ সরকার রাজ্যের শাসন-

সংস্কার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইয়াছেন, কালের গতির বিরুদ্ধতা করিয়া যদি তাঁহারা এখনও মধ্য-যুগীয় সামন্ততান্ত্রিকতাকেই বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন, তবে অনর্থেরই কারণ সৃষ্টি করা হইবে।

জিন্না কি চাহেন—

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্র ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"সপ্তাহর পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু ভারতের সমস্যা যেমন তেমনই আছে। যুদ্ধ থাকুক বা না থাকুক, বিশেষভাবে যুদ্ধ যখন আছে, তখন এ বিষয়ে উদাসীনতা শোভা পায় না। ভারতে ব্রিটিশ নীতির উদ্দেশ্য কি? যতদিন সম্ভব ভারতবর্ষকে অধীন করিয়া রাখা অথবা ভারতবাসীদের সদ্ভাব এবং সহ-যোগিতা বজায় রাখা? এই প্রশ্ন বর্ত্তমানের এই সমস্যা সকল ভারতবাসীর চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। শুধু ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেই ভারতবাসীদের সদ্ভাব এবং সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। অবশ্য এই স্বীকৃতির ফলে ইংরেজের কতকগুলি অর্থ-নৈতিক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত স্বার্থের ঝুঁকি রহিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের স্থির নিশ্চয় হওয়া কি উচিত নহে যে, যদি আমরা স্বাধীনতার এই সংগ্রামে ভারত-বাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা চাই, তাহা হইলে ভারতীয় সেনাদলের উপর কর্ত্তৃত্বের জোরে ভারত-সচিবের হুকুমনামা জারীর সাবেক নীতি ছাড়িয়া রাজনীতিক এবং সমানাধি-কারের ভিত্তিতে ও ন্যায় বিচারের যুক্তিতে আমাদের অর্থ-নীতিক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত স্বার্থ রক্ষা করিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

উপসংহারে 'গার্ডিয়ান' জিন্না সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত সমস্যার সম্পর্কে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, মিঃ জিন্না একজন খাঁটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং বৈদেশিক শাসন অসহিষ্ণু। আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি হয়ত তাঁহার মক্কেলদের মতামত এবং মনোভাবের উপর জোর দেওয়া যতটা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে শান্ত করা বা শিক্ষিত করা ততটা কর্ত্তব্য মনে করেন না; কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানদের আপোষ-নিষ্পত্তিকারক হিসাবে স্মরণীয় না হইয়া মোশ্লেম সম্প্রদায়ের স্বার্থের নামে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াই স্মরণীয় তিনি হইতে চাহিবেন?"

প্রশ্ন এমন কিছু জটিল নয়, কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত; কিন্তু জিন্না সাহেব কংগ্রেসের উপর বিশ্বাসী নহেন বৈদেশিক প্রভুদের কৃপাকেই তিনি প্রধান সম্বলরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। তিনি অন্তরে জাতীয়তাবাদী কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে যাওয়া অবান্তর এবং তেমন অনুমানে অস্বস্তিরও কারণ নাই, কারণ কার্য্যত তিনি ভারতের স্বাধীনতাকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিবার পথই ধরিয়াছেন। তাঁহার এতাবৎকাল অনুসৃত নীতির অনিবার্য্য ফল যে তাহাই,—'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'র উক্তিতেই তাহা সুস্পষ্ট। এমন অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে ভারতের জাতীয়তা-বাদী যাঁহারা কিম্বা যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা চাহেন, তাঁহাদের কোন মীমাংসা অসম্ভব। তেলে-জলে কখনও মিশ খায় না।

পৃথিবীটা কার বশ?—

শ্রীযুত রূপনাথ ব্রহ্ম আসামের বড়দলুই মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। ইনি আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধি। সম্প্রতি ব্রহ্ম মহাশয় স্যার মহম্মদ সাদুল্লার দলে ভিড়িয়া মন্ত্রিগিরি লুফিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যের তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই উপভোগ্য। প্রথমত তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা আসামের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন; তবে ব্রহ্ম মহাশয় সে দল ছাড়িয়া কংগ্রেসী দলের নীতির সুস্পষ্টভাবে বিরোধী যে দল সেই দলে যোগ দিলেন কেন? কোন বস্তু স্বদলে বিদলের ভেদবুদ্ধি লোপ করিয়া ব্রহ্ম মহাশয়কে অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিল? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কংগ্রেসী দলের হাতে এখন আর মন্ত্রিগিরি নাই, তাই ব্রহ্ম মহাশয় যে দলের হাতে মন্ত্রিগিরি আছে সেই দলেরই ভক্ত বনিয়াছেন। কথায় আছে, পাগড়ী যে দিকে সেলাম সেই দিকে। ব্রহ্ম মহাশয় বলেন,—'ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক যাহারা, তাহারা সব সময় কংগ্রেসের নীতি এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিতে পারে না। তাহাদের কতকগুলি বিশেষ অভাব অভিযোগ আছে, বৃহত্তর আদর্শের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সেইগুলির প্রতীকার তাহারা আগে চায়।' যুক্তি চমৎকার। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সব বড় স্বার্থই প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিয়া। ক্ষুদ্র স্বার্থের আকর্ষণ যাহারা ছাড়িতে পারে না, তাহাদের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বিদায় লওয়া উচিত। ক্ষুদ্রতর স্বার্থ-সেবার দায়ে বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তাহার প্রতিক্রিয়ার আঘাত একদিন আসিবেই, ব্রহ্ম মহাশয় ইহা বুঝিয়া রাখুন। মন্ত্রি-গিরির কোন মহিমাই ব্যক্তিকে দেশবাসীর ধিক্কার হইতে ঊর্দ্ধে তুলিতে পারে না।

হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ—

অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ ওরফে হলওয়েল মনুমেণ্টকে নবাব সিরাজদৌল্লার কলিকাতা বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বাঙলার স্বরাষ্ট্র-সচিব ঐ স্মৃতিস্তম্ভ অপ-

সারণের আন্দোলনকে চাপা দিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কথার কায়দায় মনের গোপন দুর্ব্বলতাকে সব সময় ঢাকা যায় না, বরং যে কসরতের সঙ্গে ঐ কাজটা করিতে হয়, তাহাতে কৃত্রিমতা অধিকতর উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি আলীগড় শহরে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, এই অধিবেশনে অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভটি অবিলম্বে অপসারিত করিবার নিমিত্ত তরুণ দলের পক্ষ হইতে স্যার নাজিমুদ্দিনের নিকট দাবী করা হইয়াছে। আমরা জানি, বাঙলাদেশের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব মুসলমান সংস্কৃতির যতই জয়গান করুন না কেন, বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের নামে মিথ্যা গ্লানির প্রস্তর মূর্ত্তিটি অপসারিত করিবার কার্য্যত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহস তাঁহার সহজে হইবে না; কারণ, নিজের যে ভোটের জোর বজায় রাখিবার গরজে পড়িয়া মুসলিম সংস্কৃতির দোহাই তাঁহাকে দিতে হয়, হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সেই ভোটের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইবার শঙ্কা আছে। কায়দা করা কথার কারসাজী হইতে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলকে প্রকৃত কাজের পথে যদি এ সম্বন্ধে নামাইতে হয়, তাহা হইলে বিষয়টির উপর ক্রমাগত জোর দিতে হইবে এবং মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া দৃঢ়ভাবে অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িকভাবে উদার আদর্শে এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে এই আন্দোলন চালাইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া তরুণ মুসলমানদের দৃষ্টি জাতীয়তার দিকে সম্প্রসারিত হউক, বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা ইহাই কামনা করেন।

পরলোকে সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়—

'ভারতবর্ষের' অন্যতম সম্পাদক সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে আমরা একজন অকৃত্রিম সাহিত্যসেবী এবং অমায়িক হৃদয় বন্ধুকে হারাইয়াছি। মৃত্যুকালে সুধাংশুশেখরের বয়ঃক্রম মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি নিরভিমানী পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার সাহিত্যসেবা ছিল অনাড়ম্বর। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারীস্বরূপে বাঙলা দেশের অনেক সাহিত্যিককেই সুধাংশুশেখরের সংশ্রবে যাইতে হইয়াছে, এবং যিনিই তাঁহার সংশ্রবে গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না, ভগবান তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

শক্করের দাঙ্গা—

সিন্ধু প্রদেশের শক্কর অঞ্চলে দাঙ্গায় হতাহত এবং ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে পাকা সরকারী খবর বাহির হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, ঐ দাঙ্গায় ১৪২ জন হিন্দু নিহত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে ১০ জন জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। ৫৮ জন হিন্দু জখম হয়, তন্মধ্যে ৯ জন পরে মারা যায়। ২৭ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এবং ২২ জন এখনও হাসপাতালে আছে। দাঙ্গায় ১৪ জন মুসলমান নিহত হয়, এবং ১২ জন জখম হয়, আহতগণ সকলেই পরে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ১৬৪ খানা বাড়ী ভস্মীভূত হয়,—অধিকাংশই হিন্দুর বাড়ী। উহাতে অনুমান ১,৪৮,০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। লুণ্ঠিত হইয়াছে ৪৬৭ খানা বাড়ী এবং লুণ্ঠনের ক্ষতির পরিমাণ ৬,৫৩,০০০ টাকা। ৬টি হিন্দু নারী অপহৃতা হয়, ইহাদিগকে পরে উদ্ধার করা হইয়াছে।

উভয় পক্ষে লোক নিহত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, ব্যাপারটাকে দাঙ্গা বলা হয়। ১০ জন হিন্দু জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে এবং ৬টি হিন্দু নারী অপহৃতা হয়, ইহাতেই বুঝা যায়, আক্রমণ কিভাবে হইয়াছিল এবং সে আক্রমণের পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল কতখানি। বিংশ শতাব্দীতে কোন সভ্য দেশে এবং সভ্য শাসনে যে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে, ইহা ধারণা করাও কঠিন। ইহা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু বলিবার নাই; বিশেষত শুধু কথা বলার দ্বারা এমন নৃশংস পাশবিকতার প্রতিবাদ করা হয় না, এবং করাটাতেও কতকটা কাপুরুষতারই পরিচয় দেওয়া হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

শরৎ-স্মৃতি

(দেবানন্দপুর শরৎ-স্মৃতি সমিতির অর্ঘ্য)

নব বাঙলার হে প্রিয় পথিক,
প্রেমিক, পূজারী, ত্যাগী,
শত হিয়া মাঝে প্রেরণা তোমার
যুগ যুগ রবে জাগি'।

মুক্তিলাভের আশায় গিয়েছ
আমাদের থেকে দূরে,
আমরা ভুলিনি, ভুলিব না কভু
রেখেছি স্মৃতির পুরে॥

ব্রিটিশ চিন্তারাজ্যে চাঞ্চল্য

লড়াই চলিবে, পুরাপুরি লড়াই এখনও আরম্ভ হয় নাই। কখন হইবে, কবে হইবে, এ কথা কেহই বলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধ উপলক্ষে ইংলণ্ডের মনীষী-মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এই প্রশ্ন করিতেছেন যে, কেন এই লড়াই? হিটলারবাদকে উৎখাত; কিন্তু এই ভাঙ্গার দিকটা দেখিলেই চলিবে না, আমরা সত্য সত্যই কি গড়িতে চাই।

কিছুদিন হইতে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সংবাদপত্র-গুলিতে সে দেশের চিন্তানায়কগণ এই বিষয়ের সম্বন্ধে লেখালেখি আরম্ভ করিয়াছেন। বানার্ড-শ, হাক্সলি, ওয়েলস্, এডিংটন প্রমুখ মনীষিমণ্ডলী ব্রিটিশ চিন্তারাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ রাখিবার নিমিত্ত আমাদেরও সে সব কথা কিছু জানার দরকার; বিশেষভাবে আমাদেরও এখন প্রশ্ন এই যে, যুদ্ধ কেন হইতেছে, যুদ্ধের লক্ষ্য কি? এবং যুদ্ধে ইংরেজ যদি জয়লাভ করেন, তাহা হইলে আমরা পাইব কি?

হিটলার রুষিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ একটা গুজব শুনা যাইতেছে। অসম্ভব কিছু নয়। রুষিয়া ফিনদের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে বলিয়া যে হিটলার মধ্যস্থতা করিতে যাইতেছেন, ইহা মনে করা ভুল; অন্য উদ্দেশ্য আছে। রুষিয়া যদি মনে করে, তবে কয়েকদিনের মধ্যেই ফিনল্যাণ্ডের লড়াই খতম করিয়া দিবার মত সামর্থ্য তাহার আছে; কিন্তু ফিনল্যাণ্ডকে চূর্ণ করা রুষিয়ার উদ্দেশ্য নয়, তাহার উদ্দেশ্য হইল নিজের রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য কিছু অধিকার আদায় করা এবং ফিনল্যাণ্ডের উপর যত কম চাপ দিয়া সে ইহা করিতে পারে, সে তাহাই করিবে। রুষিয়া বুঝিতেছে যে, নিজের শক্তির অযথা অপব্যয় না করিয়া শক্তিকে সংরক্ষণ করাই তাহার দরকার; কারণ অদূরে ভবিষ্যতে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে রুষিয়াকে সে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। রুষিয়া যুদ্ধে নামিবার আগে ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভিমত সুস্পষ্টভাবে জার্ম্মান বিরোধী থাকিলেও রুষিয়ার বিরোধী ছিল না, এখনও নহে; কিন্তু যুদ্ধের গতি যেভাবে ঘুরিতেছে তাহাতে ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে রুশিয়াকে সমর্থন না করার পক্ষে কাহার কাহারও মত দেখা যাইতেছে। প্রফেসার হালডেন সম্প্রতি বিলাতের "ট্রিবিউন" পত্রে, "নূতন জগতের পথ" এই নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তিনি বলেন,—"মিত্র পক্ষের সাহায্য পাওয়া যাইবে, জার্ম্মান সামরিকগণ যদি ইহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তাহারা রুষিয়ার বিরুদ্ধে মহা-স্ফূর্ত্তিতে যুদ্ধে নামিয়া পড়িবে। যুদ্ধের মোড় যদি ক্রমে ঘুরিয়া এই দিকে দাঁড়ায়, তাহা হইলে জগতে নিশ্চয়ই স্থায়ী শান্তি হইবে না।"

প্রফেসার হালডেন বলেন, পক্ষান্তরে ইংরেজ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যদি এখনও একটি শান্তি-পরিষদ আহ্বান করেন এবং তাহাতে রুষিয়ার প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ করা হয় এবং ইউরোপে যত নিরপেক্ষ শক্তি আছে, সকলের প্রতিনিধি-দিগকে আনা হয়, তাহা হইলে হিটলারকেও শান্তির পথে আসিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লন; তবে শুধু তেমন সর্ত্তে এইরূপ শান্তি সম্ভব হইবে। ইহার অর্থ এই যে, যদি পোলদিগকে এবং ফিনদিগকে নিজেদের দেশের শাসনতন্ত্র-গঠনে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবেই শান্তি সম্ভব। ভারত-বাসী, আনামী, আলবেনীয় প্রভৃতিরও এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

যুদ্ধ বাধিবার অনতিকাল পরেই এইচ, জি, ওয়েলস বিলাতের 'ব্রিটিশ' পত্রে এবং অন্যান্য কয়েকখানা সাপ্তাহিক পত্রে এই বিষয় লইয়া প্রথমে লেখনী সঞ্চালন করেন।

তিনি 'ফর্টনাইটলী রিভিউ' পত্রে লিখেন,—একটা বড় বিতর্ক সভার আয়োজন করা দরকার। এই বিতর্কে জগতের যত লোকে পারে যোগদান করিবে। যুদ্ধের চেয়ে এইটি হইল বিশেষ দরকার। এত বড় একটা দুর্ব্বিপাকে জগতের এত লোক কষ্ট পাইবে, অথচ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য জন-কয়েক রাজনীতিক ছাড়া ইহার গতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার অন্য কাহারও থাকিবে না, ইহা অত্যন্তই শোচনীয়। মিঃ ওয়েলসের এই লেখার পর ক্রমাগত নানা কাগজে লেখালেখি সুরু হইল। বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, জ্যোতিষী, জীবতত্ত্ববিদ, শান্তিবাদী, রাজনীতিক সকলের হাজার হাজার চিঠি সংবাদ-পত্রে ছাপা হইতে থাকিল এবং এখনও ছাপা হইতেছে। 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান', 'টাইমস', 'নিউ ষ্টেটসম্যান্' প্রভৃতি পত্র খুলিলে পাঠকেরা সে পরিচয় পাইবেন।

এই সব চিঠিতে দেখা যায় যে, প্রধানত তিনটি জিনিষের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। এক দল বলিতেছেন, যুদ্ধ কর, প্রাণপণে এবং স্ফূর্ত্তির সঙ্গে লড়াই চালাও। তবে, যুদ্ধের লক্ষ্য কি, সে কথাটা আগে আমাদিগকে বলিয়া দাও এবং জগতের লোকদের বুঝাইয়া দাও যে, বিভিন্ন শক্তির স্বার্থ-সামঞ্জস্য বজায় রাখাই তোমাদের লড়াইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তোমরা সত্যই নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিতে চাও, সাম্রাজ্য বাদের স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নূতন অর্থনীতির পত্তন করিতে তোমরা যে প্রয়াসী, এই কথাটা বলিয়া দাও।

অপর একদল বলিতেছেন,—লড়াই থামাইয়া দাও।

তৃতীয় দল বলিতেছেন,—যুদ্ধ চালাও, কিন্তু শান্তির কথা তুলিও না। শান্তির কথা তুলিলে তোমাদের মূল উদ্দেশ্য হইতে মানুষের চিত্ত অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হইবে। যুদ্ধে জয়ই আপাতত উদ্দেশ্য।

প্রথম দলেরই জোর বেশী দেখা যাইতেছে এবং এই দলের অগ্রণী হইলেন মিঃ ওয়েলস্। তিনি বলেন, হিটলার-বাদকে ধ্বংস করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না, গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। সেই গলদ একেবারে দূর করিতে হইবে। নহিলে এক হিটলার যাইবেন, আর এক হিটলারের আবির্ভাব ঘটিবে। উৎপাতের শেষ হইবে না। প্রকৃত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিকদের চিন্তার ধারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে।

মিঃ বানার্ড-শ'য়ের লেখার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। তিনি বলেন, যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দাও। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে তাঁহার এ সম্বন্ধে লেখাটি প্রথমে বাহির হয় এবং তাহা ইংলণ্ডে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁহার মত এই যে, এই যুদ্ধ চালাইয়া জগতের সম্মুখে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধান হইবে না। সমাধান করিতে হইবে অন্য উপায়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ স্যার আর্থার এডিংটন, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার রিচার্ড গ্রেগরী এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জন মিডলটন সাহেব ইঁহারা মিঃ শ'য়ের মতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, হিটলার এবং তাঁহার সমর্থকদিগকে দলন করিতে হইবে। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহা প্রয়োজন এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা স্থায়ীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। বল প্রয়োগের দ্বারা বলের অপ-প্রয়োগের পাপ উৎখাত করিতে গেলে পরোক্ষভাবে বলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং বলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার অপ-প্রয়োগের সম্ভাবনাও সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

মিঃ জুলিয়ান হাক্সলী মিঃ ওয়েলসের সমর্থকদের মধ্যে একজন অগ্রণী বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, গ্রেট ব্রিটেনের প্রথমে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নাৎসী প্রভুত্ব ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকা উচিত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গকে লইয়া একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করা। দেশের লোকের সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা থাকা কর্ত্তব্য, তিনি এই যুক্তিকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতেই এইগুলি নির্দ্ধারিত হওয়া কর্ত্তব্য। মোটের উপর তিনি আন্তর্জ্জাতিকতার উপর জোর দিতেছেন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের তিনি বিরোধী। মিঃ হাক্সলী বলেন, আমরা ইউরোপের ভবিষ্যতের জন্য লড়াইতে অবতীর্ণ হইয়াছি এবং আমরা পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। এই পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার অবদান জগতের মধ্যে এখনও অসামান্য। যুদ্ধের নীতি এরূপভাবে নির্ণীত হওয়া উচিত, যাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য নিরপেক্ষ শক্তিসমূহের সমর্থন লাভ করা যাইতে পারে।

ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিবর্গকে লইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করার যুক্তির জোর অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি লর্ড হ্যালিফাক্স তাঁহার একটি বক্তৃতায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তিনি এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে পারেন নাই। লর্ড হ্যালিফাক্স সংবাদপত্রে পত্র-প্রেরকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের শুধু কল্পনাবিলাসী হইলে চলিবে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যে কর্ম্মপদ্ধতির পশ্চাতে জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার যোগ নাই অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহানুভূতি নাই, তাহা কোনদিনই সাফল্যলাভ করিতে পারে না। সমষ্টির অন্তরের সঙ্গে যে অনুভূতির যোগ নাই, সেই ব্যক্তিগত আবেগ বা উচ্ছ্বাসের মূল্য বাস্তব রাজনীতিতে থাকিতে পারে না। পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অষ্ট্রিয়া সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুস্পষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি কি লর্ড হ্যালিফাক্স তাহা খুলিয়া বলেন নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে লেখালেখি এখনও চলিতেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের ধারণা যে তেমন কিছু গুরুত্ব দিতেছে না, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ বিগত মহাসমরের পর সে সম্বন্ধে লোকের যথেষ্টই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। সেইরূপ রাজনীতিকদের মুখের বড় বড় বুলিও লোকে তেমন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মিঃ ওয়েলস আগাইয়া আসিয়া বলিতেছেন—"মানবজাতির মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে ইংলণ্ডের গতি নির্দ্দিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বেতারযোগে, বিশেষভাবে শত্রুদের দেশে সে লক্ষ্যকে প্রচার করা।"

ভারতবর্ষের কথাই এই সম্পর্কে খুব বেশী উঠিতেছে না, তবে একেবারে যে না উঠিতেছে ইহাও বলা যায় না। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' এবং 'নিউ ষ্টেটসম্যান' পত্রের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, এই দুইখানা পত্র প্রধানভাবে কংগ্রেসের দাবীকেই সমর্থন করিতেছে এবং একটা আপোষ-মীমাংসার উপর জোর দিতেছে। মোটের উপর বিগত যুদ্ধেও আমরা দেখিয়াছি, যুদ্ধ ব্রিটিশ জাতির চিন্তাজগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে; গত মহাযুদ্ধের সময় মিঃ ওয়েলস, মারে ইঁহারা এই আলোচনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের দেশের যাঁহারা মনীষী, তাঁহাদের চিন্তা এদিকে তেমন উদ্রিক্ত হয় না, তাঁহারা এই আলোচনাকে রাজনীতিকতার গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতেই বেশী ভালবাসেন। অবশ্য, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র, মানবতার উপর যখনই কোন আঘাত আসে তাঁহার কণ্ঠে তখনই ভৈরব মন্দ্র বাজিয়া উঠে। আজও দুর্গত মানবতার জন্য সমবেদনা তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সমগ্র দেশের মনীষিবর্গ এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী নহেন। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে বলিষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবোধের অভাবের ইহা পরিচায়ক। কিন্তু জগতের সম্বন্ধে সম্পর্কবিচ্যুত হইয়া আমরা চলিতে পারিব না। জগতের মধ্যে যে ব্যাপার একটা প্রবল বিপর্য্যয় ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই চিন্তা করা উচিত এবং কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। রাজনীতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তি-জীবনে কোন সাধনারই পরিপূর্ত্তি বর্ত্তমানে সম্ভব নহে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমানের এই পরিস্থিতিতে দেশের সমগ্র চিন্তাশক্তি জাতির স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থরক্ষার দিকে উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার; সে কর্ত্তব্য একমাত্র কংগ্রেসেরই নহে।

চলতি ভারত

বোম্বাই

গান্ধী ও খৃষ্ট—

অখিল ভারত খৃষ্টান সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের জিন্না-হলে খুব খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন, "শোষণ আর দারিদ্র্য, যুদ্ধ আর দুঃখ—এ সকলের অবসান করতে হ'লে ভগবানের পথে আমাদের চলতে হবে। এই ভাগবত পথেরই নির্দ্দেশ খুঁজে পাই গান্ধীজীর ও খৃষ্টের বাণীর মধ্যে।" গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের আর অহিংসার পথকে অনুসরণ করবার জন্য ডাঃ মুখোপাধ্যায় আহ্বান করেছেন ভারতের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে। এ আহ্বান খুবই যুগোপযোগী হয়েছে। খৃষ্টের যে বাণী সে বাণী তো ভীরু কাপুরুষদের জন্য নয়। তিনি তো অন্যায় আর অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করবার উপদেশ দেন নি তাঁর সহচরগণকে। কালোকে কালো বলতে তাঁর রসনা কখনো কুণ্ঠিত হয়নি। 'ছুঁচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উষ্ট্রের প্রবেশ সম্ভব, কিন্তু ধনীদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কখনো সম্ভব নয়'—ঐশ্বর্য্যের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তাঁর এই অভিযান তাঁকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মধ্যে। জাতিগত, সম্প্রদায়গত কোনো সঙ্কীর্ণতাকে তিনি ক্ষমা করেন নি। সাম্যের অমরমন্ত্র উৎসারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। তাই সেদিন যারা আত্মার সম্পদকে না চেয়ে কামনা করেছিলো ক্ষমতাকে এবং বাহিরের ঐশ্বর্য্যকে—তারা তাঁকে ক্ষমতা করতে পারে নি—ক্রুশ কাঠে পেরেক বিঁধে মেরে ফেলেছিল। গান্ধীজীর অহিংসার মধ্যেও শৌর্য্যের প্রকাশ। তাঁর সহিষ্ণুতার মধ্যে ক্লৈব্যের কোনো মলিনতা নেই। ভারতের খৃষ্টানেরা ইউরোপের পাদ্রীদের নির্দ্দেশকে কেন মেনে চলেছে? তাদের গির্জ্জাঘরে প্রার্থনার সুরের মধ্যে মিলিয়ে রয়েছে যোদ্ধার গর্জ্জন। খৃষ্টের বাণী ফুটে উঠেছে গান্ধীজীর কণ্ঠে, খৃষ্টের চরিত্রের মহিমা খুঁজে পাই গান্ধীজীর আচরণে। ভারতের খৃষ্টানগণকে গান্ধীজীর অনুসরণ করবার জন্য তাই, ডাঃ মুখার্জ্জির এই করুণ আবেদন। আশা করি, এই আবেদন ব্যর্থ হবে না। খৃষ্টান ভাইদের ধর্ম্মের সঙ্গে গান্ধীজীর পথের কোনো পার্থক্য নেই। তাছাড়া খৃষ্টানগণ তো ভারত-বাসী। সুতরাং ভারতবর্ষের কল্যাণের সঙ্গে তাঁদের কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে আছে। সেই কল্যাণ যখন স্বাধীনতার মধ্যে তখন কেন তাঁরা পার্শী, মুসলমান, জৈন, হিন্দু, শিখ—সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতার মন্দির পানে এগিয়ে চলবেন না?

যুক্ত-প্রদেশ

জনগণই দেশের ভাগ্য-বিধাতা—

পণ্ডিত জওহরলাল গাজিয়াবাদের এক জনবহুল সভায় বলেছেন, "ভারতবর্ষের ভাগ্য-নির্দ্ধারণ করবার অধিকার নেই বড়লাটের অথবা তাঁর নিমন্ত্রিত বাহান্ন জন পরামর্শদাতার। সার সিকন্দর হায়াত খাঁ যে বারোজন জ্ঞানীর কথা প্রস্তাব করেছেন, তাঁদেরও কোনো সাধ্য নেই ভাগ্য নির্দ্ধারণ করবার। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা তার জনগণ।" এই উক্তির পিছনে জোর যেমন আছে, সত্যও তেমনি আছে। যে মুহূর্ত্তে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকটি নর-নারীর ভোটাধিকারকে স্বীকার ক'রে গণতন্ত্রের মূলনীতিকে মেনে নেওয়া হ'য়েছে সেই মুহূর্ত্তে মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুরু হয়েছে এক জ্যোতির্ম্ময় অধ্যায়। আজ যদি জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে অস্বীকার ক'রে জাতির ভাগ্যবিধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে—মানুষের প্রগতির ইতিহাসকে বর্ব্বরতার অন্ধকারের পানে ঠেলে দেওয়া হবে। এ রকম একটা গণতন্ত্রবিরোধী চেষ্টাকে বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত ভারতবর্ষ কিছুতেই সহ্য করবে না। মানুষের ইতিহাস বারে বারে আনলো যারা যুগান্তর তারা তো অখ্যাত জনসাধারণ। তাদেরই ত্যাগ এবং শৌর্য্যকে আশ্রয় ক'রে এক একটা জীবন্মৃত জাতি জেগে উঠেছে নবজীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিশপ্ত জীবনের দুঃসহ দুঃখ সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। মহাকালের হাতে বেজে উঠেছে রুদ্রশঙ্খ। সেই শঙ্খের আহ্বানে অখ্যাতনামা মানুষ-গুলি বেরিয়ে এসেছে মুক্তপথের বুকে তাদের জীর্ণকুটীরকে পিছনে রেখে, গগন-পবন মুখরিত ক'রে গর্জ্জে উঠেছে, 'মানবো না, অন্যায়কে মানবো না' আর সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের আধিপত্য লুটিয়ে পড়েছে পথের ধূলায়। ভারতবর্ষেও নব-জীবনের বন্যাকে নিয়ে আসবে ভারতবর্ষের যারা অখ্যাতনামা জনসাধারণ। কংগ্রেসের শক্তি যে আজ এত দুর্জ্জয় হয়ে উঠেছে তার কারণ, কংগ্রেস ভারতবর্ষের জনসাধারণের কল্যাণকে ক'রেছে তার ধ্রুবতারা আর যারা সাধারণ, তারা দাঁড়িয়েছে এর পতাকাতলে। তাদেরই দুর্জ্জয় সংকল্প ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারিত করবে।

অপরাজেয় কথা-শিল্পী

যাদের দৃষ্টি আছে তারাই কেবল সৃষ্টি করতে পারে। যে দৃষ্টি থাকলে ডস্‌টয়েভস্কি আর টলষ্টয় আর হুগোর মতো প্রথমশ্রেণীর রূপশিল্পী হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে—শরৎচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই দুর্লভ দৃষ্টি নিয়ে। তাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখতে পেয়েছিলেন সৌন্দর্য্য আর মহিমাকে। এই দেখার ক্ষমতা যার নেই সে কি কখনো উচ্চস্তরের আর্টিস্ট হ'তে পারে? সে তো কখনো দেখতে পাবে না কত সৌন্দর্য্য ছড়ানো রয়েছে দিকে দিকে। সে কেবল দেখবে বাহিরের দুটো চামড়ার চোখ দিয়ে—তার অন্তরের চোখ দুটো যে অন্ধ। শরৎচন্দ্র তাঁর ভিতরের চোখ দুটিকে নিমেষের জন্যও নিমীলিত রাখেন নি—তাই অতি

সাধারণের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন অসামান্যকে—ছোট-বড়ো সব-কিছুর উপরে দেখতে পেয়েছিলেন সুন্দরের পদচিহ্ন। কৈলাশ খুড়ো, বৃন্দাবন পণ্ডিত—এ'রা কেউ অক্স-ফোর্ড আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীর ছাপ নিয়ে আসে নি। এ'রা অভিজাত সমাজের কেউ নন। কৈলাস খুড়ো তামাক খায় আর দাবা খেলে, বৃন্দাবন পণ্ডিত গ্রাম্য পাঠ-শালায় মাষ্টারি করে। তবু এ'দের মহত্বের তুলনা নেই। কৈলাস খুড়োর আর বৃন্দাবন পণ্ডিতের মন পুষ্পের মত কোমল, ইস্পাতের মত কঠিন। তাঁদের চরিত্রের অবর্ণনীয় গরিমার কাছে মাথা আপনি থেকে নত হ'য়ে পড়ে। তাঁরা কত শান্ত অথচ কত শক্ত। অনুরাধা গ্রামের মেয়ে—কলেজের উচ্চশিক্ষার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা কিন্তু তার চরিত্র কি দৃঢ়, হৃদয় কি বিশাল, আত্মসম্মানবোধ কি সুতীব্র! সাহিত্যিকদের দৃষ্টিকে এতকাল ধ'রে আকর্ষণ করছিলো বড়োলোকের উদ্যানবাটিকার প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের প্রগলভ সৌন্দর্য্য। শরৎচন্দ্রের হৃদয়কে মুগ্ধ করলো মেঠোপথের ধারে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে বনমল্লিকা, তারই স্নিগ্ধসুরভি। তিনি সাহিত্যের দরবারে সাদরে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন তাদের যারা ছিলো জনতার মধ্যে অখ্যাত। তাঁর সাহিত্যের মায়ামুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাদেরই মুখচ্ছবি যারা আমাদের অতি-নিকটের মানুষ—যারা আমাদের প্রতিবেশী আর প্রতিবেশিনী। অতি সাধারণ গৃহস্থঘরের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যে মহিমা আর যে ক্ষুদ্রতা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—আলো-ছায়ায় বিচিত্র হয়ে তারা প্রতিফলিত হয়েছে তার অনিন্দ্যসুন্দর সাহিত্যের অপরূপ দর্পণে। তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে কৃত্রিমতার নামগন্ধ নেই। তারা সবাই জীবন্ত—তাদের ভুলে যাবার উপায় নেই। ইন্দ্রনাথকে কখনো ভোলা যায়, না ভোলা যায় শ্রীকান্তকে? নিরীহ ভালো ছেলে বলতে যা বোঝায় তারই প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে পথের দাবীর অপূর্ব্ব পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকবে।

যারা দেখতে পারে—তারাই মানুষকে ভালোবাসতে পারে। শরৎচন্দ্র মানুষকে ভালোবেসেছিলেন—কারণ মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য তাঁর দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। মানুষের উপরটা দেখে তাকে যারা বিচার করে—তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত স্থূল; তাই তাদের বিচার প্রায়ই সুবিচার হয়নি। কাজের মধ্যে মানুষের যতটা প্রকাশ পায়—তার মধ্যে আসল মানুষটার পরিচয় অল্পই থাকে। আসল মানুষটা তার নিষ্কলঙ্ক রূপ নিয়ে লুকিয়ে থাকে ব্যবহারিক জগতের আটপৌরে ধূলি-কাদা-মাখা মানুষটার আড়ালে। যারা ভিতরের চোখ দিয়ে দেখতে পারে তাদেরই কবি-দৃষ্টির সামনে ফুটে ওঠে মানুষের অন্তরের প্রচ্ছন্ন মহিমা। শরৎচন্দ্র মাতাল দেবদাসের বাহিরের ঘৃণ্য রূপটার পিছনে দেখতে পেয়েছিলেন আর একজন দেবদাসকে যাকে স্পর্শ করতে পারে না পৃথিবীর কোনো মলিনতা। এই দৃষ্টি ছিল ব'লেই চরিত্রহীনা সাবিত্রীর অন্তরে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন কুমারী হৃদয়ের অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য আর মহিমা নেই কোথায়? কিন্তু তারা ধরা পড়ে কয়জনের দৃষ্টিতে? যাদের চোখে ধরা পড়ে—সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে তারা পৃথিবীকে পরিবেশন করে আলো। শরৎচন্দ্র বিশ্ব-সাহিত্যের আকাশে একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সন্দেহ নেই। তাঁর অমর সাহিত্যের চির অম্লান সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্রষ্টার গৌরব নিয়ে তিনি বেঁচে চির অম্লান সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্রষ্টার গৌরব নিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন—রসপিপাসু অগণিত চিত্তে বিশ্বজয়ী সম্রাটের মতো।

প্রতিভার বরপুত্রগণের বৈশিষ্ট্যকে আমরা আবিষ্কার ক'রতে পারি শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে। তিনি আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের অন্ধকারের মধ্যে এনেছিলেন সত্যের সুতীব্র আলো। মরিচা ধরা আদর্শের জীর্ণতাকে অতি নিষ্ঠুরভাবেই আঘাত দিয়েছেন তিনি। সেই আঘাত দিতে গিয়ে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীর নিক্ষিপ্ত শরজাল তাঁকে সইতে হয়েছে বিস্তর। কিন্তু ভাঙতে গিয়ে কোথাও তিনি সীমা অতিক্রম করেন নি। যেটুকু না ভাঙলে নয়—মাত্র সেইটুকুই তিনি ভেঙেছেন। বিদ্রোহী শরৎচন্দ্রের আড়ালে আমরা আবিষ্কার করি আর একজন শরৎচন্দ্রকে যিনি ছিলেন আদর্শ-বাদী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—যাঁর হাতে ছিলো ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ধ্বজা, কণ্ঠে ছিলো ভারতীয় আদর্শের জয়গান। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে শরৎচন্দ্র হয়েছেন নূতন বাঙলার স্রষ্টাদের অন্যতম। তাঁর সাহিত্যে পশ্চিমের সঙ্গে প্রাচ্যের সমন্বয় সাধনের ঐক্যতান।

অঘটন

(গল্প)

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

গৃহিণী গ্রহণে গঙ্গাস্নানে যাইবেন। যাইবেন পরমতীর্থ নবদ্বীপ ধামে।

গঙ্গা অবশ্য কলিকাতাতেও আছেন, থাকিবেনও; কিন্তু দেবী এখানে 'গেঁয়ো যোগী'—তাই কলিকাতাবাসীদের বিশেষ পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টায় কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ, অভাব-পক্ষে নবদ্বীপ ছুটিতে হয়।

নূতন পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়াই সর্ব্বজয়া একদিন সখেদে কাতরোক্তি করিলেন—"সংসারের গর্ত্তে" পচিয়া পচিয়াই অমূল্য মানব-জীবনটা তাঁহার বাজে খরচ হইয়া গেল। অতঃপর অন্য সব ভাগ্যবতী রমণীকুল যে কত তীর্থ, ধর্ম্ম, দান, পুণ্যের মূল্যে স্বর্গরাজ্যের ফার্ষ্টক্লাশ সিট অগ্রিম রিজার্ভ করিয়া রাখিতেছে, তাহারই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কর্ত্তার ভীতত্রস্ত অনিচ্ছুক শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া—উপসংহারে—"আমি এবার কাশী যাবোই—" বলিয়া সদর্পে প্রস্থান করিলেন। অবশেষে কর্ত্তার আপ্রাণ চেষ্টায় কাশী হইতে নবদ্বীপে রফা।

ইহারই জন্য আজ কয়দিন ধরিয়া সর্ব্বজয়ার চিন্তার অন্ত নাই।

'মাধি' চাকরাণী, 'ঝগড়ু' চাকর ও বধূ 'দেবী' তিনটিকেই তিনি সমান অপোগণ্ড বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহারা 'মানুষ' না হওয়া পর্য্যন্ত যে তাঁহার মরিয়াও স্বস্তি নাই, সে কথা বিধিমতে বুঝাইয়া দিবারও ত্রুটি করেন না।

শুনিয়া শুনিয়া দাসী-চাকরের কতটুকু কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারাই জানে—তবে বধূ বেচারার, যে দুই-এক আনা আত্মবিশ্বাস ছিল, ধুইয়া মুছিয়া ষোল আনাই অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী যখন বহুদিনের অব্যবহৃত সেমিজটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া গায়ে দিয়া ফরসা কালাপাড় শাড়ীখানি পরিয়া অনভ্যস্ত সাজে নিতান্তই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, বুকের ভিতরটা তাহার সত্যই 'দুড়দুড়' করিয়া উঠিল।

স্বস্তি সর্ব্বজয়ারও নাই, পরীক্ষার আগের রাত্রে—বার বার পড়া বইগুলোর উপর শেষবার চোখ বুলাইয়া লওয়ার মত গত কয়দিনের শতপ্রকার সাবধান বাণীগুলো আবার স্মরণ করাইয়া দিতে সুরু করিলেন।

তাঁহার একটি দিনের অনুপস্থিতির সুযোগেই কিছু না কিছু অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে, ইহাই বদ্ধমূল ধারণা।

কাজেই—সংসারে 'দৈবাৎ', 'আকস্মিক', 'সহসা', 'হঠাৎ' ইত্যাদি যতপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে, সব 'যদি'—করিয়া তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিতে দিতে তাঁহার গলা শুকাইয়াছে।

ওদিকে কর্ত্তার ধৈর্য্য শেষ সীমায় আসিয়া পোঁছিয়াছে। আর দেরী করিলে, ট্রেন পাওয়া অসম্ভব বলিয়া জোর তাড়া দিতেই সর্ব্বজয়া বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন—তুমি থামোতো বাবু অত তাড়া দিও না, সবটি গুছিয়ে না বলে গেলে চলবে? বৌমার তো যা হুঁস্—আমার আবার বেরোনো. হুঁঃ।

যেন কর্ত্তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই তাঁহাকে যাইতে হইতেছে।

—তা'হলে এই থাকলো বৌমা 'এ্যালমিলিয়ামের' কড়া, ছোট খুন্তি, সাঁড়াশি, ছিপ্টি গুছিয়ে রাখলাম।

দেখো বাছা সাবধান, হাত পা পুড়িও না, আমার যে কত জ্বালা, কত চিন্তে—নেপু বাড়ী এলেই দিও খাবারটুকু করে। 'এসটোভেই' করে নিও, উনুন জ্বালতে যেও না। সাতটা বাজবার আগেই খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিও, 'গেরোণ' লাগলে আর খেতে নেই জানোতো?

নেপুকে ত পই পই করে বলে দিলাম, বেলা থাকতে বাড়ী আসতে, এখন বাছাধন রাত না করেন।

বেশী কিছু ঝঞ্ঝাট ক'র না বৌমা, লুচি, আলু-পটল ভাজা, আর একটু আলুর দম। পাথর বাটীতে চাটনী ঢাকা থাকল দিও মনে করে—যে তোমার মন বাছা গপ্প করতে বসলে ত অজ্ঞান।

খাবার ঘরের তাকে মিষ্টি রেখে গেলাম—জল খেতে দিও আগে।

ঝগড়ু পোড়ারমুখো গেল কোথায়? এই যে—দাদাবাবু না আসা পর্য্যন্ত কোনখানে নড়বি না। মাধী গেলে দোর বন্ধ করবি ভাল করে।

কেউ কড়া নাড়লে সাড়া নিয়ে খুলবি বুঝলি? এসে যদি শুনি, দোর-তাড়া খুলে রেখে মন্দারাম চা খেতে আড্ডায় গিয়েছিলে, আস্ত রাখব না। বুঝলি!

বৌমা, তোমরা যখন চা খাবে রাক্ষসটাকে দিও একটু গিলতে—নইলে মরবে ছটফটিয়ে।

ওদিকে ছটফটানি ধরিয়াছে কর্ত্তার, গতিক দেখিয়া হতাশভাবে কহিলেন—ওই ক'র বসে বসে, গাড়ী আর পেয়েছ!

—নাঃ, পাবে না, অমনি আর কি। সর্ব্বস্ব এলিয়ে দিয়ে গেলেই হ'ল কি না? শুনলে ত সেদিন নেড়ীর মার বাড়ী—একদণ্ডের জন্যে কালীঘাটে গিয়েছে—আর কি কাণ্ড! —বৌমা ফেরিওলা-টোলা ডেক না বাছা।

বৌমা অবশ্য কোনদিনই ডাকে না—তবু সাবধানে ক্ষতি কি!

হ্যাঁ, দেখ বৌমা নেপুর আমার খাওয়ার কষ্ট হয় না যেন—লুচি ক'খানা ভেজো একটু লালচে করে—আলু ভাজা আমি যেমন মুড়মুড়ে করি, দেখেছ ত! তুমিও নিও ভাল করে। আর শোন—দেশ থেকে দৈবাৎ কেউ এসে পড়লে—যেন রাঁধতে ব'স না। তুমি ছেলেমানুষ—অতয় কাজ নেই—কর্ত্তা, পাকান চাদরখানি গলা হইতে খুলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন—দেশ থেকে যারা আসবে, তাদের জন্যে তুমিই বরং রাঁধতে ব'স, যাওয়া ত হচ্ছে না। খুঁজে খুঁজে দুশ্চিন্তা টেনে আনাকে বলিহারী দিই, আশ্চর্য্য।

—কেন আশ্চয্যি কি শুনি? সেবার—"চূড়োমণি যোগে"

দেশ ঝেঁটিয়ে এল না একপাল! তাদের ভাত-জল করতে আমারই যোগের চান মাথায় উঠল।

গাড়ী ছেড়ে দেবে—মগের মুলুক আর কি! টিকিট কেনা রয়েছে না! নাও এগোও, দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

নেপুটা আবার কখন আসবে জানি না; সাতটায় 'গেরোন' লাগবে। আবার গজগজ করছো! এই ত বেরোলাম বাবু—দুগ্‌গা।

ইহার পর বধূর আর সুদীর্ঘ দিনটা পড়া, সেলাই, ঘুম, কোনটাই ধরিবার সাহস হয় নাই।

তিনটাতেই বেহুঁস হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

ছাদে বারান্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘর ঝাড়িয়া দুপুরটা কাবার করিল এবং কলে জল আসিতে গা ধুইয়া লইয়া কেশের বিশেষ পারিপাট্য সাধন করিয়া আলমারী হইতে একখানি রঙিন শাড়ী বাহির করিয়া পরিল।

সর্ব্বজয়ার আশংকা অমূলক, মাতৃভক্ত নেপু, মাতৃ আজ্ঞা রক্ষা করিতে বেলা পাঁচটা বাজিবার অনেক আগেই আসিয়া হাজির হইয়াছে।

দেখা গেল, দালানের একপাশে নেপু স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়াছে। জানলার সামনে বেতের মোড়া পাতিয়া দেবী বসিয়া।

রঙিন শাড়ীতে ও উজ্জ্বল মুখে পড়ন্ত বেলার আভা পড়িয়া ভারী সুন্দর দেখাইতেছে।

কাব্যের ছন্দ পতনের মত বেকুব 'ঝগড়ু'টা একপাশে—ঘরোয়া কথায় যাহাকে 'হাঁ করিয়া' থাকা বলে সেইভাবে দাঁড়াইয়া।

গরম জলের কেটলী নামাইয়া স্টোভ নিভাইতেই দেবী চমকিয়া কহিল—ওই যাঃ—নিভিয়ে দিলে! আমি রান্না করব যে—

রান্না করবে! স্টোভে কেন? তুমি এখন ওই করবে বসে বসে, বা রে!

বসে বসে আবার কি, দু'জনের মতন খাবার করে নেব শুধু—

আর ঝগড়ু।

ও হোটেলে খাবে মা পয়সা দিয়ে গেছেন।

গুড্, তবে আবার রান্নার কি দরকার? 'আর কিছু' খেয়ে পেট ভরে না ?

আঃ, কি হচ্ছে—দেখছ ভূতটার নড়বার নাম নেই?

কি নীরেট বাস্তবিক, কিন্তু ওটাকে সরাবার চেষ্টা দেখলে হয় না?

—কি করে শুনি! ভারী কৌতুক অনুভব করে দেবী।।

কেন খেতে চলে যাক না—সাতটার আগে নাকি বলছিলে যে—

হ্যাঁ খোট্টাদের আবার বিচার, তা ছাড়া মোটে পাঁচটা বেজেছে।

তা'তে কি—এই ঝগড়ু, ইধার আও।

যদিও সর্ব্বজয়ার কবলে পড়িয়া ঝগড়ু প্রায় বাঙলা-নবীশ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি নেপু হাত, মুখ ও নিজকৃত বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষার সাহায্যে তাহাকে প্রাঞ্জল বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে—ইহার পর অধিক বিলম্ব করিলে হোটেলে চাবি পড়িবে—কারণ আজিকার দিনে শুধু তামাসা দেখিতেই ঘাটে দশ লক্ষ লোক জমা হইয়াছে।

তা' ছাড়া যাহারা স্নান-পুণ্য করিতে গিয়াছে, তাহারা দুই হাতে সোনা-রূপা ছড়াইতেছে, পথের লোক—কুড়াইয়া শেষ করিতে পারিতেছে না।

বিনা আয়াসে লাভবান হইবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

ঝগড়ুকে অত বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল না—সে নিজেই বাহিরে যাইবার সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। আদেশ পাইয়া এক নিশ্বাসে এক গ্লাস ফুটন্ত চা গিলিয়া দাদাবাবু প্রদত্ত একটি দেড়ামাপের কোট ও সুদৃশ নাগরা জোড়াটি পরিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুয়ারে খিল দিয়া আসিয়া দেবী ত হাসিয়াই আকুল, বলে, হ'ল ত আপদের শান্তি, এইবার কি করবে শুনি!

—সে শুনলে তুমি বিস্মিত, স্তম্ভিত, উল্লসিত, পুলকিত হয়ে উঠবে।

কপট বিস্ময়ে দুই চোখ বড় বড় করিয়া দেবী বলে—তাই ত শেষ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব না ত!

—সে তুমি জান—নেপু পকেট হইতে দুইখানি টিকিট বাহির করিয়া দেখায়—মেট্রোর।

পুলকিত না হইয়া উপায় আছে কিছু! দেবী ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লয় টিকিট দুইখানা—ওমা সত্যি তাই বুঝি! তুমি কী ভাল।

কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ণিমা চাঁদে মেঘ ভাসিয়া আসে—বেশ দিনে আনলেন—বাড়ীতে কেউ নেই বেরুন হবে কি করে!

বাড়ীতে সব্বাই থাকলেই খুব সুবিধে বে'রুনোর কেমন! নেপু মুখ টিপিয়া হাসে।

ঘরের কথা প্রকাশ করিলে নিন্দার মত শোনায়—সুবিধার সত্যই অভাব।

নেপুর মা অমন 'দুইজনে একলা একলা' হুট হুট করিয়া বেড়ান পছন্দ করেন না। গুরুজনের সামনে একটু ভব্যতা, সভ্যতা থাকা উচিত। যাক না দিন কতক, দুই চারিটি কাচ্চা-বাচ্চার মা হউক, তখন আর চোখে খারাপ ঠেকিবে না। সখ, সাধ ত পলাইতেছে না। আজকালকার ছেলে হইলে হয় কি নেপু বড় মুখচোরা।

তা' নেপুর মা'ইকি তেমন বেয়াক্কেলে—মেয়েরা, শ্বশুড়-বাড়ী হইতে আসিলে, নিজেই তিনি বধূ, কন্যা, নাতি-নাতিনীদের এখানে-ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বাহন অবশ্য নেপুই।

দুইজনে একলা বেড়াইবার সাধ দেবীর বিলক্ষণ আছে—তবে প্রকাশ করিবার সাহস হয় না।

তা' হলে বড় তালাচাবি বার কর একটা—দরজায় দিয়ে যেতে হবেত—নেপু তাড়া দেয়—আর কিন্তু সময় নেই মোটে।

আচ্ছা, ঝগড়ুকে তাড়ালে কেন! বাড়ী আগলাতো বসে।

তোমার যে বুদ্ধি—বাড়ী আগলাক্ আর সব রহস্য প্রকাশ করে দিক।

তাও বটে।

—আর দেখ খুব ভাল করে সাজ-টাজ করে নাও—খুব স্মার্ট দেখায় যাতে।

দেবী হাসিয়া ফেলে—আর নিজে!

আমি! আমি ত বাহন মাত্র, দেবী মূর্ত্তি নিয়েই লোকের ভাবনা—বাহনের জন্যে কে মাথা ঘামায়!

স্তব স্তুতিতে সুপ্রসন্ন হ'ন না এমন দেবী স্বর্গেই বিরল তা মর্ত্তে—প্রসন্ন হাসি হাসিয়া দেবী বলে—তা ত বেশ কথা—কিন্তু রান্না হ'ল না যে!

ধ্যেৎতারি রান্নার নিকুচি করেছে। পথে বেরলে আবার খাওয়ার ভাবনা—ফারপোয় খাইয়ে আনব তোমায় চল।

তখন যে গ্রহণ লেগে যাবে চাঁদে—দেবী মনে পড়াইয়া দেয়।

নেপু মাথা নাড়িয়া বলে—উহুঃ, আমার আকাশে চির পূর্ণিমা, গ্রহণ লাগে না।

ভারী কবিত্ব শিখেছেন—দেবী ছুটিয়া পলায়।

তা' ঘোমটা টানিয়া থাকে বলিয়া দেবী জড়সড় মেয় নয়, সাজিয়া আসিয়াছে চমৎকার।

হাইহিল সু ও হাইকলার ব্লাউসের সঙ্গে ম্যাচ করিয়া পরা বরোদা শাড়ীতে বাস্তবিকই ভারী সুন্দর ও স্মার্ট দেখাইতেছে তাহাকে।

আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে—বলিয়া ব্যস্ত নেপু সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে একটু আবেগ প্রকাশ না করিয়া পারে না।

থাকগে—আর যায় না—চল দু'জনে ছাদে বসিগে—এত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়, পথে বার করার সাহস হচ্ছে না।

তাই বলিয়া দেবীর এত কবিত্ব নাই যে, অত সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হইবার মুখে ফিরিয়া গিয়া ছাদে বসিবে।

ঝঙ্কার দিয়া বলে—আহা সঙ্গে থাকবেন, তাও সাহস হচ্ছে না? ডাকাতী করবে লোকে, কেমন?

আশ্চর্য্য নয়,—নেপু যেন হতাশভাবে বলে—নাও চল—নেহাৎ যখন একলা আমায় দেখিয়ে তৃপ্তি হবে না তোমার।

রাত্র দুইটা—গ্রহণ অনেকক্ষণ ছাড়িয়াছে, বিছানায় চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। ঘড়ির শব্দে চমকিয়া দেবী বলে—ও কি দু'টা বাজল কেন? এর মানে!

নেপু নিশ্চিন্ত স্বরে বলে—মানে কিছুই নয়—প্রতি ষাটটি মিনিট অন্তর মানুষকে একবার করে সচেতন করে দেওয়া ওর ডিউটী।

—কিন্তু আর সব কখন বাজল? শুনতে পেলাম না!

—তুমি যখন গান গাইছিলে, তখন বারটা বেজেছে—সত্যি এমন মিষ্টি গলা তোমার—কিন্তু একটি গান কখনও শুনতে পাই না।

সে খেদ অবশ্য দেবীর মনে বিলক্ষণই আছে—বিবাহ-কালে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা একটি বিশেষ গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই সে গুণের সদ্ব্যবহারের আবশ্যকতা কেহ অনুভব করে না। কিন্তু সে কথা খুলিয়া বলিতে গেলে, গুরুজনের নিন্দা আসিয়া পড়ে—তাই হাসিয়া বলে—ভালই ত, নিত্যি শুনলে অরুচি ধরে যেত। কিন্তু এইবার কাপড়-চোপড়গুলো বদলাই! সারা রাত সিল্কের শাড়ী পরে বসে থাকব না কি সং সেজে! ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে দিতে হবে জান ত—মা নেই—তোমার অফিসের ভাত।

কর্ত্তা গৃহিণী যখন আসিয়া পৌঁছিলেন—দেবী স্নান সারিয়া রান্না চাপাইয়াছে—নেপু রান্নাঘরের সামনে রোয়াকে কামাইবার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছে—এবং ঝগড়ু বেচারা গত রাত্রে সোনা-রুপা ত দূরের কথা—একটি তামার পাই পয়সা পর্য্যন্ত কুড়াইয়া না পাওয়ার দুঃখে বিরস-ম্লান মুখে বাহির দুয়ারে মাথা হেলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই কহিলেন—কিরে খবর সব ভাল ত! ঝগড়ু মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

—আকাটের মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ, হতভাগার যেন সব বিটকেল—বলিয়া কর্ত্রীত্বের বিরাট মহিমার সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করিয়া দিবার জন্যই বোধ করি, উঠানে অবস্থিত 'মাধী'কে একপালা অহেতুক তিরস্কার করিয়া লইয়া রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নেপু অবশ্য চম্পট দিয়াছে—একদিকের সকণ্টকিত গণ্ড লইয়া।

দেবী সন্ত্রস্তদৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছে, কোনখানে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে কি না।

সর্ব্বজয়া সস্মিতবচনে বলেন—এই যে রান্না চড়েছে বৌমা—নাও বেরিয়ে এস আমি যাচ্ছি।

দেবী ব্যস্ত হইয়া বলে—এখুনি আপনি ঢুকবেন কেন মা—কাপড়-চোপড় ছাড়ুন, স্নান করুন!

না বাছা, চান আর করছি না—রাত বারটা অবধি গলা-ভোর জলে—মা গঙ্গা এখন মাথায়—তসরখানা পরে এই এলাম বলে—আমি বলে হুড়মুড় করে আসছি—এখন ত টেরেন নেই, যাত্রীর ভীড় দেখে 'পেশাল' না কি একখানা দিয়েছে, তাতেই চলে এলাম। তুমি ছেলেমানুষ, একলা রয়েছ, আমার কি স্বস্তি আছে!

তিনি ব্যতীত একদিনের জন্যও অপর কাহারও দ্বারা সংসার রথের চাকাখানি চলতে পারে এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য।

উপর হইতে তসর কাপড়টি পরিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে সর্ব্বজয়া হৈ হৈ করিতে থাকেন—হ্যাঁ গা বৌমা, ই কি কান্ড, যেখানকার যা ছিষ্টি পড়ে—রাঁধওনি, খাওনি, কি হয়েছিল কাল! তাকের ওপর মিষ্টিটুকু পর্য্যন্ত ঢাকা রয়েছে, (দেবী অলক্ষিতে জিভ্ কাটে) ব্যাপার কি গো!

কলিকালে না কি ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে—খুব মিথ্যাও নয় কথাটা—নেপু যেন এইমাত্র মায়ের সাড়া পাইল—তোয়ালে হাতে বাহির হইয়া বলে, মা এলে না কি—কেমন পুণ্যি-টুন্যি করলে! খুব ভীড় হয়েছিল ত—!

(শেষাংশ ৩৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হিন্দু সমাজের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

কাশীর ডাক্তার ভগবানদাস ভারতবিখ্যাত মনীষী। ভারতের বাহিরেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার খ্যাতি বিস্তৃত। সম্প্রতি তিনি হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত বিবৃত করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা লইয়া কোন আলোচনা হয় নাই। ডাঃ ভগবানদাস হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে পত্রখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের মতে, হিন্দু সমাজের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তির এই পত্র পাঠ ও উহা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ডাঃ ভগবানদাস তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভূয়োদর্শনের সাহায্যে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সমাধানের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ডাঃ ভগবানদাসের পত্র ও তাঁহার সিদ্ধান্ত লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ডাঃ ভগবানদাস বলিতেছেন,—একতাই যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন—এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। হিন্দু সমাজের দৌর্ব্বল্য ও শক্তিহীনতার প্রধান কারণই একতার অভাব, ইহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি এবং প্রকাশ্যে সেই অভিমত প্রকাশও করিতেছি। কিন্তু what is the secret of achieving this unity?—এই একতা লাভের গুপ্ত রহস্য কি? যদি আমরা সেই রহস্যের সন্ধান করিতে পারি, তবে হিন্দু সমাজের অন্যান্য সমস্যার আপনা হইতেই সমাধান হইবে। কিন্তু একতালাভের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পাইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন—এই অনৈক্যের কারণ কি? কেননা, ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিতে না পারিলে উহার চিকিৎসা করা সম্ভবপর নহে। "বিশাল হিন্দু সম্প্রদায়", "সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু"—এই সব কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই সব কথার কোন অর্থ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন যে, ভারতে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাত্র কাগজে-কলমে নিবদ্ধ (Paper majority)। ইহার কারণ কি? ভারতের ২৭ কোটি হিন্দু যে প্রকৃতপক্ষে একটা সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায় নহে, তাহার মূল রহস্য কোথায়? হিন্দুজাতি এবং হিন্দুত্বকে রক্ষা করিবার জন্য আজ কেন আমরা চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছি? কিন্তু ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা একশত হইতে শতকরা ৬৫তে কেন নামিয়া আসিয়াছে? বাঙলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা যে শতকরা ৪৫-এ দাঁড়াইয়াছে, তাহারই বা কারণ কি? ইহার জন্য কি অন্যেরা দায়ী? না, হিন্দুদের নিজের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে? হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভেদের অত্যাচার, হিন্দুদের স্বধর্ম্মচ্যুতি, কুসংস্কারের প্রাবল্য—এই সবের মূলে কি তাহাদের অধঃপতনের কারণ নিহিত নাই? যদি আমরা এই দুর্গতি ও অধঃপতনের মূল কারণ নির্ণয় করিতে না পারি, তবে সভা, সমিতি, সম্মিলন প্রভৃতি করিয়া কোনই ফল হইবে না।

ডাঃ ভগবানদাস বলিয়াছেন, আমি বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতিই হিন্দুদের বর্ত্তমান দুর্গতির মূল। এই বিকৃতির জন্যই হিন্দুসমাজ আজ আর একটি সঙ্ঘবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নহে,—বহু বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমষ্টিমাত্র। গত আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুসারে এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির সংখ্যা দুই হাজার হইতে তিন হাজার পর্য্যন্ত হইবে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পরস্পরের "অস্পৃশ্য", পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন, এমন কি অনেক স্থলে পরস্পরের পরিপন্থী। জাতি, উপজাতি, শাখাজাতি এইভাবে হিন্দুসমাজ ক্রমাগত বিভক্ত, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতির ফলেই ৭।৮ কোটি লোক অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য, তাহারা হিন্দু সমাজের মধ্যে নামে মাত্র আছে। আরও ৭।৮ কোটি লোক হিন্দুসমাজ হইতে বাহির হইয়া গিয়া মুসলমান হইয়াছে এবং কয়েক কোটি খৃষ্টান হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহার মধ্যে কিছুমাত্র কল্পনা নাই, সমস্তই নিষ্ঠুর সত্য। যাঁহারা হিন্দু সমাজের দুর্গতির কথা চিন্তা করিতেছেন, তজ্জন্য উদ্বেগ বোধ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ডাঃ ভগবানদাস জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কেন এমন হইল? যদি ইহা হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতির ফল না হয়, তবে উহার অন্য কি কারণ হইতে পারে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,—তৃতীয়পক্ষের প্ররোচনা ও প্রচারের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই যদি ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা না থাকিবে, তবে 'তৃতীয়পক্ষ' তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে কেন? সুতরাং 'তৃতীয় পক্ষের' স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। নিজেদের সমাজদেহেই যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—অন্যথা আসন্ন ধ্বংস হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই।

ডাঃ ভগবানদাস লিখিয়াছেন,—"আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—হিন্দু সমাজের এই অনৈক্য, বিশৃঙ্খলতা এবং সঙ্ঘশক্তিহীনতার কারণ কি? তাহা হইলে আমি দ্বিধাহীনচিত্তে উত্তর দিব—প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া জাতিভেদে পরিণত করাই ইহার কারণ।" প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগ বা জীবিকাবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; যে যে-কার্য্যের যোগ্য, তাহাকে সেই কার্য্যের অধিকার দেওয়া হইত। উহা সব সময়ে বংশানুক্রমিক হইত না, অন্ততপক্ষে সেরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কিন্তু উহাই কালক্রমে বিকৃত হইয়া 'জাতিভেদে' পরিণত হইল, কর্ম্ম বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইল, স্বাভাবিক যোগ্যতা বা গুণের আর কোন মর্য্যাদা রহিল না। কোন ব্রাহ্মণ-বংশজাত যতই মূর্খ হউক

না কেন, বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ, পৌরোহিত্যের অধিকার সে পাইবে-ই। ক্ষত্রিয়ের পুত্র কাপুরুষ ও দুর্ব্বল হইলেও যুদ্ধই হইবে তাহার মৌলিক বৃত্তি, বাণিজ্য-বুদ্ধি না থাকিলেও বৈশ্য-পুত্রকেই করিতে হইবে শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ। এইভাবে—(১) বিভিন্ন বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বংশানুক্রমিক প্রথার মধ্য দিয়া বহু স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের মধ্যে এই সব 'স্বতন্ত্র জাতির' সংখ্যা প্রায়—তিন হাজার। (২) এই সব জাতি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন। (৩) প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্বতন্ত্র স্বার্থবোধের সৃষ্টি হইল, আর তথাকথিত উচ্চ জাতিরা সেই সুযোগে যতদূর সম্ভব সুখ-সুবিধা-অধিকার নিজেরাই হস্তগত করিলেন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ ত্যাগ করিলেন। (৪) ঐশ্বর্য্য, শাসনক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব, এমন কি, বিদ্যা পর্য্যন্ত কতকগুলি মুষ্টিমেয় বংশের মধ্যে নিবদ্ধ হইল। (৫) এই সব সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে যোগ্য লোকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল এবং অযোগ্যের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, কেন না যোগ্যতালাভের জন্য তাহাদের কোন প্রয়োজন বা উৎসাহ ছিল না, অযোগ্যতার জন্যও তাহাদিগকে কোন শাস্তিভোগ করিতে হইত না (৬) ইহার ফলে সমাজে ক্রমেই অযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং সমষ্টিগত-ভাবে সমাজজীবন অধিকতর বিশৃঙ্খল ও সঙ্ঘশক্তিহীন হইতে লাগিল। (৭) দম্ভ, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, লোভ, বিদ্বেষ, কাপুরুষতা প্রভৃতি পাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। (৮) তথা-কথিত উচ্চ জাতিরা তথাকথিত নিম্ন জাতিদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, অবনত এবং বাধ্য রাখিবার জন্য তাহাদের মনে অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার সৃষ্টির সহায়তা করিতে লাগিল। (৯) সাধারণভাবে ভারতবাসী এবং বিশেষভাবে হিন্দুরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং বিদেশীরা আসিয়া ভেদনীতির সাহায্যে সহজেই তাহাদিগকে পদানত করিতে পারিল। (১০) বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ তথা সাধারণভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে যে অসন্তোষ, অশান্তি, বিদ্রোহভাব, পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ এবং বিপর্য্যয়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—ইহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা-সমূহেরই শেষ পরিণতি।

নিজেদের যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, যতদিন তাহারা নিজেদের এই সব দোষ বা অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে এবং উহার প্রতিকারে সঙ্কল্পবদ্ধ না হইবে, ততদিন হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়াই থাকিবে।

(ক্রমশ)

অঘটন

(৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

—তা' আর বলতে—লোকে লোকারণ্য, কে কার মাথায় পড়ে, কে কাকে মাড়িয়ে দেয়, এমনি অবস্থা—গৌর-গঙ্গা মাথায় থাকুন, অমন জায়গায় মানুষে যায়! কেবল সর্ব্বত্র পয়সা পয়সা—

সে যাকগে মরুকগে—তোদের কাল কি হয়েছিল? খাওয়া হয় নি! বৌমা বোধ হয় বেহুঁস হয়ে বসে গল্প করেছে? আর 'গেরোন' লেগে গেছে—তখনই জানি আমি—

নেপু অম্লানমুখে, অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিল—খাব কি মা? কাল কি সাঙ্ঘাতিক পেটের যন্ত্রণা—চাটুকু খেয়েই বাস—

রুদ্ধশ্বাসে জননী চোখ কপালে তুলিয়া ফেলেন—বলিস কি? কেন? সোণার শরীর কখনও কিছু হয় না—

কি জানি—হঠাৎ কি রকম—বললাম কত করে, রেঁধে-বেঁধে নিতে তা তোমার আদুরী বৌ নিজের জন্যে আর করে উঠতে পারলেন না। কথাগুলো একনিশ্বাসে সারিয়া লইয়া নেপু খসিয়া পড়ে।

সর্ব্বজয়া এতক্ষণে পায়ের নীচে মাটি পান; তাইত বলি—সব যেন শুকনো শুকনো মুখ, হ্যাঁ বৌমা তুমি এইস্ত্রি মানুষ রাত-উপোসী থাকলে কি বলে! বৌমা দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলে— হ্যাঁ একলার জন্যে আবার—আপনিও যেমন।

ইহার পর শত আপত্তি সত্ত্বেও নেপুকে পাতিনেবুর রস, নুন, যোয়ান ও টাইকোসোডা ট্যাবলেট খাইতে হয়, একটাও বাদ দেওয়া চলে না।

দেবীকেও এক রেকাবী খাবার লইয়া বসিতে হয় বৈকি। পুত্রবধূর মুখের কল্পিত শুষ্কতা লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজয়া ব্যস্ত হইয়া ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সখেদ কাতরোক্তি করিতে থাকেন—মরিয়াও স্বোয়াস্তি নাই তাঁহার—একবেলার জন্যে নড়িয়াছেন কি, একটা অঘটন ঘটিয়া বসিয়া আছে।

তাকের মিষ্টিটুকু পর্য্যন্ত পাড়িয়া খাইবার ক্ষমতা বৌয়ের নাই—এমন কপাল সর্ব্বজয়ার।

কিন্তু ইহার বিপরীতটা দেখিলেই কি খুসী হইতেন সর্ব্বজয়া! মুখ দেখিয়া ত মনে হয় না।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাসগুপ্ত

অরবিন্দের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই সতীশ যেন সমস্ত কিছু ভুলিয়া গেল। অনেকদিন সে তাহার সাহিত্যকে অপমান করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। আজ যেন অকস্মাৎ সমস্ত কিছু মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে নিজের কাছেই অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। যাহা সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে তাহা যে কেমন করিয়া একটি নারী গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। খাতা কলম লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। আর কোন কিছুই সে ভাবিবে না, ঠিক পূর্ব্বের মতই সে নিজের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে। কিন্তু তথাপি সে সম্পূর্ণরূপে সব কিছু ভুলিতে পারিতেছিল না, অলকার মুখ মাঝে মাঝে তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। উহার জন্য চিন্তার যেন অবধি নাই, উহাকে লইয়া কি যে করিবে তাহাও ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। যখন মন কতকটা স্থির হইত তখনই হয়ত' অলকা আসিয়া পড়িত, লেখা বন্ধ করিয়া তাহাকে স্নান করিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিতে এতটুকু ইতস্ততও করিত না। সতীশ মনে মনে বিরক্ত হইলেও না উঠিয়া পারিত না। এমনি করিয়া প্রতিদিনকার বিরক্তি জমিয়া উঠিয়া একদিন অনর্থপাত হইল।

সেদিন দরজা বন্ধ করিয়া সতীশ লিখিতে বসিয়াছিল, অলকাকে বিরক্ত করিতে দিবে না বলিয়াই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইল না, রোজকার মতই ঠিক সময়ে আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া অলকা দরজায় করাঘাত করিল। সতীশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু অলকাও ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে দরজায় অনবরত ঘা দিয়াই চলিল।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, আমাকে বিরক্ত ক'র না অলকা, দরজা বন্ধ দেখেই কি বুঝতে পার'না। বিরক্ত করা একটা স্বভাব হ'য়ে গেছে, আশ্চর্য্য।

অলকার মুখে কে যেন সজোরে আঘাত করিল, হাসি মুখে সে আসিয়াছিল কিন্তু এখন লজ্জার আর অবধি রহিল না। তথাপি সে একবার কি বলিতে গেল কিন্তু গলা দিয়া তাহার কোন শব্দই বাহির হইল না, ঠোঁট দুইটা একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আঘাত করিবার ইচ্ছা সতীশের আরও বাড়িয়া গেল। তেমনি রূঢ়ভাবেই সে বলিল, আমার জন্য ভাববার কোন কারণই তোমার নেই। আর আমি সময় নষ্ট ক'রতে চাইনা, তোমার জন্য আমার অনেক সময়ই গেছে, যাও। সতীশ পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া লিখিতে বসিল, কিন্তু আর লিখিতে পারিল না। সে যে কোন অন্যায়ই করে নাই তাহা বুঝাইবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিল, নিজেকে বুঝাইতে তাহার এতটুকু দেরীও হইল না। চুপ করিয়া খাতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে যেন লেখার কথাই ভাবিতে লাগিল কিন্তু মন তাহার সেখানে ছিল না, কোথায় যে ছিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার চক্ষের সম্মুখে খোলা খাতাটার লেখাগুলি যেন একাকার হইয়া গিয়াছিল, একটা বিরাট শূন্যতা যেন তাহার মনকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়াছিল। কলম তেমনই খোলাই পড়িয়া রহিল, সে না পারিল লিখিতে না পারিল উঠিয়া যাইতে। স্তব্ধ হইয়া সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দরজা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অলকার চক্ষু ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এমনি করিয়া কেহ তাহাকে কোনদিন অপমান করে নাই। চোখের জল মুছিয়া সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন কিছুই আর যেন তাহার নজরে পড়িতেছিল না, সমস্ত আশ্রয়ই যেন তাহার কাহার একটা আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আর কোন অবলম্বনই তাহার নাই। আবার চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। চক্ষু মুছিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর জগদীশ আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। অলকাকে অমনি করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া চোখে মুখে একটা মমতার ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া সে ডাকিল, ঘুমচ্ছেন নাকি বৌদি?

অলকা চমকাইয়া উঠিল, নিজেকে সংযত করিয়া সে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, না ঘুমইনি, আপনি এরই মধ্যে যে?

জগদীশ এতটুকু শব্দ না করিয়া হাসিয়া বলিল, ও ঘর ত' দেখলুম বন্ধ, তাই আপনাকে খুঁজে বার করলুম, আর দরকারটাও আপনার সঙ্গেই যে।

অলকা মৃদুস্বরে বলিল, কি বলুন?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, আপনার স্বামীর সম্বন্ধেই কয়েকটা কথা আপনাকে ব'লতে চাই। কিন্তু তার আগে বলুন ত' কি হ'য়েছে আজ, আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে পারেন। অবিশ্বাস ক'রবার কোন কিছুই ত' আমি কোনদিন করিনি বৌদি।

স্বামীর কথা শুনিয়া অলকার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, কতকটা ব্যস্ত হইয়াই সে বলিল, না অবিশ্বাস ক'রব কেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করি আপনাকে।

স্থির নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, সতীশ আপনাকে কোন কিছু ব'লেছে কি? আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনার চোখের জল শুকিয়ে গেলেও দাগ এখনও মিলায়নি।

অলকা কোন কথাই বলিতে পারিল না, আবার জল আসিয়া পড়িতে পারে এই ভয়েই সে তখন মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জগদীশ বলিল, বুঝেছি। আপনার স্বামীর খোঁজ আমি পেয়েছি, সেখানে এখন আপনি যখন খুসী যেতে পারেন। সে কথাই কাল ব'লেছিলুম সতীশকে, ও কিন্তু সেকথা আপনাকে জানাতে বারণ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আমিত' আর তা' পারিনা। আপনাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে ওর না থাকতে পারে কিন্তু আপনার স্বামী, সুধীরবাবুর কথা না ভাবলেও ত' চলে না। সতীশের মত আমি কঠিন নই, ও আপনাকে ছাড়তে চায় না কি জন্যে সে আমি জানি না, হয়ত' আপনার ভালর জন্যেই কিন্তু আপনার স্বামীই বা কি দোষ ক'রলে?

আজিকার অপমানের কারণ যেন অলকার কাছে জলের মত সহজ বোধগম্য হইয়া গেল। জগদীশ সত্য সত্যই সতীশকে কিছু জানাইয়াছে কি না সে প্রশ্নও তাহার মনের মধ্যে একবারের জন্যও উঠিল না। তাহার সমস্ত কথাই সে বিশ্বাস করিল। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আছেন তিনি, আমাকে নিয়ে যেতে পারেন এখনি সেখানে।

নিতান্ত অনাসক্ত ভাবে জগদীশ বলিল, সেত' কলকাতায় নয়, রেলে যেতে হয়। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, আপনার সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়া উচিত। আপনার স্বামী যে আমাদেরই মেসে কিছুদিন ছিলেন তা' জানতুম না। তিনি চলে যাবার পর তাঁর কাছে তাঁর কাকা এক চিঠি লেখেন। সে চিঠিটা কাল হঠাৎ ম্যানেজারের ঘরে পেয়েছি। অনেকদিন আগেকার চিঠি, আপনি হারিয়ে গেছেন ব'লে দুঃখ ক'রেছেন, আবার বিয়ে করবার জন্য উপদেশ আর অনুরোধও করেছেন। কি যে হয়েছে এতদিনে—। পকেট হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া সে অলকার হাতে দিল।

আকুল আগ্রহে অলকা চিঠিটা পড়িয়া ফেলিল, তারপর হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আমাকে যেতে হবে, আজই, এখুনি।

অতি সহজভাবেই জগদীশ বলিল, সতীশ কিন্তু কিছুতেই রাজী হবে না। আপনি সব কিছু জেনে ফেলেছেন বুঝতে পারলে ও আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবে না।

অলকা আগ্রহ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, বিরক্তভাবেই বলিল, তার সঙ্গে ত' আমার কোনই সম্পর্ক নেই জগদীশবাবু। তার কথা আমার না ভাবলেও চ'লবে।

জগদীশ বলিল, সতীশ আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজী হবে না।

অলকা বলিল, সে খবর জানবার আমার কোন দরকারই নেই। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা তুলিয়া জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি কি আমায় একটুও সাহায্য ক'রতে পারেন না?

জগদীশ নিতান্ত শান্তভাবেই বলিল, তা' আমি খুব পারি আর সাহায্য যদি না-ই করব' ত' সতীশের কথা অগ্রাহ্য ক'রেও সমস্ত খবর আপনাকে দেব কেন? তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া সে বলিল, উপায় মাত্র একটিই আছে বৌদি, আপনার গাড়ী ত' সন্ধ্যার আগে নেই, এ সময়টা যদি কোন পরিচিতের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারেন ত ভাল হয়, নইলে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অলকা বলিল, এখানে আমার আর এক মুহূর্ত্তও থাকবার ইচ্ছে নেই, পরিচিতও আমার কেউ নেই, আপনার ওখানে এসময়টুকু আমাকে থাকতে দিতে পারেন না?

জগদীশ বলিল, তা খুবই পারি বৌদি, কিন্তু সেখানে হয়ত' আপনার অসুবিধা হবে, আমার বাড়ীতে মেয়েলোক ত' কেউ নেই।

অলকা এইবার হাসিয়া বলিল, এখানেই বা সে-রকম কে আছে? চলুন, এখুনি আমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে চাই।

জগদীশ মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইয়া বলিল, আসুন, আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত আজ।

অলকা নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রয়োজন হইতে পারে জানিয়াও কোন কিছু স্পর্শও করিল না, সমস্ত কিছুই পড়িয়া রহিল। জগদীশের পিছনে পিছনে সে বাহির হইয়া গেল।

রামহরি বাড়ীতে ছিল না, সতীশও নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, তাই কেহই কিছু জানিতে পারিল না। জগদীশ যে আসিয়াছিল তাহাও সকলের অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

বড় রাস্তায় আসিয়া জগদীশ অলকাকে লইয়া একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। অলকা তখন নিজেকে হারাইয়া অল্প কয়েক ঘণ্টা পরের কথাই ভাবিতেছিল বোধ হয়,—তাহার স্বামী, একটি সুখী পরিবারের কথা স্পষ্ট হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া আসিতেছিল। সে অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াই জগদীশের মুখের রেখার পরিবর্ত্তন, তাহার চক্ষের ক্রূর হাসি তাহার নজরে পড়ে নাই।

গৃহে পেঁৗছিয়াই উপরের একটা ঘরে অলকাকে লইয়া গিয়া অদ্ভুত হাসি হাসিয়া জগদীশ বলিল, অনেক দিন পর আজ আমার জয় হ'ল, তাই সত্যি আমি নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অলকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তেমনি ভাবে হাসিয়াই জগদীশ বলিল, এই ঘরটাই অনেক দিন থেকে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, ঘরটার সৌভাগ্য আছে বলতে হবে।

অলকার যেন ভাল লাগিতেছিল না, ওই লোকটা যাহা বলিতেছে তাহার মধ্যে কেমন যেন একটা অমঙ্গলের চিহ্নই তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে একটু পিছাইয়া গেল।

জগদীশের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, নিজের মনের কথা সে আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। অলকার সম্মুখে আগাইয়া গিয়া সে বলিল, বুঝতে পারছ না, না? আমার কথায় একমুহূর্ত্তেই আশ্রয়দাত্রীকে অবিশ্বাস করে এসেছ, আমার বাকী কথাগুলোও বিশ্বাস করতে আপত্তি করলে কি চলে? বৌদির দিদিটুকু আজ থেকে খসে গেল অলকা। জগদীশ তীব্রভাবে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি শুনিয়া শয়তানও বোধ করি কাঁপিয়া ওঠে।

অলকা হাত দুইটা বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ভীতভাবে পিছাইয়া গেল, কি যেন বলিবার জন্য ঠোঁট দুইটা তাহার বার বার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই বোধ করি জগদীশ আবার তেমনি ভাবে হাসিয়া উঠিল।

পাকা শীকারীর মত শীকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জগদীশ বলিয়া চলিল, এখানে চীৎকার করলেও কেউ সাড়া দেবে না, আসে পাশে শিক্ষিত ব'লতে কেউ নেই, প্রতিদিনই এ বাড়ীতে যাদের নিয়ে আসি তাদের খবর ওরা জানে, তাই তোমার কথায় কেউ সাড়া দেবে না, কাঁচা ব'লে ওরা শুধু হাসবেই।

অলকা এইবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই, দয়া করুন জগদীশবাবু।

জগদীশ যেন তাহার কথা শোনেই নাই এমনি ভাবে বলিয়া চলিল, তোমার স্বামী আমাকে ভাল করেই চেনে, আমার কাছে তুমি ছিলে এ জানতে পারলেও সে আর তোমাকে নেবে না; আবার তোমাকে ফিরে আসতে হবে আমারই কাছে। ওসব ভুলে যাও অলকা। সতীশ ভীরু, ভাল মানুষ তাই তোমায় স্পর্শও করেনি, কিন্তু আমি সে দলের নই।

অলকা যেন হঠাৎ চাবুকের ঘা খাইয়া সোজা হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু তাহার জ্বলিয়া উঠিল, অকস্মাৎ পাগলের মত জগদীশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিল। জগদীশ নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি অলকা তাহাকে ছাড়িল না। আকস্মিক আক্রমণে আঘাত পাইয়া জগদীশের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, কোন কিছু করিবারই সামর্থ্য তাহার ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অলকা হাঁপাইয়া পড়িল, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পিছাইয়া আসিয়া সে উত্তেজনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সেই অবসরে জগদীশ বাহিরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, আচ্ছা রাত্রেই দেখা যাবে। দু'দিন পরেই স্বীকার করতে হবে তবু—।

এতক্ষণের সমস্ত উত্তেজনা ভাসিয়া গেল, নিতান্ত অসহায়ের মত চক্ষে অঞ্চল দিয়া অলকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরের দিন খুব ভোরে প্রতুল আর সতীশ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসিয়া প্রতুল সতীশ আর অলকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সতীশের নিকট অলকার গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মুখের হাসি কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি কেহই ঘুমাইতে পারে নাই, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কোন একটা মীমাংসায় পেঁৗছিবার জন্য তাহারা আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু কোন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। চুপ করিয়া ভাবিয়াও বিশেষ কোন কারণই তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

সতীশ প্রতুলের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না, সমস্ত ঘটনার জন্য নিজেকেই তাহার দোষী বলিয়া মনে হইতেছিল, কোনও মতে গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, আশ্চর্য্য প্রতুল, এতদিন তাকে কাছে রাখতে পারলুম আর আজ এই সময়ে সুধীরবাবুর খোঁজ পেয়েও তাকে পেঁৗছে দেবার কোন সুবিধেই আমাদের হাতে নেই।

প্রতুল বলিল, আরও কিছুদিন আগে তোমাকে খবর দিতে পারতুম, কিন্তু সেটা খুব দরকার মনে করিনি তখন, দেখছি

এসব কাজও ঠিক সময়ে করতে হয়, নইলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

সম্মুখের দিকে অন্যমনস্কের মত চাহিয়া থাকিয়া সতীশ বলিল, আমার দোষেই সব ঘটেছে সে আমি জানি, কিন্তু এতবড় শাস্তির কথাও যে ভাবতে পারি না। ক্ষমা চেয়ে নেবারও বোধ হয় আর আমার কোন পথই রইল না।

প্রতুল একথার কোন জবাবই দিল না, ঠিক এই কথা সতীশ বহুবার বলিয়াছে। তাহার মনে যে আঘাতটা অত্যন্ত গভীর ভাবেই কাটিয়া বসিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না।

তাহাদের দুইজনকে বিস্মিত চমকিত করিয়া ঠিক সেই সময়ে ঝড়ের বেগে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল অলকা।

সতীশ বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, অলকা!

অলকা হাঁপাইতেছিল, কথা বলিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল না। প্রতুল যে কুশনটায় বসিয়াছিল, তাহারই একধারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে চক্ষু ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রতুলের মুখের উপর দিয়া একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল, অলকার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সে সস্নেহে বলিল, এই ত বেশ হয়েছে দিদি, শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই শাস্তি নিয়ে বসে আছেন, এদেশের মেয়েদের এ দুর্ব্বলতা আজও গেল না, বড়ই লজ্জার কথা নয়?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া নিজেকে সংযত করিয়া অলকা বলিল, শাস্তি দিতে গিয়েই শুধু নয় প্রতুলদা, অবিশ্বাস ক'রে। জগদীশবাবুর কথায় সতীশবাবুকে অবিশ্বাস করে তার সঙ্গে গিয়েছিলুম, আমার স্বামীর খোঁজ নাকি তিনি জানতেন, তাই শাস্তি পেয়েছি—আপনাদের বন্ধু বোধ হয় এখনও অজ্ঞান হয়েই পড়ে আছে। আশ্চর্য প্রতুলদা, ওর মত নীচ লোক এ বাড়ীতে আসবার সুবিধে পেল কি করে ব'লতে পারেন।

অলকা ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। কেমন করিয়া গভীর রাত্রে মত্ত অবস্থায় জগদীশ তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে অচেতন করিয়া সে তাহাকে সেই ঘরেই বন্ধ করিয়া রাখিয়া সমস্ত রাত্রি সেই বাড়ীতেই কাটাইয়া খুব ভোরে নিঃশব্দে ঘরটা খুলিয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ী ডাকিয়া এই ঠিকানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কোন কিছুই সে গোপন করিল না।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তবে আরও শাস্তি দেওয়া উচিত, আমি চললুম প্রতুল। প্রতুল হাসিয়া বলিল, লাভের চেয়ে ক্ষতিই তাতে বেশী হবে। যে শাস্তি দিদি নিজের হাতেই তাকে দিয়ে এসেছে সেই হয়েছে ভাল। তারপর অলকার দিকে চাহিয়া জোর করিয়া তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া সে হাসিয়া বলিল, সারা রাতই ত' বসে কাটিয়েছি দিদি, এবার একটু চা পেলে কি রকম হয় বুঝতেই পারছেন। পনের মিনিট সময় দিলুম, এ কাজটা করা হয়ে গেলে আমরাও একটা আনন্দের সংবাদ দেব।

অলকাও এইবার না হাসিয়া পারিল না, যাইতে যাইতে সে বলিয়া গেল, ভাগ্যে আপনি আজ এসেছিলেন প্রতুলদা, নইলে যে অপমান আমি সতীশবাবুকে করেছি তারপর তাঁর মুখের দিকে চাইতেও আমি লজ্জায় মরে যেতুম। এখন আশা হচ্ছে হয়ত তিনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

সতীশকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই অলকা চলিয়া গেল।

রামহরি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কোন কথাই কহে নাই। গতকল্যকার অবসাদের পর আজ যেন তাহাকে পাইয়া তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তাহারই সাহায্যে দশ মিনিটের মধ্যেই চা আর খাবার লইয়া অলকা উপরে উঠিয়া গেল।

তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে প্রতুল বলিল, মেয়েরা আমাদের আশ্চর্য্য করে দিলে দেখছি, গুছিয়ে চলবার কি যে অদ্ভুত একটা পথই আপনারা আবিষ্কার করেছেন তা' ভেবে আমরা শুধু অবাক হয়েই যাই, অথচ আপনাদের পক্ষে এটা কতই না সহজ।

অলকা হাসিয়া বলিল, কি একটা সুখবর দেবেন বলেছিলেন যে?

প্রতুল বলিল, আপনার স্বামীর খোঁজ আমরা পেয়ে গেছি। প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, হয়ত আজই তিনি এসে পরতে পারেন।

অলকার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। যে আশ্রয়কে ছাড়িতে গতকল্য সে আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, সেই আশ্রয়কেই সে যেন আজ আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিল। তাহার একান্ত আপনার জন তাহাকে লইতে আসিতেছে, হয়ত বা আজিও আসিতে পারে, মনে করিয়াও সে এতটুকু আনন্দিত হইতে পারিতেছিল না। তথাপি ইহাদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিবার লজ্জা হইতে সে বাঁচিতে চায়। তাই অতি কষ্টে ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল, সেই ত' ভাল প্রতুলদা, আপনারাও তাতে বাঁচেন।

সতীশ অন্যমনস্কের মত বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রতুল বলিল, হয়ত ভাল দিদি, কিন্তু আমার তাতে সুবিধে নেই, রামহরি ত' আপনার মত গুছিয়ে দিতে জানে না। বাঁচার কথা যদি বলেন ত' সে-সব সতীশের সম্বন্ধে খাটে, বাঁচা না বাঁচা ওর হাত।

রামহরি জানাইয়া গেল যে, দুইটি বাবু আসিতেছেন।

সতীশ অলকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, অলকার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

প্রতুল আপন মনেই হাসিয়া বলিল, অক্ষয় তা'হলে সঙ্গেই আছেন। এক একটা লোক ঠিক এমনি থাকে যাদের মতের দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গে একজন না থাকলে পথ চলতেই পারে না। অক্ষয় মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন ভাল।

অলকার পা উঠিতেছিল না, তথাপি একবার সতীশের দিকে চাহিয়া জোর করিয়া সে কম্পিত বক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতুল বলিল, থেকেই যান না দিদি, এ তাঁরাই, আমি জানি।

অলকা তাহার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত ঘরটাই যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের দুইটি লোকই যেন কি এক চিন্তায় গভীরভাবে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাইতেছিল। দেয়ালে ঘড়ি নাই যে টিক্ টিক্ করিবে, আর কোন শব্দই কোন দিকে নাই, সমস্তই যেন মরিয়া গেছে অথবা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, প্রতুল মাথা নাড়িয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, অদ্ভুত।

সুধীর এবং অক্ষয় ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

প্রতুলকে দেখিয়াই সুধীর বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, এ কি হেমন্ত বাবু যে? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বুঝেছি, আপনি এর মধ্যে আছেন বলেই আমরা আজ এখানে আসতে পেরেছি।

সতীশ সুধীরের এবং প্রতুলের মুখের দিকে বার কয়েক চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, হেমন্ত? সে আবার কে?

হাসিয়া প্রতুল বলিল, ও কিছু নয়, নামটা শুধু ডাকবার সুবিধের জন্যই রাখা হয়। একটা কিছু হলেই হ'ল। কোথাও বা হেমন্ত, কোথাও বা প্রতুল—আসলে লোক কিন্তু একই। যাক্‌গে শেষ পর্য্যন্ত আপনার কাজ ত' সফল হ'লই।

সুধীর সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ শুধু আপনার জন্যেই সফল হ'ল হেমন্তবাবু, আপনি মাঝে এসে না পড়লে কি যে হ'ত!

প্রতুল বলিল, এখানে হেমন্ত নাম অচল, প্রতুল বলেই ডাকবেন।

সুধীর সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা' হয় না, আমার কাছে ও নামটাই মূল্যবান।

প্রতুল হাসিল, কোন কথাই বলিল না। মানুষের মনের ভিতরে যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম তার রহিয়াছে তাহা সে জানে, ইহাও যে তেমনি একটিতে মৃদু ঝঙ্কারের ফল তাহা বুঝিতে তাহার বিন্দুমাত্রও দেরী হইল না।

অক্ষয় কাজের লোক, সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল, আর দেরী ক'রে লাভ কি? বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে আছেন, আর ঘণ্টা দু'য়েক পরেই একটা গাড়ী আছে।

সতীশ যেন চমকাইয়া উঠিল, দেরীটা যে কিসের তাহা সে বুঝিল কিন্তু তথাপি কোন কথাই না বলিয়া সে অসহায়ের মত প্রতুলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া প্রতুল হাসিয়া বলিল, ব্যস্ত কি অক্ষয়বাবু, পাবামাত্রই যে লাফিয়ে উঠছেন। কিন্তু এদিকেরও একটা অধিকার আছে ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনার গাড়ীর সময় ব'য়ে যাচ্ছে অস্বীকার করি না কিন্তু আমরাও আজকে ছেড়ে দেব' কি না সেটাও ত' জানা দরকার।

সুধীর ব্যস্ত হইয়া বলিল, নিশ্চয়, অক্ষয়ের কথায় কিছু মনে ক'রবেন না, ও একটু অতি মাত্রায় ব্যস্ত, নিজেকে মস্ত কাজের লোক ব'লেই ও মনে করে।

প্রতুল বলিল, দিদির দেখা হয়ত' আর কোনদিনই মিলবে না, কালকের গাড়ীতে যেতে পাবেন আপনারা। তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া বলিল, আজ রাতে একটা বড় রকম ভোজ দিয়ে দাও হে, আমরা এই সুযোগে কিছু আনন্দ ক'রেনি।

সতীশ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, ঠিক ব'লেছ প্রতুল, এটা আমাদের ক'রতেই হবে, খুব ভাল ক'রে, এমন ক'রে করতে হবে—। আর কোন কথাই না বলিতে পারিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন সব কিছুই বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে, প্রতুলের মুখ, উহাদের মুখ ভাল করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তবে কি সে অন্ধ হইল বলিয়া? ডাক্তারদের কথা মনে হইল, মনের মধ্যে আকস্মিক ঘা খাইলেই নাকি তাহার চক্ষের শেষ জ্যোতিও নিভিয়া যাইবে। মনকে সে বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিল, আকস্মিক আঘাতের কিই বা তাহার থাকিতে পারে? অলকা তাহার কেহই নয়, কুড়াইয়া পাইয়াছিল আবার আজ তাহাকেই ফিরাইয়া দিতেছে। ইহাতে তাহার কি হইতে পারে? কিন্তু তথাপি চক্ষুর সম্মুখে তাহার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া সে কোনমতে বাহির হইয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্তও প্রতুল আসিয়া উপস্থিত হইল না। ভোজের সমস্ত আয়োজনই যেন মিথ্যা হইয়া গেল। অলকা এবং সতীশের কাছে ইহার কোন অর্থই ছিল না, প্রতুলের অনুপস্থিতিতে সুধীরেরও মনটা যেন খারাপ হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, প্রতুলবাবু এসেছেন কি?

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে আসে নাই।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, তাঁর ত' আসবার কথা ছিল আজ, আমরাও ত' ঘণ্টা তিন চার তাঁর অপেক্ষায় আছি।

বিস্মিত হইয়া সতীশ বলিল, ঘণ্টা তিন চার? তা' ভেতরে এসে বসলেন না কেন? কি দরকার তার কাছে?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, আপনি সাহিত্যিক, এসব অতটা বুঝবেন না। আমাদের দরকারগুলো একটু চুপে চুপেই সেরে নিতে হয়। তিনি আর আসবেন না এখানে, যতটা বুদ্ধিমান ব'লে তাঁকে জানতুম দেখছি তার চেয়েও ঢের বেশী বুদ্ধিমান তিনি। যাক্ যাবার সময় ব'লে যাই, এ'দের সঙ্গে বেশী না থাকাই ভাল। সাহিত্য নিয়ে থাকলেও কেবলমাত্র বন্ধু ব'লেও আপনি রেহাই পাবেন না।

ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন, সতীশ নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মতই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

* * *

সে রাত্রে সতীশ মুহূর্ত্তের জন্যও ঘুমাইতে পারিল না। অস্থিরভাবে সমস্ত ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইল। প্রতুল আর কোনদিনই আসিবে না, অলকাও আর কয়েক ঘণ্টা পরে চলিয়া যাইবে। অনেক কথাই তাহার মনে হইতেছিল। থিয়েটার হইতে ফিরিয়া সে রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও আজ কেবলই তাহার মনে হইতেছিল। অলকার চক্ষের সে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি এখনও যেন তাহাকে নিঃশেষ করিতেছিল। যাহা তাহার কোনদিনই ছিল না কাল তাহাই তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে ইহাতে দুঃখ করারই বা কি থাকিতে পারে? তাহার দুর্ভাগ্য যেন তাহাকে দলিয়া পিষিয়া মারিতে চায়। তাহার বন্ধু নাই, তাহার কেহ-ই নাই। তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের মাঝখানে ধূমকেতুর মত ওই যে নারীটি আসিয়া সমস্ত চুরমার করিয়া দিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে তাহাকে ত' কই সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না, পারিবেও না তাহা বুঝিতে পারিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ঘরময় পায়চারী করিতে করিতে সে ঘরের মধ্যস্থলে রাখা টেবিলটার উপর দুই হাতের ভর রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল। দেওয়ালটা যেন সরিয়া গিয়াছে, যতদূর দেখা যায় শুধু অন্ধকার, চারিদিক হইতে অন্ধকার ঘিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আর চাহিয়া থাকিবার সাহস তাহার ছিল না, দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধ হইয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ঠিক পাশের ঘরে অলকাও তেমনি করিয়া নিঃশব্দে পায়চারী করিতেছিল। নিজের নিঃশ্বাস পতনের শব্দেও মাঝে মাঝে সে চমকাইয়া উঠিতেছিল। ওই পাশের ঘরে যে লোকটি রহিয়াছে তাহার কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রতুলদার কথাও তাহার মনে ছিল না। সুধীর, অক্ষয়, দিলীপ কেহই মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে অন্যমনস্ক করিতে পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে সে আগাইয়া গিয়া ওই ঘরের শব্দ শুনিবার জন্য একবার দেওয়ালের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কোন শব্দই নাই। হয়ত' সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কি নিঃশব্দেই না সে তাহার জন্য দুঃখ মাথায় পাতিয়া লইয়াছে। বন্ধু-বান্ধবের ছি ছি শুনিয়াও ত' সে টলে নাই। প্রতুলদা চলিয়া গিয়াছে আর আসিবে না, সেও চলিয়া যাইবে, শত সহস্রবার তাহার কথা মনে পড়িলেও মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, আবার সেই রামহরি আর তার খোকাবাবু সমস্ত থাকিয়াও এতটুকু ওলট-পালটও কি হইবে না? ওই লোকটাকে সে যে কত স্নেহ করে তাহা সে আজ যাইবার পূর্ব্বে স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইল। উহাকে সেবা দিয়া, মমতা দিয়া, ঘিরিয়া রাখিবার জন্য সে নিজের জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতেও পারে।

তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ইচ্ছা না হইলেও যাইতে হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিই নাই যাহার সাহায্যে সে থাকিয়া যাইতে পারে। ওই লোকটা তাহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াই ফেলুক আর যাহাই হউক না কেন তাহাকে যাইতেই হইবে। সে তাহার কেহই নহে, এতদিন উহারই আশ্রয়ে থাকিলেও উহার জন্য ভাবিয়া মরা তাহার চলিবে না।

অলকা শয্যায় লুটাইয়া পড়িল, বালিশটাকে বুকের কাছে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র!

* * *

পরের দিন যাইবার সময় অলকা সতীশের সম্মুখে আসিতে

(শেষাংশ ৩৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

(ভ্রমণ কাহিনী পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(পাঁচ)

পশ্চিম ভারতের গিরিমন্দির কার্লি

পুণার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে ২৯শে অক্টোবর তারিখ কার্লির গুহামন্দির দেখিতেও চলিলাম। পূর্ব্বেই স্থির ছিল যে, এক রবিবার দিন শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ গিরি মন্দিরটি দেখাইতে লইয়া যাইবেন। তাঁহার গাড়ীখানি বেশ বড়, কাজেই আমাদের দলবল লইয়া যাইতে কোনও অসুবিধা হইবে না। মিঃ চৌধুরীর এই অযাচিত অনুগ্রহে আমাদের সকলেরই মন খুবই প্রফুল্ল হইল। শনিবার দিন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া আসিয়া আরামে কম্বল মুড়ি দিয়া চায়ের পেয়ালার পর পেয়ালা পার করিয়া দিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি কি কি সঙ্গে যাইবে তাহা লইয়াও খানিকক্ষণ আলাপ ইত্যাদি চলিল। এ বিষয়ে আমার কন্যাদ্বয়ই ভার গ্রহণ করিলেন। পাঁচ শত ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর উঠিয়া গুহাগুলি দেখা শ্রীমান রজতবাবু ও শিপ্রা দেবীর ত আর সম্ভব নয়, তাই তাহাদিগকে কিন্তু বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। রজত মুখ বেজার করিল, শিপ্রা তাহার মাকে বলিল—"আচ্ছা যাও না, আমি কলকাতা গিয়ে বাবাকে বলে দোব!—কেমন!" শ্রীমান্ শচীন্ বাবাজী বলিলেন, "আপনারা কিন্তু দেরী করবেন না, খুব সকাল সকাল উঠবেন, মিঃ চৌধুরী যখন বলেছেন সাতটার সময় আসবেন, তখন এতটুকু নড়চড় হবে না।" আমার বৈবাহিক চণ্ডীবাবু সেদিন পাশের বাড়ীর অবসরপ্রাপ্ত জজ মিঃ চিত্রে মহাশয়ের সহিত দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, ঈশ্বর ও পরকাল লইয়া অনেকটা সময় তর্ক করিয়াছিলেন। উপনিষদ সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। রীতিমত পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া এবং প্রতিনিয়ত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার বিবিধ উপনিষদের বহু শ্লোকই কণ্ঠস্থ হইয়াছে। চণ্ডীবাবু কার্লি যান—পিতৃভক্ত পুত্র শ্রীমান্ শচীনের তাহা বড় একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু চণ্ডীবাবু বলিলেন—আমি বেড়াইতে আসিয়াছি, যদি কার্লি না দেখিয়া যাই, তাহা হইলে যে আমার কিছুই দেখা হইল না। তারপর মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে সেখানে কার্লি পাহাড়ের নীচে চেয়ার পাওয়া যায়, চেয়ারে বসিয়া পাহাড়ে লোকেরা লইয়া যায়—মাত্র দুই টাকা করিয়া আসাযাওয়ার জন্য লইয়া থাকে। কাজেই চণ্ডীবাবুর পক্ষেও কার্লি যাওয়ার পক্ষে আর কোনও বাধা রহিল না। আমরা অর্থে শ্রীমান্ সুধাংশু, চণ্ডীবাবু, শ্রীমতী প্রতিভা, কণিকা, সকলেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তখনও ভাল করিয়া অন্ধকার দূর হয় নাই, শীতে শরীর অবসন্ন, বাহিরে জানালার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে—পান্ডুর চন্দ্র অস্ত যাইতেছে, আকাশে নিশান্তের তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে! সেই সময়ে দেখিলাম, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী উনুন ধরাইয়া চায়ের জল চাপাইয়া দিয়াছে। তাহার মাত্র দুই তিন মাসের শিশু কন্যাটি সেই ভোরে জাগিয়া হল্লা করিয়া খেলা করিতেছে। আমি এই কন্যাটির নাম রাখিয়াছি—জীজাবাই! শিবাজীর দেশে জন্ম কিনা!

ক্রমে সাতটা বাজিল। সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ সুধাংশু চৌধুরীর গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম, কাজেই দুই এক মিনিটের মধ্যেই সকলে গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। নূতন দেশ, নূতন প্রাকৃতিক শোভা চারিদিকের বৈচিত্র্যে চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিল। গাড়ী চলিল। শীতের সেই প্রভাতে দুই একজন প্রাতঃভ্রমণকারী মাথায় ও গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া পথ দিয়া চলিয়াছেন। নাগকেশরের গাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে শুভ্রসুন্দর পুষ্পরাজি পথের বুকে কোমল শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিল।

গাড়ী চলিতে লাগিল চল্লিশ মাইল বেগে। কার্লি গিরিমন্দির পুণা হইতে প্রায় ৪৪ মাইল দূরবর্ত্তী। পুণা ও বোম্বের সুন্দর পথটি ধরিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। এই পথের শোভা অনুপম। দুই দিকে তরুশ্রেণী সুন্দর বীথি রচনা করিয়া দিয়াছে। আমরা ক্রমে মুলা ও মুথার সেতু পার হইলাম। পথের বাম দিকে, দক্ষিণ দিকে সম্মুখে ও পশ্চাতে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। কি সুন্দর সবুজ শ্রী মণ্ডিত তাহাদের বন্ধুর কলেবর। কোন পাহাড়টি মাত্র দুই একটি শৃঙ্গ লইয়া আপনার দেহ রচনা করিয়াছে, কোন কোনটি বেশ বড়। ক্রমেই আমরা উপরে উঠিতেছি। দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলাম—প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ প্রভায় মাঠে মাঠে যেন সোনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোথায়ও কৃষক পুরুষ ও রমণী ক্ষেতে কাজ করিতেছে। মহিষেরা মাঠে মাঠে চরিতেছে। দুই একটি ঝিলের বুকে পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পড়িয়াছে। মিঃ চৌধুরীর পুত্র কাজল বলিল—আমরা একদিন এইখানে বাবার সাথে শিকার করিতে আসিয়াছিলাম। সজল ও কাজল ছেলে দুইটি খুবই 'স্মার্ট'।

আমরা চলিতে লাগিলাম। কি সুন্দর এই পৃথিবী, কি উদার, কি অপূর্ব্ব এই সৃষ্টি। নীল আকাশের নীচে যোজনের পর যোজন বিস্তৃত প্রান্তরের বুকে কোন্ দেবীর কোমল সুন্দর শয্যা। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া যাইতেছিলাম। কোনটি পড়িতেছিল বামে, কোনটি পড়িতেছিল দক্ষিণে। মাঝে মাঝে বাম দিকের গিরিগাত্রে দুই একটি গিরিমন্দির চক্ষে পড়িতেছিল।

একটা পথের বাঁক ফিরিতেই একটি সুশ্রেণীবদ্ধ গিরিমালা দেখিলাম। মিঃ চৌধুরী সোল্লাসে বলিলেন ঐ যে কার্লি। হাঁ, ঐ ত কার্লি। ঐ যে পাহাড়ের গাত্রে কতকগুলি কালো কালো দাগের মত দেখাইতেছে।

আমাদের এই পথটুকু চলিবার সঙ্গে সঙ্গে অভ্রান্ত গাড়ী-চালক মিঃ চৌধুরী মাঝে মাঝে যে সকল বিচিত্র কাহিনী বলিতেছিলেন, তাহা বাঙালীর গৌরবের নহে—অপমানের। বাঙালী বীরেরা বিদেশে যাইয়া শ্বেতাঙ্গিণী তরুণীদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া পরে কিভাবে এবং কতরূপে কতভাবে 'প্রেমের অপমান' করে তাহার অনেক গল্প করিলেন। কেহ দেশ হইতে বিবাহ করিয়াও বিদেশে যাইয়া মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া ইংরেজ, জার্মান প্রভৃতি তরুণীদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। তাহার অনেক গল্পই তিনি করিলেন। আমি এ বিষয়ে অধিক কথা বলিতে চাই না, শুধু মনে হয় এইরূপ দুর্ব্বলতা কি বাঙালী যুবকদের মন হইতে দূর হইবে না!

আমার এই পথে যাইতে যাইতে মনে হইতেছিল, ভারতের ন্যায় বৈচিত্র্যময় দেশ জগতে অতি দুর্লভ। এই দেশের সর্ব্বত্র প্রাচীন কালের কত স্মৃতি, কত ললিতকলার মনোজ্ঞ নিদর্শনই না রহিয়াছে। রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সহিত উত্থান পতনের তরঙ্গ দোলায় দোলায়মান হইয়া যেমন প্রাচীন ক্রিয়াকলাপ, শাস্ত্রবিধান, বিবিধ গ্রন্থের পত্রে পত্রে পরিস্ফুট রহিয়াছে, তদ্রূপ গিরিগাত্রে, দুর্গম অরণ্যাণীর নিভৃত প্রদেশে, সমুদ্র তরঙ্গবিধৌত তটভূমির প্রান্তদেশে কত মন্দির, চৈত্য, মঠ, অভ্রভেদী স্তম্ভ ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে—সে সমুদয় কীর্ত্তির কতটুকু সন্ধানই না আমরা করিতে পারিয়াছি।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে আর তেমন প্রভাম্বিত নহে, কিন্তু ভারতের নানাস্থানে এখনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপতি ও শ্রমণগণের কত না কীর্ত্তি দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইতেছি।

ধর্ম্ম-জগতের ক্রমিক উত্থান ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে শিল্পের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়াছে। ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শুধু মানুষের চিত্তরঞ্জনের জন্য স্ফুটতর হইয়া উঠে নাই, উহা ভারতের ধর্ম্মকে জগতের সমক্ষে নানাভাবে প্রচার করিবার নিমিত্তই দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের শিল্প, ভারতের চিত্র বা ভাস্কর্য্য ধর্ম্মের সহিত এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই সর্ব্বত্র আপনার কীর্ত্তি ও যশ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাঁহারা বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই যথার্থরূপে আমাদের এ কথা কয়টির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা গিরিমন্দিরে চৈত্যে, মঠে, স্তূপে, বিহারে, স্তম্ভে যে সকল মূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাই তাহার কোনটিই অলীক কল্পনাপ্রসূত নহে ; প্রত্যেকটির সঙ্গেই কোন না কোন উপাখ্যানের সংস্রব রহিয়াছে, আর সে সকল পৌরাণিক বা ইতিবৃত্তমূলক কথা যাঁহাদের অজ্ঞাত তাঁহাদের নিকট সে সকল মূর্ত্তি মোনভাবে এক অজ্ঞাত কাল্পনিক কৌতূহল জাগাইয়া দেয় মাত্র। গ্রুন ওয়েডেল সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন যে,

"The art of ancient India has always been a purely religious one; its architecture as well as the sculpture, which has always been intimately connected therewith, never and nowhere employed for secular purposes." [Buddhist Art in India —by Grenweddel.]

কাজেই যে সকল জীবজন্তু, কিন্নর-কিন্নরী, যক্ষ, নাগ, মকর, হংস এবং বিবিধ পক্ষী, পশুপ্রাণী খোদিত বা চিত্রিত দেখিতে পাই সে সকলের মধ্যে একটী জীবন্ত অভিব্যক্তি রহিয়াছে। সেকালের সামাজিক রীতিনীতি, দৈনন্দিন ঘটনাবলীর চিত্র প্রভৃতিও শিল্পিগণ নিজ নিজ সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এ সকলের মধ্য হইতে আমরা অতীতের কত কথাই না জানিতে পারি, সে যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন রীতি, প্রেমাভিনয়, শ্মশান দৃশ্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয় যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে।

আমরা পথের একটা মোড় ফিরিতেই যে রাস্তাটি পাইলাম, সেটি কাঁচা রাস্তা। এই রাস্তাটি একেবারে কার্লি পর্ব্বতের পাদদেশে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। এ সময়ে যাত্রী সংখ্যা খুব বেশী হয়। বিশেষ করিয়া স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা অবসরকালে এসব স্থান দেখিতে আসে, সঙ্গে অধ্যাপক দলও থাকেন। 'বয়স্কাউট'ও একদল দেখিলাম, তাহারা বেঙ্গালোর হইতে আসিয়াছে।

কার্লি গিরিমন্দির পুণা জেলার অন্তর্গত মাভাল তালুকের মধ্যে অবস্থিত। লোনাভ্‌লা ষ্টেশন হইতে মাত্র ৬ মাইল দূরে। সেখানে টেক্সি, মোটরবাস, গোরুর গাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায়। অনেকে আবার পুণা হইতে আসাই সুবিধাজনক মনে করেন। পাহাড়টির বামদিকে একটি বেশ বড় জলাশয়, সেখানে জেলেরা মাছ ধরিতেছিল।

পাহাড়টির পায়ের তলা হইতে মনে হয় যে, বোধ হয় পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই দৌড়িয়া গুহাগুলির সম্মুখে যাইয়া পোঁছিতে পারিব। চণ্ডীবাবুর মনেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু আমরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তিনি যতটা সহজ মনে করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। পাহাড়-পর্ব্বত এমনি করিয়াই ভ্রমণকারীদের প্রতারণা করে।

এইবার আমাদের পাহাড়ে উঠিবার পালা। বেলা ঠিক ৯॥টার সময় আমরা এখানে আসিয়া পোঁছিয়াছিলাম। এখন রৌদ্রকিরণে চারিদিক যেন হাসিতেছিল। হেমন্তের রৌদ্রের পীতাভ শ্রী দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া দূর পাহাড়ের গায়ে যাইয়া মিলিয়াছে। রৌদ্রের ঢেউ যেন নাচিতে নাচিতে সোনার রাশি ছড়াইয়া দিতেছে। দূরে দেখা যাইতেছে পল্লী, লোনাভ্‌লার পাহাড় ও সাদা বাড়ী ঘর। ছোট ছোট ছেলেরা ছুটিয়া আসিতেছে, পাহাড়ের উপরে পথ দেখাইয়া নিবে। গাড়ী নীচে রাখিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের গা কাটিয়া পথ তৈরী। পথ বেশ প্রশস্ত। এখন মেরামত আরম্ভ হইয়াছে কেন না এ সময় হইতেই যাত্রীদের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। আমাদের অর্থাৎ আমি ও শ্রীমান্ সুধাংশুর পাহাড়ে উঠিবার পূর্ব্বেই শ্রীমতী প্রতিভা ও কণিকা, সজল ও কাজল এবং মিঃ চৌধুরী মহাশয় দ্রুত উপরে উঠিতেছিলেন, আর চণ্ডীবাবু, তিনি ত আজ রাজাধিরাজের ন্যায় সিংহাসনাসীন হইয়া অতি দ্রুত উপরে উঠিতেছেন।

আমি ধীরে ধীরে উঠিতেছিলাম। শ্রীমান্ সুধাংশুর শরীরটা তেমন ভাল না থাকিলেও সেও আজ পরমানন্দে পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিতেছিল। আমি দেখিতেছিলাম—কেমন করিয়া মুক্ত প্রান্তরে পশুর দল বিচরণ করিতেছে, কৃষক বালকেরা মহানন্দে ছুটাছুটি করিতেছে, কয়েকটি পাখী মাথার উপর দিয়া উড়িয়া এক পাহাড়ের চূড়া হইতে আর এক পাহাড়ের চূড়ায় যাইয়া বসিল। দুইশত ফিট উঁচুতে উঠিয়াও মহিষের গলার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলাম। উপরে প্রায় গুহার কাছাকাছি প্রতিভা ও কণিকা যাইয়া পোঁছিয়াছে! সজল ও কাজল হরিণ শিশুর মত ছুটিয়া যাইতেছে। আরও উপরে উঠিয়া দেখিলাম—সম্মুখে মুক্ত বিস্তৃত প্রান্তর, কোন বাধা নাই সম্মুখে, শুধু অতি দূরে দূরে পর্ব্বত শ্রেণী। কার্লি পাহাড় এই স্থানটায় অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিরাজ করিতেছে।

কোন কোন স্থানে নূতন মাটি ফেলিয়া পথ প্রস্তুত করার দরুণ, পা পিছলাইয়া যায়। ক্রমে উপরে উঠিলাম। প্রশান্ত সুন্দর সমতল ক্ষেত্র। ছোট একটি চায়ের দোকান। সেখানে লিমোনেড, কমলালেবু, চা সবই পাওয়া যায়। আমরা মন্দিরগুলি দেখিবার আগে চায়ের দোকানে বসিয়া চা পান করিলাম। এখানকার Caretakerএর নামে শ্রীমান্ চারুচন্দ্র পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন। ভদ্রলোক পত্রখানি পড়িয়া অতিশয় ভদ্রতার সহিত বলিলেন—"কেন দোকানে বসে চা খেলেন! আমার এখানেই ত হতে পারত।" তাঁহাকে এই পাহাড়ের উপরই থাকিতে হয়। নয় দশ বৎসরের একটি বালিকা, ভদ্রলোকের বাড়ীর বারান্দার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। সুন্দরী মেয়েটি ফুট্‌ফুটে রঙ। অবাক্ বিস্ময়ে সে আমাদের প্রতি, আমাদের কন্যাদের প্রতি চাহিয়াছিল। পরিচয়ে জানিলাম ভদ্রলোকের কনিষ্ঠা শ্যালিকা। ভদ্রলোক আমাদিগকে কার্লির সব কিছু দেখাইবার জন্য নিজেও সঙ্গে আসিলেন।

(ক্রমশ)

বেদুইন

(গল্প)

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, নাম লাবণ্য।

চুল তার পিঠ ছাড়িয়ে কোমরে গিয়েও পড়েনি। বয়স নয় পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। চুল লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা—ঠিক মেঘের ওপর রামধনুর মত। দীঘীর জলের মত কাল দুই চোখে চঞ্চলতা নেচে বেড়াচ্ছে। বাতাসে উড়ে যাওয়া মেঘের মত সরল গতি তার, আর তার সকল দেহ নিয়ে যেন একটা মাধুর্য্য ঝরে পড়ছে। ফ্রক পরে বই হাতে ক'রে সে রোজ ঐ গলিটা দিয়েই স্কুলে যায়।

গলির মোড়ে ঐ যে খালি বাড়ীটা, যেটার দেওয়ালে লাবণ্য কতদিন ভূত এ'কেছে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফাঁকা আওয়াজ করেছে, সেই বাড়ীটা আজ মুখর হয়ে উঠেছে নূতন ভাড়াটের কোলাহলে ঘুমের পর জাগরণের চাঞ্চল্যের মত।

ভাড়াটের নাম নবীন চাটুজ্যে, যার মাসের প্রথমে ব্যাঙ্ক থেকে একটা মস্ত বড় অঙ্ক ঘরে আসে। প্রাচুর্য্যের মাঝেই আলস্যের বাসা; নবীন চাটুজ্যেরও তাই। অর্থের প্রাচুর্য্যে তাঁর খাটুনীর দরকার হয় না, তাই তিনি অলস, ঠিক পুরুষ-মৌমাছির মত অলস। ঝি, চাকর, বামুন, নায়েব—বাড়ী একেবারে বোঝাই। বাড়ী বোঝাই হলেও সংসারে নবীনের কেউ নেই—ছেলে মেয়ে বৌ কেউ না। তাই তাঁর স্থায়ী বাড়ীরও দরকার হয় না। বেদুইনের মত অস্থাবর তিনি। কোন বাড়ীতেই তাঁর দু' মাসের বেশী মন টে'কে না, তিনি যেন হাঁফিয়ে ওঠেন। চলার পথ নাকি তাঁর ভাল লাগে, তাই তিনি সতত ভ্রাম্যমান। ন বছর আগে তিনি তাঁর স্থায়ী বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে এই জিপসি জীবন বেছে নিয়েছেন। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কেউ তাঁকে দু' মাসের বেশী এক বাড়ীতে দেখে নি।

জানলার ধারের ইজিচেয়ারে বসে নবীন রাস্তার দিকে চেয়েছিলেন, লাবণ্যকে দেখতে পেয়ে ভয়ানক চমকে উঠলেন। আশ্চর্য্যে, আনন্দে অধীর হয়ে ডাকলেন, "খুকী, ও খুকী শুনে যাও।" লাবণ্যর ভারমিন রঙের ঠোঁট বেয়ে খানিকটা হাসি উপ্‌ছে পড়লো। সে চঞ্চল পদক্ষেপে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। বাড়ীটা ভাল করে দেখবার সাধ তার অনেক-দিনের, আজ সুযোগ জুটেছে। নবীন তাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন,—"তোমার নাম কি মা?"

"লাবণ্য", সে কতকটা হকচকিয়ে গেল।

নবীন তাকে ছাড়তেই চান না, বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় একটা হাত বুলোতে বুলোতে চোখ বুজে গভীর আরাম অনুভব করেন; সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা ভাববার চেষ্টা করেন।

"স্কুলের যে দেরী হ'য়ে যাবে।" লাবণ্য ভয়ে ভয়ে বললে।

নবীনের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি চোখ খুলে তার ভয়বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ভয় কি মা, তুমি যে আমার মেয়ে। ঠিক ন' বছর আগে তুমি আমার হাত ধরে কত খেলা করতে, কত গান গাইতে। আঃ কি মিষ্টি তোমার স্পর্শ, কি সুন্দর তোমার স্বর।" নবীন আজ ন' বছর আগেকার ঘটনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান।

লাবণ্য সাহস পেয়ে বল্‌লে,—"এখন ছাড়ুন, স্কুল থেকে ফেরবার পথে আবার আসব।"

নবীন বললে,—"ঠিক আসবে তো মা, ঠিক, ঠিক তো?"

লাবণ্য ঘাড় নাড়ে।

নবীন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,—"না এলে কিন্তু বড্ড কষ্ট পাব।" লাবণ্য চপল হেসে বেরিয়ে পড়ল।

সে আজ ১৭।১৮ বছরের কথা।

সরযূ একটি ফুটফুটে মেয়ে রেখে চোখ বুজলেন। নবীন মেয়েটিকে বুকে ক'রে স্ত্রীর শোক ভুললেন। বসোরার কুঁড়ি গোলাপের মত সে ছিল সুন্দর, আকর্ষণীয়। নবীনের বংশের একমাত্র দুলালী, নয়নের মণি। কমলাকে তিনি সর্ব্বদা মুঠোর সামনে রাখতে ভালবাসতেন।

ন' বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল ছোট মেয়েটিকে কেন্দ্র ক'রে। তারপর এল দুর্দ্দিন, নবীনের জোড়ালাগা বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

সেই ছোট্ট মেয়েটির স্মৃতি এখনও নবীনের বুকে পাষাণ হ'য়ে আছে। তার হাসবার সময়ের মুখভঙ্গী, কাঁদবার, আব্দার জানাবার সবই সে মনে করতে পারে। তার খেলনাগুলো তিনি যত্ন ক'রে তুলে রেখে দিয়েছেন। দেওয়ালে দেওয়ালে তার ছবি, আলমারিবন্দী ছোট ছোট নানা রকমের বই তার, বাক্স জামা কাপড়ে ঠাসা। চারিদিকেই তার স্মৃতি। নবীন সেই দেখেই দিন কাটান। বই খুলে ছোট ছোট বাঁকা অক্ষরে শ্রীমতী কমলা নাম পড়েন আর চোখ উপ্‌ছে পড়ে জলে বর্ষার নদীর মত। সেই থেকেই তিনি অন্য ধরণের হ'য়ে গেছেন। সদাই বিমর্ষ, জগতের কিছুই যেন তাকে টানতে পারে না। কোন জিনিষেই আকর্ষণ নেই। শান্তি পাবার আশায় তিনি ঘুরে বেড়ান—পাড়ার পর পাড়া, দেশের পর দেশ, কিন্তু শান্তি তিনি এক ফোঁটাও পান না কোথাও, কেবল লটবহর টেনে টেনে ঘুরে বেড়ান বেদুইনদের মত, কিন্তু এতে তিনি ক্লান্ত হন না বরং আনন্দ পান।

নবীন বাক্স থেকে একটা ছবি বের করে মেলাতে বসেন। হয়তো ঠিক ঠিক মিলে যায় সেইজন্যে অত বেশী জল পড়তে থাকে নবীনের চোখে। নবীন জানলা ধরে বসে থাকেন পথ চেয়ে, লাবণ্যের পথ চেয়ে। ঐ যে লাল ফ্রক, ঐ, নবীন অনেক দূর থেকেও চিনতে পারেন। লাবণ্যকে হাত ধরে বাড়ীতে এনে তিনি তাকে অসংখ্য প্রশ্ন করতে থাকেন। লাবণ্য হাঁফিয়ে উঠে এই অসংখ্য প্রশ্নের মাঝে।

"এ আবার কাকে জোটালে হে নবীন", বাপের আমলের বুড়ো নায়েব হরিচরণ এসে বলেন।

"ঠিক কমলার মত নয়?" ব'লে তিনি হরিচরণের দিকে চেয়ে হাসেন। বৃদ্ধের চোখে জল এসে পড়ে। লাবণ্যর সঙ্গে নবীনের সেইদিনেই রীতিমত ভাব হয়ে যায়।

সেই থেকে লাবণ্য রোজ আসে। নবীন তার পথ চেয়ে

ব'সে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে এলেই বলেন,—"বড্ড দেরী হ'ল মা।"

লাবণ্য হয়তো হেসে বলে,—"আজ তো তবু দশ মিনিট আগে এসেছি।" নয়তো কিছু না ব'লে শুধু হাসে। লাবণ্য আগে এলেও নবীনের চোখে দেরী ঠেকে। সে না আসা পর্য্যন্ত নবীন বাড়ীটাতে হাঁফিয়ে ওঠেন, ছটফট্ করতে থাকেন। নতুন দেওয়ানকে ডেকে ধমকে বলেন,—"বাজারে কি ভাল পুতুল পাওয়া যায় না যে, ঐ ছাইভস্মগুলো কিনে আন; দিদিমণি হয়তো রাগ ক'রে আসছে না।" বামুনকে বলেন,—"কি ছাই-পাঁশ খাবার কর দিদিমণির অরুচি ধরে। তোমাদের নিয়ে কোন কাজ যদি ঠিকমত হয়।" হয়তো হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে লাবণ্যদের বাড়ীর সামনে পায়চারি করেন। কোন কোনদিন রাস্তাতেই তাদের দেখা হয়ে যায়।

ক্রমে লাবণ্যর বাপের সঙ্গে নবীনের ভাব হয়ে যায়, গল্প শুনে তিনি ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন, চোখের কোণে জল দেখা দেয়। নবীন বলেন,—গিন্নী মারা যাবার পর ঐ ছোট মেয়েটাকে কোলে বুকে ক'রেই বুক বেঁধেছিলুম। ওকে কেন্দ্র করেই আমার ছোট ছোট আরামের দিনগুলো কেটে যেত। এক মিনিট কাছছাড়া করতাম না পাছে অঘটন ঘটে। কিন্তু তবুও ত রাখতে পারলাম না, তবুও ত সে আমায় ফাঁকি দিয়ে তার মা'র কাছে চলে গেল। নবীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

পরিচয়ের প্রথম পর্ব্ব তাদের এইরকমভাবেই শেষ হ'ল।

এইরকম ক'রে এক বছর কেটে গেল। নবীনের বুড়ো বয়সে প্রাণশক্তি ফিরে আসে লাবণ্যের সাহচর্য্যে; এমন প্রসন্নতা তাঁর অনেকদিন দেখা যায় নি।

বুড়া নায়েব বলেন,—"অনেক দিন যে এক বাড়ীতে আছ হে, নতুন বাড়ী একটা দেখব নাকি?"

নবীন বলেন,—"আর পারি না নায়েবকাকা এই বেশ আছি, বুড়ো বয়সে আর রোজ রোজ বাড়ী বদল ভাল লাগে না।"

বয়সের দোহাই দেওয়াতে হরিচরণ একটু হাসেন মাত্র। নবীনের কিন্তু বলতে লজ্জা করে। লাবণ্যর আকর্ষণই যে তাঁর বেদুইন-জীবনে ছেদ টেনেছে—একথাটা তাঁর মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরয় না, তাই নানা বাজে ওজরের দরকার হয়। আরও দিন কাটতে থাকে।

একদিন লাবণ্য এল না, নবীনও যেতে পারলেন না তাদের বাড়ী বাতের জন্যে, সেদিন বাতের যন্ত্রণাটা ভয়ানক কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে নবীন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েন, নানা রকমের বিশ্রী চিন্তা তাঁর মাথায় জোট পাকাতে থাকে। এইরকম শীতের দিনেই তো কমলা তাদের ছেড়ে চলে যায়। দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না। মাথার মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়তে থাকে, লেপের ভেতরে তিনি ভীষণ ঘামতে থাকেন।

বাতের যন্ত্রণা কমে গেছে, নবীন ভোর হ'তে না হ'তেই বেরিয়ে পড়েন।

লাবণ্যর বাড়ীর সামনে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান। নিস্তব্ধ বাড়ীর মধ্যে থেকে যেন একটা করুণ কান্না ভেসে আসছে। অশুভ সংবাদ শোনবার ভয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, কিন্তু সেই লাবণ্যর খবর নিতেই তিনি এত দূরে এসেছেন।

সামনেই একটা চায়ের দোকান। ভোরে খদ্দের নেই তবু উনুনে ধোঁয়া দিয়ে ব'সে আছে। নবীন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সাহসে ভর দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হ্যাঁ হে লাবণ্য ব'লে একটা মেয়ে......" তাঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়।

দোকানী বলে,—কি দিনকাল বলুন তো মশাই? শীতকালে কি না কলেরা!

আরে মশাই দশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই কাবার, ওকি মশাই, অমন করছেন কেন?"

নবীন অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে রাস্তার ওপরেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন।

পথের ধারের বাড়ীটা ঠিক আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে খাড়া হ'য়ে। নতুন ভাড়াটে বাড়ীটাকে খালি রাখতে দেয়নি। সবই আছে, কিন্তু এখন আর জানলার ধারে গভীর আগ্রহভরে পথ চেয়ে কেউ ব'সে থাকে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর কোন ছোট মেয়ে ফ্রক প'রে চঞ্চলপদে বাড়ীটাতে যাতায়াত করে না। একদিন যে তাঁর বেদুইন-জীবনে ছেদ টেনেছিল, সে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে, তাই তিনি আবার সুরু করেছেন তাঁর ভ্রমণ। সে ভ্রমণে আর ছেদ পড়বে কি না কে জানে।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(৩৯১ পৃষ্ঠার পর)

সাহস করিল না, দরজার নিকট হইতেই বিদায় লইয়া গেল। তাহাদের পদশব্দ মিলাইয়া গেলে সতীশ সম্মুখে হাত বাড়াইয়া আকুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওরা গেছে, না রামহরি? কিন্তু আমার চোখে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার কি হবে?

রামহরি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া অলকা কি যেন কান পাতিয়া শুনিল, তারপর হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধ-স্বরে বলিল, আমি যাব না, ওকে অন্ধ অবস্থায় ফেলে যাব কি ক'রে।

অক্ষয় কঠিনভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, না গেলে চ'লবেই বা কেন বৌদি, সমাজ ত' আপনাকে ছেড়ে দেবে না। যে অন্ধর কথা মনে ক'রে দুঃখ পাচ্ছেন তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে সবাই যে চরিত্রহীন ব'লে বিদ্রূপ ক'রবে?

মুখ হইতে হাত সরাইয়া অলকা স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসটা চাপিয়া ফেলিয়া শেষবারের মত পিছন ফিরিয়া চাহিয়া সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

—শেষ—

প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রের নিদর্শন

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষ বুঝি গণতন্ত্রের সহিত চির অপরিজ্ঞাত। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ভারতে কোনদিন গণতন্ত্রের আভাষ মাত্র ছিল না। ভারতের প্রকৃতি এরূপ গণতন্ত্র বিরোধী যে, এখানে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র কিছুতেই সফল হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিয়াছে। প্রাচীন যুগে ভারতে গণতন্ত্র ছিল। আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে কেবল স্বৈরাচারের কাহিনীই পড়িয়াছে। প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত নহে। অথচ একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, এই ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বৈরাচারের পার্শ্বেই গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে। কারণ সেই আদি কাল হইতে এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক দেশে গণতন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ক্রমবিকাশের ফলে। কিন্তু যে দেশ পরাধীন অবস্থায় থাকে, সে দেশে গণতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না। সেইজন্য ভারতে গণতন্ত্র ষোলকলায় বিকশিত হয় নাই। আজ প্রাচীন ভারতের একটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় দিব।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে নগর-রাষ্ট্র (City-state) ও গ্রাম্য সমিতিগুলি পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের উৎসমূল ছিল। সিন্ধু প্রদেশে মহেঞ্জদাড়োতে যে-সব খনন কার্য্য হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে প্রাচীনকালে একটি সুবৃহৎ নগর-সভ্যতা বিরাজমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই সভ্যতা বিকশিত হয়। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সুন্দর নগরটির কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য আরও বহু পূর্ব্ব হইতেই সুব্যবস্থা হইয়া আসিতেছিল। তাহা কতকটা বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটির মত। এই ত গেল উত্তর ভারতের কথা। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, সেখানে প্রাচীনকাল হইতে স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইবার প্রারম্ভে তথায় তিনটি তামিলি রাজ্য ছিল—যথা—কোরা, কোলা ও পাণ্ডা। ইহাদের প্রত্যেকটিকে 'মণ্ডলম্' বলা হইত। ইহার সহিত আর একটির নাম যোগ করা যাইতে পারেঃ—'টোনডায়-মণ্ডলম্' (Tondaimandalam) ইহা ছিল পল্লবদের বাসভূমি। কোলাদের ক্ষমতার প্রভাবে অপরগুলি কালক্রমে তাহাদের অধীনস্থ হয়। সে যুগে 'মণ্ডলমই' সাম্রাজ্য মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রদেশ হইয়া পড়িল। একটি 'মণ্ডলম' বহু 'ভানান্ডুর' (Vanandu) দ্বারা গঠিত হইত। এবং ভানান্ডুগুলি আবার বহু 'উরস্' (Urs) ও 'মঙ্গলাম' (Mangalam) দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। শাসনের সর্ব্ব নিম্ন কেন্দ্র (Unit) ছিল উরস্। ইহা এক একটা গ্রাম লইয়া গঠিত হইত। ইহা সাধারণত অব্রাহ্মণদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। যেখানে ব্রাহ্মণ বাস করিত, অথবা বসত-বিস্তার করিয়াছিল, তাহার নাম ছিল 'মঙ্গল'। অব্রাহ্মণ গ্রামের স্থানীয় ব্যাপারগুলি স্থানীয় পরিষদগুলির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইত। 'মঙ্গলম'-এর ব্যাপারগুলি যে পরিষদ নিয়ন্ত্রিত করিত, তাহার নাম 'সভা'। যখন সর্ব্বসাধারণের উপযোগী কোন সমস্যা সমুদ্ভূত হইত, তখন পরিষদ ও সভার যুক্ত অধিবেশন হইত। এবং তাহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ হইত। এই সব গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ত ছিল, ইহা ব্যতীত নগর শাসনের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল, তাহার নাম 'নগরম্'। বণিক কারুকার্য্যজীবীদের জন্য 'গিল্ড' (guild) ছিল। ইহার মধ্যবর্ত্তিতায় তাহারা সাধারণ অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করিত। দক্ষিণ ভারতের বর্ত্তমান নগর 'চিদাম্বরম্' হইতে একটা খোদিত প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বহু তন্তুবায়ের নাম আছে। বর্ত্তমানে তানজোর জেলার নিকট 'তিরুভিডায়মারুডুর' নামক স্থানে একটি প্রাচীন প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অবগত হই যে, সেখানে একটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ছিল। দুই তিনটি সভার একত্র যুক্ত অধিবেশন হইত।

'উরস্', 'মঙ্গলম্' ও 'নগরম্' ব্যতীত আরও বহু বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। তাহার নাম তানিয়ুর (Taniyur)। ছোট ছোট গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত হইত। বর্ত্তমান চিদাম্বরম-এর নিকটে একটি তানিয়ুর ছিল, তাহাতে প্রায় পনর শত গৃহ ছিল, আর তাহার পরিধি ছিল প্রায় পাঁচ মাইল।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাদেশিক পরিষদের অধীনে ছিল। প্রাদেশিক পরিষদ ব্যতীত বৃহৎ বৃহৎ জনপদের জন্য অন্যবিধ শাসন-কেন্দ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেরানু (বর্ত্তমান পুডুকোট্টা ষ্টেট) প্রস্তরলিপি হইতে জানিতে পারি যে তথায় দুইটি বিখ্যাত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান স্বগোরবে কার্য্য-পরিচালনা করিত। একটি ক্ষুদ্র কানজিভেরাম-এ অবস্থিত ছিল। এই গণতন্ত্র মণ্ডলমের অন্তর্ভুক্ত। এই মণ্ডলমের পরিষদ মাঝে মাঝে আহূত হইত। ইহার কার্য্যক্ষমতা কতগুলি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা ভূমিসকলের উপর হইতে খাজনার কিয়দংশ হ্রাস করিতে পারিত। সম্পূর্ণ হ্রাস করিতে হইলে উপরিতন পরিষদের অনুমতি লইতে হইত। দক্ষিণ ভারতের শত শত প্রস্তরলিপি হইতে আরও কয়েকটি স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিব। ব্রাহ্মদেবা গ্রামে এতৎসন্নিহিত অঞ্চলে যে সব "সভা" হইত তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দুস্প্রাপ্য নহে। পাণ্ডা রাজা মারানজাদেরা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠত্রিংশ বৎসরের বিবরণ হইতে অবগত হই যে, তাঁহার সময় উপরিউক্ত "সভা"তে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নাগরিকদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হয়। শিক্ষা, সৎচরিত্র ও কিছু ভূসম্পত্তি, এই তিনটি গুণ সভার সদস্যপদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল। সভার বিভিন্ন কমিটির জন্য ও ঐ সকল গুণ থাকা প্রয়োজনীয় ছিল। রাজা প্রথম পারানাট্কা (Paranatka I) দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ের প্রস্তরলিপি বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহা হইতে জানিতে পারি যে তাঁহার অধীনস্থ সভাসমূহের ভোটারের কতকগুলি নূ্যন যোগ্যতা ছিল যথাঃ—শিক্ষা, সম্পত্তি, যোগ্যতা, চরিত্র, অভিজ্ঞতা। গোপনে ভোট দিবার ব্যবস্থাও ছিল। বিভিন্ন সাব-কমিটির তদনুরূপ যোগ্যতা ছিল। সাব-কমিটির নাম "সমবৎসারাভারিয়াম" (বাৎসরিক কমিটি)। টোলাটাডারিয়াম (উদ্যান সাব-কমিটি) এরিডারিয়াম (হ্রদ ও পুষ্করিণী সাব-কমিটি), পানডারিয়াম (সুবর্ণ সাব-কমিটি) ইত্যাদি।

বর্ত্তমান তানজোর জেলার অন্তর্গত সোঙ্গানার অঞ্চলের প্রস্তরফলক হইতে অবগত হই যে, কোলা নৃপতি তৃতীয় রাজা রাজার ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ত্রিংশ বৎসরের একটি প্রস্তরফলক পাওয়া যায়। সেখানে বহুকাল হইতে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তির নগর ও গ্রাম শাসিত হইয়া আসিতেছিল। এখানকার সভা ও পরিষদের নিয়মাবলী বেশ কঠোর ছিল। যদি কোন সদস্য নিয়মভঙ্গ করিত এবং রাজার কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অন্য কোন দলে যোগদান করিত তবে তাহাকে গ্রামের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা হইত। প্রতি বৎসর পরিষদের অধিবেশন হইত। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাজস্বের হিসাব পৃথকভাবে রাখা হইত। যে সব বিষয়ের জন্য পূর্ব্ব হইতে অনুমতি দেওয়া হইত, সেই সব বিষয়ের উপর কর ধার্য্য হইত।

এবং অতি নিপুণভাবে কর আদায় করা হইত। বৎসরের শেষে সভার খরচপত্রের বাজেট পেশ করিতে হইত এবং আলোচনার পর তাহা গৃহীত হইত। দুই হাজার কাসুর (Kasur—এক প্রকার মুদ্রা) অধিক খরচ করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে মহাসভার লিখিত অনুমতি লইতে হইত। এই নিয়মগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য। যাহারা এগুলি ভঙ্গ করিত তাহাদিগকে শাস্তি পাইতে হইত। অপরাধের জন্য যে সব জরিমানা আদায় হইত তাহা স্থানীয় শাসনকার্য্যে ব্যয়িত হইত। হিসাবপরীক্ষক ও শাসন কমিটির সদস্য প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তিত হইত। এই সব বিবরণ অন্য একটি দলিল হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান তানজোর জেলার মুনারগাডি (Munnargudi) হইতে একটি দলিল পাওয়া যায় তাহাতে উপরিউক্ত বিবরণ সমর্থিত হইতেছে। তৃতীয় রাজা-রাজার ত্রৈবিংশ বৎসরের রাজত্বের কাহিনী উক্ত দলিলে বিধিবদ্ধ আছে। (খৃঃ ১২৩৯)। এই সব দলিলপত্রে যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা সাধারণত ব্রহ্মদেবা গ্রামের সম্বন্ধে। অ-ব্রাহ্মণদের গ্রামের সভাও দেশের চারিদিকে ছড়াইয়াছিল এবং তাহারাও ব্রাহ্মণদের পরিষদের মতই সুবিধা, অধিকার ও স্বাচ্ছন্দ ভোগ করিত। কিন্তু এই সব সভার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। যতটুকু পাওয়া যায় তাহাতে অনুমিত হয় যে, উররগণ তাহাদের অধীনস্থ কেন্দ্রে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করিত। ক্ষমতা ও অধিকারের দিক হইতে এইসব সভা ব্রাহ্মণদের সভা হইতে বেশী পৃথক ছিল না। তবে স্থানকালভেদে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিতে পারে।

স্বায়ত্তশাসন চালাইতে হইলে সকল মতের মধ্যে যে সমন্বয় দরকার তাহার মূলনীতি ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত হইতে লঘিষ্ঠদের রক্ষা করিবার জন্য যে অনুমতি ও সতর্কতা দরকার তাহাও বলিতেছেন যে, ভারত গণতন্ত্রের অযোগ্য তাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস জানেন না। প্রাচীনকালে ভারতে গণতন্ত্র ছিল—আর ভবিষ্যতেও থাকিবে। পরিপূর্ণ গণতন্ত্র পাইলে ভারত তাহার যেরূপ সদ্ব্যবহার করিবে পৃথিবীর অন্য দেশ তাহা পারিবে না।

একদা

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সমুখেতে কাঁপে হিজল গাছের বন,
বসিয়াছিলাম একা একা উন্মন,
শ্রাবণ শেষের জলে জলে ভিজে ভিজে
সারাটা আকাশ কাঁদিয়া মরিছে কি যে!
এখানে ওখানে মেঘেরা চ'লেছে ঘুরে
ঝাপ্‌সা পাহাড় উঁকি দেয় দূরে দূরে,
গোরুরা চরিছে ওধারে মাঠের শেষে
দীর্ঘ বিরাট বটের প্রান্ত ঘেঁসে,
নদীটা চ'লেছে একা একা উন্মন
সমুখে আমার হিজল গাছের বন!

২

বসিয়াছিলাম ক্লান্ত মনের ভারে
বনের কিনারে ঘন মেঘ বারে বারে,
ঘুরিয়া ফিরিছে মেলিয়া বিরাট পাখা,
সারাটা আকাশ দেবে যেন আজ ঢাকা,
বিদ্যুৎলতা ঝলিতেছে থেকে থেকে
ওধারে অদূরে পথটা গিয়েছে বেঁকে,
ব'সে আছি একা—সমুখে জানালা খোলা
পাতায় পাতায় লাগিছে ঝড়ের দোলা,
বাতাসে বাজিছে সেই রব শন্‌ শন্‌
সমুখে আমার হিজল গাছের বন!

৩

এমনি অন্ধ মেঘ-মন্থর দিনে
এসেছি কতো যে একা একা পথ চিনে,
শুধু অকাজেই সময় কেটেছে কতো
সেই সে দিনের ছোট ইতিহাস যতো
আজি তারি সব টুকরো কাহিনীগুলি
আমারো মনের সব বাতায়ন খুলি,
ভাসিয়া আসিছে মন্থর পদভরে,
বাহিরে সজল সন্ধ্যা গুমরি মরে;
আর বসে আছি একা একা উন্মন
সমুখে আমার হিজল গাছের বন!

৪

সেই সে হিজল গাছের প্রান্ত হ'তে
কেন যে চরণ বাড়ালে স্মরণ-স্রোতে?
চোখেতে তোমার সে কি বিদ্যুৎ-বিভা,
ভুলবোই বলে ভোলাই কি যায়—নিভা?
মনেতে তোমার সে কি আলোকের লেখা,
ধীরে ধীরে ধীরে রেখে গেল তারা রেখা,
সেই সে আলোর দীপ-বর্ত্তিকা হাতে
ঘুরিয়া ফিরিনু মেঘান্ধকার রাতে
ঘুরিয়া দেখিনু আমি একা নির্জন,
সমুখে শুধুই হিজল গাছের বন!

বিচিত্র বার্ত্তা

সার্কাসে কীট-পতঙ্গদের অভিনয়

বুদ্ধির বলে মানুষ শক্তিশালী জীব-জন্তুদের বশ করে আমোদ-প্রমোদের কাজে লাগায়। সার্কাসে শক্তিশালী ও হিংস্র জীব-জন্তুদের দিয়ে মনোমত অভিনয়, তারই পরিচয় দেয়। ইদানীং

গঙ্গা ফড়িংয়ের বেড়াদৌড়

সার্কাসের প্রচলন ক্রমশঃ কমে আসচে আর উৎসাহী মানুষ বৃহৎ জীব-জন্তুদের ছেড়ে দিয়ে কীট-পতঙ্গদের বশ করে তাদের দিয়ে নানারকম ক্রীড়া-কৌতুক দেখানোর দিকে ঝোঁক দিয়েচে। বড় বড় জীব-জন্তুদের চেয়ে কীট-পতঙ্গদের বশ করা যে আরও কঠিন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই। কেন না, জন্তুদের দৈহিক শাস্তি অথবা আহার কমিয়ে দিয়ে সহজে আয়ত্তে আনা
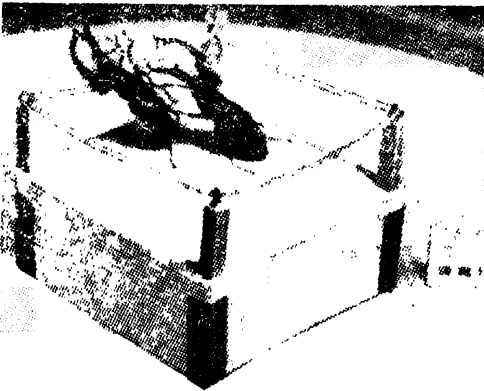
মুষ্টিযুদ্ধরত দু'টি কীট

সম্ভব হয়। কিন্তু অনুরূপ ভাবে কীট-পতঙ্গদের বশে আনা একেবারে অসম্ভব। কেবলমাত্র অধিকতর ধৈর্য্য ও বিশেষ অনুশীলন দ্বারা কীট-পতঙ্গদের এইরূপ ভাবে বশে আনা সম্ভব হ'তে পারে। দুইটি কীটের মুষ্টি-যুদ্ধ এবং গঙ্গা ফড়িংয়ের বেড়া-দৌড়ের অভিনব ক্রীড়া-কৌশল সত্যই উপভোগ্য।

বিজ্ঞাপনের বহর

বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞাপন এই নিয়েই বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আজ যে নতুন নতুন অদ্ভুত জিনিষের আবিষ্কার হ'চ্ছে তা সাধারণের কাছে প্রচারের জন্য আবার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করাটা আজ একটা উচ্চাঙ্গের আর্ট ব'লে সমাদৃত লাভ করেছে। সে তুলনায় আমরা অনেকখানি পশ্চাতে পড়ে রয়েছি। বিজ্ঞাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করাটাকে আমাদের দেশে বহু ব্যবসায়ী এখনও পাগলামী বলে মনে করেন। ফলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অন্য দেশের মত ব্যাপকভাবে দেশের সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করতে পারেনি। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কত অদ্ভুত কৌশলেই না ওদেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, যা শুনলে আমরা অনেক সময় চক্ষু বিস্ফারিত করে বিস্ময় প্রকাশ করি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ক'লকাতায় এ্যারোপ্লেনের সাহায্যে আকাশের বুকে বিজ্ঞাপন লেখা হ'য়েছিল। তা দেখে আমাদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। এরকম বিজ্ঞাপন প্রচারে ওদেশে আজ কোন নূতনত্ব নেই। নতুন কিছু করা দরকার। ঠিক এই সময়েই বৈজ্ঞানিকদের মাথায় এক নতুন কৌশলের উদ্ভব হ'ল। যুদ্ধ লেগেছে—বোম দু'একটি শহরের বুকে পড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রছে—এই সুযোগ। একদিন শহরের শঙ্কিত নর-নারীর মন আতঙ্কিত করে আকাশের মাথায় বোমা বিস্ফোরিত হ'ল। আকাশের উপর খানিকটা স্থান কাল ধূয়ায় আচ্ছন্ন হ'ল, তারপর সহস্র সহস্র নর-নারীর ভয়-বিহ্বল চোখের উপর এক আশ্চর্য্য-কাণ্ড। একটু পরেই ধূঁয়া অদৃশ্য হ'য়ে সেখানে কয়েকটা জিনিষের ছবির আবির্ভাব হ'ল—ছবির নীচে লেখা। এটা যে বিজ্ঞাপন ভিন্ন আর কিছুই নয় প্রথমে লোকে তা বুঝতে পারে নি। আত্মরক্ষার-কক্ষ থেকে আত্মপ্রকাশ করে সকলে আকাশের দিকে আনন্দে বিজ্ঞাপন পড়তে সুরু করলে। সিল্কের কাগজের উপর বিজ্ঞাপনের বিষয়-বস্তু লেখা—প্রায় ৬৫ বর্গমাইল স্থান জুড়ে কাগজটি বিস্তারিত; লম্বায় প্রায় পনের ফিট। আর ওজন মাত্র নয় আউন্স। পুনরায় মাটিতে সেটির নেমে আসতে অন্তত দশ মিনিট সময় লাগে। সমুদ্রের নিকটস্থ কোন স্থান থেকে বিশেষ কোন যন্ত্র সাহায্যে বোমাটি আকাশের ৩৬০ ফিট উচ্চে পাঠানোর কসরৎ অভ্যাস করা হয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে এক শ্রেণীর লোক আমোদের লোভে নিরীহদের শত্রুপক্ষের আক্রমণের ভয় দেখায়। তামাসা করতে গিয়ে সত্যি সত্যিই কোন দিন 'বাঘ পালে পড়বে' এ কথা ভেবে আমরা নিরপেক্ষ থেকেও আতঙ্কিত।

সোভিয়েট-ফিনিশ বিরোধের কারণ ও স্বরূপ

শ্রীবিনয় ঘোষ

ফিনল্যাণ্ডে যে যুদ্ধ চলছে, সে সম্বন্ধে সাধারণের খুব সুস্পষ্ট ধারণা নেই। থাকাও সম্ভব নয়, কারণ বর্ত্তমান যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ও অস্ত্র হচ্ছে প্রচারকার্য্য। যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাতে যুদ্ধের ধারণা স্বভাবতঃই ধোঁয়াটে হয়ে যায়। তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে যুদ্ধ চলছে দুই দলের মধ্যে বক্তব্য ও বিবৃতি দুই দলেরই থাকা উচিত। কিন্তু তা থাকছে না। আমরা শুধু হেলসিঙ্কির কম্যুনিক পাচ্ছি, লেনিনগ্রাড বা মস্কোর কোন কম্যুনিকে পাচ্ছি না। ক্বচিৎ যা পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যাই হোক, সংবাদ যাই আসুক, সোভিয়েট-ফিনিশ বিরোধের সমস্যাটাকে অন্তত আমরা খানিকটা ঠিকভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে পারি ইতিহাস থেকে। যুদ্ধ কিভাবে হচ্ছে, তার উত্তর ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে অনেকটা প্রাঞ্জল হয়ে যাবে।

ম্যানারহাইম-ট্যানার গোষ্ঠীর ইতিহাস

প্রায় ৬০০ বছর সুইডেনের সঙ্গে একত্রিত থেকে ১৮০৮ সালে ফিনল্যাণ্ড জারিষ্ট রাশিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তারপর থেকে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার জারতন্ত্রের উপনিবেশের মতই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফিনদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ কিছু দেখা যায় বটে, কিন্তু ফিনল্যাণ্ডে সুইডিশ ফিনদের আধিপত্য থাকার দরুণ সে-জাতীয়তা আত্ম-প্রকাশের বিশেষ কোন পথ খুঁজে পায়নি। যদিও ফিনল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র শতকরা দশজন সুইডিশ ফিন ছিল, তবু তারাই ছিল আসল শাসকশ্রেণী এবং ধনিকগোষ্ঠী। ১৯০৫ সালের রুষ বিপ্লবের সময় ফিনিশ জাতীয়তা প্রথম প্রকাশের পথ পায় এবং ১৯০৬ সালের কতকগুলি ধর্ম্মঘটের ফলে ফিনল্যাণ্ড খানিকটা স্বাধীনতা তখন লাভ করে। কিন্তু নূতন যে ফিনিশ ডায়েট হল, তাকেও রাশিয়ার জার স্বীকার করেন নি এবং তাঁর আধিপত্য সেখানে কায়েম রাখবার চেষ্টা করেছেন। ১৯১৭ সালের রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জার-তন্ত্রের উচ্ছেদের পর ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ উৎসাহিত হয়, কিন্তু করেনস্কীর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ফিনল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার না দিয়ে সোশ্যালিষ্ট ও মধ্যবিত্ত দলগুলিকে সমান-ভাবে নিয়ে একটা প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট গঠনের অনুমতি দেয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে রাশিয়ার শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফিনল্যাণ্ড পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এতদিন রাশিয়ার জার বা কেরেন্স্কী যা স্বীকার করেন নি, বোলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে ফিনল্যাণ্ডের সেই স্বাধীনতা সোল্লাসে স্বীকার করে নিল।

১৯১৭ সালের ১৫ই মে তারিখে লেনিন বোলশেভিকদের আহ্বান করে বলেছিলেনঃ—

"Finland was annexed by the Russian Tsars through a deal with Napolean, the stifler of French Revolution. If we are really against annexations we must come out openly for Finland's freedom. After we have said it and practised it, then and only then will agreement with Finland become a really voluntary, free and true agreement, and not a deception. The Tsars used to carry out their annexationist policies somewhat harshly, exchanging one people for another people by agreement with other monarchs......like serf-owners exchanging their serfs. The bourgeoisie, on becoming Republican, is carrying out the same
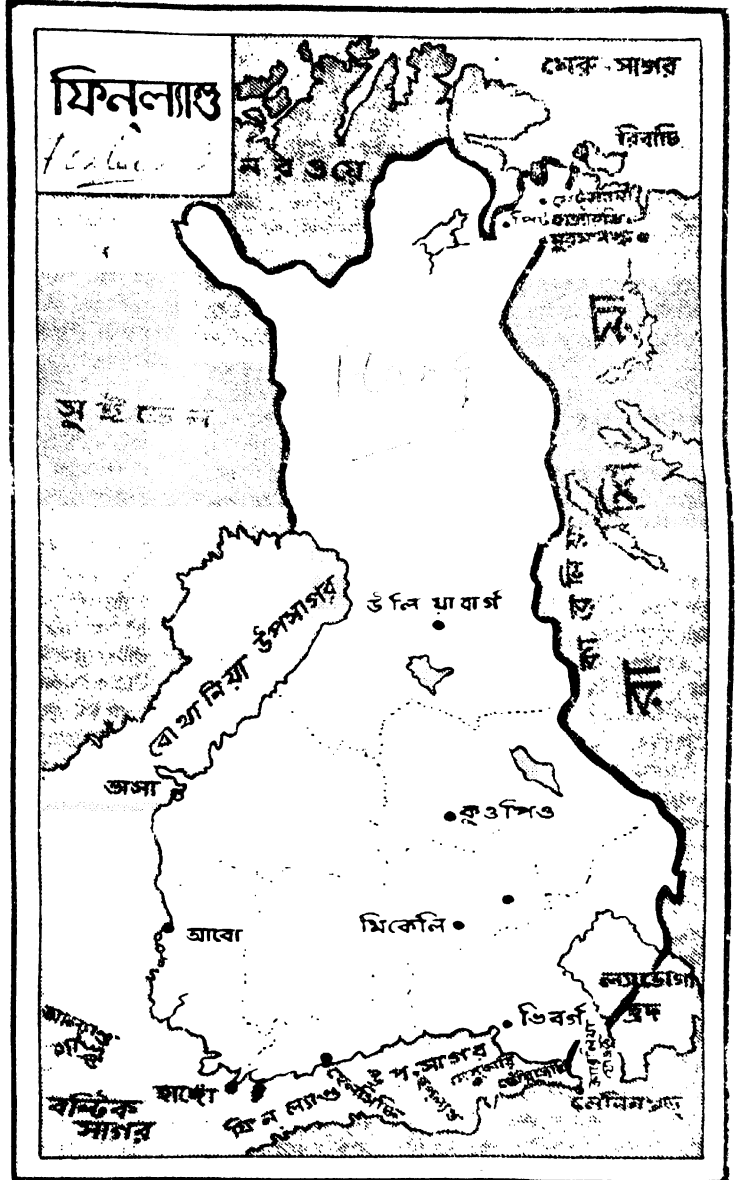
annexationist policy more cunningly, more secretly. Comrades, do not fear to recognise these people's right to independence."

কেরেনস্কীর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট যখন ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে' নেয় নি এবং বোলশেভিক্ বিপ্লব যখন পূর্ণ সফল হয় নি, তখন লেনিন এইভাবে বোলশেভিকদের কাছে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য আবেদন করছিলেন। ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লেনিনের ও বোলশেভিকদের কাছে আনন্দেরই বিষয় হ'ল।

কিন্তু স্বাধীনতার ইতিহাস এখানেই থেমে রইল না। রাশিয়ার শ্রমিকদের বিপ্লবের সাফল্য দেখে ফিনল্যাণ্ডের শ্রমিকেরাও অনুরূপ বিপ্লবের জন্য অনুপ্রাণিত হ'ল এবং ফিনিশ শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হ'ল। ফিনল্যাণ্ডের নূতন শাসকশ্রেণী এ-অসন্তোষ বরদাস্ত করলেন না এবং জার্ম্মানীর সঙ্গে তাঁরা চুক্তি করলেন। চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা জার্ম্মান কাইজারের এক আত্মীয়কে ফিনল্যাণ্ডের সিংহাসন অর্পণ করতে রাজী হলেন এবং জার্ম্মানদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন। এই সময় ভূতপূর্ব্ব জার সৈন্যের কর্ণেল এবং বর্ত্তমান ফিনিশ সেনাপতি ম্যানারহাইম জার্ম্মান সৈন্য নিয়ে হেলসিঙ্কিতে অভিযান করে, ফিনিশ জনগণের বিপ্লবকে নির্ম্মমভাবে দমন করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফিনিশ নরনারী ও শিশুকে তখন ম্যানারহাইমের "হোয়াইট গার্ড" সেনাবাহিনী নির্ব্বিবাদে হত্যা করেছিল। ১৫,০০০ সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টকে হত্যা করা হয়েছিল এবং ৭৪,০০০ জনকে বন্দী করা হয়েছিল। কয়েকজন রাশিয়াতে পালিয়েছিলেন, তার মধ্যে কোমিণ্টার্ণের (আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘ) ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী এবং ফিনল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মঁশিয়ে কুইসিনেন একজন। এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত মিলবে স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবের ইতিহাসে। স্পেনে যেমন ফ্যাশিষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি জেনারেল ম্যানারহাইম সেই সময় ফিনিশ জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে' তাদের দমন করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ সালে যখন ফিনল্যাণ্ডে এই দমননীতি চলছিল, তখনও মহাযুদ্ধ শেষ হয় নি। কিছুদিন পরে জার্ম্মানীর যখন পরাজয় ঘটল, তখন অন্যান্য যুদ্ধরত ১৪টি জাতি তাদের সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করল নূতন সোভিয়েট গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্য। নূতন সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করবার আর কোন সুবিধাজনক পথই নেই, একমাত্র আছে উত্তরদিকে ফিনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে। এই সমস্ত আক্রমণকারী সৈন্য-সামন্তকে ম্যানারহাইম সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছিলেন ফিনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে নূতন রুশ গণ-তন্ত্রকে বিনাশ করবার জন্য। বিশ্বাস ঘাতকতার এর চাইতে চূড়ান্ত নিদর্শন আর কিছু হ'তে পারে না। যে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বোলশেভিকদের বিপ্লবের সাফল্যের জন্য, অর্থাৎ রাশিয়ায় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সম্ভব হ'ল, সেই ফিনল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী অন্যান্য জাতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' নিজের দেশকে বিলিয়ে দিলে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ধ্বংস করবার জন্য। ম্যানারহাইম ফিনল্যাণ্ডে শত্রুদের পথ পরিষ্কার করে দিলেন। সোভিয়েটের শত্রুরা ফিনল্যাণ্ডে ঘাঁটি স্থাপন করে' সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাল এবং ম্যানারহাইমের "হোয়াইট গার্ড" সেনাবাহিনী তাতে সাহায্য করল। এখানেই বোঝা যাবে, ফিনল্যাণ্ডের যে শাসকশ্রেণী, তাদের কতটুকু স্বাতন্ত্র্য আছে এবং ফিনিশ জনসাধারণেরই বা কতটুকু স্বাধীনতা আছে। ফিনল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক, ফিনিশ জনসাধারণের কোন স্বাধীনতা নেই।

গত একুশ বছর ধরে' ফিনল্যাণ্ড এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শ্রেণীর দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। ১৯২৩-২৪ সালে ম্যানার-হাইমের এই "হোয়াইট গার্ড" সেনাবাহিনী সোভিয়েট ক্যারেলিয়ায় দাঙ্গা-বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছিল। এরাই শ্রমিক-আন্দোলন দমন করে' ফিনিশ লেবার পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে' সমস্ত সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের বন্দী করেছিল। ফিনল্যাণ্ডের ওক্রানা (Ochrana) নামক গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে জার্ম্মানীর "গেষ্টাপোর" (Gestapo) কোন প্রভেদ নেই। তেমনি এই ম্যানারহাইম 'হোয়াইট গার্ডদের' সঙ্গে নাৎসী ঝটিকা বাহিনীর (Storm troops) কোন পার্থক্য নেই। এখানে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে ফিনল্যাণ্ডের ল্যাপ্যো-ফ্যাশিষ্ট আন্দোলন। মানার-হাইমের প্রিয় শিষ্য লেফট্ন্যাণ্ট জেনারেল ওয়ালেনিয়াস এই আন্দোলনের নেতা। ফিনল্যাণ্ডে ফ্যাশিষ্ট আন্দোলন শক্তিশালী করাই এই ল্যাপ্যো দলের উদ্দেশ্য এবং হিটলার এর যাবতীয় খরচ ও সরঞ্জাম জুগিয়ে থাকেন। নাৎসীরা একে তাদের "পঞ্চম বাহিনী" (Fifth Column) বলে অর্থাৎ এটি হচ্ছে উত্তর ইউরোপে সোভিয়েট-বিরোধী বাহিনী, সুতরাং জার্ম্মানী ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্রের যথেষ্ট দরদ আছে এর উপর, যে-জন্য তারা ফিনল্যাণ্ডে হিটলারের আধিপত্য বিস্তারে বাধা দেয় নি। অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ভেবেছিল যে, হিটলারকে দিয়ে সোভিয়েট-বিরোধিতার কার্য্যোদ্ধার করা হবে, সুতরাং ফিনল্যাণ্ডে তারা হিটলারের প্রতিপত্তি-প্রসারে উৎসাহ দিয়েছিল। নাৎসীরা মহানন্দে ফিনল্যাণ্ডের সব বিমান ও ডুবো-জাহাজের ঘাঁটি সংরক্ষণ করতে আরম্ভ করল। ম্যানারহাইম এবং ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী জার্ম্মানী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ফ্যাশিষ্ট আন্দোলন শক্তিশালী করে' জার্ম্মানীর মত 'বৃহত্তর ফিনলাণ্ডের' (Greater Finland) দাবী করলেন। তাঁদের অভিসন্ধি হ'ল সোভিয়েট ক্যারেলিয়া এবং উত্তরের খানিকটা সোভিয়েট অংশ এই "বৃহত্তর ফিনল্যাণ্ডের" অন্তর্ভুক্ত করা। ১৯৩৭ সালে ম্যানারহাইম পেটসামো জার্ম্মানীকে "মৎস্যের দান" (Fishery Concession) হিসাবে দিতে রাজী হয়েছিলেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল সময়ই, যখন ম্যানারহাইম এই সব ষড়যন্ত্র করছেন, সোভিয়েট-রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের তখন অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) বজায় রয়েছে। এই হ'ল ম্যানারহাইম-কালিও-রাইলি-ট্যানার প্রমুখ ফিনিশ শাসকগোষ্ঠীর মনোবৃত্তি ও স্বরূপ।

ফিনিশ জনসাধারণের মনোভাব

এখন সকলের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী নাৎসীপন্থী ও সোভিয়েট-বিরোধী ছিল, কিন্তু ফিনিশ জনগণেরও যে ঐ মনোভাব ছিল না, তারই বা প্রমাণ কি? অর্থাৎ প্রশ্ন হ'তে পারে যে, ফিনিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি ফিনিশ জনসাধারণও সোভিয়েট-বিরোধী হয়, তা হ'লে আর দোষের কি হতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে, ফিনিশ জনসাধারণ কোনদিনই সোভিয়েট-বিরোধী বা নাৎসীপন্থী নয়। তার দু'টা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এ্যাল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের (Aaland Island) গত ডেপুটি নির্ব্বাচনের সময় ফিনল্যাণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে একজন প্রার্থী দাঁড়ান সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এই দ্বীপ সুরক্ষিত করবার দাবী নিয়ে এবং আর একজন প্রার্থী দাঁড়ান সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ সমর্থনের দাবী নিয়ে। নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার ফল হয় ৪০০ ভোট ও ৭৭০০ ভোট। অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়াকে সমর্থনের দাবী নিয়ে যে প্রার্থী ডেপুটির পদ চেয়েছিলেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে ৭৭০০-৪০০=৭৩০০ ভোটে পরাজিত করেন। এখানেই বোঝা যাচ্ছে, ফিনিশ জনসাধারণ কি চায়। ফিনিশ জনসাধারণ চায় সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী। আর একটি দৃষ্টান্ত অধুনা প্রকাশিত Sir E. D. Simon-এর "The Smaller Democracies" পুস্তক থেকে দিচ্ছি, যদিও লিবারাল

লখক সিমন্ আসল ঘটনাটি উল্লেখ করেও তার ব্যাখ্যা করেছেন বপরীত। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে ফিনল্যাণ্ডের কোয়ালিশনী বর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সালের নিয়ম অনুযায়ী ফিনল্যাণ্ডের ফ্যাশিষ্ট পার্টিকে জনসাধারণের অনিষ্টকর বলে' ডায়েটে তাকে বে-আইনী ঘোষণা করবার জন্য এক প্রস্তাব তোলেন। ডায়েটের (Diet) ২০০ জন সভ্যের মধ্যে ১৬০ জন এই প্রস্তাব সমর্থন করে' ভোট দেন এবং বাকি যে ৪০ জন ছিলেন, তার মধ্যে ১৪ জন ফ্যাশিষ্ট পার্টিরই প্রতিনিধি। কিন্তু এই ভোটকে বাতিল করে' দিয়ে ফ্যাশিষ্ট পার্টিকে আজও আইনী রাখা হয়েছে। সিমন সাহেব লিখেছেন:—

"This action on the part of the Government shows, their desire to preserve democracy even by drastic steps". (P. 165).

অর্থাৎ ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী এইভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অভিমত অগ্রাহ্য করেও গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রাখেন। কথাটা একটা লোককে হত্যা করে' তাকে পালন করার মত শোনাই না কি? তা হ'লে কি বোঝা যাচ্ছে? ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী ফ্যাশিষ্টপন্থী, ফিনিশ জনসাধারণ ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী; ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী সোভিয়েট-বিরোধী, ফিনিশ জনসাধারণ সোভিয়েটপন্থী।

সোভিয়েট রাশিয়ার দাবী

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, সোভিয়েট রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের কাছে কি দাবী করেছিল এবং কেন দাবী করেছিল?

ফিনল্যাণ্ড থেকে ফিনিশ উপসাগরে রাশিয়ার জাহাজের পথ বন্ধ করে' দেওয়া যায় এবং যে বল্টিক হোয়াইট সি ক্যানালের দ্বারা উত্তর সোভিয়েট ও লেনিনগ্রাডের যোগ রয়েছে, তাকেও অবরোধ করা যায়। ফিনিশ-সোভিয়েট সীমান্ত থেকে লেনিনগ্রাড মাত্র কুড়ি মাইল দূরে অর্থাৎ ফিনিশ সীমান্ত থেকে কামান বিস্ফোরণে লেনিনগ্রাড উড়িয়ে দেওয়া যায়। এর সামরিক গুরুত্ব বিলাতের রক্ষণশীল দলের 'টাইমস' পত্রিকার মারফতই বোঝা যাবে। গত যুদ্ধের সময় ১৯১৯ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের 'টাইমস' পত্রিকায় এই বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল যে:—

"So far as stamping out the Bolsheviks is concerned we might as well send expedition to Honolulu as to the White Sea. If we look at the map we shall find that the best approach to Petrograd is from the Baltic and the shortest route is through Finland. Finland is the key to Petrograd and Petrograd is the key to Moscow."

এখন পেট্রোগ্রাডের নাম হয়েছে লেনিনগ্রাড্ এবং আছে বল্টিক হোয়াইট সি ক্যানাল। 'টাইমস' পত্রিকার মার কথা হচ্ছে যে, ফিনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে লেনিনগ্রাড আক্রমণের সুবিধা সব চেয়ে বেশী এবং লেনিনগ্রাড দখল করলে মস্কোও দখলে আসতে দেরী হবে না। সুতরাং রাশিয়া কি চাইতে পারে ফিনল্যাণ্ডের কাছে? রাশিয়া চেয়েছিল যে, ফিনল্যাণ্ড তার সঙ্গে বল্টিক রাষ্ট্রগুলির মত পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করুক। ফিনল্যাণ্ডের কাছে রাশিয়া আত্ম-নিরাপত্তার জন্য কতকগুলি দাবী পেশ করল। দাবী হচ্ছে, ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কয়েকটা ঘাঁটি রাশিয়াকে দিতে হবে এবং লেনিনগ্রাডের উত্তরে খানিকটা জায়গা দিতে হবে, যার পরিবর্ত্তে রাশিয়া ক্যারেলিয়াতে দ্বিগুণ জায়গা ফিনল্যাণ্ডকে দিতে রাজী হয়েছিল ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। এই দাবীগুলি ফিনিশ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ফিনিশ জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের প্ররোচনায় অগ্রাহ্য করেছে।

ফিনিশ যুদ্ধের আবশ্যকতা

সর্ব্ব শেষ প্রশ্ন হ'তে পারে যে, এত শীঘ্র সোভিয়েট রাশিয়ার দিক থেকে ফিনল্যাণ্ডে এই যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল? এটা কি হঠকারিতা নয়?

যাঁরা রাজনীতির অতিবাস্তব দিকটা বুঝতে পারেন না, তাঁরাই এই রকম প্রশ্ন করেন। রাজনীতিক বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার কাল্পনিক বিলাসিতা নেই। সোভিয়েট রাশিয়া বাস্তবপন্থী, যা প্রত্যক্ষভাবে ঘটছে, বাস্তব জগতের সেই উত্তপ্ত ভিটের উপর তার নীতিকে রূপ দিতে হয়। দেখা গেল যে, দক্ষিণ দিকে "ব্ল্যাক সি" (Black Sea) দিয়ে যে আক্রমণের পথ তাকে বন্ধ করা আপাতত সম্ভব হ'ল না। তুরস্কের শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় অন্যান্য রাষ্ট্রের প্ররোচনায় রাশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে গররাজি হ'ল। রাশিয়ার দাবী ছিল যে, ব্ল্যাক-সি রাষ্ট্রগুলি ভিন্ন অন্য সব রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজের বস্ফোরাস্ থেকে ব্ল্যাক-সির পথ বন্ধ করে দিতে হবে। তুরস্ক রাজী হ'ল না এবং মলোটোভের ভাষায়,—

"Turkey....thereby definitely discarded the policy of strict neutrality and entered into the orbit of the developing European war."

তারপর জার্ম্মানীও যুদ্ধ থেকে বিরত হ'তে পারে না এবং শীতকাল কেটে গেলে, যেহেতু যুদ্ধ আরও ঘোরতরভাবে ঘনিয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য এই সময়ের মধ্যেই উত্তর দিকের পথ আগলে রাখবার বন্দোবস্ত করতে হয়। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ার দিক থেকে ফিনিশ সমস্যার জরুরী মীমাংসা ভিন্ন কোন গত্যন্তর ছিল না।

মীমাংসা যখন কোন উপায়েই সম্ভব হ'ল না, অর্থাৎ রাশিয়া যখন দেখল যে, ফিনল্যাণ্ডের ম্যানারহাইম-ট্যানার প্রমুখ বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই শান্তিপূর্ণ রফা করতে রাজী নয়, অথচ ফিনিশ জনসাধারণ এই রফার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল, তখন রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের সব বামপন্থী দলগুলি ও যুদ্ধ-বিরোধী সৈনিকদের নিয়ে মঁশিয়ে কুইসিনেনের নেতৃত্বে একটি সাধারণতন্ত্র (People's Government) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করল। এই কুইসিনেন গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে রাশিয়া পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করল, হাজার হাজার বর্গ মাইল সোভিয়েট এলাকা তাদের ছেড়ে দিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে যে, তাদের আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে। ম্যানারহাইমের দল এই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, যেমন করেছিল ১৯১৭ সালে। কিন্তু তখন সোভিয়েট রাশিয়া ছিল শিশু, এখন সে পূর্ণ শক্তিমান। সুতরাং ফিনিশ জনসাধারণকে এইবার দমন করা আর সম্ভব হবে না।

তা হ'লে ফিনল্যাণ্ডে কি যুদ্ধ হচ্ছে? কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে? ১৯১৭ সালের ইতিহাসের আজ পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ভূমিকার সঙ্গে আজ ফিনল্যাণ্ডে ম্যানারহাইমের কিছু প্রভেদ নেই। ফিনল্যাণ্ডের ম্যানারহাইম-ট্যানার দল স্পেনের ফ্রাঙ্কোর দলের অনুরূপ এবং ফিনল্যাণ্ডের কুইসিনেন গবর্ণমেণ্ট স্পেনের রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্টের সমতুল্য। ফিনিশ যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা হচ্ছে, স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে "International Brigade"-এর অনুরূপ, তফাৎ এই যে, শুধু রাশিয়ার লালফৌজ আজ ফিনিশ জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। আসল যুদ্ধ গৃহ-যুদ্ধ (Civil War) ভিন্ন অন্য কিছু বলে মনে হয় না। —(আনন্দবাজার)

ফিনিশ সঙ্ঘর্ষে সোভিয়েট সমরনীতির আলোচনা

ভানু গুপ্ত

ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েটবাহিনীর দুর্গতির মুখরোচক সংবাদে আজকাল খবরের কাগজ প্রত্যহই মুখর থাকে। অবশ্য সমস্ত সংবাদই একতরফা; সোভিয়েট তরফের বিবরণ এক রকম দেওয়াই হয় না। সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করাই যদি এ রকম প্রচার-কার্য্যের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করতে হয়, সে উদ্দেশ্য কতকটা সফল হয়েছে। কারণ আমরা অনেকেই, এমন কি শিক্ষিতেরাও শিশু-সুলভ সারল্যে এ সব সংবাদ নির্ব্বিচারে মেনে নিচ্ছি; এ সারল্যের পেছনে অচেতন মনের কোনো প্রেরণা,

ম্যানারহাইম

যেমন বিলাতী প্রচার সম্বন্ধে বিশ্বাস-প্রবণতা বা কম্যুনিজম-বিমুখতা আছে কিনা সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও আরও একটা যুক্তি থাকে। সেটা হচ্ছে এই যে, সোভিয়েট প্রায় দেড় মাসের মধ্যেও ফিনল্যাণ্ড দখল করতে পারে নি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তুলনায় জার্ম্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের কথা মনে আসে। জার্ম্মানী 'বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের' (Lightning War) নীতি অবলম্বন করে ১৮ দিনের মধ্যে পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করেছিল। সোভিয়েট যদি ফিনল্যাণ্ডকে সেই রকম করতে পারত তা'হলে তাকে বাহবা দেওয়া যেত।

কিন্তু এই যুক্তি ওঠাবার সময় কয়েকটা ভুল করা হয়। প্রথমত, বাইরের লোকের বাহবা পাওয়ার জন্যে লড়াই চালানো হয় না, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করেই রণকৌশল নির্দ্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে, বিশেষত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জার্ম্মানী ও সোভিয়েটের যুদ্ধ-নীতি এক হতে পারে না। তৃতীয়ত, পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে সব দিক দিয়েই পার্থক্য খুব বেশী।

প্রথম কথাটাই ধরা যাক। রণ-কৌশল নির্দ্ধারিত হয় কোনো একটা ব্যাপক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। এ উদ্দেশ্য কতকটা রাজনৈতিক, কতকটা সামরিক। সব ক্ষেত্রেই দুটো উদ্দেশ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জার্ম্মানীরই দৃষ্টান্ত দিই। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 'বিদ্যুৎগতি যুদ্ধ' করা জার্ম্মানীর পক্ষে প্রয়োজন ছিল, কারণ পশ্চিমে বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে-ছিল, পোল্যাণ্ডকে তাড়াতাড়ি খতম না করলে তাকে এক সঙ্গে দুই সীমান্তে যুদ্ধ করতে হত এবং অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সামরিক নীতি সে অবলম্বন করেছিল, পশ্চিম সীমান্তে তা করে নি। মিত্রশক্তির অস্ত্রবল এর একটা কারণ বটে; কিন্তু সেটাই সব নয়। গত বারের মতো এবারও সে নিরপেক্ষ দেশ লঙ্ঘন করে' মিত্রশক্তিকে একটা প্রচণ্ড আঘাত দেবার চেষ্টা করতে পারত। আর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য জার্ম্মানীর আছে—সে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভেদ ঘটাতে চায়। ফ্রান্সকে কোনো রকম আঘাত না করে, সে ফরাসী জনসাধারণের মনোভাবে পরিবর্ত্তন আনতে চায়, যাতে তারা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার বিরোধী হয়ে ওঠে। এই অবসরে সে মাইন ও সাবমেরিনের আক্রমণে বৃটিশ নৌ-শক্তিকে খর্ব্ব করতে চায়।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই জার্ম্মানী 'বিদ্যুৎগতি যুদ্ধে'র নীতি অবলম্বন করে বা করে না। সোভিয়েটের বেলাতেও এ তথ্যটা প্রযোজ্য হতে পারে। সোভিয়েট যদি বুঝে থাকে যে, ফিনল্যাণ্ডে এক মাসের বদলে এক বছর যুদ্ধ চালালেও ভাবনার কিছু নেই, কারণ ইউরোপের বৃহত্তর যুদ্ধের জন্যে বাইরের কোনো দেশ ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে তেমন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, তা হলে বিদ্যুৎগতি যুদ্ধ সে কেন করতে যাবে, বিশেষত যখন মন্থর যুদ্ধে তার শক্তিক্ষয় হবে যথাসম্ভব কম? তা ছাড়া তার আর একটা উদ্দেশ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। গোঁড়া রক্ষণশীল ইংরেজরাও স্বীকার করে' থাকেন যে, অন্য দেশে জনগণের বিপ্লব বাধিয়ে ধনিকদের হাত থেকে ক্ষমতা শ্রমজীবীদের হাতে নিয়ে আসায় সাহায্য করা সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শ। ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কে সে অভিপ্রায় তার নিশ্চয়ই আছে, বিশেষ করে' ইতিহাস থেকে আমরা যখন জানি যে, ফিনল্যাণ্ডের অসহায় জনসাধারণ বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের বিরোধী। এই ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী ও তার সৈন্য-বাহিনীর উপর যতখানি সামরিক চাপ রাখলে ফিনল্যাণ্ডে গণ-বিপ্লব এগিয়ে আসে ঠিক ততখানি চাপ সোভিয়েট দেবে। ফিনিশ জনসাধারণ যদি ক্ষমতা অধিকার করে নেয়, তাহলে সোভিয়েটের সামরিক ও রাজনৈতিক সমস্ত উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়ে যায়।

এ ছাড়া অন্য কূটনৈতিক উদ্দেশ্যও তার থাকতে পারে। সোভিয়েট হয় তো ফিনিশ সঙ্ঘর্ষকে দীর্ঘস্থায়ী করে' ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াকে তার মধ্যে জড়িয়ে নিতে চায়। বিলাতী সামরিক সংবাদদাতারা মনে করেন যে, সোভিয়েট নরওয়ের নার্ভিক বন্দর দখল করবার মতলব করেছে। এই বন্দর যদি সে দখল করতে পারে, তা'হলে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলাণ্টিক মহা-

সাগর পর্যন্ত সোভিয়েট প্রধান্য বিস্তৃত হবে এবং সোভিয়েট আটলান্টিক থেকে উত্তর সাগরে প্রবেশ-পথ মুঠোর মধ্যে রাখবে। নরওয়ের উপকূলে এলে সোভিয়েট ইংলণ্ডের একেবারে সামনা-সামনি এসে যাবে।

তারপর ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে ক্রমশ বৃটেন ও ফ্রান্সকে টেনে এনে পশ্চিমে জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ খানিকটা সহজ করে' দেবার মতলবও সোভিয়েটের থাকা অসম্ভব নয়।

মলোটোভ

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, সোভিয়েট বৃটিশ মূলধন-নিয়ন্ত্রিত পেটসামোর নিকেল খনিগুলো ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছে এবং লালফৌজ নরওয়ের সীমায় পৌঁছে গেছে।

ফিনিশ সংঘর্ষ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, সোভিয়েট সাধারণত জার্ম্মাণীর বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করতে পারে না। 'বিদ্যুৎগতি যুদ্ধ' হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গীন ধ্বংসের যুদ্ধ। শুধু শত্রুর সৈন্যবাহিনী নয়, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ চালাতে হবে এবং প্রথম চোটেই ক্রমাগত প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে শত্রু-জাতিকে নৈতিক ও সামরিক সমস্ত দিক দিয়ে পিষে ফেলতে হবে। এ রকম যুদ্ধে বিমানবাহিনী একটা প্রধান অঙ্গ; কারণ, শত্রুর সৈন্যব্যূহের পেছনে অসামরিক এলাকায় নির্ব্বিচার বোমা-বর্ষণে সমস্ত জাতিকে ধ্বংস বা ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া প্রয়োজন। সোভিয়েট এ পদ্ধতি নিতে পারে না; কারণ সোভিয়েট একটা জাতি নয়, কম্যুনিজমের আদর্শে বহু বিভিন্ন জাতির সমন্বয় হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জাতি হিসাবে কেউ তার শত্রু নয়। বরং সমস্ত জাতির জনসাধারণকেই সে মিত্র মনে করে এবং যে কোনো দেশের জনসাধারণের প্রকৃত ক্ষমতালাভকে সে তার স্বার্থ ও আদর্শের অনুকূল মনে করে। অতএব নির্ব্বিচার বিমান-আক্রমণে ফিনল্যাণ্ডের অ-সামরিক অধিবাসীদের সে নিধন করতে পারে না। গণ-বিপ্লবই যদি তার আদর্শ হয়, তবে জনসাধারণকে আক্রমণ করে লালফৌজ কখনও তাদের সোভিয়েট-বিরোধী করে' তুলতে পারে না। ফিনল্যাণ্ডে লালফৌজ তা' করছেও না। হেলসিঙ্কির তরফ থেকেই বলা হয়, শত শত বিমান-পোত ফিনল্যাণ্ডের সমস্ত শহরের উপর দিয়ে প্রায়ই উড়ে যায়। যারা এ রকমভাবে উড়ে যেতে পারে, তারা আর কিছু না পারুক, ইচ্ছে করলে বোমা ফেলে সমস্ত শহর ভস্মসাৎ করে' দিতে পারে, আশা করি এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না।

তৃতীয় কথা, ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীন পার্থক্য। দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্য যথেষ্ট। ফিনল্যাণ্ডে মেকানাইজড্ বাহিনীর চলাচলের ভয়ানক অসুবিধা; সমস্ত দেশটা জলাশয় ও জঙ্গলে আকীর্ণ। পোল্যাণ্ডের সমতলে মোটর-বাহন সৈন্যদের অগ্রসর হবার রাস্তা ছিল ভালো। তারপর আবহাওয়া। শীতকালে ফিনিশ সংঘর্ষ চলছে, পোলিশ অভিযানের সময় আবহাওয়া ছিল চমৎকার। ফিনল্যাণ্ডের শীত আমাদের কল্পনাতীত; দুর্গম স্থলপথ ও জলপথ বরফে আরো দুর্গম হয়েছে। পশ্চিম সীমান্তে এর চেয়ে কম শীতই দুই পক্ষকে আড়ষ্ট করে' ফেলেছে।

কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে বড় তফাৎ ঘটিয়েছে তাদের পররাষ্ট্র-নীতি। পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতি বরাবর ছিল জার্ম্মানীর তাঁবেদারী। জার্ম্মান আক্রমণকে প্রতিহত করবার মতো কোনো আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পোলিশ শাসক-সম্প্রদায় করে নি; পোলিশ-জার্ম্মান সীমান্তে পোল্যাণ্ড কোনো দুর্গ-শৃঙ্খল গড়ে নি। তাই প্রথম জার্ম্মান আঘাতেই অপরিণামদর্শী পোলিশ শাসকদের সামরিক ব্যবস্থা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ফিনিশ ধনতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-নীতি স্পষ্টত সোভিয়েট-বিরোধী। সোভিয়েট আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এবং প্রয়োজন হলে বৃহত্তর ধনতান্ত্রিক শক্তির ঘাঁটি হিসাবে ফিনল্যাণ্ড ব্যবহারের জন্যে ফিনিশ শাসকেরা নিখুঁত সামরিক ব্যবস্থা গড়েছিলেন (সোভিয়েটের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র যে চলছিল না তা জোর করে' বলা যায় না; নইলে শীতকালে ফিনল্যাণ্ডকে আয়ত্তে আনা কঠিন জেনেও সোভিয়েট অপেক্ষা করে' না থেকে কেন এই সময় তাকে আক্রমণ করল?)।

আর একটা কথা। যাঁরা পোল্যাণ্ডের উপমা আনেন, তাঁদের আবিসিনিয়ার কথাও মনে রাখা উচিত। আবিসিনিয়া ফিনল্যাণ্ডের চেয়ে বহু গুণ দুর্ব্বল ছিল; সমস্ত জাতটাই ছিল এক রকম নিরস্ত্র; বাইরের কোনো দেশও তাদের সাহায্য করে নি। উপরন্তু আবিসিনিয়ার দুই দিকে ইতালীর রাজ্য ছিল। এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইতালীকে ছয়মাস লড়তে হয়েছিল আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এমনই দুরতিক্রমণীয়।

পরিশেষে ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট রণ-কৌশলের একটু উল্লেখ করব। 'রয়টার' মারফৎ আমরা এ রকম সংবাদ বহুবার পেয়েছি যে, সোভিয়েট সেনাপতিরা লড়াইয়ের কায়দা জানে না, পালে পালে রুশ সৈন্যকে তারা ফিনিশদের মেশিনগানের মুখে পাঠাচ্ছে এবং দুই দিকের গুলী খেয়ে সেই সৈন্যরা পালে পালে মরছে ইত্যাদি। এ সম্পর্কে আমরা কিছু বলবার অধিকারী নই। সোভিয়েট-বিরোধী এবং সমরবিজ্ঞানী "ষ্টেটস্‌ম্যান" কয়েকদিন আগে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট সামরিক প্ল্যান সম্বন্ধে লিখেছেন—

"যে সামরিক প্ল্যান গ্রহণ করা হয়, তার চেয়ে ভালো প্ল্যান আর হতে পারত না। ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে কারেলিয়ান যোজককে ধরে' রাখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। অতএব যথাসম্ভব বেশী ফিনিশ সৈন্যকে অচল করে' রাখবার জন্যে লেনিনগ্রাড সেনাপতি-মণ্ডলী উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেন; সেই সঙ্গে তাঁরা পাশ থেকে লাডোগা হ্রদের উত্তরে যে অভিযান করেন তার উদ্দেশ্য ছিল, রিজার্ভ সৈন্যদের (ফিনিশ) ব্যাপৃত রাখা। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে মুরমানস্ক সেনাপতিমণ্ডলী পেটসামো অঞ্চলে আক্রমণ করেন; তাঁদের একটা স্পষ্ট রণকৌশলী উদ্দেশ্য ছিল, নরওয়ে থেকে ফিনল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করে' দেওয়া; কিন্তু আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল, তা হচ্ছে উত্তরের ফিনিশ বাহিনীর যত বেশী সম্ভব সৈন্যকে মেরুবৃত্তের মধ্যে টেনে আনা। এর ফলে মধ্য ফিনল্যাণ্ডের সঙ্কীর্ণ অংশ দিয়ে সুওমুসালমি এবং বোথনিয়া উপসাগরস্থিত উলুর উপর আঘাত করবার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। সোভিয়েট আশা করেছিল, এই আঘাতেই চূড়ান্ত জয়-পরাজয় হয়ে যাবে। শীত না পড়া পর্যন্ত এই প্ল্যান খুবই সফল হয়েছিল। রুষরা মধ্য ফিনল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক পথ অগ্রসর হয়ে যেতে সমর্থ হয়, উত্তরে তাদের সাফল্যের কথা বাদই দিলাম।" (আঃ বাঃ)

কলিকাতা বাগবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর

বাগবাজারে যুদ্ধ

এই যুদ্ধের দুইটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ এইঃ—নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর তিনটি কন্যা ছিলেন, ঘেসেটী-বেগম, মায়খানা-বেগম ও আমিনা-বেগম (সিরাজউদ্দৌলার মাতা)। ঘেসেটী-বেগমের স্বামী নিবাইস্-মহম্মদের মৃত্যু হইলে বৈদ্য-বংশীয় রাজা রাজ-বল্লভ সেন ঢাকায় তাঁহার নায়েব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিরাজের ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত থাকিতেন। এই হেতু, আলিবর্দ্দির মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে (কৃষ্ণদাসকে?) স্বীয় প্রচুর ধন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদিসহ কলিকাতায় ইংরাজদিগকে আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণবল্লভ গর্ভবতী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পুরীধাম-যাত্রা-ছলে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ মার্চ তারিখে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজদিগের আদেশে উমিচাঁদের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবল্লভকে ধন-সম্পত্তি ও পরিজনবর্গসহ মুরশিদাবাদে ফেরৎ পাঠাইবার নিমিত্ত সিরাজ ক্রোধভরে ইংরেজদিগকে পত্র লেখেন। তৎকালে ক্লাইভ বালেশ্বরে ছিলেন। তিনি ওয়াট্‌স্‌কে লিখিলেন, "আমি বরং ধন-সম্পত্তিসহ কৃষ্ণবল্লভকে নবাবের নিকট পাঠাইতে পারি, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীলোকদিগকে কিছুতেই পাঠাইতে পারি না।" ওয়াট্‌স্ সাহেব সিরাজকে এই কথা জানাইবামাত্র সিরাজ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ এইঃ—উমিচাঁদের আত্মীয় রাজারাম ও নারায়ণ দাস (দুই সহোদর) সিরাজের প্রধান চর ছিলেন। সিরাজ কিছুপূর্ব্বে রাজারামের মুখে শুনিয়াছিলেন, ইংরেজরা দুইটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিতেছেন। ইহা সত্য কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত সিরাজ একখানি পত্রসহ নারায়ণ দাসকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। নারায়ণদাস উমিচাঁদের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উমিচাঁদ নারায়ণদাসকে লইয়া ড্রেক সাহেবের নিকটে গেলেন। ড্রেক সাহেব পত্র লইলেন না; অধিকন্তু তিনি নারায়ণ-দাসকে নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়া কলিকাতা হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নারায়ণদাস গঙ্গার উপর দিয়া উত্তর-দিকে যাইতে যাইতে দেখিলেন, চিৎপুর-নবাবপটীর কিঞ্চিৎ উত্তরে কাশীপুর নামক স্থানে আরও একটি আট কোণা কেল্লা নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহার নাম Kelsall House বা Kashipur House. এখন ইহা "শেঠেদের বাগান-বাড়ী" বলিয়া বিখ্যাত। *সিরাজ নারায়ণদাসের মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া ক্রোধভরে ড্রেক সাহেবকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, "তোমরা এখনই এই কেল্লা দুইটি ভাঙ্গিয়া ফেল; নচেৎ আমি শীঘ্রই কলিকাতা আক্রমণ করিব।"*

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১১ জুন তারিখে গভর্ণর ড্রেক সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন, ইউরোপীয়, আর্ম্মিনিয়ান ও ফিরিঙ্গী সৈন্য লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদের ৫১৫ জন যোদ্ধা হইতে পারেন। তাঁহারা নামে যোদ্ধা,—একদিনও জীবনে বন্দুক ধরেন নাই। কর্ণেল স্কট সাহেব অর্ম্মি সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, "কলিকাতা রক্ষা করিতে এক হাজার লোকের অধিক লাগে না।" এস্-সি হিল সাহেব লিখিয়াছেন, "বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানে যে নূতন কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে এন্‌সাইন্ পিকার্ড ও ক্যাপ্টেন ব্র্যাগ্ সৈন্যাধ্যক্ষ রহিলেন। ওল্ড পাউডার মিল ঘাটে (বর্ত্তমান 'অন্নপূর্ণা ঘাটে) তিনখানি জাহাজ রক্ষিত হইল। প্রথম-খানির নাম Prince George, হেগ্ সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন; দ্বিতীয়খানির নাম Fortune, ক্যাম্‌বেল সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন; তৃতীয়খানির নাম Chance, চ্যাম্‌পিয়ন সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন রহিলেন। কোমরটুলীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় 'সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, নবরত্ন ও যোড়-বাঙলা পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পাছে সিরাজের সৈন্য এই সকল প্রাসাদ ভগ্ন করিয়া দেয়, এই ভয়ে তিনি বর্ত্তমান 'অন্নপূর্ণাঘাট হইতে শোভাবাজার পর্য্যন্ত চিৎপুর রোডের উপর বড় বড় গাছ কাটাইয়া আনিয়া পাহাড়ের মত স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আপনার লাঠিয়াল, সড়কীদার ও বরকন্দাজ রাখিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বনমালী সরকার, গোকুলচন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাগবাজারের প্রধান ধনাঢ্য ও বিখ্যাত লোক ছিলেন।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে, ১৬ জুন (১১৬৩ বঙ্গাব্দে, ৬ আষাঢ়, বুধবার) আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা ১২টার সময় সিরাজ-সেনাপতি মীরজাফরের কামান ঘন ঘন গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। মীরজাফরের সৈন্যগণ বরাহনগর, চিৎপুর, কাশীপুর ও পাইকপাড়ায় তাঁবু ফেলিয়া রহিল। পেরিনের বাগান ও তাহার দক্ষিণদিকে ক্যাপ্টেন ব্র্যাগ ও এনসাইন্ পিকার্ড নূতন কেল্লা রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমত মীরজাফরের ৪০০০ সৈন্য মারহাট্টা-ডিচ্ অতিক্রম করিয়া বাগবাজারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। তৎকালে চিৎপুরে মারহাট্টা-ডিচের উপরিভাগে ইংরেজদিগের একটি Draw Bridge (টানা সাঁকো) ছিল। তাঁহারা মনে করিলে এই ব্রিজ্ খুলিয়া দিতে ও বন্ধ করিতে পারিতেন। ইংরেজরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। মীরজাফর এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বর্ত্তমান কারমাইকেল কলেজের নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করেন। তাহাতেও তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন।

বাগবাজারে সাবর্ণ্যবেড়ে

এক সময়ে সমগ্র কলিকাতা, বেহালা-বড়িশার সাবর্ণ্য চৌধুরী মহাশয়দিগের জমিদারী ছিল। এখন যেখানে 'পঞ্চানন ঠাকুর ('বাবা ঠাকুর) আছেন, সেই স্থানের নাম "সাবর্ণ্য-বেড়ে।" উত্তর-দিকে এই স্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদের জমীদারীর সীমা ছিল। এই হেতু ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে।

বাগবাজার খাল

মারহাট্টা-ডিচ্ যখন ক্রমে ক্রমে বুজিয়া আসিতে লাগিল, তখন নৌকা করিয়া আমদানী-রপ্তানি করিবার বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। এই হেতু, বাগবাজার খালের সৃষ্টি। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহা খনন করিতে আরম্ভ করা হয় এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। তৎকালে Gailiff সাহেব কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ইহা খনন করা হইয়াছিল। এই খালের দক্ষিণপার্শ্বে Gailiff Street এখনও তাঁহার নাম জাগরূক রাখিয়াছে। ইহার উপরিভাগে ৭টি ব্রিজ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাগবাজারে পংক্ষীর দল

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র। *তিনি দেখিলেন, ভদ্রসন্তানগণ পথেঘাটে বসিয়া গাঁজা খায়।* এই *হেতু, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি একটি গাঁজার আড্ডা খুলিলেন। ইহার নাম হইল "গোচর্ম্ম বিহার"।* ঘরখানি *দৈর্ঘ্যে* ৩০০ হাত ও *প্রস্থে* ১০০ হাত। তামাক দিয়া মেজে *নির্ম্মিত হইল;* গাঁজা দিয়া বেড়া তৈয়ারী হইল এবং সিদ্ধি দিয়া ঘরের চাল প্রস্তুত হইল। যাহারা এই "বিহার"ভূমিতে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদের জন্য তিনটি শ্রেণী খোলা হইল। একদমে ১০৮ ছিলিম গাঁজা খাইলে সে প্রথম শ্রেণীতে, ৫০ ছিলিম খাইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ২৫ ছিলিম খাইলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইত। এক একটি পংক্ষীর নামে প্রত্যেকের নাম রাখা হইল। প্রত্যেক লোক (পক্ষী) নিজ নামানুসারে পক্ষীর মত আওয়াজ করিত, ডানা ঝাড়া দিত ও বসিতে শিখিত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কালোয়াৎ ও বাদকেরা আসিয়া গাওনা-বাজনা শিখাইত। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবু উদারস্বভাব ছিলেন। তিনি পংক্ষীদের জন্য প্রায় ২০০ খাঁচা নির্ম্মাণ করাইলেন। আহারের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত। চব্য-চূষ্য, লেহ্য-পেয়ের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২০০ হইয়াছিল।

আজ-কাল

স্বাধীনতা দিবস

আগামী ২৬শে জানুয়ারী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্যে সমস্ত বামপন্থী কর্ম্মী সংকল্প করেছেন। পাটনাতে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছেন যে, ২৬শে জানুয়ারী কর্ম্মীরা গ্রেপ্তার হতেও দ্বিধা করবে না। বাঙলায় শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীগোপাল হালদার প্রমুখ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যেরা বাঙলায় অসহ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলকে স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি অর্জ্জনের পথে পা বাড়াবার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু এবার ওয়ার্কিং কমিটি যেভাবে স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পরিবর্ত্তন করে সুতাকাটা, খদ্দর ধারণ ও হরিজন উন্নয়নের কথা ঢুকিয়েছেন তাতে আন্দোলনকামী সমস্ত কর্ম্মী বিক্ষুব্ধ। সেইজন্যে অনেকে আগেকার সংকল্প-বাক্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন, কেউ কেউ বা সুতাকাটা ইত্যাদির কথাগুলো বাদ দিয়ে বর্ত্তমান সংকল্প বাক্য পাঠ করতে মনস্থ করেছেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের প্রতি এ সম্পর্কে এক নির্দ্দেশ প্রচার করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, স্থানীয় অবস্থায় প্রয়োজন হলে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যেরা স্বাধীনতা দিবসে পৃথক সভা করে প্রাচীন সংকল্প বাক্য গ্রহণ করতে পারেন ; কিন্তু কোনোক্রমেই সুতাকাটা ইত্যাদির ধারাগুলি পড়া চলবে না। তিনি নিজে ২৬শে জানুয়ারী লক্ষ্মৌতে ১৯৩০ সালের সংকল্প-বাক্য গ্রহণ করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল পৃথক সভা করবার বা অন্য সংকল্প-বাক্য গ্রহণের পক্ষপাতী নয়, তবে তাঁহারা গান্ধীবাদের কথাগুলি বাদ দিতে চান। ভারতীয় সাম্যবাদীদের পক্ষ হইতে শ্রী পি সি যোশী এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, গান্ধীবাদী ছাড়া আর সকলকে কংগ্রেস থেকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে এই সংকল্প-বাক্য রচনা করা হয়েছে ; এই সংকল্প-বাক্য গ্রহণ না করলে গান্ধীবাদী নেতারা আন্দোলন আরম্ভ না করবার একটা অজুহাত এবং কংগ্রেসকে অনৈক্যের পথে নিয়ে যাবার সুযোগ পাবেন ; অতএব এই সংকল্প-বাক্য গ্রহণ করাই সমীচীন ; তবে বামপন্থীদের উচিত প্রকাশ্যে এই সংকল্প-বাক্যের অসারতা গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যপন্থার অসারতা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া।

বাঙলা কংগ্রেস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁদের প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে যে সব সিদ্ধান্ত চেয়েছেন, তা দ্রুত জানাবার জন্যে বাঙলা কংগ্রেসের সভাপতি রাষ্ট্রপতির কাছে এক তার করেন। তার ফলে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯শে জানুয়ারী তারিখে ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির এক বিশেষ বৈঠক ডেকেছেন।

গুজরাট কংগ্রেস কমিটির এক সভায় সর্দার বল্লভভাই এই বলে ভয় দেখান যে, বাঙলা কংগ্রেস কমিটি যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার ফলে বাঙলা কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, সর্দ্দারের এই হুমকিতে তিনি বিচলিত নন।

বড়লাটের ঘোষণা ও সমালোচনা

বোম্বাইতে বড়লাট গত ১০ই জানুয়ারী এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, ভারতকে ওয়েষ্টমিনষ্টার ষ্ট্যাটিউট বর্ণিত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেওয়াই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ; তবে ভারতের নানা দলের মধ্যে মতানৈক্য না কমলে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা চলে না। এই ঘোষণার উত্তরে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন যে, ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস চায় না, চায় স্বাধীনতা ; আর সমস্ত দলনেতা সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিনিধি নন ; সুতরাং তাদের মধ্যে মতৈক্যের কথা না বলে গণ-পরিষদের ব্যবস্থা করাই সংগত। হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীসাভারকরও বড়লাটের বিবৃতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তবে বড়লাট বিবৃতি দেওয়ার পর ১৩ই জানুয়ারী বোম্বাইতে শ্রীভুলাভাই দেশাই এবং জনাব জিন্না সাহেব বড়লাটের সঙ্গে পর পর দেখা করে দীর্ঘ আলাপ করেছেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়েই নাকি আলাপ হয়েছে। এই রকম বিবৃতির পর বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতা দেশাইজী দেখা করায় সুভাষচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

পাঞ্জাব ও বাঙলা

পাঞ্জাবের অবস্থাও প্রায় বাঙলার মতো। সেখানে ব্যবস্থা পরিষদে গবর্ণমেণ্ট বলেছেন যে, ৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্সে মোট ১৯১ জনকে পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নোয়াখালীতে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছিল, ভোটাধিক্যে তা অগ্রাহ্য হয়। নোয়াখালীতে কয়েক বছর ধরে কি রকম অনাচার চলছে একাধিক বক্তা তা বর্ণনা করেন।

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, বাঙলাদেশে বিশেষত নোয়াখালী, পাবনা ও মালদহে হিন্দুদের যে কি রকম নির্য্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে, মহাসভা তার তালিকা প্রস্তুত করেছেন ; তালিকাটি বেশ বৃহদাকার হবে।

সীমান্তে হাঙ্গামা

সীমান্তে উপজাতিরা উগ্র হয়ে উঠেছে। অপহৃত মেজর ডুগালের মুক্তির জন্যে যে চাপ দেওয়া হয় তারই জবাবে নাকি তারা সীমান্তের নানা জায়গায় হানা দিয়ে হত্যা, লুঠতরাজ ও

মানুষ অপহরণ আরম্ভ করেছে। ভারতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের বেশ একটা বড় সঙ্ঘর্ষ হয়ে গেছে। আফ্রিদিরাই এই উপদ্রবে অগ্রণী হয়েছে। এদিকে মেজর ডুগাল অন্য উপজাতীয় মালিকদের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করেছেন। উপজাতীয় হানা এখনো চলছে।

সোভিয়েট সম্পর্কে বিতর্ক

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানে যে পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন করেছে, তাতে সে জগতের বিশ্বাস হারিয়েছে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে গত ১২ই জানুয়ারী কলকাতায় সমস্ত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক বিতর্ক সভা হয়। সভায় এইভাবে প্রস্তাবটা ওঠানো হয় যে, সভার মতে সোভিয়েট তার বর্ত্তমান পররাষ্ট্র নীতির জন্যে জগতের বিশ্বাস হারিয়েছে। ৭ জন ছাত্র প্রস্তাবের পক্ষে এবং ৬ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি ভোটে দিলে বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। যাঁরা প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাঁদেরও অনেকে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন-নি।

ইউরোপের আবর্ত্ত

ফিনিশ সংঘর্ষ

ফিনদের জয়-সংবাদ এ সপ্তাহে একটু কমেছে। ১৪।১৫ দিন ধরে' সাল্লা রণক্ষেত্রে ফিনিশ সাফল্যের সংবাদ শোনার পর হঠাৎ ১৩ই জানুয়ারী তারিখে শোনা গেল যে, সাল্লা অঞ্চলে লালফৌজ ফিনল্যাণ্ডের প্রায় মাঝামাঝি চলে' গেছে। সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, সম্প্রতি হেলসিঙ্কির পক্ষ থেকে যে সব সাফল্যের কথা প্রচার করা হয়েছে তা সমস্তই ভিত্তিহীন, এ ছাড়া লালফৌজ পুনঃ-সংগঠনের জন্যে জার্ম্মান অফিসার চাওয়ার সংবাদও তাঁরা অস্বীকার করেছেন।

১২ই থেকে ১৫ই জানুয়ারী চারদিন বিরাট সোভিয়েট বিমানবহর ফিনল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র হানা দেয়; একদিন ৫০০ বিমান ফিনল্যাণ্ডে যায়। হেলসিঙ্কি, লাটি, ভিবর্গ, ভাসা, আবো ও হাঙ্গোর উপর তারা বোমাবর্ষণ করে। হাঙ্গোর সঙ্গে বাইরের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। জমি থেকে মাত্র এক হাজার ফুট উঁচুতে নেমে এসে সোভিয়েট বিমান বোমাবর্ষণ করে। হেলসিঙ্কি বলছে, সব শুদ্ধ ২০০০ বোমা পড়েছে; এই বোমাবর্ষণে মোট ১৮ জন মারা গেছে।

নরওয়ে-সুইডেনকে সোভিয়েটের হুমকি

নরওয়ে ও সুইডেনে গবর্ণমেণ্ট-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ও সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে এবং উভয় দেশ, বিশেষত সুইডেন সরকারী উৎসাহে ফিনল্যাণ্ডে সাহায্য পাঠাচ্ছে—এই অভিযোগ করে' সোভিয়েট দুই গবর্ণ-মেণ্টের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠায় এবং এই বলে' তাদের সাবধান করে' দেয় যে, এ রকম করলে তাদের সঙ্গে সোভিয়েটের গোলমাল বাধবে।

নরওয়ে ও সুইডেন উত্তরে জানিয়েছে যে, তারা সরকারী ভাবে ফিনল্যাণ্ডকে কোনো সাহায্য করছে না। সোভিয়েট তাদের উত্তর সন্তোষজনক মনে করেনি।

এর পরেই খবর পাওয়া যায়, সুইডেনে এক বিমানবহর হানা দিয়ে কয়েকটা বোমা ফেলে। সোভিয়েট বিমান উত্তরে কয়েক জায়গায় নাকি নরউইজান সীমানা লঙ্ঘন করে। বোমাবর্ষণে সুইডিস গবর্ণমেণ্ট মস্কোতে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

জার্ম্মান-সোভিয়েট সহযোগিতা

জার্ম্মানী ও সোভিয়েট পরস্পরের সঙ্গে সামরিক সহ-যোগিতা করছে, এই মর্ম্মে এক সংবাদ এসেছে। সোভিয়েট অধিকৃত পোল্যাণ্ডে রুমেনিয়ার সীমান্তে জার্ম্মান সৈন্য দেখা যাচ্ছে এবং জার্ম্মানী মস্কোতে একটা সামরিক মিশন পাঠিয়েছে। কারো কারো অনুমান, জার্ম্মানী সোভিয়েটকে বল্কান অভিযানে রাজী করাবার চেষ্টা করছে।

পশ্চিম সীমান্তে উৎকণ্ঠা

এদিকে জার্ম্মানী হঠাৎ বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের সামনে দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করতে থাকায় ঐ দুই দেশে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বেলজিয়ামে পূর্ণ সৈন্য সমাবেশের পূর্ব্ব অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে; হল্যাণ্ডেও সমস্ত সৈন্যকে প্রস্তুত করা হয়েছে। বৃটেন তার সৈন্যদের ছুটি আপাতত স্থগিত করেছে এবং ফ্রান্স তার সীমান্তের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামের অসামরিক অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করেছে। ওদিকে সুইজারল্যাণ্ড ইতিপূর্ব্বেই পূর্ণ সৈন্য সমাবেশ করেছে।

এই রকম একটা খবর পাওয়া গেছে যে, জার্ম্মানী বসন্ত-কালের প্রারম্ভেই একটা অভিযান করবার সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু কোন্ দিকে অভিযান করা হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। গোয়েরিং নাকি ইংলণ্ডের কাছাকাছি যাবার জন্যে হল্যাণ্ড আক্রমণ করতে বলছেন, আর রিবেণ্ট্রপ নাকি বলছেন, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে অভিযান করতে। সেনা-নায়কেরা গোয়েরিং-কেই নাকি সমর্থন করেছেন।

নতুন জাপ মন্ত্রিসভা

এডমিরাল ইওনাই-এর নেতৃত্বে জাপানে এক নতুন মন্ত্রি-সভা গঠিত হয়েছে। মিঃ আরিতা পররাষ্ট্র-সচিব ও জেনারেল হাতা সমর-সচিব হয়েছেন। এডমিরাল ইওনাই বরাবরই চরম সোভিয়েট-বিরোধী নীতির বিপক্ষে। তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বে জাপান পররাষ্ট্র-নীতি ক্ষেত্রে কোন্ পথ ধরে তা সকলের পক্ষেই নিশ্চয় সাগ্রহ প্রতীক্ষার বিষয়।

১৫।১।৪০

—ওয়াকিবহাল

সিনেমায় নাটক চলে না কেন

আমাদের দেশে যে সকল নাটক রঙ্গমঞ্চে বিপুল দর্শক-সমাগমের জন্য ঘটা করিয়া 'সিলভার' অথবা 'গোল্ডেন' জুবিলী নাইট করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, কিছুকাল পরে দেখা যায় সেইগুলিই সিনেমায় রূপান্তরিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই এই রূপান্তরের চেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় পাইয়াছি, কেননা দৃশ্য-বৈচিত্র্য ও ঘটনা-সঙ্কুল করা সত্বেও থিয়েটারের প্রভাব হইতে তাহা মুক্ত হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটিকার সিনেমায় রূপদানের দুর্গতি আমরা বহুকাল আগে দেখিয়াছি। সম্প্রতি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চাণক্যর' সিনেমা-রূপ দেখিয়া আমাদের হতাশ হইতে হইল। এই কারণে সিনেমার কাহিনী নির্ব্বাচনে নাটকীয় সংস্কার সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। ভাল নাটক দিয়াই যে ভাল চিত্র তৈয়ারী হইবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সংলাপের ভিতর দিয়াই নাটকে চরিত্রগুলি ফুটিয়া ওঠে, কিন্তু সিনেমায় চরিত্রগুলিকে কথা কহিবার অনর্থক সুযোগ দেওয়া হয় না, সেখানে চরিত্র-স্ফূর্ত্তি হয় ঘটনা অবস্থানের ভিতর দিয়া। সিনেমার কাহিনীর তাই বাক্‌সঙ্কুল না হইয়া ঘটনা-সঙ্কুল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অবান্তর ঘটনার উপদ্রবে মূল ঘটনার সূত্র যেন হারাইয়া না যায় এবং ঘটনার জটিলতায় কাহিনীটি প্রচ্ছন্ন, দুর্ব্বোধ্য যেন না হইয়া ওঠে। চিত্র-গল্প হইবে সরল রেখানুগত। ঘটনাবলী তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ তুলিতে পারে, কিন্তু পথ আঁকাবাঁকা করিয়া দিবে না। চিত্র-গল্পের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা মূল কাহিনীর পরিণতিমুখী, স্বাবলম্বী নয়। এই ঘটনার গঠন ও অবস্থানের উপরই চিত্র-নাট্যের সাফল্য নির্ভর করে। চিত্র-নাট্যের সংলাপও ঋজু এবং প্রাঞ্জল হওয়াই দরকার, কিন্তু তা একেবারে অলঙ্কার বর্জ্জিত হইবে না। কথার প্যাঁচ সেখানে অসহ্য ঠেকিলেও অপ্রত্যাশিত বাঁক দেওয়ায় নিষেধ নাই। সংলাপের প্রত্যাশিত উত্তর অপ্রত্যাশিত উত্তরে পরিণত হওয়াই উৎকৃষ্ট চিত্রের বিশেষত্ব। নাটক ও ছায়া-চিত্রের মূলগত পার্থক্যের আলোচনা সংক্ষেপে করা হইল; সিনেমায় নাটক কেন চলিতে পারে না চিত্র-পরিচালকগণ যদি তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ব্যর্থতার নৈরাশ্য হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকটিও সিনেমায় রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে—এই রূপান্তর পূর্ব্বের বহু ব্যর্থ চেষ্টার ইতিহাসে আরেকটি সংখ্যা বাড়াইবে বলিয়াই আশঙ্কা জাগে, তবে পরিচালক মহাশয় পাকা হাতের পরিচয় দিয়া হয়ত এই চিত্রটিকে উৎরাইয়া দিতে পারিবেন।

সাগর মুভিটোনের 'কুমকুম'

নৃত্যবহুল ঘটনা সম্বলিত সিনেমা আমাদের দেশে এক রকম নাই বলিলেই হয়। যে দু'একটি আছে তাহা হয় গল্পের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, নতুবা অপটু ও চটুল ভঙ্গীর নৃত্যভারে তাহা দর্শকদের নিকট পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশে নৃত্যবহুল চিত্র বহু আছে এবং ফ্রেড এ্যাস্টায়ার, জিঞ্জার রজার্স, ইলিনর পাওয়েল প্রভৃতি নট ও নটীদের লইয়া যে সকল উৎকৃষ্ট চিত্র তৈয়ারী হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বোম্বাইয়ের 'সাগর মুভিটোন' নৃত্যকে প্রাধান্য দিয়া 'কুমকুম' নামে একটি চিত্র তুলিয়াছেন। তাহাতে নায়িকার ভূমিকায় আছেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু। 'কুমকুমের' কাহিনী রচনা করিয়াছেন মন্মথ রায়, পরিচালনা করিয়াছেন মধু বসু এবং ইহার সুর সংযোজনা করিয়াছেন তিমিরবরণ। এই ছবির জন্য সাগর মুভিটোনকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি এবং ইহা 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম; কেননা এই ধরণের ছবি ভারতে বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম।

'কুমকুম' চিত্রে ভুজঙ্গ রায় ও সাধনা বসু

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দল পরাজিত

গত বৎসরের আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বিজয়ী বাঙলা দল এই বৎসরের প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় যুক্তপ্রদেশ দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। বাঙলা দলের এই পরাজয় সাধারণ ক্রীড়ামোদীর নিকট অপ্রত্যাশিত ও হতাশাব্যঞ্জক হইলেও আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারে নাই। বাঙলা দল যে এইরূপ নৈরাশ্যজনক ফলাফল প্রদর্শন করিবে তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্ব হইতেই দলের খেলোয়াড় নির্বাচন আলোচনা কালেই দিয়াছি। এই খেলাটি যাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের মন্তব্যের সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছেন। কয়েকজন দায়িত্বপূর্ণ খেলার অনুপযোগী খেলোয়াড়ের জন্যই যে বাঙলা দল পরাজিত হইয়াছে সেই বিষয় কাহারও আর সন্দেহ নাই। খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটির সভ্যগণ যে খেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া খেলোয়াড়গণ মনোনীত করেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ সকলে পাইয়াছেন। নির্বাচন কমিটির সভ্যগণের অপসারণ ব্যতীত বাঙলার ক্রিকেট খেলার সুনাম বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই ইহাও সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই প্রমাণ লাভ ও উপলব্ধি বৃথা হইবে না। বাঙলার ক্রিকেট খেলা যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার প্রচেষ্টা শীঘ্রই দেখা দিবে। বাঙলার উৎসাহিত ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে নিয়মিত শিক্ষা দিয়া বাঙলার সুনাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ক্রিকেট পরিচালকগণ যেরূপভাবে তরুণ, উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে দায়িত্বপূর্ণ খেলার অধিকারী করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাঙলা দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে। ভারতীয় ক্রিকেট দলে বাঙলার খেলোয়াড়গণও যাহাতে স্থান লাভ করে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিবে। বাঙলা দেশেও যে অমরনাথ, অমর সিং, সি এস নাউডুর ন্যায় খেলোয়াড় জন্মাইতে পারে তাহার প্রমাণ দিবে। এই দিন দেখিবার আশায় আমরা আছি ও থাকিব।

প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুইটির অধিনায়কদ্বয় কার্ত্তিক বসু (বাঙ্গলা) ও পি ই পালিয়া (যুক্তপ্রদেশ)

যুক্তপ্রদেশ দলের খেলা

অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত যুক্তপ্রদেশ দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা আনন্দদায়ক ও প্রশংসনীয়। আনন্দদায়ক এই জন্যই যে এই দলের কয়েকটি তরুণ খেলোয়াড় দুই এক বৎসরের মধ্যেই অতি উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন ও বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ অবসর গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের স্থান পূরণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়-গণের মধ্যে স্থান পাইবার জন্য যে সাধনায় লিপ্ত তাহার প্রমাণও খেলার মধ্য দিয়া তাঁহারা দিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা ও প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ক্রিকেট খেলার অবশ্য

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালের বিজয়ী যুক্তপ্রদেশ দলের খেলোয়াড়গণ

প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও তৎপরতার অভাব তাঁহাদের নাই। পূর্বাঞ্চলের ফাইনালের তৃতীয় দিনের শেষ সময়ের খেলাতেই তাহার পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন। দর্শকগণের সমবেত বিদ্রূপ-ধ্বনি তাঁহাদের কোনরূপ বিচলিত করে নাই। দলের সম্মান, প্রদেশের সম্মান মনের মধ্যে সজাগ রাখিয়া অবিচলিত চিত্তে তাঁহারা খেলিয়াছেন। একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও দায়িত্বজ্ঞানই যে খেলার সাফল্য আনয়ন করে ইহাই তাঁহারা একরূপ প্রমাণ করিয়াছেন। বাঙলা দেশের খেলোয়াড়গণের মধ্যে এইরূপ কয়েকটি খেলোয়াড়কে কোনদিন দেখিবার সৌভাগ্য কি আমাদের হইবে না?

উল্লেখযোগ্য দিনের খেলা

পূর্বাঞ্চলের ফাইনালের তৃতীয় দিনের খেলায় যেরূপ উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি হইয়াছিল ইতিপূর্বে বাঙলা দেশের কোন খেলাতেই তাহা পরিদৃষ্ট হয় নাই। দিনের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দিনের শেষ পর্য্যন্ত দর্শকগণকে আশা ও নিরাশার মধ্যে আলোড়িত মন লইয়া সময় অতিবাহিত করিতে হয়। দিনের আরম্ভে যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংস ২৯৫ রাণে শেষ হইলে বাঙলা দল প্রথম ইনিংসে ৩৫ রাণে পশ্চাতে পড়িলেন। দর্শকগণ বাঙলা দলের পরাজয় কল্পনা করিতে লাগিলেন। বাঙলা দলের খেলা আরম্ভ হইল। ১০০ মিনিট খেলিয়া বাঙলা দল ১৬৩ রাণ সংগ্রহ করিলেন। যুক্তপ্রদেশ দল ১২৮ রাণে পশ্চাতে পড়িলেন। খেলার সময় উত্তীর্ণ হইতে ১৫০ মিনিট বাকি। যুক্তপ্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিলেন। ৩৯ রাণে ৪টি উইকেট পড়িয়া গেল। ৮০ রাণের সময় ষষ্ঠ উইকেটের পতন হইল। বাঙলা দলের জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। খেলা শেষ হইতে ২৫ মিনিট বাকী। ১১০ রাণের সময় অষ্টম উইকেটের পতন হইল। ৬ মিনিট সময় বাকী। দর্শকগণ প্রতি মুহূর্তে অবশিষ্ট দুইটি উইকেটের পতন কল্পনা করিতে লাগিলেন। উন্মাদনা শেষ সীমানায় পেঁছিল। দর্শকদের স্থানে বসিয়া থাকা সকলের পক্ষে অসম্ভব হইল। বোলারদের প্রতি বলের গ্রহণ ও প্রদানের মধ্যে দর্শকগণ অন্তরের মধ্যে যে প্রবল অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন তাহা বিপুল চীৎকার ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া মাঠটি মুখরিত করিতে লাগিল। এক এক করিয়া শেষ ছয় মিনিট অতিবাহিত হইল। দর্শকগণের আশা নিরাশায় পরিণত হইল। যুক্তপ্রদেশ দলের শেষ দুইজন খেলোয়াড় আউট হন না। যুক্তপ্রদেশ দলের ৮ উইকেটে ১২৪ রাণ হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তিনদিনব্যাপী খেলার নিয়মানুসারে যুক্তপ্রদেশ দল প্রথম ইনিংসের খেলার ফলাফলে বিজয়ী হন। সকল উত্তেজনা ও উন্মাদনার অবসান হয়।

খেলার বিবরণ

বাঙলা টসে জয়ী হইয়া খেলা আরম্ভ করে। প্রথম খেলোয়াড়দ্বয় মিলার ও বেরেন্ড দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া ১০০ রাণ সংগ্রহ করেন। ১০৪ রাণে তিনটি উইকেট পড়িয়া যায়। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি খেলায় যোগদান করেন। বাঙলা দলের ২৩০ রাণ হয়। বেরেন্ড ১০৭ রাণ করিয়া আউট হন। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি ৬৮ রাণ করিয়া ২৩৭ রাণের সময় আউট হন। বাঙলা দলের প্রথম দিনে ৯ উইকেটে ২৪৫ রাণ হয়। দ্বিতীয় দিনে ৩০ মিনিট খেলার পর বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস ২৬০ রাণে শেষ হয়। যুক্তপ্রদেশ দল খেলা আরম্ভ করেন। ৫৫ রাণে দুইটি উইকেট পড়িয়া যায়। পালিয়া ও আফতাব আমেদ খেলায় যোগদান করিয়া দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া রাণ তোলেন। ২০০ রাণে পালিয়া আউট হন। ২০৫ রাণে আফতাব আমেদ আউট হন। এই দুইজন খেলোয়াড় একত্রে ১৪৫ রাণ করেন। ইহার পরে কে ভট্টাচার্য্যের বোলিং কার্য্যকরী হয়। দ্বিতীয় দিনের শেষে যুক্তপ্রদেশ দল ৮ উইকেটে ২৭১ রাণ করিয়া ১১ রাণে অগ্রগামী হয়। ইহার তৃতীয় দিনের খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি হইয়া যায়। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

বাঙলা দলঃ—প্রথম ইনিংস ২৬০ রাণ (বেরেন্ড ১০৭, পি এন মিলার ৪০, এন চ্যাটার্জ্জি ৬৮; এম সালাউদ্দীন ৬২ রাণে ৬টি, পি ই পালিয়া ৫৩ রাণে ৩টি, জে ই আলেকজেণ্ডার ৩৭ রাণে ১টি উইকেট পান)।

যুক্তপ্রদেশ দলঃ—প্রথম ইনিংস ২৯৫ রাণ (মামুদ আলাম ৩৩, পি ই পালিয়া ৭১, আফতাব আমেদ ৭২, এস খাজা ৩৩, বি গুরুদাচারী ১৮; বেরেন্ড ৫৬ রাণে ২টি, কে ভট্টাচার্য্য ৫৬ রাণে ৫টি, একেলষ্টন ৩৭ রাণে ২টি, এন হ্যামণ্ড ৭২ রাণে ১টি উইকেট পান)

বাঙলা দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৩ রাণ (কে রায় ১১, পি এন মিলার ৫৫, এন চ্যাটার্জ্জি ২৬, বেরেন্ড ১৭, কে ভট্টচার্য্য নট আউট ১৮, পি ই পালিয়া ৬৬ রাণে ৪টি, আফতাব আমেদ ৫৫ রাণে ৫টি উইকেট পান)

যুক্তপ্রদেশ দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস (৮ উইঃ) ১২৪ রাণ (পি ই পালিয়া ২২, এস খাজা ১১, এম সালাউদ্দিন ৩৯, গুরুদাচারী নট আউট ১০; বেরেন্ড ২৮ রাণে ২টি, এন হ্যামণ্ড ২৫ রাণে ১টি, এন চ্যাটার্জ্জি ৯ রাণে ২টি, কে ভট্টাচার্য্য ২৮ রাণে ১টি, একেলষ্টন ২০ রাণে ১টি উইকেট পান)

যুক্তপ্রদেশ দল ১ম ইনিংসের খেলার ফলাফলে বিজয়ী।

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন

গত ১২ই জানুয়ারী শুক্রবারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা আনন্দবাজার পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম। বাঙলার নানা প্রান্ত হইতে আমরা সহানুভূতিসূচক সমর্থন পাইয়াছি এবং আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতি সকলশ্রেণীর পাঠকগণের সুগভীর অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। পৃষ্ঠাসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিয়া সংবাদাদি সংক্ষেপে দিয়া সংবাদপত্রের অঙ্গহানি না করিয়া, বহু পাঠক ও সংবাদপত্র বিক্রেতাদের পরামর্শক্রমে কিছু মূল্য বৃদ্ধি করা হইল। আগামী ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবারের সংখ্যা হইতে আনন্দবাজারের দাম প্রতি সংখ্যা তিন পয়সা করিয়া ধার্য্য হইল। রবিবারের সংখ্যার দাম চার পয়সাই রহিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্ব্বের মত এই যুদ্ধকালীন সঙ্কটের দিনেও আমরা দেশবাসীর সহৃদয় আনুকূল্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইব না। নিবেদন ইতি—

কার্য্যাধ্যক্ষ,
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড।

সমর-বার্ত্তা

১০ই জানুয়ারী—

বৃটেনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে বৃটিশ যাত্রিবাহী জাহাজ "ডানবার ক্যাসল" (১০,০০০ টন) মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে। জাহাজে দুইশত যাত্রী ছিল। বিস্ফোরণের ফলে জাহাজটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। জাহাজের ক্যাপ্টেন কাউন্টন নিহত হইয়াছেন।

উত্তর সাগরে বৃটিশ বিমান-বহরের সহিত জার্ম্মান বিমান-সমূহের এক সংঘর্ষ হয়। একটি জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হইয়াছে। উত্তর সাগরে জার্ম্মান বিমানের আক্রমণে 'আপ মিনিষ্টার' নামক একটি বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হয়। ফলে ১৩ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

১১ই জানুয়ারী—

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের উপকূলবর্ত্তী বিস্তৃত অঞ্চলে জার্ম্মান বিমানসমূহের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধারম্ভের পর ইহাই জার্ম্মান বিমানের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অভিযান। নরফোকের উপকূলে জার্ম্মান বিমান একটি বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু বৃটিশ জঙ্গী বিমানের আক্রমণে বিতাড়িত হয়। প্রকাশ, চুম্বক মাইন স্থাপনের উদ্দেশ্যে জার্ম্মান বিমানসমূহ বৃটেনের পূর্ব্ব উপকূলে দিবা-রাত্র ব্যাপী অভিযান সুরু করিয়াছে।

বৃটেনের উপকূলে "ট্রাভিয়াটা" (৫০০০ টন) নামক একটি ইটালীয় জাহাজ মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হয়।

ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে জার্ম্মান মাইনের আঘাতে বৃটিশ তৈলবাহী জাহাজ 'এলওসো' (৭২৬৭ টন) ধ্বংস হইয়াছে।

ইটালীয় স্বেচ্ছাসৈনিক দলের প্রথম দল ফিনল্যাণ্ডে পৌঁছিয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—

জার্ম্মান বিমানবহর পুনরায় ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে হানা দেয়। শত্রুপক্ষের বিমানগুলি দৃষ্টিগোচর হইলে বৃটিশ বিমান বিধ্বংসী কামানগুলি গোলাবর্ষণ করে এবং জঙ্গী বিমান-সমূহ ঊর্দ্ধাকাশে উড়িয়া বিমানগুলিকে বিতাড়িত করে।

১৩ই জানুয়ারী—

পশ্চিম রণাঙ্গনে ৪টি ফরাসী বিমান ও ১২টি জার্ম্মান বিমানের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফরাসী বিমানের আক্রমণে তিনটি জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হয়।

স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে বৃটিশরক্ষী বিমানের আক্রমণে একটি জার্ম্মান বিমান ভূপাতিত হয়।

জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, হেলিগোল্যাণ্ডে ডেষ্ট্রয়ার আক্রমণকারী ৮টি বৃটিশ বোমারু বিমানের মধ্যে একটিকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছে এবং অপর একটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

প্যারিসের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, নিরপেক্ষ দেশ-সমূহ হইতে ফ্রান্সের মধ্য দিয়া এক্ষণে সমর-সম্ভার ও বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ফিনল্যাণ্ডে প্রেরিত হইতেছে।

ইটালীর আধা-সরকারী সংবাদপত্র 'রিলিজিয়ান ইণ্টার-ন্যাশনাল' ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার কোন অভিপ্রায় কিংবা পরিকল্পনা ইটালী পোষণ করে না বটে, তবে ইটালী দানুবীয় ও বলকান রাষ্ট্রসমূহকে বলশেভিক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে।

সাল্লা রণাঙ্গনে লালফৌজের অগ্রগামী বাহিনী ফিনল্যাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত কেমারাভি নামক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হইতে ২০ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নূতন রিজার্ভ বাহিনী লাল-ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

হেলসিঙ্কির খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট বিমান হেলসিঙ্কি শহরের উপর হানা দেয় ও বোমাবর্ষণ করে। ফলে ১০ জন নিহত হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী—

যুদ্ধের আশঙ্কায় হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বেলজিয়ামে রিজার্ভ ও বিদায়ভোগী সৈন্যদলকে অবিলম্বে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। জার্ম্মানীর একটি ইস্তাহারে একটি ডাচ বিমান জার্ম্মান সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

জাপ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। সম্রাট এডমিরাল ইয়োনাই-এর উপর নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ভার অর্পণ করিয়াছেন।

ওয়াকিবহাল ফরাসী সূত্রে প্রাপ্ত রয়টারের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, মস্কোতে জার্ম্মান সামরিক মিশন প্রেরণ করা হইয়াছে এবং পোলিশ ইউক্রেনে জার্ম্মান ও সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিতেছেন। এই সহযোগিতার উপর প্যারিসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে,

১৫ই জানুয়ারী—

সোভিয়েট ইউনিয়ন নরওয়ে ও সুইডেনের নিকট তাহাদের 'সোভিয়েট বিরোধী নীতি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। মস্কোর বেতারে বলা হইয়াছে যে, সুইডেন ও নরওয়ে এই প্রতিবাদের যে উত্তর দিয়াছে, তাহা সন্তোষজনক নহে।

সুইডেনের উপর অজ্ঞাত বিমানবহর হানা দিয়া কয়েকটি বোমাবর্ষণ করে। দারুণ তুষারপাতের জন্য বিমানপোতগুলির পরিচয় জানা যায় নাই।

নবগঠিত জাপ মন্ত্রিসভায় এডমিরাল ইয়োনাই প্রধানমন্ত্রী, মিঃ আরিতা পররাষ্ট্র-সচিব, জেনারেল হাতা সমর-সচিব এবং ভাইস-এডমিরাল যোশিদা নৌ-সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট বিমানসমূহ উপর্য্যুপরি চারিদিন যাবৎ দক্ষিণ ফিনল্যাণ্ডের উপর বোমাবর্ষণ করে।

১৬ই জানুয়ারী—

হেগে 'রয়টার'কে বলা হয় যে, "হল্যাণ্ড যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত; তবে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ দেখা দিতে পারে।"

নরওয়ে সরকারের এক ইস্তাহারে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানসমূহ গত ১২ই ও ১৪ই জানুয়ারী বহু স্থানে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া নরওয়ে এলাকায় প্রবেশ করে। উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইবার জন্য নরওয়ে গবর্ণমেণ্ট মস্কোর নরওয়ে দৌত্য-বিভাগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

হেলসিঙ্কির এক খবরে প্রকাশ, ৬০খানি সোভিয়েট বিমান হইতে গতকল্য ফিনল্যাণ্ডের আটটি অঞ্চলে ছয় শত বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

বৃটিশ নৌ-দপ্তরের এক ইস্তাহারে তিনখানি বৃটিশ সাব-মেরিন ধ্বংসের আশঙ্কা করা হইয়াছে।

আমষ্টার্ডামের এক সংবাদে প্রকাশ যে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সীমান্তে জার্ম্মান সৈন্যের সমাবেশ করা হইয়াছে।

ফরাসী নৌ-সচিব মঃ কাম্পিনচি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিতে গিয়া যুদ্ধারম্ভের চারমাস কালের মধ্যে মিত্র-শক্তির সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মিত্র-শক্তি তাহাদের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়াছে এবং বিদেশের সহিত জার্ম্মানীর ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার পথ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন বন্দরগামী চারিশত জার্ম্মান জাহাজ আটক করিয়াছে। শুধু একা ফরাসী নৌ-বহরই দশটি ইউবোট ডুবাইয়াছে। মিত্র-শক্তি মোট ৩০ খানি ইউবোটকে ডুবাইয়া দিয়াছে।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

১১ই জানুয়ারী—

লাহোরের 'দৈনিক প্রতাপ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর ও পাঞ্জাবের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র গতকল্য ভারত-রক্ষা অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির সদস্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আবেদনক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ব্যাপার সম্পর্কে বিবেচনার জন্য কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগামী ১৯শে জানুয়ারী তারিখে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এই বৈঠকে অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কেও বিবেচনা হইবে।

চীনে প্রেরিত ভারতীয় চিকিৎসক দলের অন্যতম সদস্য ডাঃ দেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুনরায় চীন যাইবার পথে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের আদেশে রেঙ্গুণে আটকাইয়া পড়েন। অদ্য কলিকাতা আসিয়া পৌঁছামাত্র তাঁহাকে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১২ই জানুয়ারী—

নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবী করিয়া শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস (কংগ্রেস) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বিনা ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জানান হয় যে, ৮ই নবেম্বর পর্যন্ত পাঞ্জাবে ভারত-রক্ষা অর্ডিন্যান্সে মোট ১৯১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং গত এপ্রিল হইতে এ পর্যন্ত ৩৩ জন ১২৪ (ক) এবং ১৫৩ ধারায় দণ্ডিত হইয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী—

মণিপুর প্রজা সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ইরাবৎ সিংহ সম্প্রতি সম্মিলনীর এক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাহোরে সহিদগঞ্জ গুরুদ্বারে জনৈক মুসলমান যুবকের আক্রমণে তিনজন শিখ জখম হইয়াছে।

মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ এম এ জিন্না বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট হাউসে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইর সহিত বড়লাটের সাক্ষাৎকার হয়।

২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক সভার বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক, ঢাকার নবাব বাহাদুর এবং মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁ এই তিনজন মন্ত্রী মাদারীপুর সফরে গেলে হিন্দুগণ তাঁহাদের অভ্যর্থনায় যোগদান করেন নাই।

অদ্যকার 'হরিজন পত্রে' 'চরকা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী অহিংসার সহিত চরকার অচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

পাতিয়ালা রাজ্যের ধর্ণান গ্রামে উত্তেজিত জনতা বিতাড়নের জন্য পুলিশ গুলী চালায়।

১৪ই জানুয়ারী—

সিন্ধু মন্ত্রিসভা আসন্ন সংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন। সিন্ধু পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রিসভা প্রয়োজনীয় সমর্থন পাইবেন না বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স একবার কংগ্রেস আর একবার মুসলিম লীগকে তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু স্বতন্ত্র দল বিশেষ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শক্কর দাঙ্গায় হিন্দুদের যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ না করিলে এবং মফঃস্বলের হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করিলে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে।

ওয়াজিরী উপজাতীয় দস্যুদল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বান্নু জেলার নানাস্থানে হানা দেয় এবং একটি গ্রামের পাঁচজন হিন্দু নরনারীকে অপহরণ করে।

১৫ই জানুয়ারী—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যগণকে আগামী স্বাধীনতা দিবসে নূতন সংকল্প বাক্যে সুতা কাটা সম্পর্কিত ধারাটি পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। পাটনায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে বিহার প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যনির্বাহক সমিতির এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যগণ স্বাধীনতা দিবসে লাহোরের গৃহীত পুরাতন সংকল্পবাক্য পাঠ করিবেন।

মণিপুরের জননায়ক শ্রীযুক্ত ইরাবৎ সিংকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'সেলে' আবদ্ধ করা হইয়াছে।

উপজাতীয় মাসুদগণ কর্তৃক অপহৃত মেজর অমরনাথ ডুগাল মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ফেণী মহকুমার কয়েকটি গ্রামে গত ঈদের দিনে অনুষ্ঠিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ফেণীর অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের গৃহাদি চড়াও, রাজনগরের উক্ত চড়াও ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের তদন্ত কার্য এবং তথাকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য সম্পর্কে অনেক প্রশ্নোত্তর হয়।

১৬ই জানুয়ারী—

শক্কর দাঙ্গা সম্পর্কে প্রথম সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে মোট ১৫১জন হিন্দু নিহত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দশজন হিন্দুকে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইয়া মারা হইয়াছে। প্রায় ১৬৪খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। ফলে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। অধিকাংশ বাড়ীর মালিকই হিন্দু। এতদ্ব্যতীত ৪৭খানি বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। শক্কর দাঙ্গা সম্পর্কে এতাবৎ ৮ শত লোক ধৃত হইয়াছে।

সীমান্তে উপজাতিগণের উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত রবিবার বান্নু জেলার লাণ্ডিমীর নিকট সাড়ে তিন শত ওয়াজির লস্কর ও ৫০জন গ্রামবাসীর মধ্যে ৪ ঘণ্টা ব্যাপী সঙ্ঘর্ষ হয়। এই সঙ্ঘর্ষে ইপীর ফকিরের চেলা পাইয়োগুল এবং আক্রমণকারীদের দলপতি একজন মাসুদ গুরুতর আহত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুরে এক ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের উপর গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" এই দুইটি জাতীয়তাবাদী দৈনিক ও মন্ত্রিসভার একখানি মুখপত্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকার রক্ষা কমিটি যে দুইটি রিপোর্ট দিয়াছেন, অদ্য ব্যবস্থাপক সভায় তাহা বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হয় এবং আলোচনান্তে দুইটি রিপোর্টই পুনর্বিবেচনার জন্য কমিটিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কেওড়াতলা শ্মশানে সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় মৃত্যু স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৪৬, Saturday, 13th January, 1940 [৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনর্থক বাগাড়ম্বর—

সেদিন নাগপুর শহরে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এক বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, এমন সময় আসে যখন কিছু বলার চেয়ে না বলাই হয় ভাল। বড়লাট বাহাদুরের নাগপুরের বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইল, এক্ষেত্রে তাঁহার নিজের বেলাতেও তাঁহার অতিথি মহারেটী ধুরন্ধর স্যার ম্যাণেকজী দাদাভাইয়ের মনস্তুষ্টির জন্য বক্তৃতা না করিয়া চুপ করিয়া থাকাই ছিল ভাল। কারণ, তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে সার কিছুই নাই, আছে শুধু কথাবাজী এবং সে কথাও কাজের কথা কিছুই নয়। বড়লাট বাহাদুর আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিবার জন্য ব্রিটিশ জাতি ব্যগ্র এবং তাহারা এক পায়ের উপর খাড়া হইয়াই আছে। ভারতবাসীরা ৩৫ কোটি লোক শুধু এক মন এক প্রাণ হইয়া গেলেই ব্রিটিশের প্রদত্ত এই পরম ফল উপভোগ করিতে পারে। বড়লাট বাহাদুর ভাষার বহর ছুটাইয়া বলিয়াছেন,—"ভেদ-বিভেদ রহিয়াছে, ইহা আমরা ভাল করিয়াই জানি, কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে অন্য একটি ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর জোর দিয়াছি, সেই বিষয়ের উপরই জোর দিয়া বলিব, ভেদের উপর জোর না দিয়া যে সব ক্ষেত্রে মতের মিল রহিয়াছে, সেই দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। আমরা যদি সব সময় অখণ্ড ভারতের চিন্তা লইয়া কাজ করি, তাহা হইলে আমাদের কাজ বুদ্ধিমানের মত হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে ঐক্য বিদ্যমান থাকে, তেমন ইচ্ছা অন্তরে লইয়া আমাদের সব সময় কাজ করিতে হইবে এবং সেইভাবে ভারতবর্ষ যাহাতে রাজনীতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য আমাদিগকে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে।"

ভারতবাসীদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিবার পক্ষে প্রয়োজন হইল, ভেদ-বিভেদ বিস্মৃত হওয়া, বড়লাটের কথা হইল ইহাই। ইহা ছাড়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার পক্ষে অন্যান্য সর্ত্তও আছে, দেশকে সেই সর্ত্ত প্রতিপালিত হইবার উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, বড়লাট এমন কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সব সর্ত্ত বক্তৃতায় উহ্য রহিয়াছে; সুতরাং সেগুলি আমাদের অনুমানের বাহিরে, শুধু যে সর্ত্তটি বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতায় সুস্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে, আমরা তৎসম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিতে চাই। কথা বেশী নয়, কথা অল্প; তাহা এই যে, ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি এবং অখণ্ড ভারতের ধারণাই যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রদানে একান্ত আগ্রহশীল ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ সেজন্য কি করিয়াছেন? সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা এবং শাসনতন্ত্রের ভিতর দিয়া বিশেষ স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদমূলক নীতির বিস্তার কি সংহতি এবং ঐক্যের পথে ভারতবাসীদিগকে লইয়া যাইবার পথেই ব্রিটিশ জাতির ঐকান্তিকতাপূর্ণ উদ্যমের অভিব্যক্তি এবং সেই অখণ্ড ভারতের ঐক্য এবং সংহতিকে শক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই কি গণতান্ত্রিকতার মূলীভূত নীতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের ধুয়া ছড়ান হইতেছে। ভারতে যত লোক আছে সকলের মধ্যে মনের মিল না হইলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মধুর মেওয়া ভারতবাসীরা পাইতে পারে না এমন কথা শুনান হইতেছে। কোন শাসনতন্ত্র অবিসংবাদিতভাবে সকলের দ্বারা সমর্থিত, এমন কোন দেশ জগতে আছে কি? ভেদ-বিভেদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, এমন দেশ মর্ত্ত্যভূমিতে নাই; কিন্তু না থাকিলে কি হইবে, ভারতের প্রতি অহেতুক প্রেম ব্রিটিশ জাতির এমনই যে, তাঁহাদের নিজেদের দেশে ভেদ-বিভেদশূন্য পরম প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, ভারতবাসীদিগকে তাঁহারা তাহা না দিয়া ছাড়িবেন না। ভারতবাসীরা প্রভুদের এমন মহিমা যদি উপলব্ধি করিতে না পারে এবং গণতান্ত্রিক শাসন বলিতে অধিকাংশের সমর্থিত

শাসনই বুঝে, মুষ্টিমেয় স্বার্থবাদীদের বিরোধকে উপেক্ষা করিয়া চায় সোজাসুজি দেশের স্বাধীনতা, তবে তাহারা নেহাৎ-ই অকৃতজ্ঞ!

বাঙলার দাবী—

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত কামিনী-কুমার দত্ত ভাষার ভিত্তিতে বাঙলার সীমা নির্দ্ধারণের যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছেন,—হিন্দুদেরই ইহা কারসাজী; তাহারা বাঙলাদেশে বর্ত্তমানে মুসলমানদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তাহা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই এই চাল চালিয়াছে। কিন্তু সকলেই জানেন, এই প্রশ্নের সঙ্গে হিন্দু বা মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন প্রশ্নই নাই, হক সাহেব সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গাইয়া নিজের জোট বজায় রাখিবার জন্যই প্রস্তাবের ঐ রকম ভাষ্য দিয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-বিভাগ মূল নীতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং জাতীয়তার প্রধান একটি ভিত্তি হইল ভাষা। এই প্রশ্ন আজ উঠে নাই, শ্রীহট্টকে বঙ্গভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন বহু পূর্ব্বে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গের এত বড় আন্দোলন চলিয়াছিল উহাকেই ভিত্তি করিয়া—বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন এবং দুর্ব্বল করিবার সেই চেষ্টা পূর্ব্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করিবার ভিতর দিয়া সফল হয় নাই বটে, কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা কৌশল করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। তাঁহারা বাঙলার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বঙ্গ-ভাষাভাষী জেলা বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং অপর কয়েকটি আসামের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইভাবে বাঙালী জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া রাখার মূল নীতি বজায় রাখা হয়। বর্ত্তমানে বাঙলা ভাষাভাষী যে কয়েকটি জেলা এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেগুলি বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করিলেও বাঙলাদেশে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হইবে না। তবে শ্বেতাঙ্গদের সমর্থনের জোরে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখন যেভাবে বজায় রাখা হইতেছে সে অবস্থা থাকিবে না। বাঙালী জাতি হিসাবে আত্মনির্ভরশীল হইবে। বাঙালী চিরদিন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের অধীনে থাকুক, হক সাহেব কি ইহাই চাহেন? সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতা-লঘিষ্ঠতার প্রশ্ন এক্ষেত্রে বড় নয়—এক্ষেত্রে বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতিগত সংহতিই বড়। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রভাব কাটাইয়া বাঙালী যতদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দিক হইতে সংহত না হইতে পারিবে, ততদিন সে বলিষ্ঠ হইতে পারিবে না। আজ হউক, কাল হউক, বাঙলাকে এ সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে। সাম্প্র-দায়িকতার ভেদনীতি কলুষিত কোয়ালিশনী দলের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য সে চেষ্টা আজ ব্যাহত হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিগত আত্মীয়তার আকর্ষণ একদিন এই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতা হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবেই এবং সে দিনের বেশী দেরী নাই।

সিন্ধু সমস্যায় মহাত্মাজী—

সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার এবং নির্য্যাতন হইতেছে, তৎসম্বন্ধে মহাত্মাজী 'হরিজন' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "অহিংস নীতিতেই হউক, অথবা হিংস নীতিতেই হউক, দুর্ব্বলদিগকে যদি আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে তাহা-দিগকে সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে।" মহাত্মাজীর একথা আমরা বুঝি, দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে পড়িয়া নিজেদের দেশ রাজ্য ছাড়ার মধ্যে আমরা সাহস, বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব দেখি না। মহাত্মাজী কিন্তু তাহা দেখেন। তিনি সিন্ধুর হিন্দুদিগকে দেশ-রাজ্য ছাড়িবার পরামর্শ দিয়া বলিতেছেন,—"হিন্দুদের সাহস ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসনে কোন অন্যায়, অসম্মান বা কাপুরুষতা নাই। ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। যদিও ভারতবর্ষ গরীব দেশ, তথাপি যোগ্য; কর্ম্মক্ষম ও সাধু ব্যক্তিরা যদি ভারতের এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন স্থানে যায়, তবে সেখানে তাহাদের বসবাসের স্থানের অভাব হইবে না।" আমাদের মতে এইরূপ ভাবে দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে দেশ ছাড়ার মধ্যে সাহস নাই, কিংবা দূরদৃষ্টি নাই, তাহা অন্যায়, মানুষের পক্ষে অসম্মানকর এবং অতি ঘোর কাপুরুষতা। অন্যায়কে বাধা দেওয়ার মধ্যে বীরত্ব, তাহাতেই সাহস এবং তাহাতেই মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া যে দুর্ব্বল, জগতের কোথায়ও তাহার নিশ্চিন্ততা নাই, সুখ নাই। দুর্ব্বলতা এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাপ এবং সেই দুর্ব্বলতার পাপ হইতে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। মহাত্মাজী বলেন,—"আমি আজকাল বারংবার এ কথা বলিতেছি যে, আমাদের অহিংস সবলের অহিংস নহে; দুর্ব্বল হঠাৎ অহিংসার এই শক্তি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু অন্য কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা আমার নিকট নাই।" অহিংসা দুশ্চর সাধনার দ্বারাই লাভ করিতে হয়। অপ্রতিকারের অবস্থা আসে সাধনার অতি ঊর্দ্ধ্ব স্তরে, ইহা আমরাও স্বীকার করি। সর্ব্বক্ষেত্রে অহিংসার তত্ত্ব আওড়াইলে মিথ্যাচারই প্রশ্রয় পায় এবং দুর্ব্বলতাই আসিয়া দেখা দেয়। দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ করাতেই মনুষ্যত্ব এবং তাহাই বীরের ধর্ম্ম। দেশ ছাড়িয়া পলাইলে অন্তরে অহিংস প্রেম কার্য্যত উথলিয়া উঠে না, ভীরুতা এবং কাপুরুষতারই পরিচয় দেওয়া হয়। প্রকৃত যে বীর, সে পলায়ন বুঝে না, হিংসই হউক আর অহিংসই হউক, মাথা উঁচু করিয়াই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।

কুকুরের শ্রেণীবিভাগ—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক জব্বলপুরে গিয়া আর একবার জবর বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেস ও হিন্দুসভার সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"সকল কুকুরই সমান; তবে পার্থক্য এই যে, কতকগুলি কুকুর কামড়াইবার পূর্ব্বে ডাকে আর কতকগুলি ডাকে না।" বেহালার কুকুরের দৌড়ে লব্ধকীর্ত্তি হক সাহেবের সারমেয়তত্ত্বের উপলব্ধির সম্বন্ধে সন্দেহ করা আমাদের মতে মহামূর্খতার পরিচায়ক

হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি, তবে আমাদের মনে হয়, তিনি আর এক শ্রেণীর কুকুরের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই শ্রেণীর কুকুরের স্বভাব হইল, বগলেসের জোরে ঘেউ ঘেউ করা—কামড়াইতে ইহারা জানে না, কিংবা কামড়াইতে হইলে যে সাহসের দরকার ততটা সাহসও ইহাদের নাই। নেহাৎ মনিবের চাবুকের চোটেই ইহারা ঘেউ ঘেউ করিয়া রুখিয়া যাইতে অভ্যস্ত হয়—কিন্তু তাড়া খাইবামাত্র লেজ গুটাইয়া মনিবের টেবিলের তলায় আসিয়া লুকায়। এই শ্রেণীর কুকুরই সাহেব লোকদের পোষ্য, বেহালার কুকুর দৌড় জমিয়াছিল এই শ্রেণীর কুকুরদের দ্বারা কিনা, সুবে বাঙলার 'বাদশা' হক সাহেব সম্ভবত তাহা বলিতে পারেন।

ওয়ার্কিং কমিটি ও বাঙলা—

ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দলের অহিংস আধ্যাত্মিকতার যে অপূর্ব্ব মহিমার প্রকাশ পায়, আজ বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর তাহার ঝড় বরিষণ আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণপন্থীপ্রধান ওয়ার্কিং কমিটি দেখিতেছেন—বাঙলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রের সমর্থক, কয়েকজন খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের কর্ম্মী ছাড়া দক্ষিণপন্থীদের এখানে কোন প্রভাব নাই, অথচ বাঙলাদেশটাকে মুঠোর মধ্যে লইতে হইবে; কিন্তু নির্ব্বাচনের কলকাঠি হাত না করিতে পারিলে তাহা সম্ভব নয়। এইজন্য কৌশল করিয়া প্রথমে ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করা হইল; কিন্তু তাহাতেও যখন সুবিধা হইল না, 'এড হক' কমিটির হইল অবতারণা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ন্যায্য অধিকারকে দলন করিবার জন্য এমন আগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন দেখা যায় নাই। প্রাদেশিক আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটি সহজে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিন্তু এখন প্রাদেশিক কোন অধিকারকেই স্বীকার করা হইতেছে না বরং সর্ব্বপ্রকারে বাঙলার কংগ্রেসকে লোকচক্ষুতে হেয় করিবার জন্য কারসাজী চলিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে বাঙলার কংগ্রেসের এই বিরোধের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিবার একটা প্রস্তাব হয়, কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ইচ্ছা নয় যে তাহা হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের অজুহাত তিনি তুলিয়াছেন। সে বিষয়ে বিবেচনা করা খুবই কর্ত্তব্য ইহা সত্য; কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিষয়টি যেমন গুরুতর তাহাতে স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে উপদেশ দিলে আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইত; কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ গররাজী, তাহাতে উদ্দেশ্য বোধ হয় সিদ্ধ হয় না। বাঙলার নির্ব্বাচনটা 'এড হক কমিটির মারফতে করিয়া কৃত্রিম উপায়ে নিজেদের জোট পাকা করাই দক্ষিণী দলের মতলব। তাঁহাদের এই একগুঁয়েমির ফলে হিত অপেক্ষা অহিতই হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙলাদেশ নিজের বিশিষ্টতাকে এবং স্বাতন্ত্র্য মর্য্যাদাকে বিসর্জ্জন দিবে না। স্বাধীনতার সাধনায় অনপেক্ষ আত্মাবদানের যে আন্তরিকতা বাঙলার অন্তর হইতে স্ফুরিত হইয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়াছিল, তাহা আজও নিঃশেষ হয় নাই।

জিন্না-জওহরলাল পত্রাবলী—

মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ এম এ জিন্না সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি বাহির করিয়া বলিতেছেন—"পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমি ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েম করিতে কৃতসঙ্কল্প। এই অভিযোগ শুধু অনাবশ্যক নহে, ইহা অতিশয় হীনবৃত্তির পরিচায়ক।" স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে জিন্না সাহেবের মত সঙ্কীর্ণচেতা এবং হামবড়া নেতা যে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল যে সত্য কথা বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতাকামীমাত্রেই তাহা সমর্থন করিবেন। জিন্না সাহেব ইহাতে চটিতে পারেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা বলিব, পণ্ডিত জওহরলাল যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশেই সত্য এবং সে সম্বন্ধে প্রমাণ খুঁজিবার জন্য অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন হয় না। মোস্লেম লীগের ক্রীডে ভারতের স্বাধীনতার কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা ধাপ্পাবাজী মাত্র কাজে জিন্না সাহেব এবং তাঁহার চেলার মত ভারতের স্বাধীনতার সাধনায় বিশ্বাসঘাতকতাই করিতেছেন; জিন্না-নেহরুর যে পত্রালাপ জিন্না সাহেব নিজে সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার ভিতরই সে প্রমাণ পর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইবে।

জিন্না সাহেবের দাবী এই, "প্রথমত যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস মুসলীম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষমতা-বিশিষ্ট এবং প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে প্রস্তুত না হইবে, নিখিল ভারতীয় মুসলীম লীগের নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি অনুসারে ততদিন হিন্দু-মুসলমানদের মিটমাটের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা অসম্ভব এবং দ্বিতীয়ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে কংগ্রেসের যে দাবী করা হইয়াছে, তাহাও আমরা সমর্থন করিতে পারি না; কেননা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সমস্যার একটি মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ দাবী সমর্থন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।"

এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের উত্তর এই—"আপনি যে দাবী করিয়াছেন, উহা দ্বারা যেসব মুসলমান লীগের অন্তর্ভুক্ত নহেন, প্রকারান্তরে কংগ্রেসকে তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিতে এবং তাঁহাদের সংস্রব অস্বীকার করিতে হইবে। কংগ্রেসের সহিত আর সব প্রতিষ্ঠানের একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, কংগ্রেসের নিয়মাবলী অনুসারে উহার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা সকলেই গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু মুসলীম লীগের সদস্য মুসলমান ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না।"

জিন্না সাহেবের দাবী যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে কংগ্রেসকে খোলাখুলি এই কথাই স্বীকার করিতে হয় যে, গোটা ভারতের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই; কংগ্রেস শুধু হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মাত্র। কংগ্রেস যদি একবার সেই নীতিকে স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে অসাম্প্রদায়িকভাবে ভারতে কথা

বলিবার কোন প্রতিষ্ঠানই থাকে না। সাম্প্রদায়িকতাই ভারতের রাজনীতির সার কথা হইয়া দাঁড়ায়; তাহার ফলে ব্রিটিশ প্রভুত্বই ভারতে কায়েম হয় কিনা বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারেন। জাতির সংহতি এবং ঐক্যের সর্ব্বনাশ তো হয়ই, তাহা ছাড়া ভারতকে স্বাধীনতা দিবার পক্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রধান অন্তরায় বলিয়া যাঁহারা অজুহাত তুলিতেছেন, স্পষ্টভাবে তাঁহাদেরই যে জোর বাড়ে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন কি?

জিন্না সাহেবের দ্বিতীয় দাবী হইল, কংগ্রেসের যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—"ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং বাহিরের প্রভাব বর্জ্জিত হইয়া স্বদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ভারতবাসীদের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া সম্পর্কে ঘোষণা প্রকাশের দাবী কংগ্রেস করিয়াছে। ইহাতেও মুসলীম লীগের যদি আপত্তি থাকে, তাহা হইলে উহাতে ইহাই বুঝায় যে, আমাদের রাজনৈতিক আদর্শও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।"

জিন্না সাহেব চটিয়া গিয়াছেন তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম করিতে কৃতসঙ্কল্প এই কথা বলাতে। অথচ ব্রিটিশের প্রভুত্ব-প্রভাব বিবর্জ্জিতভাবে ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ভারতবাসীদের অধিকারকে ব্রিটিশ জাতি স্বীকার করে, ইহাতেও তিনি নারাজ। সংখ্যালঘিষ্ঠ যত সম্প্রদায় ভারতে আছে, সকলে আগে একমত হউক, তারপর ব্রিটিশ জাতি ঐরূপ ঘোষণা করিবে; এইরূপ দাবীর গূঢ়ার্থ দাঁড়ায় কি? জিন্না সাহেব না বুঝেন ইহা নয়। জগতে এমন কোন দেশ নাই, যেখানে এমন ঐক্যমত বিদ্যমান আছে; সুতরাং প্রকারান্তরে ইহাই দাঁড়ায় যে, জিন্না সাহেব ভারতে ব্রিটিশ শাসনই কায়েম থাকে, ইহাই চাহেন।

তারপর মুক্তি দিবসের পালা। জিন্না সাহেব বলেন, হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন অভিযোগ নাই, অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাঁহার এই যুক্তির যে কোন মূল্য নাই এবং তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে নানা উপায়ে হিন্দু মন্ত্রিমণ্ডলী বা হিন্দু প্রভাবিত মন্ত্রিমণ্ডলী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া সেই মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগে আনন্দ প্রকাশের দ্বারা যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকেই প্ররোচনা দিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। লীগের মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠার ফলে আনন্দ করিলে আপত্তি এতটা থাকিত না; কিন্তু আনন্দটা দাঁড়াইয়াছে কংগ্রেসীদের বদলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতের কয়েকটি প্রদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে। সুতরাং জিন্না সাহেব যে ব্রিটিশ শাসন কায়েম করিতে চাহেন না, এমন কথা কিসে বলা যায়? পণ্ডিত জওহরলাল উপসংহারে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা একেবারে অকাট্য। তিনি বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার উস্কানি এবং উহার সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা একসঙ্গে চলিতে পারে না।' জিন্না সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ যদি পূর্ব্ব হইতে এমন সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা অনেকটা সরল হইয়া যাইত।

উদ্ভট প্রস্তাব

কলিকাতায় নিখিল ভারত মোসলেম শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশনে একটি উদ্ভট প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা যে উপভোগ্য হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবটি এই—"যেহেতু এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙলা ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইত এবং যেহেতু ঐ রীতি বন্ধ হওয়াতে বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অতএব এই সম্মেলন বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন আরবী অক্ষরে বাঙলা ভাষা লিখিবার অনুমতি দেন। সম্মেলন বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে আরও অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন উর্দ্দু ভাষার প্রচারের সুবিধার জন্য উর্দ্দু ভাষা বাঙলা অক্ষরে লিখিবার অনুমতি দেন।" বর্ত্তমান বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলমানের কতটা অবদান আছে তাহা আমরা কিছু জানি; কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙলা ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইবার রেওয়াজ ছিল, কোন্ বিদ্যাদিগ্‌গজ আলেমের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এহেন মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার প্রসূত হইল তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, শিক্ষা সম্মেলনের যে সব মুরুব্বীর মাথা হইতে এই সারবান্ প্রস্তাব বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য বেচারা বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে নাজেহাল হইতে হইবে; কারণ ইহাতে একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে—প্রথমত আরবী অক্ষরে বাঙলা ভাষা লিখিবার অনুমতি চাওয়া হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, উর্দ্দু ভাষার প্রচারের জন্য বাঙলা অক্ষরে উর্দ্দু ভাষা লিখিবারও অনুমতি দিতে বলা হইয়াছে। উর্দ্দু ভাষার হরফও আরবী হরফ। উর্দ্দু ভাষা চালাইবার দায়ে যদি বাঙলা অক্ষরে উর্দ্দু ভাষা লিখিতে অনুমতি দিতে হয়, তবে আরবী অক্ষরে বাঙলা ভাষা লিখিবার অনুমতিটার গতি কি দাঁড়াইবে? সুতরাং প্রস্তাবটি যে প্রহসন মাত্র, এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষা সম্মেলনে বিদ্বান্ লোকদের সমাগম হয় বলিয়াই আমরা জানি, সেখানে এমন উদ্ভট্টী ফলাইয়া নিশ্চয়ই মোসলেম সংস্কৃতির মহিমা বাড়ান হয় নাই।

পরলোকে মনোজমোহন দাস—

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের মনোজ-মোহন দাসের অকাল মৃত্যুতে আমরা যারপরনাই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রেরণায় তরুণ বয়সেই মনোজমোহন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন; রাজরোষে নিদারুণ নিগ্রহ এবং নির্য্যাতন তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। সেই ত্যাগ এবং শ্রম স্বীকার জীবনের পরিণামকে ঘনাইয়া আনিল। মনোজমোহন আমাদের সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা স্বজনের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

যুদ্ধে জোর বাঁধে না কেন

বৃটিশ রাজদূত হিসাবে লর্ড লোথিয়ান গত ৫ই জানুয়ারী আমেরিকার চিকাগো শহরের পররাষ্ট্র পরিষদে এক বক্তৃতায় বলেন,—"বৃটেনের ধারণা এই যে, খুব সম্ভব, আগামী বসন্ত-কালের প্রথমদিকে জার্ম্মানী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে প্রচণ্ড আক্রমণ করিবে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, জার্ম্মান আক্রমণ আমরা প্রতিহত করিব। যদি ১৯১৮ সালের মত জার্ম্মান আক্রমণ পর্য্যুদস্ত হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই হিটলারবাদের পতন হইবে। এই সংঘর্ষ যে কিরূপ সাঙ্ঘাতিক হইবে এবং উহার ফলাফলের উপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য যে কতখানি নির্ভর করিতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই।"

যুদ্ধ বাধে বাধে কিন্তু যেমনভাবে বাধিবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, এখনও তেমনভাবে বাধিতেছে না। প্রচণ্ড রকম সম্মুখ সংগ্রাম এ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিলেও চলে। বিগত মহাসমরের পরে বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র যেরূপ গুরুতর রকম উন্নতি লাভ করিয়াছে, তদনুপাতে সে অস্ত্রের মারাত্মক প্রয়োগ এখনও হয় নাই। সহস্র সহস্র উড়োজাহাজ পঙ্গপালের মত পাখা মেলিয়া শত্রুপক্ষের রাজ্য আক্রমণ করে নাই; এজন্য অনেকেই মনে করিতেছেন এ যুদ্ধ একটা অদ্ভুত যুদ্ধ—লর্ড লোথিয়ানের বিবৃতিতে এই শ্রেণীর লোকের মনে যুদ্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে সত্যকার একটা ধারণা হইবে।

জার্ম্মানী সত্যই কি বসন্তকালে পশ্চিম সীমান্তে প্রভূত সৈন্য সমাবেশ করিবে এবং মিত্রপক্ষকে আক্রমণ করিবে? যদি তাহাই করে, কোন্ পথে করিবে? ম্যাজিনো লাইনের পথে না বেলজিয়াম অথবা হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া? জার্ম্মানীর বিমান-বহর সত্যই কি জেনারেল গোয়েরিংএর হুমকী কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ক্রমাগত ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ চালাইবে? এই সব প্রশ্নের সঙ্গে পক্ষান্তরে এই প্রশ্নও একদল লোকের মনে উঠিতেছে যে, মিত্রপক্ষের ঘরবন্দী নীতিতে জার্ম্মানী কি কাবু হইবে, না জার্ম্মানীর মাইন ও সাবমেরিণের অপেক্ষাকৃত জোর আক্রমণে অপর পক্ষকেই আগে কাবু হইতে হইবে? এমন প্রশ্নও মনে উঠিতেছে যে, বর্ত্তমানে যে সব শক্তি নিরপেক্ষ রহিয়াছে, ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থা কেমন দাঁড়াইবে। হল্যাণ্ড, বলকান, বিশেষভাবে সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি রাজ্য আজ জটিল সমস্যার মধ্যে পতিত হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে রুষিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, ফিনল্যাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী পতনের পর ফিনল্যাণ্ডের উত্তরদিকস্থ সেই সব স্বাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতা সত্যই বিপন্ন হইবে কি? বর্ত্তমান লড়াইয়ের মোড় ঘুরিয়া গিয়া যদি রুষিয়ার বিরুদ্ধে সাম্যবাদ-বিরোধীদের সংগ্রামে দাঁড়ায়, তবে সেক্ষেত্রে রুষিয়া কি করিবে?

মহাসংগ্রামের প্রকট মূর্ত্তি এখনও দেখা দেয় নাই ইহা ঠিক, কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উদ্যোগ-আয়োজনের দিক হইতে ত্রুটি কিছুই নাই। উভয়পক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ সৈন্য সজ্জিত হইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উভয়পক্ষে প্রায় ২৫ হাজার উড়োজাহাজ সাজান হইয়াছে। এই সব সৈন্য কিংবা উড়োজাহাজ কেন কাজে লাগান হইতেছে না, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন, তবে কাজে যে লাগান হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। প্রচণ্ড শীতের জন্য পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধে ভাটা পড়িয়াছে একথা সত্য, কিন্তু তাহা ছাড়া যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে না বাধিয়া মন্থরগতিতে কেন চলিতেছে ইহার অন্য কারণও রহিয়াছে।

একদল বিশেষজ্ঞের ধারণা এই যে, শীতকালে পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধে জোর বাঁধিবার সম্ভাবনা নাই, বসন্ত সমাগমে সংগ্রাম প্রচণ্ড আকার ধারণ করিবে। আর একদল কিন্তু সেকথা বলেন না; তাঁহারা বলেন, হিটলার এতদিন অপেক্ষা করিবেন না, তিনি তৎপূর্ব্বেই বড় রকমের কিছু একটা ব্যাপার বাধাইয়া দিবেন। জার্ম্মানী অবিলম্বে ইংরেজকে আক্কেল দিবে বলিয়া জার্ম্মানী হইতে যে সব প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে, শেষোক্ত ধারণার মূলে সেগুলির প্রভাব রহিয়াছে বলা চলে।

কম লোক ক্ষয় করিয়া কার্য্যসিদ্ধি—হিটলারের এই নীতির কয়েক ক্ষেত্রে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; হিটলার সম্ভবত সেই বিবেচনাতেই পশ্চিম সীমান্তে বেশী জোর এখনও দিতেছেন না। ফরাসী এবং ইংরেজের সঙ্গে ঠোক্কর দিতে আসা, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা পোল্যাণ্ড জয় নহে। প্রথমত এই-রূপ উদ্যমে প্রচুর লোকক্ষয় স্বীকার করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত, সেইরূপ ঝুঁকির ফলে জার্ম্মানী একেবারে পর্য্যুদস্ত হইয়াও পড়িতে পারে। সামরিক বিশেষজ্ঞগণের হিসাব এই যে, ফরাসীদের ম্যাজিনো লাইনে ছেঁদা করিতে হইলে জার্ম্মানীর ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ সৈন্য হতাহত হইবে; কিন্তু ম্যাজিনো লাইনে ছেঁদা করিলেই যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এমন কথাও বলা যায় না, পক্ষান্তরে বিপদ বাড়িতেও পারে। ম্যাজিনো লাইনের দুই ধার দিয়া ফরাসীদের দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী রহিয়াছে, লাইন বড় করিয়া ভাঙ্গিতে না পারিলে সঙ্কীর্ণ পথে প্রবিষ্ট জার্ম্মান বাহিনী বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া নষ্ট হইবে। সেদিকে এই বিপদ রহিয়াছে, তবে কি জার্ম্মানী হল্যাণ্ড অথবা বেলজিয়ামের পথে অথবা হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম যুগপৎভাবে এই দুই দেশের ভিতর দিয়া মিত্রপক্ষকে আক্রমণ করিবে? জার্ম্মানীর সীমান্তের ধার দিয়া ফরাসীদের ম্যাজিনো লাইন যেমন সুরক্ষিত, বেলজিয়ামের কাছ দিয়া তেমন সুদৃঢ় নয়। এই বিবেচনা করিয়া হিটলার তেমন চেষ্টাও করিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে জার্ম্মানদের প্রধানত দুইটি বিষয়ে চিন্তা করিতে হইতেছে। জার্ম্মানী যদি হল্যাণ্ড অথবা বেলজিয়াম আক্রমণ করে, তাহা হইলে নৈতিক দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধতা বৃদ্ধি পাইবে। ১৯১৪ সালে জার্ম্মানী বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়াছিল; কিন্তু ইহার পর জার্ম্মানী হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা মান্য করিবার সম্বন্ধে লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সে সব ভঙ্গ করিলে তাহার দুর্নাম বেশী হইবে; অবশ্য যুদ্ধের ব্যাপারে এই প্রশ্নই বড় নয়, তদপেক্ষা বড় প্রশ্নও আছে; তাহা হইতেছে বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ডের

বাধাদানের ক্ষমতা। বেলজিয়াম এবং হল্যান্ড এই দুই শক্তি অনায়াসেই ১০ লক্ষ সৈন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ করিতে সক্ষম। ইহার পিছনে ম্যাজিনো লাইনের ধার দিয়া ইংরেজ এবং ফরাসীর ব্যূহবদ্ধ বাহিনী রহিয়াছে। জার্ম্মানী যদি হল্যান্ড কিংবা বেলজিয়াম আক্রমণ করে অথবা উভয়কে আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই দুই শক্তিকে জয় করিবার মত সময় ফরাসী এবং ইংরেজ জার্ম্মানীকে দিবে না; তাহারা জার্ম্মানীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবে অথবা জার্ম্মান সৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিবার নীতি অবলম্বন করিবে।

জার্ম্মানীর বিলম্বের এই সব কারণ দেখান হইয়া থাকে; কিন্তু ফরাসী এবং ইংরেজের সমর-নীতির মন্থরতার কারণ কি? তাহারা জার্ম্মানীর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইংরেজ এবং ফরাসী মনে করে যে, যুদ্ধ যত বেশী বিলম্বিত হইবে, তাহাদের তত বেশী সুবিধা হইবে। বিগত মহাসমরের সময় দেখা গিয়াছিল যে, ইংরেজের ঘরবন্দী নীতি কম কাজ করে নাই। জেনারেল গোয়েরিং তাঁহার বক্তৃতায় বৃটিশের এই ঘরবন্দী-নীতির সম্বন্ধে আতঙ্ক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইংরেজেরা জার্ম্মানীর নরনারীকে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টায় আছে। ইহার পর রুষিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর মৈত্রী বাড়াতে জার্ম্মানীর সুবিধা কিছু হইয়াছে কি? জার্ম্মানী কি রুষিয়া হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল, খাদ্য প্রভৃতি পাইতেছে? এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে। ইহার উপর তেলের প্রশ্ন রহিয়াছে। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন শুনা গিয়াছিল যে, জার্ম্মানীর ১০ মাসের তেল মজুত আছে। জার্ম্মানী কৃত্রিম উপায়ে যে গ্যাসোলীন প্রস্তুত করে, তাহাতে তাহার অভাব পূরণ হয় না। রুষিয়া হইতে জার্ম্মানী এ পর্য্যন্ত তেল সাহায্য পায় নাই।

জার্ম্মানীর ডুবোজাহাজের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাইয়াছে, অন্তত আপাতত ইহাই দেখা যাইতেছে, ইহার পরে উহা নূতন আকারে বাড়িবে কি না বলা যায় না; তবে হিসাবে দেখা যায় যে, যুদ্ধের তৃতীয় মাসে ডুবোজাহাজের যত দৌরাত্ম্য ছিল, এখন তাহা নাই। উড়োজাহাজের ভবিষ্যৎ তৎপরতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কোন কথা বলা কঠিন; জার্ম্মানেরা তাহাদের কারখানায় উড়োজাহাজ তৈয়ারীর পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছে ইহা নিশ্চিত; কিন্তু ইংরেজদের তৈয়ারী উড়োজাহাজের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার পর আমেরিকা যুদ্ধোপকরণ বিক্রয়ের নিষেধবিধি প্রত্যাহার করিবার পর ইংরেজ এবং ফরাসীর খুব সুবিধা হইয়াছে। তাহারা আমেরিকার নিকট হইতে উড়োজাহাজ কিনিতেছে, কিন্তু জার্ম্মানীর পক্ষে সে পথ বন্ধ। জার্ম্মানী যেমন হুমকী দেখাইয়াছিল, তেমন প্রবলভাবে উড়োজাহাজে বোমাবর্ষণ চালাইতেছে না, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে ঐ কাজে সাহসী হইতেছে না অথবা ইংরেজ ও ফরাসীর পাল্টা আক্রমণের ভয় করিতেছে। জার্ম্মানী খুব চেষ্টা করিয়াও বৎসরে ৩ হাজার হইতে ৫ হাজারের বেশী উড়োজাহাজ প্রস্তুত করিতে পারে না; কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাজ্য অনায়াসেই বিক্রয়ের জন্য মাসে ১২৫০ খানা উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইংরেজ এবং ফরাসী এই সুবিধার অধিকারী হইয়াছে। জার্ম্মানী এই ভয় দেখাইতেছে যে, সে আমেরিকা হইতে যুদ্ধোপকরণের চালান লইয়া ইংরেজ বা ফরাসীর জাহাজকে আসিতে দিবে না; কিন্তু এডমিরাল 'গ্রাফ স্পে'র পরিণতিতে দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মানীর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। নিরপেক্ষ শক্তিদের মধ্যে অন্য কোন শক্তি যদি জার্ম্মানীর পক্ষে যোগ না দেয়, তাহা হইলে বৃটিশের ঘরবন্দী-নীতিকে ব্যর্থ করা জার্ম্মানীর পক্ষে কঠিন। ইংরেজের ঘরবন্দী-নীতির ফলে জার্ম্মানীর আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, জার্ম্মানী অন্য স্থান হইতে এই ক্ষতি পূরণ করিতে পারিবে কি? নরওয়ে, সুইডেন, বল্কান-রাজ্যসমূহ, ইটালী এগুলি তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবে কি? আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যে আকার ধারণা করিতেছে, তাহাতে মনে হয় এই সব রাজ্য জার্ম্মানীর উপর বিদ্বিষ্ট হইয়াই উঠিতেছে। রুষিয়ার নীতিতে জার্ম্মানীর লোকসান হইয়াছে বেশী, লাভ কার্য্যত কিছুই হয় নাই। ষ্ট্যালিনের নীতির সম্বন্ধে পক্ষপাতপূর্ণ সমালোচনা যাহাই হউক, রাজ-নীতিজ্ঞগণ অনেকেই জগতের রাষ্ট্রনীতির সম্বন্ধে তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। অসুবিধা-জনক অবস্থার ভিতর দিয়া নিজেদের নীতির সুবিধা করিয়া লওয়া যতটা সম্ভব, তিনি তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। জার্ম্মানীর সঙ্গে তাঁহার সন্ধি করার নীতি বাহ্যত অনেকের মতে নিন্দনীয় হইলেও সম্প্রতি ষ্ট্যালিন যেভাবে রুষিয়ার রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে স্থূলবুদ্ধি এশিয়াবাসী জর্জ্জিয়ান বলিয়া যাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিতেন, তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। রুষিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর মতের মিল কোনদিনই নাই, হইবারও সম্ভাবনা নাই। রুষিয়া পোল্যান্ডের ইউক্রেন অঞ্চল হাত করিয়া জার্ম্মানীকে কাবু করিয়াছে; ইহা ছাড়া আমেরিকার দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত সাম্যবাদী-বিরোধী শক্তি-দের বিরুদ্ধে সে নিজের ঘাঁটি সুদৃঢ় করিয়া লইতেছে। ফিনল্যান্ডের সম্বন্ধে রুষিয়ার নীতির উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে এই দিকটা বিচার করা আবশ্যক।

চলতি ভারত

যুক্তপ্রদেশ

রাজনীতি ও অর্থনীতি—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এলাহাবাদে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির অঙ্গাঙ্গী যোগের উপরে জোর দিয়ে যে বক্তৃতা করেছেন, তার মধ্যে ভাববার কথা অনেক আছে। তাঁর মতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ হ'তে গেলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে তাকে যুক্ত হ'তে হবে। স্বাধীনতার মূল্য কি, যদি তার দ্বারা আমাদের আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত না হয়? আমাদের এই আত্মপ্রকাশ কখনোই সম্ভব নয়—যদি দারিদ্র্য আমাদের সহচর হয়। এই দারিদ্র্য দূর হ'তে পারে তখনই যখন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্যের ভিত্তিতে। যেখানে ধন সঞ্চিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে আর লক্ষ লক্ষ নরনারীর কোন অধিকারই নেই সামাজিক সম্পদের উপরে—সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। যাদের হাতে টাকা আছে, তারা রাষ্ট্রকে টাকার জোরে করায়ত্ব করে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। সুতরাং সম্পদের বণ্টনে যেখানে তারতম্য—সেখানে রাজনৈতিক অধিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারে কোনো মঙ্গলকেই বহন ক'রে আনবে না। তাদের জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবে। সাম্য চাই—তবেই স্বাধীনতার মূল্য আছে। অধিকারের তালিকা নিয়ে আমরা করবো কি, যদি অর্থের অভাবে সে সব অধিকারকে বাস্তবে ফলপ্রসূ করতে না পারি? দোকানে খাবার খাওয়ার অধিকার থাকলেই যথেষ্ট হোলো না—হাতে পয়সা না থাকলে সে অধিকার থাকা না থাকা সমানই কথা। অর্থনীতির জগতেও সমতা চাই—আর সেই সাম্য তখনই সত্য হ'য়ে উঠবে যখন ধনোৎপাদনের উপাদানগুলির উপরে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেখানে সত্যিকারের সাম্য নেই, আর যেখানে সত্যিকারের সাম্য নেই, সেখানে সত্যিকারের স্বাধীনতাও নেই। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক, তাদের এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

বোম্বাই

কল্যাণ সমন্বয়ে

পুণায় বহু শিক্ষাব্রতীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্গতির অবসানের যে পন্থার নির্দ্দেশ দিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের মতের যথেষ্ট মিল আছে। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের মতো অধঃপতিত জাতিগুলিকে তুলবার প্রকৃষ্ট পন্থা হ'চ্ছে শিক্ষা—সেই শিক্ষা যার ভিত্তি অতীতের সাধনার উপরে কিন্তু যা আধুনিক সমাজের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না।" খুব সত্য কথা। আমরা যারা ভারতবর্ষকে নবজীবনের স্বর্গে উন্নীত করতে চাই—আমরা যেন আমাদের জাতির সাধনার ধারা থেকে আমাদের বর্ত্তমানের সাধনার ধারাকে বিচ্ছিন্ন না করি। বিজ্ঞান আর সোস্যালিজ্‌ম্—এই দুয়ের মধ্যেই যুগ-সত্যের প্রকাশ। বিজ্ঞান লক্ষ্মী আমাদের দান করবে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য আর সোস্যালিজ্‌ম্ সম্পদের সেই প্রাচুর্য্যের অধিকারী করবে সবাইকে। আমরা ভারতবাসীরা আধ্যাত্মিকতার উপরে অত্যন্ত জোর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করেছিলাম। সেই উপেক্ষার ফলে আমাদের এই সর্ব্বনাশ। ইউরোপ বিজ্ঞানের উপরে অত্যন্ত জোর দিতে গিয়ে আত্মার সম্পদ-রাশিকে করেছে উপেক্ষা—সত্যের আর অহিংসার গলায় দিয়েছে ছুরি—ভোগের প্রবৃত্তিকে দিয়েছে প্রাধান্য। আত্মার সম্পদরাশিকে উপেক্ষা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য আপনার শিয়রে ডেকে এনেছে ধ্বংসের দূতকে। ভারতবর্ষ যদি আবার নূতন গরিমায় বাঁচতে চায়—তাকে অতীতের সঙ্গে মেলাতে হবে বর্ত্তমানকে—সত্যের আর অহিংসার ভিত্তিতে গ'ড়ে তুলতে হবে বিজ্ঞানের ইমারতকে—সোস্যালিজ্‌মের আদর্শকে রূপ দিতে হবে ভারতের যুগযুগান্তের আদর্শকে ভিত্তি ক'রে। মার্ক্সের প্রচারিত অর্থনৈতিক সত্যকে যতক্ষণ আমরা না মেলাতে পারবো ভারতের আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে ততক্ষণ হয় আমরা অতীতকে একান্তভাবে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে পচে মরবো—নয়তো অতি আধুনিকতার পিচ্ছিল পথে দৌড়াতে গিয়ে পরানুকরণতার মোহে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবো।

মাদ্রাজ

স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মাদ্রাজের এক বিতর্ক সভায় যুদ্ধ এবং শান্তি নিয়ে কতকগুলো সোজা এবং সরল সত্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে—যারা মনে করছে যুদ্ধ শীঘ্র থেমে যাবে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে শাশ্বত শান্তি—তারা স্বপ্ন-বিলাসী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানবজাতি চক্ষের নিমেষে আপনাকে বদলে ফেলতে পারে না। ব্যক্তির স্বভাব বদ্‌লাতে যদি কতকগুলো বছর লেগে যায়, জাতির স্বভাব বদ্‌লাতে অনেক শতাব্দী লেগে যাবে। তবে একথা সত্য—এই আলো-ছায়া আর আশা-নিরাশার জগতে মানুষ প্রগতির পথে অনেকখানি আগিয়ে গিয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় ভুয়োদর্শী প্রতিভাশালী ব্যক্তি। তাঁর মন্তব্য যুক্তিসংগত। আদর্শবাদীরা লেখায় এবং বক্তৃতায় স্বাধীনতার এবং সাম্যের যতই জয়গান করুন না, যুদ্ধের শেষে শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে কোন্ ভিত্তিতে—সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করে ধুরন্ধর রাজনীতি-বিশারদগণের মতামতের উপরে। ইতিপূর্ব্বে মহাযুদ্ধ যখন শেষ হ'য়ে গেল তখন অনেকেই মনে করেছিল, এই যুদ্ধই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ এবং ভার্সাই-সন্ধিপত্র মানবজাতির

ললাট থেকে বর্ব্বরতার কালিমা চিরকালের জন্য বুঝি মুছে নিলো। কুড়ি বছর যেতে না যেতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে রণডঙ্কা আবার বেজে উঠ্‌লো। সন্ধিপত্রের খসড়া তৈরী হোলো রল্যাঁ আর রাসেলের, শ' অথবা ওয়েলসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নয়, ভার্সাই সন্ধিপত্র রচনা করলো লয়েড্‌ জর্জ্জ আর ক্লিনোস্যার মতো চাণক্যের দল। ফরাসী দেশের রাষ্ট্রনীতির হালে ব্রিয়াঁ থাকলেও ভার্সাই সন্ধিপত্রের মতো সন্ধিপত্র রচিত হতে পারতো না। হিটলার ভার্সাই সন্ধিপত্রের অনিবার্য্য ফল। বর্ত্তমান যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের উপরেও একদিন যবনিকা নামবে। তখন যে সন্ধিপত্র রচিত হবে তার মধ্যে ভার্সাই সন্ধিপত্রের পুনরভিনয় দেখবো কি না, কে বলতে পারে? সেই সন্ধিপত্র রচনার দিনে বৃটেন কি বার্নার্ড শ', ওয়েলস্‌, হাক্সলী জাতীয় আদর্শবাদীদের মতকে প্রাধান্য দিতে রাজী হবে? মনে তো হয় না—বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো মনীষীও ভবিষ্যত সম্পর্কে বেশী আশা পোষণ করে না। একথা আমাদের ভালো ক'রে জানা দরকার যে, শান্তির আবির্ভাবের পথ খুব সহজ নয়। রাষ্ট্রের উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য যতদিন বিলুপ্ত না হচ্ছে, একটা রাষ্ট্রের উপরে আক্রমণ হ'লে যতক্ষণ পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সে আক্রমণকে নিজেদের উপরে আক্রমণ ব'লে মনে না করতে পারছে ততক্ষণ শান্তির আশা সুদূরপরাহত। শান্তি তখনই আসবে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ হবে এবং একের লাঞ্ছনাকে সকলের লাঞ্ছনা মনে ক'রে আততায়ীর বিরুদ্ধে সার বেধে দাঁড়াবে। সেদিন এখনও অনেক দূরে। লীগের মধ্যে যে ঐক্যের ছবি আমরা দেখেছি সে হ'চ্ছে চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভায়ের ঐক্য। ভবিষ্যতে এমন আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারি যার ভিত্তি হবে ন্যায়ের উপরে—তবেই শান্তির স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

অভিভাবকের সমস্যা

দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিভাবকের যে সমস্যা—সে সমস্যার সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করছেন আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু জটিল সমাধানের মধ্যে অবাধ্য ছেলেমেয়ের প্রকৃতি সংশোধনের সমস্যা অন্যতম। মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজে শ্রীযুক্তা রত্নাবাই এ সম্পর্কে একটা সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, কোনো ছেলে যখন বদভ্যাসের দাস হ'য়ে পড়েছে তখন তাকে নিষেধ ক'রে সেই অভ্যাস থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। ভর্ৎসনা ক'রে, বিদ্রূপ ক'রে, প্রহার করেও তার চরিত্র সংশোধন করা এক রকম অসম্ভব। প্রহারের দ্বারা, তিরস্কারের দ্বারা আমরা ছেলেকে ভালো করবার সমস্যাকে জটিলতর ক'রে তুলি মাত্র। ছেলেকে দুষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে চাই তার প্রতি অভিভাবকের দরদ। অপরাধী লাঞ্ছিত বালক যার মধ্যে খুঁজে পাবে দরদী হৃদয়ের সহানুভূতিকে তার কাছে আপনাকে সে নিবেদিত করবে, জীবনের সব কথা খুলে বলবে। বালকের হৃদয় একবার জয় করতে পারলে তাকে সংশোধন করবার রাস্তা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। যার কাছ থেকে সে পেয়েছে স্নেহের সুশীতল স্পর্শ—পাছে সে দুঃখ পায় এই ভয়ে বালক অন্যায় কার্য্য থেকে বিরত থাকবে। যেখানে প্রেম নেই সেখানেই ছেলেরা বাধায় গণ্ডগোল। কান্নাকাটি ক'রে চীৎকারে বাড়ী ফাটিয়ে বে-দরদী অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। স্নেহের আতিশয্য যত ছেলেকে নষ্ট করে তার চেয়ে অনেক বেশী ছেলেকে নষ্ট করে স্নেহের দৈন্য।

ক্যারাভ্যান

শ্রীউমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারি সারি উটের ওপর রয়েছে
সোয়ার আর মধু, খেজুর ও খোবানী;
চলেছি ঢিলে পায়জামা আর আলখাল্লা পরা
আমরা,—বণিকের দল।
চলেছি মরুভূমির পর মরুভূমি,—
স্মির্ণা থেকে ইস্পাহান, ইরাক থেকে প্যালেস্টাইন।......
সীমাহীন বালির সমুদ্র, কোথায় এর পার?
নীল পাথরের গায় তাম্রাভসূর্য্য—
এই সমুদ্রকে করেছে পিঙ্গল বিষুবিয়াসের গহ্বর।
আমরা স্বপ্ন দেখ্‌ছি পারস্য সাগরের অগাধ জলরাশির
আর কানে বাজ্‌ছে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিসের কল্লোলধ্বনি।
যেখানে ঊর্ম্মিরাশির ওপর সূর্য্যের আলোয়—
ঠিক্‌রে পড়্‌ছে চুণী আর পান্নার আভা,
অগাধ প্রাণ যেখানে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে—
তরল জলরাশির আকারে।......
কোথায় ওয়েসিস্‌?
সরস গাছপালা যেখানে কালো হয়ে উঠেছে
বাদশাজাদীর চোখের কোলে সুর্ম্মার মত,—
গুলবাগের সুন্দরীদের হিল্লোলিত বেণীবন্ধের মত।
যেখানে খেজুর গাছের ছায়া ও শীতল জলে রয়েছে
মাটির সঞ্চিত স্নেহরস,
যা সাকীর অতলস্পর্শ চোখের গভীর চাউনির মত
নিরন্তর আহ্বান কর্‌ছে মরুভূর যাত্রীদের।

কোথায় ওয়েসিস্‌?
চিহ্ন তার মুছে গেছে আমাদের চোখের সাম্‌নে থেকে;
আছে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত পথ
আর তপ্ত বালির অগ্নিশয্যা।

মৃত্যুর রূপ

(গল্প)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ডাক্তারে বলে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া।

হবে। না হলেও ক্ষতি নেই। টাইফয়েড কিম্বা নিউমোনিয়া, কলেরা কিম্বা কালাজ্বর, কিম্বা অন্য যে কোনো একটা ল্যাটিন নামের শক্ত রোগ হলেও ক্ষতি ছিল না। তাতে রোগের লক্ষণের হয়তো তফাৎ হ'ত, ডাক্তারের প্রেস্‌কৃপ্‌-সনেরও, কিন্তু আমার কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। আমি তখন পরলোকের যাত্রী। আমার কাছে তখন যাওয়ার সমস্যাটাই মুখ্য, যানের সমস্যাটা গৌণ। অসংখ্য লতা-পাতা-ফুলে-ভরা এই পৃথিবী, তারায়-ভরা এই আকাশ, চেনা-অচেনা অগণিত লোকের প্রতিদিনের স্পর্শ, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে যাওয়ার দিন-ক্ষণ যদি ঠিক হয়ে গিয়েই থাকে, তাহ'লে কিসে চড়ে যাচ্ছি, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় না টাইফয়েড, তা নিয়ে মাথা ঘামানো মিথ্যে।

তবে ডাক্তারে বলে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। আমিও বলি তাই, অর্থাৎ আমার তাতে আপত্তি নেই।

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ কোনো দিন? দেখেছ মৃত্যুর রূপ? সরীসৃপের মতো লকলকে জিহ্বা দিয়ে কেমন ক'রে লেহন করে নেয় মানুষের প্রাণশক্তি, অনুভব ক'রেছ কখনও? ঠান্ডা হয়ে আসে পায়ের পাতা, তারপরে হাঁটু, কোমর, বুক। পরাজিত রাজার মতো একটি একটি ঘাঁটি ছাড়তে ছাড়তে প্রাণশক্তি আশ্রয় নেয় রাজধানীর সর্ব্বশেষ দুর্গের অভ্যন্তরে। একটির পর একটি অঙ্গ স্তিমিত হয়ে মৃত্যুর ধূমল স্পর্শের কাছে করে আত্মসমর্পণ। দুর্দ্দান্ত শত্রু পরিবেষ্টিত রাজা দুর্গ-কোণে বসে ধুক ধুক করে কাঁপতে থাকে। তারপরে সেই শেষ আশ্রয়ও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। রাজারও কাঁপুনী আসে ঝিমিয়ে। যুদ্ধেরও সমাপ্তি হয়।

তারপরে?

ধোঁয়া।

ধোঁয়ার পর ধোঁয়ার কুন্ডলী যা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো প্রথমে এসে পায়ের তটদেশে আঘাত করছিল, দেখতে দেখতে সমস্ত চৈতন্যকে তাই গ্রাস করে ফেলে।

এর নাম মৃত্যু।

একদা এই মৃত্যুর মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি অনুভব করেছি, সেই সরীসৃপের লেহন। তার ধূম্র বাহিনীর স্পর্শহীন আঘাত শুধু টের পাওয়া যায়, অনুভব করা যায় না। পরম মৃত্যুকে তেমনি করে একদিন আমার চেনবার সুযোগ ঘটেছিল।

সপ্তমী পুজোর দিন।

ভোরের দিকে সানাইএর সুরে ঘুম ভাঙ্গল। দেখি মাথা তোলা যায় না, এত ভারী হয়েছে। বেশ শীতও করছে। চেয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই। পুজোর আয়োজনে এত ভোরেই সব উঠে গেছে। তাদের কলরব ওপরে বসেই শুনতে পাচ্ছি।

একটা কিছু গায়ে দেবার দরকার। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে কোথাও কিছু খুঁজে পেলাম না। শুধু বাচ্চুর দলিত-মর্দ্দিত ছোট্ট বিছানাটি এক পাশে প'ড়ে রয়েছে।

ভাবছি কি করা যায়, এমন সময় বোধ করি আমাকে ডাকবার জন্যেই গৃহিণী এলেন।

বললাম, একটা কিছু গায়ে চাপিয়ে দাও তো।

গৃহিণী চমকে উঠলেন। বললেন, সে আবার কি?

—জ্বর।

—তাই নাকি? দেখি।

হাত দিয়ে ললাট স্পর্শ করে গৃহিণীর মুখ শুকিয়ে গেল।

—উঃ! এযে খুব জ্বর! দেখ তো কান্ড! বাড়ীতে পুজো। কোথায় খাটবে-খুটবে, আমোদ-আহ্লাদ করবে, তা না জ্বর করে বসলে ঠিক এই সময়েই।

গৃহিণী একটা লেপ আমার গায়ে বেশ ক'রে গুছিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, আর আমি নিঃশব্দে শুনতে লাগলাম। সত্যিই কাজটা ভালো হয় নি। জ্বর মানুষের হয়, আমারও হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে? যখন নিজের বাড়ীতে পুজো? যখন বাইরে সানাই বাজছে? সময় নির্ব্বাচনের দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে, জ্বরের সময়টা ঠিক উপযোগী হয় নি।

তারপর থেকে গৃহিণী একবার বাইরে গিয়ে পুজোর্চ্চনা, কাজকর্ম্ম দেখে আসেন আর একবার আমার শয্যাপার্শ্বে এসে ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করেন। উত্তাপ কেবলই বেড়ে চলতে লাগল। ১০২· থেকে তিন, তা থেকে চার, বারোটার সময় উঠল পাঁচ। বাইরের আনন্দ-উৎসব-কলরব, পুজো-অর্চ্চনা, বাইরেই পড়ে রইল। সবাই এসে আমার বিছানার পাশে বসলেন। তাঁদের মুখে উদ্বেগের চেয়ে অপ্রসন্নতার লক্ষণই বেশী।

একশো পাঁচ জ্বর অবশ্য খুব বেশী। কিন্তু ম্যালেরিয়ার দেশে তাও খুব বেশী নয়। অর্থাৎ উদ্বেগের কারণ নেই। কিন্তু কাল মহাষ্টমীর রাত্রে থিয়েটার আছে। তার পরদিন লোকজন খাওয়া আছে। সে সব দেখবেই বা কে? করবেই বা কে?

ডাক্তার এসে বলে গেলেন, ম্যালেরিয়া। জ্বর একটু বেশী হয়েছে।

ব'লে গেলেন, মাথাটা বেশ করে ধুয়ে ফেলে কপালে জলপটি দিতে।

ভীষণ শীত এবং কাঁপুনী! মাথার স্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সব কথা ঠিক মনে পড়ে না। বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল।

কেবল মনে পড়ে রায় বাড়ীর জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, ওকে মহিমের পাঁচন খাইও ঠাকুরপো। মহিম কবরেজ তো নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। আমাদের পুটুকে সেবার, দেখেছ তো।

পাঁচটার পরে আমার ঘুম ভাঙ্গল। গায়ে ঘাম দেখা

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

(ভ্রমণ কাহিনী পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

চার

পুণার কথা

বিদ্যাকেন্দ্র

পুণা একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। আমরা এখানে তাহার কয়েকটি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিব। সবগুলির কথা বলা সম্ভব নয় ও হইবে না। আমরা বিশেষ করিয়া এখানকার নব প্রতিষ্ঠিত The Nowrosjee Wadia College-এর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি।

অধ্যাপক মিঃ বি সরকারের নাম পুণা বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। ইঁহার নাম হইতেছে শ্রীবিনয় সরকার। মিঃ সরকার স্বর্গত ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডিতবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দৌহিত্র। সরকার মহাশয়ের মাতা বাঙলা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার। দাৰ্জ্জিলিং যাত্রী শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই শ্রীযুক্তা সরকার মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আনন্দলাভ করেন। দাৰ্জ্জিলিং-এর মহারাণী বালিকা বিদ্যালয় ইঁহারই স্নেহে পালিত। স্বর্গত ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার মহাশয় ইঁহার স্বামী ছিলেন।

অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় অতি সজ্জন। যেমন বিনয়ী, সদালাপী তেমনি প্রবাসী বাঙালীদের একান্ত হিতকামী। একদিন শ্রীযুত সরকার আমাদের নওরোসজী ওয়াদিয়া কলেজ দেখাইতে লইয়া চলিলেন। আমাদের দেশের যুবকদের বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এই বিদ্যালয়ে রহিয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মাত্র এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুণা রেল ষ্টেশন হইতে কলেজ ভবনের দূরত্ব মাত্র পোয়া মাইল। ষ্টেশন হইতে পদব্রজে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

এই কলেজের যিনি অধ্যক্ষ, তাঁহার নাম মিঃ জোয়াগ। ইনি Principal Joag নামে জনসমাজে সুপরিচিত। একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। কলিকাতায় যেবার ভারতীয় দর্শন সমিতির অধিবেশন হয়, সে সময়ে তিনি কলিকাতা আসিয়া সিটি কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন।

আমরা বেলা নয়টার সময় অধ্যক্ষ জোয়াগের বাড়ীতে আসিলাম। ছোট সুন্দর বাংলোটি। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না। একটি মহিলা আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি কলেজের প্রাঙ্গণ মধ্যে কাজ দেখিতে গিয়াছেন।

ওয়াদিয়া কলেজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মস্ত বড় 'কম্পাউণ্ডের' মধ্যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর কলেজের বাড়ীঘরগুলি নিৰ্ম্মিত। প্রায় সাত একর পরিমাণ ভূখণ্ড সুধু খেলাধুলার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। চমৎকার ক্রীড়া-কৌতুকের বাড়ীগুলি সব। এখানকার Gymkhana Pavilionটি অতি সুন্দর—ছাত্রেরা উহা Stadium এবং Gymnasium এই দুইভাবেই ব্যবহার করিতে পারে। এই বিদ্যায়তনের বাণী হইতেছে—For the spread of Light.

এই কলেজে আর্টস (Arts), বিজ্ঞান (Science), প্রভৃতি সকল বিভাগই রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বিভাগ বিখ্যাত অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে সুপরিচালিত। এই কলেজে আর্টস বিভাগের ছাত্রদের optional languages-এর মধ্যে সংস্কৃত, অৰ্দ্ধমাগধী, পারস্য, মারাঠি, গুজরাটি, উৰ্দ্দু ও ল্যাটিন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়; হয়না শুধু বাঙলা ভাষা। বি-এ পরীক্ষার Pass ও Honours-এ ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত, অৰ্দ্ধমাগধী, পার্শী, উৰ্দ্দু, মারাঠি, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এখানেও বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নাই। বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত।

আমরা খানিকটা দূরেই Electrical Technology শিক্ষা দিবার জন্য যে বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকাটি নিৰ্ম্মিত হইতেছে, সেখানে আসিয়াই অধ্যক্ষ জোয়াগের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি একটি বাঙালী যুবকের সহিত কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। আমাকে অধ্যাপক সরকার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, এইখানকার Electric Department-এ একজন বাঙালী অধ্যাপক আছেন। আমি নিকটে যাইবামাত্রই বাঙালী অধ্যাপক যুবক তাঁহার মাথার টুপি খুলিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"স্যার, আপনি এখানে?"—আমি দেখিবামাত্রই চিনিলাম, শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে—সে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আমার ছাত্র ছিল। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে বেঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া এইখানেও নিজ প্রতিভাগুণে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। অধ্যাপক সরকার বলিলেন,—Appointment Committeeতে আমিও একজন ছিলাম। নরেশের গুণপনার জন্যই সে এই পদ পাইয়াছে। শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র ও অধ্যাপক সরকার উভয়েই আমাকে অধ্যক্ষ জোয়াগের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। অধ্যক্ষ জোয়াগ মানুষটি মধ্যমাকৃতি, দিব্য গৌর দেহ, মাথায় একটি টাক। মুখের ভিতর একটা দৃঢ়তার চিহ্ন। চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল। হাস্যময় মুখমণ্ডল। দার্শনিক বলিয়া যে তিনি 'বিবল বিভল মন' তাহা নহেন, স্বপ্নবিলাসী একেবারেই নহেন—খাঁটি কাজের লোক। অধ্যাপক সরকার বলিলেন—এই যে সব বড় বড় বাড়ী দেখিতেছেন এই সব বাড়ী ঘর এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ছোটখাট মানুষটির অমানুষিক শ্রম, নিষ্ঠা ও পরিচালন শক্তির দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান বিভাগের বাড়ীটির (Building for the Science Department) জন্য মিঃ বিসাজি ডি, বি, তারাপোরিওয়ালা (Mr. Vicaji D. B. Taraporevala) ৮০,০০০ হাজার টাকা দান করেন। এই বাড়ীটির নিৰ্ম্মাণকার্য্য ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিভাগটি "The Vicaji D. B. Taraporevala Institute of Science" নামে পরিচিত। বাড়ীটি অতি সুন্দর—প্রত্যেকটি কক্ষ প্রশস্ত ও দিব্যি খোলা মেলা। Store rooms, Balance rooms, Laboratories, Professor's rooms, Lecture Theatres প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। শ্রীমান্ নরেশ পরম উৎসাহের সহিত আমাকে লইয়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাইল।

The Sir Cusrow Wadia Institute of Electrical Technology তিন বৎসর পড়িতে হয়। এই Institute-এ ভর্ত্তি হইতে হইলে ১৫ই জুন তারিখের মধ্যে Application for admission পাঠাইতে হয়। বৎসরে দুইটি Terms. 1st term: 20th June to 10th October, 2nd term: 10th November to 10th March.

এই বিদ্যালয়ে ছুটি বা vacation বড় কম। অক্টোবরের ছুটি (October vacation) এক মাস। Summer vacation-এর সময়টা works training-এ যাপিত হয়।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে শিক্ষানবীশরূপে (as apprentices for training) গ্রহণ করিবার জন্য:—

(1) Nowrosjee Wadia & Sons, Bombay, (2) Century Spinning & Mfg. Co., Bombay, (3) Government Central Stores & Workshops, Dapuri, Poona, (4) Moon Mills Ltd., Bombay, (5) Richard-

son and Cruddas, Bombay, (6) Poona Electric Supply Co., (7) Kirloskar Brothers, Ltd., Kirloskarwadi (Satara Dist.), (8) Ahmedabad & Calico Ptg. Ltd., Ahmedabad, (9) Ahmedabad Electricity Co., Ltd., (10) Pratap Spinning & Weaving Co. Ltd., Amalner, (11) R. S. R. Gopaldas Mohota Mills, Akola, (12) Hira Mills, Ujjain, C. I.), (13) Empress Mills, Nagpur, (14) Raja Bahadur Motilal Poona Mills, Ltd., (15) Greaves Cotton & Crompton Parkinson, Ltd., (16) Bombay Electric Supply and Tramways Co., Ltd. ইত্যাদি। Nowrosji Wadia College, Poonaতে কোনও বাঙালী ছাত্র পড়ে না। আমার মনে হয় বাঙালী মেধাবী ছাত্রগণ এইরূপ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিলে এবং হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিলে, তাহারা ঐসব অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। অধ্যক্ষ জোয়াগ বলেন যে, তাঁহাদের ছাত্রদের চাকরী দিতে তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। পুনার ন্যায় স্থানে থাকিলে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য, যোগ্যতা এবং কার্য্যপটুতা বাড়িতে পারে। আমাদের দেশের উৎসাহী ছাত্রেরা The Nowrosji Wadia Collegeএ এবং The Sir Cusrow Wadia Institute of Electrical Technologyতে যদি ভর্ত্তি হইতে চাহেন, তাহা হইলে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলেই Application for Admissionএর ফর্ম্ম পাইতে পারেন। আমার মনে হয় এই দিকে আমাদের ছাত্র সমাজের উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। বাঙালী এক সময়ে নানাস্থানে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন দিন দিনই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। কাজেই ছাত্র সমাজের দেখা উচিত কোথায় কোন্ সুযোগাদি রহিয়াছে।

আমি আমাদের উৎসাহী ছাত্রগণের জন্য Wadia Institute of Electrical Technologyর Prospectus হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"The rapid strides with which industrialisation is progressing in the world and the very important role electricity occupies in the industries and daily life of a civilised nation, sufficiently justify electricity's claim to enjoy a leading place in the world of modern science. That there is a tremendous future for the development of electricity in India has been unanimously acclaimed by technical experts as well as the Governments of the country. The province of Bombay, particularly, is already ahead of her sister provinces in various kinds of electrification schemes and the use of electrical appliances of every kind. "Consequently, the need for trained" youngmen of the right type, has been more keenly felt in this province than elsewhere."

"The Sir Cusrow Wadia Institute of Electrical Technology "has been started to provide youngmen" with a thorough training in theoretical and practical electro-technology including specialised training, in radio communication engineering, electroplating and welding. The course of instruction is so designed that no time is spent on the subjects which have no direct bearing on the industrial uses of electricity."

এখানে Radio Engineering-এর জন্য Post Graduate training-এরও ব্যবস্থা আছে। এখানকার Mechanical workshop, Electrical Laboratory, Radio Laboratory প্রভৃতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা এখানে ভর্ত্তি হইতে পারেন। বয়স আঠারো বৎসরের কম হওয়া চাই। প্রতি বৎসর ৪০জনের বেশী ছাত্র ভর্ত্তি করা হয় না। আমরা Prospectus-এর যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম, তাহা আমাদের অভিভাবক ও ছাত্রগণের পড়িয়া দেখা উচিত।

এখানকার কলেজ বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীও অতি সুন্দর। ছাত্র ও ছাত্রীদের স্বতন্ত্র বোর্ডিং রহিয়াছে। মাঝখানে অধ্যক্ষের বাড়ী। খাবার ঘরে ছাত্র ও ছাত্রীরা এক সঙ্গে আহার করেন। অবশ্য বসিবার স্থান স্বতন্ত্র। আমাকে অধ্যক্ষ জোয়াগ বলিলেন যে, কলেজে এখন অক্টোবর মাসের ছুটি। নতুবা আপনাকে ছাত্র ও ছাত্রীদের খাবার সময় লইয়া যাইতাম। দেখিতেন কিরূপ প্রফুল্ল মনে বিনা সঙ্কোচে ইহাদের আহারাদি চলে।

শ্রীমান নরেশচন্দ্র বলিল যে, এই কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কোন ছাত্র বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে না। সকলেই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছে। এখানকার ছাত্রেরা বাঙালী ছাত্রদের মত এত কাব্য-প্রাণ এবং বিরহ মিলনের কবিতা লইয়া মত্ত থাকে না। মহারাষ্ট্র-দেশের মাটি তাহাদিগকে দেহে ও মনে সবল করিয়া তোলে।

বেলা প্রায় ১১॥টা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ জোয়াগ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাংলোতে আসিলেন। রাষ্ট্রভাষার কথা, মারাঠা সাহিত্যের অনেক কথা হইল। রবীন্দ্রনাথের কথা যেমন তুলিলাম, অমনি অধ্যক্ষ জোয়াগ তাঁহার পড়িবার ঘর হইতে একখানি ছোট মুদ্রিত পুস্তক লইয়া আসিলেন, সেখানি দেবনাগরী অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। তিনি বেশ সুন্দরভাবে পড়িতে লাগিলেন :—

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরণ পারিজাত ল'য়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি' গেলে তোমার সোণার রথে,
বারেক থামিয়া, মোর বাতায়ন পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়ন পাতে।'

উচ্চারণে ত্রুটি থাকিলেও তিনি অতি সুস্পষ্টভাবে গানটি পড়িলেন এবং বলিলেন যে, সংস্কৃত শব্দ অধিক থাকায় আমার অর্থ বোধে কোনও কষ্ট হয় না। সব কথাই বুঝিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। অধ্যক্ষ জোয়াগ বলিলেন যে, তিনি প্রতিদিন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কোন একটি কবিতা পাঠ করেন।

তারপর রাষ্ট্রভাষা, জাতীয়তা, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই হইল। তাঁহার একটি কথা আমার মনে লাগিল—তিনি বলিলেন যে, অতুল রত্নভাণ্ডার এই ভারতের জ্ঞানরত্ন যেমন আহরণ করিতে হইবে—তেমনি ভোগবতীর সুমিষ্ট ধারার ন্যায় যে অতুল ঐশ্চর্য্য মাতা বসুমতী তাঁহার পর্ব্বতে-বনে-জঙ্গলে ও পাতাল পুরীতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে আমাদের অর্জ্জুনের মত বাণ নিক্ষেপ করিয়া উদ্ধার করিয়া ঐশ্বর্য্যের শুভ্র রজতধারা প্রবাহিত করিয়া ভারতের অভাব-দুঃখ-দারিদ্র্যকে মোচন করিতেই হইবে। এখন এই সাধনার মন্ত্রে ভারতবাসীর দীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। (ক্রমশ)

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

একটি বুড়ি ছোট পাহাড়টার উপর কতকগুলি বাঁশের লাঠি লইয়া বসিয়াছিল। যাত্রীদের সুবিধার জন্য এক পয়সা দিয়া লাঠি ভাড়া লইতে হয়। ভাড়া—অর্থাৎ ফিরিবার পথে লাঠি আবার ফেরৎ দিয়া যাইতে হয়। ওই পাহাড়েরই উপর একটা গাছের পাশে তাহার কুটির, দরজার সম্মুখে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল, হয়ত তাহাদের দেখিয়াই একটা অভিমানের আস্বাদন পাইয়া তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ পথ দিয়া তাহারা ফিরিবে না তাই লাঠি ভাড়া লওয়া হইল না। তাহারা আবার আগাইয়া চলিল, ওইখানে বসিয়াই বুড়ি ছেলেমেয়েগুলিকে যে ইঙ্গিত করিল, তাহা দিলীপের দৃষ্টি এড়াইল না—সে মনে মনে হাসিল।—

একটা বাঁক পার হইতেই সেই ক্ষুদ্র দলটি পয়সার জন্য তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল। মাজীর দয়ায় পয়সা পাইতেও বিলম্ব হইল না।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, সকলেই যদি তোমার মত হত দিদি। অলকাও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তা'হলে তোমার খুব সুবিধা হ'ত না?

দিলীপ অন্যমনস্কের মত বলিল, আমার ত' এই একটাতেই যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে আমার কথা ভাবি না কিন্তু আরও অনেক ভাইই যে পথে-ঘাটে পড়ে আছে।

ঝর্ণার ধারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হাত মুখ ধুইয়া তাহারা আবার আগাইয়া চলিল। সম্মুখে এবং পিছনে পথ পড়িয়া রহিয়াছে, আগাইয়া যাইতে হইবে আবার ফিরিয়াও আসিতে হইবে। পুরাতন পথকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না, নূতন পথের সন্ধান ওই বলিয়া দিয়াছে—পৃথিবীর মাটিতে ওই আবার ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে পা ব্যথা হইয়া যায়, বিশ্রাম করিতে হয় সেই পথেরই জন্য, নীচের দিকে চাহিয়া বুকের জোর বাড়িয়া যায়। অস্পষ্টভাবে নীচের গাছগুলি নজরে পড়ে, অলকা বুঝিতে পারে যে, তাহারা মেঘের উপরে উঠিয়াছে। আকাশের মেঘ পায়ের তলায় স্থির হইয়া আছে মনে হইতেই তাহার মন আনন্দে ভরিয়া গেল, বিশ্ব জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরেরা হয়ত এমনি আনন্দই অনুভব করে।

তাহাদের মত আরও অনেকে আসিয়াছে। আর কোন বাঙালী তাহাদের চোখে পড়িল না, আমেদাবাদ, সুরাট হইতে ইহারা তীর্থ করিতে আসিয়াছে। যে তীর্থঙ্করেরা একদিন পৃথিবীরই বুকে বসিয়া তাঁহাদের মহতী বাণী প্রচার করিয়া জনগণের কল্যাণ সাধিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরই কথা স্মরণ করিয়া ইহারা বহুদূর হইতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছে। কত বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ডুলিতে চাপিয়া, কত যুবক, যুবতী হাঁটিয়া ডুলিতে চাপিয়া নামিতেছে, কেহ-বা উঠিতেছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়, রূপ দেখিয়া পরিচয়ের ইচ্ছা জাগে—অলকা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ডাক-বাংলো পার হইয়া মন্দিরে আসিয়া পৌঁছাইতে আর বেশী দেরী হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দির এইটা, অনেকগুলি সিঁড়ি পার হইয়া উঠিতে হয়।

সতীশ বলিল, কতদিন ধরে না জানি এসব তৈরী হয়েছে, নীচে থেকে সব কিছু বয়ে আনতে হয়েছে ওপরে, উঃ ভাবতেও পারা যায় না।

অলকা বিস্মিত দৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখে তাহার সম্ভ্রমের দৃষ্টি। মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নহে, ঐশ্বর্য্য এমন কিছু নাইও, মহাপুরুষদের প্রতি এই যে ইহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাহাই অলকার দৃষ্টিতে সম্ভ্রম আনিয়া দিয়াছিল। ইহাদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব সে দেখিয়াছে, সমালোচনা করিতেও তাহার বাধে নাই, কিন্তু তাহারই পাশে যে শ্রদ্ধাটুকু এখন তাহার চোখে পড়িল তাহাকে সে ত গ্রাহ্য করিতে পারিল না।

এ মন্দিরের মধ্যে কোন মূর্ত্তি নাই—পরেশনাথজীর পায়ের ছাপ রহিয়াছে। কোথাকার মহারাজা সেই পায়ের ছাপ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য মহামূল্য একটি ঢাকনী দিয়াছেন।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, এদের সব কিছুই মূল্য দিয়ে আড়াল করা দিদি। মূল্য দিয়েই এদের ভক্তির যাচাই হয়। মহাপুরুষের পায়ের ছাপ নিয়েই এরা ব্যস্ত, কিন্তু তার কাজের কথা এদের মনে থাকে না; আশ্চর্য্য।

অলকা কোন কথাই বলিল না, তাহার মনের সম্ভ্রম কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেল না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দিলীপ বলিল, এবার নেমে যাবেন, না দূরের ওই মন্দিরগুলোও দেখতে যাবেন?

বড় মন্দিরটির সম্মুখে আর একটা মন্দির প্রস্তুত হইতেছিল, দূরে আরও অনেকগুলি মন্দির ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই-দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, না এর মধ্যেই নেমে যাওয়া হবে না, এগুলো দেখতেই হবে।

দিলীপ বলিল, ওসবের মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই, তবে জল-মন্দিরে জল আর নীচের মন্দিরের মত কয়েকটা মূর্ত্তি আছে।

সতীশ বলিল, নাই-বা থাকল কিছু, ওখানে পৌঁছানটাই আসল। ঠিক ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছুঁয়ে অনুভব করা আর এখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকা কি এক? তারপর একটু ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, তোমরা এখান থেকে যেমনভাবে দেখতে পাচ্ছ আমি ত তেমনভাবে দেখতে পাচ্ছিনে ভাই, আমি দেখছি সাদা সাদা কতকগুলো কি বসান আছে ওখানে। আমার কি ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে না।

অলকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল, ওদিকে আর দেরী করলে ফিরতেও দেরী হয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার হলে বাঘের ভয়ের চেয়েও হোঁচট খাবার ভয় হবে বেশী।

জল-মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া ফিরিতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। আর দেরী করা যায় না, নামিতে নামিতে অন্ধকার হইয়া যাইবে। দুই পাশের গাছের ছায়ায় সে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে, ভীতি উৎপাদক জানোয়ারের কথা ছাড়িয়া দিলেও সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে যে সতীশের খুবই অসুবিধা হইবে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

গাইড বলিল, আপনারা ত ও পথ দিয়ে যাবেন বাবু, একটু তাড়াতাড়ি করুন, ও পথ দিয়ে বড় কেউ যায় না।

সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি থাকবে ত বাপু আমাদের সঙ্গে। সসম্ভ্রমে সেলাম জানাইয়া লোকটা বলিল, আমি থাকলে আর ভাবনা ছিল কি বাবু, কিন্তু আমার ত বাড়ী ওদিকে নয়। ও রাস্তায় গেলে আজ আর আমি বাড়ী ফিরতে পারব না। পাহাড়টা ত কম নয় বাবু।

সকলে মিলিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার নামিতে লাগিল। সতীশের মনে একটা ভয় খুবই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, গাইড থাকিবে না, পথ ভুল করিয়া যদি সমস্ত রাতই ঘুরিয়া মরিতে হয়? এই পাহাড়ে বন্য-জন্তুর ভয় যে যথেষ্ট তাহা তাহার জানা আছে বিশেষ করিয়া এইমাত্র শুনিল যে, ওই রাস্তাটা নির্জ্জন, ভয় না করিয়া উপায় কি? দিলীপকেই যা একটু ভরসা, কিন্তু ও যে ধরণের তাহাতে এ অবস্থায় তাহাকেই ভয় বেশী। আর অলকা? তাহার কথা মনে না আনাই ভাল। ভবিষ্যতের সম্ভব ও অসম্ভব সমস্ত রকম বিভীষিকাই তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু একথা প্রকাশ করিয়া অলকার মনে ভয়ের ছায়াপাত করিবার ইচ্ছা হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া

সকলের পশ্চাতে সতর্কভাবে চলিতে লাগিল, এতটুকু শব্দও তাহাকে এড়াইয়া যাইতে পারিল না।

চলিতে চলিতে একটা মোড়ের মাথায় আসিয়া থামিয়া পড়িয়া গাইড বলিল, এই বাঁ দিক দিয়ে আপনাদের যেতে হবে বাবু, আমি এখান থেকেই বিদায় হব। কথা শেষ করিয়াই সে একটু নত হইয়া অভিবাদন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অলকা তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল, এতটুকু ইতস্তত না করিয়া সে তাহার হাতে দুইটা টাকা তুলিয়া দিল। লোকটা মুহূর্তের জন্য অতি বিস্ময়ে চক্ষু তুলিয়া চাহিল, কিন্তু অলকার চক্ষুর দিকে নজর পড়া মাত্র অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা আসিয়া সেই বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তাহার দৃষ্টিতে যে করুণা যে মমতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, তাহা এই অশিক্ষিত লোকটার চক্ষুতেও মুহূর্তের মধ্যে ধরা পড়িয়া গেল। তাহার চক্ষু বোধ করি তখন আর শুষ্ক ছিল না, নত মুখে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ভাষাও সে খুঁজিয়া পাইল না।

দিলীপ বলিল, আর দেরী নয়, দিদি সামনে যান, দাদা মাঝে আর আমি পেছনে। নামতে নামতেই অন্ধকার হয়ে যাবে একটু সাবধানে চলবেন।

সতীশ বলিল, রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না ত!

হাসিয়া দিলীপ বলিল, একটাই রাস্তা কোন ভয় নেই, রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে একেবারে নীচের দিকে নেমে গেছে, উঠবার আর হাঙ্গামা নেই, কিন্তু পিছলে যাবেন না যেন।

চলিতে চলিতে একটা বাঁকের মুখ ঘুরিয়া তাহারা সকলেই পিছন ফিরিয়া চাহিল, সেই লোকটা তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল, তাহাদের পিছনে চাহিতে দেখিয়া সে এইবার নত হইয়া অভিবাদন করিল—অলকা হাত তুলিয়া বোধ করি বা তাহাকে আশীর্ব্বাদই জানাইল।

পরমুহূর্ত্তেই আর তাহাকে দেখা গেল না। আবার পথ বাহিয়া নামিতে হইবে- গাড়ী তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে অনেক, অনেক নীচে। ওই লোকটাও ফিরিয়া যাইবে সেই পুরাতন পথেই, হয়ত একাই যাইবে, কিন্তু মন তাহার তাহাকে ছাড়িয়া হয়ত ইহাদের সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইবে। পথ চলিতে চলিতে হয়ত কোন বন্ধুর দেখা মিলিতেও পারে কিন্তু তাহা তাহার পক্ষে হয়ত আজ আনন্দদায়ক হইবে না। বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া ফেলাও অস্বাভাবিক হইবে না। প্রত্যেক কাজের ফাঁকে ফাঁকে অলকার কথা মনে পড়িয়া শ্রদ্ধায় আনন্দে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিবে। মানুষের মনের পটে এমনি যে সব ঘটনা সহসা ঘটিয়া যায় সে সব অগ্রাহ্য করিবার ত কোন উপায়ই নাই। আকাশের বুকে ধূমকেতু উঠিয়া মানুষের মনে কয়েকদিনের জন্যও ত একটা আলোড়ন তুলিয়া দেয়। সে কখন আসিবে, কেমন করিয়া আসিবে তাহা কেহই জানে না, কিন্তু আসিয়া পড়িলে আর ত আসে নাই বলিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই চলে না। এই যে ইহাদের স্নেহ, মমতা তাহার মনকে আজ আলোড়িত করিয়া দিয়া গেল সে কতদিন থাকিয়া তাহাকে ভাবাইয়া মারিবে তা কে বলিতে পারে? মানুষের জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে ইহারা তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবার সাধ্য ত কাহারও নাই।

ক্রমে তাহারা নামিয়া আসিল। বহুদূরের পথ অতিক্রম করিয়া মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া তাহারা শেষবারের মত পিছন ফিরিয়া চাহিল।

অলকা আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ সত্যি নিজের ওপর একটু শ্রদ্ধা হচ্ছে। সতীশ আপন মনেই বলিয়া উঠিল, উঃ কতদূর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরের দিন দেওঘরে ফিরিতে বৈকাল পার হইয়া গেল। গৃহে পৌঁছিয়াই বাহিরে চাকরটাকে দেখিতে পাইয়া অলকা জিজ্ঞাসা করিল, বুড়োবাবু কেমন আছে রে?

চাকরটা মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, বাবুর বড় অসুখ মা।

অলকার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, ঠিক এই জন্যেই সে প্রথমে যাইতে রাজী হয় নাই। ব্যস্ত হইয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল।

খাটের উপর অরবিন্দ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, হয়ত বা ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার সেই শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তিনি খুবই অসুস্থ।

অলকা ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকের নিকটে গিয়া কপাল স্পর্শ করিল, হাত যেন তাহার পুড়িয়া গেল, সে চমকাইয়া উঠিল, হাতটাও তাহার কাঁপিয়া গেল।

অরবিন্দ দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলিলেন, হাসিয়া কি বলিতে গেলেন কিন্তু সে তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার পাশে শয্যার উপরে বসিয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সতীশ ডাক্তার লইয়া আসিল।

কয়েকদিনের চেষ্টায়ও যখন বিশেষ কোন ফল হইল না তখন কলিকাতায় যাওয়াই স্থির হইল।

ট্রেনে উঠিয়া দিলীপ বলিল, কালকেই আমার যাবার কথা ছিল দিদি, প্রতুলদা বোধ হয় ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন না?

অরবিন্দের মস্তকের নিকট স্থির হইয়া বসিয়া অলকা একটু মৃদু হাসিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

আস্তে আস্তে অরবিন্দ বলিলেন, তোমাকে বড়ই কষ্ট দিলুম মা—তোমার যত্নেরও যে শেষ নেই। আজ আমার কেবলি মনে পড়ে সে শরীর আমি আরও খারাপ করে দিলুম। এ লজ্জা যে আমার কি করে যাবে!

একটু ঝাঁকিয়া পড়িয়া অলকা বলিল, শেষ হয়েছে ত আপনার কথা কাকাবাবু, না আরও কিছু বলবার আছে?

অরবিন্দ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, একথার ত শেষ নেই মা—তোমার যত্নেরও যে শেষ নেই। আজ আমার কেবলি মনে হচ্ছে তোমাদের কষ্ট দেবার আগে কেন আমার মৃত্যু হল না। তোমার স্নেহের স্পর্শও পেতুম না বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার ওপর অত্যাচারের অপরাধ থেকেও ত মুক্তি পেতুম।

অলকা তাহাকে কোন বাধা দিল না, সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে এ রোগ যে তাহাকে সহজে মুক্তি দিবে না, এ বিষয়ে তাহার যেন কোন সন্দেহই ছিল না। মনের ভিতরে যে কথা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে তাই বাধা দিয়া আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিল না।

অরবিন্দ বলিয়া চলিলেন, সারা জীবনটাই মানুষকে জ্বালিয়ে গেলুম, অন্ধ যারা তারা পৃথিবীর একটা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক দিন আগে থেকেই আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের কাঁধে চেপে বসেছি, আজও তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারলুম না। তোমাদের মধ্যেই পেলুম যত কিছু স্নেহ-মমতার সন্ধান, তাই বোধ করি তোমাদেরই সব চেয়ে কষ্ট দিয়ে গেলুম। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিয়া চলিলেন, কিন্তু আর বেশীদিন কষ্ট দেব না মা, ঈশ্বর বোধ হয় মুখ তুলে চেয়েছেন, তোমাদের দুঃখের বোঝা এবার কমবে।

অলকা আর থাকিতে পারিল না, কয়েক ফোঁটা জল তাহার চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বাহিয়া অরবিন্দের কপালের উপর টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল—চক্ষে আঁচল চাপা দিয়া সে নিজেকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অরবিন্দ বুঝিলেন, হাত তুলিয়া অলকার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, কাঁদবে সে আমি জানি, কিন্তু আমিও বারণ করব না। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি ব'লে ব্যথা পাই সত্যি, কিন্তু তবু মনে হয় তোমরা যদি না আমাকে আশ্রয় দিতে আমার কি হ'ত তা

আমি ভাবতেও পারি না মা। আমার মৃত্যুর পরেও আমার জন্যে ভাববার লোক থাকবে, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা।

অলকা নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, আর ওসব বলবেন না কাকাবাবু, একটু চুপ করুন। মানুষকে দয়া করতেও কি জানেন না?

অরবিন্দ হাসিলেন, তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, যারা আমাকে এতটুকু দয়াও কোনদিন করে নি, তাদের আমি সহজেই ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তোমাদের ত পারি না মা। দয়া করার যে অশেষ দুঃখ, সেটা ভাল ক'রে না জানিয়েই কি নিশ্চিত হ'তে পারি?

ইহার উত্তরে অলকা কিছুই বলিতে পারিল না। সতীশ নিকটে আসিয়া বলিল, বেশ ত আমাদের সকলকে কষ্ট দিতে একটু তাড়াতাড়িই সেরে উঠুন না।

অরবিন্দের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অলকার হাত দুইটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

* * *

কলিকাতায় পৌঁছাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গৃহে আসিয়াই সতীশ বড় ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার দেখিলেন, মাথা নাড়িলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই বলিলেন না। বৃদ্ধ বয়সটাই একটা বড় রকম রোগ, তাহার উপর অন্য উপসর্গ আসিলে কোনদিনই ভরসা করা যায় না—ডাক্তাররাও ভরসা দিতে পারেন না হয়ত বা লজ্জায়।

সেদিন অলকা অরবিন্দের শয্যায় বসিয়া তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। অরবিন্দ আজ কতকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন।

অলকা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ বেশ ভাল মনে হচ্ছে, না কাকাবাবু?

অরবিন্দ ম্লানভাবে হাসিয়া বলিলেন, নিভবার আগে বাতি ত একটু দপ ক'রে ওঠেই মা। বয়েসের হাতে পড়ে মন যাদের ভেঙ্গে গেছে, তাদের বেঁচে থাকাই যে অভিশাপ।

অলকা বলিল, আপনি অন্য সব কথা ভুলে গেছেন দেখছি। যে-সব ভাবতে নেই, সে-সব কথাই সব সময়ে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা দুষ্টুমীর লক্ষণ, তা ভুলে গেছেন বুঝি?

অরবিন্দ যেন তাহার কথা শোনেন নাই, এমনিভাবে বলিলেন, মানুষের দুঃখে সহানুভূতি জানান আর দুঃখ পাওয়া অনেক তফাৎ। নিজের সাক্ষী আমি নিজেই মা। পৃথিবীটা কেমন তা আমি দেখেছি, চোখ আমার চিরদিনই অন্ধ ছিল না। একটা আঘাত লেগে ক্ষীণদৃষ্টি কেমন ক'রে চিরদিনের মত নিঃশেষে মিলিয়ে যায় তা আমি খুব ভাল ক'রেই জেনে নিয়েছি। তারপর গলার স্বর নামাইয়া কেবলমাত্র অলকাকে শুনাইবার জন্যই যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া তিনি বলিলেন, সতীশের জন্যও তাই আমার ভয় হয় মা, জানি ওকে তুমি কোনদিনও অবহেলা করতে পারবে না, জানি স্নেহ-মমতায় তুমি ওকে ভরিয়ে দেবে আজীবন, তবু না ব'লে ত পারি না। কোন কিছু থেকেই ও যেন হঠাৎ মনে আঘাত না পায়। সে আঘাত শুধু ওর মনেই থেকে যাবে না, ওর চোখ দুটোকেও শেষ ক'রে দেবে। সে দুঃখ আমি বুঝি, আজও আমি তোমাদের মুখ দেখতে পাই নি। অরবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন, কিন্তু ওদিকে তাঁহারই মমতাপূর্ণ কথার আঘাতে অলকার হৃদয়ে যে কি এক আবেগ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। কতকগুলি পুরাতন ঘটনা তাহার চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। তাহার স্বামী, সতীশ, প্রতুল—সকলেই ছায়াবাজীর মত ভাসিয়া উঠিল, মিলাইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সতীশের বিষাদ-মলিন চিন্তিত মুখ বার বার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। ওই অলসপ্রকৃতির সরল অক্ষম লোকটিকে না বলিয়া দিলে কিছুই করিতে জানে না, উহার জন্য ব্যস্ত না হইলেও উহার চলে না। মমতা দিয়া তাহাকে ভাবিতে হয়, সমস্ত প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দিতে গিয়েই যে একান্ত অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িতেও ইতস্তত করে নাই, তাহার কথা না ভাবিয়াই বা সে কি করিতে পারে?

'নিভিবার পূর্ব্বে বাতি দপ করিয়া উঠে'—কথাটা অতি সত্য-রূপেই অরবিন্দের জীবনেও ফলিয়া গেল। দুই দিন পরেই তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেও লাগিলেন। এই শেষ সময়ে সতীশ, অলকা সকলকেই ছাপাইয়া মণি তাঁহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিল। তিনি বার বার তাহাকেই ডাকিতে লাগিলেন। উপরে বসিয়া সে বোধ করি বা তাহারই অন্ধ পিতার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। পরলোকে তাঁহার হাত ধরিয়া সে ছাড়া আর কেই বা লইয়া যাইবে। সন্ধ্যার কিছু পরে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলিলেন, অলকা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল, কিন্তু আর পারিল না, অরবিন্দের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই বয়সে দিলীপ বোধ হয় এমনি হাহাকার অনেক শুনিয়াছে, সে উঠিয়া গিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। সতীশের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে সে-ঘর ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

পৃথিবীর নিয়মের অতি অবধারিত রূঢ় সত্য। এমন কোন মানুষই নাই যে, ইহাকে অবহেলা করিতে পারে অথচ ইহাকে ঘিরিয়াই না কত দুঃখের সৃষ্টি। অতি সত্য বলিয়াই বোধ হয় ইহা অতি কঠোর। (ক্রমশ)

সংগ্রাম

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘনায় শূন্যে ঈগলের মত নিকষ-অন্ধকার ;
ক্লান্তি-কাতর ঘুমায় ধরণী ধূলির শয়ন-তলে—
মৃদু-নিশ্বাসে স্পন্দন লাগে অরণ্যে নদীজলে
ছায়াপথ বেয়ে স্তিমিত প্রহর করিতেছে অভিসার॥
ম্লান-মন্থর মহাকাল-স্রোত সহসা ফেনায়ে উঠে—
নিশীথ-বিরাম করি' বিদীর্ণ জ্বলে রকেটের আলো,
চকিত 'বিগল্' চীৎকারি' ওঠে—সুপ্তি নিমেষে টুটে,
বজ্র-শিখায় উদ্ভাসি' তোলে সহসা রাতের কালো॥
আকাশে আকাশে পতঙ্গসম মরণ মেলেছে পাখা,
ঘর্ঘর রবে ঈথারে ঈথারে থর-তরঙ্গ জাগে,
ফেটে পড়ে বোমা রাঙায়ে আঁধার শাণিত অগ্নিরাগে—
জ্বলন্ত 'শেলে' আসে প্রতিবাদ ধূম-গন্ধক মাখা!
শোণিত-সুরায় হয়েছে পূর্ণ দ্রাক্ষা-পাত্র আজি,
লোভের বিকারে লোলুপ-রসনা প্রসারিত দিকে, দিকে,
ঘন-সংঘাতে আকাশে-পাতালে ইস্পাত ওঠে বাজি'
রক্ত-আখরে বেয়নেট্ রাখে যুগ-ইতিহাস লিখে'॥
জেগেছে বন্দী—শৃঙ্খলে তার জাগিয়াছে ঝঙ্কার,
থর থর করি' কাঁপে শর্ব্বরী—যুগের দেবতা হাসে—
লোভ আপনারে অর্ঘ্য সঁপিছে আপন ক্ষুধিত গ্রাসে,
টুটে' যায় বুঝি গণ-মানবের শাশ্বত-কারাগার!

বিচিত্র বার্ত্তা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব

সৃষ্টির প্রথমভাগে প্রকৃতি যে জিনিষটার উপর বেশী ঝোঁক দিয়েছিল, সেটি পরিমাণগত—গুণগত নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আমরা যে-সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব-জন্তুর খবর পেয়েছি, তারা বর্ত্তমান জীব-জন্তুর তুলনায় অতিকায় ও অতিশয় শক্তিশালী হ'লেও বুদ্ধির দিক থেকে অতি দুর্ব্বল। খ্যাতনামা ইংরেজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক ই রে ল্যাংকেষ্টারের মতে ১৬৪,৫০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠে জীবের প্রথম আবির্ভাব হয়। সেই সব অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তু বহু বৎসর ধরে এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্ব চালিয়েছিল। মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে মাত্র পনের কি কুড়ি হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

জীবজগতে মানব শ্রেষ্ঠ হ'লেও তুলনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবের সহযোগিতা ভিন্ন বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা সভ্য-জগতে বাস করেও জীব-জগতের খুঁটিনাটি অনেক কিছু খবর রাখতে বাধ্য হই। জীব-বিদ্যার জ্ঞান-প্রসারতায় যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বর্ত্তমান কালের অন্যতম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লামার্ক এবং ডারুইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান কালের জীব-জগৎ সম্বন্ধে গবেষণা করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীব-জন্তুর কংকাল স্তূপ, পর্ব্বত গুহা এবং মৃত্তিকা গর্ভ থেকে উদ্ধার করে তাদের দৈহিক গঠন, আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, এই সব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবেরা বর্ত্তমানে পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত হলেও তাদের বংশধরদের কেহ কেহ আকারে খুবই খর্ব্ব হয়ে এই পৃথিবীতে আজও বিচরণ করছে। উদাহরণস্বরূপ হস্তী, গণ্ডার, সিন্ধুঘোটক, জিরাফ প্রভৃতির নাম করা যায়। বর্ত্তমান জীব-জগতে ইহারাই অতিকায় জীবরূপে পরিগণিত।

বৈজ্ঞানিকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব-জগৎকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ঐ সব প্রাগৈতিহাসিক জীবের কংকাল পর্ব্বত গুহায় পাওয়া যায়। গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ ৭৩টি প্রাগৈতিহাসিক জীবের সম্পূর্ণ এবং আংশিক কংকাল আবিষ্কার করেছেন। আজ পর্য্যন্ত যে সব জন্তুর কংকাল উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গণ্ডারের অস্থি সর্ব্বাপেক্ষা ওজনে ভারী। উক্ত কংকালের মাথার ওজনই তিন টনের উপর—দেহের দৈর্ঘ্য ২৫ ফিট। মাঙ্গোলিয়াতে প্রায় আট কোটী বৎসর পূর্ব্বের Dinosaur-এর ডিম পাওয়া গেছে। এছাড়া সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মাংসাশী পক্ষী, বীভৎসকায় জলজন্তু প্রভৃতির কংকাল এবং বৈজ্ঞানিকদের কাছে এখনও যে সব জন্তুর নাম অজ্ঞাত এইরূপ বহু জীবের কংকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় দেড় শত ফিটের একটি জন্তুর কংকালের আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি রোম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ইটালীর সমুদ্রতীরস্থ এক পর্ব্বত গুহাতে 'নিয়ানদারথাল' উপত্যকাবাসী মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। এই জাতীয় মানুষের খুলি প্রথম পাওয়া যায় ১৮৫৭ সালে। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা পৃথিবীতে বাস করত। খুলিটির উপরিভাগে কোন ভারী বস্তুর আঘাতের বহু চিহ্ন পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকদের মত নাকি এইরূপ আঘাতের ফলেই খুলির মালিকের মৃত্যু হয়েছে। 'নিয়ানদারথাল'-এর মানুষেরা গরিলা কিম্বা ওরাংওটাংয়ের মত বিকৃত ভংগীতে না চলে যে, লম্বা সোজা হাঁটতে পারত তা অধ্যাপক সারগিয়ো সারগির এই খুলি গবেষণা করে মত দিয়েছেন।

"নিয়ানদারথাল" অধিবাসীদের নব-আবিষ্কৃত মাথার খুলি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবীতে ইহাদের বাস ছিল (উপরে)

(বামদিকে) অধ্যাপক সারগিয়ো সারগির মাথার খুলি গবেষণায় নিমগ্ন
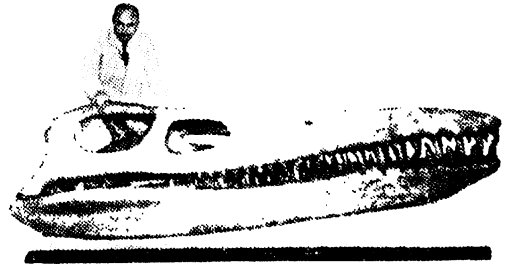
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সামুদ্রিক জীব। ১২,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে সামুদ্রিক জীবজগতে রাজত্ব কর'ত

এছাড়া আর একটি অতিকায় সামুদ্রিক জীবের কংকালও আবিষ্কৃত হয়েছে। কংকালটি লম্বায় দশ ফিট এবং উচ্চতায় তিন ফিট। প্রায় ১২০,০০০,০০০ বৎসর আগে এই জাতীয় জলজন্তু সমুদ্রে বাস করত। এই দৈত্যকায় জীবটির চোয়ালে ৯০টি সুতীক্ষ্ম দাঁত সাজান। হারভার্ড মিউজিয়ামে কংকালটি সযত্নে রাখা হয়েছে।

শ্বশুর বাড়ীর দেশে

(গল্প)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

স্বদেশ হইতে দূরে, বহুজনের মধ্যেও বান্ধবহীন ভাবে এমন একা-একা থাকিতে আর কিশলয়ের ভাল লাগে না। এবারে সে দেশেই ফিরিবে। জানে ঃ সে ভাল করিয়াই জানে সবাই তাহাকে দেখিয়া নাক সিঁটকাইবে; ঘৃণায় সুচিবাইগ্রস্ত নারীর মত হয়তো বা কিশলয়ের প্রতি তাহাদের মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিবে, আর হয়তো বা গ্রামশুদ্ধো সবাই অহেতুক উন্মত্ততার মাদকে ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া। তবু সে যাইবেই।

মনের সাথে সে অনেক হিসাব-নিকাশ করিয়াছে। তিল তিল করিয়া মরিতে সে রাজী নয়। ক্ষমা? না ক্ষমা হয়তো তাহাকে কেহই সেখানে করিবে না; নিশ্চয় সুমিত্রাকে বর্জ্জন করার উপদেশই সবাই দিবেন। হয়তো শাস্ত্র বচনের মাঝ দিয়া সবাই বুঝাইয়া বলিবেন ঃ নারী নির্ব্বাচনের ভুল যদি পুরুষ করিয়াই থাকে, দোষ নাই। ত্যাগ করিলেই সব মিটিয়া যায়।

হয়তো বা বেদ এবং মনুর বিধানে যাহা আছে তাহাই সত্য। কিন্তু কিশলয় মনের সাথে হিসাবের মিল করাইয়া লইতে পারে না। বিবাহের পর আজ পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্যও সে শান্তি পাইল না। সুমিত্রাকে বিবাহ করিয়া সে এমন অন্যায়ই বা কি করিল!

কিশলয় ভাবিয়া ভাবিয়া কেমন বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মনের তার সেই বিরাট প্রশান্তি যেন হারাইয়া গেছে; যেন মিশিয়া লয় পাইয়া গেছে তার পরিপূর্ণতা।

পিতার পত্রখানা সে পাঠ করিল। যাহা প্রথমে পাঠ করিয়াছে এখনও তাহাই আছে। নূতন একটি অক্ষরও নাই।

কতো কাল পরে আজ প্রথম পত্র সে পিতার নিকট হইতে পাইয়াছে। পিতা লিখিয়াছেন ঃ ভুল করিয়া যাহা তুমি করিয়াছ—এখনও তার জন্য ক্ষমা পাইতে পার। আমাদের সকলের ইচ্ছা তুমি তাকে ত্যাগ কর ইত্যাদি।

এ ধরণের কাহিনী কিশলয়ের কাছেও নূতন নয়। এমনত বহু সংসারে বহু হইয়াছে। উপন্যাসের পাদপীঠেরও কতো বিস্তৃত ইতিহাস সে জানে। কিন্তু কিশলয় কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না তার শঙ্করের মত পিতা অকস্মাৎ এমন রূঢ়, এমন আত্মাভিমানী কঠোর হইলেন কি করিয়া। যে উদার মতবাদ এবং ক্ষমাশীল সহিষ্ণুতা ছিল তাহার পিতার কাছে অক্ষয় কবচের মত, কিসের দোলায় এমন করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া গেল।

রাত্রি বেশ গভীর হইয়াছে। নিশ্চুপ, ধীর এবং হালকা ঘুমান রাত্রির মাঝে ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের লঘু স্পন্দন শোনা যায় শুধু। সুমিত্রাও নিশ্চয় এখন ঘুমাইয়া আছে। কচি দুর্ব্বাদলের মত নরম এবং শ্বেতপদ্মের কুঁড়িটির মত তাজা ও স্বচ্ছ সুমিত্রা হয়তো একান্ত নির্ভাবনায় ঘুমাইয়া আছে!

কিশলয় সুমিত্রার ফটোর দিকে তাকাইয়া দেখিল। সুমিত্রা হাসিতেছে। না, সুমিত্রাকে ত্যাগ করা তার অসম্ভব। পৃথিবীর বিনিময়ে পর্য্যন্ত কতো নর কতো নারীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিষের ভরাভাণ্ডার চুমুকে দিয়া নিঃশেষ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া আছে......আর বিবাহিতা স্ত্রীকে আজ কোন্ অপরাধে সে নির্ব্বাসন দিবে। কেনই-বা দিবে—

হোটেলের একটি ছোট্ট ঘরে বসিয়া কিশলয় আবার ভাবিতে সুরু করিল। সুমিত্রা থাকে তার পিতার কাছে শ্যামবাজারের দিকে। কিশলয় কয়েকদিন হইল একটা ছোট্ট চাকরিও পাইয়াছে। আপাতত হোটেলেই থাকে। ইচ্ছা ছিল ছোট্ট একখানা বাড়ী লইয়া সুমিত্রাকে লইয়া সে থাকিবে। তাহাও বুঝি হইবার নয়। এতো বড় বিরাট শহরে তাহার স্থান নাই। সুমিত্রাদের ওখানে কয়েকদিন সে যাইতেও পারে নাই। হয়তো দুটি কৃষ্ণতারার মত উজ্জ্বল কালো চোখে সুমিত্রা রোজই পথ চাহিয়া তাকাইয়া থাকে। কিন্তু যাহা হউক একটা সম্পূর্ণ বোঝাপড়া না করা পর্য্যন্ত সুমিত্রার কাছে গিয়াই বা সে কি করিবে? সুমিত্রাদের অবস্থাও এমন নয় যে খাওয়ার তার কিছু ভাবনা হইবে। ঐশ্বর্য্য তাহাদের অনেক।

হোটেল শুদ্ধ সবাই ঘুমাইয়া আছে। কিশলয় বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। নির্মেঘ পরিস্কার আকাশ। মহানগরীর মাঝে আলোকের বন্যা। বিদ্যুতের বিকীরণে চারিদিক যশস্বী-মহিমান্বিতা।

দিন দুই যাইতে না যাইতে পুনরায় চিঠি আসিয়াছে। পত্রপাঠ পিতা তাহার উত্তর প্রত্যাশা করিতেছেন। কিশলয়কে লইয়া বোধ হয় তাহার পিতার মনেও শান্তি নাই।

হাঁটিতে হাঁটিতে কিশলয় আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়াইল। সম্মুখেই কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগরের ষ্ট্যাচুর কাছে অনেক লোক ভিড় করিয়া জলের মাছ দেখিতেছে। কিন্তু কিশলয়ের কিছুই ভাল লাগে না। কি মনে করিয়া ধীরে ধীরে সে আবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। দুই নম্বরের বাস শ্যামবাজারের দিকে চলিয়াছে। কিশলয় একটাকে থামাইল এবং নামিল আসিয়া সুমিত্রাদের বাড়ীর কাছে।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া সে দোতালায় উঠিল। বসিবার ঘরটাতে কেহ নাই। সুমিত্রার ঘরটা ভেজান। উপরের জানালাটা খোলা। সুমিত্রাকে দেখা যাইতেছে না।

কিশলয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দরজাটির কড়া ধরিয়া শব্দ করিল। ঢুকিল না।

ভিতর হইতে সুমিত্রা বলিল ঃ কে?

কিশলয় উত্তর দিল না। দাঁড়াইয়া রহিল।

সুমিত্রা ভিতরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। ভাবিল কিছু নয়। হয়তো বা বাতাস।

কিন্তু দরজায় আবার শব্দ হইয়াছে।

সুমিত্রা দরজা খুলিয়া কিশলয়কে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলঃ কি দুষ্টু তুমি বলত! বলিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছে।

কিশলয় বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল ঃ আমিত

দুষ্টুই, কিন্তু সেই কতক্ষণ ধরে এসেছি, একবার খবরও নিলে না তুমি।

সুমিত্রা বলিল ঃ আমি কি জানি তুমি এসেছ। কিন্তু আমি জানতাম তুমি আসবে।

ঃ কি করে জানতে?

ঃ সে আর তোমার জেনে দরকার নেই। তারপর কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিতে লাগিল ঃ মেয়েরা এ বুঝতে পারে। তারা তাদের প্রিয়জনের আগমন সংবাদ আগেই জেনে রাখে। কদিন হতেই মনে হচ্ছিল তুমি আসবে—আজ ভোরের বেলা কি হয়েছিল জান?

ঃ কি?

ঃ থাক সে কথা শুনে দরকার নেই। কিন্তু এখনও বাইরেই দাঁড়িয়ে আছো। এসো।

ঃ দরজায় তুমি দাঁড়িয়ে আটকিয়ে আছ; কিশলয় বলিতে লাগিল; দরজা আটকে রাখলে, ভিতরে যাই কি করে বলত!

সুমিত্রা অবাক্ হইয়া বলিল ঃ ইস্ ভারী লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছত! এবারে এসো।

কিশলয় বলিলঃ না, এই গরমে আর ঘরে গিয়ে দরকার নেই। তার চেয়ে চল ছাদে যাই—শীতল পাটি বিছিয়ে বেশ গল্প করা যাবে। গোটা কতক কথাও আছে।

সুমিত্রা হাসিতে গিয়াও হাসিতে পারিল না বলিল ঃ আমারও কয়েকটা কথা ছিল। চল।

এতক্ষণ যে আনন্দবিনিময় সুমিত্রা-কিশলয় উপভোগ করিতেছিল, দুইজনেই কিসের অজানিত সঙ্কোচে তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেল। ছাদের মাঝে কয়েকটি টবে বসান ফুলের গাছ। দোপাটির গাছ নানান রংয়ের নানান ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। হাওয়া আসিতেছে—পারিপার্শ্বিকতাও চমৎকার। তবু দুজনেই যেন একেবারে নিস্তেজ।

কিশলয় নখ দিয়া শিশুর মত পাটিতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলিল ঃ বাবার চিঠি পেয়েছি। আজকেও এসেছে সুমিত্রা।

সুমিত্রার দীর্ঘায়তন দুটি চোখ প্রতিভাময়ী কোমলতায় গাঢ় এবং গভীর হইয়া উঠিল। বলিল ঃ বাবা তোমাকেও লিখেছেন না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমার বাবার কাছেও তিনি লিখেছেন। আমি সবই শুনেছি।

পরিস্কার আকাশে হঠাৎ বৈশাখীর প্রচন্ড কালো মেঘ যেমন সব মাধুর্য্যকে কালিমাময় করিয়া তোলে সুমিত্রার চোখও তেমনি বনহরিণীর মত শঙ্কিত কুণ্ঠায় ভরিয়া গেল। সুমিত্রা নিজের ভবিষ্যৎ ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিতেছে। চোখের সামনে তার আজ ব্যর্থ জীবনের ধূ-ধূ করা মহাপ্রান্তর ব্যতীত আর কিছু নাই।

সুমিত্রা জলভরা দুটি চোখে একবার স্বামীর দিকে তাকাইতে চেষ্টা করিল। পারিল না। মাথা নীচু করিয়া বলিতে লাগিল ঃ তোমার কোন দোষ নেই। আমার জীবনে আমি কোনদিনই শান্তি পাই-নি।

সুমিত্রা একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিল ঃ কবে একদিন বিয়ে হয়েছিল জানিনে—ঠাকুরদা বেঁচে ছিলেন সেদিন। তিনিই দিয়েছিলেন বিয়ে। তারপর যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম সীমন্তে আমার নেই সিন্দুর।

সুমিত্রা থামিয়া গেল। বলিতে লাগিল ঃ সীমন্তের সিন্দুর হাতের নোয়া মুছে গেল। বাবা পড়তে পাঠালেন। তোমার সাথে দেখা হ'ল য়ুনিভার্সিটিতে—কি দিয়ে কি হল—তুমি আমায় চাইলে। আমি না করতে পারলাম না।

কিশলয়ের চোখের সম্মুখেও আজ সেই বিগত দিনের কাহিনী ভাসিয়া উঠিল। সুমিত্রার সাথে তার পরিচয়........ সুমিত্রা বলেছিল—না, না, না, তুমি আমায় নিও না, আমাকে নিয়ে শান্তি তুমি পাবে না। কিন্তু সে শোনে নাই। বিবাহ হইয়া গেল। সুমিত্রার বাবা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন ঃ সুখী হও।

কিন্তু সুখী তাহারা হইল কৈ!

দুজনের মনের মধ্যেই অলক্ষ্য সে কাহিনী হাত-ছানি দিয়া ডাকিয়া গেল। দুজনে দুজনকে চাহিয়াছিল—পাইলও। কিন্তু চারিদিকে এত বাধা!

কিশলয় ও সুমিত্রা দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল।

কি ভাবিয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিয়াছেঃ কি করবে তুমি ঠিক করলে!

কিশলয় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলঃ কিছুই ঠিক করিনি। কিন্তু কি করা উচিত বলত!

সুমিত্রা গম্ভীরভাবে বলিলঃ তোমার বাবার কথা শোনাই তোমার উচিত। আমার জীবনের পথ আমি বেছে নেব। আমার জন্যে তোমার জীবন ব্যর্থ হবে এ আমি কল্পনা করতেও ভয় পাই। তুমি দূরে থাকো সেও ভাল কিন্তু তুমি বড় হবে, সেই হবে আমার গর্ব্বের। সেই আশাতেই আমি বেঁচে থাকবো।

কিশলয়ও হাসিলঃ তাই হবে।

ঃ তাই হোক। দেশে যাও। বাবার কাছে ক্ষমা চাও গিয়ে। তোমার সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে, আর তোমাদের সংসারে বা সমাজে যখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত নেই তখন তুমি কি করবে আর!

সুমিত্রার অত্যন্ত সহজ কথাগুলিও কিশলয়ের কাছে বিদ্রূপের মত শোনাইতে লাগিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

বলিল সে অন্য কথাঃ কালই যাব ঠিক করেছি।

ঃ কালই?

ঃ হ্যাঁ। যাব যখন ঠিক হয়ে গেল তখন দেরী করে নয়। কালই।

কিশলয় আর অপেক্ষা করিল না। সুমিত্রাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মহাযুদ্ধের মত চারিদিক যেন সশস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। সুমিত্রাকে সবাই মিলিয়া যেন গ্রাস করিয়া ফেলিবে!

কিশলয় শেষ পর্য্যন্ত ফিরিয়াও তাকাইল না। আকাশে দু' একটা তারা উঠিয়াছে। সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। সুমিত্রার জীবনেও বুঝি নূতন করিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল।

(৩)

সমস্ত রাত সুমিত্রা ঘুমাইতে পারিল না।

মা আসিয়া বলিলেনঃ ঝড়ের মত এলো, ঝড়ের মত চলে গেলো কি বলে গেলো?

মায়ের সহিত স্বামীর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে কোন মেয়েরই ভাল লাগিবার কথা নয়। একান্ত আবশ্যক হইলে হয়তো বা দু-একটা কথা বলা চলে। সুমিত্রার বুঝি তাও ছিল না।

চুপ করিয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

মাও নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়াই চলিয়া গেলেন।

কয়েকটা দিন কাটিয়াও গেল। দিন নাকি কাহারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

সুমিত্রার কিছু ভালো লাগে না। কিশলয়ের নিশ্চয়ই এতোদিনে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কৈ বৌ দেখাইতেও ত একদিন আসিল না!

অকারণে চোখ দুইটি তার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল শুধু।

সে না হইতে পারিল নারী, না হইল মা। চিরদিন একটা ব্যথিত আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়াই তাহার জীবন কাটাইতে হইবে। নিজের ঘরের মাঝে বসিয়া বসিয়া সুমিত্রা তাহাই ভাবিতেছিল। ঘরে যেন কে প্রবেশ করিয়াছে।

করুক। আসুক যে কেহ। সংসারে তাহাকে লইয়াও যেমন কাহারও প্রয়োজন নাই, তাহারও তেমনি কাহাকেও লইয়া কোন প্রয়োজন নাই।

মন্দ কি সুমিত্রার! ছোট্ট একটি ট্যুশনিও পাইয়াছে। দু এক মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মিসট্রেসীও জুটিয়া যাইবে।

সুমিত্রা তাকাইল না।

মাও আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছেনঃ কখন এলে! এ কি চেহারা হয়ে গেছে?

কিশলয় হাসিয়া বলিলঃ শরীরটা ভাল ছিল না কদিন।

সুমিত্রা গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়াই রহিল।

মা কি মনে করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

কিশলয়কে আজ খুব খুশী দেখাইতেছে। শরীর অনেকখানি খারাপ হইয়াছে সত্য তবু আনন্দ যেন আর ধরে না। বলিলঃ সুমিত্রা তুমি কেমন আছো।

সুমিত্রা কিশলয়ের দিকে তাকাইলঃ ভালই আছি।

কিশলয় হাসিল। হাসিয়া বলিলঃ ভাল আছ, ভালই থাক। কিন্তু কিছু খেতে দেবে!

তাহাকে এইভাবে বিব্রত করার অর্থই সুমিত্রা বুঝিতে পারে না। এত আপ্যায়ন কেন। কি বলিবে যেন সে ভাবিয়াছিল। বলা হইল না। কিশলয়ের চেহারা সত্যই খারাপ হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে কি অসুখ করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না। সুমিত্রা কিশলয়ের জন্য খাবার আনিতে চলিয়া গেল।

আসিয়া দেখিল মা এবং কিশলয়ে কথা হইতেছে।

মা বলিলেনঃ তুমি নিয়ে যাবে—সে ত ভাল কথা।

কিশলয় বলিলঃ আটকা পড়ে গেলাম অসুখে—যাওয়া হল না, ভাবছি ওকে নিয়েই যাব।

সুমিত্রা আসিয়া চা দিয়ে গেল।

কিশলয় মাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিলঃ নটা বারোতে ট্রেণ। আজই রওনা হব ভাবছি। ওকে তৈরী হয়ে থাকতে বলবেন।

সুমিত্রা ঘরে দাঁড়াইল না। বাহির হইয়া গেল। সখ করিয়া আজ আর তাহাকে লইয়া যাইবার কি অর্থ থাকিতে পারে! চা খাইয়া কিশলয়ও বাহির হইয়া গেল কিন্তু সুমিত্রাকে কিছু বলিল না।

আটটার সময়ে কিশলয় ফিরিয়া আসিয়া দেখে সবাই মিলিয়া সুমিত্রাকে সাধিতেছে। কিন্তু সুমিত্রা কিছুতেই যাইতে রাজী হইতেছে না।

কিশলয় বলিলঃ যদি না যায়, তবে আর কি করা যাবে।

মা বলিলেনঃ কেনই বা যাবে না শুনি? স্বামীর ঘর স্ত্রীর কাছে সব চেয়ে বড় তীর্থ। যাবে না কেন শুনি?

বলিয়া নিজেই অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। অন্য সকলেও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কিশলয় দরজাটা বন্ধ করিল আগে। আস্তিন গুটাইয়া সুমিত্রার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলঃ তুমি একটা আস্ত বোকা।

সুমিত্রা বলিলঃ তার মানে?

ঃ তার মানে—তুমি না জানিয়ে চাকুরি পর্য্যন্ত সুরু করে দিয়েছ। এদিকে আমি রোগে ভুগে ভুগে সারা।

সুমিত্রা বলিলঃ দেশে যাওনি এখনও?

না! এই দেখ আমার চেহারা—কিশলয় জামাটা খুলিয়া ফেলিল। হাড়গুলি তাহার দেখা যাইতেছে। বলিলঃ খবরও নেওনি একবার।

সুমিত্রা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

কিশলয় বলিয়া চলিলঃ অবস্থা সেই এক রকমই আছে। বাবা ক্ষমা করবেন না কিছুতেই। তবু আমার ইচ্ছা তোমাকে নিয়ে যাই। বাবাকে একটা প্রণাম করে আসবার এই একটি মাত্র সুযোগ তারপর আমার কর্ত্তব্য আমি বেছে নেব। দেরী হয়ে যাচ্ছে ওঠ—

সুমিত্রা উঠিল।

(৪)

স্বামীর সাথে সুমিত্রা শ্বশুর বাড়ীর দেশের দিকে চলিল। শ্বশুরকে সে কখনও দেখে নাই। শুনিয়াছে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির। হয়তো বা শ্বশুর মহাশয় তাহাকে দেখিবেনই না, ক্ষমা করা ত দূরের কথা। তবু যদি সুযোগ পায় সুমিত্রা শুধু জানাইবে তাহার অপরাধের জন্য যেন কিশলয়কে তিনি কোন কঠিন শাস্তি না দেন।

ট্রেন আসিয়া নদীর সীমানায় দাঁড়াইল। এখান হইতে নৌকায় করিয়া যাইতে হইবে গাঁয়ের দিকে।

জল আর নৌকা দেখিয়া সুমিত্রা একেবারে কচি খুকি মেয়ের মত নাচিয়া উঠিয়াছে। আঃ! মুখ দিয়া সুমিত্রা খুশীর শব্দ করিয়া বলিলঃ আঃ, কি সুন্দর! কি সুন্দর দেশ তোমাদের। কি ভালই যে লাগছে।

শহরের বাইরে সুমিত্রা বড় একটা যায় নাই। বলিতে গেলে নৌকায়ও কখনও সে চড়ে নাই। সুমিত্রা গলই-এর কাছে আগাইয়া গিয়া জল নাচাইতে সুরু করিয়া দিল।

কিশলয় বলিলঃ অতো এগিয়ে যায় না। পড়ে যাবে।

সুমিত্রার কালো কালো চোখ দুইটি প্রাচুর্য্য ও খুশীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বাতাস পাইয়া মন সজীব হইয়া উঠিল। নৌকা খালের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। দুধারে গাছপালার সমারোহ। যত দূরে দৃষ্টি যায় ধানের ছোট ছোট শীষ উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে গ্রাম। গ্রামের মাঝে ছোট ছোট কুটীর।

এত দুঃখের মধ্যেও সুমিত্রার আজ তাই আনন্দ। বন-বনানীর দিকে সে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু কিশলয় ভাবিতেছে অন্য কথা। পিতাকে না জানাইয়া বিবাহ করার অপরাধ কিভাবে তাহার পিতা গ্রহণ করিবে তাও সে জানে না, তার উপর সুমিত্রাকে লইয়াই সে আবার গ্রামে চলিয়াছে। সুমিত্রাকে সে পরিত্যাগ করিবে না কিন্তু পিতার মনেই বা আঘাত দিবে কি করিয়া?

সুমিত্রা আসিয়া ভিতরে বসিয়াছে, দৃষ্টি তাহার বাহিরের দিকে।

কিশলয় বলিলঃ আচ্ছা সুমিত্রা কি হবে?

ঃকিসের?

ঃধরো বাবা যদি গ্রহণ না করেন?

সুমিত্রা ধীরে ধীরে শুধু বলিলঃ আমি আমার কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছি; আমি শুধু চলেছি তাঁকে প্রণাম করতে। এর বেশী আমি কিছু চাইও নে। কিন্তু দেখ কি চমৎকার একটা বাছুর। কতদূর আর তোমাদের গ্রাম। স্বর্ণরেণু। কি ফাইন তোমাদের গাঁয়ের নাম। চারিদিকে শুধু সোনা।

কিশলয় বলিলঃ কিন্তু আনন্দ তুমি করতে পারছ?

সুমিত্রা বলিলঃ নিশ্চয়। দুঃখটা ত মিলিয়ে যাবে না, কিন্তু সত্যিকারের আনন্দ তাকেই বা দুঃখ দিয়ে আটকিয়ে রাখবো কেন! ও মাঝি কতদূর আর স্বর্ণরেণু রে?

মাঝি বলিলঃ এসে গেছি মা! ঐ যে বড় গাছটা—ওখানটাই নোঙর করব নৌকা।

সুমিত্রা আপন মনে উচ্চারণ করিলঃ স্বর্ণরেণু—আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ।

এবারে তাহারা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

কিশলয় আসিবার সংবাদ দিয়াই আসিয়াছিল। অবশ্য সুমিত্রার কথা সে লেখে নাই।

ঘাটে নায়েব মশাই আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধ মানুষ। এ গৃহে তিনি অনেককেই কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। সুমিত্রাকে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া কি করিবেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কিশলয় ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল।

সুমিত্রার দিকে তাকাইয়া বলিলঃ ওঠ, চল সুমিত্রা। দেখছ কি সুমিত্রা—আসবার পথে যে সব গাঁ তুমি দেখেছ, এখনও যা দেখছ সবই বাবার। এত বড় জমিদারের পুত্র-বধূকেও আজ ঘরে তুলে নেবার কেউ নেই। চল।

সুমিত্রা কোন কথা না বলিয়া স্বামীর সহিত ধীরে ধীরে নৌকার বাহির হইতে পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

নায়েব মহাশয় কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু জমিদারের পুত্রবধূকে এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকাটা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছেন না।

বলিলেনঃ একটু অপেক্ষা কর মা, আমি একটা পাল্কি নিয়ে আসছি।

সুমিত্রা কিশলয়কে বলিলঃ না, না, পাল্কি আনতে তুমি নিষেধ কর। হেঁটেই যাব'খন। কতদূর?

ঃকাছেই।

ঃতবে তাই চল। আমাদের আগমন কারো কাছে প্রিয় নয়; না?

কিশলয় জবাব দিলঃ হ্যাঁ।

দুজনে চলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে গ্রামে খবর পৌঁছিয়া গিয়াছে।

রাস্তার দুপাশে নানা বয়সী ছেলে-মেয়ে, পুরুষ ও নারীর দল হাঁ করিয়া তাহাদের তাকাইয়া দেখিতেছে।

নায়েব মশাই পিছনে মাল-পত্র লইয়া আসিতেছিলেন। মালপত্র লইয়া জমিদার বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাই-লেন, অন্দরের গৃহদেবতার মন্দিরের কাছে সুমিত্রা ও কিশলয় দাঁড়াইয়া আছে; বরণ করিবার কেহ নাই।

মালপত্রগুলি নামাইয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—এখানে নয় মা, চল বুড়ো ছেলের বাড়ীতেই গিয়ে উঠবে।

উপর হইতে কে যেন নারীকণ্ঠে হাঁক দিয়া বলিলেনঃ বলে দাও চক্কোত্তি এ বাড়ীতে ওদের স্থান হবে না, কর্ত্তার এই আদেশ।

কিশলয় পিসিমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। এখনও উহারা যখন এখানেই রহিয়াছে সুমিত্রার স্থান নিশ্চয়ই এ বাড়ীতে হইবে না।

সুমিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল।

নায়েব মশাই-এর দিকে তাকাইয়া বলিলঃ আমি সবই বুঝতে পেরেছি নায়েব মশাই। আমি এখান হতেই ফিরে যাব। কিন্তু শ্বশুরের ভিটেয় এসে শ্বশুরকে প্রণাম করে যাব, এই ইচ্ছা নিয়েই এসেছিলাম। চলুন আমায় পথ দেখিয়ে দিন, আমি উপরে যাবো।

বৃদ্ধ নায়েব কি ভাবিয়া বলিলেনঃ চল মা।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে সুমিত্রা শুনিতে পাইল একটা ঘর হইতে ছোট ছোট কথা ভাসিয়া আসিতেছেঃ কেন তাদের উঠতে দিলি আমার বাড়ী?

সুমিত্রা বুঝিল তাহার শ্বশুরই কথা বলিতেছেন।

ঃনায়েবমশাই কার অনুমতিতে ঢুকতে দিল শুনি? হ্যাঁরে সত্যিই খুব সুন্দরী নাকি রে? সত্যিই বলেছে শ্বশুরের ভিটেয় এসে শ্বশুর প্রণাম না করে যাবে না?

সেই পিসীমার কণ্ঠস্বরই শোনা গেলঃ ধিঙ্গিমেয়ে, যত সব বেহায়াপনা জানে।

ঠিক তাই, জমিদার বলিলেনঃ বলে দাও আমার বাড়ীতে ওদের স্থান হবে না।

সুমিত্রা সিঁড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নায়েব মশাই বলিলেনঃ শুনলে ত মা—কি করবে তুমিই ঠিক কর মা।

সুমিত্রা একবার হাসিতে চেষ্টা করিল। তারপর তর-তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল। যে ঘরে তাহার শ্বশুর মহাশয় প্রভৃতি ছিলেন, সে ঘরেই প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। ঘরে এখনও আলো দেওয়া হয় নাই। সুমিত্রা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া শ্বশুরের দিকে আগাইয়া চলিল।

শ্বশুর চমকিত হইয়া বলিলেনঃ কে?

সুমিত্রা কোন কথা বলিল না। আগাইয়া গিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া দূর মাটিতে মাথা রাখিয়া উদ্দেশ্যে শ্বশুরকে প্রণাম করিল। বলিলঃ জানিনে ছুঁলে আপনার আবার নাইতে হবে কিনা—তাই সে সাহস আমি পেলাম না, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন বাবা, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি এসেছিলাম শুধু আপনাকে প্রণাম করতে!

বৃদ্ধ কথা বলিলেন না। অত্যন্ত উদ্বেগ লইয়া সমস্ত ঘরময় পাইচারী করিতে লাগিলেন।

নায়েব মশাই সুমিত্রার দিকে তাকাইয়া বলিলেনঃ তোমার পিসীমাকে প্রণাম কর।

পিসী মুখ দোলাইয়া এবং কি একটা শান্তিবচন আওড়াইয়া আর এক ঘরে চলিয়া গেলেন।

সুমিত্রাও নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল।

কিশলয় এতক্ষণ নীচেই দাঁড়াইয়াছিল। সুমিত্রার মুখ দেখিয়াই সব বুঝিতে পারিয়াছে। হাসিয়া বলিলঃ শ্বশুরকে প্রণাম করতে এসেছিলে, এবারে চল আবার আমরা ফিরে যাই।

সুমিত্রা বলিলঃ তুমি কেন যাবে?

কিশলয় বলিলঃ কেন যাব সে কথা থাক, অন্তত তোমাকে পৌঁছে দিয়েও ত আসতে হবে। চল।

নায়েব মশাই হা-হা করিয়া উঠিলেনঃ সমস্ত দিন পেটে কিছু যায়নি, না খেয়েই যাবে সে কি হয়। আমার বাড়ী পড়ে রয়েছে ত, সেও ত তোমাদেরই বাড়ী।

কিশলয় হাসিল মাত্র।

সুমিত্রার দিকে তাকাইয়া বলিলঃ চল।

(৫)

জমিদার ঘরময় তেমনি পায়চারী করিতেছেন। তাহার অনুমতি না লইয়া বিবাহ করিতে কিশলয় সাহসী হইল কি করিয়া! মাতৃহারা একমাত্র সন্তান—কিন্তু তাই বলিয়া এত বড় অপরাধ! কিন্তু বেশ মেয়েটি। জমিদার মনে মনে বোধহয় এমন একটি কল্যাণী বধূমাতাই আনিতে চাহিয়াছিলেন। আঃ যদি বিধবা না হইত। কিন্তু বিধবা বিবাহও ত শাস্ত্র বিরোধী নয়।

জমিদার তেমনি ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

না, ক্ষমা তিনি কিছুতেই করিবেন না। এত বড় অপরাধের ক্ষমা নাই। কিন্তু বেশ লক্ষ্মীর মত মেয়েটি—সত্যি যদি তাহাকে বধূমাতা হিসাবে সে পাইতে পারিত!

উপর হইতে জমিদার সব দেখিতে লাগিলেন। ওরা হাঁটিয়া হাঁটিয়া ঘাটের কাছে পেঁছিয়াছে। একি অন্যায় —উহাদের জন্য একটা পাল্কিও ব্যবস্থা করা গেল না? না খাইয়াই গেল? চিৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেনঃ চক্কোত্তি!

চক্কোত্তি ওরফে নায়েব মশাই ছুটিয়া আসিলেন।

ঃনা খেয়েই গেল? এই ভর সন্ধ্যে বেলা না খেয়েই গেল?

চক্কোত্তিও কথা কহিল না।

ঃতা সঙ্গে একটা পাল্কিও দিতে পারলে না—তোমরা সব কি!

তাকাইয়া দেখিলেন উহারা নৌকায় উঠিয়া বসিয়াছে।

মুহূর্তে জমিদার মশাই এক কান্ড করিয়া বসিলেন। চিৎকার করিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ ওরে কে আছিস, নৌকা ফিরিয়ে আন—বলিতে বলিতে হাতে একটা শাঁখ লইয়া তিনি নিজেই তাহাদের বরণ করিয়া আনিবার জন্য নদীর দিকে ছুটিলেন।

বড়দিনের চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

কলকাতায় বড়দিন.........বড়দিনের কলকাতায় স্তিমিত পাংশু মনকে নাড়া দিয়ে প্রায়-জীবন্ত করে তুলবার জন্য নেশা ও তামাসার অভাব নেই। মেট্রোতে একসঙ্গে নর্ম্মা শীয়ারার ও জোয়ান ক্রফোর্ড এবং আরো অনেকে—স্ত্রী-চরিত্রের নিপুণ নিখুঁত বিশ্লেষণ চান যদি, তো যাবেন মেট্রোতে—একটিমাত্র পুরুষের পার্ট নেই; নাই বা থাকল গল্প, আছে তো মেয়েদের মনোহর মনস্তত্ত্ব, বিচিত্র বিশ্লেষণ.....কে বলছিল, লরেল আর হার্ডিকে আর কখনও একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে না? লাইট-হাউস সে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে, অন্তত আর একবারের মত...... ক-বছর পরে উদয়শঙ্কর এসেছেন বড়দিনের কলকাতায়, শুনছি এবার তিনি অনেক নতুন নাচ সৃষ্টি করে এনেছেন; হিন্দু-মুসলমান মিলনের ব্যঞ্জনা করেছেন নাচে মাথায় ফেজ পরে, দেখি নি অবশ্য.....তারপরে আছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মোড়ে মেলা, আছে নতুন বাজারে সেল, এমনি আরো কত কি।

এ-সব তামাসা যদি আপনার পছন্দ না হয়, সিনেমা দেখা যদি আপনার মনে হয় প্রাকৃতজনোচিত, মেলার ভিড় যদি আপনার সহ্য না হয়, বাঙলা থিয়েটার দেখতে যদি আপনার রুচিতে বাধে, তবে আপনার জন্য আছে কালচার্ড তামাসা, চিত্র-প্রদর্শনী, আর্ট একজিবিশন।

তামাসাই বটে। চিত্র-প্রদর্শনী দেখে পরম বিস্ময়ে অবাক হবার দিন শেষ হয়ে গেছে যেবার দেখেছি, অবনীন্দ্রনাথের আরব্য উপন্যাস চিত্রাবলী, দেখেছি নন্দলাল বসুর শান্তিনিকেতন দৃশ্যচিত্রাবলী, স্বর্ণকুম্ভ। তারপরেও চার পাশে অক্ষম শিল্পীদের স্তূপীকৃত ব্যর্থতার মধ্যে হঠাৎ নন্দলাল বসুর রাধার বিরহ মনকে শ্রদ্ধায় আকর্ষণ করেছে। গত দু'-এক বৎসরের এবং এ বছরকার প্রদর্শনীগুলি বড়দিনের তামাসারই অঙ্গ, যে তামাসা দেখা আপনার একটি সামাজিক কর্ত্তব্য, কারণ আর্টের বিষয় একটু চর্চ্চা না করলে এ-যুগে মুখ দেখানো চলে কি? মুখ দেখানো গেলেও মুখ খোলা চলে না, অতএব বড়দিনের সপ্তাহে যেদিন আপনার সিনেমা দেখার বার নয়, সেদিন বিকেলে প্রদর্শনীগুলি সেরে আসা ভাল। অসম্বন্ধ অর্থহীন রঙীন প্রলাপে আপনার শিরঃপীড়া জন্মাতে পারে, কিন্তু আর্টের বেদীতলে বার্ষিক অর্ঘ্য নিবেদন করবার আত্মপ্রসাদ তো অনুভব করতে পারবেন।

বস্তুত, কয়েক বৎসর যাবৎ কলকাতায় প্রদর্শনীর প্রাচুর্য্যে যাঁরা এই ভেবে আনন্দিত হন যে, দেশে আর্টের আদর বাড়ছে, শিল্পকলা সম্বন্ধে রসবোধ ও জ্ঞান সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এই প্রদর্শনীগুলির মধ্যস্থতায়, তাঁরা নিশ্চয়ই এই সকল প্রদর্শনী গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করেই সে আশা পোষণ করে থাকেন। কারণ, এমন আশাবাদী দুর্লভ, যিনি এই প্রদর্শনীগুলির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করবার পরেও এ-দেশের আর্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো আশা পোষণ করতে পারেন। বড়দিনে কলকাতায় পথের ধারে রেলিঙে যে-সব ক্যালেণ্ডার প্রদর্শনী বসে, তার সঙ্গে আর্টের দিক দিয়ে এই সব বহুপ্রচারিত প্রদর্শনীর মূলত কোনোই প্রভেদ নেই। পরিচয়পত্রে অবশ্য রসবেত্তাদের দীর্ঘ সূচী থাকে, কিন্তু ছবি নির্ব্বাচনে বিচারক-সভা তাঁদের সে বহুবিজ্ঞাপিত রসবোধের কোনো চিহ্ন রাখেন না।

মায়ামৃগ—শিল্পী শ্রীসুহাস দে

বিলাতপ্রত্যাগত কোনো শিল্পী বলছিলেন, বিলাতের প্রদর্শনীগুলিতেও নাকি এমন অযোগ্য ছবি অনেক থাকে। অর্থাৎ আমাদের দেশেও অতএব তা চলতে পারে। শিল্পীবরের দৃষ্টান্ত যদি বা সত্য হয়, তাঁর তুলনাটি সত্য নয়। কারণ, এ-কথা মেনে নিতে আপত্তি হওয়া উচিত নয় যে, শিল্পবোধ আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে এখনও অপরিস্ফুট; বিদেশের প্রদর্শনীতে অসার্থক চিত্র যতই থাকুক, সেগুলিকেই সংবাদপত্রে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে বিজ্ঞাপিত করা হয় না, সমালোচক দুরূহাচার্য্য, দুর্ব্বোধ্য ভাষায় সেগুলির স্তুতি পাঠ করে দর্শকের মনকে ধাঁধিয়ে দেন না; যে ছবি শ্রদ্ধার যোগ্য, রসিক সমালোচক ও উৎসুক দর্শকের সহযোগিতায় সেগুলিই সম্মানের আসন পেয়ে থাকে। আর আমাদের প্রদর্শনীতে হাজার ছবির মধ্যে ন-শ ছবি প্রদর্শনীর কলঙ্ক,

শিল্পীযশঃপ্রার্থীর ব্যক্তিগত বন্ধুমণ্ডলীর বাইরে মুখ দেখাবার অযোগ্য সে সব-ছবি—দেশী বা বিদেশী আধুনিক বা প্রাচীন, কোনো শিল্পরীতি অনুসারেই সেগুলি চিত্র-আখ্যা পাবার উপযুক্ত হয় নি। এই সব ছবি দিয়ে প্রদর্শনী বোঝাই করবার অর্থ যদি এই হয় যে, আমরা শিল্পকলার কত পিছনে আছি তা তথ্য-প্রমাণযোগে প্রচার করা, তবে প্রদর্শনীগুলিকে সার্থক বলতে হবে; কিন্তু লোকশিক্ষার দিক থেকে এগুলি ব্যর্থ—শুধু ব্যর্থ নয়, ক্ষতিকর; ক্ষতিকর এই জন্য যে, আমাদের দেশের জনসাধারণ মাসিক পত্রে প্রকাশিত ছবি, প্রদর্শনীর ছবি থেকেই শিল্পজ্ঞানকে পুষ্ট করে থাকে—সংবাদপত্রে বা ছবির প্রদর্শনীতে যে-সব ছবি প্রচারিত হয়ে প্রশস্তি পায়, সেগুলিকেই তারা শ্রেষ্ঠ ছবি বলে জানে এবং সেইগুলিরই মাপে অন্য ছবির ভালমন্দ বিচার করে। এইজন্য আমাদের দেশে পত্রিকার ও প্রদর্শনীর বিশেষ দায়িত্ব

অভিসারিকা—শিল্পী শ্রীরাণী চন্দ

আছে; এইজন্য, চিত্রপদবাচ্য নয় পাসমার্কাও পায়নি এমন কাঁচা দুর্ব্বল শিল্পরাশ কখনও আমাদের দর্শকদের সামনে তুলে ধরা উচিত নয়।

এখন বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীর কথা সংক্ষেপে বলা যাক। যাদুঘরের প্রদর্শনীতে এক হাজারের উপরে ছবি, তার মধ্যে অনেক ক্লান্তি স্বীকার করে মুষ্টিমেয় দর্শনযোগ্য ছবি খুঁজে বার করতে হয়—অপরিণত, অশিক্ষিত হাতের অক্ষম প্রয়াস সমস্ত প্রদর্শনীটিকে আবিল করে দিয়েছে; তার মধ্যে চেষ্টা করে যে কয়টি উল্লেখ করবার মত ছবি দৃষ্টিগোচর করতে পারা গেছে, তার তালিকা করে দিই।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর রামায়ণ-চিত্রাবলীর সবগুলি সমান না উৎরে থাকলেও, কাহিনী-চিত্রণ, book-illustration হিসাবে উৎকৃষ্ট রচনা; যদিও শ্রীনন্দলাল বসুর রামায়ণ-চিত্রাবলী যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের চোখে রামায়ণের ছবি দিয়ে নূতন করে রং ধরান কঠিন। রমেনবাবুর এই পৌরাণিক চিত্রাবলীর (৮৩২. ৮৩৪-৮৩৬, ৮৩৮-৮৪২, ৮৪৪ নং) পার্শ্বেই যখন শ্রীরণদা উকীলের দেবী-চিত্রাবলীকে সমাদৃত হতে দেখি, তখন আমাদের আর্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশার কারণ ঘটে না। আধুনিক ভারতীয় শিল্প বা নব্য-বঙ্গীয় পন্থার চিত্র সম্প্রতি যে যে গুণে সংশয়ভাজন হয়ে উঠেছে, তার প্রত্যেকটি গুণই উকীল মহাশয়-দের কারণ এ'দের একজনের ছবি অন্যের থেকে পৃথক করে দেখা চলে না। ছবিতে আছে—যেমন অতিলালিত্য, পুনরাবৃত্তি,

নৃত্যরতা—শিল্পী শ্রীমুকুল দে

ভ্রূযুগের প্রতি অনাদর, চাঁপার কলির মত চোখ ও পদ্মকলির মত আঙ্গুল—অভিসারিকা হ'লেও তাই, পূজারিণী হ'লেও তাই, ইদের চাঁদ হলেও তাই, চামুণ্ডা হলেও তার ব্যতিক্রম হবে না। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বর্ম্মার "নদীপথে" (৮২৭ নং) ছবিটি দেখলে হঠাৎ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের ছবি বলে মনে হয়; ছবিটি শিল্পীর ওস্তাদ কলমের উপযুক্ত হয় নি। শুধু "বাঙালী মহিলার চিত্র" বলেই যে পুরস্কারযোগ্য, তা নয়, শ্রীমতী রাণী চন্দের "রাধার প্রতীক্ষা" (৬৯৭ নং) চিত্রখানি অলঙ্কারপ্রধান চিত্র হিসাবে সমস্ত প্রদর্শনীর মধ্যেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তবে ছবির নীচে পদ্ম ও পদ্মপাতার পাড়টি মূল ছবিটির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়, মূল ছবিটির সঙ্গে তার যোগ শোভন হয়নি। শ্রীমতী রাণী চন্দের অন্য ছবিগুলিও দর্শনযোগ্য। পুরস্কার-প্রসঙ্গে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, শ্রীযোগেশচন্দ্র দের পুরস্কৃত ছবিটি ("গ্রামের পথে", ৭১৭ নং), শ্রীবাসুদেব রায়ের একটি ছবির

অনুকৃতি মাত্র, মূলে ছবিটি কয়েক মাস আগে কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-রকম অনুকৃতি অবশ্য এ প্রদর্শনীতে আরও অনেক আছে, যেমন শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদারের "বধূ" (৮৪৫ নং) ছবিটি শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর একখানি ছবির অনুকৃতি বললে অন্যায় হয় না। শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঘরমুখো" (৫০১ নং) প্রভৃতি ছবি সূক্ষ্ম তুলিতে "মিনিয়েচার" কাজের উৎকৃষ্ট নমুনা। (সম্ভবত শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ছাত্র) শ্রীরামানুজনের "তুলনা" (৮৭৮ নং) চিত্রটি উপভোগ্য। দেবীপ্রসাদের অন্য একজন ছাত্র শ্রীপরিতোষ সেনের কোন কোন ছবি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁর আঁকা কদলীকুঞ্জের ছবিটি অলঙ্করণ, প্যাটার্ন সৃষ্টির দিক থেকে সার্থক; কিন্তু ছবিটি শুদ্ধমাত্র প্যাটার্নও নয়। ছবিটির বর্ণসম্পাতও স্নিগ্ধ এবং সরস, মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের ছাত্রদের যা বিশেষত্ব, অর্থাৎ গুরুর অনুসরণে একখানি ছবি বলেই হঠাৎ ভ্রম জন্মায়, সে ভ্রম দূর হতে সময় লাগে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার মহাশয়ের "অ্যাবষ্ট্রাক্ট" ছবি কয়খানিকে প্রদর্শনীকর্ত্তৃপক্ষ পোষ্টারের মধ্যে গণ্য করেছেন! (অসিতবাবুর ছবিকে অ্যাবষ্ট্রাক্ট বলতে ভয় হয়; তাঁর মতে হয়ত, অবনীন্দ্রনাথের ধারাতেই তিনি তাঁর এই ছবির রূপ পেয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের ধারা থেকে একটুও ব্যতিক্রম যাঁরা করেছেন, বা আধুনিক ইউরোপের শিল্পধারার প্রভাব স্বীকার করেছেন, সেই সকল শিল্পীদের প্রতি অনেক তিরস্কার তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে বর্ষণ করেছেন। অতএব তিনি নিজে নিশ্চয়ই বিদেশী প্রভাবে পড়েন নি, অগত্যা আমাদের এই ধরে নিতে হবে।)

তেল-রঙের ছবির মধ্যে শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কলকাতার দৃশ্যচিত্রগুলি (৪১, ১১৭ ইত্যাদি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পল্লীগ্রামে ঋণসালিশী বোর্ড—শিল্পী শ্রীবাসুদেব রায়

কুহেলিকার সমাবেশ, সেরূপ নয়। এঁর ছবির ধারা দেখে মনে হয়, এঁর গুরু-নির্ব্বাচন দৈববশেই হয়েছে, প্রবৃত্তিবশে হয়নি; যদি গুরুর প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে ইনি একজন সার্থক শিল্পী বলে পরিগণিত হবেন আশা আছে। শ্রীহেরম্ব গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুহাস দে, শ্রীবাসুদেব রায় প্রভৃতির আঁকা ছবিগুলিও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযামিনী রায়কে যাঁরা বাঙলার "কৃষ্টি"র ধ্বজাবাহী পটুয়া বলে জেনে রেখেছেন, তাঁরা আশা করি, ইতিপূর্ব্বেই নিরাশ হয়েছেন, এই প্রদর্শনীতে তিনি তাঁদের আরও নিরাশ করবেন। সুখের বিষয়, আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকর ও ইজম্‌'এর প্রভাব মেনে নিতে তিনি কোন দ্বিধা বোধ করেন নি, তাঁর চিত্রের বলিষ্ঠতা ও প্রসার এমনই। এই প্রদর্শনীতে তাঁর কয়েকটি দৃশ্যচিত্র দেখলেই এ-কথার সত্যতা বুঝতে পারা যাবে। এমন-কি, তাঁর একটি ছবিকে নিশ্চয় ভ্যান গঘেরই (Van Gogh-এর) টালিগঞ্জ পুলের আশে পাশে যে নূতন পল্লী গড়ে উঠছে, যে অংশের সঙ্গে কলকাতার চেয়ে মফঃস্বল শহরের মিল বেশি, সেই অংশের মধুর আলোকদীপ্ত চিত্র এগুলি; রমেনবাবু বিলেত থেকে ফিরবার পর তেল-রঙেই ছবি আঁকছেন বেশি, কিন্তু তাঁর নিজস্ব পূর্ব্বধারা এতে অক্ষুণ্ণ আছে, বিদেশের কোন আর্ট স্কুলের কোন গুরুকে কপি করেন নি। প্রতিকৃতি অঙ্কণে তাঁর দক্ষতার নিদর্শনও এই প্রদর্শনীতে আছে।

এই বিভাগেও দর্শনযোগ্য ছবির নিদর্শন কমই আছে, বাঙলার বাইরের দু'চারখানি ছবি ছাড়া। এই প্রদর্শনীর পৃষ্ঠপোষক কেউ কেউ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে নগ্ন নারীর চিত্র বহুমূল্যে কিনে নেবার পরেই বোধ হয়, এই প্রদর্শনীতে নগ্ন চিত্রের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি হয়েছে। সেগুলি যদি দেহ-গঠন নির্দ্দেশ বা "ষ্টাডি"ই হত, তাহলে কিছু বলবার ছিল না; কিম্বা যদি একান্তভাবে সৌন্দর্য্য-পূজা, দেহ-সৌন্দর্য্যের আত্মবিস্মৃত জয়গানই হ'ত, তাহলে সেগুলি [illegible]

মধ্যেই এমন একটা মাংসল শ্রীহীন স্থূলে রুচি আত্মপ্রকাশ করেছে যা দেখে মন অত্যন্ত বিতৃষ্ণায় জুগুপ্সিত হয়।

এর পরে সরকারী আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীর কথা কিছু উল্লেখ করব। কিছুকাল ধরে এই প্রদর্শনীটি একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছন্ন রূপ ধরছিল। এতে থাকত শুধু স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাজ; ছাত্রদের কাজ অধিকাংশই হ'ত কাঁচা, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে তাদের একটি নবীন উদ্যম, শিক্ষার আগ্রহ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রকাশ পেত। সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কাজ যাঁরা অনেক পূর্ব্বে দেখেছেন, তাঁরা আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করে আনন্দিত হবেন—অধ্যক্ষ শ্রীমুকুলচন্দ্র দে, প্রধান শিক্ষক শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহাদের যোগ্য সহকর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে

মায়ের কোলে—শিল্পী শ্রীঅতুল বসু

ছাত্ররা কেমনভাবে নূতন বিষয়-বস্তু, নূতন পদ্ধতি ইত্যাদিতে হাত দিয়ে কৃতকর্ম্মা হচ্ছে। এবারে তার সঙ্গে একটি "সর্ব্বজনীন শিল্পোৎসব" মোটামুটি, (এটি যাদুঘরের ছবির বাজারেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হয়েছে) জুড়ে দেওয়াতে স্কুলের প্রদর্শনীর যা প্রধান দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ ছাত্রদের কাজ, তাই চাপা পড়েছে। যে উদ্দেশ্যে এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, শুধু ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রদর্শনী দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত। তা ছাড়া, শ্রীমুকুলচন্দ্র দের এচিঙের "রেখার সঙ্গীতের" পাশে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্টে রঙ লাগান ছবি চলে না, শ্রীমুকুলচন্দ্র দের "পুরীর পথে", অবনীন্দ্রনাথের "মন্দির-দ্বারে" প্রভৃতি আমাদের মনকে যে রহস্যস্বপ্নে আবৃত করে সিক্তবসনা সুন্দরীর ছবি দেখা মাত্র সে স্বপ্ন অত্যন্ত রূঢ় আঘাত পায়। গরমিলে মিলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে লাভ কি? হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি না হলে স্বরাজ আটকে থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষায় সংস্কারে লক্ষ্যে যে-সব শিল্পীর মানসিক গঠনে কোথাও কিছুমাত্র মিল নেই, তাদের মধ্যে এক সপ্তাহের জন্য প্যাক্ট স্থাপিত না করলেও, আর্টের স্বরাজ আটকে থাকবে না।

আমাদের প্রদর্শনীগুলির এই নৈরাশ্যকর অবস্থায় একমাত্র সান্ত্বনা একক চিত্রকরের প্রদর্শনীগুলি। দু'-এক বছর যাবৎ এখানে এইরূপ প্রদর্শনীর চলন হয়েছে, শ্রীক্ষিতীশ রায়ের ষ্টুডিওতে ধারাবাহিক এইরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন সম্প্রতি হয়েছে। একাধারে এগুলিতে অপাংক্তেয় থেকে শ্রেষ্ঠ ছবির বিভ্রান্তিকর ভিড় থাকে না, ছবির একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড থাকে এবং চিত্রামোদীরা একজন শিল্পীর বিকাশ ও বিশিষ্ট ধারা একান্ত মনে আলোচনা করবার সুযোগ পান। বড়দিনে শ্রীঅতুল বসুর চিত্রাবলীর এইরূপ একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীর আয়োজনের জন্য এই লেখকের মত আরও অনেক দর্শকই বিশেষ কৃতজ্ঞ; সে কৃতজ্ঞতা শ্রীঅতুল বসুর বহুবিজ্ঞাপিত "বাঙলার বাঘ' চিত্র বা মহারাণীর চিত্র দেখবার সুযোগ পাবার জন্য নয়। সে কৃতজ্ঞতা, এই সুযোগে শ্রীঅতুল বসুর শিল্প-ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁদের মন থেকে কোন কোন ভ্রান্ত ও অন্যায় ধারণা দূর হ'তে পারল বলে। এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর "গুণ্টানা" বা 'রবীন্দ্রনাথ' ছবি দেখবার পরও তাঁর দক্ষতার প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। কিন্তু কোন্ শুভবুদ্ধিবশে জানি না, তিনি এবার তাঁর পুরনো স্কেচবুক আমাদের সামনে ধরেছেন, আরও বার করেছেন, অনেক ছবি যা হয়ত অপরিণত বয়সের কাজ বলে ইতিপূর্ব্বে ততটা প্রকাশ করেন নি। এই স্কেচগুলির মধ্যে পাই তাঁর সত্যকার শিল্পী মনের পরিচয়, বুঝতে পারি, সামান্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করবার ক্ষমতা ও কালি কলমের আঁচড়ে সে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। সেই সঙ্গেই এই কথা ভেবে দুঃখিত হ'তে হয়, কি মহৎ সম্ভাবনাকেই তিনি অপচয় হ'তে দিয়েছেন। এটা একটা বিস্ময়ের বিষয়, এই স্কেচগুলির মধ্যে তাঁর যে শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় পাই, তার অনেক পরিশ্রমের বার্নিশ-করা ছবিগুলির অধিকাংশের মধ্যেই সে দৃষ্টির, সে ক্ষমতার চিহ্ন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, অনেক চেষ্টায়ও আর তার সন্ধান পাওয়া যায় না। যাঁরা নিদ্রিতা তরুণী ছবিটির স্কেচ ও পূর্ণাঙ্গ দুই-ই দেখেছেন, তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য

সুপরিস্ফুট হবে। যিনি Sphinx ছবিটি আঁকতে আনন্দ পেয়েছিলেন, তিনিই আবার কি করে পালিশ চড়িয়ে নিখুঁত-নিটোল লাল-গোলাপী মুখের মালা খুশী হয়ে আঁকতে পারলেন, এটা একটা রহস্য।

আশার কথা আছে তার একটি প্রস্তাবে, যাতে জানতে পারি, তিনি এখন থেকে সামান্য দক্ষিণায় সকলের প্রতিকৃতি আঁকতে সিদ্ধান্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি বৈচিত্র্যহীন বিশিষ্টকে বর্জ্জন করে সম্ভাবনাময় সাধারণের কাছে এলেন, নিজের প্রতিভাকে ক্ষয় করে অর্থ উপায়ের পথ ছেড়ে দিলেন। আমরা আশা করে থাকবো, এবার তিনি চলবেন নিজের বিস্মৃতপ্রায় শিল্পী-সত্তাকে পুনরাবিষ্কারের পথে, অন্য কোন ফরমায়েসই তাঁর কাছে আর পৌঁছবে না, যা এতদিন তাকে আবৃত করে রেখেছিল, হোক সে ফরমায়েস অর্থবান চিত্রলোভীর, কি বহুজনের পদচিহ্নে নিরাপদ শিল্পরীতির।

মৃত্যুর রূপ

(৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে-মনে আবৃত্তি করলাম ঃ "ওগো মরণ, হে মোর মরণ"। ভুল তো হ'ল না। সবই তো মনে আছে।

তিনটেয় আসবে মৃত্যু, কে জানে কেমন ক'রে। জেগে থেকে দেখতে হবে, কেমন তার রূপ। সে কি আসে রাজার মতো বিজয়গর্ব্বে? না বধূর মতো কুণ্ঠিত চরণে? জেগে থেকে দেখতে হবে। চোখ জড়িয়ে এলে চলবে না।

গৃহিণীকে টানাটানি করছে কটি প্রৌঢ়া, সব শেষ হবার আগে শেষবারের জন্যে দুটি মাছ-ভাত খেয়ে নেবার জন্যে। ওর সিঁথির সিন্দুর যেন মোটা রক্তের মতো বিবর্ণ দেখাচ্ছে। আমার পা ছেড়ে ও নড়বে না কিছুতে। কিন্তু ওরাও ছাড়বে না। অবশিষ্ট জীবন-কালের জন্যে যার খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে চলেছে, শেষবারের জন্যে তাকে দুটি খাইয়ে দেওয়া নিতান্তই চাই।

কিছু কি বলবার আছে ওকে? কিছু না। এতগুলি বসন্ত এসেছে-গেছে, তার মধ্যে বলা যদি শেষ হয়ে না গিয়ে থাকে, এই শেষ মুহূর্ত্তে আর কি বলতে পারি আমি?

মাকে নিয়ে কারা যেন কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বোধ করি যত দেবতার দোরে দোরে। তা ছাড়া আর কোথায় হবে? কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে আসছেন আর এঘরে ফিরে এসে মেঝেয় লুটোচ্ছেন।

কিন্তু ঘরে এত ধোঁয়া কেন? ভালো ক'রে সবারই মুখ দেখা যাচ্ছে না যে!

দেওয়ালে কে যেন হিজিবিজি কি লিখে দিয়ে গেল! দেওয়ালের গা ঘেঁষে কারা যেন ছায়াছবির ছবির মতো একটির পর একটি এসে দাঁড়ায়।

গান্ধীজী? কিন্তু অত লম্বা নাক কেন?

চার্লি চ্যাপলিন? চুলগুলো অমন খাড়া কেন?

ও কার চোখ আলেয়ার মতো ঘন ঘন একবার নিভছে, একবার জ্বলছে? অমন ক'রে ও কেবল ডাকছে কেন?

তিনটে বাজতে আর কত দেরী?

পরলোক সে কোথায়? আমি কোথায় চলেছি? বৈতরণীর উপর দিয়ে? হাত-পা অবশ হয়ে আসে কেন?

এত ধোঁয়া কিসের? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যে!

পরলোক আর কত দূর? তার চিহ্নমাত্রও তো দেখা যায় না,—না দূরের বনলেখা, না ভেসে-আসা অস্পষ্ট কলরব।

—আর ভয় নেই কাকা, এ যাত্রা বেঁচে গেল।

কে কথা বলছে? নিবারণ ডাক্তার? কে বেঁচে গেল? আমি? ফিরে এসেছে নাড়ী?

কে যেন কেঁদে উঠল না?

বাবা?

কি হ'ল তাঁর? উঠতে পারছেন না যে! সারা রাত ঠায় উবু হয়ে ব'সে থেকে কোমর বেঁকে গেছে! ও কি হ'ল? মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলেন যে!

মৃত্যুকে দেখতে চেয়েছিলাম।

অবশেষে তাকে দেখতে পেলাম। পেলাম, দেওয়ালের গায়ে হিজিবিজি লেখায় নয়, বিচিত্র দর্শন মূর্ত্তির মধ্যে নয়, আলেয়ার মতো জ্বালাময় চোখের দৃষ্টিতেও নয়।

তাকে দেখলাম, আমার বৃদ্ধ পিতার ভূলুণ্ঠিত দেহে, আমার মায়ের উদাসীন রূপে, আমার স্ত্রীর ধূমাঙ্কিত চোখের কোটরে। তাকে দেখলাম, একান্ত প্রিয়জনের উদ্বিগ্ন চোখের কাতরতায়।

কি নিষ্ঠুর সে রূপ!

পাশ্চাত্য-সভ্যতার শিকড় ভারতবর্ষের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি। শূন্যে ঝুলছে বৃটেনের বিশাল সাম্রাজ্য। ভারতের মাটির সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের যোগ কোথায়? যে-টুকু রয়েছে তার মধ্যে আর যাই থাক্—প্রীতির কোনো স্পর্শ নেই। কংগ্রেস যে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পকে গ্রহণ করেছে এবং সেই সংকল্প যে সমস্ত জাতির সংকল্প হ'য়ে উঠেছে—তার মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যের প্রতি প্রীতির একান্ত অভাব। আমরা সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে অনুভব করেছি শিকলের কঠিনতার মধ্যে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সে তার সূক্ষ্মতম শিকড়টিকেও প্রবেশ করিয়ে দিতে সমর্থ হয় নি। তবুও যে সাম্রাজ্যের লৌহদুর্গ ভারতের ভূমিতে আজও আপনার অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছে—তার কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার একান্ত দৈন্য। আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিনে, বুঝবার চেষ্টাও করিনে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা লক্ষ লক্ষ অস্পৃশ্যকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে। হিন্দু আর মুসলমান—পরস্পর পরস্পরকে দেখ্ছে সন্দেহের চোখে আর এই সন্দেহের আগুনে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাচ্ছে তৃতীয় পক্ষ। নিজেদের মধ্যে এত অনৈক্য যেখানে সেখানে স্বাধীনতা কখনো নাগালের মধ্যে আস্তে পারে? একজনের পিছনে এসে যেখানে হাজারজন মানুষ এসে দাঁড়ায় সেখানেই শুধু স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্ভব। যে কথা বল্ছিলাম। ভারতবর্ষ বৃটেনকে যেটুকু স্বীকার করেছে সে ভক্তিতে নয়। ভক্তি করবার মতো কিছু সে দেখতে পায় নি সাম্রাজ্যের লৌহ-বাহুর মধ্যে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার সর্ব্বহারা কৃষক আর মজুরের কাছে সাম্রাজ্য যে কোনো মঙ্গলই বহন ক'রে আনে নি—এমন কথা বল্ছিনে। কিন্তু সে মঙ্গলকে ছাপিয়ে উঠেছে কোটী কোটী মানুষের পর্ব্বত-প্রমাণ দুঃখ। কলিকাতা সহরের বুকে উপরে দাঁড়িয়ে আছে যে সব গগনস্পর্শী অট্টালিকা—তাদের বিশালতা অথবা সংখ্যাধিক্য দিয়ে তো একটা জাতির সম্পদের বিচার করা চলে না। এই বিশাল দেশে কল্কাতা, দিল্লী, বোম্বাই, লাহোরের মতো শহর আর কয়টা? গঙ্গার ধারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জুট্ মিল অথবা বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের বড়ো বড়ো কলগুলির কষ্টিপাথরেও তো একটা দেশের সমৃদ্ধির যাচাই করা চলে না। সেই দেশই হোলো সম্পদশালী, যার অধিবাসিগণ হাড়-ভাঙা পরিশ্রম না ক'রেও মানুষের মতো বাঁচতে হ'লে যা যা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে পারে। এই মাপকাঠি দিয়ে একটা দেশের ঐশ্বর্য্যের বিচার করতে গেলে ভারতবর্ষকে কি সম্পদশালী দেশ বলা চলে? ভারতবর্ষের কোটী কোটী কৃষক-মজুরের জীবন কি অনশনের সঙ্গে একটা নিরন্তর সংগ্রাম নয়? আর সেই সংগ্রাম কি অধিকাংশ সময়েই শেষ হয় না পরাজয়ের মধ্যে? ভারতবর্ষের কোটী কোটী কৃষকের সমস্যা বেঁচে থাকার সমস্যা নয়—মরণকে ঠেকিয়ে রাখার সমস্যা। কেমন ক'রে দেহের সঙ্গে প্রাণকে যুক্ত রাখা যেতে পারে—এই দুশ্চিন্তা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের আকাশে নিরন্তর জেগে রয়েছে ধূম-কেতুর বিভীষিকা নিয়ে। কলকারখানাগুলো আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো শূন্য থেকে জেগে উঠ্ছে বিরাট বিরাট দেহ নিয়ে—কিন্তু তাদের অস্তিত্ব কোটী কোটী কুটীরের দ্বারে কতটুকু মঙ্গলকে বহন ক'রে এনেছে? ভুবনেশ্বরের মন্দির বানিয়েছে যাদের নিপুণহস্তের কৌশল, যাদের ভাস্কর্য্য থেকে তৈরী হ'য়েছে বারাণসীর মতো সহর, যাদের অঙ্গুলির নৈপুণ্য জগতকে দান ক'রেছে মসলিনের মতো অনুপম বস্ত্র-শিল্প—তারা গেলো কোথায়? পুরুষ-পরম্পরায় একই কার্য্যে ব্রতী থাকায় শিল্প-চাতুর্য্য লাভ করেছিল তার পূর্ণতাকে। যারা শিল্পী তাদের কাজ ছিলো পল্লীর মনোরম বুকে। সেখানে আকাশ ছিলো নীল আর প্রান্তর ছিলো সবুজ। গ্রামের প্রান্ত দিয়ে ব'য়ে যেতো স্বচ্ছতোয়া নদীর জলধারা। তারই তীরে গ্রামগুলি মুখরিত থাকতো চরকার গুঞ্জনে আর মাকু-চালানোর ঠকাঠক্ শব্দে। কার্টুনি আর তন্তুবায়েরা জাতির সম্পদ সৃষ্টি করতে গিয়ে কোনো নদীকে করতো না দূষিত, আকাশকে করতো না ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কলঙ্কিত, শ্যামল অরণ্যগুলিকে করতো না নিশ্চিহ্ন, বাতাসকে ভরিয়ে তুলতো না নর্দ্দমার দুর্গন্ধে। কাজের মধ্যে তারা অনুভব করতো সৃষ্টির আনন্দ। জনসাধারণের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে প্রকাশ পেতো একটা জাতির কল্পনাশক্তির অবাধ খেলা। তারপর বহিঃশক্তির নিষ্ঠুর চাপে জাতির শিল্পজীবন গেল পঙ্গু হ'য়ে। গ্রামের শীতল তরুচ্ছায়ায় আনন্দের মধ্যে সম্পদ সৃষ্টি ক'রে যারা নিরুদ্বেগে যাপন করতো গৃহস্থের অনাবিল জীবন, যন্ত্রের আবির্ভাব গ্রাম্যজীবনের বুক থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে গেল জনাকীর্ণ সহরের বস্তীগুলির পঙ্কিলতার মাঝে। সেখানে কলের কুলি-মজুর হ'য়ে তারা তৈরী করতে লেগে গেল মিলের কাপড়। সেই কাজে না আছে মগজের খোরাক, না আছে প্রাণের খোরাক। মানুষকে স্রষ্টার আসন থেকে নামিয়ে এনে পর্য্যবসিত করা হোলো প্রাণহীন যন্ত্রে। হাজার হাজার মানুষ চরকা তাঁত ছেড়ে দিয়ে কেন গ্রাম থেকে চ'লে এলো সহরে, কেন তারা সম্মত হোলো কুলির অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে—তার ইতিহাস অতি মর্ম্মন্তুদ। ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, গ্লাসগো প্রভৃতি সহরের কলের তাঁতে তৈরী কাপড় ভারতবর্ষে চালান যেতে লাগলো—সেই কাপড়ের উপরে নামমাত্র শুল্ক বসানো হোলো। পক্ষান্তরে বাঙলা ও বিহার থেকে হাতে তৈরী যেসব টেঁকসই আর সুন্দর কাপড় বিলাতে চালান যেতো তার উপর বসানো হ'তে লাগলো দুর্ব্বহ শুল্কভার। প্রতিযোগিতায় ভারত পেরে উঠলো না—তার অতুলনীয় বস্ত্রশিল্প কালের বক্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। এমনি আরও অনেক দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতায় না পেরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ধ্বংসের কাহিনী ইতিহাসের যাদুঘরে সঞ্চিত হ'য়ে আছে।

আসল কথা হ'চ্ছে—সাম্রাজ্যের ভুজচ্ছায়ায় দীর্ঘকাল ধ'রে বাস ক'রেও ভারতবর্ষ কোনো দিক দিয়েই আপনাকে লাভবান মনে করবার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। যারা চাষ ক'রে খায়, সেই অজ্ঞ কৃষক সম্প্রদায় হ'য়ে আছে জড়পিণ্ডবৎ। তাদের মানুষ না ব'লে

চলন্ত নরকঙ্কাল বলাই ঠিক। আর যারা শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাদের মনেও বিপুল অসন্তোষ। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জগতের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারা পেয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্ন, পরাধীনতার জ্বালা। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা তাদের মনে পরাধীনতার জ্বালাকে তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুলছে। প্রত্যেকটি গোরা সৈন্যের অস্তিত্ব নীরবে ইঙ্গিত করছে আমাদের শৃঙ্খলের প্রতি। যারা সৈন্যদলভুক্ত নয়, তারাও আমাদের অনুরাগকে আকর্ষণ করতে পারছে কই? তাদের শিগার, শ্যাম্পেন, মোটরগাড়ী নিয়ে আমাদের মধ্যে থেকেও তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছে। তারা বড়ো বড়ো হোটেলে পিয়ানোর টুং-টাংএর মধ্যে নাচে আর খায়, খায় আর নাচে—আমরা কেরাণীর অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সেই দৃশ্য দেখি আর নিঃশব্দে চলে যাই গৃহপানে যেখানে দারিদ্র্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকার। ছুটিতে তারা চ'লে যায় দার্জ্জিলিং-এ আর সিমলায় রেলগাড়ীর প্রথমশ্রেণীর কক্ষগুলিকে কলরবে মুখরিত ক'রে, আমাদের উপবাসশীর্ণ দেহগুলি তখন রেলগাড়ীর থার্ড ক্লাসে বস্তাবন্দী মালের মতো চলে সহরের কর্ম্মস্থলের পানে। তারা মনের আনন্দে গল্ফ্ খেলে আর টেনিস্ খেলে, আমাদের লোকেরা সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনে, তাদের ছেলে-মেয়েরা যখন ঠেলা-গাড়ীতে মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, আমাদের ছেলে-মেয়েরা তখন বায়ুশূন্য স্যাঁত্সেঁতে ঘরে একটু দুধের জন্য ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে কাঁদে। তাদের জীবন নিয়ে তারা আছে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মাঝে, আমাদের জীবন নিয়ে আমরা আছি—অভিশপ্ত গোলামের জীবন—পেটে পিলে আর গায়ে দাদ, মাথায় দেনার পাহাড় আর ঘরে ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা। ওদের আর আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আমাদিগকে তাদের দরকার কেবল প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। তারা 'কলিং বেল' টিপলে আমরা আর্দ্দালি হয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হই, তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বাবুর্চ্চি হয়ে আহারের টেবিলে মদ্য এবং মাংস পরিবেশন করি, তাদের ছেলেমেয়েদের মাঠে হাওয়া খাইয়ে আনবার জন্য 'আয়ার' কাজ নিই, সোফার হয়ে তাদের মোটার চালাই, তাদের কলে গিয়ে কুলির কাজ ক'রে চলি। তাদের সুবিধার জন্য যেটুকু আমাদের দরকার—আমাদের সঙ্গে তাদের কারবার সেইটুকু নিয়েই। আমাদের জীবনকে, আমাদের প্রকৃতিকে বুঝবার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই তাদের মধ্যে। বলা বাহুল্য, এ রকম অবস্থায় একটা জাতির সঙ্গে আর একটা জাতির হৃদয়গত কোনো সম্পর্কই গড়ে' উঠতে পারে না। মনের সঙ্গে যেখানে মনের কারবার, সেখানেই সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার আদান-প্রদানের কাজ চলতে পারে। আমাদের দেশে শাসকরূপে অবতীর্ণ হয়েছে যারা, তারা আমাদের মনকে জানবার একটুও চেষ্টা করে নি—এসেছে যাযাবর পাখীর মতো খাদ্যের সন্ধানে—কাজের শেষে যাযাবর পাখীর মতোই মিলিয়ে যায় দিগন্তে। পেন্সনের খরচটা কেবল বহন করছে ভারতের তহবিল। আমাদের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ককে তারা স্বীকার করেছে—সে কেবল তাদের প্রয়োজনে আমরা যতটুকু আসি ততটুকু নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছায়ায় ভারতবর্ষ রাজনীতি, অর্থনীতি—সব দিক দিয়ে প্রগতির পথে আগিয়ে গেছে—এই ধারণা কতখানি সত্য আর কতখানি সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থপরতাকে ঢাকবার আবরণমাত্র—সে কথা ভালো ক'রে ভেবে দেখবার বিষয়।

ইউরোপ এশিয়াকে কোনো কিছু দান করে নি—একথা বলা ভুল। ইউরোপের নিউটন, ইউরোপের ডারউইন, ইউরোপের টলষ্টয়, ইউরোপের ইবসেন, ইউরোপের ম্যাৎসিনি, ইউরোপের রাসকিন, ইউরোপের সেক্সপীয়ার, ইউরোপের মার্ক্স এশিয়াকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে সে আমাদের কিছু দেয় নি। বিজয়ী ইউরোপের কাছ থেকে পদদলিত এশিয়া যা পেয়েছে—তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে দাতার দারুণ অশ্রদ্ধা। আমরা তার মধ্যে দেখেছি সঙ্গীনধারী বিজেতার উদ্ধত মূর্ত্তি। এই জন্যই ইউরোপের কাছ থেকে এত কিছু পেয়েও এশিয়া তার সঙ্গকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলে মনে করেছে। জোর করে এশিয়াকে শাসন করবো নিজের স্বার্থকে পুষ্ট করবার জন্য এবং সেই শাসনকে সমর্থন করবো—এশিয়াকে উন্নত করছি—এই রকমের একটা অজুহাত দেখিয়ে, সাম্রাজ্যবাদের এই কালিমার আর নির্ব্বুদ্ধিতার বুঝি তুলনা নেই ইতিহাসের পাতায়।

ইউরোপীয় সভ্যতা আজ দেউলিয়া হবার উপক্রম করেছে। তার নগ্ন বর্ব্বরতাকে প্রকাশ করছে জ্বলন্ত শহরগুলির লেলিহান অগ্নিশিখা—ঘুমন্ত সহরের উপরে বোমাবর্ষণের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। ইউরোপ আবার বাঁচতে পারে, যদি সে রক্তাক্ত তরবারি দূরে ফেলে দিয়ে প্রাচ্যের তপোবনে জিজ্ঞাসুর নম্র মন নিয়ে প্রবেশ করে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষ আজও বেঁচে আছে—চীন আজও বেঁচে আছে। এই বেঁচে থাকার রহস্য কোন্খানে ইউরোপকে তা জানতে হবে। এই জানার মধ্যে রয়েছে ইউরোপের নবজীবন লাভের সোনার কাঠি।

These Eastern civilisations alone have stood the test of time; the qualities which have enabled them to survive ought surely to be matter of deep concern for the mushroom civilisations of the West.

ইউরোপের দৃষ্টি আজ অন্ধ—কারণ চিত্ত তার কামনায় আবিল। সে তো এশিয়ায় আসে নি জানবার কৌতূহল নিয়ে; সে এসেছিল বণিকের মানদণ্ড নিয়ে ব্যবসা করবার লোভে। সে মানদণ্ড কখন্ রূপান্তরিত হ'য়ে গেল রাজদণ্ডে—বণিক দেখা দিলো বিজেতা হ'য়ে। শাসক এলো শক্তির আস্ফালন আর লোভের বিশালতা নিয়ে। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের মনের কারবার আরম্ভ হ'তে পারলো না। যেখানে শক্তির ঔদ্ধত্য এবং লোভের নির্লজ্জতা, সেখানে চিত্তের সঙ্গে চিত্তের অবাধ আদান-প্রদান চলতেই পারে না। ইউরোপ লোভের বশীভূত হ'তে গিয়ে আপনাকে বঞ্চিত করলো এশিয়ার যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানের সম্পদ থেকে। এশিয়াকে অবহেলা করে যে মৃত্যুকে ইউরোপ ডেকে এনেছে আপনার শিয়রে—এশিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেই সেই মৃত্যুর হাত থেকে তার পরিত্রাণ।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন গত ৮ই জানুয়ারী মাদ্রাজে শেষ হয়ে গেল। কংগ্রেসের মূল সভাপতি ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরবল সাহনী। তিনি পাঞ্জাবের শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক রুচীরাম সাহনীর তৃতীয় পুত্র। অধ্যাপক বীরবল সাহনী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, পরে মৌলিক গবেষণার জন্য লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। ১৯২৯

ডাঃ বীরবল সাহনী

খৃষ্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজের এসসি-ডি ডিগ্রী পান। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয়দের মধ্যে এর আগে কেউ এই ডিগ্রী পান নি। প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ, যা বর্ত্তমানে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, অধ্যাপক বীরবল সাহনী প্রধানত সেই বিষয়ে গবেষণার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তিনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডামে আন্তর্জ্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসের শিলীভূত উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ন্যাচারেল হিষ্ট্রি মিউজিয়ামের তৃতীয় শতবার্ষিকী উৎসবে অধ্যাপক সাহনী ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক সাহনী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এর আগে রামানুজন্, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ সি ভি রমন এই চারজন মাত্র ভারতীয় রয়াল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক সাহনী তাঁর অভিভাষণে পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর তৃতীয় যুগের উৎপত্তির কাল নির্ণয় করেন। ছয় সাত কোটি বৎসর আগে এই যুগের প্রারম্ভকালে ধরাপৃষ্ঠের রূপ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেন যে, এই যুগই বসুন্ধরার নবযুগের প্রভাত। ভূগর্ভের প্রচণ্ড বিক্ষোভের পর এই কালে পৃথিবী সবেমাত্র শান্ত হয় এবং দ্রুত রূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সময়েই প্রথম উদ্ভিদ ও জীবের আবির্ভাব। তখনো মানুষের জন্ম হয় নি।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা কি রকম ছিল, সভাপতি তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মাদ্রাজ প্রদেশ আগে যে জায়গায় ছিল তা থেকে ক্রমে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে স'রে এসেছে এবং অধ্যাপক ওয়েগনারের অনুমান যে এই ভূখণ্ড এখনো স্থান পরিবর্ত্তন করছে। হিমালয় ও দক্ষিণ ভারতের পর্ব্বতমালার জন্ম সম্বন্ধে সভাপতি আলোচনা করেন। তৃতীয় যুগের প্রথম দিকে মধ্যপ্রদেশের বনে-জঙ্গলে ডাইনোসোরাস জাতীয় জীবজন্তুর বাস ছিল। এর মধ্যে কতকগুলি ভারতীয় জন্তুর অনুরূপ আবার কতকগুলির আকৃতি ম্যাডাগাস্কার এবং দক্ষিণ আমেরিকার ডাইনোসোরাসের মত। এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, তখন পর্যন্ত এই দুই ভূভাগের মধ্যে সংযোগ ছিল।

তৃতীয় যুগের ঠিক আগেই ধরাপৃষ্ঠে হাজার হাজার মাইল লম্বা খাদ ও ফাটল তরল লাভায় ভরা ছিল। রাজপিপলা পাহাড়ে, কচ ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে এই সমস্ত লাভাস্রোত প্রবাহের স্তর এখনো দেখা যায়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের লাভাস্রোতে লোহার অংশ বেশী থাকায় জমাট বাঁধতে সময় নেয় এবং বন্যার মত ঐ স্রোত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক জমাট-বাঁধা লাভাস্তরের উপর আবার যখন তরল লাভার প্লাবন হয়, তখন সেখানকার ফুল, পাতা, জন্তু সব সমাধিলাভ করে। আশ্চর্য্যরকমে ঐ সব গাছপালা এবং জানোয়ারের কঙ্কাল প্রস্তরীভূত অবস্থায় ঐ দুই স্তরের মধ্যে অটুট আছে। এই সমস্ত কঙ্কালের পরীক্ষা দ্বারাই এই যুগের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক লুথরা ভারতে কৃষিকার্য্যের অবনতির কারণ নির্ণয় করেন। তিনি বলেন যে, বীজ নির্ব্বাচনে কৃষকের অসাবধানতাই তার কারণ। উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহারে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে আইন প্রণয়নে শস্য বীজ বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে, ভারতে শস্যের শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা না থাকায় আশানুরূপ উন্নত স্তরের শস্য পাওয়া কঠিন। এই কারণেই এই দেশে উৎপন্ন শস্য ইউরোপের বাজারে অচল। শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য রাশিয়াতে যে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চলেছে—সভাপতি সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেন।

ডাঃ লুথরা বলেন যে, শস্যের মিশ্র উৎপাদন সম্বন্ধে গবেষণার
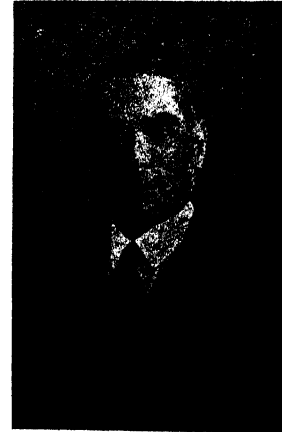
অধ্যাপক লুথরা

ফলে কৃষিশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। ভারতবর্ষেও মিশ্র-উৎপাদন সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারাবাহিক গবেষণা হয়েছে, তাতে কয়েকটি শস্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছে।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে অধ্যাপক বলেন যে, গ্রামে চাষ-আবাদে উন্নত প্রণালী অবলম্বনের আগ্রহ জন্মাবার জন্য প্রচারকার্য্য দরকার। কৃষিজীবীদের উন্নতির জন্য জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি যে পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন, তা অবিলম্বে কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ লুথরা কৃষকের আর্থিক সমস্যা বিচার বিবেচনার জন্য বিজ্ঞান কংগ্রেসকে একটি কমিটি গঠন করতে অনুরোধ করেন।

ভূগোল শাখার সভাপতি ছিলেন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস পি চ্যাটার্জ্জি। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনায় ভূগোলের স্থান। তিনি বলেন যে, দেশের সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় না থাকলে শিল্প উন্নয়ন অসম্ভব। বাঙলাদেশের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে, এখানে জমি ক্রমে অনুর্ব্বর হ'য়ে পড়ছে। নদী-নালার স্রোতবেগ কমে আসাতে যথেষ্ট পলি মাটির অভাব ঘটেছে এবং উর্ব্বর ভূমি নানা জায়গায় জলাভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম।

পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বেশী এবং অন্য দেশের মত ভারতীয়ের কোনো কলোনি নাই এবং এদেশে এখনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা ভাল ক'রে গ'ড়ে ওঠেনি। এজন্য ভারতীয় জনসাধারণকে জমির উপরই নির্ভর করতে হয়। ডাঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন যে, এইজন্য জমির উৎপাদিকা শক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় সেইদিকে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, রাশিয়ার চাষের অযোগ্য জমি ক্রমে উর্ব্বর ক'রে তোলবার প্রচেষ্টা চলেছে এবং তুর্কিস্থানের কারাকুম ও কির্জিলকুম মরুভূমি সোভিয়েট সরকারের জলসেচন ব্যবস্থায় শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

অধ্যাপক কে এস কৃষ্ণাণ

রসায়ন শাখার সভাপতি ডাঃ এস কৃষ্ণ ভারতীয় বনজ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ বিরাট ঐশ্বর্য্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই উৎস ঠিকমত কার্য্যে নিয়োগ করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা অনেকাংশে দূর হতে পারে। এই ঐশ্বর্য্যকে ঠিকমত বাড়তে দিতে হবে, রক্ষা করতে হবে। কারণ বন জঙ্গল আবহাওয়ার উপর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া করে বিশেষ করে ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করতে সাহায্য করে। বন সংরক্ষণের জন্য প্রজাপতি, ঘাস ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণের সুশৃঙ্খল রীতি পালন করা দরকার। গাছপালা বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিকেরা নানা দিকে গবেষণার কাজ করছেন। গাছের বৃদ্ধির উপর অক্সিনের প্রভাব কি তা দেখতে গিয়ে দেখা গেছে যে এর প্রতিক্রিয়া জীবজন্তুর "হরমোনের" প্রতিক্রিয়া থেকে অনুরূপ।

পোকা মাকড় থেকে বনানীকে সংরক্ষণ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলেছে কিন্তু এখনো ভাল ফল পাওয়া যায়নি। তামা, পারা ক্রোমিয়াম প্রভৃতি গাছের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে যে, এতে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কমে কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে এ সমস্যা এখনও দূর হয়নি।

বাঁশ ও ঘাস থেকে আরও সস্তায় কাগজ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে যে গবেষণার কাজ চলেছে ডাঃ কৃষ্ণ তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন অদূরে ভবিষ্যতে কাগজ শিল্পে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হতে পারে।

বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ওষধির চাষের প্রয়োজনীয়তার কথা

ডাঃ এস পি চ্যাটার্জ্জি

উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এদেশে অপটু লোক দিয়ে গাছ গাছড়া সংগ্রহ করা এবং ওষুধে ভেজাল মিশানোর জন্যই ওষধি ব্যবসায়ে এই দুর্গতি।

পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কে এস কৃষ্ণাণ। অধ্যাপক কৃষ্ণাণ স্যার সি ভি রমণের একজন কৃতি ছাত্র। "রমণ এফেক্ট" আবিষ্কারে ইনি সাহায্য করেছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ওয়ারসতে "ফটো লুমিনেসেন্স" সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল তাতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ডাঃ সেন্ডারকার

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কৃষ্ণাণ লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউসান, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাভেণ্ডিস লেবোরেটরীতে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। গত বৎসরেও তিনি ষ্ট্রাসবার্গের চুম্বক

কৃষ্ণাণ এখন বৌবাজার বিজ্ঞান সমিতিতে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন।

সভাপতি তাঁর অভিভাষণে অণু পরমাণুর, বিশেষ করে বেনজিনের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শেণ্ডারকার মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন। অভিভাষণে তিনি কলেজে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাদানের রীতির সমালোচনা করেন। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করে যে সুফল পাওয়া গেছে তার আলোচনা সম্পর্কে ডাঃ শেণ্ডারকার বলেন এদেশে স্কুলের লেখা পড়ার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। গবেষণাগারে যে কাজ ও ফল পাওয়া গেছে সাধারণ বিদ্যালয়ে তার প্রয়োগ অতি অল্প। শিশুমন সম্বন্ধে ডাঃ শেণ্ডারকর বলেন যে, শিশু যখন বড় হয় তখন নানা সমস্যা দেখা যায়। শিশুমন কিভাবে বিকশিত হয় এই তত্ত্ব জানা দরকার।

প্রাণীতত্ত্ব বিজ্ঞান শাখার সভাপতি, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ বি কে দাস তাঁর অভিভাষণে বায়ুসেবী মাছের প্রকৃতি, ক্রমোন্নতি ও প্রয়োজনমত অঙ্গের পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ডাঃ দাস গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কয়েক জাতীয় অদ্ভুত মাছের বর্ণনা করেন যারা জলে ও মুক্ত বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। মুক্ত বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ করবার জন্য তাদের এক নতুন রকমের ফুসফুস আছে। কই, মাগুর প্রভৃতি মাছের মাথায় এই রকমের ফুসফুস দেখা যায়। যেসব মাছ অল্প পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত জলে বাস করে সেইসব মাছের মধ্যে এই শ্বাস-যন্ত্রের উদ্ভব দেখা যায়। মুক্ত বাতাসে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করবার ব্যবস্থা থাকায় এই সব মাছ স্থলপথে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে যায়।

গণিত শাখার সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ সি বন্দ্যোপাধ্যায় নীহারিকমণ্ডলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সৌর জগতের জন্ম সম্বন্ধে যেসব সিদ্ধান্ত আছে শ্রীযুক্ত এ সি বন্দ্যোপাধ্যায় তার উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষভাবে রাসেল, লিটলটন ও ভাটজগরের থিওরী আলোচনা করেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক যাজ্ঞবল্ক ভরদ্বাজ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের একরকম জলের পানার জীবন কথা আলোচনা করেন। এই পানা জীব জগতের প্রাচীন শাখার অন্যতম বংশধর। এই পানা জলে স্থলে পাহাড়ে সমুদ্রে উষ্ণ প্রস্রবনে এবং বরফে সব অবস্থায়ই বেঁচে থাকতে পারে। জলের উপর এই উদ্ভিদের স্তর জলজন্তুদের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। কিন্তু এই উদ্ভিদ ভূমির, বিশেষ করে ধানের জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে।

অধ্যাপক এ সি বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক যাজ্ঞবল্ক

রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত

আজ-কাল

বি-পি-সি-সি'র প্রস্তাব

বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর ওয়ার্কিং কমিটি যে কি রকম মারমুখো হয়ে উঠেছেন তা সকলেই জানেন। আগামী নির্ব্বাচনের জন্যে একটা 'এড হক' কমিটি নিযুক্ত করে' বর্ত্তমান বি-পি-সি-সি'কে কিভাবে জবাই করবার ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন, তা-ও সকলে জানেন। গত ৬ই জানুয়ারী বি-পি-সি-সি'র এক অধিবেশনে এ বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবে বি-পি-সি-সি বলেছেন যে, কংগ্রেস নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি একটা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে সমগ্রভাবে বাতিল করে দিতে পারেন, কিন্তু তার ক্ষমতা আংশিকভাবে 'এড হক' কমিটিতে হস্তান্তর করে' তাকে আংশিকভাবে বাতিল করতে পারেন না। নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনালকে উপেক্ষা করার যে অভিযোগ দিয়ে 'এড হক' কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে, বি-পি-সি-সি সে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেছেন। পরিশেষে 'এড হক' কমিটির নিয়োগের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ঐ কমিটির প্রতি বি-পি-সি-সি'র অবিশ্বাস ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বাঙলায় আন্দোলনের প্রশ্ন

আর একটি প্রস্তাবে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে' জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার হরণের উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ না করলে অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে; সে জন্যে কংগ্রেস নেতৃদলকে আন্দোলনের আহ্বান দিতে বলা হয়েছে। বাঙলাতে ভারতরক্ষা আইনে যেভাবে দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বাঙলার জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতিরা ইতিপূর্ব্বে এক সম্মেলন করেন। বাঙলায় যাতে আন্দোলন আরম্ভ করা যায় সে জন্যে ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে অনুমতি আনতে শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে গত অক্টোবর মাসে দিল্লীতে পাঠানো হয়। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি এ পর্য্যন্ত কিছু বলেন নি। বি-পি-সি-সি আবার তাঁদের কাছে অনুমতি চেয়েছেন। বি-পি-সি-সি আরো বলেছেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নির্ব্বাচন চালানো কঠিন ও অবাঞ্ছনীয়; সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি যেন নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার নির্দ্দেশ দেন।

স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্য

আর একটি প্রস্তাবে স্বাধীনতা দিবসের কার্য্যক্রম ঠিক করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের নতুন সঙ্কল্প-বাক্যে খদ্দর পরা, সুতাকাটা ও হরিজন উদ্ধারের যে কথাগুলো ঢুকানো হয়েছে, বি-পি-সি-সি তা অবান্তর ও ক্ষতিকর বলে মত প্রকাশ করেছেন।

র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস কর্ম্মীদল ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলও স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্যে অনুরূপ আপত্তি জানিয়েছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির আচরণ

ইতিপূর্ব্বে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, ১৫ই জানুয়ারী ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে। কিন্তু বি-পি-সি-সি'র অধিবেশনের পরই আচার্য্য কৃপালনী ফতোয়া দিয়েছেন যে, জানুয়ারী মাসে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে না। অথচ এদিকে ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে কংগ্রেস নির্ব্বাচন শেষ করার নির্দ্দেশ রয়েছে। অতএব মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ওয়ার্কিং কমিটি বি-পি-সি-সি'র কোনো যুক্তিতর্কে বা অনুরোধে কর্ণপাত করতে ইচ্ছুক নন।

বাঙলার পার্লামেণ্টারী কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর হাতে কংগ্রেসী সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত যে টাকা ছিল সে সম্পর্কে শরৎবাবু, আবুল কালাম আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অডিটর কোম্পানীর মধ্যে লিখিত চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো পড়লে দেখা যায়, শরৎবাবু তাঁর কাছে গচ্ছিত টাকার হিসেব-নিকেশ নিয়মিতভাবে এ-আই-সি-সি দপ্তরে পাঠাতেন এবং আয়-ব্যয়ের কোনো বিষয়ে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ কোনো সময়ে আপত্তি করেন নি; অথচ হঠাৎ শরৎবাবুকে কিছু না জানিয়ে সমস্ত টাকা আবুল কালাম আজাদকে দিয়ে দিতে ওয়ার্কিং কমিটি নির্দ্দেশ দেন। টাকা তিনি দিয়ে দেওয়ার পর আবার হঠাৎ তাঁর হিসেব অডিট করবার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটি হুকুম দিলেন এবং সে খবরটা আগে থেকেই কাগজে প্রচার করে' দেওয়া হল। শেষ পর্য্যন্ত অডিটের সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাহার করলেন; কিন্তু এ খবরটা একেবারে চাপা দেওয়া হল। শরৎবাবু তাঁর পত্রাবলীতে ওয়ার্কিং কমিটির এরকম আচরণের কারণ জানতে চান; কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বত্রই সে কথা চেপে গিয়েছেন। অডিটর কোম্পানীর আচরণ সম্বন্ধেও শরৎবাবু কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বি-পি-সি-সি ফাণ্ড

বি-পি-সি-সি'র ফাণ্ড অডিট করবার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটি বাইরের অডিটর কোম্পানী নিযুক্ত করায় এবং সেই অডিটরের রিপোর্ট পাওয়ার পর বি-পি-সি-সি'র সেক্রেটারী বা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কোনো কৈফিয়ৎ না চেয়েই প্রস্তাব গ্রহণ করায় বি-পি-সি-সি'র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গত ৫ই তারিখে এক সভায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করেন। অডিটরের রিপোর্ট,

সে সম্পর্কে বি-পি-সি-সি সেক্রেটারীর 'নোট' এবং ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করে' দশ দিনের মধ্যে একটা রিপোর্ট দেবার জন্যে ৭ জন সদস্যের এক কমিটি গঠন করা হয়।

বি-পি-সি-সি'র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও অডিটর কোম্পানীর অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। ওয়ার্কিং কমিটির মনোনীত অডিটর ছিলেন বাট্‌লিবয় কোম্পানী।

দিল্লীতে ছাত্র-সম্মেলন

গত ১লা ও ২রা জানুয়ারী দিল্লীতে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন হয়ে গেছে। সম্মেলনে ছাত্রীদের সম্বন্ধে, অন্যান্য উপনিবেশের ভারতীয় ছাত্রদের ও দেশীয় রাজ্যের ছাত্রদের সম্বন্ধে এবং গণ-পরিষদ ও স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইউরোপের আবর্ত্ত

ফিনল্যান্ড

ফিনল্যান্ডে যুদ্ধের খবর আগের মতোই চল্‌ছে। লন্ডনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ মাইস্কি এক বিবৃতিতে এই সব খবরকে খুব বিদ্রূপ করেছেন এবং ফিনদের পক্ষের প্রচারকার্য্যের অসঙ্গতি দেখিয়ে দিয়েছেন।

ফিনিশ বাহিনীর এক ডিভিসন সোভিয়েট সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে' দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য, ফিনদের জয়-গৌরব যে সময় প্রচার করা হয় সে সময় সোভিয়েট তরফের কোনো খবর পাওয়া যায় না। তিন চারদিন বাদে বাদে মস্কোর যে ইস্তাহার দেওয়া হয়, তাতে থাকে 'অদ্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই।' ঘট্‌বার এখন অবশ্য বিশেষ কিছু নেই, কারণ ফিনল্যান্ডে শীত এখন প্রচণ্ড—শূন্য ডিগ্রি থেকে ৫০।৬০ ডিগ্রি কম।

জার্ম্মানীর মনোভাব

মাঝে মাঝে রটানো হচ্ছে যে, জার্ম্মানীর কাছ থেকে সোভিয়েট সামরিক সাহায্য চাচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে, জার্ম্মানী সাহায্য দিতে অস্বীকার করেছে; কখনো বলা হচ্ছে, জার্ম্মানী সামরিক অফিসার রাশিয়াতে পাঠিয়েছে। কিন্তু জার্ম্মানী সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে যে, সোভিয়েট তার কাছে কোনো সাহায্য চায় নি।

একটা খবর পাওয়া গেছে যে, জার্ম্মানী সুইডিশ গবর্ণমেণ্টকে জানিয়েছে, সে বৃটেন ও ফ্রান্সকে সুইডেনের মারফৎ ফিনল্যান্ডে সাহায্য পাঠাতে দেবে না। যদি সুইডেন থেকে ফিনল্যান্ডে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ না হয়, তাহলে জার্ম্মানী তার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবে। এতে অনেকে বল্‌ছেন, জার্ম্মানী স্ক্যান্ডিনেভিয়া আক্রমণের মতলব করেছে এবং এ সম্পর্কে সোভিয়েটের সঙ্গে তার পরামর্শ হয়ে গেছে।

আর একটা খবরে জানা গেল, ইতালী ফিনল্যান্ডে যে বিমানপোত পাঠাচ্ছিল জার্ম্মানী তা পথে বল্টিক বন্দরে আটক করেছে।

বল্কানের রাজনীতি

ভেনিসে হাঙ্গারীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সাকির সঙ্গে ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট চানোর দীর্ঘ গোপন আলোচনা হয়ে গেছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, উভয় রাষ্ট্র বর্ত্তমান পরিস্থিতির বিভিন্ন বিষয়ে একমত হয়েছে। সোভিয়েট যদি বল্কান চড়াও করে তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে এমন কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু এতে সন্দেহ যাচ্ছে না। ইতালীর আধুনিক সোভিয়েট-বিরোধী বুলি অনেকে একটা আবরণ বলে' মনে করছেন। এসব সলা-পরামর্শের গূঢ় উদ্দেশ্য যে কি তা ভবিষ্যৎই বল্‌বে।

এদিকে বুলগেরিয়ার সঙ্গে সোভিয়েটের একটা বাণিজ্য-চুক্তি হয়ে গেছে।

বৃটিশ সমর-সচিবের পদত্যাগ

বৃটিশ মন্ত্রিসভায় আবার বিভেদ হয়েছে। সমর-সচিব মিঃ হোর-বেলিশা পদত্যাগ করেছেন। মিঃ চেম্বারলেন মন্ত্রিমণ্ডলী পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত করে' মিঃ হোর-বেলিশাকে বাণিজ্য-সচিব করতে চান; কিন্তু মিঃ হোর-বেলিশা তাতে রাজী হন নি।

বৃটিশ সমর-সচিবের পদত্যাগে সর্ব্বত্র বিস্ময় এবং ইংলণ্ডে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো কাগজে বলা হয়েছে যে, মিঃ হোর-বেলিশা দৃঢ়ভাবে এবং অগ্রণী হয়ে যুদ্ধ চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁর সঙ্গে সেনাপতিদের বন্‌ছিল না; সেইজন্য তাঁকে বিদায় নিতে হল।

নতুন সমর-সচিব হয়েছেন মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলী। প্রচার-সচিব লর্ড ম্যাকমিলানও পদত্যাগ করেছেন।

আয়র্ল্যান্ড

ডাবলিনে আইরিশ রিপাব্লিকান আর্ম্মি একটা অস্ত্রাগার লুঠ করার পর আইরিশ পার্লামেণ্ট ডেলে সরকারী প্রস্তাব অনুযায়ী জরুরী ক্ষমতা আইন পাশ হয়েছে। এই আইনে যে কোনো রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে। ইতিমধ্যেই এই আইন অনুসারে কয়েকজনকে বন্দী করা হয়েছে।

এশিয়ায়

জাপান সোভিয়েটের সঙ্গে তার বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছে। মাঞ্চুকুওতে চাইনীজ ইষ্টার্ন রেলওয়ে বাবদ সোভিয়েটের পাওনার যে টাকা জাপান এতদিন দিচ্ছিল না, সেই টাকা সে শোধ করে দিয়েছে। এক জাপ বাণিজ্য-প্রতিনিধি দলও মস্কোতে গেছেন আলোচনার জন্যে।

চীনারা ১লা জানুয়ারী দক্ষিণ কোয়ানতুং-এ এক ভয়ানক পাল্টা আক্রমণ করে। তারা দাবী করছে যে, এই আক্রমণ সফল হয়েছে এবং দশ হাজার জাপ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

৮।১।৪০ —ওয়াকিবহাল

কলিকাতা বাগবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর

বাগ্‌বাজারে ক্যাপ্‌টেন চারল্‌স্ পেরিন সাহেবের বাগান ও বাজার

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, ২৪শে আগষ্ট, রবিবার জব-চার্ণক (Job Charnock) সাতজন সহচর লইয়া নিমতলা-ঘাটের উপরিভাগে আনন্দময়ী-তলা হইতে ৺শিবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটী) আসিয়া উপস্থিত হন। বলিতে কি, ইনিই এই দিনে এই স্থানে কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জব-চার্ণকের আসিবার কয়েক বৎসর পরেই (১৭০৫ খৃষ্টাব্দে) পেরিন-সাহেব (Captain Charles Perrin) বাগ্‌বাজারে বাগান ও বাজার বসাইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা-ঘাটে তাঁহার তিনখানি জাহাজ বাঁধা থাকিত। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালপত্র লইয়া যাইবার ও আনিবার জন্যই জাহাজের প্রয়োজন ছিল। পেরিন-সাহেব তাঁহার বাগান ও বাজার "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে" বিক্রয় করেন। জেফানিয়া-হলওয়েল (Zephania Halwell) সাহেব ইহা প্রকাশ্য নিলামে (১৭৫২ খৃষ্টাব্দে) ২৫০০, (মতান্তরে ২৫০০০,) টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে স্কট্-সাহেব (Colonel Barolene Frederick Scott) ইহা হলওয়েল-সাহেবের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এই স্কট্-সাহেবের কন্যা মেরী, ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের প্রথমা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সুতরাং হেষ্টিংস্ বাগ্‌বাজারের জামাই-বাবু। স্কটের মৃত্যুর পরে তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ বুচানন (Captain John Buchanan) সাহেব এই বাগান ও বাজার ক্রয় করিয়া পরিশেষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে ৪০০০, টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

বাগ্‌বাজার নামের উৎপত্তি

বাগ্‌বাজারে 'বাঘ' বিক্রয় হইত বলিয়া যে ইহার নাম 'বাগ্-বাজার' হইয়াছে, এরূপ নহে। এখানে পেরিন-সাহেবের একটি বাগ (বাগান) ও তন্মধ্যে একটি 'বাজার' ছিল বলিয়াই ইহার নাম 'বাগ্‌বাজার' হইয়াছে।

বাগ্‌বাজার-ষ্ট্রীট্

পূর্ব্বে এই ষ্ট্রীটের নাম ছিল, "Old Powder Mill Bazar Factory Road." ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আপজন-কৃত মানচিত্রে ইহার নাম ছিল, "Old Powder Mill Bazar Road." ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুরের আদেশমতে কলিকাতার অনেক রাস্তার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই নামটি অত্যন্ত লম্বা বলিয়া পেরিন-সাহেবের বাগান অর্থাৎ 'বাগ' এবং তাঁহার 'বাজার' এই দুইটি শব্দমাত্র লইয়া "বাগবাজার-ষ্ট্রীট্" এই সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হইয়াছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে "বাগ্‌বাজার-ষ্ট্রীট্" এই নামকরণ হইয়াছিল।

বাগ্‌বাজারের নামান্তর 'বারুদখানা'

ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের পূর্ব্বপক্ষের শ্বশুর স্কট্-সাহেব এই-স্থানে একটি 'বারুদের কারখানা' করিয়াছিলেন। এই হেতু, বাগ্‌বাজারের অন্য একটি নাম 'বারুদখানা'। 'কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সরকার, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাচীন অধিবাসিগণ 'বাগ্-বাজার' না বলিয়া 'বারুদখানা'ই বলিতেন। এখন যেখানে শ্রীনিত্য-গোপাল দত্ত মহাশয়ের বাটী ও সুরকীর কল, সেই স্থানেই 'বারুদের কারখানা' ছিল।

বাগ্‌বাজার কেল্লা

বাগ্‌বাজারে একটি ছোট আটকোণা কেল্লা ছিল। ইহার নাম Bagbazar Redoubt or Perrin's Redoubt. কোম্পানী-বাহাদুর আত্মরক্ষার জন্য O'Hara নামক একজন সিভিলিয়ান ও Simpson নামক একজন কর্ম্মচারীকে একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন যেখানে শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা (H. D. Harry) মহাশয়ের গদী ও চূণের গুদাম রহিয়াছে, সেইখানেই Bagbazar Redoubt অবস্থিত ছিল।

ওল্ড-পাউডার-মিল বাজার

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের আপ্‌জন্-সাহেবের মানচিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এখন যেখানে এঞ্জিনিয়ার সি কে সরকার, ও ৺অক্ষয়কুমার বসু মহাশয়ের বাটী, তাহার মধ্যস্থলেই Old Powder Mill Bazar অবস্থিত ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এই বাজার উঠাইয়া লইয়া গিয়া বর্ত্তমান শ্যামবাজার স্থাপন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ইহার নাম ছিল Charles Bazar.

মারহাট্টা-ডিচ

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁস্‌লার পুত্র জানুজী ভোঁস্‌লা, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনতায় বহু সৈন্য প্রেরণ করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। ইহাদের নাম 'বর্গী'। একদল বাঁকুড়া ও বীরভূম দিয়া এবং অন্য দল হাবড়া, সালিখা, বালি, উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, শ্রীরামপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে বর্দ্ধমানে গিয়া উপস্থিত হইত। অবশেষে কালনা, কাটোয়া, ডাঁইহাট, মেটিরী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান চষিয়া ফেলিয়া ও নদী পার হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর নিকটে চৌথ (রাজস্বের চতুর্থাংশ) চাহিয়া বসিল। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী ও কলিকাতার অধিবাসিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎকালীন গবর্ণর Thomas Braddyllকে বলিল, "আপনারা কলিকাতার চতুর্দ্দিকে একটি গড়খাত কাটাইয়া দিন। নচেৎ আমরা মারা যাই।" গবর্ণর-সাহেব, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অনুমতি লইয়া গড়খাত করিতে আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মজুর কাজ করিতে লাগিল। তৎকালে প্রত্যেক মজুর উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া একটিমাত্র পয়সা পাইত। প্রত্যেক গৃহস্থ অন্ততঃ একটি করিয়া মজুর দিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় ৫০০ মজুর দিয়াছিলেন। কোম্পানী-বাহাদুর ২৫,০০০, টাকা খরচ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বাঙালীরা এই টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন। বাগবাজারে গঙ্গানদীর মুখ হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত ৭ মাইল কাটিবার কথা ছিল; কিন্তু বর্গীদিগের সহিত নবাবের সন্ধি হওয়ায় ৫ মাইল মাত্র কাটা হইয়াছিল। বর্ত্তমান "নাপ্‌তে বাজারের" নিকট ২ মাইল আর কাটা হয় নাই। খাত কাটিয়া দুই পার্শ্বে যে পর্ব্বতপ্রমাণ মাটি রাখা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা উক্ত খাত বুজাইয়া দিয়া বর্ত্তমান Circular Road নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের কথা। এখন আমরা যাহাকে "গড়পার" বলি, তাহা গড়ের (মারহাট্টা-ডিচের) পারে (বাহিরে) ছিল বলিয়া তাহার নাম "গড়পার" হইয়াছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল Marquis of Wellesley ও অন্যান্য সাহেব-বিবিগণ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে এই স্থানে বেড়াইতে আসিতেন।

(ক্রমশঃ)

মেট্রো সিনেমায়—"নিনচ্কা"

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী গ্রেটা গার্ব্বো ও জনপ্রিয় অভিনেতা মেলভিন্ ডগলাস অভিনীত "নিনচ্কা" ছবিটি এ সপ্তাহে মেট্রো সিনেমায় প্রদর্শিত হইতেছে এবং ইহাই এই সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কেবল এ সপ্তাহ নয়, এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান এই ছবিরই প্রাপ্য। দীর্ঘ দুই বৎসর পর গার্ব্বোকে আনন্দোজ্জ্বল হাস্যময় কমেডি চিত্রে প্রেমিকার মধুর চরিত্রে অভিনয় করিতে দেখা যাইবে। বিখ্যাত পরিচালক আর্ণষ্ট লুবিশের যাদুস্পর্শে চিত্রটি হাস্যে লাস্যে ও স্বকীয়তায় অপূর্ব্ব ও মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। গার্ব্বোর অভিনয় যেমন কবিত্ব-ধর্ম্মী, লুবিশের পরিচালনা তেমনি শিল্পী-মনের পরিচায়ক। উভয়ের যোগাযোগেই ছবিটি একদিকে যেমন কবিত্বময় আবেষ্ট-নীতে মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে অপর-দিকে হাল্কা হাসির ঘটনা ও স্বচ্ছসুন্দর সংলাপে চিত্তকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে।

গ্রেটা গার্ব্বো

রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত নিনচ্কা নামে একটি মেয়েকে গবর্ণমেণ্টের কাজে ফ্রান্সে আসিতে হয়। প্যারিসের বিলাসিতা, আনন্দ ও ভোগের জীবনের সংস্রবে আসিয়া নিনচ্কা তাহার কঠোরতার আবরণকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না—ফরাসী-জীবনের হাসি আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্য্য তাহাকে মুগ্ধ বিমোহিত করিয়া তুলিল; সে ভালবাসিল একজন ফরাসী কাউণ্টকে। ইহার পরই তাহার প্রাণের যে শতদল কুঁড়িটি এতদিন কর্ত্তব্যের কঠোর আবরণে বন্ধ ছিল তাহাই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল প্রেমের মাধুর্য্যে। তাহার পরই সুরু হইল প্রেম ও ভালবাসা বিরহ-মিলনের দ্বন্দ্ব। অবশেষে একটি মধুর কমেডিতে ছবিটির পরিসমাপ্তি।

এই ছবি সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য হইতেছে যে, হাল্কা ঘটনার মধ্য দিয়া স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হইতে হইতে ছবিটি এমন একটি গভীর রসঘন করুণ বিদায় দৃশ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, সেইখানেই ট্রাজেডীতেই ছবিটির পরিসমাপ্তি অনায়াসেই হইতে পারিত। কিন্তু দর্শকদের সান্ত্বনার জন্য পরিচালক জোর করিয়া ছবির মোড় ঘুরাইয়াছেন কমেডিতে। যাঁহারা "কুইন্ ক্রিশ্চিনা," "অ্যানা ক্যারেনিনা" ও "মেরী ওয়ালেস্কার" ট্রাজেডীতে গার্ব্বোকে দেখিয়াছেন তাঁহারা "নিনচ্কা"র কমেডিতে গার্ব্বোকে নূতনরূপে দেখিলেও নিরাশ হইবেন বলিয়া মনে হয়।

নাট্য নিকেতনে—"অগ্নিশিখা"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের নূতন সামাজিক নাটক "অগ্নি-শিখা" গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে নাট্য নিকেতন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। "অগ্নিশিখার" প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে যথেষ্ট entertainment রহিয়াছে। নাট্যকার অতি আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের কয়েকটি typical চরিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নাটকটি আগাগোড়া দেখিয়া আমাদের মনে হইল গল্পাংশের ছন্দ অথবা টেম্পো ঠিক রহে নাই। যেমন প্রথম অঙ্কে প্রধান চরিত্র ও মূল গল্পাংশ ক্লাইম্যাক্স-এ উঠাইয়া দ্বিতীয় অঙ্কে ধীরে ধীরে artistic ভাবে নামিয়া যায় কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে মূল গল্পাংশ স্বাভাবিক সীমা হইতে কিছু হেলিয়া পড়ে। আমাদের মনে হয় দীপ্তি, দীপ্তির মা প্রভৃতির চরিত্রের উপর এতটা জোর না দিলে ভাল হইত। শীলার প্রাধান্য রাখিলেই suspense বজায় থাকিত এবং নাট্যকারের উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হইত এবং উক্ত দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত করিলে মূল নাটকের প্রভাব বৃদ্ধি পাইত বই কোন ক্ষতি হইত না বলিয়া আমাদের মনে হয়। নৃত্যগীতের দৃশ্যটি নিতান্তই অবান্তর বলিয়া আমাদের মনে হইল। নাচ গান না থাকিলে পাছে নাটক জমিবে না অথবা

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র 'ডক্টর'এ নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী ভারতীকে বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাইবে। ছবিখানির পরিচালক শ্রীফণী মজুমদার।

দর্শকরা সন্তুষ্ট হইবে না এই আশঙ্কাতেই যদি নাট্যকার মদনের বাণ নিক্ষেপের দৃশ্যটির অবতারণা করিয়া থাকেন তাহা হইলে নাচ ও গান আরও উৎকৃষ্ট ধরণের হওয়া উচিত ছিল। এই দৃশ্যে 'মডার্ণ' সোসাইটির মেয়েদের পয়সাওয়ালা ছেলের মন ভুলাইবার যে ব্যঙ্গ নাট্যকার করিয়াছেন তাহার পক্ষে কি দীপ্তির ফুল উপহার দেওয়া ও নিভৃতে ড্রইং রুমে গান শুনাইবার দৃশ্যটি যথেষ্ট নহে?

অভিনয়ের দিক হইতে বলিতে গেলে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এবং শ্রীমতী শেফালিকার নাম উল্লেখ করিতে হয়। হত্যার অপরাধে হরিশের গ্রেপ্তার হওয়া পর্য্যন্ত নির্ম্মলেন্দুর অভিনয়ে লায়নেল ব্যারীমুরের অভিনয় অনুকরণের চেষ্টা দেখিতে পাই, তাহার পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাগল হরিশের অভিনয়ে নির্ম্মলেন্দু তাঁহার নিজস্বতা দেখাইয়াছেন বলিয়াই তাহা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নাটকের মাঝখানে সাব-প্লটগুলির উপর জোর দেওয়ায় এই প্রধান চরিত্রটি একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উমার ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালিকার প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে উমা চরিত্রটি মূর্ত্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। উমার আত্মসম্মান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা একদিকে যেমন কঠোরতা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছে অপর দিকে বিরহ-মিলনের দ্বন্দ্ব একটি কোমল করুণ আবেশের সৃষ্টি করিয়া চরিত্রটিতে মেঘ ও রৌদ্রের বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। উমা চরিত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়া শ্রীমতী শেফালিকা নাটকের "অগ্নিশিখা" নামটি সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। সুন্দর দৃশ্য পরিকল্পনা ও মনোরম মঞ্চসজ্জার গুণে নাটকটি অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে। নাটকের একটিও গান আমাদের ভাল লাগে নাই। পরিশেষে একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। বিজ্ঞাপন অনুসারে অভিনয় সাড়ে সাতটায় আরম্ভ হইবার কথা কিন্তু সওয়া আটটায় আরম্ভ হয়। সময় জ্ঞান সম্বন্ধে বাঙালীর দুর্ণাম আছে কিন্তু সে দুর্ণাম কি আজও ঘুচিবে না?

বাঙলা ক্রিকেট দল নির্বাচন

এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় বাঙলা দল শোচনীয়ভাবে বিহার দলকে পরাজিত করিয়াছে। শীঘ্রই বাঙলা দলকে উক্ত প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় যুক্তপ্রদেশ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। ইতিপূর্বে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের সহিত যুক্তপ্রদেশ দলের খেলা হয় নাই। এইবারই সর্বপ্রথম উভয় দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। এই খেলা উপলক্ষে বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করা হইয়াছে। পূর্ব খেলায় যে সকল খেলোয়াড়গণ খেলিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই বাদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বের দলের একজন মাত্র ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়কে স্থান দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এইবার ৫ জন ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হইয়াছে। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় অধিকাংশ তরুণ বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিয়া অপূর্ব সাফল্যলাভ করিবার পর নির্বাচনমণ্ডলীর বর্তমানে এইরূপ ভাবে দল গঠন করিবার কি যে প্রয়োজন হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষ করিয়া যখন পূর্বের খেলোয়াড়গণের স্থানে যে সকল খেলোয়াড়গণকে দলে লওয়া হইয়াছে, তাঁহারা পূর্বের খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য-সম্পন্ন খেলোয়াড় নহেন? স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের সন্তোষ গাঙ্গুলী এই বৎসর কোন খেলায় এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই যাহাতে তিনি বাঙলা দলে স্থান পাইতে পারেন? বালীগঞ্জের বেরেহেণ্ডের যাঁহারা খেলা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিবেন যে, গত বৎসর বেরেহেণ্ড যেরূপ খেলিয়াছিলেন এই বৎসর সেইরূপ খেলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার খেলা পড়িয়া গিয়াছে। কি বোলিং, কি ব্যাটিং, কি ফিল্ডিং কোন বিষয়েই তিনি বর্তমানে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন না। এই বৎসর বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় দলের পক্ষে খেলিয়া নৈরাশ্যজনক খেলার অবতারণা করেন। অথচ তাঁহাকে বাঙলার একজন উৎসাহী তরুণ খেলোয়াড়কে বঞ্চিত করিয়া দলে লওয়া হইয়াছে। ক্যালকাটা দলের এস ই একেলস্টনকে এই বৎসর ক্যালকাটা দলের পক্ষে মাত্র কয়েকটি খেলায় যোগদান করিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল খেলার কোনটিতেই তিনি উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনিও বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত! ই বি আরের এ জব্বর একজন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তবে তিনি এই বৎসর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটি খেলায় যেরূপ হতাশব্যঞ্জক খেলিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহাকে বাঙলা দলে স্থান দেওয়ায় নির্বাচকমণ্ডলী বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নাই। এই সকল খেলোয়াড়গণের পরিবর্তে অনিল দত্ত, সুশীল বসু, জে এন ব্যানার্জ্জি, এস দত্ত প্রভৃতি খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত করিলে নির্বাচনমণ্ডলীকে বিশেষ কেহই দোষারোপ করিতেন না। বরং বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ, বিশেষ করিয়া নির্বাচনমণ্ডলীর সভ্যগণ রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়া প্রশংসা করিতেন। নির্বাচক-মণ্ডলীর সভ্যগণের ভাগ্যে তাহা নাই। ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণকে এতদিন ধরিয়া প্রাধান্য দান করিয়া যে কদভ্যাস অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই তাঁহারা প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, দেশের উৎসাহী তরুণ খেলোয়াড়গণকে বঞ্চিত করিয়া ইউরোপীয়ান অনুপযুক্ত, অখ্যাত খেলোয়াড়গণকে দলে স্থান দিয়াছেন।

খেলোয়াড় নির্বাচনকালে ইউরোপীয়ান খেলোয়াড় প্রীতি যেরূপভাবে বাঙলা দেশের ক্রিকেট পরিচালকগণের মধ্যে দেখা যায়, এইরূপ আর ভারতের কোন প্রদেশেই পরিলক্ষিত হয় না। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে আমরা এই বিষয় প্রতি বৎসরই পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্য উদীয়মান তরুণ ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা, দেশের খেলোয়াড়গণের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের উন্নতি করা। বাঙলা প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশের ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই বিষয়ে বিশেষ সজাগ। প্রদেশের প্রকৃত অধিবাসী ও উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে সেই জন্যই তাঁহারা দলে স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙলা প্রদেশের ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের সেই দিকে কোন দৃষ্টিই নাই। কবে যে এই দূষনীয় ব্যবস্থা অপসারিত হইবে তাহাও বলা কঠিন। একটি মাত্র উপায় আছে, তাহাও বাঙলার ক্রিকেট উৎসাহিগণের উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলনই ইহার পরিবর্তন সম্ভব করিবে—বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। আর তাঁহারা যদি নীরব থাকেন তবে ইহা চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হইবে।

বাঙলার মনোনীত দল

(১) কার্ত্তিক বসু (অধিনায়ক, স্পোর্টিং ইউনিয়ন), (২) নির্মল চ্যাটার্জ্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), (৩) সন্তোষ গাঙ্গুলী (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), (৪) কে রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), (৫) কমল ভট্টাচার্য (এরিয়ান্স), (৬) এ জব্বর (ই বি আর), (৭) পি এন মিলার (ক্যালকাটা), (৮) এস ই একেলস্টন (ক্যালকাটা), (৯) এস ডবলিউ বেরেহেণ্ড (বালীগঞ্জ), (১০) ডবলিউ জি বার্টার (বালীগঞ্জ), (১১) এন হ্যামণ্ড (রেঞ্জার্স)।

দ্বাদশ ব্যক্তিঃ—সুশীল বসু (এরিয়ান্স)।

অতিরিক্তঃ—এস ব্যানার্জ্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)।

যুক্তপ্রদেশ দলের সাফল্য

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলায় যুক্তপ্রদেশ দল এক ইনিংস ও ৯৬ রাণে মধ্যভারত দলকে পরাজিত করিয়াছে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

যুক্তপ্রদেশ দলঃ—প্রথম ইনিংস ৩২৬ রাণ (পালিয়া ৪৭, খাজা ১২৫, মুর্তী ২৯, সাহাবুদ্দীন ২৫, ডাঃ হাসান নট আউট ২৫, মুস্তাক আলী ১০৮ রাণে ৭টি উইকেট পান)।

মধ্য ভারত দলঃ—প্রথম ইনিংস ৬৪ রাণ (পাভরী ১৫, আলেকজেণ্ডার ১৫ রাণে ৪টি, গুরুদাচার ৩০ রাণে ৬টি উইকেট পান)।

মধ্যভারত দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৬ রাণ (মুস্তাক আলী ৭৪, পাভরী ১৭, জে ভায়া ৪১, আলেকজেণ্ডার ৬১ রাণে ৩টি, গুরুদাচার ৫৯ রাণে ৪টি, পালিয়া, ১৮ রাণে ১টি উইকেট পান)।

(যুক্তপ্রদেশ দল এক ইনিংস ৯৬ রাণে বিজয়ী)।

সমর-বার্ত্তা

৩রা জানুয়ারী—

ফিনল্যাণ্ডের সাল্লা রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র তুমুল সংগ্রাম চলে। ফিনিশ-ব্যূহ ভেদের জন্য রাশিয়ানরা মরিয়া হইয়া সংগ্রাম চালায়, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জার্ম্মান উপকূলের নিকট তিনটি বৃটিশ বোমারু বিমানের সহিত বারটি জার্ম্মান বিমানের এক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে তিনটি জার্ম্মান বিমান ও একটি বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

কোপেনহেগেনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানী সুইডেনের নিকট এক কূটনৈতিক নোট প্রেরণ করিয়া এই মর্ম্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, জার্ম্মানী সুইডেনের মারফতে পশ্চিম ইউরোপের কোন শক্তিকে ফিনল্যাণ্ডে সাহায্য প্রেরণ করিতে দিবে না।

৪ঠা জানুয়ারী—

নববর্ষে চীনাবাহিনী কাওয়ানটুঙ্ প্রদেশে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জাপবাহিনীকে পরাভূত করে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। চুংকিং-এ চীনাদের উক্ত যুদ্ধে জয়লাভের বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই যুদ্ধে দশ সহস্র জাপ সৈন্য হতাহত হয়।

সুইডেন ও নরওয়ের মারফতে বৃটেন ও ফ্রান্স ফিনল্যাণ্ডে সাহায্য প্রেরণ করিলে সোভিয়েটের সহিত জার্ম্মানীর সামরিক সহযোগিতা সম্ভবপর হইবে কি না, জার্ম্মান সমর-পরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তাহা আলোচিত হয়।

মঃ ষ্ট্যালিন জার্ম্মানীর নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়াছেন, এই সংবাদ জার্ম্মান সরকারী নিউজ-এজেন্সী ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

জার্ম্মানীর সরকারী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং জার্ম্মাণীর সমরকালীন ব্যয়সংকোচ ব্যবস্থার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী বৎসরের বাজেটে দেশরক্ষার খাতে ১৮০ কোটি ডলার মুদ্রার মোটা অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী—

হেলসিঙ্কির এক সংবাদে প্রকাশ, হঠাৎ ফিনল্যাণ্ডে প্রবল শীত পড়ায় রুশ সৈন্যেরা ক্যারেলিয়ান যোজকে পরিখা খনন করিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইতেছে।

হেলসিঙ্কির এক সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়া ব্যাপক সামরিক সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে; নূতন নূতন শ্রেণীকে সৈন্য-বাহিনীতে আহ্বান করা হইয়াছে এবং সীমান্তসমূহে বহু সৈন্য সমাবেশ করা হইতেছে।

মিঃ ডি, ভ্যালেরা এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে আয়ারের ডিক্টেটর হইবার ক্ষমতা পাইলেন। প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হাইড অদ্য জরুরী ক্ষমতা সংশোধন বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এতদ্বারা গবর্ণমেণ্টকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণকে বিনা-বিচারে অন্তরীণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

৬ই জানুয়ারী—

স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে একটি মাইনের আঘাতে "সিটি অব মার্সাই" নামক জাহাজ গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

হেলসিঙ্কির এক খবরে বলা হইয়াছে যে, বোথনিয়া উপসাগরে এক রুশ সাবমেরিন একটি সুইডিশ জাহাজকে আক্রমণ করে।

বৃটিশ সমর-সচিব মিঃ হোর বেলিশা এবং প্রচার-সচিব লর্ড ম্যাকমিলান পদত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ অলিভার ষ্টানলিকে সমর-সচিবের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। স্যার জন রীথ প্রচার-সচিবের পদে ও স্যার এণ্ডরু ডানকান বাণিজ্য-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭ই জানুয়ারী—

হেলসিঙ্কিতে এক বেতার ঘোষণায় বলা হইয়াছে, "আমরা অস্ত্রবলে পরাভূত হইতে পারি; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। হেলসিঙ্কির এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সাল্লা রণক্ষেত্রে ফিনিশদের বিরুদ্ধে রুশরা আক্রমণ করে; কিন্তু উহা প্রতিহত হয়। শত্রুপক্ষের তিন শত সৈন্য নিহত হয়।

ষ্টকহলমের ফিনিশ মহলের খবরে প্রকাশ যে, ফিনিশ বৈমানিকরা বারংবার লেনিনগ্রাডের উপর উড়িয়া গিয়া শত শত ছোট বাইবেল নিক্ষেপ করে। ফিনদের বিশ্বাস, ইহাতে লাল ফৌজের উপর যথেষ্ট নৈতিক ফল পাওয়া যাইবে।

ফিনল্যাণ্ডে কয়েকদিন ধরিয়া যে প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, তাহাতে ফিনরা আনন্দিত হইয়াছে। কারণ শীতের ফলে ক্যারে-লিয়ান যোজকে ও ফিনল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্তে স্থানে স্থানে শুধু বিচ্ছিন্ন লড়াই চলিতেছে। ইহাতে ফিনিশ সৈন্যেরা বিশ্রাম পাইতেছে এবং গুলীগোলা সঞ্চয় করিতে পারিতেছে।

বৃটিশ নৌ-সচিব অদ্য ফ্রান্সে বৃটিশবাহিনীর পরিদর্শনকালে বিমানবাহিনীর এলাকায় প্রবেশ করেন। কিন্তু খুব কুয়াসা থাকায় তিনি সকল দল পরিদর্শন করিতে পারেন নাই।

বৃটিশ জাহাজ "টাউনলী" (২৮৮৮ টন) ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের নিকট মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হয়।

ফরাসী বেতারে প্রচার করা হইয়াছে যে, লাল ফৌজ পুনঃ-সংগঠনের জন্য জার্ম্মান সেনাপতিমণ্ডলীর ২০জন অফিসার রাশিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী—

হেলসিঙ্কির একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, সুওমুসালমী হইতে সোভিয়েট সীমান্তে যাইবার রাস্তায় ফিনরা সোভিয়েট বাহিনীর একটি ডিভিসনকে ধ্বংস করিয়া বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে। ফিনরা এক সহস্র সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত বহু ট্যাঙ্ক, সাজোয়া গাড়ীসহ প্রচুর রণসম্ভার হস্তগত করিয়াছে।

বৃটিশ জাহাজ "সেড্রিংটন কোর্ট" (৫০০০ টন) গতকল্য দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে বিস্ফোরণের ফলে জলমগ্ন হয়।

৯ই জানুয়ারী—

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ম্যান্সন ভবনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "জগতের ইতিহাসে এই নববর্ষ সম্ভবত গুরুতর পরিণতিসূচক হইবে। এবার নববর্ষ অনাড়ম্বরে সমাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ নীরবতা ঝটিকার পূর্ব্বে প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, স্থল ও বিমান যুদ্ধ ব্যাপারে এক্ষণে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহা প্রধান সংঘর্ষের প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন মাত্র।

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে শত্রুপক্ষের আক্রমণে দুইটি বৃটিশ জাহাজ (৫৭৫৮ টন) এবং তিনটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

আমষ্টার্ডামের এক খবরে প্রকাশ যে, ইটালী হইতে যে সব বিমান ও সমর-সম্ভার ফিনল্যাণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে জার্ম্মানী আটক করিয়াছে।

হেলসিঙ্কির এক খবরে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনীর বিধ্বস্ত ৪৪শ ডিভিশনের অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে ফিনল্যাণ্ডের সৈন্যেরা নানাভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

ইটালী ও হাঙ্গারী পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

আমষ্টার্ডামের খবরে প্রকাশ যে, ইটালী ও রুশিয়ার সহিত জার্ম্মানীর সম্বন্ধ কি হইবে, সে বিষয়ে হের হিটলার বার্লিনে অতি জরুরী আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

৩রা জানুয়ারী—

দিল্লীতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, "আমি কোনরূপ পদমর্য্যাদা কিংবা নেতৃত্ব চাহি না। সর্ব্বদাই আমি গান্ধীজীর নেতৃত্ব অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছি।" শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, অগ্রগামী ব্যবস্থা হইলে তিনি যে কোন নেতাকে অনুসরণ করিবেন।

সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু নেতা রায় বাহাদুর বেলীরামের হত্যার সহিত জড়িত সন্দেহে একখানি চলন্ত ট্রেনে গুলীভরা পিস্তলসহ একজন পাঠানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাঞ্জাব বয়সঙ্কোচ কমিটি বিবাহের উপর কর ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। পাঞ্জাবে প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ বিবাহ হয়। কমিটি মনে করেন যে, বিবাহের উপর কর ধার্য্য করিলে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। বর ও কন্যার আর্থিক অবস্থা অনুসারে করের হার এক টাকা, পাঁচ টাকা ও দশ টাকা হিসাবে ধার্য্য করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

বড়দিনের অবকাশের পর অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পুনরধিবেশন হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদে একজন বাঙালী হিন্দুপ্রার্থীর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দুইজন ইংরেজ প্রার্থীকে নিযুক্ত করাতে বহু অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

৪ঠা জানুয়ারী—

জব্বলপুরে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার তুলনা করিয়া বলেন, "সকল কুকুরই সমান; তবে কোন কোন কুকুর কামড়াইবার আগে ঘেউ ঘেউ করে; আবার কোন কোনটি সেরূপ করে না।"

৫ই জানুয়ারী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের এক সভা হয়। সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ বি বি পি সি'র হিসাব-নিকাশ পরীক্ষার্থ অডিটর নিয়োগ সম্পর্কে এবং বাঙলায় কংগ্রেসী নির্ব্বাচন সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। একটি প্রস্তাবে বি পি সি সি'র হিসাবপত্র উহার নিজস্ব অডিটর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্বেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগ করায় নিন্দা প্রকাশ করা হয়। উক্ত অডিটরের রিপোর্ট, এই সম্পর্কে সেক্রেটারীর মন্তব্য ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য পরিষদ একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর প্রস্তাবে জাতীয় সংগ্রাম অপরিহার্য্য দৃষ্টে কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ বঙ্গীয় কংগ্রেসের অধীন বাঙলার সকল প্রকার কংগ্রেসী নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত বি পি সি সি'র কোষাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন, সভায় তাহা গৃহীত হয় এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩৯ সালের ৯ই জুলাইএর প্রতিবাদ-সভার পর হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সব বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়া কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব "প্রকাশ্যভাবে অমান্যের" অভিযোগ করিয়াছেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক ইলেকশন ট্রাইবুন্যাল ও "এড হক" কমিটি নিয়োগের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

"সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম ও ভারতবর্ষ" নামে পুস্তিকা প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজনকুমার দত্ত ও সুধীর দাশগুপ্ত ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের এক বৎসর ও অপর দুইজনের তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬ই জানুয়ারী—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার-বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত ভাষার ভিত্তিতে বাঙলার সীমা পরিবর্ত্তন ও সমস্ত বাঙলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের পুনর্ম্মিলনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বিনা ডিভিসনে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

ই বি রেলওয়ের ভরতখালি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট একখানি মালগাড়ী ও মোটর বাসে সংঘর্ষের ফলে তিনজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক 'এড্ হক' কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবে "এড হক" কমিটির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে।

নাগপুরে এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বলেন যে, ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। উহা অর্জ্জনের জন্য তিনি সকলকে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে কংগ্রেসের নিজস্ব গৃহ "মহাজাতি সদন" নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য ৭ই জানুয়ারী হইতে ১৪ই জানুয়ারী "মহাজাতি সদন সপ্তাহ" ঘোষিত হইয়াছে এবং ঐ সপ্তাহে সকলকে অর্থ সাহায্যের অনুরোধ জানাইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

৭ই জানুয়ারী—

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার জন্য পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ জিন্নার মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা কেন ব্যর্থ হইয়াছে সেই সম্পর্কে উভয়ের পত্রাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস-লীগ আলোচনার ব্যর্থতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার এক পত্রে মন্তব্য করিয়াছেন, "রাজনৈতিক লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কেই আমাদের মতভেদ বর্ত্তমান এবং তাহাই হইল প্রকৃত অন্তরায়।"

পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী নেতা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য লালা শ্যামলাল হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী—

মধ্য কলিকাতার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত মনোজমোহন দাস যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

৯ই জানুয়ারী—

প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও "ভারতবর্ষের" অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১০ই জানুয়ারী—

বোম্বাইয়ে ওরিয়েণ্ট ক্লাবের ভোজসভায় বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতকে ষ্ট্যাটুট অব ওয়েষ্ট মিনষ্টার অনুসারে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দান করাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। উক্ত বক্তৃতায় এই আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে যে, যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যেই উক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইবে।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ২১শে পৌষ ১৩৪৬, Saturday, 6th January 1940 [৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

হিন্দু মহাসভার অধিবেশন—

হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন জাতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে কলিকাতা শহরে কয়েক দিন যে উৎসাহ-উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা বহু দিন দেখা যায় নাই। হিন্দু মহাসভার নির্ব্বাচিত সভাপতি বীর সাভারকর ভারতের অন্যতম সুসন্তান, তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে অনন্যসাধারণ রকমের ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু শহরে তাঁহার উপস্থিতি বা তাঁহার অভিভাষণই এমন উৎসাহ-উদ্যমের একমাত্র কারণ নহে। বাঙলা ভারতের জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি। স্বাধীনতার সাধনার উদ্বোধন হইয়াছে এই বাঙলা দেশ হইতে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিষময় ফল বাঙলার অন্তরকে আজ এমন তীব্রভাবে আঘাত করিয়াছে যে, সে এই বিষকে উৎখাত করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষকে পুষিয়া রাখিবার পক্ষে কিংবা এই ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির কোন মনোভাব, তাহা যতই সদিচ্ছা-পূর্ণ বলিয়া কথিত হউক না বাঙলা দেশ তাহা বরদাস্ত করিয়া লইতে পারিতেছে না। সাইমন কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছিলেন—'আমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ফলে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিভেদ স্থায়ী হয়।" "সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি ব্যবস্থা সাধারণ নাগরিক মনোভাব জাগরণের বিরোধী।" সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে বীজভূত এই অনিষ্টকারিতা আজ বাঙলা দেশকে অভিভূত করিতে উদ্যত হইয়াছে। বাঙলার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে নিদারুণ বেদনা। হিন্দু সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিস্বরূপে স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে এই বেদনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙালী স্বাধীনতাকেই বড় বলিয়া বুঝে, সে সাম্প্রদায়িকতা বুঝে না। হিন্দু মহাসভার এই অধিবেশনের সাফল্যের মূলে বাঙলার হিন্দু সমাজের স্বাধীনতার সেই অনুভূতিই প্রেরণাশক্তি যোগাইয়াছে। বাঙালী হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক হয় নাই, হইবেও না কোন দিন। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের অন্যায়ের সংঘাতে বাঙলার বুক হইতে জাতীয়তার বেদনাই আজ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। সেই উচ্ছ্বাসই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এই কয়েকদিনের উৎসাহ ও উদ্যমের মধ্যে। বাঙলার অন্তর এখনও সুস্থ আছে, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত—

হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে ও বিনাসর্ত্তে মুক্তির এবং বিদেশে নির্ব্বাসিত সকল ভারতীয়কেই ফিরাইয়া আনার দাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বীর সাভারকর বলেন,—"এ পর্য্যন্ত আমরা যেটুকু রাজনীতিক অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহার সমস্ত কৃতিত্ব এই সকল রাজনীতিক বন্দীদেরই প্রাপ্য।" বাঙলা দেশ তাঁহার এই মন্তব্যের আন্তরিকতাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবে। মহাসভার সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের নিন্দাসূচক প্রস্তাবটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালী সমাজের সর্ব্বতোভাবে সমর্থন রহিয়াছে হিন্দু মহাসভার এই দুইটি প্রস্তাবের পশ্চাতে। রাজনীতিক বন্দীদের জন্য বাঙালী আন্দোলন কম করে নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশের রাজনীতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করিলেও বাঙলা দেশের বহু রাজনীতিক বন্দী এখনও কারাগারে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিষে সমগ্র বাঙলা দেশ মুহ্যমান হইলেও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অচল এবং অটল। হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকর কথার অপেক্ষা কাজ বুঝেন বেশী। তাঁহার অতীত জীবন সেই ত্যাগময় কর্ম্মপ্রভাবে প্রদ্দীপ্ত। মহাসভায় গৃহীত এই সব প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সমগ্র বাঙলা দেশ তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিবে।

হক মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

গত শনিবার হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে ১৯ দফা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত ত্যাগ-প্রভাব-প্রণোদিত চিত্তের ঔদার্য্যের অভিব্যক্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ডাক্তার মুখুজ্যে বলেন, ১৯টি কেন, ১৯ শত দৃষ্টান্ত তিনি দিতে পারেন নমুনাস্বরূপ মাত্র ১৯টি দেওয়া হইয়াছে। এই ১৯ দফা অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা বিস্তৃতভাবে সেগুলির উল্লেখ করিতে চাই না, কারণ, হক মন্ত্রিমণ্ডলের যত কিছু কেরামতি বলিতে গেলে সকলগুলির মধ্যেই আগাগোড়া সাম্প্রদায়িকতা জড়িত রহিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের ন্যায় ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের অভিযোগ শুধু শূন্য কথার উপর নয়, তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বিশিষ্টভাবে নজীর উপস্থিত করিয়াছেন এবং প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি অভিযোগ তিনি নিরপেক্ষ বিচারে প্রমাণিত করিতে সক্ষম। আমরা তাঁহার বক্তৃতা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ডাক্তার মুখুজ্যে বলেন,—

"ফিজিওলজির প্রফেসার ভাল লোক চাই, বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, ভাল মুসলমান হইলে তাহাকে ঐ পদ দেওয়া হইবে। বাঙলা দেশের একজন মুসলমানও সে চাকুরীর জন্য আবেদন করিলেন না। পাবলিক সার্ভিস কমিশন হইতে ভাল ভাল বাঙালী হিন্দু পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ফজলুল হক সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন, পাঞ্জাবে মুসলমান যদি পাই তাহাকে লইয়া আসিলে হয় না?"

"বি-সি-এস পরীক্ষা—যাহা হইতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি নিযুক্ত করা হয়, অনেক দিন হইল সেই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার ফল এখনও বাহির হয় নাই। ৫৬জন লোক নিযুক্ত হইবে—২৮ জন হিন্দু, ২৮ জন মুসলমান। মাত্র ১৪ জন মুসলমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সেই জন্য এখন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও বাঙলা সরকারের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। বাঙলা সরকার বলিতেছেন—ফেল হইয়াছে একথা বল কেন? শতকরা ৪০ নম্বর তাঁহারা পান নাই। আচ্ছা, ওটা তো ৪০, ৩০, ২০ কিম্বা শূন্য হইবে সেটা আমরা ঠিক করিয়া দিব।"

"নোয়াখালী, পাবনা, সিরাজগঞ্জের কথা কাগজে কিছু কিছু পড়িয়াছেন। যেখানে শতকরা ৮০ জন মুসলমান, সেখানে তাহারা প্রকাশ্যভাবে হিন্দুদিগকে অর্থনৈতিক বয়কট করিবার জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। নোয়াখালির সন্দ্বীপে দুর্গাপূজার ফলাফল সম্বন্ধে মুসলমান এস-ডি-ও এক চিঠিতে লিখিয়াছেন—সব সময়েই মসজিদের সামনে দিয়া বাজনা না বাজাইয়া যাওয়াই ভাল। যদি বাজান হয়, তিনি গ্যারাণ্টি দিতে পারেন না, শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় এখনও বহু প্রতিমার ভাসান হয় নাই।"

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার লোপ, মক্তবে হিন্দু ছেলেদিগকে হিন্দু সভ্যতার বিরোধী শিক্ষা দেওয়া এ সব কথা তো সকলেরই জানা আছে। ডাক্তার মুখুজ্যে বলিয়াছেন,—এই সব অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে তিনি সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন। তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বাঙলার সমস্ত হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি এই সব প্রশ্ন শুধু সম্প্রদায় বিশেষের প্রশ্ন নয়, ইহা জাতিগত প্রশ্ন। জাতির সংহতি নষ্ট হইলে শক্তি নষ্ট হয় এবং দুর্ব্বলের সম্বল শুধু থাকে পরের গোলামী। ডাক্তার মুখুজ্যে এই সব সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতির অনিষ্টকারিতাকে উপলব্ধি করিয়া উত্তপ্ত চিত্তে বলিয়াছেন,—"তোমরা যে এত লম্ফ-ঝম্ফ দিতেছ তোমরাও তো ইংরেজের গোলাম। তোমাদের পশ্চাতে আছে ইংরেজ, যাহাদের ইঙ্গিতে তোমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।" যে নীতি সমগ্র বাঙলা দেশের পক্ষে বিদেশীয় দাসত্ব এমনভাবে দুর্নিবার করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মর্য্যাদাসম্পন্ন সমগ্র বাঙালী সমাজকে বর্ণ-সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জাগ্রত হইতে হইবে।

নিরপেক্ষ উক্তি—

কিছুদিন হইল নাগপুর শহরে নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁহার অভিভাষণটি প্রত্যেক ভারতবাসীর পড়া উচিত। ডাঃ মুখুজ্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, ভাবপ্রবণ আন্দোলনকারী নহেন, কিম্বা অনিষ্টকারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন কমিউনিষ্ট কিম্বা কংগ্রেসীও নহেন। তিনি বলেন,—"ভারতের রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণের বেলায় সাম্প্রদায়িক প্রতিবন্ধকতার উপর গ্রেট ব্রিটেন ক্রমাগত জোর দিয়া থাকে, এইরূপ মতিগতি সমীচীন নয়।" গ্রেট ব্রিটেনের এইরূপ মতিগতিতে সাম্প্রদায়িকতার অন্তরায় দূর হওয়া দূরে থাকুক, কাজে কি ঘটিতেছে, ডাঃ মুখুজ্যে মহাশয়ের পরবর্ত্তী উক্তিতেই তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলেন,—"আমাদের কতকগুলি মুসলমান ভ্রাতা যে অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক মতিগতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন এবং মোশ্লেম লীগ যে মতিগতি দেখাইতেছেন, অন্য কারণের অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসন-বিভাগ হইতে ক্রমাগত প্ররোচনাই রহিয়াছে তাহার মূলে বেশী।" সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের তোয়াজের দ্বারা কংগ্রেস যে ঐ শ্রেণীকে আস্কারা দিয়া সমস্যা জটিল করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, ডাঃ মুখুজ্যে সে কথাটাও স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়া দিয়াছেন। বাঙলার সমগ্র জাতীয়তাবাদী দল ডাঃ মুখুজ্যের এই নিরপেক্ষ উক্তিকে যে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—দক্ষিণমার্গী কংগ্রেসী নেতারা যাহাই মনে করুন না।

বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের দান—

বিগত সপ্তাহে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল। হিন্দু সাহিত্যিক এবং মুসলমান সাহিত্যিক, সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন গণ্ডী-ভেদের আমরা বিরোধী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙলা দেশে এই ভেদ স্বীকৃত হয় নাই এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, সাম্প্রদায়িকতার সংস্কার মনের কোণ হইতে দূর হইয়া গেলে এমন স্বতন্ত্রতার প্রয়োজনও লোপ পাইবে। আবশ্যক মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত সাহিত্য-সাধনার। সম্মিলনীর সভাপতিস্বরূপে খান বাহাদুর আজিজুল হক সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানদের সমবেত দান যথেষ্ট ছিল। তখনকার দিনে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে ভাষাস্বরূপ ফুটিয়া উঠিত। রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলমানদের গতি পথ যখন বন্ধ হইয়া যায়, তখন হইতে ভাষার মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের পথও বন্ধ হইয়া যায়। নিজস্ব ভাষার ভিতর দিয়া যে জিনিষটা পরিস্ফুট হওয়া দরকার, সাহিত্যে যদি আমরা তাহা না আনিতে পারি, তাহা হইলে লোক শিক্ষা প্রচার হইবে না। তাহাতে পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, ভাবুকতার সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু লোক-শিক্ষা হইবে না। বাঙলা দেশে যাহারা শতকরা ৫৫ জন তাহাদের নিজস্ব জিনিষ এখনও বাঙলা সাহিত্যে পরিস্ফুট হয় নাই।" জনসাধারণের অন্তরের সঙ্গে রসসূত্রে যোগ সাধনাই সাহিত্যিকতা, এই সাধনা কোনরূপে কৃত্রিমতা স্বীকার করে না। বাহির হইতে উর্দ্দু বুলি ফরমাইস দিয়া আনিয়া যাহারা কৃত্রিম উপায়ে বাঙালী মুসলমানদের সংস্কৃতি বাঙলা সাহিত্যে ঢুকাইতে চাহেন, তাহাদের এই সত্যটি বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, কৃত্রিমতার ঐরূপ কসরত খাটাইতে গেলে সাহিত্যেরই কণ্ঠরোধ হইবে এবং সাহিত্যের যদি কণ্ঠ-রোধই হয়, তবে তাহার সাহায্যে মুসলমান সংস্কৃতির প্রচারের চেষ্টার কথাই উঠিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাঁধা বুলিতে বিভ্রান্ত না হইয়া সাহিত্যিকগণ বাঙলার অন্তরের রস-সাধনায় আপনাদিগকে নিষ্ঠিত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভারতের জাতীয়তা—

কিছুদিন হইল লক্ষ্ণৌ শহরে নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে সভা-পতিত্ব করেন স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। জ্ঞানং অভেদ দর্শনং—স্যার রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার অভিভাষণে শিক্ষার আদর্শের সম্বন্ধে আমাদের ঋষিদের ঐ কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "শিক্ষায় আমরা সর্ব্বপ্রকার রাজনীতির উর্দ্ধে। মানুষের বিকাশের মূলসূত্র সর্ব্বত্রই এক। ইহা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে শিক্ষার সাহায্যে পক্ষপাত-মূলক ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। অতীতে জাতীয়তাবাদের সার্থকতা যতই থাকুক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে ইহা মুমূর্ষু।" স্যার রাধাকৃষ্ণণ যে আদর্শের কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ স্তরের কথা, একেবারে শুদ্ধ সত্ত্বের স্তর। মানুষের আদর্শ যে তাহাই এই বিষয়ে আমাদেরও মতের অমিল নাই; কিন্তু কথা হইল এই যে, পরাধীনতার বিষময় প্রভাবে যে জাতি পড়িয়া রহিয়াছে তামসিকতার অন্ধতম স্তরে, তাহাদের পক্ষে ঐ সব বড় বড় কথা বিশেষ কোন কাজেই আসে না। জাতীয়তার নামে পরকে লুঠ-পাট করা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ তেমন জাতীয়তা চাহেও না; কিন্তু যেটুকু জাতীয়তার ভাব না জাগিলে সে এই পরাধীনতার অন্ধতম স্তর হইতে উঠিতে পারিবে না, সে জাতীয়তার প্রয়োজন আছে এই ভারতবর্ষের আগে। বিশ্ব-মানবতা বিশ্ব-প্রেম ভারতবাসী-দের পক্ষে সবই অকেজো থাকিয়া যাইবে যদি ভারতবর্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠপর মনোবৃত্তিকে অবলম্বন না করে এবং অত্যুচ্চ ভাবাদর্শের অপেক্ষা ভারতের পক্ষে নিতান্ত প্রথম প্রয়োজন এই আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তির জাগরণ। জাতীয়তার নিন্দাবাদের দ্বারা এই মনোবৃত্তির বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিলে ভারতের যে বিশেষ আদর্শের কথা স্যার রাধাকৃষ্ণণ এমন জ্ঞান-গর্ভ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই নষ্ট হইবে। পরধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—পরকীয় দাসত্ব হইতে যে জাতি মুক্ত নয়, তাহার কোন ধর্ম্মই সাধনা হয় না। পরের প্রভুত্বের চাপে এবং পরের প্ররোচনায় ধর্ম্মগত ঐক্যের সকল আদর্শ সেখানে ব্যর্থ হয় এবং যত রকম সঙ্কীর্ণতা ও ইতরতাই প্রশ্রয় পাইয়া থাকে।

জাতীয়তার দোষ ও গুণ—

লাহোর শহরে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে ডাক্তার প্রথমনাথ বাড়ুয্যে মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের কর্ম্মপন্থার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের উল্লেখ করিয়া ডাক্তার বাড়ুয্যে বলেন,—শুধু স্বাধীনতা লাভ করিবার পক্ষেই যে ভারতবাসীদের পক্ষে জাতীয়তাবাদ অপরিহার্য্য এমন নয়, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যও জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন। কিন্তু সকল দেশের পক্ষে সকল সময়েই যে জাতীয়তা অবিমিশ্র কল্যাণকর, একথা বলা চলে না। ন্যায্য হউক, অন্যায্য হউক, আমার দেশের জন্য যত কিছু সবই ভাল এমন নীতির অনেক অনিষ্টকারিতা রহিয়াছে। অসংস্কৃত স্বদেশ প্রেম রাষ্ট্রীয় আত্মম্ভরিতাকে বাড়াইয়া তোলে। ডাক্তার বাড়ুয্যের অভিমত আমরাও সমর্থন করিতে পারি। আমাদের কথা এই যে, অন্য দেশের পক্ষে জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন না থাকিতে পারে; কিন্তু ভারতের পক্ষে জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন সকলের আগে। আগামী একশত বৎসরকালের জন্য জননী জন্মভূমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য হউক,—বাঙলার বীর সন্ন্যাসীর এই বাণীতে সমগ্র ভারত যতদিন অনুপ্রাণিত না হইবে, ততদিন ভারতের মুক্তি নাই। বিশ্ব-প্রেমের ফাঁকা কথায় বিভ্রান্ত না হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের এই বীর-বাণী আমাদের জীবনধর্ম্মকে কর্ম্মের পথে পরিচালিত করুক, নতুবা বিশ্ব-প্রেম আমাদের পক্ষে শুধু মিথ্যাচার এবং অলস ও অকর্ম্মার মানস-বিলাস মাত্র। ভারতের অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ, তাহাতে প্রেম-পরিনিষ্ঠিত

দৃষ্টি এখানকার প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্য দিয়া উগ্র জাতীয়তার আকারেই আগে দেখা দিবে এবং পরাধীনতার বাঁধন ভাঙিয়া সেই জাতীয়তাবাদ বিশ্বের জীবন ধারণের সঙ্গে যুক্ত হইবে।

দোষী কাহারা?—

লাহোর হইতে অতি মর্ম্মন্তুদ সংবাদ আসিয়াছে, সীমান্ত প্রদেশের বিশিষ্ট হিন্দু-নেতা রায় বাহাদুর বেলীরাম গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতার হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করিয়া সবেমাত্র ফিরিতেছিলেন। আততায়ী পলায়ন করিয়াছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইহার মূলে থাকা খুবই সম্ভব। সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষের ভাব উগ্র থাকার কারণ রহিয়াছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সেই পাপ হয়ত এই ঘৃণিত এবং জঘন্য পশু-বৃত্তির মূলে প্ররোচনা যোগাইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য খান বাহাদুর আব্দুল কোয়ায়েম কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুর জেলায় হিন্দু-নির্য্যাতন ব্যাপারের তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"প্রকৃত বা কাল্পনিক অভিযোগের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মানুষ যে এই ধরণের নৃশংসতায় লিপ্ত হইতে পারে, ইহা মানব প্রকৃতির এক ঘোরতর কলঙ্ক। আমি পেশোয়ারে আসিয়া কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, সুক্কুর অঞ্চলে ধন-প্রাণ হানির পরিমাণ এইরূপ আতঙ্কজনক।" খান বাহাদুর বলিয়াছেন, তথাকথিত ইশ্লাম এবং হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষাকারী মোশ্লেম লীগ এবং মহাসভাকে যদি অবিলম্বে চিরদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সুক্কুরে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, ভারতের সর্ব্বত্র অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সেইরূপ ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে। খান বাহাদুর আব্দুল কোয়ায়েম হিন্দু মহাসভা এবং মোশ্লেম লীগকে এক গোত্রে দেখিলেন কি করিয়া বুঝা গেল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে যে কথা বলিয়াছেন তাহার সহিতই তাঁহার ঐরূপ যুক্তির কোন সামঞ্জস্য থাকে না। তিনি বলেন—"মোশ্লেম লীগের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির অনর্থক চেষ্টা হইতে কংগ্রেসের বিরত হওয়া উচিত; কারণ দেখা যাইতেছে, আমরা যতই আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছি, আমরা যতই বিবেচনাপরায়ণ হইতে চাহিতেছি, লীগের মতি-গতি ততই বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে।" যে কংগ্রেসের আপোষ-নিষ্পত্তির মনোবৃত্তি এমন বাড়াবাড়ি রকমের সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল সেই কংগ্রেসকে হিন্দু মহাসভার প্রভাবিত বলিয়া নিজেরাই প্রচারকার্য্য চালাইতেছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, নেহাৎ যাহারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী তাহারাও হিন্দু মহাসভার নীতিকে কংগ্রেস হইতে বিশেষ তফাৎ দেখেন না। সেই নীতির সম্বন্ধে বেয়াড়া হইতেছে যাহারা তাহাদের কার্য্য যদি এই সব আতঙ্কের মূল কারণ হয়, অর্থাৎ সেই বেয়াড়া হওয়ার ফলে যে বিপদ আসন্ন তাহা এড়াইবার জন্য যদি কংগ্রেসকে মোশ্লেম লীগের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনা বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে উত্তরোত্তর যাহারা বেয়াড়া হইতেছে এবং বেয়াড়া হইয়া আসিয়াছে দায়ী হয় সেই মোশ্লেম লীগই। হিন্দু মহাসভা আগা-গোড়া জাতীয়তাবাদী, অন্যায্যভাবে কোন অধিকার পাইবার জন্য দাবী মহাসভা কোন দিন করে নাই। পক্ষান্তরে মোশ্লেম লীগ উত্তরোত্তর দাবী চড়াইতেছে এবং সেইভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের দ্বারা নিজেদের প্রচার বাড়াইবার চেষ্টায় আছে। এমন মনোবৃত্তি যাহাদের তাহাদের সঙ্গে দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী কাহারও কোনরূপ সম্পর্ক রাখা উচিত নহে। ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিবার ফলে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিবার সময় আজ আসিয়াছে। এ বিষয়ে কোনরূপ দুর্ব্বলতা দেখাইয়া যাঁহারা আপোষ-নিষ্পত্তির কথা আওড়াইবেন তাঁহারা দেশের সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত করিবেন।

ইংরেজী নববর্ষ—

সুইডেনের প্রধান মন্ত্রী ইউরোপীয় নববর্ষের বাণী দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের জীবন ও আমাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মনে হয় যেন বৃহৎ জাতিগুলির অস্তিত্বই ছোট জাতিগুলির বাঁচিবার অধিকার হরণ করিবে"—সুইডেনের প্রধান মন্ত্রী যে আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন, সে আতঙ্ক শুধু সুইডেনের বেলাতেই সত্য নয়, জগতের সকল জাতির পক্ষেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সত্য। কোন জাতিকে কোন হিসাবে দুর্ব্বল বুঝিলেই প্রবল আসিয়া সে মুহূর্ত্তে তাহাকে পিষ্ট করিবে ইহা আধুনিক রাজনীতির পরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়, নীতি, ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রাজনীতি হইতে এগুলি বহুদিন পূর্ব্বেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। যে জাতিকে বাঁচিতে হইবে, তাহাকে আজ সব রকম দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া শক্ত হইতে হইবে, পণ্ডিত জওহরলাল নববর্ষের জাতিকে এই শক্তি-সাধনার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"দশ বৎসর পূর্ব্বে লাহোরে রাবি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম। সে সঙ্কল্প এখনও পূর্ণ হয় নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে পণ করিয়াছিলাম, তাহা পুনরায় স্মরণ করিয়া আমরা এক স্বাধীন সম্মিলিত এবং গণতান্ত্রিক ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিতে থাকিব। সেই ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ সুযোগ থাকিবে এবং পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা লইয়া সকলে সুখে বাস করিবে।" পণ্ডিত জওহরলালজীর এই কথার সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটি কথা যোগ করিয়া দিয়া বলিব, স্বাধিকারলব্ধ সেই ভারতই সেদিন সঙ্ঘর্ষ, সংগ্রাম এবং দুর্গতিক্লিষ্ট ও প্রবলের পীড়নে পিষ্ট জগতের বিভিন্ন জাতির নিকট নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে। পরাধীন ভারতের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ, আজ তাহার ক্লিষ্ট কণ্ঠের বাণী প্রবলের কাছে উপহাসেরই বিষয়। পরাধীনতার এই বেদনা ভারতকে উত্তপ্ত করিয়া তুলুক— শুধু তখনই জগতে তাহার কথা বিকাইবে।

বীর সাভারকরের বাণী

বীর সাভারকর প্রকৃত কর্ম্মী এবং ত্যাগী পুরুষ। ভারতের স্বাধীনতার অগ্নিময় প্রেরণার প্রভাবে বহু পীড়ন ও নির্য্যাতনের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি শক্ত মানুষ এবং বলিষ্ঠ সাধক। বীর সাভারকরের মত মানুষ পরাধীন ভারতে খুব কমই আছেন, জগতের মধ্যেও এমন মানুষ দুর্লভ। কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার সভাপতিস্বরূপে বীর সাভারকর যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা ওজস্বী ও আন্তরিকতা-পূর্ণ—সোজাসুজি প্রাণকে গিয়া স্পর্শ করে। খুঁটি-নাটি বিষয়ের মতভেদকে তুচ্ছতার মধ্যে ফেলিয়া চিত্ত আকৃষ্ট হয় তাঁহার অভিভাষণের যাহা অভিধেয় সেই ভারতের স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শের মধ্যে। বীর সাভারকর স্বাধীনতার সাধক—দাসত্বের প্রভাব-বিনির্ম্মুক্ত ভারতের মহিমময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিবেদনের উগ্রতার অভিব্যক্তি রহিয়াছে তাঁহার অভিভাষণের সর্ব্বত্র।

বীর সাভারকর

স্বাধীনতা আমাদের চাই এবং চাই সকলের আগে। স্বাধীনতা না পাইলে আমরা মানুষের মত বাঁচিতে পারিব না এবং স্বাধীনতার সেই প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে অন্য সব বিচার-বিবেচনাই গৌণ। এই স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে কোন পথে। সাভারকরের মূল নির্দ্দেশ—ভারতের জাতি গঠন প্রণালী লইয়া তিনি বলেন, ভৌগলিক ভিত্তিতে জাতি গঠনের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। গত ৫০ বৎসর যাবৎ কংগ্রেস এই চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। হিন্দু জাতিই ভারতের একমাত্র জাতি। মিশ্র জাতি গঠনের জন্য কংগ্রেস দীর্ঘ দিন চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজ ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে অনেকে স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলমান থাকিতে চাহিতেছে—অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়ত্বের মধ্যে মুসলমানেরা তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে বিলীন করিয়া দিতে এখনও সম্মত নহেন। তিনি বলেন,—"কোন কোন সরলমনা হিন্দু এই আশা ও ধারণা পোষণ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন যে, যেহেতু ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই জাতি ও ভাষার দিক দিয়া আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, সেই হেতু তাহাদিগকে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আবেদন করিলেই হিন্দুদের সহিত এক জাতীয়ত্ব এমন কি রক্তের সম্পর্ক স্বীকার করিয়া এক নেশনত্বের মধ্যে বিলীন হইতে রাজী করা যাইবে। ঐ সমস্ত সরল ব্যক্তিগণ যথার্থই কৃপার পাত্র। মুসলমানগণ এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় খুব ভাল করিয়া জানে, একমাত্র প্রভেদ এই যে, হিন্দুগণ যে সমস্ত সম্পর্কে এক হিন্দুকে অপর হিন্দুর সহিত একসূত্রে গ্রথিত করে, এবং তৎসমুদয় ভাল বলে, পক্ষান্তরে মুসলমানগণ উহাদের নাম উচ্চারণেও ঘৃণাবোধ করে এবং স্মৃতি হইতে উহা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তুর্কী বা আরবদের সহিত আপনাদের জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করিবার জন্য মনগড়া ইতিহাস বা কুলজী রচনা করিতেছে। তাহারা যাহাদের জন্য আরবীভাবাপন্ন স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে তাহারা হিন্দুর সহিত যে সমস্ত বিষয়ে ঐক্য আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে ব্যবধান আরও বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক।"

এক সমাজ, এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, একই শোণিত সম্পর্ক এ সব জাতি গঠনের প্রধান সহায় সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐগুলির উনিশ-বিশ পার্থক্য সত্ত্বেও যে মিশ্র জাতি গঠন সম্ভব হয় না, এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে মিশরের কথা বলা যাইতে পারে। মিশরীয় জাতি বলিতে শুধু মুসলমানকে বুঝায় না, মিশরের খৃষ্টানদিগকেও বুঝায় এবং মিশরের স্বাধীনতার মূলে অবদান মিশরের মুসলমানদের যেমন আছে খৃষ্টানদেরও তেমনই আছে। উভয় সম্প্রদায়ের ত্যাগ ও আত্মাবদানের পথেই মিশর দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া এ সব স্থানেও খৃষ্টান এবং মুসলমান এতদুভয়ের মধ্যে ধর্ম্মগত ব্যবধান দীর্ঘ দিনে একই ভূমিতে বাসের জন্য সংস্কৃতির সংহতিতে দূর হইয়াছে এবং পরাধীনতার বেদনা সকলের অন্তরেই সুতীব্র করিয়া তুলিয়াছে। চীনের সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যাইতে পারে। চীনের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ হইলেও চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান সেখানকার মুসলমানদেরই বরং বেশী। মাইনরিটির অধিকার রক্ষার আগ্রহ সেখানে জাতীয়তার বিরোধী সঙ্কীর্ণতা বা ইতরতায় আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তৃতীয় পক্ষের প্রভাব যদি পশ্চাতে না থাকিত, তাহা হইলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও জাতীয়তা বিরোধী মতিগতি এমন মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিত না। অধীনতার গ্লানি ও দুর্গতির অনুভূতি স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীকতাকে দৃঢ় করিয়া তুলিত; পোলিশ মুসলমান, গ্রীক মুসলমান বা চীনা মুসলমান যেরূপ নিজেদের দেশের নামে জাতীয়তার পরিচয় দেয়, জাতির সংস্কৃতিকেই সাম্প্রদায়িকতার অপেক্ষা বড় বলিয়া বুঝে, ভারতের মুসলমানেরাও তাহাই বুঝিত। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারতের বিরাট মুসলমান সমাজ, এখনও নিজদিগকে সেই

হিসাবেই দেখে, তুরস্ক বা আফগান কিম্বা আরবের কুলজী জাহির করে না। যাহারা করে, তাহাদের সংখ্যা অধিক নয় এবং তাহারা তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনাতেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য উহা করিয়া থাকে।

সাভারকরজী বলেন,—"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে হিন্দু ও জাতীয়তা বিরোধী করিয়া তুলিতেছেন, গান্ধীবাদীদের একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলীম লীগের অভিযোগগুলি বিচার করিবার জন্য গান্ধীজী এবং তাঁহার কংগ্রেসী অনুচরেরাই বা কি করিয়া সেই গবর্ণর বা বড়লাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছেন?"

সাভারকরজী এ স্থলে পূর্ব্ব প্রশ্নটি ছাড়িয়া কংগ্রেসের একটি বিশিষ্ট নীতির বা ব্যবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, কংগ্রেসের এই নীতি ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু মূল প্রশ্ন তিনি যতটা পুষ্ট হয়, মনে করিয়াছেন, ততটা হয় না। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের গুরুত্ব কার্য্যত কমে না। তৃতীয় পক্ষের কর্ত্তৃত্ব ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অপসারিত না হইলে ভারতের তথাকথিত এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার যে সমাধান হইবে না, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ একথা সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধী অভ্রান্ত ভাষায় সম্প্রতি তাঁহার সে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে, কংগ্রেসীদের অবলম্বিত নীতি বিশেষের বিরোধ যদি ঘটে, সেই নীতি ভ্রমপূর্ণ এই পর্য্যন্ত বলা চলে।

সাভারকরজী বলিয়াছেন,—"কংগ্রেসী ভাইদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা লীগের আচরণের বিরুদ্ধে চীৎকার না করিয়া নিজেরা আত্মস্থ হউন এবং তাঁহাদের চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করুন। এখন হইতেই তাঁহারা মুসলমানগণকে বর্জ্জন করিয়া চলুন।"

লীগের আচরণের বিরুদ্ধে চীৎকার করা আমাদেরও মত নয় এবং লীগওয়ালাদের তোয়াজ করিবার যে মনোবৃত্তি কংগ্রেসী দলের এক শ্রেণীর একরূপ কুসংস্কার হইয়া উঠিয়াছে, আমরাও সমর্থন করি না। আমরা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া আসিয়াছি যে, লীগওয়ালাদের চালই হইল কংগ্রেসী দলের তোয়াজের তৎপরতায় নিজদিগকে ফাঁপাইয়া তোলা।

কংগ্রেসী দল লীগওয়ালাদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা একান্ত অনাবশ্যকভাবে বড় করিয়া তুলিয়া লীগওয়ালার এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষক পরপক্ষের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিয়াছেন। সুখের বিষয়, লীগের মুক্তি-দিবস এই কুসংস্কার হইতে মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

কিন্তু লীগওয়ালারাই মুসলমান সমাজ নয়, লীগের মত সমর্থন করেন না এমন মুসলমান এদেশে অনেক রহিয়াছেন এবং বিলাতের 'নিউ ষ্টেটসম্যান' পত্র সেদিন সুস্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, লীগের বিরোধী মুসলমানের সংখ্যাই এখন ভারতবর্ষে বেশী। কংগ্রেসের কর্ত্তব্য হইবে, লীগওয়ালাদিগকে উপেক্ষা করিয়া সেই সব মুসলমানদিগকে ভারতের স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শের সম-স্বার্থে সংহত করা। স্বাধীনতা লাভ না হইলে যে কাহারও স্বার্থ সত্যকারভাবে রক্ষিত হইতে পারে না, এই অনুভূতিকে একান্ত করিয়া তোলাই হইতেছে এখন প্রথম প্রয়োজন। সমষ্টি-মুক্তির সেই আদর্শ উগ্র হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া তৃতীয় পক্ষের প্ররোচিত সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল বেশী দিন যে সুবিধা পাইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। তাহাদের স্বরূপ ইতিমধ্যেই উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। পরাধীন ভারতে কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থই রক্ষা হইবার উপায় নাই, এই সত্যটি অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দ্দশার আঘাতের ভিতর দিয়া জাতির অন্তরে স্বাধীনতার প্রেরণাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে—এবং সেই প্রেরণা ভারতভূমিকে সমন্বয়সূত্রে ভারতীয় মহাজাতি গড়িয়া তুলিবে। প্রকৃতপক্ষে সে সূত্র দৃঢ় হইয়াছে, সুতরাং পরপদলেহীদের "বিপন্ন ইসলামী জিগীরে" আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই।

যীশুখ্রীষ্ট

শ্রীঅরুণকুমার সরকার

লৌহ শিকলে বন্দী মানুষ
বারুদ-বোমার ঘরে;
দূষিত ধোঁয়ায় তোমারে কি যায় চেনা?
মরণ-মাতাল দানব গরজে
শান্ত নীলাম্বরে,
তব বাণী হায় কেহ আজ শুনিবে না!

মানবাত্মার এ মহাশ্মশানে,
কোলাহল হাহাকারে,
তুমি এস ক্ষমা-প্রেমের নিশান-ধারী।
নিপীড়িত নর তোমায়, তাপস,
খুঁজিতেছে চারিধারে,
প্রেমের আগুনে গলাইয়া দাও নির্ম্মম তরবারী!

চলতি ভারত

যুক্তপ্রদেশ

স্বাধীনতার পথে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এলাহাবাদ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী পাণ্ডিলা গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকদের লক্ষ্য ক'রে একটা কথা বলেছেন যা স্বাধীনতার প্রত্যেকটি পূজারীর স্মরণে রাখা উচিত। "ভারতবর্ষের নগরে এবং গ্রামে যারা বাস করে, তাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য বলে যারা পরিচয় দিতে চায়, তাদের জানা দরকার চিবুক উঁচু করে আর বুক সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কেমন করে হাঁটতে হয়।" কোন্ জাতি স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য এবং কোন্ জাতি স্বাধীনতা পাওয়ার অযোগ্য, তা অনেকটা বুঝতে পারা যায়, সেই জাতির চলার ভঙ্গিমা দেখে। যাদের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে জড়তা আর আলস্য, যাদের মনের মধ্যে নেই কোনো উচ্চ আদর্শে জ্বলন্ত নিষ্ঠা, তাদের পক্ষে সোজা হ'য়ে চলা আর সোজা হ'য়ে বসা মুস্কিল। স্বাধীন দেশের মানুষদের চলা আর পরাধীন দেশের মানুষদের চলা ঠিক একরকমের নয়। দীর্ঘ-কালের পরাধীনতার অভিশাপ যাদের জীবনকে বঞ্চিত করেছে আনন্দ থেকে, আত্মসম্মানবোধ থেকে, যাদের ভবিষ্যৎ জুড়ে নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার, যাদের চলার পথ বিধি-নিষেধের অসংখ্য কণ্টকে কণ্টকাকীর্ণ—তাদের চলার মধ্যে কোথা থেকে আসবে স্বাধীন মানুষের অকুণ্ঠ গতিভঙ্গিমা? আমরা যে স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্যতা সত্য সত্যই অর্জ্জন করেছি—তার একটা লক্ষণ হচ্ছে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে হাঁটবার ক্ষমতা। কাবুলীদের ঢঙে কাপড় পরলেই যথেষ্ট হোলো না, চলার যে ভঙ্গিমা তার মধ্যেও চাই শৌর্য্যের গরিমা, পৌরুষের দৃপ্তপ্রকাশ, অন্তরের দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের অবারিত পরিচয়। থোরোর একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য—The impure can neither stand nor sit with purity.

শিক্ষার আদর্শ

লক্ষ্ণৌতে অখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের উদ্বোধন সভায় পণ্ডিত জওহরলাল যা বলেছেন, তা' ভাববার কথা। তাঁর উক্তির মধ্যে আছে, "আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে রয়েছে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আর শিক্ষা-ব্যবস্থা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই সমাজ-ব্যবস্থাকেই সমর্থন করছে। এই সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি আমরা পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা না করি, সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।" তাঁর উক্তির মধ্যে আরও আছে, "সমস্ত শিক্ষারই একটা সামাজিক পটভূমি থাকা উচিত; যে রকম সমাজ আমরা গড়তে চাই—তারই উপযুক্ত ক'রে আমাদের যুবকদের গ'ড়ে তোলা দরকার। সেই আদর্শ সমাজ সাধারণের কল্যাণকে বড়ো ক'রে দেখবে ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে; সেখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে, জাতি জাতির সঙ্গে একযোগে কাজ করবে মানব-সমাজকে উন্নতির পথে আগিয়ে দেওয়ার জন্য; সেখানে মানুষের মূল্য হবে সকলের মূল্যের উপরে এবং শ্রেণী কর্ত্তৃক শ্রেণীর ও জাতি কর্ত্তৃক জাতির শোষণ হবে চিরতরে বন্ধ। এই যদি আমাদের ভাবী সমাজের আদর্শ হয়, তবে শিক্ষাকে গ'ড়ে তুলতে হবে এই আদর্শে, এই আদর্শের বিরোধী যা কিছু, তার কাছে শিক্ষা কোনো অর্থই পৌঁছে দেবে না।" পণ্ডিত জওহরলালের উক্তির সঙ্গে আমাদের মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। আমাদের এখনকার শিক্ষকদের সামনে শিক্ষার কোনো বড় আদর্শ নেই। অন্য কোথাও যখন চাকরি জোটে না—তখন মানুষ নাম লেখায় স্কুল মাষ্টারের দলে। স্কুল মাষ্টারেরা উপরিওয়ালা-দের ভয়ে সর্ব্বদা শশব্যস্ত; এমন একটা কথাও বলবার জো নেই, যা বর্ত্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে আঘাত করতে পারে, অথবা ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সমাজের ইমারতে আঁচড় কাটতে পারে। নতুন ধরণের শিক্ষক চাই যাদের প্রাণ ভাবী সমাজের স্বপ্নে হয়ে থাকবে বিভোর, যারা শিক্ষাদানের মত মহাব্রতকে গ্রহণ করবে ভবিষ্যতের জ্যোতির্ম্ময় সমাজকে গ'ড়ে তুলবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিয়ে। তারা হবে সন্ন্যাসীর মতো। ভাবী সমাজের ইমারতকে গ'ড়ে তুলবার জন্য যে মাল-মসলার দরকার—ছাত্রেরা হবে সেই সমাজ-সৃষ্টির মূল্যবান উপাদান। আমাদের স্কুল-কলেজগুলি হ'ল ভিত্তি; যার উপরে গ'ড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের সমাজকে। আজ যারা ছাত্র, কাল তারা হবে নাগরিক। সেই নাগরিকের আচরণকে পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করবে সেই আদর্শ-গুলি, যারা তার মর্ম্মমূলে বাসা বেঁধেছে পাঠদ্দশায় ছাত্র-জীবনের তপস্যার মাঝে। আমরা ছাত্র-অবস্থায় যে আদর্শ-গুলিকে বরণ ক'রে নিই আমাদের মর্ম্মের মন্দিরে, তারাই আমাদের মানুষ অথবা অ-মানুষ হবার জন্য দায়ী। তাই ভাবী সমাজ-সৃষ্টির কাছে শিক্ষকের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। সেই দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্বের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

শিক্ষার আদর্শ—

শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত—সে সম্পর্কে সার রাধাকিষণের অভিভাষণে মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লক্ষ্ণৌতে অখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে বলেছেন, "শিক্ষার আদর্শ হ'চ্ছে ব্যক্তির মুক্তি—নিজের মন দিয়ে ভাববার, নিজের চিত্ত দিয়ে স্বপ্ন দেখবার, নিজের হৃদ দিয়ে শ্রদ্ধা করবার স্বাধীনতা।" এই আদর্শকে অশ্রদ্ধা করতে গিয়েই পৃথিবী আজ মল্লক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন মানুষ গড়বার আদর্শ আজ পৃথিবীর বহু দেশেই পরিত্যক্ত হয়েছে। জার্ম্মানী আজ জার্ম্মান ছাত্রদের গড়তে চাচ্ছে একটা বিশেষ ছাঁচে—তারা সবাই হবে হিটলারের প্রতিমূর্ত্তি। ইটালি

নবীনের সঙ্গে সুরমার চলে আসা ব্যাপারটা বেশ পল্লবিতভাবে গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং এখানে সেখানে বেশ একটু আলোচনাও হতে লাগল। নবীন বিবাহ করছে না এবং কেন সে বিবাহ করতে চায় না এ বক্রোক্তি করে কেউ কেউ হাসলে।

ঈশান মেয়ের দিকে চায়—

সুরমা যেন ঝড়ে লতিয়ে পড়া একটি লতা, উঠবার শক্তি তার নাই, তবু সে বেঁচে আছে। তার স্থান সুন্দর পৃথিবীতে, তবু পৃথিবীর কোন কিছুরই উপর তার অধিকার নাই।

ঈশান জামাইয়ের কাছে লোক পাঠালে—যদি সে একবার আসে। সুমঙ্গল জানালে—তার এখন সময় নাই, মাঠে ধান পাকছে, পাহারা দিতে হবে, তারপর কাটতে হবে, মাড়তে হবে, গোলা বোঝাই করতে হবে।

কোন রকমে নিজের ও পরাণের খাওয়াটা এতদিন ঈশান চালিয়ে এসেছে, নিজের মেয়ে হলেও পরের ঘরের বউ সুরমা যখন তার ঘরে এল তখন ঈশান সত্যই হয়ে উঠল সন্ত্রস্ত। নিজের মেয়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে এমন ব্যগ্র কোনদিন হয়নি, এখন তার মনে হচ্ছিল—এর চেয়ে সুরমার রামনগরে স্বামীর আশ্রয়ে যাওয়াই ভাল,—যেহেতু গ্রামের লোককে সে বিশ্বাস করে না।

একদিন ভিন্ন গ্রামে কাজে যাওয়ার নাম করে ঈশান বার হয়ে পড়ল, চলল রামনগরের দিকে; সুরমার ভাবনা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

পথেই দেখা হয়ে গেল সুমঙ্গলের সঙ্গে—শ্বশুরকে সে প্রণাম করলে।—

ঈশান আশীর্ব্বাদ করলে—"দীর্ঘজীবী হও।" তারপরেই জিজ্ঞাসা করলে—"সুরমাকে রামনগরে পাঠিয়ে দেব কি?" কি অপরাধ করেছে সে ঈশান তা জানে না, জানতেও চায় না; মেয়ে স্বামীর বাড়ীতে থাক্—শুধু এইটুকু হলেই তার যথেষ্ট পাওয়া হয়।

সুমঙ্গল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর গম্ভীর হয়ে বললে,—"না, এখন আপনার কাছে থাক, আমি আগে ঘুরে আসি তারপর আনার ব্যবস্থা করা যাবে।"

কোথা হতে ঘুরে আসবে সে কথা ঈশানকে সে কিছুই জানালে না, থপ করে একটা প্রণাম করেই চলে গেল।

শ্রান্তপদে বাড়ী ফিরে ঈশান বসে পড়ল—সুরমা রন্ধন করছিল, তাকে লক্ষ্য করে বললে, "সুমঙ্গলের কাছে গিয়েছিলুম মা—"

সুরমা জিজ্ঞাসুনেত্রে পিতার পানে তাকাল।

ঈশান বললে, "সে তোকে নিয়ে যেতে চায় না—স্পষ্টই এ কথা বললে।"

অকস্মাৎ দৃপ্ত হয়ে উঠে সুরমা বললে, "কেন তুমি গিয়েছিলে বাবা,—স্বেচ্ছায় অপমান সইতে কেন তুমি তার কাছে গিয়েছিলে? যে তোমায় ছোট-লোক বলে অপমান করে—"

বলতে বলতে সে মুখ ফিরালে।

ঈশান একটু হাসলে, মেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "বললেই বা ছোট লোক,—মেয়ের বাপকে এমন কত কথাই শুনতে হয়, সব দিয়েও অনুষ্ঠানের এতটুকু ত্রুটি হলে জোচ্চোর বদনাম নিতে হয়। মেয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশের লোক ভেবে রাখে—তার মাথা নোয়াবার দিন এল—আর সত্যি মাথা নোয়াতেও হয় মা, ওতে অপমান মনে করলে চলে না।"

আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় সে বসল।

(৩)

নিজের অপরাধ যে কোনখানে সুরমা তা দেখতে পায় না।

তাদের ঘরে যে বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী বয়সে তার বিবাহ হয়েছে—বৃদ্ধ অথর্ব্ব-প্রায় পিতা এবং ছোট ভাইটির দিকে চেয়ে সে কিছুতেই বিবাহ করতে চায়নি। গ্রামের লোক দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে—ঈশান মেয়ের কথাতেই মত দিয়েছে, তাকে আঠার ঊনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখেছে।

কেবল একটি লোক সকল আলোচনায় যোগদান করতে এড়িয়ে গেছে, সে নবীন।

একদিন সে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল—সুরমাকে সে গৃহলক্ষ্মী-রূপে বরণ করে নেবে, ঈশান এবং পরাণও স্বচ্ছন্দে তার বাড়ীতে থাকতে পারবে, কিন্তু ঈশান তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাকে নিদারুণ আঘাত দিয়েছিল তার মায়ের কথা তুলে।

যে বেদনা তার মিলিয়ে এসেছিল সেই ক্ষতস্থানে আঘাত করে ঈশান বেদনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নবীন নিতান্ত কাজ না পড়লে কোথাও যায় না। বিশেষ দরকার না পড়লে কারও সঙ্গে কথা বলে না। তার মনে অহোরাত্র জেগে আছে সে কুলত্যাগিনী মায়ের ছেলে, মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তারই করতে হবে।

মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত—

তার অন্তরদেবতা আর্ত্তনাদ করে—সে ত পতিতা মায়ের সন্তান নয়,—পিতৃসম্পত্তি সে পেয়েছে, পিতা ত তাকেই নিজের সন্তান বলে মেনে নিয়েছেন। যে নারী একদিন পিতার কোলে সন্তান রেখে কোথায় চলে গেছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক তার কই?

হয়ত আছে—নইলে লোকে—বিশেষ করে ঈশান সে কথা বলবে কেন?

একদিন সুমঙ্গলের সঙ্গে এর মধ্যে তার দেখা হয়েছিল, সুমঙ্গল কিছু টাকা ধার করতে এসেছিল। নবীন টাকা ধার দিত—ভিন্ গ্রাম হতেও অনেকে টাকা ধার নিতে তার কাছে আসত।

সুমঙ্গল যে কঙ্কনজোড়াটা বন্ধক দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিল তার পানে চেয়ে নবীনের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে—এ কঙ্কন সুমঙ্গল কোথায় পেয়েছে তা সে জেনেও জিজ্ঞাসা করলে—"এ কার?"

সুমঙ্গল নির্ভীকভাবেই উত্তর দিলে—"কার আবার, আমার।"

একটিও কথা না বলে নবীন তাকে টাকা দিয়ে কঙ্কন বন্ধক

রাখলে, সুমঙ্গল খুসি হয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, সে এবার-কার ফসল বিক্রি করেই কঙ্কনজোড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সে যে শুধু মুখেরই কথা তা নবীন জানে। ফসল হয়ত বিক্রয় করবে—কিন্তু তার টাকা হাতে থাকবে না, মদ খেয়ে সে সব উড়িয়ে দেবে।

এ কঙ্কন বিবাহের সময় সেই দিয়েছিল সুরমাকে—তার ঠাকুরমায়ের হাতের কঙ্কন—তার স্ত্রীর জন্যই পিতা সযত্নে রেখেছিলেন। সেই কঙ্কন বিবাহের রাত্রে নবীন পাঠিয়ে দিয়েছিল ঈশানের কাছে—ঈশান ইতস্তত করেছিল, তারপর নিয়েছিল। সেই কঙ্কনই আজ আবার ফিরে এসেছে তার উত্তরাধিকারীর কাছে।

পরদিন সকালে নবীন যখন কঙ্কন নিয়ে ঈশানের বাড়ীতে গিয়ে পেঁছাল তখন ঈশান বাড়ী ছিল না; বাড়ী বন্ধকের তিন বৎসর মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে আর বেশী দেরী নাই—সেজন্য এই সময় হতে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় সে বার হয়েছে। বাড়ীতে ছিল একা সুরমা—বারান্ডায় বসে কতকগুলো পোকা ধরা চাল বেছে নিচ্ছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "এ চাল কি হবে সুরমা ভাত হবে বুঝি? ঘরে চাল নেই—?

সুরমা চুপ ক'রে রইল।

নবীন মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করে রইল, তারপর বললে, "এ রকম অবস্থা, আমায় একবার বলে পাঠালেই পারতে—"

সুরমা কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

কেন? নবীন যেন থতমত খেয়ে গেল,—তারপর বললে, "আমার ঘরে আর ত কেউ নেই—ধান-চালের অভাব নেই—আর—আর—"

সুরমা বললে, "তাই তোমার কাছ হতে ভিক্ষে করে আনতে যেতে হবে—না?"

নবীনের মুখখানা কালো হয়ে গেল, খানিক চুপ করে থেকে বললে, "ভিক্ষে নয়,—একবার শুধু বলা মাত্র—"

বাধা দিয়ে সুরমা বললে, "কিন্তু কোন অধিকারে—কেন তোমার কাছে বলব শুনি—?"

নবীন একটি কথাও আর বলতে পারলে না।

সুরমা শান্তকণ্ঠে বললে, "আর কেন জ্বালাতে এস নবীন-দা, নিজেও কষ্ট পাও আমাদের জন্যে। তোমায় বারণ করছি তুমি আর এস না—আমাদের সংস্পর্শে আর তুমি থাকবে না—"

তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

নবীন ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "তোমরা সবারই কাছে নিজেদের কথা বলতে পার, সবারই সাহায্য নিতে পার—আর আমি—"

আর্দ্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সুরমা বললে, "হ্যাঁ, কেবল তুমি বাদ। কেন বাদ তা তোমারও জানতে বাকি নেই নবীন দা। হয় ত তোমাকেই উপলক্ষ্য পেয়ে আমার স্বামী আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে,—হয় ত ক্ষমা পাব—যেদিন তুমি বিয়ে করবে—সংসারী হবে, সকলের মনের খারাপ ধারণা সেদিন দূর হবে। সেদিন যদি দরকার পড়ে, অসঙ্কোচে তোমার কাছে সাহায্য চাইব নবীন দা, তার আগে নয়।"

কোটা তরকারীগুলো নিয়ে সে ঘরের মধ্যে চলে গেল। নবীন কতক্ষণ নির্ব্বাক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে আস্তে আস্তে বার হল।

কঙ্কনের কথা সে সাহস করে মুখে আনতে পারলে না।

(৪)

কথাটা সুরমার কানে এসেও পেঁছালো—নবীনের বিবাহ।

পাত্রী অপরিচিতা নয়; রামতনু মণ্ডলের মেয়ে তারা। রামতনু মণ্ডলের কাছেই ঈশানের সমস্ত বন্ধক এবং একদিন যখন নবীনের সঙ্গে সুরমার বিবাহের কথা উঠেছিল, সেদিন রামতনু মণ্ডলই প্রবল বাধা দিয়েছিল। ঈশানকে জানিয়ে-ছিল, পতিতার সন্তানের সঙ্গে ঈশান মণ্ডলের মেয়ের বিবাহ দিলে কেবল সমাজেই নয়, ধর্ম্মেও সে পতিত হবে।

আজ সেই রামতনু মণ্ডলই নিজের মেয়ের সঙ্গে নবীনের বিবাহ দিচ্ছে—আশ্চর্য্য।

তারার বয়স হয়েছে অনেক,—সুরমারই সমবয়স্কা সে, তবু তার আজও বিবাহ হয় নাই কেবল সে কুৎসিতা বলেই নয়, সে খঞ্জ। দেশে এত ভাল মেয়ে থাকতে অর্থশালী নবীন এই মেয়েটিকেই যে কেমন করে পছন্দ করে ফেললে তা সুরমা ঠিক করতে পারে না।

গ্রামের মাথা রামতনু মণ্ডল—তার উপরে কেউ কথা বলতে পারলে না। উপযাচক হয়েই রামতনু সকলকে জানালে—"পণ্ডিতের কাছে বিধান নিয়েছি মায়ের পাপে নবীনের এতটুকু ক্ষতি নেই। ওর মা ওকে বড় করে রেখে গেছে, ওর বাপই ওকে মানুষ করেছে। বাপ নিজের ছেলে বলে না চিনলে কখনও সম্পত্তি দিয়ে যেত, না সকলের কাছে ছেলে বলে পরিচয় দিত?

বিবাহে ধুমধাম হল মন্দ নয়, গ্রামসুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ খেলে।

বিবাহে গেল না শুধু সুরমা। ঈশানকে যেতে হল—নেহাৎ মহাজন যাতে না চটে সেই জন্যই, সুরমা মুখ বক্র করলে।

নবীনের বাড়ী হতে বউভাতের নিমন্ত্রণ এল—সুরমা সেখানেও গেল না, ভাইকে পাঠিয়ে দিলে। গ্রামের সকলেই স্বীকার করলে—হ্যাঁ, এ একখানা বিয়ের মত বিয়ে বটে, লোকের অনেক কাল মনে থাকবে।

যারা নিতান্ত নিমন্ত্রণে যেতে পারেনি, নবীন তাদের সিধা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, এবং সেই সিধা সঙ্গে নিয়ে সে নিজেই ঈশানের বাড়ী পেঁছে দিতে এল।

প্রকাণ্ড বড় বারকোষে চাল, ডাল, লবণ, তৈল, ঘি, নানা-রকম মসলা, তরকারী—একটা বিরাট ব্যাপার।

নবীনের স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। বাহককে বারকোষ নামিয়ে দিতে সাহায্য করতে করতে সুরমাকে ডেকে সে বললে, "সত্যিই বিয়েটা করে ফেললুম সুরমা—ভেবে দেখলুম—বিয়ে না করায় ঠকতে হয় বড় বেশী রকমই।

দুনিয়ায় সকলকেই যখন বিয়ে করতে হবে, আমিই বা ঠকি কেন, তাই ঝড়াক্‌সে একটা বিয়ে করে ফেললুম।"

সুরমা নিব্বাকে শুনে গেল; নিব্বাকেই পাত্র এনে জিনিষপত্রগুলো ঢেলে নেওয়ার উদ্যোগ করছিল, নবীন বাধা দিলে—"না না, ও বারকোষ, বাটি, গেলাস সব শুদ্ধ থাকবে, ওসব আবার আমার বাড়ী যাবে ভেবেছ? ওসব তুলে রাখ ঘরে। হ্যাঁ, তুমি আমার বউ দেখতে গেলে না সুরমা—বউকে যা সাজিয়েছি একেবারে যেন দুর্গোপ্রতিমে—"

সুরমা ক্ষীণকণ্ঠে বললে—"বেশ করেছ—"

ঘরের দিকে দু'পা বাড়িয়ে সে হঠাৎ ফিরে এল—"আচ্ছা, দেশে কি আর মেয়ে ছিল না নবীন দা—ওই বিশ্রী চেহারা, খোঁড়া নুলো মেয়ে,—যাকে কেউ বিয়ে করলে না—"

নবীন উত্তেজিত হয়ে উঠল—"খবরদার, তুমি নিন্দে কর না সুরমা; সব বুঝলে নিন্দে করবার মুখ পাবে না। বিয়ে করতে তুমিই বলেছ না—তাই ত বিয়ে করলুম আমাদেরই জাতের বড় মোড়লের মেয়েকে, যে চিরদিন আমায় ঘৃণা করে এসেছে, যার কথা শুনে একদিন তোমার বাবা ভয় পেয়ে আমার হাতে তোমায় না দিয়ে দিলে ওই মাতাল চোর সুমঙ্গলের হাতে। জান—সে দুটি বছরের জন্যে জেল খাটতে গেছে? সেই চোর সুমঙ্গলের চেয়ে পতিতা মায়ের ছেলে নবীন কি যোগ্য পাত্র ছিল না সুরমা—?"

হঠাৎ উত্তেজনার মুখেই চিরদিনকার গোপন কথা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল,—কোনদিন এ কথা প্রকাশ করার ইচ্ছা নবীনের ছিল না।

সুরমার দিকে আর না চেয়ে সে দ্রুতপদে চলে গেল, কথাটা বলে ফেলার জন্য তার অনুতাপ হয়েছিল বড় কম নয়।

সুরমা অন্যমনস্কভাবে তাকিয়েছিল আকাশের কোন্ একপ্রান্তে—একটা নিঃশ্বাস জোরে ফেলবার সাহস পর্য্যন্ত তার হয়নি।

সন্ধ্যায় ভাত রাঁধবার জন্য চাল নিতে গিয়ে স্তূপাকার চাল ভাঙ্গতেই বার হয়ে পড়ল—তারই হাতের কঙ্কনজোড়া,—যা বিবাহের রাত্রে নবীন দিয়ে গিয়েছিল, বিবাহের পর সুমঙ্গল যেদিন—তাকে সৎপথে ফিরানর অপরাধে—তাকে প্রহার করে কঙ্কন কেড়ে নিয়ে পথে বার করে দেয়—এ সেই কঙ্কন।

কঙ্কন জোড়াটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে সুরমা আড়ষ্ট ভাবে বসে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে কেমন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল—তেমনই তার মন কুয়াসার ধূমে ভরে উঠল—তার চোখ দুইটি সজল হয়ে উঠল।

(৫)

ঈশান ভয়ানক মুসড়ে পড়েছে।

সুমঙ্গল দুই বৎসরের জন্যে জেলে গেছে—ঈশান নিজে শয্যাশায়ী, এ শীতের প্রকোপ কাটিয়ে উঠবার ক্ষমতা তার যে হবে না তা সে বুঝেছে।

সময় বুঝে রামরতন মণ্ডল নোটিশ দিয়েছে—তিন বৎসর অতীত হয়ে গেছে, এখন পনের দিন সময় দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে তাকে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

ঈশানের মাথা ঘোরে, শয্যাশায়ী ঈশান বুক চেপে ধরে ছটফট করে, তার চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—"মা—"

সুরমা মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবে, তারপর বলে—"তুমি ভেবনা বাবা, আমি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।"

বাক্স খুলে সে কঙ্কন জোড়া বার করে এনে বললে, "এ জোড়াটা বিক্রি করে দেই বাবা; যাই দাম হোক—হিসেব করে দেখব—দিয়ে আর কত দেনা থাকে। আমি যেমন করেই হোক—দেনা শোধ করব।"

পরাণকে পিতার কাছে রেখে সে কঙ্কন নিয়ে বহুকাল পরে চলল নবীনের বাড়ী। অনেকদিন আগে নবীনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, দেখা হলেই নবীন পালায়। একদিনের দুর্ব্বলতা প্রকাশের লজ্জা সে ঢাকতে পারছিল না।

অসঙ্কোচে সুরমা গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে—"নবীন দা, আজ বড় দরকারে তোমারই কাছে এসেছি ভাই, এ সময়ে যদি এতটুকু দয়া করে আমাদের বাঁচাও চিরকাল তোমার দাসী হয়ে থাকব।"

নবীন এতক্ষণ পরে মুখ তুলে চাইলে,—সুরমার চোখে জল—।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে—"কি বল—যদি সাধ্যে কুলায় নিশ্চয়ই করব, তোমায় দাসী হতে দেব না।"

সুরমা চোখ মুছে ফেলে কঙ্কন বার করে নবীনের সামনে দিতেই সে চমকে বিবর্ণ হয়ে গেল।

মলিন হেসে সুরমা বললে, "না, ফেরৎ দিতে আসিনি, তোমার দান আমি মাথা পেতে নিয়েছি। আজ এ জোড়া ন্যায্য মূল্যে তোমার কাছেই বিক্রি করতে এসেছি নবীন দা—কেবল তোমার শ্বশুরের দেনা শোধ করে আমাদের ভিটে বাঁচাবার জন্যে,—আমার বাবাকে ভিটেয় মরতে দেবার জন্যে। এটুকু দয়া কর নবীন দা—কঙ্কন পরার লোকের অভাব তোমার এখন নেই—তুমি নিতে পারবে—।"

নবীন হাসলে, কঙ্কন জোড়া হাতে নিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, কঙ্কন পরার লোক আছে, আর সে লোক আনবার জন্যে ব্যগ্রতা ছিল তোমারই বেশী। আমিও সে লোকের কাছে এই আজই মাত্র কৃতজ্ঞ হচ্ছি সুরমা—সে যদি না আসত, তুমি আজ আমার বাড়ীতে পদার্পণ করতে না। আচ্ছা, এর যা দাম হয়, আমি হিসেব করে তোমায় পাঠাব এখন।"

সুরমা বললে, "সুদে আসলে দেনা অনেক হয়েছে, কঙ্কন বিক্রি করে সব দেনা শোধ হবে না। আমি বলছি, বাকি টাকাটা তুমি তোমার শ্বশুরকে দিয়ো—যত টাকা আমায় ধার দেবে, আমি তোমার বাড়ী ঝিয়ের কাজ করে শোধ দেব—কেমন?"

নবীন সুরমার পানে তাকিয়ে রইল—

সুরমা মাথা নীচু করলে—। নবীন মলিন হেসে বললে, "কথাটা তোমার মত মেয়েই বলতে পারে সুরমা। জীবনে

(শেষাংশ ৩০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিমান যুগের প্রবর্ত্তক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়

শ্রীসুধীরকুমার বসু

মাত্র ৩৬ বৎসর পূর্বে ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে অর্ভিল রাইট ও তাঁহার ভ্রাতা উইলবার রাইট তাঁহাদের যন্ত্র-চালিত বিমানে চড়িয়া আমেরিকার অন্তর্গত নর্থ ক্যারোলিনার 'কিটি হক'-এ যে সামান্য সময় মাত্র পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, তাহাতে সেদিন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ এত সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে। সেদিন দুই ভাই তাঁহাদের পরিকল্পিত বিমানে চাপিয়া উড়িবার জন্য বারকয়েক চেষ্টা করেন। চতুর্থবার তাঁহারা ৫৭ সেকেন্ড কাল পর্যন্ত বিমানে উড়িতে সমর্থ হন এবং এইভাবে বিমানে ৮৫২ ফুট অগ্রসর হন। নিজেদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অর্ভিল তখনই তার করিয়া পিতাকে তাঁহাদের এই সাফল্যের সংবাদ জানাইলেন এবং সংবাদপত্রে খবর দিবার জন্য লিখিলেন। মিলটন রাইট তাঁহার পুত্রদ্বয়ের এই সংবাদ স্থানীয় পত্রিকায়

রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়—১৯১০ সালে গৃহীত ছবি

প্রকাশার্থ পাঠাইলে সম্পাদক উপহাস করিয়া জানাইলেন—"এ আবার প্রকাশ করার কি আছে—৫৭ সেকেন্ড সময় মাত্র—তবুও যদি ৫৭ মিনিট হত।" পত্রিকা সম্পাদক সেদিন এই সাফল্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই—তাই এরূপ একটি 'Scoop' খবর হেলায় হারাইলেন। কিন্তু রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই সাফল্যই মানুষের স্বপ্নকে—বহুদিনকার রঙীন স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিল। মানুষ সত্যই পাখীর মত অনন্ত আকাশে বিচরণ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিল। গত ৩৬ বৎসরের ইতিহাসের পাতায় পাতায় মানুষের এই বিজয়-গৌরবের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

মানুষের এই বিমান অভিযানের কাহিনী আলোচনা করিতে বসিয়া উইলবার রাইট ও অর্ভিল রাইটের নাম স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। যন্ত্রচালিত বিমানকে ইহারাই প্রথম সম্ভবপর করিয়া তুলেন, সে হিসাবে ইহারা বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শকদের অন্যতম।

নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে উইলবার রাইটকে ১৯১২ সালে ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু অর্ভিল রাইট আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আজও জীবিত রহিয়াছেন এবং একান্ত অনাড়ম্বরভাবে ওহিয়োর অন্তর্গত তাঁহার ডেটনের বাসগৃহে দিনাতিপাত করিতেছেন। অর্ভিল রাইটের বয়স এখন ৬৮ বৎসর। এ বয়সেও তিনি নিয়মিতভাবে তাঁহার দৈনন্দিন কাজ করিয়া যাইতেছেন। তবে অধিকাংশ সময়েই শহর-তলীর একাংশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত তাঁহার সুন্দর শ্বেতগৃহে একান্তে বসিয়া তিনি পড়াশুনা করিয়া থাকেন। আধুনিক বিমানের আবিষ্কর্তার অন্যতম হইলেও বহুদিন তিনি কোন বিমান পরিভ্রমণ করেন নাই। নিজের পড়াশুনা ও অফিসের কাজকর্মের মধ্যেই তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছেন। প্রথম জীবনের সাফল্যের গৌরব তাঁহার মধ্যে এতটুকু অহমিকাও আনিতে পারে নাই। স্বাস্থ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি বৃদ্ধ অর্ভিল দশজনকে জীবনপথে সহায়তা করিয়া শান্ত প্রশান্ত মনে জীবনের বিশ্রাম সময় অতিবাহিত করিতে-ছেন। তাঁহার অনুগ্রহে বহু অন্নহীন অন্ন পাইতেছে, তাঁহার দানে বহু দরিদ্র শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইতেছে। ডেটনের বহু লোক নানাভাবেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

অর্ভিলের জীবনে গর্ব করিবার মত অনেক কাহিনী আছে কিন্তু সে সমস্ত তিনি নিজে অতি অল্পই বলিতে চাহেন। আত্মপ্রচার তাঁহার স্বভাব নহে। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে খুব সহজে কথা বাহির করা কঠিন। অথচ রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের অসীম ধৈর্য ও কর্মক্ষমতার কাহিনী পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

অর্ভিল রাইট প্রথম জীবনে সাংবাদিকতা শিক্ষার চেষ্টা করেন। সতের বৎসর বয়সে তিনি "ওয়েষ্ট সাইড্ নিউজ" নামে একটি চারি পৃষ্ঠা সাপ্তাহিক কাগজ পরিচালনা করেন। সম্পাদনা হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রাকর ও প্রকাশকের যাবতীয় কাজ প্রথমত তিনি একাই করিতেন। পরে যখন আর পারিয়া উঠিলেন না, তখন তাঁহার চারি বৎসরের জ্যেষ্ঠ সহোদর উইলবারকে ঐ কাজে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে সম্পাদকের কর্মভার দিয়া তিনি মুদ্রণের যাবতীয় কাজ দেখিতে লাগিলেন। 'ওয়েষ্ট সাইড্ নিউজ' পত্রিকার পর তাঁহারা একখানি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা বাহির করেন; পরে ১৮৯৪ সালে 'স্ন্যাপ্ শট' নামে একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনও প্রকাশ করেন, কিন্তু কোন-টিতেই অর্থাগমের তেমন সুবিধা না হওয়ায় তাঁহারা পত্রিকা-পরিচালন পরিত্যাগ করিয়া সাইকেলের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় সাইকেলের খুব আদর ছিল। সুতরাং তাঁহারা ডেটন শহরে "রাইট সাইকেল কোম্পানী" নাম দিয়া সাইকেল প্রস্তুত ও মেরামত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্প বয়স হইতেই উইলবার ও অর্ভিল রাইটের নানা-রূপ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার দিকে ঝোঁক ছিল। কিশোর বয়সেও তাঁহারা বাক্সের আকারে এরূপ সুন্দর ঘড়ি প্রস্তুত করিতে পারিতেন যে অপর বালকেরা অবাক হইয়া তাহা দেখিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যন্ত্রনির্মাণ শক্তির অধিকতর বিকাশ হইল এবং কালক্রমে ইহাই তাঁহাদিগকে অসামান্য সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতে লাগিল।

তখন তাঁহারা সবেমাত্র বিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহাদের মনে যন্ত্র পরিচালিত কোন কৌশলের

সাহায্যে আকাশে উঠিবার সম্ভাবনার বিষয় মনে হয়। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দুই ভাই বিমান পরিচালন সম্পর্কে প্রচলিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের দোকান ঘরের আবেষ্টনীর মধ্যে নানারূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আকাশে উড়িবার স্বপ্ন রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্বেও অনেকে দেখিয়াছেন। ইংলন্ডে পিলচার, আমেরিকায় মণ্টগোমারি, ল্যাংলি ও চ্যানিউট এবং জার্মান বৈজ্ঞানিক লিলিয়েনথাল প্রভৃতি অনেকে বিমান-বিজ্ঞানে বহুতর মৌলিক গবেষণাও করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ ইহাদের গবেষণায় তত গুরুত্ব আরোপ করে নাই। যন্ত্রচালিত বিমানের পরিকল্পনা তাহারা পাগল বা স্বপ্নবিলাসীদের খেয়াল বলিয়াই চিরদিন উপহাস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রাইট ভ্রাতৃদ্বয় অসামান্য ধৈর্য সহকারে একান্ত সঙ্গোপনে তাঁহাদের জীবনের স্বপ্ন সফল করিতে যত্নবান হইলেন। অটো লিলিয়েনথাল-এর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহারা প্রথমত 'গ্লাইডার' প্রস্তুত করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন

অরভিল রাইট

লিলিয়েনথালের অনেক 'থিয়োরী'ই ভ্রমাত্মক। সুতরাং তাঁহাদিগকে নূতন করিয়াই পরীক্ষায় নামিতে হইল।

বহু বৎসরের একান্ত সাধনায় তাঁহারা উন্নত ধরণের 'গ্লাইডার' প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিবার পাত্র ছিলেন না। আকাশে ক্ষণকালের জন্য ভাসিয়া থাকার আনন্দে তাঁহারা সুখী হইতে পারিলেন না। যন্ত্র সাহায্যে বাতাসের মধ্য দিয়া ইহাকে কি ভাবে পরিচালনা করা যাইতে পারে দুই ভাইয়ের তাহাই ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিল।

এই সময় তাঁহারা কঠোর পরিশ্রম সহকারে কাজ করিতে লাগিলেন। দোকানে কঠোর পরিশ্রমের পরেও তাঁহারা বিমান সংক্রান্ত নানারূপ পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিতেন। সাইকেলের ব্যবসায় লব্ধ প্রতিটি পাই পর্যন্ত তাঁহারা বিমান প্রস্তুতের মালমশলায় ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের এক ভগ্নী শিক্ষকতা করিতেন। তিনিও এ সময় দুই ভাইকে এজন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

সাত বৎসর কঠোর সাধনার পর তাঁহারা বিমান চালাইবার উপযোগী একটি চার-সিলিন্ডার ইঞ্জিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন ইহাতে আট অশ্বশক্তির মত ক্ষমতা পাওয়া যাইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ইঞ্জিন
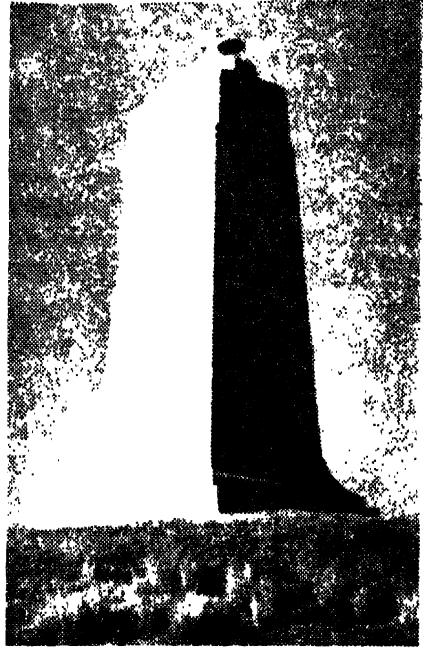
'কিটি-হকে' নির্মিত রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম বিমান-অভিযানের স্মৃতিস্তম্ভ

দ্বারা বার অশ্বশক্তির পরিচালন ক্ষমতা পাওয়া গেল। কিন্তু উহার ওজন বড় অত্যধিক ছিল। বর্তমানে বিমানে যে সমস্ত ইঞ্জিন ফিট করা হয় তাহার ওজন প্রতি অশ্বশক্তিতে এক পাউন্ডের সামান্য বেশী হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্মিত বিমানে ইঞ্জিনের ওজনই হইল ১৭৬ পাউন্ড। ইঞ্জিনসহ গোটা বিমানপোতখানির ওজন প্রায় ৭৪৫ পাউন্ড হইল। তার ও বাঁশের ফ্রেমে শক্ত করিয়া কাপড় লাগাইয়া তাহার দ্বারা পাখা প্রস্তুত করা হইল। পাখাগুলি চারি ফুট পরিমিত চওড়া ছিল। উহার বিস্তারও ৩০ ফুটের কম হইল না। তখন পর্যন্ত 'প্রোপেলার' সম্পর্কে কোনরূপ গবেষণা সুরু হয় নাই। কিন্তু এই দুই ভাই এই কাজ চালাবার মত যে যন্ত্র বিমানপোতে স্থাপন করিলেন তাহা কিম্ভূতকিমাকার হইল বটে, কিন্তু কাজে বাধা জন্মাইল না।

অতি সন্তর্পণে দুই ভাই নর্থ কেরোলিনার অন্তর্গত 'কিটিহকে' তাঁহাদের বিমানপোতখানি লইয়া উড়িতে গেলেন। এই স্থানে পূর্বে গ্লাইডারে করিয়া দুই ভাই অনেকবার আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইবার তাঁহারা ইঞ্জিন ফিট করা বিমান যন্ত্র নিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ১৯০৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁহারা প্রথম পরীক্ষায় নামিলেন। কে আগে বিমানে চড়িবেন, টস করা হইল। বড় ভাই উইলবার 'টসে' জিতিয়া বিমানে আরোহণ করিলেন। দিনটি ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, তার উপর মৃদু মন্দ হাওয়া বহিতেছিল। উইলবার বিমানে উঠিয়া যন্ত্র পরিচালনা করিলেন, কিন্তু ৩½ সেকেন্ড পরিমিত সময় মাত্র তিনি উড়িতে সমর্থ হইলেন। কয়েক ফুট স্থান অতিক্রম করিয়া বিমানটি সজোরে ভূতলে পতিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে,

তেমন দুর্ঘটনা ঘটিল না। সেই প্রথম দিনের পরীক্ষায় সাফল্য না আসিলেও ইহা দুই ভাইয়ের প্রাণে দারুণ আশার সঞ্চার করিল। তিনদিন পরে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে, তাঁহারা আবার তাঁহাদের বিমানে উড়িবার চেষ্টা করিলেন। সেদিন জোর বাতাস বহিতেছিল। বাতাসের জন্য তাঁহারা খুবই অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কোনরূপ অসুবিধাই তাঁহাদিগকে দমাইতে পারিল না। অরভিল রাইট পরম উৎসাহে বিমানে চাপিয়া যন্ত্র টিপিয়া দিলেন, বিমান সশব্দে এরূপ দ্রুত অভিযান সুরু করিল যে, উইলবার পাশে পাশে দৌড়িয়াও তাহার আর নাগাল পাইলেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে সেইদিন বিমানে তাঁহারা ৫৭ সেকেণ্ডে ৮৫২ ফুট পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বহুদিনের সাধনা এইবার সিদ্ধিলাভ করিল। তাঁহাদের আর সন্দেহ রহিল না যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির যেমন উন্নতি সাধিত হইবে, মানুষের আকাশে উড়িবার পথও ক্রমে উন্মুক্ত হইবে। আজ ৩৬ বৎসর পরে দেখিতেছি তাঁহাদের আশা সত্যিই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আজ মানুষ অনন্ত আকাশ পথেও তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উইলবার রাইট নিজেও পরে ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে ঘণ্টায় ৩৮ মাইল বেগে বিমানে চড়িয়া ২৪½ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন।

বহুদিন লোকলোচনের অন্তরালে পরীক্ষা করিয়া রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় যে সাফল্য অর্জন করেন, অবিশ্বাসী মানুষে তাহা বহুদিন বিশ্বাস করিতে চাহে নাই। ১৯০৮ সালে উইলবার রাইট তাঁহাদের প্রস্তুত 'হোয়াইট ফ্লাইয়ার' নামক বিমানে করিয়া ফরাসী-দেশে না থামিয়া একাদিক্রমে ৭৭½ মাইল পরিভ্রমণ করিলে পর রাইটভ্রাতৃদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

উইলবার রাইট জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত দিনের স্মৃতি বহিয়া অরভিল আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকদের মনে আশার ও উৎসাহের প্রেরণা জোগাইতেছেন। অরভিলের অফিস ঘরে বিমান আবির্ভাবের 'প্রথম যুগের' নানা গবেষকগণের গৌরবোজ্জ্বল দিবসের বহু চিত্র ও মূর্তি আজও শোভা পাইতেছে। অরভিল যেখানে বসেন তাহারই সামনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর উইলবারের একটি সুদৃশ্য ছবি। অপর পার্শ্বে ডেভেনপোর্টে অঙ্কিত একটি সুদৃশ্য চিত্রে দেখা যাইতেছে, Uncle Sam রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের দুই স্কন্ধে হাত দিয়া দুই ভাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন। উপরে বহু পাখী চক্রাকারে ঘুরিতেছে ও তাহাদের পায়ের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে রাশি রাশি ফুলের গুচ্ছ ছবিটির নীচে লেখা—"Your country is proud of you—yes, even the birds." বস্তুত শুধু আমেরিকাই নহে, সমগ্র জগতই আজ রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

কুজ্ঝটিকা

(৩০৪ পৃষ্ঠার পর)

একটা দারুণ বোঝা চাপিয়েছে যাকে নামানোর উপায় নেই, আবার দাসীর বোঝা চাপাবে বই কি। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি কাল তোমাদের বাড়ী গিয়ে, সব জানাব।"

সুরমা আস্তে আস্তে বার হয়ে এল।

পরদিন সকাল বেলা নবীন এসে দাঁড়াল সুরমাকে ডাক দিতেই সে এল।

একখানা কাগজ তার হাতে দিয়ে নবীন বললে,—"এই নাও সুরমা, তোমাদের বাড়ী কালই দেনার দায় হতে ছাড়িয়ে এনেছি। অবিশ্যি সুদে আসলে অনেক টাকা হয়েছে, কিন্তু সে টাকা দেওয়ার জন্যে আমি তোমায় আমার বাড়ীর দাসীর কাজ দিতে চাইনে। তার বদলে তোমায় আর একটা কাজ করতে হবে।"

সুরমা উৎসুকভাবে বললে, "বল, তুমি যা বলবে আমি করব।"

গম্ভীর হয়ে নবীন পকেট হতে কঙ্কন বার করে বললে,—"আমার প্রথম দেওয়া এই কঙ্কন তোমায় হাতে পরে থাকতে হবে, আর তোমাদের তিনজনের খাওয়া পরার ভার আমাকে বইতে দিতে হবে। আমি চাইনে—তুমি কারও বাড়ী ঝিয়ের কাজ করতে যাও। আমার এই দান দিয়ে তোমার দেহটাকে নয়—তোমার আত্মাকে আমি বন্ধক রাখতে চাই সুরমা—।"

"নবীন দা—"

সুরমা কাঁপতে কাঁপতে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখের জলে নবীনের পা দু'খানা আর্দ্র হয়ে গেল।

একদা

শ্রীচিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সহন না যায় আর প্রগাঢ় আঁধারে
আচ্ছাদিত এই জীবনেরে; বারে বারে
হতেছে সন্দেহ, বুঝি, আর নাহি আশা
অর্থহীন জীবনের সব ভালোবাসা;
লক্ষ্যহীন মনে লাগে দীর্ঘ যাত্রাপথ,
শূন্য হতে শূন্যে চলে বাসনার রথ,
থামিবার ঠাঁই নাই, নাই তৃষ্ণাবারি,
ঊর্দ্ধ্বে প্রাণ-চিহ্ন-হীন, নিম্নে মহামারী,
চতুর্দ্দিকে বুভুক্ষিত-শিবা-কলরব।
শবাসীন ব্যাভিচারী কাপালিক স্তব—
তারি মাঝে শুনিতেছি অচেনা অজানা
কণ্ঠে উঠিতেছে এই গান; একটানা
সুরে অবিরামঃ "আছে আশা, পাবে পার—
একদা খুলিবে যবে পূর্ণতার দ্বার।"

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

গিরিডী ষ্টেসনে নামিয়া বাহিরে কয়েকটা ভাড়া মোটর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সতীশ বলিয়া উঠিল, তুমি এদিকের সব ঠিক ক'রে নাও দিলীপ, আমি ততক্ষণ একটা গাড়ীতে উঠে ব'সে পড়ি।

হাতজোড় করিয়া তাহার পথ আট্‌কাইয়া ঘাড়টাকে একটু কাৎ করিয়া দিলীপ বলিল, ব্যস্ত হবেন না দাদা, মোটর, সে ত' ক'লকাতার জিনিষ, আর অবশ্য কুলিও দরকার হবে একটা—অতদূরের পথ। কিন্তু আজ তা হয় না দাদা, যে দেশের যে রীতি।

ভয় পাইয়া সতীশ বলিল, হেঁটে যেতে হবে নাকি, কতদূর?

তাহার ভয় দেখিয়া হাসিয়া দিলীপ বলিল, না, হেঁটে নয়, টাঙ্গা—এ দেশের মহাসম্মানীয় রথ।

বাহিরে আসিয়া দুইটা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া একটাতে মালপত্র-সমেত অলকাকে বসাইয়া দিয়া অপরটাতে সতীশকে লইয়া দিলীপ উঠিয়া পড়িয়া টাঙ্গাওয়ালাকে বলিল, ডাক-বাঙ্গলোতে নিয়ে চলত' বাপু, আর দেখ হে, রথটা যেন একটু জোরেই চলে।

টাঙ্গাওয়ালা সসম্ভ্রমে বলিল, বলেন কি বাবু, উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পাঁচ-ছ' মিনিটেই, সে দেখতে হবে না বাবু।

টাঙ্গাওয়ালার পিছনেই দুইজনের বসিবার মত একটু স্থান। ঘাস এবং খড়ের একটিমাত্র গদীর উপরই সকলকে বসিতে হয়। পুষ্পকরথ দুইটি চলিতে সুরু করিল।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, গাড়ী যে-দিকে চ'লেছে তার ঠিক উল্টোদিকে মুখ ক'রে ব'সে থাকা, এ যেন গাড়ী যে চ'লছে তাই নিজেকে বুঝতে না দেবার চেষ্টা, মন্দ নয়, কি বলেন দাদা?

টাঙ্গাওয়ালা মুখ ফিরাইয়া সেলাম জানাইয়া বলিল, আমার পাশের জায়গাটাতেও ব'সতে পারেন বাবু, তিনটে ক'রে জায়গা আছে প্রত্যেক গাড়ীতে।

দিলীপ বলিল, সে ত' দেখতেই পাচ্ছি বাপু, বেশ তিনজনেই চড়া যাবে খ'ন, কিন্তু টাট্টু তোমার টানতে পারবে ত'?

নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে হাসিয়া ঠাঙ্গাওয়ালা বলিল, তিনজন! ও আর শক্ত কথা কি বাবু। এই ত' সেদিন কলকাতা থেকে দু'জন বাবু এসেছিলেন, তাদের এক একজনই আপনাদের তিনজনের সমান, মোটর গাড়ী থেকে কেড়ে নিলুম তাদের, উঃ তাদের সে কি ভয়। কিন্তু হ'ল কিছু? হুঁ, সে রকম টাট্টুই নয়, এ তল্লাটে আছে নাকি এর জুড়ি!

তাহার বীরত্বব্যঞ্জক কথা শুনিয়া হাসিয়া দিলীপ বলিল, বেশ'ত বাপু, এস দেখি আজ গোটা দুয়েকের সময়, উশ্রী নিয়ে যেতে পারবে ত?

হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া লোকটা বলিল, উ আর শক্ত কথা কি বাবু, পরেশনাথ নিয়ে যেতে পারে—তিন ঘণ্টায় উড়িয়ে।

কথাটাকে এতটুকু বিশ্বাস না করিয়া দিলীপ বলিল, না হে বাপু, সে পরখে কাজ নেই আমাদের। তোমাকে যা বললুম তাই কর, এস ঠিক সময়।

'দুটো গাড়ীই আসবে ত?' লোকটা জিজ্ঞাসা করিল—

মাথা নাড়িয়া দিলীপ বলিল, কেন হে তিনজনকে না নিয়ে যেতে পারবে বললে?

লোকটা সেলাম করিয়া জানাইল, বহুত, খুব, ঠিক সময়েই এসে যাব, কিছু ভাবতে হবে না। মেহেরবাণী করিয়া কিছু বকশীশও যাহাতে তাহাকে দিতে বাবুরা ভুলিয়া না যান তাহাও সে বারকয়েক মনে করাইয়া দিল।

ডাক বাঙ্গলোয় আসিয়া গিয়াছিল। টাঙ্গা বিদায় দিয়া, বাঙ্গলোয় আশ্রয় লইয়া আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইতেও দিলীপের বিলম্ব হইল না।

বেলা প্রায় তিনটার সময় টাঙ্গাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হইলেও তাহার পক্ষীরাজের পক্ষে যে উহা অকিঞ্চিৎকর তাহা বার বার জানাইয়া লোকটা তাহাদের সমস্ত ভাবনা দূর করিয়া দিল বলিয়াই মনে করিল।

সতীশ কিন্তু মোটেই প্রসন্ন হইতে পারিতেছিল না। এ দেশে এতগুলি মোটর থাকিলেও টাঙ্গার প্রতি দিলীপের এই অহৈতুকী প্রীতি দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নিতান্ত হতাশ হইয়া সে মাথা নাড়িয়া বলিল, নাঃ, তুমিই শেষ পর্য্যন্ত আমায় মারবে দেখ্‌ছি, সমস্ত গায়ে যা ব্যথা হবে। আর ওখানে পৌঁছাতেও ত' সন্ধ্যে পার হয়ে যাবে—শুনেছি বাঘ নাকি বেরোয় মাঝে মাঝে।

টাঙ্গাওয়ালা সসম্ভ্রমে বলিল, না বাবু, বাঘ আর কই। ওদেরও ত' একটা ভয় আছে। হায়না লেক্‌ড়ে দেখা যায় মাঝে মাঝে—ও কিছু নয়। এক ঘণ্টার রাস্তা, উঠে যান্ বাবু।

একটু ইতস্তত করিয়া সতীশ টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসিয়া পড়িল। অলকা আর দিলীপ পিছনে উঠিয়া বসিতেই টাঙ্গা চলিতে সুরু করিল।

হাসিয়া দিলীপ বলিল, এ রথগুলো বেশ কিন্তু, মনে হয় যেন বসে বসে হেঁটে যাচ্ছি। যুধিষ্ঠিরের সময় থেকে এ যানটি সম্মান পেয়ে আসছে, আমরা সামান্য মানুষ দু'হাত তুলে একে কুর্নিশ করা ছাড়া আমাদের আর কি উপায় থাকতে পারে।

তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, নূতন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল একথা কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই।

দিলীপ বলিল, দাদা একেবারে চুপ করে আছেন, অভিজ্ঞতার জাল বুনছেন হয়ত।

সতীশ আর নিজেকে সংযত রাখিতে না পারিয়া বলিল, কাল আর আমার কোথাও যাওয়া হবে না। এলুম পরেশনাথ দেখতে তোমার পাল্লায় পড়ে তা নয় ত পক্ষীরাজের রথে চাপিয়ে হাড়গুলো গুঁড়ো করে ছাড়লে। আজ সারা রাত গা টিপিয়ে তবে ছাড়ব।

টাঙ্গাওয়ালা বিস্মিত হইয়া বলিল, বলেন কি বাবু, গুঁড়ো হবে কি? সেই মোটা বাবুরা পর্যান্ত বকশীশ দিয়েছেন যে।

সতীশের ইচ্ছা হইল যে বলে সেই মোটাবাবুদের কি আর হাড় আছে। কিন্তু কোন কথা বলিবারই আর তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়াই সে চুপ করিয়া রহিল।

নিতান্ত ভালমানুষের মত দিলীপ বলিল, এ-ত বেশ ভাল রাস্তা দাদা, বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে দেখবেন কেমন চড়াই আর উৎরাই।

সতীশ হতাশ হইয়া বলিল, আরও আছে?

লোকটা হাতের চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, গাড়ীর দোষ কি বাবু, রাস্তাটাই যা একটু! তা ভাবতে হবে না কিছু, একটু ঝাঁকানি লাগবে, টাট্টু আমার ঠিক আছে।

সতীশ হতাশভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, যাহা হইবার হউক সে আর কিছুই বলিতে চাহে না। দিলীপ, এমন কি অলকাও যদি হাসিয়া ইহাকে কৌতুক বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে ত' তাহার ভাবিবার কি থাকিতে পারে!

বাজারের শেষ প্রান্তে আসিয়া টাঙ্গাওয়ালা বলিল, ভাড়ার একটা টাকা দিন বাবু, একটু কাজ আছে এখানে।

দিলীপ বলিল, কি হে বাপু, পেঁছিবার আগেই টাকা?

লোকটা মাথা চুলকাইয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু যা শীত পড়বে আর টাট্টুর জন্যও কিছু সওদা করে নিতুম। আপনারাও নিন্ না কিছু খাবার কিনে।

সতীশ বলিল, তুমি দেখ্ছি আরও দেরী করাবে, আজ কপালে বাঘই লেখা আছে। অর্ব্বাচীনের পাল্লায় পড়ে কোন কাজই করতে নেই দেখছি।

দিলীপ বলিল, আমি কানে তুলো গুঁজে বসে আছি, ওতে আমার কিছু হবে না।

লোকটার হাতে একটা টাকা দিয়া অলকা বলিল, একটু তাড়াতাড়ি করে নিও, দেরী হয়ে গেলে দেখবার সময় ত বেশী পাওয়া যাবে না।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই লোকটা ফিরিয়া আসিল। সতীশ অন্যদিকে তাকাইয়াছিল, পাশের দোকানে দোদুল্যমান একটি রবারের বানরকে চোখ পিট্ পিট্ করিতে দেখিয়া অলকা সেইদিকেই চাহিয়াছিল, লোকটা যে একটা বোতল আনিয়া লুকাইয়া ফেলিল তাহা উহারা দুইজনে না দেখিতে পাইলেও দিলীপের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারিল না।

টাঙ্গা চলিতে সুরু করিল।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, খুবই শীত পড়বে, কি বল হে?

লোকটা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, কি করব হুজুর, আপনাদের মত শীতের কাপড় যে আমাদের নেই। মূর্খ গেয়োঁ লোক আমরা।

লোকটা যে অনেক দিন হইতেই বাবুদের দেখিয়া আসিতেছে এবং অনেক ভাল ভাল কথাও যে সে শিখিয়াছে সে সম্বন্ধে দিলীপের আর কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু যেকথা এইমাত্র ওই লোকটা বলিয়া বসিল তাহার সত্যই কোন সদুত্তর দিবার আছে!

অনেক দূরে চলিয়া আসিবার পর ওদেশীয় একটা ছোট্ট নদী পার হইতে হইল। কোন যাত্রী লইয়া ওই ছোট্ট খালটুকু পার হওয়া কোন পক্ষীরাজের পক্ষেই নাকি সম্ভব নয়। অলকাকে লক্ষ্য করিয়া লোকটা কিন্তু বলিল, আপনি বসে থাকুন মা, আমার টাট্টু সবার সেরা, আপনাকে নিয়ে অনায়াসেই—। লোকটা টানিয়া টানিয়া বার কয়েক হাসিয়া যেন তাহাকে ভরসা দিতে চাহিল।

অলকা এতটুকুও ভরসা পাইল না বরং তাহার টাট্টুর শক্তির কথা শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। অত শক্তিমান টাট্টু যে কখন সোজা রাস্তা ফেলিয়া অসমান রাস্তা দিয়া দৌড়াইতে সুরু করিয়া দিবে তাহা কে বলিতে পারে!

অলকাকে নামিয়া পড়িতে দেখিয়া একটু দুঃখিতভাবে লোকটা বলিল, টাট্টুকে বিশ্বাস হ'ল না মা।

অলকা কিন্তু স্বান্ত্বনা দিবার জন্য বসিয়া থাকিতে পারিল না, এপারে আসিয়া খানিকটা হাঁটিয়া শরীরের জড়তা কাটাইয়া আবার তাহারা উঠিয়া বসিল।

হাতের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল আর কতক্ষণ লাগবে বাপু?

'আর বাবু এসে গেছে।' লোকটা উত্তর করিল।

আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

দুই চারিটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ সাঁওতাল শিশু টাঙ্গার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাদের একত্র কলধ্বনির মধ্য হইতে 'পয়সা' কথাটাই বার বার কানে আসিতে লাগিল।

টাঙ্গাওয়ালা বলিল, দিয়ে দিন মা, দু'একটা পয়সা, নয়ত' এমনি ক'রে ওরা মাইলখানেক ছুটে আসবে।

হাসিয়া হাত বাড়াইয়া অলকা তাহাদের ডাকিতে লাগিল। উৎসাহে, আনন্দে তাহারাও হেলিয়া দুলিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিছু যে মিলিবে সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই তাহাদের ছিল না, এমনি করিয়া কেহ তাহাদের ডাকে নাই। অলকা প্রত্যেকের জন্য একটা করিয়া পয়সা ফেলিয়া দিল, তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, কেহ পাইল না, কেহ বা বেশী পাইল। অপরকে বঞ্চিত করিবার সুযোগ পাইলে কেহ ছাড়িয়া দেয় না, দূর গ্রামের প্রান্তে থাকিয়া ইহারাও স্বতসিদ্ধভাবেই তাহা শিখিয়া ফেলিয়াছে। দূরে আরও কয়েকটা উলঙ্গ ছেলে মেয়েকে আসিতে দেখা গেল।

দিলীপ তাহাদের আসিতে দেখিয়া বলিল, একটু জোরে চালাও হে, শেষকালে কি এখানেই আট্‌কে পড়তে হবে নাকি?

টাঙ্গা আগাইয়া চলিল। আরও মিনিট পনের কাটিয়া গেল। ছোট্ট একটা লাঠি হাতে অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটি বার তের বৎসরের ছেলেকে তাহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখা গেল।

দিলীপ তাহাকে দেখিয়া বলিল, এরা দেখছি ব্যাধির মত, গন্ধও পায় ত' বেশ।

তাহার দিকে ফিরিয়া টাঙ্গাওয়ালা বলিল, ও বাবু পয়সা চাইতে আসছে না, ও আসছে আপনাদের উগ্রীতে পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাবার জন্যে। দু'আনা পয়সা পেলেই ও আপনাদের সব ঠিক্ ঠিক্ দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

সতীশ বলিল, তবে এসে গেছে বল?

লোকটা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আধ মাইল আর হবে।

ততক্ষণে ছেলেটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। সাঁওতালের শরীরের সে লাবণ্য তাহার দেহে নাই, সভ্যতার মাঝে আসিয়া দেহের স্বাস্থ্যকে ইহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেটা টাঙ্গার পাশে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, উশ্রী যাবি ত বাবু, হামি পথ দেখাইয়ে লিয়ে যাব।

টাঙ্গা থামাইতে আদেশ দিয়া দিলীপ বলিল, উঠে এস হে বাপু, এমনি ক'রে আর কতক্ষণ দৌড়বে।

ছেলেটা তাহার কথা না বুঝিলেও তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, নেঁহি বাবু, হামি ঠিক আছি, তুরা চল্ না।

টাঙ্গাওয়ালাও হাসিয়া বলিল, ওদের এই অভ্যেস বাবু, বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখলেন ত' একটা পয়সার জন্যে কত মেহনৎ করে।

এমনি করিয়া অর্দ্ধমাইলেরও উপর দৌড়াইয়া আসিয়া বাবুদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ইহারা তাহাদের সুখ-সুবিধা করিয়া দেয় এবং তাহারই পরিবর্ত্তে দুই এক টুক্‌রা রুটি এবং আনা দুই পয়সা লইয়া সানন্দে গৃহে ফিরিয়া যায়।

ধীরে ধীরে টাঙ্গা থামিয়া গেল। তাহারা তিনজনেই নামিয়া পড়িল, ছেলেটা একটু পিছাইয়া আসিয়া হাতের ছোট লাঠিটাকে কাঁধের উপর ফেলিয়া বলিল, তুদের সঙ্গে ধোঁয়া কল নাই?

দিলীপ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কি দরকারই বা তার?

ছেলেটা ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া হাসিয়া বলিল, হামার সঙ্গে টাঙ্গি ভি নাই। আচ্ছা চল্, শের কুথাকে মিলবে?

সতীশের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, অলকা তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

দিলীপ তাহার হাসি দেখিয়া বলিল, যাকে ঠাট্টা ক'রেই হাস না কেন দিদি, বিপদের ভয় কিন্তু তোমার জন্যই বেশী।

অলকা হাসিয়াই বলিল, আমি ত' আর সাধারণ মেয়েদের মত বোঝা নই ভাই যে আমার জন্যে তোমাদের ভেবে সারা হ'তে হবে।

দিলীপ বলিল, অসাধারণটাই বা কিসে?

অলকা বলিল, তাত' জানিনে ভাই, কিন্তু নিজেকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, সদুত্তর হয়ত মিলতেও পারে। তারপর হঠাৎ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া সে ছেলেটার দিকে চাহিয়া বলিল, তোর নাম কিরে?

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া ছেলেটা উত্তর করিল, হামি লছমন আছি মা।

পকেট হইতে একটা ধারাল বড় ছুরি বাহির করিয়া পথের দুই পাশের শালগাছের মধ্য হইতে তিনটা লাঠি কাটিয়া উহাদের দুইজনের হাতে দিয়া এবং নিজেও একটি সামরিক প্রথায় কাঁধে তুলিয়া লইয়া দিলীপ বলিল, এইবার আক্রমণকারীরা প্রস্তুত, অভিযান সুরু হ'ক, চল হে দূত।

চলিতে চলিতে অলকা বলিল, বাঘ এলে কি লাঠিরই জয় হবে নাকি!

হাসিয়া দিলীপ বলিল, না সে-সময়ে তোমাকে সামনে রেখে আমরা পিছু হ'টে আসব, ধর্ম্মযুদ্ধে নারীর গায়ে হাত তোলা নিষিদ্ধ, তুমি ত বেঁচে যাবে, আমরাও।—

অলকা বলিল, পুরুষদের পক্ষে সে খুব আশ্চর্য্যের নয়।

উশ্রীর ধারে পেঁাছিয়া ছেলেটা বসিয়া পড়িয়া বলিল, তুরা ঘুরে দেখ, হামি এখানেই আছি।

কিন্তু কোথায়ই বা ঘুরিয়া বেড়াইবে, দিলীপ খানিকক্ষণ লাফালাফি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

সতীশ বলিল, কি যে হ'ল এখানে এসে, কি আছে দেখ্‌বার?

দিলীপ বলিল, এ ত' কলকাতা নয় দাদা যে খানিক ভিক্টোরিয়া হল দেখে বেড়াবেন। আমার ত মনে হয় ওই পাথরটার ওপর শুয়ে শুয়েই আমি রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতে পারি। আপনার লেখা পড়ে কি করে যে লোকে আনন্দ পায় তা' তা' ভেবে পাইনে।

এইবার সতীশ হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

অলকা জলের ধারে গিয়া বসিয়াছিল, উপর হইতে জল নীচে আসিয়া পড়িতেছে আর জলকণা ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া ফেণার সৃষ্টি করতেছে। তাহার শাড়ী ভিজিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তথাপি সেই স্থান ছাড়িয়া সে উঠিয়া যাইতে পারিতেছিল না।

দিলীপ সেই দিকে চাহিয়া বলিল, একেবারে ভিজে যাবেন যে দিদি, ফেরবার সময় শীত কেমন লাগে বুঝবেন। আমার চাদরটাও দিতে পারব না কিন্তু।

অলকা হাসিয়া বলিল, দিতে হবে কেন ভাই, লাগলে আমি কেড়েই নিতে পারব।

সতীশ শঙ্কিত হইয়া বলিল, পড়ে গেলে কিন্তু—

পড়িয়া গেলে যে কি হইবে তাহা না বলাই ভাল। জল যে খুব উপর হইতে আসিয়া পড়িতেছে তাহা নহে কিন্তু যেভাবে আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে একবার ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গেলে জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়।

লছ্‌মন দূরে হইতেই বলিল, ছবি তুলবিনে তুরা! ফুটুস্ করে যে ফটোক ওঠে সে নাই তুদের কাছে?

দিলীপ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না সে-সব নেই।

লছ্‌মন ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, তবে তুরা কি বাবুরে? কত কত বাবু আরও আস্‌ছে, হামার ভি ফটোক্ লিছে, পাঠাইয়া দিবে বলে ঠিকানা ভি লিছে।

হাসিয়া অলকার দিকে একবার চাহিয়া দিলীপ বলিল, পাঠিয়েছে নাকি রে, দেখাবি?

ঘাড় নাড়িয়া লছ্‌মন জানাইল যে, যদিও অনেকদিন হইয়া গিয়াছে কেহই তাহাকে ছবি পাঠায় নাই, তথাপি ছবি যে আসিবেই, সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এমনি করিয়া ফাঁকি দিবার কোন কারণই দিলীপ ভাবিয়া পাইল না। আজিও ইহার ভরসা আছে, বাবু যাহারা

তাহারা মিথ্যা বলিবে না, এই বিশ্বাসে আজিও সে হয়ত উৎসুক হইয়া আছে, সমবয়সী এবং মাতব্বরদের নিকটে সে সেই ছবি দেখাইয়া কেমন গর্ব্ব অনুভব করিবে, তাহাও হয়ত সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, ভবিষ্যৎ যে তাহার জন্য কি লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে, ভাবিয়া দিলীপ সত্য-সত্যই দুঃখিত হইল। নিজেদেরই গোষ্ঠির ভদ্র-সন্তানদের কথা মনে করিয়া সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। ফটো তুলিবার যন্ত্র যাহাদের সঙ্গে না থাকে, তাহারা কি রকম বাবু, তাহা আজ ওই ছেলেটি ভাবিয়া পায় না, একথা মনে হওয়ায় সে আনন্দিতই হইল। বাবুর পর্য্যায়ে পড়িয়া ভবিষ্যতে উহারই চক্ষে সে ছোট হইয়া যাইতে চাহে না।

অকস্মাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া দিলীপ বলিল, এখানে এই উশ্রীর মূর্ত্তি দেখে নদীটা সম্বন্ধে একটু ভাল ধারণাই হয়, কিন্তু আসল নদীটায় পায়ের পাতাও ডোবে না। মানুষের মাঝেও হঠাৎ যে সাজসজ্জা চোখে পড়ে, তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু তার আসল দৈন্যটা ধরা পড়ে একটু তলিয়ে দেখলে। যাক্‌গে, অন্ধকার হ'য়ে আসছে, এবার উঠে পড়ুন দাদা।

অলকা হাসিয়া বলিল, ভয় কি, লাঠিই ত আছে, বাঘ এসে ক'রবে কি?

দিলীপও হাসিয়া বলিল, লাঠি হ'চ্ছে সাপের জন্য, বাঘের জন্যে ত তুমিই রয়েছ।

সতীশ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না, আর দেরী ক'রে কাজ নেই। বাঘের চেয়েও শীতের ভয় আমার বেশী, সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে।

ফিরিয়া আসিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। লছ্‌মনের হাতে একটা আধুলি গুঁজিয়া দিয়া অলকা বলিল, সত্যি শীতটা একটু বেশীই প'ড়েছে, দেরী করা ভাল হয় নি।

লছ্‌মন বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া সে মাথা নোয়াইয়া অলকাকে প্রণাম জানাইল।

টাঙ্গা চলিতে আরম্ভ করিল, লছ্‌মন গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে মাঠের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিল।

সেদিকে চাহিয়া দিলীপ বলিল, এরা বড় গরীব দিদি, এই শীতে গায়ে দেবার মত এতটুকু কাপড়ও জোটে না, সম্বল হচ্ছে গান আর ছুটে চলা। জঙ্গল থেকে পাতা আর কাঠ কুড়িয়ে এনে তাই জ্বালিয়ে ছেলে-বুড়ো চুপ ক'রে ব'সে থেকে পুরনো দিনের গল্প করে।

অলকা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু স্বীকার না করিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যাইত। সেই উলঙ্গ শিশুগুলির কথা তাহার কেবলি মনে হইতেছিল। এই শীতে তাহাদের অমনি উলঙ্গই থাকিতে হয়, এতটুকু বস্ত্র দিয়া কেহ তাহাদের সযত্নে ঢাকিয়া দেয় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুঁড়ের সম্মুখে যে আগুন জ্বালিয়া সকলে বসিয়া থাকে তাহারই একপাশে হয়ত ইহারা বসিয়া বসিয়াই ঢুলিতে থাকে। ইহাদেরও মা আছে। অলকা নিজেও নারী, মায়ের মনের প্রতি কথাই তাহার নিজের ভিতরও লুকাইয়া আছে। দূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে যে-সব কুটীর নজরে পড়ে, অলকা সেইদিকে চুপ করিয়া চাহিয়াছিল। উহারই কোন কোনটার ভিতর সেই শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পয়সার কথা আর তাহাদের মনে নাই, গৃহে পৌঁছিয়াই মায়ের হাতে হয়ত তাহারা নিজেদের সম্পত্তি তুলিয়া দিয়াছে, যাহারা দেয় নাই, অজস্র মার খাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের লুব্ধ মায়েরা সেই অবসরে তাহাদের মুঠি খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া লইয়াছে। অলকা আর ভাবিতে চাহে না, কিন্তু ভাবনাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছিল না। গাড়ীর একপাশে মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পরেরদিন খুব ভোরে চা-পানের পর তাহারা তিনজনেই মোটরে উঠিয়া বসিল। আজ অভিযানের শেষ দিন। পুরাতন কয়লা-খনির পাশ দিয়া পোল পার হইয়া নির্জ্জন রাস্তাকে সচকিত করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

দুই পাশের জঙ্গলের দিকে চাহিয়া দিলীপ বলিল, একদিন এখানে বাঘ ছিল, আজকালও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, আর ছিল ডাকাতের দল। আজ কিন্তু প্রায় সব কিছুই শেষ হ'য়ে গেছে।

ড্রাইভার বলিল, এই ত কিছুদিন আগেও কয়েকটা ধরা পড়েছে বাবু। পুলিসকে কিন্তু বড় ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল তারা।

অন্যমনস্কের মতই দিলীপ বলিয়া চলিল, একদিন এখানে মেরে পুঁতে রাখলেও টের পাওয়া যেত না, আজ আর সে-সব হবার যো নেই। তাদের অনেকেই জেলের মধ্যে প'চছে, কেউ হয়ত সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। ভাল হ'য়েছে কি মন্দ হ'য়েছে তা কিন্তু আজও আমি ভেবে পাইনে দিদি।

সতীশ বিস্মিতভাবে বলিল, তার মানে?

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া দিলীপ তেমনিভাবেই বলিয়া যাইতে লাগিল, প্রতুলদা বলেন, সমস্ত মানুষকে সমান করে দিতে হবে, পরস্পরকে ঈর্ষা করার কোন কিছুই যেদিন না থাকবে, সেদিন সব ঠিক হয় যাবে। একথা আমি বিশ্বাস করি দিদি, নিজের মনেও আমি ...তা বুঝি— সেদিনটা কিন্তু দেখে যেতেই হবে।

পরেশনাথ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। ওই উচ্চে তাহারা উঠিয়া যাইবে, এখান হইতে যাহা দেখা যায় না, তাহারই পাশ দিয়া ছুঁইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আগাইয়া যাইবে। আনন্দে অলকার বুকের ভিতরে যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এমনি করিয়া উচ্চে উঠিবার বাসনা যে প্রথম কাহার মনে জাগিয়াছিল, তাহা সে জানে না, কিন্তু তাহার মনের আকাঙ্ক্ষা যে কত বড় ছিল, তাহা সে এতটুকু না ভাবিয়াও বলিয়া দিতে পারে। মানুষের মনে চিরকালের জন্য সে আকাঙ্ক্ষার বীজ যে সে রাখিয়া গেছে, এজন্য সে তাহার কাছে মনে মনে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারিল না।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, কত উঁচু হবে ওটা?

দিলীপ হাসিয়া বলিল, সেটা এমন কিছু বেশী নয়

যে মনে ক'রে রাখতে হবে। উঠতে কষ্ট হবে না, সোজা রাস্তা বাঁধা আছে, তবে পা একটু ব্যথা করতে পারে।

অলকা বলিল, অনেক উ'চু ব'লে মনে হচ্ছে না?

সতীশ বলিল, বেশ উ'চু, পায়ের কথা থাক্, আমার ত মাথা ব্যথা আরম্ভ হ'য়ে গেছে এখন থেকেই। পরের কথা শুনে কোন কিছু করাই পাপ দেখছি।

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া দিলীপ বলিল, আপনার এ-সব মতামত আমি বিশ্বাস করি না দাদা, ওপরে উঠে হয়ত আপনি নিজেই এমন চুপ করে বসে চারদিকে চেয়ে দেখবেন যে, আপনাকে তোলাই মুস্কিল হয়ে পড়বে। দিদিরও কি ওই মত নাকি? কতক্‌গুলো অসুধ নিয়ে এলে হ'ত দেখ্‌ছি।

অলকা বলিল, না আমার ও মত নয়। আমি ভাবছি, ওই রাস্তাটার কথা। এই যে আমরা মোটরে চ'লেছি, যে রাস্তাটি দিয়ে, সে রাস্তা দিয়ে কত লোকই না গেছে; কিন্তু ওপরের ওই রাস্তা দিয়ে গেছে আরও অনেক কম লোক, আমিও সেই কমেরই একজন। আমার সত্যি আনন্দ হ'চ্ছে ভেবে যে, ওই ওপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাকতে পারব। ওপর থেকে একটা ছোট পাথর গড়িয়ে দিতে পারব নীচে, আর সেটা কি জোরেই না নেমে আসবে, আমিই ফেলেছি সেটা, সত্যি খুব ভাল লাগছে আমার। আচ্ছা, কতক্ষণ লাগবে উঠ্‌তে?

দিলীপ বলিল, প্রায় ছ'মাইল রাস্তা, ঘণ্টা দুই আড়াই হ'লেই চলে, তবে আজ আমাদের তিন ঘণ্টারও ওপর লাগবে। সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অলকাও হাসিয়া বলিল, আমি কিন্তু খুব বেশী পিছিয়ে প'ড়ব না।

সে দেখা যাবে। দিলীপ হঠাৎ সতীশের দিকে ফিরিয়া বলিল, একটা ডুলি নিলে ভাল হ'ত না দাদা? পথ ত আর সোজা নয়, ওপর দিকে উঠ্‌তে হবে।

অলকার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, নেওয়াই উচিত, তবে তুমিই ত নেতৃত্ব পেয়েছ, আমার কথা কি টি'কবে? নেতার কথা তবু না হয় মান্‌তে পারে কেউ, কেউ, দেখ না ব্যবস্থা ক'রে।

অলকা জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ওসবে চ'ড়ে যেতে আমি পারব না, তাঁর চেয়ে গাড়ীতে ব'সে থাকতেও আমি রাজী আছি।

দিলীপ বলিল, তোমার একার জন্যেই নয় দিদি, উনিও ব'সতে পারবেন মাঝে মাঝে।

সতীশ ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না দিলীপ, প্রতুলের সাক্‌রেদী অনেকদিন আমিও ক'রেছি। সে তোমাদের দাদা, কিন্তু আমার কাছে আজও প্রতুল হ'য়েই আছে। ভয় শুধু আমি করি আমার চোখ দুটোকে আর কিছুকেই নয়।

দিলীপ লজ্জিত হইয়া বলিল, মাপ করবেন দাদা, ওকথা আর আমি ব'লব না।

অলকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী আসিয়া পাহাড়ের নীচে ধর্ম্মশালার সম্মুখে থামিল। দিলীপ নামিয়া পড়িয়া ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমরা মন্দিরগুলো ঘুরে আসি, ততক্ষণে তুমি একটা গাইড ঠিক ক'রে ফেল। তারপর তোমাকে নিমিয়া-ঘাটের দিকে গাড়ী রাখতে হবে, ফেরবার সময় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডটাও ঘুরে যাব।

তাহারা তিনজনে মন্দিরে প্রবেশ করিল। পরেশনাথ, মহাবীর প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি চারিদিকেই সাজান রহিয়াছে, চক্ষে সাধারণ পাথরের বদলে মুক্তা প্রভৃতি বসান। ধনী জৈনদের ধনী দেবতা! বহু নারী দামী শাড়ী আর গহনা পড়িয়া মুখে কাপড় বাঁধিয়া দেবতার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কলিকাতার সুসজ্জিত দোকানে এরূপ দামী শাড়ী সহজে চোখে পড়ে না। পরেশনাথ পাহাড়ের তলায় চারিদিকের নিস্তব্ধতার মাঝে মন্দিরের কার্য্যে ব্যস্ত এইসব রূপসীদের দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের অটুট স্বাস্থ্য দেখিয়া বাঙালী নারীদের জন্য দুঃখ হয়।

অলকা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ওরা মুখে কাপড় বেঁধে কাজ ক'রছে কেন?

হাসিয়া দিলীপ বলিল, দেবতার শুচিতা বজায় রাখবার জন্যে। অদ্ভুত ওদের ধারণা, মনে করে এতেই বুঝি দেবতা খুসী হবে। ধনী ব্যবসাদারদের ঘরণী ওরা, ঠিক তাদের মত ক'রেই বিচার করে। মানুষকে লুণ্ঠন ক'রে যে পাপ হয়, মনে করে এমনি ক'রে দেবতাকে সাজিয়ে রাখলেই সে পাপ ক্ষয় হ'য়ে যাবে।

সতীশ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল।

ধর্ম্মশালা ছাড়াইয়া মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের পাশেই একটা ঘরে কয়েকজন লোক বসিয়া বসিয়া লাল মোটা খাতায় কি সব হিসাব লিখিতেছিল।

বাহির হইয়া আসিয়া অলকা বলিল, ব্যবসায়ের লোভ এদের কিছুতেই যায় না, এখানে ব'সেও হিসেব না ক'সলে যেন শান্তি নেই।

দিলীপ বলিল, ওটা দেবতার ব্যবসা দিদি, পাহাড়ের ওপর যে-সব গাছ আছে, তা থেকেও এরা রস নিংড়ে নেয়। ধর্ম্মপ্রীতি ওদের খুব বেশী ব'লেই দেবতার কাজে নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় ওদের থাকে না।

বাহিরে আসিয়া দিলীপ বলিল, ওদিকে চলুন, আর একটা মন্দির আছে। এদের মধ্যেও দুটো সম্প্রদায় আছে যে। এদের ঝগড়া কোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়।

সতীশ বিস্মিত হইয়া গেল। অহিংসার প্রতীক ইহারা, ইহাদের মধ্যেও বিবাদের বিরাম নাই?

দিলীপ বলিল, সব সময়ে এরা অহিংস থাকে না, তবে হিংসা ক'রতে যেটুকু সাহসের দকার হয়, তাও বোধ হয় এদের নেই, পরকালের ভয় এদেরই বেশী কি-না। মাটির পৃথিবীতে

সব চেয়ে আরামপ্রদ যে মোটর যান তাতেই চ'ড়ে বেড়িয়ে এবং আরও বহুবিধ উপায়ে আরাম উপভোগ ক'রে স্বর্গের মাটি-হীন জমিতে কষ্ট করার ইচ্ছে এদের নেই। স্বর্গের হাওয়া-গাড়ী না-কি মেঘ, তারই এক আধ টুকরো পাবার জন্যে ভগবানকে ভেট দিতে এরা কসুর করে না। তাই ত' লাঠির বদলে এরা অহিংস থেকে আইনের কাছে বিচার চায়।

'যার যা নেশা।' সতীশ আপন মনে বলিয়া উঠিল।

হাসিয়া দিলীপ বলিল, নেশা হয়ত' সত্যি, কিন্তু নিজেদের ঠকিয়ে এবং পরকে ঠকিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমক ক'রে ওরা নেশার গুণগান ক'রে বেড়ায় ব'লেই না আমরা মাঝে এসে পড়ি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাতলামি করলে পুলিশের হাতে পড়তেই হয়।

দুই সম্প্রদায়েরই মূর্ত্তি এক, তবে ওদের দেবতার গায়ে কোন আভরণ নাই, আবরণও নাই—ওরা দিগম্বরী সম্প্রদায়। চক্ষে একই রকম মুক্তা বসান, একই রকম সব কিছু হইলেও মামলা বাধিতে বিলম্ব হয় না।

প্রধান মন্দিরের মেঝেতে টাকা, আধুলী গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। দেবতার মন্দিরে আসিলে টাকা পায়ের তলার বস্তু হইয়াই পড়ে, ইহাই হয়ত' তাহারা জানাইতে চায়, অথবা সম্প্রদায়ের বিশেষত্বের জন্য দেবতার গায়ে আভরণ দিতে না পারিলেও দিবার ক্ষমতা যে তাহাদের আছে, ইহাই বুঝাইয়া দিয়া মনের মধ্যে আনন্দ অনুভব করিতে চায় হয়ত'। কি যে তাহারা বুঝাইতে চায় তাহা না জানিতে পারিলেও ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে অর্থের জন্য তাহাদের কোন কিছুই আটকাইয়া থাকে না। সমস্ত কিছু দেখিয়া শুনিয়া দিলীপের হাসি পাইতেছিল, ইহা সে পূর্ব্বে হইতেই জানিত, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখাও যায় না।

নিজের মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য সে বলিল, এরকম একটা থাকবার জায়গা যদি পেতাম কি আরামই না হত। চকচকে মেঝের ওপর টাকা বসান, তারই ওপর শুয়ে থাকা, আঃ।

তাহার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লুক্কায়িত ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া অলকা বলিল, কোন কিছুই কি তুমি ভাল চোখে দেখতে পার না? সমালোচনা করাটা বুঝি স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে?

হাসিয়া দিলীপ বলিল, তুমিই কি ভাল চোখে দেখতে পারছ দিদি?

অলকা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, জানি না।

'জানি না নয়, বলব' না।' দিলীপ সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করিয়া দিল।

তাহার কণ্ঠে একটা প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া অলকা আর কোন কথাই কহিল না। স্তব্ধভাবে সে পরেশনাথজীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাথরের সে মূর্ত্তি হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু স্থির হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইল মূর্ত্তি কাঁদিতেছে। তাহার মাথার ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। বিশ্বমানবের কল্যাণে তাঁহারা আসিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সকলের কল্যাণ হরণ করিয়া নিজেদের এ-কল্যাণ দেখিয়া না কাঁদিয়া আর তাঁহারা কি করিতে পারেন? সকলের মনের মধ্যে আসন পাতিবার আর তাঁহাদের কোন উপায়ই নাই, মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ শুচিতা আঁকড়াইয়া ধরিয়াই তাঁহাদের টিঁকিয়া থাকিতে হইবে।

বাহিরে আসিয়া অলকার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া দিলীপ বলিল, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দুটো সিপাহীর মূর্ত্তি দেখেছেন ত' দিদি? হাতে তাদের আবার বন্দুকও আছে, অহিংসার প্রতীক, কি বলুন? শুনেছি পাহাড়ের ওপর বন্দুক নিয়ে যাবার হুকুম নেই। এখানে কিন্তু সে বালাই নেই, মন্দিরের দরজা কিনা।

অলকা কোন কথাই না বলিয়া অত্যন্ত ম্লানভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দিলীপ বলিল, দুঃখ দিলুম কি?

অলকা মাথা নাড়িয়া বলিল, দুঃখ সত্যি কিন্তু তাতে তোমার কোন হাত নেই। এসব যেন আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রেই ছিল। এ আশা করিনি, নিজের চোখে না দেখলে কারও কাছে শুনেও বিশ্বাস করতুম না, হয়ত' তোমার প্রতুলদার কথাও নয়। আজ কিন্তু একটা জিনিস পরিস্কার হ'য়ে গেল, আসলে যে যাই হক না কেন, ভক্তরাই তাকে নামিয়ে আনে, বিকৃত ক'রে ফেলে। আজকের দুঃখ কোনদিনই ভুলব' না।

দিলীপ বলিল, দুঃখের ভেতর দিয়েই আসল জিনিষটা চোখে পড়ে দিদি। কোন আনন্দই আজ পর্য্যন্ত দুঃখের সংস্পর্শে না এসে খাঁটি হতে পারেনি।

ড্রাইভার যে লোকটিকে গাইড ঠিক করিয়াছিল সে নিকটে আসিয়া অলকাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সে যে এ-কাজে পাশ হইয়া গেছে তাহা তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়াই বোঝা যায়। নারী জাতীকে খুসী করিতে পারিলেই যে ভাল বখসীস্ মেলে সে অভিজ্ঞতা সে পূর্ব্বেই সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটার তামাটে রং, শক্তিশালী মাংসপেশী চতুরতা মাখা চক্ষু দেখিয়া তাহাকে কাজের লোক বলিয়াই মনে হয়। আঁটিয়া কাপড় পড়া, গায়ে আর একখানা কাপড় জড়ান, হাতে মাথা পর্য্যন্ত উঁচু বাঁশের লাঠী আর সর্ব্বোপরি তাহার সরলতা মাখা মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাহাকে বিশ্বাস করিলে ঠকিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, কত নিবিরে? যা লাঠী হাতে নিয়েছিস্ ওপরে উঠে মাথায় বসিয়ে দিবিনে ত'!

লোকটা হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, কি বলেন বাবু, এ লাঠী ত' আপনাদের মাথা বাঁচাবার জন্যে। যা খুসী দিবেন, আমি বাবু আপনাদের চাকর আছি।

মোটর ড্রাইভার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, আট আনা দিলেই খুসী হ'য়ে যাবে।

অলকা বিস্মিত হইয়া গেল। সমস্ত বোঝা কাঁধে লইয়া এই ছয় মাইল রাস্তা পথ দেখাইয়া

(শেষাংশ ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

(ভ্রমণ কাহিনী পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পুণার কথা

তিন

সিংহগড়

পুণা শহরের যে কোন স্থান হইতেই সিংহগড় দুর্গটি দেখা যায়। সব পাহাড়ের উপরে মাথা তুলিয়া সিংহগড় দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গের প্রাকার দূর হইতেই সুস্পষ্ট দেখা যায়। পুণা হইতে সিংহগড়ের দূরত্ব মাত্র দশ বারো মাইল। পুরন্ধরের দুর্গটির দূরত্ব হইবে পুণা হইতে প্রায় কুড়ি মাইল। সিংহগড় বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু সিংহগড়ে আজকাল কেহ বড় একটা থাকে না। শুধু মাঝে মাঝে ভ্রমণকারীরা প্রায় ৪,৪০০ হাজার ফিট পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া নির্জ্জন সেই দুর্গের প্রাঙ্গণে ইতস্তত বেড়াইয়া চারিদেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও সিংহগড় দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ইন্দারার সুপেয় জল পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাকেন।

সিংহগড়কে পুণার লোকেরা বলেন "কোন্দানা" (Kondana) সিংহগড় পর্ব্বতের উপরে উঠিতে রীতিমত ক্লেশ হয়, কেননা পাহাড়ে উঠিবার পথ তেমন ভাল নহে। তারপর দুর্গের নীচের দিকে প্রায় ২০০ দুইশত ফিট পর্যন্ত স্থান এমন খাড়া ও শিলা-সঙ্কুল যে, ঐ দিক্ দিয়া পাহাড়ে উঠিতে পারে এমন ক্ষমতা কার? দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের গায়ে কামান দাগিবার জন্য অনেকগুলি গর্ত্ত আছে, মাঝে মাঝে প্রাকার স্তম্ভ আছে। প্রাকারের গা হইতে ইট ও পাথর খসিয়া পড়িতেছে। গুল্মরাজি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কতকগুলি পুরানো কামান, গুটিকয়েক বাঙ্গলো আর অনেক জলাশয় আছে। সিংহগড় দুর্গের দুইটি মাত্র তোরণ। একটি উত্তর দিকে, অপরটি দক্ষিণ দিকে। উত্তর দিকের তোরণটির নাম 'পুণা দরওয়াজা' বা Poona Gate আর দক্ষিণ দিকের তোরণটি কল্যাণ তোরণ বা Kalyan Gate নামে পরিচিত। দুইটি দুর্গ তোরণই এক সময়ে বেশ সুরক্ষিত ছিল। এই দুইটি তোরণ পথে সহজে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। সৈন্যদল পরিচিত পার্ব্বত্য-পথে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিত, সে পথ তাহাদের জানা ছিল।
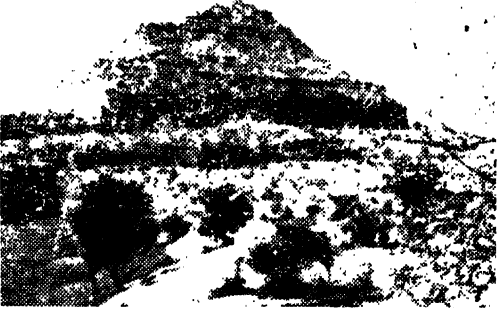
সিংহগড় দুর্গের ভিতরকার দৃশ্য

আমি পুণার যেদিকে বেড়াইতে যাইতাম, সেখান হইতেই অপলকে সিংহগড়ের উচ্চ-চূড়ার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। সমতল-ক্ষেত্রের সবুজ প্রান্তদেশ হইতে স্তরে স্তরে পাহাড় একটির পর আর একটি সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। পুণা শহর হইতে যে দিকেই দৃষ্টি করিবে, সেদিকেই দেখিবে—শ্যামল-সুন্দর গিরিশ্রেণী—পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া উৎসুক-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। সিংহগড়ের দিকে তাকাইয়া বারবার আমাদের বন্ধু কবিবর যতীন্দ্র-মোহনের সিংহগড় কবিতাটি মনে পড়িতেছিল:—

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর;
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ংকর।
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী,—
"সিংহগড়, মাতা, ফিরি লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে—প'ড়ে আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর।'

এখানেও লোকের মুখে মুখে এ কাহিনী শুনা যায়।

শিবাজীর আমলে সিংহগড় ছিল, গড়ের মত গড়, দুর্ভেদ্য ও দুর্জ্জেয়। এই গড়ের উপর হইতে দক্ষিণে ভোরঘাট ও সাতারার সুবিস্তৃত মালভূমি চোখে পড়ে। উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় পুণা শহরটিকে যেন একটি শ্যামলতরুপল্লব সমাকীর্ণ মনোহর উদ্যানের ন্যায়। পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইবে কল্যাণ অধিত্যকা। পূর্ব্বে দিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। এখান হইতে শিবাজী নির্ম্মিত তোরণ, পুরন্ধার প্রভৃতি দুর্গও চক্ষে পড়ে। এমন একদিন ছিল, যখন এই সিংহগড় দুর্গ সৈন্যগণের কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত! এমন একদিন ছিল, যখন কোন অরাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পুণাবাসীরা সকলে আসিয়া এই সিংহগড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। এখান হইতেই শিবাজী শত্রু দলকে পর্য্যুদস্ত করিতেন। মোগলের সহিত শিবাজীর যখন ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছিল, সে সময়ে (১৬৬২—১৬৬৬ খৃঃ অঃ) শিবাজী মোগল সেনাপতি রাজা জয়সিংহকে অন্যান্য কয়েকটি দুর্গের সহিত সিংহগড় দুর্গটিও হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সিংহগড় দুর্গ শিবাজীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি গল্প আছে। এইখানে সে কাহিনীটি বলিতেছি।

ভ্রমণ কাহিনী লিখিতে যাইয়া আমাকে ইতিহাসের কথা বলিতে হইতেছে। কিন্তু কি করিব, শিবাজীর দেশে প্রতি পল্লী, প্রতি নগর, প্রতি বন, প্রতি প্রান্তর সকলই যে তাঁহার কোন না কোন স্মৃতি বহন করিতেছে। তাই ইতিহাসের কথা যে বলিতেই হইবে।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দের কথা। উদয়ভান—রাজপুত আলমগীর বাদশাহের সেনাপতি সিংহগড় দুর্গের দুর্গাধিপতিরূপে বাস করিতেছেন। সে সময়ে একদিন প্রতাপগড়ে শিবাজী জননী জীজাবাঈ বীরপুত্র শিবাজীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। শিবাজী—মাতৃভক্ত শিবাজী, কেমন করিয়া মায়ের আহ্বান উপেক্ষা করিবেন? তিনি জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রায়গড় হইতে প্রতাপগড়ে আসিলেন।

শিবাজী প্রতাপগড়ে পৌঁছিয়া মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,—"মা, আমাকে আহ্বান করিলে কেন?"

জননী কহিলেন,—"এস, তোমার সঙ্গে আমি পাশা খেলিব। বাজী জিতিলে আমাকে তোমার বিজিত ২৯টি দুর্গের মধ্যে যে কোন একটি দুর্গ আমি চাহিব তাহাই আমাকে দিতে হইবে।" শিবাজী জননীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, কিন্তু খেলায় শিবাজীর পরাজয় হইল। জননী জীজাবাঈ তখন শিবাজীর নিকট বলিলেন, "বৎস! আমাকে সিংহগড় দাও।" শিবাজী পড়িলেন মহা সমস্যায়! সিংহগড় যে আর তাঁহার নাই! সিংহগড় যে এখন মোগলের হাতে। জীজাবাঈ পুত্রের মনের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু তেজস্বিনী জননী আবার বলিলেন, "পণ রক্ষা কর শিবা। আমি সিংহগড় চাই, সিংহগড় দাও। মোগলের অধিকারে আছে তাই ভয়? মোগলকে পরাজয় করিয়া আমাকে সিংহগড় দুর্গ অর্পণ কর।" শিবাজী মাথা নত করিয়া মায়ের চরণ ছুঁইয়া বলিলেন, "মা তোমার আদেশ পূর্ণ হইবে!"

সে সময়ে তানাজী মালশ্রী নামে শিবাজীর একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। শিবাজী তানাজীর উপর সিংহগড় দুর্গ জয় করিবার আদেশ দিলেন। তানাজী শিবাজী মহারাজার আদেশ পালন করিতে ছুটিলেন সিংহগড় দুর্গাভিমুখে। সঙ্গে চলিল ১০০০ হাজার মাওয়ালি সৈনিক দল।

শিবাজীর রণ-কৌশল ছিল একটু অন্য প্রকারের, তিনি কখনও সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন না। কৌশল করিয়া গোপনে-গোপনে আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেন। তাঁহার সেনাপতিও মাওয়ালি সৈনিক দলও এই রণ-কৌশলে অভিজ্ঞ ছিল। এই জন্যই আলমগীর শিবাজীকে পার্ব্বত্য-মূষিক নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

একদিন এক ভালুকওয়ালা তাহার ভালুক লইয়া খেলা দেখাইতে আসিল সিংহগড় দুর্গে। এই ভালুক খেলোয়াড় আর কেহই নহেন, স্বয়ং তানাজী মালশ্রী। তানাজী মালশ্রী কয়েকদিন ক্রমাগত সিংহগড় দুর্গের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া দুর্গের ভিতরকার অবস্থা বেশ ভাল ভাবে বুঝিবার জন্য ছদ্মবেশে ভালুকের খেলোয়াড় হইয়া আসিলেন। তিনি চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, এই দুর্ভেদ্য দুর্গ এমন ভাবে সুরক্ষিত যে কোন-রূপেই তাহা আক্রমণ করা সম্ভবপর নহে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দুইটি তোরণই অত্যন্ত সুরক্ষিত। আর দিবারাত্র সুসজ্জিত সৈন্যেরা এখানে পাহারা দিতেছে। একমাত্র পশ্চিম দিক্ দিয়া দুর্গে প্রবেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেদিকে খাড়া পাহাড়—সেখানে মানুষের সাধ্য নাই যে আসিতে পারে। তানাজী দেখিলেন, এই একটি মাত্র পথ ছাড়া দুর্গে প্রবেশের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

পণ করিলেন তানাজী এই দুর্ভেদ্য পথেই তিনি দুর্গজয়ে অগ্রসর হইবেন। একদিন মাঘের শেষ অন্ধকার রাত্রিতে সরীসৃপের মত কোমরে দড়ি বাঁধিয়া একের পর আর একজন এইরূপে মাত্র একশত-জন সৈনিক দুর্গের উপরে যাইয়া উঠিলেন। সকলের আগে তানাজী মালশ্রী পাহাড়ের উপর উঠিয়া অন্য সকলকে দুর্গের উপর উঠিবার সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ভাবে দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চাশজন বীর দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন কল্যাণ তোরণ দিয়া। দুর্গের সৈন্যেরা নেশা-ভাঙ্গ খাইয়া অচেতনপ্রায় ছিল, আর তাহারা ভাবিতেও পারে নাই, এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের কথা। উদয় ভান ও তাহার সৈন্যেরা যুদ্ধ করিল। উদয় ভান ও তাঁহার দ্বাদশজন পুত্র এই আকস্মিক সংগ্রামে নিহত হইল। তানাজীর দক্ষিণ বাহু শত্রুর আক্রমণে প্রথমে ছিন্ন হইয়াছিল, পরে দুর্গ মধ্যস্থিত সৈন্যদের আক্রমণে তাঁহার প্রাণহীন দেহ দুর্গ-ভূমে লুটাইয়া পড়িল, কিন্তু দুর্গ বিজিত হইল। উদয় ভানের মৃত্যুতে বিশৃঙ্খল ভাবে সৈন্যেরা প্রাণভয়ে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সিংহগড় জয় করিয়া সত্য সত্যই শিবাজী জননীকে উপহার দিলেন। Harry Arbuthnot Acworth রচিত Ballads of the Marathas গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি গাথা আছে। গাথাটির নাম The Ballad of Tanaji Maloosre. তিনি গাথাটির বিষয়-পরিচয়ে লিখিয়াছেন ঃ

The hill fort of Singhur, some 10 miles from Poona, was held in 1670 by a choice Rajput garrison under Udeban. Shiwaji was very anxious to gain possession of it, and his friend Tanaji Maloosre, one of the most famous of his leaders, offered to surprise it if he was allowed to take 1000 Mawullis and his younger brother Sooryaji, called Sooryaba in the ballad. Three hundred of the Mawullis together with Tanaji, had gained the interior of the fort before the alarm was given, but a desperate conflict then ensued, in which Tanaji fell, and his men would have retreated if they had not been supported by the reserve under Sooryaji. Though still opposed by very superior numbers, their energy and resolution were too much for the Rajputs, and the fort was taken, but the lion slain. Shiwaji was much distressed at Tanaji's death, and is said to have exclaimed, 'The den is taken, but the lion slain. I have gained a fort, but lost Tanaji Maloosre.' Singhur—more correctly Singhur means the hill of the fort of the

মুলা ও মুথা নদীর বাঁধের একদিকের দৃশ্য

lion.* The Ballad of Tanaji Maloosreর শেষ পংক্তি কয়টি অতি সুন্দর—আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

"And ye, Marathas brave! give ear,
Tanaji's exploits crowd to hear.
Where from your whole dominion wide
Shall such another be supplied ?
O'er seven and twenty castles high
His sword did wave victoriously.
The iron years are backward roll'd,
His fame restores the age of gold ;
Whene'er this song ye sing and hear,
Sins are forgiv'n, and heaven is near :

কবির এ উক্তি অতি সুন্দর। আমাদের কবি যতীন্দ্রনাথের সিংহগড় গাথাটিও অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনিও একই সুরে সুর বাঁধিয়া বলিয়াছেন ঃ

"থার্ম্মো পলির পুণ্য কাহিনী
হলদি ঘাটের ধন্যবাহিনী।
অপূর্ব্ব কথা তুলনা পাই নি তবু এর কোন কালে,
ভাগ্যে যে লিপি লিখিলা সেদিন মহারাষ্ট্রের ভালে।

শিবাজী তানাজীর মৃত্যু সংবাদে প্রাণে দারুণ বেদনা পাইয়াছিলেন। তিনি করুণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন ঃ—"সিংহগড় জয় করিলাম, কিন্তু আমার সিংহকে চিরদিনের জন্য হারাইলাম।

মহারাষ্ট্র দেশের ঘরে ঘরে তানাজী মালশ্রীর (Tanaji Maloosre) এই বীরত্ব গীত হইয়া থাকে। সিংহগড় দুর্গের মধ্যে তানাজীর বাহুখানি সমাহিত আছে। ইহাই হইতেছে সিংহগড় দুর্গের ইতিহাস।

[Ballads of the Marathas by Harry Arbuthnot Acworth. Longmans, Green & Co., 1894, page 10.]

মহাত্মা গান্ধী যখন পুণা আসিয়াছিলেন, তখন তিনি 'পর্ণ-কুটিরে' থাকিতেন। পর্ণ-কুটির নাম শুনিয়া পাঠকেরা মনে করিবেন না যে, উহা সত্য সত্যই 'পর্ণ-কুটির'। সে এক বিশাল রাজপ্রাসাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিলাসোপকরণেরও তাহাতে অভাব নাই। সুন্দর একটি টিলার উপর বাড়ীটি অবস্থিত। দূর হইতেই পর্ণ-কুটিরের বাড়ী সকলের চক্ষে পড়ে। মহাত্মা এই রাজপ্রাসাদে থাকিতেন আর তাঁহার পানীয় জল আসিত প্রতিদিন সিংহগড় পাহাড় হইতে।

আমরা একদিন পুণার বিখ্যাত ফার্গুসন কলেজ দেখিতে চলিলাম। এই কলেজের নাম ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। ফার্গুসন কলেজ থুবে পার্ক হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। কলেজে যাইবার পথ খানিকটা মাঠের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কলেজটি অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। উহার চারিদিক বেড়িয়াই প্রাচীর। ফল ও ফুলের গাছ এবং নানা জাতীয় তরুরাজি বেষ্টিত এই কলেজটিকে দূর হইতে একটি মনোরম উদ্যানবাটিকার মত মনে হয়। আমরা প্রধান তোরণ পথে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পথের দুইদিকে তরুবীথির অন্তরালে অধ্যাপকদের বাসভবন। এখানকার অধ্যাপকদের ত্যাগ ও মহত্ত্ব আদর্শস্থানীয়, কাহারও বেতনই ১৫০, দেড়শত টাকার অধিক নহে। একটি পাহাড়ের নীচে ফার্গুসন কলেজ অবস্থিত। আমরা কলেজ দেখিয়া 'মারুতি পাহাড়ের' উপর উঠিলাম। শ্রীমতী প্রতিভা, তাহার কন্যা শিপ্রা, শ্রীমান্ সুধাংশু, রজতবাবু প্রভৃতি পাহাড়ের নীচে একটি শ্যামদুর্ব্বাদল শোভিত মাঠের উপর বসিলেন। আমি ও আমার অপর কন্যা কণিকা পাহাড়ের উপর উঠিলাম। পাহাড়টি ছোট। ২০০।২৫০ শত ফিটের অধিক উচ্চ নহে। পথও বেশ—দলে দলে তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা এই পাহাড়ের উপর সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য আসিতেছে। পাহাড়ের একটি উচ্চ চূড়ায় একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত স্মারক স্তম্ভ আছে। তাহাতে খোদিত রহিয়াছে যে, মহাত্মা গোখলে ঐ স্থানে ভারত সেবক সমিতির (Servant of India Society) কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। আমার ছোট ডায়েরিখানাতে তাহা টুকিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু বোধ হয় ঔরঙ্গাবাদে ঐখানা হারাইয়া ফেলিয়াছি তাই সঠিক সন তারিখ দিতে পারিলাম না।

ফার্গুসন কলেজের বাড়ীঘরগুলি বড়ই সুন্দর এবং স্থাপত্যের দিক্ দিয়াও একটু বৈচিত্র্য রহিয়াছে।

পুণাতে গীর্জ্জার প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক গীর্জ্জা, বিদ্যালয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ওখানে রহিয়াছে।

এখানকার ডেকান কলেজ (Decan College), সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (Civil Engineering College), স্যাসুন হাসপাতাল (Sassoon Hospital) দর্শনীয় বটে। এই স্যাসুন হাসপাতালেই মহাত্মা গান্ধীর এপিণ্ডিসাইটিসের অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছিল। স্যাসুন হাসপাতালটির অবস্থান বড় সুন্দর। খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর চারিদিকে নাগকেশর ও অন্যান্য বৃহদাকার বৃক্ষ থাকায় স্থানটিকে বেশ চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিবাজী মিলিটারী স্কুল (Shivaji Military School), স্যার পরশুরাম ভাউ কলেজ (Sir Parshuram Bhau College), রিয়া মিউজিয়াম প্রভৃতি দর্শনীয়।

মুলা ও মুথার বাঁধটি পুণা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্ষার সময় এই বাঁধের শোভা হয় অতি চমৎকার। বাঁধের খোলা মুখ দিয়া অতি বেগে জল নির্গত হইয়া আসে, কি তার শব্দ। [ক্রমশ]

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

লইয়া যাইবে এবং ফিরাইয়া লইয়া আসিবে কেবলমাত্র আট আনা পয়সার বিনিময়ে! একটা পয়সাকে যেন ইহারা টাকার মত করিয়া দেখে। ইহাদেরই ঠিক পাশে মন্দিরের ওই ধন ঐশ্চর্য্য একটা বিরাট বিদ্রূপ বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল। মন্দিরের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও আর তাহার ইচ্ছা হইল না।

ঠিক সেইখানেই দিলীপ আঘাত করিল, বলিল, এই লোকগুলা বুকের রক্ত দিয়ে যে পয়সা উপায় করে সেই পয়সাই কেমন সহজে ওই মন্দিরের লোকগুলো উড়িয়ে দেয়। ওদের শুচিতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, এদের ওরা ঘৃণা করে, উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু ছাড়া কারও মন্দিরে বা পাহাড়ে উঠবার নিয়ম নেই—এরাই আবার পিঁপড়ের গর্ত্তে চিনি দিয়ে আসে দিদি, রাতে বিশেষ কিছু খায় না পাছে না দেখতে পেয়ে জীব হত্যা করে বসে। এদের কি করা উচিত বলতে পার?

অলকা কোন কথাই বলিল না, সতীশ মনে মনে পাহাড়ের উচ্চতার হিসাব করিতেই বোধ হয় ব্যস্ত ছিল।

দিলীপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, আপন মনেই সে বলিয়া চলিল, লোহার ঘর করে ঠিক চিঁড়িয়াখানার জীব-জন্তুর মতই এদের সাজিয়ে রাখতে হয় আর যে-সব পিঁপড়ের গর্ত্তে এরা চিনি দিয়ে আসে সেগুলোকেই এদের গায়ে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু থাক, যাবে যে দিদি?

টিফিন-ক্যারিয়ার প্রভৃতি কাঁধে ঝুলাইয়া গাইড ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিলীপ ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি তা'হলে ওদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।

ড্রাইভার ঘাড় নাড়াইয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল। তাহারাও পাহাড়ের পথে পা বাড়াইয়া দিল। অলকার বুক কাঁপিয়া উঠিল, ওই অতদূরের পথ সে কি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে? কিন্তু ডুলির কথা মনে হইতেই সে নিজেকে দৃঢ় করিয়া ফেলিল, লোকের কাঁধে দড়িবাঁধা দোলনায় ঝুলিয়া যাওয়ার কথা মনে হইলেই তাহার যেন হাসি পায়। বৃদ্ধদের যাহা সাজে তাহা নারী হইলেও তাহার সাজে না।—

অনেক দূর চলিয়া আসিয়া গাইড বলিল, এটা একটা ছোট পাহাড় বাবু, এটা পার হ'য়ে তবে আমাদের পরেশনাথে উঠতে হবে।

তাহার কথা শুনিয়া অলকা হতাশ হইয়া পড়িল। এই ছোট পাহাড়টা মিছামিছিই পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া আছে? এতখানি উঠিয়া আসিয়া আবার নামিয়া যাইতে হইবে। তবেই মিলিবে পরেশনাথ? (ক্রমশ)

কালো মেয়ে

(গল্প)

শ্রীআশালতা সিংহ

স্কুলের বাস আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অরুণা কোনমতে আধসিদ্ধ ডাল ভাত খাইয়া লইয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলটা আঁচড়াইয়া লইতেছিল, মা দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিলেন, আজ তোর স্কুল যাওয়া হ'বে না। বাস ফিরিয়ে দিয়েছি আমি।

অরুণা অবাক হইয়া কহিল, কেন মা?

অরুণার মা একটু রুক্ষ্ম কণ্ঠে কহিলেন, কেন, কি বৃত্তান্ত অত জেনে তোমার দরকার কি? যাওয়া হবে না বলে দিলুম ব্যস্ চুপ করে থাক।

তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। খোলা জানালাটা দিয়া শূন্য অনামনস্কভাবে অরুণা চাহিয়া রহিল। রোজ ন'টার সময় বাস আসে, তাড়াহুড়ো করিয়া স্নানাহার সারিয়া কোনমতে বাস ধরিবার জন্য সে সকাল হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। ইহারই মধ্যে বিছানা তুলিতে হয়, ঘর ঝাঁট দিতে হয়। ছোট খোকাটা দুধ খাইবার সময় রাজ্যের বায়না ধরে, তাহাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইতে হয়। স্কুলের পড়াও ইহারই মধ্যে বড়দা মেজদাকে খোসামুদি করিয়া একটু-আধটু দেখাইয়া লইতে হয়। তবু সমস্ত দিনটা রুটিনে বাঁধা, ভাবিবার অবসর নাই, একদণ্ড দাঁড়াইবার সময় নাই। কিন্তু আজ সামনে দীর্ঘ দুপুর বেলাটা পড়িয়া আছে। মা আসিয়া জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন, স্কুল যাইতে হইবে না। অরুণার কাকীমা সেইপথ দিয়া যাইতেছিলেন তিনি ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, অরু আজ আমি তোমাকে স্নান করিয়ে দেব। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না। কাঁচাহলুদ বাঁটিতে দিয়েছি, সর ময়দার জোগাড় করেছি, মাখিয়ে দেব।

অরুণা বলিল, আমি যে ইস্কুলের বাস আসবে বলে তাড়াতাড়ি নাওয়া খাওয়া সেরে নিয়েছি কাকীমা!

কাকীমা অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, ইস্কুল ইস্কুল করেই গেলে মা। ইস্কুলে পড়ে কি জজ মেজিষ্টর হবে না টাকা রোজগার করতে হবে তোমাকে? এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না এরা। অরুণা তথাপি তাঁহার এই আকস্মিক বিরক্তির কারণ বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার বিস্ময়ের বিমূঢ়তা শীঘ্রই কাটিয়া গেল। তাহার খুড়তুতো বোন রমা সহাস্যমুখে সে ঘরে ঢুকিয়া পিঠে একটা ঠেলা মারিয়া কহিল, খবর শুনিসনি বুঝি, ভবানীপুরের ইন্দ্রবাবুরা যে বলে পাঠিয়েছেন আজ, শীগ্‌গীর তাঁরা কনে দেখতে আসছেন। কনে পছন্দ হ'লে অন্য কথাবার্ত্তা হবে।

মা আজ সকাল বেলায় তাই বলছিলেন, অরুণার আর স্কুল যাওয়া হবে না। ন'টার সময় দুটি নাকেমুখে গুঁজে ইস্কুল যায়, সেই বেলা পাঁচটায় আসে, মুখচোখ শুকিয়ে কালীবর্ণ হয়ে যায়। এখন ওসব বন্ধ।

অরুণা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। তাই কাকীমা অত্যন্ত স্নেহ করিয়া তাহার স্নানের ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছিলেন। তাই মা গাড়ী ফিরাইয়া দিয়াছেন।

রমা পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, নে নে, এখন ইস্কুলের পরীক্ষার জন্যে আর পড়তে হবে না, এই পরীক্ষায় একবার পাশ কর দিকি। তাহলে সবাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু তুই ভাই যেন কী রকম। রাতদিন পড়া আর চুপটি করে ঘরের কোণে কাজ নিয়ে থাকা। সংসারের কোন খোঁজ খবর রাখিসনে। এই যে এতবড় খবরটা আমি তোকে দিলাম, এর বিন্দু বিসর্গও জানতিসনে। আমি কিন্তু আমার বিয়ের এক বছর আগে থেকে কান পেতে থাকতাম। মায়ের বাক্স থেকে চিঠি চুরী করে লুকিয়ে পড়তাম। কোথায় চেষ্টা হচ্ছে, কোনখান থেকে সম্বন্ধ আসছে সমস্ত খবর রাখতাম। কেনই বা রাখব না বল। বিয়ে কোথায় হবে, কেমন জায়গায় হবে তারই উপর মেয়েদের সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে। জানতে ব্যগ্রতা হবে না?

অরুণা এইবার একটুখানি ম্লানহাসি হাসিয়া কহিল, আমার আর ব্যগ্র হয়ে কি হবে বল ভাই, যা রঙ, কেউ দেখে পছন্দ করবে না। শুধু শুধু মনকে চঞ্চল করে লাভ কি।

এইবার রমার হাসিহাসি মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। কারণ একথাটার মধ্যে সত্যতা ছিল। অরুণার গায়ের রঙ অনুজ্জ্বল। রমার পাশে তাহাকে শ্রীহীন দেখায়।

কিন্তু অধিকক্ষণ তাহার এ ভাব রহিল না, জোর করিয়াই যেন হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কী যে বল ভাই, আর শুধু গায়ের রঙই কি সব? তোমার মত এমন সুন্দর মুখশ্রী, এমন মিষ্টি স্বভাব কার? গানের এমন গলা, তার উপর ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছো, এসব বুঝি কিছুই নয়? দেখো আমি ঠিক বলে দিচ্ছি ইন্দ্রবাবুরা দেখতে এসে পছন্দ না করে কক্ষণো ফিরে যাবেন না।

তখন কার্ত্তিক মাস যায় যায়। শীতের ঈষৎ তীক্ষ্ণ বাতাস সবেমাত্র দিতে সুরু হইয়াছে। আকাশ নির্ম্মেঘোজ্জ্বল। রমার কথায় অরুণার মনটি চঞ্চল হইয়া উঠিল। আকাশ বাতাস জুড়িয়া যে একটি মধুর স্রোত নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে, সে কথা এই যেন সে সবেমাত্র আবিষ্কার করিল।

সেখান হইতে রমা উঠিয়া তাহার জ্যেঠাইমার খোঁজে গেল। মাত্র ছয় সাত মাস হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, আনন্দে, লজ্জায়, সৌভাগ্যে সে সর্ব্বদাই ছল ছল করিতেছে।

অরুণার মা তখন স্কুল কলেজের ছেলেদের বৈকালিক জলখাবারের জন্য ময়দা মাখিতেছিলেন। রমা তাঁহার পাশে বসিয়া কহিল, জ্যেঠাইমা এ কিন্তু আপনার অন্যায়, অরুণার জন্যে আপনার আরও আগে থেকে চেষ্টা করা উচিত ছিল। ওকে যখন দেখতেই আসছে, তখন অন্তত মাসখানেক আগে থেকে ওর স্কুল বন্ধ করা উচিত ছিল। কিছুদিন ভালো ক্রীম, সাবান মাখান, খাওয়া দাওয়া সব বিষয়ে একটু যত্ন নিন' তবে তো!

রমার মা কি একটা কাজে তথা দিয়া যাইতেছিলেন,

তিনিও সেখানে দাঁড়াইয়া রমার সহিত যোগ দিয়া বলিলেন, ঠিক, ভিতরে কিছু বর্ষণ আর উপরে কছু ঘর্ষণ করলে হাজার কালো মেয়ে হোক তার একটু জৌলুস খুলবেই। তুমি দিদি অন্তত এই ক'দিন ওকে একটু বেশি করে দুধ ফল এসব খাওয়াও। আর আমি একটা ফর্দ্দ করে দিচ্ছি, মণি কলেজ থেকে ফিরে আসুক তাকে একবার পাঠাও দিকি বাজারে। মুখে মাখবার কয়েকটা জিনিষ কিনে আনুক। আমার রমার তো উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তবুও বিয়ের এক বছর আগে থেকে আমি তাকে এইসব মাখাতাম। ওকে কনে দেখতে এসেই বরপক্ষের মনে ধরে গেল, নইলে আমাদের মত অবস্থার লোকে কি আর অতবড় ঘরে মেয়ে দিতে পারি!

পরের দিন হইতে অরুণার প্রসাধনপর্ব্ব সুরু হইল। খুড়িমার তত্ত্বাবধানে তাহাকে এতরকম বস্তু মাখিতে হইত এবং এতবার স্নান করিতে হইত যে, সারাদিন তাহার আর অন্য কিছুই করিবার অবসর জুটিত না। বাড়ীর লোকেরাও কি যেন একটা অসম্ভব আশায় তাহার সহিত আশ্চর্য্য রকম ভাল ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন। এখন ভোর পাঁচটায় উঠিয়া ঘর ঝাঁট দিয়া বিছানা তুলিয়া তাহাকে বাবার জন্য চা তৈয়ারী করিয়া দিতে হয় না। অত তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলে মুখ চোখ শুষ্ক দেখাইবে বলিয়া কাকীমা সাতটার আগে তাহাকে উঠিতেই দেন না। বিকালবেলায় বরাবর সে স্কুল হইতে ফিরিয়া রুটি কিম্বা মুড়ি খাইত এখন তাহার জন্য একবাটি দুধ, আপেল, কিসমিস, বেদানা সমস্ত সাজান থাকে। এই আদরের ঘনঘটায় অরুণার বুকের ভিতর দুরুদুরু করিতে থাকে। মনে হয় যেদিন পরীক্ষা-অন্তে ফাঁকি ধরা পড়িয়া যাইবে সেদিন সে লজ্জায় কোথায় গিয়া মুখ লুকাইবে। কিন্তু এই আশঙ্কার আবহাওয়ার মাঝে রমা বসন্তের দমকা বাতাসের মত একটা পুলকের হিল্লোল বহিয়া আনে। কাকীমার হাত হইতে দণ্ড কয়েকের জন্য নিষ্কৃতি পাইয়া অরুণা হয়ত ইংরেজী সাহিত্যের বইটা একটু খুলিয়া বসিয়াছে, রমা পাশে আসিয়া বসিয়া বলে, খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, ইন্দ্রবাবুর বড়ছেলে ইংরিজীতে এম-এ পাশ করেছেন খুব ভাল করে। আর ভাই তোমাকে পরীক্ষা পাশ করবার জন্যে ইংরিজী পড়তে হবে না। বিয়ের পরে তাঁকে টেনিসন্ বাইরনের কবিতা পড়ে শোনাবে এখন। আমি ত ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। মা বিয়ের আগে স্কুলেও দেননি, ভাল করে লেখাপড়াও শেখাননি। আবার খোলা জানালা দিয়া বাইরের দিগন্তলীন নীল আকাশের দিকে চাহিয়া অরুণা অন্যমনস্ক হইয়া যায়। এই চিরাভ্যস্ত পরিচিত জীবনের উপকূল ছাড়াইয়া তাহার মন কোন স্বপ্ন-সাগরে স্নান করিয়া আসে।

দিন পনের পর অগ্রহায়ণের প্রথমে এক শুভদিনে ইন্দ্র রায় তাঁহার জন-দুই বন্ধু সঙ্গে লইয়া ভাবী পুত্রবধূকে দেখিতে আসিলেন। কাকীমার প্রসাধনে প্রসাধিত এবং সজ্জিত হইয়া পিতার সহিত অরুণা বৈঠকখানায় আসিল। পিতা কহিলেন, আমার মেয়েটির গানের গলা ভারি মিষ্টি, বড় সুন্দর কীর্ত্তন গায়। ইংরিজীটাও বেশ জানে। এইবার ম্যাট্রিক দেবে, কিন্তু শেলী, টেনিসন, বাইরন অনেকের কবিতা ভাল করে পড়েছে, অনেক কবিতা ওর কণ্ঠস্থ। তথাপি ইন্দ্র রায় অরুণার গান শুনিতে চাহিলেন না বা আবৃত্তি শুনিতেও ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন না। মিনিট পাঁচেক উভয়পক্ষ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিবার পর তিনি বন্ধুদের লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাড়ীতে গিয়া যা হয় খবর দিবেন। পাশের ঘরে জলযোগের প্রচুর আয়োজন সত্ত্বেও তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। বিনীত ভঙ্গীতে জানাইলেন, ডাক্তারের আদেশে মিষ্টি খাইবার তাঁর যো নাই।

তাঁহার ভাবভঙ্গীতে জলের মত পরিষ্কার বোঝা গেল, মেয়ে পছন্দ হয় নাই। রমার কলহাস্য নিভিয়া গেল। বাড়ীর সকলের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। ছোট ভাইটিকে কোলে তুলিয়া নিয়া দোতালার চোর-কুঠুরিতে অরুণা তাহার ছোটদার পড়িবার ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার ছোড়দা ও সে এক ক্লাশে পড়ে। পড়িবার টেবিলের উপর এলোমেলো অগোছাল হইয়া এ্যাল্‌জেব্রা, জিওম্যাট্রি, ইতিহাসের বইগুলি ছড়ানো আছে। সেই সমস্ত বইয়ের অক্ষরগুলি অরুণার কাছে অর্থহীন দুর্ব্বোধ্য কোন এক ভাষার মত বোধ হইতে লাগিল। এই কয়েকদিনেই তাহার এতদিনকার জগতের সহিত যেন একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। রাত্রিবেলায় সবাই শয়ন করিলে, সে অতি সন্তর্পণে চোরের মত কোন এক ফাঁকে ঝুপ করিয়া ভাই-বোনের পাশে তাহার নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকুতে আসিয়া শুইয়া পড়িল। পাশের ঘরে তখন অরুণার বাবা স্ত্রীকে বলিতেছেন, শুনলাম অরুণার নাকি স্কুল বন্ধ করেছ? না না, তা করো না। এই সামনে টেষ্ট আসবে। লেখাপড়াটা ভাল করে শিখুক। নেহাৎ বিয়ে না হয় ত, আমাদের অবর্ত্তমানে করে খেতে পারবে।—তাঁহার স্বর গভীর হতাশাব্যঞ্জক।

পরের দিন আবার যথানিয়মে স্কুলের বাস আসিল। ন'টার মধ্যে পূর্ব্বের মত কোনপ্রকারে স্নানাহার সারিয়া অরুণা বইখাতা গুছাইতে বসিল। শীতার্ত্ত প্রকৃতির আকাশ-বাতাস সবই সেই পুরাতন দিনের মত আছে, কিন্তু অরুণার মনে হইল তাহার নিজেরই মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যে মন লইয়া কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সে প্রতিদিনের খুটি-নাটি তুচ্ছ কাজকর্ম্ম, লেখাপড়া করিয়া যাইত, সে মন সে হারাইয়াছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন, তুমি ভাল রেজাল্ট করবে আশা ছিল, কিন্তু ঠিক পরীক্ষার মুখে এতদিন কামাই!

কেন সে স্কুল আসিতে পারে নাই তাহার কি কারণ বলিবে ভাবিতে বসিয়া অরুণা কোনক্রমে চোখের জল চাপিল।

কলিকাতায় অখিল ভারত হিন্দু-মহ সভার অধিবেশন

গত ২৮শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকায় দেশবন্ধু পার্কে মহাসমারোহে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার একবিংশতিতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছয় হাজার প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাঙলার প্রায় চারি হাজার, মধ্যপ্রদেশ ২০০, যুক্তপ্রদেশ ২২০, বিহার ২০০, পাঞ্জাব ৭৫, আমেদাবাদ ২৫, বোম্বাই ৭৫, দিল্লী ২০, আসাম ২০০, সিন্ধু ৪০, মহারাষ্ট্র

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সময় সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ দণ্ডায়মান বীর সাভারকর

৪০০, বেরার ১০০, সীমান্তপ্রদেশ ১০, মাদ্রাজ ২৫ এবং মহাকোশলের ৪০ জন ও ব্রহ্ম এবং সিংহলের কয়েকজন দর্শকও অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০ হাজার লোক অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন; এই সম্মেলনে ১০০০ হাজার মহিলা যোগ দিয়াছিলেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি বীর সাভারকর সভাস্থলে পৌঁছিলে, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একদল ত্রিশূলধারী ও খড়্গধারী সন্ন্যাসী ও দুইজন জাপানী ভিক্ষু শঙ্খ বাজাইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলের অগণিত জনতার সমস্বরে "বীর সাভারকর কি জয়" ধ্বনিতে সভামণ্ডপ ধ্বনিত হইতে থাকে। এই অধিবেশন উপলক্ষে সমগ্র ভারতের সকল শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যে সাড়া ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, তাহা হিন্দু মহাসভার ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বলা যাইতে পারে। বিরাট সুদৃশ্য সভামণ্ডপ ও সমবেত অগণিত নর-নারীই এই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ উদ্দীপনার পরিচায়ক।

অপরূপ মণ্ডপ-সজ্জা এই অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য বিষয়। সভামণ্ডপের অভ্যন্তরভাগের যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই শুধু "ওঁ" "স্বস্তিকা" ও "তলোয়ার" চিহ্নিত গৈরিক পতাকা ও হিন্দু দেবদেবী ও মহাপুরুষদের চিত্র দেখা যাইতেছিল। নেতৃবৃন্দের উপবেশনের জন্য যে বৃহদাকার মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা যেমন মনোরম তেমনি সুসজ্জিত। মঞ্চের মধ্যভাগে ছিল শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ ভারত-ভূমে দাঁড়াইয়া যেন সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবটি অতি সুচারুভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। মণ্ডপটি একদিকে যেমন সুশৃঙ্খল কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনি উহা অভিরুচি, সৌন্দর্যবোধ ও হিন্দু-কৃষ্টির দ্যোতক। বাঙালী, শিখ, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, আর্যসমাজী, সিংহলী, ব্রহ্মদেশীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিচিত্র বেশভূষা পরিহিত সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারীর সমাবেশে মণ্ডপটির সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠান ও বৈদিক স্তোত্র এবং 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের সহিত প্রথম দিনের অধিবেশন সুরু হয়। সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত এম এস আনে, শ্রীযুক্ত এন সি কেলকার, রাজা নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে যে সকল পত্র ও তার আসিয়াছে তাহা সভায় পাঠ করা হয়। তৎপরে বীর সাভারকর কে হিন্দু মহাসভার একবিংশতিতম অধিবেশনের সভাপতিত্বে বরণ করিয়া বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বীর সাভারকরের ত্যাগ ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

অখিল ভারত হিন্দু মহসভা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণের সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান আছে আমি তাহারই আলোচনা করি। উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলকল্পে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমস্ত চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন এইরূপ মতভেদ থাকিবে ততদিন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানদের জাতীয়তা-বোধের ভিতরে তাহাদের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারা মাঝে মাঝেই বলিয়াছে যে, বৃটিশ জাতি মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে এবং মুসলমানদের হাতেই তাহারা ভারতবর্ষের অধিকার প্রত্যর্পণ করিবে। আমি কল্পনার আশ্রয় লইয়া এইরূপ কথা বলিতেছি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ্যভাবে এইরূপ কথা বলা হইয়াছিল। এখনও কোনও কোনও মুসলমান নেতা বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন।

এই ধর্ম্ম ও সংস্কৃতমূলক জয়োল্লাসের ফলে এমন কতকগুলি

ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার জন্য দুই সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। মোপলা অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু তদন্তের ফল প্রকাশ করা জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী হইবে বলিয়া তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। ইহার পরই মুলতানে যে শোচনীয় কাণ্ডটি অনুষ্ঠিত হয়, তৎসম্পর্কে মুসলমান নেতাগণ স্বীকার করেন যে, অসহায় হিন্দুদের উপর মুসলমানগণ অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। তৎপর ১৯২৩ সালে মালকানা রাজপুতদের পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হয় ও আগ্রা, মথুরা, ভরতপুর, সাহারাণপুর প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। ইহার কিছুদিন পর কোহাট এই জাতীয় অত্যাচারের স্থান হইয়াছিল; সেই সময় প্রায় কুড়ি হাজার ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি, বাসস্থান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া আহার্য্য ও আশ্রয়ের জন্য অন্য স্থানে পলায়নপর হইতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে কলিকাতা ও পাটনায় ব্যাপক দাঙ্গা হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন। তৎপর দিল্লীর লালা নানকচাঁদ সমেত কতিপয় আর্য্য সমাজী নেতাকে হত্যা করা হয়। ইহার পশ্চাতে আসে রঙ্গিলা রসুল আন্দোলন; রঙ্গিলা রসুলের প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাজপাল দুইবার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার পর তৃতীয়বারে প্রাণ দেন। এই জাতীয় অত্যাচারের আর একটি দৃষ্টান্ত কলিকাতায় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেনের হত্যা। ১৯৩২ সালে এবং তাহার পর হইতে হায়দরাবাদ, ভূপাল, ভাওয়ালপুর, রামপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিতে গোলযোগ দেখা দেয় এবং সরকারী চাকুরীতে স্থান, ধর্ম্মানুষ্ঠান, শিক্ষার সুবিধা লাভ প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের স্বার্থ-বিরোধী পৃথক ব্যবস্থার ফলে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কয়েকটি স্থানে দমনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দুদের ন্যায্য অভিযোগ প্রকাশে বাধা দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকটি রাজ্যে তথাকথিত 'সংস্কার' প্রবর্ত্তনের অজুহাতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা মুসলমানদের আধিপত্য চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাশ্মীরে মুসলমান জনসাধারণ মহারাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে শান্তি স্থাপন করা হয়। ১৯৩৫ সালে সহিদগঞ্জ আন্দোলনের ফলে লাহোর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে শোচনীয় অবস্থা দেখা দেয়, তাহাতে বহু জীবন ও ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। পরিশেষে সম্প্রতি মীরাটে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তাহাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি, যদিও উহার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কিছু বলিতে চাহি না।

স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জির অভিভাষণের পর বীর সাভারকর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি হিন্দু মহাসভার আদর্শ ও নীতির বিশ্লেষণ করিয়া বলেন :—

হিন্দু আন্দোলনের মূল জ্ঞাতব্য তথ্য এই—যিনি সিন্ধু নদ হইতে সাগরচুম্বিত এই ভারতভূমিকে তাঁহার পিতৃভূমি, তাঁহার ধর্ম্মের উৎপত্তি ভূমি এবং ধর্ম্মের লীলাভূমি বলিয়া মনে করেন তিনিই হিন্দু।

বীর সাভারকরের কলিকাতায় আগমনোপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা

স্বরাজ্য

স্বরাজ্য বলিতে হিন্দুদের নিকট একমাত্র সেই রাজ্য বুঝাইবে, যেখানে তাহাদের সত্তা, তাহাদের হিন্দুত্ব ভৌগোলিক হিসাবে ভারতীয় কিম্বা ভারতের বাহিরের কোন অহিন্দু জাতির অধীন না হইয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

সুতরাং ভারতীয় জাতীয় রাষ্ট্র বলিতে এই বুঝাইবে যে, ভারতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের নাগরিক হিসাবে ব্যবহার পাইবার ও সমান সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভের অধিকার এবং তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে পৌর অধিকার থাকিবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন হিন্দুর ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না; কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত শাসনতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যে অধিকার ভোগের অধিকারী হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে কিছুতেই

সেই ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিতে পারে না।

সুতরাং আমাদের দেশের নাম "হিন্দুস্থান" হইবে। ইহাতে ভারতীয় কোন অহিন্দুর অবমাননা কিম্বা অধিকার ক্ষুন্ন হয় না। ভারতীয় পার্শী ও খৃষ্টানগণ সংস্কৃতির দিক দিয়া আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী এবং অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক; কিন্তু এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এইরূপ ন্যায়সংগত বিষয়েও আমাদের সহিত যোগ দিতে অসম্মত। মুসলমানদের সম্পর্কে ইহা গোপন করা বৃথা যে, তাহাদের মধ্যে কতক এই সামান্য বিষয়কেও হিন্দু-মোস্লেম ঐক্যের পথে অলংঘ্য প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করে। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানগণ একমাত্র ভারতেই বাস করে না এবং ভারতীয় মুসলমানগণই ইসলাম বিশ্বাসীদের একমাত্র বীর বংশধর নহে। চীনে কোটি কোটি মুসলমান আছে; গ্রীস, প্যালেস্টাইন, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডে সহস্র সহস্র মুসলমান আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত দেশে তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া ঐ সমস্ত দেশের অধিকসংখ্যক অধিবাসীর বাসভূমির দ্যোতক পুরাতন নাম পরিবর্ত্তনের দাবী কখনও উপস্থিত করা হয় নাই। পোলদের দেশের নাম পোল্যাণ্ড, গ্রীকদের দেশের নাম গ্রীস। ঐ সমস্ত দেশে মুসলমানগণ আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে নাই বা রাখিতে সাহসী হয় নাই; প্রয়োজন হইলে তাহারা পোলিশ মুসলমান, গ্রীক মুসলমান বা চীনা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়। এইরূপে ভারতীয় মুসলমানগণও হিন্দুস্থানী মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে পারে। মুসলমানগণ ভারতে আগমনের পর হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "হিন্দুস্থানী"রূপে আপনাদিগকে পরিচিত করিতেছে। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন শ্রেণীর মুসলমান আমাদের স্বদেশের "হিন্দুস্থান" নামে আপত্তি করে, তবে তজ্জন্য আমাদের বিবেকের নিকট কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়ার কোন কারণ নাই। জার্ম্মানদের দেশের নাম যেরূপ জার্ম্মানী, ইংরেজদের দেশের নাম ইংলণ্ড, তুর্কীদের দেশের নাম তুর্কীস্থান, আফগানদের দেশের নাম আফগানীস্থান সেইরূপ আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে হিন্দুদের দেশের নাম "হিন্দুস্থান" বলিয়া লিখাইব।

হিন্দুর জাতীয় প্রতিষ্ঠান

আমি লক্ষ্য করিয়াছি বহু ইংরেজী শিক্ষিত ও রাজনীতি ভাবাপন্ন হিন্দু হিন্দু-মহাসভাকে খৃষ্টান মিশনের ন্যায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া ইহা হইতে দূরে থাকেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা হিন্দু-ধর্ম্ম মহাসভা নহে, ইহা হিন্দুর জাতীয় মহাসভা। হিন্দুর জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু মহাসভা অবশ্যই অ-হিন্দুর আক্রমণ হইতে হিন্দুর ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে সচেষ্ট থাকিবে, কিন্তু ইহার কর্ম্মক্ষেত্র আরও ব্যাপক। হিন্দুর জাতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরে —সামাজিক, আর্থিক ও সংস্কৃতিমূলক যাবতীয় বিষয়, সর্ব্বোপরি হিন্দুর রাজনৈতিক অধিকার, স্বাধীনতা শক্তি ও গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ন্যায়সংগত উপায়ে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হিন্দু মহাসভা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শুক্রবারের অধিবেশন

শুক্রবার অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে মোট ছয়টি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই হিন্দু নেতাগণ প্রস্তাবসমূহের আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে ও বিনাসর্ত্তে মুক্তির এবং বিদেশে নির্ব্বাসিত সকল ভারতীয়কে ফিরাইয়া আনার দাবী করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানের যে সকল হিন্দু মন্দির মসজিদে পরিণত করা হইয়াছে বা অন্যভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, সেইগুলি হিন্দুদের হস্তে প্রত্যর্পণ করার দাবী জানান হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে হিন্দু মহাসভা মুসলিম লীগের উৎসাহে সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানগণ মঞ্জিলগড়ে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে তাহার তীব্র নিন্দা করা হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রদ করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন করিবার জন্য আবেদন করা হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পাঞ্জাবের আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং ও অধ্যাপক গঙ্গা সিং অধিবেশনে উপস্থিত

প্রথম দিনের অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ গায়ক-গায়িকা দল

পর শতাব্দী ধ'রে বংশপরম্পরায় দুঃসহ দৈন্যের মধ্যে এই যে ক্রীতদাসের অভিশপ্ত জীবনকে বহন ক'রে চলেছে—এর চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ পৃথিবীতে আর কি আছে? চীনের প্রাচীরই বল আর তাজমহলের সৌন্দর্য্যই বল—সব আশ্চর্য্য জিনিষকে হার মানিয়ে দেয় লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগা মানুষের এই ধৈর্য্যের বিভীষিকা।

নতুন বৎসর এলো। কোন্ নবীন মন্ত্রে দীক্ষা নেবো আমরা? অশান্তির মন্ত্রে, জীবনের মন্ত্রে, বিপদের মন্ত্রে। শান্তি চাইবো না—চাইবো না বন্দরের নিরাপদ দিনগুলি। চারিদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন উপবাসী, নিরাশ্রয়, অর্দ্ধনগ্ন তখনও যারা সুখ চায়, তাদের হৃদয় পাথরের মতোই কঠিন। মানুষের সংস্কৃতিকে রক্তসাগরে ডুবিয়ে দিয়ে বর্ব্বরতা যখন সভ্যতার সূর্য্যকে গ্রাস করতে বসেছে তখনও যদি ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকি—তবে বুঝতে হবে মানুষের স্তর থেকে পশুর স্তরে নেমে গেছি। না, আজকের দিনে সুখ চাইবার আমাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই। সুখ চাইবো সেইদিন যেদিন সব মানুষ আনন্দের প্রাচুর্য্যের মাঝে বাঁচবার অধিকারে হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষের ইতিহাসে সেই সুপ্রভাত যতদিন অনাগত থাকবে ততদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে মানুষের মতো বাঁচানো ছাড়া কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না।

স্বাধীনতা ছাড়া কোটী কোটী মানুষকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই। আর একটা সত্য কথা আমাদের জানতে হবে। স্বাধীনতা আজ পর্য্যন্ত কোনো দেশেই আসেনি উদার-হস্তের দানকে আশ্রয় ক'রে। ইচ্ছা ক'রে কেউ কাউকে স্বাধীনতা দেয় না। স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করতে হয় দুঃখের জোরে। সেই দুঃখবরণের শৌর্য্য নেই যেখানে—সেখানে পরাধীনতার অন্ধকার চিরন্তন। স্বাধীনতার চেয়ে কম যদি কিছু চাই, তবে অবশ্য বিপদকে বরণ করবার কোনো আবশ্যকতা নেই। বৃটেন আনন্দের সঙ্গে তা আমাদের দান করবে। কিন্তু আধা-স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কোনো লাভ হবে না—তাতে পেটও ভরবে না, জাতও যাবে, মধ্যে থেকে গোলামের কলঙ্ক-তিলক আমাদের ললাটে যেমন আঁকা হ'য়ে আছে, তেমনই আঁকা হ'য়ে থাকবে। তাছাড়া দয়ার দান হিসাবে যা আমরা পাবো, তাকে তো আমরা রক্ষা করতে পারবো না। যাকে আমরা পৌরুষ দিয়ে, রক্ত দিয়ে অর্জ্জন করি তাকেই আমরা রক্ষা করতে পারি। সুতরাং পূর্ণ স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য আমাদের বহু দুঃখ বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। 'মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাবে রঙ্গে'—এরকম কোনো কথা স্বাধীনতার ইতিহাসে নেই। তাই দুঃখের মন্ত্রই হোক আমাদের নব বৎসরের মন্ত্র। যে নতুন জগৎকে আমরা সৃষ্টি করবো ব'লে সংকল্প করেছি তার আবির্ভাব কখনো সহজে ঘটবে না। জীবন আসে মৃত্যুর বুক চিরে। বীজকে মাটির তলায় আগে ম'রে যেতে হয়, তবে সে হেমন্তের সোনালী শস্য-সম্ভারে আপনাকে সার্থক করতে পারে। আমরা যারা আনন্দের নতুন জগৎকে তৈরী করবো ব'লে কৃতসংকল্প হয়েছি—আমাদেরও মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে। আমাদের মরতে হবে—ছেঁড়া কাঁথায় ম্যালেরিয়ার রোগীর মত নয়, ন্যায়ের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সত্যের পথে অবিচলিত থেকে তিলে তিলে মরতে হবে।

এ-তো গেল নিজেদের সম্পর্কে। আর এই যে হাজার হাজার মানুষ দুঃসহ দৈন্যের মধ্যে জীবন্মৃত হ'য়ে আছে—এদের কানে আমরা কোন্ মন্ত্র দেবো নব বৎসরের প্রভাতে? শক্তিমন্ত্র আর অভীঃ মন্ত্র। দৈবকে সমস্ত দুঃখের জন্য দায়ী ক'রে যারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জড়ের জীবন অতিবাহিত করছে তাদের শোনাও শক্তির মন্ত্র। তাদের বল, দুঃখের জন্য দায়ী তাদের অজ্ঞতা আর ভীরুতা। দারিদ্র্যের দুঃখ ভূমিকম্পের মতো দৈবদুঃখ নয়—সে দুঃখের মূলে রয়েছে বর্ত্তমান নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থা যার ভিত্তি অন্যায়ের উপরে। এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় আছে, আর সে উপায় হ'চ্ছে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে সর্ব্বাগ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে পৌরুষের জোরে এই নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করা। টি'কে থাকার আদর্শের পরিবর্ত্তে তাদের সামনে ধরতে হবে বেঁচে থাকার আদর্শ। লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার শ্রমকে আশ্রয় ক'রেই যে এই সমাজের ইমারত খাড়া হ'য়ে আছে—এই কথা সর্ব্বাগ্রে শ্রমিক আর কৃষকদের বোঝানো দরকার। তারা যদি একবার গগনবিদারী কণ্ঠে গর্জ্জন ক'রে বলে,—আমাদের পরিশ্রম দিয়ে এই ইমারতকে আর খাড়া রাখবো না—এক মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান সমাজ-যন্ত্র বিকল হ'য়ে যায়। আপনাদের শক্তি সম্পর্কে এই চেতনা যে মুহূর্ত্তে জনসাধারণের বুকে জীবন্ত হ'য়ে উঠবে, সেই মুহূর্ত্তে আরম্ভ হবে পুরাতনের মৃত্যু এবং নতুনের সৃষ্টি। নবজাগ্রত গণসিংহ আপনার শক্তিকে আশ্রয় ক'রে অনিচ্ছুক হস্ত থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেবে।

নতুন বৎসরে তাই যে মন্ত্রে আমরা দীক্ষা নেবো—সে হচ্ছে দুঃখের মন্ত্র, অভীঃ মন্ত্র, শক্তিমন্ত্র। সুখ নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, খ্যাতি নয়, ঘরের আনন্দ নয়, পথ—দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ—এই পথই হোক আমাদের নব বৎসরের সাথী।

আজ-কাল

ওয়ার্কিং কমিটি বনাম বি-পি-সি-সি—

বাঙলায় আগামী কংগ্রেসী নির্ব্বাচন চালাবার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের মনোমত একটা কমিটি নিযুক্ত করায় বাঙলার কংগ্রেসী মহলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। প্রথমে বি-পি-সি-সি'র সেক্রেটারী মৌলবী আস্রাফউদ্দীন এক বিবৃতিতে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্রবিরোধী বলে বর্ণনা করেন এবং বি-পি-সি-সি'র বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটির অভিযোগকে অকিঞ্চিৎকর ব'লে অভিহিত করেন। গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেবও এক বিবৃতিতে অনুরূপ কথা বলেন। তিনি বলেন, এক তরফা অভিযোগ দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের সংখ্যাধিক দলকে উচ্ছেদ করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

অবস্থা এখন চরমে পেঁচেছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাঙলা ও সুরমা উপত্যকার সমস্ত কংগ্রেস কমিটিকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে, বাঙলার নির্ব্বাচনের জন্য কমিটি নিয়োগ এক-তরফা এবং নিয়মতন্ত্র বিরোধী। এই কমিটি স্বীকার ক'রে নিলে বি-পি-সি-সি'কে আত্মহত্যা করতে হয়; কিন্তু বি-পি-সি-সি'র বর্ত্তমান কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি বাঙলার জনসাধারণের পূর্ণবিশ্বাসভাজন; সুতরাং সে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতা ছাড়বে না। বি-পি-সি-সি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য ক'রে নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী নির্ব্বাচন চালাবেন।

ওয়ার্কিং কমিটির মনোনীত কমিটির অন্যতম সদস্য ও বি-পি-সি-সি'র কোষাধ্যক্ষ মিঃ জে সি গুপ্ত দুই জায়গা থেকেই পদত্যাগ করেছেন। তিনি নিরপেক্ষতার মনোভাব দেখিয়ে উভয়পক্ষকে মিটমাট করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

হিন্দু মহাসভা—

২৮শে ডিসেম্বর থেকে ক'লকাতায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ২৭শে তারিখে সভাপতি শ্রীযুক্ত সাভারকর এখানে পেঁছান। তাঁকে কলকাতার হিন্দুরা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানায়; হাওড়া ষ্টেশন থেকে বিরাট শোভাযাত্রা বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অভিভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিনে কয়েকটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবিলম্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাওয়া হয়, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করা হয়, হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহের সাফল্যে আনন্দপ্রকাশ করা হয় এবং পরলোকগত বিশিষ্ট হিন্দুদের জন্যে শোকপ্রকাশ করা হয়।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে বাঙলা মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির তীব্র প্রতিবাদ ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বাঙলার হিন্দুদের অধিকার ও স্বাধীনতা কিভাবে হরণ করা হচ্ছে এবং হিন্দুদের অর্থ-নৈতিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক জীবন কিভাবে দমন করা হচ্ছে তার ২০ দফা অভিযোগ দিয়ে এই প্রস্তাবটি রচনা করা হয়। বাঙলা মন্ত্রিমণ্ডীর এই নীতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে সমস্ত বাঙলার হিন্দুদের মিলিত হতে বলা হয় এবং ভারতের হিন্দুদের সাহায্য করতে বলা হয়। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন ক'রে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক জোরালো বক্তৃতা করেন।

প্রত্যেক দিন সভায় বিপুল জনসমাগম হয়।

৩১শে ডিসেম্বর ভাই পরমানন্দের সভাপতিত্বে হিন্দু যুব-সম্মেলন ও শ্রীযুক্তা সুশীলা সপ্তর্ষির সভানেতৃত্বে হিন্দু নারী সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

মণিপুরী মেয়েদের দাবী—

ধান কাটার সময়ে সমস্ত জিনিষপত্রের, বিশেষ ক'রে চালের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় মণিপুর রাজ্যে ভয়ানক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেখানকার মেয়েরা গত ১২ই ডিসেম্বর দরবারগৃহে চড়াও ক'রে দাবী জানায় যে, মণিপুর থেকে চাল রপ্তানি বন্ধ করতে হবে। হঠাৎ সৈন্যদল এসে তাদের উপর পড়ে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়। ফলে ২০ জন মেয়ে আহত হয়।

নিখিল মণিপুরী মহাসভা এই ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল, মণিপুররাজ চাল রপ্তানি বন্ধের দাবী মেনে নিয়েছেন।

ইউরোপের আবর্ত্ত

সোভিয়েট-ফিনিশ নাটক—

ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠেছে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধ'রে অনবরত খবর আসছে, সমস্ত রণক্ষেত্রে সোভিয়েট হেরে যাচ্ছে এবং তার সমর-শক্তি তুচ্ছ প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধ কি রকম হচ্ছে না হচ্ছে তা আমাদের পক্ষে এখান থেকে এখন বলা অসম্ভব। তবে সংবাদ প্রচারের কায়দার বাহাদুরী দিতে হয়। গত ২৬শে তারিখের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সোভিয়েটের কোন ইস্তাহার প্রচার করা হয়নি, এদিকে রোজ হেলসিঙ্কির বিস্তারিত ইস্তাহার তো দেওয়া হচ্ছেই, উপরন্তু স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে কোথায় হেলসিঙ্কির কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে তা প্রচার করা হচ্ছে। এ ছাড়া রয়টার-প্রতিনিধি মাঝে মাঝে হেলসিঙ্কির ফিনিশ কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে বাণী নিয়ে আসছেন।

কিন্তু এত সাঙ্ঘাতিক এবং রাশিয়ার পক্ষে এমন বিপর্য্যয়কর একটা যুদ্ধ যখন চলছে, তখন রাশিয়ার

কর্ত্তাদের নিশ্চয়ই তাঁদের জনসাধারণকে যুদ্ধের কোনো-না-কোনো রকম বিবরণ দিয়ে বুঝিয়ে রাখতে হচ্ছে। কিন্তু সে বিবরণ কেন আমাদের জানতে দেওয়া হচ্ছে না? মাঝে মাঝে যে সোভিয়েট ইস্তাহার প্রচার করা হয়, তা খুবই সংক্ষিপ্ত; তা থেকে কি ধরণের কথাগুলো ছাঁটাই করা হচ্ছে জানতে কৌতূহল হয়।

প্রতি একজন ফিনিশ সৈনিকে চল্লিশজন সোভিয়েট সৈনিক নিহত বা আহত হচ্ছে (দুই দেশের জনসংখ্যার অনুপাত ঠিক আছে), রুশ সৈন্যেরা ভুল ক'রে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, তারা যুদ্ধের সরঞ্জাম 'স্কি' পুড়িয়ে আগুন পোয়াচ্ছে ইত্যাদি চমকপ্রদ সংবাদ আমরা বেশ উপভোগ করছি; কিন্তু কতকগুলো খবর শেষ পর্য্যন্ত চাপা পড়ে যাচ্ছে—যেমন, প্রথমে সোভিয়েট সৈন্যদের বাধা দিলেন কাদা (সেনাপতি কর্দ্দম), তারপরে এলেন বরফ (সেনাপতি তুষার)। বোধ হয়, তাতেও সুবিধা হচ্ছে না দেখে অবতীর্ণ হলেন সেনাপতি বসন্ত, অর্থাৎ রুশ সৈন্যদের মধ্যে লেগে গেলো বসন্তের মড়ক। কিন্তু ঐ একদিন, তারপরে কি যে হ'ল তা জানা গেল না। মনে হয় ফিন সৈন্যেরা দারুণ জয়লাভ করতে থাকায় সেনাপতি বসন্তের আর দরকার হয়নি। সংবাদদাতারা আর একটু হুঁসিয়ার হ'লে আমরা—পাঠক বেচারীরা মাথা খাটাবার দায় থেকে রেহাই পাই।

সে যাক্, যুদ্ধের ফল যাই হোক, আসলে ফিনল্যাণ্ডে হচ্ছে কি? মঃ ষ্ট্যালিনের বাণী থেকে তো বোঝা যায়, ফিনল্যাণ্ডে একটা গৃহযুদ্ধ চল্‌ছে এবং এক পক্ষকে সোভিয়েট সমর্থন করছে। সোভিয়েট ইস্তাহারগুলোতে কোথাও এরকম কথা লেখা থাকে কি না জানি না, তবে ইতালীর আধা-সরকারী পত্রিকা "রেলাৎসিওনে ইন্তার-নাসিওনালি" পর্য্যন্ত সোভিয়েট-ফিনিশ সঙ্ঘর্ষকে "রহস্যাবৃত" ব'লে বর্ণনা করেছেন। তারপর আর একটা খট্‌কা লাগে। যে সময় সোভিয়েট এই রকম শোচনীয়ভাবে হেরে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় তার মতো একটা হাস্যকর সমর-শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানী এবং জাপান মিতালী আরো ঘনিষ্ঠ করছে। জাপান এই সপ্তাহেই সোভিয়েটের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তি ক'রে একটা চুক্তি করেছে। হে রয়টার, অন্ধজনে দেহ আলো!

"টাকোমা" জাহাজ আটক—

"গ্রাফ স্পে" যুদ্ধ-জাহাজকে "টাকোমা" নামে একটা জাহাজ নাকি রসদ ইত্যাদি সরবরাহ করত। "গ্রাফ স্পে" যখন উরুগুয়ের মণ্টিভিডেও বন্দরে যায়, তখন "টাকোমা"ও সেখানে গিয়েছিল। "গ্রাফ স্পে" আত্মবিলোপ করার পর উরুগুয়ে গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, "টাকোমা" জার্ম্মান নৌ-বহরের সাহায্যকারী জাহাজ, সুতরাং তার সম্বন্ধে যুদ্ধ-জাহাজ সম্পর্কীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। "টাকোমা"কে চ'লে যাবার জন্যে একটা সময় দেওয়া হয়; কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে সে চ'লে না যাওয়ায় তাকে উরুগুয়ে কর্তৃপক্ষ আটক করেছেন। যতদিন যুদ্ধ চলবে, ততদিন "টাকোমা"কে উরুগুয়েতে আটক রাখা হবে। এদিকে "গ্রাফ স্পে"র নাবিকদেরও বুয়েনোস এয়ারেসে আর্জ্জেণ্টাইন গবর্ণমেণ্ট অন্তরীণ করেছেন। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তা তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন।

তুরস্কে ভূমিকম্প—

গত সপ্তাহে তুরস্কের আনাতোলিয়াতে ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে। প্রায় ৩০ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং ১৫ হাজার লোক আহত হয়েছে। এরকম ভূমিকম্প পৃথিবীতে খুব কমই হয়েছে। ভূমিকম্পের পরই আবার ভীষণ জলপ্লাবন সুরু হয়েছে। দুর্গত তুর্কীদের সাহায্যের জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে অর্থাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

নববর্ষের আরম্ভ—

যুদ্ধের ছায়ায় এবার নববর্ষারম্ভ ম্লান। লণ্ডনে চিরা-চরিত উৎসব-অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-নায়কেরা নববর্ষের যে বাণী দিয়েছেন, তাতে আশার চেয়ে আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক) ১৯৪০-এ তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখ্‌ছে। জেনারেল স্মাট্‌স্ শান্তির জন্যে অলৌকিক ঘটনার ভরসায় আছেন। আর ফ্রান্স, বৃটেন ও জার্ম্মানী প্রত্যেকেই জয়লাভের সঙ্কল্প উচ্চারণ করেছে।

সিনেমা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতে শ্রম-শিল্পের উন্নতির জন্য সর্ব্বত্রই আন্দোলন চলিয়াছে এবং সে আন্দোলনের ঢেউ ভারতের সিনেমা-শিল্পগুলির উপরও আসিয়া পড়িয়াছে। সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন শ্রমশিল্পের ইতিহাসে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। সময়ের প্রয়োজনের তাগিদের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানই সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি ভারতের সিনেমা-শিল্পেও এই পরিবর্ত্তনের তাগিদ দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ এতদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে উৎপাদন করিতে হইবে; নতুবা ভারতের সিনেমা-শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে বিলীন।

কিন্তু এই সিনেমা-শিল্পে বৃহৎ-উৎপাদন আমাদের দেশে এখনও সম্ভব নয়। বৃহৎ আকারে উৎপাদন করিতে হইলে কাজের বোঝা ও দায়িত্ব যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা যদি একবার বিফল হয়, তাহা হইলে যে ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণ কখনও হইবে কি না সন্দেহ। ক্ষুদ্রাকারে উৎপাদনের দায়িত্ব কম বলিয়াই ইহার ক্ষতি সহজেই পূরণ করিয়া লওয়া যায়। সিনেমা-শিল্পের সহিত যাহারা অল্প-বিস্তর পরিচিত তাহারাই জানেন যে, প্রত্যেক ছবির গড়পরতা আয়ের একটা

'ডেষ্ট্রী রাইডস্ এগেন' চিত্রে উনা মার্কেল ও মার্লিন ডিয়েট্রিক্

যেভাবে কাজ চলিতেছিল, প্রযোজকরা তাহাতে আর সন্তুষ্ট নহেন, সিনেমা-শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা উদ্গ্রীব। ইহার অন্য একটি কারণ, দর্শকদের পক্ষ হইতে নূতন ছবি দেখিবার স্পৃহা। আজকাল একটি ছবি নূতন বাহির করিয়া দুই তিন মাস একই চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, কিন্তু সিনেমা-দর্শকগণ ইহাতে সন্তুষ্ট নহে, তাহারা চায় বিদেশী চিত্রগৃহের ন্যায় প্রতি সপ্তাহে নূতন ছবি। নূতন ছবি পরিবেশনের দায়িত্ব ও গুরুত্ব কম নহে, এমনকি ভারতীয় সিনেমা-শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। সুতরাং সিনেমা-শিল্পের কর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ ধুয়া তুলিয়াছেন যে, এতদিন যেভাবে কাজ চলিয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া বৃহদাকারে মোটামুটি হার আছে। ছবির জন্য যতই খরচ করা হউক না কেন, আয়ের সংখ্যা তাহাতে বাড়িবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অল্প খরচের মধ্যে ক্ষুদ্র আকারে যে ছবি উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রতি দৃশ্যকে সুন্দর ও সুচারুরূপে তুলিবার জন্য যথেষ্ট সময় তাহারা দিতে পারে। কিন্তু বৃহৎ শিল্পে অর্থব্যয় বেশী করিতে হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবি শেষ না করিতে পারিলে প্রযোজককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

অনেকেই অভিযোগ দিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের ষ্টুডিওগুলির সংগঠনকার্য্যের অক্ষমতার জন্য বৎসরে তিন চারিটির বেশী ছবি তুলিতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটি ছবি তুলিবার পূর্ব্বে তাহার সর্বদিক বিবেচনা করিয়া ও সকল

আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ছবি তুলিতে হইলে বৎসরে চার পাঁচটির বেশী ছবি তোলা সম্ভব নয়। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাড়াহুড়ার মধ্যে যেখানেই ছবি তোলার চেষ্টা হইয়াছে, সে চেষ্টা অধিকাংশ স্থলেই অৰ্দ্ধপথে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে এবং যাহা সম্পূর্ণভাবে তোলা হইয়াছে তাহা নানারকমের ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

অবশ্য একথা ঠিক যে, ছবি তোলার কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে হইলে ভারতের সিনেমা-শিল্পের সংগঠনা ও ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হওয়া উচিত; কিন্তু সিনেমা-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থায় বৃহৎ-উৎপাদনকে কোনক্রমেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। প্রতি ছবির গড়পরতা আয় যদি বৃদ্ধি না পায় এবং সিনেমার প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ যদি আরও না বাড়ে, তাহা হইলে বৃহৎ-উৎপাদনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় সিনেমা-শিল্পই দুর্ভাগ্যবশত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এমনকি আইন প্রণয়নকারীরাও এবিষয়ে একেবারেই চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় বিঘ্ন হইতেছে, বর্ত্তমানের যুদ্ধবিগ্রহ। ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে সিনেমা-শিল্পের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের আমদানী নিয়মিত হইতেছে না এবং যে সকল জিনিষ পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় নির্ব্বিঘ্নে ছবি তোলার কাজে নানারূপ বাধার সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সিনেমা-শিল্পের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সাধনের পূর্ব্বে নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

মার্লিন ডিয়েট্রিকের নূতন চিত্র

"ডেস্ট্রী রাইডস্ এগেন" নামক ইউনিভার্সালের একটি নূতন ছবিতে মার্লিন ডিয়েট্রিক নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছেন। নায়কের ভূমিকায় আছেন বর্ত্তমানের জনপ্রিয় অভিনেতা জেমস্ ষ্টুয়ার্ট। বিশিষ্টা অভিনেত্রী উনা মার্কেল, যিনি দর্শকদের প্রচুর হাসাইয়া থাকেন, তাঁহাকেই এই ছবিতে দেখা যাইবে।

যুদ্ধকালীন বৈদেশিক ছবি

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রথম সূচনা হইতেই সিনেমা-শিল্প ব্যবসায়ীদের ও সিনেমা অনুরাগীদের মনে আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল যে, উৎকৃষ্ট ছবি প্রস্তুত হয়ত আর সম্ভব হইয়া উঠিবে না; উপরন্তু অধিকাংশ ষ্টুডিও হয়ত বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু বৈদেশিক সিনেমা সংবাদ হইতে আমরা জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, শান্তিকালে যে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ছবি প্রস্তুত হইয়াছে যুদ্ধকালেও সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ছবিই প্রস্তুত হইতেছে এবং হইবে। এই আশ্বাসের মূল কারণ হইতেছে বণিক সঙ্ঘের সভাপতির ঘোষণা। তিনি জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানকেই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে। নবপ্রবর্ত্তিত জরুরী আইন অনুসারে সিনেমা-শিল্পের সব চেয়ে বড় সুবিধা হইতেছে এই যে, সিনেমা-শিল্পের যে বাৎসরিক পরিকল্পনা যুদ্ধের পূর্ব্বে হইতেই স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল, ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী থাকিবে এবং ৩১শে মার্চ্চের পরেও প্রয়োজন হইলে সুবিধা মতন উক্ত পরিকল্পনা বলবৎ থাকিবে। আমেরিকান ও বৃটিশ ছবির প্রতি যাঁহারা অনুরক্ত তাঁহাদের পক্ষে এই সংবাদ আনন্দের নিশ্চয়ই।

কলিকাতায় গ্র্যাণ্ড ফেয়ারী সার্কাস

এবার বড়দিনে প্রোঃ আম্বুর গ্র্যাণ্ড ফেয়ারী সার্কাস প্রত্যহ ২॥ ঘণ্টা কাল বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক দেখাইয়া আসিতেছে। ইহারা প্রত্যহ তিনবার খেলা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইংরেজ, অষ্ট্রেলিয়ান ও ভারতীয় শিল্পিগণের ক্রীড়া, ব্যায়াম, ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পাহাড়-জঙ্গল হইতে সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত বন্য জন্তু, হাতী, সিংহ, ঘোড়া, ব্যাঘ্র, বানর প্রভৃতির ক্রীড়া-কৌতুক ইহাদের বিশেষত্ব।

নকল বন্দুক হাতে হিন্দুসভার স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী

নিখিল ভারত ও পূর্ব্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

সাউথ ক্লাব পরিচালিত নিখিল ভারত ও পূর্ব্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইয়াছে। নিখিল ভারত অনুষ্ঠান হিসাবে এই অনুষ্ঠানে উৎসাহ ও উদ্দীপনার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অধিকাংশ দিনই দর্শকবিরল মাঠে প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিখিল ভারত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানকে এইরূপভাবে পূর্ব্ব ভারত প্রতিযোগিতার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়ার ফলেই এইরূপ হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। পরিচালকগণের পরিচালনায় যে কোনরূপ দোষ-ত্রুটি ছিল না, তাহাও নহে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালকগণ অপটু, অনভিজ্ঞ, প্রথম শ্রেণীর টেনিস খেলার অযোগ্য খেলোয়াড়গণকে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দেন নাই। ঐ সমস্ত খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার সম্মান ও গুরুত্ব অনেকখানি কমাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাস্যোদ্দীপক ক্রীড়াকৌশল দর্শকগণের নিরুৎসাহের অন্যতম কারণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পরিচালকগণ এই একটি বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যদি কার্য্য করেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতে এইরূপ অনুষ্ঠানের ভার লইয়া উৎসাহের অভাব অনুভব করিবেন না।

বৈদেশিক খেলোয়াড়গণ

যুগোশ্লাভিয়ার দুইজন খেলোয়াড় পুনচেক ও মিটিককে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পরিচালকগণ যে উদ্দেশ্যে আনাইয়াছিলেন, তাহা সার্থক হয় নাই। পুনচেক তাঁহার খ্যাতি অনুযায়ী খেলিলেও মিটিক টেনিস উৎসাহীদের বিশেষভাবে হতাশ করিয়াছেন। সিংগলসের চতুর্থ রাউণ্ডে প্রবীণ ভারতীয় খেলোয়াড় মহম্মদ শলীমের নিকট ডি মিটিক পরাজিত হইলে সকলেই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পরিচালকগণ অর্থের অপব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমরা পরিচালকগণের বিশেষ দোষ দিতে পারি না। কারণ যে মিটিক এই বৎসর উইম্বলডেন ও ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি মাত্র কয়েক মাস পরে যে ভারতের কোন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন, ইহা পরিচালকগণ কিরূপে জানিবেন? মিটিক ঐ সমস্ত প্রতিযোগিতার পর খেলা হইতে অবসর লইয়া বসিয়াছিলেন, অথবা নিয়মিত অনুশীলন করিতেন না, ইহা পরিচালকগণের জানা অসম্ভব। এই বৎসরের খেলার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াই মিটিকের জন্য তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। মিটিক কোন এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি সাউথ ক্লাবের ন্যায় নরম ঘাসের মাঠে কখনও খেলেন নাই এবং সেইজন্য তিনি স্বাভাবিক খেলা খেলিতে পারেন নাই। পুনচেক ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৪ সালে খেলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এই বৎসর খেলিতে আসিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন নাই। তাঁহারা হাউকোর্ট মাঠে খেলিতে অভ্যস্থ। মিটিকের এই উক্তি খুব যুক্তিহীন বলা চলে না। মিটিক সকলকে হতাশ করিলেও পুনচেক সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তাঁহার ক্রীড়াকৌশল হইতে সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন, কেন তিনি পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পূর্ব্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার সিংগলসের সকল খেলাতেই তিনি প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করিয়াছেন। ডাবলসের খেলাতেও তাঁহার দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা এস এল আর সোহানী ও এইচ এল সোনীকে ফাইনালে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য করে। মিক্সড ডাবলসে তিনি পরাজিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহার সহযোগিনী মিসেস বিশপের জন্য।

খেলার ফলাফল

নিখিল ভারত ও পূর্ব্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বের এক প্রবন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, ফলত, একরূপ তাহাই হইয়াছে। পুরুষদের সিংগলসে পুনচেক, ডাবলসে পুনচেক ও মিটিক বিজয়ী হইয়াছেন। মহিলাদের সিংগলসেও লীলারাও চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। কেবল মাত্র মিক্সড ডাবলসে সোহানী ও মিস হার্ভিজনষ্টন পরাজিত হইয়াছেন। এই দিন সোহানী স্বাভাবিকভাবে খেলিতে না পারায়, এইরূপ ফল হইয়াছে।

বিভিন্ন খেলার ফলাফল :—

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল

এফ পুনচেক ১১—৯, ৬—৪, ৭—৫ গেমে যুধিষ্ঠির সিংহকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

ইফতিকার আমেদ ও মিস উডব্রিজ ৬—৩, ৩—৬, ৬—২ গেমে এস এল আর সোহানী ও মিস হার্ভিজনষ্টনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিস উডব্রিজ ও মিসেস আর এল সি ফুটিট ৭—৫, ৬—২ গেমে মিস লীলারাও ও মিসেস ডি ক্রুচকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডাবলস ফাইনাল

এ পি মিত্র ও মহম্মদ শলীম ৩—৬, ৬—৪, ১০—৮ গেমে এস এইচ মেয়ার ও এইচ ব্রককে পরাজিত করেন।

ছোটদের ডাবলস ফাইনাল

নসু সেন ও খসু সেন ৬—২, ৮—৬ গেমে রণবীর পান্ধী ও সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল

এফ পুনচেক ও ডি মিটিক ৬—৩, ১১—৯, ৩—৬, ৭—৫ গেমে এস এল আর সোহানী ও এইচ এল সোনীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল

মিস লীলারাও ৬—৩, ৬—২ গেমে মিস উডব্রিজকে পরাজিত করেন।

ছোটদের সিংগলস ফাইনাল

খসু সেন ৪—৬, ৬—৩, ৬—১ গেমে নরীন্দ্রনাথকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের সিংগলস ফাইনাল

এস এইচ মির্জ্জা ৬—৪, ৬—৩ গেমে এল পি মিশ্রকে পরাজিত করেন।

পেশাদারদের সিংগলস ফাইনাল

মুরাদ খাঁ ৬—১, ৬—২, ৩—৬, ৬—৪ গেমে সিরাজুল হককে পরাজিত করেন।

পেশাদারদের ডাবলস ফাইনাল

মুরাদ খাঁ ও তমাস খাঁ ৬—২, ৬—০, ৬—২ গেমে রাম-সেবক ও আল্লাবক্সকে পরাজিত করেন।

আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা

কলিকাতা সাউথ ক্লাব পরিচালিত আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হইয়াছে। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় আশাতীত ক্রীড়ানৈপুণ্যে প্রদর্শন করিয়া যুগোশ্লাভিয়ান টেনিস খেলোয়াড়-গণকে ৩—২ খেলায় পরাজিত করিয়াছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়-গণের এই সাফল্য প্রকৃতই প্রশংসনীয় ও উৎসাহবর্দ্ধক। পূর্ব্বে ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় যুগোশ্লাভিয়ান টেনিস খেলোয়াড়-গণের কৃতিত্ব অবলোকন করিয়া কেহই ধারণা করিতে পারে নাই যে, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ আন্তর্জ্জাতিক খেলায় বিজয়ী হইবে। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতাটি ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। উভয় দলকে চারিটি সিংগলস ও একটি ডাবলস খেলায় যোগদান করিতে হয়। এই পাঁচটি খেলার মধ্যে যে কোন তিনটি খেলায় জয়লাভ করিলে, সেই দলকেই বিজয়ীর সম্মান দেওয়া হয়। সুতরাং পূর্ব্বে ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুসারে যুগোশ্লাভিয়ান খেলোয়াড়গণই সেই সম্মান লাভ করিবেন। যুগোশ্লাভিয়ার এফ পুনচেক দুইটি সিংগলসে ও ডি মিটিকের সহযোগিতায় ডাবলসে বিজয়ী হইবেন। কিন্তু ফলত তাহা হইল না। পুনচেক দুইটি সিংগলসে বিজয়ী হইলেন, কিন্তু ডাবলসে ডি মিটিকের সহযোগিতায় খেলিয়া ষ্ট্রেট সেটে ভারতীয় জুটী এস এল আর সোহানী ও ইর্ফতিকার আমেদের নিকট পরাজিত হইলেন। এস এল আর সোহানীর খেলা এই দিন এতই মারাত্মক ভাব ধারণ করিল যে, পুনচেক বা মিটিক কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং ডাবলসের খেলায় শোচনীয় পরাজয় বরণ করিলেন। সিংগলসের দুইটি খেলায় যুগোশ্লাভিয়ার ডি মিটিক ভারতীয় প্রতিনিধি যুধিষ্ঠির সিং ও ইর্ফতিকার আমেদের নিকট পরাজিত হইলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দুইটি সিংগলসে ও একটি ডাবলসের খেলায় জয়ী হওয়ায় প্রতিযোগিতায় ৩—২ খেলায় জয়লাভ করিলেন। সাউথ ক্লাবের পরিচালিত আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় ইহাই ভারতীয় দলের চতুর্থ জয়লাভ।

আন্তর্জ্জাতিক খেলার ইতিহাস

১৯৩০ সালে সর্ব্বপ্রথম সাউথ ক্লাব আন্তর্জ্জাতিক টেনিস খেলার প্রবর্ত্তন করেন। উহার পর হইতে প্রতি বৎসরই এই প্রতিযোগিতা সাউথ ক্লাবের উডবার্ন পার্কস্থ লনে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই পর্য্যন্ত যতবার খেলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ চারিবার বিজয়ী ও চারিবার পরাজিত হইয়াছে। একবারের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ১৯৩১ সালে জাপানের ভাইকাউণ্ট কানো উক্ত প্রতিযোগিতার জন্য একটি কাপ প্রদান করেন। ঐ কাপটি বিজয়ী দলকে প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া প্রতিযোগিতায় যে সকল খেলোয়াড় যোগদান করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে সাউথ ক্লাব একটি করিয়া বিশেষ উপহার দিয়া থাকেন। নিম্নে এই বৎসরের ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

সিংগলস খেলা

যুধিষ্ঠির সিংহ (ভারতবর্ষ) ৯-৭, ৬-৩ গেমে ডি মিটিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

এফ পুনচেক (যুগোশ্লাভিয়া) ৬-০, ১-৬, ৬-১ গেমে ইর্ফতিকার আমেদকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

ইর্ফতিকার আমেদ (ভারতবর্ষ) ৬-১, ৬-৪ গেমে ডি মিটিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

এফ পুনচেক (যুগোশ্লাভিয়া) ৬-০, ৬-২ গেমে যুধিষ্ঠির সিংহকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

ডাবলসের খেলা

এস এল আর সোহানী ও ইর্ফতিকার আমেদ (ভারতবর্ষ) ৬-৪ ৬-১ গেমে এফ পুনচেক ও ডি মিটিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বের ফলাফলঃ—

১৯৩০ সালঃ—গ্রেট ব্রিটেন বনাম ভারতবর্ষ। খেলায় গ্রেট ব্রিটেন দল বিজয়ী।

১৯৩১ সালঃ—জাপান বনাম ভারতবর্ষ। জাপান দল এই খেলায় জয়লাভ করেন।

১৯৩২ সালেঃ—ইটালী বনাম ভারতবর্ষ। ভরতবর্ষের দল এই খেলায় জয়লাভ করেন।

১৯৩৩ সালেঃ—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ। ভারত-বর্ষ দল এই খেলায় জয়লাভ করেন।

১৯৩৪ সালেঃ—যুগোশ্লাভিয়া বনাম ভারতবর্ষ। যুগো-শ্ল্যাভিয়া দল বিজয়ী হয়।

১৯৩৫ সালেঃ—মধ্য ইউরোপ বনাম ভারতবর্ষ। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

১৯৩৬ সালেঃ—ফ্রান্স ও নিউজিল্যাণ্ড সম্মিলিত দল বনাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ দল খেলায় বিজয়ী হয়।

১৯৩৮ সালেঃ—আমেরিকা বনাম ভারতবর্ষ। আমেরিকা দল এই খেলায় জয়লাভ করে।

সমর-বার্ত্তা

২৭শে ডিসেম্বর—

পশ্চিম রণাঙ্গনে ঘন কুয়াসার জন্য যুদ্ধ একরূপ বন্ধ থাকে। উত্তর সাগরে বৃটিশ বিমান-বহরের সহিত জার্ম্মান বিমান ও জাহাজের সংঘর্ষ হয়।

উত্তর রণাঙ্গনে সোভিয়েটবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ফিনরা সোভিয়েটবাহিনীর পাঁচ হাজার সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে এবং ৪০টি সোভিয়েট বিমান ভূপাতিত করিয়াছে বলিয়া দাবী করে।

দক্ষিণ ফিনল্যাণ্ডের উপর রাশিয়ানরা ব্যাপক আক্রমণ চালায়। রাশিয়ানরা ম্যানারহাইম লাইন ভেদ করার জন্য খুব চাপ দেয় এবং ক্যারেলিয়ান যোজকের সমস্ত রণক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করে।

২৮শে ডিসেম্বর—

হেলসিঙ্কির এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ানদের সুভাণ্টা হ্রদ অতিক্রমের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দাবী করা হইয়াছে যে, ক্যারেলিয়ান যোজকে আটটি সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে।

ভারতীয় সৈন্যদলের প্রথম দল ফ্রান্সের একটি বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছে। ইহারা ফ্রান্সে বৃটিশবাহিনীর সহিত কার্য্য করিবে।

আনকারার রেডিওতে প্রচার করা হইয়াছে যে, মঃ ট্রটস্কি অদ্য এক বিবৃতিতে রুশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের নিন্দা করিয়াছেন।

"গ্রাফ স্পে"র নাবিকগণকে অন্তরীণ করার বিরুদ্ধে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট যে নোট দিয়াছিলেন, আর্জ্জেণ্টাইন গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পোপ অদ্য রোমে গমন করিয়া ইতালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পোপ ও ইতালীর রাজার এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সকলেই মনে করিতেছে যে, ইতালীর রাষ্ট্র ও ভাটিকানের মধ্যে যে প্রাচীন বিরোধ ছিল, তাহা এই ঘটনায় মিটিয়া গেল।

২৯শে ডিসেম্বর—

উত্তর সাগরে একটি ইউবোটের আক্রমণে একটি বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ ঘায়েল হয় এবং তিনজন লোক নিহত হয়। ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলের নিকট 'হানে' নামক একটি ডেনিশ জাহাজ মাইনের আঘাতে নিমজ্জিত হয়।

ষ্টকহলম-এর বেতার ঘোষণায় প্রকাশ, ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যের জন্য সুইডেনে মোট ৫০ লক্ষ ক্রোনার (সুইডিশ মুদ্রা) সংগৃহীত হইয়াছে। অসলোর খবরে প্রকাশ, নরওয়েতে এ পর্য্যন্ত লোকে স্বেচ্ছায় মোট ৮০ লক্ষ ক্রোনার চাঁদা দিয়াছে এবং উহা ফিনিশ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

৩০শে ডিসেম্বর—

একটি সুইডিশ পত্রিকায় প্রকাশ যে, উত্তর ইউরোপে যুদ্ধ বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জার্ম্মানী ও রুশিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার (সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। উক্ত পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মানী ও সোভিয়েট শীঘ্রই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করিবে।

ম্যানারহাইম লাইন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রুশেরা বিরাট আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং দেড় লক্ষ নূতন রুশ সৈন্য সেলনে গিয়া যোগদান করিয়াছে।

জার্ম্মান বাহিনীর উদ্দেশে প্রেরিত বাণী ছাড়া হের হিটলার নববর্ষ উপলক্ষে নাৎসী পার্টির উদ্দেশেও একটি সুদীর্ঘ বাণী পাঠাইয়াছেন। এই বাণীতে তিনি ১৯৪০ সালকে "জার্ম্মান জাতীয় ইতিহাসের চরম ভাগ্য নির্দ্ধারণের বৎসর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৩১শে ডিসেম্বর—

হেলসিঙ্কির এক ইস্তাহারে সমস্ত রণক্ষেত্রেই ফিনদের সাফল্য দাবী করা হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সুওমুসালমি রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সৈন্য দল একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সাল্লা রণক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ১২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে। ক্যারেলিয়ান যোজকে বরফের উপর দিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে এবং ৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে। কালজাড়ুওসুলাতে ফিনরা বহু রণসম্ভার হস্তগত করিয়াছে। ফিনরা পেটসামো বন্দর পুনরধিকার করিয়াছে।

দক্ষিণ ফিনল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েট বিমান বহর ব্যাপক আক্রমণ চালায়।

ফিনল্যাণ্ডে বিদেশী পর্য্যবেক্ষকগণ নাকি অনুমান করিতেছেন যে, যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এ পর্য্যন্ত রাশিয়ার এক লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ফিনরা দাবী করিতেছে যে, উত্তরাঞ্চলের ফিনিশ বাহিনীর রক্ষী সেনাদল মারমানস্ক-লেনিন-গ্রাড লাইনের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়াছে।

টোকিওর খবরে প্রকাশ, ফরাসী-ইন্দোচীনের পথে ন্যানিং শহরটি পুনরধিকার করার জন্য চীনাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং ১৩৫৫ জন চীনা সৈন্য নিহত হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী—

বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষের আক্রমণে মোট ৪৬৯৯ টনের তিনটি বৃটিশ ও দুইটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রসংঘে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফিনল্যাণ্ডকে সর্ব্বপ্রকার সম্ভবপর উপায়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন এবং ঐ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

জার্ম্মান নৌ-বহরের সাহায্যকারী জাহাজ 'টাকোমা'কে 'গ্রাফস্পে'র নাবিকগণসহ মণ্টিভিডিও বন্দরে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

দুইটি জার্ম্মান বিমান সেটল্যাণ্ডে হানা দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু বৃটিশ বিমানধ্বংসী কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে বিতাড়িত হয়।

২রা জানুয়ারী—

ক্যারেলিয়ান যোজক রণাঙ্গনে মোট তিন লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য সমবেত হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী ম্যানারহাইম ব্যূহ ভেদ করার জন্য প্রবল আক্রমণ চালায়।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, মঃ ষ্ট্যালিন ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনীর নায়ক মার্শাল বুদেনীকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনীর মধ্যে নববর্ষের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় হইয়াছে।

কোপেনহেগেনের সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া যান-বাহন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য মঃ ষ্ট্যালিন জার্ম্মানীর নিকট দুই লক্ষ যন্ত্রবিদ্ ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশেষজ্ঞ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমেরিকার উদ্দেশ্যে বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে চীনের পররাষ্ট্র-সচিব ওয়াং চু এই ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ জয় সম্পর্কে চীন সুনিশ্চিত।

জাপানের সমর-সচিব জেনারেল হাটা নববর্ষ উপলক্ষে ঘোষণা করেন যে, অচিরে চীনে একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

২৬শে ডিসেম্বর—

বোম্বাই আইন সভার কংগ্রেসী দলের এক বৈঠকে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করিয়া এক বক্তৃতা করেন। মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লইবার জন্য মিঃ জিন্না যে দাবী জানাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে সর্দ্দার প্যাটেল বলেন, "মিঃ জিন্নার দাবী মানিয়া লওয়ার অর্থ কংগ্রেসের আত্মহত্যা করা।"

২৭শে ডিসেম্বর—

তুরস্কের আনাতোলিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। ফলে প্রায় আট সহস্র লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বহু নগর ও গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতার হিন্দু নাগরিকগণ কর্ত্তৃক তিনি বিপুলভবে সম্বর্দ্ধিত হন।

ডাঃ আর পি পরাঞ্জপের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশন আরম্ভ হয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেয়ারম্যান স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৮শে ডিসেম্বর—

কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে বীর সাভারকরের সভাপতিত্বে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার একবিংশতিতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছয় হাজার প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে লইয়া প্রায় ৩০ হাজার লোক অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ভাই পরমানন্দ, ডাঃ বি এস মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ নারাঙ্, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোর্জ্জি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট হিন্দু নেতা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এইবারকার অধিবেশনে সমগ্র ভারতের সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যে সাড়া পড়িয়াছে তাহা হিন্দু সভার ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বলা যাইতে পারে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে নেপালের মহারাজাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। মেয়র শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন মানপত্র পাঠ করেন।

২৯শে ডিসেম্বর—

কলিকাতায় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে মোট ছয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে ও বিনাসর্ত্তে মুক্তির ও বিদেশে নির্ব্বাসিত সকল ভারতীয়কে ফিরাইয়া আনার দাবী করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বাঁটোয়ারা রদ করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন করিবার জন্য হিন্দু মহাসভা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতের জনগণের নিকট আবেদন জানান।

মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধী "যমুনা-নর্ম্মদা-সিন্ধু-সাগর পার্টি" নামে কংগ্রেসের মধ্যে একটি নূতন দল গঠন করিয়াছেন।

৩০শে ডিসেম্বর—

কলিকাতায় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন শেষ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে মোট ১৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী আইন প্রণয়নে ও শাসনকার্য্যে যে সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার নিন্দা করা হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোর্জ্জি প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কেও হিন্দু মহাসভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবে যুদ্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একেবারে অসহযোগিতা ঘোষণা করা হয় নাই; তবে কার্য্যকরী সহযোগিতা পাইতে হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি কাজ করিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, যেমন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে তাহা দূর করা।

হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, শেঠ যুগলকিশোর বিরলা বাঙালী হিন্দু যুবকগণের শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করিয়া বৎসরে মোট ৩৬ হাজার টাকা হিসাবে তিন বৎসরকাল দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কলিকাতার লোহা-লক্কর ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলী হিন্দু সভার কার্য্যের জন্য ৫ শত টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি কলিকাতার লোহা-লক্কর ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ২০ হাজার টাকা তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। করাচীর বিখ্যাত জনহিতৈষী রায় বাহাদুর নারায়ণদাস সিন্ধুদেশে একটি সামরিক কলেজ স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে অদ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে কার্য্যকরী সমিতি 'এড হক' কমিটি মানিয়া লইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কার্য্যকরী সমিতির মতে উক্ত কমিটি মানিয়া লইলে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সত্তা বিলুপ্ত হইবে।

৩১শে ডিসেম্বর—

কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে ভাই পরমানন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু যুব-সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়। ঐ দিন দেশবন্ধু পার্কে অখিল ভারত হিন্দু মহিলা সম্মেলনেরও অধিবেশন হয়। মাদ্রাজের শ্রীযুক্তা সুশীলা সপ্তর্ষি উহাতে সভানেত্রীত্ব করেন।

১লা জানুয়ারী—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে দিল্লীতে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সংগ্রাম বিমুখতার কঠোর সমালোচনা করেন এবং ছাত্র সমাজকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ জানান।

২রা জানুয়ারী—

লাহোরে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু নেতা রায় বাহাদুর বেলীরাম আততায়ীর আক্রমণে নিহত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর বেলীরাম হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে যোগ দিবার পর কলিকাতা হইতে ফিরিতে ছিলেন। আততায়ী একজন বলিষ্ঠ পাঠান যুবক বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

মাদ্রাজে নিখিল ভারত খাদি ও স্বদেশী প্রদর্শনীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে প্রদর্শনীর সমস্ত ষ্টল ভস্মীভূত হইয়াছে।

মাদ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্তবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধ্যাপক বীরবল সাহনী উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

ভূমিকম্প এবং প্লাবনের পরেই তুরস্কে আবার আর একটি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কৃষ্ণসাগরের ভীষণ ঝড়ে বহু তুর্কী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। পশ্চিম আনাতোলিয়ায় কামাল পাশা অঞ্চলে খরস্রোত বন্যার জলে সাত শতেরও অধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ১৪ই পৌষ ১৩৪৬ Saturday, 30th December 1939 [৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার পথ—

ওয়ার্কিং কমিটি বলিতেছেন—"কংগ্রেসকর্ম্মীরা এক্ষণে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কঠোর শ্রম ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে না।" কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে এতদিনে এই সত্য ওয়ার্কিং কমিটি বুঝাইতে যাইতেছেন ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সম্বন্ধে আত্যন্তিকতায় প্রথমেই উপলব্ধি হয় এই সত্যটি। স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। অর্জ্জনের যোগ্যতার পথেই স্বাধীনতা আকার ধরিয়া উঠে, স্বাধীনতাকে সত্য করিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং স্বাধীনতা আদায় করিতে হইবে, উদারতার প্রভাবে কেহ আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে পারে না, দিলেও উহা কথামাত্রেই থাকিয়া যায়, কার্য্যত পরের অনুগ্রহই জাতিকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই স্বাধীনতা আদায় করিবার পথ কি? ওয়ার্কিং কমিটির তৎসম্বন্ধে উপদেশ এই যে—"অহিংসা, মৈত্রী ও আর্থিক স্বাধীনতার প্রতীক খদ্দর প্রচার কর্ম্মপন্থার সাফল্য অর্জ্জনে অত্যাবশ্যক। সুতরাং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আশা করেন যে, সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠনমূলক কার্য্যতালিকা প্রবলভাবে চালাইয়া নিজদিগকে উপযুক্ত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে যখন আহ্বান আসিবে তখন তাহারা তাহাতে সাড়া দিতে পারিবেন।" চরকা এবং খদ্দরের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে অহিংসার কি সম্পর্ক আছে আমরা জানি না। স্বাধীনতার আহ্বান আসে স্বার্থ-সঙ্ঘাতের উপলব্ধির ভিতর দিয়া এবং সেই উপলব্ধির উগ্রতা আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন তীব্র করিয়া তোলে। স্বাধীনতার পথ 'কঠোর পথ' বলিতে যদি ওয়ার্কিং কমিটি এই আত্মাবদানের পথই বুঝিয়া থাকেন, তবে জিজ্ঞাস্য হয় এই যে, চরকা ও খদ্দরের পথ কি সেই পথ? যদি তাহাই হয়, তবে যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ জাতির কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করা অবান্তর হইয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের পরিস্থিতির সাময়িকতার রাজনৈতিক গুরুত্ব যদি স্বীকার করতে হয়, তাহা হইলে সাময়িক হিসাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযোগী সুযোগও গ্রহণ করিতে হয়। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবের সার্থকতা ছিল এই দিক হইতেই। ওয়ার্কিং কমিটি হরিপুরা কংগ্রেসের যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবকে এড়াইয়া আজ চরকা ও খদ্দরের কথা শুনাইতেছেন; কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার অনেক আগেও আমরা সেকথা শুনিয়াছি; বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্পর্কিত রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োগ-পটুতা উহাতে নাই এবং তাহা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আত্যন্তিকতার অভাবকেই প্রকারান্তরে অভিব্যক্ত করে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝে শক্তি, এমন যুক্তিতে তাহাদের অন্তরে প্রেমপ্রশ্ন ফুটিয়া উঠিবে, মনের কোণে এমন বিশ্বাসের সঙ্গে 'কঠোর শ্রম ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে না' এই বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের একান্ত সঙ্গতি কোথায়?

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত—

গত ২২শে ডিসেম্বর ওয়ার্দ্ধাতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। বড়লাটের কলিকাতার বক্তৃতা এবং জিন্নাই 'মুক্তি দিবসের' ব্যর্থ বিক্ষোভের অভিজ্ঞতা লইয়া এবারকার অধিবেশনের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং গুরুত্ব সেদিক হইতে কিছু আছে। বিশেষত্ব দেখা

যাইতেছে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের সুনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া। কমিটি বলিয়াছেন—"যতদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় এমন কোন তৃতীয় পক্ষের মুখাপেক্ষী থাকিবে, যাহার নিকট হইতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ বিশেষ সুবিধা, এমনকি জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়াও আদায় করিবার প্রত্যাশা রাখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সন্তোষজনকভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের আশা নাই।" বৈদেশিক শাসন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতে বাধ্য। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস, বৈদেশিক শাসন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হইলেই মৈত্রী স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইবে। সিদ্ধান্ত বুঝিতে গোল কিছুই নাই, গোল ঘটিতেছে কার্য্যে পরিণত করিবার বেলায়। কারণ, বৈদেশিক শাসন যতদিন আছে, তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সমস্যাও ততদিন আছে এবং থাকিবেও। বৈদেশিক শাসন-সংশ্লিষ্ট স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতাকে সচেতন রাখিবে; সমস্বার্থের ভিত্তিতেই আপোষ-নিষ্পত্তি সম্ভব। বিদেশীর স্বার্থের দ্বারা যাহারা প্রভাবিত, তাহারা জাতীয়তার ভিত্তিতে সমস্বার্থকে কিছুতেই মনেপ্রাণে স্বীকার করিতে পারে না। সমস্যার সমাধানের পথে আসার সূত্র এই যে, বিদেশীর স্বার্থ ভারতের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থকে পরিপুষ্ট করিতে পারে না। যদি তাহাই সে করিতে যায়, তাহা হইলে নিজের উদ্দেশ্যই তাহার নষ্ট হইবে। বিদেশীর স্বার্থের প্রলোভনে ব্যক্তির স্বাধীন পিপাসা তৃপ্ত হইতে পারে—সে শুধু জাতির স্বার্থকে ক্ষুন্ন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতারই পথে। এমন অবস্থায় স্বাধীনতার পথে শক্তি বাড়াইবার প্রকৃত পথ হইল বিদেশীর স্বার্থে প্রভাবিত যাহারা, তাহাদিগকে উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলিয়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থের উপরই জোর দেওয়া। স্বাধীন ভারতের স্বার্থ এবং বিদেশীর শোষণ-স্বার্থ এই দুইয়ের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির চক্রের মধ্যে পড়িবার যে মোহ কংগ্রেসের নীতিকে এতাবৎকাল বিড়ম্বিত করিয়াছে, প্রক্রিয়া-প্রয়োগে সেই বিড়ম্বনার জাল ছিন্ন করিতে হইবে। তেলে জলে কখনও মিশ খায় না—এই সার সত্যটি বুঝিয়া শক্ত মানুষের মত চলিতে হইবে।

সাহেব রক্ষিনী সভায় সওয়াল—

বড়দিনের পূর্ব্বে কলিকাতার 'ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন' বা সাহেব রক্ষিণী সভার অধিবেশন হয়, এবারও হইয়া গিয়াছে। এই সভায় সভাপতি বার্ডার সাহেব—বর্ত্তমান যুদ্ধের এই সংকটকালে ভারতের কালা আদমীদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, তোমরা ভারতবাসীরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নামিয়াছেন, সে কথা এখন জিজ্ঞাসা করিও না। একটা যুদ্ধ বাধিবে এবং সে যুদ্ধে আমাদের উদ্দেশ্য থাকিবে ইহাই, এমন কিছু ঠিক করিয়া ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধে নামে নাই। বার্ডার সাহেবের যুক্তি যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে মিঃ বার্ণার্ড-শয়ের যুক্তি মানিয়া লইয়া বলিতে হয় যে, চেম্বারলেন প্রভৃতি বৃটিশ রাজনীতিকরা স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতা প্রভৃতি বড় বড় যত বুলি তাঁহাদের যুদ্ধের লক্ষ্য বলিয়া আওড়াইতেছেন সেগুলি নিতান্তই মূল্যহীন, ছেঁদো কথা মাত্র। বার্ডার সাহেব কি তাহাই স্বীকার করিয়া লইবেন? বার্ডার সাহেব কি স্বীকার করিয়া লইবেন এই কথা যে, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ লড়াইতে নামে নাই, নামিয়াছে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য? যদি তাহা না হয়, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা, অন্যান্য দুর্ব্বল জাতির স্বাধীনতা নষ্ট হইবার আতঙ্ক নিরাকৃত করাই যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ইংরেজ করিবে কিনা, এ প্রশ্নটি অবান্তর হয় কোন হিসাবে? অপর জাতির স্বাধীনতার জন্য দরদে ইংরেজ যখন সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, তখন ইংরেজের অধিকারের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা সে দিবে, এই কথাটা খোলাখুলি বলিতে ইংরেজের কি আপত্তি থাকিতে পারে? সোজাসুজি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের ধুয়া ধরিয়া প্রশ্নটিকে চাপা দিবার যে কৌশল অবলম্বিত হইতেছে, তাহার ফলে সন্দেহ-সংশয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। বার্ডার সাহেবের উপদেশ বৃষ্টি এই দিক হইতে একান্তই নিরর্থক হইয়াছে।

ব্রিটিশ ও ভারত—

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বিলাতের পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্য; শুধু তাহাই নয়, ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তিনি পরিচিত। গত রবিবার বাঙলার সাংবাদিকদের সঙ্গে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের কথাবার্ত্তা হয়। এই আলোচনায় স্যার ষ্ট্যাফোর্ড দুইটি উল্লেখযোগ্য উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট এই প্রশ্ন করা হয় যে, ব্রিটিশ জাতি যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের উপর প্রভুত্ব চালাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না, অনেকে এইরূপ মনে করেন ইহা ঠিক কি? এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড বলেন,—এই সমস্যা সমাধান হইবার পথে যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভারত হইতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অপসারণ অর্থাৎ স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা যে প্রথমে দরকার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ব্রিটিশ জাতির মনের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি—এই মর্ম্মে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডকে আর একটি প্রশ্ন করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—"আমার মনে হয় যে, ইংলণ্ডের জনমতের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের সমীচীনতা শুধু যে উন্নতিশীল সম্প্রদায়ই উপলব্ধি করিয়াছেন এমন নয়, তথাকথিত সংরক্ষণশীল এবং প্রগতি-বিরোধীদের মধ্যেও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমি ইহাও বলিব যে, যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা উচিত কমন্স সভায় অধিকাংশ সদস্য এই মত পোষণ করেন।"

স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের এই দুই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কারণ, কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্যই হইল ব্রিটেনের ভারত সম্পর্কিত নীতির প্রকৃত কর্ত্তা এবং তাঁহারা যদি ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার অনুকূল মতাবলম্বীই হন, তাহা হইলে, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আগে দরকার, ব্রিটিশ প্রভুত্ব অপসারণের বা স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার—স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের এই যুক্তির কোন মূল্য থাকে না। কারণ ব্রিটিশ প্রভুত্ব যদি ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের অন্তরায়ই হইয়া থাকে, এবং এতটা অন্তরায় হইয়া থাকে যে, সর্ব্বাগ্রে সেই প্রভুত্ব অপসারণ আবশ্যক, তাহা হইলে সেই অন্তরায়ের কারণ স্বীকার করিতেই হয়—কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্যের ভারতকে অধীন রাখিবার প্রবৃত্তি। অন্তরে যেখানে কাজ করিতেছে সেই প্রবৃত্তি তখন যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিবার সদিচ্ছার সত্যকার কোন মূল্য থাকিতে পারে না এবং উহা শুধু যে নিজেদের কাজ বাগাইয়া লইবার জন্য ফাঁকা অজুহাত মাত্র ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্যের আন্তরিক ইচ্ছা যদি প্রকৃতপক্ষেই হইত ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা, তাহা হইলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব যতদিন থাকিবে ততদিন ভারতের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সমাধান কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়, স্যার ষ্ট্যাফোর্ডকে এমন কথা বলিতে হইত না।

স্বাধীনতা ও তাহার যোগ্যতা—

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—"কংগ্রেস বৃটেনের নিকট স্বাধীনতা প্রার্থনা করে নাই, বৃটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণার দাবী করিয়াছে। স্বাধীনতা যখন আসিবে, তখন ভারত উহা পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়াই আসিবে। স্বাধীনতা পাইলেও বর্ত্তমানে ভারত তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া পত্রপ্রেরক যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। স্বাধীনতা অন্যের নিকট হইতে দান হিসাবে পাওয়া সম্ভব, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমার পত্রপ্রেরক ঐ উক্তি করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত না ভারত সমগ্র পৃথিবীর বিরোধীতা স্বত্ত্বেও প্রাপ্ত স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে, ততদিন ভারত কোনক্রমেই স্বাধীন হইবে না।" স্বাধীনতা পাওয়া এবং তাহা রক্ষা করার যোগ্যতা সম্বন্ধে এই যে প্রশ্ন, ইহা যে বিদেশীর মনেই উদয় হয় এমন নহে; এ দেশের রাষ্ট্রনীতিকেও এই প্রশ্ন কার্পণ্যের মধ্যে বহুদিন ক্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, বলিষ্ঠ কর্ম্মপন্থা অবলম্বনে উৎসাহিত করে নাই। ভিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, কোন জাতিই সে পথে পায় নাই এবং ইহা সত্য যে, যে আত্মবলের বিকাশে ভারতের উপর হইতে বিদেশীর এই সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্বের অবসান হইবে, সেই আত্মবল অপরের আক্রমণ হইতে ভারতভূমিকে অধৃষ্য করিয়া রাখিবে। ভারতের বিপুল জনসাধারণ যদি একবার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত হইয়া উঠে, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিরই সাধ্য নাই যে, তাহাকে অধীন করিয়া রাখিতে পারে বা অধীনতা বাহির হইতে আসিয়া নূতন করিয়া তাহার উপর চাপাইতে পারে। অতীতে রাষ্ট্রনীতিক যে সংহতির উপলব্ধির অভাবে ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছিল, সে অভাব বিদ্যমান থাকিতে ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হইবে না, একথা যেমন সত্য, তেমনই সে অনুভূতি জাগিলে অন্য কেহ যে তাহাকে অধীন করিয়া রাখিতে পারিবে না, ইহাও তেমনই সত্য। ভারতের এই অখণ্ড জাতীয়তার সম্বন্ধে সংবিদই হইতেছে কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান অবদান। বিদেশী স্বার্থবাহদের প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক ভেদবাদীর দলের কৃত্রিম চেষ্টা কিছুতেই অখণ্ড জাতীয়তার অনুভূতিকে শিথিল করিতে সমর্থ হইবে না। স্বাধীনতার আগুন যে জাতির মধ্যে একবার জ্বলে, তাহা আর নির্ব্বাপিত হয় না, বাহিরের বাধা শুধু তাহার প্রচণ্ডতর রূপ পরিগ্রহণেই সাহায্য করিয়া থাকে।

কল্যাণ গণতন্ত্রে—

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে বক্তৃতা করিয়াছেন ছাত্রদের সম্মেলনে—তাহা নানা মূল্যবান জ্ঞাতব্যে পরিপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের লাগাম যতদিন একটা ক্ষুদ্র স্বার্থসর্ব্বস্ব শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিবর্গের হাতে থাকিবে ততদিন নূতন জগতের সমস্যা-সমাধানের কোনোই উপায় নাই।" আমরা সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। রাষ্ট্রের রথ কোন পথে চলিবে—তাহা বর্ত্তমানে নির্ভর করিতেছে মুষ্টিমেয় লোকের ইচ্ছার উপরে যাহাদের জীবনের আকাশের ধ্রুবতারা হইতেছে স্বার্থ। এই স্বার্থের খেলা অবশ্যই চলিতেছে গণতন্ত্রের নামে—কারণ জনসাধারণের ভোটের উপরেই তো গবর্ণমেন্টের রূপ নির্ভর করে। যে মুষ্টিমেয় লোক রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ব করিয়া সেই শক্তিকে ব্যবহার করিতেছে নিজেদের স্বার্থকে পুষ্ট করিবার জন্য তাহারা জনসাধারণ কর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত হইতেছে। কিন্তু আসলে এই গণতন্ত্র মেকী গণতন্ত্র। জনসাধারণের মতামত প্রকৃতপক্ষে স্বার্থসর্ব্বস্ব কতকগুলি মানুষের মত ছাড়া আর কিছুই নয়। গণতন্ত্রের নামে যাহার নৃত্য চলিতেছে তাহার নাম মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ। এই স্বার্থের খেলার অবসান না ঘটা পর্য্যন্ত নূতন জগতের সমস্যার কোনোই নিরাকরণ হইতে পারে না। মুষ্টিমেয় মানুষ আপনাদের বিপন্ন স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশে সৈন্য প্রেরণ করিবে—সেই সৈন্যেরা পররাজ্যকে গ্রাস করিবে—ফলে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি অনিবার্য্য। সাম্রাজ্যবাদের সহিত সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষও অনিবার্য্য। এই সংঘর্ষের বিষময় পরিণাম হইতে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় রাষ্ট্রকে মুষ্টিমেয় স্বার্থসর্ব্বস্ব মানুষের চক্রান্তজাল হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে জনসাধারণের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

গণতন্ত্রের মুখোস—

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ আপনার বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'গণতন্ত্রকে কেবল নামে গণতন্ত্র না থাকিয়া সত্যিকারের গণতন্ত্র হইতে হইবে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে যুক্ত হইতে হইবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে—অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্য্যে শক্তি দেয়।' কথাগুলি ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। একদিন গণতন্ত্রের রূপকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে আমরা একান্তভাবে সীমাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভগবানের চোখে সবাই সমান এবং সকলের মধ্যে একই আত্মা—এই দৃষ্টির মধ্যে ছিলো গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক রূপ। তাহার পর গণতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপকে আমরা প্রকটিত দেখিলাম সকলের সমান ভোটাধিকারের মধ্যে। আধ্যাত্মিকতার মেঘরাজ্য ছাড়িয়া গণতন্ত্র মাটির দিকে একধাপ নামিয়া আসিল। কিন্তু মানুষের আত্মা তবুও তৃপ্তি মানিল না। গণতন্ত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিবার জন্য উহা তৃষিত হইয়া আছে। গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে আর একধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণাবয়ব হইয়া প্রকটিত হইতে হইবে। স্বাধীনতার কোনো অর্থ হয় না সাম্যের নীতিকে অস্বীকার করিলে এবং সাম্যেরও কোনো অর্থ হয় না ধনোৎপাদনের যন্ত্রগুলির উপরে সমস্ত সমাজের অধিকারকে মানিয়া না লইলে। বর্ত্তমানে মুষ্টিমেয় স্বার্থ-পরায়ণ লোক যে রাষ্ট্রের রথকে নিজেদের পরিকল্পিত পথে লইয়া গিয়া জগতের মহাঅনিষ্ট ঘটাইতে সমর্থ হইতেছে, তাহার কারণ বড়ো বড়ো ব্যবসা এবং কলকারখানাগুলির একচ্ছত্র মালিক হইতেছে তাহারাই, তাহারাই সীমাহীন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া সেই ঐশ্বর্য্যের শক্তিতে রাষ্ট্রকে বশীভূত করিয়াছে এবং রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করিতেছে নিজেদের স্বার্থকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যে। তাহাদেরই ইঙ্গিতে পুরোহিতগণ গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় দারিদ্র্যের গুণগানে পঞ্চমুখ, ইস্কুল-কলেজের অধ্যাপকগণ ছাত্রগণকে স্বজাতি-প্রীতির নামে সর্ব্বপ্রকার অন্যায়কে সমর্থন করিতে শিখাইতেছে, অধ্যাপক ও পুরোহিতকে দিয়া যে নোংরা কাজ করানো হইতেছে—রেডিওকেও সেই একই কার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে। এরকম একটা অবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ কখনো সত্য হইয়া উঠিতে পারে না—কখনো জনসাধারণের থাকিতে পারে না নিজেদের চোখ দিয়া দেখিবার, নিজেদের কান দিয়া শুনিবার এবং নিজেদের মন দিয়া ভাবিবার ক্ষমতা। গণতন্ত্রের ঘোমটার আড়ালে চলে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বেচ্ছা-চারিতার খেমটা। গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে মূর্ত্ত হইবে সেই দিন যেদিন বড়ো বড়ো ব্যবসা এবং কলকারখানাগুলির উপরে মুষ্টিমেয় মানুষের অবাধ অধিকার আর থাকিবে না—সেগুলির অধিকারী হইবে সকলেই। এই অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের রূপ যত দিন বাস্তবে সত্য হইয়া না উঠিতেছে ততদিন রাষ্ট্ররথের লাগাম মুষ্টিমেয় মানুষের হাতের মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীতে বারে বারে আনিবে দক্ষযজ্ঞের বিভীষিকা।

'বন্দেমাতরম্' বিভীষিকা—

উপদেশ ক্ষেত্র বিশেষে সুবুদ্ধি উন্মেষের সহায়ক না হইয়া কুবুদ্ধিকেই উস্কাইয়া তোলে—বিষ্ণুশর্ম্মার এই বাণী স্মরণ করিয়া কংগ্রেস যে কুক্ষণে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিলেন, সেইদিনই আমরা আতঙ্কিত হইয়াছিলাম। জনকয়েক সাম্প্রদায়িকতাবাদী নিজেদের মতলব বাগাইবার জন্য 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের কুব্যাখ্যার সাহায্যে যে কৃত্রিম আন্দোলন সৃষ্টি করে, তাহা কিছুদিন পরেই চাপা পড়িয়া যাইত; কিন্তু কংগ্রেসের অবিবেচনার ফলে অনিষ্টকারীর দল ধুয়া তুলিবারই সুবিধা পাইল। কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিলেন যে, যে স্থলে আপত্তি উঠিবে, 'বন্দেতামরম্' সঙ্গীত বর্জ্জনই সেখানে শ্রেয়। হীন সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা 'বন্দেমাতরমে'র এমন কুব্যাখ্যা করে তাহা বুঝা যায়, কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যবোধ করি, কলিকাতা কর্পোরেশনের মত পৌর-প্রতিষ্ঠান এই হীন প্রচেষ্টায় সায় দিল কেমন করিয়া! নেপালের মহারাজাকে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপসংহারে 'বন্দেমাতরম্' এই কথাটি কর্পোরেশনের একজন মুসলমান কাউন্সিলার প্রতিবাদ করাতে উহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা জানি না, এই মুসলমান কাউন্সিলারটি কে। তিনি যিনিই হউন, কর্পোরেশনের কোন্ কোন্ কাউন্সিলার এই যুক্তিতে সায় দিয়া 'বন্দেমাতরম্' বর্জ্জন করিবার পক্ষে রায় দিলেন, তাঁহাদের নাম জানিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, ভারতের জাতীয়তার দ্যোতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র। যাহারা ঐ মন্ত্রের প্রতিবাদ করে, তাহারা ধর্ম্মমতের জন্য করে না—করে, গোলামীর মনোবৃত্তির জন্য। এই মনোবৃত্তির মাত্রা চরমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জের এক সভায়। সাদুল্লা মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য মৌলবী মুনাওর আলী সুনামগঞ্জের এক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গেলে মেয়েরা 'বন্দেমাতরম্' গান করিতে উঠে। মন্ত্রীপ্রবর ইহাতে বিরক্ত হইয়া ইংরেজের জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে ফরমাইস করেন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে বিদেশীর জাতীয় সঙ্গীতটি মন্ত্রীবর মৌলবী মুনাওর আলীর কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করে। ধর্ম্মের তথাকথিত ধুয়ায় ভুলিয়া 'বন্দেমাতরম্' বর্জ্জনের দ্বারা দাস-মনোবৃত্তিকে এইভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার অনিষ্ট-কারিতা দেশবাসীর উপলব্ধি করা উচিত। জাতীয়তার ভাব বাড়াইবার উদ্দেশ্যে 'বন্দেমাতরম্' বর্জ্জনের ফলে দাস-মনোবৃত্তিই যে বাড়িতেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার ভাব উস্কানী পাইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে যাঁহারা সত্যই সচেতন, তাঁহাদের দৃঢ়তা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ নীতি

জার্ম্মানীর পকেট রণতরী এডমিরাল গ্রাফ স্পে দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টেভিডো নামক স্থানের কাছে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই রণতরীখানা চোরা-গোপ্তাভাবে আক্রমণ চালাইয়া অনেক সওদাগরী জাহাজ ধ্বংস করে। পরে বৃটিশ রণতরীর তাড়া খাইয়া উরুগুয়ের নিরপেক্ষ রাজ্যে আশ্রয় লয়। ঐ বন্দর হইতে সে যাহাতে বাহির হইয়া আবার উপদ্রব চালাইতে না পারে সেজন্য বন্দরের বাহিরে কয়েকখানা রণতরী পাহারা থাকে। এই রণতরীগুলির মধ্যে ফরাসীদের দ্রুতগামী রণতরী 'ডানকার্ক' এবং ইংরেজের 'রিনাউন' নামক বিখ্যাত ক্রুজারখানা ছিল। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, এই 'রিনাউন' জাহাজই রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড যুবরাজ স্বরূপে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন।

এখনও নষ্ট হইতেছে ইহা সত্য, কিন্তু এই উপদ্রব দমন করিবার জন্য ইংরেজ কম লড়াই করিতেছে না। স্থলযুদ্ধে মিত্রপক্ষের তেমন উল্লেখযোগ্য তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে না ইহা সত্য। এবারকার লড়াইতে স্থলযুদ্ধের ব্যাপারে আসল লড়ায়েদের মধ্যে ততটা উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—যতটা উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে যাহারা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সরকারীভাবে ঠিক লড়ুয়ে নয় তাহাদের মধ্যে। স্থলযুদ্ধের প্রচণ্ডতা দেখিয়াছি আমরা কয়েকদিন পোল্যাণ্ডে। তারপর স্থলযুদ্ধের প্রচণ্ডতা পরিলক্ষিত হইতেছে ফিনল্যাণ্ডে। ফিনল্যাণ্ডের রক্ত-জমাট-বাঁধান এই দারুণ শীতেও ফিনরা বীরবিক্রমে লড়াই করিতেছে; কিন্তু ইহা অনিবার্য্য সত্য যে, রুষিয়ার সঙ্গে সে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

গুলী করিয়া ভাসমান মাইন বিনাশ করা হইতেছে।

সমুদ্রবক্ষে মাইনটি ভাসিয়া উঠিয়াছে

এডমিরাল গ্রাফের কাপ্তেন গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাঁহার এই কার্য্যের প্রশংসা করিতেছে জার্ম্মানরা এবং নিন্দা করিতেছে অপরপক্ষ। প্রকৃতপক্ষে এডমিরাল গ্রাফের কাপ্তেন এমন নূতন কিছুই করেন নাই। ইহার আগেও অনেক যুদ্ধ-জাহাজের কাপ্তেন শত্রুপক্ষের হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজেরাই জাহাজ উড়াইয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন।

এই উপায়ে জার্ম্মানরা সেদিন বার্ম্মুডার উপকূলে 'কলম্বাস' নামক তাহাদের সওদাগরী জাহাজখানাও উড়াইয়া দিয়াছে। জার্ম্মানীর তিনখানা বড় লাইনার বা যাত্রী-জাহাজ ছিল। এই তিনখানার মধ্যে 'ব্রিমেন' এবং 'ইউরোপা'র নীচেই 'কলম্বাসের' স্থান ছিল। কলম্বাস জাহাজখানা দৈর্ঘ্যে ছিল ৭৪৯ ফুট। গত ১৯২২ সালে ডানজিগে এই জাহাজখানা নির্ম্মিত হয়।

জার্ম্মানীর ডুবো-জাহাজের উপদ্রব অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। মাইনের বিস্ফোরণে নিরীহ সওদাগরী জাহাজ

তাহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা জাতি-সঙ্ঘের যে নাই—একথা বলাই বাহুল্য, অপর কোন শক্তিও যে প্রকাশ্যভাবে তাহার পক্ষে যোগ দিয়া রুষিয়াকে ঘাটাইতে যাইবে, ইহা প্রায় অসম্ভব। অথচ ধনতন্ত্রবাদী হেলসিঙ্কি গবর্ণমেণ্ট ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক স্বরূপে থাকিয়া রুষিয়ার কণ্টক হইয়া থাকিবে, রুষিয়া তেমন অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের স্থূল রূপের ভিতর দিয়া যে নীতি আকার ধরিয়া উঠিতেছে, রুষিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে তাহার প্রতিক্রিয়া শেষটা আসিয়া পড়িবে তাহারই উপর, ইহা বুঝিয়াই সে কাজে নামিয়াছে। রুষিয়ার নীতির একটা ব্যাপক দিক আছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতের ভিতর দিয়া সে সেই নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া লইতে চায় এবং সেজন্য সে ফাঁকা গণতান্ত্রিকতা বা ধনতন্ত্রবাদীদের বাকসর্ব্বস্ব স্বার্থসন্ধানী স্বাধীনতার ধুয়াকে মানিয়া চলিবে না। ইহারা দুর্ব্বলের স্বাধীনতার কে কতটা দরদী কিছুদিন জাতি-সঙ্ঘের সদস্য থাকিয়াই

সে তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। দুর্ব্বলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতি-সঙ্ঘের মারফতে রুষিয়া ইহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য যত উস্কাইয়াছে সব ব্যর্থ হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কি গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষা করিতে প্যারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত; রুষিয়া ফিনল্যাণ্ডে নিজের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবেই। সেই সঙ্গে এদিকে যুদ্ধের গতি কিরূপ দাঁড়াইবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কথা কিছুই বলা যায় না। রুষিয়া এবং আমেরিকা এই দুই শক্তি দুই দিকে ভারকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ডাক্তার এম জনসন একজন সমর-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পুরুষ। তিনি সম্প্রতি বিলাতি কাগজে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার ব্যাপকভাবে গবেষণা করিয়া উপসংহারভাগে লিখিয়াছেন,—"উড়োজাহাজযোগে ঘরবন্দী করার নীতি এবং জলপথে ঘরবন্দী করার নীতি, এই দুই নীতির আড়াআড়ি পরীক্ষা চলিতেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি সাফল্য লাভ করিবে? এবং ঘরবন্দী নীতির ফলে অনাহারে বেকায়দায় পড়িবে প্রথমে কে—ইংরেজ না জার্ম্মানী? ইংরেজ যদি আমেরিকা হইতে যথেষ্ট রকমে প্রথম শ্রেণীর উড়োজাহাজ না পায়, তাহা হইলে ইংরেজকে অসুবিধায় পড়িতে হইবে সন্দেহ নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্য অথবা গণ-তান্ত্রিকতার ভবিষ্যৎ—পূর্ব্ব-সীমান্ত এবং পশ্চিম-সীমান্ত কোন সীমান্তের স্থলযুদ্ধের উপর নির্ভর করিতেছে না—নির্ভর করিতেছে এই জলপথে এবং শূন্যপথে ঘরবন্দী করিবার জন্য যে লড়াই চলিতেছে তাহাতে জিতিবার উপর এবং আমেরিকা এইদিকে বড় একটা শক্তি।"

ইহার পর আমেরিকা সমর উপকরণ বিক্রয় করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাতে সুস্পষ্টভাবেই ইংরেজ এবং ফরাসী লাভবান হইয়াছে এবং ইংরেজ যে আমেরিকা হইতে প্রথম শ্রেণীর যথেষ্ট উড়োজাহাজ যোগাড় করিতে পারিবে—এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

জলপথে জার্ম্মানী তাহার ঘরবন্দী নীতি লইয়া কতটা সুবিধা করিতে পারিবে, ইহাই হইতেছে কথা। জার্ম্মানীর মাইনের মারাত্মকতার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই মারাত্মক মাইন ধ্বংস করিবার জন্য ইংরেজেরা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছিল, কিন্তু সে উপায় এখনও সক্রিয় দেখা যাইতেছে না। কিছুদিন হইল, বৃটিশ নৌ-বহরের 'ভার্নন' নামক জাহাজের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে রাজকীয় সম্মানে বিভূষিত করা হয়। এই জাহাজের মোট আট শত লোক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সমুদ্রবক্ষে ভাসমান তিনশত হইতে চারশত জার্ম্মান মাইন ভাসাইয়া উপরে তুলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কি উপায়ে মাইনগুলি নষ্ট করা হইয়াছে এবং এগুলি কি ধরণের মাইন তাহা জানা যায় নাই। যাহা হউক, বৃটিশ নৌ-বীরদের বীরত্বের যে ইহা পরিচায়ক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জাতির সঙ্কটে ইংরেজ কোন দিনই মরণকে ভয় করে না।

যাঁহারা সমর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁহাদের ধারণা এই যে, চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিবার পর হইতে জার্ম্মানীর সৈন্য-বাহিনী আধুনিক সমরোপকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিত হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার বড় বড় কয়েকটি আয়ুধাগার জার্ম্মানীর করতলগত; মজুর, মিস্ত্রীও জার্ম্মানীর হাতে অনেক আসিয়াছে। কিন্তু স্থলযুদ্ধে সেনাদলের চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হইল বিমানবহর এবং সেই সঙ্গে বর্ত্তমান সংগ্রামের গুরুত্ব বেশী জলপথের। সামরিকদের হিসাবে দেখা যায়, জার্ম্মানীর ১০ হাজার উড়োজাহাজ আছে, তন্মধ্যে ৪ হাজারখানা প্রথম শ্রেণীর। পক্ষান্তরে যুদ্ধ বাধিবার সময় ইংরেজ এবং ফরাসীর উভয়ের ছিল ৬,৫০০খানা উড়োজাহাজ। ইহার পর এ পক্ষের বিমানশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৈমানিক-দের তৎপরতার সুযোগ জার্ম্মানী এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে গ্রহণ করে নাই। বিমান-বিধ্বংসী কামানের ভয়ে জার্ম্মানী ফরাসী কিংবা ইংরেজের রাজধানী দূরের কথা, বড় কোন বন্দরও এ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই; অথবা বোমা ফেলিয়া কোন রণতরী ডুবাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মানীর ডুবো-জাহাজ, মাইন এবং কয়েকখানা পকেট রণতরীই জলযুদ্ধে যাহা কিছু চাঞ্চল্য সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ১৯১৪ সালে লড়াইয়ের সময় জার্ম্মানী নৌ-শক্তি হিসাবে ইউরোপের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে সে ষষ্ঠ স্থানীয়। সম্মুখ যুদ্ধে আগাইয়া জলপথে লড়াই করিবার সাহস জার্ম্মানীর নাই। জার্ম্মানীর ডুবো-জাহাজ ছিল যুদ্ধ বাধিবার সময় ৭৭ খানা, এইগুলির মধ্যে বৃহৎ সমুদ্রে চলাফেরা করিবার মত শক্তিশালী ছিল খুব কম-সংখ্যকই। সুতরাং বিগত মহাসমরে জলপথে জার্ম্মানীর ঘরবন্দী নীতি যতটা আতঙ্কের কারণ ঘটাইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত ততটা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে নাই। জার্ম্মানীর বৃহৎ রণতরী ছিল আটখানা—দুইখানা আধুনিক সমরোপকরণযুক্ত বড় জাহাজ, তিনখানা দ্রুতগামী পকেট রণতরী। ইহার মধ্যে একখানা নষ্ট হইল। জার্ম্মানীর আটখানা দ্রুতগামী ক্রুজার আছে এবং ৪৪খানা ডেস্ট্রয়ার আছে। মোটের উপর ইংরেজের নৌ-শক্তির তুলনায় জার্ম্মানীর নৌ-শক্তি অতি ক্ষুদ্র। বিগত মহাসমরের সময় ইংরেজের নৌ-শক্তি যেরূপ ছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক উন্নত। ইংরেজের যে নৌ-শক্তি আছে তাহাতে ডুবো-জাহাজের উপদ্রবের ভয় ইংরেজের নাই বলিলেই চলে। জার্ম্মানীর ডুবো-জাহাজ ধ্বংস করিবার কাজে ইংরেজ ২ শত-খানা ডেস্ট্রয়ার নিযুক্ত করিতে সক্ষম। উহার সঙ্গে ফরাসীদের ৭১খানা ডেস্ট্রয়ার তো আছেই। উহা ছাড়া, অন্য শ্রেণীর ছোট রণতরী তো অনেকই রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ইংরেজ ও ফরাসীর যত ডুবো-জাহাজ আছে, জার্ম্মানীর তাহার অর্দ্ধেকও নাই। ক্রুজারের সংখ্যাও ইংরেজের অনেক বেশী। ইংরেজের ১৫ খানা বড় ক্রুজার এবং ২৫ খানা দ্রুতগামী ক্রুজার সমুদ্র-বক্ষে সর্ব্বত্র ফিরিতেছে। বৃহৎ রণতরী ইংরেজের আছে ১৫ খানা এবং ফরাসীদের আছে ১৭ খানা, তুলনায় জার্ম্মানদের আছে মাত্র তিনখানা। এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে,

(শেষাংশ ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চলতি ভারত

যুক্তপ্রদেশ

ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা—

ভারতীয় খৃষ্টানগণের এক ঘরোয়া বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা বিশেষভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে, 'ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ন্যায়-সংগত নহে বলিয়াই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ভিতর ধর্ম্ম আসিয়া পড়িয়াছে'। একথা আমরাও বিশ্বাস করি। ধর্ম্ম জিনিষটার সঙ্গে চাকুরীর ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে দর কষাকষির কোনোই সম্পর্ক থাকতে পারে না। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত যে নিবিড় সম্পর্ক—তারই মধ্যে ধর্ম্মের মর্ম্ম। যে সব দেশে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথরের চাপে পঙ্গু—সেই সব দেশেই লোকে ধর্ম্মকে ব্যবহার করবার সুযোগ পায় নিজেদের আর্থিক সুখ-সুবিধার পথকে প্রশস্ত করবার জন্য। একমাত্র স্বরাজের মধ্যেই রয়েছে সকল সম্প্রদায়ের একত্র মিলিত হবার জ্যোতির্ম্ময় সম্ভাবনা। কারণ, স্বরাজ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি গৃহে আনবে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য—স্বরাজের মধ্যেই ভারতের দুঃসহ দারিদ্র্যের চির-অবসান। প্রত্যেকটি মানুষ যেখানে দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত—সেখানে ধর্ম্ম হ'য়ে থাকবে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার। পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলিতে সব ধর্ম্মের মানুষ মিলনের মধ্যে একত্র সুখশান্তিতে বাস করছে। সেখানে ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈচিত্র্য জাতীয় জীবনে কোনো বিরোধেরই সৃষ্টি করে না। সব মানুষকে সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করবার অধিকার দাও—সব মানুষের মধ্যে এই বোধ জাগাও যে, অর্থনৈতিক সাম্যের মধ্যেই তাদের প্রকৃত কল্যাণ এবং তাদের আর্থিক মঙ্গলের পথ একই—তাহলে দেখবে—কোনো নেতাই ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মধ্যে টেনে এনে বিরোধের বীজ বপন করতে সক্ষম হবে না।

হায়দ্রাবাদ

আদর্শের অবনতি—

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দর্শন-কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতি মিঃ এম হিরায়ণ তাঁর অভিভাষণে ভারতবর্ষের সেবার আদর্শ সম্পর্কে যা বলেছেন তা গভীরভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। তিনি বলেছেন,—ভারতবর্ষ যে বিশ্বপ্রেমের আদর্শের জয়গান ক'রেছে তার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের ভিত্তির উপরে। জ্ঞানহীন সেবাকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কখনো উচ্চস্থান দান করেনি। শ্রীযুক্ত হিরায়ণ অনুযোগ করেছেন, বর্ত্তমান আমরা জন-সেবার আদর্শকে নামিয়ে এনেছি প্রেমকে জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে। সেবার পথ বড়ো কঠিন পথ। মানুষের প্রতি যেখানে সত্যিকারের দরদ জেগে উঠেছে, সেখানে সেবার মধ্যে রয়েছে ত্যাগের মহিমা। কোটি কোটি মানুষ দুঃসহ দৈন্যের মধ্যে আজ যাপন করছে সর্ব্বহারার অভিশপ্ত জীবন। এই অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে আনন্দ আনতে হ'লে ব্যক্তিবিশেষের দয়ায় কুলাবেনা—সমাজ ব্যবস্থাকে দাঁড় করাতে হবে ন্যায়ের ভিত্তির উপরে। সম্পদ সৃষ্টির যে দায়িত্ব তার অংশ নিতে হবে সবাইকে। সবাই কাজ করবে, সবাই অবসরও ভোগ করবে। এই ন্যায়ের আদর্শকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে জনসাধারণের সত্যিকারের মঙ্গল। কিন্তু ন্যায়ের যে দাবী—সে বড়ো নিষ্ঠুর। সে দাবীকে মানতে গেলে সম্পদের চূড়ায় বসে অলস পরগাছার জীবন যাপন ক'রে দীনজনকে দয়া করা চলে না, সম্পদের শিখর থেকে নেমে আসতে হয় দরিদ্রের কুটীর দ্বারে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সম্পদ সৃষ্টির জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন তার অংশ গ্রহণ করতে হয়, নিজে যে অবসর ভোগ করি সে অবসরের ভাগী করতে হয় সবাইকে। ন্যায়ের কঠিন দাবীকে স্বীকার ক'রে নিতে গেলে কাজের ভার অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে অলস পুরুষ মৌমাছির মত আনন্দের মধু খাওয়া চলে না বলেই আমরা দয়ার সহজ আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছি। দীন দেখিলে দয়া কর—ন্যায় এমন কথা বলে না। ন্যায় চায় দৈন্যের বিলুপ্তি। ন্যায়ের রাজত্বে দরিদ্র বলে নেই কেউ। সস্তায় আত্মপ্রসাদ লাভ করবার জন্য আমরা ন্যায়ের কঠিন পথ ছেড়ে দয়ার সহজ পথ বেছে নেই। এর দ্বারা আমরা সেবার নামে আত্মপ্রতারণা করি, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের দৈন্য ঘোচানোর সত্যিকারের উপায়কে এড়িয়ে গিয়ে উদারতার নামে ঔদার্য্যের অভিনয়ে তুষ্ট থাকি।

বোম্বাই

পূর্ণ স্বাধীনতা ও গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধীকে একজন পত্রলেখক জানিয়েছে, 'ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা পায়—সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে অক্ষম হবে সে।" গান্ধীজী এই উত্তরে লিখেছেন, "পত্রলেখক মনে ভেবেছেন, স্বাধীনতা ভারতবর্ষে আসবে পরহস্তের দান হিসাবে। ভারতবর্ষ যতদিন সমস্ত জগতের আক্রমণ থেকে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে না পারবে—ততদিন স্বাধীনতা তার হাতের মধ্যে আসবে না।" যাকে আমরা দাতার হাত থেকে দয়ার দানরূপে পাই, নিজের শক্তির জোরে যাকে অর্জ্জন করি নে—তাকে মুঠোর মধ্যে কতদিন রাখতে পারবো—সে কথা বলা মুস্কিল। যাকে আমরা অর্জ্জন করি দুঃখ-বরণ করবার শক্তির জোরে, যাকে আমরা অর্জ্জন করি বীর্য্য দিয়ে, পৌরুষ দিয়ে—তাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে কে? যে শক্তির জোরে স্বাধীনতাকে আমরা অর্জ্জন করবো—সেই শক্তির জোরেই আমরা তাকে রক্ষা করতে পারবো। স্বাধীনতাকে আমাদের হাত থেকে অন্য জাতি ছিনিয়ে নেবে—এই আশঙ্কা অমূলক—কারণ স্বাধীনতা তো বাজারের সাধারণ পণ্যদ্রব্য নয় যে তা নিয়ে বেচা-কেনা চলতে পারে। একটা জাত স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনে যতদিন সক্ষম না হ'চ্ছে ততদিন কেউ তার শৃঙ্খল ঘোচাতে পারে না। গান্ধীজী বলেছেন, "ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যতদিন বৃটেনের সাহায্য দরকার হবে—ততদিন তার স্বাধীনতা কখনো স্বাধীনতার পর্য্যায়ে উঠতে পারে না।

সে রকম স্বাধীনতায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ভাতবর্ষ তার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য লড়াই করছে—এ দৃশ্যে বরং সহনীয় কিন্তু ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার শিখরদেশে উপনীত হবার পূর্ব্বেই লড়াই ত্যাগ করেছে—এ দৃশ্য সত্য সত্যই অসহনীয়। শান্তিকে মেনে নিতে পারে সে তখনই যখন স্বাধীনতার চূড়ায় সে পেতেছে তার আসন—যে স্বাধীনতাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবার শক্তি নেই কারও।"

এই কথা থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার ক'রে বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধীজী পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হবার পাত্র নন। এই যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি তাঁর অনুরাগ—এই অনুরাগের পিছনে কোনো ভাব-বিলাসিতা নেই। যাকে রক্ষা করতে হ'লে আমাদের পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হবে—তা নিয়ে আমরা করবো কি? সে তো যে কোনো দিন আমাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে। পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে বৃটেনের সাহায্যের উপরে নির্ভর করার কোনো কথাই নেই। কারও দয়াকে আশ্রয় ক'রে সে আসবে না—সে আসবে আমরা যখন তাকে পাবার উপযুক্ত হবো। সেই যোগ্যতা যতদিন অর্জ্জন করতে না পারছি—মুক্তিকে পাওয়ার জন্য ষোলো আনা মূল্য দিতে যতক্ষণ প্রস্তুত না হচ্ছি—ততক্ষণ যা পাবো তা কখনো স্বাধীনতা হবে না—হবে স্বাধীনতার ভ্যাংচানি। তা আমরা রাখতে পারবো না—কারণ তার পিছনে রয়েছে অন্যের অনুগ্রহ। অতএব গান্ধীজী বলেছেন—পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করতে। সে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রামের কথা উঠ্‌তেই পারে না। গান্ধীজী বলেছেন, "জীবনের পরম আনন্দ স্বাধীনতার আদর্শের জন্য লড়াই করায়—মুক্তির শিখরদেশে পৌঁছানোর জন্য ক্লান্তিহীন সাধনায়, স্বাধীনতার জন্য দুঃখের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ায়। জয়লক্ষ্মীর মন্দিরে পৌঁছে গেলে তখন আর আনন্দ থাকবে না—আসবে সাফল্যের ক্লান্তি। স্বাধীনতার জন্য এই যে বিনিদ্র সাধনা—এই সাধনার মধ্যেই জয়ের আনন্দ।" আমরা গান্ধীজীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি চির-যৌবনের বাণী। যৌবনের আনন্দ লক্ষ্যের পানে চিরন্তন চলার মধ্যে। চলা যেখানে থেমে গেছে সেখানে আর যৌবন নেই। কামনার জিনিষকে যখন পেয়ে গেছে তখন আনন্দও ফুরিয়ে গেছে। তাই তো চাই এমন লক্ষ্যে অনুরাগ যা ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার গন্ডীকে পেরিয়ে জীবনের সমস্ত ভবিষ্যতকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে। পূর্ণ স্বাধীনতা হ'লো এই রকমের একটা লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে আমাদের অনুরাগ অবিচলিত থাকুক।

মাদ্রাজ

স্বরাজ দফায় দফায় নয়

বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত খের মাদ্রাজের এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'পরীক্ষকের সামনে গিয়ে আর কখনো আমরা দাঁড়াবো না, দফায় দফায় স্বরাজ নেবার দিন চিরকালের মতন শেষ হয়েছে। গণ-ভোটের পথই হোলো একমাত্র পথ যে পথে স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধান হবে।' শ্রীযুত খেরের কথার সমর্থন করি আমরা। আমরা স্বরাজ পাওয়ার উপযুক্ত কিনা—তার উত্তর বৃটেনের কাছে দিতে আমরা একেবারেই বাধ্য নই। স্বরাজের উপরে আমাদের জন্মগত অধিকার। আমরা তার যোগ্য হয়েছি কি না—তা নিয়ে আমরা বোঝাপড়া করবো নিজেদের সঙ্গে। আমরা কি স্বাধীনতার জন্য সমস্ত প্রকার দুঃখকে বরণ করতে প্রস্তুত হ'য়েছি? আমাদের ভিতরে কি সম্পূর্ণ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে? কংগ্রেসের মধ্যে যাতে শৃঙ্খলা থাকে—সেদিকে কি আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি আছে? মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে সহ্য করতে যদি প্রস্তুত না থাকি—প্রস্তুত হ'তে হবে। আমাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা যদি এখনও না হ'য়ে থাকে—তার প্রতিষ্ঠা করা চাই। সাম্রাজ্যবাদের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরই দুর্ব্বলতার উপরে। সে দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত হ'লেই স্বরাজ আমাদের নাগালের মধ্যে এসে যাবে। সাগর পার থেকে যাঁরা বারে বারে আমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন তাঁদের সে প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। ক্রীতদাসের যে মালিক সে কি ক্রীতদাসকে জিজ্ঞাসা করবে—তুমি কি মুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছ? শৃঙ্খলিতকে মুক্তি দেওয়াই যে তার নৈতিকধর্ম্ম। এখানে শৃঙ্খলিতের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কোনোই প্রশ্নই ওঠে না।

নারী ও ভবিষ্যৎ

শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা 'হিন্দু' কাগজে নারী ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে ভাববার খোরাক আছে যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন, মারবার কাজে পুরুষের যে রকম উৎসাহের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়, সৃষ্টি ও পালন করবার কাজে সে রকম নয়। নারীর বেলায় স্বতন্ত্র কথা। জীবনকে সৃষ্টি করবার দায়িত্ব তাদেরই ব'লে জীবনকে নষ্ট করবার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে পুরুষের মতো উগ্র নয়। এই জন্যই দেখা যায়—যেখানে নারী এসে দাঁড়িয়েছে তার করুণায় ঢলঢল মাতৃমূর্ত্তি এবং কল্যাণ হস্তের সেবা নিয়ে সেখানে বিরোধের কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠেছে মিলনের সামগান। দুঃখের বিষয়, বিধাতার হাত থেকে হৃদয়ের যে দান নিয়ে নারী আবির্ভূত হয় পৃথিবীতে—সে দানকে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির কাজে লাগাবার সুযোগ তার কম। তাকে আমরা রেখেছি পর্দ্দার আড়ালে বন্দিনী ক'রে, বাহিরের বিশ্বকে সে যে রূপান্তরিত করবে তার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য দিয়ে এমন কোন সুবিধা পুরুষ তাকে দান করেনি। ফলে পুরুষের তৈরী এই পাষাণ কঠিন সভ্যতা আজ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে দিগন্তব্যাপী কুরুক্ষেত্রের বিভীষিকা, যা করলে মানুষ সুখ-সম্পদের মধ্যে বাঁচতে পারে তার চেয়ে যা করলে মানুষকে মেরে ফেলতে পারা যায় তারই উপরে পুরুষ জোর দিয়েছে বেশী। শান্তির পথ আজ ছেয়ে আছে কামানে আর জেপলিনে। বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাঁদছে অন্নের জন্য। এই মৃতপ্রায় মানব-সভ্যতাকে প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার শক্তি আছে তাদেরই যারা হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী। পৃথিবী নূতন করে জন্মাবার জন্য অপেক্ষা করছে নারীর কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

[শ্রীঅরবিন্দ]

সাম্রাজিক ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ রাজতন্ত্র

মনে হয়, রাজতন্ত্রের পক্ষে একটিমাত্র সুযোগ—ইহা অসমধর্ম্মী সাম্রাজ্যের ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ সংরক্ষিত হইতে পারে, আর জগতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিন্যাসে কোনরূপ ঐক্য-সাধন করিতে হইলে, এরূপ অসমধর্ম্মী সাম্রাজ্যই হইবে বৃহত্তম অংশ। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ সাম্রাজ্যেরও প্রতীক-স্বরূপ রাজতন্ত্র অপরিহার্য্য নহে। ফ্রান্স উহার প্রয়োজন অনুভব করে নাই, রুশিয়া অধুনা উহা বর্জ্জন করিয়াছে। অষ্ট্রিয়ায় ইহা কতকগুলি অন্তর্ভুক্ত জাতির পক্ষে পরাধীনতার চিহ্নস্বরূপ ঘৃণাভাজন হইয়া উঠিতেছে এবং সম্প্রতি ইহা বাহিরের জগতেও নিন্দার পাত্র হইয়াছে *। কেবল মাত্র ইংলণ্ডেই রাজতন্ত্র একই সঙ্গে অ-হানিকর এবং সুবিধাজনক, সেইজন্যই উহা সাধারণ সম্মতির দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। ইহা কল্পনীয় যে, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (এই সাম্রাজ্যটি এখনও জগতে নেতৃস্থানীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রহিয়াছে) ভবিষ্যৎ ঐক্যসাধনের কেন্দ্রস্বরূপ বা নমুনা স্বরূপ হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজতন্ত্র বাহ্য রূপে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে, আর নামে মাত্র রূপও অনেক সময় লাভজনক হয়, সেইটিকে ধরিয়া, সেইটিকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ বিকশিত ও জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আমেরিকার সুদৃঢ় রিপাবলিকান্ প্রবৃত্তি, আর ইহার সম্ভাবনা খুব কম যে, একটি সাতিশয় অসমধর্ম্মী সমুচ্চয়ের একটিমাত্র অংশে যে রাজতন্ত্র বর্ত্তমান, তাহা নামে মাত্র হইলেও, অন্য সকলে মানিয়া লইবে। অন্তত অতীতে ইহা ঘটিয়াছে, কেবল যুদ্ধ জয়ের চাপে। আর যদিই বিশ্বরাষ্ট্র অভিজ্ঞতার ফলে তাহার সংগঠনে রাজতন্ত্রকে গ্রহণ বা পুনর্গ্রহণ করা সুবিধাজনক বলিয়াই উপলব্ধি করে, তাহা হইলেও তাহা হইবে গণতান্ত্রিক রাজপদের কোন নূতন পরিকল্পনা। কিন্তু নিষ্ক্রিয় নামে মাত্র রাজপদের স্থলে কোনরূপ গণতান্ত্রিক রাজপদের পরিকল্পনা বিকাশ করিতে আধুনিক জগৎ এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয় নাই।

আধুনিক পরিস্থিতিতে যে দুইটি কারণে সমগ্র সমস্যাটিই অন্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সে দুইটি এই যে, এইরূপ ঐক্য-সাধনে অধিজাতিগুলিই ব্যক্তির স্থান গ্রহণ করিবে, আর এই অধিজাতিগুলি হইতেছে পরিণত স্ব-চেতন সমাজ, অতএব তাহাদের ভবিতব্যতাই হইতেছে, সামাজিক গণতন্ত্র (Social democracy), কিম্বা অন্য কোন প্রকার সমাজতন্ত্রের ভিতর দিয়া যাওয়া। ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, বিশ্বরাষ্ট্র যে সকল স্বতন্ত্র সমাজ লইয়া গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত সংগঠন-নীতিই সে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। সমস্যাটি আরও সরল হইত যদি আমরা ধরিয়া লইতে পারিতাম যে, বিচ্ছেদমুখী অধিজাতিক ভাব দমিত হওয়ায় এবং বিশ্বজনীন আন্তর্জ্জাতিকতার বিকাশ হওয়ায় জাতীয় ধাত, স্বার্থ ও কৃষ্টিসমূহের বিরোধ হইতে উৎপন্ন প্রতিবন্ধকগুলি হয় একেবারেই দূর হইয়া যাইবে, অথবা তাহাদিগকে বড় হইয়া উঠিতে দেওয়া হইবে না। এইরূপে সমাধান যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা নহে, যদিও বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে আন্তর্জ্জাতিকতা গুরুতরভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অধি-জাতিক ভাব প্রবলভাবেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ ইহা ধারণীয় যে, যুদ্ধের দরুণ যে সকল রাগ-দ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে, এইগুলি কাটিয়া যাইলে আন্তর্জ্জাতিকতার ভাব আবার দ্বিগুণ বেগে জাগিয়া উঠিতে পারে। সেরূপ ঘটিলে, ঐক্যসাধনের প্রবৃত্তি এক বিশ্বব্যাপী রিপাবলিকের আদর্শ সম্মুখে ধরিতে পারে, অধি-জাতিগুলি হইবে তাহার প্রদেশস্বরূপ (যদিও প্রথম প্রথম সেগুলি পরস্পর হইতে সুতীব্রভাবেই বিভক্ত থাকিবে) এবং তাহা জগতের সম্মিলিত গণতন্ত্র সকলের নিকট দায়ী একটি কৌন্সিল বা পার্লামেন্টের দ্বারা শাসিত হইবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এক রকমের পরিবর্ত্তিত ও নমনীয় মুখ্যতন্ত্রই (oligarchy) হইবে প্রথম রূপ। তাহা অর্দ্ধ-নিষ্ক্রিয় গণতন্ত্রের সম্মতি অনুযায়ী শাসন করিবে, সে সম্মতি নির্ব্বাচন বা অন্য কোন উপায়ে অভিব্যক্ত হইতে পারে। কারণ, আধুনিক গণতন্ত্র বর্ত্তমানে বস্তুত এই-রূপেই ; সাধারণ জনমত, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে নির্ব্বাচন এবং যাহারা জনসাধারণের বিরাগভাজন হইবে, তাহাদিগকে পুন-নির্ব্বাচন না করিবার ক্ষমতা—কেবলমাত্র এইগুলিই হইতেছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অংশ। গবর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ পক্ষে রহিয়াছে বুর্জ্জোয়াদের হস্তে, উকীল প্রভৃতি পেশাদার ও ব্যবসাদারদের হস্তে, জমিদারদের (যেখানে এ-শ্রেণী এখনও বিদ্যমান আছে) হস্তে,—আর শ্রমিক শ্রেণী হইতে কতকগুলি লোক ইহাদের সহিত যোগ দিয়া ইহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহারা খুব শীঘ্রই শাসক শ্রেণীর ধাত ও পরিকল্পনাসমূহ আয়ত্ত করিয়া লইতেছে। মানব-সমাজের বর্ত্তমান ভিত্তিতে যদি একটি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নিজ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে এই নীতি অনু-সারেই গড়িয়া তুলিতে বেশই চেষ্টা করিতে পারে, আর তাহা যে রূপেই গ্রহণ করুক না কেন ; বস্তুত, এই শ্রেণীগুলিই জন-সাধারণের নামে শাসনকার্য্য চালাইবে।

বর্ত্তমান যুগ-সন্ধি—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য এবং শ্রমিক-শক্তির অভ্যুদয়

কিন্তু বর্ত্তমান হইতেছে পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্ত এবং একটা বুর্জ্জোয়া বিশ্বরাষ্ট্র যে ইহার পরিণতি হইবে, সে সম্ভাবনা কম। অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল জাতিগুলির প্রত্যেকটিতেই মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য দুই দিক দিয়া বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে রহিয়াছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অসন্তোষ, তাহারা ঐ শ্রেণীর অকল্পনাকুশল ব্যবহারিক বুদ্ধি ও একান্ত ব্যবসা-দারীকে তাহাদের আদর্শসিদ্ধির পরিপন্থী বলিয়া দেখিতেছে। আর রহিয়াছে শ্রমিকদের প্রবল ও ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ, তাহারা দেখিতেছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণতান্ত্রিক আদর্শ ও পরিবর্ত্তন সকলকে অনবরত নিজেদেরই স্বার্থে লাগাইতেছে, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে পার্লামেণ্টারী প্রথা দ্বারা নিজেদের শাসন বজায় রাখিয়াছে, তাহার স্থলে অন্য কিছু আবিষ্কার করিতেও তাহারা এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই *। দুই দিক হইতে এই অসন্তোষের সংযোগের ফলে কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, তাহা পূর্ব্বে হইতে বলা যায় না। রুশিয়াতেই এই সন্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী হইয়াছে এবং আমরা দেখিতে পাইতেছি, এইটি ইতিমধ্যেই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং বুর্জ্জোয়া শ্রেণীকে ইহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসিতে বাধ্য করিয়াছে, কিন্তু এইভাবে যে একটা আপোষ হইয়াছে, তাহা যুদ্ধের পরিস্থিতির অবসান হইলে, আর টিকিবে বলিয়া মনে হয় না। দুই দিক দিয়া ইহা গণ-তান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সংশোধিত মুখ্যতন্ত্রের কোন নূতন পরকল্পনার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আধুনিক সমাজের শাসনকার্য্য এখন অতিশয় জটিল ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে, ইহার প্রত্যেক বিভাগে বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ দক্ষতা, বিশেষ শক্তির

* গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যদি ইহা ভাঙ্গিয়া না পড়িত তাহা হইলেও ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য ছিল।

* রুষিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের এবং ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। শেষোক্ত প্রথায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এবং এক নূতন ধরণের গবর্ণমেন্ট ও সমাজ স্থাপন করিয়াছে।

প্রয়োজন, আর রাষ্ট্রগত সমাজতন্ত্রের (State socialism) দিকে অগ্রসর হইতে হইলে প্রতিপদেই এই প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। কৌন্সিলের সভ্য এবং শাসনকার্য্য নির্ব্বাহকগণের পক্ষে বিশিষ্ট শিক্ষা ও বিশিষ্ট শক্তির এই প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে এ-যুগের গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তি প্রাচীন চীন শাসনতন্ত্রের কোন এক আধুনিক আকারের দিকে লইয়া যাইতে পারে। —সে শাসনতন্ত্রে নীচে ছিল গণতান্ত্রিক অর্গ্যানিজেশন এবং উপরে ছিল এক-প্রকার শিক্ষিত আমলাতন্ত্র, বিশেষ জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন সরকারী কর্ম্মচারীদের একটা অভিজাতশ্রেণী, তাহারা শ্রেণীনির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইত। সকলকে অবশ্য সমান সুযোগ দিতেই হইবে, তথাপি এই শাসক-শ্রেণী নিজ-দিগকে লইয়া সমাজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হইয়া উঠিবে। অন্য পক্ষে আধুনিক জাতি সকলের শ্রম-শিল্প ব্যবহার (Industrialism) যদি পরিবর্ত্তিত হয়—কেহ কেহ এইরূপ আশা করিতেছেন এবং কোন রকমের গিল্ড্ সোস্যালিজমে (guild socialism) পরিণত হয়—তাহা হইলে শ্রমিকদের গিল্ড্ এরিষ্টক্রেসিই (guild aristocracy of Labour) সমাজের শাসকমণ্ডলী হইয়া উঠিতে পারে*। তাহা হইলে বিশ্বরাষ্ট্রের দিকে প্রবৃত্তিও ঐ একই পথ ধরিবে এবং ঐ একই ছাঁচের শাসনতন্ত্র বিকাশ করিবে।

বিশ্ব-পার্লামেণ্টের বিকাশ—গণতান্ত্রিকতার পক্ষে পার্লামেণ্টারী প্রথার উপযোগিতা ও ত্রুটিসমূহ

কিন্তু এই সকল সম্ভাবনার বিচারে আমরা একটা বড় জিনিষের হিসাব লই নাই, সেটি হইতেছে জাতীয়তার ভাব (nationalism) এবং তাহা হইতে সৃষ্ট বিরোধী স্বার্থ ও প্রবৃত্তি সকলের ক্রিয়া। অনুমান করা হইয়াছে যে, এই সব বিরোধী স্বার্থকে দমন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে কোন রকমের একটা বিশ্ব-পার্লামেণ্ট, ধরা যাউক যে তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই চলিবে। পার্লামেন্টারী প্রথা হইতেছে ইংরেজের রাজনৈতিক প্রতিভার বিশিষ্ট সৃষ্টি এবং গণতন্ত্রের বিকাশে এইটি হইতেছে একটি প্রয়োজনীয় স্তর, কারণ ইহা ব্যতীত বিপুলায়তন জনসমষ্টি সংক্রান্ত রাজনীতি, শাসননির্ব্বাহ, অর্থনীতি, আইনপ্রণয়ন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ সমস্যাগুলি ন্যূনতম সঙ্ঘর্ষের সহিত বিবেচনা ও পরিচালনা করিবার ব্যাপক শক্তি সহজে বিকাশ করিতে পারা যায় না। আর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকর্ত্তাগণ (the State executive) যে ব্যক্তির ও জাতির স্বাধীনতা সকল দমন করে, তাহা নিবারণ করিতে পার্লামেণ্টারী-প্রথা যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছে, এমন আর দ্বিতীয় পন্থা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব যে সকল জাতি সমাজের আধুনিক রূপের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছে, তাহারা স্বভাবত এবং সমীচীনরূপেই এই প্রথার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু অধিকতর গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে বর্ত্তমানের যে প্রবৃত্তি, তাহার সহিত পার্লামেণ্টারী-প্রথার মিলন করা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই; এই প্রথা সকল সময়েই সংশোধিত রূপে আভিজাতিক শাসন, অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শাসনেরই যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহার যে পদ্ধতি, তাহাতে সময় ও শক্তির অত্যধিক অপব্যয় হয় এবং ইহার কর্ম্ম হয় বিশৃঙ্খল, দোলায়মান, অনিশ্চিত, তাহা শেষ পর্য্যন্ত যেমন-তেমন করিয়া কোন রকম একটা চলনসই ফলে উপনীত হয়। এখন সুদক্ষ গবর্ণমেণ্ট ও শাসনকার্য্য সম্বন্ধে যে সব অপেক্ষাকৃত কড়াকড়ি পরিকল্পনা প্রবল ও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে, সে সবের সহিত এই পদ্ধতির বেশ সামঞ্জস্য হয় না, আর সারা জগতের ব্যাপারের ন্যায় জটিল কার্য্য পরিচালনার দক্ষতার পক্ষে এইরূপ পদ্ধতি মারাত্মক হইবে। আর কার্য্যত পার্লামেণ্টারী-প্রথার অর্থ হইতেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের (এমন কি, অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠের) শাসন এবং অনেক সময়েই তাহা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার, কিন্তু আধুনিক মানবের মন সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারসমূহকে উত্তরোত্তর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেছে। আর বিশ্বরাষ্ট্রে এই সকল অধিকার আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইবে, সেখানে সে-সবকে দলন করিতে যাইলে, সহজেই গুরুতর অসন্তোষ ও গোলমাল উদ্ভব হইতে পারে, অথবা এমনও বিক্ষোভ হইতে পারে, যাহা সমগ্র সংগঠনটির পক্ষেই মারাত্মক হইয়া উঠিবে। সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জাতি সকলের পার্লামেণ্টের অর্থই হইতেছে, মুক্ত, স্বাধীন জাতি সকলের সম্মিলিত পার্লামেণ্ট; জগতে বর্ত্তমানে শক্তির যেরূপ অন্যায় ও বিশৃঙ্খল বিন্যাস রহিয়াছে, ইহার মধ্যে সেটি সম্ভব নহে। কেবল-মাত্র এশিয়ার সমস্যাটিই যদি এখনও সমাধান না করিয়া ফেলিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে এইটিই একটি মারাত্মক বাধা হইয়া উঠিবে, আর এইটিই একমাত্র সমস্যা নহে, অসাম্য ও অন্যায় সর্ব্বব্যাপী, তাহাদের সংখ্যা নাই।

বিশ্বরাষ্ট্রের সম্ভাব্য রূপ—ইহার পথে প্রতিবন্ধকসমূহ

অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে জগতের বর্ত্তমান বিন্যাসে যে সকল স্বাধীন ও সাম্রাজ্যিক জাতি রহিয়াছে, তাহাদের একটি সুপ্রীম্ কৌন্সিল বা উচ্চতম পরিষদ গঠন করা, কিন্তু ইহারও অনেক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। ইহা প্রথমে কার্য্যকরী হইতে পারে, কেবল যদি কার্য্যত ইহা কয়েকটি প্রবল সাম্রাজ্যিক জাতির মুখ্যতন্ত্র Oligarchy হইয়া দাঁড়ায়, প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের কথাই সংখ্যায় বহু, কিন্তু ক্ষুদ্রতর সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রগুলির কথার উপরে চলিবে, আর ইহা স্থায়ী হইতে পারে, কেবল যদি ইহা উত্তরোত্তর (এবং সম্ভব হইলে শান্তিপূর্ণভাবেই) এইরূপ শক্তিশালী জাতিগণের মুখ্যতন্ত্র হইতে অধিকতর ন্যায্য ও আদর্শ ব্যবস্থায় পরিণত হয়, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদের বিলয় হইবে এবং বৃহত্তর সাম্রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ মানব-জাতির মধ্যে তাহাদের নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা নিমজ্জিত করিয়া দিবে। আজ সর্ব্বত্র বাহ্যিক যে উদার ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা সত্ত্বেও জাতীয় অহমিকা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও বিপজ্জনক বিক্ষোভ সৃষ্টি না করিয়া এই বিবর্ত্তন কতদূর ঘটিতে দিবে, তাহা গুরুতর ও কুলক্ষণময় সংশয়ে পরিপূর্ণ।

অতএব মোটের উপর আমরা যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, বিশ্ব-রাষ্ট্রের রূপ কি হইবে, এই প্রশ্নটি সংশয় ও প্রতিবন্ধকে পূর্ণ, আর এখন সে সবের কোন সমাধানই দেখা যাইতেছে না। অতীতের যে সব মনোভাব ও স্বার্থ এখনও বর্ত্তিয়া রহিয়াছে, সেই সব হইতে কতকগুলি বাধার উৎপত্তি হইতেছে; কতকগুলি ভবিষ্যতের দ্রুত বিকাশশীল বৈপ্লবিক শক্তি সকল হইতে আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় না যে, সে সবের সমাধান কখনও হইতে পারে না, বা হইবে না, কিন্তু কোন্ ভাবে এবং কোন্ পথে তাহাদের সমাধান হইবে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কেবল বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং আধুনিক জগতের শক্তি ও প্রয়োজন সকলের চাপের মধ্যে পরীক্ষা দ্বারা। তাহা ছাড়া, গবর্ণমেণ্টের রূপ কি হইবে, সেইটিই সব চেয়ে বড় কথা নহে। যে-কোন চলনসই বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সামরিক প্রভৃতি শক্তি সকলের যে ঐক্যসাধন এবং একরূপতা অনিবার্য্য হইবে, সেইটি লইয়াই হইতেছে প্রকৃত সমস্যা।* (ক্রমশ)

* এই ধরণের একটা কিছুর জন্য চেষ্টা সোভিয়েট রুশিয়ায় কিছুকালের জন্য করা হইয়াছিল। বাস্তব পরিস্থিতি তাহার অনুকূল হয় নাই, আর বৈপ্লবিক ও সামরিক গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত কোন সুনির্দ্দিষ্ট শাসনতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না। ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে করপোরেটিভ্ (Corporative) রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা গড়িয়া উঠে নাই।

* The Ideal of Human Unity (Arya, 1917) হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

৪৫ ঘণ্টা

(ছোট গল্প)

শ্রীসতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমবার......

আজ ফিলিপ্-এর বিচার হয়ে গেল। সে কান পেতে শুনল তার ফাঁসীর হুকুম......বুধবার বেলা ১টার সময়। প্রহরী তাকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে চল্‌ল কারাগৃহের দিকে... চাবি খুলে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিলে। ফিলিপ মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল কঠিন মেঝের ওপর... কপালের একধার থেকে নেমে এল রক্তের ধারা। ফিলিপ-এর হাতের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠল...গর্জ্জন করে উঠল... প্রহরী একটু হেসে চলে গেল।

...পরশু তার হবে ফাঁশী...হ্যাঁ, ফাঁশীই ত! বিচারক যখন রায় দিলেন তখন সে শুনেছিল..."বিনা অপরাধে জুবিলি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ম্যানেজারকে খুন করবার জন্যে তার ফাঁশী হবে...বুধবার বেলা ১টার সময়।" নাঃ সে ভুল শোনেনি। সত্যিই তার ফাঁশী হবে...তার সব শেষ হয়ে যাবে...তার মৃত্যু হবে...বুধবার বেলা ১টা...। এখন ৪-টে। আর ঠিক ৪৫ ঘণ্টা পরে...তার জীবনের মেয়াদ আর মোটে ৪৫ ঘণ্টা, তার এক মিনিট বেশী নয়। নিজে আশ্চর্য হ'য়ে গেল...সে আর বাঁচতে পারবে না...পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না, আর ৪৫ ঘণ্টা পরে...তার মাথা ঘুরে ওঠে... সে আর ভাবতে পারছে না।...

কিন্তু কোন্ অপরাধে তাকে ফাঁশী দেওয়া হ'ল?... অপরাধ তার আছে বইকি...বিচারপতি যখন বললেন...তখন তার নিশ্চয়ই অপরাধ হয়েছে...আর তার বিচারে হয়েছে তার ফাঁশী। বিচার! সে নিজে খুব জোরে হেসে উঠল...পৃথিবীর লোকে কি পৃথিবীর লোকের বিচার করতে পারে?...নিজের হাসির আওয়াজে নিজেই চম্‌কে ওঠে...চুপ করে বসে ভাবতে থাকে কি তার অপরাধ!...যার জন্যে তার হ'ল ফাঁশী...কি করেছে সে...যার জন্যে ৪৫ ঘণ্টা বাদে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে?......

......ধীরে ধীরে তার মনের যবনিকা সরে গেল......

* * * *ছোট্ট একটা সংসার........সে, তার স্ত্রী........ আর তার মেয়ে লিলি...হ্যাঁ, লিলি...ছোট্ট ৪ বছরের মেয়ে... কি সুন্দর তাকে দেখতে...কি সুন্দর কথা বলতে পারে...।

......ফিলিপ্ একটা কারখানায় চাকরী করে...জুবিলি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী...। রোজগার যা করত তাতেই বেশ তাদের চলে যেত...। সচ্ছলতা না থাকলেও অভাব ছিল না...। সংসারে তিনটি প্রাণী...শান্তির কেন্দ্র...আনন্দের মেলা। ফিলিপ্-এর স্ত্রী মেরী হাসিমুখে সংসারের কাজ করে যায়। ফিলিপ্‌কে বুঝতে দেয় না...কি তাদের অভাব... কি তাদের নেই...কি তাদের চাই।

......কারখানার কোয়ার্টার। ছোট্ট দু'খানা ঘর। তাতেই থাকত তারা তিনজন...ফিলিপ্...মেরী...লিলি।

কারখানার বন্ধুরা ফিলিপ্‌কে ঈর্ষা করত, তাদের মুখে শান্তি দেখে। ফিলিপ্-এর ঘরের ওপর লিখে দিয়েছিল "শান্তি-কুটীর"। ফিলিপ্ কারখানার ছুটির পর মাঝে মাঝে ১টা করে মোমের পুতুল কিনে নিয়ে যেত...মেয়ের জন্যে। লিলি খুব খুশী...সে জিজ্ঞাসা করত..."পুতুলগুলো বেশ! আচ্ছা এটা কথা বল্‌তে পারে না—এটা নাচতে পারে না কেন বাবা?" ফিলিপ্ কিছুদিন পরে আবার একটা দম দেওয়া পুতুল এনে দেয়...লিলি দু-একদিন পরে আবার বলে—"আচ্ছা বাবা...এ পুতুলটা কথা বলে না কেন?" ফিলিপ্ তার মেয়েকে আশ্বাস দেয় এবার একটা গান-গাওয়া পুতুল কিনে এনে দেবে...এই রকম করে শান্তির মধ্য দিয়ে দিন চলে যায়।

হঠাৎ একদিন কারখানার অবস্থা খারাপ হতে সুরু হয়। গুজব শোনা যায়, কারখানার অর্দ্ধেক লোক কমিয়ে দেবে।... ফিলিপ্-এর মনে ভয় লাগে, কিন্তু তার বন্ধুরা বলে—"তোর কোন ভয় নেই! তোর মতন কারিগরকে ছাড়াতে পারে না।..." ফিলিপ্ কিন্তু তাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারে না। ম্যানেজার যে রকম লোক... ও সব করতে পারে।

হঠাৎ একদিন একটা চিঠি আসে। ম্যানেজার লিখেছে, আর তার কারখানায় যেতে হবে না।...কারখানার অবস্থা খারাপ হওয়াতে ফিলিপ্‌কে ছাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। ফিলিপ্-এর চোখের সামনে পৃথিবী দুলে ওঠে...তার সংসার চলবে কি করে?...সে ছুটে চলে ম্যানেজারের ঘরে। অনুনয় ক'রে বলে—"সাহেব আমায় ছাড়িও না...আমরা মারা যাব..." সাহেব বলে—"না! না! তা হ'তে পারে না"—ফিলিপ্ সাহেবের কাছে জানু পেতে ভিক্ষা চায়...বলে—"আমার স্ত্রী মেয়ে সব না খেতে পেয়ে মারা যাবে।" ম্যানেজার বলেন—"আমি কি করতে পারি...কোম্পানী ত ক্ষতি স্বীকার করে চালাতে পারে না। অন্য জায়গায় চেষ্টা কর।" ফিলিপ্ আরও অনুনয় করে... সাহেব বলে—"বেরিয়ে যাও"! ফিলিপ্ সহ্য করতে পারে না...সে ভুলে যায় সে একজন শ্রমিক...ভুলে যায় সে ম্যানেজারকে,—চীৎকার করে বলে—"যাব না...তুমিও ত মাইনে করা চাকর...তুমিও ত চাকর।" সাহেব উত্তরে একটি সীসের পেপার-ওয়েট ফিলিপ্‌কে ছুড়ে মারেন...বলেন—কুকুর..." ফিলিপ্ আর্তনাদ করে ওঠে......।

যখন ফিলিপ্-এর জ্ঞান হয়, তখন সে হাঁসপাতালে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা। মাথার শিরায় আঘাত লেগেছে...। ফিলিপ্-এর এক বন্ধু মেরীকে খবর দেয়। মেরী আর লিলি দেখা করতে আসে।...ফিলিপ্ তার স্ত্রীকে বলে—"মেরী সংসার চলবে কি করে...? মেরী উত্তর দেয়..."তুমি ভেব না চলে যাবে কোন রকমে"...লিলি বলে—"কবে তুমি বাড়ী যাবে বাবা?" ফিলিপ্ হেসে বলে—"কাল যাব-রে...কাল যাব।"... মেরী আর লিলি অল্পক্ষণ পরেই চলে যায়, কারণ ফিলিপ্-এর বেশীক্ষণ কথা বলার হুকুম নেই...।

ফিলিপ্-এর মনে হয় এর জন্যে দায়ী ঐ ম্যানেজার... শুধু শুধু আমাকে...। তার মনের মধ্যে একটা সঙ্কল্প জেগে ওঠে...তারপর বলে—"নাঃ, থাক্।..."

২ মাস কেটে যায়। একদিন হাসপাতাল থেকে জবাব আসে...তাকে যেতে হবে, কারণ সে সুস্থ হয়ে গেছে।

সে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দেয়...। পথে এক বন্ধু তাকে খবর দেয় তাদের কারখানা আবার খুলেছে...আবার চলেছে...পুরান লোক সব নেবে নোটিশ দিয়েছে...। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখ...একটা মস্ত দুর্ভাবনা ছিল তার।...বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই লিলি দৌড়ে আসে... অভিমানের সুরে বলে—"বাবা তুমি বড় মিথ্যে বল...তুমি রোজ বল যে কাল আসবে...এতদিন পরে এলে কেন?...আমার খুব খারাপ লাগে।"...ফিলিপ্ তাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লে—

"তোর জন্যে আজ বিকেলে একটা গান গাওয়া পুতুল আনব..." লিলি পুতুল পাবার আনন্দে ছোটে মায়ের কাছে। ফিলিপ্ বাড়ী ঢুকেই বলে—"মেরী, আমি আবার সেই চাকরীটা পেয়েছি...মেরী উত্তর দেয় "খুব ভালই হয়েছে...চাকরী না পেলে বড় কষ্ট হ'ত আমাদের...ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন..." ২।৪ জন বন্ধু এসে ফিলিপ্কে বলে দরখাস্ত নিয়ে ম্যানেজারের কাছে যেতে...পুরান সবাই চাকরী পেয়েছে ও পাবে। ফিলিপ্ খুশী হ'য়ে ওঠে...একটা দরখাস্ত নিয়ে সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ম্যানেজারের কথা তার মনে পড়ে, কিন্তু সে ভাবে "থাকগে আবার ত চাকরী দিচ্ছে ...তার আর দোষ কি? কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হলে সে কি করতে পারে...তা ছাড়া রাগের মাথায় কত কি হ'য়ে যায়...আজ লিলির জন্যে একটা বড় গান গাওয়া পুতুল নিয়ে যেতে হবে...অফিসে ঢুকে দরোয়ানের হাত দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়...। ১ ঘণ্টা পরে তার ডাক পড়ে...ফিলিপ্ ম্যানেজারের ঘরে ঢোকে...দেখে ম্যানেজার তার দরখাস্তটার উপর কি লিখছে...ফিলিপ্ ঢুকতেই তিনি মাথা না তুলেই জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি আগে এখানে চাকরী করতে?" ফিলিপ্ বলে—"হ্যাঁ স্যার" ম্যানেজার বলেন—"কত করে সপ্তাহে পেতে?" ফিলিপ্ বলে—"১০ শিলিং করে..." ম্যানেজার বলেন—"আচ্ছা এবার থেকে ১২ শিলিং করে পাবে।" ম্যানেজার ফিলিপ্-এর হাতে দরখাস্তটা দেবার সময় ফিলিপ্-এর মুখ দেখে চম্‌কে ওঠেন, তারপর দরখাস্তটা টুকর টুকর করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন—"তুমি আমাকে অপমান করেছিলে...স্কাউন্‌ড্রেল! বেরিয়ে যাও। তোমার চাকরী হবে না।" ফিলিপ্ বলে—"সাহেব...২ মাস পরে কাল হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি...কাল বাড়ী ফিরেছি...আর সকলকেই ত তুমি চাকরী দিয়েছ...আমায়..." ফিলিপ-এর কথা শেষ হয় না...ম্যানেজার গর্জ্জন করে বলেন..."কোন রকম জবাব তোমায় দিতে রাজী নই...বেরিয়ে যাও তুমি..."। ফিলিপ্ শেষবারের জন্যে অনুনয় করে। শেষে সাহেব বলেন— "কুকুরটাকে বের করে না দিলে যাবে না..." ফিলিপ্ আর সহ্য করতে পারে না...তার পুঞ্জীভূত ক্রোধে আগুন লেগে যায়... তার মনে জেগে ওঠে "প্রতিশোধ—প্রতিহিংসা—"। টেবিল-এর দিকে নজর পড়তেই একটি সীসের রুল তার নজরে পড়ে, সে সেটাকে হাতে তুলে নেয়। সাহেব চীৎকার করেন—"কুকুরটা আমায় মেরে ফেল্লে—" তার কথা শেষ হয় না। ফিলিপ পাগলের মতন হাতের রুলটা চালায় ম্যানেজার-এর উপর.........সাহেব চীৎকার করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন...ফিলিপ্ পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না...ম্যানেজার-এর চীৎকারে লোকেরা এসে তাকে ধরে ফেলে...।

সাহেবের জন্য আসে এম্বুলেন্স—আর ফিলিপের জন্য আসে পুলিশ আর প্রিসিন্‌ভ্যান। থানায় ৪ দিন পরে ফিলিপ্ শুনলে ম্যানেজার মারা গেছে...সে একটু চমকে উঠল...তার স্ত্রী আর লিলি এ ক'দিন আসেনি, বোধ হয় অনুমতি পায়নি। আজ রবিবার।...৫টার সময় তার স্ত্রী আর লিলি তার সঙ্গে দেখা করতে এল। অনেক কষ্টে ৫ মিনিটের জন্য তারা অনুমতি পেয়েছে...। ফিলিপ্কে দেখে মেরী আর লিলি কেঁদে ওঠে। ফিলিপ্ থামিয়ে দেয় তাদের, বলে—"কেঁদোনা মেরী কাল ত আমার বিচার হবে...আমার বন্ধুরা আমায় বলেছে, ভাল ভাল উকিল লাগাবে...ছাড়া ত পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু সে এই মিথ্যাটা বলে নিজেই মনে মনে হেসে ওঠে। ভাবে...হায়রে মানুষের আশা। মেরী যেন ফিলিপ-এর কথাটা সত্যি বলে মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। ফিলিপ্ লিলিকে জিজ্ঞাসা করে—"তুই কাঁদছিলি কেনরে?" লিলি উত্তর দেয়— "মা যে কাঁদছিল।" ফিলিপ্ এক দৃষ্টে মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। কি বোকা হয় ছোটবেলা সবাই। ফিলিপ্ জানে তার বাড়ী যাবার আশা কোনদিনই নেই। হয়ত তার স্ত্রীও এ-কথাটা মনে মনে জানে, কিন্তু এই অবোধ শিশু ঠিক করে আছে যে, তার বাবা যাবে বাড়ী। প্রহরী এসে তাড়া দেয় ৫ মিনিট শেষ হয়ে গেছে। ফিলিপ্ মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—"লিলি তোর জন্যে একটা খুব বড় গান-গাওয়া পুতুল নিয়ে যাব।" লিলি বাবাকে দিয়ে সত্যি করিয়ে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যায়। ফিলিপ্ এক দৃষ্টে তাদের চলে যাওয়া দেখে...তারা চলে গেলে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে। সে কাঁদতে চেষ্টা করে...পারে না। কাল তার বিচার হবে...কি হবে শাস্তি তাও সে জানে...মৃত্যু!...ওঃ সে আর ভাবতে পারে না—।

সোমবার—

বিচার হয়ে গেছে। সাজার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে...ফাঁসী বুধবার বেলা ১টা। বিচারালয় থেকে সে আর থানায় যায় না, তাকে অন্য একটা জেলে নিয়ে আসা হয়। ফিলিপ্ বিকেলে ভাবে যদি মেরী আর লিলি আসে? মেরীর অশ্রুসজল মুখখানা সে যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। ফিলিপ্-এর চোখে জল আসে, তার নিজের জন্যই তার স্ত্রী আর লিলির এই দুর্দশা। তার নিজের ভাবনা ছেড়ে মেরী আর লিলির সারাজীবন চলবে কি করে ভাবতে থাকে—ভাবনার শেষ নেই। সে কোন উপায় ভেবে বার করতে পারে না...। লিলি যখন জিজ্ঞাসা করবে "বাবা তুমি বড় মিথ্যা বল, তুমি বল্লে কাল বাড়ী যাবে...গান-গাওয়া পুতুল কিনে দেবে..." আর সে ভাবতে পারে না, নিজের মাথাটা চেপে অসহ্য যন্ত্রণায় শুয়ে পড়ে ছোট্ট কুঠ্‌রীর মেঝের উপর।

তারা আসেনি—যাক্! ভালোই হয়েছে। তারা এলে ফিলিপ্ কি জবাব দিত তা সে সারারাত ভেবে ঠিক করে

উঠতে পারে নি। আজ যদি তারা আসে...নাঃ লিলির কথা তার মনে পড়ে, ঐটুকু মেয়ে...তারই বা কি দোষ। কিন্তু তার স্ত্রী? সংসারের সব দুঃখ, ব্যথা, অভাব হাসিমুখে সে সহ্য করে এসেছে। তাদের সুখের সংসার! নাঃ! ফিলিপ্ চীৎকার করে ওঠে, একটা প্রহরী ছুটে আসে। তারপর ফিলিপ্‌কে একটা গাল দিয়ে চলে যায়...ফিলিপ ক্ষেপে তাকে মারবার জন্যে ছোটে, কিন্তু কঠিন লোহার দরজায় তার মাথায় আঘাত লাগে। সে যন্ত্রণায় সেইখানেই লুটিয়ে পড়ে। বিকেল গড়িয়ে যায়, সন্ধে আসে। ফিলিপ্ ভাবে তারা আসবে... কি বল্‌বে সে? কিন্তু তারা আসে না...ফিলিপ্ ভাবে ভালোই হ'ল, কিন্তু বুধবার বেলা ১টা কি ভয়ঙ্কর...তার মাথা ঘুরে ওঠে...কেমন করে সে মরবে...কি দোষে সে মরবে...? একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেজে চলে। ফিলিপ্ গোনে ৭টা বাজল। আর মোটে ১৯ ঘণ্টা। তার জীবনের মেয়াদ আর ১৯ ঘণ্টা, তারপর তাকে মেরীকে আর লিলিকে ছেড়ে যেতে হবে...দূরে অনেক দূরে...গভীর অন্ধকারের মধ্যে। সে তাদের বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না...। সে চীৎকার করে ওঠে..."আমি বাঁচতে চাই...আমি বাঁচতে চাই।" একটা প্রহরী তার কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে...বলে ওঠে "পাগল"; ফিলিপ্-এর কানে প্রহরীর হাসি আগুন ঢেলে দেয়। সে তারদিকে চেয়ে চীৎকার করে ওঠে—"তোমায় আমি খুন করব...খুন করব...।" প্রহরীটা তখনও হাসতে থাকে...আরও জোরে...আর নিজের গলায় নিজের দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে কিসের একটা ইঙ্গিত করে। ফিলিপ্ বুঝতে পেরে চীৎকার করে ওঠে।

বুধবার—

ঢং ঢং করে ৬টা বাজল.........শব্দে ফিলিপ্-এর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল—আর মোটে ৭ ঘণ্টা সময়। কি তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। কাল সারারাত্রি ফিলিপ্ ভেবেছে, পালাবার উপায় খুঁজেছে। দরজায় ব্যাকুলভাবে ধাক্কা মেরেছে, কিন্তু কঠিন দরজা তার আবেদন শোনেনি। সারারাত সে উত্তেজনায় ঘরময় ছুটোছুটি করেছে...। ৭টা বাজছে, ইচ্ছে হ'ল ঘড়িটা চুরমার করে দেয়, আর যে ঘণ্টা বাজাচ্ছে তাকে মেরে ফেলে। আর মোটে ৬ ঘণ্টা... জীবনের বোঝা-পড়া, দেনা-পাওনা সব শেষ হয়ে যাবে। ভগবানের কথা তার একবার মনে পড়ল। ভগবান নাকি ঠিক বিচার করেন, সব বুঝতে পারেন। "না...না...না..." সে চীৎকার করে ওঠে—"ভগবান নেই, ভগবান অন্ধ...ভগবান বধির।" হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ আসে...তার স্ত্রী আর লিলি ঘরে ঢুকেছে। সে দৌড়ে গিয়ে লিলিকে কোলে তুলে নেয়। লিলি কিন্তু চীৎকার করে ওঠে। ফিলিপ্ জিজ্ঞাসা করে—"কি হয়েছে লিলি?" লিলি বলে—"আমায় নামিয়ে দাও... তুমি কে, আমার বাবা কোথায়...মা আমার ভয় করছে একে দেখে...।" ফিলিপ্ হঠাৎ লিলিকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। লিলি কাঁদতে থাকে—"মা আমি বাবার কাছে যাব—" ফিলিপ্ বুঝতে পারে না...কি হয়েছে তার? মেয়ে বাপকে চায় না...মেয়ে বাপকে চিনতে পারে না...মেয়ে বাপকে ভুলে যায়...সে ক্ষেপে ওঠে। চীৎকার করে বলে—"বেরিয়ে যাও তোমরা...তোমরা আমার কেউ নও...বেরিয়ে যাও...খুন করব তোমাদের...।" মেরী লিলিকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। প্রহরী দরজা বন্ধ করতে করতে বলে—"পাগল"। ফিলিপ্ বুঝতে পারে না কিছু...সে ত পাগল হয়নি। সে ভাবতে থাকে কি হয়েছে তার?...আবার একজন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে...। ফিলিপ্ চিনতে পারে তার বন্ধু জন্‌কে। ফিলিপ্‌কে দেখে জন বলে—"একি তোমার চেহারা হয়েছে ফিলিপ্! তোমাকে একদম চেনা যায় না...২ দিনে যেন ২৫ বছর বেড়ে গেছ।" জন অনেক কথা বলে যায়, ফিলিপ-এর কানে ঢোকে না। খট্ করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হয়। ফিলিপ্ দেখে, জন কখন চলে গেছে। ফিলিপ্ বুঝতে পারে কেন লিলি তাকে দেখে চীৎকার করে উঠেছিল...কেন তার কাছে আসতে ভয় পেয়েছিল...।

ঢং! ঢং! ফিলিপ্ গোণে...১২টা বাজল। আর ১ ঘণ্টা... ৬০ মিনিট...তারপর? সে বসে পড়ে মেঝের উপর। ভাববার চিন্তা তার যেন লোপ পেয়েছে...। খানিকটা পরে একজন বিশপ ঘরে ঢোকেন। তার হাতে একখানা বাইবেল...। সে হঠাৎ বিশপ্‌কে বলে—"তুমি আমার মেয়ের জন্যে গান-গাওয়া পুতুল কিনে দেবে?" বিশপ বললেন—"দেব......কিন্তু তুমি এখন প্রার্থনা কর যীশুর কাছে...তোমার সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন।" ফিলিপ্ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তার গলা থেকে আওয়াজ বেরোয় না। অল্পক্ষণ পরে বিশপ চলে যান। ফিলিপ্ তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে হয়ত লিলির কথা ভাবছে। ......৪।৫ জন প্রহরী আসে ঘরের ভেতর। তাকে নিয়ে চলে, সে কিছু বলে না। তার মন যেন পাথর হয়ে গেছে। একটা ঘড়ির দিকে তার নজর পড়ে, সে চমকে ওঠে। ১টা বাজতে ৫ মিনিট বাকী। একটা জায়গায় তাকে দাঁড় করান হয়। একটা দড়ির ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে দেওয়া হয়...কতকগুলো লোক আস্তে আস্তে কি বলাবলি করে। ফিলিপ্ চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে...সে হয়ত তখনও ভাবছে...তার স্ত্রীর কথা তার মেয়ের কথা। কি সুন্দর তার ছোট্ট মেয়েটা! সে হয়ত ফিলিপ্-এর ফিরে যাওয়া নিয়ে মাকে বল্‌ছে "মা! বাপটা বড় মিথ্যেবাদী...বল্‌লে কাল আস্‌বে...ফিলিপ্ চঞ্চল হয়ে উঠে। তার স্ত্রী এতক্ষণ হয়ত কাঁদছে...।

হঠাৎ একটা তীব্র হুইসিলের আওয়াজ তার কানে আসে...ফাঁসটা মনে হ'ল চেপে বসে গেল...পায়ের নীচে থেকে পৃথিবীটা সরে গেল......।

মৃত্যুর শীতল ছায়া ফিলিপ্-এর উপর ঘনিয়ে এল। ঢং...........

১টা বাজলো...........।

Victor Hugo-র "Last day of the Condemned man"-এর ভাব অবলম্বনে লিখিত।

ভিজাগাপট্টমে কয়েকদিন

শ্রীঅনাথচন্দ্র রায়চৌধুরী

ভ্রমণে মাদকতা আছে, উন্মাদনা আছে আর আছে অশ্রান্ত আনন্দ। প্রবাস হ'তে যখনই কলকাতায় ফিরেছি তখনই চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি, ভেবেছি মনে কেন এই বেহাগ সুর বাজে! চিন্তা-ভাবনা দু'হাতে সরিয়ে যদি কেউ মুক্তবিহঙ্গের মত আনন্দাকাশে বিচরণ করতে চায়, তবে ভ্রমণ তার একমাত্র পথ।

দার্জিলিং হ'তে ফি'রে আমি, সুরজিৎ, অনিল, অমূল্য ও করুণা পাঁচ বন্ধু মিলে ঠিক ক'রলাম এবার 'ওয়ালটেয়ার' যে'তে হবে। পর্বত ও সমুদ্রের এত সুন্দর সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না।

'ওয়ালটেয়ার' সম্বন্ধে কিছু জানতে দু'একজন বন্ধুর কাছে গিয়েছি কিন্তু তারা নাসিকাকুঞ্চিত ক'রে 'ওয়ালটেয়ার'এর প্রতি অশ্রদ্ধাই দেখিয়েছে।

৩১শে অক্টোবর আমরা যাওয়ার দিন ঠিক করলাম। যাওয়ার পূর্বে এক বন্ধু এসে বললে—'তবে সত্যিই চললে?'

বন্ধু আমার ওয়ালটেয়ারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে অন্য-স্থানে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছিল। তবুও আমরা ওয়ালটেয়ার যাচ্ছি জেনে একটু হতাশ হয়ে বললে—ওয়ালটেয়ার তোমাদের বোধ-হয় মন্দ লাগবে না।

হাসি এল। ভাবলাম ও কতবড় ভুল করেছিল আমাদের বুঝতে! যারা স্বাস্থ্যের জন্য বাইরে যায় আমরা সে পথের পথিক নই। আমরা যাই বিভিন্ন স্থানের বৈশিষ্ট্য দেখতে, বিচিত্র রূপ দেখতে। প্রত্যেক স্থানের তার নিজস্ব একটা রূপ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে; সেই রূপ বা বৈশিষ্ট্য যদি না দেখলাম তবে বেড়াবার সার্থকতা কোথায়!

আমাদের ভ্রাম্যমান দলে এবার বাসন্তীদেবী যোগ দিয়েছিলেন। বাসন্তীদেবী বন্ধুবর করুণার নব-পরিণীতা স্ত্রী। অতএব আমাদের যাত্রাপথে সাথী হওয়ার তাঁর যথেষ্ট দাবী ছিল আর সে দাবী তিনি মোটেই হারাতে চাইলেন না।

কিন্তু আমাদের দলের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সভ্য অনিল যখন এসে জানালে তার যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন আমরা সবাই একটু মর্মাহত হ'লাম। আমাদের আনন্দের বা স্ফূর্তির রসদ ওই অর্ধেক যোগায়। তার বাবা অসুস্থ জেনে আমরা কোন কথাই বলতে পারলাম না।

মাদ্রাজ মেলে আমি, অমূল্য ও সরজিৎ রওনা হ'লাম। অনেক রাতে ঘুম ভাঙতে দেখি ট্রেণ থেমেছে এবং সুরজিৎ গাড়ীতে নেই। অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করতে বললে—'মার্জাদিয়ার ট্রেণ দুর্ঘটনার পর হ'তে সুরজিৎ গাড়ী থামলেই ষ্টেশনে নেমে পড়ে'। দু'এক ষ্টেশন লক্ষ্য করে কথাটা একদম অবিশ্বাস করতে পারলাম না, ভাবলাম জিজ্ঞাসা করে দেখি কী উত্তর দেয়। জিজ্ঞাসা করতে ও বললে—'ষ্টেশনের চারিদিকের Scenery observe করছি।' এই আঁধারে ষ্টেশনের দৃশ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছে শুনে চুপ করে গেলাম। এমন উত্তর দিয়ে আমায় বোবা করে দেবে আমি বুঝতে পারিনি।

যখন ভোর হ'ল তখন চিল্কার পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটেছে। রেল লাইন চিল্কার পাশে প্রায় চল্লিশ মাইল চলেছে। এই হ্রদে যেতে হ'লে রম্ভা ষ্টেশনে নামতে হয়। চিল্কার বিস্তৃত নীল জলরাশি ও পূর্বঘাটের গিরিমালার বিশাল কলেবর ভ্রমণকারীর নয়ন মন ভোলায়।

সুরজিৎ তন্ময় হ'য়ে চিল্কার রূপ দেখছিল। সূর্য তখন রক্তজবার মত লাল হ'য়ে দেখা দিল। বললুম—সূর্যের কি অনুপম জ্যোতির্মূর্তি। সুরজিৎ যেন ধ্যানস্থ হয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে—অপূর্ব!

বললুম—তবুও যেন এ দেখার মাঝে একটা ব্যথা রয়ে গেল।

সুরজিৎ বললে—ঠিক বলেছ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোরম তা প্রিয়জনের সাথে না দেখলে সে দেখা চিরদিনই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে আমরা তিনজনেই চিল্কার সেই প্রাতঃ-কালীন অপরূপ সৌন্দর্য তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম। মাদ্রাজ মেলও দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে রম্ভা ষ্টেশনে এসে থামল। এরপর ট্রেন থেকে আর চিল্কা দেখা যায় না।

সিংহাচলম্ মন্দির

ষ্টেশনে প্রচুর আতা ও কলা বিক্রী হচ্ছিল এবং তা দামেও সস্তা। পয়সায় বড় বড় আতা ও কলা দুটি করে। সস্তা পেয়ে অমূল্য এক কাঁড়ি কলা ও আতা কিনে ফেললে। মাদ্রাজ প্রদেশে পড়বার পর হতে মাটির রং রাঙা দেখলাম আর দুধারে তাল বনের সারি চলেছে আর তারই গায়ে লালজলের নদী দেখে রূপকথার রক্তনদীর কথা মনে পড়ে গেল।

ওয়ালটেয়ারে যখন পেঁ'ছলাম, তখন দুটো বাজে। আমরা মালগুলি ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রেখে ষ্টেশনেই স্নানাহার করে ঠাণ্ডা হয়ে নিলাম। তারপর থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত করবার জন্য তিনজনে একটা "ঝট্‌কা" যাতায়াতের জন্য ঠিক করে বেরুলাম।

ভিজাগাপটম্-এ "পিরোজ ম্যানশান"এ থাকবার বন্দোবস্ত করে আবার ঝট্‌কায় চড়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লাম। কারণ সন্ধ্যার গাড়ীতে করুণা ও তার পত্নী বাসন্তীদেবী আসছিল। "ঝট্‌কা" ঝটিকার অপভ্রংশ কি না জানি না, কিন্তু ঝট্‌কা খেয়ে যখন ষ্টেশনে এসে পেঁ'ছলাম তখন জীবনান্ত হয়ে পড়েছি। মনে মনে, যে লোকটি এর নামকরণ করেছিল, তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম।

ওয়ালটেয়ার যাতায়াতের যন্য ঝট্‌কা, মাণ্ডি মোটর ও রিক্সা পাওয়া যায়। ওয়ালটেয়ার হতে ভিজাগাপট্টম তিন মাইল দূরে। ভিজাগাপট্টমে যেতে ট্যাক্সী এক টাকা দেড় টাকা নেয়, ঝট্‌কায়

নেয় ছয় আনা ও মাশিডতে নেয় পাঁচ আনা যদিও আমাদের ট্যাক্সী ভাড়া লেগেছিল দু'টাকা। কারণ অজানা লোক দেখলে ওরা লোভের আশা ছাড়তে পারে না; দাম চায় চড়া করে।

করুণা ও বাসন্তীদেবী আসছিলেন সন্ধ্যার গাড়ীতে। ট্রেন জার্নিতে বাসন্তীদেবীর চোখ-মুখে ক্লান্তির চিহ্ন পড়েছে। আশা ছিল "পিরোজ ম্যানশান"এ গেলে সব অবসাদ মুছে যাবে। আমরা পূর্বেই স্নানের জল ও Rice-curry-র সংস্থান করে রেখেছিলাম, কিন্তু জানতে পারলুম বাসন্তীদেবী মাংস-ডিম খান-না, কোনদিন হয়ত খাবেনও না। অমূল্য সুরজিৎ যখন সমস্ত হোটেল তোলপাড় করে মাছ না পেয়ে ফিরে এল তখন ওদের দিকে আর তাকাতে পারলুম না। দেখলুম শক্তিশেলের ব্যথা ওদের মুখে আঁকা রয়েছে। সেই রাতেই আমরা রাঁধবার লোক ঠিক করলুম যাতে প্রভাত আমাদের সুপ্রভাত হয়।

বাসন্তীদেবী দরদী। তাঁর অনুভব করবার বা বুঝবার ক্ষমতা অসীম। অমূল্য সুরজিৎ-এর সমস্ত চেষ্টা তাঁর চারুচোখ হতে এড়াতে পারেনি। সমস্ত তাঁর মনের দেওয়ালে আঁকা রইল।

ভোরে চা খেতে খেতে বাসন্তীদেবী যতদূর সম্ভব কণ্ঠে মধুনির্যাস মাখিয়ে বললেন—'আপনারা আমার জন্য মোটেই ব্যস্ত হবেন না আমি সব সইতে পারি।'

তিনি হয়ত সব সইতে পারেন, কিন্তু সইতে দিই কী করে। সুরজিৎ বললে—'আর ও-কথা তুলে লজ্জা দেবেন না।

বললুম—অমূল্য যেন কর্ণ। কর্ণ যুদ্ধের সময় সঠিক অস্ত্র-চালাতে ভুলে যায় আর অমূল্য কাজের সময় বুদ্ধির সঠিক চালনা করতে ভোলে।

ও-দিকে সমুদ্র গর্জনের ওপর গর্জন করে পাড়ে আছাড় খাচ্ছিল। বাসন্তীদেবী বললেন—সমুদ্র দেখে আপনাদের কী মনে হয়?

সুরজিৎ দ্বিধা না করে বললে—সহস্র ফণীর একত্র দংশন।

করুণা বললে—আমার গর্জন শুনলেই ভয় হয়। মনে হয় পশ্চিম সীমান্তে কামান গর্জন।

সবাই হেসে ফেললুম।

বাসন্তীদেবী বললেন—আমার মনে হচ্ছে দুরন্ত ছেলে মায়ের বুকে আছাড় খেয়ে মাকে অস্থির করে তুলছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' মনে পড়তে আবৃত্তি করে গেলাম—

> হে আদিজননি সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
> একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
> চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা
> সদা আন্দোলন, তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
> নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র মন্দির পানে
> অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা নিয়ত মঙ্গল গানে
> ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি;......

প্রথম দিন আমরা ভিজাগাপটম-এর চারিদিক ঘুরে দেখলাম। বাসন্তীদেবী, করুণা ও অমূল্যকে 'ঝট্‌কা'য় চড়িয়ে আমি ও সুরজিৎ "হারবার" (পোতাশ্রয়) দেখতে গেলাম। দুইটি পাহাড়ের মাঝ হ'তে জল এনে হারবারটী নির্মিত হ'য়েছে। মধ্যপ্রদেশের নানাবিধ ধাতু ও পণ্য দ্রব্য এখান হ'তেই বিদেশে রপ্তানী হয়। ভবিষ্যতে হারবারটী বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করবে। এখানকার নানারূপ কাজ ও Dry-Dock দেখে ফিরে এসে ঠিক করলুম কাল ভ্যালী গার্ডেন-এ যেতে হবে। ভ্যালী গার্ডেন, ডক-এর বিপরীত দিকে। পরদিন ভোরে ভ্যালী গার্ডেন দেখতে গেলাম। স্থানীয়-লোক সীতারাম বলেছিল—বাবু ভ্যালী গার্ডেন পিকনিক করবার খুব ভাল জায়গা। অনেকে ওখানে পিক্‌নিক্ করে থাকে। অদূরে একটি বাঙলো দেখতে পেলাম। বাঙলো আসতে ইটের রাস্তা। রাস্তার দুধারে নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী চলেছে। দক্ষিণে একটি পুকুর আছে, তার চারিদিকে কলা গাছের বন। বাঙ্গলোটি একদম নির্জন। এটি ভিজিয়ানাগ্রাম-এর রাজার প্রমোদ-কানন। উদ্যানের চারিদিকে বাঁধান রাস্তা চলে গেছে, তারই পাশে মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত কূপ রয়েছে। আজকাল রাস্তাগুলি অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বোধহয় রাজার দৃষ্টি পূর্বের মত নেই।

ভ্যালী গার্ডেন-এর পূর্বদিকে Dolphin nose (ডল্‌ফিন নোজ)। ডল্‌ফিন নোজে যেতেও নৌকা ব্যবহার করতে হয়। ভ্যালী গার্ডেন বা ডল্‌ফিন নোজে আসতে এক পয়সা করে জন-

ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র

প্রতি ভাড়া নেয়; সন্ধ্যার পর নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ডল্‌ফিন নোজের পাহাড়ে পাহাড়ীদের পল্লী আছে। কতিপয় সন্ন্যাসীও তথায় বাস করে। স্থানটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। একটি পুরাতন দুর্গের চিহ্ন দেখা যায়।

ডক-এর গা বেয়ে যে পাহাড় উঠেছে, তার উপরে পর পর মন্দির, মসজিদ ও গির্জ্জা রয়েছে। মন্দিরটি দুশত বৎসরের পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বেঙ্কট স্বামী—গির্জাটি প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের।

সমুদ্রের পাশ হ'তে সুন্দর রাস্তা চলে গেছে। পিরোজ ম্যানশান ঠিক সমুদ্রের ওপর। উত্তরে কিছুদূর গেলেই মিউনিসিপ্যাল অফিস ও টাউন হল পড়ে। টাউন হলটি দ্বিতল। এক-তলায় ভাইজাগ লাইব্রেরী রয়েছে। এখানে প্রবাসীদের সভ্য হওয়ার বন্দোবস্ত আছে। পিরোজ ম্যানশনের দক্ষিণে লাইট-হাউস। রাস্তায় রাত্রি ১০-৩০ পর্যন্ত আলো জ্বলে। বসবার জন্য মাঝে মাঝে কিছু স্থান বাঁধিয়ে রেখেছে। রাতে খাওয়া হলেই আমরা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে বসতাম। পিরোজ ম্যানশান-এ এসে উঠেছি বলে নিজেদের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম।

বৈকালে মোটরে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। পিরোজ ম্যানশান হ'তে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় মাইল তিন-চার দূরে। ওয়ালটেয়ার-এর তিনটি ভাগ আছে। আপার ওয়ালটেয়ার, লোয়ার ওয়ালটেয়ার ও মিডল ওয়ালটেয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সুধর্মসদন' 'অশোকবর্ধন' ও 'বিনয়-বিহার' নামে তিনটি ছাত্রাবাস আছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অত্যল্প। দু'শতেরও কম ছাত্র এখানে বাস করে। মহিলাদের পাঠের জন্য পৃথক আসনের সুবন্দোবস্ত আছে। কলেজের সর্বস্থান হ'তে ঘড়ি দেখবার সুবিধার জন্য সায়ান্স কলেজ হর্ম্যের গম্বুজে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান আছে। Clock Tower-এর নীচে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক জয়পুরের মহারাজা শ্রীবিক্রমদেও বর্মা ডি-লিট-এর মর্মর মূর্তি অবস্থিত। নানা ভাষার নানা বিষয়ের মূল্যবান পুস্তক লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে। বর্তমানে মিঃ সি আর রেড্ডী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার।

এস্থানের স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী বেশ সুন্দর। পিছন দিকে পূর্বঘাটের গিরিমালা ও সামনে অসীম সমুদ্র ইহাকে অনিন্দসুন্দর ক'রে তুলেছে।

ভিজাগাপটম-এর মেন রোড-এর উপর দু'টী বড় বাজার র'য়েছে। এখানে যথেষ্ট মাছ ও তরীতরকারি পাওয়া যায়। এখানকার হিন্দুরা মাছ-মাংস খায় না, এখানে ১২০ একশত কুড়ি তোলায় অর্থাৎ আমাদের দেড়সেরে ওদের একসের বলে বিবেচিত হয়। এরা তেলেগু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। এখানে বাঙালীর সংখ্যা খুবই কম। পিরোজ ম্যানসন-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে কতিপয় বাঙালীর ছোট একটি ক্লাব আছে। এদেশে ধর্মশালার নাম ছত্রম। টোর্ণাস্ ছত্রমে দুইদিন বিনা পয়সায় থাকা চলে কিন্তু তৃতীয়দিনে চার আনা দিতে হয়। ছত্রমটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

সমুদ্র স্নানে নূতনত্ব আছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাওয়া বা ভাঙা ঢেউয়ের মাঝে ডুব দেওয়ায় অপার আনন্দ। করুণা ও সুরজিৎ সমুদ্রে এই প্রথম স্নান ক'রল। স্নানে সুরজিতের ভয়ের অন্ত নেই। নুলিয়ার উপর সে কি আক্রোশ। কয়েকবার আছাড় খেয়ে সে সমুদ্রের পাড়ে বসে রইল। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল, কথা বলবার ক্ষমতা একদম হারিয়ে ফেলেছে।

সামলে নিয়ে বললে—আমি আর কখনও সমুদ্রে স্নান করছি না।

"পিরোজ ম্যানশান"এ খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হয়। ঘরগুলি দিন বা মাস হিসাবে ভাড়া পাওয়া যায়। প্রত্যেক ঘরের সংলগ্ন বাথরুম আছে এবং প্রত্যেক ভাড়াটেকে একটী করে রান্নাঘর দেয়। আমরা যে দু'টী ঘর নিয়েছিলাম তার ভাড়া যথাক্রমে দিন হিসাবে ২৲ দুই টাকা ও ১৷৹ দেড় টাকা ও মাস হিসাবে ৩৫৲ টাকা ও ৩০৲ টাকা। ম্যানসান-এ জলের কল এবং বিজলী আলোর ব্যবস্থা নেই। বাইরে হতে জল আনিয়ে নিতে হয়, প্রতি ঘড়া জলের জন্য এক পয়সা করে দিতে হয়। রান্না করার লোক আমাদের কাছ হ'তে দৈনিক আট আনা নিত এবং আর একজন লোক খাওয়া পরিবেষণ করবার জন্য দৈনিক চার আনা করে নিত। ওখানে খাওয়াদাওয়া ও রান্নাবান্নার সমস্ত বাসন ভাড়া পাওয়া যায়। মাসে ২৲ টাকা ভাড়ার বাসনে পাঁচজনের চলে যায়।

পরদিন ভোরে সিংহাচলম যাওয়ার ঠিক করলুম। পূর্বেই ট্যাক্সী বলে রেখেছিলাম। মোটরপথে সিংহাচলম্ ওয়ালটেয়ার হ'তে নয় মাইল ও ভিজিগাপট্টম হ'তে এগার মাইল দূরে। সকালে চা-রুটি, ডিম ও কলা খেয়ে রওনা হ'লাম। ভোরের বাতাস চোখে-মুখে এসে লাগছিল। একে সুন্দর প্রভাত তায় চতুর্দিকে মনোরম দৃশ্য, করুণা গান ধরে দিলে। গান গাইবার এতবড় সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর পাওয়া যাবে না। এ সুযোগ হারাবার মত নির্বোধ অমূল্য নয়। অমূল্যও গলা ছেড়ে দিলে। বাসন্তী দেবী, আমি ও সুরজিৎ দরদী সমজদার হ'য়ে রইলুম। একটু পরে অমূল্য নিজের সুরে নিজেই চমকে উঠে গান থামিয়ে দিলে। অমূল্যর গান যে না শুনেছে সেই ধন্য। আমরা আজও বুঝতে পাচ্ছি না সে দিন অমূল্য গান গেয়েছিলো না পুত্রশোকের কান্না কেঁদেছিল।

মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে আমাদের মোটর থামল। ৮০০ শত ফিট উচ্চ পর্বতশিরে নরসিংহ দেবতার মন্দির। সিঁড়ির ধাপ ১১২০টি। সিঁড়ির কাছে এসে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলাম বিশাল সিঁড়ির ধাপ সোজা চলে গেছে। সিঁড়ির ঐশ্বর্য্য দেখে স্বভাবতই মনে আসে যে কোন বিরাট পুরুষ উপরে অবস্থান করেন। আমরা ধাপের পর ধাপ ভেঙে উপরে উঠতে লাগলুম আর অবাক বিস্ময়ে স্বনামধন্যা রাণী অহল্যা বাঈ-এর অমর কীর্ত্তির কথা ভাবতে লাগলুম। ধাপগুলি লম্বায় ১২ ফিট ও চওড়ায় এক হাত। দশ বারটি ধাপ অন্তর একটি বিশ্রাম চাতাল। প্রায় পাঁচশ ধাপ উঠলে একটা তোরণ পড়ে। হনুমন্তস্বার নামে ইহা খ্যাত। সিঁড়ির দু'পাশ হ'তে দু'টি ঝরণা হ'তে অজস্র জল পড়ছে। একটির নাম 'পিচিকা' অন্যটির নাম 'আকাশধারা'; দুধারে গণেশ প্রভৃতি পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি রয়েছে।

কথিত আছে সিংহাচলম্ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল। পিতৃদ্রোহী প্রহ্লাদকে সমুচিত শাস্তি দিতে হিরণ্যকশিপু তাকে এই পর্বতমালা হ'তে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবার আদেশ দিয়েছিলেন। দৈত্যরাজ স্ফটিকস্তম্ভে অস্ত্রাঘাত ক'রলে নৃসিংহদেব সেখান হ'তে বের হ'য়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। তিনি শ্রীলক্ষ্মীর সহিত এখানে বাস করেন। সেই নৃসিংহ মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত।

উপরে উঠে চারিদিক দেখছি, কতকগুলি মেয়ে ফুলের মালা নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল। আমরা ওদের দিকে তাকিয়ে আর না বলতে পারলাম না, সবার গলায় মালা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন ওদের ক্ষান্ত হ'তে বল্লুম।

তীর্থযাত্রীদের এখানে থাকবার বন্দোবস্ত আছে। বহু অর্থ-ব্যয়ে এখানে বিজলী বাতি দিয়েছে অতএব মন্দির ও দেবতা দেখবার সুবিধা রাতে ও দিনে সমান।

যাত্রীরা বৎসরে কেবলমাত্র একদিন অক্ষয়তৃতীয়ায় নৃসিংহ-দেবের মূর্ত্তি দেখতে পান। অন্য সময় চার হাত উঁচু তাম্র পাত্রস্বারা আবরিত থাকে। প্রত্যহ এই পাত্রটি শ্বেতচন্দনে লিপ্ত হ'য়ে পূজিত হয়। মন্দিরটি ছয় শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। মন্দিরের চূড়া বেশী উঁচু নয় তবে সোনার পাত দিয়ে মোড়া। প্রতিদিন তিন মণ চালের 'অন্নভোগ' হয়। সেই ভোগ 'ছত্রবাটী'তে বিক্রী ও বিলি হয়। মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, দক্ষিণে মণিক্যাম্বা ও পশ্চিমে বামাদেবীর মন্দির আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে পরম বৈষ্ণব রামানুজাচার্য্যের মূর্ত্তি অন্যান্য ভক্তের সহিত স্থাপিত আছে। এই মন্দিরটি বিজয়না-গ্রামের রাজার দেবোত্তর সম্পত্তি। আজকাল একটি সঙ্ঘের স্বারা ইহা পরিচালিত হচ্ছে। সমতল ভূমি হতে একটু উঠিলে রাজার পুষ্পোদ্যান ও বিশ্রামভবন দেখা যায়।

এখানে পান্ডা বা ছড়িদারের উৎপাত নাই। মন্দির প্রবেশের জন্য এক আনার গেট-পাশ নিতে হয়। মন্দিরের চারিদিকের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রকৃতি যেন মুক্তহস্তে তার ভান্ডারের ঐশ্বর্য্য মন্দিরের চারিদিকে ঢেলে দিয়েছে।

মন্দির হতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। ক্ষিদেতে জঠরে আগুন জ্বলছিল তবুও বাসন্তীদেবীকে বিশ্রামের অবসর দিচ্ছিলাম। কিন্তু অমূল্য একদম গদ্য বললে—চল চল আর আয়াস করতে হবে না।

আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু অমূল্যের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলাম—বুঝলুম অমূল্য মেজাজে আছে। অমূল্য ভাল থাকলে 'ভোলানাথ', রাগলে 'নটরাজ'।

মাঝে মাঝে করুণা বাসন্তীদেবীকে নিয়ে একান্ত একলা হতে চাইত। আমরা বুঝলুম এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই একদিন বাসন্তীদেবীকে বললুম—বড় দুঃখ রইল, আপনাদের মিলন-পথে আমরা চোর-কাঁটা হয়ে রইলুম।

দেখতে দেখতে আমাদের থাকার দিন ফুরিয়ে গেল। পাত-তাড়ি গুটিয়ে আমরা সবাই রওনা হলাম। কথা ছিল আমি, অমূল্য ও সুরজিৎ গোপালপুরে 'হল্ট' করব আর করুণা ও বাসন্তী-দেবী সোজা পুরীতে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন।

বহরমপুর-এর কয়েক ষ্টেশন আগে সুরজিৎ, করুণা ও বাসন্তীদেবীর সাথে দেখা করতে গেল। এসে বললে বাসন্তী-দেবী অমূল্যর সাথে দেখা করবার জন্য ব্যাকুল। বহরমপুর ষ্টেশনে মাল নামিয়ে সুরজিৎ ও অমূল্য দেখা করতে গেল।

(শেষাংশ ২৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাসগুপ্ত

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঝশিডীতে গাড়ী বদল করিয়া যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তাহারা উঠিয়া বসিল তাহাতে একটি মাত্র ভদ্রলোক ছাড়া আর কেহই ছিল না। ভদ্রলোক কোন্ দেশীয় দেখিয়া ঠিক বোঝা যায় না, হয়ত' বা বাঙালী, বাঙলার বাহিরে থাকিয়া আকৃতি এবং প্রকৃতি যতটা সম্ভব বদ্লাইয়া ফেলিয়াছেন। বাঙলা কথা কহিতেও পারেন, কেমন একটা বিহারী টান তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। দেহের ওজন দুই মণের কম হইবে না, মাথার মধ্যখানের ছোট্ট একটু গোলাকৃতি টাককে ঘিরিয়া কয়েকগাছি চুল যেন নিজেদের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্যই টিকিয়া আছে। গিলে করা ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী ভেদ করিয়াও তাঁহার ভূঁড়ি যেন আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পাশে বেঞ্চির উপর ফেলিয়া রাখা চশমার খাপ হইতে চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর আঁটিয়া খবরের কাগজ পড়িবার ফাঁকে ফাঁকে ওই নবাগত তিনজনের বিশেষ করিয়া একজনকে অতি সাবধানে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অলকা লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল; দিলীপ হাসিয়া ভদ্রলোকের নিকট আগাইয়া গিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আজকের কাগজ নাকি, দেবেন একটু?

ভদ্রলোক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়, কি বলে গিয়ে, আজকেরই ত', তবে মফঃস্বলের আজকে আর কি।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ মফঃস্বলে ওইত' মুস্কিল, বাসী খবর। কিন্তু বাসী হ'লেই বাজে নয়, আমাদের কাছে ত' টাট্‌কাই, কি বলুন?

ভদ্রলোক বলিলেন, নিশ্চয়। তা' যাচ্ছেন কতদূর? হাওড়া পর্য্যন্ত ত? তা' একসঙ্গেই যাওয়া যাবে গল্প ক'রতে ক'রতে।

মুখে একটা করুণ ভাব ফুটাইয়া দিলীপ বলিল, না অতদূর আর যাওয়া হ'ল কই? মধুপুরেই নেমে যেতে হবে আমাদের, একটা ষ্টেশন মাত্র—আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট।

ভদ্রলোকের মুখের ভাব অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন তাইত' নেমে যাবেন এত তাড়াতাড়ি। গাড়ী যতক্ষণে না ভ'রে যায় ততক্ষণ আর নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, কি জানি কা'রা উঠে পড়ে, হয়ত' দু'টো কাবুলী কিংবা একটা ফিরিঙ্গিই উঠে বসে।

দিলীপ বলিল, আর কতক্ষণ বাকী গাড়ী ছাড়তে?

হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া এবং চকিতে ওই দিকের বেঞ্চে উপবিষ্ট অলকার দিকে চাহিয়া মনে মনে যেন একটু হিসাব করিয়াই তিনি বলিলেন, আর মাত্র তিন মিনিট, ছাড়লে' ত' পৌঁছে যাবেন, ভাবনা কি?

ঘাড় নাড়িয়া দিলীপ বলিল, না ভাবনা আর কা'রই বা আছে বলুন না।

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা বটে, তা বটে।

এমন সময় জানলার বাহিরে একটি ফিরিওয়ালা ডাকিয়া উঠিল, কেলা চাই বাবু, কেলা।

ভদ্রলোক যেন লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিলেন, এই ইধার আও, এই কেলা।

কলাওয়ালা চলিয়া যায় নাই দাঁড়াইয়াই ছিল।

তাহার ঝুড়ি হইতে মাঝারি গোছের একটা ছড়া তুলিয়া লইয়া বেশ করিয়া বার দুই গণিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, কেতনা হো? তারপর ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া দিলীপকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কলা খেতে আমি খুব ভালবাসি, প্রত্যেকেরই খাওয়া উচিত, স্বাস্থ্যের এমন চমৎকার কোন অসুধ আর আছে কি না জানি না।

তাহার শরীরের দিকে চাহিয়া অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই ছিল না, ওই ভূঁড়ির অন্তরালে স্বাস্থ্য বৃদ্ধির কতগুলি এমনি অসুধ যে আত্মগোপন করিয়া আছে তা কেই বা জানে।

হিসাব করিয়া বিক্রেতা বলিল, ছে' পয়সা বাবু।

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। ভদ্রলোক বলিলেন, নেহি চার পয়সা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোগা।

লোকটি মাথা নাড়িয়া ছড়াটি ফেরত চাহিল, বাবু কিন্তু ফেরত দিলেন না। গার্ডের বাঁশী বাজিল, ট্রেনও চলিতে সুরু করিয়া দিল। বিক্রেতা ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। ভদ্রলোক নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবেই ছড়াটি বেঞ্চির উপর রাখিয়া পকেট হইতে একটি আনী তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

লোকটি প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, নেহি বাবু আউর দোঠো।

কিন্তু আর সময় ছিল না, গাড়ী প্ল্যাট্‌ফরম ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল, কলা বিক্রেতা সক্রোধে গালি দিতে লাগিল, পকেট হইতে একটা আনী বাহির করিয়া দিলীপ তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। লোকটা ব্যস্ত হইয়া খুঁজিতে লাগিল, দিলীপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল, গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া আগাইয়া গেল—আর কিছুই দেখা যায় না, হয়ত' সে উহা খুঁজিয়া পাইয়াছে হয়ত' বা পায় নাই, কিন্তু পাইলেও তাহার মনের ক্ষোভ কি মিটিয়াছে?

স্থির হইয়া বসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, একটা জলজ্যান্ত আনী দিয়ে দিলেন? অচল বুঝি, তা বেশ করেছেন, চ'লবে না-ই যখন তখন ওকে ঠাণ্ডা ক'রে মন্দ করেন নি।

তাহার কথা শুনিয়া দিলীপের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, না অচল কিছু আমাদের পকেটে থাকে না।

মুখ তুলিয়া চাহিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, তবু দিয়ে দিলেন? না আপনারা সত্যি পাগল দেখছি। রোজগার ক'রতে হয়না বুঝি আজও। বেশ, বেশ। অতগুলো কলা কিনেও যে আনীটা আমি দিয়েছি, দেখে আসুন গিয়ে, কেমন ঘষা আর একটু কাটাও আছে, সহজে চালানো যাবে না। আর আপনি কি না, ছিঃ। বাঙালীর ছেলে এত' বোকা তা ত' কখনও ভাবিনি, আশ্চর্য্য।

দিলীপের আর কোন কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না, সে অন্যমনস্কের মত বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোক আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, গাছ থেকে কতকগুলো কলা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে তার আবার দাম! আমার জমীদারীতে গিয়ে দেখুন না, যা চান সবই পাবেন, আমার নাম করুন, কোন্ কি বলে গিয়ে, ইয়ের সাধ্যি পয়সা নেয়। বলে এ হচ্ছে গিয়ে মাধব রায়, রায় রায়ান ব'ললেই বা কে আট্কাতে পারে। বিশ বচ্ছর পুলিসে চাক্‌রী ক'রেও যদি মানুষ না চিনতে পেরে থাকি ত' আমি একটা আস্ত গজ-কচ্ছপ। তারপর গোটা চারেক কলা দিলীপের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, নিন না এ'কটা, আপনাদের—।

দিলীপ মাথা নাড়িয়া বলিল, না ও খাবার ইচ্ছে আমাদের নেই। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বিলক্ষণ, কলা খাবার আবার ইচ্ছে! পুলিসে যখন চাক্‌রী করি তখন হেঁ হেঁ। তারপর সেই জমীদারী পাওয়াটার কথা জানেন না বুঝি? একেই বলে গিয়ে বুদ্ধি। ওখানকার জমীদার খুনের দায়ে ধরা প'ড়ে গেল, একেবারে নির্ঘাৎ ফাঁসী, আমারই হাতে তদারকের ভার ছিল কি না, ফাঁসী বেঁচে গেল আর কিছু টাকা দিয়ে জমীদারকে বুঝলেন না? তারপর সমস্ত জমীদারীটাই এসে গেল হাতে, একটু বুদ্ধির খোঁচা আর কি। এসব শিখতে হয়, শিখতে হয় বাপু। একটা আস্ত কলা মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নিতান্ত তুচ্ছভাবেই খোসাটাকে ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া মোটা কম্বলটাকে পায়ের কাছে নামাইয়া বালিশে হেলান দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

মধুপুরে আসিয়া গাড়ী থামিল। সতীশ ও অলকাকে নামাইয়া দিয়া বিছানা দুইটা কুলীর মাথায় চাপাইয়া ছোট-খাট জিনিষগুলি লইয়া দুই হাত একত্র করিয়া মাধববাবুকে নমস্কার করিয়া দিলীপ বলিল, চললাম, আপনার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকলে আরও কিছু শেখা যেত। যাই হ'ক আপনার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে যদি কয়েকজনকেও অন্তত তৈরী ক'রে যেতে পারেন ত' বাঙলা দেশের জন্যে আর ভাবতে হবে না।

কথাটাকে অত্যন্ত প্রশংসাসূচক মনে করিয়া মাধববাবু টানিয়া টানিয়া হাসিয়া বলিলেন, সে আর ব'লতে, আমিও ত' তাই মনে করি। কি বলে গিয়ে, শিক্ষাটাই ত' আসল, আপনার মত যদি দু'একজনও পেতুম হেঁ হেঁ। যাবেন আমাদের ওদিকে, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, মাধব রায়ের জমীদারী, বুঝলেন কি না? বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খায়, এও তাই, বিশ বচ্ছর পুলিসে ছিলুম ত'। আচ্ছা, নমস্কার, যাবেন। মাধব রায় দুই হাত একত্র করিয়া নমস্কার করিলেন, শেষবারের মত অলকার দিকে চাহিতেও ভুলিলেন না।

গিরিডীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া দিলীপ বলিল, চমৎকার ওই মাধব রায়, ভারতবর্ষের সৌভাগ্য ব'লতে হবে, এমনি বুদ্ধির জাহাজ কত মাধব রায়ই না জানি এর পল্লীতে পল্লীতে লুকিয়ে আছে।

অলকা হাসিয়া বলিল, বেশ ভাব ক'রে নিয়েছিলে কিন্তু তুমি। ঘসা আনি দিয়ে কেনা অত সাধের স্বাস্থ্যের বীজের ভাগও বসিয়েছিলে আর একটু হ'লেই।

হাসিয়া দিলীপ বলিল, ওটা মাধব রায়ের রায় রায়ান স্বভাবের সুগম্ভীর চাল।

সতীশ বলিল, আশ্চর্য্য লোকটার নির্লজ্জতা, আনিটা তোমায় ফেরত দেবার কথা একবারও মনে হ'ল না ত'? নিজের দোষকে কেমন সুন্দর গুণ ব'লে চালিয়ে দিয়ে গেল, আশ্চর্য্য।

দিলীপ বলিল, বিশ বচ্ছর পুলিসে চাক্‌রী ক'রেছে, ফাঁকী দিয়ে জমীদারী নিয়েছে তার সমকক্ষ কি আমরা হ'তে পারি? আপনার সাহিত্যে এদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন না? উত্তেজনায় উঠিয়া পড়িয়া দিলীপ সমস্ত কামরাটার মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহার উত্তেজনা সতীশ ও অলকার নিকট অত্যন্ত অভিনব বলিয়াই মনে হইল। রায় রায়ানের সম্মুখে বসিয়াও যে মুহূর্ত্তের জন্য উত্তেজিত হয় নাই তাহার হঠাৎ এ কি হইল? কিন্তু কেহই কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না।

উত্তেজনা কতকটা উপশম হইলে সতীশের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া দিলীপ বলিল, খেলোয়াড়দের আর আপনাদের, সাহিত্যিকদের ওপর আমার ভয়ানক রাগ হয় দাদা। আপনাদের নাকি রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। আমি ভেবে পাই না, জাতীয়তার কোন কথাই কি আপনাদের মনে আঘাত করে না। আপনাদের কলমের যা শক্তি সে যদি কাজে লাগাতেন! থাক্‌গে। সে উঠিয়া গিয়া জানলার বাহিরে চাহিয়া রহিল। ওই দূরের শালবনের দিকে চাহিয়া মনের উত্তেজনা সে উপশম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ সমস্তই নিজেদের অথচ কিছুর উপরই যেন জোর নাই। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া অলকার সম্মুখে বসিয়া বলিল, কেমন যেন হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেছে দিদি, বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে, না?

কোন কথাই না বলিয়া শান্তভাবে একটা রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া অলকা তাহার সম্মুখে আগাইয়া দিল দিলীপও মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই রেকাবীটা খালি করিয়া ফেলিয়া সে হাসিয়া বলিল, উঃ, ক্ষিধে পেয়েছিল ব'লে কি বক্তৃতাই সুরু ক'রে দিয়েছিলুম। যে কটা দিন কলেজে প'ড়েছিলুম তাতেই বুঝেছিলুম যে খালি পেটে পথ চ'লতে চ'লতে দর্শনের যে ব্যাখ্যা অতি সাধারণ ছেলেরাও ক'রতে পারে সে ব্যাখ্যা বৈদ্যুতিক পাখার তলায় ব'সে বিরাট অধ্যাপকদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আমার উত্তেজনা দেখে রাগ করেননি ত' দাদা?

সতীশ বলিল, রাগ করার মত কোন কিছুই ত' তুমি বলনি। যা সত্যি তাই শুধু ব'লেছ, তা শুনে যদি রাগ ক'রে বসি ত' আরও হাস্যাস্পদ হব যে। সত্যি কথা শুনে রাগ করার মত মূর্খ আমায় ভেব' না যেন।

লজ্জিত হইয়া দিলীপ বলিল, কি যে বলেন আপনি, ছিঃ, ছিঃ। আমি ও-সব কিছু ভেবে বলিনি, মনে হ'ল তাই

বললুম নইলে রাগ ক'রতে আপনাকে কেউ কোনদিন দেখেছে বলে ত' আমার বিশ্বাস হয় না।—

অলকা বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, এমনি ধরণের কথা তাহার এখন ভাল লাগিতেছিল না। উহাদের মধ্যে একজনের যে নিস্পৃহ ভাব এবং অপরজনের যে সহজ শিশু-সুলভ ব্যবহার সে এতদিন দেখিয়া দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে তাহার বাহিরের কোন অবস্থাতেই যেন সে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না। নিজেদের ভুলিয়া উহারা এই যে গম্ভীর আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে ইহা যেন উহাদের এতটুকুও মানাইতেছিল না। আজ এই সহজ আনন্দের দিনে, এই দুইটা দিনের আনন্দ অভিযানের একটা ছক আঁকিতে না বসিয়া এমনি আলোচনা করিয়া কি যে ফল হইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। দূরের মাঠে দুই চারিটা গরুর পিছনে যে সাঁওতালের ছেলেটা দৌড়াইতেছিল তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অলকার আশা মিটে না। এমনি সহজ আনন্দেই নিজের খুসী মত যদি সবাই দিন কাটাইতে পারিত? রাখাল বালকটিকে আর দেখা যাইতেছিল না। দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হইয়া যাইতেছে, চোখের উপর নূতন নূতন ছবি ভাসিয়া উঠিতেও বিলম্ব হয় না, কিন্তু যাহা চিরন্তন, যাহার জন্য মানুষের দুঃখের অন্ত নাই তাহাকে কি এমনি করিয়া পাওয়া যায়? অলকা ভাবিয়া পাইল না, ভাবিবার আর ইচ্ছাও তাহার ছিল না।

দিলীপ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, যাক্‌গে ও-সব, উপস্থিত এ দুটো দিনের কথা নিয়েই ভাবতে হবে আমাদের। চায়ের আসরের বক্তৃতার মত করে কোন গভীর বিষয়েই মন দেওয়া যায় না। এ দু'দিনের একটা পাকা বন্দোবস্ত হ'য়ে যাক্ কি বলুন দিদি?

অলকা মুখ ফিরাইয়া চাহিল, কিন্তু তাহার চক্ষের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, সে তখন কোন্ এক স্বপনরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

হাসিয়া ফেলিয়া দিলীপ বলিল, দিদিও কি আমাদের সঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নাকি? কিন্তু আর ত অন্যদিকে মনটাকে রেখে দিলে চলবে না, বর্ত্তমানে ফিরে আসুন। আমাদের কথা না শুনলে যে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না।

এতক্ষণে অলকা সহজভাবে হাসিয়া বলিল, আমি বেশী দূরে যেতে পারিনি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সমানভাবে হেঁটে পথ চলা কি আমাদের সাধ্য মনে কর?

কপালে করাঘাত করিয়া দিলীপ বলিল, আপনার আশে-পাশে থেকে অনেকেই অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নিলে দাদা, কিন্তু এ অভাগার কপালে তা আর হ'ল না। কি আশ্চর্য্য, দু-চারটে বেশ ভাল ভাল কথাও কি মনে আসতে পারে না ছাই।

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বেশত, আমিই শিখিয়ে দেব' না হয়। কিন্তু এ দুটো দিনের কথা কি ব'লছিলে যেন।

দিলীপ বলিল,—পরেশনাথে যেতেই ত' এসেছি এখানে। কিন্তু বেচারা উশ্রী বাদ প'ড়ে যায় কেন? আজ ত' আর আমাদের পরেশনাথ যাওয়া হবে না, কাল, এর মধ্যে আজ বিকালে উশ্রীর ওপর যদি আমরা একটু দয়া দেখাই ত' এমন কিছু অন্যায় হবে কি?

কথাটা সমর্থন না করিবার কোন কিছুই ছিল না। অলকা মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিয়া বলিল, হ্যাঁ এখানে উশ্রীরও একটা পদমর্য্যাদা আছে, তাকে অপদস্থ করার আমাদের কোন অধিকারই নেই।

প্রস্তাব উঠিলেই সাধারণত তাহা পাশ হইয়া যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। (ক্রমশ)

ভিজাগাপট্টমে কয়েকদিন

(২৬৮ পৃষ্ঠার পর)

অমূল্যকে দেখে বাসন্তীদেবী বললেন—ভাবলুম বুঝি এলেন না।

অমূল্য হেসে ফেললে, বললে—আমরা যে তাল-বেতাল, স্মরণ করলে না এসে পারি!

বাসন্তীদেবী বললেন—এখানেই নামব ঠিক করলুম। এক-দিনে এসেছি আবার একদিনেই ফিরব। এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে দেব না।

শুভ সংকল্প সন্দেহ নেই।

বহরমপুরএ চা খেয়ে মোটর চেপে গোপালপুর রওনা হলাম। গোপালপুর গঞ্জাম জেলার একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। বহ-রমপুর ষ্টেশন হ'তে প্রায় ৩০ মাইল দূরে 'তপ্তপানি' নামে একটি গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। গোপালপুর ছোট শহর হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোহর। এখানকার সমুদ্রের জল অত্যন্ত স্বচ্ছ। আমরা স্নান সেরে হোটেলে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। এখানে বাঙালী, মাদ্রাজি ও ইউরোপীয়ান হোটেল আছে।

আমরা হোটেলে গিয়ে পাঁচ কাপ চায়ের হুকুম দিলাম। হোটেল ম্যানেজার বললেন—প্রতি কাপ চার আনা পড়বে। বললাম—ও হতে গলায় ভোজালি বসিয়ে দিন।

লোকটি অত্যন্ত অমায়িক। হেসে বললেন—দামের জন্য ঘাবড়াবেন না, আগে খেয়ে সুস্থ হোন।

চা এলে দেখলুম লোকটি অন্যায় কিছু চাননি। চায়ের সাথে টোষ্ট ও ডিম রয়েছে।

বাসন্তীদেবী ও করুণা হোটেলে ভাত খাবে বলে রেখেছিল। আমরা তিনজন ষ্টেশনে ফিরে Refreshment roomএ আহারাদি করব বলে ঠিক করেছিলাম। ভাত দিতে বাসন্তীদেবী সুরজিৎকে বললেন—একটা কথা রাখবেন?

সুরজিৎ হাতজোড় করে বললে—এ কি বলছেন। আপনার কথাই আদেশ, বলতে দ্বিধা করে আর অপরাধী করবেন না।

বাসন্তীদেবী বললেন—আমাদের সাথে দুটি ভাত খেয়ে নিন। সুরজিৎ তাই চাইছিল। দ্বিরুক্তি না করে খেতে বসে গেল।

এমনি অনাবিল আনন্দে দিন কাটিয়ে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হলাম। পথে একদিনের জন্য পুরীতে halt করেছিলাম। হাওড়ায় আসতে অমূল্য বললে—যাক নির্বিঘ্নে পৌঁছান গেল। গণৎকার আমার হাত দেখে বলে-ছিল এ বৎসর তোমার তুঙ্গে বৃহস্পতি। এত দুঃখেও হাসি এল, বললাম—তুমি অষ্টম গর্ভের পুত্র তোমার কথা স্বতন্ত্র।

শ্রীনিকেতনে স্বাস্থ্য-সংগঠন

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। বাঙলা দেশের বর্দ্ধমান যশোহরের মত জিলাগুলিতে বহু পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়ায় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এদেশের মৃত্যুহার হাজার-করা ৩০, ইংলণ্ডে ১৩। অনেক সময় দেখা যায় স্বাস্থ্যের অজুহাতে ধনী ও অবস্থাপন্ন পরিবারসমূহ পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পরেই এই সমস্যাটি কর্ম্মীদের সম্মুখে গুরুতররূপে উপস্থিত হয়। শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীদিগকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রথমে স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হয়। তখন চারিপাশের গ্রামগুলিতেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী ছিল।

গ্রামের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পল্লীর স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। তখন কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় এই সম্বন্ধে দেশের সম্মুখে কোন সুস্পষ্ট পন্থা ছিল না। বাঙলার স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বেণ্ট্‌লি এই সমস্যার সমাধানকল্পে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বেণ্ট্‌লিকে বাঙলার সকলেই ভালবাসিতেন। তিনিও বাঙলা দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু নানাকারণে তাঁহার সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রদ্ধেয় ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের জন্য যে আন্দোলন সৃষ্টি করেন তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই দুইজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বাঙালীকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ডাঃ বেণ্ট্‌লি সেই সময় বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রচারের সু-ব্যবস্থা করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচারকার্য্য শুনিয়াছি, রাজনৈতিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে। পূর্ব্বে সে ব্যবস্থা ছিল না। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পল্লীবাসীদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের কার্য্য পিছাইয়া গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ডাঃ বেণ্ট্‌লির বাঙালী জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল এবং বাঙলা দেশকে ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার দৃঢ়সংকল্প ছিল। তিনিই Medical Graduate দিগের জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন (D. P. H. course) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের Scheme সমর্থন করিয়া বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

পল্লী সংগঠনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রামের সংস্পর্শে আসা-মাত্রই কর্ম্মীদিগকে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ভাবিতে হইল। এই সময় এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটির একজন ডাক্তারকে আনাইয়া বর্দ্ধিত-প্লীহার তালিকা সংগ্রহ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির বর্দ্ধিত প্লীহার হার শতকরা ৯০-এর উপর। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে দেখিতে পাই যে, বাঙলার যে কয়টি জিলা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বীরভূম তাহার মধ্যে অন্যতম। ম্যালেরিয়ায় বীরভূমের কি রকম ক্ষতি হইয়াছে আমরা প্রথমে তাহার আলোচনা করিব।

(১) এই রোগের প্রধান লক্ষণ এই যে, রোগ সারিয়া গেলেও বহু বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর কর্ম্মোদ্যম (vitality) নষ্ট করিয়া দেয়।

(২) দরিদ্র অধিবাসিগণ বার বার জ্বরে ভুগিবার জন্য সেই কয়দিন উপার্জ্জন করিতে পারে না, তদুপরি তাহাদিগকে চিকিৎসার ব্যয় বহন করিতে হয়।

(৩) এই জিলা এক ফসলের দেশ, তাই কৃষকের আয় খুব কম। বর্ষাকাল চাষের সময়। দরিদ্র কৃষক সামান্য সঞ্চিত অর্থ চাষের কার্য্যে ব্যয় করিয়া যখন রিক্তহস্ত হয়, তখন আশ্বিন মাসে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়।

তখন তাহাদের ডাক্তারের ভিজিট ও কুইনাইনের মূল্য দেওয়ার শক্তি থাকে না। জীবনসংকট উপস্থিত হইলে ঘটিবাটী বন্ধক দিয়া তাহারা ডাক্তার দেখায় অথবা মূর্খ হাতুড়ের হাতে জীবন সমর্পণ করে।

(৪) অকাল মৃত্যুর জন্য অনেক অনাথ পরিবার সমগ্র সমাজের বোঝাস্বরূপ হয়।

(৫) মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদিতেও প্রত্যেক পরিবারকে ব্যয় করিতে হয় ঋণ করিয়াও।

১৯২৭ সালে রায়পুর গ্রামের অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা হয় তখন গ্রামের পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬০জন, কিন্তু তার মধ্যে অর্দ্ধেক ছাত্র ম্যালেরিয়া ঋতুতে জ্বরের জন্য বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত।

আদিত্যপুর গ্রামের তথ্য সংগ্রহের সময় জানিতে পারি যে, একটি দরিদ্র কৃষকের ছয় বিঘা জমি ছিল। তার স্ত্রী এক বৎসর গুরুতর ম্যালেরিয়ায় ভোগে। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা করাইতে এক বৎসরে তাহাকে ছয় বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

১৯২৬ সালে বল্লভপুর গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ক্ষুদ্র গ্রাম। ৫ বৎসরে ২২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, উক্ত গ্রামে কিন্তু সকলেরই মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া।

বোলপুর থানার লোকসংখ্যা ৪০, ৩৫৩ জন। নানাদিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই একটি থানায় ম্যালেরিয়ার দরুণ যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ বার্ষিক এক লক্ষ টাকার কম হইতে পারে না। সমগ্র জিলার আর্থিক লোকসান বৎসরে অন্তত দশ লক্ষ টাকা।

সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে এই ব্যাপক ম্যালেরিয়ার দরুণ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। অথচ এই ক্ষতির গতিরোধ সম্বন্ধে সমাজ অথবা সরকার উদাসীন। উপযুক্ত অর্থ এবং জনসাধারণের সহযোগিতা মিলিত হইলেই এই মহাব্যাধির গতিরোধ করা সম্ভব। সরকার অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ এবং সাধারণের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের অভাব। তাহার ফলে জাতি দ্রুত শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

গ্রামগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার মনে প্রথমেই এই চিন্তার উদয় হইল যেঃ—

(১) সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপকতা কমাইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে।

(২) পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য্য চালাইয়া স্বাস্থ্যনীতির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাদের অভ্যাস এবং সংস্কারের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

ভিতর হইতে যদি দায়িত্বজ্ঞান না জন্মে তাহা হইলে বাহির হইতে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিলেও তাহা রক্ষিত হয় না। কোন পল্লীতে একটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করিয়া দিলেও, জল ব্যবহার সম্বন্ধে স্বাস্থ্যনীতির অজ্ঞতাবশত অতি সত্বর সেই জল কলুষিত হইয়া ব্যাধি সৃষ্টির কারণ হইয়া পড়ে। অতএব জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হইলে শুধু ধনীর চেষ্টায় অথবা সরকারের সাহায্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিলেও স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে।

(শেষাংশ ২৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রেম ও পৃথিবী

(ছোট গল্প)

শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণে দারুণ একটা আবেগ আসিয়াছিল।

অন্তরালে সঙ্গত কারণ যে নাই এমত নহে। অর্থাৎ আকাশে উঠিয়াছিল দিব্যি একখানা গোলাকার চাঁদ,—শান্ত স্নিগ্ধ রূপালি চাঁদ। চারিদিকে অজস্র তারার মেলা—একরাশ বকুল ফুলের মতো। জ্যোৎস্নাধৌত গাছগুলো যেন কিসের রহস্যময় ইঙ্গিত লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন মুহূর্ত্তে পৃথিবীকে ভারী ভাল লাগিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কলম লইয়া বসিয়া গেলাম।

দিব্যি কলম চলিতেছিল। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের তালে তালে লিখিয়া চলিয়াছি, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দেহ অপূর্ব্ব আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে,—বাঙলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব অধ্যায়ের সৃষ্টি করিব এবার!

কিন্তু এই পৃথিবীটা অশেষ বিঘ্নের স্থল, প্রতি পদে এখানে রহিয়াছে কণ্টক,—বাধা আর বিঘ্ন একেবারে থাপ পাতিয়া আছে যেন! কোন মহৎ কার্য্য কেহ যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবে, ইহার উপায় নাই। এবং দেখিতে দেখিতে হুবহু প্রমাণ মিলিয়া গেল।

প্রেমের এক দারুণ সমস্যামূলক চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলাম, সহসা একেবারে টেবিলের নীচ হইতে টমি কুকুরটা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—কেঁউ—উঁ—উঁ.........

প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগিল, মনে হইল অতর্কিতে কে যেন একেবারে দশহাত উচ্চস্থান হইতে ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এমন আকস্মিক রূঢ় ছন্দপতন,—কাব্যের এমন করুণ অবমাননা কদাপি কেহ শুনিবে না। পরক্ষণে টমির পিঠে সজোরে এক লাথি কশাইয়া দিলাম।

টমি বাহির হইল কিন্তু জড়িত পদে খানিকদূর অগ্রসর হইয়া কি মনে করিয়া দাঁড়াইল।

আমার গায়ের রাগ তখনো মেটে নাই, এক ভীষণ ধমক কশাইয়া বলিলাম,—টমি!

ঊর্দ্ধমুখী হইয়া টমি ডাকিল,—কেঁউ—উঁ—উঁ...........

কিন্তু এবার আমি রীতিমত চমকাইয়া উঠিলাম,—ইহা তো সহজ কণ্ঠের ডাক নয়! তাহার কণ্ঠধ্বনি হইতে যেন একটা ব্যাকুল মূর্চ্ছনা বারে বারে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, কিসের এক অজানা ব্যথা যেন সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া বাহির হইবার জন্য উন্মুখ। টমি অপলক মুগ্ধ নয়নে চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমার হাত হইতে কলমটা পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তে নিজের প্রতি নিদারুণ ধিক্কার জন্মিল,— বিরহী বক্ষের বেদনা, প্রিয়তম বিরহে কাতরা স্ত্রীজাতির মর্ম্মব্যথা অনুভব না করিয়া যে কঠিন হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছি, তাহা সত্যই ক্ষমার অযোগ্য!

সত্যই তো! টমির এ শ্রী যেন পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই! অমন ঘোর লোহিত বর্ণের মুখখানায় কে যেন একপোঁচ কালি ঢালিয়া দিয়াছে, চোখ দুইটার মধ্যে যেন কিসের ব্যাকুল উন্মাদনা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে, দাঁতের ফাঁক দিয়া জিভটা আধহাত পরিমাণ ঝুলিয়া নামিয়াছে। দেখিলেই করুণা না হইয়া যায় না!

কণ্ঠে মধু ঢালিয়া বলিলাম, টমি! টমি! আয়,—আয়—য়ু .....

কিন্তু টমি আসিল না। আর আসিবেই বা কেন? তাহার হৃদয়ে নিবিড় জ্বালা,—উপরন্তু পিঠেও বেশ জ্বালা দিয়া দিয়াছি। দেহ মন উভয়ই যাহার এমন করিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়, পৃথিবীর কোন্ আকর্ষণ তাহাকে পশ্চাদগতি করাইবে?

টমি বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে ঘুমের ঘোরে সেদিন সহসা চমকাইয়া উঠিলাম। মনে হইল কে যেন সন্তর্পণে আমার শিয়রে চলাফেরা করিতেছে,—অতি মৃদু তাহার পদধ্বনি, আবেগ-উত্তেজনায় তাহার হৃদ্পিণ্ডে রক্ত যেন ছলাৎ ছলাৎ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে! একটা দীর্ঘশ্বাস,—পরক্ষণে এক অস্ফুট মৃদুধ্বনি, কোন্ এক ভীরু ব্যাকুল হিয়া কাহার বিরহে অধীর মুহ্যমান হইয়া উঠিয়াছে যেন! সে আরো,—আরো আগাইয়া আসিল, একেবারে আমার মাথার কাছে আসিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

দীর্ঘশ্বাস? আমি চমকিয়া উঠিলাম।

আবার,—আবার শুনিলাম এবং পরক্ষণে কম্পিতবক্ষে অসীম সাহস করিয়া টর্চ্চের বোতাম টিপিয়া ফেলিলাম। সে চমকিয়া উঠিয়া দু'পা পিছাইয়া গেল।

কিন্তু আশঙ্কার কারণ নাই, চাহিয়া দেখি শ্রীমতী টমি ব্যাকুল নয়নে অপরাধীর ন্যায় আমার প্রতি চাহিয়া আছে।

চাহিয়া আছে? অকস্মাৎ মনটা ভীষণ খারাপ হইয়া গেল। অসহায় অবলা জীব বলিয়া উহার ব্যথায় কেহ আজ সাড়া দিবার নাই, উহার অন্তরে যে তীব্র বিচ্ছেদের আগুনে অহর্নিশি দাউ দাউ জ্বলিতেছে, কেহ তাহাতে আহা বলিবে না। পৃথিবীটা এমনই কঠিন-হৃদয় মনুষ্যকুলের আবাসভূমি!

টমি অতি করুণ চোখে আমার প্রতি চাহিল। তাহার কাতর দৃষ্টি হইতে যেন এক ব্যাকুল মিনতি ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হইতেছে, বারংবার মিনতি করিয়া সে তাহার হৃদয়ের কোন গোপন ব্যথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে চাহে যেন।

আমার হৃদয় একেবারে বিগলিত হইল,—এবং পরক্ষণে একটানে দরজাটা খুলিয়া দিলাম। সে অমনি অভিসারে বাহির হইল।

কিন্তু টমির 'কি হইল অন্তরে ব্যথা'!

একটা দিন সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল অথচ এযাবৎ দেখা নাই। তাহার স্নানাহার হয় নাই আজ, বাড়ীতে পদার্পণও করে নাই একেবারে,—প্রেমের নিকট সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছে সে।

এই কথাই ভাবিতেছিলাম বসিয়া।

রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়া গিয়াছে অথচ আমার চোখে নিদ্রা নাই আজ। টমির দুঃখে প্রাণটা বারংবার কাঁদিতেছে,—বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া তাহার কথাই ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা করিতেছি। কী তাহার গতি হইবে, প্রেমাস্পদের অভিসারে সে বাহির হইয়াছে, কিরূপে তাহার সন্ধান মিলিবে পুনঃপুন তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে বালিশটা একেবারে ভিজিয়া গেল।

সমাজ! ভাবিয়া দেখিয়াছি এই সমাজই চিরশত্রু সকলের। এখানে প্রাণের বিচার নাই, হৃদয়ের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না,—বিরহী তাপিতের প্রাণ যে সকলের অলক্ষ্যে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে পারে,—ইহা একেবারেই অস্বীকার করিবে সে। শুধু অসার ছুৎমার্গ আর তুচ্ছ ভোজন-দক্ষিণা লইয়াই এই সমাজের যত কারবার,—হৃদয়কে একেবারেই উপেক্ষা করিবে তাহারা! তাই টমি আজ যে হৃদয়াবেগ লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, যে নিদারুণ মর্ম্ম-পীড়ায় আহার নিদ্রা পরিহার করিয়া অভিসারে বাহির হইয়াছে, ইহারা তাহা কদাপি বুঝিবে না। উপরন্তু কুলত্যাগী বলিয়া অপবাদ তুলিবে এবং একমাত্র লাঠ্যৌষধিই যে উহার এই নীচ কুলটা বৃত্তির প্রকৃত মহৌষধ এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। নাঃ, এতটুকু যদি সুখ থাকে বাঁচিয়া এখানে!

চাঁদ? হ্যাঁ, আজও আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে,—কি সুন্দর স্নিগ্ধ চাঁদ! তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া টমির দুঃখে আজ ক্ষণে ক্ষণে নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে বুক ফাটিয়া বাহির হইতেছে এক একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। অথচ এই পৃথিবীরই উদাসীন লোকগুলো একেবারে অচেতন,—নিঝুম মড়ার মত পরম

নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রামগ্ন তাহারা! হায়, কবে ইহাদের চৈতন্য-নয়ন খুলিবে কে জানে?

ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ—

সহসা পেছনের রান্নাঘর হইতে দারুণ একটা শব্দ উত্থিত হইল, কে যেন বাসনপত্র সকল টানিয়া ফেলিয়া একেবারে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছে। মুহূর্ত্তে একেবারে চমকাইয়া উঠিয়া বসিলাম,—এবং পরক্ষণে ঘরের ভিতর হইতে বড়দা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—চোর! চোর! মেজদা হাতের কাছে কিছু না পাইয়া একটা খালি কেরোসিনের টিন লইয়া বাহির হইলেন এবং সেই ভীষণ মারাত্মক অস্ত্র লইয়া সবেগে রন্ধনশালা অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইলেন। তাহার পরেই যাহা হইবার!

কিন্তু ও-কী? সশব্দে কেরোসিনের টিন তস্করের পিঠে পড়িতেই শুনিলাম,—কেঁউ—উঁ—উঁ…………

টমি চীৎকার করিতেছে।

পর মুহূর্ত্তে পাশ দিয়া ক্ষিপ্রপদে টমি ও পাশের বাড়ীর বাঘা কুকুরটা প্রহৃত হইয়া আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে দ্রুত পলায়ন করিল। বড়দা তাহার উদ্দেশ্যে সজোরে পায়ের স্যাণ্ডেল ছুঁড়িয়া মারিলেন, কিন্তু আমার মনটা ভীষণ খারাপ হইয়া গেল।

হ্যাঁ, সত্যই তো! টমি তাহার প্রিয়তমকে পাইয়াছে, সারাদিন অনশনে কাটাইবার পর নিরিবিলি তাহারা আহার করিতে আসিয়াছিল কিন্তু মেজদা তাহাকে কেরোসিনের শূন্য টিন দিয়া অতি নির্দ্দয়ভাবে পিটাইয়া দিলেন। টমির জীবনে আজ নব বাসন্তী-লগ্নের সঞ্চার,—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কিন্তু জীবনকে উপভোগ করিবার অধিকার নাই তাহার। প্রেমকে সে উপভোগ করিতে পারিবে না,—বাড়াবাড়ি ঠেকিলে কেরোসিনের শূন্য টিন সশব্দে পিঠে পড়িবে। নাঃ, এ পৃথিবীর পাষাণহৃদয় মানুষগুলো বক্ষের বেদনাকে যদি বুঝিত এতটুকু!

কোঁচার খুট দিয়া চোখ মুছিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া বিছানা লইলাম।

চাঁদের দিকে চাহিলাম। কিন্তু ও-কী? চাঁদটাও মনে হইল এবার অতি ক্রুদ্ধভাবে দাঁত বাহির করিয়া কুষ্ঠরোগীর ন্যায় হাসিতেছে। কী বীভৎস হিংস্র তাহার হাসি, উহাদের দলের সকলেই যেন আমার সহিত আজ সমানে ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়াছে।

সশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

শ্রীনিকেতনে 'স্বাস্থ্য-সংগঠন

(২৭২ পৃষ্ঠার পর)

জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনে একজন শিক্ষিত জার্ম্মান বন্ধুর সহিত নানাস্থান দেখিয়া বেড়াইতেছিলাম। একদিন এক হোটেল হইতে আহার করিয়া রাস্তায় আসিয়া পাশের ড্রেনে থুতু ফেলিতে যাইব এমন সময় বন্ধুটি আমাকে বিনীতভাবে জানাইল যে, আমি যেন এই ড্রেনে থুতু না ফেলি। কারণ এই দেশে কেহই পথেঘাটে থুতু ফেলে না। আমাকে থুতু ফেলিতে দেখিলে আমার প্রতি অত্যন্ত খারাপ ধারণা করিতে পারে, সেজন্য ইনি নিষেধ করিতেছেন।

ইউরোপে শাসনকর্ত্তাগণ যেমন একদিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তনের দ্বারা মহামারীর প্রতিকারে সর্ব্বদা সচেতন, নাগরিকগণও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্বন্ধে তেমনি সতত জাগ্রত। উভয়ের সহযোগিতায়ই সে সকল দেশে ইহার সমাধান সহজ হইয়াছে।

শ্রীনিকেতনে আমরা সেইজনাই প্রথমে প্রচারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিই। প্রায় সহস্রাধিক স্লাইড এবং দুইটি ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিপুলভাবে আমরা পল্লীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালাইতে থাকি এবং সেই সঙ্গে একটি স্বাস্থ্য সংগঠনের পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করি। শিক্ষার দ্বারা মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। সেই সতেজ ও সজাগ মনকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কার্য্যের গোড়াপত্তন করিবে। যাবতীয় ক্ষেত্রেই সংগঠনের ইহাই মূল কথা। শিক্ষা ও সংগঠনকে পাশাপাশি পরিচালনা করিতে হইবে।

উৎসবান্তে

অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী

নীরব সকাল,—ভাঙিয়া গিয়াছে মেলা,
উৎসব-নিশি হ'য়ে গেছে সমাপন,
থেমে গেছে সব হাসি-গান-কলরব,
পায়ে পায়ে হায় মুছেছে আলিম্পন;

নিভিয়া গিয়াছে শত দীপালোক মালা,
প'ড়ে আছে শুধু শূন্য কুসুম ডালা;
যত উপচার ফুরায়েছে ধীরে ধীরে,
চারিদিকে চলে বিদায়ের আয়োজন!

বুকের মাঝারে রিক্ততা ওঠে কাঁদি',
সহে না হৃদয়ে শুধু এসে চ'লে যাওয়া;
পাওয়ার চেয়ে যে ছিল ওগো আরো ভালো,—
ব্যাকুল হৃদয়ে শুধু পথ পানে চাওয়া!

যার লাগি হায় উতলা নয়ন দুটি—
উৎসুক হ'য়ে ছিল দিবানিশি ফুটি',—
ধূসর ধূলায় হেরি তার শেষ স্মৃতি,
—শূন্য হৃদয় কেঁদে ফেরে অনুখন।

বাংলার অক্ষর-শিল্প

শ্রীস্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য এম-এ

ললিতবিস্তরে দেখা যায়, শাক্যরাজপুত্র সিদ্ধার্থ অন্যান্য লিপির সহিত বঙ্গলিপিও শিক্ষা করিতেছেন; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ললিতবিস্তর রচনার সময়ে (খৃঃ ১ম শতক) বঙ্গলিপি উত্তর ভারতে পরিচিত ছিল। প্রাচীন ভারতের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের প্রদেশগুলিতে বঙ্গলিপি যে পরিচিত এবং বহির্বঙ্গের এই তিনটি প্রদেশের কোন কোন অংশে যে ইহা প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাঙলা অক্ষরের প্রাচীনতার ইতিবৃত্ত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তনে বাঙলা অক্ষরশিল্প বা ছাপার হরফের পরিণতির ইতিহাস বর্ণনাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড্ মিল নামক একজন ভদ্রলোক এদেশীয় ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার লাটিন গ্রন্থের (Dissertationes Seleeate) ভূমিকায় বাঙলা অক্ষর যে বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যায় প্রচলিত একথার উল্লেখ করেন। আসামে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙলা অক্ষর প্রচলিত। বাঙলা অক্ষর সম্বন্ধে ডক্টর গ্রিয়ারসন, অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিষদ আলোচনা করিয়াছেন।

এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন যেমন আকস্মিক, দেশীয় ভাষার ছাপার হরফের আবির্ভাব তেমনি আকস্মিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের কোন ধারাবাহিক কিংবা ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত নাই; ইংরেজেরাই এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহাদের প্রয়োজন সাধনের জন্যই দেশীয় ভাষার ছাপার হরফের প্রয়োজন হয়। এইজন্য তাহারাই অগ্রণী হইয়া ইহার ব্যবস্থা করেন। ইংলণ্ডে তখন মুদ্রণ-শিল্পের বিশেষ উন্নত অবস্থা; সুতরাং প্রথম হইতেই সেই দেশীয় রীতি অনুযায়ী এদেশেও সীসার টাইপের প্রবর্ত্তন হয়। এই হরফ প্রবর্ত্তনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী চার্লস উইলকিন্সের নাম বাঙলার মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। তিনিই প্রথমে ছেনি কাটিয়া বাঙলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ইহা ১৭৭৮ সালের কথা। এই সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক আলোচনা না হইলেও ইতঃপূর্ব্বে অনেকেই প্রসঙ্গত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

তালপাতায়, তুলোট কাগজে ও তাম্রলিপি প্রভৃতিতে বহু শতকের প্রাচীন বাঙলা অক্ষরের নিদর্শন অবশ্য পাওয়া যায়; তাহা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিণতির পথে আসে নাই। মুদ্রণ-শিল্প প্রবর্ত্তনের পর হইতে বাঙলা অক্ষর এক বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রে বাঙলা হরফে গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেও ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ বাঙলা অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৬৯২ সালে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ প্রতিলিপি গৃহীত হয়; ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড তাঁহার কোড্ অব্ জেণ্টু লজ (A code of Gentoo Laws) পুস্তকে বাঙলা প্রতিলিপি মুদ্রিত করেন। ইহার দুই বৎসর পরেই বাঙলা হরফের জন্ম। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের মুদ্রিত বাঙলা অক্ষরের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার "বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ"-এর ইতিহাসে দিয়াছেন। সেই সকল নিদর্শনে বাঙলা অক্ষরের যে পরিচয় আমরা পাই, তাহা হইতে ছাপার হরফের বর্ত্তমান পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা করিতে পারি। যাঁহারা বাঙলা পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, একশত বৎসরের প্রাচীন পুঁথির লিপিও আমাদের অনেকের কাছে দুর্বোধ্য। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে মুদ্রণ-শিল্পের উপকারিতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যুগ যুগ ধরিয়া মানব আপনার ভাবকে অমর করিয়া রাখিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছে, পাথর, পাহাড়, ধাতুফলকে ক্ষোদিত লিপি, তালপাতা, গাছের ছাল ও তুলোট কাগজে লিখিত লিপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু তাহা বহুলভাবে প্রচারের বিশেষ কোন পন্থা পূর্ব্বে ছিল না। মুদ্রণ-শিল্প তাহা সহজ ও সুচারু করিয়া তুলিয়াছে; অধুনা রোটারি ও লাইনো-টাইপের প্রবর্ত্তনে মুদ্রণ-শিল্প বিশেষ এক চরম উৎকর্ষের অবস্থায় পৌঁছিয়াছে; বাঙলার মুদ্রণ-শিল্পে লাইনো-টাইপের উপযোগী বাঙলা অক্ষরের প্রবর্ত্তন করিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা"র অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় বাঙলার মুদ্রণ-শিল্পে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বাঙলার অবস্থা এরূপ ছিল না; ইংরেজের মানদণ্ড সবেমাত্র রাজদণ্ড হাতে নিয়াছে; ওয়ারেণ হেষ্টিংস তখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল। এদেশীয়দিগের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য না হউক, রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা ও দেশীয় ভাষায় সরকারী বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের আবশ্যক হয়; সেই সময় পর্য্যন্ত টাইপ-রাইটিং মেশিনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই; সরকারী অফিসে কর্ম্মচারীদিগের সমস্ত কাজই হাতে লিখিয়া সম্পন্ন করিতে হইত। অবশ্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছাপাখানায় ইংরেজী বিষয় মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল। হেষ্টিংস দেশীয় ভাষায় মুদ্রণের ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে এদেশীয় ভাষা ও রাজনীতি আলোচনা করিতে উৎসাহিত করিতেন। বিশেষত তাঁহার জন্যই খৃষ্টান মিশনারিগণ এদেশে ধর্ম্ম প্রচারের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হন। যাহাতে মিশনারিগণ ধর্ম্ম প্রচার করিতে না পারে, এজন্য আইন প্রণয়ন পর্য্যন্ত হইয়াছিল; পাছে এদেশবাসীর চিরাগত সংস্কারের বাধা জন্মে এরূপ কোন কাজ করিতে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সাহস করিতেন না। এবং হেষ্টিংস এরূপ ব্যাপারে বরং এদেশবাসীকেই সাহায্য করিতেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা এদেশীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গ্লাডউইন, হালহেড, উইলকিন্স ও জোন্স প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বাঙলা ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রণের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল।

কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বাঙলা ভাষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড একখানি বাঙলা ব্যাকরণ (A Grammar of the Bengali Language) রচনা করেন; এই পুস্তক মুদ্রণের জনাই বাঙলা ছাপার হরফের জন্ম হয় (১৭৭৮ খৃঃ)। হালহেড সাহেবের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া হেষ্টিংস অত্যন্ত মুগ্ধ হন; এবং ছাপার হরফ প্রস্তুতের জন্য উইলকিন্সের শরণাপন্ন হন। উইলকিন্স ইতঃপূর্ব্বে অবসর বিনোদনের জন্য বাঙলা অক্ষর ছেনি কাটিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস সে কথা জানিতেন। ইহার পূর্ব্বে উইলিয়ম বোল্টস্ নামক কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী বিলাতে বসিয়া বাঙলা অক্ষর প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। হেষ্টিংস সাহেব উইলকিন্সকে ছেনি কাটিতে অনুরোধ করেন। উইলকিন্সের সঙ্গে হালহেড সাহেবেরও বন্ধুত্ব ছিল। হালহেড ও উইলকিন্স উভয়েই তখন হুগলীতে কোম্পানীর কর্ম্মচারী। উইলকিন্স এদেশীয় ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজীতে ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন। তিনি হালহেডের গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য বাঙলা অক্ষর প্রস্তুতে অমানুষিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। এইজন্য ছেনিকাটা, ঢালাই ও ছাপার কাজ সবই তাঁহাকে করিতে হয়। হরফ প্রস্তুতে তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন। পঞ্চাননের বাড়ী ত্রিবেণীতে ছিল। পঞ্চাননই উইলকিন্সের নিকট ছেনিকাটা, ঢালাই প্রভৃতি মুদ্রণের সমস্ত বিষয়

শিক্ষালাভ করিয়া বাঙলার মুদ্রণ-শিল্প সহজ ও সুচারু করিয়া তুলেন। হালহেড সাহেবের ব্যাকরণের ভূমিকায় উইলকিন্সের কৃতিত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার ব্যাকরণই বাঙলা ভাষায় ও বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক। ইহার সাত বৎসর পরে ১৭৮৫ সালে জোনাথান ডানকান সার ইলিজা ইম্পের রেগুলেশনের বাঙলা অনুবাদ কলিকাতা কোম্পানীর প্রেস হইতে প্রকাশ করেন। ইহাই বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত দ্বিতীয় পুস্তক। ইহার পর ১৭৯১ ও ১৭৯২ সালে এডমনস্টোন সাহেব দুইখানি আইন পুস্তকের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৯৩ সালে কলিকাতা ক্রনিকেল প্রেস হইতে প্রথম "ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি" নামক অভিধান (আপজন কৃত) প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে এই কয়েকজন ইংরেজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। ইঁহারাই বাঙলা ভাষাকে ব্যাকরণ ও অভিধানের গণ্ডীতে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভিন্ন অপর একদল ইউরোপীয়ও এদেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে এই সময়ে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠেন। ইঁহারা মিশনারি। এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া এদেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন ইঁহারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। বিশেষত ইংরেজ-অধিকারে প্রকাশ্যে ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষভাবে বাধা থাকায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া শিক্ষাদান ও খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রন্থাদির অনুবাদ দেশীয় ভাষায় প্রচারে নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর তখন ডেনিস্ সরকারের অধিকারভুক্ত থাকায়, মিশনারিদিগের একটি প্রধান আড্ডারূপে পরিণত হয়। কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নামক তিনজন মিশনারি এই স্থান হইতে বাঙলা ভাষার আলোচনা লাভ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উইলকিন্স-শিষ্য পঞ্চাননই এতাবৎকাল বাঙলা হরফ প্রস্তুতের কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। মার্শম্যানের লিখিত বিবরণীতে দেখা যায় ১৭৯৮ সালে "দেশীয় ভাষায় ছাপার কার্য্য চালাইবার জন্য কলিকাতায় একটি অক্ষর ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কোলব্রুক এই সময়ে পঞ্চাননকে ছেনিকাটার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পঞ্চানন এই সময়ে গার্ডেনরীচে বাস করিতেন। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা পঞ্চাননকে পাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করেন; কিন্তু কোলব্রুকের সতর্ক ব্যবস্থায় পঞ্চাননের পক্ষে কোলব্রুকের কাজ ছাড়িয়া শ্রীরামপুরে যাইবার কোন উপায় ছিল না। অতঃপর কেরী সাহেবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কোলব্রুক কয়েকদিনের জন্য পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে যাইবার অনুমতি দেন। কিন্তু কেরী কোলব্রুকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। তিনি পঞ্চাননকে অধিক মাহিনার লোভ দেখাইয়া রাখিয়া দিলেন। এবং ডেনিশ-সরকারের সহায়তায় নানা প্রলোভনে পঞ্চাননকে ভুলাইয়া তাঁহাকে শ্রীরামপুরে আটক করিলেন। কোলব্রুক এই ব্যাপার ইংরেজ-সরকারকে জানাইলেন। ইংরেজ-সরকারের অনুরোধেও ডেনিশ-সরকার পঞ্চাননকে ফেরৎ দিতে সম্মত হইলেন না। এই ব্যাপার বিলাত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন পঞ্চাননকে পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইলেন। এবং সেই হইতে শ্রীরামপুর বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকারের পথে অগ্রসর হইল। পঞ্চানন তাঁহার জামাতা মনোহরকে তাঁহার সহকারী করেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার মুদ্রণ-শিল্পে পঞ্চানন, মনোহর ও মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র—এই তিনজন বাঙালী যে রীতি প্রবর্ত্তন করেন, তাহা আজিও প্রচলিত। তাঁহাদের হাতে বাঙলা অক্ষর যেভাবে রূপায়িত হইয়া উঠে, বাঙলা অক্ষরের অধুনা-প্রচলিত রূপে তাহাই প্রতিফলিত। কেরীর অধীনে পঞ্চানন নাগরী অক্ষরের ফাউণ্ট প্রস্তুত করেন। সংস্কৃতে বহু যুক্তাক্ষর থাকায় প্রায় সাতশত ছেনির দরকার হয়। এই কাজে থাকাকালে পঞ্চানন বাঙলা অক্ষরের আরও একটি ফাউণ্ট প্রস্তুত করেন। নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ যে অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এই নূতন অক্ষর তাহা অপেক্ষা আকারে ছোট ও অধিকতর সৌষ্ঠবসম্পন্ন হয়। ১৮০৩ সালে এই নূতন অক্ষরে নিউ টেষ্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা আরম্ভ হয়। মিশনারিরা পঞ্চাননকে পাইয়া শ্রীরামপুরে একটি অক্ষর প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারখানায় পঞ্চাননের অধীনে আরও কয়েক ব্যক্তি নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুরে প্রবেশের বৎসর তিনেক পরে পঞ্চাননের মৃত্যু হয়। জামাতা মনোহর তখন মুদ্রণ কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মনোহর ৪০ বৎসরের অধিককাল কাজ করেন। তিনি চীনা, উড়িয়া ও নাগরী প্রভৃতি নানাভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন; এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছাপার হরফের জন্মও ইঁহাদের হাতে হয়। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রণ-শিল্পে শ্রীরামপুর তথা এই তিনজন বাঙালীর দান অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৪০ সহস্র অক্ষর-ঘটিত চীনা অক্ষর প্রস্তুত সামান্য ব্যাপার নহে। বিলাতের বিশেষজ্ঞ মিস্ত্রীরা পর্য্যন্ত চীনা অক্ষর প্রস্তুত করিতে যাইয়া বিফল মনোরথ হন। মার্শম্যান সাহেবের জন্য মনোহর ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এই অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব করিয়াছিলেন। তৎকালীন সংবাদপত্র "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" (Friend of India) ও "সত্যপ্রদীপ"-এ মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্রের অজস্র প্রশংসা আছে; এতদ্ভিন্ন স্মিথ্ ও মার্শম্যান সাহেব নিজেদের গ্রন্থে ইঁহাদের সম্বন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী কর্ম্মকারত্রয়ের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও শিল্পনৈপুণ্য বিদেশীদিগের অন্তর বিমোহিত করিয়াছিল। ইঁহারা ১৮ বৎসরে চৌদ্দ ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করেন। ১২৫৩ বাঙলা সালে মনোহরের মৃত্যু হয়। ১২৪৫ সালে মনোহর শ্রীরামপুর যন্ত্রালয় নামক ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের খ্যাতি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। এই ছাপাখানায় বিখ্যাত শ্রীরামপুর পঞ্জিকার জন্ম হয়; এখান হইতেই বৎসরে বৎসরে পঞ্জিকা ও ইংরেজী, বাঙলা নানাভাষার পুস্তক প্রকাশিত হইতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের দক্ষতা এই ব্যাপারে অতুলনীয়। তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনের লৌহ নির্ম্মিত মুদ্রণ যন্ত্রের অনুকরণে নিজেই আপন ছাপাখানার মুদ্রণযন্ত্র প্রস্তুত করেন; তিনি কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব (ব্লক) ও স্বর্ণরৌপ্যঘটিত সূক্ষ্ম অলঙ্কার নির্ম্মাণের কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিম্বই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বহস্ত ক্ষোদিত ছিল। 'সত্যপ্রদীপ' (২৫মে, ১৮৫০) তাঁহাকে 'সুবিজ্ঞ, সুপটু, সুরচক ও সুশীল' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি মুদ্রণের জন্য একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও তিনটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৫০ সালে ৪৩ বৎসর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীরামপুরযন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হন। কৃষ্ণচন্দ্রের হাতেই বাঙলা অক্ষর চরম পরিণতি লাভ করে; কলিকাতার সকল ছাপাখানায় তাঁহাদের প্রস্তুত অক্ষর ব্যবহৃত হইত। তাঁহাদেরই শিষ্যগণ পরম্পরাক্রমে বাঙলা ছাপা হরফের চাহিদা বহুকাল যাবৎ মিটাইয়া আসেন।

নক্ষত্র চেনা

(পৌষের আকাশ)

শ্রীকামিনীকুমার দে এম-এস-সি

পরিষ্কার নৈশ আকাশের সৌন্দর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করে, আকাশে যে অগণ্য জ্যোতিষ্ক রহিয়াছে, তাহাদের কিছু পরিচয় জানিবার আমাদের স্বতঃই আগ্রহ হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক কার্লাইল আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মাথার উপর যে নক্ষত্র খচিত আকাশ রহিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক নক্ষত্রমণ্ডলকেও (constellation) আমি আজ পর্য্যন্ত চিনি না—কেন ইহাদের সঙ্গে কেহ আমাকে পরিচিত করাইয়া দেয় নাই?" তাঁহার দুঃখ ছিল যে, অল্পবয়সে কেহ তাঁহাকে নক্ষত্র চিনার যে আনন্দ তাহার সন্ধান দেয় নাই। তবে পরিণত বয়সে এ আনন্দ তিনি পাইয়াছিলেন। আকাশ-ভরা তারার মাঝে যেদিকে তাকান যায়, সেদিকেই যদি পরিচিত মুখ দেখা যায়, তবে কাহার না আনন্দ হয়? মানুষ যখন আপনাকে একান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে, তখন সে এই নক্ষত্রদের মাঝে সঙ্গী খুঁজিয়া পাইতে পারে—এমন কি, কত শোক-তাপ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে পারে। আমরা যে বিরাট বিশ্বে রহিয়াছি, তাহার সহিত পরিচিত হইবার প্রথম সোপান এই নক্ষত্র চিনা, প্রাচীনকাল হইতে নক্ষত্রদের গতিবিধি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কোথাও কতকগুলি নক্ষত্র লইয়া এক একটি জন্তুর আকৃতি কল্পনা করিয়া বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে, যদিও অনেকস্থলে নামের সঙ্গে আকৃতির কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি প্রাচীন নামগুলির ব্যবহার আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে নক্ষত্রমণ্ডল বলিতে আকাশের বিভিন্ন বিভাগ বুঝায়। সুবিধার জন্য জ্যোতির্ব্বিদেরা সমগ্র আকাশকে কতকগুলি অংশে বিভাগ করিয়া নিয়াছেন। আমাদের জানা মেষ, বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশিও এক একটা নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্গত। নক্ষত্রের সংখ্যা অগণ্য বলিয়া মনে হইলেও, বাস্তবিক কিন্তু খালি চোখে আমরা একসঙ্গে তিন হাজারের বেশী নক্ষত্র দেখি না, এক সময়ে আমরা আকাশের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখি। সমগ্র আকাশে ছয় হাজার নক্ষত্র খালি চোখের গোচর। দূরবীণে বহু লক্ষ নক্ষত্র দেখা যায়।
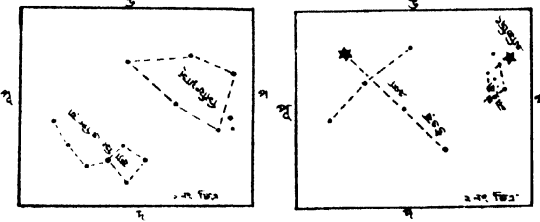
পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, আমাদের নক্ষত্র-জগতে অন্তত দশ সহস্র কোটি নক্ষত্র আছে, আবার আমাদের নক্ষত্র-জগতের মত আরও বহু নক্ষত্র-জগতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এখানে পৌষ মাসের আকাশের বর্ণনা দেওয়া হইবে। নক্ষত্রদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পক্ষে আজকালের আকাশ বেশ উপযোগী। অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারাগুলির সাহায্যে কতকগুলি নক্ষত্রমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য চিত্র দ্বারা দেখান হইল। আকাশ মাথার উপর বলিয়া চিত্রগুলি উপর দিকে নিয়া উল্টাইয়া উঃ, পূঃ এবং পঃ যথাক্রমে উত্তর, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকের সঙ্গে মিলাইয়া তারপর দেখিতে হয়। বেশী উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি * চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইহাদিগকে আমরা প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র বলিব। সমগ্র আকাশে এ রকম কুড়িটি নক্ষত্র আছে। যে সকল নক্ষত্রমণ্ডলের কোন বিশেষ আকৃতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেবল তাহাদেরই পরিচয় দেওয়া হইল। আর এক একটা নক্ষত্রমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যটুকুই কেবল দেখান হইয়াছে; কোথাও তাহার সীমা দেখান হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই এগুলির কথাও বলা হইবে। নক্ষত্র চেনার প্রারম্ভে একটা কথা স্মরণ রাখিলে সুবিধা হইবে। আজ যে নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলকে যে সময়ে যেখানে দেখা যাইবে, পনের দিন পরে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে সেখানে দেখা যাইবে। এই হিসাবে এক মাস পরে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে উহাকে একই স্থানে দেখা যাইবে। আবার আজ যে নক্ষত্রকে যে সময়ে যেখানে দেখা যাইবে, এক মাস পরে তাহাকে সেই সময়ে উক্ত স্থানের প্রায় ৩০° ডিগ্রী পশ্চিমে দেখা যাইবে। আজ যে নক্ষত্র সন্ধ্যায় মাথার উপর আছে, এক মাস পরে উহাকে ৩০° পশ্চিমে এবং তিন মাস পরে অস্ত
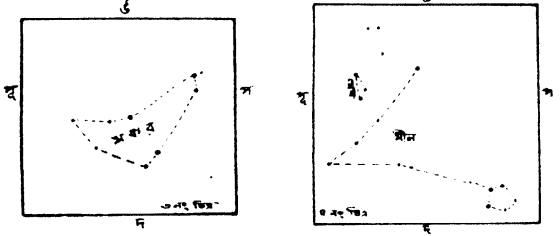
যাইতে দেখা যাইবে। এইরূপ আজ যে নক্ষত্র সন্ধ্যায় পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছে, এক মাস পরে তাহাকে ঐ সময়ে ৩০° ডিগ্রী উপরে এবং তিন মাস পরে মাথার উপরে দেখা যাইবে।

প্রথমে গ্রহ কয়টির কথা বলিয়া লইলে মন্দ হয় না। সূর্য্যাস্তের কিছু পরেই মাথার উপরের দিকে (একটু দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে) যে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি দেখা যায়, তাহা বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পশ্চিম আকাশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইহাপেক্ষাও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি শুক্র গ্রহ। বৃহস্পতির পশ্চিম দিকে (একটু দক্ষিণে) উজ্জ্বল লাল জ্যোতিষ্কটি মঙ্গল। বৃহস্পতির পূর্ব্বদিকে উজ্জ্বল শনিকে দেখা যায়। শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল কিছু উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত প্রায় এক সরল রেখায় আছে। বুধকে এখন দেখা যাইবে না। ইহা সাধারণত সূর্য্যের খুব কাছে থাকে বলিয়া ইহাকে দেখিবার সুযোগ কমই হয়।

সন্ধ্যাকালে উত্তর আকাশে পাঁচটি নক্ষত্র লইয়া ইংরেজী অক্ষর M-এর মত অথবা ছয়টি নক্ষত্র লইয়া একটা চেয়ারের মত আকৃতি কল্পনা করা যায়; ইহা ক্যাসিওপিয়া। ইহা হইতে দূরে সোজা উত্তর দিকে সর্ব্ব নিম্নে যে মাঝারি উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখা যায়, তাহা ধ্রুবতারা। ক্যাসিওপিয়া এবং ধ্রুবতারা অনেকেরই হয়ত পরিচিত। এখান হইতে আরম্ভ করাই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। ধ্রুবতারার উপরে পশ্চিম দিকে পাঁচটি নক্ষত্র মিলিয়া শিবমন্দির অথবা গির্জ্জার মত আকৃতি দেখা যাইবে—ইহা সিফিয়াস। সিফিয়াসমণ্ডলে যে নক্ষত্রটির কাছাকাছি আর দুইটি নক্ষত্র চিত্রে দেখান হইয়াছে, সেই ক্ষীণোজ্জ্বল নক্ষত্রটি সুপ্রসিদ্ধ সিফিয়াস (Cepheus) নক্ষত্র [১নং চিত্র]। উপর্য্যুপরি কয়দিন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ইহার আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। আকাশে দূরবীণ দিয়া এ রকম বহু নক্ষত্র দেখা যায়, যাহাদের আলো নির্দ্দিষ্টকাল পরে পরে বাড়ে এবং কমে। এই শ্রেণীর নক্ষত্র সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদেরা বহুদূরের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং নক্ষত্র-জগতের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারেন।

সিফিয়াসের পশ্চিমে ছায়াপথের ঠিক উপরেই ছয়টি নক্ষত্র মিলিয়া একটা ক্রসের (cross) মত দেখায়। ইহা সাইগ্‌নাস্ বা উত্তর ক্রস। ক্রসের মাথায় ডেনেব (Deneb) একটি প্রথম শ্রেণীর

উজ্জ্বল নক্ষত্র। উত্তর ক্রসের পশ্চিম দিকে উত্তর আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অভিজিৎকে (Vega) দেখা যাইবে। অভিজিৎ-এর কাছে আর চারিটি ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্র মিলিয়া এক সমান্তরাল চতুর্ভুজ করিয়াছে। অভিজিৎ এবং এই নক্ষত্রগুলি লইয়া (Lyra) মণ্ডলের অন্তর্গত [২নং চিত্র]।

লাইরার দক্ষিণে যে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র দুই পাশে দুইটি ক্ষীণোজ্জ্বল নক্ষত্র-সহ এক সরল রেখায় আছে, তাহা শ্রবণা (Altair)। শ্রবণার দক্ষিণে মকরমণ্ডল কতকগুলি ক্ষীণ-প্রভ নক্ষত্র দিয়া গঠিত একখানি মালার মত আকাশের গায়ে
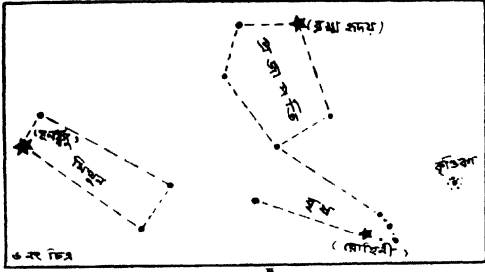
শোভা পাইতেছে। এই মণ্ডল দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে অস্তের দিকে। পৌষ মাসের শেষের দিকে ইহাকে আর দেখা যাইবে না। [৩নং চিত্র]

এখন আমরা আবার ক্যাসিওপিয়াতে ফিরিয়া আসি। ইহার দক্ষিণে প্রায় মাথার উপরের দিকে (একটু পশ্চিমে) চারিটি নক্ষত্র মিলিয়া একটি প্রায় সমচতুর্ভুজক্ষেত্র বা ঘুড়ির মত আকৃতি দেখা যাইবে। ইহার ক, খ, গ পেগাসুসমণ্ডলের অন্তর্গত। চ, ছ, জ ঘুড়ির লেজ য়্যাণ্ড্রোমিডামণ্ডলের অন্তর্গত। চ নক্ষত্রটির নাম উত্তর ভাদ্রপদ। লেজের শেষের দিকের নক্ষত্রগুলি পারসিয়ুস-মণ্ডলে আছে। ইহার আল্‌গল বা দৈত্য তারার চারিদিকে একটি নিষ্প্রভ নক্ষত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায় তিন দিন পরে একবার উহা আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়ে। তখন দৈত্য তারাকে তাহার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার এক তৃতীয়াংশ মাত্র উজ্জ্বল দেখায়। য়্যাণ্ড্রোমিডার ছ নক্ষত্র হইতে ক্যাসিওপিয়ার দিকে দুইটি ক্ষীণ-প্রভ নক্ষত্র ইহার সঙ্গে প্রায় এক সরলরেখায় আছে। শেষ নক্ষত্রটির পাশে ক্ষীণোজ্জ্বল একটু মেঘের মত যাহাকে দেখা যায়, উহা সুপ্রসিদ্ধ য়্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা। ইহা বহু কোটি নক্ষত্র-সমন্বিত আমাদের নক্ষত্র-জগতের ন্যায় দূরের আর একটি নক্ষত্র-জগৎ। দূরবীণে এরূপ বহু নক্ষত্র-জগৎ দেখা যায়। উক্ত নীহারিকাটিকে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র-জগৎ বলা যায়। কিন্তু উহা হইতে আমাদের কাছে আলো পৌঁছিতে আট লক্ষ বৎসর গত হয়—আর আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। আমাদের কাছে আলো আসিতে দশ কোটি বৎসর লাগে এমন দূরের নক্ষত্র-জগৎও আমেরিকা মাউণ্ট উইল্‌সন্ বীক্ষণাগারের শত ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীণে দেখা যায়। দূরবীণের শক্তি বাড়িলে আরও দূরে নক্ষত্র-জগৎ দেখা যাইবে আশা করা যায়। এই সকল নক্ষত্র-জগৎ লইয়া যে বিশ্ব, তাহা কত বড় এবং উহার শেষই বা কোথায় ভাবিবার বিষয় বটে। আমরা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরি। আল্‌গলের দক্ষিণে তিনটি নক্ষত্র মিলিয়া ত্রিভুজাকৃতিমণ্ডল বা ট্রায়্যাঙ্গুলাম্ (Triangulum)। তাহার দক্ষিণে তিনটি নক্ষত্র মেষমণ্ডলে; ইহার মধ্য নক্ষত্রটিই অশ্বিনী [৪নং চিত্র]।

পেগাসুসের অল্প দক্ষিণে পাঁচটি ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্র মিলিয়া একটি ছোট পঞ্চভুজ ক্ষেত্র করিয়াছে। ইহা মীনরাশির একটি অংশ [৫নং চিত্র]। বৃহস্পতি এখন ইহার কাছে বলিয়া, তাহার উজ্জ্বলতার পাশে ইহাদিগকে আরও ম্লান দেখায়।* পেগাসুস-মণ্ডল চিনিয়া থাকিলে ইহার পশ্চিমদিকের খ, ক রেখাকে দক্ষিণদিকে বাড়াইয়া দিলে, উহা একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্রের পাশ দিয়া যায়। তাহার নাম ফমালহাউট (Fomulhaut)। দক্ষিণ আকাশে সর্ব্বনিম্নে যে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখা যায়, উহা আচার্নার (Achernar)। পূর্ব্ববর্ণিত মকর এবং মীনমণ্ডলের মাঝখানে কয়টি নক্ষত্র মিলিয়া কতকটা কুম্ভাকৃতি কুম্ভমণ্ডল অবস্থিত। মীন ও মেষরাশির দক্ষিণদিকে চিটাস (Cetus) নামে একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে। উহাতে মীরা (Mira) নামে একটি আশ্চর্য্য নক্ষত্র আছে। ইহা কখনও বেশ উজ্জ্বল দেখায়, আবার কখনও খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না। প্রায় এগার মাস পরে উহা একবার উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। আজকাল মীরাকে খালি চোখে দেখা যায় না।

মেষরাশির কিছু পূর্ব্বদিকে ছয় সাতটি নক্ষত্রের জটলা দেখা যাইবে—ইহারা সর্ব্বজন পরিচিত সাত ভাই কৃত্তিকা। দূরবীণে এখানে বহু নক্ষত্র দেখা যায়—অপেরা গ্লাস বা বাইন-কিউলার (Opera glass) দিয়াও বিশ পঁচিশটি নক্ষত্র দেখা যায়। কৃত্তিকার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বৃষরাশির লাল রং-এর প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র রোহিণী (Aldebaran)। বৃষরাশির উত্তরদিকে যে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উহা ব্রহ্মহৃদয় (capella)। ব্রহ্মহৃদয় এবং আর চারিটি নক্ষত্র মিলিয়া একটি পঞ্চভুজ ক্ষেত্র করিয়াছে; ইহা প্রজাপতিমণ্ডল (Auriga)। পূর্ব্বাকাশে কালপুরুষমণ্ডল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চারিটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আয়ত ক্ষেত্রটিকে আকাশে সহজেই চিনা যায়, ইহার নক্ষত্রগুলিকে নিয়া একটি মানুষের আকার কল্পনা করা যায়; লাল উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আর্দ্রা (Betelgeuse); কোণাকোণি বিপরীত দিকেরটি রিগেল (Rigel)। দুইটিই প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র। কেন্দ্রের কাছে একই রেখায়
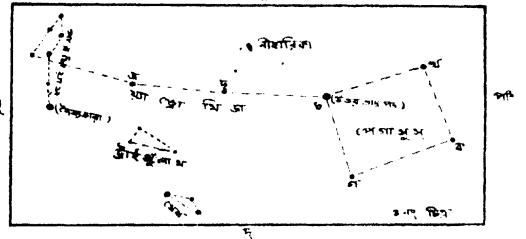
তিনটি নক্ষত্র কালপুরুষের কটিদেশ, ইহার দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে এক রেখায় তিনটি নক্ষত্র তাহার তরবারি। ইহার মত সুন্দর মণ্ডল সমগ্র আকাশে আর নাই। সন্ধ্যার কিছু পরেই আকাশের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মিথুন রাশির প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র পুনর্ব্বসু (Pollux) এবং তাহার কিছুদূরে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বিতীয় পুনর্ব্বসু (castor) দেখা যাইবে [৬নং চিত্র]। দ্বাদশ রাশির মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ ও মিথুন এই ছয়টি পৌষ মাসের সান্ধ্য আকাশে দৃষ্টিগোচর থাকে।

রাত্রি প্রায় ৭টার পর কালপুরুষের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সমগ্র আকাশে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে (Sirius) দেখা যাইবে। কালপুরুষের উত্তর-পূর্ব্বদিকে সরমা (Procyon) আর একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র। আর্দ্রা, সরমা এবং লুব্ধক মিলিয়া একটি সমবাহু ত্রিভুজ হয় [৭নং চিত্র]। কালপুরুষের পায়ের নিকট হইতে এরিডানাস বা নদীমণ্ডল বাহির হইয়া নানা বক্রগতিতে

*শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথির পর হইতে চন্দ্রের উজ্জ্বলতার জন্য ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্র লইয়া যে সমস্ত মণ্ডল গঠিত উহাদিগকে চি...র সুবিধা হয় না।

গিয়া আচার্নারে শেষ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নদীমণ্ডল, সিটাস্ এবং আরও দুই চারিটি মণ্ডলের চিত্র দেওয়া সম্ভব হইল না। লুব্ধকের বহু দক্ষিণে আর একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। ইহার নাম অগস্ত্য তারা (Canopus); ইহা উজ্জ্বলতায় আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। রাত্রি একটু অধিক হইলে অগস্ত্য তারাকে ভাল করিয়া দেখা যাইবে।

শেষ রাত্রে আর কতকগুলি নক্ষত্র দেখিবার সুযোগ হয়। মিথুন রাশিকে এখন পশ্চিম আকাশে আর একবার চিনিয়া লইলে ভাল হয়। মিথুনের পূর্ব্বদিকে কর্কট রাশির বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। এক জায়গায় কতকগুলি ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্রের জটলা দেখা যাইবে, ইহারা পুষ্যানক্ষত্র। উত্তর আকাশের দিকে তাকাইলে সপ্তর্ষিকে দেখা যাইবে। সাতটি উজ্জ্বল তারা মিলিয়া একটি লাঙ্গলের মত বা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত সপ্তর্ষি মণ্ডল (Great Bear)
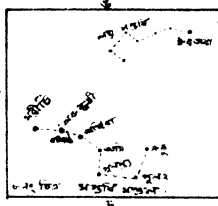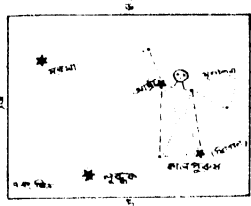
অনেকের নিকটই পরিচিত। ইহার নক্ষত্রগুলির নাম চিত্রে দেওয়া হইয়াছে। বশিষ্ঠের পাশে একটি অতি ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্র আছে—ঋষি বশিষ্ঠের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীর নামানুসারে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অরুন্ধতী। পুলহ ও ক্রতু নক্ষত্রের ভিতর দিয়া একটি সরলরেখা কল্পনা করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া দিলে একটি মাঝারি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পাশ দিয়া যায়; ইহা ধ্রুবতারা [৮নং চিত্র]। সপ্তর্ষি যখন পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়, ক্যাসিওপিয়া তখন পশ্চিমাকাশে অস্তের দিকে। ধ্রুবতারা ও আর ছয়টি ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্র লঘুসপ্তর্ষি বা শিশুমার মণ্ডলের অন্তর্গত—ইহার দুইটি নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল।

সপ্তর্ষির ক্রতু ও পুলহের ভিতর দিয়া একটি রেখাকে ধ্রুবতারার বিপরীত দিকে বাড়াইয়া দিয়া দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ছয়টি নক্ষত্র মিলিয়া কাস্তের মত একটি আকৃতি এবং তাহার পূর্ব্বদিকে তিনটি নক্ষত্র মিলিয়া একটি সমকোণী ত্রিভুজ দেখা যাইবে। ইহারা সিংহ রাশির অন্তর্গত। কাস্তের বাঁটের গোড়ায় উজ্জ্বল নক্ষত্রটি মঘা (Regulus) এবং ত্রিভুজের কোণায় উত্তর ফল্গুনী (Denebola) নক্ষত্র [৯নং চিত্র]। সিংহের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে যে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায় উহা কন্যা-রাশির চিত্রা (Spica) নক্ষত্র। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বুওটিস মণ্ডলে [১০নং চিত্র] আর একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র আছে: তাহার নাম স্বাতী (Arcturus)। উত্তর-ফল্গুনী, চিত্রা এবং স্বাতী লইয়া একটি সমবাহু ত্রিভুজ কল্পনা করা যায়। কন্যা-রাশির পূর্ব্বদিকে তুলারাশি। শেষ রাত্রে বৃশ্চিক রাশির প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৌষের শেষে বিছার মত বৃশ্চিক রাশি আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ভালরূপে দৃষ্টিগোচর হইবে।

শেষ রাত্রে প্রায় সোজা উত্তরে সর্ব্বনিম্নে চারিটি নক্ষত্র মিলিয়া যে ঘুড়ির মত বা ক্রুসের মত আকৃতি দেখা যায় তাহা দক্ষিণ ক্রুশ্ (Southern Cross)। ইহাতে একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। ইহার পশ্চিমে সেণ্টরাস নামে একটি মণ্ডল আছে তাহাতে দুইটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। ইহারা দিক্-চক্রবাল বা ক্ষিতিজ রেখার খুব নিকটে বলিয়া ইহাদিগকে ভাল
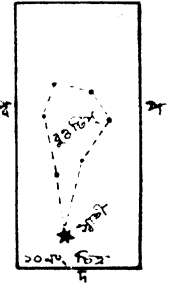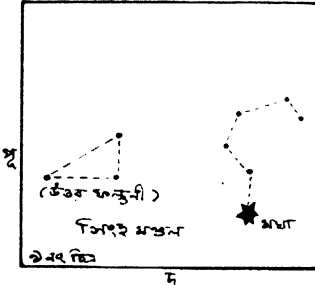
করিয়া দেখার সুবিধা হয় না। আবার দক্ষিণ ক্রুশ্ মণ্ডল ৩৪ ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরস্থ স্থানসমূহ হইতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি-গোচর হয় না। এইরূপ সেণ্টরাসের উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় ৩০ ডিগ্রি এবং আচার্ণার ৩৩ ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরস্থ স্থানসমূহ হইতে দৃষ্টিগোচর নয়।

এইবার প্রথম শ্রেণীর ২০টি নক্ষত্রের নাম ক্রমান্বয়ে প্রথম হইতে উজ্জ্বলতা অনুসারে দেওয়া হইতেছে। লুব্ধক (Sirius), অগস্ত্য (Canopus), ক সেণ্টাউরি অর্থাৎ সেণ্টরাসের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র, অভিজিৎ (Vega), ব্রহ্মহৃদয় (Capella), স্বাতী (Arcturus), রিগেল্, সরমা (Procyon), আচার্ণার, সেণ্ট-রাসের দ্বিতীয় উজ্জ্বল নক্ষত্র, শ্রবণা (Altair), আর্দ্রা (Betel-geuse), দক্ষিণ ক্রুসের উজ্জ্বল নক্ষত্র, রোহিণী (Aldebaran), পুনর্ব্বসু (Pollux), চিত্রা (Spica), জ্যেষ্ঠা (Antares), ফমালহাউট, দেনেব্, মঘা (Regulus)।

এখানে বর্ণনা ও কয়েকটি চিত্র সাহায্যে সামান্যভাবে নক্ষত্র চিনিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। আগ্রহ জন্মিলে নক্ষত্রের মানচিত্র সাহায্যে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া এখন সহজ হইবে।

আর্টের আদর্শ

না ঘুমিয়েও যারা স্বপ্ন দেখতে পারে তারাই হলো আর্টিষ্ট। কিন্তু কবির স্বপ্ন আর সাধারণ মানুষের দিবাস্বপ্ন ঠিক এক গোত্রের নয়। সাধারণ মানুষের মনে স্বপ্ন আসে, কিন্তু সে স্বপ্ন তার মনে দীর্ঘকালের জন্য বাসা বাঁধে না, ক্ষণকাল পরে তারা মিলিয়ে যায় বিস্মৃতির অন্ধকারে স্রোতের শৈবালের মতো। আর্টিষ্টরা কেবল যে স্বপ্ন দেখে, তা নয়; স্বপ্নকে তারা স্মরণ করতে পারে। তাদের সেই অদৃশ্য স্বপ্নকে প্রতিবিম্বিত করে আর্টের মায়ামুকুর। আমরা কাঁচের আয়না ব্যবহার করি আমাদের মুখের চেহারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে আর আর্টের মায়ামুকুর রচনা করি আমাদের অন্তরের চেহারাকে ভালো ক'রে দেখতে। সকলের চক্ষুর অগোচরে আত্মার স্বপ্নকে আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে লালন করি আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে। তারপর আসে সৃষ্টির সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তটি যখন আমাদের স্বপ্নকে আমরা রূপ না দিয়ে থাকতে পারিনে। অন্তরের সেই গোপন স্বপ্ন কখনও শব্দের যাদুকে আশ্রয় ক'রে কবিতায় মুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে, কখনও সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে গানের ভেলায় চিত্তকে বহন ক'রে নিয়ে যায় অনন্তের পদপ্রান্তে, কখনও রেখার বন্ধনে বন্দী হ'য়ে পুষ্পিত হয় ছবিতে, কখনও বা পাষাণে রূপ নেয় অনুপম নারীমূর্ত্তি হ'য়ে। রূপশিল্পীর স্বপ্ন যে মূর্ত্তিতেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, সব বড়ো আর্টের মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সেই বৈশিষ্ট্যটি হ'চ্ছে— যে আর্ট উচ্চস্তরের, তার জন্ম হয় না কাউকে খুসী করবার প্রবৃত্তি থেকে। বড়ো আর্টিষ্ট নিজেকেও খুসী করবার জন্য সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয় না। যে আর্টের ললাটে চিরন্তনের ছাপ তার সৃষ্টি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত দুর্ব্বার প্রেরণা থেকে। চেষ্টা করে ঘুমাতে গেলে ঘুম আসে না, চেষ্টা ক'রে সাহিত্য তৈরী করতে গেলেও তেমনি সাহিত্যিক হওয়া যায় না।

যে কথা বলছিলাম। স্বপ্নের কথা। যেমন ক'রে মা বুকের রক্ত দিয়ে নিঃশব্দে লালন ক'রে চলে গর্ভের সন্তানকে তেমনি ক'রেই আর্টিষ্ট তার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে নীরবে পুষ্ট ক'রে চলে তার বুকের স্বপ্নকে। ভাবীকালের জন্মভূমির যে জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন একদা বঙ্কিমের চিত্তকে অধিকার ক'রেছিল সেই স্বপ্নকে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চোগা-চাপকানের নীচে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতি সন্তর্পণে লালন করেছিলেন। তেমন ক'রে স্বপ্ন দেখতে না পারলে কি আনন্দমঠের মতো উপন্যাসের এবং বন্দেমাতরমের মতো সঙ্গীতের সৃষ্টি সম্ভব? বাল্মীকির মনে রামচন্দ্র প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বপ্নরূপে। বজ্রের চেয়েও কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল, কর্ত্তব্যে অবিচলিত একটি পূর্ণ মানবের স্বপ্ন কবির মনের মধ্যে পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি মেলে জেগে উঠলো প্রভাতের প্রস্ফুটিত শতদলের মতো। সেই স্বপ্ন অবশেষে ভাষার যাদুকে আশ্রয় ক'রে মহাকাব্যে জীবন্ত হ'য়ে উঠলো রামচন্দ্রের মূর্ত্তিতে। উপন্যাস-জগতে জাঁ ক্রিস্তফের মতো চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব করেছে রল্যাঁর স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা। প্যারিসের জনারণ্যের মাঝে নিঃসঙ্গ রল্যাঁ অন্তরের মধ্যে মানুষ ক'রে তুলছেন তাঁর স্বপ্নের শিশু ক্রিস্তফকে। সেই আদর্শ-মানস-সন্তান হবে বন্যার মতো দুর্ব্বার, সহস্র বাধাবিঘ্নকে ঠেলে সে সংসারে বিচরণ করবে বন্যকুঞ্জরের মতো, জীবনের সমস্ত সুখ যখন শ্মশানের ছাই হয়ে যাবে তখনও সেই ভস্মস্তূপের উর্দ্ধে তার চিরজয়ী প্রাণ প্রভাতের বিহঙ্গের মত গাইবে আনন্দের গান, শান্তি সে চাইবে না, সে চাইবে জীবন, পতন-উত্থানের মধ্য দিয়ে সে দৃঢ় পাদবিক্ষেপে এগিয়ে চলবে পূর্ণতার আদর্শের পানে, সহস্রবার পরাজিত হ'য়েও পাপের কাছে কখনও সে করবে না আত্মসমর্পণ। শিল্পীর স্বপ্ন অবশেষে ক্রিস্তফে রূপায়িত হলো।

জীবনে যা হ'তে চাই অথচ হ'তে পারিনে, যা শুধু স্বপ্ন হ'য়ে, আদর্শ হ'য়ে বিরাজ করে অন্তরের মণিকোঠায়—তাকেই আমরা রূপ দিই আর্টের মধ্যে। এইজন্য আর্টের মায়ামুকুরে যার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই—সে আমাদেরই অন্তরের রূপ। আত্মার মধ্যে রয়েছে পূর্ণতার ছবি, জীবনে কিন্তু অপূর্ণতার বেদনা। পূর্ণতার স্বপ্নকে তাই রূপ দিই সাহিত্যে আদর্শ নর-নারী সৃষ্টি ক'রে, সমতল পাষাণে অনিন্দ্য-সুন্দর মুখশ্রী জাগিয়ে। বেটোফেনের গানের সুরের মধ্যে যে ঝড়ের ঝঙ্কার, সেই ঝঙ্কারের মধ্যে পরিচয় পাই শিল্পীর ইস্পাত-গড়া দুর্জ্জয় প্রাণের—যে প্রাণ দুঃখময় জীবনের পাষাণ থেকে আনন্দরস সংগ্রহ ক'রে মর্ত্ত্যের ধূলায় বানিয়েছে সঙ্গীতের অমরাবতী। আমরা কাব্যে, সাহিত্যে, ভাস্কর্য্যে, সঙ্গীতে যা সৃষ্টি করি তার মধ্যে প্রকাশ পায় আমাদেরই অন্তরের ছবি। আর্টের ধর্ম্মই হলো প্রকাশ করা—যা আমরা আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করি তাকেই প্রকাশ করা।

আদর্শের প্রতি যেখানে নেই অন্তরের গভীর নিষ্ঠা, হৃদয়ের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে যেখানে আমরা অনুভব করিনে সত্যের দুর্জ্জয় আহ্বানকে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম ক'রে আছে এমন একটা বিরাট স্বপ্নে যেখানে আমাদের চিত্ত হ'য়ে নেই বিভোর, সেখানে বড়ো সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব নয়। বার্ণার্ড শ' আর ইবসেন যে এত বড়ো সাহিত্য তৈরী করতে পারলেন তার কারণ সত্যের আর স্বাধীনতার বিরাট আদর্শ, পূর্ণ এবং বন্ধনমুক্ত নরনারীর জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন তাঁদের জীবনকে শাসন করেছে একচ্ছত্র সম্রাটের মতো। খেয়ালের বশে তাঁরা লেখনী ধারণ করেননি। গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি হৃদয়ের সকল-ডোবানো প্রীতিই হুইটম্যানের কণ্ঠে জাগিয়েছে এমন সঙ্গীত যার মৃত্যু নেই কোনকালে। বিপুল গৌরবের দাবী করতে পারে সেই আর্ট যার পিছনে থাকে একটা জীবন্ত আদর্শে অখণ্ড বিশ্বাস।

এই জীবন্ত অনুভূতির দৈন্যই বেশী ক'রে চোখে পড়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের অধিকাংশ লেখায়। সাহিত্যের হাটে পরানুকরণপ্রিয়তার যেন হিড়িক লেগে গেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার অতি আধুনিক কবি যা লিখে যশোলক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করেছেন তার অনুকরণে কবিতা লিখতেই হবে—তা সে যত দুর্ব্বোধ্যই হোক। অনেক কবিতার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না; কেবল কতকগুলো শূন্যগর্ভ শব্দের বুদ্বুদ। কথার কুজ্ঝটিকাজালে অর্থ যত অস্পষ্ট হবে, কবিতার ততই যেন ঔৎকর্ষ। শব্দের কুয়াশায় কাব্যকে দুর্ব্বোধ্য ক'রে তুলবার চেষ্টার মধ্যে সস্তায় বাহবা নেবার যে ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়, তা রুচিজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। কবি-যশের অধিকারী হবার আশায় কতকগুলো বাক্যকে মাত্র অবলম্বন ক'রে যেখানে আমরা কাব্যকে অতি আধুনিকতার গৌরবে গৌরবান্বিত করতে যাই, সেখানে সাহিত্যের হাটে আমাদের সেই সস্তায় দাঁও মারবার প্রয়াস দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের মতো সত্য সত্যই হাস্যকর। মিষ্টি-সিজমের গিল্টি যে ভিতরের সস্তা পিতলকে লুকিয়ে রাখবার জন্যই—এ সত্য অতি সহজেই পাঠকের চোখে ধরা পড়ে যায়।

তাই ব'লে এ কথা সত্যি নয় যে, বিদেশের সাহিত্য থেকে আমাদের নেবার কিছু নেই এবং আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের গোময়লিপ্ত পবিত্র মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকাই হচ্ছে কল্যাণের একমাত্র পথ। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এ'রা সবাই বিদেশী সাহিত্যের কাছে ঋণী এবং সে ঋণের পরিমাণ একেবারেই অল্প নয়। পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চিমকে মিলিয়েই এ'দের প্রতিভা হ'য়ে উঠেছে গগনস্পর্শী। কিন্তু এ'দের কেউ পশ্চিমের অনুকরণ করেননি। অনুকরণ ক'রে কেউ কখনও বড়ো হয় না। রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী স্বামী মধুসূদনের ছায়া আর প্রতিধ্বনি হ'য়ে আপনাকে অসম্মান করতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু কুমুর চরিত্রকে আঁকতে গিয়ে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ইবসেনের নোরাকে লাল-পেড়ে সাড়ী পরিয়ে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে আমদানী করেননি।

কুমু যে নরওয়ের মেয়ে নয়, বাঙলার মেয়ে—একথা বুঝতে পাঠককে একটুও বেগ পেতে হয় না।

পশ্চিমের আধুনিক সাহিত্য আমাদিগকে দান করেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আইডিয়াল। আমাদের ভারতবর্ষের মহাকাব্যগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে আমল দেয়নি, কর্ত্তব্যের চরণমূলে ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করে দেবার আদর্শকেই বড়ো বলে প্রচার করেছে। ইবসেনের নোরা আর বাল্মীকির সীতা এক ছাঁচে তৈরী নয়। 'ধর্ম্ম গেল, শাস্ত্র গেল' এই রব তুলে প্রাচীনপন্থীরা নূতনের আবির্ভাবকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য অন্ধকারের শক্তিগুলিকে জড়ো করেছে বারংবার। আজও সে চেষ্টার বিরাম নেই। আর্টের একটা প্রকাণ্ড দান হ'চ্ছে শ্যাওলা-পড়া প্রাচীন আদর্শের রাহুগ্রাস থেকে মানুষের চিত্তকে মুক্ত ক'রে তার সামনে একটা নূতন দিগন্তের মহিমাকে উদ্ঘাটিত করা। আর্ট আমাদের শেখায় নতুন দৃষ্টিতে দেখতে, নতুন মন দিয়ে ভাবতে, নতুন পথে চলতে। নীতিবাগীশের দৃষ্টি সুদূর ভাবীকালের দিকে। আমাদের প্রত্যেকটি আচরণ সমাজের ভবিষ্যতের উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করবে—সেই আচরণের ফলে সমাজ জাহান্নামে যাবে কিনা—নীতিবাগীশ এই ভাবনাতেই অস্থির। সমাজের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখবার জন্য সাহিত্যিকের একটুও মাথা ব্যথা নেই। তার কাজ হচ্ছে বর্ত্তমানের নগদ পাওনা নিয়ে।

অবশ্য আত্মপ্রকাশের নামে অসংযমকে প্রশ্রয় দেবার কোনই হেতু থাকতে পারে না। নারীর মনে পুরুষের জন্য এবং পুরুষের মনে নারীর জন্য যে আসঙ্গ-লিপ্সা রয়েছে, তার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। সে প্রয়োজন না থাকলে যে সৃষ্টির ধারা এতদিনে যেতো শুকিয়ে। কিন্তু একথাও তো সত্য—আমাদের প্রবৃত্তিগুলি আর আমাদের আত্মা এক বস্তু নয়, প্রবৃত্তিগুলি হ'চ্ছে আত্মার যন্ত্র মাত্র। তাদের গলা টিপে জোর ক'রে মারতে গেলে আমাদের আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এইজন্যই তাদের দাবীকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু কারও দাবী স্বীকার করা মানে তার আধিপত্যকে স্বীকার করা নয়। মানুষের জীবন তো কেবল তার প্রবৃত্তিকে নিয়ে নয়, তার আত্মা আছে, মন আছে। সেই আত্মার পরম তৃপ্তি প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় নয়: প্রবৃত্তির যেখানে প্রভুত্ব সেখানে ক্লান্তি অনিবার্য্য। আনন্দের উৎস সেখানে অচিরে শুকিয়ে যায়, মিলনের উল্লাস অতীতের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়। আমাদের যথার্থ সুখ একটা সুবৃহৎ লক্ষ্যের পানে চিরন্তন চলায়, যে লক্ষ্য সুদূর ভবিষ্যতকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে। আমাদের চারিদিকে যে সহস্র সহস্র নরনারী রয়েছে তাদের সঙ্গে যেখানে যোগসূত্রকে আমরা ছিন্ন করি সেখানে অমিত-ব্যয়ী—মূর্খের মত আমাদের প্রেমের মূলধনকে আমরা দু'দিনেই নিঃশেষ ক'রে ফেলি।

আমাদের যৌনজীবনের উপরে এত যে বিধিনিষেধের বোঝা চাপান হয়েছে, এর কারণ আছে। আমাদের মনের যে শক্তি তার ভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডার নয়। সেই শক্তির ধারাকে আমরা চালিয়ে দিতে পারি দুটা খাতে—পারিবারিক ও যৌনজীবনের খাতে আর সংস্কৃতি ও সভ্যতার খাতে। মানুষের সভ্যতাকে গড়ে তুলবার কাজে যেখানে মনের শক্তিকে আমরা ব্যয় করি সেখানে আমাদের পারিবারিক জীবন ও যৌনজীবন খানিকটা উপেক্ষিত হ'তে বাধ্য। পক্ষান্তরে যেখানে প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ এবং মনের মত নীড় রচনা করতে গিয়ে আমাদের উদ্যমকে আমরা নিঃশেষ ক'রে ফেলি সেখানে মানুষের সভ্যতাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেবার মতো চিত্তের উদ্যম আর অবশিষ্ট থাকে না। সংস্কৃতির দাবী যেখানে প্রাধান্য লাভ করে, ঘরের চেয়ে পথ সেখানে বড়ো হয়ে ওঠে, মা সেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং প্রেয়সী নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করতে থাকে। প্রত্যেক সভ্যতার একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হ'চ্ছে, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড শক্তিকে কেমন ক'রে উচ্চতর সংস্কৃতির কাজে লাগানো যায়। মনে রাখতে হবে, মানুষের সংস্কৃতির গৌরবময় যুগ তখন থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে যখন থেকে তার যৌনজীবনে এসেছে সংযমের মহিমা। জঙ্গলের মানুষ সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে পারেনি, কারণ তার প্রবৃত্তির জীবন সেদিন ছিল উচ্ছৃঙ্খল। সুতরাং আত্মপ্রকাশের দোহাই দিয়ে অবাধ যৌনমিলনের আদর্শ পূজা পেতে চায় যে সাহিত্যে তার আমরা সমর্থন করিনে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার, আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ক'রে তোলার পক্ষে যৌনজীবনের খানিকটা তৃপ্তি প্রয়োজনীয়। প্রবৃত্তির জীবনের মধ্যে আনন্দের অনুভূতির যে একটি উৎস আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সে আনন্দের অনুভূতি থেকে আমাদের জীবনকে যেখানে বঞ্চিত করি, সেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশের পথ কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে ওঠে। সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের যৌনজীবন নিয়ে এত কথা বলতে হলো, কারণ আধুনিক ঔপন্যাসিকদের অনেকের লেখায় যৌনজীবনকে সমস্তপ্রকার বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার দাবী অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

এইবার প্রগতি-সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলবো। একটা কথা খুব ভাল ক'রে আমাদের জানা দরকার যে, পৃথিবীতে আজ এমন দিন এসেছে যা 'কালচারে'র পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দিন। কামান-পূজার প্রবৃত্তি মানুষকে বর্ব্বরতার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বেটোফেনের আর গেয়টের জার্ম্মানীতে আজ 'কালচারের' আসনকে জুড়ে বসেছে উদ্ধত উলঙ্গ পশুশক্তি। সেখানে আজ স্থান নেই আইনষ্টাইনের, টমাস ম্যানের, এমিল লুডউইগের এবং আরও অন্যান্য প্রতিভাশালী আর্টিষ্টের ও বৈজ্ঞানিকের। স্বাধীন চিন্তা সেখান থেকে নির্ব্বাসিত। কেন এমন হলো? কারণ আর্ট আপনার আভিজাত্য-গৌরবে অন্ধ হয়ে পলিটিক্স থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বাস্তবের দাবীকে অস্বীকার করবার এই মূঢ়তাই আজ 'কালচারে'র শিরে ডেকে এনেছে নিদারুণ অভিসম্পাত। দিগন্তব্যাপী কুরুক্ষেত্রের রক্তসাগরে মানুষের সংস্কৃতির গৌরবময় নিদর্শনগুলি আজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে বসেছে।

আজকের দিনে জগতকে নতুন ক'রে গড়বার দায়িত্ব লেনিনের মতো গান্ধীর মতো কর্ম্মবীরদের স্কন্ধে চাপিয়ে সাহিত্যিকদের স্বপ্নের জাল বুনবার কোন অধিকার নেই। নবযুগের বোধন-শঙ্খ বারে বারে বাজিয়েছে কবি আর সাহিত্যিকের দল। জ্ঞান আর কর্ম্মের মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই। জ্ঞানকে হ'তে হবে কর্ম্মের সৈনিক। গোর্কিকে এসে দাঁড়াতে হয়েছে লেনিনের পাশে—তবে রুশিয়ায় এসেছে যুগান্তর। ইতিহাসে মিল্টন আর ক্রমোয়েলের মিলনকে আমরা দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের লেখা গান্ধীজীর কর্ম্মসাধনাকে যে সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টিতে ভলটেয়ারের লেখনী যুগিয়েছে ইন্ধন। জ্ঞান চাই, ভাব চাই, চিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চাই—জগতকে রূপান্তরিত করার কাজে। প্রগতি-সাহিত্যের কাজ হ'চ্ছে এই ভাব যোগান—জ্ঞান দিয়ে প্রাণ জাগান। প্রগতি-সাহিত্যের আরও একটা কাজ আছে। সে কাজ হচ্ছে যারা উপেক্ষিত, যারা অনাদৃত, যারা সকলের পিছে, সকলের নীচে, তাদের সাহিত্যের দরবারে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসা। সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান কি রয়েছে কেবল পিয়ানোর সুরে মুখরিত অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে? যারা বিরাট মানব-পরিবারের এক প্রান্তে বহন করছে বিলাসী-বিলাসিনীদের কৃত্রিম জীবন, কেবল তাদের জীবনের কাহিনীই কি চিরকাল ধরে সাহিত্য-সৃষ্টির মাল-মসলা যোগাতে থাকবে? এই বিরাট আকাশের তলায় দিবানিশি চলেছে যে উপেক্ষিত মহামানবের শোভাযাত্রা এদের জীবনে কি কোন মহিমাই

(শেষাংশ ২৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গণতন্ত্রে মাইনরিটিদের স্থান

[রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল]

মাইনরিটিদের সমস্যা তুলিয়া কতকগুলি স্বার্থপর লোক দেশের সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা ভীতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। যেখানে অধিকাংশ লোকের ভোটের দ্বারা সমস্ত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সেখানে মাইনরিটিদের অবস্থা কাহিল হইবারই ত কথা! গণতন্ত্র! বাপরে বাপ! ইহা ত মাইনরিটিকে আস্ত গিলিয়া খাইবে! না পাইবে তাহারা তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার, না থাকিবে তাহাদের স্বতন্ত্র কোন স্বত্ত্ব। তাহারা মেজরিটিদের চাপে আধমরা হইয়া যাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত মেজরিটিদের দাস হইয়া পড়িবে। ইহাই হইল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মাইনরিটিদের দলপতির অভিযোগ। অকাট্য অভিযোগ! শত যুক্তি দাও, নানাপ্রকার ঐতিহাসিক নজীর দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা কর, সবই ব্যর্থ হইবে। কিছুতেই তাঁহারা বুঝিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের অভিযোগ সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, যে দেশে মাইনরিটি আছে, সে দেশে গণতন্ত্র অচল।

মাইনরিটিদের নেতৃবর্গের যুক্তি পরম্পরার মধ্যে যে সব গলদ আছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না! কারণ তাহা হইলে জনসাধারণকে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া প্রতারণা করা সম্ভব হইবে না। গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝায়, ইহার ক্ষমতা কতদূর, ইহার স্বরূপ কি, ইহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি, এ সব বিষয় সম্যক অবগত হইলে বোধ হয় মাইনরিটিগণ সহজে প্রতারিত হইবে না। সত্য বটে গণতন্ত্রে সমস্ত ব্যাপার অধিকাংশের ভোট দ্বারা নির্ণীত হয় এবং তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া ব্যতীত মাইনরিটিদের গত্যন্তর নাই—কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষমতা যে বহু বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা অনেকেই হয়ত জানেন না! প্রত্যেক প্রকার শাসনতন্ত্র মানুষের প্রয়োজনের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত বলিয়া পৃথিবীতে কোনও প্রকার শাসনতন্ত্র ত্রুটিবিহীন নহে। রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, একনায়কত্ব, অভিজাত-তন্ত্র, ধনতন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই বিবেচ্য। এখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানে ত্রুটিবিহীন নহে। বরং কোনটাতে সব চেয়ে কম ত্রুটি আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ ত্রুটিবিহীন কোনটাই নহে। এই সব শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া ও তাহাদের গুণাগুণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করিয়া রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, গণতন্ত্রই হইতেছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রে বরণীয়। কারণ ইহার অন্তর্নিহিত ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তজ্জন্য গণতন্ত্রই সাধারণ লোকের বেশী উপকার করিতে পারে। Goverment of the people by the people for the people. জনসাধারণের কল্যাণের জন্য জনসাধারণের দ্বারাই জনসাধারণের শাসন—ইহারই নাম গণতন্ত্র। এই তিনটি একসঙ্গে হওয়া চাই। তবেই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র গঠিত হইবে। গণতন্ত্রের সুবিধার কথা চিন্তা করিলে অসুবিধাগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুমিত হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে উন্নতির এতদূর সম্ভাবনা আছে যে, শত অসুবিধা স্বীকার করিয়াও গণতন্ত্রকেই বরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। গণতন্ত্র জাতির ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলে। প্রত্যেক লোকের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হইবার যে অসীম প্রতিভা আছে, যে অনন্ত তেজ আছে, তাহাকে প্রকাশ করিবার পরিপূর্ণ অবসর ও সুযোগ দেয়। জাতির প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমতা ও ঐক্যবোধ জন্মাইয়া দেয়। এখানে মাইনরিটি মেজরিটির কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পুষ্টিকর খাদ্য খাইলে যেমন একই সঙ্গে শরীরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবান, সতেজ ও পুষ্ট হয়, গণতন্ত্রের পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকিলে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি সমভাবে ও যুগপৎ সমস্ত শক্তি লইয়া বিকশিত হইয়া থাকে। সেইজন্য সাময়িক কতকগুলি অসুবিধার কারণে গণতন্ত্রকে পদাঘাত করা কাহারও উচিত নহে।

গণতন্ত্রে সমস্ত বিষয় অধিকাংশের ভোটের দ্বারা মীমাংসিত হয়। সুতরাং আমি যাহা চাহি না, অথবা যাহা আমার স্বার্থ-বিরোধী, তাহা যদি অধিকাংশ লোক চাহে তবে আমার কোন গতি নাই। মাইনরিটি দলপতিগণ এই প্রকার বিকৃত অর্থে ব্যাপারটি বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আসল ব্যাপার সেরূপ নহে। এইরূপ অসুবিধা যে হইতে পারে, তাহা গণতন্ত্রের সমর্থকগণ ভাল করিয়া জানেন এবং সেজন্য তাঁহারা তাহার প্রতীকারও নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমি কি চাহি অথবা চাহি না, কি আমার স্বার্থসাপেক্ষ অথবা স্বার্থ-বিরোধী এই সব বিষয়কে দুইটি পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। কতকগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার যথাঃ—ব্যক্তিগত রুচি, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ব্যক্তিগত স্বার্থ। আর কতকগুলি জাতিগত—সমগ্র জাতির সাধারণ কল্যাণকর বিষয়। গণতন্ত্রে এই বিষয়গুলি অধিকাংশের ভোটের দ্বারা নির্ণীত হয়। সর্ব্বসাধারণের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকের মতানুসারে কাজ করাই ন্যায় ও নীতিসম্মত। আমাদের সামাজিক ব্যাপারও এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু গণতন্ত্র যাহাতে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তজ্জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বাহ্নে মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষিত হয়। মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মপালন, ভাষা ও সাহিত্য প্রচার, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার—এই সবই মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। গণতন্ত্র কিছুতেই এইগুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই সব মৌলিক অধিকার বর্ণে বর্ণে পালন করা গণতন্ত্রের পবিত্রতম দায়িত্ব। ইহার সামান্য মাত্র হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার গণতন্ত্রকে দেওয়া হয় না। যে গণ-পরিষদ গণতন্ত্র সৃষ্টি করে, কেবল তাহারই অধিকার থাকে এইগুলি পরিবর্ত্তন করিবার অথবা নূতন অধিকার সংযুক্ত করিবার। তাহাও আবার সর্ব্ববাদীসম্মত ব্যতিক্রমে হইতে পারে না। এই মৌলিক অধিকার মাইনরিটিদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। এই অধিকার অব্যাহত থাকিলে মাইনরিটিদের বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই।

ইহা ত গেল গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার সময়। কিন্তু গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পরও মাইনরিটিগণ আরও কতকগুলি বিশেষ অধিকার পায়—যাহা তাহাদিগকে মেজরিটিদের সকল প্রকার অবিচার ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারে। ইংরেজিতে যাহাকে বলে Rule of law, অর্থাৎ আইনের শাসন। গণতন্ত্রে প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তির তাহা অমোঘ রক্ষাকবচ। আইনের মর্য্যাদা সকলের আগে রক্ষা করিতে হইবে। আইন ভঙ্গকারীকে দণ্ড পাইতে হইবে, নিগৃহীত জন প্রত্যেক প্রকার অত্যাচারের প্রতীকার পাইবে। পাছে ছোট বড়র মধ্যে কেহ পার্থক্য করিয়া বসে, এইজন্য গণতন্ত্রে আইনের চক্ষে সকলকে সমান ও তুল্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন সকলের মূল্য আইনের চক্ষে এক ও অভিন্ন। আর বিচারালয় যাহাতে নিরপেক্ষ ও ত্রুটিহীন হইতে পারে সেইজন্য বিচারকগণকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহারা কাহারও উপর নির্ভরশীল নহেন। তাঁহাদের সহিত শাসন বিভাগের কোন সংস্রব থাকে না। সেইজন্য শাসকগণের বহু কাজকে তাঁহারা বাতিল করিয়া দিতে পারেন। গণতন্ত্রে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় বলিয়া শাসকবর্গ যে কোন লোককে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করিতে পারেন না। আবার গ্রেপ্তার করিলে অধিক দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। গ্রেপ্তার করিবামাত্র তাহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে হইবে। বিচারালয় শাসকবর্গের উপর নির্ভরশীল নহে বলিয়া সেখানে সুবিচারের আশাই

করা যাইতে পারে। গণতন্ত্রের আর একটা সুবিধা এই যে, আজ যাহারা মাইনরিটি, কাল তাহারাদের মেজরিটি হইবার সমস্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। মেজরিটিগণ যদি অন্যায় করে, অত্যাচার করে, দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে মৌলিক অধিকারের বলে তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তাহাদের লোকপ্রিয়তা কমাইয়া দিতে পারে এবং পরে সেই মাইনরিটিগণ মেজরিটি হইতে পারে। এইভাবে দুই দিকের চাপে সব সময় মাইনরিটিদের সুবিধা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে মাইনরিটি সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম। তাহার মূলে রাজনীতিগত অথবা অর্থনীতিগত কোন কারণ নাই। তাহা কতকটা ধর্ম্মগত। কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির চাপে এই কৃত্রিম মাইনরিটি বেশী দিন টিকিবে না। পৃথক নির্ব্বাচন এই ধর্ম্মগত পার্থক্যকে অনর্থক জাগাইয়া রাখিয়াছে। পৃথক্ নির্ব্বাচন ও মাইনরিটিদের স্বার্থ-রক্ষার দাবী একসঙ্গে চলিতে পারে না। কারণ পৃথক্ নির্ব্বাচন একদল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে চিরকাল মাইনরিটি করিয়া রাখিবে। মাইনরিটিগণ যদি কোনদিন মেজরিটি হইতে চায় তবে তাহাদিগকে পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচন থাকিলেও গণতন্ত্রের অন্যান্য সুবিধা তাহারা সমানভাবেই পাইতে থাকিবে। আশা করি, উপরের আলোচনা হইতে পাঠকবর্গ বেশ বুঝিলেন যে, গণতন্ত্রে মাইনরিটিদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যে আশঙ্কার কথা পুনঃপুন বলা হইয়া থাকে, তাহা অমূলক ও বাস্তবতার সহিত সম্পর্কশূন্য। ভারতে মাইনরিটি কোন অবস্থাতেই বিপন্ন নহে। পুনঃপুন স্বার্থ সংরক্ষণের কথা তুলিয়া মাইনরিটিগণ নিজেদের অবস্থাকে এরূপ প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন যে, আজ সর্ব্বাপেক্ষা যদি কোন দল নিরাপদ হইয়া থাকে, তবে জোর করিয়া বলিব যে, সে দল হইতেছে ভারতের মাইনরিটি দল। এই সদা রোরুদ্যমান সম্প্রদায়ের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

বাবুমশাই*

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

গাঙের ধারে অশথ্‌তলার ঘাটে
'চামরু' বুনো আজ সারাদিন খাটে।
কোদাল ধ'রে বানাচ্ছে ঘাট
ভিড়বে হেথায় বাবুমশার বোট
কলাগাছের গেট্ বানিয়ে
হল্লা করে অনেক ছেলের জোট্।
—তখন শরৎকাল!
অশথ তলায় ধানের মড়াই
—সেই সকাল—বিকাল—!
নতুন আউস্ ধানের গন্ধে
কী আনন্দে মাত্‌লা বাতাস নাচে,
কাঁচা সোনার ধানের বাইলে
সোনালী রোদ চিক্‌মিকিয়ে হাসে।
ধানের পালার পাশে ব'সে
কী আনন্দে বলদ গরুগুলি
কী মিষ্টি যে ধানের বাইল্
খাচ্ছে সুখে সব মেহানৎ ভুলি'।
পুবাল্ হাওয়া বয়—
আজ আস্‌বেন এই ঘাটেতে মোদের রাজা—
বাবুমহাশয়।

কল্‌সী রেখে মেয়েরা নায় ঘাটে।
ছেলেরা সব ঘোলা জলে ডুবিয়ে সাঁতার কাটে।
"—ঐ আস্‌ছে বাবুমশার বোট।"
আঙুল তু'লে দেখায় তারা দূরে—
"ছাড়িয়ে এলো এ্যাতক্ষণে নিশ্চয়ই ঐ পাবনা বাজিতপুরে।
ওই দেখা যায় মস্তবড় পাল—
বোটের মাথায় ঐ উড়ে যায়
গাংশালিকের পাল।

'তপ্‌সী' মাঝি ঐ যে নাড়ে হাল,
সাদা মেঘের একটু নীচে
ভরা গাঙের অথৈ হল্‌দে জলে—
পদ্মাবুকে হেলে দুলে'
বাবুমশার বোট যে নেচে চলে—
মেঘভাঙা ঐ চিক্‌চিকানো রোদ্
হালে পালে হেসে নেচে ক'চ্ছে কি আমোদ্।
বাঁক্ ঘুরেই ঐ 'সাদিপুরের' চর,
ঝাউ-এর সারি ছাড়িয়ে অতঃপর,—
আর বেশী দেরী নয়।
এই বেলাতেই পৌঁছে যাবেন—মোদের রাজা—
বাবুমহাশয়।"

এ যেন সেই ময়ূরপঙ্খী নাও!
কোন্ অজানা দেশ থেকে কোন্ রাজপুত্রে নিয়ে'
কোন্ সমুদ্রে কবে যেন হয়েছে উধাও!
কোন্ ঘুমন্ত রাজকন্যা তরে,
এই গাঁয়ের ঘাটে সন্ধ্যাবেলা ভিড়ে।
"রাজকন্যে! জাগো—জাগো—ঘুমায়ো না আর!"
বাজিয়ে বাঁশী রাজপুত্র বল্‌ছে বারে বার!
মিলন হল,—সে যেন কোন্—
জ্যোৎস্নামাখা গন্ধে ঘেরা শারদ নিশীথে!
সে মিলন কেউ পায়নি দেখিতে!
সে রহস্য—সেই যে গোপন—
নীরব রাতের প্রণয় অভিসার
—কেউ দ্যাখেনি আর,—
কুলুকুলু গানের সাথে দেখেছে তা—
আনন্দিতা গাঙের এই ধার!

---

* শিলাইদহের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে "বাবুমশাই" বলিত।

বিচিত্র বার্ত্তা

জোড়া মোটর বাস

ওহিও-র আর্‌নুন নামক রাস্তায় কিছুকাল আগে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছিল। হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা গেল একটি মোটর বাস বেরিয়েছে—তার আকৃতি দেখলে মনে হয় দুটি বাস একসঙ্গে জোড়া দেওয়া। আসলে ঠিক তাই-ই। দুটি হাল্কা একতলা বাসকে জুড়ে দিয়ে একটি প্রকাণ্ড লম্বা বাস তৈরী করা হয়েছে, ১২০ থেকে ১৪০ জন যাত্রী এতে আরামে ভ্রমণ করতে পারে। দুটি রেল গাড়ীর কামরা জুড়ে দিলে যেমন দেখায় এই বাসটি দেখতে অনেকটা সেইরকম

এবং এর এক একটি ভাগে চারটি করে চাকা থাকায় সবশুদ্ধ আটটি চাকা আছে। যে জায়গায় জোড়া দেওয়া হয়েছে সেখানে উপর দিয়ে একটি নমনীয় রবারের ছাত দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে। এই জোড়া বাসটি এ্যালুমিনিয়ামে তৈরী এবং ৫০ মাইল বেগে চালানো হলেও কোন ঝাঁকুনি লাগবে না। এই বাসের নির্ম্মাতা বলেন যে, খুব অল্প জয়গায় অনায়াসেই এই বাস মোড় ফিরতে পারে।

অতিকায় মাউথ অর্গান

চিকাগোতে সম্প্রতি একটি বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনী হয়ে গেছে,
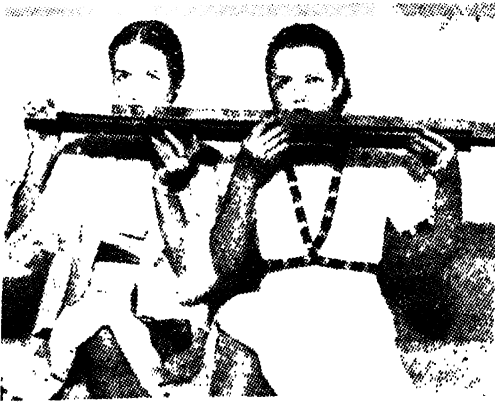
তাতে ২,০০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর সকলের চেয়ে বড় আকর্ষণের বিষয় ছিল এক গজের উপর লম্বা দৈত্যাকার একটি মাউথ অর্গান,—দুজনে যাতে একসঙ্গে বাজাতে পারে সেই অনুসারেই যন্ত্রটি নির্ম্মিত। প্রদর্শনীর নিয়ম হচ্ছে—যে যন্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে তাকে দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে বাজিয়ে শোনাতে হবে। সব যন্ত্র বাজানো শেষ হলে যখন এই মাউথ অর্গানটি বাজাবার ডাক পড়ল তখন চারিদিকে কৌতূহল ও বিস্ময়ের সাড়া পড়ে গেল। সবাই ভেবেছিল বাজিয়েটি যন্ত্রের আকারেই দৈত্যবিশেষ কেউ একজন হবেন। কিন্তু সকলকে চমৎকৃত করে এগিয়ে এলেন দুটি সুন্দরী তরুণী, তাঁরা দুজনে একসঙ্গে যন্ত্রটি বাজিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। যন্ত্রটির পরিমাপ লম্বায় ৪১ ইঞ্চি এবং এতে ছিল ৩২০টি পর্দ্দা।

মাখন-তোলা দুধের গুণ

চায়ের পেয়ালা পিরিচ ছোট বড় ডিশ—চীনে মাটির তৈরী, এসব বাসন-কোসন আজ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে ব্যাপক ব্যাবহার করা হয়। কিন্তু সেসব ডিশ-কাপে সামান্য ফাটল বা চিড় ধরলে, দেখতে দেখতে তা' বর্দ্ধিত হয়ে পাত্রটিকে অকেজো করে ফেলে। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, অতি সহজ উপায়ে তা'কে রিপু করে নেওয়া যায়। এই কৌশলটি আর কিছুই নয়—ফুটন্ত দুধে এই পাত্রটি রেখে কিছুক্ষণ সেটাকে সিদ্ধ করা। মাখন-তোলা দুধেই এ কাজটি হয় ভাল। কলকাতার শহরে হামেশা যে দুধ গোয়ালাদের কাছে পাওয়া যায়, তা আর যাই হোক্ একাজের জন্য যে একেবারে নিখুঁত সে কথা আর পাঠক-পাঠিকাদের খুলে বলার প্রয়োজন হবে না আশা করি। ঐ দুধে পাত্রটি ভাল করে ফুটিয়ে নামিয়ে তার কানা ভাল করে বাজিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এর সেই ভাঙ্গা ক্যানকেনে আওয়াজ লোপ পেয়েছে। চুলফাটা পাত্রই এভাবে মেরামত করা যায় ভাল রকম। আর মেরামতের পর টেঁকসই হয় ঠিক নূতনের মত হুবহু। যে ফাটল ধরেছিল তা আর নজরে পড়বে না। তবে ফেটে বেশী রকম ফাঁক হয়ে গেলে অথবা একেবারে দুই টুকরো হয়ে গেলে অবশ্য জোড়া লাগবে না। তখন জোড়া লাগাতে হলে ক্যানাডা ব্যালসাম ছাড়া উপায় নেই।

আজ-কাল

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

গত ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর ওরার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি করে' ওয়ার্কিং কমিটি বলেছেন যে, ভারত-সচিব তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে আবার সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলে আসল প্রশ্নকে চাপা দিয়েছেন। বৈদেশিক শাসনের সম্পূর্ণ অবসান না হলে স্থায়ী সাম্প্রদায়িক ঐক্য আসতে পারে না। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক ধূয়া তুলবার অর্থ হচ্ছে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিবার অনিচ্ছা। ওয়ার্কিং কমিটি কর্ম্মীদের সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হতে বলে' গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করতে বলেছেন।

স্বাধীনতা দিবস

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাতে তাঁরা বলেছেন যে, যে সংকটের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ ও পৃথিবী এখন যাচ্ছে তার জন্যে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তীব্রতর আকার ধারণ করবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আগামী স্বাধীনতা দিবসের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। এই অনুষ্ঠান শুধু জাতির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হবে না, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সুশৃঙ্খল কার্য্যের আয়োজন-পর্ব্ব হবে।

স্বাধীনতা দিবসের একটা নতুন সংকল্পবাক্য ওয়ার্কিং কমিটি রচনা করে দিয়েছেন। তাতে এক জায়গায় আছে, "ভারত-বর্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতা তো হরণ করেছেনই, উপরন্তু ভারতীয় জনগণকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শোষণ করছেন এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক—সর্ব্ব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করেছেন।" এই কথাগুলিতে কলকাতার ফিরিঙ্গি খবরের কাগজটি ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

বাঙলার কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে কার্য্যত বাতিল করে দিয়েছেন। বাঙলা কংগ্রেসের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা বাঙলায় কংগ্রেসের কাজ চালাবার ভার নিজেরাই নিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আপাতত তা না করে, আসন্ন কংগ্রেস নির্ব্বাচন চালাবার জন্যে এক কমিটি নিযুক্ত করেছেন (অবশ্য একথা কারো অজানা নেই যে, নির্ব্বাচন যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরাই কংগ্রেসের নতুন সংগঠন করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারবেন)। এই কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সদস্য মনোনীত হয়েছেনঃ—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (সভাপতি), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ জে সি গুপ্ত, শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ পালিত।

বাঙলা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক মৌলবী আস্রাফ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির আচরণ সম্পূর্ণ গণতন্ত্র-বিরোধী; তাঁরা যে কমিটি নিযুক্ত করেছেন এবং যে নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বসিয়েছেন উভয়ই একটা বিশেষ দলের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ডিগবয় তদন্তের রিপোর্ট

গত ২২শে তারিখে আসাম গবর্ণমেণ্ট ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জির রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। স্যার মন্মথ মোটের উপর ডিগবয়ের ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। তিনি সাধারণভাবে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে যে সব নিয়ম-কানুনের সুপারিশ করেছেন তা গ্রহণ করার বদলে নাৎসী রাষ্ট্রের মতো ধর্ম্মঘট একেবারে নিষিদ্ধ করে দিলে শাসক ও মালিকদের কাজ আরও হাল্‌কা হয়ে যায়। স্যার মন্মথ মুখার্জ্জির এই সব সুপারিশ সম্বন্ধে ভারতে নবাগত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বলেছেন, "এ রকম প্রতিক্রিয়াশীল রিপোর্ট আমি কখনও দেখি নাই। বিশ্ব-রাজনীতির গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তিনি এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে শ্রমিক শ্রেণী সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তাও করতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না।"

অর্থ-সচিবের পদত্যাগ

যুদ্ধ প্রস্তাব নিয়ে মতভেদের পরিণামে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি গত ২০শে ডিসেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই মন্ত্রি-সভা ক্রমশ কোয়ালিশন দলের নেতৃত্ব হারিয়েছে। কিছু করবার উদ্যম আর মন্ত্রিসভার নেই। পার্টিই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠেছে। ফলে মন্ত্রিমণ্ডলীর ধীর আলোচনা ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের চেয়ে একটা বৃহৎ দলের হঠকারিতা ও স্বার্থপর পক্ষপাতিত্ব বড় হয়ে উঠেছে। আর এই দলের প্রকৃতি প্রধানত সাম্প্রদায়িক এবং ভোটের বলে ক্ষমতা পেয়ে এই দল এখন দৃকপাতহীন।"

ব্যর্থ ফতোয়া

জিন্না সাহেবের ফতোয়া ব্যর্থই হয়েছে। "মুক্তি দিবস"-এর আহ্বানে মুসলমানেরা সাড়া দেয় নি। কয়েক জায়গায় অবশ্য সভার খবর পাওয়া যায়; কিন্তু তেমনি অনেক বিরোধী সভারও খবর আসে। জুম্মাবারে মসজিদে সাধারণত মুসলমান উপাসকদের ভিড় হয়; সুতরাং শুক্রবারে "মুক্তি দিবস" নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় স্বভাবত সেদিনও মসজিদে মুসলমান সমাবেশ হইয়াছিল; কিন্তু উপাসনার পর কংগ্রেসকে গালাগালি করার মনোবৃত্তি তাদের হয় নি।

হিন্দু মহাসভা

২৮শে ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় সাড়ম্বরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হচ্ছে। শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকরের সভাপতিত্বে তিন দিন এই সম্মেলন হবে। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছেন। ৩১শে ডিসেম্বর হিন্দু যুব সম্মেলন, হিন্দু নারী সম্মেলন ও শুদ্ধি সম্মেলন হবে।

কমাণ্ডারের আত্মবিলোপ

"গ্রাফ স্পে" ডুবিয়ে দেওয়ার পর তার কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন লাংসডর্ফ নাবিকদের নিয়ে বুয়েনোস এয়ারেসে যান। সেখানে তিনি রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এক চিঠিতে তিনি লিখে

যান যে, তিনি তাঁর জাহাজের সংগেই আত্মোবিলোপের সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু নাবিকদের নিরাপত্তার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট ক্যাপ্টেন লাংসডর্ফের আত্মহত্যাকে বীরোচিত বলে' অভিহিত করেন, আর নাৎসী-বিরোধীরা একে হিটলারবাদের প্রতিবাদ বলে' বর্ণনা করেন।

জার্ম্মানরা "কলম্বাস" নামে নিজেদের এক অতিকায় যাত্রী-জাহাজও (৩২৫৬৫ টন) আটলাণ্টিকে ডুবিয়ে দিয়েছে। বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ দেখতে পেয়ে জার্ম্মান নাবিকরা এই কাজ করে।

ফিনল্যাণ্ডের রহস্য

ফিনল্যাণ্ডে যুদ্ধের অবস্থা স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, এক তরফা প্রচার। সোভিয়েট ইস্তাহার সামান্য কিছু মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে প্রত্যহ হেলসিঙ্কির কৃতিত্বের সবিস্তার বর্ণনায় সংবাদপত্র প্লাবিত হয়ে যায়। সোভিয়েট ক্রমাগত পর্যুদস্ত হচ্ছে শুনতে শুনতে হঠাৎ একদিন শোনা গেল, নরওয়ের সীমান্তবর্ত্তী অধিকাংশ ফিনিশ ভূভাগ লালফৌজের হাতে চলে' গেছে। আবার এখন শুনছি, নানাদিকে সোভিয়েট সৈন্য হটে' যাচ্ছে এবং তাদের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।

গত তিন সপ্তাহের যুদ্ধের ফলাফল দিয়ে উভয় পক্ষ থেকে দুটো বিবৃতি বেরিয়েছে; হেলসিঙ্কির বিবৃতিতে যথারীতি কল্পনাতীত সাফল্য দাবী করা হয়েছে। সোভিয়েট বিবৃতি স্পষ্ট ও সংযত। তাতে বলা হয়েছে, তিন সপ্তাহে ফিনদের ২২০০ সৈন্য নিহত ও ১০০০০ আহত হয়েছে এবং সোভিয়েটের ১৮২৩জন সৈন্য নিহত ও ৭০০০ আহত হয়েছে। লালফৌজ পেটসামো থেকে ৮০ মাইল, উলিয়াবর্গের দিকে ৯৫ মাইল, সার্ডোবোলের দিকে ৫০ মাইল ও ভিবর্গের দিকে ৪০ মাইল এগিয়ে গেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উলিয়াবর্গে লালফৌজ পৌঁছলেই ফিনল্যাণ্ডের স্থলভাগ চারিদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; লালফৌজ প্রায় চার-পঞ্চমাংশ পথ চলে গেছে।

গত দুই দিন শত শত সোভিয়েট বিমান ফিনল্যাণ্ডের উপর দিয়ে উড়েছে; কিন্তু কোথাও বিশেষ বোমাবর্ষণ করে নি।

ষ্ট্যালিনের বাণী

ষ্ট্যালিনের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে হিটলার ও রিবেণ্ট্রপ যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। উত্তরে ষ্ট্যালিন বলেছেন যে, জার্ম্মান ও সোভিয়েট মৈত্রী রক্ত দিয়ে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে এবং ঐ মৈত্রী স্থায়ী হবার কারণ রয়েছে। ষ্ট্যালিন জাপানীদের বিরুদ্ধে মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের জয় কামনা করে তাঁকে একটা তার পাঠিয়েছেন।

ফিনিশ গণ-গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মঃ কুসিনেনের কাছে এক বাণীতে ষ্ট্যালিন অত্যাচারী ম্যানারহাইম-ট্যানার দলের বিরুদ্ধে ফিনিশ জনগণের জয় কামনা করেছেন। তাঁর এই বাণী থেকে বোঝা যায়, তিনি তথা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ফিনিশ সঙ্ঘর্ষকে সোভিয়েট বনাম ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধ হিসেবে দেখছেন না, দেখছেন ফিনল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ হিসেবে, যার এক পক্ষে জনগণ অপর পক্ষে মুষ্টিমেয় শাসক-শোষক দল।

অন্য খবর

বড়দিন উপলক্ষে জার্ম্মানী ও মিত্রশক্তির লড়াই-এর দুই দিন একটু মন্দা পড়ে। তবে জাহাজের উপর জার্ম্মান আক্রমণ যথারীতি চলছে (জলমগ্ন জাহাজের তালিকা পরে দেওয়া যাবে)।

বল্কান সম্পর্কে কাউণ্ট সিয়ানো এক বক্তৃতা দিয়েছেন; এ বক্তৃতায় ইংরেজ রাজনীতিবিদরা আশ্বস্ত হলেও বল্কান রাজ্যগুলো আতঙ্কিত হয়েছে। কাউণ্ট সিয়ানো বলেছেন যে, বল্কানে আক্রমণ নিবারণ ইতালীর পক্ষে প্রয়োজন। গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া মনে করছে, এই ধুয়ো তুলে ইতালী তাঁদের গ্রাস করবার মতলব আঁটছে।

২৫।১২।৩৯ —ওয়াকিবহাল

আর্টের আদর্শ

(২৮১ পৃষ্ঠার পর)

নেই? সেই জীবনের দুঃখ-সুখের কাহিনী নিয়ে লেখা ডষ্টয়েভস্কির Crime and Punishment, আলেকজাণ্ডার কুপ্রীনের Yama, the Pit কি সাহিত্যের দরবারে অনাদৃত হ'য়ে আছে? ওয়াল্ট হুইটম্যানের অমর কাব্যে কাদের জয়গান? রাজারাণীদের না সাধারণ মানুষের? পৌরাণিক দেবদেবীদের না বনের কাঠুরিয়ার আর রাজমিস্ত্রীর? ইতিহাসের রথী মহারথীদের না নৌকার মাঝির আর মাঠের চাষীর? শরৎচন্দ্রের প্রতিভারও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছেন আমাদের অতি নিকটের যারা তাদেরই জীবনের প্রতিদিনের কাহিনী থেকে। তাঁর সাহিত্যের মুকুরে দেখতে পাই আমাদেরই অখ্যাতনামা ঘরের মানুষগুলির আর প্রতিবেশিনী প্রতিবেশীদের সুপরিচিত মুখচ্ছবি। গল্পগুচ্ছের মধ্যে বাঙলার অন্তঃপুরচারিণী নদীতীরবর্ত্তী গ্রামগুলির অতি সাধারণ নরনারীদের অবতারণা ক'রে রবীন্দ্রনাথই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ললাটে সর্ব্বপ্রথম গণতন্ত্রের জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁরই পন্থা অনুসরণ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণ রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের উত্তরসাধক।*

---

*ধুবড়ী সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ।

রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমা

অভিনয়-উৎকর্ষতার দরুণ এককালে যেমন কোন কোন অভিনেতা যাত্রাদল হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রমোশন পাইত, তেমনি আজকাল রঙ্গমঞ্চে পারদর্শী অভিনেতারা সিনেমায় উন্নতি সংস্থান লাভ করিতেছে। ইহার ফলে সিনেমায় রঙ্গমঞ্চের প্রভাব আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি। প্রবাদ আছে যে, কাবুলিওয়ালা তাহার হিং-এর ঝোলা রাখিয়া আসিলেও গা হইতে হিং-এর গন্ধ বাহির হইতে থাকে, তেমনি রঙ্গ-মঞ্চের অভিনেতারা রঙ্গ-মঞ্চ হইতে সিনেমায় আসিলেও রঙ্গ-মঞ্চের গন্ধ তাহারা সঙ্গে নিয়া আসেন। সুতরাং অভিনেতাদের রঙ্গ-মঞ্চ ও সিনেমার মূল পার্থক্যটুকু সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। রঙ্গ-মঞ্চ ও সিনেমার মধ্যে দৃশ্য-ব্যবহারে বৈষম্য আছে। একটি সম্পূর্ণ কাহিনীকে সংলাপে ব্যক্ত করাই নাটকের উদ্দেশ্য, সংলাপের প্রাধান্যই সেখানে অধিক। এ বিষয়ে সিনেমা উপন্যাস-ধর্ম্মী। সংলাপের হ্রস্বতার দরুণ সিনেমার অভিনয়ে মনস্তত্ত্বের মূল্য দিতে হয়, কিম্বা জীবনের সঙ্গে সিনেমা-অভিনয়ের হুবহু সাদৃশ্য রাখিবার চেষ্টার ফলে স্বাভাবিকভাবে মনস্তত্ত্ব প্রবেশ করিয়া সংলাপকে হ্রস্ব করিয়া দেয়। সিনেমা তাই বাক্সর্ব্বস্ব নয়।

বিলাস নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও জোহরা

আমাদের একটা ধারণা আছে যে, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের কৃতিত্ব বেশী; কারণ যথেচ্ছ বিচরণ তাহাদের নিষিদ্ধ; আবদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যেই তাহাকে অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের হাসাইতেও হইবে, কাঁদাইতেও হইবে; আর সিনেমায় প্রকৃতিই রঙ্গমঞ্চ বলিয়া চাল-চলতিতে বা ভাব-ভঙ্গীতে অভিনেতা মুক্তির সুযোগ পায়। কিন্তু এ ধারণা আমাদের ভুল। কারণ, সিনেমায় অভিনেতাদের বিচরণক্ষেত্র আরও নির্দ্দিষ্ট, আরও গণ্ডীবদ্ধ—ক্যামেরা ফোকাসের ইচ্ছাধীন। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় হইতে সিনেমার অভিনয় পৃথক এই হিসাবে যে, মোটারকমের অভিনয় রঙ্গমঞ্চে চলে, কিন্তু সিনেমার অভিনয়ে সূক্ষ্মতার এবং প্রচুর নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সিনেমায় ক্যামেরা অভিনেতাকে দর্শকদের সম্মুখে মুখোমুখি উপস্থিত করিয়া দেয়, কোন সময় অভিনেতার সমস্ত শরীর, কোন সময় আ-কটিমস্তক আবার কোন সময় মুখাবয়ব দৃষ্টি গোচর হয়। সুতরাং আবয়বিক ভঙ্গীগুলিকে স্বায়ত্ত সাবলীল করিবার কৌশল জানা না থাকিলে সিনেমা অভিনয়ে কেহ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে না। ইহা ছাড়া আরেকটি অন্তরায় আছে। নাটকে অবিচ্ছিন্নভাবে দৃশ্যপরম্পরা অভিনীত হয় বলিয়া আবেগ ও সহানুভূতি অভিব্যক্ত করা অভিনেতাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয় না, কিন্তু সিনেমায় দৃশ্য-পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চিত্র-গ্রহণ অসম্ভব—একটি সেট-এর যতগুলি দৃশ্য-কাহিনী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে, সেগুলিকেই পর পর গ্রহণ করিয়া এক একটি সেট-এর কাজ সমাধা করা হয়। কাজেই কতকগুলা খাপছাড়া ক্ষুদ্র দৃশ্যের পরিমিত সংলাপের মধ্যে অভিনেতা দৃশ্যগত ভাবাবেগ ব্যক্ত করে। অতএব সিনেমা অভিনয়ে যান্ত্রিকতা রহিয়াছে, কিন্তু নৈপুণ্যের সহিত সে যান্ত্রিকতাকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে অভিনয়ে ভাবাবেগ ঢালিয়া দেওয়া সহজসাধ্য নয়।

গ্লোবে উদয়শঙ্কর

বিশ্ববিশ্রুত নৃতন-শিল্পী উদয়শঙ্কর গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে গ্লোব রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-কলা প্রদর্শন করিতেছেন। বাঙলার নৃত্য-কলামোদীদের নিকট ইহা অবিস্মরণীয় বিষয়। এই নৃত্য-বাসরের প্রধান ও নূতন নৃত্য-পরিকল্পনা 'জীবনের ছন্দ' উদয়শঙ্করের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি; এই নৃত্যে ভাবের অভিনবত্ব, ছন্দের মাধুর্য্য ও নৃত্য-ভঙ্গীর বৈচিত্র্যের সহিত বিষ্ণুদাস শিরালীর সঙ্গীত পরিচালনা যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নৃত্যশেষেও দর্শকদের বহুক্ষণ অভিভূত করিয়া রাখে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সরোদ বাজনা এই নৃত্যানুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। অবশ্য খাঁ সাহেবের ন্যায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সরোদীয়ার বাজনা কোন নৃত্য-বাসরের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নয়, তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যাহা শুনাইয়াছেন, তাহার স্পর্শ সহজে মুছিবার নয়।

সর্ব্বসমেত এগারটি নৃত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কার্ত্তিকেয়', 'মোহিনী', 'রাসলীলা', 'বিলাস', 'তাণ্ডব-নৃত্য' এবং 'ইন্দ্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রূপবাণীতে "বামনাবতার"

গত ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার রূপবাণী চিত্রগৃহে রাধা ফিল্মসের ভক্তি-রসপুষ্ট পৌরাণিক চিত্র বামনাবতার মুক্তিলাভ করিয়াছে। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে চিত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য রাধা ফিল্ম কোম্পানীর যথেষ্ট সুনাম আছে এবং উল্লিখিত চিত্রটিতেও সেই যশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অবশ্য পৌরাণিক যুগের

স্বর্গবাসী দেব-দেবী আর মর্ত্তের দুরন্ত বাসিন্দা দৈত্যকুলের অলৌকিক পট-ভূমিতে সৃষ্ট আখ্যানবস্তুর মধ্যে কতখানি সত্য ঘটনা নিহিত রহিয়াছে তাহা বিচার সাপেক্ষ্য নয়—এইখানে একমাত্র ধর্ম্মের যুক্তি-তর্কহীন চিরন্তন বিশ্বাসের অনুশাসনই বড়। তবে বিংশ শতাব্দীর এই প্রগতিশীল জনসমাজে ইহার জন্য কতখানি মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। আলোচ্য চিত্রটি দানব্রতে ব্রতী দৈত্যরাজ বলির নিকট বামনবেশী নারায়ণের ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাওয়া এবং নারায়ণের বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একপদে পৃথিবী এবং অন্যপদে স্বর্গ অবরোধ করিয়া পরিশেষে নাভিমূল হইতে তৃতীয়পদ নির্গত করিয়া উহা রাখিবার স্থান চাহিলে পূর্ব্ব অঙ্গিকার রক্ষার্থে বলির মস্তক পাতিয়া তৃতীয়পদ ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পাতালে গমন প্রভৃতি ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। বামনাবতারের কথা ও কাহিনী রচনায় শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের কৃতিত্ব একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়। পুরাকালের পটভূমির উপর বর্ত্তমান যুগের সামান্য আলোক-সম্পাতের চেষ্টা মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। কিন্তু চিত্রনাট্য রচনায় ও চিত্র পরিচালনায় শ্রীযুক্ত হরিভঞ্জের আর্টিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ের যথেষ্ট অভাব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে নির্ম্মিত পৌরাণিক চিত্রের বাঁধাধরা 'ফরমুলা'ই তিনি তাঁহার অক্ষম হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিত্রটির সমতা-রক্ষা হয় নাই। সেইজন্যই হয়ত এক এক সময় মনের অগোচরেই ভক্তি চাপা পড়িয়া থাকে এবং সম্মুখের চলমান দৃশ্যগুলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পীড়াটাই বড় বলিয়া অনুভূত হয়।

বামনবেশী বালক মুকুল রায় চৌধুরীকে দিয়া এতগুলি গান না গাওয়াইলেই হয়ত ভাল হইত। কারণ কথার দিক দিয়া ও সুরের দিক দিয়া গানগুলি নিতান্তই মামুলি ধরণের। তবে তাহার অভিনয়নৈপুণ্য আলোচ্য চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ। 'মন্দা' চরিত্রটি নিতান্তই অচল এবং উহার বামনের বিদায়ের দৃশ্যে " নিদয় হ'য়ে কাঁদায়ে আমারে যেওনা—" গানটি বিদায় দৃশ্যের করুণ পরিবেশের রস ভঙ্গ করিয়াছে। বলিবেশী শ্রীযুক্ত অহীন চৌধুরীর সুষ্ঠু ও স্বভাবিক অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর 'প্রহ্লাদ', মনোরঞ্জনের 'শুক্রাচার্য্য', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারায়ণ' ভালই। মৃণাল ঘোষের 'নারদের' ভূমিকায় গান ও অভিনয় মন্দ নয়। লক্ষ্মীর ভূমিকায় রেণুকা রায় ও অদিতির ভূমিকায় নিভাননীর অভিনয় চলনসই। মোহিনীবেশী সাবিত্রীর অভিনয় ও বারুণীর অংশে পূর্ণিমার নৃত্য-গীত প্রশংসনীয়। দৃশ্যসজ্জা ও রূপ-সজ্জার কাজ সুন্দর হইয়াছে। যতীন দাসের চিত্রগ্রহণের কাজে তাহার পূর্ব্ব-খ্যাতি নষ্ট হয় নাই। শব্দগ্রহণের কাজ মাঝে মাঝে পাত্র-পাত্রীদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে।

পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, ভাবপ্রবণ বাঙালী নর-নারী আজও এই ধরণের ভক্তিমূলক চিত্র হাসি-কান্নার সহিত উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের এই ধর্ম্মপ্রবণতার সুযোগ লইয়া যেকোন প্রকারে ছবি খাড়া করিবার লোভ পরিচালক সংবরণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই চিত্রটির মধ্যে পরিচালকের সাধনা, সহানুভূতি ও অনুভূতির সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তবে যে সকল ত্রুটির কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখিলে ছবিখানি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারিত এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ নীতি

(২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

জলপথে ইংরেজ ফরাসীকে কাবু করা জার্ম্মানীর পক্ষে কিরূপ সুদুরপরাহত।

সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধে জলযুদ্ধই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এইজন্যই যুদ্ধে ইংরেজের উপর চাপ পড়িয়াছে বেশী। ফরাসীরা স্থলযুদ্ধে ভাল যোদ্ধা এবং তাহার বিপুল সৈন্যদলও সজ্জিত করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সংগ্রামক্ষেত্রে এই শক্তি প্রয়োগের অবসর হয় নাই, হয় ত পরে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই ইংরেজের নৌ-বহরের উপর রীতিমত চাপ পড়িতেছে। শুধু নৌ-বহরের রণতরীগুলিই খাটিতেছে এমন নয়, আনুষঙ্গিক সব তোড়জোড় সমানভাবে খাটাইতে হইতেছে। দিবারাত্র বিশ্রাম নাই। প্রত্যহ জাহাজ-ডুবির খবর কিছু না কিছু আছেই এবং সাধারণের মনে এই প্রশ্ন উঠে যে, কতদিন এইরূপ ব্যাপার চলিবে। সরকারী যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধের এই তিন মাসে ইংরেজ ৫০ হাজার টন রণতরী হারাইয়াছে; কিন্তু ১০ লক্ষ টন তৈয়ারী হইতেছে। ইংরেজের ২ কোটি ১০ লক্ষ টন সওদাগরী জাহাজ আছে। ইহার মধ্যে যুদ্ধে ৩৪০,০০০ টন ক্ষতি হইয়াছে। পক্ষান্তরে জার্ম্মানীর নিকট হইতে ধৃত এবং নুতন তৈয়ারী মাল লইয়া ইংরেজের পক্ষে ইতিমধ্যে সওদাগরী জাহাজ ২৮০,০০০ টন বাড়িয়াছে। এই হিসাবে গড়ে শতকরা ৩ টন হইয়াছে তাহার ক্ষতি।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ-গতি নির্ভর করিতেছে আমেরিকা ও রুষিয়ার উপর। ক্ষুদ্র ফিনল্যান্ড এই সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিবে কি না বলা যায় না। ইহা সুস্পষ্ট যে, ফিনল্যান্ডের প্রতি রুষিয়ার আচরণে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। জে বুস ফিল্ড মার্কিন দেশের একজন জননায়ক। সম্প্রতি তিনি লিখিয়াছেন,—"ক্ষুদ্র ফিনল্যান্ড ব্যতীত, ইউরোপের সকল জাতি আমাদের কাছে যে কথা দিয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। আমরা তাহাদের সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা বিস্মৃত হই নাই, বিস্মৃত হই নাই বিগত মহাসমরে আমাদিগকে যে লোকক্ষয় করিতে হইয়াছিল তাহা।"

ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা টেনিস খেলোয়াড়

ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা টেনিস খেলোয়াড় মিসেস বোল্যাণ্ড সম্প্রতি প্রথম শ্রেণীর টেনিস খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসরও তিনি ভারতের বিশিষ্ট প্রতিযোগিতাসমূহে যোগদান করিয়া সাফল্যলাভ করায় ভারতের টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকায় মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মিসেস বোল্যাণ্ডের সমতুল্য খেলোয়াড় বর্ত্তমানে ভারতে নাই। সুতরাং তাঁহার অভাব ভারতীয় টেনিস মহলে বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। মিসেস বোল্যাণ্ডের পূর্ব্বের নাম ছিল মিস জেনী স্যাণ্ডিসন। এখনও পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র তিনি "জেনী" নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯২৬ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত মিস জেনী স্যাণ্ডিসন ভারতের সকল প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে মিঃ বোল্যাণ্ডের সহিত বিবাহ হইলে সকলেই মনে করিয়াছিলেন জেনী টেনিস খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন; কিন্তু জেনী তাহা করেন নাই। তিনি ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বের অর্জ্জিত গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার স্বাস্থ্যভংগ হইয়াছে বলিয়াই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১৯১০ সালে কলিকাতায় মিসেস বোল্যাণ্ডের জন্ম হয়। শৈশবেই তাঁহার টেনিস খেলার প্রতি বিশেষ প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৫ সালে সর্ব্বপ্রথম তিনি ক্যালকাটা টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯২৬ সালে বেংগল চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেন। ১৯২৭ সালে এলাহাবাদে নিখিল ভারত চ্যাম্পিয়ানসিপ পান। সেই বৎসর বেংগল চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হন। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালেও জেনী পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সকল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। ১৯২৯ সালে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সোসাইটির পরিচালকগণ জেনীর অপূর্ব্ব ক্রীড়া-কৌশল পরিদর্শন করিয়া ইংলণ্ডে জেনীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশন ঐ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন ও জেনীকে ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া অভিহিত করেন। জেনী সেই বৎসর উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন; কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। তাহা হইলেও তিনি এ্যাংগমেরিন অন সি প্রতিযোগিতায় সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হন। বুডলে সল্টারটন প্রতিযোগিতায় সিংগলসে বিজয়ী হন। ক্রানলেতে সিংগলস ও মিক্সড ডাবলসে, সেফিল্ডে সিংগলসে, ওয়াটফোর্ডে সিংগলস ও মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ান হন। ইষ্টবোর্ণে দক্ষিণ ইংলণ্ড টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলসে ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠিতে সক্ষম হন। ১৯৩০ সালে সার্ব্বিণ্টনে সারে টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে মিস বেটী নাথালকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হন। সেই বৎসর ভারতে পদার্পণ করিয়া এলাহাবাদে নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলস ও মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ান হন। বেংগল চ্যাম্পিয়ানসিপে সিংগলসে ও ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ানসিপে সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে জয়লাভ করেন। ১৯৩১ সালে পুনরায় ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ানসিপে তিনটি বিভাগে ও বেংগল চ্যাম্পিয়ানসিপে সিংগলস ও মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হন। ১৯৩২ সালে পুনরায় নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ান হন। কলিকাতার সকল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ১৯৩৩, ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে সিংগলস চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯৩৬ সালে শরীর অসুস্থ থাকায় কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন না। ১৯৩৭ সালে পুনরায় খেলায় যোগদান করেন, ভারতের সকল প্রতিযোগিতায় সিংগলস চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯৩৮ সালে পূর্ব্ব-ভারত, উত্তর-ভারত প্রভৃতি নিখিল ভারত প্রতিযোগিতাসমূহে যোগদান করিয়া নিজের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হন। মিসেস বোল্যাণ্ডের এ্যাথলেটিকস ও হকি খেলাতেও বিশেষ সুনাম

মিসেস বোল্যাণ্ড (মিস জেনী স্যাণ্ডিসন)

ছিল। মহিলা এ্যাথলীট হিসাবে তিনি ১৯২৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন দৌড় ও উচ্চ লম্ফন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। হকি খেলায় তিনি মহিলা খেলোয়াড়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম পাইয়াছিলেন। মিসেস বোল্যাণ্ডের ন্যায় এইরূপ একজন কৃতী খেলোয়াড় ও এ্যাথলীট যে সহজে পাওয়া যাইবে ইহা আমাদের মনে হয় না।

নিম্নে মিসেস বোল্যাণ্ডের ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ানসিপ ও পূর্ব্ব-ভারত প্রতিযোগিতার কয়েক বৎসরের ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

মহিলাদের সিংগলস

১৯২৫ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯২৬ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯২৭ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।

১৯২৮ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯২৯ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯৩০ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯৩১ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯৩৩ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯৩৪ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯৩৫ সালেঃ—মিসেস জে বোল্যাণ্ড।
১৯৩৭ সালেঃ—মিসেস জে বোল্যাণ্ড।
১৯৩৮ সালেঃ—মিসেস জে বোল্যাণ্ড।

মহিলাদের ডাবলস

১৯২৭ সালেঃ—মিস ই স্যাণ্ডিসন ও মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯২৮-৩২ সালঃ—মিসেস সাইমন ও জে স্যাণ্ডিসন।
১৯৩৪ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন ও মিসেস ষ্টর্ক।
১৯৩৭ সালেঃ—মিসেস বোল্যাণ্ড ও মিসেস ই এইচ এডনী।
১৯৩৮ সালেঃ—মিসেস বোল্যাণ্ড ও মিসেস এডনী।

মিক্সড ডাবলস

১৯২৭ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন ও মিঃ এল ব্রুক এডওয়ার্ড্স।
১৯২৮ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন ও মিঃ জি পার্কিন্স।
১৯২৯-৩০ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন ও মিঃ এল ব্রুক এডওয়ার্ড্স।
১৯৩১ সালেঃ—মিকি ও মিস জে স্যাণ্ডিসন।
১৯৩২ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন ও মিঃ ডি হিল।
১৯৩৪ সালেঃ—মিস জে স্যাণ্ডিসন ও মিঃ এন কৃষ্ণস্বামী।
১৯৩৫ সালেঃ—মিসেস বোল্যাণ্ড ও মিঃ এন কৃষ্ণস্বামী।

পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকা

এই বৎসরের পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই আমেরিকার খেলোয়াড় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। এই তালিকা এই বৎসরের উইম্বলডন, ফ্রান্সের ফরেষ্ট হিল ও আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। নিম্নে ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

পুরুষ বিভাগ

(১) আর এল রিগস (আমেরিকা)।
(২) জে ই ব্রমউইচ (অষ্ট্রেলিয়া)।
(৩) এ কে কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া)।
(৪) ডন ম্যাকনীল (আমেরিকা)।
(৫) এফ পুনসেক (যুগোশ্লাভিয়া)।
(৬) ই টি কুক (আমেরিকা)।
(৭) এইচ হেঙ্কেল (জার্ম্মানী)।
(৮) এইচ ডবলিউ অষ্টিন (ইংলণ্ড)।
(৯) ডবলিউ ভ্যানহর্ন (আমেরিকা)
(১০) এফ কুকুলজেভিক (যুগোশ্লাভিয়া)।

মহিলা বিভাগ

(১) মিস এলিস মার্ব্বেল (আমেরিকা)।
(২) মিস কে ষ্ট্যামার্স (ইংলণ্ড)।
(৩) মিস হেলেন জেকবস (আমেরিকা)।
(৪) ফ্রাউ এস স্পার্লিং (ডেনমার্ক)
(৫) ম্যাডাম ম্যাথু (ফ্রান্স)।
(৬) ম্যাডাম জেডজিওয়াস্কা (পোল্যাণ্ড)।
(৭) মিসেস এম ফ্যাবিয়ান (আমেরিকা)।
(৮) মিস আর এম হার্ডউইক (ইংলণ্ড)।
(৯) মিস ভি ই স্কট (ইংলণ্ড)।
(১০) মিস ডি বাণ্ডী (আমেরিকা)।

পুরুষদের ক্রমপর্য্যায় তালিকার চারিজন খেলোয়াড়কে কলিকাতায় খেলিতে দেখা গিয়াছে। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

এইচ ডবলিউ অষ্টিন (১৯৩০)।
এফ কুকুলজেভিক (১৯৩৪)।
এফ পুনসেক (১৯৩৪ ও ১৯৩৯)।
ডন ম্যাকনীল (১৯৩৮)।

টেনিস খেলোয়াড় আর এল রিগস

আমেরিকার তরুণ টেনিস খেলোয়াড় মিঃ আর এল রিগস এইবারের পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের উইম্বলডন, ফ্রান্সের প্রতিযোগিতায় ও ফরেষ্টহিল ও আন্তর্জ্জাতিক ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করার জন্যই রিগস পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করিয়াছেন। রিগসের বয়স বর্ত্তমানে মাত্র ২১ বৎসর। ১৯১৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী লস এঞ্জেলস শহরে রিগসের জন্ম হয়। রিগস শৈশবে খুবই রুগ্ন ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি যে কোন দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া পরিচিত হইবেন ইহা সকলেরই ধারণার অতীত ছিল। ১৯৩৪ সালে আমেরিকার জুনিয়ার প্রতিযোগিতায় রিগস উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান হন। সেই বৎসর তিনি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপ ও নিউপোর্ট কাপ বিজয়ী হন। ১৯৩৬ সালে তিনি আমেরিকার প্রতিনিধিরূপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। ১৯৩৭ সালে তাঁহার ক্রীড়াকৌশল আরও উন্নততর হইল। আমেরিকান চ্যাম্পিয়ানসিপে সেমি-ফাইনালে ফনক্রামের নিকট পরাজিত হইলেন। তবে ঐ খেলা পাঁচ সেট পর্য্যন্ত গড়ায়। ফনক্রামকে বিজয়ী হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ঐ খেলার পরেই তিনি ফনক্রামকে সানফ্রান্সিস্কো প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিলেন। এই সাফল্য রিগসকে পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায় পঞ্চম স্থান দান করিল। রিগসের ক্রীড়াকৌশল যেরূপ উচ্চাঙ্গের তাহাতে অনেকেই আশা করেন রিগস আগামী বৎসরেও নিজ সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবেন।

মিস এলিস মার্ব্বেল

আমেরিকার মহিলা টেনিস খেলোয়াড় মিস এলিস মার্ব্বেল এইবারের পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকায় মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এলিস মার্ব্বেল ১৯১৩ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্লুমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে টেনিস খেলায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯৩২ সালে স্যানফ্রান্সিস্কোতে প্যাসিফিক কোষ্ট প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ান হন। সেই বৎসরই লস এঞ্জেলসে প্যাসিফিক সাউথ ওয়েষ্ট প্রতিযোগিতায় রাণার্স আপ হন। ১৯৩৩ সালে আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া উইম্যান কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্যাসিফিক কোষ্ট চ্যাম্পিয়ানসিপ পুনরায় লাভ করেন। লংউডের প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হন। ১৯৩৪ সালে ইউরোপ ভ্রমণকারী আমেরিকান টেনিস দলে যোগদান করিবার জন্য মিস মার্ব্বেলকে নির্ব্বাচিত করা হয়। সেই বৎসরের পৃথিবীর ক্রমপর্য্যায় তালিকায় মিস মার্ব্বেল দশম স্থান লাভ করেন। হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় মিস মার্ব্বেল ঐ ভ্রমণকারী আমেরিকান দলে যোগদান করিতে পারেন না। ১৯৩৬ সালে পুনরায় মিস মার্ব্বেল প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ফরেষ্টহিলের প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস বিজয়ী হন। সিঙ্গলস ফাইনালে তাঁহার সহিত মিস হেলেন জেকবের খেলা হয়।

সমর-বার্ত্তা

২১শে ডিসেম্বর

হেলসিঙ্কির সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট বিমান বহর হেলসিঙ্কি এবং সমগ্র উপকূলবর্তী শহর সমূহের উপর হানা দেয় এবং অনুমান ৬০টি বোমাবর্ষণ করে। ছয়টি ফিনিশ বিমান সোভিয়েট বিমান বহরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করে। দুইটি সোভিয়েট বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয়। বিমান আক্রমণের ফলে সামান্য কয়েকজন হতাহত হয়।

হেলসিঙ্কির অপর এক খবরে বলা হইয়াছে যে, ফিনিশ সৈন্যেরা দুই ডিভিশন রুশ সৈন্যকে ধ্বংস করিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় বিশ হাজার রুশ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

"এডমিরাল গ্রাফ স্পে"র কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ গত ১৯শে ডিসেম্বর রাত্রিতে রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। বুয়েনোস্ এয়ারেসের জার্মান-দৌত্য বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ দেশের জন্য আত্ম-বলিদান করিয়াছেন এবং জার্মান নৌ-বিভাগের ইতিহাসে গৌরবমণ্ডিত অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

২২শে ডিসেম্বর

মঃ দালাদিয়ের অদ্য চেম্বারে জানান যে, গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের স্থল বাহিনীর ১১৩৬জন, নৌ-বাহিনীর ২৫১ জন এবং বিমান বাহিনীর ৪২ জন সৈনিক হতাহত হইয়াছে। তিনি আরও জানান যে, উত্তর জুরায় সীমান্ত পর্যন্ত দেশ-রক্ষার জন্য দুর্গাদি নির্মাণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, অযথা আক্রমণ চালাইবার এবং সমগ্র রণাঙ্গনে বিচ্ছিন্ন ভাবে হানা দেওয়ার তাঁহারা পক্ষপাতী নহেন।

মস্কোর একটি ইস্তাহারে এই দাবী করা হইয়াছে যে, গতকল্য আকাশ-যুদ্ধের সময় দশখানা ফিনিশ বিমান ভূপাতিত করা হয়।

হেলসিঙ্কির এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্যারেলিয়ান যোজকে রাশিয়ানরা এখনও আক্রমণ চালাইতেছে। বহু রুশ সৈন্য হতাহত হইয়াছে এবং তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আটটি সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে ফিনরা অগ্রসর হইতেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষের বিমান বহরের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২৩শে ডিসেম্বর

উইণ্ডসরের ডিউক পত্নী ফরাসী নারী এম্বুলেন্স বাহিনীতে যোগ দিয়াছেন।

পূর্ব ফ্রান্সে ম্যাজিনো লাইনের নিকটে গতকল্য শত্রুপক্ষের চারিটি বিমানের সহিত তিনটি বৃটিশ বিমানের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ বৈমানিকগণ দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহারা শত্রু-পক্ষের ২টি বিমান ভূপাতিত করিয়াছেন। দুইটি বৃটিশ বিমান ভূপাতিত হইয়াছে; ফলে তিনজন বৈমানিক নিহত হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডে লাল-ফৌজের অভিযান পর্যালোচনা করিয়া মস্কোতে এক বিস্তারিত ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যেরা পেটসামো হইতে ৮০ মাইল, বোথনিয়া উপসাগরস্থিত উলিয়াবর্গ-এর দিকে ১৫ মাইল, সার্ডোবোল-এর দিকে ৫০ মাইল এবং ভিবর্গ-এর দিকে ৪০ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের ২২০০ সৈন্য নিহত ও ১০০০০ সৈন্য আহত হইয়াছে এবং ১৪০০ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ফিনদের ৩৫টি কামান, ৩০০ মেশিনগান ও ৩০০০ রাইফেল সোভিয়েট বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। সোভিয়েটের ১৮২৩ জন সৈন্য নিহত ও ৭০০০ জন সৈন্য আহত হইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর

হের হিটলার পশ্চিম সীমান্তে বড়দিন যাপন করিতেছেন। অদ্য তিনি বিমান-বিধ্বংসী কামানশ্রেণী, রক্ষী-ভবন এবং সার-ব্রুকেনের নানাস্থান পরিদর্শন করেন।

সুইডিস জাহাজ "কার্লহেনকেল" উত্তর সাগরে মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

২৫শে ডিসেম্বর

মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার ৬০তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে হের হিটলার ও হের ফন রিবেনট্রপের অভিনন্দনের উত্তরে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। মঃ ষ্ট্যালিন লিখিয়াছেন, "জার্মান ও সোভিয়েট জনসাধারণের মৈত্রী রক্তের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। এ বন্ধুত্ব স্থায়ী অটল করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।" মঃ ষ্ট্যালিন ফিনল্যাণ্ডের গণ-গবর্ণমেণ্ট ও মার্শাল চিয়াং-কাইসেকের জয় কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

বৃটিশ নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, গত সপ্তাহে দশটি বৃটিশ জাহাজ (মোট ৬৫৮১ টন) এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আটটি জাহাজ (মোট ১০৮৩৯ টন) জলমগ্ন হইয়াছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহামান্য পোপ বড়দিন উপলক্ষে এক বাণী দিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও পোপের নিকট একটি বাণী পাঠাইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মিঃ মিরন টেলরকে ভ্যাটিকানে তাঁহার নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ মিরান টেলর আন্তর্জাতিক আশ্রয়প্রার্থী কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস ষ্টীল কর্পোরেশনের প্রাক্তন সভাপতি।

উত্তর সাগরে জার্মান মাইনের আঘাতে দুইটি সুইডিস জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—

লেনিনগ্রাড সামরিক কর্তৃপক্ষের এক ইস্তাহারে উভয় পক্ষের পর্যবেক্ষণকারী সৈন্য বাহিনীর মধ্যে যে সব সংঘর্ষ হইয়াছে, তাহাতে সোভিয়েটের সাফল্য দাবী করা হইয়াছে। সুওমুসালমি অঞ্চলে রুশ পর্যবেক্ষণকারী বাহিনী ফিনিশদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়াছে এবং তাহাদের সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহ অধিকার করিয়াছে।

ফিনিশ গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কুমলা অঞ্চলে ফিনিশরা দুইদল সোভিয়েট সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।

ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলের অদূরে একখানি জার্মান সাব-মেরিণের আক্রমণে "ষ্ট্যানহোম" (২৪৭৩ টন) নামক বৃটিশ জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে। ফলে ১৪ জনের সলিল সমাধি হইয়াছে।

প্যারিসের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মোজেলের পূর্বদিকে মিত্রশক্তির গুলীবর্ষণে শত্রুপক্ষের দুইটি আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

আমেরিকার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ডি ভ্যালেরা ঘোষণা করেন যে, একটি মীমাংসার জন্য সমর পরিচালকগণের একটা বৈঠক করা উচিত।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর—

বাঙলার গবর্ণর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মিঃ এইচ এস সুরাবর্দিকে অস্থায়ীভাবে অর্থ-সচিবের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ব্যাপার সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং প্রাথমিক, মহকুমা ও জেলা কংগ্রেস কমিটিসমূহের অন্যান্য নির্বাচন সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেনঃ—(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (চেয়ারম্যান), (২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, (৩) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, (৪) ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, (৬) শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, (৭) শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও (৮) শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত। এই কমিটির হস্তে নির্বাচন কেন্দ্রের সীমা নির্ধারণ এবং নির্বাচন কেন্দ্র গঠনের ক্ষমতাও থাকিবে।

ডিগবয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং সালিশী বোর্ডের রিপোর্ট সম্পর্কে আসাম গবর্ণমেণ্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জির সভাপতিত্বে উক্ত তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ডিগবয় ধর্মঘট সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, শ্রমিকদের এমন কোন অভাব-অভিযোগ ছিল না যাহার ফলে তাহাদের ধর্মঘট ঘোষণার কোন কারণ থাকিতে পারে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় আগামী ২৮শে ডিসেম্বর নেপালের মহারাজাকে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইবে, উহার শেষ দিকে **"বন্দে-মাতরম্"** কথাটি যোগ করা হইবে কি না, তাহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডা হয়। বাদ-বিতণ্ডার পর **"বন্দে মাতরম্"** কথাটি বাদ দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২২শে ডিসেম্বর——

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটির মর্ম এইরূপ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য, বিশেষ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য আবেদন করিয়া কংগ্রেস যে মূল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা চাপা দিয়া সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে ভারত-সচিব সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত গণ-পরিষদই সাম্প্রদায়িক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের একমাত্র উপায়।

ইতিপূর্বেই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের অধিকারসমূহ রক্ষা করা হইবে এবং কোন বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে, উহা একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থিত করা হইবে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস কর্মিগণ এক্ষণে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কঠোর কার্য ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ হইবে না। কংগ্রেসের আদর্শ অহিংসা; নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ উহার শেষ পরিণতি—ইহা সত্যাগ্রহের অংশ। সত্যাগ্রহের অর্থ সকলের প্রতি সদিচ্ছা—বিশেষত প্রতিপক্ষের প্রতি। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি আশা করেন যে, সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠনমূলক কার্যতালিকা প্রবলভাবে চালাইয়া নিজদিগকে উপযুক্ত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে যখন আহ্বান আসিবে, তখন তাঁহারা তাহাতে সাড়া দিতে পারিবেন।

'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সকলকে আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে, 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ জে ইউনী তারকেশ্বরের ভূতপূর্ব মোহান্ত সতীশ গিরির মামলার রায় দিয়াছেন। হুগলীর জেলা জজ মিঃ এস সেন কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট লিখিত বলিয়া দুইখানি পত্র জাল করিবার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে সতীশ গিরি এবং অপরাপর সাতজনকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে সতীশ গিরির (৮০ বৎসর) প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অপরাপর সাতজন আসামীর মধ্যে প্রভাত গিরি (সতীশ গিরির চেলা), ও অন্য ছয়জনের প্রত্যেকের প্রতি সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই মামলার রাজসাক্ষী ও সতীশ গিরির ভূতপূর্ব ম্যানেজার বংশীধর ঠাকুর মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কলিকাতায় আগমন করেন।

২৩শে ডিসেম্বর—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক সভার অধিবেশন হয়। আগামী কংগ্রেসে বাঙলা দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য ও এতৎসম্পর্কিত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি করিবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি একটি কমিটি নিয়োগ করায় যে অবস্থা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা উঠে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক সভার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ভূতপূর্ব চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্নী শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে স্বামীর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা একটি ফণ্ড স্থাপিত হইবে এবং তাহার আয় হইতে বৃত্তি দিয়া যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হিন্দু ছাত্রদিগকে উচ্চতর ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হইবে।

শিকারপুরে হিন্দু নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লা বক্স বলেন যে, সিন্ধু-প্রদেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যদি মন্ত্রিমণ্ডল পুনর্গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহা হইলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর আসন পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের হৈমন্তিক অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর

প্রবীণ সংবাদপত্র সেবী "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার ভূতপূর্ব সহযোগী সম্পাদক প্রিয়নাথ গুহ (পি এন গুহ) কলিকাতায় স্বীয় বাস-ভবনে মারা গিয়াছেন।

২৫শে ডিসেম্বর—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ ভারতীয় খৃষ্টানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ দফায় ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহা লইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট চারি লক্ষ টাকা দান করিলেন।

হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে। নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত বীর সাভারকর বোম্বাই হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

অখিল ভারত হিন্দু যুব-সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ভাই পরমানন্দ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

৭ম বর্ষ ৷ শনিবার, ৭ই পৌষ ১৩৪৬ Saturday, 23rd December 1939 ৷ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অর্থসচিবের পদত্যাগ—

বাঙলার অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করিয়াছেন। এই ব্যাপার আমরা এমন কিছু চাঞ্চল্যকর কিংবা অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে করি না। ইতি-পূর্ব্বেও দেশের স্বার্থের দিক হইতে মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে মতের বিরোধ ঘটাতে মৌলবী নৌশের আলী এবং পরে মৌলবী সামসুদ্দীন আহম্মদ পদত্যাগ করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যেরূপ দেশের স্বার্থের প্রতিকূল সাম্প্রদায়িকতা-প্রভাবিত নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা যেভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন বিদেশী স্বার্থবাহদের আনুকূল্যের প্রত্যাশা পরায়ণতায়, তাহাতে দেশের স্বার্থের দিক হইতে বিবেক-বুদ্ধিকে অক্ষত রাখিতে গেলে এক নাগারে বেশী দিন এমন মন্ত্রিসভায় থাকা শুধু স্বার্থের আকর্ষণে ছাড়া অন্যভাবে সুকঠিনই হইয়া পড়ে। নলিনীবাবুর সঙ্গে মতভেদ আজ নূতন হয় নাই। সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল এবং মহাজন কারবার নিয়ন্ত্রণ বিলে নলিনীরঞ্জন প্রধান মন্ত্রীর মত সমর্থন করিতে পারেন নাই। দেশের স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনার জন্য ঐসব ক্ষেত্রে নলিনীরঞ্জনের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর মত-ভেদ ঘটিয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলে বলিতে হয় যে, ইহার অনেক পূর্ব্বেই নলিনীবাবুর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কারণ বিবেককে অক্ষত রাখিতে হইলে বিবেকের বিরুদ্ধে যে কার্য্য হয়, তাহার সংস্রব এবং তৎসংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব বর্জ্জনই করিতে হয়। শুধু বাধা দেওয়াতে কিংবা মতপার্থক্য ব্যক্ত করাতেই বাস্তব অনিষ্টকারিতার দায়িত্ব এড়ান যায় না। বিবেকের সঙ্গে একটা গোঁজামিল দেওয়া হয় মাত্র; কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-মর্য্যাদা এমন গোঁজামিলকে স্বীকার করে না। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলে অন্যান্য যে কয়েকজন হিন্দু মন্ত্রী আছেন, তাঁহাদের কথা আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করি না; কারণ কলের-পুতুল হিসাবে তাঁহারা আগাগোড়া কর্ত্তাদের সায়েই সায় যোগাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু নলিনীবাবু সর্ব্বত্র তাহা করেন নাই, হিন্দু মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই মতভেদকে বিবেকানুমোদিত কার্য্যক্রমে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই মনুষ্যত্ব। দেশের লোক অনেক আগেই সে মনুষ্যত্ব-মর্য্যাদার প্রত্যাশা তাঁহার নিকট হইতে করিয়াছিল। যাহা হউক, এতদিন পরেও তিনি যে সুখী মন্ত্রী-পরিবারের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, ইহাও সুখের বিষয় বলিতে হইবে।

বড়লাটের বক্তৃতা—

গত সোমবার বড়লাট কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স নামক বণিক-সভায় বার্ষিকী বক্তৃতা দিয়াছেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, বড়লাট এই বক্তৃতায় হয়ত নূতন কথা কিছু বলিবেন। কিন্তু বড়লাট নূতন কথা ত কিছুই বলেন নাই, পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি কথা অনেকটা অবান্তরভাবে বলিয়াছেন, যেগুলি এ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে তাঁহার পক্ষে না বলাই ভাল ছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু যে আদর্শের জন্য

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন, তিনি তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। জিন্না সাহেব কংগ্রেসী মন্ত্রি-মণ্ডলের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহাতে শুধু কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকেই জড়িত করা হইয়াছে এমন নয়; সেই সেই প্রদেশের গবর্ণরদিগকেও দোষী করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর 'কল্পনাতীত' অত্যাচার করিলেও লাটসাহেবেরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া-ছেন। এমন কি বড়লাটের কাছে এ সম্বন্ধে আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই। অনেকে মনে করিতেছিলেন, গবর্ণর-দিগকে সমর্থন করিবার জন্য বড়লাট এ সম্বন্ধে এই বক্তৃতায় কিছু বলিবেন; সেজন্য তাঁহার কাছে আবেদন-নিবেদনও কম করা হয় নাই। কিন্তু বড়লাট সে বিষয়ও একেবারে এড়াইয়া গিয়া সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিতে সুস্পষ্টভাবে যাঁহাদের নীতি প্রভাবিত, প্রশংসা করিয়াছেন সেই বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলকে এবং তৎসহ পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডলকে। সুতরাং তিনি জিন্না সাহেবের অপ্রমাণিত অভিযোগের খণ্ডন ত করিতে চেষ্টা করেনই নাই, বরং লীগপন্থী প্রভাবিত বাঙলা ও পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডলের সাফাই গাহিয়া জিন্না সাহেবের অনুকূলতাই করিয়াছেন। ভারতসচিব পর্য্যন্ত জিন্না সাহেবের মুক্তিদিবসের অনিষ্ট-কারিতার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বড়লাট সে সম্বন্ধে নীরব। তিনি 'মুক্তি দিবসের' প্রতিকূল মতের কোন কথা ত বলেনই নাই, অধিকন্তু বাঙলার যে সব মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে জিন্নার প্রস্তাবিত মুক্তি দিবস প্রতিপালনের যৌক্তিকতার উপর জোর দিতেছেন, তাঁহাদেরই জয়গান করিয়াছেন। আসামের সাদুল্লা মন্ত্রিসভা এখনও জনমতানুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। বড়লাট সাহেব একান্ত আবেগভরে মোসলেম লীগের মাতব্বরদের পরিকল্পিত, সুস্পষ্টভাবে জনমত-বিরোধী সেই মন্ত্রিসভাকেও সার্টিফিকেট দিয়া ছাড়িয়াছেন। বড়লাট ঐক্যের জন্য তাঁহার ব্যগ্রতার কথা শুনাইয়াছেন; কিন্তু জাতীয়তামূলক যে কার্য্য-পদ্ধতিতে ঐক্য সত্য হইতে পারে, সে দিকে না গিয়া সকল সম্প্রদায়ের ষোল আনা মতের ঐক্য না হইলে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান ইংরেজের পক্ষে করা সম্ভব হইবে না, এই সাবেক কথাই ভিন্ন রকমে শুনাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, লীগওয়ালার দলই ইহাতে আশ্বস্ত হইবে এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী যাঁহারা, তাঁহারা বড়লাটের বক্তৃতায় আশার আভাস কিছুই লাভ করিবেন না। বড়লাটের এই বক্তৃতার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিক দূরদর্শিতার অভাবই আর এক দফা স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

হক সাহেবের অভিযোগ –

অনবরত মিথ্যাকে ধরিয়া থাকিতে হইবে, মিথ্যাকে খণ্ডন করিবার পথ কৌশলে এড়াইয়া চাপ দিতে হইবে মিথ্যার উপরই, মিঃ জিন্নার নীতির বিশিষ্টতা হইল ইহাই। তাঁহার ধারণা হইল এই যে, মিথ্যাকে যদি এইভাবে অনবরত খাড়া করিয়া রাখা যায়, তবে মিথ্যাও অন্ধতার স্তরে কাজ করিবার মত সত্যের শক্তি লাভ করে। এই কৌশল অবলম্বন করিয়াই জিন্না সাহেব চলিতেছেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁহার মন-গড়া সত্য বলিয়া অপ্রমাণিত অভিযোগ-সমূহকে খণ্ডন করিবার জন্য যখনই তাঁহার নিকট অগ্রসর হওয়া যায়, তিনি কাজের পথ এড়াইয়া যান, সরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেইসব অসত্যের উপরই কৌশল করিয়া জোর দিতে থাকেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জিন্না সাহেবের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যেই কাজের পথ ধরিতে গেলেন, জিন্না সাহেব দেখিলেন মুস্কিল, অমনই তিনি কাজের পথ এড়াইয়া গেলেন। এমন চাল চালিলেন, যাহাতে আলোচনা না হয়, অথচ মিথ্যার ঢাক পিটাইয়া নিজের ব্যবসা বজায় থাকে। পণ্ডিত জওহরলালজীর সহিত মীমাংসার আলোচনা আরম্ভ হইবার মুখে তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পতনে 'মুক্তি-দিবস' ঘোষণা করিলেন। এমন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা চালান আত্মসম্মানজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অসম্ভব হইল। যিনি বিচার বুঝিবেন না, যুক্তি বুঝিবেন না—অপ্রমাণিত কতকগুলি অভিযোগই যাহার সম্বল এবং ব্যবসা হইল এইভাবে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে উস্কান, তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া লাভ কি? এই যে জিন্নাই চাল, এই চালের জুড়ি দাঁড়াইয়াছেন আর একজন। তিনি হইলেন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক। হক-সাহেব জিন্নাই জিগীরে যোগ দিয়া কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট-সমূহের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের যে-সব অভিযোগ করিয়াছিলেন, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই হক-অভিযোগের সম্বন্ধে তদন্ত করিতে স্বয়ং জওহরলাল নেহরু দাঁড়াইলেন। হকসাহেব প্রথমে সুর ধরিলেন যে, তিনি নেহরুজীর সঙ্গে যোগ দিবেন এবং হাতে-নাতে ধরাইয়া দিবেন, কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের এমন সব অনাচারকে, পণ্ডিতজীর পক্ষে যাহা স্বপ্নেরও অগোচর। হকসাহেব যখন উক্ত মর্ম্মে বিবৃতি বাহির করেন, তখনই আমরা মোল্লার দৌড় কতদূর পর্যন্ত জানিতাম। জানিতাম যে ঐ কথাই সার; হকসাহেব কাজের কাছেও ঘেঁসিতেছেন না। ইহার পর জিন্নার সুর ঘুরিয়া গেল—জিন্নাসাহেব মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নূতন চাল দিলেন, হাঁকিলেন চাই রয়াল কমিশন। তিনি জানেন, রয়াল কমিশন একটা বড় ব্যাপার। সহজে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না; অথচ রয়াল কমিশনের ধুয়া তুলিয়া মিথ্যা অভিযোগগুলিকে জিয়াইয়া রাখা যাইবে। মিথ্যার উপর চাপ দিয়া বাড়িবে তাহার পসার। জিন্না-সাহেবের দেখা-দেখি তাঁহার সমপন্থী হক-সাহেবের এতকালের সঙ্কল্পও ঘুরিয়া গেল সুবিধা রকমে। তিনি বিবৃতি জারী করিলেন, জওহরলালজীর কাছে তিনি যে প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন, তিনি সে প্রস্তাব লইয়া আর অগ্রসর হইবেন না। তিনি যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি জিন্না সাহেবের প্রস্তাবিত রয়াল কমিশনের নিকট উপস্থিত করিবেন। আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। উদ্দেশ্য হইল আপাতত বিচারকে এড়াইয়া এক-তরফা

অভিযোগের উপর চাপ দেওয়া এবং সেই কৌশলে সাম্প্রদায়িকতার ভাব ফুটাইয়া রাখা। জিন্নাই কূটনীতির এই পরিপূর্তি দেখিতে পাইতেছি হক-সাহেব সম্প্রতি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে সকল ফিরিস্তি বাহির করিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া। বলা বাহুল্য, হক-সাহেবের যত অভিযোগ সবই এক তরফা। সেগুলির সত্যতার প্রমাণ কিছুই নাই; কিন্তু সত্য প্রমাণিত হইবার পথকে সুকৌশলে এড়াইয়া এক তরফা অভিযোগের অনিষ্টকর আবহাওয়ার মধ্যেই জিন্না-সাহেবের নীতির মূলতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এ নীতির মধ্যে সাধ্য এবং সাধনা হইল জাতির সংহতিকে শিথিল করা এবং তৃতীয়পক্ষের অভিভাবকত্বকে পাকে-প্রকারে পোক্ত করা। এ নীতির অন্তর্নিহিত ইতরতা আত্মমর্য্যাদাবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে।

রবীন্দ্রনাথ ও নারী—

"এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার শেষ মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইয়াছি যে, নারী—সমাজের শক্তি ও দৃঢ়তা—এই দেশে নব-জীবন সঞ্চার করিয়াছে"—মেদিনীপুরে নারী-সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যেমন চমকপ্রদ, তেমনি সত্য। নারীজাতির উপরে এই শ্রদ্ধা যেমন গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য, তেমনি রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ নূতন ভারতবর্ষ সৃষ্টির কাজে নারীর কাছ হইতে যেমন অনেক কিছু আশা করিয়া থাকেন, তেমনি গান্ধীজীও। আমরাও মনে করি, পুরুষের তৈরী এই মানব-সভ্যতা বোমা এবং রিভলভারের পথ অনুসরণ করিতে গিয়া আপনাকে একেবারে দেউলিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাকে নব-জীবনের মধ্যে রূপান্তরিত করিতে পারে দরদী হৃদয়ের সরস স্পর্শ, আর এই দরদী হৃদয়ের অধিকারিণী হইতেছে মাতৃজাতি। আরও এক কারণে মানব-সভ্যতার রূপান্তর নারীর উপরে নির্ভর করিতেছে। মেয়েদের মন পাইবার ইচ্ছা পুরুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল। নারীকে খুশী করিবার জন্য পুরুষ অনেক কিছু করিতে পারে। মেয়েরা যদি পুরুষের নিকট হইতে মানবোচিত গুণগুলি দাবী করে, সে দাবী পুরুষের না মিটাইয়া উপায় নাই। তাই পুরুষের নিকট হইতে নারী যাহা দাবী করিবে, তাহার উপরে মানব-সভ্যতার রূপান্তর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত—

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি কর্ম্মী। শান্তি-নিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া তিনি জাতির গঠনমূলক কর্ম্ম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশপ্রেমিক কর্ম্মী হিসাবে কবিগুরু সেদিন কলিকাতার কমার্সিয়াল মিউজিয়ম হলে খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার আন্তরিকতা প্রাণকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"য়ুরোপে বিগত মহাসমরের যখন অবসান হোলো তখন বিজিত জার্ম্মানদের যথোচিত আহারের অপ্রতুলতা নিয়ে মানব-হিতৈষী নেভিলসন যে আক্ষেপ করেছিলেন অবিকল সেই আক্ষেপই যে আমাদের হ'য়ে আর কেউ করে না, এমনকি আমরা নিজেরাও করি না, তার কারণ জগতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূল্য অকিঞ্চিৎকর।"

অধীন জাতির জগতে কোন মর্য্যাদা নাই। সে বেদনা তো আছেই। সে বেদনা কবির মর্ম্মদেশ মন্থন করিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"স্বদেশের শাসন-চালনার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়াতে আমাদের যে দুর্গতি তারি বেদনায় আমাদের মন সর্ব্বাপেক্ষা পীড়িত।"

"য়ুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা কাজে শৈথিল্য করে, তাদের কেবলই পাহারা এবং শাসনের উপর রাখতে হয়। বংশানুক্রমে প্রভুদের নিজেদের দেহ সহজেই পুষ্ট বলে একথা তারা মনে করতে পারে না যে, এ দেশের কর্ত্তব্য এড়াবার ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতই শরীর পোষণের অভাব হতে।"

নিজেদের দেশের লোকের বেলায় কর্ত্তাদের যে জ্ঞান অতিমাত্র টনটনে, আমাদের উপর উপদেশ ঝাড়িবার বেলায় তাহাদের সে জ্ঞান মনের অবচেতন স্তরে আরাম উপভোগ করে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। নিজেদের দেশের লোকের উপর যে টান তাঁহাদের আছে, শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে অপরের বেলায় তাহা কার্যরূপে ধরিবার আন্তরিক প্রেরণা পায় না। সেদিক হইতে দুঃখ তো আছেই, কিন্তু বড় দুঃখ হইল এই যে, বিদেশীর কাছে আমাদের এই যে অমর্য্যাদা, সেই অমর্যাদা আমাদের আত্মপ্রত্যয়কে পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব সমষ্টি-স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করিয়া আমাদের ব্যক্তি-জীবনকেও অনিবার্য্য মৃত্যুর দিকে আগাইয়া লইতেছে। জাতির স্বার্থ আমরা বুঝি না, এইজন্য নিজের স্বার্থও হারাই। নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারি। তামসিকতাজনিত এই দুর্ব্বুদ্ধি। এ দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইতে পারে শুধু স্বদেশ-প্রেম এবং স্বজাতি-স্বার্থানুভূতি প্রসারে। সে বেদনার আগুন অন্তরে যেদিন জ্বলিবে পরাধীনতার বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন হইতে দেরী লাগিবে না। আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া প্রাণ-কীটের পোষণ করিতে চাই, ফলে পোকা মাকড়ের মত মরি।

শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা—

শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমরা কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারি না। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, প্রাথমিক স্কুলের অভাবে বাঙলার যে-সব অঞ্চলে হিন্দু ছাত্রেরা মক্তবে পড়িতে বাধ্য হইতেছে, পরিষদের অভিমত এই যে, সেই সব অঞ্চলে অবিলম্বে সাধারণ বা

অসাম্প্রদায়িক প্রাথমিক স্কুল খোলা হউক। ডাক্তার শ্যামা-প্রসাদ মুখুজ্যে মহাশয় এই প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন—"আমার মতে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রেরাই এক সঙ্গে পড়িতে পারে এইরূপ স্কুলের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ভাল হয়।" আমরাও তাঁহার উক্তি সমর্থন করিয়া বলি, সাম্প্রদায়িকতার ভাব কোন অঞ্চলের বিদ্যালয়েই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। মক্তব নামে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু মক্তবের শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়া—এইখানেই আমাদের আপত্তি। সর্ব্বজনীন নীতি বা আদর্শের পরিবর্ত্তে বিশেষ সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানকে বড় করিতে গেলে ইহা এড়ান যাইবে না এবং তেমন শিক্ষা কি হিন্দু, কি মুসলমান, সার্ব্বভৌম উদার আদর্শকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম অপরিণত-বয়স্ক কোন সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদের পক্ষেই কল্যাণকর হইতে পারে না। এই বিবেচনা করিয়াই শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মত সমর্থন করিয়াই আমরা বলিব—মক্তবের বহু পাঠ্য পুস্তক আমরা দেখিয়াছি। এই সব পাঠ্য পুস্তক হিন্দু বা মুসলমান কোন শ্রেণীর ছাত্রদেরই পড়া উচিত নহে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার বাতিক অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। ইহার ফলে ধর্ম্মের প্রসারের পরিবর্ত্তে অন্ধতা, গোঁড়ামী এবং প্রকৃতপক্ষে অধর্ম্মই প্রশ্রয় পাইতেছে।

স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার কুফল

ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—প্রাচীন মধ্যযুগ অথবা বর্ত্তমান কালের প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন সভ্যতার ইতিহাস রচনায় ভারতীয় কোন ঐতিহাসিকের উল্লেখযোগ্য কোন দান নাই। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর প্রায় সমুদয় উন্নত দেশের ঐতিহাসিকগণই ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপারে প্রচুর আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার কুফল আমরা অতীতে যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি। আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ মানব-সভ্যতার ধারার সহিত যোগাযোগ না রাখিলে ভবিষ্যতে আরও গুরুতর ফলভোগ করিতে হইবে।" ডাক্তার মজুমদার তাঁহার যুক্তি সমর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ আরব ঐতিহাসিক আল-বেরুণীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল-বেরুণী একস্থানে লিখিয়াছেন—'ভারতবাসীরা নিজেদের দেশ এবং নিজেদের জাতি ছাড়া অন্য সব দেশের লোককে ঘৃণা করে। কাহারও সঙ্গে মিশিতে চায় না।' আল-বেরুণী যে যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, সে যুগে শুধু ভারতবাসীদের মধ্যে যে ঐ দোষ ছিল এমন নয়, সব দেশের লোকদের মধ্যেই ঐ ভাব বিদ্যমান ছিল। সব দেশের লোকেরাই নিজেদের দেশের চৌহদ্দীর বাহিরের লোককে বর্ব্বর বলিয়া মনে করিত। কিন্তু জগতের সে অবস্থা এখন আর নাই। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমিয়াছে, নানা কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক নিবিড় হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব-সভ্যতার ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া এই যে প্রাণক্রিয়া, পরাধীন বলিয়া ভারতবর্ষ তাহার সঞ্জীবন-শক্তি হইতে বঞ্চিত আছে। বিশ্বের প্রাণধর্ম্মের সঙ্গে ভারতের কর্ম্মশক্তির যোগ ঘটিতেছে না, আড়াল করিয়া রহিয়াছে বিদেশীর প্রভুত্বের বেড়া। ভারতবর্ষ যদি পরাধীন না হইত, তাহা হইলে বিশ্ব-সভ্যতার প্রত্যক্ষ সম্পর্কে শক্তিতে জাগিয়া উঠিত। সভ্যদেশ যে ধারায় ভাবিতেছে, ভাবিত সেও সেই ধারায়। ডাক্তার মজুমদার যাহাকে ভারতের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলিয়াছেন, সে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ভারতের প্রকৃত অন্তরায় হইয়া যে আজও আছে, আমরা এমত মনে করি না। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার মধ্যে প্রাণশক্তি তবু একটা আছে, কিন্তু পরাধীন ভারত একেবারে প্রাণহীন, তামসিকতার স্তরে অভিভূত, অবসন্ন। সে রহিয়াছে পরের ঘুম পাড়াইবার গানে প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার মধ্যে পড়িয়া। সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আগে আবশ্যক ভারতের স্বাধীনতা এবং সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইলে বাহিরের কথার অপেক্ষা ঘরের কথার আলোচনার দরকার অধিক। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিস্বরূপে মিঃ আজিজুল হক সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের আলোচনার মত প্রয়োজন আর কিছুরই নাই। ভারত কি দিয়াছে, আমাদের নিজের এবং জগতের সম্মুখে তাহা দেখাইতে হইবে এবং বংশপরম্পরায় আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রাণে প্রেরণা জাগাইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, মানব-জাতির মৌলিক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রসারলাভ করিলে আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মন হইতে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব দূর হইবে।" স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার নামে ঐতিহাসিকেরা ঘরের সমস্যার এই আত্যন্তিকতাকে উপেক্ষা করিয়া শুধু বাহিরের বিচারকে যদি বড় বুঝেন, তবে বাহিরের জন্য তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে যেমন কোন বড় কাজ করিতে পারিবেন না, তেমনই ঘরের অজ্ঞানতাও পরকীয়-প্রভাবে পুঞ্জীভূত হইবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্ত দৌত্য

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়া বলেন,—

"সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যাহাতে মাথা চাড়িয়া থাকে, ইহা দেখা যাইতেছে মিঃ জিন্নার মতলব। তথাকথিত 'মুক্তি-দিবস' প্রতিপালনের জন্য তিনি যে জিদ ধরিয়াছেন, বর্ত্তমান বিরোধ-বিদ্বেষকে বৃদ্ধি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা সুস্পষ্ট— ইহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা আকার ধারিয়া উঠাও আশ্চর্য্য নয়।"

সর্দার প্যাটেলের এই বিবৃতি প্রচারের কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীও এমন কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু হিন্দু নেতারাই নহেন, ভারতের সমস্ত প্রদেশের মুসলমান নেতারাই তীব্র ভাষায় মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের মুসলমান সমাজের একজন সর্ব্বজনমান্য নেতা। তিনি বলেন,— "মুসলমান হিসাবে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার পক্ষে এইরূপ অবমাননাকর প্রস্তাব বরদাস্ত করা সম্ভব নহে। আমি এই কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ভারতবর্ষের ৮ কোটি মুসলমান এমনই অসহায় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, ৮টি প্রদেশের মন্ত্রিসভা ২॥ বৎসর ধরিয়া তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ, সংস্কৃতি বিনাশ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ পদদলিত করা সত্ত্বেও তাহারা কেবলমাত্র শান্তভাবে 'মুক্তি-দিবসের' প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ইহা দ্বারা অমৃতের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে হলাহল দেওয়া হইয়াছে।"

মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার মত কংগ্রেস-ঘেঁষা হওয়া অস্বাভাবিক নয়,— এমন যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের ধারণা দূর করিবার জন্য এমন অনেক মুসলমান নেতার অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাঁহারা কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, বরং যাঁহারা কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থার অনেক ক্ষেত্রে কার্য্যত বিরুদ্ধতাই করিয়াছেন। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গবর্ণর স্যার মহম্মদ ওসমানের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভবে উল্লেখযোগ্য। জিন্না সাহেবের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"মিঃ জিন্নার সর্ব্বশেষ কার্য্য যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই অভাবনীয়। ইহা একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। ভারতের দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের প্রীতির সম্বন্ধ কেবল সাময়িকভাবে নহে, চিরতরে অশান্তিপূর্ণ করাই যে ঐ প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

লাহোরের অধ্যাপক আব্দুল মজিদ খাঁ আগাগোড়া কংগ্রেসের সমর্থক নহেন। তিনি স্পষ্টবাদী লোক। মিঃ জিন্নার বিবৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"মিঃ জিন্নার সর্ব্ব-শেষ ববৃতি হইতে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ী করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত। গণ-পরিষদ আহ্বান প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে তিনি যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি ডায়ার সাহেবকেও পরাস্ত করিয়াছেন।"

বিহারে ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সচিব ডাঃ সৈয়দ মামুদ বলেন,—"এই সমস্ত বিবৃতি দ্বারা ঘৃণার মন্ত্র প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের ভাব আরও বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ বিরোধ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ঘোরতর অনিষ্টকর।"

সিন্ধু প্রদেশের জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা একটি বিবৃতিতে জিন্না সাহেবের বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—"গণতন্ত্র ও সাম্যই ইসলামের শিক্ষা, কিন্তু মিঃ জিন্না মুসলমানদিগকে পুনরায় আমলাতন্ত্রের অধীন হইতে এবং জনসাধারণের নির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্টসমূহের পদত্যাগে 'মুক্তি-দিবস' প্রতিপালন করিতে বলিয়াছেন, কোন প্রকৃত মুসলমানই এই প্রকার দাস-মনোভাব সমর্থন করিবেন না।"

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য খাঁ আবদুল কোয়ায়েম খাঁ অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতাই করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেন,—"মিঃ জিন্নার বিবৃতিতে মুসলমানদিগকে তাহাদের নূতন প্রভুদের নিকট নতজানু হইয়া কংগ্রেস-শাসনে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতীকার প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এইরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে পারে, এমন কি ইহা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইঙ্গিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে, বাঙলাদেশের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অপর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিই মিঃ জিন্নার প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর এই জিন্না-প্রীতির মূল কারণ কোথায়, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। যাহাদের ভোটের জোরে বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলী টিকিয়া আছেন, তাহাদের অনেকেই হয় সাম্প্রদায়িক হীনস্বার্থের সেবক নতুবা বৃটিশ সাম্রাজ্যসেবীদের অনুগত বা ভারতের স্বার্থ-শোষণ নীতির সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট।

আমাদের তথাকথিত 'ভারত বন্ধু' ওরফে 'ষ্টেটসম্যান' সম্প্রতি জিন্না সাহেবের জবর অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ বোম্বাইয়ের 'টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া' পত্র শ্বেতাঙ্গ দলের দ্বারা পরিচালিত হইলেও মিঃ জিন্নার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'ভারত বন্ধু'র সুর ঘুরিবার কারণ অবশ্য আমরা না বুঝি এমন নহে ;—পিছন হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের কলকাঠি ঘুরিতেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার ধুয়া ধরিয়া আজ যাহারা জিন্না-জিগীরে সায় যোগাইতেছেন, তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই টানে পড়িয়া চলিতেছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থই তাহাদের চেষ্টার পশ্চাতে থাকিতে পারে না ; কারণ, ভারতের আসন্ন স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন ও পন্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ—বিরোধ যাহাতে বাড়ে, এমন কোন উদ্যম কোন সুস্থচিত্ত ব্যক্তির সমর্থন লাভ করিতে পারে না এবং মিঃ জিন্নার প্রস্তাব এই

ভেদ-বিরোধকেই কার্য্যত বাড়াইয়া দিবে; আইনগত পারিভাষিক কূট ব্যাখ্যার সাহায্যে সে প্রস্তাবের কার্য্যকর প্রভাবের দিকটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

যে দুই একজন জিন্না সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, জিন্নার প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ব্যাপ্তার্থ এই বিষময় প্রক্রিয়া যে তাঁহাদের অনুভূতির অগম্য, এমন কথা বলিলে মানুষের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকেই অস্বীকার করা হয়। তাঁহারা বুঝেন সকলই-; কিন্তু বুঝিয়াও ইহার সমর্থন করেন। অজ্ঞানকৃত পাপের চেয়ে এই জ্ঞানকৃত পাপীদের অনিষ্টকারিতা হইল আরও সাংঘাতিক। দেশের স্বাধীনতাকে বিকাইয়া দিয়া থাকে ইহারাই।

এই পক্ষের যুক্তি বড় অদ্ভুত। যুক্তি এই যে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টসমূহ ত হিন্দু গবর্ণমেণ্ট ছিল না; সুতরাং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগে জয়োল্লাস করিলে, অথবা এ পক্ষের উৎকট আধ্যাত্মিক আখর দিয়া ঈশ্বরের কাছে সুদীন অন্তরে আঁখির জল ফেলিলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িবার কি কারণ থাকিতে পারে। তাঁহাদের এই কথার উত্তর আছে দুইটি ; কারণ বিষয়টির দুইটি দিক রহিয়াছে।

প্রথম কথা এই যে, মিঃ জিন্না এবং তাঁহার অনুগত দল কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টসমূহকে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট হিসাবে কোনদিন দেখেন নাই। তাঁহারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্ত্তৃক পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া ক্রমাগতভাবে নির্লজ্জ মিথ্যার সাহায্যে সেই সব গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুসলমানদের চিত্ত বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'জাতীয় পতাকা', 'বন্দে মাতরম্', হিন্দী শিক্ষার প্রচলন—এমন কতকগুলি অছিলা তাঁহারা খাড়া করিয়াছেন ; কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা মুসলমানদের উপর কোন রকম অবিচার হইয়াছে, এমন প্রমাণ তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কার্য্যত উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের এই পদত্যাগজনিত আনন্দ প্রকাশের ভিতর দিয়া জিন্না সাহেবের অনুগত দলের অন্তরে হিন্দুবিদ্বেষই প্রশ্রয় পাইবে ; প্রেম বা মৈত্রী বাড়িতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থা সেরূপ নাই। দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জগতের আন্তর্জাতিক অবস্থার অনুকূলতা প্রভৃতি অনেক কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে। কংগ্রেসের সাধনা সত্যকার শক্তি এদিকে যে দিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের হাতে স্বাধীনতা ছিল এমন কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু বাহ্যত সে সব গবর্ণমেণ্ট জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। দেশের লোকের কর্ত্তৃত্ব-সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টের স্থলে বিদেশীর ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব সমর্থিত শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জিন্নাই-জিগীর যদি উঠে, তবে ভারতের স্বাধীনতার প্রেরণা যাহারা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। মিঃ জিন্নার দলের জোর নাই, ইহা আমরা জানি। তিনি তাঁহার দলের জোরে অথবা তাঁহার নীতির প্রভাবে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে টলাইয়া যদি দেশের লোকের কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার যুক্তির মূল্য কিছু থাকিত। কিন্তু তিনি জয়োল্লাস ছড়াইতেছেন বিদেশীর মাতব্বরীয় মহিমা-মুখে। তাৎপর্য্য ইহার এই যে, মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারকারী বলিয়া তিনি যে সব গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন, তাঁহারা মুসলমানদের এমনই শত্রু যে, তাহাদের চেয়ে বিদেশীর পদলেহন করাও মুসলমানদের পক্ষে পরম প্রীতিকর বস্তু। একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, শুধু মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়াই জিন্না সাহেবের আবেদন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের ভাগ্য লইয়া কূট খেলা চলিতেছে। তাঁহারা চাহেন ভারতের ভেদনীতি বজায় রাখিতে। ভারতে এ পর্য্যন্ত যত নীতি তাঁহাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ঐ একই উদ্দেশ্যের অভিমুখে তাহা কার্য্য করিয়াছে। ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সেদিন কমন্স সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"যতদিন আইনসভাগুলি রাজনৈতিক দল-ভেদে না হইয়া সম্প্রদায়-ভেদে বিভক্ত থাকিবে, ততদিন সাফল্যের সহিত গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার পক্ষে গুরুতর বাধা দেখা দিবে।"

ভারত-সচিবের এই কথার উত্তর কি দিব? নিবেদন শুধু এইটুকু যে, আইনসভাগুলিতে এই যে সাম্প্রদায়িক ভেদের নাচ চলিতেছে, এই নটের গুরু কাহারা? সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন আগাগোড়া বৃটিশ রাজনীতিকেরাই এবং সে নীতির এখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার ধুয়ায় জাতীয়তার বিরোধী পথে এখনও ভারতকে ঠেলিয়া লইবার ক্রমাগত চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ভারতবাসীরা এখন সেয়ানা হইয়াছে, জিন্না সাহেবের অনিষ্টকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভই সে পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

চলতি ভারত

মাদ্রাজ

জিন্নার পাগলামি

মাদ্রাজের পূর্ব্বতন অস্থায়ী গবর্ণর স্যার মহম্মদ উসমান লিখেছেন,—"জিন্নার আচরণ আমাকে অতিশয় নিরাশ করেছে। এই আচরণের দ্বারা যে সকল মুসলমান কংগ্রেসের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন, তাঁদের যেমন নিন্দা করা হয়েছে একদিকে, তেমনি আর একদিকে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের উপরেও কটাক্ষপাত কম হয় নি।" তিনি জনাব জিন্নাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কদর্য্যতা থেকে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ জানিয়েছেন। শ্রীযুত সফী মহম্মদ, মাদ্রাজের সৈয়দ জালালুদ্দিন প্রমুখ মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দও জিন্নার আচরণকে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। সৈয়দ জালালুদ্দিন সাহেব জিন্নাকে তুলনা করেছেন ছায়াভয়চকিত ধাবমান অশ্বের সঙ্গে যে ছুটে চলেছে সর্ব্বনাশের গহ্বরের অভিমুখে। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত খাঁ সাহেবও জিন্না সাহেবের ফতোয়াকে একটুও সমর্থন করেন নি। কিন্তু যে পাগলা ঘোড়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ধেয়ে চলেছে, আপন উৎকর্ষ অহমিকাকে চরিতার্থ করবার জন্যে—সদেশ-দেশের মর্ম্ম অনুভব করবার মত মনোভাব তার নিকট হ'তে আশা করা দুরাশা মাত্র। কাঁটার লাগাম ছাড়া তাকে নিরস্ত করা অসম্ভব। সেই কাঁটার লাগাম হ'চ্ছে কংগ্রেসের পতাকা-তলে হাজার হাজার মুসলমানকে টেনে নিয়ে আসা। দেশের রাষ্ট্রশক্তি যদি একবার লাভ করা যায়, তবে জনাব জিন্নার মত মানুষদের বিষ দাঁত নিমেষে উৎপাটিত হবে। স্বরাজ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারেই কল্যাণকে বহন ক'রে আনবে। সেই কল্যাণের অরুণালোকে স্বাধীনতার বেদী-মূলে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান উপলব্ধি করবে, ঐক্যের সার্থকতাকে। জনাব জিন্না জানেন—স্বরাজের সেই গৌরবময় প্রভাতে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাবে রাস্তার ডাষ্টবিনে। সুতরাং স্বাধীনতার ঊষাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য কংগ্রেসের মর্য্যাদাকে বিনষ্ট করবার এই হীন প্রচেষ্টা।

শিশু ও শিক্ষা

আমাদের শিক্ষার আর একটি গলদের প্রতি শ্রীমতী মণ্টেসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজে আমরা বয়স্ক নরনারীদের দানকেই অত্যন্ত বড়ো ক'রে দেখেছি। শিশুদের দানকে গণনার মধ্যে আনি নি. শ্রীমতী মণ্টেসরি বলেছেন, "যে সব গভীর বিশ্বাসকে সারা জীবন আমরা মনের মধ্যে বহন ক'রে চলি, যে সব অভ্যাসকে আমরা মনে করি জাতির কাছ থেকে পেয়েছি—সেই সব বিশ্বাস এবং অভ্যাস শৈশবেই আমরা গড়ে তুলি এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারা সারা জীবনের মতো গাঁথা হ'য়ে যায়। কোনো দেশের অথবা জাতির জীবনে পরিবর্ত্তন নিয়ে আসা যেখানে লক্ষ্য—মানব জাতিকে উন্নত করে তোলা যেখানে সামাজিক আদর্শ, সেখানে লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে শিশুকে আশ্রয় করা ছাড়া উপায় নেই।"

মণ্টেসরি আরও বলেছেন, "ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা এবং জাতির আধ্যাত্মিক সম্পদ-গুলিকে পুনরধিকার করতে হ'লে শিশুর জীবন থেকে আমাদের আরম্ভ করতে হবে" ভাববার কথা সন্দেহ নাই! শিশুদের অপরিণত জীবনের বিপুল সম্ভাবনাকে আমরা সত্য সত্যই উপেক্ষা করে এসেছি, যেমন উপেক্ষা করে এসেছি নারী এবং শ্রমিকের জীবনকে। আজ আমাদের ভুল সংশোধন করবার দিন এসেছে। যারা বয়স্ক, তাদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবার উপায় নেই—কারণ তারাই গড়ছে ইমারত, তারাই বানাচ্ছে যন্ত্রপাতি, তারাই আবিষ্কার করছে প্রকৃতির অন্তঃপুরের গোপন রহস্য। এ সব কাজ করবার বেলায় বয়স্কদের দানকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। কিন্তু যেখানে আমরা নতুন জগৎ তৈরীর পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য অধীর হয়েছি—যেখানে আমাদের মনে ন্যায়ের এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়া সমাজের স্বপ্ন—সেখানে শিশুদের কথা আমরা সর্ব্বাগ্রে যেন মনে করি, কারণ তারাই ভবিষ্যতের নাগরিক—তারাই ভাবী সমাজের আসল স্রষ্টা—তারাই পৃথিবীতে নতুন স্বর্গ গড়বার শ্রেষ্ঠ উপাদান।

শিক্ষার আদর্শ

শ্রীমতী মণ্টেসরি মাদ্রাজে 'শিশু ও ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছেন, তার মধ্যে মূল্যবান কথা অনেক আছে। তিনি বলেছেন, "আজকের দিনে সব চেয়ে বড়ো সমাজ-সংস্কারের কাজ হচ্ছে শিক্ষাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা হৃদয়গত সম্পর্কের উপর গড়ে তোলা।" একথা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান যোগ্য। আমরা শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ রাখি নি—শিক্ষাকে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে এক ক'রে ফেলেছি। জীবন তো কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে নয়—জীবনের মধ্যে কর্ম্মের, জ্ঞানের এবং প্রেমের অখণ্ড প্রকাশ। আমাদের শিক্ষা আত্মার দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করেছে। মানুষের সমাজ বিভক্ত হয়েছে দুটো দলে—একদল ধনী এবং আর একদল দরিদ্র। গরীবেরা হাতের কাজ জানে, কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে তারা একেবারে নিঃস্ব। ধনীরা লেখাপড়া-জানা লোক বটে— কিন্তু ঠুঁটো জগন্নাথ। হাতের ব্যবহার জানে কেবল খাবার বেলায়। সমাজের সেবার ক্ষেত্রে তাদের হাত থেকেও নেই। এই দু'দল লোকের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক একেবারেই নেই। একদল চেষ্টা করছে কত বেশী খাটিয়ে কত কম দেওয়া যায়, আর একদলের চেষ্টা কত কম খেটে কত বেশী নেওয়া যায়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে মানুষের সমাজ আজ এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে—আর এরা ক্রমাগত পরস্পরের দিকে চোখ রাঙাচ্ছে। শিক্ষা যদি মানুষের জীবনে সংস্কৃতির আলো না আনতে পারে, তাকে

ভাবতে না শেখায়, তার হৃদয়কে প্রসারিত না করে, তাকে স্বার্থপর, অলস, ঠুঁটো জগন্নাথ ক'রে রাখে—তবে বুঝতে হবে শিক্ষার মধ্যে নিশ্চয়ই গলদ আছে। শ্রীমতী মণ্টেসরি আর একটা কথা বলেছেন। নিজের জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না যে শিক্ষা—তার সার্থকতা অল্পই। আমাদের এই দরিদ্র দেশে যাঁদের হাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করবার ভার, তাঁরা বাস্তব সম্পর্কে বড়ো উদাসীন। কত বড়ো উদাসীন, তা বছরে বছরে পাঠ্য-পুস্তকের পরিবর্ত্তন দেখলেই বোঝা যায়। একই ক্লাসের বই বছরে বছরে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এর ফলে যাঁরা পাঠ্য-পুস্তক লেখেন, তাঁদের পক্ষে হয় পৌষ মাস—কিন্তু ছেলেদের অভিভাবকদের ভাগ্যে পাঠ্য-পুস্তকের এই ঘন ঘন পরিবর্ত্তন সর্ব্বনাশ হ'য়ে দেখা দেয়। এ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির জনসাধারণের প্রয়োজন অপ্রয়োজন যে কতখানি উপেক্ষা করে—তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বোম্বাই

যাবো কোন্ পথে ?

"স্বাধীনতার লক্ষ্যপানে ভারতবর্ষের যে জয়যাত্রা—এই জয়যাত্রার পথে বৃটিশের সৃষ্টি আই. সি. এস-কে যেমন অন্তরায় হ'য়ে থাকতে দেবো না, রাজা মহারাজাদেরও তেমিনি অন্তরায় হ'য়ে থাকতে দেবো না। উভয় দলকেই স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার কাজে সহায়তা করতে হবে নইলে তাদের আমরা বিদায় ক'রে দেবো।" এই কথাই গান্ধীজী লিখেছেন হরিজনে। গান্ধীজী লিখবার সময় খুব ওজন ক'রে লিখে থাকেন। রাজা-মহারাজা এবং জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের ভেবে দেখবার সময় এসেছে, কোন্ পথ তাঁরা বেছে নেবেন—সাম্রাজ্যবাদীর হাতে যন্ত্র হয়ে থাকবার পথ, না ভারতবর্ষ যাতে স্বাধীনতা পায় তার জন্য তাকে সাহায্য করবার পথ। দুধ এবং তামাক দুটো খাওয়া চলবে না। স্বাধীনতার বিরোধী হ'য়ে ভারতবর্ষে মোড়লগিরি করার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হবে। স্বাধীনতার যে দিগন্ত-ব্যাপী অভিযান সুরু হয়েছে তার সামনে মুষ্টিমেয় রাজা-মহারাজার বাধা প্রবল বন্যার সামনে তৃণখণ্ডের মতোই ভেসে যাবে।

গান্ধীজী ও ধনতন্ত্র

'হরিজন' পত্রিকায় এই সপ্তাহে গান্ধীজী একটি প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন, "আমার অনেক ধনী বন্ধু জানেন, সোস্যালিস্ট, এমন কি কমিউনিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পাণ্ডা যিনি, তিনি ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ যতখানি কামনা ক'রে থাকেন আমিও ততখানি যদি নাও হয়, প্রায় ততখানি কামনা করে থাকি।" আমাদের দেশে অনেকে এখনো আছেন যাঁদের বিশ্বাস গান্ধী ধনতন্ত্রের বিরোধী নন। আশা করি গান্ধীজীর উক্তি প'ড়ে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। কিছুদিন আগে গান্ধীজী 'হরিজনে' লিখেছিলেন, 'আমি এমন অনেক সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টকে জানি যাঁদের মনে মাছি মারতেও কুণ্ঠার উদ্রেক হয়। তাঁরা কিন্তু বিশ্বাস ক'রে থাকেন, ধনোৎপাদনের যন্ত্রগুলির অর্থাৎ জমি, খনি কল-কারখানার উপরে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমি নিজেকে তাঁদেরই অন্যতম ব'লে বিশ্বাস করি।' মার্ক্স থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত সবাই অকুণ্ঠচিত্তে বলছেন, জগদ্ব্যাপী দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে গেলে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। লাস্কি, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ বর্ত্তমান জগতের বড়ো চিন্তাবীরগণও এই মতবাদই পোষণ ক'রে থাকেন।

অভিযোগ ভিত্তিহীন

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনাব জিন্নার অভিযোগ সম্পর্কে ছোট্ট একটি বাক্যে একটা খাঁটি সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কাছে অভিযোগ উপস্থিত করা সত্ত্বেও তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছুই করেন নি। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ,—সেগুলি ভিত্তিহীন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা মুখ ফুটে যদি বলে ফেলতেন, জিন্নার অভিযোগ ভিত্তিহীন, তবে অনেক কিছু কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে যেতো। তাঁদের নীরবতার কারণ উপলব্ধি করা অবশ্য শক্ত নয়। শ্রীযুত জিন্না অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য রয়াল কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন। কংগ্রেস কি কচি খোকা যে তার আচরণের ন্যায়ান্যায় বিচার করবার জন্য বিদেশ থেকে হেডমাষ্টার আমদানী করতে হবে? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা একটা অছিলামাত্র। আসলে জিন্না চান প্রত্যেক প্রদেশের শাসন-ব্যাপারে লীগের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই কারণে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু ভারতবর্ষের নব-জাগ্রত গণ-হস্তী কি গণতন্ত্র-বিরোধী এই সব আচরণকে সহ্য করবে?

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

তাহার ভাবান্তর দেখিয়া দিলীপ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার চোখে জল দেখিয়া আর সে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না, অত্যন্ত ম্লানভাবে সে আস্তে আস্তে ডাকিল, দিদি!

টপ্ করিয়া এক ফোঁটা জল অলকার চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল। অলকা সচকিত হইয়া উঠিল, নিজেকে দৃঢ় করিয়া সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি ভাই, অবাক হ'য়ে গেছ? কিন্তু ও কিছুই নয়।

দিলীপ তেমনিভাবেই বলিল, দোষ যদি কিছু ক'রে থাকি, নিজের হাতেই কেন শাস্তি দিলে না, চোখের জল—ও যে গুরুদণ্ড দিদি।

তাহার দিকে ফিরিয়া অলকা এবার সত্য সত্যই হাসিল।

দিলীপ বলিল, এমনি করে মা-বাপ ছেড়ে আসায় তাদের প্রতি অবিচার করা হয় জানি, কিন্তু ওর বাইরে আর কিছুই কি চোখে পড়ে না? শুধু একটা দিক নিয়েই যদি বিচার করতে হয়, তবে চোখের জলের নদী বইয়ে দিলেও ত শান্তি মিলবে না, কিন্তু আর কোন দিকই কি নেই এর মধ্যে?

সম্মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অলকা বলিল, বুঝেছি, কি বলতে চাও তুমি, অস্বীকার করতে চাই না, পথও নেই। এমনি দুঃখ-কষ্টের পাকা রাস্তা না হ'লে পথের শেষে গিয়ে পৌঁছান যায় না জানি, কিন্তু সে-সব ত আমাদের চোখে পড়ে না!

দিলীপ বলিল, পড়ে না ব'লেছে কে? পড়াবার চেষ্টা না ক'রে যদি একটা অন্ধ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে একদিক নিয়েই প'ড়ে থাকে কেউ ত তার চোখে কি পড়বারই বা আশা ক'রতে পারা যায়?

অলকা বলিল, তোমরা অনেক কিছুই বোঝ, মামাও ব'লতেন, বিচার না ক'রে কোন কিছুই ক'র না মা। এ জগতটা বড় অদ্ভুত, কার আড়ালে যে কি লুকিয়ে থাকে, কাকে দেখতে গিয়ে যে কার ওপর অবিচার করা হয় তা কে-ই বা বলতে পারে। দৃষ্টিটাকে সূক্ষ্ম করে রেখ' তবে জয় হবে, নইলে প্রতি পদেই ঠকে যাবে। কিন্তু তাই কি পারি আমরা, চোখ দুটো যে আমাদের স্নেহ মমতায় অন্ধ ভাই।

দিলীপ বলিল, তোমাকে বলতে বাধা নেই দিদি, আমার এই দেওঘর আসবার পেছনেও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। আমি যখন সুস্থ শরীরে কাজ ক'রছিলাম তখন প্রতুলদা একদিন আমাকে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে যাবার আদেশ দিলে। আমার না-কি শরীর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। আমি আপত্তি ক'রেছিলাম; কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই বলতে পারিনি। কি যে ছিল সেখানে তা জানি না, ভয় পাবার কোন কিছুই সেখানে ছিল না; কিন্তু তবু আর কিছুই বলতে পারিনি। একটা তারিখ ঠিক করে দিয়ে প্রতুলদা জানালে তার আগে আমার ফেরা নিষেধ। উঃ, এক মাস কেটে গেছে; কিন্তু আর সাতটা দিন মাত্র বাকী—তারপর, আঃ। সেই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের তারিখটা দেখবে দিদি? বুক পকেট হইতে একটা ক্যালেণ্ডার বাহির করিয়া সে অলকার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল—সাত দিন পরের একটা তারিখ কে যেন শত সহস্রবার দাগ কাটিয়া একেবারে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

অলকার বুকের ভিতর প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠিল, এমনি করিয়া একে একে সকলেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে কে জানে? ভবিষ্যতের অজানা অন্ধকূপের কথা মনে হওয়ায় সে বারবার শিহরিয়া উঠিল। নিতান্ত অভিশপ্ত সে, কাহার অভিশাপ লইয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে জন্মিয়া চলায়মান জগতের কোন্ প্রান্তে যে সে আসিয়া ঠেকিবে তাহা কে বলিতে পারে। যাহাদের মধ্যে সে আসিয়া পড়িবে তাহারাও অভিশপ্ত হইয়া যাইবে, তাহার মামা, মামী, তাহার স্বামী এমন কি ওই সতীশকেও সে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতুল, দিলীপ এমনি দুই একজন আসিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাকে সজীব করিয়া তুলিলেও বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইতেও তাহারা দেরী করে না। এ যেন তাহাকে লইয়া কি খেলা চলিতেছে, অথচ এ খেলায় আর তাহার প্রবৃত্তি নাই, সমস্ত কিছু ছাড়িয়া দিয়া এইবার সে বিদায় লইতে চায়।

ক্যালেণ্ডারটা পকেটে রাখিয়া দিলীপ বলিল, আচ্ছা দিদি বলুন ত' আমি কি সত্যিই অসুস্থ? প্রতুলদা কিন্তু তবু বিশ্বাস করেনি। পরমুহূর্ত্তেই চক্ষু তুলিয়া অলকার চক্ষুর দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া সে বলিল, পরের ওপর এত স্নেহ যার সে কি কেবলমাত্র বাজে কাজে বেড়াবার জন্যেই মা, ভাই-বোনকে ছেড়ে আসতে পারে?

পারে না ইহা সত্য। অলকা তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। যাহারা পরকে আপন করিয়া লইয়া তাহাদের জন্য ভাবিয়া মরিতে পারে, তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভব নয়। বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই, বিশ্বাস করাও সহজ নয়।

অকস্মাৎ সমস্ত কথার মোড় ফিরাইয়া দিয়া দিলীপ বলিল, আর সাত দিন মাত্র বাকী, চলুন না এর মধ্যে একদিন গিরিডি গিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

হাসিয়া অলকা বলিল, ঠাকুর দেবতার ওপর হঠাৎ এত টান হল যে! হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া দিলীপ বলিল, ঠাকুর-দেবতা মাথায় থাকুন, তাঁদের চোখের আড়ালে রাখাই ভাল। মানুষ নিয়েই আমাদের কাজ, সেই মানুষেরই একটা আস্তানা দেখে আসা যাবে আর সেই সঙ্গেই দেখে আসা যাবে দরিদ্র-সাধারণের মাঝে তোমাদের দেবতার সাজ-সজ্জা।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া অলকা বলিল, অর্থাৎ সেখানে যেতে চাও শুধু দেবতার সমালোচনা করতে, মানুষের প্রত্যেক কাজকেই তোমরা তীব্রভাবে বিদ্রূপ করতে চাও এই-ত'?

গম্ভীর হইয়া দিলীপ বলিল, তা নয় দিদি, সমালোচনা

ক'রতে চাই না, আলোচনা করলেই হবে, আমার সঙ্গে তোমার মতের অমিল হবে না বলেই মনে করি। আর বিদ্রূপ করার কথা যদি বললেই ত' বলি ওটা না হলে তোমাদের চলেও না যে। তোমাদের মনের দৃঢ় বিশ্বাসকে তীব্রভাবে আক্রমণ না করলে ও-যে কখনই ঠিক হবে না। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ত' তর্ক চলে না, বিদ্রূপ করে ঠিক উল্টো চাপ দেওয়াই ওখানে কর্ত্তব্য। বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়ে যেদিন বিচার-বুদ্ধি হবে সেদিন তর্কেরও আর প্রয়োজন থাকবে না দিদি, সবই সোজা হ'য়ে যাবে।

অলকা বলিল, তা হয়ত' পারবে কিন্তু সেই সঙ্গে আর কোন কিছু বিশ্বাস করার শক্তিও আর ওদের থাকবে না। অল্পবুদ্ধি যাদের তাদের কি বোঝাবে বিচারবুদ্ধির কথা। বিশ্বাসই যে তাদের বেঁচে থাকার মূল। সে মূলটাই যেদিন ধ্বংস হ'য়ে যাবে সেদিন তাদের থাকবে কি? তার চেয়ে যা বিশ্বাস করাবে তাই বিশ্বাসের উপযোগী ক'রে তোল না কেন?

হাসিয়া দিলীপ বলিল, বিশ্বাস করাতে শেখাব কি? কোন সত্যই যে চিরকালের জন্যে নয়, অথচ বিশ্বাসটা এমন একটা জিনিষ যা রক্ত মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে ভবিষ্যতের মানুষের সংস্কার হ'য়ে দাঁড়ায়। আজকের সত্য যা দুদিন বাদে মিথ্যে হ'য়ে যাবে তাকেই বা তখন ভাঙ্গাবে কে? মানুষের মনটাকেই তাই ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলতে হবে, বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন পথই আর তাদের রেখে দিলে চ'লবে না, যার যতটুকু শক্তি সে তাই দিয়েই বিচার ক'রে দেখবে—তাতে লজ্জার কিছু নেই, ঠকবারও নয়। কিন্তু থাক'গে সে-সব, যেতে তুমি রাজী আছ কিনা তাই বল?

অরবিন্দ কখন তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কেহই টের পায় নাই। দিলীপের কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন, কথাগুলো হয়ত' তোমার সত্যি দিলীপ কিন্তু ওসব আমাদের শুনতে নেই। যে-কটা দিন আছি সে-কটা দিন আমাদের একটা কিছু আঁক্‌ড়ে ধ'রেই থাকতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবার ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে?

দিলীপ বলিল, পরেশনাথে কাকাবাবু, দিদি নাকি খুব হাঁটতে পারেন তাই দেখতে চাই ওপরে উঠতে গেলে মাটীর টান তাকে কেমন বিপদগ্রস্ত ক'রে ফেলে।

সম্মুখের দিকে মুখ তুলিয়া হয়ত' বা বহুদিন আগে হারাইয়া যাওয়া দিনের কথা মনের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতে করিতে অরবিন্দ বলিলেন, পরেশনাথ? হ্যাঁ, গিয়েছিলাম অনেকদিন আগে, তখন আমার চোখে ছিল দৃষ্টি, দেহে ছিল বল। মণি বলেছিল, ডুলিতে চেপে যেতে; কিন্তু তাই কি পারি? কি চমৎকার লাগছিল ওই ওপরে উঠে যেতে, মনে হচ্ছিল আমি শক্তিশালী, প্রতি পদক্ষেপে সে কি অসীম নির্ভরতা কিন্তু সেদিন আর নেই মা। ওপরে উঠে নীচে মেঘের দিকে তাকিয়ে, এঁকে বেঁকে যাওয়া নদীটাকে দেখে হাসি পাচ্ছিল, ওদের প্রতি করুণা হচ্ছিল—কোনদিনই ত' ওরা ওপরে উঠে আসতে পারবে না। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডটা সেখান দিয়েও গিয়েছে, মনে হ'চ্ছিল একবার ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই ব'লতে পারব' এই আমাদের রাস্তা—সোজ কলিকাতায় চ'লে যাওয়া যায় ওটার উপর নির্ভর ক'রেই। একটা মোটর নীচে দিয়ে যাচ্ছিল, ছোট্ট, খেলনার গাড়ীর মত তারপর আরও কত কি—কিছুই আর মনে পড়ে না, সে আলো আর নেই, সে শক্তি? তিনি আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, মুখের উপর এক টুক্‌রা হাসি ভাসিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

উৎসাহিত হইয়া দিলীপ বলিল, সেখানেই নিয়ে যেতে চাই দিদিকে। নূতন মানুষ তাদের নূতন উৎসাহ নিয়ে যৌবন নিয়ে সেখানে যাবে কিন্তু পরেশনাথ আর তার নীচেকার সৌন্দর্য্য তাদের সেই পুরানো মূর্ত্তি নিয়েই তাদের অভ্যর্থনা ক'রবে। মানুষের জন্যে তাদের চিন্তা নেই কিন্তু মানুষ তাদের জন্যে অস্থির। আপনার দিন ফুরিয়ে গেছে এসেছে আমাদের দিন, তাই আমি যেতে চাই দিদিকে নিয়ে।

অলকা বলিল, আমার যাওয়া হয় না দিলীপ, তুমি আর তোমার দাদা যেতে পার কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

অরবিন্দ বলিলেন, না মা, দিন থাকতে তাকে অগ্রাহ্য ক'রতে নেই। প্রতিদিনই মানুষ বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায় তাই যখন যে সুবিধে পাবে তাকেই গ্রহণ ক'রবে। জীবনে সুবিধে আসে আর তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়। কোন কিছুর জন্যেই যেন ভবিষ্যতে অনুতাপ ক'রতে না হয় মা।—

অলকা বলিল, আপনাকে ফেলে আমি কি ক'রে যেতে পারি কাকাবাবু?

অরবিন্দ হাসিলেন, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, এইবার তুমি একটা হাসির কথা ব'লেছ মা। আমি ত' তোমার জীবনে কুগ্রহ হ'য়ে আসিনি যে, আমার কথা মনে ক'রেই পদে পদে তোমাকে পিছিয়ে যেতে হবে। তুমি কি বোঝ না ও আমাকে শুধু আঘাতই করে। পথে পথে যখন ঘুরে বেড়াতাম তখন কে দেখত আমাকে? একটা লাঠি আর দশজনের ভিক্ষে, এইত' ছিল আমার সম্বল। দুটো দিন এ বুড়োকে ঠাকুর চাকরের ওপর ছেড়ে দিয়ে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না মা।

দিলীপ বলিল, দু'একজন মানুষের অসুবিধে দূর ক'রেই খুসী হ'য়ে উঠবেন না দিদি। সমস্ত মানুষের অসুবিধে কি ক'রে দূর করা যায়, কি ক'রে মানুষে মানুষে বিবাদ বন্ধ করা যায় সেটাই হবে আমাদের একমাত্র চিন্তা। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিকে নিয়েই হবে আমাদের কাজ, অভিজ্ঞতার প্রয়োজনকে অস্বীকার ক'রলে চ'লবে কেন?

অলকা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমরা সত্যিই বড় কঠোর, মানুষের দুঃখ তোমাদের চোখেই পড়ে না। আমি না থাকলে কাকাবাবুর যে কষ্ট হবে তা' আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অরবিন্দ বলিয়া উঠিলেন, না, মা, কষ্ট একটু হ'লেই যে—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিলীপ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে হাসি থামাইয়া বলিল কাকাবাবুর কষ্ট হবে না তাত' আমি বলিনি দিদি। তোমা

দুঃখ দেখে সাহায্য ক'রতে অভ্যস্ত আমরা কিন্তু তা নই, আমরা তার উৎসর মুখ খুঁজে বেড়াই তারপর ঘা দিই সেখানে। কিন্তু থাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক করা উচিত হবে না দিদি। কাকাবাবুর সম্মতি ত' পেয়েইছ, তবে আর কি!

অরবিন্দ বলিলেন, সম্মতি শুধু নয়, তুমি না গেলে আমি বরং অসন্তুষ্টই হব মা। এমন সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সোৎসুক কণ্ঠে দিলীপ বলিয়া উঠিল, কতদূর বেরিয়ে এলেন দাদা? আমরা কিন্তু অনেক দূর চ'লে গিয়েছিলাম, পরেশনাথ পাহাড়—অবশ্য কল্পনায়। কাল আর হবে না, পরশু খুব ভোরেই গাড়ী—কল্পনাকে পাশে ফেলে রেখে বাস্তবভাবেই সবাই মিলে যাব সেখানে। ফ্লাস্ক, টিফিন-কেরিয়ার সব ঠিক ক'রে রাখতে হবে আজ থেকেই।

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আজ থেকেই?

দিলীপ সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, নয়-ই বা কেন? আমার একার কতখানি লাগে তার একটা পরখ ক'রতে গেলে আজই সব কিছু ভ'রে দেখতে হবে ত'! জানেন দিদি আর একবার গিয়েছিলাম ওই পাহাড়ের ওপর, হাতে ছিল একটা শাল গাছের ভাঙ্গা লাঠি, সঙ্গে এক ফোঁটা জলও ছিল না—পায়ের ছেঁড়া স্যান্ডেলটাকে ওখানেই রেখে আসতে হ'য়েছিল, পথপ্রদর্শকও ছিল না, লোকজনও বিশেষ দেখিনি ওপরে, শুনেছি বাঘ নাকি আছে অনেক—এবারে তারই শোধ নিতে হবে ত'? আজ থেকেই কাজে লেগে না গেলে কোন কিছু বাদ থেকে যায় যদি?

সতীশ বলিল, তোমরা যাও, আমি না হয় থেকেই যাই।

দিলীপ বলিল, কাকাবাবুর কথা মনে হ'চ্ছে ত'। কিন্তু আপনি থেকে তাঁর সুবিধে ক'রবেন না অসুবিধে বাড়াবেন?

অলকা হাসিয়া ফেলিল, অরবিন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না আমাকে তোমরা পাগল ক'রে দেবে দেখছি। তুমিই দেখছি কাজের লোক দিলীপ, আমাকে নিয়ে গিয়ে যশিডী ষ্টেশনে রেখে আসতে পারবে কি? এই শেষ বয়েসে আর কোন অপরাধই ঘাড়ে তুলে নেবার শক্তি আমার নেই।

সতীশ বলিয়া উঠিল, কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার কাঁধে অপরাধ চাপিয়ে দিয়েই কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব' নাকি? বেশ ত' পরশুই যাওয়া যাবে, তুমি সব ব্যবস্থাই ক'রে ফেল দিলীপ, এ অভিযানের নায়ক তুমিই।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, নেতৃত্ব করবার সুবিধে এর আগে আর কোনদিন মেলেনি, এবার সে সুযোগ ছাড়ব' না, গৌরী-শৃঙ্গ আক্রমণকারী নেতাদেরও হারিয়ে দেব' আমার নৈপুণ্যে। কেবল একটা অনুরোধ দাদা, সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই গাড়ী, খুব সকালে উঠবেন পরশু। যত বড় অভিযানের নেতৃত্ব ক'রতেই সক্ষম হই না কেন আপনার ঘুম ভাঙ্গাবার বিরুদ্ধে আমার কোন কূটনীতিই টিকবে না ব'লেই মনে করি। কুম্ভকর্ণের পিঠে হাতী চাপাতে হ'ত কিন্তু এখানে সে-সব মিলবে না ত'।

অরবিন্দ বলিলেন, সে-যুগে বুদ্ধির চেয়ে দৈহিক শক্তির ওপরই নির্ভর ছিল বেশী কিন্তু এ-যুগে আর তা' নেই।—যা শীত প'ড়ছে, হাতীর বদলে ভোরের জল হবে বেশী কার্যকরী।

সতীশ হাসিয়া বলিল, সত্যি যেন জল ঢেলে দিও না গায়ে, তা'হলে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়ার সম্ভাবনাই হ'য়ে প'ড়বে বেশী।

দুই হাত জোড় করিয়া দিলীপ বলিল, তবে কথা দিন যে দেরী করে এ অভাজনকে যাওয়া থেকে বঞ্চিত ক'রবেন না।

সতীশ ও অলকা তাহার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া উঠিল অরবিন্দও তাহার অদ্ভুত স্বর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, চমৎকার! মানুষের মনের দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জন্যেই যেন এদের সৃষ্টি।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, শুনে রাখুন দিদি, ভবিষ্যতে ঠাট্টা ক'রবেন না যেন।

উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন করিয়া অলকা আস্তে আস্তে বলিল, শুনে রাখব কেন ভাই, এ মত যে আমারও। তোমাকে সেদিন আনতে পেরেছিলাম ব'লে আমি নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ দিই।

দিলীপ বলিল, এইরে, এবার দাদার পালা, উনি আবার সাহিত্যিক—এমন কতকগুলো কথা হয়ত ব'লে ব'সবেন যার মানেও বুঝব' না তার চেয়ে আগেই পথ দেখা ভাল। আজ আমার বেড়ানো হয়নি, চললাম দিদি। আর কাহাকেও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল, অলকা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, হয়ত বা প্রতুলের কথাই তখন তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল। ইহাদের জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হয় না, নিতান্ত সাধারণভাবেই পথ চলিতে চলিতে নিজেরই বাড়ীর আশেপাশে অতি সাধারণের মধ্যেই এই সব অসাধারণ-দের দেখা মেলে। ইহাদের দেখিয়া কোন কিছুই বুঝিবার উপায় নাই কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়া যে-ভাব মনের মধ্যে উহারা নিজেদেরই অজ্ঞাতে ফুটাইয়া দেয় তাহাও মুছিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই থাকে না। উহাদের প্রশংসা করিলে হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া অপদস্থ করিয়া দেয়, প্রশংসা না করিলেও নিজেকে নিজের কাছেই ছোট বলিয়া মনে হয়। অতি আপন যাহারা তাহাদের ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছে বলিয়াই অপর কাহাকেও আপন করিয়া লইতে এতটুকু দেরীও ইহাদের হয় না। কোন কথাই না বলিয়া মূক বিস্ময়ে ইহাদের দিকে চাহিয়া থাকাই ভাল।

(ক্রমশ)

ভারতীয় সাহিত্য

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি-আর-এস

ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত ঐক্য লইয়া আমরা সর্বদাই স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকি। কিন্তু আজও কোনও কোনও পণ্ডিতের মুখে শুনি, ভারতভূমির মধ্যে ভৌগোলিক ভিন্ন অন্য কোন যোগসূত্র নাই; সমস্ত এশিয়ার বাণী যেমন এক নহে, জাপানী ও ইরাণী সভ্যতায় যেমন কোনও মিল নাই, চীন ও ইরাকে যেমন কোনও সংস্কৃতির আদান-প্রদান হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও তেমনই কোনও সংস্কৃতিগত মিলন-ভূমি নাই, আমরা বাস্তবিকই শতধাবিচ্ছিন্ন, আজই শুধু জগতের দরবারে "এক দেশ এক প্রাণ" বলিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু প্রদেশগত, জাতিগত, আচারগত বহু প্রভেদ থাকিলেও তরুণ ভারত নিশ্চয় বিশ্বাস করে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একই ভাবধারা চলিয়াছে, তাহার অন্তরে অন্তরে একই চিন্তা-প্রবাহ, একই ভাব-সাধনা, সংস্কৃতিতে সকল ভারত এক।

এই ভারতের ঐক্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। দক্ষিণী ও নেপালী, শিখ ও জৈন, হিন্দু ও মুসলমান, গুজরাতী ও বাঙালী—সকলে যে একই মায়ের সন্তান, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাদেশিকতার দুষ্ট ক্ষত আমাদিগকে আজ কষ্ট দিতেছে, জাতির সংহতিকে আহত করিয়া ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিব, আমাদের পূর্বগামী সাহিত্যিকগণ, দেশপ্রেমিকগণ নানাভাবে নানা গীতে, নানা ভাষায় যে সংহতির কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের সোনার হিন্দুস্থানকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই সংহতির কথা ভুলিলে চলিবে না, চক্ষু সেখান হইতে ফিরাইয়া লইলে চলিবে না।

সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিলে পাই এই সংহতির পোষকতা। যুগে যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভাষাগত বৈষম্য সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্য প্রকট রহিয়াছে। মীরা, কবীর, তুকারাম, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস—কোনও প্রদেশবিশেষের সম্পত্তি ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন সমগ্র ভারতের সাধনার ধন। তাঁহাদের কথা মনে করিলে আমরা ভৌগোলিক গণ্ডীর কথা ভুলিয়া যাই, মনে পড়ে তাঁহারা আমাদের সমগ্র জাতির অন্তরের কথাই বুঝি বলিতেছেন।

দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের মধ্যে 'অচল বাধা' দণ্ডায়মান। তাহা হইলে বিন্ধ্যপর্বত। আমরা বাঙালী; উত্তর ভারতে বা উত্তরাপথে যদি বা আমাদের গতিবিধি কিঞ্চিৎ আছে, দক্ষিণাপথে ত কিছু নাই, যাহা আছে তাহা 'কিছু নয়' বলিলে চলে। লিপি-বৈষম্যের জন্য আমরা যেন চক্ষে অন্ধকার দেখি। কিন্তু একবার লিপি-বৈষম্য দূর করিতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম, আমরা যে ভাবে ভাবিত, মলয়ালী-কর্ণাটী-তামিলী-তৈলঙ্গী সকলেই সে ভাবে ভাবিত, যুগধর্ম সকলের উপর কাজ করিতেছে।

বর্তমান যুগে কর্ণাটী সাহিত্যের কথা একটু আলোচনা করি। শ্রীযুক্ত কে ভি পুটাপ্পা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি মহীশূর কলেজের অধ্যাপক, বয়স চল্লিশের নীচে, অকৃতদার, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি নাটক, উপন্যাস, কবিতা বিস্তর লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ কবিতার নাম 'কল্কি'। কয়েক বৎসর পূর্বে কাশী হইতে পরিচালিত প্রবাসী বাঙালী মুখপত্র উত্তরাতে ইহার একটি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কবি কল্কিকে মূর্ত দেখিতেছেন আমাদের ভাবী সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়া। মানুষে মানুষে কত বৈষম্য, কত প্রভেদ; ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কি অলঙ্ঘ্য পারাবার; যেন বিস্তৃত শোণিত-সাগর পড়িয়া আছে। যাহারা দীন হীন, যাহারা শোষক-সমাজের দ্বারা তিলে তিলে জীবনীশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন কল্কি। কবি এইরূপে বুভুক্ষাপ্রপীড়িত, অত্যাচারিত, জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর, মনুষ্য কঙ্কালের মধ্যে দশমাবতারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আর একজনের নাম করিতেছি—ইনিও প্রাচীন নহেন, আধুনিক যুগেরই কবি। আমাদের বাঙলা দেশে কবি বা সাহিত্যিক এখনও উপনাম লইয়া লেখনী চালনা করেন না, কিন্তু অন্য প্রদেশে এইরূপ উপনাম গ্রহণ আদৌ রীতি-বিরুদ্ধ নহে, বরং তাহাই বহুল পরিমাণে প্রচলিত রীতি। আলোচ্য কবির নাম বেন্দ্রে। কিন্তু ইনি 'অম্বিকাচরণ দত্ত' নামেই লিখেন। আমরা 'ত্রিংশৎ কোটি কণ্ঠে' ভারতমাতার জয়গান করি,—ইনি তেত্রিশ কোটির সংহতি দেখিতে পান নাই, তাই লিখিতেছেন, ভারত-ভূমির মুখ দিয়া জানাইতেছেন—"তেত্রিশ কোটি! আমার তেত্রিশ কোটি সন্তান! কই তাহাদের ত বজ্রকঠিন করিয়া আশীর্বাণী দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলাম, কোথায় গেল সেই শক্তি, সেই তেজ! তাহারা যে আজ প্রাণহীন দেহমাত্র। পরদাস হইয়া অবসাদে নিমগ্ন, পরপদলেহনে তৎপর!" বর্তমান ভারতের দেশভক্তিমূলক কবিতার মধ্যে বেন্দ্রের এই ভারত-বিলাপ অনুভূতির তীব্রতায় ও প্রকাশের উৎকর্ষে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, আর সে দেখা চেষ্টা করিয়া দেখা নহে, গুর্জর ও মহারাষ্ট্রে, বঙ্গ ও বিহারে, উৎকল ও কর্ণাটে সমস্যা ও অনুভূতি অনেকাংশে এক। প্রাদেশিকতা রাক্ষসী আমাদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু যদি আমরা আমাদের সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আমাদের বৈষম্য অল্প, সাম্য প্রচুর। বঙ্কিমবাবু বড় দুঃখ করিয়াই বলিয়াছেন, অবশ্য তিনি বাঙলার সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন,—"এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই!" আমাদের এক জাতীয়ত্ব আছে এবং তাহা আরোপিত ধর্ম নহে, স্বরূপত। সেই এক-জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কুড়ি বৎসর পূর্বে স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আবেগময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন,—"এস সাহিত্যিক, এস বঙ্গ-ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙালী......আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য রাজ্যগুলি এক করিয়া, এক বিরাট সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তুমি আমি চলিয়া যাইব, আরও কত আসিবে, কত যাইবে, কিন্তু যদি এই ভারতব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারি,—অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আনুকূল্যও করিয়া যাইতে পারি, আমাদের মর-জীবন সার্থক হইবে।"

স্যার আশুতোষের এই কথাগুলি ব্যর্থ যাইবে না।

মহাসমর

(গল্প)

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

শরৎকাল।

ছোট নৌকা। হেলিয়া দুলিয়া অতি মন্থর গতিতে চলিয়াছে। গাঙ্গে স্রোতও নাই জলও অনেক কমিয়া গিয়াছে। আর কুড়ি পঁচিশ দিন হয়ত নৌকা চলিতে পারিবে তারপর অনেকদিন পর্যন্ত নৌকাও চলিবে না, হাটিয়া চলাও সম্ভবপর হইবে না।

কচুরীপানার দাম ঠেলিয়া মাঝিরা বহু কষ্টে নৌকা চালাইতেছে। সুজিত মাঝিদের দিকে চাহিয়াছিল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মিনতির দিকে চোখ ফিরাইল। মিনতি অদূরে পা গুটাইয়া নির্জীবের মত বসিয়া রহিয়াছে। সুজিত পা ছড়াইয়া ছৈ'এ হেলান দিয়া বসিয়াছিল, দুইটি বালিশ কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ছোট নৌকাতে ভদ্রলোক চলে? কী বিশ্রী রাস্তা। জার্মানী দামে রাস্তা ছেয়ে গেছে, ছৈ-এ মাথা ঠুকতে ঠুকতেই শেষ হবার যোগাড়।

মিনতি বাহিরে চাহিয়াছিল, বাহিরেই চাহিয়া রহিল।

সুজিত বলিয়া চলিল, আর দুটো দিন সবুর করলে যে কি করে রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যেত আমার মাথায় ঢোকে না। সুবিধে বই অসুবিধে যে হত না হলপ করে বলতে পারি।

মিনতি একবার আড়চোখেও চাহিল না। সে যেন সুজিতের কোন কথাই শুনিতে পায় নাই এবং সুজিতের নিকট হইতে যেন সে কোন কথা প্রত্যাশা করিতে পারে না।

ভাদ্র মাস শেষ হইয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ। সুনীল আকাশে স্তবকে স্তবকে জমিয়া রহিয়াছে মেঘপুঞ্জ। মেঘের পাশে মেঘ। আকৃতি ও দূরত্বের মাহাত্ম্যে একই আলোকে মেঘমালাগুলি বৈচিত্র্যময় দেখাইতেছে। মিনতি বিস্ময় নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। অদ্ভুত—অদ্ভুত ওই রঙের খেলা।

লাল, নীল, ধূসর, সবুজ, কাল—কত রঙ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুদূরে আকাশে মেঘগুলি যেন পর্বতমালার মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অস্তরাগের সুবর্ণ ঝর্ণাধারায় মেঘমালা অপরূপে বর্ণচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হইয়াছে। আকাশে বাতাসে আলো-ছায়া আর শত শত রঙের আলিম্পনা। মিনতি আর চাহিতে পারে না, চোখ দুইটি তাহার ঢুলিয়া পড়ে।

সুজিত একটু অগ্রসর হইয়া বসিল। মিনতি লক্ষ্যও করিল না।

সুজিত বলিল, মানুষ পরের দোষ ও ত্রুটিই সর্বদা বড় করে দেখে। তা দেখুক, কিন্তু আমরা পর হলুম কোন যুক্তিতে। তারপর অর্থ সমস্যা—আমার অপরাধটাই বা কি। যাকে কেন্দ্র করে এত বড় বিপর্যয়—সেটা কি, হ্যাঁ সত্যি ত' আমার অন্যায় কোথায়। আমি এমন কি মহা অপরাধ করেছি!

তথাপি মিনতি কোন জবাব দিল না। যেমনই ছিল তেমনই উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল সুদূর আকাশ পানে —দিক্‌দিগন্তের মহাশূন্যে।

নৌকাটি বেশ দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছে। সুজিত পিঠে একটা বালিশ দিয়া বলিল, তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ, শত অনুরোধেও তোমায় ধরে রাখতে পারিনি। আমি জানি, তোমায় আমি যদি সজ্ঞানে কখনও পীড়ন করতুম, হীনতায় ও স্বেচ্ছাচারে তোমার জীবন দুর্বিসহও করে তুলতুম, তবু তুমি কারো কাছে একটু অভিযোগ করতে না। এ কথা আমি তোমার মতই অতি সত্য বলে জানি, এরপর তুমি আমায় সামান্য কিছুর জন্যেও বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করবে না। সবই আমি জানি, চিনি আমি তোমার উদার মন, প্রশস্ত হৃদয়, শিক্ষাদীক্ষা—তোমার কোন কিছুই আমার নিকট অবিদিত নয়। কিন্তু মিনতি এ কথা আমি অনেক ভেবেও কিছুতেই বুঝতে পারিনি তোমার আমার গরমিল কোথায়। এমন কি গরমিল আছে যা আমরা জানিনে, বুঝতেও পারিনে। আশ্চর্য এমনি যে, এর থেকেই এত বিরাট একটা ট্রাজিডির সূচনা হল।

মিনতি তবু কোন জবাব দিল না। সুজিতের সকল কথাই হয়ত সে শুনিয়াছে, কিন্তু কোন উত্তর দিতে চেষ্টা করিল না, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। ক্লান্ত হইয়া দেহের সকল ভার ছৈ-এর খুঁটিতে ঢালিয়া দিয়াছে। দৃষ্টি ক্লান্ত সর্বশরীরে যেন একটা আবেশ, শ্রান্ত শৈথিল্য লুটোপুটি খাইতেছে।

সুজিত বলিয়া চলিল। তুমি জবাবই দিলে না, হয়ত শেষ পর্যন্ত কোন কথাই বলে যাবে না। কিন্তু মিনু—

মিনতি একবার ক্লান্ত চোখে সুজিতের দিকে চাহিয়া আবার চোখ ঘুরাইয়া লইল।

সুজিত একটু আবেগের স্বরে বলিয়া চলিল, কিন্তু মিনু, যে জন্যে আমি এত বড় শাস্তি পেতে যাচ্ছি তা জানতে পারিনি। যে কোন শাস্তি—যত কঠিনই হোক না কেন মাথা পেতে নিতে পারি, কিন্তু তোমাকে এমনি নীরবে শাস্তি দিয়ে চলে যেতে দিতে পারব না। তোমাকে বলতে হবে, আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে—কি আমার অপরাধ, কি আমার ত্রুটি।

নির্জন খাল। খোলা প্রান্তর। চারিদিকে জলরাশি, বড় বড় সবুজ কচুরীপানা। লম্বা লম্বা পাতার ফাঁকে ফাঁকে বেগুনী ও নীল রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়াছে। খালের দুই পাশে রোয়া ধানের ক্ষেত। সবুজ ধানের ডগাগুলি জলের উপর মাথা তুলিয়া মৃদুমন্দ বাতাসে দুলিতেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় দুই একটা শেওড়া, অশ্বত্থ ও বট গাছ। গতিশীল নৌকা হইতে মনে হয় গাছগুলি যেন চলিতে চলিতে সম্মুখে জলাশয় দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে।

সূর্যের আলোক স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে যেন একটা অস্পৃশ্য, মসৃণ একটা জাল সারা ভুবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মিনতি ফিরিয়া তাকাইল। সে যেন স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। সে দুর্বল, বিপর্যস্ত, ক্লান্ত।

সুজিত সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, আমরা আজ যে স্থানে এসে পৌঁছেছি, জানিনে এর পরিণাম কি। তোমার

বাবা ঢাকাতে এসেছেন, সেখানে তোমায় পেঁৗছে দিয়ে বিদায় নেব, তারপর তোমরা যাবে লক্ষ্ণৌ আর আমি! সুজিত মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল, জানিনে আমি এর পর কোথায় থাকব। বিদায় বেলায় তুমি ফিরেও তাকাবে না, তোমার চোখে অজানিতে এক ফোঁটা জলও জমবে না, সে সময়ই হবে আমাদের দেনা-পাওনার শেষ নিষ্পত্তি। সুজিত একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিতে লাগিল, মিনু, তবু আমি জানতে পাব না—কেন আমাদের নতুন জীবন এমনি অকারণে ব্যর্থ হয়ে গেল। তুমি জান আমি চরিত্রহীন নই, মাতাল নই, সজ্ঞানে কখনও তোমায় পীড়ন করেছি, কিংবা স্বেচ্ছায় কখনও তোমায় ব্যথা দিয়েছি, এমন কথাও তুমি বলতে পার না। হয়ত আদর্শ স্বামী নই, কিন্তু দশজনের স্বামী যেমন হয়ে থাকে আমি তাদের তুলনায় নিকৃষ্ট নই।

বিলের মধ্যে আসিয়া খালটা মিশিয়াছে। নৌকাটা খানিকক্ষণের জন্য থামিলে মিনতি বিলের দিকে তাকাইল। নৌকার চারিপাশে বহু পদ্ম ও সাপলা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাঝি বড় বড় দেখিয়া অনেকগুলি পদ্মফুল তুলিয়া মিনতিকে বলিল, বৌঠাকরুণ, পদ্মফুল নিবান, ভারি বড় বড় ফুল ফুটছে!

মিনতি মৃদু হাসি হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। পদ্মফুল নেবার উপর কোন উৎসাহও প্রকাশ পাইল না, কিন্তু বৃদ্ধ মাঝির সাগ্রহ উপহার গ্রহণ না করিয়া পারিল না, সযত্নে ফুলগুলি কোলের উপর তুলিয়া লইল। পদ্মফুলগুলি সুন্দর। মিনতি তাজা ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

নৌকা আবার চলিতে সুরু করিল। সুজিত হঠাৎ মিনতির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মিনু আমরা কি আর প্রথম জীবনে ফিরে যেতে পারি না, আবার কি নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারি না। মিনু, কথা কও, কথা কও!

মিনতি ফুলগুলির উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর পানে চাহিল। তাহার মনে হইল যে, সে বলে, অপরাধ তোমার কিছু নেই, সজ্ঞানে কোন অন্যায়, কোন পীড়নই তুমি করনি। এমনি হতভাগ্য আমরা যে, কেন আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল তা' বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা আমাদের নেই, কোন অভিযোগ করবার মতও কিছু নেই। পরস্পর পরস্পরকে পিছন দিয়ে সোজা চললে যেমন কখনও মিলন ঘটে না, তেমনি করেও আমরা চলতে চাইনি। আমরা মিলনের আকাঙ্খাতেই চলতে সুরু করেছিলুম। কিন্তু আমাদের মনের মিল হল না। হল না যে তাই শুধু আমরা সারাক্ষণ অনুভব করতে পারি, কিন্তু তার বিচার করতে পারি না, কোন রূপই দিতে পারি না। আমাদের জীবন যে ব্যর্থ হয়ে গেছে তা অতি সত্যি, কিন্তু কেন যে হল তা' আমরা বুঝতে পারি না। ভগবান, আমাদের এ অপ্রকাশ্য ও রূপহীন উপলব্ধি ও চেতনাকে ধ্বংস করে দাও— দয়াময়। মিনতি ঊর্ধ্বে চাহিল।

সুজিত বলিল, কি ভাবছ, মিনতি! ভাবছ কি আমরা আবার নতুন করে জীবন সুরু করতে পারি, জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে পারি। পারব মিনতি, আমরা নিশ্চয়ই পারব। তুমি ফিরে চল!

অদূরে দামে ঠাসা বিলের পাড় দিয়া একটি রাখাল বালক গরু লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। বালকটি আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে,—

'দিনের আলো যার ফুরাল সাঁঝের আলো জ্বল্‌ল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়........'

একটি অশিক্ষিত রাখাল বালকের মুখে বিদায় সঙ্গীত শুনিয়া মিনতির প্রাণ চমকিয়া উঠিল। তাহার কেন যেন মনে হইল, এই ত মানুষের জীবন। দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হইয়াছে মনে হওয়ায় সে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। কী তাহার ভবিষ্যৎ তাহা সে জানে না। হয়ত আবার সে লক্ষ্ণৌ যাইবে, আবার শিক্ষকতার জীবন আরম্ভ করিবে। হয়ত শিক্ষকতার কাজেই তাহার জীবন শেষ হইয়া যাইবে।

কত আশা করিয়াই জীবন সুরু করিয়াছিল, কত আকাশ-কুসুম কল্পনায় লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া কোন সুদূরে দেশে আসিয়াছিল। যাহার আশায় সে লক্ষ্ণৌ, বন্ধুবান্ধব, সভ্যতা, আভিজাত্য সব ত্যাগ করিয়া এই ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহরে আসিতে একটু দ্বিধা করে নাই, ভাটির দেশের পল্লীগ্রামে বাস করিতেও একটুও কুণ্ঠা বোধ করে নাই, তাহা এমনিভাবে কেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল? তবে মানুষ শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া, সভ্যতার আলোক লাভ করিয়া কি লাভবান হইল? ইহার জন্য কি আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা দায়ী নয়? এ কেমন শিক্ষা যাহার জন্য এমনি অজ্ঞাত কারণে মানুষের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়!

তাহার স্বামী কংগ্রেসকর্মী। উদার, সাহসী, বীর ও ত্যাগী। দিবারাত্র কঠোর শ্রম করিয়া কখনও ক্লান্ত হয় না, দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য সর্বদা এক দুর্যোগের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। এমন স্বামীকে পাইয়াও কেন সে সুখী হইতে পারিল না?

মিনতি কোন জবাব দিতে পারিল না। কেমন একটা দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে সাঁঝের আকাশে চাহিয়া রহিল। তাহার বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত অনুভূতিতে এখনও রাখাল বালকের বিদায় সঙ্গীতের সুরের রেশখানি লুটোপুটি খাইয়া পড়িতেছে।

গাড়ী ছাড়িবার বেশী বিলম্ব নাই। নৌকা ষ্টেশন ঘাটে লাগিবামাত্র সুজিত ও মিনতি তাড়াতাড়ি করিয়া ষ্টেশনে আসিল।

খানিকক্ষণ পূর্বে কলিকাতা হইতে ডাক-গাড়ী আসিয়াছে। পত্রিকার হকারগণ চীৎকার করিতেছে।

হকারের চীৎকারে সুজিত থমকিয়া দাঁড়াইল।

হকার চীৎকার করিয়া উঠিল 'ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাঁধিল' 'জার্মান-পোল্যান্ড বাবু.........'

সুজিত চট করিয়া একখানা কাগজ কিনিয়া লইল।

গাড়ী ছাড়িবার কথা সুজিত ভুলিয়া গেল, এক স্থানে নিশ্চলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া পত্রিকাটি পড়িয়া চলিল।

কুলিরা বলিল, বাবু বেশী সময় নেই কিন্তু।

সুজিত বড় বড় হেডিংগুলি ও প্রধান প্রধান সংক্ষিপ্ত সংবাদগুলি পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হইল।

কুলিরা জিনিষপত্রগুলি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। মিনতি কুলিদের পয়সা দিয়া সুজিতের পাশে আসিয়া বসিল। মিনতি বলিল, গ্রেটওয়ার বাধল শেষ পর্যন্ত! মিনতির কণ্ঠে অজানা আতঙ্ক ও বিস্ময়ের স্বর।

সুজিত কোন কথা বলিল না। সে তন্ময় হইয়া য়ুরোপের মানচিত্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। স্থির, গম্ভীর, মৃত্যুর মত দৃঢ় চাহনি। মিনতি ভাবিয়াছিল, সুজিত জোরে জোরে সংবাদগুলি পড়িবে, কিংবা সারমর্ম বলিয়া দিবে, কিন্তু সুজিত কোন কথাই বলিল না। এমন কি মিনতির অস্তিত্বই যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে।

মিনতি একবার সুজিতের মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত—অদ্ভুত ওই মুখের চেহারা—ভয়ঙ্কর। মিনতি ভয় পাইয়া গেল।

মিনতি সুজিতের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া সংবাদপত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দেহের পাশে দেহ, মুখের পাশে মুখ—যেন অতি ঘনিষ্টভাবে দুইজনে সংবাদ পড়িতেছে।

সংবাদপত্র হইতে সুজিত যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন তাহার মন নানা প্রকার জটিল সমস্যায় ভরিয়া গিয়াছে।

মিনতি ভয়ে ভয়ে সুজিতের মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত সুজিতের চাহনি, অদ্ভুত তাহার হাবভাব, ভয়াবহ তাহার গাম্ভীর্য, দুর্বোধ্য তাহার মনস্তত্ত্ব ও চিন্তাধারা।

চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মিনতির মনে হইল, এমন রূপ যেন সে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় দেখিয়াছিল। তখন ছিল তাহাদের প্রথম যৌবন, নূতন অনুভূতি, নবীনতম প্রণয়রাগ। এমনি করিয়াই তাহারা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া, মাতাল নেশায় চাহিয়া চলিয়াছিল কোন সুদূর সমুদ্র তীরে। প্রথম প্রণয়ের মিলনরাগে দেহের কানায় কানায় ফুটিয়াছিল যৌবনের ও মাধুর্যের শতদল, মনের অণু-পরমাণুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল শতরূপের অগ্নিশিখা হৃদয়ের গহন দ্বার হইতে বাজিয়া উঠিয়াছিল সুমধুর সুরে সপ্ত রাগ-রাগিণী। কিন্তু মিনতির মনে পড়িতেও শরীর শিহরিয়া উঠিল। মিনতির মনে পড়িল, এক নিমিষে সব-কিছুই চুরমার হইয়া গিয়াছিল। বৃহত্তর পৃথিবীর আহ্বান ও মানবতার আকর্ষণ রোধ করিতে পারে এমন শক্তি তাহার ছিল না—প্রেমদেবতারও ছিল না। তাহার অস্ফুট আর্তনাদ, অজস্র নয়নধারা, প্রেমদেবতার অপমৃত্যু বীরের জয়যাত্রা পথের ধূলিতে অলক্ষ্যে মিলাইয়া গিয়াছিল।

গাড়ী পূর্ণগতিতে চলিয়াছে। সুজিত পুনরায় উত্তেজিতভাবে পত্রিকার মানচিত্রের দিকে চাহিল।

মিনতি ভয়ে ভয়ে ডাকিল, ওগো, শুনছ?

সুজিত কোন সাড়া দিল না।

মিনতি প্রশ্ন করিল, গ্রেট ব্রিটেন নিশ্চয়ই যুদ্ধ ঘোষণা করবে না? যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে কি তোমাদের গ্রেপ্তার করা হবে? তোমরা ত' চরমপন্থী।

সুজিত মিনতির প্রশ্নের কোন জবাব দিল না, পত্রিকাতেই চোখ রাখিয়া বলিল, আমাকে তোমার শেষবারটি ক্ষমা করতে হবে। আমি ঢাকাতে নামতে পারব না। নেক্‌ষ্ট ষ্টেশনে তার করে দেব, ওরা তোমায় নারায়ণগঞ্জ থেকে নিয়ে যাবেন।

ঃ তুমি! মিনতির গলা অসম্ভবরকম ভাবে কাঁপিয়া উঠিল।

ঃ আমি সোজা কলকাতায় যাব। আমি এ অবস্থায় এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারিনে—হয়ত এতক্ষণে বাড়ীতে তার গেছে। তুমি ভয় পেয়ো না, কেউ যদি ষ্টীমারঘাটে না আসতে পারেন, তবে তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পার। মামীমার বাড়ীতে তুমি উঠো। পরে তুমি ঢাকায় যাবার বহু সঙ্গী পাবে, কিংবা যদি না যাও তবে তোমার বাবা লক্ষ্ণৌ যাবার পথে তোমায় নিয়ে যাবেন।

মিনতি সুজিতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, না, তা' হয় না।

সুজিত অবাক হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীর ও সংযতকণ্ঠে বলিল, মানে! সুজিত হাত দুইটি মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, ভুল করছ মিনতি—আমি কংগ্রেসকর্মী!

কর্মী! মিনতি যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

মিনতি কোন জবাবই দিল না, কোন জবাব দিতে পারিল না—শুধু প্রাণপণ শক্তিতে সুজিতের হাত দুইটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সুজিতের কোলে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মিনতির চোখ দুইটি বুজিয়া গিয়াছে, শরীরটা মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে।

সূর্য্যের পরমায়ু

শ্রীসুখময় গঙ্গোপাধ্যায় এম, এস-সি

রাত্রিতে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকাইলে সহস্র সহস্র নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা আরও অধিক সংখ্যক দেখিতে পারি। এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আছে যারা আকারে আমাদের এই পৃথিবী হইতে ছোট, বরং অধিকাংশ নক্ষত্রই এত বড় যে সহস্র সহস্র পৃথিবী উহাদের একটির মধ্যে পুরিয়া রাখা যাইতে পারে। আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রের সংখ্যাও এত বেশী যে, বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীর বালুকা-কণার সংখ্যাও তাহা হইতে কম হইবে। এই নক্ষত্রগুলি এক অসীম শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের তুলনায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এত বড় যে, তাহাদের একটি হইতে অন্যটি বহুদূরে অবস্থিত। কাজেই ইহাদের একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ বড় ঘটে না। অবশ্য অনেকগুলি নক্ষত্র কাছাকাছি অবস্থিত এরূপও দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, প্রায় ২০০ শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের সহিত একটি নক্ষত্রের প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে গ্রহগুলির জন্ম হয়। একটি নক্ষত্র ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ সূর্য্যের আকর্ষণীয় দূরত্বের মধ্যে আসিয়া পড়ে। আমাদের পৃথিবীতে যেমন চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা খেলে, তেমনি নক্ষত্রটির আকর্ষণে ততই বেশী ফুলিতে লাগিল এবং ক্রমে বিরাট পর্ব্বতের আকার ধারণ করে। এই আকর্ষণী শক্তি, নক্ষত্রটি ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই এতটা বাড়িয়া গেল যে, সূর্য্যের অংশটি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায় এবং তাহার টুকরাগুলি সূর্য্যের আকর্ষণে তহারি চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এই গুলিই গ্রহ এবং পৃথিবী ইহাদের অন্যতম।

সূর্য্য এবং তারকাগুলি এত প্রচণ্ড উত্তপ্ত যে, তাহাতে জীব-জন্তুর বাস সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহগুলি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতে লাগিল এবং এখন তাহাদের নিজস্ব তাপ সামান্যই আছে। তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যের আলোকে আলোকিত ও উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীও যখন ঠাণ্ডা হইল তখন তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি অবস্থার সমন্বয় হইল যে, তাহাতে জীবের জন্ম সম্ভব হইল। কখন এবং কিরূপভাবে তাহা হইল সে সম্বন্ধে আমরা সঠিক কিছুই জানি না।

এই অসীম বিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী যে কত নগণ্য তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সুতরাং ইহা আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারি না যে, আমাদের এই সামান্য পৃথিবীর জীব-জন্তুর জন্মের জন্যই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ তাহা হইলে আর ক্ষেত্রের তুলনায় উৎপন্ন শস্য এত সামান্য হইত না। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে চুম্বক বা তড়িতের মতই প্রাণেরও আবির্ভাব হইয়াছে।

পৃথিবীতে জীব-জন্তুর বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ অবস্থা (Physical Conditions) পূরণ হওয়া দরকার, তাপ (Temperature) এবং আলো (Light) ইহাদের মধ্যে প্রধান। জীব-জন্তুর প্রয়োজনীয় আলো ও তাপ সূর্য্য-কিরণ হইতে পাইয়া থাকে। সুতরাং যদি কখনও আমরা প্রয়োজনীয় আলো বা তাপ হইতে বঞ্চিত হই, তবে প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন যে, আমাদের এই পৃথিবীতে এক সময় আসিবে যখন ইহা সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যের আলো এবং তাপ হইতে বঞ্চিত হইবে, কারণ তখন আমাদের সূর্য্যেরই অস্তিত্ব থাকিবে না। হয়ত ইহার বহুপূর্ব্বেই পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। পৃথিবী যে এক সময়ে ধ্বংস হইয়া যাইবে তাহা প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই বিশ্বাস করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ বলেন, সেই ধ্বংস হইবে তাপের অভাবে, কিরূপে তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত কিরণ (radiation) বিকীরণ করিতেছে। নিউটন বলিতেন যে, আলো বস্তু-কণার (corpuscles) সমষ্টিমাত্র এই কণাগুলি আমাদের চক্ষুর উপর পড়িলে আমরা দৃষ্টিশক্তি পাই। কিন্তু নিউটনের এই থিওরী সর্ব্ব বিষয়ে (phenomenon) প্রযোজ্য না হওয়ায় বিখ্যাত ডাচ্ বৈজ্ঞানিক হিগেনস্ বলিলেন, আলো ইথরের মধ্যে একপ্রকার কম্পন ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে এই থিওরীও কোন কোন বিষয়ে অকেজো হইয়া পড়ে এবং এর পর আমরা গ্রহণ করিলাম প্লাঙ্কের (Plank)এর কোনটাম থিওরী (Quantum Theory)। এই থিওরী গ্রহণ করায় আমরা প্রকারান্তরে আবার সেই নিউটনের থিওরীতেই (Corpuscles Theory) ফিরিয়া আসিয়াছি। কোনটাম থিওরী মতে আলো কতকগুলি কণার (Photons) সমষ্টিমাত্র। এই আলোকণাগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে চলিতেছে এবং এই কণাগুলির শক্তি এবং ওজন দুই আছে। এই কণাগুলি আমাদের পৃথিবীর উপর যে চাপ দিতেছে তাহার পরিমাণ লিবিডিউ, নিকলস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ করিয়াছেন। একটি আলোকণার কতটা শক্তি (energy) আছে, তাহা নিম্নোক্ত ফরমুলা দ্বারা বাহির করা যায়।

শক্তি (Energy) = প্লাঙ্ক সংখ্যা (Planks Constant) × প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যা আইনষ্টাইনের থিওরী মতে প্রত্যেক শক্তিরই বস্তু হিসাবে তাহার একটা পরিমাণ আছে। বহু বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় তাহা প্রমাণিত ও হইয়াছে। তাহর ফরমুলা—

বস্তু পরিমাণ (mass) = শক্তি ÷ (গতি বেগ)২

সুতরাং আমরা আলো-কণার ওজন বাহির করিতে পারি। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় এক আউন্সের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ ওজনের সূর্য্যের আলো পৃথিবীর প্রতি বর্গ-মাইল স্থানের উপর এক মিনিটে পড়ে। এই এক বর্গ-মাইল স্থানের উপর আলোর চাপ হইবে প্রায় বাতাসের চাপের আড়াইশত কোটি ভাগের এক ভাগ। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে সূর্য্যের আলোর ওজন খুবই কম মনে হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সূর্য্য চতুর্দ্দিকে এক অসীম বিশ্বে আলো বিতরণ করিতেছে এবং তাহার তুলনায় এক বর্গ মাইল স্থান নগণ্য। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে সূর্য্য প্রতি মিনিটে প্রায় আড়াই কোটি টন আলো তাহার চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতেছে। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই কারণে সূর্য্যের আয়তন দিন দিনই কমিতেছে এবং তাহা হইতে প্রদত্ত আলোর পরিমাণও প্রতিদিন কমিয়া যাইতেছে।

সূর্য্যের এই যে জ্ঞান যাহা দিন দিন কমিতেছে, তাহা অন্যদিক দিয়া পূরণ হইতেছে কি না তাহাও আমাদের দেখা প্রয়োজন। প্রথমত কিছু ওজনের আলো অন্যান্য নক্ষত্র হইতে সূর্য্যের উপর পড়িতেছে, কিন্তু যে পরিমাণ আলো সূর্য্য হইতে বাহির হইতেছে তাহার তুলনায় ইহা খুবই কম, সুতরাং এই আলোর পরিমাণ আমরা আমাদের গণনা হইতে বাদ দিতে পারি। দ্বিতীয়ত সূর্য্য তাহার অসীম শূন্যে ভ্রমণকালে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত meteors এবং অন্যান্য ভ্রাম্যমান পদার্থ তাহার উপর পতিত হয়। এই meteors সৌর-জগতে অসংখ্য আছে। কখনও কখনও এইগুলি পৃথিবীর আকর্ষণীয় দূরত্বের মধ্যে আসিয়া প্রজ্বলিত হইয়া যায় এবং এই গুলিকেই আমরা shooting stars বলি। অনেক সময় ইহারা ভূপৃষ্ট স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, কিন্তু এই গুলি আকারে যদি খুব বড় হয় তবে সবটা ছাই হইবার পূর্ব্বই পৃথিবীতে পড়ে। এইগুলিকেই আমরা meteorite ও আমাদের পৃথিবীতে সেপ্লি (shapley) নামক একজন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রতিদিন বহু কোটি shooting star আমাদের

(শেষাংশ ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

[শ্রীঅরবিন্দ]

গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন রূপ

বিশ্বরাষ্ট্রের সম্ভাবনা

স্বাধীন অধিজাতি ও সাম্রাজ্য সকলকে লইয়া একটি নিখিল বিশ্ব-সম্মেলন, তাহা প্রথমে হইবে শিথিল, কিন্তু কালক্রমে এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবে—প্রথম দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ঐক্যের এই রূপটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম বলিয়া মনে হয়; বস্তুত, মানব-জাতির মনে ঐক্যের সঙ্কল্প যদি ত্বরায় ফল-প্রসূ হয়, তাহা হইলে কেবল এই রূপটিই এখনই কার্য্যত সিদ্ধ হইতে পারে। অন্যপক্ষে রাষ্ট্রবাদই হইতেছে এখন প্রভাবশালী। রাষ্ট্রই হইয়াছে ঐক্য-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য ও নিপুণ উপায় এবং সমাজ সকলের প্রগতিশীল সামূহিক জীবন নিজের জন্য যে সব প্রয়োজন সৃষ্ট করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, রাষ্ট্রই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে সে সবের সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহা ছাড়া মানব-জাতি এখন এই কৌশলটিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার যৌক্তিক এবং তাহার ব্যবহারিক বুদ্ধি, উভয়ের পক্ষেই এইটি হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পন্থা। কারণ, ইহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট যন্ত্র এবং অর্গানিজেশনের কড়াকড়ি পদ্ধতি দেয় এবং আমাদের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি সর্ব্বদা এইটিকেই সর্ব্বোত্তম কৌশল বলিয়া মনে করে। অতএব ইহা মোটেই অসম্ভব নহে যে, যদি একটা শিথিল সম্মেলন লইয়াই আরম্ভ করা হয়, তথাপি জাতি সকল তাহাদের প্রয়োজন ও স্বার্থসমূহের উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ হইতে যে সব বহুল সমস্যা উঠিবে, তাহাদের চাপে সেই সম্মেলনকে দ্রুত একটি বিশ্বরাষ্ট্রের অধিকতর কড়াকড়ি আকারে পরিণত করিতে অগ্রসর হইবে; এইরূপ একটি রাষ্ট্রের সৃজন এখনই কার্য্যত সম্ভব নহে, অথবা বহু সমস্যা ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে—এইরূপ সব আপত্তি হইতে আমরা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না; কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, "কার্য্যত অসম্ভব" (impracticability) —এই আপত্তির বিশেষ কোন মূল্যই নাই। আজিকার কাজের লোক যেটাকে আজগুবি ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেয়, অনেক সময়েই দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগের মানুষ ঠিক সেইটিকেই বাস্তবে পরিণত করিতে লাগিয়া যায় এবং ঘটনা-ক্রমে কোন না কোন আকারে সেইটিকে কার্য্যত সিদ্ধ করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রের অর্থ হইতেছে, একটি বলিষ্ঠ কেন্দ্রীয় শক্তি-প্রতিষ্ঠান, তাহা হইবে জাতি সকলের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিনিধি, অন্তত তাহার প্রতীকস্বরূপ। এই কেন্দ্রীয় ও সাধারণ শাসকমণ্ডলীর হস্তে সমস্ত প্রয়োজনীয় শক্তিগুলি—সামরিক, শাসন-নির্ব্বাহক, বিচার-বিষয়ক, অর্থনৈতিক, আইন-বিষয়ক, সামাজিক, শিক্ষা-বিষয়ক শক্তিগুলি থাকা, অন্তত এই সব শক্তির উৎস থাকা অনিবার্য্য হইবে। আর ইহার প্রায় অনিবার্য্য ফল হইবে, সমস্ত জগৎব্যাপিয়া এই সকল বিভাগে ক্রমবর্দ্ধমান সম-রূপতা, এমন কি, সম্ভবত একটি সাধারণ ও বিশ্বজনীন ভাষাও নির্ব্বাচন বা সৃষ্টি করা হইবে। বস্তুত, ঐক্যবদ্ধ জগতের এই-রূপ স্বপ্নই আদর্শ বিলাসীরা উত্তরোত্তর আমাদের সম্মুখে ধরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পরিণতিতে উপনীত হইবার পথে প্রতিবন্ধকগুলি বর্ত্তমানে সুস্পষ্ট, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে সেগুলি যত কঠিন মনে হয়, সম্ভবত সে গুলি তত কঠিন নহে; আর তাহাদের কোনটিই এমন নহে, যাহার সমাধান হইতে পারে না। আদর্শ বিলাসীর অবাস্তব স্বপ্ন বলিয়া আর ইহাকে ঠেলিয়া রাখা চলে না।

বিশ্বরাষ্ট্র শাসকমণ্ডলীর রূপ কি হইবে

এই শাসকমণ্ডলীর স্বরূপ ও গঠন-প্রণালী কিরূপ হইবে, সেইটিই প্রথম সমস্যা, আর এই সমস্যা সংশয় ও বিপদে পূর্ণ। প্রাচীনকালে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান সহজেই হইয়াছিল স্বৈর ও রাজতান্ত্রিক সমাধানের দ্বারা; বিজেতা জাতির শাসনেই ইহার আরম্ভ হইয়াছিল, যেমন হইয়াছিল পারসীক ও রোমক সাম্রাজ্যে। কিন্তু মানব-সমাজের নূতন পরি-স্থিতিতে সেই সমাধান আর আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, অতীতে শক্তিশালী জাতি বা তাহাদের জার বা কাইজারের মাথায় যে স্বপ্নই ঢুকিয়া থাকুক না কেন। রাজতন্ত্র স্থায়িত্ব ও পুনরাবর্ত্তনের একটা ক্ষণিক ও ভ্রান্ত প্রয়াসের পর নিজেই অস্তমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় মনে হইতেছে যে, ইহা অন্তিম শ্বাসের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহার উপর মৃত্যুর ছাপ পড়িয়াছে। সমসাময়িক ঘটনার বাহ্য দৃশ্য হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনেক সময়েই ভ্রান্তিজনক, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অপেক্ষা এই ক্ষেত্রে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম, কারণ, এখনও বিদ্যমান রাজতন্ত্রগুলিকে লুপ্ত করিবার জন্য যে শক্তি কাজ করিতেছে, তাহা প্রবল, মূলগত এবং ক্রমবর্দ্ধমান। সামাজিক সমুচ্চয় সকল এখন স্ব-চেতন পরিণতাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহাদের হইয়া তাহাদের শাসনকার্য্য করিয়া দিবার জন্য অথবা তাহাদের প্রতীক-স্বরূপ হইবার জন্য কোন পুরুষানুক্রমিক রাজপদের আর প্রয়োজন নাই—কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায় কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ রাজপদের প্রয়োজন হইতে পারে। অতএব হয় রাজতন্ত্র কেবল নামে মাত্র বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে,—যেমন ইংলণ্ডে, সেখানে তাহার ক্ষমতা ফরাসী প্রেসি-ডেণ্টের অতি নগন্য ক্ষমতা অপেক্ষাও কম, আর আমেরিকার গণ-তন্ত্রগুলির প্রেসিডেণ্টের তুলনায় তাহার ক্ষমতা যে কত কম, তাহার সীমা নাই—নতুবা তাহা হইয়া দাঁড়াইবে একটা আপদ-স্বরূপ। জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক এবং প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি সকলের অল্পাধিক কেন্দ্রস্বরূপ, আশ্রয়, অন্ততপক্ষে তাহাদের একটা সুযোগস্বরূপ। অতএব ইহার মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমশ হ্রাসের দিকেই চলিয়াছে। আর যখনই কোন সন্ধিক্ষণে ইহা জাতির জাতীয়তা-বোধের সহিত অতি মাত্রায় সঙ্ঘর্ষে আসিতেছে, তখনই এমনভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে যে, তাহার পুনরুত্থানের আর বিশেষ কোন আশাই থাকিতেছে না।

রাজতন্ত্রের ক্রমিক বিলোপ

এইভাবে রাজতন্ত্র ধ্বংস হইতেছে অথবা বিপন্ন হইতেছে; যে সকল দেশে রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য এক সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, সেই সকল দেশেই ইহা অতি অতর্কিতভাবে ঘটিয়া যাইতেছে। এমন কি, বর্ত্তমানেই ইহা চীন, পর্ত্তুগাল, রুশিয়ায় ধ্বংস হইয়াছে, গ্রীসে এবং স্পেনে বিপন্ন হইয়াছে। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং কয়েকটি ক্ষুদ্রতর রাজ্য ব্যতীত কোন পাশ্চাত্য দেশেই ইহা প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী নহে, আর এই সকল দেশেও তাহারা যে সব কারণে বর্ত্তিয়া আছে, সে সব ইতিমধ্যেই অতীতের সামিল হইয়া পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাদের জোর কমিয়া যাইতে পারে*। ধরিয়া লওয়া যাউক যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে, সেই ঘটনা স্রোতেই

---

* বস্তুত, এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর রাজতন্ত্র জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় ধ্বংস হইয়াছে, ইটালীতে বিপন্ন হইয়াছে, স্পেন হইতে বিদূরিত হইয়াছে। আজ প্রায় সর্ব্বত্রই রাজতন্ত্র হয় বিলুপ্ত, না হয় বিপন্ন।

জার্ম্মাণীতে হোহেনজলরদের ঐতিহাসিক প্রভুত্বও লুপ্ত হইবে, তাহা হইলে আর সন্দেহের কোন কারণই থাকিবে না যে, ইউরোপ কালক্রমে দুইটি আমেরিকার ন্যায় সর্ব্বত্রই রিপাবলিকান হইয়া উঠিবে। কারণ, রাজতন্ত্র এখন কেবল অতীতেরই অবশেষ; আধুনিক মানব-জাতির ব্যবহারিক প্রয়োজন বা আদর্শ বা প্রকৃতিতে ইহার আর কোন গভীর শিকড় নাই। যখন ইহা লুপ্ত হইবে, তখন ইহা আর জীবিত রহিল না বলা অপেক্ষা ইহা আর অবশিষ্ট রহিল না বলাই অধিকতর সত্য হইবে।

রিপাবলিকান প্রবৃত্তি—চীনের দৃষ্টান্ত

রিপাবলিকান প্রবৃত্তিটি হইতেছে, তাহার উৎপত্তিতে প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য জিনিষ। আমরা পশ্চিম দিকে যতই যাই, ততই এইটিকে অধিকতর শক্তিশালী দেখিতে পাই: ইতিহাসে দেখা যায়, এইটি প্রধানত পশ্চিম ইউরোপেই প্রবল হইয়াছে এবং আমেরিকার নূতন সমাজগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, জগতের সক্রিয় সম্মিলিত জীবনে এশিয়া যখন প্রবেশলাভ করিবে, তাহার বর্ত্তমান যুগ-সন্ধির তীব্র বেদনা অতিক্রম করিয়া জগৎ সভায় নিজ স্থান করিয়া লইবে, তখন হয়ত' রাজতন্ত্র তাহার শক্তি পুনরুদ্ধার করিবে এবং জীবনী-শক্তির একটা নূতন উৎস পাইবে। কারণ এশিয়াতে রাজতন্ত্র কেবল রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন ও পরিস্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ঐহিক ব্যাপার মাত্র নহে, পরন্তু ইহা হইয়াছে একটি আধ্যাত্মিক প্রতীক এবং ইহাকে পুণ্য চক্ষে দেখা হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপের ন্যায়ই এশিয়াতেও রাজতন্ত্র ইতিহাসের ধারাতেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে, অবস্থাবিশেষেরই পরিণতি হইয়াছে, অতএব ঐ সকল অবস্থা যখন আর না থাকিবে, তখন তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। এশিয়ার যে প্রকৃত মন, তাহা সকল বাহ্য-দৃশ্যের পশ্চাতে সকল সময়েই রহিয়া গিয়াছে: সামাজিক—রাজনৈতিক নহে, তাহা বাহ্যত রাজতান্ত্রিক এবং আভিজাতিক, কিন্তু তাহাতে রহিয়াছে মূলগত গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তি এবং ধর্ম্মীয় ভাব। জাপান তাহার গভীরভাবে বদ্ধমূল রাজতান্ত্রিকতা লইয়া হইয়াছে এই সাধারণ নিয়মের একটি মাত্র প্রখ্যাত ব্যতিক্রম। ইতিমধ্যেই পরিবর্ত্তনের দিকে একটা প্রবল প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। চীন ভিতরে ভিতরে সকল সময়েই গণতান্ত্রিক ছিল, যদিও তাহার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে সরকারী কার্য্যের জন্য বুদ্ধিজীবীর আভিজাত্য এবং প্রতীকস্বরূপে একটি সম্রাটকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু এখন সে নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট-ভাবেই রিপাবলিকান হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান করা অথবা তাহার পরিবর্ত্তে সামরিক স্বৈর-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে প্রতিবন্ধক হইয়াছে চীনবাসীর অন্ত-র্নিহিত গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তি, এখন উচ্চতম গবর্ণমেণ্টে গণতন্ত্র রূপে গৃহীত হওয়ায়, তাহা আরও প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে (গবর্ণমেণ্টের এই গণতান্ত্রিক রূপটিই হইতেছে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার একমাত্র মূল্যবান অবদান, প্রাচ্যের প্রাচীন বিশুদ্ধভাবে সামাজিক গণতন্ত্রগুলি এই সমাধানে উপনীত হইতে সক্ষম হয় নাই)। চীন তাহার সুদীর্ঘ রাজবংশপরম্পরার শেষ বংশকে বর্জ্জন করিয়া তাহার অতীতের এমন একটি অংশকে বর্জ্জন করিয়াছে, যেটি বস্তুত তাহার সামাজিক ধাত ও সংস্কারসমূহের একেবারে কেন্দ্র ছিল না; পরন্তু কেবল একটা বাহ্যিক অংশমাত্র ছিল। ভারতবর্ষে রাজতান্ত্রিক প্রবৃত্তি যাজকীয় ও সামাজিক প্রবৃত্তির সহিত একসঙ্গে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু কোনদিনই ইহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই (কেবল মোগলদের অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী শাসন ছিল ইহার ব্যতিক্রম)। আর এখন তাহা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের শাসনের ফলে এবং জাতির সক্রিয় মন ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত হওয়ায়, তাহা একেবারেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, যদিও তাহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই*। পারস্য দেশে রাজতন্ত্র নবজাত পারস্য স্বাধীনতাকে নষ্ট করিতে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রচ্ছন্ন বৈদেশিক শাসনের যন্ত্র হইয়াছে, তাহাতে তাহা অবিশ্বাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

এশিয়া মহাদেশের দুইটি প্রান্তে, জাপান ও তুরস্কে রাজতন্ত্র এখনও কতকটা তাহার প্রাচীন শ্রদ্ধাভাজনতা এবং জাতির মনে তাহার প্রতি ভক্তি বজায় রাখিয়াছে। জাপান এখনও সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিকভাবাপন্ন হইয়া উঠে নাই, তথাপি সেখানে মিকাডোর প্রতি ভক্তি যে হ্রাস হইতেছে, তাহা সুস্পষ্ট; তাহার মর্যাদা এখনও বর্ত্তিয়া আছে, কিন্তু তাহার বাস্তব ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ, আর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাব যেমন বৃদ্ধি পাইবে, তেমনিই রাজতন্ত্রের শক্তি আরও হ্রাস হইতে বাধ্য এবং ইহার ফলে ইউরোপে যেমন হইয়াছে, এখানেও সেইরূপই হইতে পারে। মুসলমানদের খলিফা প্রথম ছিল ধর্ম্মীয়, গণ-তন্ত্রের ঘাতকস্বরূপ, মুসলমান সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, সে সাম্রাজ্য এখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার একটুমাত্র দুর্ব্বল অংশ কন্‌স্তান্তিনোপল ও এশিয়া মাইনরের উপর তুরস্কের শাসক-রূপে কোন রকমে টিকিয়া আছে। খলিফার পদ এখন কেবলমাত্র ধর্ম্মনায়কত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহাতেও তাহার ঐকিকতা পারস্য, আরব ও মিশরে নব আধ্যাত্মিক ও জাতীয় আন্দোলনের ফলে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজিকার এশিয়ায় একটি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হইতেছে এই যে, ইহার ভবিষ্যতের সমগ্র সক্রিয় শক্তি এখন আর যাজক সম্প্রদায় বা অভিজাত সম্প্রদায়ে কেন্দ্রীভূত নহে, পরন্তু রুশিয়ার ন্যায়, এমন কি, রুশিয়া অপেক্ষাও বেশী উহা এখন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—তাহাদের সংখ্যা এখনও অল্প, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় এবং সংকল্পের দৃঢ়তায় দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহারা সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন নূতন পরিকল্পনার উপর তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার কল্যাণে তাহারা সাতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিতে বাধ্য। এশিয়া যে তাহার প্রাচীন আধ্যাত্মিকতাকে হারাইবে, তাহা সম্ভব নহে; বরঞ্চ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তেই সে জড়বাদী ইউরোপীয় মনের উপর স্বীয় মর্যাদা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতা কোন্ পথ ধরিবে, তাহা এই নূতন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনোভাবের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে এবং তাহা যে প্রাচীন পরিকল্পনা ও প্রতীকসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। এশিয়ার প্রাচীন রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র লুপ্ত হইতে বাধ্য; নূতন আকারে তাহারা পুনরাবির্ভূত হইবে, এখন সেরূপ সম্ভাবনা কিছুই নাই, যদিও ভবিষ্যতে তাহা ঘটিতেও পারে।

---

* এই দিকে কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-তর দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের যে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট ও অর্থসূচক।

(ক্রমশ)

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা

(ছোট গল্প)

শ্রীস্মরজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

"মা, এই দেখ কত বই পেয়েছি। একটা মেডেলও দিয়েছেন। দেখছ মা, মেডেলটি কত বড়, আর কেমন সুন্দর, না মা?"—এই বলিয়া কল্যাণী উৎসুকনেত্রে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুলতা অদূরে বসিয়া কুটনো কুটিতেছিলেন। কল্যাণী নিকটে বসিলে তিনি মেডেলটি হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "সত্যি, বেশ তো মেডেলটি!"

কল্যাণী কহিল, "ইংরেজীতে ফার্ষ্ট হয়েছি কিনা, তাই হেডমাষ্টার মশাই দিলেন।"

'খুক্'—কল্যাণী কাশিয়া উঠিল। কাশির বেগ থামিলে কহিল, "দেখ মা, আজ কদিন থেকে কি রকম যে কাশি হয়েছে, বাবাকে যদি কিছু ওষুধ দিতে বল তো...........।"

"মা, আজকে আর স্কুলে যাবো না, কেমন যেন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে। কাশিটাও যেন বেড়েছে। হ্যাঁ মা, আজ কদিন তো হ'ল ওষুধ খাচ্ছি, কাশি তবুও কমছে না কেন মা?"

মধ্যরাত্রে কাশির শব্দে হঠাৎ সুলতার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কাশি যেন আর থামিতে চায় না। "বমি ক'রবি নাকি রে?"—বলিয়া দ্রুত একটি সরা লইয়া আসিয়া কল্যাণীর মুখের নিকট ধরিলেন। কিন্তু বমি অধিক হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কাশির বেগ থামিলে তিনি সরাটা খাটের পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। রাখিয়া দিবার সময় সরার ভিতরে চক্ষু পড়িতেই সুলতা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার সারা অঙ্গ দিয়া যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া গেল।......সরাটায় ছিল কয়েক বিন্দু রক্ত!

"বাবা।"

"কি মা?"

"আমার নাকি স্কুলে নাম কাটিয়ে দিয়েছে? ভারী তো জ্বর, আর কদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। তবে আমার নাম কাটিয়ে দিলে কেন বাবা?"

অলস মধ্যাহ্ন। কল্যাণী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। রাস্তা দিয়া ফেরীওয়ালা হাঁকিয়া যায়, "ছিট্ চাই, রঙীন ছিট্..........."

কল্যাণী চমকিয়া উঠিয়া পড়ে। সুলতাকে ডাকিয়া বলে, "মা, আমার জন্যে একগজ ছিট্ কেনো না মা। সেজদিকে বলো, একটা জামা করে দেবে অখন। আর কদিন পরেই তো স্কুলে যেতে হবে। অন্য জামাগুলো সব পুরানো হয়ে গেছে। রোজই সে সকল জামা পরতে ভাল লাগে না। অন্য মেয়েরা রোজ রোজ কত রঙের জামা পরে আসে।"

"আচ্ছা, ডাক্তারবাবু! রোজ কি বার্লি খেতে ভালো লাগে? বাবাকে বলি, একটু বিস্কুট অথবা লজেন্স এনে দিতে, তা কিছুতেই এনে দেবে না। আপনি যদি বাবাকে বলেন, তা হ'লে বাবা নিশ্চয়ই এনে দেবেন। বলবেন তো? বলুন না ডাক্তারবাবু।"

"বাবা।"

"কি বলছ মা?"

"একটা কথা বলব বাবা?"

"কি কথা মা?"

"তুমি যদি শোনো তো বলি।"

"নিশ্চয়ই শুনব, কি কথা বল?"

"বলছিলাম কি, আমি যখন স্কুলে যেতাম, তখন আমার পাশে যারা বসত, তারা সকলেই একটা করে ফাউন্টেন পেন নিয়ে আসত। আমায় একটা দেবে বাবা? বল না বাবা, দেবে কিনা?"

"মা।"

"কি মা?"

"আমার বইগুলো ও'রকম করে রেখেছ কেন মা? কত ধুলো পড়েছে দেখতো? এই নূতন সব বইগুলো......। খোকা আবার একটা খাতা নিয়ে দাগ কাটছিল। ওকে নিষেধ করে দিও। দিদিমণি ভারী রাগ করেন কিনা?"

"সেজদি।"

"কি বোন?"

"ছোড়দা যে কাপড়টা দিয়েছে, সেটা ভালো করে রেখে দিও। আমি যখন ভালো হয়ে যাবো তখন ওটা পরে স্কুলে যাবো। আচ্ছা কোন্ রঙের জামা এই কাপড়ের সঙ্গে মানায়, বলনা সেজদি। আগে থেকে ঠিক করে না রাখলে শেষকালে বড় মুস্কিলে পড়তে হয়, না সেজদি?"

"ডাক্তারবাবু। ঠিক করে বলুন না আমি কবে সেরে উঠব? 'আর কদিন পরে' বললে হবে না। একেবারে ঠিক বলুন, কবে স্কুলে যাবো। এই বুধবারের পরের বুধবারে যেতে পারবো? বলুন না ডাক্তারবাবু.........।"

কাল রাত্রি হইতে অসহ্য গরম। ভাদ্রমাসের শেষ ভাগ। অথচ সাত আট দিন যাবৎ একেবারেই বৃষ্টি নাই।

সকাল বেলায় কল্যাণী নিদ্রা হইতে উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইয়াছে। সুলতা থার্ম্মোমিটার লইয়া দেখিলেন, জ্বর মাত্র আটানব্বই। সাধারণত জ্বর এরূপ কমে না। আজ প্রায় তিন মাস হইতে চলিল, রক্ত উঠা বন্ধ হইয়াছে। জ্বরও তাহার উপর আশাতীত কম। সুলতার অন্তরে আশার সঞ্চার হয়। কহিলেন, "মা এবার তুমি শীগ্গিরই সেরে উঠবে। জ্বর আজ খুব কম। মাত্র আটানব্বই।"

"সত্যি মা?" —আশাতীত পুলকে কল্যাণীর হৃদয় ভরিয়া উঠে। গভীর তৃপ্তির সহিত সে ক্রমশ পুনরায় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে।

বেলা দুইটার সময় সুলতা একবাটী গরম দুধ যৎসামান্য বার্লির সহিত মিশাইয়া লইয়া আসিলেন। কল্যাণী তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার রোগক্লিষ্ট মুখখানি ভরিয়া একটি গভীর আশার আবরণ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা বলিয়াছেন, "এবার শীঘ্রিগরই সে সেরে উঠবে।" সুলতা তাহাকে ডাকিলেন না। দুধটা চাপা দিয়া রাখিয়া স্বয়ং তাহার শিয়রের নিকট শুইয়া পড়িলেন। কল্যাণী আজ সকাল হইতে ঘুমাইতেছে। এ রকম সে কোন দিন ঘুমায় না।

বেলা তিনটার সময় হঠাৎ কল্যাণী কাশিয়া উঠিল। সে কাশি আর যেন থামিতে চায় না। তাহার বুকের উপর যেন কে শতমণ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। সমস্ত জীবনের সঞ্চিত ব্যথা আজ যেন বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়।

"এরকম তো কোন দিন হয় না, বমি করবি নাকি?"—এই বলিয়া সুলতা একটা সরা লইয়া আসিলেন। কিন্তু এ-কী? এত রক্ত কেন? সরাটা যে ভরিয়া গেল......। সুলতা ত্রস্তভাবে সরাটা নামাইয়া রাখিয়া নিকটস্থ একটি গামলা লইয়া আসিলেন। কিন্তু কল্যাণীর আজ সারা দেহের রক্ত যেন উজাড় হইয়া চলিয়াছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়া গামলাটা প্রায় ভরাইয়া দিল। সে রক্ত দেখিয়া কল্যাণীর অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। বিবর্ণমুখে সে

কোনরূপে কহিল, "এ-কী মা? এত রক্ত কেন? হ্যাঁ মা, এ-কী? চারিদিক এত অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? মাগো, আমি যে আর নিশ্বাস নিতে পারছি না, আমার নিশ্বাস যে বন্ধ হয়ে আসছে মা.........।"

"ও কিছু না মা, কিছু ভয় নেই" বলিয়া সুলতা কল্যাণীর দৃষ্টির অন্তরালে গামলাটি রাখিয়া দিলেন। তাহার মাথা বালিশের পার্শ্বে এলাইয়া পড়িয়াছে। সুলতা সাড়ীর অঞ্চল দিয়া অতি যত্নে কল্যাণীর মুখের উপরের রক্ত মুছাইয়া দিলেন। বুকের উপর হাত বুলাইতেই কিন্তু সুলতা চমকাইয়া উঠিলেন—এ-কী, এত ঠাণ্ডা কেন? এযে একেবারে বরফের মত......

সুদূর পশ্চিম হইতে প্রলয়ঙ্করী ঝড় ছুটিয়া আসে। নিমেষে কৃষ্ণ মেঘে সারা গগন আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তপ্ত ধরণীর হৃদয়ে সুধামৃত সঞ্চার করিয়া বর্ষার স্নিগ্ধ জলধারা অবিরল ধারায় ঝরিয়া পড়ে। কল্যাণীর রুক্ষ দুই একটি কেশগুচ্ছ অতি ধীরে তাহার মুখের উপর উড়িয়া পড়ে। তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া একটা পরম তৃপ্তির ভাব। কোন বেদনার চিহ্ন সেখানে বর্ত্তমান নাই। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মির মত একটি ঔজ্জ্বল্যহীন আভা তাহার সারা মুখখানি ভরিয়া উঠিয়াছে।

নিষ্ঠুর পৃথিবী। নিষ্ঠুর এই প্রকৃতি। যে তোমাদের কত ভালবাসিত, সে আজ তোমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার এই চিরনির্ব্বাসন তোমাদের অন্তরে কি একটা ক্ষুদ্রতম রেখাও অঙ্কিত রাখিয়া যাইতে পারে না?

প্রতিদিনের ন্যায় নবারুণ আগামী প্রভাতে নবীন জীবনের বার্ত্তা বহিয়া আনিবে। নবজীবনের বাধা-বন্ধনহীন উদ্দামস্রোতে বিশ্বমানব পুনরায় ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু যে জন জীবনের বিপরীত স্রোতের টানে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহার জন্য সহানুভূতিসূচক একবিন্দু অশ্রু ফেলিবার অবকাশ কাহারো কি নাই?

বৃষ্টি তখনকারমত বিরামলাভ করিয়াছে। কিন্তু আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। অর্দ্ধরাত্রে শ্মশানে একটি চিতার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই তমসাচ্ছন্ন রজনীতে চিতা হইতে অনতিদূরে কে ওই বসিয়া? তাহার অশ্রুতে যে চিতার বহ্নিরূপ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে? 'কে তুমি? তুমি কি নালিশ জানাতে এসেছ? কিন্তু কার কাছে জানাবে তোমার ওই ক্ষুদ্র তুচ্ছ নালিশ?' *

---

*কোন্নগর জহৎ-সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।

স্থবির আকাশ

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-টি।

আকাশ, তুমি কি মরিয়াছ বহুদিন?
অথবা, মৃত্যু-প্রহর গণিছ বসি'?
তারার চোখের নিষ্প্রভ-চাহনিতে
আয়ুহীনতার বেদনা যে ওঠে শ্বসি'!

বিরাট্ শূন্যে জাগে তাই হাহা রব,
চন্দ্র সূর্য্য জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে,
তোমার সে দান ফুরায়ে গিয়াছে, তাই,
ধরণীর ধূমে তোমারে মলিন করে!

লক্ষ বিমান তোমারে নিয়াছে লুঠি',
তোমার বক্ষে চলে ধ্বংসের খেলা,
তোমার স্নেহের পাখীরা সভয়ে কাঁপে,
ভাঙিয়া গিয়াছে বলাকার মধু-মেলা।

বিমান-পাখায় মৃত্যু-আঁধার নামে,
স্বননে তাহার ঘনায় আর্ত্তনাদ,
পুরানো আকাশ, স্থবির, অচঞ্চল,
চাহিয়া দেখিছ, মৃত্যু পাতিছে ফাঁদ?

স্নেহের ছায়ায় রেখেছিলে কবে ঢাকি',
বিচিত্ররূপা বিরাট্ ধরিত্রীরে,
দেখিছ না বসি', যুগের আবর্ত্তনে
আজিকে তাহার সে রূপ গিয়াছে ফিরে?

হিংস্র কুটিল-দৃষ্টি আবেষ্টনে
বিষজর্জ্জর পৃথিবী মধুক্ষরা,
বল-দাম্ভিক-পদ-লম্ফনে, শোনো,
শঙ্কা-শিথিল কাঁপিছে বসুন্ধরা।

বজ্র-বহ্নি ছুটিছে চতুর্দ্দিক্,
আগ্নেয় ধূমে ঢাকিল তোমার বুক,
তোমা পানে চাই, দেবতারে দিতে ডাক,
ধোঁয়ায় উহ্য, দেখি না তোমার মুখ।

পুরানো আকাশ! দেখায়ো না কালো মুখ,
সময় এসেছে, ডাকিছে যুগের কবি,
শেষ নাভিশ্বাসে এখুনি ভাঙিয়া পড়,
নূতন আকাশে উঠুক্ নূতন রবি!

মাদাম জগলুল পাশা

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নব্যমিশরের জন্মদাতা জগলুল পাশার নাম কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু সেই কর্মবীরের পশ্চাতে থাকিয়া যে এক মহিয়সী নারী নিয়ত উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইতেন, তাঁহার কথা অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম সম্পাদনে নারী যে কতখানি সাহায্য করিতে পারে, জগলুলপত্নী সফিয়া হানেম তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। মিশরের জাতীয় আন্দোলনে এই নারীর দান অসামান্য। সত্য কথা বলিতে কি—স্ত্রীর সাহায্য না পাইলে জগলুল পাশা তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হইতেন কি না সন্দেহ।

সফিয়া হানেম রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও একেবারে দীনদরিদ্র ঘরে তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি যখন ভুমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার পিতা মিশরের রাজ-দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাহার পর তিনি একাদিক্রমে তের বৎসরকাল মিশরের প্রধান মন্ত্রিত্ব করেন। সফিয়া হানেম রাজনীতিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজনীতিক জগলুল পাশার সহিতই তাঁহার বিবাহ হয়। কাজেই রাজনীতি যে তাঁহার ধাতস্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। জগলুলের সহিত সফিয়ার যখন বিবাহ হয়, জগলুল তখন আইন ব্যবসায়ে ভাল পসার জমাইয়াছেন। জগলুল সফিয়ার চেয়ে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় ছিলেন। বিবাহের কিছুকাল পরেই জগলুল মিশরের মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানকাল পর্যন্ত রাজনীতিক ক্ষেত্রে জগলুল তেমন কোন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারেন নাই। ১৯১৮ সালের ১৩ই নবেম্বর তিনি সর্বপ্রথম রাজনীতি ক্ষেত্রে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। মহাযুদ্ধ অবসানে ইউরোপে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে; বিভিন্ন দেশে শান্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে; কিন্তু মিশরের রাজধানী কায়রোতে উৎসব উদ্‌যাপনের কোনই সমারোহ নাই। জগলুল এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী মিলিয়া ইংলণ্ডের তৎকালীন হাই কমিশনার সার রেজিনাল্ড উইংগেটকে এক লিখিত আবেদনে জানাইলেন:—গ্রেটবৃটেন কর্তৃক মিশরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হউক। ইউরোপে প্যারী নগরীতে সকলে তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়মকানুন রচনা লইয়া ব্যস্ত, কাজেই জগলুল এবং তাঁহার সহকর্মীদের আবেদন কিছুদিনের মত চাপা পড়িল। ইহার মধ্যে আবেদনের উত্তর না পাইয়া জগলুল পাশা বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট কড়া ভাষায় এক তার প্রেরণ করিলেন। সেই তারের কথা মিশরের সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলের মনেই আশঙ্কা জাগিল, বুঝি বা জগলুলকে অচিরেই গ্রেপ্তার করা হয়। আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইল; তার পাঠাইবার কয়েকদিন পরেই জগলুল গ্রেপ্তার হইয়া মাল্টা দ্বীপে প্রেরিত হইলেন।

জগলুল পাশা যখন দ্বীপান্তরে, সফিয়া হানেম ব্যক্তিগতভাবে তখন হাই কমিশনারকে এই মর্মে এক আবেদন জানাইলেন যে, স্বামীর নিকট তিনি যে সকল চিঠি-পত্র লিখিবেন—সেগুলি যেন কোনরূপে কাটছাট না করিয়া পাঠান হয়। অবশ্য তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, চিঠিতে রাজনৈতিক বিষয় কিছু লেখা হইবে না। এই আবেদন জানাইবার পরই তাঁহার মনে কেমন একটা খটকা বাধিল—কাজটা তিনি ভাল করেন নাই। স্বামী তাঁহার বন্দী; স্বামীর অসমাপ্ত কার্যভার ত তাঁহারই লওয়া উচিত। যাহারা তাঁহার স্বামীকে বন্দী করিয়াছে, তাহাদের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। তেজস্বিনী নারীর প্রাণে ইহাতে অনুশোচনা আসিল। হাই কমিশনার সার রেজিনাল্ড উইংগেট-এর নিকট হইতে তাঁহার আবেদনের তখনও কোন উত্তর আসে নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া সফিয়া হানেম টেলিফোনের নিকট পাগলের মত ছুটিয়া গেলেন এবং ফোনে হাই কমিশনারকে চাহিলেন। ফোনে উত্তর মিলিল,—হাই কমিশনার গল্‌ফ্ খেলার মাঠ হইতে তখনও ফিরেন নাই। সফিয়া ফোনে বলিলেন, "আমি মাদাম জগলুল পাশা। রেসিডেন্সিতে ভারপ্রাপ্ত যে কর্মচারী আছেন, তাঁহাকে একবার সত্বর ডাকুন।"

ফোনে আসিয়া একব্যক্তি ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাদাম পাশা, আমি আপনার জন্য কি করিতে পারি?"

সফিয়া ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে উত্তর দিলেন,—"হাই কমিশনার আসিলে বলিবেন, আজ ভোরে আমি তাঁহাকে যে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তাহা আমি প্রত্যাহার করিলাম। কেবল তাহাই নয়,—তাঁহার কিম্বা তাঁহার সরকারের নিকট হইতে আমি কোনরূপ অনুগ্রহ ত চাহি-ই না, পরন্তু আমি তাঁহাকে এই কথাটাই জানাইয়া দিতে চাহি যে, ইংলণ্ড যে পর্যন্ত না মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করে, সে পর্যন্ত আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব। মিশরের স্বাধীনতাই এখন আমার ধ্যান, জ্ঞান ও নিয়ত চিন্তা। আমার এই সঙ্কল্পের ফলে আমার এবং আমার স্বামীর যদি মৃত্যুও আসে, তাহাতেও আমরা বিচলিত হইব না। এই সান্ত্বনা লইয়াই মরিতে পারিব যে, মিশরের জন্যই আমরা মরিলাম এবং আমাদের মৃত্যু হইলে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মিশর বাঁচিয়া থাকিবে।"

জগলুল পাশাকে দ্বীপান্তরে পাঠাইবার পর মিশরে সত্য সত্যই এক বিপ্লব দেখা দিল। বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন সফিয়া হানেম নিজে। অবস্থা কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া সার রেজিনাল্ড উইংগেটকে বিলাতে ডাকা হইল এবং তাঁহার স্থলে লর্ড এলেনবিকে হাই কমিশনার করিয়া পাঠান হইল। নূতন হাই কমিশনার আসিয়া শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জগলুল পাশার মুক্তির আদেশ দিলেন। সফিয়ার আন্দোলন সার্থক হইল; মিশরের নারীজাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই জগলুল পাশাকে আবার দ্বীপান্তরে পাঠান হইল। এইবার আর তাঁহাকে মাল্টা দ্বীপে না পাঠাইয়া আফ্রিকার পূর্বদিকে সেচেলেস দ্বীপে পাঠান হইল। সফিয়া হানেম আবার আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। জগলুল পাশার প্রতিষ্ঠিত ওয়াফদ দলের নেতৃত্বভার কার্যত আসিয়া পড়িল তাঁহারই উপর। জগলুল পাশা এবং তাঁহার প্রধান চারিজন সমর্থককে লইয়া ছিল ওয়াফদ দলের কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত। জগলুলের সঙ্গে তাঁহার উক্ত চারিজন সমর্থককেও সেচেলেস দ্বীপে

পাঠান হয়। তাহারা যাইয়া উক্ত দ্বীপে পৌঁছিবার পূর্বেই আবার পরবর্তী পাঁচ ব্যক্তি একই অপরাধে ধৃত হইলেন। সামরিক আদালতের বিচারে এই নূতন পাঁচজন নেতার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। পরে তাঁহাদের প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া তাঁহাদিগকে নির্বাসনে পাঠান হইল। ইহার পর তৃতীয় দল গ্রেপ্তার হইল এবং তাহাদের অদৃষ্টেও একইরূপ শাস্তি জুটিল। দলের পর দল এইভাবে গ্রেপ্তার হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে লইয়া হয়রান হইয়া উঠিলেন। প্রথমে আসামীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত এবং পরে প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া হয় তাহাদিগকে নির্বাসনে নতুবা কারাগারে পাঠান হইত। সফিয়া হানেম এইভাবে আন্দোলনের মূলে থাকিয়া কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার বাড়ীতেই হইল ওয়াফদ দলের প্রধান কার্যালয়। তিনি সেখানে প্রকাশ্যে আসিয়া দলের নেতাদের সহিত রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিতেন। অপরদিকে তাঁহার পর্দানসীন বান্ধবীদিগকে দিয়া তিনি বাড়ী বাড়ী আন্দোলনের বাণী প্রচার করিতেন।

বৃটিশ পণ্য বর্জনই হইল জগলুলপত্নীর প্রধান প্রচেষ্টা। পর্দানসীন নারীদের সাহায্যে পিকেটিং চালাইতে তাঁহার খুবই সুবিধা হইল। পুলিশের সাধ্য নাই কোন পর্দানসীন নারীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে বা কোনরূপ বাধা দেয়। অবগুণ্ঠনবতী নারীর মুখ দেখিয়া চিনিবারও উপায় নাই। কাজেই আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া সফিয়ার নিযুক্ত নারীরা অনায়াসে তাহাদের কার্য হাসিল করিতে পারিত। সন্দেহ করিয়া কেহ কিছু বলিতেও পারিত না। মিশরে বিলাতি মালের কারবার শত শত লোক করিত। এইসব অন্তরপুরচারিণীরা ঐ সকল দোকানের মধ্যে যাইয়া যেখানে বিলাতি মাল বিক্রয় হইত সেখানে পিকেটিং করিত। অনেক সময় তাহারা খরিদ্দারদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখাইত: "আপনার নাম-ধাম আমরা জানি। আপনি যদি এখানে কোন মাল কিনেন তবে আপনার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকে বলিয়া দিব যে, আপনি মিশরের উপর দমনকার্য চালাইতে ইংলন্ডকে সাহায্য করিতেছেন।"

এইরূপ পিকেটিং-এর ফলে মিশরে বৃটিশ পণ্যের কাটতি অসম্ভব রকম হ্রাস পাইল। বাজার নষ্ট হইতে দেখিয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষেরও ভালভাবেই টনক নড়িল। এই বর্জন আন্দোলনের ফলে বৃটেনের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইল।

১৯২৭ সালে জগলুল পাশার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরও সফিয়া হানেম-এর প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। তাঁহার বাড়ীতেই ওয়াফদ দলের প্রধান কার্যালয় রহিয়াছে এবং নিয়মিতভাবেই তিনি উক্ত দলের কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে উপস্থিত হইয়া থাকেন। দলের সদস্যগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং তিনিও সকলের সহিত প্রসন্ন মুখে আলাপ করেন। লোকে তাঁহার নাম দিয়াছে; "মিশরজননী"।

স্বামীর মৃত্যুর পর সফিয়াকে কিছুকাল নানারূপ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতে হয়। ওয়াফদ দলের হাত হইতে মন্ত্রিত্ব চলিয়া গেলে দলের ঐক্য নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। সফিয়া তখন স্বীয় বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা গুণে দলের ঐক্য রক্ষা করিতে সক্ষম হন। তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় দলের সদস্যদের নিকট আবেদন করেন। দলের মধ্যে যখনই তিনি কোনরূপ দুর্বলতা বা নৈরাশ্যের ভাব দেখিতে পাইয়াছেন, তখনই অতি সাবধানতার সহিত সেগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সকলকেই সর্বদা আশার বাণী শুনাইয়া থাকেন। নৈরাশ্যে কেহ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সফিয়ার উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনিলে আবার তাহার প্রাণে নূতন আশা ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। কাজ ছাড়া তিনি কখনও থাকিতে পারেন না। তাঁহার স্বামীর সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। ওয়াফদ দলের পরিচালকমণ্ডলী তাঁহারই বাড়ীতে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। কোনও অনিবার্য কারণে একান্তই দলের বৈঠক যদি অন্যত্র করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে উক্ত বৈঠকের সমস্ত বিবরণ সফিয়া হানেমকে যথারীতি জানান হয়। তাঁহার স্বামীর সহকর্মীদের উপর তাঁহার এতখানি প্রভাব যে, দলের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া তাহা মিটাইয়া দেন। দলের নেতাদের প্রত্যেককে তিনি চিনেন এবং কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাও তিনি ভালভাবেই জানেন। কখনও হাসিয়া কখনও মৃদু ভৎসনা করিয়া তিনি স্বীয় কার্য হাসিল করেন। আবার প্রয়োজন হইলে দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব কঠোর হইতেও কুণ্ঠিত হন না। এমনই তাঁহার প্রভাব যে, বিরোধী দলের নেতাদিগকে কোনও ব্যাপারে ডাকা হইলে তাহারাও একে একে আসিয়া সফিয়ার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য বিরোধী দলের কোনও নেতাকে ঐভাবে ডাকিবার পূর্বে কৌশলে তিনি বুঝিয়া লইতেন, আলোচনার ক্ষেত্র অনুকূল কি না। যে সকল পর্দানসীন নারীর সাহায্যে সফিয়া বৃটিশ পণ্যের দোকানে পিকেটিং চালাইতেন, তাহাদেরই সাহায্যে বিরোধী দলের নেতাদের অন্তঃপুরচারিণীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিতেন। এইভাবে তাহাদের সাহায্যে সফিয়া তাঁহার সঙ্কল্প বিরোধী দলের নেতাদের কানে পৌঁছাইতেন। যখন বুঝিতেন আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিতেন। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, সফিয়ার সহিত আলোচনার পর বিরোধী দলের নেতারা ওয়াফদ দলের সঙ্গে একযোগে কার্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সমগ্র মিশরের উপর জগলুলপত্নী সফিয়া হানেম-এর প্রভাব যে কতখানি, এইবার তাহার একটি উদাহরণ দিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৯৩৬ সালে মিশরের সহিত বৃটেনের যখন পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তির কথা উঠে, তখন মিশরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। ওয়াফদ দলের নেতা মুস্তাফা নাহাস পাশা সেই সময় মিশরের প্রধান মন্ত্রী। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মী এবিদ পাশা অনন্যোপায় হইয়া বৃটেনকে জানান যে, সরকার-বিরোধী দলের নেতারা যদি চুক্তির দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত না হন, তবে তাঁহাদের পক্ষে বৃটেনের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মুস্কিল। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সমস্ত আলোচনা পণ্ড হইবার উপক্রম হয়। সেই অবস্থায় সফিয়া হানেম তাঁহার অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরোধী দলের নেতাদিগকে চুক্তির পক্ষে আনিতে সক্ষম হন। যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল সফিয়া হানেমের চেষ্টায় তাহাই সম্ভব হইল। উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর উক্ত চুক্তি যখন অনুমোদনের জন্য মিশর প্রতিনিধি সভায় ভোটে দেওয়া হইল, তখন দেখা গেল, চুক্তির পক্ষে হইয়াছে ২০২ ভোট এবং বিপক্ষে হইয়াছে মাত্র ১১ ভোট। চুক্তির পশ্চাতে জগলুলপত্নীর সমর্থন ছিল বলিয়াই প্রতিনিধি সভায় তাহা অনায়াসে গৃহীত হইয়াছিল; নতুবা ইঙ্গ-মিশর চুক্তির বরাতে কি ছিল বলা যায় না। এতখানি প্রভাব আছে বলিয়াই ত তাঁহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে "মিশরজননী"।

বিচিত্র বার্তা

অস্বাভাবিক চোখের ইতিহাস

এ সপ্তাহে বিচিত্র রকমের চোখের আলোচনা করা যাক। যে চোখ স্বাভাবিক, অর্থাৎ সকল জীব-জন্তু, পশু-পক্ষীর মধ্যে এমন কি, মানুষের মধ্যেও যার সাদৃশ্য রয়েছে, সে চোখ ছাড়াও পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আছে, যাদের আমরা দৈনন্দিন জীবনে রাস্তা-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে এবং চিড়িয়াখানায় নিত্য-

প্যাঁচার চোখ

নৈমিত্তিক দেখে থাকি, অথচ তাদের অস্বাভাবিক অদ্ভুত চোখের পরিচয় আমরা পাইনি। মানুষের মধ্যে চোখের অস্বাভাবিকতা একালে যদিও নেই, পুরাণে ছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছেন মহাদেব। তাঁর তিনটি চোখ ছিল বলে তাঁকে বলা হয় ত্রিলোচন। তাছাড়া রাবণের ছিল দশ মাথায় দশ জোড়া চোখ; তিনি সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, চতুর্দিকে, একই সময়ে দেখতে পেতেন বলে সম্মুখ সমরে তাঁকে পরাভূত করা শত্রুদের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার ছিল। মানুষের মধ্যে আজকাল আর সে ত্রিলোচনও নেই, সে দশাননও নেই, কিন্তু পশু-পাখীদের মধ্যে অস্বাভাবিক চোখের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

কাঁকলাস

প্রথমেই ধরা যাক প্যাঁচার কথা। প্যাঁচা মস্ত বড় বড় চোখ নিয়েও দিনের বেলায় দেখতে পায় না এবং সেই জন্যেই তাকে আমরাও দিনের বেলা দেখতে পাই নে। রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকার কোটরের মধ্যে সে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে। পাখীদের মধ্যে প্যাঁচার বিশেষত্ব হচ্ছে, তার চোখের দৃষ্টি মানুষেরই মত সব সময়েই সোজাসুজি সামনের দিকে নিবদ্ধ।

শকুনি

তফাৎ শুধু এই যে, তার চোখের তারা মানুষের মত এপাশ-ওপাশ নড়ে না—চিরকালের মত সম্মুখের দিকে স্থির নিবদ্ধ। তাই প্যাঁচাকে পুতুল-নাচিয়েদের পুতুলের মত ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে হয়।

পাখীর স্বচ্ছ চোখ

পাখীরা যোগ-সিদ্ধ নয়, তাদের এক্সরে চোখও নেই, অথচ তারা চোখ বুঁজেও দেখতে পারে। এর কারণ তাদের চোখের উপর একজোড়া স্বচ্ছ (transparent) চোখের পাতা আছে।

প্যাঁচা ছাড়া অন্য সব পাখীরই দুই চোখ থাকে মাথার দুই পাশে—অর্থাৎ তাদের দুই চোখের দৃষ্টি কখনও এক জায়গায় মিলিত হ'তে পারে না। ডান চোখ দিয়ে যা দেখে, বাঁ চোখ দিয়ে তা' দেখবার উপায় নেই।
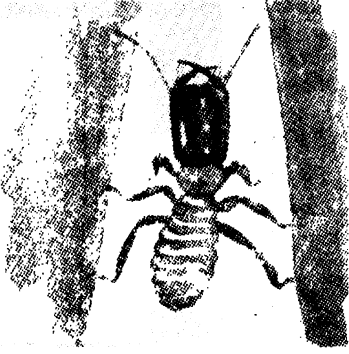
টারমাইট্

টারমাইট্ পোকা (termite) সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু তাদের মাথার উপরের একজোড়া শুঁড় ও পা তাদের চোখের অভাব পূরণ করে দেয়।

জগতে সব প্রাণীই তাদের দু'চোখ দিয়ে কেবল সামনেই দেখে, পিছন দিকে তাকাতে হলে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি দেবী কাঁকলাস নামক এই কিম্ভূৎ কিমাকার জীবটি সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেছেন। এক চোখ দিয়ে সে সামনে দেখে, অপর চোখ দিয়ে সে তখন দেখে পিছন দিক থেকে অন্য কোন জীব আবার তাকে শিকার করে না বসে।
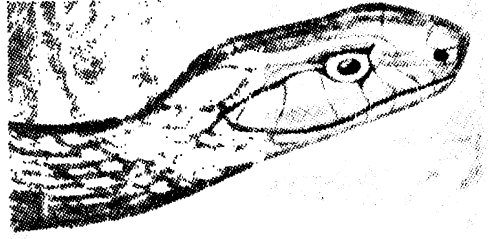
সাপের চোখ

কিবা দিন কিবা রাত্র সাপ কখনও চোখ বন্ধ করে না—করবার উপায়ও নেই। কারণ চোখের পাতা বলে সাপের কোন বালাই নেই।

তারা মাছ (star-fish) নামে পাঁচটি শুঁড়ওয়ালা এক রকম সামুদ্রিক মাছ আছে। তার প্রত্যেকটি শুঁড়ের ডগায় চোখ আছে

তারা মাছ

বলে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা তার পক্ষে খুবই সহজ। পুরীর সমুদ্র-তীরে এই মাছ প্রায়ই দেখা যায়।

সূর্য্যের পরমায়ু

(২২৮ পৃষ্ঠার পর)

পৃথিবীতে পড়ে এবং সেজন্যই পৃথিবীর ওজনও বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যে বোধ হয় পৃথিবী হইতেও বহু গুণ বেশী সংখ্যায় meteors পড়ে এবং সূর্য্যের ওজন অনেকটা বৃদ্ধি পায়। সেপ্‌লি গণনা করিয়া বলিয়াছেন, সূর্য্যের ওজন প্রতি সেকেণ্ডে এই দরুণ ২০০০ টনের বেশী হয় না। সুতরাং যে পরিমাণে ওজন আলো বিতরণে ব্যয়িত হয়, তাহার ২০০০ ভাগের এক ভাগও এই উপায়ে পূরণ হয় না। সুতরাং সূর্য্যের ওজন প্রতি মিনিটে আড়াই কোটি টন কমিতেছে বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিতে পারি।

আমরা জানি, সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৩৩২০০০ গুণ ভারী আর পৃথিবীর ওজন কেভেন্ডিস (Cavendish) সাহেব তাঁহার তুলা যন্ত্রে ওজন করিয়া বলিয়াছেন ৬.০২২×১০^{২১} টন। তাহা হইলে সূর্য্যের ওজন দাঁড়ায় ২০×১০^{২৬} টন। আর সূর্য্য যদি প্রতি মিনিটে ওজনে আড়াই কোটী টন কমে, তাহা হইলে সূর্য্যের আয়ু আর ১৫×১০^{১২} বৎসর অর্থাৎ ১৫ লক্ষ কোটী বৎসর অবশ্য পৃথিবীর জীবজন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কারণ সূর্য্যের ওজন কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে প্রদত্ত আলো এবং তাপের পরিমাণও কমিতে থাকিবে এবং এক সময়ে পৃথিবী এতটা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে যে, তাহাতে আর জীবজন্তুর বাস সম্ভব হইবে না। এরূপ ভবিষ্যতে অন্যান্য নক্ষত্র এবং গ্রহদের জন্য ঠিক হইয়া আছে।

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

[ভ্রমণ-কাহিনী]

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পুণার কথা

দুই

পুণার কথা পুঁথিপত্রে কত পড়িয়াছি। এই যে পুণা নগরী যেখানে শিবাজীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। শিবাজী জননী জীজাবাঈ-এর কথা মনে পড়িল। আর চারিদিগের ঘন নীল পর্ব্বতশ্রেণী ও সবুজ প্রান্তর দেখিয়া মনে পড়িল শিবাজীর বাল্যজীবনের কথা। আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হইয়া উঠিল ষোল বৎসরের তরুণ শিবাজীর মূর্ত্তি—দেখিতে পাইলাম যেন শিবাজী তাঁহার সমবয়সী যুবকদিগকে লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছেন। সেই শিবাজীর দেশে আসিয়া প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইল।

পুণা দেখিবার জন্য যেমন ঔৎসুক্য জাগিয়াছিল, তেমনি পুণা শহরটি যেমন দূরে হইতে দেখিলাম, তখনি আমার মন মুগ্ধ করিল। দাক্ষিণাত্যের এই বিস্তৃত সুন্দর মালভূমি নয়নাভিরাম বটে।

বিকেল বেলা শহর দেখিতে বাহির হইলাম। ডক্টর সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রাম নিবাসী—এখানকার আবহাওয়া (Metereology) বিভাগের ডিরেক্টার। তিনি থুবে পার্কে আমাদের পাশের বাংলোতে থাকিতেন। তিনি বলিলেন—আমাদের অফিসের পাশেই একটি গিরি-মন্দির আছে। পুণাতে গিরি-মন্দির আছে তাহা জানিতাম না। কাজেই আমরা সেই গুম্ফা দেখিতে চলিলাম। পুণার পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুইধারে তরুশ্রেণী সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। আবহাওয়া অফিসের পাশের পথটি ধরিয়া চলিতেই আমার নজরে পড়িল সেই গিরি মন্দিরের পথ। আর আমার চারি বছর বয়স্ক দৌহিত্র রজতবাবু—না চিনেন এমন স্থান নাই, তারপর তাহার ভাষাজ্ঞানও অসাধারণ হিন্দী, মারাঠি সব ভাষাতেই সে কথা বলে। সে বলিল—'জঙ্গলি মহারাজের বাড়ী হয়ে পরে এখানে আস্‌বো! কিন্তু আমার মন তাহা মানিল না। আমি প্রথমে গিরি-মন্দির দেখিতেই চলিলাম।

বড় রাস্তার দিক্ হইতে একটি পথ গিরিগুহাগুলির দিকে গিয়াছে। চারিদিকে তারের বেড়া। ভিতরে প্রবেশ করিলেই বিস্তৃত সমতলভূমি। এই অঞ্চলের নাম ভামুর্ডি—ইংরেজীতে বানান করা হয় Bhamurde এইরূপ। পুণার উত্তর প্রান্তের এই ভামুর্ডি গ্রামটি একসময়ে অখ্যাত ও অজ্ঞাত ছিল। চারিদিকে ছিল গভীর বন-জঙ্গল, লোকের বসতি ছিল না বলিলেই হয়। সে সময়ে এই গিরি-মন্দিরগুলি ছিল লোকচক্ষুর অগোচর, কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিত না। পরে শহর যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনি জঙ্গল পরিষ্কার হইল, নগর গড়িয়া উঠিল। আবহাওয়া অফিসের উচ্চচূড় বাড়ীটি এখন পুণার একটি দর্শনীয় সুন্দর সৌধ।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। দূরে পাহাড়ের গায়ে শেষ সূর্য্য-রশ্মি আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া মেঘের ন্যায় কালো পাহাড়ের বুকে আলো ও ছায়ার বিচিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছিল। আমরা সমতলভূমি হইতে অল্প কয়েকটি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণের চারিদিকে পাহাড় কাটিয়া দেওয়াল করা হইয়াছে। সম্মুখে একটি মণ্ডপের মধ্যে নন্দী বা বৃষ। চারিকোণেও চারিটি নন্দী বা বৃষ ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। কেননা এখনও দুই কোণে দুইটি বৃষ রহিয়াছে। মধ্যস্থ মণ্ডপটিও পাহাড় কাটিয়া তৈরী করা হইয়াছে।

ভামুরডীর এই গিরিগুহাটি শৈবমন্দির (Saiva Rock Temple)। এখানকার নন্দী বা বৃষের অবস্থান মণ্ডপটি চতুষ্কোণ নহে গোলাকার। মণ্ডপের পরে মূল মন্দির গুহা। বেশ বড়। বারান্দায় সারি সারি থাম। সব থামই পাহাড় খুদিয়া গঠিত হইয়াছে। মন্দির ও প্রাঙ্গণ ১৬০×১০০ ফিট হইবে। মন্দিরের বারান্দা বেশ প্রশস্ত। বারান্দার মেজে বেশ সমতল। মধ্যস্থলের গুম্ফা গৃহটিতে শিবলিঙ্গ রহিয়াছেন। পাশের ছোট দুইটি ঘরেও দুই একটি মূর্ত্তি আছে। ক্ষীণ আলোকে মূর্ত্তিটিকে ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না। আমার দৌহিত্র ও দৌহিত্রী দুইজনে পরমানন্দে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ও বারন্দার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের অপূর্ব্ব আনন্দ কে দেখে! এই গুম্ফা-মন্দিরের উপরটা ছাতার মত বিস্তৃত। আমরা গুম্ফাটির উপরেও উঠিয়াছিলাম। মণ্ডপের একপাশে একটি কুণ্ড। এই

শিবাজী মেমোরিয়েল পার্কে শিবাজীর মূর্ত্তি

কুণ্ডে জল সঞ্চিত রহিয়াছে। স্থানটি শহরের মধ্যে হইলেও বেশ নির্জ্জন। সরকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। তবু একজন ব্রাহ্মণ শিবের পূজারী রূপে দুই বেলাই আসেন। শিবের মাথায় জল ঢালেন। পিত্তল নির্ম্মিত সাপটিকে মার্জ্জনা করেন। কেহ দুই একটি পয়সা দেয় কেহ বা দেয় না, ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি! মন্দ কি! আলস্যে দিন কাটাইবার অপূর্ব্ব একটা সুযোগ কেই বা হেলায় হারায়।

এই গুম্ফার পাশেই "জঙ্গলি মহারাজার সমাধি"। জঙ্গলি মহারাজার এই সমাধি স্থানটি বেশ মনোরম। বড় বড় গাছ সব ছায়া করিয়া রহিয়াছে। চারিদিকে পুষ্পোদ্যান। মধ্যে বেশ বড় মণ্ডপ। কোনরূপ জাতি বিচার এখানে নাই—কেহ কোন বাধা কাহাকেও দেয় না, সকলেই সমাধি স্পর্শ করিতেছে। জঙ্গলি মহারাজা কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। একজন মারাঠি ভদ্রলোক বলিলেন, ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ

ছিলেন। যখন এই স্থান গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন তিনি এখানে আসিয়া আস্তানা গাড়েন। কোথা হইতে আসেন কেহ জানে না। তাঁহার কাছে হিন্দু-মুসলমানও যেমন ভেদ ছিল না, তেমনি ছোটজাতি-বড়জাতি বলিয়াও তিনি কোনরূপ ভেদের প্রাচীর গড়িয়া তোলেন নাই। তাঁহার এই বনভবনে যে কোন সম্প্রদায়ের সাধু আসিতেন আশ্রয় পাইতেন—যে কোন নিম্নশ্রেণীর লোক আসিত তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই মহানুভবতার গুণে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। আর নিবিড় এই জঙ্গলে বাস করিতেন বলিয়া তিনি জঙ্গলী মহারাজ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। জঙ্গলি মহারাজারই আদেশে এখানকার এই আশ্রমে কি আশ্রয় দানে—কি খাদ্য বিতরণে কোনরূপ ভেদ নাই। এক মহামিলনের মন্ত্র তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানটি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। পুষ্প-গন্ধ সুরভিত ছায়াচ্ছন্ন এই স্থানটি পুণ্য তপোবনের মতই শান্তি-প্রদ মনে হইয়াছিল। আমরা দোদুল্যমান ঘণ্টায় আঘাত করিয়া বেশ কৌতুক বোধ করিতেছিলাম। জঙ্গলি মহারাজার সমাধির পাশের রাস্তাটির নাম 'জঙ্গলি মহারাজার রোড'।

সেদিন সন্ধ্যায় আর কোথাও বাহির হইলাম না। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখি বাহিরে মাঠের মধ্যে কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই আমার জামাতা শ্রীমান শচীন্ রায় চৌধুরীর বন্ধু। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত সুধাংশু রায় চৌধুরী ও তাঁহার পত্নী এবং শ্রীযুত নেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুণার বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। সুধাংশু চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী ঠিক যেন অতিথিশালা। কোন বাঙালী বেড়াইতে গেলেই তাঁহার বাড়ী অতিথি হইয়া থাকেন। তিনি বিলাত ও আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এখানকার Electric Power House-এর Superintedent। সেই সন্ধ্যার বৈঠকেই স্থির হইল, রবিবার ছুটির দিনে শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে কার্লি বা কার্লে গিরিমন্দিরগুলি দেখাইতে লইয়া যাইবেন। তাঁহার মোটর গাড়ীটি বেশ বড়, কাজেই আমাদের যাইতে কোনও অসুবিধা হইবে না। আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বয়স বায়াত্তর পার হইয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহার যুবকের ন্যায় উৎসাহ, তিনিও পাঁচশো ফিট উঁচু পাহাড় বাহিয়া উঠিয়া কার্লি গিরিমন্দির দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের নিকট পুণা শহরে কি কি দেখিবার আছে তাহা জানিয়া লইলাম। পুঁথিপত্র পড়িয়া জানা অপেক্ষা স্থানীয় অধিবাসী বা প্রবাসী বাঙালীরা ত অনেক কথাই জানেন।

এ বৎসর কলিকাতার গরমটা বিশেষভাবে পীড়ন করিয়াছে, কিন্তু পুণা আসিয়া কোথায় গেল সে ক্লান্তি ও অবসাদ? রাত্রিতে প্রসন্নমনে শীতের আরামে কম্বল গায়ে জড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম। আর খাবার কথা না বলিলেও চলে—কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী ও জামাতা শচীন বাবাজী আহারের আয়োজনের কোনও ত্রুটি করেন নাই—মুখে তাহাদের একই কথা—এ ত বাঙলা দেশ নহে! বাঙলা দেশ যে নহে, এ অতি সত্য কথা। আর বাঙালীর মত ভারতের কোন অধিবাসীই তেমন ভোজন বিলাসী নহে, এত বেশী খাবার বরাদ্দ তাদের নাই। তাই তাহারা সবল ও কর্ম্মক্ষম।

পার্ব্বতীর মন্দিরের প্রাঙ্গণ

পুণা এক সময়ে পেশোয়ারদের রাজধানী ছিল। সেজন্যই পুণার এত খ্যাতি। একদিন যে নগরী ব্রাহ্মণদের শক্তিপ্রভাবে শাসিত হইত, আজ সেই পুণা নগরীতে তাঁহাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ সুধু পড়িয়া আছে। আছে সুধু বিরাট প্রাচীর, কয়েকটি তোরণের দ্বার আর অভ্যন্তরে রহিয়াছে প্রাসাদ-কক্ষের

ভিত্তিসমূহ। কাজেই পুণাতে পেশোয়াদের (Peshwa) কীর্ত্তি তেমন আর কিছুই বিদ্যমান নাই।

শিবাজীর ন্যায় বীরপুরুষ রাষ্ট্রনীতিবিদ যোদ্ধা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বড় বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—"খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে একসূত্রে বেঁধে দিব আমি।" তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতবর্ষে এক বিরাট হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে। তাই ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—"Sivaji, one of the greatest soldiers whom India has produced, was a statesman no less than a soldier. His ambition was to establish in India a great Hindu power. (The Cambridge shorter History of India —page—435).

আলমগীর বাদশাহের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ্বের কথা সকলেই জানেন। শিবাজীর বীরত্ব, রণকৌশল, অপূর্ব্ব সাহসিকতার কথা সর্ব্বজন-বিদিত।

মহারাষ্ট্র ঐতিহাসিক বলেন, শিবাজী ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি 'মহারাজা' ও ছত্রপতি [Lord of the Umbrella] উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। তারপর মহারাজ শিবাজী অমিতবিক্রমে রণদামামা বাজাইয়া বীরদর্পে চলিলেন দেশ জয়ে। কর্ণাটিক যুদ্ধের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী স্মরণ করিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হই। কর্ণাটিক ছিল বিজাপুর রাজ্যের একটি অংশ, তাঁহার ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজি ছিলেন সেখানকার শাসনকর্ত্তা। শিবাজী বীজাপুরের সৈন্যদল এবং ব্যাঙ্কোজির সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিলেন। তারপর চলিল বেগবতী স্রোতোস্বিনীর স্রোতোধারার ন্যায় তাঁহার বিজয়বাহিনী। দেড় বৎসরের মধ্যে তিনি ৭০০ সাত শত মাইল পর্য্যন্ত স্থানে আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইলেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসী হইল না, যাহারা বাধা দিতে আসিল তাহারা স্রোতের মুখে তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া গেল! নগরের পর নগর, পল্লীর পর পল্লী তাঁহার অধিকারে আসিল। তিনি কি কেবল বিজয় করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে। শিবাজী তাঁহার বিজিত রাজ্যসমূহে সুশাসনেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ভাবে বিজয়ের গৌরব তিলক ললাটে পরিয়া শিবাজী যখন রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকল শত্রুদল দেখিতে পাইল—সর্ব্বত্র সুরক্ষিত দুর্গ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সমুদ্রের তীরে তীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিবাজীর দুর্গসমূহে তাঁহার গৈরিক পতাকা উড়িতেছে। আর প্রত্যেক দুর্গে পানীয় জলের, আহার্য্য দ্রব্যের এবং সর্ব্বাপেক্ষা দেশভক্ত শিবাজী-ভক্ত সাহসী রণনিপুণ সৈনিকদল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—"জয় ছত্রপতি মহারাজা শিবাজী।"

এই সেই শিবাজীর দেশ। পাহাড়ের পর পাহাড় চলিয়াছে—তাহাদের শিখরে শিখরে বুঝি এখনও শিবাজীর অশ্বখুর-ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠে! আলমগীর বাদশাহ যাঁহাকে 'পার্ব্বত্য মূষিক' (the mountain rat) নামে উপহাস করিয়াছিলেন—এই সেই শিবাজীর দেশ। এই পার্ব্বত্য দেশের গিরিশ্রেণীর অন্তরালে কেহ আত্মগোপন করিলে কাহার সাধ্য ধরে? কাজেই দাক্ষিণাপথের এই গিরিশ্রেণী শিবাজীর সৈন্য দলের ছিল পরম আশ্রয়। শিবাজীর রাজ্য ছিল উত্তরে রামনগর হইতে দক্ষিণে কারোওয়ার (Karwar) পর্য্যন্ত। পূর্ব্ব সীমা ছিল বানলানা, সাতারা এবং কোলাপুর লইয়া তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটিক প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই অংশ "স্বরাজ" নামে আখ্যাত ছিল। শিবাজী নিজ তত্ত্বাবধানে এই রাজ্যাংশ শাসন করিতেন।

শিবাজী ভারতের একজন খ্যাতনামা নরপতি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান নৃপতি সে সময়ে ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। যে যুগে নৃপতিরা বিলাস-ব্যসনে সময় অতিবাহিত করিতেন—নর্ত্তকীগণের নূপুর-ধ্বনিতেই যাঁহাদের আনন্দ ছিল—সেই যুগে সেই অলস বিলাসের যুগে ধর্ম্মপ্রাণ শিবাজী হিমালয়ের তুঙ্গ শিখরের ন্যায় চরিত্রবলে

পার্ব্বতীর মন্দিরের উপরিভাগ হইতে পুণা সহর ও তাহার চারিদিকের দৃশ্য

মহৎ ছিলেন। ডক্টর স্যার স্যাফাট্ আহম্মদ খান (Sir Shafat Ahmad Khan Litt. D.) শিবাজীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"Shivaji was one of the greatest sons of India. His private life was beyond reproach. In an age when kings indulged in gross sensual pleasures, he maintained a high standard of morality. He was deeply religious and took great delight in listening to Hindu scriptures and sacred books. Though he was a pious Hindu, he did not indulge in the persecution of the Muslims. He was neither a fanatic nor a bigot. Khafi Khan bears testimony to this and says that "he made it a rule that whatever his followers went plundering, they should do no harm to the mosques, the Book of God, or the woman of any one."*

শিবাজী ভারতবাসী মাত্রেরই আদরণীয় নৃপতি। তাঁহার চরণচিহ্নপূত পুনা নগরী যে ভ্রমণকারী মাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

২৭শে অক্টোবর শুক্রবার দিন প্রত্যূষে আমরা দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'জঙ্গলী মহারাজার' পথ ধরিয়া চলিলাম। খানিক দূরে যাইতেই সম্মুখে একটি বাগান পড়িল। বাগানটির নাম শিবাজী মেমোরিয়াল পার্ক। বাগানে আমরা সকলে প্রবেশ করিলাম। কোলাপুরের মহারাজার ব্যয়ে এই সুন্দর বাগানটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাগানের মধ্যে শিবাজীর একটি মূর্ত্তি আছে। সেই মূর্ত্তিটির বাঁধানো বেদীর উপর কাহারও উঠিবার আদেশ নাই। শিবাজী মহারাজার প্রতি দাক্ষিণাত্যের লোকের এমনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি। শিবাজী অশ্বারোহীরূপে মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাগানের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত শিবাজীর এই বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তিটি দেখিয়া আমরা ভক্তিসহকারে পাদপীঠের

উপর মাথা নত করিলাম। তারপর সকলে বাগান ঘুরিয়া দেখিলাম। শিশুরা মনের আনন্দে ফুলে ভরা বাগান দেখিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

বাগান দেখিয়া পুল পার হইয়া পেশোয়ার প্রাসাদ দেখিতে আসিলাম। বালাজী পেশোয়া—শিবাজীর অযোগ্য বংশধরদের হস্ত হইতে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য গঠনমূলে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। বালাজী পেশোয়া—পেশোয়াগিরির বংশানুবর্ত্তী করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরে একে একে বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪-১৭২০) বাজীরাও (১৭২০-৪০), বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-৬১) প্রভৃতি পেশোয়া হইলেন। পেশোয়াদের শাসন প্রভাবে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সিন্ধু নদের তটপ্রান্ত হইতে গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আর পশ্চিম আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। মোগল, নিজাম, জাট এবং রাজপুত শক্তিকেও যে প্রবল শক্তিমান পেশোয়ারা পরাজিত করিয়াছিলেন, সহসা এক দিন তাঁহাদের সেই বিরাট শক্তির পতন হইল—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র শক্তির পতনের কথা জানেন আফগান বীর আহম্মদশাহ আবদালীর নিকট। 'সেদিন হইতে গ্রাসিল রাহু, মোচন না হইল আরও!'—পেশোয়া বালাজি বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পুণা নগরীতে দেহত্যাগ করিলেন। পুণা নগরীর গৌরব সেদিন হইতেই লুপ্ত হইল।

আমরা পেশোয়াদের প্রাসাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাসাদের মধ্যে দেখিবার কিছুই নাই। আমরা তোরণের উপরিভাগে উঠিলাম। একটি ঘর বেশ বড়। দেয়ালের গায়ে চিত্র অঙ্কিত ছিল। এখনও তাহা একেবারে লোপ পায় নাই।

আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাসাদের চারিদিকে দেখিলাম। এই প্রাসাদের নাম শাহানোয়ার প্রাসাদ (Shanwar palace) ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পেশোয়ারা এই প্রাসাদে বাস করিতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদাহে এই প্রাসাদটি ভস্মীভূত হইয়া যায়। প্রাসাদটি যে এক সময় বৃহৎ ছিল এবং তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

সেদিনই বিকেলবেলা আমরা মুলা ও মুথার সঙ্গমস্থল দেখিতে বাহির হইলাম। দুইটি নদী দুই দিক হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আমরা বোম্বে রোড দিয়া আসিয়া সেতুর পাশ দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। প্রস্তরসোপানাবলী নিম্নে নদীর বুকে নামিয়া আসিয়াছে। খেয়ার নৌকা গ্রামবাসীদিগকে এপারে ওপারে লইয়া যাইতেছে। নদী বহু দূরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে—দুই দিকে গাছের সারি কালো জলে কালো ছায়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া বসিয়া মুলা মুথার শোভা দেখিলাম। তারপর আমরা শ্রীমান চারুচন্দ্র দাশগুপ্তের বাড়ী আসিলাম। শ্রীমান চারুচন্দ্র আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গত প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র। চারুচন্দ্র এখানে আর্কিওলজি ডিপার্টমেণ্টের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাহার ওখানে এ অঞ্চলের গিরি-মন্দির বা Cave Temples সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাইলাম এবং পুঁথিপত্র সগ্রহ করিয়া লইলাম। কাজেই এ অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার সুযোগ ঘটিল।

এখানকার অন্যতম প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান হইতেছে পার্ব্বতীর মন্দির। পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরের নামানুসারে পাহাড়ের নাম হইয়াছে পার্ব্বতী পাহাড়। আমরা এক দিন প্রভাতবেলা মিঃ চৌধুরীর গাড়ীতে পার্ব্বতীর মন্দির দেখিতে চলিলাম। সুন্দর ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরের উপর পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরটি অবস্থিত। বেশ প্রশস্ত সোপানাবলী মন্দির পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, সংখ্যায় হইবে ২৫০ শত। অতি সুন্দর সব বড় বড় সিঁড়ি—উঠিতে কোনও ক্লেশ হয় না। শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুও ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠিলেন। আমার তিন বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রি শিপ্রা অতি সহজে এতগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রজতবাবু আর মিঃ চৌধুরীর পুত্রদ্বয় সজল ও কাজল ত কাঠবিড়ালের মত লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

নাম পার্ব্বতী দেবীর মন্দির, কিন্তু কোথায় দেবী পার্ব্বতী? মন্দিরটি ১৫০।২০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। শুনিলাম, প্রাচীন পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি অপহৃতা হইয়াছে, তাহার বদলে বর্ত্তমান মর্ম্মর নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল মন্দিরে শিবমূর্ত্তি বিরাজিত। আর চারিদিকে সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, কার্ত্তিক প্রভৃতির মন্দিরে ঐ সমুদয় দেবতার মূর্ত্তি রহিয়াছে। কার্ত্তিকের মন্দিরে 'বাঈ' অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের প্রবেশ নিষেধ। পাছে চিরকুমার কার্ত্তিকের কৌমার ব্রত ভগ্ন হয়।

পার্ব্বতীর মন্দিরের উপর হইতে পুণা নগরীর দৃশ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তরুরাজির অন্তরালে নগরীর ঘরগুলি অতি সুন্দর দেখায় মনে হয় যেন সুন্দর একটি উদ্যান। আর সম্মুখে ও পশ্চাতে চারিদিকে ঘাট পর্ব্বতশ্রেণী পাহারা দিতেছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রান্তর ও বনভূমির শ্যামল শোভা নয়ন ও মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। কার্ত্তিকের স্বর্ণাভ রৌদ্র গায়ে মাখিয়া প্রকৃতি সুন্দরী মুগ্ধ নয়নে যেন আপনার অপরূপ শোভায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

দলে দলে মহিলারা আসিতেছে যাইতেছে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক রেখা অঙ্কিত করিয়া ধীর পদক্ষেপে দেবী দর্শনে চলিয়াছেন। মহারাষ্ট্র রমণীরা খোঁপায় ফুলের মালা জড়াইয়া সুন্দরভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রঙীন বসন পরিয়া পূজার থালায় অর্ঘ্য সাজাইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন। একদল খৃষ্টান যাত্রী পুরুষ ও রমণী এখানে আসিয়াছেন, কেহ কোন বাধা দিতেছে না। এদিকের দেবমন্দিরে অন্তত পুণা শহরে দেখিলাম, উত্তর ভারতের মত ছোঁয়াচের বালাই নাই। আমরা অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া পুণা ও তাহার চারিদিকের শোভা দেখিলাম—কত দূরে কত দূরে কোথায় গিরিশ্রেণী যাইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা চোখের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ক্রমে বেলা বাড়িয়া গেল। আমরা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। মিঃ চৌধুরী, অসুস্থ শরীরেও আমাদিগকে তাঁহার গাড়ীতে করিয়া এতদূর লইয়া আসিলেন—সেজন্য ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু 'পরের জন্য যাঁহারা কষ্ট আহরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহা বরাবরই করিবেন, কাজেই তাঁহারা ধন্যবাদের অনেক উপরে। বাড়ী ফিরিতে বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা আজ সঙ্গে ছিলেন কাজেই কন্যার সেই স্নেহের শাসন—বাবা বিদেশে এত বেলা করিতে নাই!' শুনিতে হইল না। (ক্রমশ)

"A school History of India By Sir Shafat Ahmad Khan Litt. D. P. 226.

সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ

'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'—এই ধ্বনি আর লাল ঝাণ্ডা যুব-আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে। 'সাম্রাজ্যবাদ' কথাটার সঙ্গে পরিচয় নেই—এমন মানুষ আজকাল নেই বললেই চলে। কিন্তু কোন কথার সঙ্গে পরিচয় থাকা আর সেই কথার তাৎপর্য্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা এক জিনিষ নয়। আমরা অনেক সময় তোতাপাখীর মত এমন সব 'স্লোগ্যান' আওড়াই যাদের অর্থ আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। স্বাধীনতার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে এই অপরিচয়ের ব্যবধান ঘোচানো দরকার—স্লোগ্যানের যথার্থ তাৎপর্য্য সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এই মরণোন্মুখ মানবসভ্যতাকে নবজীবনের স্বর্গে উন্নীত করার পথে ইম্পিরিয়ালিজম অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ যদি প্রধান অন্তরায় হয়, তবে সাম্রাজ্যবাদের কদর্য্য রূপটাকে সকলের কাছে উদ্ঘাটিত করার প্রয়োজন সকলের আগে। কাকে বলে সাম্রাজ্যবাদ? দেশাত্মবোধের নির্ম্মল জলধারা যখন তার স্বাভাবিক তটভূমিকে ছাপিয়ে নিকটের অথবা দূরের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করতে চায় ফেনিল বন্যার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে—তখনই দেশপ্রীতির কুৎসিত পরিণতি ঘটে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতার মধ্যে।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, একটা জাতি আর একটা জাতির স্বাতন্ত্র্যে আঘাত করে কেন? কি প্রয়োজন ছিল ইটালীর আবিসিনিয়াকে গ্রাস করবার অথবা জাপানের চীনকে আঘাত দেবার? বিদেশের স্বার্থকে ক্ষুন্ন না ক'রে স্বদেশের কল্যাণ করবার কি কোনই উপায় নেই? আছে। কেবল আছে বললেই যথেষ্ট হ'ল না। অন্য জাতির কল্যাণকে আঘাত ক'রে নিজের জাতির কল্যাণ করব—এমন যদি কেউ মনে ক'রে থাকে তবে সে বাতুল। রোমের লোকেরা একদিন মনে করেছিল, এসিয়ার ও আফ্রিকার বিজিত জাতিগুলির সর্ব্বনাশের উপরে তাদের কল্যাণের স্বর্গ নির্ম্মাণ ক'রে সেখানে কেবল আনন্দের মধু লুটবে। মধু লুটবার পালা চলেছিল অনেকদিন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোম সাম্রাজ্য টিঁকলো না—বালুকার উপরে গড়া অট্টালিকার মত একদিন ধ্বসে পড়ল। রোম সাম্রাজ্যের অন্তিম অবস্থায় আমরা দেখতে পাই রোমে অর্থপিশাচ একদল ধনকুবেরের দুরন্ত আধিপত্য। রাষ্ট্রের কলকাঠি তাদের মুঠোর মধ্যে, সরকারী বড় বড় কর্ম্মচারীরা তাদের হুকুমের দাস। তারা রোমের উপনিবেশগুলিতে গিয়েছিল রাজপুরুষ হ'য়ে—রাজধানীতে ফিরে এসেছে রাশি রাশি অর্থ নিয়ে আর সেই অর্থের স্তূপের উপরে ব'সে আছে নৈবেদ্যের উপর নাড়ুটির মত। কোন কাজ নেই—টাকা ধার দাও, সেই টাকার সুদ খাও আর বিলাস-সাগরে সাঁতার দিয়ে বেড়াও।

এই তো গেল একদিকের অবস্থা। অন্যদিকে রোমের হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকের দুর্দ্দশার পরিসীমা নেই। দয়ার দানের উপরে নির্ভর ক'রে সর্ব্বহারার দল জীবনের বোঝা কোনরকমে বহন ক'রে চলেছে। তারা ছিল আগে কৃষক। রাষ্ট্রের আহ্বানে লাঙল ছেড়ে তরবারী নিয়ে তারা গিয়েছিল লড়াই করতে। কালক্রমে জমির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গেল চিরদিনের জন্য ঘুচে। তাদের স্থান অধিকার করল ক্রীতদাসের দল। সহরের অলস-জীবনযাত্রা, পরগাছাদের মত ব'সে ব'সে শুধু খাওয়া—ইটালীর অধিবাসীদের জীবনীশক্তি হরণ করতে লাগল। সমাজের উচ্চ স্তরের যারা, তারা হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়ল বিলাসিতা আর আলস্যের ফলে; রোমের সাধারণ লোক যারা তারাও উচ্চ স্তরের লোকদের অনুসরণ করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল তাদের পৌরুষ আর দেহের শক্তি। বেতনভুক্ত বিদেশী রাজপুরুষেরা চালাতে লাগল রাজকার্য্য—আরামপ্রিয় রোমকেরা তাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে ডুবে রইল বিলাস-সাগরে। তারপর এল সেই দুর্দ্দিন যখন শাসকদের মধ্যে দেখা দিল সংস্কৃতির এবং শৌর্য্যের একান্ত দৈন্য। শাসকেরা নির্ব্বাচিত হতে লাগল গুণের জন্য নয়, টাকার জন্য। বিদ্যা-বুদ্ধিহীন স্বর্ণগর্দ্দভের দল টাকার জোরে রাষ্ট্রের কর্ণধারের পদ গ্রহণ করতে লাগল। শোষণে শোষণে বিজিত জাতিগুলির দুঃখও দুঃসহ হ'য়ে এসেছে। তাদের মধ্যে সুরু হয়েছে ভীষণ চাঞ্চল্য। হীনবীর্য্য টাকার কুমীরেরা হাজার হাজার সর্ব্ব-হারাকে বেঁধে রাখবে আর কতদিন? টাকার খেলা একদিন শেষ হয়ে গেল—রোম সাম্রাজ্য জীর্ণ ইমারতের মত একদিন ভেঙে পড়ল। লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃসহ দারিদ্র্যের উপরে যে জাত বেঁচে রয়েছে অলস পরগাছার মত তার জীবনীশক্তি দ্রুত লোপ পেতে বাধ্য।

সেই পুরাতন রোম সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিয়েছিল যেমন তার আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা, বিংশ শতাব্দীর নয়া সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকেও তেমনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষয় ক'রে ফেলছে এর ভিতরের দৌর্ব্বল্য। রোম সাম্রাজ্যবাদের পতনের ইতিহাসের মধ্যে আমরা কি দেখতে পেয়েছি? দেখতে পেয়েছি একদল স্বার্থসর্ব্বস্ব ধনকুবের রাষ্ট্ররথের লাগামকে করায়ত্ব ক'রে দেশে দেশে প্রসারিত করেছে রোমক আধিপত্যের শিখরগুলিকে। কেন? বিদেশ থেকে প্রাণরস শোষণ ক'রে সেই ঐশ্বর্য্যের জোরে স্বদেশে বিলাসিতা করবার জন্য। ইউরোপের আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শোষণের একই রূপ দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনকুবেরের দল রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ব ক'রে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত করেছে সাম্রাজ্যবাদের লৌহজাল, এসিয়া আর আফ্রিকা থেকে নানাপথে নিয়ে আসছে মুনাফার টাকা আর সেই টাকা প্যারিসে আর ভিয়েনায়, বার্লিনে আর রোমে বিলাসব্যসনে উড়িয়ে দিচ্ছে জলের মত। রোমের পতনের দিনে জমির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক যেমন ঘুচে গিয়েছিল, সহরে এসে বন্দিনী হয়েছিল পল্লীর সম্পদলক্ষ্মী, একদিকে দেখা দিয়েছেন মুষ্টিমেয় সহুরে ধনী,—আর একদিকে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের দল, —আজও পাশ্চাত্য সভ্যতার পতনের দিনে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চলেছে। কল-দানব গর্জ্জন করতে করতে তৈরী করছে রাশি রাশি পণ্য-দ্রব্য, জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শিথিল হয়ে এসেছে, টাকা শাসন করছে সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরকে, সংস্কৃতির চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পাচ্ছে কাঞ্চনের গরিমা, শহরে এসে পুঞ্জীভূত হচ্ছে পল্লীর সম্পদ, ফুরিয়ে এসেছে কালচারের পরমায়ু, দিকে

দিকে উপাসনা চলেছে কামানের আর ডিনামাইটের; বেটোফেন আর রেমব্রাঁ, মাইকেল এঞ্জেলো আর সেক্সপীয়ারের মত অসাধারণ শিল্পীদের আবির্ভাব দুর্ল্লভ ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। যুগ এসেছে তাদের যারা practical men—যারা জানে টাকা কামাই করতে আর টাকা রাখতে। এমন ক'রে কোন সাম্রাজ্যবাদই দীর্ঘকাল আপনাকে টিঁকিয়ে রাখতে পারে না। সময় আসে যখন তার ভিতরটা পচতে আরম্ভ করে, তার হাড়ে ঘুণ ধ'রে যায়; পরিশেষে সে একদিন হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে—বহুকালের জরাজীর্ণ ইমারতের মত। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের সেই অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। স্পেঙ্গলারের Decline of the West আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার চমৎকার বিশ্লেষণ। তিনি ঐ পুস্তকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের তুলনা করেছেন, আর তুলনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, রোম সাম্রাজ্যের অন্তিম অবস্থার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার আশ্চর্য্য মিল আছে। স্পেঙ্গলারের মত J. A. Hobsonও তাঁর Imperialism নামক পুস্তকে দেখিয়েছেন—রোম সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বে তার মৃত্যুর যে সব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল—আজিকার সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সেই সব লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে। একথা খুবই সত্য যে, পরজাতিকে শোষণ ক'রে যে জাতি বেঁচে থাকতে চায়, সে জাতি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচে না।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে একটা জাতির মঙ্গল আর একটা জাতির মঙ্গলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অন্য জাতকে খেয়ে আমি বেঁচে থাকবো—এ যদি কোন জাতি মনে ক'রে থাকে তবে তাকে নিরাশ হ'তে হবে। তবে কেন জাতির সঙ্গে জাতির এই লড়াই? জাতিতে জাতিতে এই সংঘর্ষ তো সমগ্র জাতির স্বার্থ নিয়ে নয়। জাতির ভিতরে কতকগুলি স্বার্থান্ধ লোক থাকে যারা নিজেদের সুবিধার জন্য স্বদেশকে টেনে নিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের জতুগৃহের মধ্যে। এই লোকগুলিই জাতিতে জাতিতে লড়াই বাধানোর মূলে। এরা কখন পাদ্রী সাহেবদের পোষাকে আর এক জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসকে ও আচারকে গালাগালি করে—যখন তারা তাড়া খায়, তখন জাতির কাছ থেকে চেয়ে পাঠায় সাহায্য। আসে সিপাহীর দল সঙ্গীন উঁচিয়ে, মানোয়ারী জাহাজ নিশান উড়িয়ে। বিধর্ম্মীর দেশের উপরে উড্ডীন হয় খৃষ্টধর্ম্মের জয়ধ্বজা। ভাগ্যান্বেষী বণিকের বেশেও এরা পরদেশে যায় হীরকের, সোনার অথবা তেলের খনির সন্ধানে। খনির সন্ধান মেলে—তার উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন যায়। আসে টাকা, আসে সৈন্য, আসে গোলাগুলী। খনির উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিম অধিবাসীদের ভূখণ্ড খনিসমেত অদৃশ্য হয়ে যায় সবল জাতির উদরে। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস। এই সব লোক কেউ পাদ্রী, কেউ পর্য্যটক, কেউ বণিক, কেউ শিকারী—এদের কেউ জাতির প্রতিনিধি নয়; কিন্তু এরা নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা চরিতার্থ করবার জন্য জাতির কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা এবং হাজার হাজার জীবন দাবী করতে পারে। একটা জাতির পররাষ্ট্রনীতি কোন্ পথ ধ'রে চলবে সেটা যেখানে নির্ভর করে কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং দায়িত্ববোধশূন্য ব্যক্তিবিশেষের নির্দ্দেশের উপরে—সেখানে সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্য্য। সেখানে ধর্ম্মান্ধ এবং স্বার্থপর লোকেরা প্রতিশোধ কামনায় অথবা অর্থলালসায় রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করবে হাতিয়ারের মত।

এর থেকে মুক্তির একটামাত্র পথ খোলা আছে। রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি অথবা কতকগুলি ব্যক্তি যদি নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে জীবন অথবা বিষয়সম্পত্তি বিপন্ন ক'রে বসে, তবে আত্মরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপরে তারা বিন্দুমাত্র দাবী করতে পারবে না। জনসাধারণের পক্ষ থেকে যদি কাউকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়, তাকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব জনসাধারণের। যদি কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা কতকগুলি ব্যক্তি নিয়ে গঠিত দলবিশেষ বিদেশে সম্পত্তি গ'ড়ে তোলে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কামনায়—তবে তাদের জানা উচিত—জীবন অথবা সম্পত্তি বিপন্ন হ'লে রাষ্ট্র তাদের রক্ষায় কখনও ব্রতী হবে না।

পাছে দেশের জনসাধারণ ব'লে বসে, আমরা আমাদের রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহৃত হ'তে দেব না ব্যক্তিবিশেষের অথবা দলবিশেষের স্বার্থকে পরিপুষ্ট করবার জন্য—তাই সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডারা জনসাধারণকে শান্ত ক'রে রাখবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেছে। প্রথমত, তারা রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক ব'লে চালাবার জন্য জনসাধারণকে দিয়েছে ভোটাধিকার। ভোটের অধিকার দেওয়ার বিপদও আছে। জনসাধারণ অধিকার পেয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে সমর্থন না ক'রে উল্টেও তো দিতে পারে। এই রকমের বিপদ যাতে ঘটতে না পারে তার জন্য জনসাধারণকে ততটুকু মাত্র জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে—যতটুকু জ্ঞান পেলে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা এবং আচরণকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করবে। সংবাদপত্র, ইস্কুল-কলেজ, ধর্ম্মমন্দির, রেডিও—জনশিক্ষার প্রত্যেকটি বাহনকেই আজ সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডারা হাতের যন্ত্র বানিয়েছে জনসাধারণের চিত্তকে নিজেদের অনুকূলে গ'ড়ে তুলবার জন্য। খবরের কাগজ প'ড়ে যারা নিজেদের মত গঠন করে—সেই জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে সংবাদপত্রগুলি সেই সব বার্ত্তা বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে যাদের উপরে সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মতির ছাপ আছে। জাতিপ্রেমের দোহাই দিয়ে এমন সব আচরণ সমর্থন করতে তাদের শেখানো হচ্ছে যাদের ভিত্তি অন্যায়ের উপরে। দেশে দেশে জনসাধারণের মন আজ কারারুদ্ধ। ডিক্টেটররা তাদের যা শেখাচ্ছে তাই তারা শিখছে—যা বলাচ্ছে তাই তারা বলছে। হিটলার যখন বলছে, বলশেভিকবাদের মত এমন শয়তানী জিনিষ আর নেই—সমস্ত জার্ম্মানী গলার শিরা ফুলিয়ে রাশিয়াকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছে। সেই হিটলার আবার যখন রাশিয়ার সঙ্গে মিতালি করল—সমস্ত জার্ম্মানী ষ্ট্যালিনের জয়গান সুরু ক'রে দিল। "আমি তোমার পোষা পাখী—যা শেখাও মা তাই শিখি"—এই পরানুকরণপ্রিয়তার অভিশাপে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ আজ অভিশপ্ত। জার্ম্মানীতে, ইটালীতে, জাপানে মানুষ আজ মানুষ নয়—ছায়া, প্রতিধ্বনি, পুতুল-নাচের পুতুল আর মানুষকে পুত্তলিকায় পরিণত করেছে কে? শিক্ষা—সাম্রাজ্যবাদীদের কলকাঠি রেডিও আর খবরের কাগজের দ্বারা প্রচারিত শিক্ষা।

(শেষাংশ ২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় :—শচীন সেন। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

অনেক দিন পরে বাঙলা ভাষায় এমন একখানা সরস সমালোচনা গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা সত্যই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এমন তীব্র ও গভীর বিশ্লেষণ এবং নিগূঢ় রসের এমন নিপুণ পরিবেশন বাঙলা সাহিত্যে দুর্ল্লভ, একথা আমরা বলিবই। গ্রন্থকারের রবীন্দ্র কাব্যের ভূমিকা এক অপূর্ব্ব বস্তু। এগারটি অধ্যায়ে তিনি এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; এই আলোচনার মধ্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—অত্যুজ্জ্বল মনস্বিতার আলোকে আলোচনাংশ সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা জানিতে চাহেন, বুঝিতে চাহেন—রবীন্দ্র সাহিত্যের রসকে আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলেরই শচীনবাবুর এই গ্রন্থখানা পাঠ করা উচিত। শচীনবাবুর এই অবদানে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

রবীন্দ্র কাব্যের ভূমিকায় লেখক (ক) রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল, (খ) রবীন্দ্র কাব্যের বিচিত্রতা (গ) জীবন দেবতা, (ঘ) গতি ধর্ম্ম, (ঙ) বিশ্বৈক্যানুভূতি, (চ) প্রকৃতির সহিত যোগ, (ছ) মৃত্যু ও জীবনের সম্বন্ধ, (জ) প্রেম সাধনা, (ঝ) বৈষ্ণব প্রভাব, (ঞ) স্বাদেশিকতা, (ট) কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতা, এই কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিষয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। লেখক এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যে নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, অল্প স্থানের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়, সুতরাং মূল গ্রন্থখানাকে পাঠকদিগকে পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্তব কুসুমাঞ্জলি :—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত—উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

প্রথম খণ্ডে বেদ এবং উপনিষদ হইতে প্রচুর শ্লোক এবং সূত্র সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সুপ্রচলিত বহু স্তব আছে। শ্লোক এবং স্তবগুলির ভাষাগত বাঙলা টিকা এবং সরল অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বেদ এবং বেদান্তের মর্ম্ম উপলব্ধি করা অনেকের পক্ষেই কঠিন, এই পুস্তকের সাহায্যে সে অভাব কিছু দূর হইবে। স্তবে উল্লিখিত পৌরাণিক কাহিনীগুলি তাহার মধ্যে সংক্ষেপে দেওয়াতে পাঠকদের মর্ম্ম গ্রহণের পক্ষে সুবিধা হইবে। বাঙলা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ কয়েকখানা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ সুনির্ব্বাচিত সংগ্রহ আমরা আর কখনও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। গ্রন্থের বিশেষত্ব হইল ইহার নির্ভুলতা এবং পারিপাট্য। এমন সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ এবং চকচকে, ঝকঝকে বাঁধান বই হাতে পরিলেই পড়িবার ইচ্ছা হইবে। পাঠকেরা হিন্দু শাস্ত্রের সার আস্বাদন করিতে সক্ষম হইবেন এই সংগ্রহ হইতে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জীর মত এমন গ্রন্থ রাখা উচিত।

ধর্ম্ম সংগীতের অপূর্ব্ব পুস্তক :—শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত। মূল্য সাড়ে তিন আনা। ডাক ব্যয় এক আনা। ডি ৪৭।১১৯নং রামপুরা, বেনারস।

২০৮টি গানের সংগ্রহ, সব গানগুলিই ভক্ত, ভাবুক ও সাধকদের বিরচিত। এমন বাছা বাছা ভাল গানের এমন সুলভ পুস্তকের বহু প্রচার হইবে বলিয়া অশা করা যায়।

স্রোত ও আবর্ত্ত :—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। প্রকাশক—কিশোর গ্রন্থালয়, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

উপন্যাস। ভাষা সরস, বলিবার ভঙ্গীটিও বেশ শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু বিষয়বস্তুর দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য কিম্বা মনোবিকলন ধারায় অটুট সঙ্গতি অথবা সূক্ষ্ম ভাবের খেলার সাময়িক স্পর্শ—এমন কিছু নিজস্ব ছাপের আভিজাত্য নজরে পড়ে না, যাহা দ্বারা আজিকার উপন্যাস-প্লাবিত দেশের আর দশখানা মামুলী রচনা হইতে ইহাকে তেমন বিশিষ্ট আসনে অভিষিক্ত করা যায়। তথাপি লিপি-কুশলতা সম্ভাব্যতার যে আভাস প্রদান করে, তাহা আশাপ্রদই বলিতে হইবে এবং উহার সার্থকতাও বহু দূরে নয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

জোনাকি :—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত। ২১০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় এই ক্ষুদ্র অথচ শোভন পুস্তিকায় পঞ্চাশটি সনেট প্রকাশিত হইয়াছে। অলঙ্কার-বাহুল্যবর্জ্জিত সহজ ছন্দের এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি জোনাকির স্ফুরণ-কম্প্র স্নিগ্ধ আলোকের ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এক অলৌকিক অনুভূতি জাগাইয়া অভিভূত করিয়া তোলে। কবি সনেটকে প্রত্যেক চরণের বর্ণমালা চৌদ্দ অক্ষর হইতে আট ও এগারো অক্ষরে সংক্ষিপ্ততর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আবেদন কোথাও ব্যর্থ হয় নাই।

পথের সঞ্চয় :—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত; মূল্য আট আনা।

২৭ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার গ্রহণের জন্য তৃতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন এই পত্রগুলি সেই সময়ে লেখা। পত্রাকারে এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে কেবলমাত্র অভ্যস্ত পরিবেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া পড়াই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, য়ুরোপে মনুষ্যত্বের যে সার্ব্বভৌম বিকাশ ঘটিয়াছে তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় লাভের প্রবল ইচ্ছাই লেখার প্রতি ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতের কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষী, কবি ও সাহিত্যিকের সহিত লেখকের পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার সেই প্রথম পরিচয়ের অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষভাবে কবি য়েট্‌স্‌ ও স্টপফোর্ড ব্রুকের সাহিত্যিক জীবনের অন্তরালে যে ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্য্য গোপন রহিয়াছে, তাহাকে লেখক সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লণ্ডন ও ফ্রান্সের সহজ সরল ও অনাড়ম্বর পল্লীজীবনের একটি মনোরম চিত্র লেখক তাঁহার কবির অন্তর্দৃষ্টি লইয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এই পুস্তকটি 'লোক-শিক্ষা' পাঠ্যগ্রন্থে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

শতাব্দীর শব :—রচয়িতা শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। মোট ৮৯ পৃষ্ঠা। দাম দশ আনা। বুকল্যাণ্ড—১, শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ পট, বাঁধাই, কাগজ ও ছাপা সুদৃশ্য ও মনোরম।

ইহা একটি ছোট ছেলে-মেয়েদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস। সাধারণত যে সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই শ্রেণীর উপন্যাস লেখা হয়—এটি ঠিক সেই শ্রেণীর নহে। মিশরের 'মামী' ইত্যাদির যে গল্প আছে তাহার ছায়া লইয়া এদেশী কাঠামোর উপর ইহা লিখিত হইয়াছে। ট্রাম, বাস, মোটর, সিনেমা, রেডিওপূর্ণ বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বের সেই ভয়াবহ আত্মার রোমাঞ্চকর অভিযানের মিলন—এক অপূর্ব্ব রহস্য লোকের সৃজন করিয়াছে। শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রে লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁহার 'শতাব্দীর শব' বাঙলার ছেলেমেয়েদের আনন্দ দান করুক—ইহাই আমাদের কাম্য।

সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ

২৪২ পৃষ্ঠার পর

সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে স্বার্থ-পিশাচদের নগ্ন লোভের কদর্য্য প্রকাশ। অপরের সম্পত্তিকে হরণ ক'রে নিজেকে ঐশ্বর্যশালী ক'রে তুলবার যে শয়তানী প্রবৃত্তি—সেই প্রবৃত্তি থেকে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। যে জাত সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহণ করেছে, সে-জাত যুক্তির এবং সংস্কৃতির দাবীকে পরিত্যাগ ক'রে পশুশক্তির প্রাধান্যের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। সাফল্যের শিখরদেশে উপনীত প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেরই চরম কলঙ্ক হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদ। এর অনিবার্য্য পরিণতি শ্মশানের চিতাভস্মের মাঝে। রোম সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরিণতি কি এই পরিণতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না?

সাহিত্য-সংবাদ

"নিউ দিল্লী বঙ্গীয় সুহৃদ সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বসাধারণের জন্য (১) ছোট গল্প, (২) কবিতা, (৩) একাঙ্ক নাটিকা, এবং স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য (৪) "শিল্পের উপযোগীতা" বিষয়ক রচনার প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবেশের শেষ তারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৯।

প্রত্যেক বিষয়ে একটি পদক দেওয়া হইবে। ৪নং প্রতিযোগিতায় মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার রহিয়াছে। ছোট গল্প এবং একাঙ্ক নাটিকা অনধিক এক হাজার শব্দের এবং কবিতা অনধিক ৩২ লাইনের হইবে। রচনার জন্য প্রতিযোগীকে তাহার রচনা স্ব স্ব স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর সিলযুক্ত সহি করাইয়া পাঠাইতে হইবে। চিঠি-পত্রাদি—সম্পাদক সুহৃদ সঙ্ঘ, ১৩নং লেডি হার্ডিঞ্জ রোড নিউ দিল্লী।

সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি রচনা প্রতিযোগিতা

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের জীবনচরিত অবলম্বনে "ভারত নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের জন্য সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক ৫০ টাকা ও ২০ টাকা মূল্যের ২টি পদক যথাক্রমে ১ম ও ২য় পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। কেবল মহিলারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। প্রবন্ধ ৫ই জানুয়ারী (১৯৪০) মধ্যে ৬০-বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সমিতির সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে।

মহামায়া কিশোর সঙ্ঘ

মহামায়া কিশোর সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হস্তলিখিত 'উদয়াচল' পত্রিকার পক্ষ হইতে যে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল তাহার ফলাফল দেওয়া হইল। পুরস্কারপ্রাপ্তগণকে আগামী ২৩শে ডিসেম্বর সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবের দিন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পুরস্কার লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। গল্প—১ম—অরুণ চৌধুরী (রিক্ত), প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ রোড। কবিতা—১ম—কুমারী মলিনা দেবী, (আশা), আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। প্রবন্ধ—১ম—শুদ্ধসত্ত্ব বসু, (কাব্যের স্বরূপ), ল্যান্সডাউন রোড। পুরস্কারযোগ্য লেখা না আসায় ২য় পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

—**শ্রীশিবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'উদয়াচল' সম্পাদক।**

নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা

বালী পাঠসঙ্ঘ

উক্ত সঙ্ঘের পরিচালনায় এই রচনা প্রতিযোগিতায়, বঙ্গের যে কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বিনা প্রবেশমূল্যে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ এর মধ্যে নিম্নলিখিত ৩টির মধ্যে যে কোনও ১টি পাঠাইতে পারিবেন। রচনা বাঙলা ভাষায় লিখিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের ঠিকানা দিতে হইবে। ১ম ও ২য়কে ১টি করিয়া রৌপ্যকাপ ও ৩য়কে ১টি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিষয়ঃ—(১) বাঙলায় নারীর স্থান। (২) বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। (৩) বাঙলায় বিংশ শতাব্দীর প্রভাব। রচনা পাঠাইবার ঠিকানাঃ—(১) ফণিভূষণ গুঁই (সম্পাদক), ১৬, যদুনাথ রায় রোড, বালী, হাওড়া। (২) প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, C/o রঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদক, আর টী স্কুল, বালী)।

রচনা প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ—প্রবন্ধ—"পূর্ব্ববঙ্গের নদী-সমস্যা"। গল্প—পল্লী অথবা সমাজ-সংস্কার বিষয়ক। কবিতা। শেষ তারিখ—৩১শে ডিসেম্বর। পাঠাইবার স্থান—শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, যুগান্তর, (৩২-বি, রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট); শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর, (৩৬, আহিরী-পুকুর রোড); শ্রীযুক্ত নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য (১৭, অশ্বিনী দত্ত রোড); কুমারী অমিয়া দাশগুপ্তা, (৩, কলেজ রো, ইউনিভারসিটি গার্লস হোষ্টেল); শ্রীযুক্ত সুধীর সমাজদার, (২৩, বৃন্দাবন বোস লেন); শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৩৬।৪।৩, বোনিয়াটোলা লেন)।

—শ্রীকালীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

ফরিদপুর জেলা প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ হইতে 'শরৎ-স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর (১৩৪৬) প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় "শরৎ-স্মৃতি পদক" দেওয়া হইবে। ফরিদপুর জিলার স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বসাধারণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। বিষয়—"**শরৎ সাহিত্যে নারী**"। নিয়মাবলীঃ—(১) প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের চার পৃষ্ঠার বেশী হইবে না এবং স্পষ্ট করিয়া কালীতে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। (২) রচনার সহিত নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে থাকা আবশ্যক, নহিলে রচনা শ্রেষ্ঠ বিবেচ্য হইলেও গ্রাহ্য হইবে না। (৩) রচনা আগামী ১৫ই পৌষ (১৩৪৬) এর মধ্যে সভাপতি শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামীর নামে 'প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ, ফরিদপুর' ঠিকানায় প্রেরিতব্য। (৪) আমাদের হস্তগত কোন রচনাই পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হয় না এবং ডাকঘরের গণ্ডগোলে কোন রচনা সময়মত আমাদের হাতে না আসিয়া পৌঁছিলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। (৫) কাহারও কোন বিষয় জিজ্ঞাসা থাকিলে কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট খোঁজ করিবেন।

সম্পাদক—শ্রীরণজিৎকুমার সেন, প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ, ফরিদপুর।

গল্প প্রতিযোগিতা

হস্ত লিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অবসর'-এর জন্য গল্প প্রতিযোগিগণকে আহ্বান করা যাইতেছে। শ্রেষ্ঠ লেখককে ১টী রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হইবে। গল্প ফুলস্কেপ পৃষ্ঠার ১২ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না বা দুই পৃষ্ঠায় লিখিত গল্প মনোনীত হইবে না। কোন গল্পই ফেরৎ দেওয়া হইবে না। যথাসময়ে ফলাফল দেশেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায়,
রাধারমণ সম্মিলন সমিতি,
ডুমুরদহ,
জিঃ—হুগলী।
পোঃ—নয়াসরাই.

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

নিউ দিল্লী বঙ্গীয় সুহৃদ সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বসাধারণের জন্য (১) ছোট গল্প, (২) কবিতা, (৩) একাঙ্ক নাটিকা এবং স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য (৪) "শিল্পের উপযোগিতা" বিষয়ক রচনার প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবেশের শেষ তারিখ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯।

প্রত্যেক বিষয়ে একটি পদক দেওয়া হইবে। ৪নং প্রতিযোগিতায় মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার রহিয়াছে। ছোট গল্প এবং একাঙ্ক নাটিকা অনধিক এক হাজার শব্দের এবং কবিতা অনধিক ৩২ লাইনের হইবে। রচনা জন্য প্রতিযোগীকে তাহার রচনা স্ব স্ব স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর সিলযুক্ত সহি করাইয়া পাঠাইতে হইবে। চিঠিপত্রাদি "সম্পাদক, সুহৃদ সঙ্ঘ, ১৩নং লেডী হার্ডিঞ্জ রোড, নিউ দিল্লী" —এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

রচনা প্রতিযোগিতা

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের জীবনচরিত অবলম্বনে "ভারত-নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের জন্য সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক ৫০, টাকা ও ২০, টাকা মূল্যের ২টি পদক যথাক্রমে ১ম ও ২য় পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। কেবল মহিলারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। প্রবন্ধ ৫ই জানুয়ারী (১৯৪০) মধ্যে ৬০-বি, মুজাপুর ষ্ট্রীটে সমিতির সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে।

রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল

ঝোড়হাট তরুণ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত "নিখিল বঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতার" রচনায় জুজুরসাহা পি এন মান্না ইনষ্টিটিউশানের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমন্মথনাথ পল্লে ও বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীবিমলকুমার পাল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছেন। চিত্র প্রতিযোগিতায় ভাল চিত্র পাওয়া না যাওয়ায় কোনরূপ পুরস্কার দেওয়া হইল না। পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরে পত্র দ্বারা পুরস্কার বিতরণের দিন জ্ঞাত করা হইবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সম্পাদক'
ঝোড়হাট তরুণ সঙ্ঘ, পোঃ আন্দুলমৌড়ি, হাওড়া।

আজ-কাল

সুখী পরিবারে ভাঙন

বাংলা মন্ত্রিমণ্ডলীতে ভাঙনের আসন্ন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলা গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা-পরিষদে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রস্তাব এনেছিলেন, অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার তা সমর্থন করেন নি; গত ১৮ই ডিসেম্বরের বিতর্কে তিনি বলেন, সরকারী প্রস্তাবের শেষভাগে আছে যে, যুদ্ধের পর ভারতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রবর্ত্তন করতে হলে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থন ও অনুমোদন নিতে হবে; কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এইভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাম্য অগ্রগতি রোধ করবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান তিনি সমর্থন করেন না।

সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে যখন ভোট নেওয়া হয়, তখন অর্থসচিব সরকারপক্ষে ভোট না দিয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় ঐ একই বিষয়ের বিতর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের দাবীটা অনেকটা সমর্থন করেছিলেন। তখনই কোয়ালিশনী সদস্যেরা চটেছিলেন; তারপর ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁর এই আচরণে কোয়ালিশনী দল ক্ষেপে যান (সরকারী প্রস্তাব অবশ্য দুই সভাতেই ইউরোপীয়দলের সমর্থনে পাস হয়)। বিতর্কের পর কোয়ালিশনীরা এক সভা করে নলিনীবাবুর প্রতি অনাস্থা জানান। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক। শোনা যাইতেছে, নলিনীবাবু এর পর পদত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

শ্রীশরৎ বসুর বক্তৃতা

১৩ই ডিসেম্বর ব্যবস্থা পরিষদের বিতর্কে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেন, নাৎসীবাদকে আমরা ঘৃণা করি বটে; কিন্তু তার থেকে সাম্রাজ্যবাদকে কম ঘৃণা করি না, কারণ আমরা ভুলতে পারি না ভারতবর্ষে, আয়ার্ল্যাণ্ডে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, আমেরিকায়, কানাডায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ কী অন্যায় করেছে। ভারতবর্ষের পক্ষে বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার কোন প্রশ্ন ওঠে না; দাসের সঙ্গে প্রভুর আবার সহযোগিতা কি? ভারতের মত না নিয়েই তাকে ইতিপূর্ব্বেই যুদ্ধে জড়ানো হয়েছে।

শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন যে, যুদ্ধের লক্ষ্য বিশ্বাস করা কঠিন; কারণ গত মহাযুদ্ধে যে যে লক্ষ্য প্রচার করা হয়েছিল, সমস্ত মিথ্যা বলে' প্রতিপন্ন হয়েছে। গতবার মিত্রশক্তি পাঁচটা লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেনঃ (১) সমরবাদ উচ্ছেদ, (২) ছোট জাতিগুলোকে রক্ষা, (৩) গণতন্ত্রের জমি তৈয়ারী, (৪) যুদ্ধের অবসান করা এবং (৫) পররাজ্য গ্রাসের অভিপ্রায় বিসর্জ্জন। কিন্তু প্রত্যেকটি মিছে কথা। প্রমাণ এই—

(১) ১৯১৮ থেকে ১৯২৬ পর্য্যন্ত বৃটেন ১৩০ কোটিরও বেশী পাউণ্ড অস্ত্রসজ্জায় ব্যয় করেছে।

(২) যুদ্ধের পর ছোট দেশ মণ্টিনিগ্রো বিলুপ্ত হয়; ফরাসীরা সিরিয়ায় পীড়ননীতি চালায়; বৃটেন মিশর দখল করে; আফ্রিকায় রিফদের স্বাধীনতা আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা ও নিকারগুয়ার উপর রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে; ১৯২০ সাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা হয়।

(৩) জারের অধীন রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রশক্তির মৈত্রী গণতন্ত্র-অনুরাগকে অর্থহীন করে দেয়। তা ছাড়া যুদ্ধের পরই ইতালী, স্পেন ও পোল্যাণ্ডে নিষ্ঠুর ডিক্টেটরী কায়েম হয় এবং গ্রীস ও হাঙ্গারীতে আধা-ডিক্টেটরী স্থাপন করা হয়।

(৪) ১৯১৮ সাল থেকে যুদ্ধ কখনো থামে নি। মিত্রশক্তি বলশেভিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়; তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যুদ্ধ হয়; আয়ার্ল্যাণ্ডে 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান' পদ্ধতি চলে; রুর দখল করা হয়; মেক্সিকো ও চীনে ক্রমাগত যুদ্ধ হ'তে থাকে; রিফ, সিরিয়ান ও নিকারগুয়ানদের উপর আক্রমণ চলে।

(৫) যুদ্ধের পর মিশর, সাইপ্রাস, জার্ম্মান, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, জার্ম্মান পূর্ব্ব আফ্রিকা, টোগোল্যাণ্ড ও কামেরুনের অর্দ্ধেক, লামোয়া, জার্ম্মান নিউ গিনি ও বিষুবরেখার দক্ষিণস্থিত দ্বীপ, প্যালেষ্টাইন এবং ইরাক বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কয়েকটি অবশ্য ম্যাণ্ডেটী রাজ্য হিসাবে। অর্থাৎ যুদ্ধের পর মোট ১৪১৫৯২৯ বর্গমাইল পরিমিত পররাজ্য বৃটেনের হস্তগত হয়।

রয়েল কমিশনের ধোঁকা

জিন্না সাহেবের কেরামতি এখন রয়েল কমিশনে গিয়ে ঠেকেছে। ১৩ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, মুসলমানদের উপর কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর অত্যাচার একটা রয়েল কমিশনের দ্বারা তদন্ত করানো হোক। বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদেরও তিনি পাত্তা দিতে রাজী নন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির সভাপতি হিসেবে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল জিন্না সাহেবের এই নতুন চাল সম্বন্ধে এক স্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে মিঃ জিন্না যে দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁর পক্ষে বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই। রয়েল কমিশন দাবীর মানে এই দাঁড়ায় যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনার বেশ কিছু সময় পাওয়া যায়; সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চাঙ্গা করে তোলা যায় এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন এখন চাপা দিয়ে দেওয়া যায়। এটা সাম্রাজ্যবাদী খেলা এবং মিঃ জিন্না তার অস্ত্র। নিজেরা জড়িত থাকা সত্ত্বেও বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটেরা জিন্নার অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না দেখে শ্রীযুক্ত প্যাটেল ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

জানা গেল, এইসব ব্যাপারের পর জিন্না-নেহেরু

আপোষ-আলোচনা এখন আর হবে না। ১৮ই তারিখ থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়েছে; বৈঠক শেষ হলে সঠিক সব জানা যাবে।

ইউরোপের আবর্ত্ত

"গ্রাফ স্পে"র আত্মঘাত

গত ১৪ই ডিসেম্বর দক্ষিণ আটলাণ্টিকে উরুগুয়ের কাছে জার্ম্মান ক্ষুদে যুদ্ধ-জাহাজ "গ্রাফ স্পে"র সঙ্গে তিনটি বৃটিশ ক্রুজারের ভীষণ লড়াই হয়। ৩৬ জন জার্ম্মান এবং ৬২ জন ইংরেজ মারা যায়। একটি ব্রিটিশ ক্রুজার জখম হয়। "গ্রাফ স্পে" শেষ পর্য্যন্ত খুব জখম অবস্থায় উরুগুয়ের রাজধানী মণ্টিভিডেও বন্দরে আশ্রয় নেয়। উরুগুয়ে গবর্ণমেণ্ট তাকে মেরামতের জন্যে ৭২ ঘণ্টা সময় দেন।

ইতিমধ্যে বৃটিশ নৌবহর ও ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজ এসে "গ্রাফ স্পে"র নির্গমন প্লেট নদীর মোহনায় সমবেত হয়। সকলেই মনে করেছিল, এবার একটা চমকপ্রদ জলযুদ্ধ হবে। কিন্তু "গ্রাফ স্পে"র অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন লাংসডর্ফ সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে সমুদ্রে না বেরিয়ে মণ্টিভিডেওর কাছে ১৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জাহাজ ডুবিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, উরুগুয়ে-গবর্ণমেণ্ট জাহাজ মেরামতের জন্যে উপযুক্ত সময় না দেওয়ায় তিনি প্রতিবাদস্বরূপে জাহাজ ডুবিয়ে দিলেন। হের হিটলারের আদেশেই তিনি এরকম করেন।

উরুগুয়ের কাছে জার্ম্মানী এই নিয়ে সরকারীভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এদিকে "গ্রাফ স্পে"র ক্যাপ্টেন ও অফিসাররা জেলে-জাহাজে করে আর্জ্জেণ্টাইনে পেশৗছেছেন। সেখানে সম্ভবত তাঁদের অন্তরীণ করা হবে।

"গ্রাফ স্পে" আটলাণ্টিকে গত কয়েক মাসে নয়খানি বৃটিশ বাণিজ্যপোত ডুবিয়েছিল।

সোভিয়েটের বহিষ্কার

তাড়াতাড়ি বৈঠক করে' রাষ্ট্রসঙ্ঘ ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের অভিযোগে সোভিয়েটকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। গত ১৩ই ডিসেম্বর তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্তকে হাস্যকর বলে' উড়িয়ে দিয়েছে, আর বলেছে যে, বৃটিশ ও ফরাসী শাসকশ্রেণীর নির্দ্দেশমতো রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসী শাসকশ্রেণীর সোভিয়েটের আচরণকে 'আক্রমণ' বলে' নিন্দে করবার অধিকার নেই।

কমন্স-সভায় মিঃ এট্লী বলেছেন, রাশিয়ার বেলায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে রকম তৎপরতা দেখিয়েছেন, পূর্ব্বের কোনো আক্রমণের বেলায় তা দেখান নি; যদি তাঁরা আগে এরকম তৎপরতা দেখাতেন, তাহলে আজ জার্ম্মাণীর সঙ্গে এই যুদ্ধ করতে হ'ত না।

মিঃ চেম্বারলেন কমন্স-সভায় স্বীকার করেছেন যে, জার্ম্মানী সোভিয়েটকে ফিনিশ ব্যাপারে সাহায্য ও সমর্থন করছে। ইংলণ্ড ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য দেবে—বে-সরকারী-ভাবে সাহায্য দেবে, এই কথা মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করেছেন। ইংরেজরা অগ্রণী হয়ে ফিনল্যাণ্ডে একটা বিদেশী বাহিনী গঠন করছে। কিন্তু নরওয়ে, সুইডেন বা ডেনমার্ক কেউই ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্যদানে অগ্রসর হবে না বলেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্যদানের পক্ষপাতী সুইডিশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ সাণ্ডলারকে বাদ দিয়ে সুইডেনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।

লালফৌজের অভিযান

ফিনরা এখন স্বীকার করছে যে, লাল ফৌজ উত্তরে নরওয়ের সীমান্তবর্ত্তী ফিনিশ রাজ্যের অধিকাংশ ভাগ দখল করে নিয়েছে। আর কিছু অগ্রসর হলে রুশেরা সুইডিশ সীমান্ত ঘেঁষে বোথনিয়া উপসাগরে পেশৗছবে। সোজা পূব থেকে পশ্চিমে যে সোভিয়েট বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে তারা ৮২ মাইল এগিয়ে গেছে; এই বাহিনীও ক্রমে বোথনিয়া উপসাগরে পেশৗছবে। লাল ফৌজ বোথনিয়া উপসাগরে উপনীত হলেই ফিনল্যাণ্ড চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাবে; কারণ সমুদ্রপথে এখন সোভিয়েটের অবরোধ রয়েছে।

ফিনদের তরফ থেকে বহু সংবাদ প্রচার করে রটানো হচ্ছে যে, সর্ব্বত্র সোভিয়েটের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে; কিন্তু ফিনদের তেমন কিছু হচ্ছে না। অথচ হেলসিঙ্কি-গবর্ণমেণ্টের সদস্যেরা একবার সোভিয়েটের কাছে শান্তির প্রস্তাব করছেন, একবার জগতের কাছে সাহায্য চাচ্ছেন। এমন কেন হচ্ছে তা বিলাতী সংবাদদাতারাই বল্‌তে পারেন।

পশ্চিম সীমান্ত

এ সপ্তাহে পশ্চিম সীমান্তের আসর একটু গরম হচ্ছে বলে' মনে হয়। জার্ম্মান রক্ষীদলের আক্রমণ বারে ও তীব্রতায় বেড়েছে। কয়েকটা বিমান-লড়াই হয়ে গেছে। বৃটেন ও জার্ম্মানী উভয় তরফ থেকেই পরস্পরের দেশের উপর হানা চলছে। ফ্রান্সে বৃটিশ সৈন্যেরা এ সপ্তাহে ম্যাজিনো লাইনে গিয়ে স্থান নিয়েছে।

জাহাজ-ডুবি

৬ই ডিসম্বর থেকে এ পর্য্যন্ত জার্ম্মান আক্রমণে নিম্নলিখিত বৃটিশ জাহাজগুলোর ডুবির খবর পাওয়া গেছেঃ—ডোরিক ষ্টার, হর্স্টেড, ওয়াশিংটন, মার্ল, টমাস ওয়ালটন, নেভাসোটা, ব্র্যাণ্ডন, রে অব্ হোপ, এশ্‌লী, নিউটন বীচ, ট্রিভেনিয়ন, হাণ্ট্‌স্‌ম্যান, উইলোপুল, উইলিয়াম হ্যালেট, ডেপ্টফোর্ড, ইনভার্লেন, জেম্‌স্ লাডফোর্ড, ষ্ট্যানউড, এম্ব্‌ল্, সিরিলিটি, নিউচয়েস, ইভালিনা, সেজফ্লাই। 'চ্যান্সেলার' নামে একটা বৃটিশ জাহাজ এবং 'ডাচেস' নামে বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার অন্য জাহাজের সংঘর্ষে জলমগ্ন হয় বলে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন। নোভাস্কোটিয়ার কাছে একটা অজ্ঞাত বৃটিশ বাণিজ্যপোত ডুবেছে। এছাড়া কয়েকটা বৃটিশ জাহাজ জখম হয়েছে এবং ১৫টা নিরপেক্ষ জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে।

১৮-১২-৩৯ —ওয়াকিবহাল

উত্তরায় "চাণক্য"

গত ১৫ই ডিসেম্বর উত্তরা চিত্রগৃহে কালী ফিল্মস লিমিটেডের ঐতিহাসিক সবাক চিত্র নাটক 'চাণক্যে'র শুভ-উদ্বোধন হইয়াছে। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' অবলম্বনে এই চিত্রখানি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

সেলুকাসের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

মঞ্চ ও চিত্রের অভিনয়ের মধ্যে যেমন যথেষ্ট পার্থক্য আছে তেমন মঞ্চ ও চিত্রের সংলাপের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। মঞ্চের অভিনয় যদি চিত্রে প্রদর্শিত হয় তবে তাহা যেমন গুরু বোঝা স্বরূপ হয় তেমন চিত্রাভিনয় মঞ্চে খুব হালকা হইয়া পড়ে। সেজন্যই নাটক কিংবা কোন আখ্যানবস্তুর ঘটনা ও গতিকে চিত্রোপযোগী করিবার জন্য অনেক সময় আমূল পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হয়। তাহাতে লেখকের প্রতি অসৌজন্য বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না। তবে আমাদের দেশে চিত্র পরিচালকগণ আত্ম অহমিকা ও ভ্রান্ত একগুঁয়েমি পাণ্ডিত্যের দর্পে প্রায়ই ভাল করিতে গিয়া মন্দই করিয়া বসেন। সেইজন্যই নিরপেক্ষ ও কল্যাণকামী সমালোচকগণ মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্য ভাষণ না করিয়া পারেন না। আলোচ্য চিত্রের সংলাপ, ভাষা ও ঘটনা মূল গ্রন্থ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া যাহারা আপত্তি তুলিয়াছেন, তাঁহাদের এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যুগধারা ও অচঞ্চল মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতেই হয়। অবশ্য এ কথা আমরা বলি না যে, একদা যে সকল ভৌতিক, অলৌকিক কিংবা আজগুবি কোন ঘটনা যাহা পূর্ব্বে মানুষ বিশ্বাস করিত কিংবা অতীত যুগের প্রচলিত কোন বিষয় যাহা এখন বিশ্বাসযোগ্য নয় ও প্রচলিত নয় তাহা বর্ত্তমান যুগের আনুকূল্যে মূল বিষয়বস্তুকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নবকলেবরে প্রদর্শন করা উচিৎ। কোন ঘটনার ভ্রান্ত অথবা বিকৃত রূপ কখনও বাঞ্ছনীয় নয় এবং সমর্থনযোগ্য নয়। আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যে সকল ঐতিহাসিক ও পুরাকালের আখ্যানবস্তু লইয়া বর্ত্তমানে চিত্র নির্ম্মাণ করা হয় তাহাতে মূল ভাবধারা, শক্তি, অপরিবর্ত্তনশীল নিজস্বরূপ ও স্পিরিট সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আধুনিক যুগধারা অনুসারে ট্রিটমেণ্ট করা হয়।

আলোচ্য চিত্রের যে পরিবর্ত্তন ও রূপ আমরা দেখিতে পাইয়াছি তাহা শিশির প্রতিভার উপযুক্ত একেবারেই হয় নাই। শিশির বাবুর নিকট আমরা অনেক বড় জিনিষ আশা করিয়াছিলাম। কথাবহুল কাহিনীকেও সফল চিত্ররূপ দেওয়া যায়, উদাহরণ স্বরূপ আমরা বার্নাড স'র 'পিগ মেলিয়ান' চিত্রের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মঞ্চে সুন্দর কথাবহুল স্থানগুলির প্রতি চিত্র পরিচালকের নিরপেক্ষ ও অমায়িক হওয়া উচিত ছিল। চিত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'চাণক্য' সুতরাং চাণক্যের প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক এবং চাণক্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অন্যান্য চরিত্রের প্রয়োজন। চিত্রটি চাণক্যময় হইয়া পড়ায় আমাদের কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয় একমাত্র কাত্যায়ণ ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রের উপর পরিচালক মহাশয় অবিচার করিয়াছেন। কাত্যায়ণ না হইলে চাণক্য হয় না বলিয়াই আমরা কাত্যায়ণকে পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাইয়াছি, কিন্তু অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলির পরিস্ফুট রূপ প্রকাশের সুযোগ দেখিতে পাই নাই। চন্দ্রগুপ্ত, সেলুকাস ও ছায়া চরিত্রগুলির বিকাশ পাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভৌমিকের পরিচালনায় সাজ-সজ্জা ও দৃশ্য-পট ভালই হইয়াছে। আলোকচিত্র ও শব্দ গ্রহণের কাজ অত্যধিক খারাপ হওয়ায় চিত্রটির বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। সম্পাদনা ভাল হয় নাই। ছবিটির স্থানে স্থানে পুনঃগ্রহণ (re-take) ও কিছু সংস্কার করিলে ভাল হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত পরিচালনা সুন্দর হইয়াছে।

চাণক্যবেশী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও কাত্যায়ণবেশী শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রের অভিনয় আলোচ্য চিত্রের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। চাণক্যরূপ শিশির প্রতিভার অন্যতম সম্পদ। মঞ্চে বহু বৎসর ধরিয়া শত শত দর্শক শিশিরকুমারের চাণক্যাভিনয় বহুবার দর্শন করিয়াছে এবং এখনও করিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় মঞ্চ অভিনয়ের সে খ্যাতি আলোচ্য চিত্রে ক্ষুন্ন হয় নাই। পণ্ডিত চাণক্য, উন্মাদ চাণক্য, প্রতিহিংসাপরায়ণ চাণক্য, কূট চাণক্য, পাষাণ চাণক্য ও নিঃস্ব চাণক্য প্রভৃতি বিভিন্নরূপ শিশিরকুমার যে দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা অপর কোন নটের পক্ষে সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। শিশিরকুমারের এই অপূর্ব্ব ও অনবদ্য অভিনয়ের মধ্যে একটু মঞ্চাভিনয়ের প্রভাব মাঝে মাঝে আমাদের একটু ক্ষুন্ন করিয়াছে। ইহার কারণ হয়ত তাঁহার অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালন। নরেশবাবুর অভিনয় নিখুঁত ও খুব সুন্দর হইয়াছে। অহীনবাবু কৃতিত্ব দেখাইবার কোন সুযোগ পান নাই, তবে তাহার অনাড়ম্বর ও স্বচ্ছ অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করিবে। কঙ্কাবতীর অভিনয় খুব সংযত, রুচিমার্জ্জিত ও সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু কঙ্কাবতীর স্থলে রাজলক্ষ্মীকে একেবারেই মানায় নাই, না চেহারায় না অভিনয়ে।

সোহানীর বিজয়ী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ইঁহাদের জিম মেটা ও মিসেস ফুটিট বিশেষ বাধা প্রদান করিবেন।

ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা

সম্প্রতি ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। পুরুষদের বিভাগে গউস মহম্মদ ও মহিলাদের বিভাগে মিসেস বোল্যান্ড প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। গউস
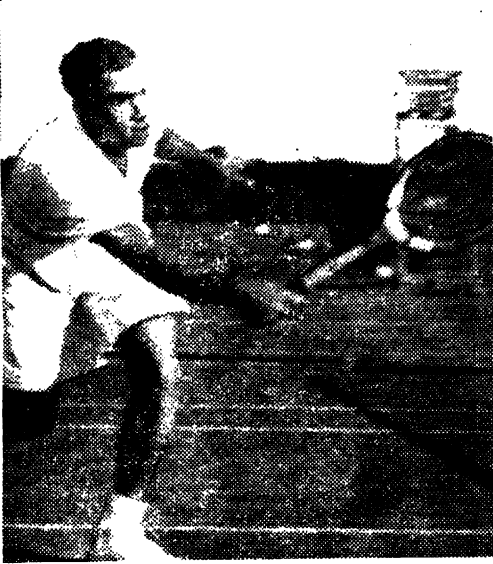
গউস মহম্মদ

মহম্মদ ১৯৩৮ সালেও প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। মিসেস বোল্যান্ড গত বৎসরেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নিম্নে ক্রমপর্যায় তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

পুরুষ বিভাগ

(১) গউস মহম্মদ
(২) এস এল আর সোহানী
(৩) বি টি ব্রেক
(৪) টি কে রমানাথম ও ওয়াই সাবুর
(৫) যুধিষ্ঠির সিং
(৬) ই ভি বব
(৭) জে এম মেটা
(৮) এস এ আজিম
(৯) ইফতিকার আমেদ

মহিলা বিভাগ

(১) মিসেস বোল্যান্ড
(২) মিস লীলা রাও
(৩) মিস উডব্রিজ
(৪) মিসেস এডনী
(৫) মিসেস ফুটিট
(৬) মিস হার্ভিজনষ্টন

বাঙলার টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা

বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশন সম্প্রতি বাঙলা টেনিস খেলোয়াড়গণের এক ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্রমপর্যায় তালিকায় মদনমোহন, দিলীপ বসু, ডবলিউ এইচ এস মিচেলমোর, সি এল মেটা স্থান লাভ করেন নাই। ইঁহাদের বিভিন্ন খেলার ফলাফল ক্রমপর্যায় কমিটির হস্তগত না হওয়ার ফলেই এইরূপ বাদ পড়িয়াছেন। তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) ডি এলবার্ট, (২) বি এম থাপ্পর, (৩) এ বি কানন, (৪) নির্মল সেন, (৫) ই টার্ণটন।

নবনগর দলের শোচনীয় পরাজয়

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিম অঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলায় নবনগর দল শোচনীয়ভাবে দশ উইকেটে বরোদা রাজ্য দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ন্যায় শক্তিশালী দলকে পরাজিত করিয়া নবনগর দল এতই গর্বিত হইয়াছিল যে, বরোদা রাজ্য দলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দল প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করে নাই। বিনু মানকড়, রণবীর সিং প্রভৃতি বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে দলে না লইয়াই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এইরূপ শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছে। তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত বরোদা রাজ্য দল নবনগর দলকে পরাজিত করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এই দল অমর সিং, এস ব্যানার্জির ন্যায় দুর্ধর্ষ বোলারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নবনগর দল অপেক্ষা প্রথম ইনিংসেই ১৬৬ রাণ অধিক করিতে সমর্থ হয়। এইচ অধিকারী ১৬০ রাণ, সি এস নাইডু ৫৫, নিম্বলকর ৮৫ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। সি এস নাইডু একাই নবনগর দলের দুই ইনিংসে ১৩টি উইকেট দখল করিয়া বিপর্যয়ের কারণ হন।

নবনগর দল প্রথমে ব্যাট করিয়া ২৩৩ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। অমর সিং ১১৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পরে বরোদা দল খেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৩৯৯ রাণ করিতে সমর্থ হয়। অধিকারী, নিম্বলকর, সি এস নাইডু, অমর সিং ও ব্যানার্জির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অধিক রাণ করিতে সমর্থ হন। দৃঢ়তা ও একাগ্রতার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট বোলারদের বোলিংয়ের তীক্ষ্ণতা যে নষ্ট হয় ইহাই প্রমাণিত করেন। তরুণ ব্যাটসম্যানদের এই কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং সত্যই প্রশংসনীয়। ইঁহারা অদূর ভবিষ্যতে যে ভারতীয় ক্রিকেটের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন তাহার নিদর্শন দিয়াছেন।

নবনগর দল প্রথম ইনিংসে ১৬৬ রাণে পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসে অধিক রাণ তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সি এস নাইডুর মারাত্মক বোলিং তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে। ১৮৯ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। কোনরূপে ইনিংস পরাজয় হইতে অব্যাহতি পান। বরোদা দল ফাইনালে পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের সহিত খেলিবে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

নবনগর প্রথম ইনিংস—২৩৩ রাণ (অমর সিং ১১৩ রাণ নট আউট, এ এফ ওয়েন্সলী ২২; প্রিন্স খাণ্ডেরাও ৬৭ রাণে ২টি, নিম্বলকর ২০ রাণে ১টি, সি এস নাইডু ৮৩ রাণে ৫টি, গহি ২৫ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বরোদা প্রথম ইনিংস—৩৯৯ রাণ (অধিকারী ১৬০ রাণ, সি এস নাইডু ৫৫, ডবলিউ এন ঘোরপদে ৪৭, বি নিম্বলকর ৮৫; এস ব্যানার্জি ১২২ রাণে ৫টি, অমর সিং ১২০ রাণে ৩টি ওয়েন্সলী ৫৬ রাণে ১টি, ওঝা ৪০ রাণে ১টি উইকেট পান)।

নবনগর দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৯ রাণ (চিমনলাল ২৬, ইন্দ্রবিজয় সিং ৩০, অমর সিং ৩৬, এস এম কোলা ৩৯, এ এফ ওয়েন্সলী ২২; সি এস নাইডু ৪৪ রাণে ৮টি উইকেট পান)।

বরোদা দ্বিতীয় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ২৫ রাণ। বরোদা ১০ উইকেটে বিজয়ী।

সমর-বার্ত্তা

১৪ই ডিসেম্বর—

রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। অদ্য রাষ্ট্রসংঘ পরিষদে রাশিয়াকে পররাজ্যলিপ্সু আখ্যায় অভিহিত করিয়া এবং সোভিয়েটকে রাষ্ট্রসংঘ হইতে বিতাড়িত করিবার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দক্ষিণ আটলাণ্টিকে জার্ম্মান ক্ষুদে যুদ্ধ-জাহাজ "এডমিরাল গ্রাফ স্পে" ও তিনটি বৃটিশ ক্রুজারের মধ্যে এক ভীষণ জলযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। "এক্সিটার", "এজাক্স" ও "একিলিস" নামক তিনটি বৃটিশ ক্রুজার একযোগে উক্ত জার্ম্মান যুদ্ধ-জাহাজটি আক্রমণ করে। "এক্সিটার" জখম হওয়ায় যুদ্ধ ক্ষান্ত দেয়। অপর ক্রুজার দুইটি জার্ম্মান যুদ্ধ-জাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করে। সারাদিনব্যাপী যুদ্ধ করার পর "এডমিরাল গ্রাফ স্পে" খুব জখম অবস্থায় মণ্টিভেডিওতে আশ্রয় নেয়। জার্ম্মান যুদ্ধ-জাহাজের ৩৬ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হইয়াছে।

১৫ই ডিসেম্বর—

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মঃ আভেনল রাশিয়াকে রাষ্ট্রসংঘ হইতে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে সোভিয়েটের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছে।

মস্কোর এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট-বাহিনী সোভিয়েট সীমান্ত হইতে ৬৭ মাইল দূরে মধ্য ফিনল্যাণ্ডে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ক্যারেলিয়ান যোজকে দুইটি গ্রাম দখল করা সম্পর্কে সোভিয়েট যে দাবী করিয়াছে, ফিনরা তাহা অস্বীকার করিয়াছে। ফিনরা এই দাবী করিয়াছে যে, সোভিয়েটবাহিনী ম্যানারহাইম লাইন ভেদ করিতে পারে নাই এবং ম্যানারহাইম লাইনের নিকট সংগ্রামে ৫ হাজার রুশ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর—

শেষ রিজার্ভ শ্রেণীকে সৈন্যদলে যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া হেলসিঙ্কিতে এক ঘোষণা জারী করা হইয়াছে। এই ঘোষণার ফলে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের প্রত্যেক লোক এবং ৬০ বৎসর বয়সের প্রত্যেক অফিসারকে সৈন্যবাহিনীতে আহ্বান করা হইল।

মস্কোর একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, মুর মানস্কের দিক হইতে সোভিয়েটবাহিনী অগ্রসর হইতেছে। ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যগণ সালিজার্ভি শহর দখল করিয়াছে। শহরটি পেটসামোর ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত, সেখানে বহু নিকেলের খনি আছে।

বৃটিশ নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, "ডাচেস" নামক ডেস্ট্রয়ার ডুবির ফলে ৬ জন অফিসার ও ১২৩ জন নাবিকের প্রাণহানি হইয়াছে।

ফিনিশ রেডিওতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র-সচিব মঃ ট্যানার সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটোভকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, রুশ-ফিনিশ বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ফিনল্যাণ্ড আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত আছে।

রাষ্ট্র-সংঘ কর্ত্তৃক রুশিয়াকে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকারী টাস এজেন্সী সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তকে একটা প্রহসন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর—

পশ্চিম রণাঙ্গনে কার্য্যতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মানরা মোজেল নদীর পূর্ব্বদিকে ফরাসী রক্ষী ঘাঁটির উপর হানা দেয়। শত্রুপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। ভোসজেস জঙ্গলের পশ্চিমাঞ্চলেও জার্ম্মানদের কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। কয়েকদল জার্ম্মান রক্ষী সৈন্য ঐ অঞ্চলে অগ্রসর হয়।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ফ্রান্সে বৃটিশ-বাহিনী পরিদর্শন করেন।

১৮ই ডিসেম্বর—

লণ্ডন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১০ই হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ২২৭২৭ টনের বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মোট ২০২৪৪ টনের জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে এবং জার্ম্মানীর মোট ৭৯২০ টনের জাহাজ আটক করা হইয়াছে।

হের হিটলারের আদেশানুযায়ী জার্ম্মানরা উরুগুয়ে উপকূল হইতে তিন মাইল দূরে গিয়া "গ্রাফ স্পে" যুদ্ধ-জাহাজটি ডুবাইয়া দিয়াছে। উরুগুয়ে গবর্ণমেণ্ট "গ্রাফ স্পে"কে মেরামতের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে অস্বীকৃত হন। সেজন্য জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট উরুগুয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

জার্ম্মানীর উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ও হেলিগোল্যাণ্ডের নিকটে আকাশ-যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হেলিগোল্যাণ্ডের নিকট আকাশ-যুদ্ধে ১২টি জার্ম্মান বিমানপোত ভূপাতিত করা হয়। ৭টি বৃটিশ বোমারু বিমানের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

১৯শে ডিসেম্বর—

জার্ম্মানীর সরকারী ইস্তাহারে বিমান হইতে আক্রমণ চালাইয়া চারিখানি বৃটিশ রক্ষী জাহাজ জলমগ্ন করার দাবী করা হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন করার জন্য সোভিয়েট বাহিনী মধ্য ফিনল্যাণ্ড দিয়া সরাসরি কেমিজার্ভি অভিমুখে অভিযানের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং সোভিয়েট বাহিনী পশ্চিম দিকে কেমিজার্ভি অভিমুখে আরও ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। ইহার ফলে দক্ষিণ ফিনল্যাণ্ডে ফিনিশ বাহিনীর যোগান বন্ধ হইবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। সোভিয়েট বাহিনী পিটকাজার্ভি শহর অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

হেলসিঙ্কির সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েটের ৩০ হইতে ৪০ হাজার সৈন্য এবং ২৫০টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে। এখন ফিনল্যাণ্ডের সমস্ত রণক্ষেত্রে মোট ৫ লক্ষ রুশ সৈন্য রহিয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের আছে মাত্র তিন লক্ষ ৫০ হাজার।

আর্জ্জেণ্টাইন গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মান যুদ্ধ-জাহাজ "গ্রাফ স্পে"র ১০৩৯ জন অফিসার ও খালাসীকে গার্সিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২০শে ডিসেম্বর—

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মান নাবিকগণ নিজেরাই জার্ম্মানীর অতিকায় জাহাজ "কলম্বাস"কে (৩২৫৮১ টন) ডুবাইয়া দিয়াছে। প্রকাশ, "কলম্বাস" নিরপেক্ষ এলাকা ছাড়াইয়া যাইবার পূর্ব্বে হইতেই বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলি উহার অনুসরণ করিতেছিল। ধরা পড়িবার ভয়েই সম্ভবতঃ জাহাজটিকে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। মার্কিন ক্রুজার "টুসকালুসা"র নাবিকগণ "কলম্বাস"-এর ৫৭৯ জন নাবিককে উদ্ধার করিয়াছে।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর—

মিঃ এম এ জিন্না কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগসমূহ সমর্থন করিয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি তাঁহার অভিযোগসমূহের তদন্তের জন্য প্রিভিকাউন্সিলের একজন বিচারপতির সভাপতিত্বে কেবল হাইকোর্টের জজদিগকে লইয়া এক রাজকীয় কমিশন নিয়োগের দাবী করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হয়। প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ কে ফজলুল হক সরকারী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে দলপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সরকারী প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ-নীতির সমালোচনা করেন।

১৪ই ডিসেম্বর—

লর্ড সভায় ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দেন। কংগ্রেসের সর্ব্বশেষ বিবৃতির উল্লেখ করিয়া ভারত-সচিব বলেন যে, কংগ্রেসের দাবী পূরণ করিতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উঠিতে পারে না,—কংগ্রেসের এই অভিমত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতে পারেন না। কারণ, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমর্থন ব্যতীত কোনরূপ শাসনতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। ভারত-সচিব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে নিজেদের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে লোক নিয়োগের জন্য আগামী এপ্রিল মাসে (১৯৪০) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার জন এণ্ডার্সন বলেন যে, গত ১লা নবেম্বর হইতে আদেশ অমান্যের অপরাধে মোট তিনশত দশ জন ভারতীয় লস্কর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫৮ জন এখনও মুক্তিলাভ করে নাই।

১৫ই ডিসেম্বর—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংয়ে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। বাঙলার গবর্ণর স্যার জন হারবার্ট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটস্থ কর্পোরেশন কমার্শিয়েল মিউজিয়ম হলে খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হয়। কংগ্রেস দলের রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, সাধারণ বা অ-সাম্প্রদায়িক প্রাথমিক স্কুলের অভাবে বাঙলার যে সব অঞ্চলে হিন্দু ছাত্রেরা মক্তবে পড়িতে বাধ্য হইতেছে, সেইসব অঞ্চলে অবিলম্বে সাধারণ বা অ-সাম্প্রদায়িক প্রাথমিক স্কুল খোলা হউক। প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়ে তদন্ত করা হইবে এবং বিষয়টি বিবেচনার জন্য পরিষদের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি স্থানীয় সভ্যদের লইয়া যথাসম্ভব শীঘ্র একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়।

মিঃ জিন্নার প্রত্যুত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, 'শাসনকার্য্য পরিচালনায় আমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে বিচার করিবার জন্য কংগ্রেস কোনও বৈদেশিক কমিশনের নিকট বিচারপ্রার্থী হইবে না।'

১৬ই ডিসেম্বর—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষাকল্পে মেদিনীপুর শহরের কেন্দ্রস্থল পুরাতন কেল্লার নিকট এক বিরাট দ্বিতল স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

ঢাকায় মিডিয়ম ওয়েভের একটি নূতন রেডিও ষ্টেশনের উদ্বোধন হইয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর—

গত নবেম্বর মাসের প্রথমে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টসমূহের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের কতকগুলি অভিযোগ সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হক যে তদন্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হইয়াছিল, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮ই ডিসেম্বর—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ১৪২—৮২ ভোটে গৃহীত হয়। অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ভোটের সময় নিরপেক্ষ ছিলেন। শ্রীযুক্ত সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকারী যুদ্ধ প্রস্তাবের শেষ অংশে তাঁহার আপত্তি আছে। এই অংশে বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে যে সংস্কৃত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে স্বীকৃত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের পূর্ণ সম্মতি ও সমর্থন থাকা চাই। শ্রীযুক্ত সরকার বক্তৃতা করায় এবং সরকারী যুদ্ধ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট না দেওয়ায় কোয়ালিশনী দলের সদস্যদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অধিবেশনের পর কোয়ালিশন দলের এক বৈঠকে শ্রীযুক্ত সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধী তিন ঘণ্টাকাল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়।

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি ভারতের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের আলোচনা করেন নাই।

১৯শে ডিসেম্বর—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কৃষি-মন্ত্রী মৌলবী তমিজুদ্দিন খাঁ জানান যে, পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে বঙ্গীয় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিলটির আর আলোচনা হইবে না, পরিষদের আগামী অধিবেশনে পুনরায় আলোচনা হইবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আর একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন। কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে এইভাবে বিলটি "ধামাচাপা" দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

বাঙলা সরকারের অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করিয়াছেন। গতকল্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা লইয়া সহ-মন্ত্রিগণের সহিত মতভেদই মিঃ সরকারের পদত্যাগের কারণ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বাঙলা কংগ্রেসের ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা হয়।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬, Saturday, 16th December, 1939 [৫ম সংখ্যা

বিদ্যাসাগর স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সযত্ন-স্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত, তারও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষ্য বারংবার উপস্থিত হয়, যে মহাত্মা বিশ্বপরিচিত, বিশেষ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে। মানুষ আপন দুর্বল স্মৃতিকে বিশ্বাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশঙ্কা ঘটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জন্যে সতর্কতা পুণ্যকর্মের অঙ্গ। কেননা কৃতজ্ঞতার দেয় ঋণ যে জাতি উপেক্ষা করে, বিধাতার বরলাভের সে অযোগ্য।

যে সকল অপ্রত্যাশিত দান শুভ দৈবক্রমে দেশ লাভ করে, সেগুলি স্থাবর নয়; তারা প্রাণবান, তারা গতিশীল, তাদের মহার্ঘ্যতা তাই নিয়ে। কিন্তু সেই কারণেই তারা নিরন্তর পরিণতির মুখে নিজের আদি পরিচয়কে ক্রমে অনতিগোচর ক'রে তোলে। উন্নতির ব্যবসায়ে মূলধনের প্রথম সম্বল ক্রমশই আপনার পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্তন এমন ক'রে ঘটাতে থাকে, যাতে ক'রে তার প্রথম রূপটি আবৃত হয়ে যায়, নইলে সেই বন্ধ্যা টাকাকে লাভের অঙ্কে গণ্য করাই যায় না।

সেইজন্যেই ইতিহাসের প্রথম দূরবর্তী দাক্ষিণ্যকে সুপ্রত্যক্ষ ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা ক'রে জানা চাই যে, নিরন্তর অভিব্যক্তির পথেই তার অমরতা, নির্বিকার জড়ত্বের বন্দিশালায় নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানাদিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টিতে; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ ক'রে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে, তার সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।

ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টি-কার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু

উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারেনি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলা ভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় মর্যাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই র'য়ে গেল, বাংলা ভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হোলো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয়নি।

শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন, তার ছাঁদটি বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ ক'রে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গীর অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে প'ড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত থেকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম ক'রে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্য-পালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ্য ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এখনো আমার সম্মাননিবেদন সম্পূর্ণ হয়নি। সব শেষের কথা উপসংহারে বলতে চাই। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম, তবু আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার বন্ধন-বিমুক্ত মন। সেই স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্রাহ্মণ যে অসামান্য পৌরুষের সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধতাকে একদা তাঁর সকরুণ হৃদয়ের আঘাতে ঠেলে দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন, অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন শুভ সংকল্পকে, সেই তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের বহু লোক সসংকোচ নিঃশব্দে অতিক্রম ক'রে থাকেন। এ কথা ভুলে যান যে, আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড়ো কথা নয়, কিন্তু যে দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রতপালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। তাঁর জীবনীতে দেখা গেছে, ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্ম-সম্মান রক্ষা করেছেন, তেমনিই যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রবর্তনায় দণ্ডপাণি সমাজ-শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেননি, সেও কঠিন সংকটের বিপক্ষে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। দীন দুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা দয়া করেছেন, সে কথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করে; কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতা আরো অনেক বেশি, কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়, তাঁর বীরত্ব। তাই কামনা করি, আজ তাঁর যে কীর্তিকে লক্ষ্য ক'রে এই স্মৃতিসদনের দ্বার উন্মোচন করা হলো, তার মধ্যে সর্বসমক্ষে সমুজ্জ্বল হয়ে থাক্ তাঁর মহাপুরুষোচিত কারুণ্যের স্মৃতি।*

২৮।১১।৩৯

* মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী।

বিদ্যাসাগর

১৬ই ডিসেম্বর প্রভাতে মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দির-প্রবেশ উৎসব এবং সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগর জন্ম-তিথি উৎসব সম্পন্ন হইতেছে। উভয় উৎসবেরই পৌরোহিত্য করিতেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা পুরুষ। সব দেশে সকল সময়ে এমন মানুষ জন্ম গ্রহণ করেন না। বিদ্যাসাগরের ন্যায় পুরুষ-সিংহ যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য হয়, যে জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন সে জাতি কৃতার্থ হয়। বিদ্যাসাগর মানব সমাজের গর্ব্ব, ভারতবাসীর তিনি গর্ব্ব; বাঙালীর তিনি গর্ব্ব। বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি মেদিনীপুর; এই জন্য মেদিনীপুর পবিত্র ভূমিরূপে পরিগণিত এবং বিদ্যাসাগরের জন্মক্ষেত্র মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম বাঙালীর নিকট পুণ্যতীর্থ।

মেঘলোকের ঊর্দ্ধে সমুন্নত শির হিমালয়ের গম্ভীর মহিমা মানুষকে যেমন স্তব্ধ করে, সেইরূপ বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, অভিভূত হইতে হয়। পরাধীনতার এই যুগেও আমাদের মধ্যে আমরা এমন মানুষকে একদিন পাইয়াছিলাম, একথা চিন্তা করিয়া জীতমাত্র আত্মপ্রত্যয়হীনতার অবসাদকর প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যেও সাহস, বল এবং শক্তির প্রেরণা আমরা লাভ করিয়া থাকি। বিদ্যাসাগরের পুণ্যচরিত মনন করিলে আমাদের জাতীয় জীবনের দৈনন্দিন হীনতা এবং দীনতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া মানব ধর্ম্মের মহত্ত্বকে আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। বিদ্যাসাগরের স্মৃতি এবং আদর্শ অমোঘ শক্তির উৎসস্বরূপে আমাদের মধ্যে কাজ করে। মহৎ-জীবনের ইহাই হইল বৈশিষ্ট্য। আদর্শের প্রজ্ঞান-ঘন-প্রেরণাময় শ্বাশ্বত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাপুরুষগণ নিত্য এবং সত্য লোকের অধিবাসী, তাঁহারা অমর।

আজিকার এই পুণ্য তিথিতে আমরা অমর বিদ্যা-সাগরের মহনীয় চরিত্র অনুধ্যান করিব। বিশেষভাবে মনন করিব তাঁহার বীর্য্যবত্তা, অকুতোভয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য-মর্য্যাদার ও স্বদেশ প্রীতির। বিদ্যাসাগরের জীবন ছিল জ্যোতির্ম্ময়। গতানুগতিক জীবন তিনি যাপন করেন নাই। তিনি যাপন করিয়াছেন জীবন্ত জীবন। সহস্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিপুল বলিষ্ঠতায় বাঙলার এই বরেণ্য ব্রাহ্মণ মনুষ্যত্বের জয়ধ্বজা বহন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিকূল শক্তির সঙ্ঘাতে তিনি দমেন নাই, টলেন নাই বরং অধিকতর দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতার সঙ্গে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করিয়া আদর্শে স্থির থাকিবার এই যে বীর্য্যবত্তা বা তেজস্বিতা ইহার মূলে ছিল বিদ্যা-সাগরের ঔদার্য্য এবং মানবতা। বিদ্যাসাগরের কার্য্যবেগ বা তাঁহার সাধন-শক্তি সমুৎসারিত হইত যেখানে মানবের ঐকান্তিকতার উৎস সেই প্রাণ-কেন্দ্র হইতে, অহঙ্কারের স্তর হইতে নয়। কার্য্য যেখানে শুধু অহঙ্কারের উপর, সেখানে জীবনে অধ্যবসায় বা অকুতোভয়তা আকার ধরিয়া উঠিতে পারে না। জাতিতে জাতিতে, যুগে যুগে, সকল মহৎ-সিদ্ধির পরম প্রয়াসের ভিতর দিয়া যে বীর্য্যবত্তা প্রকটিত হয়, স্থূলে দৃষ্টিতে তাহার স্বরূপ সব সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। অনেক সময়ে ভুল হয়। প্রকৃতপক্ষে সেবা এবং প্রেমই সেখানে সত্যকার শক্তি স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। বিদ্যাসাগর দেশ ও জাতির প্রেমের এই পরম বেদনাতে উত্তপ্ত হইয়াই অগ্নিময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য অসামান্য ছিল। তাঁহার বিরাট এবং বিশাল চরিত্র অসংখ্য গুণের একত্র সমাবেশ ছিল সমুজ্জ্বল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিতে তাঁহার দেশ এবং জাতির প্রতি প্রেমের এই প্রচণ্ড উত্তাপ। বিদ্যাসাগর সংস্কারশীল ছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারের জন্য সুদীর্ঘ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সংস্কার-প্রয়াসের মূলে পরানুকরণ-স্পৃহার দীনতা বা কার্পণ্য ছিল না, ছিল দেশ এবং জাতির প্রতি সুগভীর বেদনাবুদ্ধি। আত্ম-সম্ভ্রমে উদ্দীপ্ত বাঙলার এই বরেণ্য ব্রাহ্মণ পরানুকরণের দাসোচিত মনোবৃত্তিকে সমুন্নত শিরে এবং সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। দেশ এবং জাতির মর্য্যাদাকে তিনি কোথায়ও আহত হইতে দেন নাই, যখনই তেমন উদ্যম, যে কোন দিক হইতে আসিয়াছে প্রকৃত ব্রাহ্মণের বীর্য্যবত্তার সঙ্গে তিনি তাহা বিচূর্ণ করিয়াছেন। পরকীয় প্রভাব যে মুহূর্ত্তে স্পর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জাতীয় মর্য্যাদাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে তিনি তাহাতে করিয়াছেন পদাঘাত। গর্ব্বোদ্ধত বিদেশী এই বাঙালী ব্রাহ্মণের চটি জুতাকে সম্ভ্রম করিতে বাধ্য হইয়াছে। হ্যাট-কোটকে লজ্জা পাইতে হইয়াছে থানের ধুতি আর সাদা চাদরের কাছে।

বিদ্যাসাগরের এই স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাজাত্য গর্ব্বের মূলে ছিল দেশবাসীর প্রতি বেদনার যে বিপুল অনুভূতি, তাহাই বিচিত্র পথে বিভিন্ন ভঙ্গীতে সাধনার ধারা ধরিয়া উৎসাহিত হইয়া-ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত্তি হইল বঙ্গভাষার জন্য তাঁহার সাধনা। তিনি বুঝিয়াছিলেন মর্ম্মে মর্ম্মে এই সত্যকে যে, দেশ এবং জাতিকে বড় করিতে হইলে, দেশ ও জাতিকে দুর্দ্দশার অন্ধতম স্তর হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের সাধনায় বঙ্গভাষা নূতন এক শক্তি লাভ করিয়াছে। জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিয়া বঙ্গভাষার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। বাঙলা ভাষা আজ যে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে, তাহার মূল কারণ খুঁজিতে গেলে বিদ্যাসাগরের প্রাণবান্ স্পর্শেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিদ্যাসাগরের সাধনার শক্তিলাভ না করিলে বাঙলা ভাষা আজ এতটা উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার মূলে ছিল জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং দৈন্যের ঐকান্তিক উত্তাপ।

নারী-সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী দুশ্চর তপস্যার মূলেও রহিয়াছে এই তাপ। গতানুগতিকতার সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া

সেই তাপ সমাজের অচলায়তনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল; অনুদার অন্ধসংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করিয়া জাতির মধ্যে নূতন গতিবেগ বহাইয়াছিলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর বঙ্গের নব-জাতীয়তার বিগ্রহমূর্ত্তি। উত্তরকালে স্বাধীনতার সাধনায় যে যজ্ঞাগ্নির বিকাশ দেখিতে পাই আমরা এই বাঙলায়, তাহার উগ্রশ্রবা হোতা হইলেন বিদ্যাসাগর। জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিলেন তিনি—অসংমূঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং স্বাজাত্য-মর্য্যাদাবোধ জাগাইয়া। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্ররোচনা জাতি প্রবলভাবে পাইল তাঁহার স্বাতন্ত্র্যোদ্দীপ্ত কর্ম্ম-সাধনার ভিতর দিয়া। জাতির নিত্য এবং সত্য স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়া পরকীয় দাসত্বের বেদনাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন বিদ্যাসাগর। জাতিকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে শিখাইলেন তিনি। সাগ্নিকের বাণী দেশ শুনিল তাঁহার মুখ হইতে—"তোল তোল শির"!

আজ বন্দনা করিব আমরা তাঁহাকে। আমাদের অন্তরের অখণ্ড শ্রদ্ধা আজ অঞ্জলি ভরিয়া দিতেছি তাঁহার পাদ-পদ্মে। বহ্নিবর্চ্চিময়, হে বাঙলার বরেণ্য ব্রাহ্মণ, তোমাকে জাতি কোনদিন ভুলে নাই, ভুলিতে পারিবে না। তোমার পুণ্য চরিত্রের স্মরণ এবং কীর্ত্তন জাতির অন্তরে নিত্য নূতন শক্তি প্রদান করিবে। তোমার আদর্শের অনুধ্যান জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে স্বাতন্ত্র্য-মর্য্যাদাকে উপলব্ধি করিবার উগ্রতায়। সকল দীনতা এবং সকল হীনতার ঊর্দ্ধে অধঃপতিত এই জাতিকে আকর্ষণ করিবে তোমার মহোত্তম মানব-মহিমা; সকল বন্ধনকে সবলে ছিন্ন করিয়া দেখাইবে তাহাকে সত্যকার মুক্তির পথ। ত্যাগ এবং সেবার মধ্যে যে শক্তি আছে, রহিয়াছে যে সম্পদ, সেই শক্তি এবং সম্পদকে উপলব্ধি করিয়া জাতি দৃঢ়তা লাভ করিবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পথে তোমারই প্রসাদে। অমৃতলোকের অধিবাসী তুমি, অমর লোক হইতে তুমি আমাদের উপর তোমার আশীর্ব্বাণী বর্ষণ কর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব্বদিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে॥

২৪ ভাদ্র
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
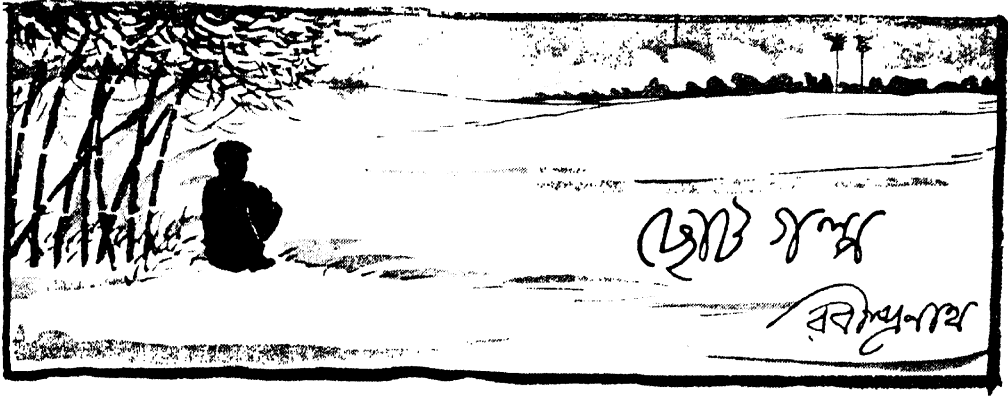
প্রথম পর্ব

শেষ-কথা

সাহিত্যে বড়ো গল্প ব'লে যে সব প্রগল্ভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাক্‌ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো—তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাপ তার চারগুণ, তাদের ল্যাজটা কলেবরের অত্যুক্তি।

অতি পরিমাণ ঘাস-পাতা খেয়ে যাদের পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব, স্তূপাকার মালের বস্তা টানা তাদের অদৃষ্টে। বড়ো গল্প সেই জাতের, মাল-বোঝাইওয়ালা। যে সব প্রাণীর খোরাক স্বল্প এবং সারালো, জাওর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। ছোটো গল্প সেই জাতের; বোঝা বইবার জন্যে সে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।

কিন্তু গল্পের ফরমাশ আসছে বড়ো বহরের। অনেকখানি মালকে মানুষ অনেকখানি দাম দিয়ে ঠকতেও রাজি হয়। ওটা তার আদিম দুর্নিবার প্রবৃত্তির দুর্বলতা। এটাই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের বিয়ের ব্যাপারে। ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য এমনতরো রসাত্মক ক্রিয়াকর্মেও ভদ্র সমাজের বিনা প্রতিবাদে আজো চলে আসছে। আতিশয্যের ঢাকবাজানো পৌত্তলিকতা মানুষের প্রপৈত্রিক সংস্কার।

মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফ'লে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রং রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।

একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক। রাজা এডোয়ার্ড ভ্রমণে বেরলেন দেশ-দেশান্তরে। মুগ্ধ স্তাবকদের ভিড় চলল সঙ্গে সঙ্গে, খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফের ঠোঙাগুলো ঠেসে ভরে ভরে উঠল। এমন সময় যত সব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিক-সম্রাট, লেখনীবজ্রপাণি সংবাদপত্রিকের ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে একটা কোন্ ছোটো রন্ধ্র দিয়ে রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী। শব্দভেদী সমারোহের স্বরবর্ষণ মুহূর্তে হয়ে গেল অবাস্তব, কালো পর্দা পড়ে গেল ইতিহাসের অসংখ্য দীপদীপ্ত রঙ্গমঞ্চের উপর। সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল ছোটো গল্পটি দুর্লভ দুর্মূল্য। গোলমালের ভিতরে অদৃশ্য আর্টিস্ট ছিলেন আড়ালে, তাকিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনসরোবরের গভীর অগোচরে। দেখছিলেন অতলসঞ্চারী অজানা মাছ কখন পড়ে তাঁর বঁড়শিতে গাঁথা, কখন চমক দিয়ে ওঠে তাঁর ছোটো গল্পটি নানাবর্ণ ছটাখচিত ল্যাজ আছড়িয়ে।

পৌরাণিক যুগের একটি ছোটো গল্প মনে পড়ছে—ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আখ্যান। দুঃসাধ্য তাঁর তপস্যা। নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্যের দুরূহ সাধনায় অধিরোহণ করছিলেন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র যাজ্ঞবল্ক্যের দুর্গম উচ্চতায়। হঠাৎ দেখা দিল সামান্য রমণী, সে শুচি নয়, সাধ্বী নয়, সে বহন করেনি তত্ত্ব বা মন্ত্র বা মুক্তি; এমন কি ইন্দ্রলোক থেকে পাঠানো অপ্সরীও সে নয়। সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ আঁট বেঁধে গেল একটি ছোটো গল্পে।

এই হোলো ভূমিকা। আমি হচ্ছি সেই মানুষ যার অদৃষ্ট ভীল রমণীর মতো ঝুড়িতে প্রতিদিন সংগ্রহ করত কাঁচা পাকা বদরী ফল, একদিন হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিল গজমুক্তা, একটি ছোটো গল্প।

সাহস করে লিখে ফেলব। কাজটা কঠিন। এতে হয়তো স্বাদ কিছু বা পাওয়া যাবে কিন্তু পেটভরা ওজনের বস্তু মিলবে না।

প্রথম পর্ব

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। গল্পের গোড়ায় প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাতে কিছু সময় নেবে। আমি যে কে, সে কথাটা পরিষ্কার করে নিই।

কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে চেনাশোনার মহলে গল্পের যাথাযথ্যের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। একথা সবাই বোঝে না যে ঠিকঠাক সত্য বলবার এক কায়দা, আর তার চেয়েও বেশি সত্য বলবার ভঙ্গী আলাদা।

কী নাম নেব তাই ভাবছি। রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকে গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাইনে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলনসই। ওর শামলা রংটা মেজে ফেলে গিল্‌টি লাগালে ওটা হোতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত, কিন্তু খাঁটি শোনাত না।

আমি ছিলুম বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল আণ্ডামানের তীর বরাবর। নানা বাঁকা পথে সি আই ডির ফাঁস এড়িয়ে প্রথমে আফগানিস্থান, তারপরে জাপান, তারপরে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছেছিলুম জাহাজি গোরার নানা কাজ নিয়ে।

পূর্ববঙ্গীয় দুর্জয় জেদ ছিল মজ্জায়। একদিনো ভুলিনি যে ভারতবর্ষের হাতকড়ায় উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে থাকতে থাকতে একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম যে আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম সে যেন আতসবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো। তাতে নিজেদের পোড়াকপাল আরো পুড়িয়েছে অনেকবার, কিন্তু ফুটো করতে পারেনি ব্রিটিশ রাজপতাকা।' আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিলুম, তখন বুঝতে পারিনি সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্চে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোট ছোট চিতানল।

তারপরে স্বচক্ষে দেখলুম য়ুরোপীয় মহাসমর। কী রকম টাকা ওড়াতে হয় ধুলোর মতো, আর প্রাণ উড়িয়ে দেয় ধোঁওয়ার মতো দাবানলের। মরবার জন্যে তৈরি হোতে হয় সমস্ত দেশ একজোট হয়ে, মারবার জন্যে তৈরি হোতে হয় দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের দুরূহ দীক্ষা নিয়ে। এই যুগান্তর-সাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়ো ঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত করব কোন্ দুরাশায়! যথোচিত সমারোহে বড়ো রকমের আত্মহত্যা করবার আয়োজনও যে ঘরে নেই। ঠিক করলুম ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে যত সময়ই লাগুক। বাঁচতে যদি চাই আদিম সৃষ্টির হাত দুখানায় গোটাদশেক নখ নিয়ে আঁচড় মেরে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা। হাতাহাতি করার তালঠোকা পালোয়ানি সহজ, বিশ্বকর্মার চেলাগিরি সহজ নয়। পথ দীর্ঘ, সাধনা দুরূহ।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। আমেরিকায় ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর কারখানায় কোনো মতে ভর্তি হলুম। হাত পাকাচ্ছিলুম কিন্তু শিক্ষা এগোচ্ছিল ব'লে মনে হয়নি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল, মনে হোলো ফোর্ডকে যদি একটু-খানি আভাস দিতে যাই যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই দেশকে বাঁচাতে তাহলে ধনকুবের বুঝিবা খুশি হবে, এমন কি দেবে আমার রাস্তা প্রশস্ত ক'রে। অতি গম্ভীরমুখে ফোর্ড বললে, আমার নাম হেনরি ফোর্ড, পুরোনো পাকা ইংরেজি নাম। কিন্তু আমি জানি আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, ইন্‌এফীসিয়েণ্ট। তাদের আমি কেজো ক'রে তুলব এই আমার সংকল্প। অর্থাৎ অকেজো টাকাওয়ালাকে কেজো করবে কেজো টাকাওয়ালা স্বগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব চিরকাল কেজোদের হাতে কাদার পিণ্ড। তারা পুতুল বানাবে। এই দুঃখেই গিয়েছিলুম একদিন সোভিয়েটের দলে ভিড়তে। তারা আর যাই করুক কোনো নিরুপায় মানবজাতকে নিয়ে পুতুলনাচের অর্থকরী ব্যবসা করে না।

কিছুদিন চাকা চালিয়ে শেষকালে বুঝলুম যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার আরো গোড়ায় যেতে হবে। শুরুতে দরকার যন্ত্র-নির্মাণের মালমসলা জোগাড় করার বিদ্যে। কৃতকর্মাদের জন্যেই ধরণী দুর্গম পাতালপুরীতে জমা করে রেখেছেন কঠিন খনিজ পিণ্ড। সেইগুলো হস্তগত করে তারাই দিগ্বিজয় করেছে যারা বাহাদুর জাত। আর যাদের চিরকালই অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ তাদের জন্যেই বাঁধা বরাদ্দ উপরিস্তরের ফলফসল শাকসবজি; হাড় বেরিয়ে গেল পাঁজরের, পেটে পিঠে গেল এক হয়ে।

লেগে গেলুম খনিজবিদ্যায়। একথা ভুলিনি যে ফোর্ড বলেছেন ইংরেজ জাত অকেজো। তার প্রমাণ আছে ভারতবর্ষে। একদিন ওরা হাত লাগিয়েছিল নীলের চাষে, চায়ের চাষে আর একদিন। সিভিলিয়ানদল দফতরখানায় law and orderএর জাঁতা চালিয়ে দেশের অস্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালোমানুষী, অতি মোলায়েম। সামান্য কিছু কয়লার আকর ছাড়া ভারতের অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে উপেক্ষা করেছে কিংবা অক্ষমতা দেখিয়েছে। নিংড়েছে বসে বসে পাটের চাষীর রক্ত। জামসেদজি টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাষাণ প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা খোকাদের দলে মিশে মা মা ধ্বনিতে মন্তর আওড়াব না, আর দেশের যত অভুক্ত অক্ষম রুগ্ন অশিক্ষিত কাল্পনিক ভয়ে দিনরাত কম্পমান দরিদ্রকে

সহজ ভাষায় দরিদ্র ব'লেই জানব, দরিদ্রনারায়ণ ব'লে একটা বুলি বানিয়ে তাদের বিদ্রূপ করব না। প্রথম বয়সে একবার বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি। কবি কারিগরদের কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে শস্তা রাঙতা লাগানো প্রতিমা গড়া হয় তার সামনে গদগদ ভাষায় অনেক অশ্রুজল ফেলেছি। লোকে তার খুব একটা চওড়া নাম দিয়েছিল দেশাত্মবোধ। কিন্তু আর নয়। আক্কেল দাঁত উঠেছে। এই উগ্র বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব ব'লে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার দেশে ফিরে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে। মেয়েলি গলার মিহিসুরের মহাকবি বিশ্বকবিদের অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ চেলারা এই অনুষ্ঠানকে তাদের দেশমাতৃকার পূজো ব'লে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানা ছেড়ে তারপর ন বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কর্মশালায় ফিরেছি, হাতে কলমে কাজ করেছি, দুই একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকের কাছ থেকে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এই সব মোটামোটা কথার বিশেষ যোগ নেই। বাদ দিলে চলত, হয়তো বা ভালোই হোত। কেবল এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেইটে বলি। যৌবনের গোড়ায় যখন নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজম রঙিন রশ্মির আন্দোলন তোলে জীবনের আকাশে আকাশে, তখন আমি ছিলুম কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী, এই সমস্ত বাণীর কুলুপ আমার মনে কষে তালা এঁটে রেখেছিল। কন্যাদায়িকেরা যখন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে তখন আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্টিতে যদি অকাল বৈধব্যযোগ থাকে তবেই যেন তাঁরা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গলাভে বাধা দেবার কাঁটার বেড়া নেই। সেখানে দুর্যোগের আশঙ্কা ছিল। আমি যে সুপুরুষ, বঙ্গনারীর মুখের ভাষায় তার কোনো ভাষ্য পাইনি। তাই এ সংবাদটা আমার চেতনার বাইরেই ছিল। বিলেতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করেছি যে সাধারণের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি, তেমনি ধরা পড়েছে আমার চেহারা ভালো। আমার দেশের অর্ধাশনশীর্ণ পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসগর্ভ কাহিনীর সূচনা সেখানে মাঝে মাঝে হয়েছিল। সেয়ানারা অবিশ্বাসে চোখ টেপাটিপি করতে পারেন তবু জোর করেই বলব সে কাহিনী মিলনান্ত বা বিয়োগান্তের যবনিকা পতনে পৌঁছয়নি কেবল আমার জেদবশত। আমার স্বভাবটা কড়া, পাথুরে জমিতে জীবনের সংকল্প ছিল যক্ষের ধনের মতো পোঁতা, সেখানে চোরের সাবল ঠিক্‌রে পড়ে ঠন্ ক'রে ওঠে। তা ছাড়া আমি জাত-পাড়াগেঁয়ে, সাবেককেলে ভদ্রঘরে আমার জন্ম, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সংকোচ ঘুচতে চায় না।

আমার জর্মন ডিগ্রি উঁচুদরের ছিল। সেটা এখানে সরকারী কাজে বাতিল। তাই সুযোগ ক'রে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার দরবারে কাজ নিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্ব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। দৈবাৎ জুরিকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে লাগিয়ে দিলেন জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে খনি আবিষ্কারের প্রত্যাশায়। এত বড়ো কাজের ভার আনাড়ি সিভিলিয়নকে না দেওয়াতে সেক্রেটেরিয়টের উপরিস্তরে বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। দেবিকাপ্রসাদ শক্ত ধাতের লোক, বুড়ো রাজার মন টলমল করা সত্ত্বেও টিঁকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা বললেন, "ভালো কাজ পেয়েছ এবার বাবা বিয়ে করো।" আমি বললুম, অর্থাৎ ভালো কাজ মাটি করো।

তারপরে বোবা পাথরকে প্রশ্ন করে করে বেড়াচ্ছিলুম পাহাড়ে জঙ্গলে। সে সময়টাতে পলাশ ফুলের রাঙা রঙে বনে বনে নেশা লেগে গিয়েছে। শালগাছে অজস্র মঞ্জরী, মৌমাছিদের অনবরত গুঞ্জন। ব্যবসাদারেরা মৌ সংগ্রহে লেগেছে, কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসর রেশমের গুটি, সাঁওতালরা কুড়চ্ছে পাকা মহুয়া ফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী। শুনেছি এখানকার কোনো অধিবাসিনী তার নাম দিয়েছেন তনিকা। তাঁর কথা পরে হবে।

দিনে দিনে বুঝতে পারছি এ জায়গাটা ঝিমিয়ে পড়া ঝাপসা চেতনার দেশ, এখানে একলা মনের সন্ধান পেলে প্রকৃতি মায়াবিনী তাকে নিয়ে রংরেজিনীর কাজ করে, যেমন করে সে অস্ত সূর্যের উত্তরীয়ে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লাগছিল। ক্ষণে ক্ষণে ঢিলে হয়ে আসছিল কাজের চাল। নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছিলুম, ভিতর থেকে কষে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। ভয় হচ্ছিল ট্রপিক্যাল মাকড়ষার জালে জড়িয়ে পড়ছি বুঝি। শয়তান ট্রপিক্‌স্ জন্মকাল থেকে এদেশে হাতপাখার হাওয়ায় ডাইনে বাঁয়ে হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের ললাটে, মনে মনে পণ করছি এঁর স্বেদসিক্ত জাদু এড়াতেই হবে।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে নুড়ি পাথর ঠেলে ঠেলে দুই শাখায় ভাগ হয়ে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সারি সারি বকের দল। দিনাবসানে তাদের এই ছুটির ছবি দেখে রোজ আমি চলে যাই আমার কাজের বাঁক ফেরাতে। ঝুলিতে মাটি পাথর অভ্রের টুকরো নিয়ে সেদিন ফিরছিলুম আমার বাংলা-ঘরে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার কাজে। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা ফালতো পোড়ো সময় থাকে সেইখানটাতে একলা মানুষের মন এলিয়ে পড়ে। তাই আমি নিজেকে চেতিয়ে রাখবার জন্যে এই সময়টা লাগিয়েছি পরখ করার কাজে। ডাইনামো দিয়ে বিজলি বাতি জ্বালাই,

কেমিক্যাল নিয়ে, মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে, নিক্তি নিয়ে বসি। এক একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়।

আজ একটা পুরোনো পরিত্যক্ত তামার খনির খবর পেয়ে দ্রুতউৎসাহে তারি সন্ধানে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে ফিকে আলোর আকাশে কা কা শব্দে। অদূরে একটা ঢিবির উপরে তাদের পঞ্চায়েৎ বসবার পড়েছে হাঁকডাক।

হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজের রাস্তায়। পাঁচটা গাছের চক্রমণ্ডলী ছিল বনের পথের ধারে একটা উঁচু ডাঙার পরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমাত্র অবকাশে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে দিয়ে একটি আশ্চর্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। সেই গাছগুলোর ফাঁকটার ভিতর দিয়ে রাঙা আলোর ছোরা চিরে ফেলেছিল ভিতরকার ছায়াটাকে।

ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে। পাশে ঘাসের উপর পড়ে আছে একখানা খাতা, বোধ হয় ডায়ারি।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, থমকিয়ে গেলুম। দেখলুম যেন বিকেলের ম্লান রৌদ্রেগড়া একটি সোনার প্রতিমা। চেয়ে রইলুম গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব ছবি এক মুহূর্তে চিহ্নিত হয়ে গেল মনের চিরস্মরণীয়াগারে।

আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হোলো জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন ক'রে ভাবা, এমন ক'রে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী ক'রে!

অত্যন্ত ইচ্ছা করছিল ওর কাছে গিয়ে কথার মতো কথা একটা কিছু বলি। কিন্তু জানিনে কী কথা যে পরিচয়ের সব প্রথম কথা, যে কথায় জানিয়ে দেবে খৃস্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী—আলো হোক—ব্যক্ত হোক যা অব্যক্ত।

আমি মনে মনে ওর নাম দিলুম—অচিরা। তার মানে কী! তার মানে এক মুহূর্তেই যার প্রকাশ—বিদ্যুতের মতো।

একসময়ে মনে হোলো অচিরা যেন জানতে পেরেছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। স্তব্ধ উপস্থিতির একটা নিঃশব্দ শব্দ আছে বুঝি।

একটু তফাতে গিয়ে কোমরবন্ধ থেকে ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম। ঝুলিতে যা হয় কিছু দিলুম পুরে, গোটা কয়েক কাঁকরের ঢেলা। চলে গেলুম মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন সন্ধান করতে করতে। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি যাঁকে ভোলাতে চেয়েছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের বিহ্বলতার আরো অনেক দৃষ্টান্ত আরো অনেকবার তাঁর গোচর হয়েছে সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি উপভোগ করলেন, সকৌতুকে কিংবা সগর্বে, কিংবা হয়তো বা একটু মুগ্ধ মনে। কাছে যাবার বেড়া যদি আর একটু ফাঁক করতুম তাহলে কী জানি কী হোত। রাগ করতেন, না রাগের ভান করতেন।

অত্যন্ত চঞ্চল মনে চলেছি আমার বাংলাঘরের দিকে এমন সময় চোখে পড়ল দুই টুকরোয় ছিন্ন করা একখানা চিঠির খাম। তাতে নাম লেখা ভবতোষ মজুমদার আই, সি, এস, ছাপরা। তার বিশেষত্ব এই যে, এতে টিকিট আছে, কিন্তু সে টিকিটে ডাকঘরের ছাপ নেই। বুঝতে পারলুম ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমার কাজ। সেই রকম কাজে লাগলুম ছেঁড়া খামটা নিয়ে।

ইতিমধ্যে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে আমার নিজের অন্তঃকরণটা। নিজের অপ্রমত্ত কঠিন মনটাকে চিনে নিয়েছি ব'লে স্পষ্ট ধারণা ছিল। আজ এই প্রথম দেখলুম তার পাশের পাড়াতেই লুকিয়ে বসে আছে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত একটা অবোধ।

নির্জন অরণ্যের সুগভীর কেন্দ্রস্থলে একটা সুনিবিড় সম্মোহন আছে যেখানে চলছে তার বুড়ো বুড়ো গাছপালার কানে কানে চক্রান্ত, যেখানে ভিতরে ভিতরে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সৃষ্টির আদিম প্রাণের মন্ত্র গুঞ্জরণ। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার সুর উদাত্ত পর্দায়, রাতে দুপুরে তার মন্ত্র-গম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়, বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে। জিয়লজি চর্চার ভিতরে ভিতরেই মনের আন্তর্ভৌম প্রদেশে ব্যাপ্ত হচ্ছিল এই আরণ্যক মায়ার কাজ। হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে সে এক মুহূর্তে আমার দেহমনকে আবিষ্ট করে দিল যখনি দেখলুম অচিরাকে কুসুমিত ছায়া-লোকের পরিবেষ্টনে।

বাঙালি মেয়েকে ইতিপূর্বে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে এমন বিশুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্যে দেখিনি। লোকালয়ে যদি এই মেয়েটিকে দেখতুম তাহলে যাকে দেখা যেত নানা-লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়িত বিমিশ্রিত এ মেয়ে সে নয়, এ দেখা দিল পরিবিস্তৃত নির্জন সবুজ নিবিড়তার পরি-প্রেক্ষিতে একান্ত স্বকীয়তায়। মনে হোলো না বেণী দুলিয়ে এ কোনোকালে ডায়োসীশনে পর্সেণ্টেজ রাখতে গেছে, শাড়ির উপরে গাউন ঝুলিয়ে ডিগ্রি নিতে গেছে কনভোকেশনে, বালিগঞ্জে টেনিস পার্টিতে চা ঢালছে উচ্চ কলহাস্যে। অল্প বয়সে শুনেছি পুরোনো বাংলা গান—"মনে রইল সই মনের বেদনা"—তারি সরল সুরের সঙ্গে মিশিয়ে চিরকালের বাঙালি মেয়ের একটা করুণ চেহারা আমি দেখতে

পেতুম, অচিরাকে দেখে মনে হোলো সেইরকম বারোয়াঁ গানে তৈরী বাণীমূর্তি, যে গান রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখর করে না। এদিকে আমার আপনার মধ্যে দেখলুম মনের নিচের তলাকার তপ্তবিগলিত একটা প্রদীপ্ত রহস্য হঠাৎ উপরের আলোতে উদ্গীর্ণ হয়ে উঠেছে।

বুঝতে পারছি আমি যখন রোজ বিকেলে এই পথ দিয়ে কাজে ফিরেছি অচিরা আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখিনি। নিজের চেহারা সম্বন্ধে যে বিশ্বাস এনেছি বিলেত থেকে, এই ঘটনা সম্পর্কে মনের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া যে হয়নি তা বলতে পারিনে। কিন্তু সন্দেহও ছিল। বিলেতফেরৎ কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি বিলিতি মেয়ের রুচির সঙ্গে বাঙালি মেয়ের রুচি মেলে না। এরা পুরুষের রূপে খোঁজে মেয়েলি মোলায়েম ছাঁদ। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক কোনো কালে দেবসেনাপতি ছিল না। এটা বলতে হবে আমাকেও ময়ূরে চড়ালে মানাবে না। এতদিন এসব আলোচনা আমার মনের ধার দিয়েও যায়নি। কিন্তু কয়েকদিন ধ'রে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে পোড়া আমার রং, লম্বা আমার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার চলন, নাক চিবুক কপাল নিয়ে খুব স্পষ্ট রেখায় আঁকা আমার চেহারা। আমি নবনীনিন্দিত কষিতকাঞ্চনকান্তি বাঙালি মায়ের আদরের ধন নই।

আমার নিকটবর্তিনী বঙ্গনারীর সঙ্গে আমি মনে মনে ঝগড়া করেছি, একলা ঘরের কোণে বুক ফুলিয়ে বলেছি, তোমার পছন্দ পাই আর নাই পাই একথা নিশ্চয় জেনো তোমার দেশের চেয়ে বড়োবড়ো দেশের স্বয়ম্বর সভার বরমাল্য উপেক্ষা করে এসেছি। এই বানানো ঝগড়ার উষ্মায় একদিন হেসে উঠেছি আপন ছেলেমানুষিতে। আবার এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তিও কাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। আপন মনে তর্ক করেছি, একান্ত নিভৃতে থাকাই যদি ওর প্রার্থনীয় তাহলে বারবার আমার সুস্পষ্ট দৃষ্টিপাত এড়িয়ে এতদিনে ও তো ঠাঁই বদল করত। কাজ সেরে এ পথ দিয়ে আগে যেতুম একবার মাত্র, আজকাল যখন তখন যাতায়াত করি, যেন এই জায়গাটাতেই সোনার খনির খবর পেয়েছি। কখনো স্পষ্ট যখন চোখোচোখি হয়েছে আমার বিশ্বাস সেটাকে চারচোখের অপঘাত ব'লে ওর ধারণা হয়নি। এক একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি আমার তিরোগমনের দিকে অচিরা তাকিয়ে আছে, ধরা পড়তেই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগলুম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেম্ব্রিজের সতীর্থ প্রোফেসর আছেন বঙ্কিম। তাঁকে চিঠি লিখলুম—"তোমাদের বেহার সিভিল সার্ভিসে আছেন এক ভদ্রলোক, নাম ভবতোষ। আমার কোনো বন্ধু তাঁর মেয়ের জন্যে লোকটিকে উদ্বাহবন্ধনে জড়াবার দুষ্কর্মে সাহায্য করতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। জানতে চাই রাস্তা খোলসা কি না, আর লোকটার মতিগতি কী রকম।"

উত্তর এল "পাকা দেয়াল তোলা হয়ে গেছে, রাস্তা বন্ধ। তারপরেও লোকটার মতিগতি সম্বন্ধে যদি কৌতূহল থাকে তবে শোনো। এ দেশে থাকতে আমি যাঁর ছাত্র ছিলুম তাঁর নাম নাই জানলে। তিনি পরম পণ্ডিত আর ঋষিতুল্য লোক। তাঁর নাৎনিটিকে যদি দেখো তাহলে জানবে সরস্বতী কেবল যে আবির্ভূত হয়েছেন অধ্যাপকের বিদ্যামন্দিরে তা নয় তিনি দেহ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। এমন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল অপরূপ সুন্দর চেহারা কখনো দেখিনি।

"ভবতোষ ঢুকল শয়তান তাঁর স্বর্গলোকে। স্বল্পজল নদীর মতো বুদ্ধি তার অগভীর ব'লেই জ্বল জ্বল করে আর সেই জন্যেই তার বচনের ধারা অনর্গল। ভুললেন অধ্যাপক ভুললেন নাৎনি। রকম সকম দেখে আমাদের তো হাত নিসপিস করতে থাকত। কিছু বলবার পথ ছিল না—বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি, বিলেত গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসবে তারি ছিল অপেক্ষা। তারও পাথেয় এবং খরচ জুগিয়েছেন কন্যার পিতা। লোকটার সর্দির ধাত, একান্ত মনে কামনা করেছিলুম ন্যুমোনিয়া হবে। হয়নি। পাস করলে পরীক্ষায়; দেশে ফেরবামাত্রই বিয়ে করলে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ মুরুব্বির মেয়েকে। লোকসমাজে নাৎনির লজ্জা বাঁচাবার জন্যে মর্মাহত অধ্যাপক কোথায় অন্তর্ধান করেছেন জানিনে। অনতিকালের মধ্যে ভবতোষের অপ্রত্যাশিত পদোন্নতির সংবাদ এল। মস্ত একটা বিদায়-ভোজের আয়োজন হোলো। শুনেছি খরচটা দিয়েছে ভবতোষ গোপনে নিজের পকেট থেকে। আমরাও নিজের পকেট থেকেই খরচ দিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে ভোজটা দিলুম লণ্ডভণ্ড করে। কাগজে কন্‌গ্রেসওয়ালাদের প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ভবতোষেরই ইশারায়। আমি জানি এই সৎকার্যে তারা লিপ্ত ছিল না। যে নাগরা জুতো লেগেছিল পলায়মানের পিঠে, সেটা অধ্যাপকেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের প্রশস্ত পায়ের মাপে। পুলিশ এল গোলমালের অনেক পরে—ইন্‌স্পেক্টর আমার বন্ধু, লোকটা সহৃদয়।"

চিঠিখানা পড়লুম, প্রাক্তন ছাত্রটির প্রতি ঈর্ষা হোলো।

অচিরার সঙ্গে প্রথম কথাটি শুরু করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। আমি বাঙালি মেয়েকে ভয় করি। বোধ করি চেনা নেই ব'লেই। অথচ কাজে যোগ দেবার কিছু আগেই কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি। সিনেমামণ্ডপবর্তিনী বাঙালি মেয়ের নতুন চাষ করা ভ্রূবিলাস দেখে তো স্তম্ভিত হয়েছি—তারা সব জাতবান্ধবী—থাক্ তাদের কথা। কিন্তু অচিরাকে দেখলুম একালের ঠেলাঠেলি ভিড়ের বাইরে—নির্মল আত্ম-মর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। আমি তাই ভাবছি প্রথম কথাটি শুরু করব কী করে।

জনরব এই যে কাছাকাছি ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাবলুম, হিতৈষী হয়ে বলি রাজা-বাহাদুরকে ব'লে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই। ইংরেজ মেয়ে হোলে হয়তো গায়ে-পড়া আনুকূল্য সইতে পারত না, মাথা বাঁকিয়ে বলত, সে ভাবনা আমার। এই বাঙালি মেয়ে অচেনার কাছ থেকে কী ভাবে কথাটা নেবে আমার জানা নেই, হয়তো আমাকেই ডাকাত ব'লে সন্দেহ করবে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল সেটা উল্লেখযোগ্য।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অচিরার সময় হয়েছে ঘরে ফেরবার। এমন সময়ে একটা হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে তার হাত থেকে তার খাতা আর থলিটা নিয়ে যখন ছুটেছে আমি তখনি বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।" এই ব'লে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর পড়তেই সে ব্যাগ খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের মাল নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম। অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললেম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ঐ লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে!"

"তার মানে তারি কৃপায় আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হ'য়ে গেল।"

অচিরা বিস্মিত হয়ে বললে, "কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"এমন অন্যায় অপবাদ দেবেন না। ও আমার বরকন্দাজ—রামশরণ।"

অচিরা মুখের উপর খয়েরি রঙের আঁচল টেনে নিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি থামতে চায় না। কী মিষ্টি ওর ধ্বনি। যেন ঝরণার নিচে নুড়িগুলো ঠুনঠুন করে উঠল সুরে সুরে। হাসি অবসানে সে বললে, "কিন্তু সত্যি হোলে খুব মজা হোত।"

"মজা কার পক্ষে?"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি।"

"আর উদ্ধারকর্তার?"

"বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিতুম আর গোটা দুয়েক স্বদেশী বিস্কুট।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে?"

"যে রকম শোনা গেল তাঁর তো আর কিছুতে দরকার নেই কেবল প্রথম কথাটা।"

"ঐ প্রথম পদক্ষেপেই গণিতের অগ্রগতিটা কি বন্ধ হবে।"

"কেন হবে? ওকে চালাবার জন্যে বরকন্দাজের সাহায্য দরকার হবে না।"

বসলুম সেখানেই ঘাসের উপরে। একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসে ছিল অচিরা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি হোলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন?"

"বলতুম, রাস্তায় ঘাটে ঢেলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে করছেন কী? আপনার কি বয়স হয়নি?"

"বলেন নি কেন?"

"ভয় করেছিল।"

"আমাকে ভয় কিসের?"

"আপনি যে মস্ত লোক, দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছেন। তিনি যা পড়েন আমাকে শোনাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও কি করেছিলেন?"

"নিষ্ঠুর তিনি, করেছিলেন। লাটিন শব্দের ভিড় দেখে জোড় হাত করে তাঁকে বলেছিলুম, দাদু এটা থাক্, বরঞ্চ তোমার সেই কোয়াণ্টম থিওরির বইখানা খোলো।"

"সে থিওরিটা বুঝি আপনার জানা আছে?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর দৃঢ় বিশ্বাস সবাই সব কিছু বুঝতে পারে। আর তাঁর অদ্ভুত এই একটা ধারণা যে, মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তাই ভয়ে ভয়ে আছি অবিলম্বে আমাকে টাইমস্পেসের জোড়-মিলনের ব্যাখ্যা শুনতে হবে। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, দাদু বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন, এটাই যে মেয়েদের বুদ্ধির প্রমাণ, দাদু কিন্তু সেটা বোঝেন নি।"

অচিরার দুই চোখ স্নেহে আর কৌতুকে ছলছল জ্বলজ্বল করে উঠল।

দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে একটা একলা তাল গাছের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা ঘরে চলেছে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ক'রে, দূরে থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "কোথায় তুমি? অন্ধকার হয়ে এল যে! আজকাল সময় ভালো নয়।"

অচিরা উত্তর দিল, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই জন্যে একজন ভলণ্টিয়র নিযুক্ত করেছি।"

আমি অধ্যাপকের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি পরিচয় দিলুম "আমার নাম শ্রীনবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "বলেন কী! আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত! কিন্তু আপনাকে যে বড়ো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।"

আমি বললুম, "ছেলেমানুষ না তো কী। আমার বয়স এই ছব্বিশের বেশি নয়, সাঁইত্রিশে পড়ব।"

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি। আমার মনে যেন দুন লয়ের ঝঙ্কারে সেতার বাজিয়ে দিল। বললে, "দাদুর কাছে সবাই ছেলেমানুষ। আর উনি নিজে সব ছেলেমানুষের আগরওয়াল।"

অধ্যাপক হেসে বললেন, "আগরওয়াল, ভাষায় নতুন শব্দের আমদানি।"

অচিরা বললে, "মনে নেই, সেই যে তোমার মাড়োয়ারি ছাত্র কুন্দনলাল আগরওয়ালা আমাকে এনে দিত বোতলে করে কাঁচা আমের চাটনি। তাকে জিগ্‌গেসা করেছিলুম আগরওয়াল শব্দের অর্থ কী—সে ফস্ করে ব'লে দিল, পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, ডাক্তার সেনগুপ্ত আপনার সঙ্গে আলাপ হোলো যদি আমাদের ওখানে যেতে যেতে হবে তো।"

"কিছু বলতে হবে না দাদু, যাবার জন্যে ওঁর মন লাফালাফি করছে। আমি যে এইমাত্র ওঁকে ব'লে দিয়েছি দেশকালের মিলনতত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।"

মনে মনে বললুম, "বাস্ রে, কী দুষ্টুমি!"

অধ্যাপক উৎসাহিত হয়ে ব'লে উঠলেন, "আপনার বুঝি Time Space-র—"

আমি ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলুম—"কিছু জানা নেই—বোঝাতে গেলে আপনার বৃথা সময় নষ্ট হবে।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে ব'লে উঠলেন, "এখানে সময়ের অভাব কোথায়! আচ্ছা এক কাজ করুন না, আজই চলুন আমার ওখানে আহার করবেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম "এখ্খুনি।" অচিরা ব'লে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ। যখন খুশি নেমন্তন্ন ক'রে ফেলো, আমি পড়ি মুষ্কিলে। উঁরা বিলেতের ডিনারখাইয়ে সর্বগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাৎনির বদনাম করবে।"

অধ্যাপক ধমকখাওয়া বালকের মতো বললেন, "আচ্ছা তবে আর কোন্‌দিন আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হোতে পারবে কিন্তু অচিরা দেবীকে রসদ নিয়ে বিপন্ন করতে চাইনে। পাহাড়ে পর্বতে ঘুরি সঙ্গে রাখি থলি ভরে চিঁড়ে, ছড়া কয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনে বাদাম। আমিই বরঞ্চ সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন। অচিরা দেবী যদি স্বহস্তে দই দিয়ে মেখে দেন লজ্জা পাবে ফিরপোর দোকান।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এই সব মুখমিষ্টি লোককে। উনি নিশ্চয় পড়েছেন তোমার সেই লেখাটা বাংলা কাগজে, সেই ভিটামিনের গুণপ্রচার। তাই তোমাকে খুশি করবার জন্যে শোনালেন চিঁড়েকলার ফর্দ।"

মুষ্কিলে ফেললে। বাংলা কাগজ পড়া তো আমার ঘটেই ওঠে না।

অধ্যাপক উৎফুল্ল হয়ে জিগ্‌গেসা করলেন, "সেটা পড়েছেন বুঝি!"

অচিরার চোখের কোণে দেখতে পেলুম একটু হাসি। তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলুম—"পড়ি আর নাই পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে—"আসল কথাটা আর হাৎড়ে পাইনে। অচিরা দয়া ক'রে ধরিয়ে দিলে, "আসল কথা উনি নিশ্চিত জানেন, কাল যদি তোমার ওখানে নেমন্তন্ন জোটে তাহলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গম কিছুই বাদ যাবে না। তাই অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। দাদু, তুমি সবাইকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করো এমন কি আমাকেও। সেইজন্যেই ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস হয় না।"

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে ওঁদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় অচিরা হঠাৎ আমাকে ব'লে উঠল, "বাস্‌ আর নয়—এইবার যান বাসায় ফিরে।"

আমি বললুম, "দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দেব।"

অচিরা বললে, "সর্বনাশ, দরোজা পেরলেই আলুথালু উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের দুজনের সম্মিলিত রচনা। আপনি অবজ্ঞা করে বলবেন বাঙালি মেয়েরা অগোছালো। একটু সময় দিন, কাল দেখলে মনে হবে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজার অপূর্ব কীর্তি, মেমসাহেবী সৃষ্টি।"

অধ্যাপক কিছু কুণ্ঠিত হয়ে আমাকে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না—দিদি বড়ো বেশি কথা কচ্ছে। কিন্তু ওটা ওর স্বভাব নয় মোটে। এখানে অত্যন্ত নির্জন, তাই ও আমার মনের ফাঁক ভরে রেখে দেয় কথা কয়ে। সেটা ওর অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। ও যখন চুপ করে থাকে ঘরটা ছমছম করতে থাকে, আমার মনটাও। ও নিজে জানে না সে কথা। আমার ভয় হয় পাছে বাইরের লোকে ওকে ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে অচিরা বললে "বুঝুক না দাদু। অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হোতে চাইনে, সেটা অত্যন্ত আন্‌ইন্টারেস্টিং।"

অধ্যাপক সগর্বে ব'লে উঠলেন, "আমার দিদি কিন্তু কথা বলতে জানে, অমন আর কাউকে দেখিনি।"

"তুমিও আমার মতো কাউকে দেখোনি, আমিও কাউকে দেখিনি তোমার মতো।"

আমি বললুম "আচার্যদেব, আজ বিদায় নেবার পূর্বে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনেমনে ততবার জিভ কাটি। আমাকে দয়া করে তুমি ব'লে যদি ডাকেন তাহলে মন সহজে সাড়া দেবে। আপনার নাৎনিও সহকারিতা করবেন।"

অচিরা দুই হাত নেড়ে বললে "অসম্ভব, আরো কিছুদিন যাক। সর্বদা দেখাশুনো হোতে হোতে বড়োলোকের তিলকলাঞ্ছন যখন ঘষা পয়সার মতো পালিশ করা হয়ে যাবে তখন সবই সম্ভব হবে। দাদুর কথা স্বতন্ত্র। আমি বরঞ্চ ওঁকে পড়িয়ে নিই। বলো তো দাদু, তুমি কাল খেতে এসো। দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন দিতে ভোলে মুখ না বেঁকিয়ে বোলো, কী চমৎকার। বোলো সবটা আমারি পাতে দেওয়া ভালো, অন্যরা এরকম রান্না তো প্রায়ই ভোগ করে থাকেন।"

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, তুমি বুঝতে পারবে না আসলে এই মেয়েটি লাজুক তাই যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে তখন সংকোচ ঠেলে উঠতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন! অনায়াসে বলতে পারতেন—তুমি বড়ো মুখরা, তোমার বকুনি অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেন্ড করবেন। কী বলবেন বলুন তো?"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি মনে মনেই জানেন।"

"থাক্‌ থাক্‌, তাহলে বলে কাজ নেই। এখন বাড়ি যান।"

আমি বললুম, "তার আগে সব কথাটা শেষ করে নিই। কাল আপনাদের ওখানে আমার নেমন্তন্নটা নামকর্তন অনুষ্ঠানের। কাল থেকে নবীনমাধব নামটা থেকে কাটা পড়বে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছাকাছি এলে ধূমকেতুর কেতুটা পায় লোপ, মুণ্ডুটা থাকে বাকি।"

এইখানে শেষ হোলো আমার বড়োদিন। দেখলুম বার্ধক্যের কী সৌম্যসুন্দর মূর্তি। পালিশ-করা লাঠি হাতে, গলায় শুভ্র পাটকরা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের

জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায়, নাৎনির হাতের শিল্প-কার্য এঁর বেশভূষণে এঁর দিনযাত্রায়। অতিলালনের অত্যাচার ইনি সস্নেহে সহ্য করেন, খুশি রাখবার জন্যে নাৎনিটিকে।

এই গল্পের পক্ষে অধ্যাপকের ব্যবহারিক নাম অনিলকুমার সরকার। তিনি গত জেনেরেশনের কেম্ব্রিজের বড়ো পদবী-ধারী। মাস আষ্টেক আগে কোনো কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ ক'রে এখানকার এস্টেটের একটা পোড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন।

অন্তপর্ব

আমার গল্পের আদি পর্ব হোলো শেষ। ছোটো গল্পের আদি ও অন্তের মাঝখানে বিশেষ একটা ছেদ থাকে না—ওর আকৃতিটা গোল।

অচিরার সঙ্গে আমার অপরিচয়ের ব্যবধান ক্ষয় হয়ে আসছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন পরিচয়টাই ব্যবধান। কাছাকাছি আসছি বটে কিন্তু তাতে একটা প্রতি-ঘাত জাগছে। কেন? অচিরার প্রতি আমার ভালোবাসা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে, অপরাধ কি তারই মধ্যে? কিংবা আমার দিকে ওর সৌহৃদ্য স্ফুটতর হয়ে উঠছে, সেইটেতেই ওর গ্লানি। কে জানে।

সেদিন চড়িভাতি তনিকা নদীর তীরে।

অচিরা ডাক দিলে, "ডাক্তার সেনগুপ্ত।"

আমি বললুম, "সেই প্রাণীটার কোনো ঠিকানা নেই, সুতরাং কোনো জবাব মিলবে না।"

"আচ্ছা, তাহলে, নবীনবাবু।"

"সেও ভালো, যাকে বলে মন্দর ভালো।"

"কান্ডটা কী দেখলেন তো?"

আমি বললুম, "আমার সামনে লক্ষ্য করবার বিষয় কেবল একটি মাত্রই ছিল, আর কিছুই ছিল না।"

এইটুকু ঠাট্টায় অচিরা সত্যই বিরক্ত হয়ে বললে, "আপনার আলাপ ক্রমেই যদি অমন ইশারাওয়ালা হয়ে উঠতে থাকে তাহলে ফিরিয়ে আনব ডাক্তার সেনগুপ্তকে, তাঁর স্বভাব ছিল গম্ভীর।"

আমি বললুম, "আচ্ছা তাহলে কান্ডটা কী হয়েছিল বলুন।"

"ঠাকুর যে ভাত রেঁধেছিল সে কড়কড়ে, আদ্ধেক তার চাল। আমি বললুম, দাদু এ তো তোমার চলবে না। দাদু অমনি ব'লে বসলেন, জানো তো ভাই, খাবার জিনিস শক্ত হোলে ভালো করে চিবোবার দরকার হয়, তাতেই হজমের সাহায্য করে। পাছে আমি দুঃখ করি দাদুর জেগে উঠল সায়েন্সের বিদ্যে। নিমকিতে নুনের বদলে যদি চিনি দিত তাহলে নিশ্চয় দাদু বলত চিনিতে শরীরের এনার্জি বাড়িয়ে দেয়।"

"দাদু, ও দাদু, তুমি ওখানে বসে বসে কী পড়ছ? আমি যে এদিকে তোমার চরিত্রে অতিশয়োক্তি অলংকার আরোপ করছি, আর নবীনবাবু সমস্তই বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করে নিচ্ছেন।"

কিছু দূরে পোড়ো মন্দিরের সিঁড়ির উপরে বসে অধ্যাপক বিলিতি ত্রৈমাসিক পড়ছিলেন। অচিরার ডাক শুনে সেখানে থেকে উঠে আমাদের কাছে বসলেন। ছেলে-মানুষের মতো হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করলেন, "আচ্ছা নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

কথাটা এতই সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক যে আর কেউ হোলে বলত না, কিংবা ঘুরিয়ে বলত।

আমি আশাপ্রদ ভাষায় উত্তর দিলুম, "না, এখনো হয়নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথা এড়ায় না। সে বললে, "ঐ 'এখনো' শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে, ওর কোনো যথার্থ অর্থ নেই।"

"একেবারেই নেই নিশ্চিত ঠাওরালেন কী করে?"

"ওটা গণিতের প্রব্লেম, সেও হাইয়র ম্যাথম্যাটিকস নয়। পূর্বেই শোনা গেছে আপনি ৩৬ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচ সাতবার বলেছেন, বাবা ঘরে বউ আনতে চাই। আপনি জবাব করেছেন তার পূর্বে ব্যাঙ্কে টাকা আনতে চাই। মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন তার পরে মাঝখানে আপনার আর সব ঘটেছিল কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে মোটা মাইনের কাজ জুটল। মা বললেন, এইবার বউ নিয়ে এসো ঘরে। বড়ো কাজ পেয়েছ। আপনি বললেন, বিয়ে করে সে কাজ মাটি করতে পারব না। আপনার ৩৬ বছরের গণিতফল গণনা করতে ভুল হয়েছে কিনা বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা বলা নিরাপদ নয়। কিছু-দিন আগেই আমার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। কথায় কথায় অচিরা আমাকে বলেছিল, আমাদের দেশের মেয়েরা আপনাদের সংসারের সঙ্গিনী হোতে পারে কিন্তু বিলেতে যারা জ্ঞানের তাপস তাদের তপস্যার সঙ্গিনী তো জোটে, যেমন ছিলেন অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাডাম কুরি। আপনার কি তেমন কেউ জোটেনি?"

মনে পড়ে গেল ক্যাথরিনকে। সে একইকালে আমার বিজ্ঞানের এবং জীবনযাত্রার সাহচর্য করতে চেয়েছিল।

অচিরা জিগগেসা করলে, "আপনি কেন তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন না।"

কী উত্তর দেব ভাবছিলুম, অচিরা বললে, "আমি জানি কেন। আপনার সত্যভঙ্গ হবে এই ভয় ছিল; নিজেকে আপনার মুক্ত রাখতেই হবে। আপনি যে সাধক। আপনি তাই নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর নিজের প্রতি, নিষ্ঠুর তার পরে যে আপনার পথের সামনে আসে। এই নিষ্ঠুরতায় আপনার বীরত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বললে, "বাংলা-সাহিত্য বোধ হয় আপনি পড়েন না। কচ ও দেবযানী ব'লে একটা কবিতা আছে। তার শেষ কথাটা এই, মেয়েদের ব্রত

পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষের ব্রত মেয়ের বাঁধন কাটিয়ে স্বর্গলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে আর আপনি মায়ের অনুনয়,—একই কথা।"

আমি বললুম, "দেখুন আমি হয়তো ভুল করেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে তাহলে মেয়েদের সৃষ্টি কেন।"

অচিরা বললে, "বারো আনার চলে, মেয়েরা তাদের জন্যেই। কিন্তু বাকি মাইনরিটি, যারা সব কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদের চলে না। সব-পেরোবার মানুষকে মেয়েরা যেন চোখের জল ফেলে রাস্তা ছেড়ে দেয়। যে দুর্গম পথে মেয়ে পুরুষের চিরকালের দ্বন্দ্ব সেখানে পুরুষেরা হোক জয়ী। যে মেয়েরা মেয়েলি প্রকৃতির বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা করে ঘরের লোকের। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদের সংখ্যা খুব কম; তারা অভিব্যক্তির শেষ কোঠায়। মাথা তুলছে দুটি একটি ক'রে। মেয়েরা তাদের ভয় পায়, বুঝতে পারে না, টেনে আনতে চায় নিজের অধিকারের গণ্ডিতে। এই তত্ত্ব শুনেছি আমার দাদুর কাছে।

"দাদু, তোমার পড়া রেখে আমার কথা শোনো। মনে আছে, তুমি একদিন বলেছিলে, পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় যেখানে কেউ পৌঁছয়নি। আমার ডায়ারিতে লেখা আছে।"

অধ্যাপক মনে করবার চেষ্টা করে বললেন, "বলেছিলুম না কি? হয়তো বলেছিলুম।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও কয় হাসির ছলে, আজ সে অত্যন্ত গম্ভীর।

খানিক বাদে আবার সে বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাৎ দিয়েছিল জানেন?"

"না।"

"বলেছিল, তোমার সাধনায়-পাওয়া-বিদ্যা তোমার নিজের ব্যবহারে লাগাতে পারবে না। যদি এই অভিসম্পাৎ আজ দিত দেবতা য়ুরোপকে, তাহলে য়ুরোপ বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের মাপে ছোটো ক'রেই ওখানকার মানুষ মরছে লোভের তাড়ায়। সত্যি কি না বলো দাদু।"

"খুব সত্যি, কিন্তু এত কথা কী ক'রে ভাবলে!"

"নিজের বুদ্ধিতে না। একটা তোমার মহদ্‌গুণ আছে, কখন কাকে কি যে বলো, ভোলানাথ তুমি, সব ভুলে যাও। তাই চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভাবনা থাকে না।"

আমি বললুম, "নিজের ছাপ যদি লাগে তাহলেই তো অপরাধ খণ্ডন হয়।"

"জানো, নবীনবাবু, ওঁর কত ছাত্র ওঁর কত মুখের কথা খাতায় টুঁকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে, উনি তাই পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেছেন, বুঝতেই পারেননি নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। কোন্ কথা আমার কথা আর কোন্ কথা ওঁর নিজের সে ওঁর মনে থাকে না—লোকের সামনে আমাকে বলে বসেন ওরিজিন্যাল, তখন সেটা প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর পাওয়া যায় না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নবীনবাবুরও এ ভ্রম ঘটছে। কী করব বলো, আমি তো কোটেশন মার্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে পারিনে।"

"নবীনবাবুর এ ভ্রম কোনোদিন ঘুচবে না।"

অচিরা বললে, "দাদু একদিন আমাদের কলেজ-ক্লাসে কচ ও দেবযানীর ব্যাখ্যা করেছিলেন। কচ হচ্ছে পুরুষের প্রতীক, আর দেবযানী মেয়ের। সেইদিন নির্মম পুরুষের মহৎ গৌরব মনে মনে মেনেছি মুখে কখ্‌খনো স্বীকার করিনে।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু দিদি আমার কোনো কথায় মেয়েদের গৌরবের আমি কোনোদিন লাঘব করিনি।"

"তুমি আবার করবে! হায়রে! মেয়েদের তুমি যে অন্ধ ভক্ত। তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। তার উপরেও বুক ফুলিয়ে সতীসাধ্বীগিরির বড়াই করে নিজের মুখে। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

অধ্যাপক বললেন, "না দিদি, অবিচার কোরো না। অনেককাল ওরা হীনতা সহ্য করেছে হয়তো সেইজন্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে একটু বেশি জোর দিয়ে তর্ক করে।"

"না দাদু ও তোমার বাজে কথা। আসল হচ্ছে এটা স্ত্রীদেবতার দেশ—এখানে পুরুষেরা স্ত্রৈণ মেয়েরাও স্ত্রৈণ। এখানে পুরুষরা কেবলি মা মা করছে, আর মেয়েরা চিরশিশুদের আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা মায়ের জাত। আমার তো লজ্জা করে। পশুপক্ষীদের মধ্যেও মায়ের জাত নেই কোথায়!"

চিত্ত চাঞ্চল্যে কাজের এত বাধা ঘটছে যে লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে। সদরে বাজেটের মীটিঙে রিসর্চ বিভাগে আরো কিছু দান মঞ্জুর করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল। তার সমর্থক রিপোর্টখানা অর্ধেকের বেশি লেখাই হয়নি। অথচ এদিকে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স্‌ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুনে আসছি। অচিরা নিশ্চিত জানে বিষয়টা আমার উপলব্ধির ও উপভোগের সম্পূর্ণ বাইরে। তাহলেও চলত, কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্যাপারটাকে সে ইচ্ছে করে শোচনীয় করে তুলেছে। ঠিক এই সময়টাতেই সাঁওতালদের পার্বণ, তারা পচাই মদ খাচ্ছে আর মাদল বাজিয়ে মেয়েপুরুষে নৃত্য করছে। অচিরা ওদের পরম বন্ধু। মদের পয়সা জোগায়, সালু কিনে দেয় সাঁওতাল ছেলেদের কোমর বাঁধবার জন্যে, বাগান থেকে জবা ফুলের যোগান দেয় সাঁওতাল মেয়েদের চুলে পরবার। ওকে না হোলে তাদের চলেই না। অচিরা অধ্যাপককে বলেছে ও তো এ ক'দিন থাকতে পারবে না অতএব এই সময়টাতে বিরলে আমাকে নিয়ে ক্রোচের রসতত্ত্ব যদি পড়ে শোনান তাহলে আমার সময় আনন্দে কাটবে। একবার সসংকোচে বলেছিলুম, সাঁওতালদের উৎসব দেখতে আমার বিশেষ কৌতূহল আছে। স্বয়ং অধ্যাপক বললেন, না, সে আপনার

ভালো লাগবে না। আমার ইন্‌টেলেক্‌চুয়ল মনোবৃত্তির নির্জলা একান্ততার পরে তাঁর এত বিশ্বাস। মধ্যাহ্নভোজনের পরেই অধ্যাপক গুনগুন ক'রে পড়ে চলেছেন। দূরে মাদলের আওয়াজ এক একবার থামছে, পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠছে। কখনো বা পদশব্দ কল্পনা করছি, কখনো বা হতাশ হয়ে ভাবছি অসমাপ্ত রিপোর্টের কথা। সুবিধে এই অধ্যাপক জিগ্‌গেসাই করেন না কোথাও আমার ঠেকছে কি না। তিনি ভাবেন সমস্তই জলের মতো সোজা। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে প্রশ্ন করেন, আপনারো কি এই মনে হয় না? আমি খুব জোরের সঙ্গে বলি "নিশ্চয়।"

ইতিমধ্যে কিছুদূরে আমাদের অর্ধসমাপ্ত কয়লার খনিতে মজুরদের হোলো স্ট্রাইক। ঘটালেন যিনি, এই তাঁর ব্যবসা, স্বভাব এবং অভাববশত; সমস্ত কাজের মধ্যে এইটেই সবচেয়ে সহজ। কোনো কারণ ছিল না, কেননা আমি নিজে সোশিয়ালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা; কারো সেখানে না ছিল লোকসান, না ছিল অসম্মান।

নতুন যন্ত্র এসেছে জর্মানি থেকে, তারি খাটাবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। এমন সময় অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে এসে উপস্থিত অচিরা। বললে, "আপনি মোটা মাইনে নিয়ে ধনিকের নায়েবি করছেন, এদিকে গরিবের দারিদ্র্যের সুযোগটাকে নিয়ে আপনি—"

চন্ করে উঠল মাথা। বাধা দিয়ে বললুম, "কাজ চালাবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাদের তারাই অন্যায়কারী আর জগতে যারা কোনো কাজই করে না করতে পারেও না, দয়ামায়া কেবল তাদেরই, এই সহজ অহংকারের মত্ততায় সত্য মিথ্যার প্রমাণ নিতেও মন চায় না।"

অচিরা বললে, "সত্য নয় বলতে চান?"

আমি বললুম, "সত্য শব্দটা আপেক্ষিক। যা কিছু যত ভালোই হোক, তার চেয়ে আরো ভালো হোতেও পারে। এই দেখুন না আমার মোটা মাইনে বটে, তার থেকে মাকে পাঠাই পঞ্চাশ, নিজে রাখি ত্রিশ, আর বাকি—সে হিসেবটা থাক্। কিন্তু মার জন্যে পনেরো নিজের জন্যে পাঁচ রাখলে আইডিয়ালের আরো কাছ ঘেঁষে যেত, কিন্তু একটা সীমা আছে তো।"

অচিরা বললে, "সীমাটা কি নিজের ইচ্ছের উপরেই নির্ভর করে?"

আমি বললুম, "না, অবস্থার উপরে। যে কথাটা উঠল সেটা একটু বিচার করে দেখুন। য়ুরোপে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধ'রে। যাদের হাতে টাকা ছিল এবং টাকা করবার প্রতিভা ছিল তারাই এটা গড়েছে। গড়েছে নিছক টাকার লোভে, সেটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু ঐ ঘুষটুকু যদি না পেত তাহলে একেবারে গড়াই হোত না, এতদিন পরে আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।"

অচিরা বললে, "আপনি বলতে চান, পায়ে তেল শুরুতে, কানমলা তার পরে?"

"নিশ্চয়। আমাদের দেশে ভিৎ গাঁথা সবে আরম্ভ হয়েছে এখনি যদি মার লাগাই তাহলে শুরুতেই হবে শেষ, সুবিধে হবে বিদেশী বণিকদের। মানছি আজ আমি লোভীদের ঘুষ দেওয়ার কাজ নিয়েছি, টাকাওয়ালার নায়েবিই আমি করি। আজ সেলাম করছি বাদশার দরবারে এসে, কাল ওদের সিংহাসনের পায়ায় লাগাব কুড়ুল। ইতিহাসে তো এই দেখা গেছে।"

অচিরা বললে, "সব বুঝলুম। কিন্তু আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছি দেখতে, এই স্ট্রাইক মেটাতে আপনি নিজে কবে যাবেন। নিশ্চয়ই আপনাকে ডাকও পড়েছিল। কিন্তু কেন যাননি?"

চাপা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম এখানে কাজ ছিল বিস্তর। কিন্তু ফাঁকি দেব কী করে? আমার ব্যবহারে তো আমার কৈফিয়তের প্রমাণ হয় না।

কঠিন হাসি হেসে দ্রুতপদে চলে গেল অচিরা।

আর চলবে না। একটা শেষ নিষ্পত্তি করাই চাই। নইলে অপমানের অন্ত থাকবে না।

সাঁওতালি পার্বণ শেষ হয়েছে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। অচিরা সঙ্গে ছিল। উত্তরের দিকে একটা পাহাড় উঠেছে, আকাশের নীলের চেয়ে ঘননীল। তার গায়ে গায়ে চারা শাল আর বৃদ্ধ শাল গাছে বন অন্ধকার। মাঝখান দিয়ে কাঠুরেদের পায়ে চলার পথ। অধ্যাপক একটা অর্কিড ফুল বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁর পকেটে সর্বদা থাকে আতস কাচ।

গাছগুলোর মধ্যে অন্ধকার যেখানে ভ্রূকুটিল হয়ে উঠেছে আর ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে তীব্র আওয়াজে, অচিরা বসল একটা শ্যাওলা ঢাকা পাথরের উপর। পাশে ছিল মোটা জাতের বাঁশ গাছ, তারি ছাঁটা কঞ্চির উপর আমি বসলুম। আজ সকাল থেকে অচিরার মুখে বেশি কথা ছিল না। সেইজন্যেই তার সঙ্গে আমার কথা কওয়া বাধা পাচ্ছিল।

সামনের দিকে তাকিয়ে একসময়ে সে আস্তে আস্তে বলে উঠল, "সমস্ত বনটা মিলে প্রকাণ্ড একটা বহু অঙ্গওয়ালা প্রাণী। গুঁড়ি মেরে বসে আছে শিকারী জন্তুর মতো। যেন স্থলচর অক্টোপাস। কালো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিরন্তর হিপ্নোটিজমে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে আমার মনের মধ্যে একটা ভয়ের বোঝা যেন নিরেট হয়ে উঠছে।"

আমি বললুম, "কতকটা এই রকম কথাই এই সেদিন আমার ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "মনটা যেন পুরোনো ইমারত—সকল কাজের বার। নিষ্ঠুর অরণ্য যেখানে পেয়েছে তার ফাটল, চালিয়ে দিয়েছে শিকড়, সমস্ত ভিতরটাকে টানছে ভাঙনের দিকে। এই বোবা কালা মহাকায় জন্তু মনের ফাটল আবিষ্কার করতে মজবুত—আমার ভয় বেড়ে চলেছে। দাদু বলেছিলেন, লোকালয় থেকে একান্ত দূরে থাকলে মানুষের মনঃপ্রকৃতি আসে অবশ হয়ে, প্রবল হয়ে ওঠে তার প্রাণপ্রকৃতি। আমি জিগ্যেস করলুম, এর প্রতিকার কী? তিনি বললেন, মানুষের মনের শক্তিকে আমরা সঙ্গে করে আনতে পারি, এই দেখো না

এনেছি তাকে আমার লাইব্রেরিতে। দাদুর উপযুক্ত এই উত্তর। কিন্তু আপনি কী বলেন?"

আমি বললুম, "আমাদের মন খোঁজে এমন একজন মানুষের সঙ্গ যে আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে রাখতে পারে, চেতনার বন্যা বইয়ে দেয় জনশূন্যেতার মধ্যে। এ তো লাইব্রেরির সাধ্য নয়।"

অচিরা একটু অবজ্ঞা করে বললে, "আপনি যার খোঁজ করছেন, তেমন মানুষ পাওয়া যায় বই কি, যদি বড় দরকার পড়ে। তারা চৈতন্যকে উঁস্কিয়ে তোলে নিজের দিকেই, বন্যা বইয়ে দিয়ে সাধনার বাঁধ ভেঙে ফেলে। এ সমস্তই কবিদের বানানো কথা, মোহরস দিয়ে জারানো। আপনাদের মতো বুকের পাটাওয়ালা লোকের মুখে মানায় না। প্রথম যখন আপনাকে দেখেছিলুম, তখন দেখেছি আপনি রস খুঁজে বেড়ান নি পথ খুঁড়ে বেরিয়েছিলেন কড়া মাটি ভেঙে। দেখেছি আপনার নিরাসক্ত পৌরুষের মূর্তি—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে প্রণাম করেছি। আজ আপনি কথার পুতুল দিয়ে নিজেকে ভোলাতে বসেছেন। এ দশা ঘটালে কে? স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি এর কারণ কি আমি?"

আমি বললুম, "তা হোতে পারে। কিন্তু আপনি তো সাধারণ মেয়ে নন। পুরুষকে আপনি শক্তি দেবেন।"

"হাঁ শক্তি দেব যদি নিজেকেই মোহ জড়িয়ে না ধরে। আভাসে বুঝেছি আপনি আমার ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। আপনার কাছে কিছু ঢাকবার দরকার নেই। আপনি শুনেছেন আমি ভবতোষকে ভালবেসেছিলুম।"

"হাঁ, শুনেছি।"

"এও জানেন আমার ভালোবাসার অপমান ঘটেছে।"

"হাঁ জানি।"

"সেই অপমানিত ভালোবাসা অনেক দিন ধরে আমাকে আঁকড়ে ধরে দুর্বল করেছে। আমি জেদ করে বসেছিলুম তারি একনিষ্ঠ স্মৃতিকে জীবনের পূজামন্দিরে বসাব। চিরদিন একমনে সেই নিষ্ফল সাধনা করব মেয়েরা যাকে বলে সতীত্ব। নিজের ভালোবাসার অহংকারে সংসারকে ঠেলে ফেলে নির্জনে চলে এসেছি। কর্তব্যকে অবজ্ঞা করেছি নিজের দুঃখকে সম্মান করব ব'লে। আমার দাদুকে অনায়াসে সরিয়ে এনেছি তাঁর কাজের ক্ষেত্র থেকে। যেন এই মেয়েটার হৃদয়ের অহমিকা পৃথিবীর সব কিছুর উপরে। মোহ, মোহ, অন্ধ মোহ।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, "জানেন, আপনিই সেই মোহ ভাঙিয়ে দিয়েছেন।"

বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে বললে, "আপনিই এই আত্মাবমাননা থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে বাঁচালেন।"

স্তব্ধ রইলুম, নিরুত্তর প্রশ্ন নিয়ে।

"আপনি তখনো আমাকে দেখেন নি। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখেছি আপনার দুঃসাধ্য প্রয়াসের দিনগুলি—সঙ্গ নেই, আরাম নেই, ক্লান্তি নেই, একটু কোথাও ছিদ্র নেই অধ্যবসায়ে। দেখেছি আপনার প্রশস্ত ললাট, আপনার চাপা ঠোঁটে অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ, আর দেখেছি মানুষকে কী রকম অনায়াসে প্রভুত্বের জোরে চালনা করেন। দাদুর কাছে আমি মানুষ, আমি পুরুষের ভক্ত, যে পুরুষ সত্য, যে পুরুষ তপস্বী। সেই পুরুষকেই দেখবার জন্যে আমার ভক্তিপিপাসু নারী ভিতরে ভিতরে অপেক্ষা করেছিল নিজের অগোচরে। মাঝখানে এসেছিল অপদেবতা প্রবৃত্তির টানে। অবশেষে নিষ্কাম পুরুষের সুদৃঢ় শক্তিরূপে আপনিই আনলেন আমার চোখের সামনে।"

আমি জিগ্‌গেসা করলুম, "তার পরে কি ভাবের পরিবর্তন হয়েছে?"

"হাঁ হয়েছে। আপনার বেদী থেকে নেমে এসেছেন প্রতিদিন। স্থানীয় কাগজে পড়লুম দূরে অন্য এক জায়গায় সন্ধানের কাজে আপনার ডাক পড়েছে। আপনি নড়লেন না, ভিতরে ভিতরে আত্মগ্লানি ভোগ করলেন। আপনার পথের সামনেকার ঢেলাখানার মতো আমাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না কেন? কেন নিষ্ঠুর হোতে পারলেন না? যদি পারতেন তবে আমি ধন্য হতুম। আমার ব্রতের পারনা হোত আমার কান্না দিয়ে।"

মৃদুস্বরে বললুম, "যাবার জন্যেই কাগজপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছিলুম।"

"না, না, কখনোই না। মিথ্যে ছুতো করে নিজেকে ভোলাচ্ছিলেন। যতই দেখলুম আপনার দুর্বলতা, ভয় হোতে লাগল আমার নিজেকে নিয়ে। ছি, ছি, কী পরাভবের বিষ এনেছি নারীর জীবনে, কেবল অন্যের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও। ক্রমশই একটা চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসল, সে যেন এই বনের বিষনিশ্বাস থেকে। একদিন এখানকার পিশাচী রাত্রি এমন আমাকে আবিষ্ট করে ধরেছিল যে মনে হোলো যে এত বড়ো প্রবৃত্তি রাক্ষসীও আছে যে আমার দাদুর কাছ থেকেও আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তখনি সেই রাত্রেই ছুটে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করে এসেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিল "দাদু।"

অধ্যাপক গাছতলায় বসে পড়ছিলেন। উঠে এসে স্নেহের স্বরে বললেন, "কী দিদি? দূর থেকে বসে বসে ভাবছিলুম, তোমার উপরে আজ বাণী ভর দিয়েছেন—জ্বলজ্বল করছে তোমার চোখ দুটি।"

"আমার কথা থাক্, তুমি শোনো। তুমি সেদিন বলেছিলে মানুষের চরম অভিব্যক্তি তপস্যার মধ্য দিয়ে।"

"হাঁ, আমি তাই তো বলি। বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার মধ্য দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা আছে সামনে, স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে কিন্তু দেবতা ছিলেন না অতীতে, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে। মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

অচিরা বললে, "দাদু, এইবার এসো, তোমার আমার কথাটা আপোসে চুকিয়ে দিই। কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়লুম, বললুম, "তাহলে যাই।"

"না, আপনি বসুন।—দাদু, সেই যে কলেজের অধ্যক্ষ পদটা তোমার ছিল, সেটা খালি হয়েছে। তোমাকে ডাক দিয়েছে ওরা।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কী করে জানলে ভাই?"

"তোমার কাছে চিঠি এসেছে, সে আমি চুরি করেছি।"

"চুরি করেছ!"

"করব না! আমাকে সব চিঠিই দেখাও কেবল কলেজের ছাপমারা ঐ চিঠিটাই দেখালে না। তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে চুরি করে দেখতে হোলো।"

অধ্যাপক অপরাধীর মতো ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমারি অন্যায় হয়েছে।"

"কিছু অন্যায় হয়নি। আমাকে লুকোতে চেয়েছিলে যে আমার জীবনের অভিসম্পাৎ এখনো তুমি নিজের উপর টেনে নিয়ে চলবে। তোমার আপন আসন থেকে আমি যে নামিয়ে এনেছি তোমাকে। আমাদের তো ঐ কাজ।"

"কী বলছ দিদি!"

"সত্যি কথাই বলছি। তুমি শিক্ষাদানযজ্ঞের হোতা, এখানে এনে আমি তোমাকে করেছি শুধু গ্রন্থকীট। বিশ্বসৃষ্টি বাদ দিলে কী দশা হয় বিশ্বকর্তার! ছাত্র না থাকলে তোমার হয় ঠিক তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুল মাস্টারি করে এসেছি কি না।"

"তুমি আবার ইস্কুল মাস্টার! কী যে বলো তুমি! তুমি যে স্বভাবতই আচার্য। দেখোনি, নবীনবাবু, ওঁর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে কি, আর দয়ামায়া থাকে না। অমনি আমাকে নিয়ে পড়েন—বারো আনাই বুঝতেই পারিনে। নইলে হাৎড়িয়ে বের করেন এই নবীনবাবুকে, সে হয় আরো শোচনীয়। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই জানি, কিন্তু বাছাই করে নিয়ো। রূপকথার রাজা সকালে ঘুম থেকে উঠেই যার মুখ দেখত তাকেই কন্যাদান করত। তোমার বিদ্যা-দান অনেকটা সেইরকম।"

"না দিদি, আমাকে বাছাই করে নেয় যারা তারাই সাহায্য পায় আমার। এখনকার দিনে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে, আগেকার দিনে সন্ধান করে শিক্ষক লাভ করত শিক্ষার্থী।"

"আচ্ছা সেকথা পরে হবে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, তোমাকে তোমার সেই কাজটা ফিরিয়ে নিতে হবে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো নাৎনির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "তুমি ভাবছ আমার গতি কী হবে। আমার গতি তুমি। আর আমাকে ছাড়লে তোমার কী গতি জানোই তো। এখন যে তোমার ১৪ই আশ্বিনে ১৫ই অক্টোবরে এক হয়ে যায়, নিজের নতুন ছাতার সঙ্গে পরের পুরোনো ছাতার স্বত্বাধিকারে ভেদজ্ঞান থাকে না, গাড়ি চড়ে ড্রাইভারকে এমন ঠিকানা বাৎলিয়ে দাও সেই ঠিকানায় আজ পর্যন্ত কোনো বাড়ী তৈরী হয়নি। আর চাকরের ঘুম ভাঙবার ভয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে কল-তলায় নিজে গিয়ে কুঁজোয় জল ভরে নিয়ে আসো।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি কী বলো নবীন?"

কী জানি ওঁর হয়তো মনে হয়েছিল ওঁদের এই পারিবারিক প্রস্তাবে আমার ভোটেরও একটা মূল্য আছে।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম তারপরে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা তখনি উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। বোধ হোলো যেন চোখ থেকে জল পড়ল আমার পায়ে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম।

অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না। আপনার তুলনায় আমি কিছুই নই সে কথা নিশ্চয় জানবেন। এই কিন্তু শেষ বিদায়, যাবার আগে আর দেখা হবে না।"

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কী কথা দিদি?"

অচিরা বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠ সামলিয়ে হেসে বললে, "দাদু, তুমি অনেক কিছু জানো কিন্তু আরো কিছু সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে অনেক বেশি, এ কথাটা মেনে নিয়ো।"

এই ব'লে চলতে উদ্যত হোলো। আবার ফিরে এসে বললে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না—আজ আমার তীব্র আনন্দ হচ্ছে যে আপনাকে মুক্তি দিলুম—তার থেকে আমারো মুক্তি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—লুকোব না, জল আরো পড়বে, নারীর চোখের জল তাঁরি সম্মানে যিনি সব বন্ধন কাটিয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।"

দ্রুতপদে অচিরা চলে গেল।

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সামনে কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

ছোটো গল্প ফুরোলো। পরেকার কথাটা খনি খোঁড়ার ব্যাপার নিয়ে। তারো পরে আরো বাকী আছে—সে ইতিহাস নিরতিশয় একলার অভিযান জনতার মাঝখান দিয়ে দুর্গম পথে রুদ্ধ দুর্গের দ্বার অভিমুখে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে যত আমার প্ল্যান আর নোট আর রেকর্ড উল্টেপাল্টে নাড়াচাড়া করলুম। দেখলুম, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র, তাতেই আমার বৃহৎ ছুটি।

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে। পাখির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।

৪।১০।৩৯

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সংকলিত

ঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন

১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। তিনি জনক-জননীর প্রথম সন্তান। তাঁহার জন্মকালের একটি গল্প তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন,—

"আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না। কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্ম-সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, 'একটি এ'ড়ে বাছুর হইয়াছে।' এই সময়ে, আমাদের বাটীতে একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও আজকাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পিতামহদেবের কথা শুনিয়া পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এ'ড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, 'ও দিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমায় এ'ড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি'। এই বলিয়া, সূতিকা গৃহে লইয়া গিয়া তিনি এ'ড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট পিতামহদেবের পূর্ব্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'ইনি সেই এ'ড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার ক্রমে এ'ড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।' জন্মসময়ে, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া আমায় এ'ড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে কার্য্য দ্বারাও এ'ড়ে গরুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।'

তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং চোদ্দ পনরো বৎসর বয়স হইতেই স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উপার্জ্জনের চেষ্টায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সামান্য বেতনে কাজ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, নিজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সংসারে মাথা তুলিতে পারেন নাই বলিয়া সন্তানের শিক্ষার দিকে তাঁহার গোড়াগুড়ি নজর ছিল। সুতরাং তিনি পঞ্চবর্ষীয় ঈশ্বরচন্দ্রকে বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষাদান বিষয়ে নিপুণ ও যত্নবান ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে গুরুমহাশয় দলের আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা বিনীত ও অধ্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহ তাঁহার প্রতি অধিক ছিল। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে ঠাকুরদাস জোড়াসাঁকো নিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট মাসিক দশ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিলেন।

পিতামহ রামজয়ের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে ১২৩৫ সালে কার্ত্তিক মাসে (১৮২৮ অক্টোবর) ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসেন। তাঁহাকে শিবচরণ মল্লিকের বাটীর পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস শিক্ষাদান বিষয়ে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ ছিলেন,

কিন্তু অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ—এই তিন মাস শিক্ষালাভ করার পরেই দুরন্ত রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহীর সহিত স্বগ্রামে ফিরিতে বাধ্য হন। ১২৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসেন। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা সম্ভব স্বগ্রামে এবং স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায় শেষ হওয়াতে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কি ভাবে শিক্ষা দিবেন, তাহা লইয়া আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র আট বৎসর বয়সে যখন প্রথম কলিকাতায় আসেন, তখন পদব্রজে আসিতে আসিতে রাস্তার মাইলষ্টোনে ইংরেজী হরফে মাইল-চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া ইংরেজী অঙ্ক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস ইহা বিবৃত করাতে পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা সকলেই একবাক্যে "তবে ইহাকে রীতিমত ইংরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও ঠাকুরদাস অবস্থা-বৈগুণ্যে ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই—এই কারণে তাঁহার মনে অতিশয় ক্ষোভ ছিল। সুতরাং আত্মীয়দের পরামর্শ তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "উপার্জ্জনক্ষম হইয়া আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।" ঈশ্বরচন্দ্রের আর ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া হইল না। তিনি ১৮২৯ সনের ১লা জুন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর।

বিদ্যাসাগরের জীবনীকারেরা, বিশেষ করিয়া সহোদর শম্ভুচন্দ্র, তাঁহার শৈশবের একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতার অনেক গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সকল গল্প হইতে এইটুকুই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাধারণ আর পাঁচজনের মত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিদ্যাসাগর চরিতে' এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যৎ বিদ্যাসাগর চরিত্রের মূল কথাটি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—'পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন শাদা বস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে, তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়-চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।'

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন, তখন প্রতিবেশী মধু মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্য-বিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণ-পরিচয়ের সর্ব্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণ-তেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী-লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস্ করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য-অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত-ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"

যে প্রতিভাগুণে বালক ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরকালে পিতা ঠাকুরদাসের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিতে পারিয়া-ছিলেন, তাহার আংশিক স্ফুরণ তাঁহার জন্মকাল হইতেই সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ভগবান তাঁহাকে এই প্রতিভার সঙ্গে অসাধারণ কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রতিভা সম্যক বিকশিত হইতে পারিয়াছিল। তাঁহার বাল্যের ইতিহাস এই অধ্যবসায় ও ক্লেশ স্বীকারের ইতিহাস।

অভাব এবং দারিদ্র্য তাঁহাকে তাঁহার গন্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই বলিয়াই তিনি উত্তরকালে বহু দরিদ্রের প্রতিপালক, ব্যথার ব্যথী এবং দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হইতে পারিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ একাত্তর বৎসরকাল বাংলা দেশে বর্ত্তমান থাকিয়া সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্র ব্যাপারে বিবিধ যুগান্তর ও মন্বন্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঘনিষ্ঠভাবে কয়েকটি যুগান্তকারী আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ একমাত্র তিনিই বাংলা দেশের অতীত এবং বর্ত্তমান কালসমুদ্রের মাঝখানে নগাধিরাজ হিমালয়ের মত মানদণ্ডস্বরূপ অবস্থিত ছিলেন; বৃহৎ আয়তনের জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ মহিমায় দেখিতে পাই না বলিয়াই তাঁহার বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমরা সজাগ নহি; আমরা খণ্ড খণ্ড-ভাবে তাঁহাকে দেখি এবং খণ্ডিত ভাবেই চমৎকৃত হই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সম্পূর্ণভাবে না দেখিতে পাওয়ার অপরাধ আমাদের নহে; তাঁহার যে-কয়টি জীবনী এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটিতে তাঁহার সমগ্র জীবন অথবা সর্ব্ববিধ কীর্ত্তি আলোচিত হয় নাই; উপকরণের অভাবেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক মধ্যে মধ্যে বড় ফাঁক আছে। বিংশ শতাব্দীতে জীবনী-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই ফাঁক পুরাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত জীবন-চরিতে তাঁহার বাল্যজীবন অর্থাৎ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জীবনের পরিচয় পাই। 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে' সরকারী কাগজপত্র হইতে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহার প্রচলিত জীবন-চরিত-গুলিতে তাঁহার শেষ-জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার ছাত্র-জীবনের সঠিক ইতিহাস এত দিন প্রায় অলিখিতই থাকিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র-জীবনের যে বিবরণ আছে, পরবর্ত্তী জীবনীকারদের তাহাই উপজীব্য হইয়াছে। ইঁহাদের কেহই মূল উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেন নাই, ফলে বিদ্যাসাগরের ছাত্র-জীবনের ইতিহাস নির্ভুল ও যথাযথ হইতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২৯ সনের ১লা জুন হইতে ১৮৪১ সনের মে মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দ্বাদশ বৎসর পাঁচ মাস ব্যাপী ছাত্রজীবনের সঠিক ইতিহাস জানিতে হইলে সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র সযত্নে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই কাজ ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংস্কৃত কলেজের পুরাতন চিঠিপত্র, মাহিনা ও বৃত্তির রসিদ-বই প্রভৃতির সাহায্যে বিদ্যাসাগরের ছাত্র-জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম।

ব্যাকরণ-শ্রেণী—

১লা জুন ১৮২৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৩৩ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে ১৮৩১ সনের মার্চ হইতে মাসিক ৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বারই নগদ টাকা ও পুস্তক পারিতোষিক পান।

ইংরেজী-শ্রেণী—

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩০ সনে ইংরেজী-শ্রেণীতেও যোগ দেন। ১৮৩৩-৩৪ সনের ও পর বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষায় পুস্তক পারিতোষিক পান।

সাহিত্য-শ্রেণী—

১৮৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এই শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ও ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট অধ্যয়ন করেন। এই দুই বৎসর মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৩৪-৩৫ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় কয়েকখানি পুস্তক পারিতোষিক পান। দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্যও স্বতন্ত্র পারিতোষিক পান।

অলঙ্কার-শ্রেণী—

১৮৩৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং পূর্ব্ববৎ মাসিক ৫৲ বৃত্তি পান। অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। ১৮৩৫-৩৬ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক পান।

জ্যোতিষ-শ্রেণী—

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর জ্যোতিষ পড়িতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীতেও যোগধ্যান মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন।

বেদান্ত-শ্রেণী—

অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৬ সনের মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীতে যোগদান করেন। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি তখন বেদান্ত পড়াইতেন। ১৮৩৭ সনের মে মাস হইতে তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া ৮৲ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই শ্রেণীতে তিনি ১৮৩৭ সনের মে মাস হইতে ১৮৩৮ সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল ছিলেন। ১৮৩৭-৩৮ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তিনি ১০৲ মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক পান।

স্মৃতি-শ্রেণী—

১৮৩৮ সনের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ও এক বৎসর হরনাথ তর্কভূষণের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৮-৩৯ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া নগদ ৮০৲ পুরস্কার পান এবং সংস্কৃত গদ্য-রচনার জন্য ১০০৲ টাকার আর একটি পুরস্কার পান। পরের দুই

বৎসরও পদ্য-রচনার জন্য পারিতোষিক পান।

হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা—

সংস্কৃত কলেজে রীতিমত স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। সেকালে যাঁহারা জজ-পণ্ডিত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে হইত। ১৮৩৯ সনের ২২ এপ্রিল এই পরীক্ষা হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী মে মাসে প্রশংসাপত্র পান।

ন্যায়-শ্রেণী—

১৮৩৯ সনের প্রথম ভাগে এই শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর রচনা-প্রতিযোগিতায় তিনি ৫০৲ টাকার একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর অনধিক তিন বৎসর কাল ন্যায়-শ্রেণীতে নিমাইচাঁদ শিরোমণি ও জয়-নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট অধ্যয়ন করেন; বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি নানা বিষয়ে পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নগদ ১০০৲, পদ্য-রচনার জন্য নগদ ১০০৲, দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য ৮৲ এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশ্যান বিষয়ে পরীক্ষায় নগদ ২৫৲—সর্ব্বসাকল্যে ২৩৩৲ পাইয়াছিলেন।

বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে বিদ্যাসাগর কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের ইতিহাস,—নীরস ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বাংলা ভাষাকে সর্ব্বপ্রথমে সরস করিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের উদ্যোগপর্ব্বের ইতিহাস ঐতিহাসিকের নিকট কম মূল্যবান্ হইবার কথা নয়।

বিদ্যাসাগরের কর্ম্মজীবন

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচলিত জীবনী-গুলিতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং সেগুলি পাঠ করিয়া আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মচারী হিসাবে যে যে প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন, সেগুলিরও তৎকালীন পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস সরকারী কাগজপত্র হইতে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণ এবং সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রাদি লইয়া কাজ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন উপকরণ পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী এইরূপ নানা নূতন উপকরণের দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া উঠুক—ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার

বারো বৎসর পাঁচ মাস কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের পর ১৮৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া, সৌভাগ্যক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিদ্যা-সাগরের চাকরি জুটিল।

১৮৪১ সনের ৯ই নবেম্বর মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন। বিলাত হইতে যে সকল সিবিলিয়ান এদেশে চাকুরি করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে কলিকাতায় থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিখিতে হইত; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জেলার শাসনকার্য্যের ভার পাইতেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন ক্যাপ্টেন জি টি মার্শেল; গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি-পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকিতেন, তাহা ছাড়া কিছু দিন ঐ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটরীও ছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। মার্শেল ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের নিকট এক সুপারিশ-পত্র পাঠাইলেন: পত্রখানি এইরূপ:—

2. I beg to recommend, for the situation of Bengali Sherishtadar, Iswarchandra Vidyasagar whose acquirements are similar to those of the late Sherishtadar as appears by the undermentioned certificates which he holds, viz.—

1st A certificate (dated 4 Dec. 1841) from the Government Sanskrit College of very good proficiency in every branch of literature taught at that institution.

2nd One from the Hindu Law Committee of eminent knowledge of Hindu Law and qualification to hold the situation of Law Pundit in any of the Court of Judicature, and

3rd One from the Examiners of the College of Fort William of qualification to instruct the students in the Sanskrit and Bengali.

Iswarchandra possesses also a moderate knowledge of English of which he acquired the rudiments in the English class of the Sanskrit College but he was unable conveniently to improve his knowledge after the abolition of that class. He bears a high character for respectability of conduct and for industrious habits.*

২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্ব-প্রধান শিক্ষাগুরুর ইহাই কর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

ক্যাপ্টেন মার্শেল সেরেস্তাদারের কাজে খুশী হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতের সংস্রবে

*G.T. Marshall, Secretary of the College of Fort William, dated 27th December, 1841, to G. A. Bushby, Secretary to the Government of Bengal, Genl. Dept.—Home Miscellaneous No. 574, Vol. No. 17, p.p. 22-23, also p. 124 (Imperial Records).

আসিয়া তিনি ক্রমেই তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, জ্ঞানের গভীরতা, কর্ম্মের ক্ষমতা এবং স্থৈর্য্য, তেজস্বিতা ও চরিত্র-বলে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই চাকরি গ্রহণের ফলে, মার্শেল সাহেবের পরামর্শে তাঁহাকে ভাল করিয়া ইংরেজী ও হিন্দী শিখিতে হইল। বিদ্যাসাগরকে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে হইত; এই কার্য্যের জন্য ইংরেজী ও হিন্দীর জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ছিল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন-কালে তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, এখন প্রতিদিন বৈকালে শিক্ষকের সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু তালতলা-নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথের পিতা) তাঁহাকে প্রথম কিছুদিন ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। প্রাতে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহাকে হিন্দী শিখাইতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে বিদ্যাসাগর রীতিমত সংস্কৃতের চর্চ্চাও করিয়াছিলেন; এই সময় তিনি সাংখ্য ও পুরাণ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

ক্রমে বিদ্যাসাগর মার্শেল সাহেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে মার্শেল সাহেব কাজ করিতেন। অনেক সময় মার্শেল সাহেবের হইয়া তিনি সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও তৈয়ার করিয়া দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিতেছি।

হরনাথ তর্কভূষণ অবসর গ্রহণ করিলে এবং গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। এই দুইটি পদে দুই জন যোগ্য লোক নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ময়েট সাহেব মার্শেলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মার্শেল সাহেব ৯০৲ বেতনের প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদটি বিদ্যাসাগরকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, তিনি শূন্য পদ দুইটিতে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে নিযুক্ত করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। বাচস্পতি চাকরি করিতে সম্মত আছেন কি না জানিতে চাহিলে, বিদ্যাসাগর অবিলম্বে অম্বিকা-কালনায় উপস্থিত হন; তথা হইতে বাচস্পতির প্রশংসাপত্রগুলি আনিয়া মার্শেলের হস্তে সমর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে মার্শেল সাহেব শিক্ষা-পরিষদকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। পত্রখানি এইরূপ:—

With reference to the request of the Council of Education for my opinion on the subject of filling up the two vacancies which at present exist among the Professors of the Sanscrit College, I beg now to transmit for submission to the Council, my sentiments on that subject.

I would recommend that the first chair to which is attached a salary of 90 Rupees per mensem should be given to Taranath Tarkavachaspati a student of Ambika and formerly a student of the Sanscrit College which he quitted about ten years ago. This recommendation is made altogether from a conviction of this individual's superior qualifications and without any solicitation, direct or indirect, on his own part: only his willingness to accept the appointment if offered to him having been ascertained. He does not teach a "Tole" or public school, but he has, I am creditably informed, several private pupils, and I know from report and also personal conversation that he has kept up and added to the stores of Hindoo Literature and science, which he acquired at College: in fact his zeal for learning has led him to visit Benares two or three times, on each of which occasions he resided at that city for a considerable period. In every department he is, in my opinion, far above mediocrity and in several branches of science I doubt if any Pundit of Bengal can compete with him, namely, in the Upanishads........in Vedanta, Sankhya, Mimangsa, Jyotisha, and Patanjala. His general intelligence, especially in Hindu Philosophy, is well known: this point, the Hon'ble Mr. Millet, to whom I had once occasion to introduce this Pundit, will, I have no doubt, add his Testimony,—a circumstance of his having been educated at the Institution in which he now aspires to be a Professor gives him the advantage of being thoroughly acquainted with the system of instruction and the best mode of bearing and conduct to be observed towards the students. On the whole, I have not the least doubt that Taranath, if appointed, will, by his services, be a worthy return to his Alma Mater for the benefits which he in the past received.

বলা বাহুল্য, মার্শেলের সুপারিশ মত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মাসিক ৯০৲ বেতনে এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (ইনি পরে "সোমপ্রকাশ" পত্রের সম্পাদক হন) মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থাকিবার কালে অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ ও গণ্য-মান্য দেশীয় বড়লোকের সহিত বিদ্যা-সাগরের আলাপ-পরিচয় হয়। ক্যাপ্টেন মার্শেল কাউন্সিল-অব-এডুকেশন বা শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটের (Mouat-এর) সহিত বিদ্যাসাগরকে পরিচিত করাইয়া দেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি বিদ্যাসাগরের গতি নির্দ্দেশ করিল। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার সুবিধা মিলিল। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন।

১৮৪৬ সনের ২৬এ মার্চ রাম-মাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোক-গমনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য আবেদন করিলেন (২৮ মার্চ)। তাঁহার আবেদন পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি:—

To
Baboo Russomoy Dutt,
Secretary to the Govt.
Sanscrit College
Calcutta.

Sir,

Understanding that the situation of Assistant Secretary to the Government Sanscrit College has been left vacant by the death of the late incumbent Rammanikya Bidyalankar I beg to present myself as a candidate for the same.

As regards my qualifications, I beg to observe that I had the honor to be educated in the above Institution where I was fortunate enough to obtain many honors and distinctions. Besides, I have the honor to

hold the office of Sheristadar of the Bangallee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the Institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the system of Sankhya Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of Education afforded by your College.

In the examinations for scholarships which Capt. Marshall the Secretary to the College of Fort William undertook for the Sanscrit College for the last four years I was kindly allowed the honor of taking an active part in preparing questions and examining the answers thereunto. And I believe I have discharged my share of this duty in a manner which afforded perfect satisfaction to the parties concerned, viz. the worthy examiner and the Professors and students of the Institution. This, together with my long connection with the college as a student has given me an intimate knowledege of the system of education pursued there, and inspires me with confidence that in case my services are accepted I shall prove useful to the Institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate remuneration, and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties.

The copies of testimonials are herewith annexed for your inspection.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
Ishwar Chunder Shurma.

28th March |46,
Calcutta.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী হিসাবে মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপঃ—

Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengalee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the Branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office —and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanskrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his fact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

Sd. G. T. Marshall,
Secretary College.

College of
Fort William
28th March 1846.

বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলোচনার পর, তাঁহার আবেদনপত্র সুপারিশ করিয়া, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত ৩১ মার্চ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন—

P. S. Since writing the above I received the accompanying application from Iswarchunder Vidyasagar the Sherishtadar of the Bengali Department of the College of Fort William, and I have delayed forwarding this report until I had an interview with the applicant. He called upon me yesterday, and told me that though he expected higher emoluments he would accept the appointment on the existing terms, hoping that the subject of an increase of pay would be taken into consideration at a future period, provided he proves himself deserving of it, and it is deemed expedient to make such an increase. Iswar is a distinguished passed student of this Institution and has produced excellent testimonials from Capt. Marshall, and I am of opinion that in appointments like the one now vacant preference should be given to the students of this Institution, (if duly qualified) to give them an opportunity of distinguishing themselves in the Public Service and to convince them that whenever they are found qualified they will be eligible thereto should it be the pleasure of the Council to fil up the appointment without reference to the Committee of Examination. Under all the circumstances stated above and specially as the orthodox Pundits of high attainments and reputation are generally disinclined to take service and as I have no doubt that the appointment of Iswarchandra would be upon the whole beneficial to the College, I have no hesitation in recommending his appointment to the vacant situation. Be pleased to return Iswar's application for record, when no longer required. 31st March 1846.

২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখের পত্রে শিক্ষা-পরিষদ্ বিদ্যাসাগরের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের স্থানে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (৪ এপ্রিল); সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী

১৮৪১ সনের ২৯ ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৬ সনের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত চার বৎসর চার মাস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিয়া, ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার কয়েক দিন পরেই—১৩ই এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে সাহিত্যের অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত এই শূন্য পদে বিদ্যাসাগরকেই বসাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই পদ গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগরের মাসিক আয় আরও ৪০৲ বাড়িত। কিন্তু এ কাজ তিনি তাঁহার সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ছাড়িয়া দিলেন। তর্কালঙ্কার তখন ৫০৲ বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের হেড পণ্ডিত। *

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক

*মদনমোহন ২৭ জুন ১৮৪৬ তারিখে মাসিক ৯০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন এবং এই পদে ১৮৫০ সনের নবেম্বর মাসের কিছু দিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি ১৮৪২ সনে দুই মাসের জন্য হিন্দু কলেজ পাঠশালায় বাংলা-শিক্ষক, ১৮৪৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৮৪৫ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, এবং ১৮৪৬ সনের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজের পণ্ডিত ছিলেন।

মেদিনীপুর সহরে নব-নির্ম্মিত বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দির

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ও স্মৃতি-স্তম্ভ

উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে যে বৃত্তি-পরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের এক স্থলে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন ঃ—

The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me well adopted to produce order, to save time, and attention which it deserves: as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory.*

বিদ্যাসাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন—একথা সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের গোচর না করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থার কথা জানা বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত তাঁহার সহকারী বিদ্যাসাগরের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। তিনি ছিলেন ঠিকা কর্ম্মচারী, অন্য সরকারী কর্ম্ম বজায় করিয়া, কয়েক ঘণ্টা মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সহকারী স্বীয় কৃতিত্ববলে কোনরূপে কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িলে তাঁহার স্বার্থে ঘা পড়িতে পারে। বোধ হয় এই সকল কারণেই তিনি বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা পরিষদের গোচর করেন নাই। দু-একটি ছোট-খাট প্রস্তাব যথা,—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

যাহা হউক, কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জ্বলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীন-চেতা পণ্ডিত চটিয়া উঠিয়া ৭ই এপ্রিল ১৮৪৭ তারিখে সরাসরি শিক্ষা-পরিষদের নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহার পদত্যাগের কথা জানিতে পারিয়া, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ পরবর্ত্তী ১০ই এপ্রিল তারিখে শিক্ষা-পরিষদের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন, যেন বিদ্যাসাগরের মত কর্ম্মী ও সংস্কারককে এ-সময় সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে দেওয়া না হয়; দিলে কলেজের উন্নতির পথে বাধা পড়িবে। তাঁহাদের আবেদনপত্রখানি এইরূপ ঃ—

THE MEMORIAL OF THE PUNDITS AND TEACHERS OF THE SANCRIT COLLEGE.

Respectfully sheweth

That your memorialists beg to express their sincere regret at learning that Essurchunder Biddasagore, Assistant Secretary to the Sanscrit College has, for reasons unknown to them, resigned his situation, as they are really afraid that his resignation at a time when the College is, as it were being altogether remodelled, will prove very much prejudicial to its true interests.

The Assistant Secretary by his personal abilities, industrious habits, and zeal in the welfare of the College, has as is already known to you, introduced several beneficial changes and proposed such salutary innovations in the system of education hitherto pursued there, as your memorialists expect, will soon place that institution on a very solid and efficient footing. Your memorialists are of opinion that the appointment of the said Bedyasagore does great credit to your judgment, who determined on the last occasion of filling up the vacant chair of your assistant upon nominating one intimately acquainted with the Sanscrit and tolerably versed in the English language as they believe that the Assistant Secretary has been in a great measure enabled by the above qualifications to plan the revised system already noticed. Under the circumstances your memorialists cannot but be sorry that he has tendered his resignation and they sincerely trust as his loss cannot easily be supplied that you will be pleased to adopt such measures as will induce Essurchunder to continue his services at the College which will no doubt be greatly conducive to the prosperity of our institution.

In conclusion your memorialists beg to state for your information that the resignation, referred to being tendered to the Secretary to the Council of Education your memorialists have, with a view to prevent delay, presented a similar memorial to Dr. Mouat in the hope that he may not take hasty steps to accept of the resignation of an officer who might otherwise be induced to continue his services to the College if not for his own, at least for the interests of the institution which he was appointed to look over.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray.

Sanscrit College
10th April 1847.

শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণাং
শ্রীভরতচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণাং
শ্রী[illegible] শর্ম্মণাম্
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীমদনমোহন শর্ম্মণাম্
শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীগিরীশচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মণাম্
শ্রীরসিকলাল সেন
শ্রীশ্যামাচরণ সরকার
Russicklall Sen
Shama Churn Sircar.

বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র ও পণ্ডিত-বর্গের আবেদনপত্র সরাসরি শিক্ষা-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে—এই সংবাদ যথাসময়ে সম্পাদক রসময় দত্তের কর্ণগোচর হইলে, তিনি একখানি আধা-সরকারী পত্রে শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরীকে জানাইলেন যে, এইরূপ করিয়া তাঁহার সহকারী, অথবা কলেজের অধ্যাপকবর্গ, কেহই যথারীতি কাজ করেন নাই; তাঁহারা যেন তাঁহাদের বক্তব্য প্রথমে সম্পাদকের নিকট পেশ করেন।

শিক্ষা-পরিষদ্ সম্পাদকের প্রস্তাব সমীচীন মনে করিয়াছিলেন (১৪ এপ্রিল); তদনুসারে ২০এ এপ্রিল বিদ্যাসাগর তাঁহার পদত্যাগপত্র সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেন এবং পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে লিখিলেন ঃ—

....My reason for resigning is,

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1846-47 (May 1846-April 1847), pp. 39, 41.

that I do not find those opportunities of being useful in anticipation of which I applied for the appointment.

এই পত্র পাইয়া সম্পাদক রসময় দত্ত পরদিন (২১ এপ্রিল) বিদ্যাসাগরকে তাঁহার পদত্যাগের কারণ আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র সেক্রেটরীকে ৩রা মে তারিখে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন।

৫ই মে তারিখে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক শিক্ষা-পরিষদকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন; সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-সংক্রান্ত সমস্ত চিঠিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগরের পত্রখানি সম্বন্ধে সম্পাদক লিখিতেছেন:—

2. The explanatory letter is an elaborate document. I cannot exactly gather from it the real cause of Pundit Ishwarchandra's resignation. It contains a series of desultory complaints: First, that a report which he made to me as my subordinate, on the internal management of the Sanscrit College was not submitted to the Council; Secondly, that I did not bestow on him that degree of commendation which he thinks he merited. The following extract from the letter would indicate some additional grounds for the step he has taken.

3rd "That you (the Secretary to the College) were not satisfied with the degree of commendation, bestowed by the Examiner and in fact you considered his laudatory remarks on the progress of the students as altogether unfounded. My just hopes of commendation were thus at once frustrated."

4th "That all my other proposals have been treated totally unworthy of consideration, but I nevertheless feel confident that each of them is calculated in no way to injure the College—but on the contrary to promote its efficiency."

5th "The privilege assumed by the Principal of the Hindoo College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his own students at particular examinations, for three or four days together."

বিদ্যাসাগরের উপরি-উক্ত অভিযোগগুলির কৈফিয়ৎস্বরূপ সম্পাদক লিখিতেছেন:—

3. Firstly Pundit Ishwarchandra never requested me to submit to to the Council of Education the report alluded to by him. Had he done so I would have forwarded it though a report of a subordinate officer to his superior on the details of the office is not necessarily a proper document to be so submitted. In fact upon the report being noticed by the Examiner from the private and unauthorized information of the Assistant Secretary, I had as a Member of the Council stated that it might be printed as an appendix to the Sanscrit College annual report which was not deemed necessary by the Council. Secondly, I beg to submit that a subordinate officer is not the best judge of his own merits, but ought to bow to the decision of his superior. Thirdly, this part of the complaint appears to me rather a vindication of the Examiner's two reports of 1845 and 1846—upon which subject I expressed my opinion in my letters dated respectively 3rd February 1846 and 4th January 1847 and that opinion remains unchanged. Fourthly, it cannot be supposed that the Head of an office will adopt all the proposals of his subordinate and have no discretion of his own. This would make the Head subordinate to the deputy.

Fifthly, Mr. Kerr required occasionally (when the examination of persons seeking employment in the Education Department takes place) the loan of a few desks and stools belonging to the Sanscrit College, and I directed Pundit Ishwarchandra to give him the desks and stools—he complained of being harshly treated by Mr. Kerr. I told him that there was no occasion to quarrel about the matter and that I would speak to Mr. Kerr, and perhaps get the sanction of the Hindoo College Committee for purchasing a set of new desks and stools for the purpose.

4. I have marked in red ink a few passages in Pundit Ishwarchandra's explanatory letter, and also made some brief comments upon his report dated 19th September 1846 (herewith submitted) to enable the Council to understand fully the merits of the case."

যে-কারণে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন তাহা যে ৫০৲ বেতনের একটি চাকরি ছাড়িয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না, এই মত পোষণ করিয়া সম্পাদক লিখিয়াছিলেন:—

For my own part, I must confess, that I do not think the reasons alleged (even if they were true in the sense they are put forth) could have induced a Pundit to resign an appointment of fifty Rupees a month, the causes appear to me to be anything but what are stated in the letter. It may not therefore be out of place especially as I apprehend a secret agency is at work in this matter, to submit a brief account of Pundit Ishwarchandra's appointment, progress, and of the real cause (as it appears to me) of his resignation.

5. Pundit Ishwarchandra having but a very scanty knowledge of English, it is more than probable that his report and explanatory letter are productions of or have been carefully revised by another; but as he has subscribed his name to both these documents, I presume he has thoroughly understood their purport.

6. I recommended the appointment of Pundit Ishwarchandra to the vacant post of Assistant Secretary on the death of Rammanikya Vidyalankar in March 1846 and the appointment was approved by the Council on the 2nd April following. I was aware at the time that he did not possess that degree of profound Sanscrit learning, which both his predecessors (Rammanikya Vidyalankar and Ramchandra Vidyabageesha) possessed. I was aware also and warned of his intriguing and uncandid disposition (you admired my "Philosophy" in recommending him!) yet I recommended him, in the hope, that his activity and intelligence would make up for his want of deep learning and that by shewing him indulgence his intriguing and uncandid disposition would undergo a reform. I was also induced to recommend him with a view to shew the students of the institution that the appoinment was open to them, notwithstanding its having been previously held by two pundits of such eminence.

7. On his appointment I shewed him every indulgence, and entrusted him with greater control over the Sanscrit Department and Professors than either of his predecessors exercised and directed that everything connected with the Sanscrit instructive department should come to me through him. On the Sahitya chair becoming vacant in February(?) last, I offered him that post, the salary attached to it being 90 Rupees per mensem, but he declined to accept it for reasons best known to himself, and asked me to nominate his friend Madanmohan; I did so, because I considered Madanmohan to be a fit person to fill the Sahitya chair and the business of the College went on most harmoniously until the end of February—he never uttered a word about his report not being submitted to the Council.

8. The establishment of a fifth division of the Grammar class being sanctioned about this time Pundit Ishwarchandra asked me to nominate his friend Grischandar

(the College Librarian). I refused to do so, and informed him that Casinath Tarkapanchanan was on the Council's list for employment and that I intended to nominate him. Pundit Ishwarchandra said that Casinath was too old and unfit to control young boys, he would do better as a Librarian and repeated his solicitation in favour of Grischunder. I declined to comply and Casinath was appointed.

9. From this time forward Pundit Ishwarchandra seemed to be somewhat vexed and reserved, but as I did not discover any very great symptom of displeasure openly manifested, I allowed the things to go on as usual.

10. On the 28th March he applied to me to purchase for the use of the College 100 copies of a Bengali work compiled by him called "Betal Panchabinsutee" (a copy of the work is herewith submitted) at 3 Rupees per copy in order that the students, as exercises in Sanscrit translation, may translate passages from that work. I told him I would look into the work and inform him of my intention. On examination I found it contained a collection of hacknied and somewhat indecent fables—quite unsuited for the purpose recommended and I was of opinion that the Revd. Krishnamohan Banerjea's Encyclopedia Bengalensis a very superior work and better suited for our purpose. I accordingly informed Pundit Ishwarchandra of my opinion about the 4th or 5th of April, upon which he immediately tendered his resignation direct to you without any knowledge or consent.

11. This conduct of Pundit Ishwarchandra is not only highly insubordinate as respects himself, but it has set a very bad example to the Professors and Teachers of the Institution, who also presumed to present a Memorial to the Council in the same irregular and disrespectful manner. If such insubordination is not checked by reprimand or otherwise, it is likely that the discipline of the College will be impaired.

12. On the retirement of Pundit Ishwarchandra I anticipate no other inconvenience than a nominal one, which will be stated in the next paragraph.

13. The Council will perhaps remember the report of the result of the examination of 1845 and the gratuitous comments of the examiner on the management and of the totally different tone of the report of examination of 1846, which took place a few months after the appointment of Pundit Ishwarchandra to the post of Assistant Secretary. That such would be the result of the last mentioned examination report I predicted to you long before it occurred. Now if after retiring from the College Pundit Ishwarchandra has any direct or indirect influence on or interference with the examination (as he stated in his explanatory letter he always had) it would not be a matter of surprise if the Council should receive again the same kind of report as was submitted to them in 1845 and I would therefore beg most earnestly to recommend that in justice to the College the system of examination may be placed on the same legitimate footing as it was at the beginning when the scholarships were established viz., to appoint two eminent Pundits with an European gentleman (the latter to preside) to conduct the examination.

সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতবর্গের আবেদন সম্বন্ধে সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করেন ঃ—

14. To the memorial of the Pundits I put no value, as I know they have more or less fears and hopes that Pundit Ishwarchandra has sufficient influence in the examinations to injure or benefit them.

বিদ্যাসাগরকে তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনচেতা পণ্ডিত একবার যাহা সংকল্প করিতেন তাহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতেন না। এদিকে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ সম্বন্ধে শিক্ষা-পরিষদের সিদ্ধান্ত সত্বর জানিবার প্রার্থনা করিয়া, সম্পাদক রসময় দত্ত ৮ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন ঃ—

I have the honor to solicit the favor of a reply, as some inconvenience has been felt for want of it.

পরবর্তী ১৫ই জুলাই তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্ সংস্কৃত কলেজের সম্পাদককে জানাইলেন যে, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র সম্পাদক ১৬ই জুলাই তারিখেই বিদ্যাসাগরকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন ঃ—

The secretary begs to inform Pundit Ishwarchandra Vidyasagar that his resignation of the post of Assistant Secretary to the Sanskrit College has been accepted, and to request that Pundit Ishwarchandra will have the goodness to give over charge of his office to Pundit Taranath Tarkabachaspute the Professor of Grammar, First Class.

2. Pundit Ishwarchander's salary as Assistant Secretary will cease from this day. The copy of Betal Punchbinsutee which Pundit Ishwarchandra submitted to the Secretary is herewith returned.

তখনকার দিনে এক কথায় ৫০৲ টাকা বেতনের চাকরি একজন পণ্ডিত কি করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন, বিজয়ী রসময় দত্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি না কি একজনকে বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর খাবে কি?" এই কথা বিদ্যাসাগরের কর্ণগোচর হইলে তিনি দত্ত মহাশয়কে জানাইতে বলিয়াছিলেন,—"বোলো বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"

যে বিদ্যাসাগরকে বিতাড়িত করিয়া সম্পাদক রসময় দত্ত নিজেকে নিষ্কণ্টক মনে করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাসাগরই তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই স্বীয় যোগ্যতাবলে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসিয়া চিরতরে দত্ত-মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন! সে কথা—এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারের ইতিহাস—স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়; কৌতূহলী পাঠক তাহা 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' * পুস্তকে পাইবেন।

* 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

বিদ্যাসাগর ও বাংলা সাহিত্য

সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেন এবং কিভাবে আপনাকে বঙ্গবাণীর পূজা-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সে ইতিহাস আজিও আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দীর্ঘ শতাব্দীকাল পরেও আমাদের বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। কথিত আছে, তিনি ভাগবতের দুই স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ বাসুদেব চরিত নামে একটি গ্রন্থে নিবন্ধ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যরূপে দাখিল করিয়াছিলেন; সেই পুস্তক পরীক্ষক-দিগের মনোনীত হয় নাই। এই কাহিনী সত্য হইলে মনে করিব, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গ-ভারতী যে মন্থর যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরকে সেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই আকর্ষণ করিয়াছিল। তবে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র (১৮৪৭ খৃঃ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যে সামান্যই সম্পর্ক ছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। সিভিলিয়ান সাহেবদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই মনে মনে পুলক-বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে 'উপক্রমণিকা' 'ঋজু-পাঠে'র পথেই তাঁহার গতি দীর্ঘপ্রসারী হইত, 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস'কে ভিত্তি করিয়া বাংলা সাহিত্য আজ এমন বিরাট সৌধের গর্ব্ব করিতে পারিত না। অর্থাৎ আমরা বলিতে চাই যে, প্রথম বাংলা রচনা করিতে বসিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পীজন-সুলভ সৃষ্টির আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়া-

বিদ্যাসাগরের কলিকাতা বাদুড়বাগানস্থ বসতবাটী
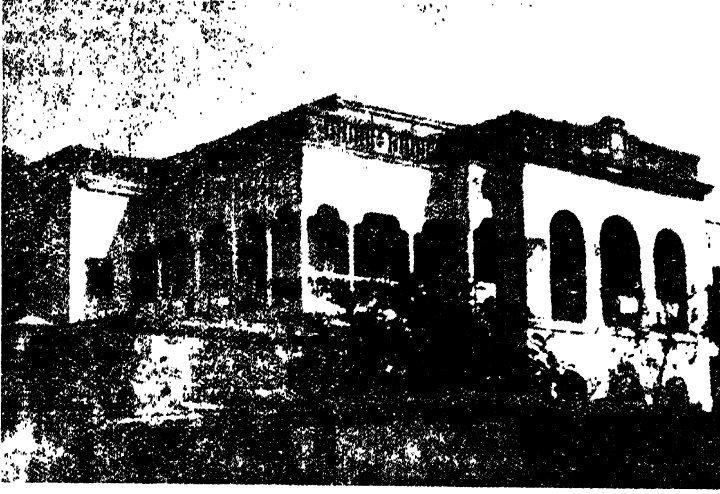
[illegible] (Shakespeare's Works) [illegible]

Awarded
to Jogindra Chunder Bose
at the close of his brilliant
Career as a Student
in the Metropolitan Institution
Ishwar Chandra Sarma
8th January 1875

বিদ্যাসাগরের বাংলা ও ইংরেজী হস্তাক্ষর

ছিলেন এবং তিনি যদি একটু কম উদার-চেতা ও কম ত্যাগী হইতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের অসহায় শিশু ও বালক-বালিকাদের কথা স্মরণ করিয়া আপন শিল্পপ্রতিভাকে দমন করিয়া 'বর্ণপরিচয়' 'বোধোদয়' 'কথামালা' 'আখ্যানমঞ্জরী'রূপে খেলনা সৃষ্টি না করিয়া বৃহত্তর কিছু রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন। আজিকার দিনে এই আত্মত্যাগের পরিমাপ করাও আমাদের পক্ষে দুরূহ। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্যস্বরূপ খুব বড় ধরণের কোন সৃষ্টিকে বিচারকের সম্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংলা ভাষাটাই তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ দীর্ঘকালের জন্য রহিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখন সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে; যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটি আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পথে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলা বন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে;—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত—প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্য-কুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি সেই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য-পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্যবর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্য-ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা-গদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।"

যে প্রতিভাগুণে কলমের গাছে প্রমাণাকারের ফজলি আম ফলাইতে পারা যায়, বিদ্যাসাগরের প্রতিভা সেই জাতীয় নয়। তিনি যাদুকরের মত ফাঁকা মাটি হইতে একেবারে ফলসুদ্ধ গাছ সৃষ্টি করিয়াছেন। 'বর্ণপরিচয়' হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিবাহবিচার পর্য্যন্ত ঠিক ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস নহে। তিনি সূত্রপাতেই অপরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষার একটি শুদ্ধ সরল ধ্বনিব্যঞ্জনাময় রূপ লইয়া 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হইতেই চমক লাগাইয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা না থাকিলে প্রচলিত কোন বস্তুর মধ্যে অদৃশ্য ও অজ্ঞাত নিয়মানুবর্ত্তিতা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। নিউটনের মত প্রতিভাই বৃন্তচ্যুত আপেল ফলের পতনের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। বিদ্যাসাগরও ভাষা ব্যাপারে নিউটনের সমগোত্রীয় প্রতিভাশালী পুরুষ।

এই পৃথিবীতে মানব-মনের তাবৎ প্রকাশের মধ্যে আপন অন্তর্নিহিত দ্যোতনা ও ছন্দোগতি—ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা—সমেত ভাষা এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু; স্বরূপে ইহাকে সহজে ধরাছোঁয়া যায় না। প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া, বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় হইতে বাংলা কবিতা রচিত হইতেছে, এবং বহু বাঙালী পণ্ডিত বাংলা ছন্দের উপরে বড় বড় পুস্তক ও প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বাংলা ছন্দের মূলে প্রাণবস্তুটি এতকাল প্রায় অনাবিষ্কৃতই ছিল। সম্প্রতি কয়েকজন প্রতিভাবান কবি ও গবেষকের সার্থক চেষ্টায় বাংলা ছন্দের সেই প্রাণ-বস্তুটি ধরা পড়িয়াছে, বাংলা গদ্য, সার্থক বাংলা গদ্য, অনেকে লিখিয়াছেন, এবং আজও অনেকে লিখিতেছেন। বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ঝঙ্কার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এখনকার দিনে অসম্ভব নয়। কিন্তু যখন ভাল গদ্যের নমুনা কদাচিৎ দেখা যাইত, সেইকালে বিদ্যাসাগর যে কি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বাংলা গদ্যের সেই অন্তর্নিহিত ঝঙ্কারের সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতিকে খেলনার সহিত তুলনা করিয়া আমরা বিদ্যাসাগরকে খাটো করিতে চাহি

নাই; বস্তুতঃ সে যুগে শিশু বাঙালী-মনের পক্ষে এইগুলি সময়োপযোগীই হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের পক্ষ হইতে বলিতে পারি, এমনই রসসৃষ্টির প্রতিভা তাঁহার ছিল যে, 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী'কে'ও সাহিত্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান সম্বন্ধে এই ভাষাগত রসসৃষ্টির দানই চরম এবং শেষ কথা।

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর

(শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

বাঙালীর রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক-জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তদশক হইতে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। রাষ্ট্রিক পরাধীনতার কথা বাদ দিয়া আমাদের সমাজ জীবনে যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সাহিত্যে সংস্কৃতিতে আমাদের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে —সে কথা অবিসম্বাদিরূপে সত্য।

কেমন করিয়া কাহাদের সুদুর্লভ প্রতিভাবলে এই অসম্ভব সম্ভব হইল—তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। কারণ ইহা সম্ভব হইয়াছে অতি অল্প-সংখ্যক কয়েকজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালীর সাধনায়; তাঁহাদের বিপক্ষে প্রায় সমগ্র সমাজ প্রাণপণে বাধা দিয়াছে। অপর-দিকে ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় সেকালের পাদরী-সমাজও প্রকারান্তরে বাধা দিয়াছে। এই দুই বিপুল শক্তির সহিত তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে গেলে—সুদুর্লভ প্রতিভাই বলিতে হয়। এই অল্প কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন মধ্যমণি। এবং এই সংস্কারকের পরিচয়ই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্রের সেই সুদুর্লভ প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আরও একটি কথা না বলিলে ঈশ্বরচন্দ্রের শক্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। সে কথা তাঁহার জন্ম ও বংশ পরিচয়ের কথা। সেকালের দূর এক পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তিনি, গ্রাম্য পাঠশালার সনাতন-পন্থী শিক্ষকের নিকট তাঁহার প্রথম শিক্ষা; পরবর্ত্তীকালে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়াও সংস্কৃত কলেজের গোঁড়া আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহাকে শিক্ষা-লাভ করিতে হইয়াছে।

যে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে রক্ষণ-শীলতার প্রভাব হইতে মন মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা আমরা বলিয়া থাকি—শৈশব হইতে সংস্কৃত কলেজ পর্য্যন্ত সে ইংরেজী শিক্ষার সহিত কোন সংস্রবই ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যে এই দৃষ্টি এই মন এই প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? ইহার একমাত্র উত্তর—সুদুর্লভ প্রতিভাশালী ঈশ্বরচন্দ্রের এই দৃষ্টি—এই মন—এই প্রেরণা তাঁহার জন্মগত প্রতিভার সঙ্গেই সহজাত, ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরচন্দ্রত্ব। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ সংস্কারকগণ সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা—তাঁহারা পরে ইংরেজী শিখিলেও বাল্যকাল হইতে কেহ ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন নাই; তাঁহারা যে মন, যে দৃষ্টি লইয়া সমাজের দুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সংস্কারে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন—সে দৃষ্টি, সে মন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব-মুক্ত। এরূপ প্রতিভা জাতির প্রয়োজনেই জন্মগ্রহণ করে।

অষ্টাদশ শতকে সমগ্র দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এই কুসংস্কারগুলিই স্তম্ভের মত ধর্ম্মের গলিত শবকে মমির মত ঘাড়ে করিয়া রাখিয়াছে; তাহার দুর্গন্ধ তাহার বিকৃতির বীভৎসতাকে—অলৌকিকত্বের চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া সমগ্র সমাজ ভয়ে চেতনা হারাইয়া নিশ্চিন্ত। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, শিশু বিবাহ, অন্তর্জলি, বিধবা পীড়ন, বহু বিবাহ তখন সমাজের মধ্যে ধর্ম্মের নামে সগৌরবে চলিয়াছে, ইহার একচুল এদিক ওদিক হইলে ব্যক্তিবিশেষেরই অধোগতি নয়—সমগ্র সমাজের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করা হইত। পদে পদে দোহাই দেওয়া হইত—কলিযুগে শেষ একপদাবিশিষ্ট বৃষরূপী ধর্ম্মের শেষ পদের অর্দ্ধেক গেল। সেই দিন-কালে রামমোহনের আবির্ভাব হইতে সমাজ-সংস্কার সুরু হইল। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন হত্যাপরাধের মত নিষ্ঠুর অপরাধ বিবেচনায় আইন বলে রদ হইল। কিন্তু তাহার পরে যাহা রহিয়া গেল—তাহাতে হাত দিবার মত আন্তরিকতা ইংরেজের থাকিবার কথা নয়। তাঁহারা হাত দিতে সাহসও করিলেন না। ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁহাদের প্রখর—শান্তিতে শাসন করিতে পারাটাই তাহাদের সব চেয়ে বড় কথা।

কিন্তু জাতির ছিল ভাগ্যবল—তাই সেই প্রারব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। আমাদের দেশের নারী-জাতির অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং সামাজিক নির্য্যাতন বোধ করি অতি বাল্যকাল হইতেই এই মহা-পুরুষের অন্তরকে বিচলিত করিয়া তুলিত। পল্লীগ্রামের মধ্যে সকলের বাড়ীতে অবাধ যাওয়া আসার মধ্যেই ইহা সেকালের সকল ছেলেরই চোখে পড়িত—কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র সকলের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না; তাঁহার মনে তাহা দাগ কাটিয়াছিল। তাঁহার জীবনীকারেরাও একথা বলিয়াছেন। তাঁহার সমাজ সংস্কারের সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এই নারী-জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের প্রচেষ্টাই যেন পনের আনা অংশ জুড়িয়া বসিয়া আছে। জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল যেন নারী জাতির দুর্দ্দশামোচন। তাঁহার প্রত্যেক সংস্কার প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল হইয়া আছেন—নারীজাতি।

তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা দেখি—ঈশ্বরচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। তাহার পর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্যে প্রবন্ধ রচনা এবং প্রকাশ করাই সব নয়। ইহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র এই ব্রতে এক ব্রতী সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ

বিষয়ে সংক্ষেপে একটি কাহিনীর উল্লেখ করিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণ 'সর্ব্ব-শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলেন যে, আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত আপনি লিখিয়া দিন। ছাত্র-সমাজের মাসিকপত্রে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবন্ধ লিখিলেন 'বাল্যবিবাহের দোষ'। ইহার মধ্যে তাঁহার সংঘ গঠনের চেষ্টাও যেন লক্ষিত হয়।

তাহার পরই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয় এবং অক্টোবর মাসেই দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম পুস্তিকাটি প্রকাশিত হইতেই সমগ্র বাঙালী সমাজ একেবারে হা-হা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, বিক্ষুব্ধ হইয়া খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবার লোকেরও অভাব হইল না। ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ দেখা দিতেই যেন কালবৈশাখীর ঝড় জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অমিততেজ ঈশ্বরচন্দ্র সৎকার্য্য বলিয়া যাহাতে হাত দিয়াছেন—তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে জানিতেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। পরাশর সংহিতা, মনুসংহিতা, স্মৃতি প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করিলেন যে—বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় বিধি নহে। পরিশেষে গভীর আবেগের সহিত আক্ষেপ ভরে লিখিলেন,—

"তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না;...........যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।" ঐ ছত্রগুলির পংক্তিতে পংক্তিতে আক্ষেপ এবং বেদনার পরিচয় সুস্পষ্ট। পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। মাতৃ-জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা বিমোচনে বদ্ধ-পরিকর বিদ্যাসাগর ৪ঠা অক্টোবর নিজের এবং আরও এক হাজার ব্যক্তির সহি দিয়া এক দীর্ঘ আবেদন করিলেন—আবেদনের সঙ্গে বিধবা বিবাহ আইনের এক খসড়াও সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য জি পি গ্রাণ্ট বিলের খসড়াটি সভায় উপস্থাপিত করেন, সমর্থন করেন—স্যার জেমস কল্‌ভিল। আবার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী বিলটি দ্বিতীয়-বার উত্থাপিত হইয়া একটি কমিটির হাতে বিচারের জন্য অর্পিত হয়। এদিকে বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল—প্রবল আন্দোলন। ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাঁশবেড়ে প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গ বিভিন্ন দরখাস্ত করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ছত্রিশ হাজার সাত শো তেষট্টিজনের স্বাক্ষর করাইয়া একখানি দরখাস্ত দিলেন। সর্ব্বসমেত চল্লিশখানি দরখাস্তে ষাট হাজার লোক সহি করিয়া বিরুদ্ধবাদ জ্ঞাপন করিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অদম্য চেষ্টায় ও কমিটির সহানুভূতিতে ১৮৫৬ খৃঃ ৩১শে মে আইনের খসড়া সমর্থিত হইল এবং ১৯শে জুলাই (Act XV of 1856—Marriage of Hindu widow) আইনে পরিণত হইল। আইন হইল কিন্তু দেশের আন্দোলন থামিল না। পক্ষে বিপক্ষে কত গান ছড়া রচিত হইল। দাশু রায় পাঁচালীর পালা রচনা করিলেন বিধবা বিবাহ। শান্তি-পুরের তাঁতীরা কাপড়ের পাড়ে ছড়া লিখিল—'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চির-জীবী হয়ে, সদরে করেছে রেপোর্ট বিধবার হবে বিয়ে।' ইহার উপর ঘরে ঘরে হাটে মাঠে আন্দোলন।

ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু সঙ্কল্প লইয়া দৃঢ়-চিত্তে চলিয়াছেন, এইবার সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। ১৮৫৬ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিধবার সহিত বিবাহ দিলেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিলে বিপক্ষ পক্ষ রটনা করিল,—'ইহা বিধবা বিবাহ আইনের পাপের ফল।'

১৮৭০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র আপনার একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিয়াছিলেন,—

"আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক;... এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না...।......আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক—তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।" ইহা সমাজ সংস্কারক সুদুর্লভ প্রতিভার অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

বহু বিবাহ নিরোধকল্পেও তিনি আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের আয়ু সংক্ষিপ্ত সেইহেতুই সে সঙ্কল্প তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মের স্রোত রুদ্ধ হইবার নয়—রুদ্ধ হয় নাই—সে স্রোত আজও আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবহমান। সেই প্রেরণাতেই আমরা আজও চলিয়াছি। তাঁহার দৃষ্টিই আজ বাঙালীর চোখে নারীকে মাননীয়া করিয়া তুলিয়াছে, ভবিষ্যতে আরও তুলিবে। যেমন সাহিত্যের ইতিহাসে—তেমনি বাঙালীর নবযুগের সমাজের ইতিহাসে—ঈশ্বরচন্দ্রের নাম অগ্নির অক্ষরে জাগিয়া থাকিবে। শুধু বাঙালীর ইতিহাসেই নয়—যদি কোন দিন বাঙালীর ইতিহাস পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে—তবে সে দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইবে যে, পৃথিবীর সকল দেশের—সকল কালের মহাপ্রাণ মহাপ্রতিভার অধিকারী-দের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্থান সমশ্রেণীতে।

বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি ও চরিত্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা-দেশের সমাজে ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের প্রতিভায় যে নবত্ব সঞ্চারিত হইয়াছিল সেকালের নানা মনীষীর মনে তাহা নানা-ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাবের পরিচয় আমরা পাই তাঁহাদের রচিত বিদ্যাসাগর-প্রশস্তি পাঠে। ইঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগরের জীবন ও কীর্ত্তির সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্পর্শ আছে। অর্দ্ধ-

মাতা ভগবতী দেবী

শতাব্দীর ব্যবধানে আমরা আজ কল্পনা-মূলক যত গবেষণাই করি না কেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতালব্ধ জ্ঞান যে অনেক বেশী সত্য বলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে অযথা বাগ্‌জাল বিস্তার না করিয়া এই সকল মনীষীর রচনার আশ্রয় লইতেছি। এগুলি একত্র পাঠ করিলে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। পরবর্ত্তীকালে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কৌতূহলী সকল বাঙালীরই এইগুলিই উপজীব্য হইয়া আছে।

প্রথমেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের অন্তর্গত ভের্সাই নামক স্থান হইতে কপর্দ্দকশূন্য বিপন্ন মধুসূদন বিদ্যাসাগরের নিকট আর্থিক সাহায্যার্থ আবেদন জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কবিজনোচিত অত্যুক্তি থাকিলেও বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশেষত্বের মূল কথাগুলি ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother."*

বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাচীন-কালের ঋষিজনোচিত দূরদৃষ্টি ও জ্ঞান, ইংরেজ সমতুল্য কর্ম্মতৎপরতা এবং বাংলাদেশের মাতৃজনসুলভ হৃদয়বৃত্তি ছিল; বাঙালী প্রতিভার জয়যাত্রার সেই আদিম যুগে একা তিনিই জ্ঞানে, কর্ম্মে ও প্রেমে অনন্যসাধারণ ছিলেন। অপরিমেয় জ্ঞানের সঙ্গে অদম্য কর্ম্মোদ্যম এবং দুস্থ ও আতুরের জন্য অপরিসীম করুণা, একাধারে একজনে আর পরিলক্ষিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর চরিত্র বুঝিতে হইলে এই তিন দিক দিয়াই তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে।

"দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগরের করুণার কথা সর্ব্বজনবিদিত। বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে বিপন্ন ও পীড়িতের ত্রাণকর্ত্তা হিসাবেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্মের পরিধি ভাবপ্রবণ বাঙালীচিত্তকে ততখানি মুগ্ধ করিতে পারে নাই—যতখানি করিয়াছে ব্যথিত ও আর্ত্তের প্রতি তাঁহার দয়া। তাঁহার চিত্তবৃত্তির এই কোমল দিকটা তাঁহার সম্বন্ধে বহুল প্রচলিত নানা কাহিনীর রূপ ধরিয়া বাঙালীকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ভের্সাই-এ বসিয়া রচিত (১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং 'চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলি' পুস্তকে মুদ্রিত (৮৪ সংখ্যক কবিতা) মধুসূদনের

ঈশ্বরচন্দ্র

বিখ্যাত "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" কবিতা-টিতে বিদ্যাসাগরের এই কোমল হৃদয়ের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

> বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
> দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
> হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।

পত্নী দিনময়ী দেবী

> কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
> যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
> সেই জানে কতগুণ ধরে কত মতে
> গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
> দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
> যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে

* 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত'—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৬

উঠিয়া বিপুল পৃথিবীতে আত্মসম্মান অর্জ্জন করিতে হইবে; এই আত্মস্থ হইবার কাজে বিদ্যাসাগরের পুণ্য-স্মৃতিকে কার্য্যকরী করিবার মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই আমরা তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করিতেছি; আশা আছে, একদিন সাময়িক কুয়াসার মলিনতা দূর হইয়া বিরাট গিরিচূড়া বিরাট মূর্ত্তিতেই প্রান্তরকান্তারবিহারী দিক্‌ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইতে সক্ষম হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উইল

নানা কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উইলটির বিশেষ মূল্য আছে; ইহা হইতে তাঁহার চরিত্রের কয়েকটি বিশেষত্ব ধরা পড়ে। বস্তুত ইহা শুধু তাঁহার "লাষ্ট উইল ও টেষ্টামেণ্ট" মাত্র নয়, তাঁহার চরিত্রবল, তেজস্বিতা, ক্ষমাশীলতা ও দাক্ষিণ্যের অকাট্য টেষ্টামেণ্টও বটে। তাঁহার জীবনের সহিত যাঁহারা সামান্যমাত্র পরিচিত আছেন তাঁহারাই জানেন, তিনি কপটতা অর্থাৎ মুখে এক মনে আর সহ্য করিতে পারিতেন না; নিজেও খাঁটি ছিলেন—পরকেও খাঁটি দেখিতে চাহিতেন; এই কারণে তাঁহার জীবনে আত্মীয় ও বন্ধু বিচ্ছেদের ইতিহাস অত্যন্ত করুণ। যে মদনমোহন তর্কালংকার একদিন তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ ছিলেন, তিনিই একদিন তাঁহার কোনও কৃতকর্ম্মের জন্য বিদ্যাসাগরের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় 'নিস্কৃতিলাভ প্রয়াস' পুস্তকে (১২৯৫ সাল) স্বয়ং অনেক দুঃখে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে সংস্কৃত কলেজের চাকুরি দিবার জন্য তিনি বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পায়ে হাঁটিয়া কালনা পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে চাকুরির সুখবর দিয়াছিলেন বহুবিবাহ বিধবা বিবাহ লইয়া তাঁহার সহিত মনান্তরের ইতিহাসও ক্লেশকর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা তাঁহার উইলে দেখিতে পাইতেছি, সেই মদনমোহনের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গেল একদিক। অন্যদিকে দেখিতেছি, তাঁহার প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রের কৃতকর্ম্মের জন্য তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে মনোবৃত্তি লইয়া আপন উইলে পুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীতে খাঁটি ইউরোপীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিতেও আমরা এতখানি তেজস্বিতা ও আত্মনিগ্রহ প্রত্যক্ষ করি না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে কেন দয়ার সাগর বলা হয়, এই উইলের পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার বাল্য-জীবন বাসন মাজিয়া কাটিয়াছে, তিনি সামান্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই অপরের ছেলের বাসন মাজার ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য যৎসামান্য মাসহারার ব্যবস্থা করিতেছেন, আপাত-দৃষ্টিতে হয়ত এই ঘটনার মধ্যে অনেকেই বিরাট কিছু মহৎ কিছু লক্ষ্য করিবেন না। কিন্তু ঋণভারপ্রপীড়িত বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত যাঁহারা একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহা প্রায় দাতাকর্ণের বদান্যতার সমতুল্য এবং বাংলা দেশের পক্ষে ইহা এক বিচিত্র ব্যাপার।

এই উইল হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয় ও আশ্রিতপ্রীতির প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়; সেই দিক দিয়া এই উইল সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার সার্থকতা আছে।

এই উইলের শেষ অংশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় আছে; কতগুলি গ্রন্থ তিনি বাংলায় রচনা করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় কতগুলি গ্রন্থ সম্পাদন ও সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় এই উইলে আছে।

এই উইল তাঁহার কোনও জীবনীতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই। নিম্নে উইলটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলঃ—

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্ব্বতন সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়—এই তিনজনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগপত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন।

৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক।

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে, কার্য্যদর্শীদিগের অবগতি-নিমিত্ত, তৎ সমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগ-পত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫। কার্য্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয় প্রভৃতির ভরণ-পোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে, এই বিনিয়োগপত্রের লিখিত বৃত্তিপ্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

৭। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন, আমি অবিদ্যমান হইলে, তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন, তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম শ্রেণী

পিতৃদেব শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০, পঞ্চাশ টাকা
মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন	৪০, চল্লিশ টাকা
তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪০, চল্লিশ টাকা
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০, ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী	১০ দশ টাকা
মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী	১০ দশ টাকা
কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী	১০ দশ টাকা
বনিতা শ্রীমতী দিনময়ী দেবী	৩০, ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী	১৫, পনর টাকা
মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী	১৫, পনর টাকা
তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী	১৫, পনর টাকা
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরতকুমারী দেবী	১৫, পনর টাকা
পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী	১৫, পনর টাকা
পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী	১৫, পনর টাকা
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৫, পনর টাকা
কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সমাজপতি	১৫, পনর টাকা
দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী	১৫ পনর টাকা
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী এলকেশী দেবী	১০ দশ টাকা
শাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী	১০ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী	১০ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী	১০ দশ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী	৩ তিন টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলদৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতা	৩ তিন টাকা
পিতৃস্বসৃপুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা	৩ তিন টাকা
পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃকন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	৩ তিন টাকা
বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী	৫ পাঁচ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা	৮, আট টাকা
শ্রীযুত মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী	১০ দশ টাকা
শ্রীযুত মধুসূদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী	১০ দশ টাকা
বারাসতনিবাসী শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ মিত্র	৩০ ত্রিশ টাকা
কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাঁহার বনিতা শ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী	১০ দশ টাকা
শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী	২ দুই টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী

মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ দশ টাকা
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী	৫ পাঁচ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী	৫ পাঁচ টাকা
পিতৃস্বসৃকন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী	২ দুই টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ ঘোষাল	৫ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার	৮ আট টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত কালিদাস মুখো	৪ চার টাকা
মাতৃদেবীর পিতৃস্বসৃপুত্র রামেশ্বর মুখোর পরিবার	৫ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী	২ দুই টাকা
বারাসতনিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী	১০, দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী	১০ দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী	৩ তিন টাকা
বর্দ্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী	১০ দশ টাকা

৮। যদি কার্য্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণী-নিবিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে, এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯। আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যমা তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশবর্ষবয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫, পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০। আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে, তাহা হইলে যাবত্ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবত্ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ২০ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবত্ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবত্ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি-ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩। কার্য্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্য্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রত্রয়ের ভরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্ত্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধেয় মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক, তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ঃ—

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয়	১০০, একশত টাকা
ঐ ঐ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিত্সালয়	৫০ পঞ্চাশ টাকা
ঐ ঐ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক	৩০ ত্রিশ টাকা
বিধবাবিবাহ	১০০ একশত টাকা

১৫। যদি শ্রীযুত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্য্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০৲ তিনশত টাকা দিবেন।

১৬। কার্য্যদর্শীরা বিষয়রক্ষা লৌকিকরক্ষা কন্যাদান প্রভৃতির আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিলাম যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খলা না হয়, তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিবেন, তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যদি উত্তরকালে তাহার খর্ব্বতা হয়, তাহা হইলে যাঁহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্ব্বন্ধ করিলাম কার্য্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোনও অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার পুস্তকসকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয়। তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২১। কার্য্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন। মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

২২। নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট দুইজনে তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীরা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগপত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২৪। যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিনিয়োগপত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ধারায় নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।

২৫। আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতুবশতঃ বৃত্তিনির্ব্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগপত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্ব্বিংশ ধারায় লিখিতমত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন ইতি তারিখ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মোং কলিকাতা

ইসাদী

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
শ্রীশ্যামাচরণ দে
শ্রীনীলমাধব সেন
শ্রীযোগেশচন্দ্র দে
শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী
শ্রীকালীচরণ ঘোষ
সর্ব্ব সাকিন কলিকাতা—

চতুর্থ ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি

(ক) সংস্কৃতযন্ত্রের তৃতীয় অংশ

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বাঙ্গালা—

(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ
(২) কথামালা
(৩) বোধোদয়
(৪) চরিতাবলী
(৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ
(৬) বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় ভাগ
(৭) জীবনচরিত
(৮) বেতালপঞ্চবিংশতি
(৯) শকুন্তলা
(১০) সীতার বনবাস
(১১) ভ্রান্তিবিলাস
(১২) মহাভারত
(১৩) সংস্কৃতভাষাপ্রস্তাব,
(১৪) বিধবাবিবাহবিচার
(১৫) বহুবিবাহবিচার

সংস্কৃত—

(১) উপক্রমণিকা
(২) ব্যাকরণকৌমুদী
(৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ
(৪) মেঘদূত
(৫) শকুন্তলা
(৬) উত্তরচরিত

ইংরেজী—

(১) Poetical Selections
(২) Selections from Goldsmith

(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ

(গ) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব
(ঘ) কাদম্বরী, সটীক বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রারী

(চ) কর্ম্মাটাঁড়ের বাঙ্গালা ও বাগান—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

সাল	তারিখ	ঘটনা
১৮২০,	২৬ **সেপ্টেম্বর** (১২ আশ্বিন ১২২৭ মঙ্গলবার)	... বীরসিংহে জন্মগ্রহণ।
১৮২৯,	১ **জুন**	... শিক্ষার্থীরূপে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।
১৮৩৯,	২২ এপ্রিল	... হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষাদান; পরবর্তী ১৬ মে তারিখে প্রশংসাপত্র লাভ।
১৮৪১,	৪ **ডিসেম্বর**	... সংস্কৃত কলেজে বারো বৎসর পাঁচ মাস ব্যাকরণ, ইংরেজী, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়নের পর কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের—দুইখানি প্রশংসাপত্র লাভ।
	২৯ ডিসেম্বর	... মাসিক ৫০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদপ্রাপ্তি।
১৮৪৬,	৬ **এপ্রিল**	... মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর **পদলাভ।**
১৮৪৭		... সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী প্রতিষ্ঠা।
	এপ্রিল	... প্রথম গ্রন্থ—'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ।
	১৬ জুলাই	... তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদ হইতে বিদায় গ্রহণ।
১৮৪৯	১ মার্চ্চ	... পাঁচ হাজার টাকা জামিনে, মাসিক ৮০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওন।
১৮৫০,	আগষ্ট	... মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে **'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'** প্রকাশ।
	৫ ডিসেম্বর	... ৪ ডিসেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যে ইস্তফা দানের পর সংস্কৃত কলেজে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের স্থলে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিয়োগ।
	ডিসেম্বর	... বীটন নারী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক।
১৮৫১,	৬ জানুয়ারি	... সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটরী।
	২২ জানুয়ারি	... ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে নিয়োগ। এই সময় হইতে কলেজে সেক্রেটরীর পদ লুপ্ত হয়।
	৯ জুলাই	... ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তানকে কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
	২৬ জুলাই	... অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্ত্তে কেবল রবিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিবার রীতি প্রচলন।
	ডিসেম্বর	... যে-কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
১৮৫২,	২৮ আগষ্ট	... সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের দুই টাকা দক্ষিণা দিবার রীতি প্রচলন।
১৮৫৩		... বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৫৪,	জানুয়ারি	... বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্য।
	জুন	... সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১৲ বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন।
১৮৫৫,	১ মে	... অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাংলা স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ। বেতন বৃদ্ধি—মাসিক ২০০৲।
	১৭ জুলাই	... বাংলা শিক্ষক গড়িয়া তুলিবার জন্য সংস্কৃত কলেজে প্রাতঃকালে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষকরূপে গ্রহণ।
	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	... নদীয়ায় পাঁচটি আদর্শ (মডেল) বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
	আগষ্ট-অক্টোবর	... বর্দ্ধমানে পাঁচটি আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, নবেম্বর	... হুগলীতে পাঁচটি আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
	অক্টোবর-ডিসেম্বর	মেদিনীপুরে চারিটি আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
	৪ অক্টোবর	... বিধবা-বিবাহ বিধির জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।
	২৭ ডিসেম্বর	... বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।
১৮৫৬,	১৪ জানুয়ারি	... মেদিনীপুরে আর একটি আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন।
	১৬ জুলাই	... বিধবা-বিবাহ বিধি বিধিবন্ধ হয়।
	৭ ডিসেম্বর	... প্রথম বিধবা-বিবাহ। বর—প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র; কন্যা—পলাশডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতী।
১৮৫৭,	নবেম্বর-ডিসেম্বর	... হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্দ্ধমানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৫৮,	জানুয়ারি-মে	... হুগলী জেলায় আরও তেরটি (তন্মধ্যে বীরসিংহে একটি), বর্দ্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে (ভাঙ্গাবন্ধ, বদনগঞ্জ ও শান্তিপুরে) তিনটি, এবং নদীয়ায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।
		... তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক।
	৪ নবেম্বর	... সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ ত্যাগ।

	১৫ নবেম্বর	… 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ।
১৮৫৯,	১ এপ্রিল	… কাঁদী (মুর্শিদাবাদ) ইংরেজী-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।
	২৩ এপ্রিল	… রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটী বাটীতে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন।
১৮৬১,	এপ্রিল	… কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের সেক্রেটরী পদ গ্রহণ।
১৮৬৩,	নবেম্বর	… ওয়ার্ডস ইন্‌ষ্টিটিউশানের পরিদর্শক।
১৮৬৪		… 'কলিকাতা ট্রেণিং স্কুল' নামের পরিবর্ত্তে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশ্যন নামকরণ।
	৪ জুলাই	… বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর নির্ব্বাচিত।
১৮৬৬,	১ ফেব্রুয়ারি	… বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র।
১৮৭০,	জানুয়ারি	… ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের বিজ্ঞান-সভায় সহস্র মুদ্রা দান।
	১১ আগষ্ট	… জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিধবার বিবাহ দান।
১৮৭১,	১২ এপ্রিল	… কাশীতে মাতার মৃত্যু।
১৮৭২,	১৫ জুন	… হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুয়িটী ফণ্ডের ট্রাষ্টি।
১৮৭৩,	নবেম্বর(?)	… মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামপুকুর শাখা স্থাপন।
১৮৭৫,	৩১ মে	… সম্পত্তির উইলকরণ।
১৮৭৬,	২১ ফেব্রুয়ারি	… হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুয়িটী ফণ্ডের ট্রাষ্টি-পদ ত্যাগ।
	১২ এপ্রিল	… পিতা ঠাকুরদাসের কাশীলাভ।
		… কলিকাতা বাদুড়বাগানের বাটী নিৰ্ম্মাণ।
১৮৭৭,	এপ্রিল	… গোপাললাল ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা,—ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫০্।
১৮৮০,	১ জানুয়ারি	… সি.আই.ঈ. উপাধিলাভ।
১৮৮৫	…	… মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বড়বাজার শাখা স্থাপন।
১৮৮৭,	জানুয়ারি	… শঙ্কর ঘোষের লেনে নবনির্ম্মিত বাটীতে মেট্রোপলিটান কলেজের গৃহপ্রবেশ।
		… মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার শাখা স্থাপন।
১৮৮৮,	১৩ আগষ্ট	… পত্নী দীনময়ীর মৃত্যু।
১৮৯০,	১৪ এপ্রিল	… বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৯১,	২৯ জুলাই (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি ২-১৮ মিনিট)	… ৭১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মৃত্যু।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থপঞ্জী

বিদ্যাসাগর যে-সকল গ্রন্থ রচনা বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কেবল সেইগুলিরই একটি তালিকা এখানে দেওয়া হইল। তিনি যে-সকল হিন্দী, সংস্কৃত বা ইংরেজী গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, বাহুল্যভয়ে সেগুলির নাম এই তালিকায় বর্জ্জিত হইল।

রচিত ও সঙ্কলিত

১৮৪৭	বেতাল পঞ্চবিংশতি	… 'বৈতাল পচ্চীসী' নামক হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত।
১৮৪৮	বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ	… মার্শম্যান-রচিত ইংরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনে সঙ্কলিত। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ হইতে বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকাল (১৭৫৬—১৮৩৫ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত ইতিহাস।
১৮৪৯	জীবনচরিত	… চেম্বার্স বায়োগ্রাফী পুস্তকের অনুবাদ।
১৮৫১	বোধোদয় (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)	… নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।
১৮৫১	সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা	
১৮৫১	ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ	… পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান।
১৮৫১	ঋজুপাঠ, ৩য় ভাগ	… হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার হইতে সংগৃহীত।
১৮৫২	ঋজুপাঠ, ২য় ভাগ	… রামায়ণ হইতে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্কলিত।
১৮৫৩	সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব	
১৮৫৩	ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ	
১৮৫৩	ব্যাকরণ কৌমুদী, ২য় ভাগ	
১৮৫৪	ব্যাকরণ কৌমুদী, ৩য় ভাগ	
১৮৫৪	শকুন্তলা	… কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের উপাখ্যানভাগ।
১৮৫৫	বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	বিধবা-বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
১৮৫৫	বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ	
১৮৫৫	বর্ণপরিচয়, ২য় ভাগ	
১৮৫৫	বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক। *	বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদকারীদের প্রতি উত্তর।
১৮৫৬	কথামালা	… Aesop's Fables পুস্তকের অংশ-বিশেষের অনুবাদ।
১৮৫৬	চরিতাবলী	… ডুবাল, রস্কো প্রভৃতি স্বনামধন্য লোকের চরিতকথা।
১৮৬০	মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)	

* ১৮৫৬ সনে বিদ্যাসাগর তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ "Marriage of Hindu Widows" নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক মরাঠীতেও অনূদিত হয়।

১৮৬০	সীতার বনবাস	
১৮৬২	ব্যাকরণ কৌমুদী, ৪র্থ ভাগ	
১৮৬৩	আখ্যানমঞ্জরী ...	ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত।
১৮৬৪	শব্দমঞ্জরী ...	বাংলা অভিধান।
১৮৬৮	আখ্যানমঞ্জরী, ১ম ভাগ *	
১৮৬৮	আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ †	
১৮৬৯	ভ্রান্তিবিলাস ...	শেক্সপীয়রের Comedy of Errors-এর উপাখ্যান-ভাগ।
১৮৭১	বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার।	বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
১৮৭৩	বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক	বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মত খণ্ডন।
১৮৮৮	নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস ...	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার শ্বশুর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচিত শিশুশিক্ষা, ১ম—৩য় ভাগের অধিকার লইয়া বিদ্যাসাগরের উপর দোষারোপ করিলে এই পুস্তকখানি রচিত হয়।
১৮৮৯	সংস্কৃত-রচনা ...	বাল্যকালের সংস্কৃত-রচনা।
১৮৯০	শ্লোকমঞ্জরী ...	উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ।
১৮৯১	বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত) ...	এই আত্মচরিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়।
১৮৯২	ভূগোলখগোলবর্ণনম্ ...	"পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক।"

* ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে (১৮৬৩ খ্রীঃ) প্রকাশিত 'আখ্যানমঞ্জরী'র মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া এবং কতকগুলি নূতন আখ্যান দিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ' এবং প্রথম বারের বাকী আখ্যানগুলির সহিত সাতটি নূতন আখ্যান যোগ করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ' একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

† ১৮৮৮ সনে 'আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশঃ—"আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

বেনামী রচনা

১৮৭৩	অতি অল্প হইল। ... কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।	বহুবিবাহের সপক্ষে তারানাথ তর্কবাচস্পতি যাহা লেখেন, তাহার প্রত্যুত্তর।
১৮৭৩	আবার অতি অল্প হইল। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।	ঐ
১৮৮৪	ব্রজবিলাস ... যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য। কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোস্য প্রণীত।	নবদ্বীপের স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, যশোহর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার ৪র্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহার উত্তর।
১৮৮৪	বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা। কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ।	১৮৮৭ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ হইয়াছে 'বিনয় পত্রিকা'।
১৮৮৬	রত্নপরীক্ষা ... অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, এই তিন পণ্ডিতরত্নের প্রকৃত পরিচয় প্রদান। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য প্রণীত।	বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনকারীদের সমালোচনা।

শ্মশানে বিদ্যাসাগর

চলতি ভারত

মাদ্রাজ

নারী ও নব-সমাজ

ডাঃ মন্টেসরি সম্প্রতি মাদ্রাজের এক মহিলা সম্মেলনে বলেছেন, আজকের দিনে সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে মুক্ত নারীর এবং মুক্ত শিশুর। মানবসমাজকে নীতির দিক দিয়ে উন্নত করতে হ'লে চাই নারীর মহৎ গুণাবলী। তার জন্য চাই মুক্ত নারীর আবির্ভাব। নারী বন্ধনমুক্ত না হ'লে শিশুর মুক্তি নেই। ডাক্তার মন্টেসরি গান্ধীজীর মতোই বিশ্বাস করেন বিদ্বেষের বিষবাষ্পে কলুষিত মৃতপ্রায় মানবসমাজ নবজীবনের মধ্যে রূপান্তরিত হবার জন্য অপেক্ষা করছে প্রেমের পরশমণির স্পর্শের। এই প্রেম এবং করুণাই নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ধৈর্য্য তার স্বভাবের অঙ্গ। জীবনকে সে সৃষ্টি করে আপনার ভিতর থেকে—তাই জীবনের সে পূজারিণী—হত্যায় তার অপরিসীম বিতৃষ্ণা। হৃদয়-চর্চ্চায় পুরুষ উদাসীন—বাহিরকে জয় করার কাজে সে সতত ব্যস্ত। ক্ষমতাপ্রিয়তা তার মধ্যে অতিশয় উগ্র। তাই পুরুষের তৈরী এই সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গে নিষ্ঠুরতার ছাপ। বিশ্বব্যাপী এই কুরুক্ষেত্র তারই সৃষ্টি। বোমা আর কামান বানিয়ে সহরের পর সহরকে নিশ্চিহ্ন করায় তার পৈশাচিক উল্লাস—মানুষের জীবনের চেয়ে কাঞ্চনকে অধিকতর মূল্য দিতে গিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে আনন্দ থেকে করেছে বঞ্চিত—জেলখানা বানিয়ে মানুষের প্রাণকে ক'রে দিচ্ছে পঙ্গু। এই সভ্যতার রূপান্তর সম্ভব যদি নারী আসে তার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গিনী হ'য়ে বিরোধের কোলাহলের মধ্যে আনে মিলনের বাণী। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীর আবির্ভাব শিশুর জীবনে আনবে মুক্তির আনন্দ আর এই মুক্তির আনন্দের মধ্য দিয়ে সে সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করবে।

যুক্তপ্রদেশ

মোমিন সম্প্রদায় ও লীগ

নিখিল ভারত মোমিন সম্মেলনের পক্ষ থেকে একদল প্রতিনিধি আনন্দভবনে পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানিয়েছেন যে, ভারতের নয় কোটি মুসলমানের মধ্যে মোমিনদের সংখ্যা প্রায় আধাআধি। পণ্ডিতজীর কাছে তাঁদের অভিযোগ জানিয়ে তাঁরা বলেন,—সমাজে তাঁরা দরিদ্র এবং সেই কারণে নিপীড়িত। 'শরীফ' ব'লে মুসলমানদের যে উচ্চতর সম্প্রদায় রয়েছে তারা নিজেদেরই সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত—মোমিন সম্প্রদায় তাদের হাতে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রমাত্র। প্রতিনিধির দল আরও বলেন যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ব'লে যে দাবী জানাচ্ছেন তার কোন ভিত্তি নেই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'—এই প্রবাদবাক্যকে সফল ক'রে জিন্না সাহেব মোড়লত্বের যে অধিকার দাবী করছেন—তার মধ্যে রয়েছে অহমিকারই উৎকট প্রকাশ। অথচ মুসলীম লীগকেই আমাদের কর্ত্তারা সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ব'লে ধ'রে নিয়েছেন এবং বলছেন,—মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেস একযোগে দাবী যতক্ষণ না জানাচ্ছেন ততক্ষণ কংগ্রেসের দাবী কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। জনাব জিন্নার আচরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের মিলনের আশা সুদূরপরাহত। এক গৃহস্থ তার প্রতিবেশীর বাড়ীতে মই চাইতে গিয়েছিল। প্রতিবেশীর মই দেবার ইচ্ছা না থাকায় ব'ললে—'মইখানা বাক্সে তোলা আছে।' আমাদের কর্ত্তারা কংগ্রেসের দাবীর উত্তরে যা বল্‌লে—তার সঙ্গে 'বাক্সের মধ্যে মই তোলা আছে' এই কথাটার মিল আছে। স্বাধীনতা আমরা দেবো না—এই কথাটা সোজাসুজি না ব'লে বলা হ'ল—লীগ আর কংগ্রেসের সম্মিলিত দাবী ছাড়া আর কোন দাবী গৃহীত হবে না। সাত মন তেলও পুড়বে না—রাধাও নাচবে না। লীগ তো গবর্ণমেন্টেরই ছায়া। এমতাবস্থায় লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষ করবার চেষ্টা—বালিতে হলকর্ষণের মতোই নিরর্থক। কোন পরাধীন দেশেই স্বাধীনতা উদারহস্তের দান হিসাবে আসেনি। অনিচ্ছুক হস্ত থেকে তাকে অর্জ্জন করতে হয়েছে অসীম দুঃখকে বরণ ক'রে। সেই দুঃখ বরণের জন্য দেশ যেদিন প্রস্তুত হবে সেইদিন স্বাধীনতা আসবে—তর্কবিতর্কের পথে আবির্ভাব অসম্ভব।

পৌর-কল্যাণের আদর্শ

শ্রীযুক্ত সন্মুখম্ চেট্টী এনাকুলম্ মিউনিসিপ্যালিটির নতুন-তৈরী বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে নাগরিকদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে খুব মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর অভিভাষণে বলা হয়েছে, "নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে কেবল বাড়ীটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা নয়, সমগ্র শহরটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও দৃষ্টি রাখা। সারা শহরটিকে মনে করতে হবে নিজের বাড়ীর মতো। স্বাস্থ্য, আনন্দ, নিরাপত্তা—এ-সব যদি কাম্য হয়, তবে দু'একটি বাড়ীকে আবর্জ্জনা-মুক্ত করলে চলবে না—সমগ্র নগরের পথ, ঘাট, রাস্তা আবর্জ্জনা-মুক্ত রাখতে হবে।" ভেবে দেখবার কথা। চেতনাকে আমরা যদি ঘরের বাইরে সমস্ত শহরটার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারতাম, তবে আমরা ঘরটাকে পরিষ্কার রাখবার জন্য যেমন সতত যত্নবান থাকি—শহরটাকেও পরিষ্কার রাখবার জন্যও তেমনি সতত যত্নবান থাকতাম। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র সকলের সঙ্গে ঐক্যের অনুভূতিকে ধর্ম্মের সার ব'লে ঘোষণা করলেও আমরা আচরণে প্রতিবেশীর আনন্দকে গণনার মধ্যেই আনিনে। সেইজন্য রাস্তায় ঘরের আবর্জ্জনা ফেলতে আমাদের কোনো কুণ্ঠা নেই, ফুটপাথে, ট্রামে কমলালেবুর খোসা, সিগারেটের খালি বাক্স, ছেঁড়া কাগজ ফেলতে আমরা একটুও সঙ্কোচ অনুভব করি নে—রেলগাড়ীর বেঞ্চির উপর দিয়ে জুতা পায়ে

(শেষাংশ ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহারাষ্ট্রদেশের যাত্রী

[ভ্রমণ-কাহিনী]

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা পুণা থাকেন। তাঁহারা আমাকে সেখানে বেড়াইতে যাইবার জন্য বহুবার অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছেন, কিন্তু কোনবারই তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তাঁহারা যখন রেঙ্গুন ছিলেন এবং করাচি ছিলেন, তখনও কতবার আমার কন্যা আমাকে সেই সব যায়গায় যাইবার জন্য পত্র দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই—এইবার কেমন মনে করিলাম—না একবার শিবাজীর দেশে যাইব।

আমাদের দেশে যদি কাহারও কোনও দুঃখের জীবন থাকে, তবে তাহা হইতেছে সাহিত্যিকদের জীবন। প্রথমত প্রকাশকদের নির্যাতন, দ্বিতীয়ত ছাপাখানার পীড়ন তারপর সাধারণের তীব্র মতামত! আবার যাহারা সাংবাদিক বা মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের ত মাথার উপরে বিরাট বোঝা! আমার ইহার কোনটিরই অভাব ছিল না! সংসার, মাসিক কাগজ, 'শিশু-ভারতী' তারপর 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রকাশের জন্য কঠিন পরিশ্রম। এ সব কিছুই মাথার উপরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছিল। তবুও পণ করিলাম—এবার যাইতেই হইবে।

আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা সেন এম-এ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র বধূ—সে এইবার বাঙলাভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছে, তাহার শরীরটাও তেমন ভাল ছিল না, তাহাকে বলিলাম, তাহার কি সম্ভব হইবে আমার সঙ্গে যাইতে, সে বলিল যদি শ্বশুর মহাশয় অনুমতি দেন, তবেই যাইতে পারি, কিন্তু সে অনুমতি লইবার ভার তোমার উপরে রহিল।

২২শে অক্টোবর আমি আমার বৈবাহিক ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যাইয়া কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলাম। দীনেশবাবু তখন 'বাঙালার পুরনারীর' প্রুফ দেখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন—"আপনার সঙ্গে যাইবে, তা বেশ, তবে বেশী দেরী যেন না হয়। আমি ত যতবার সঙ্গে ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া গিয়াছি, ততবারই একটা না একটা বিপদ ঘটিয়াছে!" আমি বলিলাম সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন! কিন্তু হায়! কে তখন ভাবিতে পারিয়াছিল, কর্মবীর দীনেশচন্দ্রের সহিত, এই আমার শেষ কথা! আর তাঁহাকে আসিয়া সুস্থ দেখিব না, এমন কথা তখন ভাবিতেও পারি নাই, ভাবিতে পারি নাই যে মৃত্যু তাঁহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ জীবনে কতজনের সহিত পরিচিত হইয়াছি, কতজনের সঙ্গে মিশিয়াছি, কিন্তু এমন আপনভোলা, সাহিত্যসেবী সরস্বতীর চরণতলে ভক্তিপ্রণত মস্তকে নিত্য সেবকরূপে দণ্ডায়মান থাকিতে বড় দেখা যায় নাই। কত বেদনা—কত আঘাত—কত নির্মম সমালোচনা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, তবু তিনি একদিনের জন্যও আপনার কর্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই।

বাঙলাদেশ একদিন বুঝিতে পারিবে কি রত্ন আজ সে হারাইল!

২৩শে অক্টোবর সোমবার আমরা রওয়ানা হইলাম। দীনেশচন্দ্র তাঁহার পুত্র সহ পুত্রবধূকে ও আমার নাতিনী শিপ্রাকে গাড়ীতে করিয়া আনিয়া আমার বাসায় পৌছাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে নামিতে বলিলাম, তিনি আর নামিলেন না! প্রণাম করিলাম—এই জীবনে শেষ প্রণাম! চলিয়া যাইবার সময়েও একবার আমার কন্যা ও দৌহিত্রীর দিকে তাঁহার দুইটি স্নেহপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন,—তারপর তাঁহার সেই ঘোড়ার গাড়ীটিতে করিয়া পুত্র শ্রীমান্ অরুণের বাসার দিকে চলিয়া গেলেন।

আমরা রওয়ানা হইলাম। ৭-৩৪ মিনিটে বেঙ্গল নাগপুরের বোম্বে মেইলে রওয়ানা হইলাম আমি আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশু আমার দুই কন্যা ও দৌহিত্রী শিপ্রা ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠ জামাতার পিতা রঙপুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ উকিল। গাড়ীতে বেশ যায়গা ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে এত বড় ফাঁকা পাওয়া আশ্চর্যই বলিতে হইবে। আমরা তিনটি বেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা পাতিয়া লইলাম। আমার জামাতা শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্র দীনেশবাবুর পঞ্চম পুত্র আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমি পূর্বে বেঙ্গল নাগপুরের পথে বোম্বে যাই নাই। আমার বয়স যখন আঠারো উনিশ বৎসর তখন কয়েক মাসের জন্য চক্রধরপুর হইতে পুস্পুসে করিয়া চাঁইবাসা গিয়াছিলাম। আর এদিকে আসি নাই। চক্রধরপুর পর্যন্ত পথের কথা বেশ আমার মনে ছিল।

বেঙ্গল নাগপুরের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলির বন্দোবস্ত একেবারেই ভাল নহে। অপ্রশস্ত বেঞ্চ তারপর পাইখানার ব্যবস্থাও অতি বিশ্রী—অপরিচ্ছন্নতাই হইতেছে প্রধান অঙ্গ। তৃতীয় শ্রেণীর জি আই পির গাড়ীতে স্নানের ব্যবস্থাও আছে। আর একটা কথা এই রেলওয়ে কোম্পানী আজকাল জাঁক করিয়া যেমন বিজ্ঞাপন দেন—যাত্রীদের মনে ভ্রমণস্পৃহা জাগরিত করিবার জন্য, সেই পরিমাণে যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি ইঁহারা দৃষ্টি মোটেই করেন না। আমাদের দুই একজন বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোকও বেঙ্গল নাগপুর রেলের Advisory Committeeতে আছেন, যেমন Mr. B. R. Sen, I. C. S. মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আমাদের বন্ধু ডক্টর N. Sanyal প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহারা যদি কখনও বেঙ্গল নাগপুরের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী গাড়ীগুলিতে ভ্রমণ করিবার সুখভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে গাড়ীগুলির অবস্থা কিরূপ। বোম্বে মেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর বিশেষ উন্নতি করা দরকার, কেন না দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল যেখানে যাত্রীদের থাকিতে হয়, সেখানে লোকের পক্ষে একটু আরাম চাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অথচ ঝরঝরে কতকগুলি পুরান নোংরা গাড়ীর পরিবর্তে তাঁহারা অতি সহজেই চওড়া বেঞ্চের গাড়ী, স্নানের ঘর, এবং পাইখানার ঘরের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় তেমন অসম্ভব ব্যাপারও নহে। আর প্রত্যেক বড় ষ্টেশনে গাড়ীগুলি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া দেওয়া কর্তব্য। গাড়ীর যাত্রীরা নিজেদের অভ্যাসবশত প্রায়ই গাড়ীতে খাদ্য-দ্রব্যাদির খোসা ইত্যাদি ফেলিয়া থাকেন। এজন্য গাড়ীর মধ্যে একটি বা দুইটি আবর্জনা ফেলিবার যায়গা করা দরকার, যাহাতে গাড়ীর মধ্যে আবর্জনা ইত্যাদি সঞ্চিত না হইয়া অনায়াসে ছিদ্র পথে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তারপর রেলের কর্মচারীরা বিনা টিকেটের রোগগ্রস্ত যাত্রীদিগকে ও মুসাফেরদিগকে কেমন করিয়া দীর্ঘ পথ যাত্রার সুযোগ করিয়া দেন তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের গাড়ীতে খড়্গপুর হইতে এইরূপ দুই তিনটি বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তি উঠিয়াছিল, তাহাদের গাত্রের দুর্গন্ধ ও মলিন বস্ত্রের হাওয়া ও ন্যাক্কারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। খড়্গপুর ষ্টেশনে টিকেট দেখা হইল, অথচ ইহার কোনও প্রতিকার কেহ করিলেন না! আমার জারশুগুদা (Jarsuguda) ষ্টেশনে নানারূপ চেষ্টা করিয়া ইহাদিগকে নামাইবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। রেল কর্তৃপক্ষ কেবল টাকা লইবেন ও যাত্রীদের প্রতি চোখ রাঙাইবেন, কোনরূপ সুব্যবস্থা করিবেন না, এইরূপ অন্যায় আচরণ কি বরাবরই নিরীহ যাত্রীরা সহ্য করিবে? অথচ দেখিতে পাইলাম যে যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। আমার মনে হয় মিঃ বি আর সেন, ডক্টর সান্যাল মহাশয়ের

ন্যায় কৃতী ব্যক্তিদের যেমন Advisory Board-এ লওয়া হইয়াছে, তেমনি এমন একজন লোককে Advisory Committeeতে নেওয়া উচিত যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন এবং যাত্রীদের দুঃখ-দুর্দশার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত আছেন। দীর্ঘ যাত্রাপথে যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সামান্যভাবে লক্ষ্য করিলেও রেল কর্তৃপক্ষ কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিবেন। আমি এ বিষয়ে রেলের সুযোগ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

রায়গড় ষ্টেশনে ভোর হইয়াছিল। এই ষ্টেশনে চা, দুধ প্রভৃতি পাওয়া যায়। প্লাটফরমে নামিয়া আমাদের সকলের জন্য দুধ কিনিতেছি, এইরূপ সময় একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর জানালা পথ দিয়া দেখিলাম একখানি পরিচিত মুখ। আমাদের বন্ধু "রবিবাসরের" সভ্য ও সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ অজন্তা ও বোম্বে ভ্রমণে চলিয়াছেন। আমাদের উভয়ের মনেই বেশ আনন্দ হইল। জ্যোতিষবাবু বলিলেন যে, তিনি জলগাঁও হইয়া অজন্তা দেখিয়া পরে বোম্বে যাইবেন। আমাদিগকেও সঙ্গী হইতে বলিলেন, কিন্তু আমাদের সহিত শিশু, বৃদ্ধ, সবই ছিল, কাজেই আমরা শেষ রাত্রিতে জলগাঁও ষ্টেশনে (Jalgaon) নামিয়া যাইতে চাহিলাম না। জ্যোতিষবাবু জলগাঁও শেষ রাত্রিতে নামিয়া গেলেন। আমরা পুণা হইতে মনমদের পথে ঔরঙ্গাবাদ হইয়া এলোরা ও অজন্তা দেখিতে যাইব বলিলাম। জ্যোতিষবাবুও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বোম্বে মেল অতি দ্রুত চলিতেছে, তবু মনে হইতেছিল বুঝি এই দীর্ঘ পথ আর ফুরাইবে না।

রেল পথের দুই পাশে দূরে নীল মেঘের মত পর্বত শ্রেণী সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। আর মাঠের পর মাঠ—বন-জঙ্গল। আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষ পরিবর্তন অনুভব করিলাম—ডোনগরগড় (Dongurgarh) আসিয়া। ডোনগরগড় হাওড়া হইতে ৫৭৭ মাইল দূরবর্তী। এইখানে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনও শেষ করিলাম। পথে হিন্দু খাবারওয়ালারা ৷৷০ আনা করিয়া নেয় এবং ভাজি, ডাল, ভাত, চাপাটি, শাক (আট আলু ইত্যাদির দ্বারা তৈরী ব্যঞ্জন) ঘৃত, পাঁপড়, টক্ ও দধি দেয়। চাউল বেশ ভাল দেয়, সেজন্য ভাতও বেশ ভাল হয়, কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যাদি বাঙালীর তেমন মুখরোচক নহে। আমার ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া রসনার এমন একটা অভ্যাস হইয়াছে যে, যে দেশের যে কোনরূপ খাদ্যই হউক না কেন গ্রহণ করিতে কোনরূপ অতৃপ্তি হয় না। কিন্তু আমার পুত্র ও কন্যারা তেমনভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

ডোনগরগড় হইতে ঘাট পর্বত শ্রেণীর দৃশ্য অতি মনোরম। শ্যামল বিস্তৃত বন্ধুর প্রান্তরের বুক দিয়া আঁকা-বাঁকা পথ চলিয়া গিয়াছে। আর তারি শেষ প্রান্তে নীল গিরিশ্রেণী কত না স্বপ্নের ছবি বুকে করিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইবার ডোনগরগড় ও স্যালিকাসা (Salekasa) নামক স্থানের মধ্যবর্তী ঘাট পর্বতশ্রেণীর বুকের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। দুই পাশে গভীর অরণ্যাণী। তরুর পর তরুশ্রেণী শাখা-প্রশাখায় পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া দূর দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। কোথাও দেখিলাম দূর পর্বতের বুক হইতে অজস্র ধারায় পর্বতের বুক হইতে বারিধারা ঝর্ ঝর্ শব্দে নামিয়া আসিতেছে—সত্য সত্যই যেন আনন্দময়ের আনন্দ ধারা এই প্রপাতের প্রত্যেকটি বারি বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিতেছে। ঘাটের মধ্যবর্তী এই দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। ডোনগরগড় হইতে স্যালিকাসার দূরত্ব ২২ বাইশ মাইল। এই বাইশ মাইল পথ যাত্রীদের নিকট পরম রমনীয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

২৪শে অক্টোবর বেলা শেষে আমরা নাগপুর পৌঁছিলাম। নাগপুর বড় ষ্টেশন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যে নাগপুরী কমলার এত নাম, সেই কমলার দাম এখানে খুবই বেশী—প্রত্যেকটি ৫১০ দু' পয়সা। জোড়া /০ আনা, কিন্তু নাগপুরের অগ্রবর্তী ষ্টেশনগুলিতে দাম অনেক কম /০ আনায় চারিটি কমলা মিলে।

আমরা সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ধা আসিলাম। ওয়ার্ধা হইতে কয়েক মাইল দূরে আজকাল মহাত্মা গান্ধী বাস করেন। আমরা যখন ওয়ার্ধা আসিলাম, তখন বহু কংগ্রেসের কর্মীকে দেখিলাম, তাঁহারা Working Committeeর কার্য শেষে যার যার বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁহারা কেহ হিন্দীতে, কেহ বা মহারাষ্ট্র ভাষায়, কেহ বা ইংরেজীতে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন। দুই একজন মাত্র পুণা-যাত্রী ছিলেন, আর সকলেই নিকটবর্তী ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার—সম্ভ্রমের সহিত কথাবার্তা এবং আমার দৌহিত্রীটিকে আদর করা এবং বাঙলাদেশের নানা গল্প শুনিয়া এবং তাঁহাদের দেশের নানা কথা বলিয়া আমাদের যাত্রাটিকে বড়ই প্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

২৫শে অক্টোবর বুধবার। আজ সকালে ৭-৩০ মিনিটের সময় কল্যাণ আসিলাম। ইগাৎপুরী ষ্টেশনে (Igutpuri) ষ্টেশন হইতে আমাদের গাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্ এঞ্জিন জুড়িয়া দিল। ইগাৎপুরীর দৃশ্য অতি মনোরম। থুলঘাট পর্বত (Thullghat) শ্রেণীর উপর ইগাৎপুরী অবস্থিত। সমুদ্রতটরেখা হইতে ইগাৎপুরীর উচ্চতা দুই হাজার ফুট। এখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস (Sanitorium) রহিয়াছে। চারিদিকে বন-জঙ্গল ও পর্বতশ্রেণী এখানকার শোভা বর্ধন করিতেছে। ইগাৎপুরীতে একটি সুন্দরহ্রদ আছে। ইগাৎপুরীর লোকেরা ঐ হ্রদের জল পান করে।

ইলেক্‌ট্রিক্ এঞ্জিন এই প্রথম দেখিলাম। ছবিতে ত অনেকই দেখিয়াছি। ছবির দেখায় আর চোখের দেখায় অনেক প্রভেদ। গাড়ী অতি বেগে চলিল। ইগাৎপুরী হইতে কল্যাণ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয়। পর্বতশ্রেণীর বনের শ্যামল প্রান্তরভূমির শস্যক্ষেত্রের—অনির্বচনীয় সবুজ শোভা চিত্তকে মুগ্ধ করে। কল্যাণে আসিয়া আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইল। কল্যাণ বেশ বড় ষ্টেশন। এক সময়ে কল্যাণ বেশ বড় বন্দর ছিল। বেশ বড় জংশন ষ্টেশন। আমরা এখানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবার পর বোম্বে হইতে পুণা-যাত্রী গাড়ী পাইলাম। এ লাইনে করিডার বা মধ্য পথযুক্ত গাড়ী দেখিলাম। এই গাড়ীর প্রধান সুবিধা এই যে গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় না।

কল্যাণ হইতে পুণার পথ অতি মনোরম। টানেলের পর টানেল বা সুরঙ্গ পথ দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। দুই দিকে পর্বতশ্রেণী। লোনাবলা (Lonavla) ষ্টেশনটি অতি সুন্দর। ভোরঘাট পর্বতের কয়েকটি সমতল শৃঙ্গের উপর স্থানটি অবস্থিত। কার্লা গিরি মন্দির বা কার্লা গুম্ফা (Karla Caves) দর্শনেচ্ছু যাত্রিগণ অনেকে এখান হইতে কার্লা দেখিতে যান। লোনাবলা ষ্টেশন হইতে দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল। ট্যাক্সি ও অন্যান্য যান-বাহন পাওয়া যায়। কার্লার কথা পরে বলিব।

লোনাবলো ষ্টেশন ছাড়িবার পরে বাঁ দিকের গিরি গাত্রে কার্লার গিরি মন্দিরগুলি দেখিলাম। গাড়ী হইতেই লোহার গড় দুর্গ দেখা গেল। পেশোয়াদের রাজত্বকালে এইখানে রাজবন্দীদিগকে রাখা হইত। এইভাবে পথে শিবাজীর নির্মিত আরও কয়েকটি গিরি দুর্গ চোখে পড়িতেছিল। বিখ্যাত দুর্গ সিংহগড় দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম। এই বিখ্যাত দুর্গ সম্বন্ধে কত কথাই না ইতিহাসে পড়িয়াছি। বেলা ১২টার সময় পুণা আসিয়া পৌঁছিলাম।

(ক্রমশ)

আজ-কাল

জনাব জিন্না সাহেব

কিছুদিন আগে গান্ধীজী যখন বলেছিলেন, মুসলিম লীগের সংগে আপোষ না হলে গণ-আন্দোলন আরম্ভ করা চলবে না তখন আমরা বিশেষ ভরসা পাইনি; কারণ জনাব জিন্না সাহেবের কেরামতি এখনো শেষ হয় নি বলেই আমাদের মনে হয়েছিল। কার্য্যত তাই-ই প্রমাণিত হল। গত ৬ই ডিসেম্বর জনাব জিন্না সাহেব 'মুসলিম ভারত'কে এক ফতোয়া দিয়েছেন; আটটা প্রদেশে কংগ্রেস শাসনের অবসান হওয়ায় ইসলামের মহাশত্রু নিপাত হল বলে খোদাতালার কাছে মুসলমানদের কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন এবং ২২শে ডিসেম্বর এই মুসলিম 'মুক্তি দিবস' পালন করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সেদিন সভায় কি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে তা তিনি খসড়া করে দিয়েছেন; তার মূল সুর হচ্ছে এই যে, হিন্দু-কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টগুলোর একমাত্র কাজ ছিল মুসলমান পীড়ন ও ইসলাম ধ্বংস; এখন মুসলমানরা পরম করুণাময়ের রাজত্বে সুখে বাস ক'রতে পারবে।

নেতা দূরে থাক কোনো সাধারণ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক একটা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ রকম বে-পরোয়া অভিযোগ করতে পারেন বলে' এর আগে কারো ধারণা ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক, এমন কি মুসলিম লীগেরই কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য জনাব সাহেবের এই কুৎসিৎ মনোবিকারের প্রতিবাদ করেছেন। গান্ধীজী, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই ও শ্রীযুক্ত রাজগোপাল জিন্নার উক্তির কড়া জবাব দিয়েছেন।

গান্ধীজী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে ভগবানের সামনে অপ্রমাণিত অভিযোগ, যা কংগ্রেসী মন্ত্রিমন্ডলী অনুসন্ধানে ভিত্তিহীন বলে' জেনেছেন, আবৃত্তি করতে বলা হয়েছে। যে সময়ে জওহরলাল জিন্না সাহেবের সংগে আপোষ-আলোচনা চালাতে যাচ্ছেন সেই সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্বেষ পোষণ করতে জিন্না সাহেব নির্দ্দেশ দিয়েছেন। গান্ধীজী মুসলমানদের এই অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন।

ভারত রক্ষা আইন বোধ হয় মুসলিম লীগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আমরা জিন্না-জওহর বৈঠক সম্বন্ধে কৌতূহল বোধ করছি।

বাঙলার হালচাল

গত ৫ই ডিসেম্বর বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করে দেন যে, তাঁদের শাসনকালে প্রেস ও সংবাদপত্রের কাছ থেকে মোট ৪৭০৫০ টাকা জামানত দাবী করা হয়েছে। এই সব প্রেস ও সংবাদপত্রের সংখ্যা হচ্ছে ৩৭; তার মধ্যে ৩১টা হিন্দুদের। ১৪টি প্রেস ও সংবাদপত্র জামানত দিতে সমর্থ হয়; বাকী ২৩টি দিতে পারে নি। ১০ জন সম্পাদক ও কীপারের নামে মামলা করা হয়। এঁদের মধ্যে ৭ জন হিন্দু। ৮৯ জন সম্পাদক ও কীপারকে সাবধান করে দেওয়া হয়; এর মধ্যে ৬৩ জন হিন্দু।

বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে গোয়েন্দা পুলিস গত ২৭শে নবেম্বর বিনা ওয়ারেণ্টে রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। ৫ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীকে আদালতে হাজির করা হ'লে তিনি গোয়েন্দা পুলিসের বিরুদ্ধে মারপিট ও নির্য্যাতনের অভিযোগ করেন। ১১ই তারিখে তাঁর অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দল এক মুলতুবী প্রস্তাব আনতে চান। স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট নৃপেনবাবুর শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখেন নি; অভিযোগকারী ইচ্ছে করলে মামলা করতে পারেন। সুতরাং মুলতুবী প্রস্তাবের কোনো যৌক্তিকতা নেই। স্পীকার প্রস্তাবটি আর উত্থাপন করতে দেন নি।

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটা প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্ত চাওয়া হয়েছিল; কিন্তু গুপ্তচরদের আচরণ গুপ্ত রাখাই গবর্ণমেণ্ট সম্ভবত সমীচীন মনে করেন।

বাঙলায় স্বায়ত্ত শাসনের ফলভোগ অস্বীকার করা যায় না।

দোকানপাট লুট

যুদ্ধের ফলে এদেশে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে। ভারতীয় জনসাধারণের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় এ মূল্যবৃদ্ধি আরো দুঃসহ। ইতিমধ্যেই এর প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কলকাতার উপকণ্ঠ কাশীপুরে, জব্বলপুরে, লক্ষ্মৌতে ও আগ্রাতে দোকান-পাট লুঠ হয়েছে। আরো কয়েকটা জায়গায় লুঠতরাজের উপক্রম হয়েছে। যেখানে ক্রেতাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে সেখানে গবর্ণমেণ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছেন। কোথাও কোথাও গবর্ণমেণ্ট জিনিষপত্রের দর বেঁধে দিচ্ছেন বা মূল্যের সমতার জন্যে অন্য রকম ব্যবস্থা করছেন।

মূল গলদ যে কোথায় জনসাধারণ তা বোঝে না, তাদের আক্রোশ গিয়ে পড়ে প্রত্যক্ষ যার সংগে সম্পর্ক সেই দোকানদারের উপরে। টাকাপয়সা দেওয়ার মালিক যাঁরা তাঁরা যদি হতভাগাদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করেন তাহলে আপাতত খানিকটা প্রতিকার হতে পারে।

ইউরোপের আবর্ত্ত

ধনতান্ত্রিক বিক্ষোভ!

সোভিয়েটের ফিনল্যাণ্ডে অভিযান এ সপ্তাহেও আন্তর্জ্জাতিক আসর মাৎ করে' রেখেছে। এ নিয়ে সরকারীভাবে যে রকম হল্লা হচ্ছে তা কৌতুকপ্রদ। নানা দেশের গবর্ণমেণ্ট 'সভ্যতা' রক্ষার জন্যে হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যে ব্যস্ততা আবিসিনিয়া, চীন, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া বা পোল্যাণ্ডের বেলায় দেখা যায় নি। চিলি এ কথাটা খুলেই বলে' দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, পেরু ও প্যারাগুয়ে সোভিয়েটের কার্য্যের যুক্ত প্রতিবাদ জানাবার জন্যে চিলিকে আমন্ত্রণ করেছিল; কিন্তু চিলি জানিয়ে দিয়েছে যে, আগে কারো বেলায় যখন প্রতিবাদ করা হয়নি তখন এত বিলম্বে এ রকম প্রতিবাদ জানাবার কারণ নেই।

তাহলে কি আমরা বুঝবে সভ্যতা মানে ধনতন্ত্র?

হেলসিঙ্কি গবর্ণমেণ্টের আবেদনে রাষ্ট্রসংঘের এক বিশেষ অধিবেশন হচ্ছে। সোভিয়েট এই কারণ দেখিয়ে এ বৈঠকে যোগদান করেনি যে, ফিনল্যাণ্ডের সংগে তার যুদ্ধ নেই; তেরিজোকিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন ফিনিশ গবর্ণমেণ্টের সংগে তার চুক্তি হয়ে গেছে। ১১ই ডিসেম্বরের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েটকে যুদ্ধ থামাবার অনুরোধ জানিয়ে এক তার করেছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সোভিয়েট কোনো উত্তর না দিলে রাষ্ট্রসংঘ যা হয় একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। সোভিয়েট এখনো উত্তর দেয় নি।

সুইডেন থেকে ফিনল্যাণ্ডে স্বেচ্ছাসৈন্য যাচ্ছে। "টাইমস" পত্রিকার এক প্রবন্ধে আভাষ পাওয়া যায় যে, বৃটেন ও ফ্রান্সও ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য দেবে। একটা সংবাদ রটানো হয়েছিল যে জার্ম্মানী ও ইতালী ফিনল্যাণ্ডে অস্ত্র সরবরাহ করছে; কিন্তু জার্ম্মানী সরকারীভাবে বলেছে, সে অস্ত্র সরবরাহ করছে না, সোভিয়েটের সঙ্গে তার মনোমালিন্য ঘটাবার জন্যেই এ রকম খবর প্রচার করা হচ্ছে।

যুদ্ধের প্রকৃতি

ফিনল্যাণ্ডে লড়াই সম্বন্ধে নানারকম সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। মস্কোতে প্রত্যেক ইস্তাহারে বলা হচ্ছে লালফৌজ এগিয়ে চলেছে; অপর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সোভিয়েট সৈন্যেরা হাজারে হাজারে এবং সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও বিমান প্রচুর সংখ্যায় ঘায়েল হচ্ছে। তবে সোভিয়েট যে অগ্রসর হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট বাহিনীর গতি এখন তিনদিকে চলছে—উত্তর মেরুর পেট-সামো থেকে একটা বাহিনী নেমে আসছে নীচের দিকে; আর একটা বাহিনী রুশ সীমান্ত ও বোথনিয়া উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী ফিনল্যাণ্ডের মাঝামাঝি সঙ্কীর্ণতম অংশে ফিনল্যাণ্ডকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করে ফেলবার চেষ্টা করছে এবং আর একটা বাহিনী কারেলিয়া যোজকে উত্তর-পশ্চিম অগ্রসর হচ্ছে। প্রচণ্ড শীতেও রাস্তার অভাবে অভিযানের গতি মন্থর হতে বাধ্য। মেরু-দেশের দিনরাত্রিব্যাপী গোধূলি-অন্ধকারে সার্চ্চলাইটের আলো ফেলে লড়াই করা হচ্ছে।

বল্কানের ভবিষ্যৎ?

বল্কান নিয়েও একটা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল রুমানিয়াকে সোভিয়েটের সঙ্গে একটা পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি করতে বলেছে এবং তুরস্ককে বৃটেনের পুতুল হতে নিষেধ করেছে। এ দিকে জার্ম্মানী হাঙ্গারীয় সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কমিণ্টার্নের উক্তির দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন; তবু বল্কানের নিকট ভবিষ্যতে একটা গোলমাল বাধার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে' রুমানিয়া যখন জার্ম্মানীকে পণ্য সরবরাহে তুষ্ট করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। কমিণ্টার্নও বলেছে যে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে বল্কানে কোনো জোট গড়তে দেওয়া হবে না। মনে হয়, এখানেও সোভিয়েট ও জার্ম্মানী নিজেদের মিতালী বজায় রেখেই একটা কিছু করবে।

এদিকে ইতালীর ফাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল জার্ম্মানীর প্রতি বন্ধুত্ব জানিয়ে এক ইস্তাহার প্রচার করেছেন এবং বল্কানে তাঁদেরো স্বার্থ আছে বলে' ভূমিকা করে' রেখেছেন।

* * * * *

এ সপ্তাহেও বৃটিশ ও অন্য দেশের জাহাজ মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হয়েছে। বারান্তরে নামের তালিকা দেওয়া যাবে।

১১।১২।৩৯ —ওয়াকিবহাল

চলতি ভারত

(২০২ পৃষ্ঠার পর)

অসঙ্কোচে হেঁটে যাই। সোভিয়েট রাশিয়াতে যেখানে-সেখানে টুকরো কাগজ, দেশলাইয়ের খালিবাক্স প্রভৃতি ফেলা অপরাধ। তারা কিন্তু আমাদের মত বড় বড় আধ্যাত্মিক কথা বলে না। আমরা বেদান্তের বড় বড় বুলি আওড়াই, কথায় কথায় অহিংসার সার ত্যাগের বুলি কপচাই—কিন্তু আমাদের দৃষ্টি নাসিকার অগ্র পর্য্যন্ত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যদি সভ্যতার এবং সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ হয়, তবে আমাদের পল্লীগ্রামের দুর্গন্ধময় পথ, ঘাট, আমাদের আবর্জ্জনাবহুল নদীতীরগুলি নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিশ্বের দরবারে লজ্জিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। বিশ্বের মধ্যে নিজেকে দেখবার বড় বড় বৈদান্তিক আদর্শ প্রচার না ক'রে, একটা ক্ষুদ্র শহরকে যদি আমরা আমাদের বাড়ীর মত ভাল-বাসতে পারতাম এবং সেখানকার পথ-ঘাটকে পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য আমাদের হস্তকে নিয়োজিত রাখতাম।

জিন্নার প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা

জিন্না সাহেব তাঁহার 'মুক্তি-দিবসের' যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক জিন্না সাহেবের দোহারগিরি করিয়াছেন। আসল কথা হইল এই যে, পাকা আইনজ্ঞ জিন্না সাহেবের প্রস্তাবের আইনের পারিভাষিক বিচার করিলেই চলিবে না। তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রতিপালনের ফলে কার্য্যত দেশময় যে অনিষ্টকারিতার আবহাওয়া উঠিবে, শঙ্কার কারণ হইল তাহাই। জিন্না সাহেব কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের নামে কতক-গুলি ফাঁকা অভিযোগের আবরণে একটা নিছক সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠানের অবতারণা করিতে চাহেন। ইহার ফলে প্রীতির ভাব বাড়ে না—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অপ্রীতির ভাবই যে বৃদ্ধি পায়, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী কি মনে-প্রাণে একথা অস্বীকার করিতে পারেন? শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এ সম্বন্ধে বলেন,—"আসন্ন অশান্তি এড়ান গেলেও এই শ্রেণীর আন্দোলনে অদূর ভবিষ্যতে একই ফল প্রসব করিবে। বিদ্বেষ প্রচারের মধ্যে কোন সমাজেরই প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণ হইতে পারে না।" মৌলবী ফজলুল হক যতই পাছদোহারী করুন, আমরা জানি, বাঙলার মুসলমানেরা এতটা আত্মমর্য্যাদাহীন এখনও হন নাই যে, জিন্না সাহেবের কথায় তাঁহারা নাচিবেন। সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গাইয়া নেতাগিরির ব্যবসায় যাহারা ইতর স্বার্থকে পুষ্ট করিতেছে, তাহাদের জিন্নাই জিগীরের মূল্য দেশের লোক বুঝিয়াছে। বাঙলার মন্ত্রীদের অনুদার এবং অদূরদর্শিতার নীতির ফলে আতঙ্কের কারণ সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের সুস্থবুদ্ধির উপর আমাদের ভরসা রহিয়াছে। জিন্নাই-জয়ঢাক বাঙলাদেশে বাজিবে না, মন্ত্রীরা সে ঢাকে যত জোরেই কাঠি দিতে থাকুন না।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

পরদিন বৈকালে সতীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। দিলীপ তাহার সহিত যায় নাই, সতীশের নিকটে বৈকালিক জলযোগে বসিলে যে উহা ভূরিভোজনে পরিণত না হইয়া জলযোগই থাকিয়া যাইবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল বলিয়াই দিলীপ তাহার সঙ্গে বসে নাই। সতীশ বাহির হইয়া যাইবার পর রান্নাঘরের মধ্যেই পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গরম গরম লুচির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে দিলীপ গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল।

মৃদু হাসিয়া অলকা বলিল, গল্প জুড়ে দিলেই ওদিকের সংখ্যাটা হিসেবের বাইরে থেকে যাবে বলেই মনে হচ্ছে বুঝি? এ চোখকে কিন্তু অত সহজেই ফাঁকি দিতে পারবে না ভাই।

উচ্চ হাসিতে ঘর ভরাইয়া দিয়া দিলীপ বলিল, চোখকে ফাঁকি দিতেই কি চাই নাকি আমি, ছোট ভাইয়ের পেট ভরে নি দেখলে কি দিদির হাত বন্ধ হয় কখনও?

হাসি থামাইয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অলকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ঠিক তোমার মত আরও একটা ভাই পেয়েছিলুম আমি, সে ছিল আমার দাদা আর আমি তার দিদি। কিন্তু অদ্ভুত সে, কোথায় যে চ'লে গেল হঠাৎ তা জানিয়েও গেল না—মমতা নেই, মায়া নেই, অথচ শুনেছি পরের জন্য কত না দরদ।

দিলীপ বলিল, অন্য কোন ভাইয়ের কথা বলবেন না দিদি, আমার কিন্তু ভারী হিংসে হবে। আমি হতে চাই একচ্ছত্র অধিপতি—একমাত্র ভাই।

দিদি মাথা নাড়িয়া বলিল, তাইত হওয়া উচিত, কিন্তু পারি কই? তোমাকেও বিশ্বাস নেই ভাই, হয়ত তারই মত কোনদিন ভীড়ের মাঝে লুকিয়ে পড়বে, তোমরা যে একই জাতের।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দিলীপ বলিল, আপনাদের মত দিদি আছে ব'লেই না আমরা কিছুদিন বেঁচে যাই। এই যে ঘর-সংসার ছেড়ে একদল লোক মাথা কুটে বেড়ায়, তারা টিঁকে আছে ত শুধু বিভিন্ন ঘর-সংসারের জন্যই। সাধ্য কি তাদের যে, এদের ফাঁকি দিয়ে যায়, আর সে সাধ্য যেন তাদের কোনদিনই না হয়। সে দুই হাত তুলিয়া বোধ করি বা সেই ঘর-সংসারের উদ্দেশ্যেই নমস্কার জানাইল।

দিদি নিঃশব্দে তাহার পাতে আরও কয়েকটা লুচি তুলিয়া দিলেন। দিলীপের তখন সেদিকে নজর ছিল না, সে আপন মনেই বলিয়া চলিল, এদেশের মেয়েদের স্নেহ-মমতাকে অগ্রাহ্য করবার বা এড়িয়ে যাবার দুর্বুদ্ধি দি সত্যই তাদের হয় ত সেদিন থেকে এদের মাথা কুটে বেড়ানই সার হবে। এদের ত্যাগ, এদের নিষ্ঠা সেদিন থেকে আর কোন কাজেই আসবে না। আমি ঠিক ব'লতে পারি দিদি, ওই যার কথা তুমি বলছিলে, সে ওদেরই একজন, তার সমস্ত স্নেহ-মমতাই তুমি পেয়েছ, কিন্তু বন্ধন বলে কোন কিছুই ত ওদের নেই। তুমি তাকে বুঝেছ, তার অন্তরের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আর তোমার নেই, তাই তার সেই কোন কিছু না বলে চলে যাবার জন্য আজও ত কই তুমি তার ওপর রাগ করতে পারলে না—শুধু ভেবেই মর, আজও এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে।

অলকা কোন কথাই বলিতে পারিল না, ইহা যে সত্য তাহা সে জানে এবং বেশ ভাল করিয়াই জানে।

হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া দিলীপ বলিয়া উঠিল, তুমি বেশ ত দিদি, আমি ব'কে মরছি, আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুনেই চলেছ আর এদিকে এগুলো যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর আমাকে বুঝি দেবার ইচ্ছে নেই?

উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিঃশ্বাসটি কোনমতে চাপিয়া ঠোঁটের উপর হাসি ফুটাইয়া অলকা বলিল, না, আর একটাও না, খাওয়াতেও আমি, আবার অসুখের সেবা করতেও সেই অমাকেই কষ্ট করতে হবে ত? সে আমি পারব না ভাই।

দিলীপ বলিল, বেশ পেট আমার খালিই থেকে যাক, দিদির স্নেহ-মমতা না থাকলে ছোট ভাইয়ের কপালে এমনি দুঃখই থাকে।

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া অলকা বলিল, তোমার সঙ্গে আমার দাদাটির একটু পার্থক্য আছে দেখ্‌ছি, তোমাকে থামান যায়, কিন্তু তাকে যায় না। এখনি না দিলে হয়ত জোর করেই সে তুলে নিত। আমাদের মত যারা আপন-পর তাদের জন্য থাকবে কি-না সে কথা ভাববারও যেন তার কোন দরকার হ'ত না।

হাসি মুখেই কৌতূহলীভাবে দিলীপ বলিল, তিনি হয়ত আমার চেয়েও বড়, দিদি।

'হ্যাঁ, বড়, বয়সে তোমার চেয়ে আট-দশ বছরের ত বটেই।' অলকা বলিল।

দিলীপ বলিল, কিন্তু বয়েসটাই ত আসল নয় দিদি, আসল যেটা, সেটাতে হয়ত তিনি আরও বড়। তাঁর নামটা কি দিদি, হয়ত কোনদিন দেখা হ'য়েছে, চিনে ফেলা ত আশ্চর্য নয়!

অলকা বলিল, তার নাম প্রতুল—প্রতুল রায়।

বিস্ময়ের উত্তেজনায় দিলীপ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, প্রতুলদা? প্রতুলদা'র দিদি আপনি! আর কোন কথাই সে বলিতে পারিল না, চক্ষু দিয়া যেন রাজ্যের বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি একসঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ঠেলা-ঠেলি লাগাইয়া দিয়াছিল।

অলকাও কম বিস্মিত হয় নাই, একজনের নাম শুনিয়াই অমন করিয়া উঠিবার কি কারণ থাকিতে পারে? হইলই বা সে তাহার প্রতুলদা, হইলই বা সে তাহার পূর্ব-পরিচিত, তথাপি তাহার দিদি হইয়াছে বলিয়াই এত শ্রদ্ধা-ভক্তির কি কারণ হইতে পারে, তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। ইহারা পাগল, হয়ত এমনি করিয়াই তাহারা পরস্পরের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে, হয়ত অনেকদিনের অসাক্ষাতে পরস্পরের জন্য তাহাদের মন এমনি ব্যগ্র হইয়াই থাকে যে, খবর পাওয়া

(শেষাংশ ২১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্ট জিনিষটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার, অভিনয়ের একটি প্রধান দায়িত্ব এই সংযমকে রক্ষা করা। যাহা চোখে দেখি তাহার হুবহু নকল করিব না অথচ তাহাকে অতিরঞ্জিতও করিব না—ইহাই অভিনয়ের আদর্শ।

অন্যান্য কলাবিদ্যার তুলনায় অভিনয় জিনিষটা যদিও অনুকরণের দিকে ঝোঁক দেয় বেশী, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নয়। স্বাভাবিকের ভিতরের লীলা দেখিবার ভার তাহার উপর। স্বাভাবিকের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে হইলেই সেই ভিতরের দিকটিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলিতে প্রায়ই দেখি মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে আতিশয্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায়, সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ন্যায় বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রতিদিন মিথ্যা সাক্ষীর সেই গলদঘর্ম্ম জবরদস্তি দেখা যায়।

অভিনয়ে অসংযত আতিশয্য অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা বিনষ্ট করে—তাহাতে কেবল বাহিরের দিকই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশের সকলের চেয়ে বড় বাধা ইহাই। বাঙলার রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এবিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

সাহিত্য ও শিল্পের মত রঙ্গমঞ্চও জাতির গৌরবের বস্তু। রঙ্গমঞ্চ দ্বারা জাতির সংস্কৃতি ও আভিজাত্য বিচার করা যায়। যে দেশে ভাল নাটক নাই, সে দেশ সত্যই দুর্ভাগা। অতীত গৌরব আমাদের কিছু হইলেও আছে কিন্তু বর্ত্তমানে মাঝে মাঝে যখন আমরা রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকাই, তখন সত্যকারের নাটকের পরিবর্ত্তে অতীতের পুনরাবৃত্তি দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়ি। কোথাও দেখা যায়, ধর্ম্মপ্রবণ বাঙালীর ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়া পৌরাণিক নাটকের পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে, কোথাও আধুনিকতা ও পৌরাণিকের উৎকট সংমিশ্রণ, কোথাও বৈদেশিক ও বিজাতীয় ভাব লইয়া দর্শকদের চমক লাগাইয়া দিবার প্রচেষ্টা। তবে ভাল নাটকাভিনয়ের প্রচেষ্টা যে হয় নাই ও হইতেছে না, তাহা আমরা বলি না। অধুনালুপ্ত নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের অতীত গৌরবের কথা বাদ দিলেও আমরা নাট্যনিকেতন ও রঙমহলে মাঝে মাঝে নাটকে নূতনত্ব দিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। বাঙলা দেশে ভাল নাটকের বড় অভাব, একথা নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ ও দর্শকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় এবং আমরাও বহুবার এ সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছি। আশা করি নাট্য-পরিচালকগণ পূর্ব্বেকার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির পুনরাবৃত্তি না করিয়া পরিবর্ত্তনশীল সমাজের পরিবর্ত্তনশীল চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নূতন নাটকের প্রয়োজনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

নাট্যনিকেতনে মহামায়ার চর

'সীতা'র যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাট্য-প্রতিভার বিকাশ আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছি। তিনি কয়েকটি চরিত্রের অসামান্য অভিনয় করিয়া নট হিসাবে অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন—আলোচ্য নাটকে তাঁহার সে খ্যাতি বর্দ্ধিতই হইয়াছে। আলোচ্য নাটক 'মহামায়ার চর' তাঁহার রচনা। তিনি যে একজন শক্তিশালী প্রতিভাবান নাট্যকার, তাহা ইতিপূর্ব্বে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। আলোচ্য নাটকটি তাঁহার প্রতিভারই পরিচায়ক। যদিও একটি বিদেশী নাটকের টেক্‌নিক ও ভাব-এর ছায়া অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে, তবু আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র, বর্ণনা ও ভাবধারার কোথাও বৈদেশিক ও বিজাতীয় ভাবের ছোঁয়াচ লাগে নাই।

আলোচ্য নাটকের চরিত্রগুলিও সুন্দর ও পরিস্ফুট। ইহার ক্ষুরধার সংযত সংলাপ এবং অলৌকিক রহস্য দর্শকদের শেষ পর্য্যন্ত উদগ্রীব করিয়া রাখে, হাস্যরস সকলকে বিমুগ্ধ করে। কিন্তু সময়ের ফাঁক (lapse of time) ও নাটকীয় সংঘাতের দুর্ব্বলতায় গল্পাংশ ঢিলা হইয়া গিয়াছে এবং নাটকের সর্ব্বশেষ পরিণতি সর্ব্বসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াও কেন জানি স্পর্শের প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে নাই। যে ধর্ম্মে নাটক আমাদের হৃদয়ের ও অনুভূতির সূক্ষ্মতম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অলক্ষে তাহার স্থায়ী প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্তার করে, এ নাটকে সেই হৃদয় ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। তবে 'মহামায়ার চর' নাটকটি নূতন ধরণের এবং এইরূপে সিনেমা টেকনিকে কোন নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। নাট্যনিকেতন লিমিটেডের এ দুঃসাহসিক পরীক্ষা প্রশংসনীয়।

'মহামায়ার চরে' শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী শেফালিকার অভিনয় অনবদ্য হইয়াছে। শ্রীমতী শেফালিকার গান ও প্রথম দিকের অভিনয় আরও উচ্চস্তরের হওয়া বাঞ্ছনীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রে 'মহানিশার' রাধিকাপ্রসন্নের পরোক্ষ প্রভাব মাঝে মাঝে দর্শকদের অস্পষ্টভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। আশা করি যোগেশবাবু এদিকে একটু লক্ষ্য রাখিবেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় চমৎকার হইয়াছে, ইহার চেয়ে ভাল অভিনয় করিবার সুযোগ তাঁহার নাই। শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় খুব সংযত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী অপর্ণার শান্ত সংযত অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। সংসার-বিরাগী পিতার অসহায় বিধবা কন্যার করুণ চরিত্র স্ফুটনে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উৎপল সেন দর্শকদের প্রচুর হাসাইয়াছেন। তবে তাঁহার অভিনয়ে আতিশয্য দোষটুকু সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে তাঁহার চরিত্রের করুণ দিকটি পরিস্ফুট হইতে পারিত। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ না হইয়াও নাটকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়ের কৃতিত্ব পাইবার বিশেষ সুযোগ তাঁহার রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূপেন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শিবকালী চট্টোপাধ্যায়ের আরও ভাল অভিনয় করিবার সুযোগ রহিয়াছে। আড়ষ্ট ভাব কাটাইতে পারিলে ভাল হয়। অন্যান্য ছোট ছোট ভূমিকাগুলি মন্দ অভিনীত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর নাট্য-পরিচালনা প্রশংসনীয়, প্রযোজক শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয়ের কৃপণতা এবং রুচির অভাব কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত সতু সেনের পরিচালনা অনিন্দনীয়। সঙ্গীত পরিচালনার প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না।
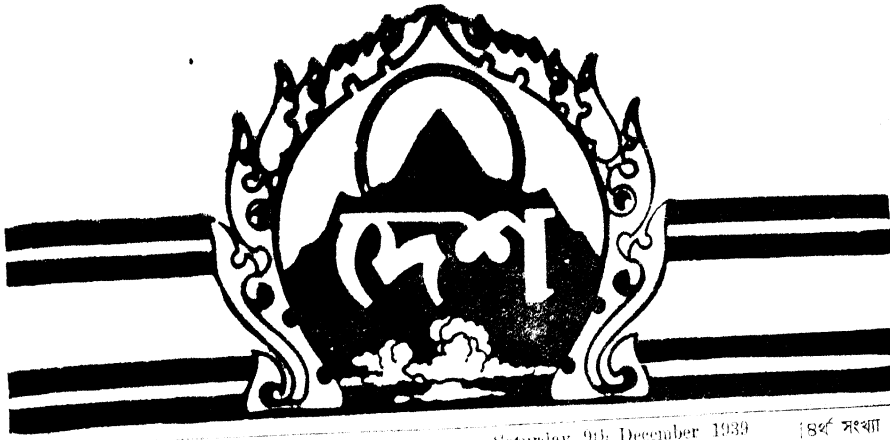
৭ম বর্ষ। শনিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬. Saturday, 9th December, 1939 ।৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

চরকা ও অহিংসা

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন,—"অদূর ভবিষ্যতে আইন-অমান্য আন্দোলন ঘোষণার কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে উত্যক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোনদিন আইন-অমান্য আন্দোলন হইতে পারে না। যখন উহা সুস্পষ্টভাবে অপরিহার্য্য হইবে, তখনই উহা আসিবে; সম্ভবত সরকারী মহলের তাড়নায় উহা আসিবে।" আইন-অমান্য আন্দোলন যে সুস্পষ্টভাবে অপরিহার্য্য হইয়াছে ইহা বুঝিবার নিরিখ কি এবং সরকারী মহলের তাড়না কোন্ পর্য্যায়ে উঠিলে আইন-অমান্য আন্দোলন অবলম্বনে ঔচিত্য বর্ত্তিবে মহাত্মাজী ইহার কোন নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই এবং আমাদের মতে তাহা করাও সম্ভব নহে, কারণ আদর্শের পথে অগ্রসর হইবার তীব্র ঐকান্তিকতার উপর এই উভয় উপলব্ধিই নির্ভর করে। স্বাধীনতা লাভের জন্য আকুলতা যে পরিমাণ তীব্র হয়, সেই পরিমাণে অন্য স্বার্থগত বিচার-বিবেচনা তুচ্ছ হইয়া পড়ে এবং আত্মত্যাগের পথে অভীষ্টসিদ্ধির প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সেইরূপ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী মহলের তাড়নার অনুভূতিও তীব্র হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র স্বার্থের টানে—স্বাধীনতার প্রেরণার অভাবে যে তাড়না গা-সহা হইয়া যায়, সেই তাড়নাই তখন অসহ্য হইয়া পড়ে এবং প্রতীকারের পন্থা অবলম্বনে প্রণোদিত করে। দেশে যদি স্বাধীনতার জন্য সে প্রেরণা না থাকে তবে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশের কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু মহাত্মাজী এমন কথা বলিতেছেন না যে, সে প্রেরণার অভাব রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—"শান্তি কোনদিন হয় নাই। স্বাধীনতা যতদিন পর্য্যন্ত লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সংগ্রাম চলিবে। সংগ্রাম কোনদিন শেষ হয় নাই। শুধু প্রকৃষ্টভাবে প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যেই আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হইয়াছে।" এই পথে প্রস্তুত হইতে হইলে কি আবশ্যক, সে সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মত এই যে, চরকার সঙ্গে অহিংসার একটি মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে। তিনি বলেন, আমি সহস্রবার এ কথা বলিয়াছি, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিব যদি লক্ষ লক্ষ লোক অহিংসার মনোবৃত্তিতে সূতা কাটে তাহা হইলে সম্ভবত আইন অমান্য আন্দোলনের আবশ্যকই হইবে না। চরকার সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক কি আমাদের মত সাধারণ লোকের বুদ্ধির পক্ষে তাহা দুরধিগম্য, কারণ, জগতে যাহারা অহিংসাতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা যে অকপট চরকা-অনুরাগী ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই; পক্ষান্তরে যাহারা একান্তভাবে চরকা কাটিয়াছে তাহারাও যে অহিংসার অত্যুত্তম শক্তিতে স্বরাজের সুখ ভোগ করিয়াছে, ইতিহাসে এমন প্রমাণও দুর্ল্লভ। চরকারূপ প্রতীকের ভিতর দিয়া জনসাধারণের সঙ্গে যোগ, ইহা ছাড়া স্থূলে বুদ্ধিতে মহাত্মাজীর যুক্তির মূলে রাজনীতিক কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাত্মাজীর লক্ষ্য ইহারও উপরে, তিনি চরকার সাহায্যে বর্ত্তমান সভ্যতার ধারাকেই পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান সভ্যতা হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা অন্য রকমের হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, চরকার সূতার জোরে সভ্যতার গতিকে ঘুরাইয়া যদি ভারতবাসীদিগকে স্বরাজ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যুগের যাহা ধর্ম্ম তাহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষের নাই। সেই ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও তাহাকে অত্যান্তিকভাবে এড়াইয়া মানুষ উপরে উঠিতে পারে না। এযুগে যন্ত্র-বিজ্ঞান উপেক্ষা করিয়া চরকা সম্বল করিতে গেলে অধঃপতন অনিবার্য্য, উচ্চ আদর্শের অলস বিলাস আমাদিগকে বাস্তবের আঘাত হইতে বাঁচাইতে পারিবে না।

সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্বার্থপরতা

জনৈক ইংরেজ সমালোচকের প্রশ্নের উত্তরে 'হরিজন' পত্রে মহাত্মা গান্ধী লিখিতেছেন,—"ব্রিটিশ সরকার বুঝিয়া

লইয়াছেন যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে আমাদের শাসন করিতে হইতেছে এবং আমাদের ভিতরকার এই বিরোধ মিটিয়া গেলেই তাহারা সানন্দে এই দেশ হইতে চলিয়া যাইবেন। এইভাবে তাঁহারা একটা কূটচক্রের মধ্যে ঘুরিতেছেন। ভারতবর্ষের যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাধান আগে দরকার, ইহাই যদি সর্ত্ত হয়, তাহা হইলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ঘরোয়া সমস্যা, আমরা যদি পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাস করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই কথাই বলা হইত যে, ইংরেজেরা যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুদিগকে উত্তর অঞ্চলের দুর্দ্ধর্ষ জাতিদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে এবং কোন কুমারীই রক্ষা পাইবে না, কোন ধনী ব্যক্তিই নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে না।"

কিন্তু এখন হিন্দুদের জন্য সে চিন্তা গিয়াছে, এখনকার ভয় নূতন ভয়, এখনকার ভয় হইল কংগ্রেসের। মহাত্মাজীর ভাষাতেই শুনুন। তিনি বলেন,—"কংগ্রেস ভারতের নিরস্ত্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবী করে। এই সব নিরস্ত্র জনসাধারণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা সামন্তরাজাদের এবং মুসলমানদের যথেষ্টই আছে, এখন সেই কংগ্রেস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সামন্তরাজারা এবং মুসলমানরা ব্রিটিশের সঙ্গীনের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে।"

একদিকে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানী, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রভৃতি প্রথার দ্বারা শতভাবে সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণ, অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অজুহাতে ভারতে অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার যে কূটচক্র চলিতেছে, ভারতবাসীদিগকে এই কূটচক্র কাটাইয়া বাহিরে আসিতে হইবে, নহিলে কোনদিন তাহাদের মুক্তি নাই। স্বাধীন ভারতই সাম্প্রদায়িক সমস্যার চূড়ান্তভাবে সমাধানে সমর্থ—মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। ভারতবাসীদিগকে এই সত্য আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে হইবে। ব্রিটিশ শাসনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা যদি আজও আমাদিগকে এদিকে সচেতন না করে, তবে আমাদের রাজনীতিক মুক্তি যে সুদূরে ইহা সুনিশ্চিত।

ইংরেজ ছোট ও বড়

রক্তের টান বড় টান, এই প্রবচন ইংরেজের পক্ষে যতটা সত্য অন্য কোন জাতির কাছে ততটা সত্য কিনা সন্দেহ, তথাপি ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ-সংশ্লিষ্ট স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়াও পরাধীন ভারতের পক্ষে উচিত কথা বলিবার লোক আজও ইংরেজদের মধ্যে যে কয়জন দেখা যায়, তন্মধ্যে স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ অন্যতম। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আগমন করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। বুড়া ল্যান্সবেরী ইংরেজ রাজনীতিক মহলে একরকম বাতিল হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু ভারতের তিনি একজন প্রকৃত বধু; সেদিনও তিনি কমন্স সভায় ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে ইংরেজ সমাজকে যে কয়েকটি কথা শুনাইয়াছেন, তাহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। তিনি বলেন,—

"হিটলার এমন, হিটলার তেমন, এসব কথা আপনারা হাজার বার আমাকে বলিতে পারেন, আপনারা আমাকে এই কথা হয়ত বলিবেন যে, কাহারও কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়, কিন্তু আপনারা যখন গণতন্ত্রের কথা বলেন, তখন ভারতবর্ষকে একটু স্মরণ রাখিবেন। নৌ-সচিব এখানে উপস্থিত নাই, এজন্য আমি দুঃখিত। বর্ত্তমান ভারতে যে ছিটেফোঁটা অধিকারের শোচনীয় নীতি লইয়া কাজ চলিতেছে, আমরা যখন তাহার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলাম, তখন চার্চ্চিল সাহেব ৭০।৮০জন সদস্য লইয়া ভারতের গণতন্ত্রের সেই যে ছিটে-ফোঁটা অধিকার তাহারও বিরুদ্ধতা করেন। আজ যদি তিনি জগৎকে দেখাইতে চাহেন যে, আমরা যথার্থই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাহা হইলে যেখানে ঐ নীতি কার্য্যকর করিবার ক্ষমতা আমাদের রহিয়াছে, সেখানে ঐ নীতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের অন্যতম মনীষী অধ্যাপক হেরল্ড ল্যাস্কির নাম করা যাইতে পারে। সম্প্রতি তিনি 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে ভারতের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমার মনে হয়, বড়লাট ভুল দিক হইতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। যদি আয়ারল্যাণ্ডকে বলা হইত যে, তোমরা যখন আলষ্টারের সঙ্গে সকল বিরোধ মিটাইয়া লইতে সক্ষম হইবে, তখনই স্বাধীনতা পাইবে—তাহা হইলে আমরা সকলেই জানি, উহার স্বাধীনতা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হইত। যদি কংগ্রেসকে বলা হয় যে, তোমরা প্রথমে মুসলীম লীগের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করিয়া ফেল তাহার অর্থ মিঃ জিন্না ও তাহাদের বন্ধুদের হাতে ভারতের দাবীকে ব্যর্থ করিয়া দিবার অধিকার দেওয়া। সম্যক পথ ছিল, বড়লাটের এখনই বলা যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার দিবেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে ভারতবাসীরা যাহাতে নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে সমর্থ হয়, সেজন্য চাপ দিবেন। এইরূপ একটা নিশ্চয়তার সম্মুখীন হইলে মিঃ জিন্না ও তাঁহার বন্ধুগণ কংগ্রেসের সহিত একটা যুক্তিসঙ্গত আপোষ করিবেন, একথা ভাবা কঠিন নহে।"

ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজের পার্থক্য কোথায়, যাহারা এই কথা বলিতেছেন, তাঁহারা এবং যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, এই দুইয়ের মনোবৃত্তি তুলনা করিলেই বুঝিতে পারি। তবে ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, আমরা নিজেরা নিজেদের অভীষ্ট লাভের জন্য যতই সংহত ও সঙ্কল্পশীল অন্য কথায় যতই শক্ত হইব, ছোট ইংরেজের সংখ্যা ততই হ্রাস পাইবে এবং বড় ইংরেজের সংখ্যা ততই বাড়িবে।

সিভিল সার্ভিসের অযোগ্যতা—

গত ৪ঠা ডিসেম্বর আগ্রায় একটি জনসভায় বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন,—"গত ২৮ মাসের অভিজ্ঞতার ফলে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মোটামুটি

ভারতের সিভিল সার্ভিস যোগ্যতাহীন এবং অনুপযুক্ত। এমন কথা বলিতেছি না যে, সিভিলিয়ানেরা সকলেই অযোগ্য কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই অযোগ্য। এক সময়ে সিভিলিয়ানদের উপর আমার কিছু শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী ইঁহাদের সম্বন্ধে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উপরে উপরে দেখা যায় তাঁহারা বেশই ভাল, প্রকাশ্যভাবে বিরোধ তাঁহারা কিছুই করেন না; কিন্তু গোপনে গোপনে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতিপত্তি হানি করিবার জন্য তাঁহাদের সকল রকমের চেষ্টা থাকে। ভারতীয় সিভিলিয়ানদের সম্বন্ধেও সমভাবেই এই কথা প্রযোজ্য। ইঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের অযোগ্যতাকে প্রমাণিত করিয়াছেন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রি-মণ্ডলের প্রতি আনুগত্যের অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেসের যাহাতে দুর্নাম হয়, এমন সব গোপন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহারা চলিতে পারেন নাই এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই।" পণ্ডিত নেহেরুর এই উক্তিতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সিভিলিয়ানরা সকলেই অযোগ্য এমন কথা আমরাও বলি না; কিন্তু আমাদের বড় কর্ত্তারা সিভিলিয়ানী প্রশংসায় আনন্দে যে পরিমাণ পঞ্চমুখ হন, সে পরিমাণ কৃতিত্ব যে সিভিলিয়ানদের নাই, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার প্রমাণ। সুদীর্ঘকাল সুশিক্ষিত, এমন সুপ্রসংশিত সিভিলিয়ানী শাসনে থাকিয়াও ভারতের অধিকাংশ লোক অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বর্ণজ্ঞানহীন, ইহাই সিভিলিয়ানী শাসনের ব্যর্থতার বড় পরিচয়। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, সিভিলিয়ানদের সঙ্গে ভারতবাসীর অন্তরের যোগ নাই, স্বার্থগত সম্বন্ধ সুনিবিড় নহে। সিভিলিয়ানরা ভারতের জনগণের ভৃত্য নহেন, তাঁহারা ভৃত্য হইলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শীর্ষস্থ ইংরেজ পুরুষদের। স্বাভাবিকভাবে মনিব যাঁহারা তাঁহাদের টানই তাঁহারা টানিবেন, মসগুল থাকিবেন তাঁহাদেরই মহিমায়। এহেন সিভিলিয়ান সমাজে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব হইল যে সত্য, সে সত্যকে অতিক্রম করিয়া ভারতের কালা আদমীদিগকে অতিরিক্ত কৃপাকণা-প্রদানে কৃতার্থ করেন যাঁহারা, তাঁহারা দুই একজন। সিভিলিয়ানদের উপর কর্তৃত্ব করিবার ভার যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীদের নিজেদের হাতে না আসিবে, ততদিন পর্যন্ত এই অসম অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে না; শেতাঙ্গ প্রভুত্বনিষ্ঠার একটা অন্ধ আভিজাত্য ভারতবাসী এবং ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যে যে ব্যবধান এবং বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা দূর হইতে পারে না।

গ্রাম-উন্নয়নের ধারা—

বাঙলার নূতন গবর্ণর গত ২রা ডিসেম্বর সরকারী গ্রাম উন্নয়ন বাহিনী পরিদর্শন করেন। গবর্ণর বাহাদুর ত্রয়োদশ বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'আমাদিগকে এখনও তিনটি মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইতে হইবে। ব্যাধি, দারিদ্র এবং অজ্ঞতা—এই তিন শত্রু যতদিন সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই উদ্যমে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে পারিব না।' গবর্ণর বাহাদুরের সঙ্কল্প দুর্জ্জয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু এই সঙ্কল্পে আমাদের বুকে আনন্দের উচ্ছ্বাস আর উঠে না। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় সরকারী এই ধরণের সঙ্কল্প শুনিতে শুনিতে এতৎসম্বন্ধে আন্তরিকতার অভাব উপলব্ধি করিয়া আমাদের আবেগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সরকারী এই গ্রাম উন্নয়নকারী ত্রয়োদশ বাহিনীর প্রধান কাজ দেখা যাইতেছে, গ্রামে গ্রামে গিয়া বক্তৃতা করা। প্রত্যেক বাহিনীতে ৫জন করিয়া সেবক এবং একজন অধ্যক্ষ থাকিবেন। প্রত্যেক বাহিনীর সঙ্গে থাকিবে একখানা করিয়া গরুর গাড়ী। এই গরুর গাড়ীতে প্রদর্শনীর জন্য দরকারী মাল এবং কিছু ঔষধপত্র থাকিবে। অধ্যক্ষ মহাশয় গ্রামের লোকজনকে উপদেশ বিতরণ করিবেন। বিনা পয়সায় এমন উপদেশ পাইবার প্রয়োজনীয়তা দেশের লোকের না আছে, এমন নয়; কিন্তু কথা হইতেছে, সে উপদেশ কাজে খাটাইবার মত পয়সা যদি না থাকে, তাহা হইলে উপদেশগুলি একান্তই যে মাঠে মারা যাইবে! উপদেশের প্রয়োজন থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার অপেক্ষা বেশী প্রয়োজন পয়সার। কাদা জল না খাইয়া পরিষ্কার জল খাইতে হয়, ব্যারাম হইলে চিকিৎসা করিতে হয়, এটুকু বুঝিবার শক্তি এদেশের লোকে না আছে এমন নয়, কিন্তু সে সব বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাহারা মরে কেন পোকামাকড়ের মত,—সে দুঃখের কথা কে কহিবে? গ্রাম উন্নয়ন বাহিনীর কল্যাণে সরকারী মহিমা প্রচারের সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে যদি আন্তরিকতার সঙ্গে কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে বাঙলাদেশের গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করার দরকার আগে, নহিলে এই সব ঠাট খাড়া করার সার্থকতা দেশের সত্যকার সমস্যা সমাধানের দিক হইতে কিছুই নাই। ঈশপের গল্পের ঘোড়া তাহার সহিসকে বলিয়াছিল, ডলাই-মলাই কম করিয়া আমাকে কিছু বেশী করিয়া খাইতে দাও, সরকারী গ্রাম উন্নয়ন বাহিনীর বক্তৃতার উত্তরে বাঙলার গ্রামবাসীদের অন্তরে সেই বুভুক্ষার বেদনাই বাজিবে।

গ্রাম-অঞ্চলে চিকিৎসা—

বাঙলার গ্রামগুলিতে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব। সুশিক্ষিত চিকিৎসকেরা শহরে ভিড় করেন, তবু গ্রামের দিকে যাইতে চাহেন না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাক্তার, রাধারমণ সিংহ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"শিক্ষিত চিকিৎসকেরা যে গ্রামে যাইতে চাহেন না, তাহার প্রধান কারণ দুইটি—প্রথমত, গ্রামবাসীরা অজ্ঞ দরিদ্র, সুতরাং তাহারা শিক্ষিত চিকিৎসক অপেক্ষা হাতুড়েদেরই বেশী পছন্দ করে; দ্বিতীয়ত, গ্রামের অবস্থা এমনই অস্বাস্থ্যকর যে, শহর হইতে শিক্ষিত

চিকিৎসকেরা গ্রামে বাস করিতে গেলে তাঁহারা নিজেরাই রোগাক্রান্ত হইয়া পলাইয়া আসেন।" সভাপতি ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন যে, গ্রামবাসীরা এমনই দরিদ্র যে, তাহারা চিকিৎসকদের দক্ষিণা দিতে অক্ষম। এদিকে শিক্ষিত চিকিৎসকেরাও গ্রামে গিয়া বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন। ডাক্তার সেনগুপ্ত সেজন্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রাম অঞ্চলে অন্ততপক্ষে প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর একটি করিয়া ভাল ডিসপেন্সারী স্থাপন করিতে হইবে এবং হেলথ ইন্সিওরেন্স প্রণালীতে চিকিৎসক সঙ্ঘের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হেলথ ইন্সিওরেন্স প্রণালী পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচলিত আছে; কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট আইন ও শান্তি রক্ষার জন্য যতটা ব্যগ্র, যাহাদের জন্য আইন ও শান্তিরক্ষার প্রয়োজন, তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য ততটা ব্যগ্র নহেন বলিয়াই এ সম্বন্ধে এখনও উদাসীন। আমলাতান্ত্রিক শাসনে দেশের এই সমস্যার দিকে তাকাইবার ফুরসৎ কর্ত্তাদের হইত না। কিন্তু হইতেছে না বলিয়াই বর্ত্তমানের অবস্থায় বসিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের তাঁবেদারীতেও এদিকে কোন কাজই হইতেছে না। অথচ হইতেছে না বলিয়াই বর্ত্তমানের অবস্থায় বসিয়া থাকা চলিবে না। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায়, কালাজ্বরে, যক্ষ্মায় পোকামাকড়ের মত মরিবে, আর আমরা ফাঁকা বড় বড় বুলি আওড়াইয়া শহরে বসিয়া দেশোদ্ধার করিব, এমন মনোবৃত্তি ছাড়িতে হইবে। ক্রমাগত আন্দোলন চালাইতে হইবে, কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা ভাঙ্গিতে হইবে জনমতের চাপে। আবশ্যক প্রথমে গ্রামের এই সব উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, অজ্ঞ আমাদেরই যাহারা দেশবাসী, তাহাদের জন্য প্রাণের দরদের। বাঙলার সুশিক্ষিত চিকিৎসকমণ্ডলী যদি এই দরদ মনে-প্রাণে অনুভব করিয়া এই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকতা সহকারে অগ্রসর হন, তবেই তাহাদের শিক্ষা সার্থক হইবে। রাজনীতির ভয় করিয়া এ কর্ত্তব্য এড়াইবার অবসর নাই, কারণ মনুষ্যত্বেরই এ আহ্বান।

সিন্ধুর সংকট—

সিন্ধু দেশ ব্রিটিশ শাসনের বাহিরে নয়, কিন্তু এই সিন্ধু দেশে কিছুদিন হইতে যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহাতে মনে করা কঠিন যে, সেখানে সভ্য দেশের শাসননীতি এখনও বলবৎ আছে। সিন্ধু সরকারের চীফ সেক্রেটারীর প্রদত্ত বিবরণ হইতেই প্রকাশ,—"পল্লী অঞ্চলে মহিলা সমেত ১২৫জন নিহত হইয়াছে। কয়েকটি পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ডাকাতগণ প্রায় এক শত গ্রাম লুঠ করে। তাহারা ২৫খানা গ্রাম পোড়াইয়া দেয়। ডাকাতেরা অনেককে অপহরণ করে, তন্মধ্যে চারটি রমণীকে উদ্ধার করা হইয়াছে।"

"দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে সুক্কুরে ৫০জন নিহত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু লোক আহত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছে। দাঙ্গাকারীরা ৪০টির অধিক দোকান, গুদাম ও বাড়ী ভস্মীভূত করিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।"

যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। কিন্তু শান্তির সময় কোন সভ্য দেশেই এমন কাণ্ড ঘটিতে পারে বলিয়া শোনা যায় না, কেবল এই ভারতবর্ষ ছাড়া। কেন ইহা সম্ভব হয়? যাহারা শান্তি ও আইনরক্ষার আগ্রহে পড়িয়াই দেশের লোকের হাতে স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিতে সাহস পান না, সেই প্রবল-প্রতাপশালী অভিভাবকগণ কি এই উপদ্রব বন্ধ করিতে পারেন না? মহাত্মা গান্ধী এ সম্বন্ধে 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"জনসাধারণ যদি আত্মরক্ষায় শিক্ষালাভ করিত এবং দাঙ্গা প্রভৃতি নিবারণে পুলিশ তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিত, তবে এই সব সঙ্কট হইতে রক্ষাকার্য্য সম্ভব হইত"; কিন্তু তাহা করিতে গেলে সাম্রাজ্যিক শাসননীতিকে সঙ্কটে ফেলা হইবে। মহামতি গোখলে দেশের এই অসহায়তার উপলব্ধি করিয়াই একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ শাসনের প্রধান কলঙ্ক এই যে, এই শাসননীতি দেশের লোককে মনুষ্যত্বহীন করিয়া ফেলিয়াছে। যাহারা বিপন্নকে রক্ষা করিতে পারে না, যাহারা দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদের হাত হইতে জননী-ভগিনীর সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম নয়, তাহাদের বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? তাহাদের মত অমানুষদের অস্তিত্বের গ্লানি পৃথিবীর বুক হইতে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হওয়া উচিত। দেশের স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, প্রেম, মৈত্রী এই সব বড় বুলি তাহাদের মুখ হইতে বাহির হওয়া উচিত নয়।"

মিথ্যার পর সত্য সন্ধান—

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন, অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী সত্য নহে, এই কথা যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতি-স্তম্ভ সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা জয়ের স্মৃতিস্তম্ভে দাঁড়ায়। স্বরাষ্ট্র-সচিবের এই উক্তির আনুষঙ্গিক হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন উঠে যে, ঐ স্তম্ভ যদি সিরাজদ্দৌলার জয়সূচক হয়, তাহা হইলে ঐ মর্ম্মে প্রস্তরফলক স্তম্ভগাত্রে স্থাপন করা হইবে না কেন? স্বরাষ্ট্র-সচিব উত্তরে বলেন যে, উহার কোন প্রশ্ন নাই, যদি এই যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, সমগ্র ব্যাপার কাল্পনিক, তাহা হইলেই উহার আবশ্যক হইতে পারে। বলা বাহুল্য, স্বরাষ্ট্র-সচিবের এই উক্তি সমস্যাকে এড়াইবার জন্য শুধু একটা ধোঁকাবাজী মাত্র। অন্ধকূপ-হত্যা হয় নাই; কিন্তু কলিকাতা জয় হইয়াছিল, মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সত্যকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিবার ভীতি, দুর্ব্বলতা ও মনুষ্যত্বহীনতার গ্লানি জাতিকে আর কতদিন বহন করিতে হইবে—অন্ততঃপক্ষে আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন স্বাধীনচেতা মানুষ যতদিন এদেশে না জাগে, ততদিন তো বটেই।

সহস্র হ্রদ ও বলগা হরিণের দেশ

সহস্র হ্রদ এবং বলগা হরিণের দেশ ফিনল্যাণ্ড, এই ফিনল্যাণ্ডের সমস্যাটা কিছুদিন হইল পাকিয়া উঠিয়াছে। রুষ সৈন্য ফিনল্যাণ্ডে প্রবেশ করাতে বর্ত্তমানের সমর সমস্যায় দস্তুরমত একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং অনেকের মনেই এই প্রশ্ন জাগে যে, ইংগ-ফরাসী-জার্ম্মান বিগ্রহের ব্যাপারে ফিনল্যাণ্ডের বর্ত্তমান পরিস্থিতি না জানি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে।

ফিনল্যাণ্ডের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয় ৮ম শতাব্দী হইতে। ফিনল্যাণ্ডের বর্ত্তমান যাহারা বাসিন্দা, তাহারা সেখানকার আদিম বাসিন্দা নয়, কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে মধ্য এসিয়া হইতে গিয়া ইহারা ফিনল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা প্রকৃতিতে দুর্দ্ধর্ষ এবং কর্ম্মকঠোর। উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ডের বরফাচ্ছন্ন ভূমিভাগ, পূর্ব্বদিকে রুষিয়া, দক্ষিণদিকে ফিনল্যাণ্ড এবং পশ্চিমদিকে বোথনিয়া এবং সুইডেন ইহাই হইল ফিনল্যাণ্ডের সীমানা। প্রচণ্ড শীতের জায়গা এই ফিনল্যাণ্ড, বৎসরের মধ্যে দশ মাসই থাকে এখানে শীত। শরৎ এবং বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ফিনল্যাণ্ডে নাই বলিলেও চলে।

ফিনল্যাণ্ডের প্রথম পরাধীনতা সুইডেনের হাতে। ইহার পর সুইডেন এবং রুষিয়ার সঙ্গে ক্রমাগত দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পর ফিনল্যাণ্ড ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ফিনল্যাণ্ড এবং আল্যাণ্ডসহ রুষিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ফিনল্যাণ্ডের লোকেরা প্রথম হইতেই রুষিয়ার অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছে; বস্তুত রুষিয়া যখন ফিনল্যাণ্ড প্রথমে দখল করে, তখন ফিনল্যাণ্ডের পুরাপুরি না হইলেও কতকটা স্বাধীনতা সে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তারপর ধীরে ধীরে শাসনতান্ত্রিক অবস্থার নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে সুইডেনের পক্ষপাতী একদল এবং ফিনিশ জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্ঘর্ষ বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিগত মহাসমরের সময় রুষিয়া ফিনল্যাণ্ডের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পায় নাই; কারণ ফিনিশ জাতীয়তাবাদী দল এই আশঙ্কা করে যে, রুষিয়া বিজয়ী হইলে তাহাদের ঘাড়ে আরও বেশী করিয়া চাপিয়া বসিবে। ১৯১৭ সালে রুষিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করিবার পর রুষিয়ায় বে-সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই গবর্ণমেণ্ট ফিনল্যাণ্ডের দায়িত্বমূলক শাসনাধিকার স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ধনিক সম্প্রদায় রুষিয়ার সাম্যতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। ফিনিশ জাতীয়তাবাদী দল ফিনল্যাণ্ডের পূর্ণ-স্বাধীনতা তাহাদের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করে, ফিনিশ গবর্ণমেণ্টও পরে সেই নীতিই তাঁহাদের নীতি বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হন এবং ফিনিশ রাষ্ট্রসভা ঘোষণা করে যে, ফিনল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র এবং আর্থিক ব্যাপারে রুষিয়ার কোন অধিকার নাই। ১৯১৮ সালে বলশেভিক গবর্ণমেণ্ট ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা নিজেরা স্বীকার করিয়া লন এবং সুইডেন প্রভৃতি দেশও ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে মান্য করিয়া লয়। কিন্তু ইহার পরে জাতীয়তাবাদী এবং বলশেভিক পক্ষপাতীদের মধ্যে তুমুল বিরোধ দেখা দেয়। ১৯২০ সালে রুষিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি সত্ত্বেও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রুষিয়ার প্রীতির ভাব বাড়ে নাই। এই সন্ধির একটি সর্ত্ত এই থাকে যে, ফিনল্যাণ্ড তাহার কয়েকটি দ্বীপে কোন কেল্লা তৈয়ার করিতে পারিবে না অথবা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে না। ১৯২১ সালে ফিনল্যাণ্ড স্বীকার করে যে, সে আল্যাণ্ড দ্বীপে সমরসজ্জা করিবে না।
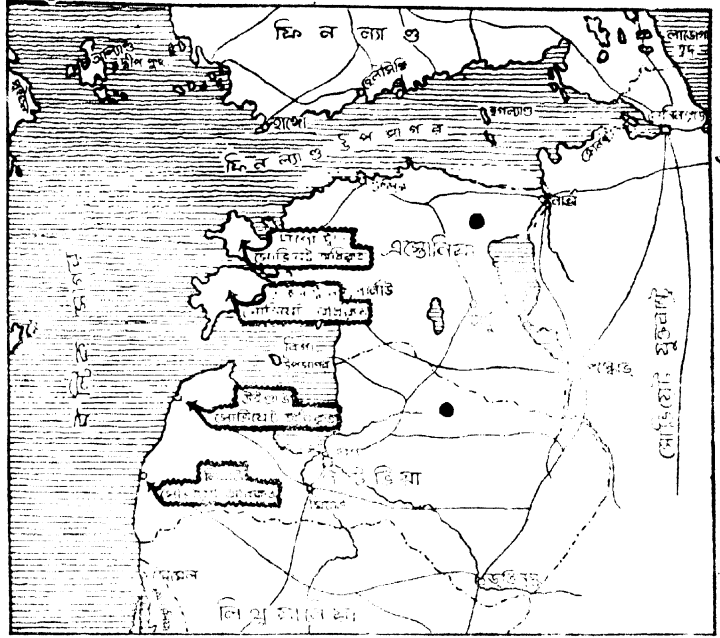
রুষ-ফিন বর্ত্তমান সমস্যার সঙ্গে সন্ধি সর্ত্তের এই ধারাটির সম্পর্ক আছে। রুষিয়া বলিতেছে যে, ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন ইচ্ছা তাহার নাই, তবে রুষিয়ার নিরাপত্তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সামরিক দিক হইতে গুরুত্ববিশিষ্ট কয়েকটি স্থানে সে নিজেদের ঘাঁটি প্রস্তুত করিতে চায়। ইহার মধ্যে আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে সাড়ে ছয় হাজারেরও অধিক অতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপ লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২০০ দ্বীপে মাত্র লোক বাস করে। এই সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা সাধারণত মৎস্যাদি মারিয়া ও চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই দ্বীপগুলির অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। ইহারা প্রায় সকলে সুইডিশ ভাষায় কথা বলে। ফিনল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির মধ্যে এই স্থানের শৈত্যই সর্ব্বাপেক্ষা কম। ফিনল্যাণ্ডের এই স্থানটিই কেবল বৎসরে তিনমাস বরফমুক্ত থাকে।

মানচিত্রের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে এই দ্বীপ-পুঞ্জটি শত্রুপক্ষের হাতে থাকিলে রুষিয়ার নৌবাহিনীর ফিনল্যান্ড উপসাগর হইতে বাহির হইবার আর কোন উপায় থাকিবে না।

আল্যান্ড দ্বীপে দুর্গপ্রাকারাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ফিনল্যান্ডের সহিত সহযোগিতা করার সর্ত্তে সুইডিস পার্লামেন্টে যে বিল উত্থাপন করা হইয়াছিল, সোভিয়েট রুষিয়া আপত্তি করাতে সুইডিস গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ফিনল্যান্ডের দেশরক্ষা সচিব মঃ নিউক্কামুন গত ৫ই জুন ষ্টকহলম পরিদর্শনকালে বলেন যে, পূর্ব্ব প্ল্যান অনুসারে ফিনল্যান্ড আল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ সুরক্ষিত করিতে চাহে। রুষিয়া সংবাদ পায় যে, ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সঙ্গে যোগ দিয়া আল্যান্ড দ্বীপ সুরক্ষিত করিবার চেষ্টায় আছে। এই ব্যাপার লইয়া ফিনিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে রুষিয়ার বহুদিন আলোচনা চলে, আলোচনার ফলে কোন মীমাংসা হয় নাই। ইহার পরে রুষ সেনারা ফিনল্যান্ডে প্রবেশ করে। ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করেন এবং সমাজতন্ত্রী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়; কিন্তু রুষিয়া এই মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গেও মিটমাট করিতে অস্বীকৃত হয়। ইতিমধ্যে ফিনিশ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র নামে একটি গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় এবং এই নবগঠিত বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে রুষিয়ার সন্ধি হইয়াছে।

পোল্যান্ডে যে ব্যাপারের অভিনয় আমরা দেখিয়াছি, ফিনল্যান্ডেও সেই ব্যাপারের অভিনয় হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে কি? এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ফিনল্যান্ডের সামরিক শক্তি বিশেষ কিছু নয়। ফিনল্যান্ডের মোট সৈন্যসংখ্যা ৩১ হাজার এবং সেনানী-সংখ্যা ২০১২, স্থল সৈন্য তিনটি ডিভিসনে বিভক্ত। সামান্য কয়েকখানা জাহাজ লইয়া উপকূলরক্ষী নৌবহর আছে। ফিন-ল্যান্ডের প্রেসিডেণ্টের হাতেই প্রধান সেনাপতিত্বের অধিকার রহিয়াছে। ফিনল্যান্ডের একটি বিমানবাহিনী আছে এবং ফিনিশ বিমানবীরদের কৃতিত্বের কিছু নামও আছে। ৪ বৎসর পূর্ব্বে ফিনল্যান্ডের সামরিক বিমানবহরে প্রথম শ্রেণীর ৬১খানা উড়োজাহাজ ছিল, এই সংখ্যার পরে আরও বাড়ান হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। বিশেষ চেষ্টা করিলেও ফিনল্যান্ড ২॥ লক্ষের অধিক সেনা রণাঙ্গনে নামাইতে পারে না, কিন্তু রুষিয়ার লক্ষ লক্ষ সৈন্য। হেলসিংফোর্শের সাবেকী গবর্ণমেণ্ট রুষিয়াকে বাধা দিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে বরং তাহাতে হইবে অনর্থক লোকক্ষয়।

ফিনিস জাতি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইতে পারে, কিন্তু ইউরোপের সংস্কৃতিতে ফিনিসেরা ইতিমধ্যেই নিজেরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কবি এবং সাহিত্যিক হিসাবে ফিনিসদের নাম আছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার খুব বেশী। ইউরোপের মধ্যে একমাত্র ফিনল্যান্ডেই মদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৯১৯ সালে এই আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ফিনল্যান্ডের অধিকাংশ কবি এবং সাহিত্যিকই দরিদ্র জনসমাজ, শ্রমিক এবং কৃষক-শ্রেণী হইতে উদ্ভূত। ফিনল্যান্ডের আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, এই সঙ্কটের জন্য জগতের সর্ব্বত্র তাহাদের প্রতি সহানুভূতির কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু এস্থলে ভাবিবার কথা আছে, তাহা এই যে, ফিনল্যান্ডের লোকেরা সত্য সত্যই কি চায়। ফিনিসরা অনেকে আমেরিকায় গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য শিখিয়া আসিয়াছে এবং ফিনল্যান্ডের বহু ব্যবসাতে মার্কিন মহাজনেরা দেদার টাকা খাটাইয়া লাভবান হইয়া থাকে। ফিনল্যান্ডের জন্য আমেরিকার দরদের মূলে কারণ এইখানে।

রুষিয়ার মূল নীতি হইল, জগতে বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, সেই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের আদর্শকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করা। রুষিয়া জানে যে ধনতান্ত্রিক শক্তিমাত্রেই তাহার আদর্শের বিরোধী এবং সুযোগ পাইলে তাহারা কেহই রুষিয়াকে ছাড়িবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধে রুষিয়া নিজের আদর্শকে সম্প্রসারিত করিবার সুযোগ পাইতেছে। বল্টিকে সে আজ সাম্যবাদীদের ঘাঁটিতে ঘা বসাইতেছে। বল্কানেও তাহাই করিবে এবং অচিরেও চীনে তাহার এই নীতি সম্প্রসারিত হইবে। জার্ম্মানীর প্রতি দরদে পড়িয়া সে যেমন পোল্যান্ড আক্রমণ বা অধিকার করে নাই, তেমনই জার্ম্মানীর সুবিধা হইবে এই বিবেচনাতে সে ফিনল্যান্ডে নিজেদের ঘাঁটী করিতেও যায় নাই। পোল-জার্ম্মান বিগ্রহের ভিতর দিয়া প্রকৃতপক্ষে রুষিয়া জার্ম্মানীর হিটলারবাদকে কাবুই করিয়াছে; ফিনল্যান্ডে সে আজ যে ঘাঁটী করিতে চাহিতেছে, ইহাতেও প্রত্যক্ষভাবে জার্ম্মানী এবং পরোক্ষভাবে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই কাবু হইবে। জার্ম্মানী এতদিনে এই সত্যটি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং ইহার ফলে যুদ্ধের গতি অন্য দিকে ঘুরিবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। রুষিয়া যদি সাম্রাজ্যবাদীদের মনো-বৃত্তি লইয়া ফিনিসদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে, তাহা হইলে রুষিয়ার লাভের চেয়ে লোকসানই উহাতে অধিক হইবে, কারণ ফিনিস জাতীয়তাবাদীরা প্রবল-তর সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়া রুষিয়ার নিরন্তর অশান্তির কারণ ঘটাইবে। বিগত মহাসমরের সময় ফিনিস জাতীয়তাবাদীরা জার্ম্মানদের সঙ্গে যোগ দিয়া লাল-পল্টনের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল, তেমন পরিস্থিতির কারণ সৃষ্টি হইবে রুষিয়ার পক্ষে ফিনল্যান্ডে। পক্ষান্তরে রুষিয়া যদি ফিনিস জাতির জনমতানুকূলতাকে পোষণ করিয়া সেখানে স্বাধীন সমাজতন্ত্রী শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনে সাহায্য করে, অর্থাৎ এমন শাসনপদ্ধতি সেখানে প্রবর্ত্তিত হয়, যে শাসনপদ্ধতিতে দরিদ্রের শোষণনীতি বন্ধ হইয়া যায়, জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে রুষিয়ার কার্য্য অসঙ্গত বলা অন্যায় হইবে। বড় আদর্শের বাঁধা বুলি আওড়াইয়া জগতে শান্তি আনা যাইবে না, দেখাইতে হইবে কার্য্যত বড় আদর্শের অনুসরণ কে কতটা করিতেছে, তাহাই। পোল্যান্ডের ব্যাপারের পর সহস্র হ্রদের দেশ ফিনল্যান্ডের পরিস্থিতিতে পরাধীন জাতি-সমূহের মনে এই প্রশ্নই আজ দেখা দিবে।

চলতি ভারত

বোম্বাই

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং

সর্দ্দার বল্লভভাই কংগ্রেসকর্ম্মীদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, তাড়াতাড়ি কোনো কাজ করা উচিত নয়। সব কাজের জন্যেই একটা উদ্যোগ-পর্ব্বের প্রয়োজন আছে। যে রকমের ঘটনা ইংরেজদের যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনেছে সে রকম ঘটনা মোটেই নূতন নয়। তেমন ঘটনা ইতিপূর্ব্বেও বারম্বার ঘটেছে। তখনও ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা তখন সে করেনি, কারণ ইংরেজ তখন প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষেও উচিত হ'চ্ছে তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করা, যখন সে আপনাকে প্রস্তুত করতে পারবে। আমরাও মনে করি—কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের একটা কোনো চরম পথ অবলম্বন করবার জন্য আগে নিজেকে তৈরী করার প্রয়োজন আছে। তার মানে এই নয় যে, যাত্রার জন্য কেবলই পাঁজি ওলটাতে হবে। যারা বেশী হিসাবী তাদের জন্য স্বাধীনতার পথ নয়। স্বাধীনতার পথ তাদেরই জন্য যারা বে-পরোয়া, বে-হিসাবী। তবুও একথা সত্য যে, আট-ঘাট বেঁধে তবেই কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া উচিত। যথাসম্ভব প্রস্তুত না হ'য়ে একটা জাতির ভাগ্য নিয়ে পরীক্ষা করা ঠিক নয়। অবশ্য এটা ঠিকই যে, ঝড় যখন আসে তখন সে কারও সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আসে না। একটা জাতির রাজনৈতিক জীবনে যখন বিপ্লবের ভূমিকম্প সুরু হয় তখনও সেটা হঠাৎই হয়। ইতিহাসের ঘটনাস্রোতের উপরে অজানার পদচিহ্ন। যে সব ঘটনা মহাকালের বুকে যুগান্তর এনেছে তারা মানুষের হিসাব বুদ্ধির কোনো ধারই ধারে নি। যে রকম ক'রে রাতের আঁধারে চোর আসে গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে তেমনি ক'রেই জাতীয় জীবনে বিপ্লব আসে তার আকস্মিকতার দ্বারা সবাইকে অভিভূত ক'রে।

মাদ্রাজ

ডাঃ মণ্টেসরির শিক্ষাপ্রণালী

ডাঃ মেরিয়া মণ্টেসরি মাদ্রাজের এক বক্তৃতায় বলেছেন, "শিক্ষার স্তরকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পাঠশালার শিক্ষা, হাইস্কুলের শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই তিনটি স্তরের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকা উচিত নয়—পাঠশালার শিক্ষা, হাইস্কুলের শিক্ষা আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা—এই তিন স্তরের শিক্ষাকে একই নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে গেঁথে দেওয়া উচিত।" ডাঃ মণ্টেসরির মতে হাইস্কুলের শিক্ষকদের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও পক্ষে উচিত হয় না হাইস্কুলের শিক্ষা ব্যাপারে উদাসীন থাকা। ছেলেদের মনের যে বিকাশ—সে বিকাশের ধারাকে যদি নিরবচ্ছিন্ন রাখতে চাই তবে হাইস্কুলের শিক্ষক কেবল হাইস্কুলের শিক্ষা এবং কলেজের অধ্যাপকেরা কেবল কলেজের শিক্ষা নিয়ে থাকবে এমন একটা ব্যবস্থাকে কখনোই সমর্থন করা উচিত নয়। ডাক্তার মণ্টেসরি বলেন, অনেক সময়ে কলেজে এমন জ্ঞান দেওয়া হয়, যে জ্ঞান দেওয়া উচিত ছিল শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে। মণ্টেসরি প্রণালীতে বায়োলজি শেখানো হয় তিন বৎসর বয়সে। আমরা মণ্টেসরি মতকে সমর্থন করি। হাইস্কুলে ছেলেদের এমন অনেক বিষয় শেখানো আরম্ভ করা হয় যা আরম্ভ করা উচিত ছিল প্রাথমিক স্কুলে। কলেজেও এমন অনেক বিষয়ে ছাত্রদের হাতেখড়ি হয়—যাদের সম্পর্কে তাদের পূর্ব্বে কোন জ্ঞানই দেওয়া হয় নি। কলেজের অধ্যাপক, ইস্কুলের শিক্ষক আর পাঠশালার পণ্ডিত এই তিন দল শিক্ষা ব্যবসায়ীর পরস্পরের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রয়েছে সে ব্যবধান ঘুচে যাওয়া উচিত। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আত্যন্তিক প্রয়োজন আছে ছাত্রের মনের কুঁড়িকে দলে দলে বিকশিত ক'রে তুলবার জন্য।

মাদ্রাজ

শিক্ষার সার্থকতা সেবায়

ডাঃ মণ্টেসরি আমাদের শিক্ষার একটা বড়ো ত্রুটির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বর্ত্তমান শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের ক'রে তুলছে স্বার্থপর। সমাজের কাছে তারা যে ঋণী—সেবা দিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করবার চেষ্টা করা যে তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য—এই দৃষ্টি তারা হারিয়ে ফেলে। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু তারা বোঝে না এবং এই স্বার্থবুদ্ধিকে উগ্র ক'রে তোলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আর সবাইকে হারিয়ে দিয়ে যশোলক্ষ্মীর মালা পাবার সাধনা। ডাঃ মণ্টেসরি বলছেন, "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকের কল্যাণ-সাধন। ইস্কুলে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা যত বেশী দিন থাকে—ততই এই জ্ঞান তার স্পষ্টতর হওয়া উচিত যে, সমাজের সেবা করবার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে সকলেরই। শিক্ষার কাজ হ'চ্ছে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। সমস্ত বিশ্ব যে একই সূত্রে গাঁথা এবং এই ঐক্যকে বাস্তবে সত্য ক'রে তুলতে হ'লে প্রত্যেকটি ব্যক্তির সহযোগিতার যে প্রয়োজন আছে—এই বোধটি জাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে মণ্টেসরি শিক্ষা-প্রণালীর মর্ম্মকথা। ডাক্তার মণ্টেসরির মতের সঙ্গে আমাদের মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্ম-বাণী হ'চ্ছে ঐক্যেরবাণী। এই ঐক্যের মহামন্ত্রই একদা উৎসারিত হয়েছিল তপোবনের বুক থেকে। ভুলে গেছি সেই বাণীর মহিমা—শিক্ষা হয়ে গেছে অর্থকরী—ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে আর সবাইকে ডিঙিয়ে একটা চাকরী যোগাড় করাই হয়েছে এখন জীবনের চরম লক্ষ্য। ম্যাডাম মণ্টেসরি গান্ধীজীর মতোই ভারতের সাধনার উপরে গ'ড়ে

তুলতে বলছেন শিক্ষার ইমারত। এই ইমারতের তোরণ-দ্বারে লেখা থাকবে—'সেবা'।

হায়দ্রাবাদ

অতীত নয় ভবিষ্যত

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথম ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে যুবকদের লক্ষ্য ক'রে বলছেন, 'যুবকদের দৃষ্টিকে অতীত থেকে সরিয়ে এনে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করা উচিত।' আমরা একথা সমর্থন করি। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বারে বারে যুগান্তর এনেছে যাঁদের চিন্তার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—তাঁরা সবাই অতীতের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত। 'পুঁথির কথা কইনে মোরা—উল্টো কথাই কই'—এই বাণী উৎসারিত হয়েছে তাঁদের সতেজ কণ্ঠ থেকে। তাঁরা একদিকে পুরাতন আদর্শকে ভেঙেছেন—আর একদিকে সৃষ্টি করেছেন নতুন আদর্শ। প্রবীণ পাকার দল তাঁদের আদর্শের জীর্ণ-কঙ্কালের উপরে আক্রমণকে সহ্য করেনি—আক্রমণকারীকে আগুনে পুড়িয়েছে, ক্রুশে ঝুলিয়েছে, বিষ দিয়েছে, কারাগারে পাঠিয়েছে, পাগল ব'লে উপহাস ক'রেছে। নতুন আদর্শের স্রষ্টারা পূজা পেয়েছে ভাবীকালের কাছ থেকে। ঠাকুরদারা যাকে বাতুল ব'লে উপহাস করেছে নাতিরা এসে তার গলায় দুলিয়েছে শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য। যীশুখৃষ্ট থেকে গান্ধীজী পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি যুগস্রষ্টা ঘুমের দেশে এনেছে জাগরণের চঞ্চলতা, কবরের শান্তির মধ্যে জাগিয়েছে ভূমিকম্পের আলোড়ন—নতুন আদর্শের কথা ব'লে চমকে দিয়েছে সবাইকে। আশ্চর্য্যের কথা—যে বক্তৃতায় তিনি ছাত্রদের আহ্বান করেছেন অতীতের শৃঙ্খল থেকে আপনাদিগকে মুক্ত ক'রে ভবিষ্যতের পূজারী হ'তে- সেই বক্তৃতাতেই তিনি দেশ-ব্যাপী অশান্তির নিন্দা করেছেন। অশান্তি যেখানে নেই—সেখানে নতুন সৃষ্টিও নেই—কারণ ভাঙনের পথে আসে নবজীবনের প্লাবন। ভাঙার পালা যেখানে সুরু হয়েছে—সেখানে একদলের কাছ থেকে আঘাত তো আসবেই। সে আঘাতই সূচনা করে নূতন প্রভাতের। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত নিয়ে ওসমানিয়া কলেজে যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ ক'রেই কি শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথম ছাত্রদের অসহিষ্ণুতার প্রতি বক্রদৃষ্টি হেনেছেন!

পাঞ্জাব

ঘর ও বাহির

কুমারী সুরী লাহোরে এক মহিলা কলেজে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আধুনিকা যাঁরা—তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ঘর এবং সমাজ—কোনটাকেই পরিত্যাগ না করা।" কথাটা মোটামুটিভাবে সত্য—কারণ ঘরই মেয়েদের আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্টক্ষেত্র—একথা যেমন সত্য তেমনি একান্তভাবে ঘরকে আঁকড়ে থাকলে মানুষের চিত্ত হ'য়ে যায় সঙ্কীর্ণ—একথাও তেমনি সত্য। ঘরে বাইরে যেখানে জনতার ঠেলাঠেলি আর হুড়াহুড়ি সেখানে মেয়েরা আপনাকে প্রকাশ করবার যথার্থ-ক্ষেত্র খুঁজে পায় না—কিন্তু ঘর যেখানে কারাগার হ'য়ে দাঁড়ায় যেখানে মেয়েদের জন্য পুরুষের মনে নেই শ্রদ্ধা—যেখানে ঘরকে সৌন্দর্য্যের এবং আনন্দের নিকেতন বানাবার নেই কোনো উপকরণ—সেখানে বাধ্য হ'য়েই মেয়েদের আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজতে হয় বাহিরে। কিন্তু একথাও তো সত্য যে সমাজের কাছে পুরুষ যেমন ঋণী, মেয়েও তেমনি ঋণী—মাটীর দেনা শোধ করবার দায়িত্ব যেমন পুরুষের তেমনি নারীরও। তাই দেশকে নবজীবনের স্বর্গে উন্নীত করবার যে কঠোর তপস্যা সে তপস্যার ভাগ মেয়েদেরও নিতে হবে। ভগবান যাঁদের তৈরী করেছেন ত্যাগের এবং সহিষ্ণুতার প্রতি-মূর্ত্তিরূপে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্যে মিলনের স্বর্গ তৈরীর যোগ্যতা পুরুষদের চেয়ে তাঁদেরই বেশী। ঘরের মধ্যে একান্তভাবে যদি তাঁরা বন্দিনী হয়ে থাকেন বাহিরকে বঞ্চিত করা হবে তাঁদের সেবা থেকে—যা সমর্থনের অযোগ্য।

শেষ ভিক্ষা

কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা সরকার

এ জীবনে শেষ করে দাও
সকল চাওয়া পাওয়া
শ্রান্ত মনের ক্লান্ত দাবী দাওয়া।

কণ্ঠে আমার যে গান জাগে,
হোক সমাপন করুণ রাগে
বেদনাতুর কণ্ঠ আমার
যদিই থেমে যায়,—
থামুক,—আমি চাইনা ফিরে তায়।
(যেন) এ জীবনে কারো কাছে
পাততে না হয় হাত
হাসিমুখে মাথায় লব মৃত্যু আশীর্ব্বাদ;
এ জীবনে কাম্য যাহা
নাই যদি বা মিলল তাহা
তবু রাখবো কেন আশা?
সবার ঘৃণা ভরবো বুকে
চাই না ভালবাসা।

এ জীবনে ছোট ছোট
শতেক স্মৃতির ছায়া
কভু তারা না পায় যেন কায়া
বিস্মরণের অন্ধকারে
এমনি করে ডুবিয়ে তারে
এ মোর জীবন করব আমি
সকল স্মৃতিহীন
লেনা-দেনার হিসাব নিকাশ
আপনি হবে লীন।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

দশম পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। অরবিন্দকে মাঝে রাখিয়া সতীশ ও অলকা পরস্পরের নিকট অতি সহজ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের মধ্যে আসিয়াছেন বলিয়াই যেন উহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে. তাঁহার অনুপস্থিতিতে দিন কেমন করিয়া কাটিত, তাহা অলকা ভাবিতেও পারে না।

সেদিন অরবিন্দ বলিলেন, আমার জন্য তুমি যদি ঘরে বসেই থাক, তবে ত আমি শান্তি পাব না মা। এ বুড়োকে কেন নিজের কাছে অপরাধী ক'রে তুলছ বলত?

অলকা তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার নিঃশেষ-প্রায় চুলের মধ্যে আঙগুল চালনা করিতেছিল। তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে বিন্দুমাত্র দেরীও তাহার হয় নাই, তথাপি যেন কিছুই বোঝে নাই এমনিভাবে বলিল, কি করতে হবে তাই বলুন দেখি কাকাবাবু? বুড়োকে ফেলে কোমরে কাপড় বেঁধে বাইরে ছুটাছুটি ক'রলেই বুঝি শান্তি মিলবে? আর তাই বা দেখবেন কি ক'রে—আমার চোখ আছে ব'লেই না আপনার দৃষ্টি ফোটে!

অলকার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অরবিন্দ বলিলেন, সে খবর আমার চেয়েও তুমি ভাল করে জান সে ত' জানিই মা, কিন্তু আর একটা খবর ত' তোমার জানা নেই। অন্ধ যারা হয়, এ তাদেরই নিজস্ব জিনিষ, বাইরের চোখ গেলেও মনের চোখ তাদের খুলে যায়। সে চোখই কার্য্যকরী হয় তখন এত বেশী যে, সে চোখ দিয়ে না দেখলে কোন আনন্দই মেলে না।

অভিমানভরে অলকা বলিল, আমাকে কি তবে কোন দরকারই নেই কাকাবাবু?

তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে টানিয়া আনিয়া অরবিন্দ বলিলেন, এ তোমার অভিমানের কথা মা। ছেলে দেখতে পায় বলে কি আর আছাড় খায় না? সে সময় কে তাকে দেখে বল দেখি? মা না এলে তার কান্না কি থামে?

হাসিয়া অলকা বলিল, মা যদি সব সময়েই কাছে থাকে, তবে ত' সেই আছাড়টাও বেঁচে যায়।

অরবিন্দও হাসিয়া বলিলেন, এবার মস্ত একটা ভুল ক'রে বসলে কিন্তু. আছাড় না খেলে ছেলের ভালই বা লাগবে কেন? গায়ে ব্যথা না পেলে, মনের মধ্যে কান্না জমে না উঠলে স্নেহের মাধুর্য্য কি বোঝা যায়?

অলকা বলিয়া উঠিল, কিন্তু—।

তাহাকে জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া অরবিন্দ বলিলেন, না কোন কিন্তুই এর মধ্যে নেই, তর্ক করতে তোমায় আমি দেব না। আজ বিকেলেই তোমাদের বেরোতে হবে, না হ'লে তোমার কোন কথাই আমি শুনব না। কাকাবাবুর কথা যদি না শোন ত' মায়ের কথাগুলোও অগ্রাহ্যই থেকে যাবে।

এমনি সময় সতীশ আসিয়া বলিল, আজ কি হয়েছে জানেন, ঠিক ধর্ম্মশালাটার সামনে, যেখানে একটা পোল আছে—

অরবিন্দ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, হ্যাঁ তুমি যখন বলছ, তখন পোল একটা সেখানে আছে, একথা অস্বীকার করি কি ক'রে, কিন্তু কি জান সতীশ আমি অন্ধ মানুষ, ও-সব দেখিনি কোনদিন —পোলটাও নয়, ধর্ম্মশালাও নয়। আর মা-টিরও ত' সেই অবস্থা, কে-ই বা দেখায়, কে-ই বা কি করে—বল।

একটু অপ্রতিভ হইয়া সতীশ বলিল, তা সে কথা ঠিক—কিন্তু কি করি বলুন—। হ্যাঁ, সেই পোলটার কাছে—।

তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না। অরবিন্দ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, ও-সব কথা আর আমরা শুনতে চাই না। আমার না হয় উপায় নেই, কিন্তু তাই বলে আর একজনই বা শুধু কল্পনা নিয়েই থাকবে কেন? আজ বিকেলে, শুধু আজ বিকেলেই নয়, রোজই একে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তোমায়। রাস্তায় যা কিছু দেখে আসবে, তার একটা ফিরিস্তি দিলেই যদি সব কিছু চুকে যেত, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মনের সৃষ্টি না করলেও ত চলে যেত'। তা হবে না আজ থেকেই এ কাজ তোমায় করতে হবে।

অলকা সতীশের দিকে চকিতে চাহিয়াই বৃদ্ধের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ করি-বা পাকা চুল লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সতীশ ক্ষণকাল অলকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার বুকের ভিতর কোথায় কি যেন বারকয়েক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারে পাশাপাশি চলিতে গিয়া তাহার বুকের স্পন্দন যে থামিয়া যাইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? অনেকদিন আগেকার একটি রাত্রির কথা মনে পড়িল, সে রাত্রিটা তাহার জীবনের একটা বিরাট কলঙ্ক হইয়া আজিও অক্ষয়, অমর হইয়া আছে। অনেক সৎকাজে ব্যয়িত রাত্রিই হয়ত' মুছিয়া গিয়াছে—মুছিয়া যাইবে না ওইটাই। কেহ কি উহা মুছিয়া ফেলিতে পারে না, সে তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে তাহা হইলে। ওই মেয়েটি সে-কথা হয়ত' গভীরভাবে মনে রাখিয়াছে, হয়ত' বা সম্পূর্ণই ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার স্থিরতা, তাহার অবিচলিত ভাব আজিও স্পষ্ট চোখে পড়ে। নিজের মনের দুর্ব্বলতার পাশে উহার ওই ধ্যানগম্ভীর ভাব মনে পড়িলে, আজিও লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ভয় ত' তবুও কমে না।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অরবিন্দ বলিলেন, আমার কথা শুনে তোমরা দেখছি একেবারে পাথর হ'য়ে গেলে, ব্যাপার কি মা?

হয়ত' সতীশের মনের একটা দিক অলকা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই তাহাকে সহজ করিবার জন্য সে তেমনি মাথা নীচু রাখিয়াই বলিল, কেউ যদি নিজের ইচ্ছায়ই কোন কাজ করে ত তাকে বোঝালেই কি কোন ফল হবে? যুক্তির জোরে ওকালতী ক'রে মামলা জিততে হয়ত' আপনি পারেন, কিন্তু যেখানে যুক্তির বদলে শুধু বিশ্বাসটাই আছে, সেখানে আপনি ত' পারবেন না কাকাবাবু। বিশ্বাস কি যুক্তি মানে?

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ বলিল, সবাই মিলে একজনকে কোণঠাসা করা আধুনিক যুদ্ধরীতি হ'লেও মহাভারতীয় নীতিতে কিন্তু বাধে কাকাবাবু।

অরবিন্দ হাসিলেন। উত্তর করিল অলকা। মুখের উপর চমৎকার একটা হাসি ফুটাইয়া সে বলিল, মহাভারতীয় নীতি যারা অপরের ওপরে খাটাতে চায় না, তাদের জব্দ করার এ ছাড়া আর কোন পথও যে নেই।

হাসি মুখেই অরবিন্দ বলিলেন, তুমি যা-ই বল সতীশ আমার এই মা-টিকে হারাতে তুমি কোনদিনই পারবে না। তাই ত' আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ওদের শক্তিরূপিণী বলে গেছেন। কিন্তু যাই হ'ক তর্ক করতে গিয়ে খেই হারিয়ে তর্কের সুরুতে আমার যে কথাটা আছে, সেটাকে ভুলে যেও না যেন।

অরবিন্দের প্রথম দিককার কথাগুলিতে যে ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে তাহারা উভয়েই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেও আর তাহারা পারিল না। নিতান্ত অপরিচিত হইলেও, আজ তাহারা এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কোন সম্বন্ধই তাহাদের নাই, অথচ লোকের মুখে, চোখের ইঙ্গিতে যে সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহা তাহাদের মনে

না আসিয়াও পারে না, লজ্জায় তাহাদের চোখ আপনা হইতেই নত হইয়া আসে—সতীশ মনে মনে বার বার শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু তবুও কথা না বলিয়া উপায় নাই। মনের মধ্যে নিগূঢ়-ভাবে একটা রহস্যকে চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে সহজ ভাব না দেখাইয়া কোন উপায়ই যে নাই। ধীরে ধীরে কোনক্রমে সে তাই বলিল, হ্যাঁ, সে ত' বটেই, তা মনে না থাকলে—।

অরবিন্দ বলিলেন, কিন্তু এত অনিচ্ছা কেন সতীশ!

সতীশ এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, অনিচ্ছা নয় কাকাবাবু, অনভ্যাস।

অলকা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল, আপনাকে ফেলে আমি নিজেই ত' যেতে পারিনি, আজ হঠাৎ একজনকে ধরে তার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে চলবে কেন কাকাবাবু। দোষ যদি কারও থেকেই থাকে সে আমার। আমরা বেড়াতে গেলেই যদি আপনার অপরাধ ঘোচে ত' আমরা কোন আপত্তিই করব না আর।

অলকাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া অরবিন্দ বলিলেন, কে বলে মা, শিক্ষার গর্ব্বে এদেশের মেয়েরা শেষ হ'তে বসেছে? স্বামীর দোষ যে নিজের কাঁধে তুলে নেবার একটা চিরকেলে রোগ এদেশের মেয়েদের মধ্যে রয়েছে, সে ত' কই শিক্ষা তোমার কাছ থেকে মুছে নিতে পারেনি।

কথাটা অলকাকে আঘাত করিল। তাহার কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, এ আপনার অন্যায় দোষারোপ—এদেশের মেয়েরা যাদের শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তাদের মনের দুঃখ পর্য্যন্ত নিজেদের মাথায় তুলে নেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, এ কি আজও আপনার অজানা আছে বলতে চান?

অরবিন্দ কোন কথাই বলিলেন না, প্রশান্ত মুখে আস্তে আস্তে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

আরও দুইটা দিন কাটিয়া গেল। অলকা রোজই সতীশের সঙ্গে বেড়াইতে যায়। আজও বিকালে তাহারা বাহির হইয়াছে, গত দুই দিনের মত অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আজ তাহারা বাহির হয় নাই, আজ তাহারা চলিয়াছে বিদ্যাপীঠের দিকে।

বাজারের কাছাকাছি আসিয়া সতীশ বলিল, একটা গাড়ী নিলে হ'ত, অনেকটা পথ, আমাদের পক্ষেও হাঁটা মুস্কিল।

অলকা হাসিয়া বলিল, নিজেদের দিয়ে বিচার করাটা পুরুষদের কিন্তু একটা মস্ত দোষ, আপনি হাঁটতে পারবেন না বুঝি?

সতীশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, সত্যি অনেক দূর, হেঁটে যেতে কেউ যদি না-ই পারে ত' তাকে দোষ দেবার কিছু নেই।

অলকা বলিল, আজ কিন্তু আপনাকে হেঁটে যেতেই হবে। অনেকদিন বেরোই নি পথে, আজ অনেক, অনেক দূর হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সতীশ বলিল, বেরোবার যদি সত্যি এতই ইচ্ছে ছিল ত' আমাকে বলনি কেন? আমি কিন্তু ভাবতেও পারিনি।

অলকা বলিল, সেটা আমার দোষ নয় আপনার। আপনি সাহিত্যিক—এত কম কল্পনা শক্তি যাদের, তারা লেখে কি করে!

একটু ইতস্তত করিয়া সতীশ বলিল, রাত হ'য়ে যায় বলেই বলবার সাহস আমার হয়নি।

সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ গলায় অলকা বলিল, আপনি অদ্ভুত, আমার কিন্তু এতটুকু অবিশ্বাসও নেই আপনার ওপর। এত বড় জীবনের একটা রাতই কি এত বড় হয়ে থাকবে? ভুল হয় বলেই কি সেই একটা ভুলই জীবনের সমস্তটা জুড়ে বসে থেকে সহজ জিনিষ থেকেও মানুষকে দূরে ঠেলে রাখবে? মামা বলতেন, ভুল জিনিষটাকেও অগ্রাহ্য কর না মা—এমনি ভুলের বেদীতেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাকা পথ করতে হ'লে ইঁট চাই, জলও চাই, ঠিক তেমনি সত্যে পৌঁছবার পাকা পথেও ভুলের প্রয়োজন।

লজ্জায় সতীশের মাথা নীচু হইয়া আসিল, চক্ষু দিয়া দুই-এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। কি অদ্ভুত ওই মেয়েটি, মানুষের বিরাট অন্যায়কেও কত সহজেই না সে ক্ষমা করিয়া ফেলে।

অলকা তাহার লজ্জা, তাহার অশ্রু দেখিয়া ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, আপনি দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু তার লজ্জা যে আমার কত বড় তা' বুঝিয়ে বলবার শক্তি আমার নেই। আমার জন্য আপনার অনেক বন্ধুই আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, একথা মনে হ'লে আজও আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই।

কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সতীশ বলিল, তারা যে আমার সত্যিকার বন্ধু নয় এ শুধু তোমার জন্যেই আমি বুঝতে পেরেছি অলকা, এত' আমার কম লাভ নয়।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উদাসভাবে অলকা বলিল, তাদের কিছু দোষ নেই, এ খুবই সত্যি কথা। শত সহস্র বছর ধরে যে সংস্কার আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ় হ'য়ে গেছে, তা কি মুহূর্ত্তেই আমরা বদলাতে পারি?

"কিন্তু তোমার ত' অত সংস্কার নেই অলকা।"

অলকা হাসিল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সংস্কার আমারও ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। তার ওপর মামার কাছে ছেলেবেলা থেকেই যে শিক্ষা পেয়েছি, তাও একেবারে ব্যর্থ হয়নি। মেয়েরা যা ধরে, তা বড় শক্ত করেই ধরে—যাকে তারা ভাল মনে ক'রে, তাকে তাদের চোখে খারাপ প্রতিপন্ন করা একরকম অসম্ভব।

'কিন্তু প্রতুল? সে ত' পারলে না আমায় ছেড়ে যেতে।'

প্রতুলের কথা মনে হইতেই অলকার চক্ষু দুইটি আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল, তাহার কথা মনে হওয়ার মধ্যেও যে কত বড় আনন্দ, তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। প্রতুল তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে—সে কাহারও দিদি নয়—অথচ এমন একটি লোকের দিদি হইয়া বসিয়াছে, যাহার তুলনা মেলে না। উজ্জ্বল চক্ষে সম্মুখের দিকে চাহিয়া অলকা বলিল, সংসারটা শুধু একদিক ঘেঁসেই যায় নি; এখানে প্রতুলের মত লোকও আছে। আমরা সাধারণ মানুষ, তাকে দেখে লজ্জায় মরে যাই, তাই তাকে আমরা দেবত্ব দিয়ে দূরে বসিয়ে রাখতে চাই। সে মানুষ, কিন্তু আমরা? সব কিছু মিলিয়েই না এই জগৎ।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বিদ্যাপীঠের নিকটে আসিয়া হাজির হইল; তার দিয়ে ঘেরা বিরাট মাঠের মধ্যে সুন্দর শাদা গুটিকয়েক বাড়ী।

ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে সতীশ বলিল, এই যে বিদ্যাপীঠ-এর পেছনেও আছে কত বড় একটা ইতিহাস। মানুষের কর্ম্মশক্তির প্রেরণায় গড়ে ওঠা এমনি প্রতিষ্ঠানগুলোর কতটুকু ভিতরে আমরা যাই। ওই শাদা দালানের আড়ালে গৈরিক-বসনাবৃত যে কয়টি অতীত মানুষ আছে, তারা আমাদের ক'জনকে ভাবিয়ে তোলে? কেউ না, আমরা আসি হাওয়া খেতে, বুঝি না ওই হাওয়ার পেছনে কত বড় শক্তি কাজ করে।—

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সতীশ বলিল, এদের ব্যবস্থা অতি চমৎকার; নিয়ম, শৃঙ্খলা এরা মেনে আসছে অনেক দিন থেকে, কিন্তু সে-সবগুলো পুরানো হ'য়ে গেছে বলেই ভেঙ্গে ফেলবার আগ্রহও ওদের নেই। যেখানে আদর্শ নেই, শুধু সেখানেই যে শৃঙ্খলা না থাকলেও চলে, এ বোধ ওদের খুব ভাল রকমই আছে।

যেখানে একদল ছেলে মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছিল, অলকা সেইদিকেই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

তাহার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে ভাব সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয়ত' ইতিপূর্ব্বে তাহার হয় নাই। বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ—আর সেই মানুষের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ওই কাঁচ মুখগুলি, ইহা যে কত বড় সত্য, তাহা সে আজ নিজের সমস্তখানি সত্তা দিয়া অনুভব করিতেছিল। উহারা যেন আপনাদের জন্য আসে নাই, আসিয়াছে শুধু অপরের মনের আনন্দ বাড়াইয়া দিতে—বুভুক্ষু হৃদয়ের বুভুক্ষা উহারা বাড়াইয়া দেয় নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই।

অকস্মাৎ সতীশের চীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সতীশ তখন একটি লোকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, ওই সেই ছেলেটি অলকা, একটু দাঁড়াও ওকে আমি ধরে নিয়ে আসছি।

সতীশ যাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া অলকা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। রংটা ময়লার ধার ঘেঁসিয়া গেছে, নাকটা একটু বেশীরকম লম্বা, টানা টানা বড় চক্ষু দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, কিন্তু আভিজাত্যের কোন ছাপই নাই। তাহার পোষাকের মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আভিজাত্য নাই, দৈন্যও নাই, অথচ এমন একটা শান্তশ্রী আছে, যাহা সহজে চোখে পড়ে না, আর একবার পড়িলে মুছিয়াও যায় না।—তাহাকে দেখিবামাত্র আর একজনের কথা স্বতই মনে হয়। এই উনিশ কুড়ি বৎসর বয়েসের ছেলেটিকে দেখিলে মনের মধ্যে স্নেহ, মায়া, মমতা জাগিয়া ওঠে, ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিরাট বলিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নত করিতে ইচ্ছা হয় না।

তাহাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সতীশ বলিল, এই সেই দিলীপ, সেই গানের আসরের।

নমস্কার করিবার কথা অলকার মনেও ছিল না, বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, এই এতটুকু? আমি কিন্তু ভেবেছিলাম—।

জোরে হাসিয়া উঠিয়া দিলীপ বলিল, বিরাট একটা কিছু, না? আপনি বেশ ক'রেছেন দাদা আমার প্রশংসা করে। বাঙলা দেশের কাগজগুলো ত' আর আমাদের জয়ঢাক বাজাবে না, সে ভারটা যদি আপনারা নেন ত' মন্দ হয় না। আপনাদের মুখ আর কলম যে কত বড় প্রচার-পত্র, তা' আমি বুঝে নিয়েছি।

হাসি মুখে অলকা বলিল, মন্দ ব্যবস্থা করেন নি দেখছি, দু'জনেই দু'জনের প্রশংসা সুরু ক'রে দিলেন যে। কিন্তু আমার করে কে?

দিলীপ বলিল, আমরা দুজনেই সে ভার নিলুম দিদি, তবে হয়ত' শেষ পর্য্যন্ত দু'জনে কুলিয়ে উঠব না। কিন্তু একটা কথা আমাকে আপনি বলা চলবে না।

অলকা বলিল, বেশ ত' আপনিটা দু'পক্ষ থেকেই মুছে নেওয়া যাক্, তাতে কাজটাও সহজ হ'য়ে যাবে। তোমার কথা প্রথম দিন শুনেই যে ইচ্ছে হয়েছিল, সে ইচ্ছেটা কিন্তু তোমাকে পালন করতেই হবে আজ।

'কিন্তু ইচ্ছেটা কি?' দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল।

অলকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার আগে কথা দাও যে, সেটা পালন করবে।

যুবকের ঠোঁটের উপর দিয়া এক ঝলক হাসি খেলিয়া গেল, সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, দিদি ত' ভয়ানক দেখছি, একেবারে শাদা কাগজের ওপর নাম সই করিয়ে নিতে চায়।

সতীশ বলিল, দিদি যদি তা-ই চায় ত' আপত্তি কি? এখানে ত' অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

দিলীপ বলিল, উঃ এ যে ঘোরতর ষড়যন্ত্র দেখছি। পুলিশ ডাকব নাকি? তারপরই কপালে করাঘাত করিয়া সে বলিল, কিন্তু কোথায়ই বা পুলিশ, সে যে বহুদূরে—হা হতোস্মি।

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, তবেই ত' বুঝতে পারছ যে, আর কোন উপায় নেই। অতএব যা বলি নির্ব্বিবাদে শুনে ফেল।

'বেশ, আমি প্রস্তুত।' দিলীপ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত অলকা বলিল, তোমাকে আমরা বন্দী করেছি, তাই তোমার সমস্ত মালপত্র নিয়ে আজই আমাদের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে আমাদের ওখানে।

একটু ইতস্তত করিয়া দিলীপ বলিল, কিন্তু—।

তাহাকে থামাইয়া দিয়া হঠাৎ তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অলকা সস্নেহে বলিল, তা হয় না ভাই, তোমাকে যেতেই হবে। পৃথিবীর 'কিন্তু'গুলোর এমন কোন জোরই নেই যে, ছোট ভাইকে দিদির কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। তোমাকে যেতেই হবে দিলীপ, নইলে সত্যিই বড় দুঃখ পাব।

আপত্তি করিবার দিলীপের আর কোন উপায়ই রহিল না।

সতীশ বলিল, রাত হ'তে চলেছে ওদিকে, আর দেরী করে লাভ কি অলকা? হোটেল থেকে ওর জিনিষ-পত্র নিয়েই ত' আমাদের যেতে হবে।

দিলীপ বলিল, আজ রাতে না হয় না-ই হ'ল দিদি, কাল সকালেই আমি না হয় গিয়ে উপস্থিত হব। একটা রাতের জন্যে মিছিমিছি কষ্ট করে লাভ কি!

অলকা বলিল, কষ্টটাই কি বড় করে চোখে পড়ছে ভাই, ওর আড়ালে যে-সব জিনিষগুলো র'য়ে গেল, সেগুলো কি কিছুই নয়?

দিলীপ আর কোন কথা বলিতে পারিল না—দিদির অন্তরের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হয়ত' শত সহস্র প্রণাম জানাইল।

দিলীপ বলিল, তবে তাই হ'ক, দিদির কাছে ছোট ভাইয়ের মতামতের কোন দামই ত' কোনদিন স্বীকৃত হয়নি, আজও না হয় সে নিয়মটাই র'য়ে গেল।—

(ক্রমশ)

দেশের কথা—ভারতের পণ্য—

কফি COFFEE

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতের কফি আবাদ ...

ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণে পশ্চিমঘাটের ঢালু প্রদেশ, প্রায় কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মদ্রের মধ্যে নীলগিরি সর্ব্বপ্রধান। তাহার পর সালেম, মাদুরা, মালবর, কইম্বটুর ও তিনেভেলী জেলা প্রধান। ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অপর একটি স্থানের নাম করা প্রয়োজন এবং তাহা হইল, কুর্গ। এখানে আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৪০,০০০ একর। করদরাজ্যের মধ্যে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন পড়ে। কাদুর, হাসান ও মহীশূর করদরাজ্য মহীশূরের মধ্যে প্রধান। কাদুর ও হাসান সর্ব্বপ্রকারেই ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবাদ।

করদরাজ্যগুলিতে আবাদী জমির পরিমাণ অধিক হইলেও (৫৬·৪%), উৎপন্ন কফির পরিমাণে ব্রিটিশ ভারতের স্থান অনেক উপরে (৫৪·৩%)। কুর্গ-এ জমির অনুপাতে ফসল খুবই বেশী। মোট জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৯০ হাজার একর এবং ফসলের পরিমাণ (ব্যবহারযোগ্য Cured coffee) ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড। কুর্গ-এ জমির পরিমাণ ৩৯,১০০ একর (২০·৬%) আর ফসলের হিসাবে ১ কোটি ১১ লক্ষ পাউন্ড (৩২·৫%)। করদ রাজ্য হিসাবে মহীশূরের নামই উল্লেখযোগ্য। পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

আবাদের অবস্থা

ভারতবর্ষে (১৯৩৮) মোট আবাদের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। তন্মধ্যে করদরাজ্যে বেশী অর্থাৎ ৩,৫০০ এবং ব্রিটিশ ভারতে ২,৫০০। ইহাতে স্থায়ী মজুর সংখ্যা ৬০ হাজারেরও অধিক।

কফি প্রস্তুত করিবার জন্যও আন্দাজ কুড়িটি কারখানা আছে। ইহার অধিকাংশই কোইম্বাটুর, টেলিচেরী, কালিকট, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। চেরী (Cherry) ও ও আবাদী কফি (Plantation coffee) নামে দুই প্রকার কফি প্রস্তুত হয়। A. B. ও C. অক্ষর দ্বারা রপ্তানী কফির মাপ নির্দ্ধারিত হয়; তাহা ছাড়া বিভিন্ন মাপের চূর্ণিত কফি "triage" নামে পরিচিত।

বাণিজ্য

আন্দাজ ১৮০৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে কফি রপ্তানি হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মারফত ২,৭২১ হন্দর যায় তখন আর বে-সরকারী কফি যায় নাই। দুই বৎসরের মধ্যেই (১৮০৯) সালে, ব্যবসায়ীতে ২১৩ হন্দর কফি লইয়া গেল এবং সরকারী রপ্তানি রহিত হয়। ১৮৪৯-৫০ সালে ১১ লক্ষ টাকার কফি রপ্তানি হয়। অতি শীঘ্র ভারতের কফি ইউরোপে প্রিয় হইয়া উঠে এবং ১৮৬০-৬১ সালে ৫০ লক্ষ টাকার উদ্ধে চলিয়া যায়। এই বৃদ্ধির ক্রমানুগতিক ধারা পরিশিষ্টে (খ) দিলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৯৫-৯৬ সাল এবং বর্ত্তমানে ১৯২৭-২৮ সালই কফি রপ্তানিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে। ঐ দুই বৎসরে যথাক্রমে ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা (২,৯৮,৪৩৫ হন্দর) এবং ২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা (২,৭৬,৬৬৮ হন্দর) কফি বিদেশে যায়। কিন্তু ১৮৭৫-৭৬ সালে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা (৩,৭৩,৪৯৯ হন্দর) রপ্তানি হয়, আজ পর্য্যন্ত আর সেরূপ হয় নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা নামিয়া ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকায় আসে; ১৮৬০-৬১ সাল হইতে এত কম রপ্তানি আর কখনও হয় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে আজ এই কফি ব্যবসায়েও ভারত এক বিপদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। গত বৎসরে কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে কিন্তু এখন অন্যান্য সকল দেশে যেভাবে কফি আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আর পূর্ব্বের দিন ফিরিয়া আসা সম্ভব নহে।

ক্রেতা

বহুদিন হইতেই ইংরেজ আমাদের প্রধান ক্রেতা; সে অবস্থা আজও আছে। তাহার অংশ ৭৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা (৪৬·৮%)। নরওয়ে, বেলজিয়ম, ইরাক, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি আমাদের অপর ক্রেতা। পরিশিষ্ট (গ) হইতে প্রত্যেকের পরিমাণ ও অংশ বোঝা যাইবে।

প্রতিদ্বন্দ্বী

পৃথিবীতে কত কফি উৎপন্ন হয়, তাহার সঠিক হিসাব রাখিতে পারা যায় না। যে সকল দেশ হইতে অধিক রপ্তানি হয়, তাহার হিসাব হইতে তত্তৎ দেশের উৎপন্ন কফির হিসাব ধরা হয়। ব্রেজিল কফি আবাদের সর্ব্বপ্রধান স্থান এবং কম বেশ ত্রিশ কোটি পাউন্ড কফি রপ্তানি করে। কলম্বিয়া, সালভাডর, গুয়েটামালা দেশ কফি উৎপাদনের খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পরিশিষ্ট (ঘ) কফির বাজার ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ আগে অনেক কফি লইত, এখন সামান্যই লয়। ব্রেজিলের উৎপন্ন সমস্ত কফির উপযুক্ত বাজার ও ব্যবহার না থাকাতে, তাহারা বহু পরিমাণ কফি দগ্ধ করিয়া ফেলে।

ব্যবহার

মৃদু উত্তেজক পানীয় রূপেই কফির ব্যবহার আছে; অন্য ব্যবহার বিশেষ নাই। কফি পানে সাধারণত সামান্য অনিদ্রা ঘটে, সেই কারণে হোমিওপাথিতে নিদ্রাহীনতায় 'কফিয়া' দেওয়ার রীতি আছে।

বর্ত্তমানে অনেক কফি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া তাহার অন্য ব্যবহার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ব্রেজিলে ঐ জাতীয় কফি হইতে জমির সার এবং আকৃতি ধারণক্ষম কর্দ্দম কোমল বস্তু (Plastic material) প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা সম্ভব হইলে প্রচুর কফি কাজে লাগিয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট ক

১৯৩৭-৩৮

মোট জমি	...	... ১,৯০,০০০	একর
ব্রিটিশ ভারত	...	... ৮২,৮০০	,, ৪৩·৬%
করদ রাজ্যসমূহ	...	... ১,০৭,২০০	,, ৫৬·৪%
মোট ফলন (cured coffee)		... ৩,৪০,০৮,০০০	পাউন্ড
ব্রিটিশ ভারত	...	... ১,৮৪,৯২,০০০	,, ৫৪·৩%
করদ রাজ্যসমূহ	...	... ১,৫৫,১৬,০০০	,, ৪৫·৭%

	একর	শতকরা অংশ	লক্ষ পাউন্ড	শতকরা অংশ
ব্রিটিশ ভারত				
মদ্র	৪৩,৬০০	২২·৯	৭৪	২১·৭
কুর্গ	৩৯,১০০	২০·৬	১,১১	৩২·৫
উড়িষ্যা	১০০	—	—	—
করদ রাজ্য				
মহীশূর	১০৪,২০০	৫৪·৮	১৪৯·৪	৪৩·৫
কোচিন	১,৯০০	১·০	৪·৩৪	১·২
ত্রিবাঙ্কুর	১,১০০	·৫	১·৩৮	·৪

পরিশিষ্ট খ

রপ্তানি—কফি

১৮৪৯—৫০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয় বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য

	হন্দর	হাজার টাকা
১৮৪৯—৫০	...	১০,৯৬
১৮৫৪—৫৫	...	১২,৪২
১৮৫৯—৬০	...	২৮,২৮
১৮৬০—৬১	...	৫০,৬১

১৮৬৩—৬৪	২,৩৮,৮৭২	১৮,৬৫
১৮৬৪—৬৫	২,৮৯,১০০	১,২০,২৯
১৮৬৯—৭০	৩,২২,১৬০	১,৩০,৫৩
১৮৭১—৭২	৫,০৭,৩০০	২,০৭,০৬
১৮৭৪—৭৫	৩,১২,৮৭৪	১,১৬,১১
১৮৭৫—৭৬	৩,৭৩,৪৯৯	২,৪৫,০০
১৮৭৯—৮০	৩,৬১,০০৭	১,৬৩,৩০
১৮৮৪—৮৫	৩,৪২,৬৮২	১,২৮,৮০
১৮৮৯—৯০	২,৪১,৬৮৮	১,৫৬,০০
১৮৯৪—৯৫	২,৯৪,৭৪৪	২,১২,২৪
১৮৯৫—৯৬	২,৯৮,৪৩৫	২,৯১,৯৯
১৮৯৯—১৯০০	২,৪৬,৪৩১	১,৪৮,৪৮
১৯০৪—০৫	৩,২৯,৬৪৭	১,৬৬,১০
১৯০৯—১০	২,৩২,৬৪৫	১,০৯,৬৪
১৯১৪-১৫	২,৯০,৩৯৪	১,৬৫,৩৮
১৯১৯—২০	২,৭২,৫৬১	১,৭১,৩৯
১৯২৪—২৫	২,৪২,১৭০	২,০৮,৯৫
১৯২৭—২৮	২,৭৬,৬৬৮	২,৩১,৯২
১৯২৯—৩০	১,৮৪,২২০	১,৪৫,৪০
১৯৩৪—৩৫	১,৪০,৯৬৩	৭২,৭১
১৯৩৫—৩৬	২,১৫,৯৫১	১,০২,২০
১৯৩৬—৩৭	২,১০,৬২৯	৮৩,৬৭
১৯৩৭—৩৮	১,৩৫,১৪২	৫৪,৫৯
১৯৩৮—৩৯	১,৮৪,৮০০	৭৫,১১

পরিশিষ্ট গ

রপ্তানি—কফি—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮—৩৯)

মোট—৭৫,১০,৮৫৭

	হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৭৪,৫১০	৩৫,২৫	৪৬·৮
ফ্রান্স	৩৭,৯২৬	১১,৯৮	১৫·৯
নরওয়ে	২২,৫০১	৮,২৫	১০·৯
বেলজিয়ম	৯,৯২৪	৩,৭৬	৪·৯
ইরাক	৭,২৩০	২,৯৭	৩·৯
অষ্ট্রেলিয়া	৫,৮৫৯	২,১২	২·৮
নেদারলণ্ড	৫,০৬৬	১,৯৬	২·৬

জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি।

পরিশিষ্ট ঘ

১৯৩৮—৩৯

রপ্তানির পরিমাণ:—

	লক্ষ পাউণ্ড
ব্রেজিল	৩০,৮০
কলম্বিয়া	৫,৬২
ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জ	২,২৯
সালভাডর	১,৩২
গুয়েটামালা	১,১৮
মেক্সিকো	৮২
কিউবা	৬৮
মাডাগাস্কর	৬৫
বেলজিয়ম অধিকৃত কঙ্গো	৫৭
বাইতী	৫৫
ডোমিনিকান গণতন্ত্র	৪৭
কষ্টারিকা	৪৬

একাকিনী পাহাড়িয়া মেয়ে

(বার্ড্স্বার্থ্)

শ্রীশান্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হের! ওই নিরজন মাঠে
একাকিনী পাহাড়িয়া মেয়ে
গাহে গান, আর ধান কাটে;
থেমে যাও, দেখ তা'রে চেয়ে।
একেলা সে কাটে ধান,
গাহে সকরুণ গান,
ধ্বনি তা'র পাহাড়ের গায়
ঘুরি' ফিরি' মুরছিয়া যায়।

পথিকেরে করিতে আভান
আরবের মরু-বীথি-মাঝে
কোন পাখী গাহে নাই গান
এত সুমধুর, কোন সাঁঝে;
এত প্রাণময় স্বরে
মধু-মাসে পিকবরে
তুলেনি' বেপথু সাগরেতে,
শিহরণ দ্বীপ-কাননেতে।

বুঝিতে নারিনু, কি সে গাহে;—
ব্যথাময় গীতি-ধারা চাহে
কহিতে কি অতীতের কথা,
নিদারুণ সমর বারতা?
অথবা কি তা'র গানে
কাঁদনের সুর আনে
মানুষের বেদনা, বিয়োগ—
প্রতি পলে জীবনের ভোগ?

থাকুক্ যে কোন ভাব তাহে,
নিরন্ত গীতিকা বালা গাহে;
কাজে রত পাহাড়ীর মেয়ে
চারিদিকে নাহি ফিরে চেয়ে;
নীরবে শুনিনু গান,
স্পন্দহীন হ'ল প্রাণ;
যবে তা'র গান হ'ল শেষ
মোর চিতে র'য়ে গেল রেশ।*

(কবিতাটি Wordsworth-এর Solitary Reaper-এর অনুবাদ)

মাছের চামড়ার জুতা

জার্ম্মানীতে নানা কৃত্রিম উপাদান প্রস্তুত হইয়া কি প্রকারে সস্তায় জিনিষ প্রস্তুতের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, সে কথা আমরা এই অধ্যায়ে কিছুকাল পূর্ব্বে কয়েক সংখ্যায়ই বর্ণনা করিয়াছি। উহার ভিতর সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন পদার্থ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ নির্ম্মাণের অন্যান্য দৃষ্টান্তের সহিত কাঠের গুঁড়া হইতে চিনি ও রুটি প্রস্তুত এবং মাছের আঁইশ হইতে জুতা তৈরীর কথা বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইটালীতে মাছের চামড়া হইতে জুতা প্রস্তুতের পরীক্ষা সফল হইয়াছে। ৩।৪ হইতে ৬।৭ পরত পাতলা পাতলা মাছের চামড়া পর পর জুড়িয়া ও চাপে জমাট করিয়া যে অভিনব 'চামড়া' তৈরী হইয়াছে, তাহা দ্বারা জুতার তলী ভিন্ন উপরের অংশ বেশ সুন্দর প্রস্তুত হইতে পারে এবং উহা টেঁকসইও হয় খুব। অথচ তুলনায় ব্যয় অতি সস্তা পড়ে। জুতা ছাড়াও হ্যাণ্ড-ব্যাগ, টেবিলের উপরকার আস্তর ও ব্রেকের নীচেকার আস্তর প্রভৃতির কাজে এই মাছের চামড়া বিস্তর ব্যবহৃত হইতেছে।

অস্ত্র-ক্ষেপণীতে মানুষ নিক্ষেপ

রোমানদের আমলে যুদ্ধাস্ত্র ছিল 'ক্যাটাপুল্ট' যাহার সাহায্যে তীর, পাথর বা এই জাতীয় পদার্থ নিক্ষেপ করা হইত শত্রুপক্ষের উপর। আমেরিকার নিউ জারসি শহরে এই জাতীয় এক ক্যাটাপুল্ট যন্ত্র সাহায্যে মানুষকে নিক্ষেপ করা হয় হ্রদের জলে। এই নিক্ষেপ কিন্তু সাজা দিবার জন্য নয়, ইহা সখের। সাঁতারের পুকুরে দেখা যায় অতি উচ্চ মঞ্চ হইতে সাঁতারুগণ লম্ফ প্রদান করিয়া ডুবের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। সেই লম্ফ প্রদানের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য এই ক্যাটাপুল্ট যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটির উদ্ভাবক ওয়ালটার বুরা। মোহক হ্রদে (নিউজারসির স্পার্টা অঞ্চলস্থ) এই কসরৎ উদ্ভাবক বুরা প্রতি-নিয়ত করিয়া থাকেন। লোহার কাঠামো—দুইটি স্তম্ভ সোজা খাড়া, তাহার গায়ে আর দুইটি লৌহস্তম্ভ হেলান ভাবে রক্ষিত। হেলান স্তম্ভ দুইটির উপর দিয়া একখানি সচল বোর্ড উপরে নীচে যাতায়াত করে তাঁবার তারে সংলগ্ন হইয়া। বোর্ডের নীচের প্রান্তে পা রাখিবার স্থান, ঐ স্থানে পা রাখিয়া সাঁতারু উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে বোর্ডের উপর। তখন যন্ত্র সাহায্যে তাঁবার তারে টান পড়ে আর বোর্ডখানি হেলান স্তম্ভের উপর দিয়া বেগে উপরদিকে উঠিয়া স্তম্ভশিরে থামিয়া যায়—শায়িত সাঁতারু সবেগে নিক্ষিপ্ত হয় শূন্যে। কাঠামোটি স্থাপিত একেবারে হ্রদের জলের উপর। কাজেই সাঁতারু নিক্ষিপ্ত হয় শূন্যে বটে, কিন্তু পরিশেষে পতিত হয় হ্রদের জলে। এইভাবে সাঁতারুর আর লম্ফপ্রদানের শ্রম স্বীকার করিতে হয় না। আপনাআপনি যন্ত্র সাহায্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়—সে নিজে প্রয়াস করিয়া আপন শক্তিতে লম্ফ প্রদান করিলে যে গতিবেগ প্রাপ্ত হইত, তাহা অপেক্ষাও ক্ষিপ্রগতিতে। এতকালের প্রাচীন সেই রোমক ক্যাটাপুল্ট (Catapult) আজ সাঁতারু ওয়াল্টার বুরার পরি-কল্পনায় নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। তবে ইহা আর মানব-হত্যার জন্য ব্যবহৃত নয়, মানুষকে আমোদ প্রদানের উদ্দেশ্যে।

গো-মেষাদির 'হেড্‌লাইট'

পল্লীগ্রামের অন্ধকারপূর্ণ রাস্তায় রাত্রিতেও গৃহপালিত গো-মেষাদি বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল রাস্তা মোটর যাতায়াতের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত হইলেও, তাহাতে আলোকদানের ব্যবস্থা নাই। ফলে অনেক সময় এই প্রকারে রাত্রি-কালে বিচরণশীল গাভী প্রভৃতির অসতর্ক অবস্থায় সহসা মোটর-যানাদি দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া উহাদিগকে দলিত-পিষ্ট

করে। এই জাতীয় দুর্ঘটনায় পর পর কয়েকটি বহুমূল্য গাভী প্রভৃতি হারাইয়া ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের এক ফার্ম্ম-মালিক গাভী প্রভৃতি পালিত পশুর শৃঙ্গে ও লাঙ্গুলে আলোকদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। ড্রাই-সেল, যাহার সাহায্যে সাধারণ টর্চ্চ প্রজ্বলিত হয়, সেই প্রকার ব্যাটারিসহ ক্ষুদ্র বাল্‌ব্ পশুগুলির শৃঙ্গে ও লাঙ্গুলে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ দ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ অন্ধকার পথের মোটর-যাত্রী বা লরীচালক এখন অনায়াসে জানোয়ারগুলিকে ঠাওরাইয়া লইতে পারে এবং যথা-সময়ে হুঁসিয়ার হইয়া দুর্ঘটনা এড়াইয়া চলিতে পারে। এখন আর ঐ ফার্ম্মের আশপাশের রাস্তায় রাত্রিকালে কোনও পালিত-পশু মোটর চাপা পড়ে না।

[illegible] ও শিক্ষা-সমস্যা

বাইরের সাজ-পোষাক দিয়ে, চেহারা দিয়ে, বিদ্যা-বুদ্ধি, আভিজাত্য, বংশ-গৌরব দিয়ে সংসার লোকের [illegible] যাচাই করে। অন্তরের মানুষটি যে এইসব বাইরের পরিচয়ের আড়ালে অতি সন্তর্পণে ডুব মেরে আছে, তাকে ক'জন জানে? যদি জানত তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পাদপীঠের উপর তার-ও ঠাঁই হত। সত্য কথা, র‍্যাফেলের আঁকা ছবি তার তুলিতে আসবে না, কিন্তু র‍্যাফেলের সঙ্গে এক জায়গায় তার তীক্ষ্ন প্রতিযোগিতা, সেখানে র‍্যাফেল তাকে হার মানাতে পারে নি: পৃথিবীর অতি তুচ্ছ জিনিষকে সে অপরূপ প্রাণবন্ত দেখেছে। ক্ষুদ্রতম তৃণাঙ্কুরে দেখেছে জীবনের বিপুল স্পন্দন, বিশ্বপ্লাবী অনুভূতির স্পর্শ-কাতরতায় তাকে-ও সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে দেখেছে, এখানে তার আসন কারও নীচে নয়।

সুব্রত ভাবছিল, ঐশ্বর্য্য চাই না, সম্মান চাই না, কিছু চাই না ; শুধু যদি নিজের শক্তি-বিকাশের যথেষ্ট পরিসর মিলত! লিওনার্ডো ডা ভিন্সি! আপেলেস্! টিম্যানথিস! ধারণার বাইরে! কত বড় শক্তি! কি মহৎ! এরা যে পৃথিবী জয় করেছে, তার বিনাশ নেই, তাতে অবসাদ নেই, তাতে পঙ্কিলতা নেই! শুধু অনাবিল আনন্দ, অনন্তের আভাস।

অজন্তার প্রস্তর মূর্ত্তি! দেহের প্রতিটি রেখা দিয়ে জীবনের অশান্ত প্রবাহ চোখে ধরা দেয়। এ শিল্প কাদের দীর্ঘদিনের সাধনার, জীবনব্যাপী তপস্যার ফল? তারাও কি তার মত নিস্তব্ধ রজনীতে দীপালোকে নিজের সৃষ্ট শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিনিদ্র চোখে তুলি হাতে জেগে কাটিয়েছে? ভোরের সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে তুলি খসে পড়েছে, ক্লান্ত দেহটা মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে এসে শয্যায় আত্মসমর্পণ করেছে আর জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে মুখের উপর বুকের উপর সারা দেহের উপর লুটিয়ে পড়েছে? তারা নিশ্চয়ই গরীব ছিল, টাকা থাকলেও তা'রা বিলিয়ে দিয়েছে। টাকা দিয়ে তাদের কি হবে? তাদের যে অসীম অখণ্ড রাজত্ব!

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ পার হতে গিয়ে আর একটু হলেই একটা লরীর নীচে পড়েছিল আর কি! না, পথে চলতে হলে আর একটু সাবধান হওয়া দরকার। ওসব চিন্তা করবার কি আর সময় নেই! কিন্তু "লাষ্ট সাপার" ছবিটা ভোলা যায় না, সত্যি চমৎকার! আর "মেডুসা'জ হেড"? অতুলনীয়!

মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট দিয়ে সুব্রত চলল। বাঁ দিকেই রাজেন মল্লিকের বাড়ী। হ্যাঁ, তার পকেটে তুলিটা আর মোমবাতিগুলো ঠিক আছে, দেশলাইটা পড়ে যায় নি ত! ক্যানভ্যাসটা বুকের সঙ্গে লাগানো, গায়ের চাদরে ঢাকা, রং এর বাক্সটা বাঁ হাতে—চাদরের নীচে। আজ সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কয়েকটা ছবির নকল করতে সে শুধু চায়। চুরি নয়, জোচ্চুরি নয়, কারো কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছা তার নেই,

[illegible] গ্রামগুলোর পুনরুদ্ধারের মত কাজ [illegible] [illegible]দের গ্রামে এসে করেছিল, প্রকাশ্যভাবে [illegible] [illegible] দিলে না ; তাতে কা'র কি [illegible] ধুতী-চাদর পরা বাঙালী সন্তানকে আমন-ই [illegible] মিনিটের জায়গায় দেখতে গেলে এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে তাড়া হুড়ো করতে আরম্ভ করে। আর চোখের উপর সে দেখেছে, পাগড়ী মাথায় মারোয়াড়ী আর হ্যাট-কোট পরা কালো সাহেবগুলো, যা'রা আর্টের 'অ-আ'ও বোঝে না, শুধু নগ্ন চিত্র দেখবার জন্য আসে, তা'রা একঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে দেখে যায় আর যাবার পথে দরওয়ানদের সিকিটা-আধুলিটা দিয়ে যায়। দুর্ভাগ্য, তা'র অত পয়সা-ও নেই, হ্যাট-কোটও নেই।

পাঁচটার সময় বাড়ী বন্ধ হবে। সে বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এখন সে ঢুকবে না, এখন মাত্র সাড়ে চারটা বাজে। সে ঢুকবে পাঁচটা বাজবার আট-দশ মিনিট আগে। গোপনে উপরে একটা ছবির হলে লুকিয়ে থাকবে এবং তারপর সমস্ত রাত ধরে ছবির নকল করবে। পরদিন যখন দরজা খোলা হবে তখন ভিড়ের সঙ্গে মিশে পড়ে নেমে আসবে।

এইবার শেষ দল যাচ্ছে। সে-ও চলল। বুকের মধ্যে কে হাতুড়ী [illegible] ছে। এখন-ও ফিরে যেতে পারে. এখনও সে কোন অপরাধ করে নি। উঃ! যদি ধরা পড়ে...সে শিউরে উঠল!

না, এতদূর এসে ফিরে যাবে? সে হয় না। আর ধরা পড়বার চেয়ে না পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। ভয় যতটা সে করছে ততটা করবার ঠিক কোন কারণ নেই হয়ত।

পনের ষোল জন দর্শকের মধ্যে সে একজন। একটা দরওয়ান উপরের হল ঘরে তাদের নিয়ে চলল। কোন্ হলে সে থাকবে? এইটায়, এই মাঝের হলটা-ই বেশ। ওই যে "কিউপিড্ ও সাইকি," ওই যে "স্যাক্রিফাইস্ অব ইফিজিনিয়া!" হ্যাঁ, আর কথা নেই। এখানেই। দরওয়ান দর্শকদের নিয়ে চলল। সে পেছন দিয়ে সরে পড়ল। কেউ দেখে ফেলল নাকি? ওই যে চশমা-পরা বুড়োটা দেখল সে দরজার আড়ালে লুকোচ্ছে। না, দেখে নি। যাক্ এবার কোথায় লুকোয়? পাঁচটা বাজতে হল-ঘরের ঘড়িটায় আর তিন মিনিট বাকী। এইবার দরওয়ান আসবে সব দরজা জানালা বন্ধ করতে। মস্ত বড় একটা ম্যাহোগ্যানি টেবিলের উপর একটা ফুলকাটা কালো চাদর বিছানো। চাদরটা মাটি পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে চারদিকে। টেবিলটার উপর প্রাচীন গ্রীক ও ইজিপশিয়ান ভাস্কর্য্যের কতকগুলো নমুনা। বেশ, এতক্ষণে জায়গা মিলল। সুব্রত সেই টেবিলটার নীচে ঢুকে পড়ল। ওঃ! টেবিলটার নীচে যা' মশা! একটাকে সুব্রত চড় দিয়ে মারল। উঃ! কী বোকা সে, যদি কেউ ওই শব্দ শুনত? দাঁত দিয়ে জিভ কাটতে

মনে মনে হাসি পেল। এই অন্ধকার টেবিলের নীচে বসে দাঁত দিয়ে জিভ কাটার কি সার্থকতা।

দরওয়ানের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা সে নিজের কানে বেশ শুনতে পাচ্ছে। নিশ্বাস গুলোয় আবার উনপঞ্চাশ বায়ু কোথা থেকে এসে যোগ দিল! উঃ! নিশ্বাস ত আর চেপে রাখা যায় না! সুব্রত মুখ-দিয়ে শ্বাস করতে আরম্ভ করল। দু-একটা শ্বাস বেশ নেওয়া চলল, তারপর আবার যে-কে-সেই। সমস্ত গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটেছে, এই শীতের সন্ধ্যায়।

দরওয়ানটা কি একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এসে জানালা-গুলো বন্ধ করে চলে গেল। এইবার সে দরজায় দরজায় চাবি লাগিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইবার সে বন্ধ। টেবিলের নীচ থেকে বেরিয়ে সুব্রত গায়ের ঘাম মুছে ফেলে টেবিলটার একটা কোণে বসে জিরুতে লাগল। এখন অসুবিধা হল আলো নিয়ে। ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাতে ভয় হয়। যদি জানালা দিয়ে কারও চোখে পড়ে যায়! মোমবাতি-ই বা রাখে কোথায়? ছবিগুলো দেওয়ালের সঙ্গে অনেক উঁচুতে। অনেক ভেবে সে মোমবাতি ধরাল। বাঃ, অ্যাপোলোর ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তিটার মাথার উপর রাখলে ত আলোটা বেশ গিয়ে ছবি দুটোর উপর পড়ে! খুশীতে মন ভরে উঠল। এইবার ক্যানভাসটা এঁটে নিল ডায়নার একটা মূর্ত্তির সঙ্গে, তা'র হরিণের একটা শিংএর সঙ্গে ক্যানভাসের উপর দিকটা, নীচের দিকটা তার হাতের একটা তীরের সঙ্গে।

তারপর নিঃশব্দে ক্যানভাসের উপর তুলির দাগ পড়তে লাগল। এক একটা আঁচড়ে জীবনের অভিব্যক্তি এক এক ধাপ এগিয়ে আসছে। "কিউপিড্‌ ও সাইকি।" নিদ্রিত কিউপিডের শিয়রে দাঁড়িয়ে দীপ হাতে সাইকি। এতদিন সে জেনে এসেছে, গভীর অন্ধকার রাতে যা'র সঙ্গে তা'র মিলন হয়, অতি কুৎসিত ভয়ঙ্কর তার চেহারা। তা'ই এত-দিন সে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু আজ যখন তা'র সংশয় মেটাতে দীপ হাতে সে এসে তা'র প্রিয়তমের শিয়রে দাঁড়াল, তখন সে কি দেখছে? চোখকে কি অবিশ্বাস করবে নাকি? এই দেব-নিন্দিত কান্তি, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ পুরুষোচিত দেহ! অজানা ভয়, আনন্দ তা'র বুকের মধ্যে কোলাহল আরম্ভ করে দিয়েছে। দীপ শিখার সঙ্গে সঙ্গে সেও কাঁপছে। ধন্য শিল্পী! প্রদীপের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে সুপ্তিমগ্ন বীরের মুখের উপর। অতি সন্তর্পণে সাইকি তাকে দেখছে। ধীরে ধীরে শ্বাস টানছে, ওর ঘুম ভেঙে না যায়। উঃ। কি আনন্দ! পুরোন প্রিয়জনকে নূতন করে পাওয়ার আনন্দ! তা'র মত সুখী কে? কিউপিড্‌ আজ তোমার ঘুম ভাঙুক, আমি তোমায় বলব, তোমায় আমি চিনেছি, তোমায় জেনেছি।

টং—টং। দুটা বেজে গেল! ভোর পর্য্যন্ত যতটা হয় হবে, তার পরে বাড়ী গিয়ে তা'র স্মৃতি আর কল্পনা বাকীটা পূরণ করবে। তুলিটা রেখে সে একটু বস্‌ল। দাঁড়িয়ে আর থাকা যায় না। পকেট থেকে দুটো কেক্‌ বার করে নিয়ে খেতে লাগল। ওঃ! 'ভেনাস্‌ অ্যান্ড অ্যাডোনিস্‌'-এর যদি একটা 'পেন্সিল-স্কেচ্‌' নেওয়া যেত! সময় কই! তেষ্টা পেয়ে গেল। যাক—জল একরাত্রি না খেলে-ও খুব চলে যাবে।

টং! আড়াইটা! এর মধ্যে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল! না, না, দেরি করলে তা'র চলবে না। সুব্রত উঠে পড়বে এইবার। আহা, অ্যাফ্রোডাইটের ডান হাতটা কে ভাঙলে? সমুদ্রে তোমার ঘর? তুমিই বোধ হয় ভারতের উর্ব্বশী। ডায়না ঝুঁকে পড়ে তার দিকে চেয়ে আছে। কিরাতিনী বেশ, চুলগুলো ঝুঁটিবাঁধা, কোমলতার গন্ধও নেই, তেজোদীপ্ত, পুরুষোচিত বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্ত্তি। অ্যাফ্রোডাইট আর অ্যাপোলোর পাশে তোমার মূর্ত্তি কেন? সন্ধ্যায় সমুদ্র-তীরে আডোনিস্‌ ভেনাসের দিকে চেয়ে আছে। ভেনাস সলজ্জা, স্মিত হাসি ঠোঁটে, মুখ নীচু। শিল্পী, তোমার নিজের জীবনের ছবিখানি অজ্ঞাতে পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেলে নাকি!

অ্যাফ্রোডাইট-এর ডান হাতখানা ভাঙা! পাথরের মুখে-ও কি বেদনার রেখা ফুটে ওঠে নি! পাথর? ছিঃ, পাথর কেন? অ্যাফ্রোডাইট! অজুত বৎসর আগে যে মুকুলিত যৌবনা কুমারী অ্যাফ্রোডাইট সমুদ্র-শয়ন থেকে উঠে এসেছিল, সেই অ্যাফ্রোডাইট! ডান হাতটা ভেঙে গেছে? দাও, দাও, চাদরটা দিয়ে ওর হাতটা ঢেকে দাও। এ দৃশ্য দেখা যায় না। কি করুণ! হ্যাঁ, হাতটা ঢেকে দিই, সুব্রত ভাবল। "আফ্রোডাইট অ্যানাডাইওমিন্‌"—অ্যাপেলেস্‌-এর অ্যাফ্রোডাইট!

টং—টং—টং। তিনটে বাজল? সে কি ঘুমিয়েছে? না, না, ওই যে "ইন্‌ফ্যান্সি অব জুপিটার।" উঃ! ধন্য তুমি রোম্যানো! ওই যে ছোট শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবন প্রতি নিশ্বাসে নিজেকে ব্যক্ত করছে। কি তেজোময়, বুদ্ধির কি দীপ্তি।

এই যে চারদিক থেকে এসে সবাই সুব্রতকে ঘিরেছে। সেত তাদের-ই একজন। "ডেথ অব অ্যাকিলিস্‌"। আঃ, শুধু পায়ে একটা সামান্য তীরের খোঁচায় এত কাতর? এতেই মৃত্যু? হেক্টরের মৃতদেহ কে রথের চাকায় বেঁধে টেনে নিয়ে চলল? একিলিস্‌? ছিঃ, এই তুমি ট্রয়-যুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান বীর! "হেলেনস্‌ চেম্বার।" প্যারিস বিদায় নিচ্ছে। ভাগ্যের দাস! হেলেন নিস্তব্ধ। দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে সারথি। প্যারিসের বিদায়ের দেরিতে তার মুখে বিরক্তির রেখা। মেনেলাউস্‌ পোষাকে মুখ ঢেকে আছে। ওই তরবারি ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠল। চোখ বোজ ইফিজিনিয়া!

টং—টং—টং—টং—টং। পাঁচটা !!! কি ঘুমই তাকে পেয়েছিল! ওঃ! দরজা জানালা কেউ খোলেনি ত! যখন খুলবে তখন কি করে পালাবে সে। ছবি দেখতে লোক আসে এগারটা থেকে। এতক্ষণ কি করে সে থাকবে? ওঃ, ছবিটা অনেক বাকী রয়ে গেল! যাক, বাকী থাক্‌, এখন সে বেরুবে কি করে? নাঃ, এমন দুর্ব্বুদ্ধি তা'র কেন হল?

(শেষাংশ ১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পল্লী সংগঠন ও শিক্ষা-সমস্যা

ডক্টর সুধীর সেন

যেদিন থেকে যন্ত্র-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট কলকারখানার আবির্ভাব হ'ল, সেদিন থেকে কল-কারখানাকে ঘিরে দ্রুতগতিতে গড়ে উঠতে লাগল বড় বড় শহর, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল পল্লী ও শহরের মধ্যে এক নূতন প্রতিযোগিতা। যন্ত্র-যুগের শহর তার বহুবিধ বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে লাগল পল্লীবাসীকে। আজ শহর ও পল্লীর যে সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকারে এ দেশেও দেখা দিয়েছে, সমস্ত পৃথিবীকেই তার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কোন দেশেই আজও তার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নি। কিন্তু তা' হ'লেও বিদেশ ও আমাদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ রয়েছে। আমাদের সমস্যা একাধিক কারণে অনেক ব্যাপকতর ও গভীরতর।

প্রথমত, ইউরোপীয় দেশগুলোতে যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার ও নগরের উদ্ভব, এ দু'য়ের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছিল। নাগরিক জীবনের বিলাসিতার উপকরণ স্বদেশের চতুঃসীমানার মধ্য হইতেই আসত। সে বিলাসিতা তাই দেশকে দরিদ্র করে নি। এমন কি, গ্রামও তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, বরং লাভবানই হয়েছিল। কারণ, শহরবাসীদের আয় অনেকগুণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের জন্যেও তাদের ব্যয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাদের দেশ সম্বন্ধে একথা খাটে না। কল্‌কাতার মত শহরের বিলাসিতার সাজ-সরঞ্জাম কোথা হ'তে আসছে, একটু তলিয়ে দেখলেই এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে। সমগ্র দেশের দিক দিয়ে দেখতে গেলে একে ধার-করা টাকায় বিলাসিতা বললে অত্যুক্তি হবে না।

দ্বিতীয়ত, যে যুগে ইউরোপীয় দেশগুলোতে যন্ত্র-বিপ্লবের প্রবর্তন হয়েছিল, সে যুগে সেখানে অতি-জনতার সমস্যা ছিল না। যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মেনীতে গ্রামের জন-সংখ্যা হয় হ্রাস পেয়েছিল, নয়ত অপরিবর্ত্তিত ছিল। ভারত-বর্ষের অবস্থা অন্যরূপ। যে হারে আমাদের জন-সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তাতে এমন আশা আমরা করতে পারিনে যে, ভবিষ্যতে গ্রামের জন-সংখ্যা হ্রাস পাবে বা অপরিবর্তিত থাকবে এবং জন-সংখ্যার বৃদ্ধি শুধু শহরেই পর্যবসিত হবে। তাই আধুনিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে আপনা হতেই আমাদের গ্রাম-সমস্যার সমাধানের সূচনা হবে মনে করা মস্ত বড় ভুল। তাই গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার আমাদের প্রয়োজন রয়েছে।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের আরও একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যাপক নিরক্ষরতার হাত থেকে ইউরোপ নিজেকে দীর্ঘ-কাল হ'ল মুক্ত করেছে। সেখানে জনসাধারণের অধিকাংশই নিজের মঙ্গল নিজে রক্ষা করে চলতে জানে। গ্রামবাসীদের মধ্যেও দূর-দৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীলতার অভাব নেই। আমাদের পল্লীবাসী-দের বেলা সেকথা প্রযোজ্য নয়। বাঙলার পল্লীর কল্যাণ বিধানের ভার দীর্ঘকাল ধ'রে ন্যস্ত ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সহৃদয় সহন-শীল নেতার উপর। অনেকে আজ সজোরে আমাদের নগরমুখী স্বভাবকে সমর্থন ক'রে বলেন যে, গ্রামের জনসংখ্যা এত বেশী যে যতই শহরের দিকে জনস্রোত প্রবাহিত হবে, ততই গ্রামের কল্যাণ হবে। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, কথাটা কেবল **সংখ্যার** নয়। সাধারণত যাঁরা শহরের দিকে চলে যান, তাঁরাই ছিলেন পুরুষানু-ক্রমে পল্লী-জীবনের অবলম্বন, তার স্তম্ভস্বরূপ। তাঁদের অনুপস্থিতিতে পল্লীর প্রাণ যায় ক্ষীণ হয়ে, পশ্চাতে রেখে যান অজ্ঞ, আত্মনির্ভরহীন জনসমষ্টির ক্রমবর্দ্ধমান দৈন্য আর হাহাকার। বাঙলার আনন্দোজ্জ্বল পল্লী আজ সেনাপতিহীন সৈন্য দলের মত বিশৃঙ্খলার প্রতীকরূপে বিদ্যমান।

দেশে ফেরার পর থেকে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে এ সত্যই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। ভাঙন সেখানে এতদূর এগিয়েছে যে, ভারাক্রান্ত মন অনেক সময় এই ক্ষয়িষ্ণু গ্রামগুলোর পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দিহান না হয়ে পারে নি। আমাদের গ্রামে এসে তাই এবার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যদিও অতীতের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের উল্লসিত হবার কোনও কারণ থাকে না এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি নিরুদ্বেগ হ'তে পারেন না, তা হ'লেও এখন পর্যন্ত এ গ্রামের অবস্থা বাঙলার বহু গ্রামের চেয়ে ভাল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। এর বড় কারণ এই যে, সৌভাগ্যক্রমে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি যাঁদের উপর পড়েছে, তাঁদের স্নেহদৃষ্টি আজও এই পল্লীর উপর জাগ্রত রয়েছে, পৈতৃক ভিটার সঙ্গে তাঁদের যোগ-সূত্র আজও ছিন্ন হয় নি। পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে সকলের এই সম্মেলনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সম্মেলন ক্ষণস্থায়ী হ'লেও এর প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হ'তে পারে না। পল্লী-জীবনে নেতৃত্বহীনতার যে সংকট সম্বন্ধে ইতিপূর্বে ইংগিত করেছি, এই উপস্থিতির ফলে অন্তত আংশিকভাবেও তার ক্ষতিপূরণ হয়। শিক্ষিত নেতৃস্থানীয় গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে তাঁদের দরদের চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে গ্রামের জনসাধারণ উৎসাহিত হয়। যাঁরা গ্রামের বাইরে থাকেন, তাঁদের মারফৎ গ্রামের অধিবাসীদেরও বহির্জগতের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় এবং অনেক দিক দিয়ে এদের দৃষ্টি প্রসার লাভ করে।

কিন্তু লাভ কেবল একপক্ষের নয় লাভ উভয় পক্ষের। একটানা শহরবাসের মধ্যে একটা বিপদ আছে। দেহের ও মনের স্বাস্থ্য তাতে অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে মন যে সজীবতা লাভ করে, শহরে তা অনেক স্থলেই সম্ভব নয়। গ্রামে প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে ব্যাপক আত্মীয়তা মনকে সরল ও উদার করে, তাকে অস্বীকার করে যাওয়াই শহরের অনিবার্য রীতি। সবুজ প্রকৃতির ক্রোড় হ'তে বিচ্ছিন্ন মনকে অতিমাত্রায় এসে জুড়ে বসে কল-কোলাহল, সিনেমা-থিয়েটার, ইট-পাটকেল। যে দেশে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ গাছপালা, লতাপাতার সঙ্গে মানব-মনের নিগূঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন, সে দেশে সভ্যতার নামে প্রকৃতির প্রতি এই ক্রমবর্দ্ধমান ঔদাসীন্য, নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

শহরবাসের এ বিপদ সম্বন্ধে ইউরোপ কোনদিনই সম্পূর্ণ চেতনা হারায় নি। কর্মজীবনের বিপুল তাড়নার মাঝখানে যখনি একটু ফুরসৎ মেলে, ইংরেজ চলে যায় তার পল্লীনিবাসে। সপ্তাহান্তে শহরের বাইরে গিয়ে ঘুরে আসা অন্যান্য দেশেও প্রথারূপে পরিগণিত হ'তে চলেছে। ইটালী ও জার্মেনীতে রাষ্ট্রচালকগণ এ প্রথাকে নানা উপায়ে দৃঢ়ীভূত করবার চেষ্টা করছেন। ইউরোপের অনেকগুলো বড় শহর প্রকৃতিকে নির্মূল করে গড়ে উঠেছিল। বর্ত্তমানে শহরকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ট্রেন ও ট্রামের সাহায্যে দ্রুত গমনাগমনের ব্যবস্থা করে পল্লী ও শহরের এক নূতন সমন্বয়ে পৌঁছবার প্রয়াস চলছে। শহরের মাঝখানে বড় বড় পার্কের ব্যবস্থা হচ্ছে, রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাছ পোতা হচ্ছে। শহর একদিন গ্রামকে উপেক্ষা করে তার পাষাণ প্রাচীর নিয়ে দম্ভ ভরে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছিল, আর নিজেকে একটা জেলখানায় পরিণত করতে চলেছিল; আজ সেই শহরই গ্রামকে তার বুকের মাঝখানে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে রাখবার জন্যে চারদিকে ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করছে।

বলছিলাম, গ্রামের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে আমরা গ্রামকে দরিদ্র করি, নিজেরাও দরিদ্র হই; গ্রামের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে গ্রামের উদ্ধারের পথ সুগম করি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও লাভবান্ হই।

এক্ষেত্রে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, এই গতি ও চাঞ্চল্যের

যুগে আমাদের জীবনের ধারা ক্ষুদ্র পল্লীর সীমা লঙ্ঘন করে চারদিকে প্রবাহিত হয়ে যেতে বাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও নিজের গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষত, দূরে বসে গ্রামের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় সফল হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। শুধু বাৎসরিক সম্মেলনও তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই পল্লীকে পুনরায় গড়ে তুলতে হ'লে বা তাকে তার দ্রুত অধোগমনের পথ হ'তে রক্ষা করতে হ'লে চাই নূতন নেতা। গ্রামে যাঁরা বার মাস বাস করেন, তাঁদের প্রাণশক্তিকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হ'বে, যেন তাঁদের মধ্যে কর্মোদ্যম ও আত্মনির্ভরশীলতা জেগে উঠে যাতে করে প্রয়োজনমত তাঁদের মাঝখান থেকেই নূতন নেতার উদ্ভব হ'তে পারে। শহরের এক সপ্তাহের বা এক মাসের ধার-করা নেতৃত্বে গ্রাম সারা বছর বেঁচে থাকতে পারে না।

চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করতে হ'লে সবার আগে চাই সত্যিকার শিক্ষা। চিত্তের উন্মেষের প্রয়োজন কেবল পুরুষের নয়, মেয়েদেরও রয়েছে। মানুষ যেমন শুধু এক পায়ের উপর নির্ভর করে স্বচ্ছন্দগতিতে চলতে পারে না, তেমনি কোনও জাতিও তার অর্ধেককে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে এই গতিশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। নারী-শিক্ষার অভাবে দেশ এতদিন চলছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তা' ছাড়া পুরুষ ও নারীর চিন্তাধারায় একটা সামঞ্জস্য না থাকলে আদর্শ গৃহ-রচনা সম্ভবপর হয় না। যে পরিবারে স্বামী তার শিক্ষার ফলে অনেক আচার ও অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করে চলতে চায় এবং শিক্ষা হ'তে বঞ্চিতা স্ত্রী তার অক্ষুণ্ণ রক্ষণশীলতা নিয়ে পুরাতনকে ষোল আনা আঁকড়ে ধরে থাকে, সেখানে গোড়াতেই গৃহ-বিবাদের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠে। লক্ষ্মীর যে বরপুত্রের অকুণ্ঠ স্নেহ এতদিন নানাদিক দিয়ে আমাদের পল্লীর পুষ্টিসাধন করে এসেছে, এদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি দেখে এ গ্রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হই। নারী-শিক্ষার যে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কামনায় আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তাতে তাঁর শুধু হৃদয়বত্তার নয়, দূরদর্শিতারও প্রমাণ পাচ্ছি।

সুশিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভর করছে দেশের সমগ্র ভবিষ্যৎ। 'সুশিক্ষা' শব্দটার উপসর্গটি এক্ষেত্রে অবান্তর নয়। এক শতাব্দীর অধিককাল ধ'রে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা চলে এসেছে। আজ তার হিসাবনিকাশ করে অনেকেই উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। বর্তমান শিক্ষার প্রতি অসন্তোষ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। যদিও শিক্ষার সঙ্কট ও তার প্রতিকারের কথা নিয়ে চারদিকে বহু গবেষণা চলেছে, তা হ'লেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, আদর্শ শিক্ষার রূপ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের ধারণা আজও নিতান্ত ঝাপসা।

ইতিপূর্বে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নিশ্চল চিত্তকে ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্যে, যেন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মানুষের মন আদ্যোপান্ত ভেবে পথের সন্ধান পায়। কার্যত দেখতে পাচ্ছি সত্যিকার স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তেমনভাবে জেগে উঠেনি। এর মধ্যে যে একটি বৃহৎ বিপদ রয়েছে সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই সচেতন। ইতিহাসের ধারা বেয়ে আমরা এসে পেঁাছেছি আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে। যান-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব এত কমে গিয়েছে যে, ভারতবর্ষ নিজেকে আর সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কথা ভাবতে পারে না। পশ্চিমের ঢেউ প্রবলতর হয়ে এসে পড়ছে আমাদের উপর। চারদিকে ভাঙনের যুগ সুরু হয়ে গেছে। এ কথা জোর করে কে বলতে পারে যে, এই তরঙ্গাভিঘাতে কেবল সেই অংশটাই বিলীন হয়ে যাবে, যা বিলীন হওয়া উচিত এবং রক্ষণার্হ যত কিছু সব আপনা থেকেই রক্ষিত হবে? স্রোতে গা ভাসিয়ে চললে তার অনিবার্য ফলস্বরূপ একদিন হয়ত দেখব যে ঠিক উল্টোটাই ফলেছে, অর্থাৎ যা রাখা উচিত ছিল তাই গেছে ভেসে, আর যা চলে যাওয়া উচিত ছিল, আবর্জনার মত তাই রয়েছে আমাদের জড়িয়ে। বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালে এ বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকতে পারে না। পদে পদে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে বিদ্রোহী হওয়া প্রয়োজন, সেখানে আমরা রক্ষণশীল, আর যেখানে রক্ষণশীল হওয়া প্রয়োজন, আমরা সেখানে বিদ্রোহী। অন্ধ অনুকরণ বা অন্ধ রক্ষণশীলতার বিপুল বিড়ম্বনা থেকে কবে আমরা নিজেকে মুক্ত করব?

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর অবধি বাণিজ্যের উত্তাল ও পঙ্কিল ঢেউ এসে আমাদের বহু পুরাতন কুটির-শিল্পকে নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে প্লাবন এসেছিল রোগ ও দুর্ভিক্ষের অগ্রদূত হয়ে। ভারতের অনশনক্লিষ্ট, জরাজীর্ণ পল্লীতে পল্লীতে সেদিনের নির্মম অভিনয় আজও মূর্ত হয়ে রয়েছে। ভয় হয় পাছে ভাবজগতের অবাধবাণিজ্য ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করে আমাদের অন্তরের দারিদ্র্যকেও বাড়িয়ে দিয়ে যায়।

ভাবের রাজ্যেও তাই রক্ষাশুল্কের কথাটা নেহাৎ অবান্তর নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাই হল সত্যিকার রক্ষাশুল্ক, আত্মরক্ষার একমাত্র বর্ম। রামমোহনের যুগ হতে বহুবার শুনে এসেছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করতে হবে। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বহুবার ঐ একই বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ নীতি গ্রহণ করার পরও থেকে যায় তার প্রয়োগসমস্যা। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আজ আমাদের জানবার প্রয়োজন, পুরাতনের কতখানি আমরা রাখব এবং কেন রাখব, কতখানি বর্জন করব এবং কেন করব; পশ্চিমের কাছ থেকেই বা কতখানি গ্রহণ করব এবং কেন করব, কতখানি গ্রহণ করব না এবং কেন করব না। এর জন্যে প্রয়োজন আমাদের অতীতকে ও বর্তমান ইউরোপকে নিখুঁতভাবে জানা। যে সমাজসৌধ ভারতবর্ষ বহু যুগের সাধনায় গড়ে তুলেছিল, তাতে আজ অনেক ফাটল দেখা দিয়েছে এবং স্থানে স্থানে তার ইঁটপাটকেলও খসে পড়েছে সত্য, কিন্তু মোটের উপর অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, সে এতদিন কালের আক্রমণ সফলতার সঙ্গেই প্রতিহত করেছে। সেখানে সংস্কারের অধিকার কেবল তারি আছে, যে আমাদের পূর্বপুরুষদের স্থাপত্যবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছে। অসম্পূর্ণ শিক্ষার বিপদ আজ আর শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিকতার মোহ শিক্ষিত মেয়েদেরও বহুলাংশে আক্রমণ করেছে। সে সম্বন্ধে দুটো কারণ অবহিত হওয়ার সময় এসেছে। প্রথমত, মেয়েদের অশিক্ষার একটা সুফল এই ছিল যে, তাদের রক্ষণশীলতা পুরুষকে পুরাতনের গ্রন্থি ছিন্ন করে বহুদূরে চলে যেতে দেয়নি। ভুল পথে চলার চেয়ে নিশ্চলতাও বাঞ্ছনীয় এবং ভুল পথে যাওয়ার বিপদ যেদিন পদে পদে দেখা দিয়েছিল, সেদিন মেয়েরা তাদের গতি কিয়ৎ-পরিমাণে সংযত করে দিয়েছিল। একই শিক্ষার ফলে যদি মেয়েদের মধ্যেও অন্ধ অনুকরণেচ্ছা প্রবলভাবে দেখা দেয়, তবে ভুলপথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া আর তেমন অসম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, বেশী দিন হয়নি এদেশে নারী-শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে। এরি মধ্যে এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় জেগে উঠেছে। শিক্ষার ত্রুটির জন্যে যদি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সু-শিক্ষার চেষ্টা না করে নারী-শিক্ষা স্থগিত রাখার চেষ্টা হয়, তবে তাকে দেশের পক্ষে মস্ত একটা দুর্ভাগ্য বলব।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, যে ইউরোপকে অনুকরণ করি বলে আমরা মনে করি, অনেক ক্ষেত্রেই তার স্বরূপ আমাদের কাছে অপরিচিত, তার সত্যিকার প্রাণের স্পর্শ আমরা আজও পাইনি। ইউরোপীয় সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধেও তাই অনেক সময় আমরা অস্পষ্ট বা ভুল ধারণা পোষণ করি। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে এরা গৃহকলার যে সামঞ্জস্য করে নিয়েছে, তাতে আমাদের মেয়েদের জন্যও গ্রহণযোগ্য উপকরণ

যথেষ্ট রয়েছে। ব্যতিক্রম থাকলেও একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষিত ইউরোপীয় নারী গৃহকর্মকে শৃঙ্খল বলে মনে করে না, বরং তার হৃদয় এবং বুদ্ধি দুই-ই সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের মধ্যেই সর্বাগ্রে নিজের সর্বোচ্চ সার্থকতার সন্ধান করে। শিক্ষার ফলে তারা অধিকতর নৈপুণ্য ও তৎপরতা সহকারে গৃহকাজ সম্পন্ন করতে পারে, তাই জ্ঞান ও আনন্দ সঞ্চয়ের জন্যও এদের যথোচিত অবকাশ মিলে। শিক্ষিতা ফরাসী রমণী পুরুষানুক্রমে রন্ধনকলায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে আসছেন। খাদ্যের পুষ্টিকরতা না কমিয়ে তাকে সুস্বাদু করার চেষ্টা এতকাল ধরে চলে আস্‌ছে বলেই ফরাসী রন্ধনকলা সমগ্র পশ্চিমে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। ঘরকে সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা ইউরোপের সব দেশের মেয়েদের মধ্যেই রয়েছে। বিলাসিতা আর সুরুচি এক জিনিষ নয়। ব্যয়ের মাত্রা না বাড়িয়েও সুরুচির পরিচয় দেওয়া যায়, মেয়েরা এখানে নিজেদের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে ধনীদের ঘরে প্রবেশ করেও অনেক সময় যে বিশৃঙ্খলা ও রুচিহীনতার পরিচয় পাই, ইউরোপে তা অকল্পনীয়। রুচি চর্চার প্রয়োজন আজও আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি। অথচ চরিত্র গঠনের জন্য এর বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে। চোখ যার সৌন্দর্য সম্বন্ধে একবার সচেতন হয়েছে, মনও তার জীবন থেকে অসুন্দরকে বিসর্জন দেবার জন্যে স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। শিশুপালনে সাধারণ ইউরোপীয় রমণী যে দক্ষতা দেখিয়ে থাকে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও তা বিরল। এ জাতীয় বহু দৃষ্টান্তের অনায়াসেই উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নে।

বিদেশে শিক্ষালাভের সার্থকতা নিজের দেশকে অস্বীকার করে না, সে জ্ঞান জাতীয় পুষ্টিসাধনে প্রয়োগ করার মধ্যে। শহরে গিয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সার্থকতা গ্রামের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে নয়, পল্লীজীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করার মধ্যে। কৈবর্ত, মুচি, তাঁতি, ছুতোর, কুমোর—এদের শিক্ষার সার্থকতা পৈতৃক বৃত্তি বা "স্ব-ধর্ম" বর্জন করে নয়, প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে সে বৃত্তিতে অধিকতর কৃতিত্ব ও পারদর্শিতা প্রদর্শনের মধ্যে। তেমনি নারীশিক্ষার সার্থকতা অন্তঃপুরকে অবহেলা করে নয়, বাইরে থেকে লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাকে সুন্দরতর করে তোলার মধ্যে। নারীশিক্ষা সেদিনই সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করবে, যেদিন এ শিক্ষার ফলে মেয়েরা স্বাস্থ্য, রুচি, শৃঙ্খলা ও আনন্দের মধ্যে এক নূতন সামঞ্জস্য স্থাপনে সমর্থ হবে।

শিল্পী

(১৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ও কি? তালা খোলার শব্দ হচ্ছে না? তাড়াতাড়ি সে গিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকল। ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলো এর আগেই সে টেবিলের নীচে রেখে দিয়েছে। একটা লোক ঘরে ঢুকে জানালাগুলো একে একে সব খুলে দিয়ে একটা বড় লম্বা ঝাঁটা দিয়ে হলঘরটা ঝাঁট দিতে লাগল। সর্ব্বনাশ! এবার আর উপায় নেই। লোকটা যে এ দিকেই আসছে। এইবার সে ধরা পড়েছে, আর দেরি নেই। বাঁ হাত দিয়ে টেবিলের কাপড়টা তুলে ডান হাত দিয়া ঝাঁট দেবার জন্য নুয়ে সে যেমনি এগিয়েছে অমনি সুব্রত তার নজরে পড়ে গেল। লোকটা চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল—"কোন্ হ্যায়রে?" আর সময় নেই। কোন অজুহাতও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। টেবিলের নীচ থেকে বেরোতেই লোকটা তাকে ধরতে ছুটে এলো। প্রাণপণ এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে আসছে। কর্কশ কণ্ঠে "পাকড়ো, চোর ভাগ্ যাতা হ্যায়—" বলতে বলতে ঝাড়ুদারটা পেছনে তাড়া করে আসছে। সিঁড়ির মুখেই একটা ভোজপুরী দরওয়ান তাকে ধরে ফেলল। চেঁচামেচিতে বাড়ীর লোকজন ছুটে এলো। চাকর-বাকর, দরওয়ানগুলো সকলে জড় হয়েছে। ঝাড়ু-দারটাকে সে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল, সে এসেই প্রথমে দু-ঘা বসিয়ে দিল। তারপর চারদিক বাঙালী, হিন্দুস্থানী ও উড়ের হাতের নানারকম প্রহার ও তিনটে মিশ্রিত ভাষার গালির মধ্যে সুব্রত শুনতে পেল,—

"তেজ সিং, বাবুকো ছোড় দেকে হামারা পাশ আনে দেও।"

এক চশমা-আঁটা প্রবীণ বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি প্রশ্ন করলেন—ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, এ দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল কেন বাপু?

সুব্রত সব কথা খুলে বলল।—তা' ছবি আঁকবে, আমাকে জানালে হত।

সুব্রত নীরব। সে একবার জানিয়েছিল, হুকুম পায় নি।

দারওয়ানের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—বাবুকো যানে দেও।

ধীরে ধীরে সুব্রত গেট পার হয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল, পাঞ্জাবীটা একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছে। কপালের ডান দিকটা বোধ হয় কেটে গেছে, ঘাম মুছতে গিয়ে একটু রক্ত লাগল আঙুলে। মাথাটা ঘুরছে। ইচ্ছে করছে রাস্তায়-ই শুয়ে পড়ে, চলবার শক্তি নেই। একটা রিক্‌শ-ওয়ালা এগিয়ে বললে—"বাবু, রিক্‌শ?"

সুব্রত বললে "চল্।" গাড়ীতে উঠ্‌তে যেতে রিক্‌শ-ওয়ালা হাত ধরে তুলে দিতে গেল। ও ভেবেছে সুব্রত নেশা করেছে। সুব্রত বললে—"দরকার নেই।" রিকশ-র পরদা টেনে দিতে বললে, পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

বাঁ হাতের ক্যানভাসের ছবিটা ওরা দুমড়ে' দিয়েছে। একেবারে নষ্ট হয় নি তবু। ওঃ, ঘুমিয়ে না পড়লে আরো হল না, ওইটুকু সময়ে কি পারা যায়!

হাতে খড়ি

(গল্প)

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নীলিমার ছোট সংসারটি আজ উন্মনা। ব্যাপারটা ত আর যা-তা নয়। আজ তার একমাত্র সন্তান—সাত বছরের ছেলে বাবলু—সর্বপ্রথম স্কুলে যাইতেছে।

বাবলু কি আর সে-বাবলু আছে! মা তাই বার বার ছেলেকে আজ তার ভাল নাম 'সুরজিৎ' বলিয়া ডাকিতে চায়। তবু অভ্যাস দোষে, মুখ হইতে কেবলি খসিয়া পড়ে 'খোকন', নয় ত 'বাবলু'। তা পড়ুক, তবু খোকা আজ নিঃসন্দেহে শ্রীমান্ সুরজিৎ রায়!

নীলিমা শশব্যস্ত। চাকরটারও সোয়াস্তি নাই—কেবলি ফরমাস। বাবলুর হৃদয়ও দুরুদুরু করে আনন্দে আর আতঙ্কে। স্কুল আর যাহাই হউক্ বা না হউক্, মামারবাড়ী যে নয় এ-বোধ তার টন্‌টনে। বাবার কাছে একটা বছর 'ঘোড়ায় চড়িল, আছাড় খাইল' করিতে যাইয়া মাঝে মাঝে কিল-চড়টা বড় কম হয় নাই। তবু কোথায় যেন, কিসের যেন, প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে বছর সাতেকের অর্ধস্ফুট এক কিশোর মন।

সারা সকাল নীলিমার আজ ফুরসৎ নাই এতটুকু। রান্নার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। খোকার ধোপদস্ত জামা-কাপড় কোঁচাইয়া গোছাইয়া রাখিয়াছে বহুক্ষণ। খানিক কাজলও প্রস্তুত। ভৃত্য ভজুয়াকে দিয়া বিল্বপত্র, আম্রপল্লব আর ধান-দুর্বা যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। আজ তার, তার খোকার আর তার বাবার জীবনে যে বিশেষ একটা দিন! সেই একরত্তি শিশু বাপ-মার সতর্ক চোখের উপর দিয়াই দেখিতে দেখিতে কবে যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই অতি-প্রত্যক্ষ নিঃশব্দ সত্যটা কেহ যেন জানিতেই পারে নাই। যাক্, নীলিমার খোকা সত্যই তবে বড় হইয়াছে! সম্মুখে তার এক সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অস্পষ্ট পথ। আজ গৃহে তাই জয়যাত্রার মঙ্গলাচরণ!

"শুনছ?"

বিশ্বজিৎ শুনিয়াও শোনে না। স্ত্রী এবার আরও কাছে আগাইয়া যায়।

"তুমি ত আজ দেরি করে বেরুবে, না?"

"হুঁ"—নথিপত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দেয় বিশ্বজিৎ।

নীলিমা অনুনয়ের সুরে জানাইল, "তুমি ওকে আজ ইস্কুলে দিয়ে এস না।"

এই লইয়া বার চারেক নীলিমা একই অনুরোধ জানাইল স্বামীকে।

"ভজুয়া দিয়ে আস্‌বে'খন। আমার আজ অনেক কাজ।—ও-বাসার মণি, পল্টু, ধীরু তারাও ত যাবে। তাদের সঙ্গে—"

"তোমার যত কথা! পল্টু-মণিরা আজই যেন প্রথম ইস্কুলে যাচ্ছে? আর, তাদের সঙ্গে বুঝি ওর তুলনা?"

"বটে!—তোমার ছেলে কোন্ নবাব নবকেষ্ট এল, শুনি?" বলিয়া বিশ্বজিৎ হাসিতে থাকে।

নীলিমা রাগিয়া ওঠে, "অ্যাঁ! কত কাজ তোমার তা-কি আর জানি না! নরহরিবাবু আজ আসেন নি তাই, নইলে ত এতক্ষণে গান্ধী আর সুভাস বোস্ নিয়ে পাড়াটা মাথায় করে তুলতে।

বিশ্বজিৎ হাসে। ছেলের ভর্তি হওয়া সম্পর্কে সব কিছু ব্যবস্থা সে কালই করিয়া রাখিয়াছে। হেড্ মাষ্টার শিবরামবাবুর সঙ্গে তার হৃদ্যতা যথেষ্ট। বাকী আছে শুধু আজ বুক্-লিষ্ট পাইলে বাবলুর বইগুলি কিনিয়া দেওয়া।

তবু স্ত্রী কি-না খোঁচা দিতে ছাড়ে না। কানের দুল-জোড়া নাচাইয়া মন্তব্য করিল, নিজের ছেলেকে এমন হেলা-ফেলা ভূ-ভারতে কেহ কোনদিন করে নাই।

অভিযোগটা পুরোপুরি স্বীকার করিয়া লইয়া বিশ্বজিৎ আবার কাজে মন দেয়। নীলিমাও কানের কাছে আবার করে ঘ্যান্ ঘ্যান্, "তুমি বুঝি কোনদিন আর ছোট ছিলে না?"

"ওই তোমার কেমন স্বভাব! একটুতেই উতলা হও। ছেলেকে চিরকাল তোমার আঁচলে বেঁধে রাখবে নাকি? এই করেই ছেলে মানুষ করবে, তা হলেই হয়েছে!—ছেলে-পুলেকে সাহস শেখাতে হয়। এই বয়স থেকে যদি—"

"ঢের হয়েছে, থাম।" নীলিমা বাধা দিয়া কহিল, "সবতাতেই কেবল লেক্‌চার!—প্রথম দিনটায় মন খারাপ অমন সবারই হয়। তুমিও এক লাফে এতটা বড় হয়েছে কি-না!

যাহাকে লইয়া এত বাদানুবাদ, সেই বাবলু আসিয়া হাজির। পিতা হাসিয়া কহিল, "কিরে খোকা, তুই একা স্কুলে যেতে পারবি নে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বাবলু ঘাড় নাড়ে সম্মতিসূচক।

"ওরে দস্যি ছেলে!" নীলিমা ছেলের কাছে আগাইয়া গেল দোর-গোড়ায়, "অমন দুঃসাহস করিস্ নি কখনো।"

"আমি একাই যেতে পারব মা। সেদিন ও-বাসার কালুদা'র সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি না!—থানার কাছেই ত আমাদের ইস্কুল, তারপরই লোন-আপিস্, খানিক পরেই ডাকঘর, তারপর মধু কুণ্ডুর গদি, তার পাশ দিয়েই ত আমাদের রাস্তাটা এসেছে। আমি ঠিক চিনে যেতে পারব মা।"

বাবলু গড় গড় করিয়া সারা পথটা মুখস্থ বলিয়া যায়। মায়ের প্রাণ কিন্তু শঙ্কায় কাঁপিয়া ওঠে। কিসের আশঙ্কা তাহা নীলিমাই কি ছাই ভাল করিয়া জানে! মফস্বল শহর। ট্রাম-বাস্ নাই। মোটরের উৎপাতও যৎসামান্য। স্বামী তার অল্পদিনেই বেশ পসার-প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছে। তার ছেলে পথ ভুলিয়া গেলেও এই ছোট্ট শহরে হারাইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবু নীলিমার কেমন যেন ভয়! অবশ্য হাসিয়াই কহিল, "বাপ্‌কা ব্যাটা।"

বাবা ছেলেকে আবার উস্কাইয়া দিল, "আজ ভজুয়া

নিয়ে যাবে। কাল থেকে কিন্তু তুই একা একা স্কুলে যাবি। ভয় কী!"

নীলিমা ফোঁস করিয়া ওঠে, "তুমি ছেলেকে অমন আস্কারা দিও না ব'লছি।"

"আমি পথ চিনি মা," বাবলু সগর্বে জানাইল, "পল্টুদাও ত একা যায় একা আসে।"

"যার খুশী সে আসুক্। তুই যদি অমন কাজ কখনো করিস! তাহ'লে বাড়ি এলে টের পাবি," মা শাসনের ভয় দেখায়।

ছেলে আপাতত চুপ করিল। সংকল্পটা মনে মনেই রাখে। স্কুলের রাস্তা কোন্ ছার, দু'চারদিনের মধ্যেই মাকে সে প্রমাণ দিয়া ছাড়িবে, এক ক্রোশ দূরে সেই রহমৎপুরের মাঠে—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার কাছে গত চৈত্র সংক্রান্তিতে যে মস্ত বড় মেলা বসিয়াছিল, সেখানটায়—বাবলুও একা গিয়া একাই ফিরিয়া আসিতে পারে।

বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছে। নাছোড়বান্দা গৃহিণীরই জয় হইয়াছে।

এদিকে নীলিমা ছেলেকে সাজাইতে ব্যস্ত। গেল পূজার জরীর আঁচ-দেওয়া কাপড়খানি পরিয়া, সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া, মুখে খানিক পাউডার মাখিয়া খোকা এখন বাবলুও নয়, সুরজিৎও নয় বোধ হয় নীলিমারই বিমুগ্ধ মনের সকৌতুক মন্তব্য অনুসারে—বিয়ের বর আর কি!

বাবলু এতক্ষণ কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু চোখে কাজল সে কিছুতেই পরিবে না। সে যেন এখনও ছোট-ই আছে!

মা-ছেলের সহাস্য হাতাহাতির মাঝখানে বিশ্বজিৎ মুখ ধুইয়া ঘরে ঢুকিল।

"এ্যাঁ! এ যে একেবারে রাজপুত্তুর! ছেলে তোমার দিগ্বিজয়ে বার হচ্ছে বুঝি?"

বাবলু লজ্জায় মুখ লুকাইল মায়ের বুকে। নীলিমাও হাসি চাপিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিল, "তোমায় কোন কাজের কথা ব'ললে তখন ঠ্যাং খোঁড়া হয়, আর অ-কাজের বেলায় পঞ্চমুখ," বলিয়া বাবলুর সলজ্জ মুখখানি জোর করিয়া তুলিয়া ধরিল, "লজ্জা কিসের, মুখ তোল। বোকা কোথাকার!—তুই যেন ওঁর মত গেঁয়ো পাঠশালায় পড়তে যাচ্ছিস্। সেদিন বুঝি আর আছে? মুখ তোল্"

বিশ্বজিৎ প্রস্তুত হইয়া লইল। স্কুল হইয়া কোর্টে যাইবে।

"আর একটা অনুরোধ আমার রাখবে আজ?"

"কী?"

"আগে কথা দাও?"

"বল না কী করতে হবে?"

"তোমার কোর্টে যাবার পথেই ত পোষ্টআপিস! মার টাকাটা আজ তুমিই পাঠিয়ে দাও। কাল পাঠান হয় নি।"

নীলিমার হঠাৎ এমনধারা অনুনয়ে বিশ্বজিৎ একটু বুঝি বিস্মিত হয়। প্রতি মাসে নীলিমাই ত নিজের হাতে কুপন লিখিয়া ভজুয়াকে দিয়া তার শাশুড়ীর নিকট টাকা পাঠাইয়া দেয়!

বিশ্বজিৎ জবাব দিল, "আমার সময় হবে না। ভজুয়াই পাঠিয়ে দেবে।"

"ভজুয়া না আজ খোকার টিফিনের সময় খাবার নিয়ে যাবে?"

"সে ত দেড়টার সময়। তিনটে অবধি মানি-অর্ডার নেয়।"

"তোমায় দিয়ে যদি কোন উপকার হয়। ছেলে বটে!" বলিয়া নীলিমা রাগ দেখাইয়া বাহির হইয়া যায়।

মঙ্গলঘটের কাছে কপাল ঠেকাইয়া, দুর্বা বেলপাতা মাথায় লইয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া বাবলু তার বাবার সঙ্গে বার-দুয়ারটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে অনেকক্ষণ। নীলিমা তবু একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। খোকা আর সে খোকা নাই! দস্তুরমত শ্রীমান্ সুরজিৎ রায়।

ফিরিয়া আসিয়া নীলিমা এই অসময়ে বিছানায় শুইয়া পড়িল। চাকরটার ভাত ত বাড়াই রহিয়াছে।.........

খোকা সত্যই তবে বড় হইয়াছে। স্কুলে যাইতেছে, আর সব ছেলের মতই। পুত্রকে দিয়া নীলিমার ভবিষ্যৎখানি কত সুখের স্বপ্নে বোনা। তবু এই ছন্দোময় বর্তমানের বুকে কোথায় যেন, কেন যেন, বেশ একটু বেসুরা বাজে।

বিছানার উপর উঠিয়া বসিল নীলিমা। রাস্তা দিয়া লোক চলিয়াছে আপন আপন কাজে। স্বামী কাজে বাহির হইয়াছে। খোকারও এতদিনে স্বতন্ত্র কাজ সুরু হইল। তার নিজের ও গৃহস্থালির শেষ কোথায়?

নীলিমা আজ বুঝিতে পারে অনেক কিছুই। অন্তত আজ হইতে বুঝিল ত বটেই। মনের দুয়ারে যত সব অশিষ্ট প্রশ্নের আঘাত সুরু হইয়াছে। একে একে মনে পড়ে সব খুঁটিনাটি। এই ত সবে আট বছরের কথা! ইহারই মধ্যে কোথাকার জল কোথায় যে গড়াইল!

ভজুয়া আসিয়া ডাকিল, "মা, নাইতে যান।—বারোটা বেজে গেছে।"

"যাক্"—নীলিমা পাশ ফিরিয়া শোয়। কি একটা অস্পষ্ট কথা যেন আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চায়। আর, সেই কথাটা পরিষ্কার করিতে গেলেই সহসা টান পড়ে তার গোটা বিবাহিত জীবনের উপর।...........

শাশুড়ী তাকে কোন দিনই সুনজরে দেখিলেন না। এ কি কম দুঃখের কথা! ছেলে তার গ্রামের হাই স্কুলে মাষ্টারি লইয়া মায়ের কাছে জীবন কাটাইতে রাজী হইল না এত অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও, সে-ও কি নীলিমার অপরাধ?......

বিশ্বজিৎ-এর সেই উচ্চ আশার চারা গাছ মহীরুহ হইতে পারে নাই। কলিকাতায় সুবিধা হইল না। গেল মফস্বলে। আজ ছয় বৎসর এখানে আসিয়া পসার তার মন্দ জমে নাই। নীলিমা ত ইহাতেই সুখী। স্বামীর মনের দৃষ্টি কিন্তু এখনও পড়িয়া আছে কলিকাতা হাইকোর্টে। আশা ছাড়ে নাই। আরও কিছু টাকা জমিলেই শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

মায়ের শুশ্রূষার জন্য ছেলে তার বৌকে দেশের বাড়ীতে কেন রাখে না, সে-কথার জবাবও নীলিমা দিবে না কি? শাশুড়ীর মত তাঁর শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার মত অন্ধ আসক্তি না থাকিলেও, সে কোনদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যাইবার বায়না ধরিয়াছিল কি? অথচ শাশুড়ী আজ সাত বছর ধরিয়া যখন-তখন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সকল কাজের কলকাঠি বলিয়া দোষারোপ করিয়া আসিতেছেন পরের মেয়েকে। ওদিকে তাঁর নিজের তিনটি মেয়েই না যার যার স্বামীর কর্মস্থানে ঘরসংসার করিতেছে নির্বিবাদে! শাশুড়ীও নিশ্চিন্ত। মেয়েদের সৌভাগ্যে একটু গর্ব্বিতও বটে। একেই বলে ধর্ম।

কিন্তু নীলিমার অধর্মের ভয় আছে। যে না ছেলে তার শাশুড়ীর! চিঠিপত্র দিয়া মায়ের খোঁজ খবর লইবার ভারটাও স্ত্রীর উপর ফেলিয়া দিয়া খালাস। নীলিমাকে তাই প্রতি চিঠিতেই লিখিতে হয়—উনি সব সময় কাজে ব্যস্ত। ভালই আছেন। পৃথক পত্র দিলেন না। ইত্যাকার।

বাড়ীর চিঠি আসিলে স্বামী অবশ্য জিজ্ঞাসা না করেন এমন নয়—মা কি লিখেছেন গো? ভাল আছেন? ছোড়দিকে কাছে এনেছেন? মলিনার আবার সন্তান-সম্ভাবনা? মাকে তবে দশ টাকা বেশী পাঠাবে এবার। ইত্যাদি।

শাশুড়ীও চিঠি দেন—বিশু কেমন আছে? কখনও বা, খোকার কোর্ট বন্ধ হইবে কবে? আমার দাদু কেমন আছে? তাকে কিন্তু মারধর করিও না, আমার মাথার দিব্বি বৌমা! এবম্প্রকার।

ছেলে বটে! মার কাছে নিজের হাতে দু'ছত্র লিখিলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়! আজ ত এত করিয়া অনুরোধ করিল নীলিমা, তবু মার কাছে মানি অর্ডারটা করাইতে পারিল?

শাশুড়ীর উপর আজ সত্যই নীলিমার বড় মায়া হয়। সারা বছরের মধ্যে পূজার সময় দিন কয়েকের দর্শন পাইয়া মায়ের প্রাণ কত ভাবে কত দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে নীলিমা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে। ছেলে কি কখনও পর হয় কোনদিন—যতই কেন না দোষারোপ করুনঃ পুত্রকে তার পুত্রবধূ গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। নীলিমা অমন মেয়েই নয়। নহিলে, শাশুড়ীর অদৃষ্টে অনেক কিছুই লেখা ছিল। কি হইত? কি যে হইতে পারিত তাহা হইলে, সেই কথাটার মুখ চাপা দিয়া নীলিমা সহসা উঠিয়া দাঁড়ায়। একটার সময় ভজুয়া বাবলুর খাবার লইয়া যাইবে আর ফিরিবার পথে ডাকঘর হইয়া শাশুড়ীর এ-মাসের টাকাটাও পাঠাইয়া আসিবে।

"হ্যাঁরে ভজুয়া।" গৃহকর্ত্রীর ডাকে ভজুয়া আসিয়া কাছে দাঁড়ায়।

"দেশে চিঠি দিস্ তুই?"

ভজুয়া মাথা নাড়ে।

"তোর মাও লেখে না?"

"না।"

"কেন?—আমায় বললে, তোর চিঠি বুঝি আমি লিখে দিতে পারি না?—হতভাগা!"

বেলা তিনটা বাজিয়া যায়। তবু ভজুয়ার দেখা নাই। হতভাগা কোন্ আড্ডায় ভিড়িয়া গিয়াছে।...............

নীলিমা উদ্গ্রীব হইয়া আছে। খোকার একটা খবর চাই। নিশ্চয়ই তার মন আজ কেমন-কেমন করিতেছে। মাকে ছাড়িয়া এতক্ষণ কোনদিন কোনখানেই কাটায় নাই সে। হয়ত অপরিচিত সহপাঠীদের মধ্যে প্রথম দিনটায় সে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। মার কথা, বাড়ীর কথা বার বার মনে পড়িতেছে নিঃসন্দেহে।

স্কুলে আর তেমন মারধর করে না। নীলিমা শুনিয়াছে, বেত-মারা বে-আইনী আজকাল। মাঝে মাঝে একটু-আধটু চোখ-রাঙান, বড় জোর মৃদু কানমলা বা চড়-চাপড়—ইহার বেশী আর কিছু নয়। তা-ও আজ প্রথম দিনেই বাবলুকে কিছু বলিবে না তারা। তবু নীলিমার ভয় করে—কেমন যেন অস্পষ্ট অসহ্য আতঙ্ক।

বার-দুয়ারে শব্দ পাইয়া নীলিমা ডাকিয়া কহিল, "ভজুয়া এসেছিস?"

"হ্যাঁ মা।"

"এত দেরি হ'ল যে?"

দেরী হইবার সঙ্গত কারণের অভাবে ভজুয়া চুপ করিয়া রহিল।

"খোকাকে তুই নিজের হাতে খাইয়ে এসেছিস্ ত?"

"হুঁ।"

"দুধ সব খেলে? ফেলে দেয় নি ত?"

"না।"

খানিক নীরব থাকিয়া নীলিমা আবার প্রশ্ন করে, "খোকা কিছু বল্‌লে?"

"না।"

"কিছ্ছু না?"

প্রশ্নটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া ভজুয়া গৃহকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বাড়ি আসতে চাইলে না?"

"না মা।"

"তোকে আমার কথা কিছু জিগ্‌গেস করলে না?"

"উঁহু।"

নীলিমা আর উচ্চবাচ্য না করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। বাড়ীর জন্য বাবলুর মন এখন ছট্‌ফট্ করিতেছে নিশ্চয়ই। ভজুয়াটা আস্ত গর্দভ। তলাইয়া বুঝিতে জানে না কোন কিছুই।

খানিক বাদে আবার ডাকে নীলিমা, "ভজুয়া!"

"যাই মা।"

ভজুয়া হাজির।

"মার টাকা পাঠিয়েছিস্?"

"হ্যাঁ"—ভজুয়া রসিদ বুঝাইয়া দিয়া ফিরিয়া চলিল।

"ভজুয়া!" ভজুয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়।

"খোকাকে তুই কোথায় দেখ্‌লি? ক্লাসের মধ্যে, না বাইরে?"

"বাইরে।"

"কি করছিল তখন?"

"খেলছিল।"

"খেলা করছিল?"

"হ্যাঁ মা। ইস্কুলের সামনে যে ছোট মাঠ আছে সেখানে ছেলেদের সঙ্গে বুড়ি-ছোঁওয়া খেলছিল।"

"আচ্ছা; তুই যা এবার।"

ভজুয়া চলিয়া গেল। নীলিমা যেমন ছিল তেমনি বসিয়া আছে। খোকা একটিবারও মার কথা জিজ্ঞাসা করে নাই! বিচিত্র কি! বাঘের বাচ্চা আজ রক্তের স্বাদ পাইয়াছে!

সংকীর্ণ গৃহের বর্ণ-পরিচয় সাঙ্গ করিয়া আজ যে বাবলু বৃহত্তর বাহিরে অবাধ গতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতে গিয়াছে। খোকা ডাগর হইয়াছে! বাড়িতেছে ক্ষণে ক্ষণে, অবাধে, দিনে দিনে, অবলীলাক্রমে—নীলিমার জাগ্রত মনের উপর দিয়া জানিতে ও অজানিতে। বাড়িয়া চলিয়াছে সব কিছুই। চতুর্দিকে শুধু নিরবিচ্ছিন্ন হওয়া আর হইয়া-ওঠা!

ঘণ্টা দেড়েক বাদে নীলিমা জানালার কাছে গিয়া বসিল। চারটা বাজিয়া গিয়াছে। ভজুয়া বাবলুকে আনিতে গিয়াছে আধ ঘণ্টার উপর হইবে। তবু দেখা নাই।

নীলিমা চাহিয়া আছে। চৌধুরী সাহেবের বৈঠকখানার সম্মুখের ঐ ছোট্ট ফুলের বাগানটার কোল ঘেঁসিয়া রাস্তাটা যেখানে নীলিমাদের শোবার ঘরের জানালাটার দৃষ্টিপথের মধ্যে হঠাৎ একটা পাক খাইয়া অদৃশ্য হইয়াছে সেখানটায় কখন খোকার মুখখানি মার নজরে পড়িবে।..............

শাশুড়ীর মত তারও আজ হইতে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবার পালা সুরু হইল। তফাৎ শুধুঃ একজন করে মাস গণনা, আর একজন ঘণ্টার হিসাব রাখে। নীলিমা যেন আজই পুরাপুরি মা হইল—সাত বছর আগে নয়।...........

আরও আধ ঘণ্টার মত দেরী করিয়া রাস্তার বাঁকে ভজুয়ার সঙ্গে নীলিমার খোকা এতক্ষণে দেখা দিল। নীলিমা ছুটিয়া গেল বার-দুয়ারে। কিন্তু খানিকক্ষণ কেমন যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খোকার ত শুকনো মুখ-চোখ নয়! হাসিতেছে। নীলিমার এতক্ষণের উন্মন প্রতীক্ষা বাবলুর খুশীর গায় যেন ধাক্কা খাইয়া ভাঙিয়া পড়িল দারুণ হতাশায়।

"দাঁড়াও, আগে আমার বই-শেলেট সব রেখে আসি," বলিয়া জননীর প্রসারিত বাহুর আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া বাবলু পড়ার ঘরে ঢুকিল।

"হ্যাঁরে ভজুয়া, তোদের আসতে এত দেরি হল কেন?"

"আর বলো না মা! খোকাবাবু বুঝি কথা শোনে আমার!—খানিকটা পথ এসেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। ডাক-বাংলায় এক সাহেব এসেছে, তাকে না দেখে আসবে না। ডাকঘরে গিয়ে টেলি-করা আজই দেখা চাই।"

"তুই বাধা দিস্‌নি কেন?"

"আমায় ধমকে ওঠে যে," বলিয়া ভজুয়া হাসিয়া ওঠে, "জলের কলের কাছে এসে আর উঠতেই চায় না। কাল দেখাব বললাম, কানে কথাই তোলে না! কি সাহস খোকা-বাবুর, মা! দুগ্‌গো বাড়ির পুলের উপর উঠে রেলিং ধরে ঝুলতে চায়।"

নীলিমা রুখিয়া ওঠে, "তোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না বাপু। রাস্তা দ্যাখ্। একটা ছোট ছেলেকে বাগ মানাতে পারিস না!—বসিয়ে বসিয়ে কে কোথায় খাওয়াবে যা না সেখানে।"

ভজুয়া ত অবাক! ভাবিয়াছিল, খোকাবাবুর বীরত্বের ফিরিস্তি পাইয়া গৃহকর্ত্রী বুঝি খুশীই হইবেন। ফল যে হইল উল্টা। ভজুয়া আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরিয়া পড়ে।

নীলিমা বার কয়েক ডাকাডাকির পর বাবলু এতক্ষণে মার কাছে আসিল।

"চট করে খেয়ে নে।"

"আমার এখন খিদে পায়নি মা।"

দৃঢ়কণ্ঠে মা কহিল, "পেয়েছে। দুধের সরটা আগে খেয়ে ফ্যাল।—তোর কখন খিদে পায়, না-পায়, তা বুঝি তোর কাছ থেকে আমি শিখতে যাব?"

বাবলু গায়ের জামাটা ছাড়িয়া দুধের বাটিটা টানিয়া নিল। মনে তার আজ সহস্র জিজ্ঞাসা। এতদিন মাঝে মাঝে ভজুয়ার সঙ্গে অল্প সময়ের ফাঁকে যে-বহির্জগতের মৃদুমন্দ আভাস পাইয়া আসিয়াছে, আজ তার অবারিত আস্বাদের ছাড়পত্র মিলিয়াছে চিরদিনের জন্য।

নীলিমা বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে সন্তানের মুখখানির দিকে।

"পড়া জিগ্‌গেস্ করেছিল?"

"প্রথম দিন বুঝি পড়া দিতে হয়!—তুমি কিচ্ছু জান না মা।"

নীলিমা নিষ্পলক চোখে খানিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি না হয় জানিই না, তাই বলে অমন করে বুঝি মায়ের কথার জবাব দিতে হয়?"

খোকা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। নীলিমা তাকে কোলে টানিয়া বিছানার এক কোণে বসিয়া পড়িল।

"খোকা! আজ বাড়ির জন্যে তোর মন কেমন করছিল, না রে?"

"না ত।"

"নিশ্চয় করেছে। ভজুয়ার সঙ্গে তখন বাসায় আসবার জন্য মনে মনে ছটফট করেছিস, কেমন?"

পুত্রের নিকট হইতে এবার কোন জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই ধরা গলায় নীলিমা বলিয়া চলিল, "ভয় কি রে বোকা! চিরকাল তোকে আমি আগ্‌লে থাকব না কি? এখন না তুই বড় হয়েছিস্!"

জননীর কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তনটা বুঝিতে না পারিয়া বাবলু জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া রহিল।

"খোকন!"

"কী মা?"

(শেষাংশ ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ ও শিশু-মন

রবীন্দ্রনাথ মজুমদার

ইংলণ্ডের "সাউথ ওয়েসেক্স স্কুল বোর্ড" কিছুদিন আগে একটা পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষাটির উদ্দেশ্য, যুদ্ধ সম্বন্ধে বালক-বালিকাদের মনোভাব কি তারই একটা রেকর্ড সংগ্রহ করা।

যদি যুদ্ধ বাধে এই আশঙ্কায় ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি বহু আগে থেকেই তৈরী হচ্ছিলেন। অবশেষে যুদ্ধ বাধল এবং গত মহাযুদ্ধের সময় যেমন একটা আকস্মিকতা সমস্ত দেশেরই জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবার-কার যুদ্ধে তা আর হয়নি। এর কারণ এই যে, অনেক আগে থেকেই লোকে এই যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিল; এবং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর গতশক্তি জার্ম্মানীর নিস্জীবতার সুযোগ নিয়ে যথাসম্ভব তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেঁটে ফেলে যে ভার্সাইয়ের সন্ধি গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যেই এই যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বুঝেছিল যে, মহাযুদ্ধের পর জন-সাধারণ যুদ্ধের নিরর্থকতা, অসারতা আর মহাক্ষতিময় পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। সুতরাং যথাসময়ে যাতে জনমত যুদ্ধের বিরোধিতা না করে ও যুদ্ধে যোগদানে বাধা না দেয় তার জন্যে প্রচারকার্য্যের বিরাম ছিল না। যুদ্ধের ভূমিকা অবলম্বন করে মনোরম প্রেমের উপন্যাস লেখা হ'ল এবং কিশোররা সেই বই পড়ে বুঝল যোদ্ধা না হ'লে নারীর শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া যায় না; কিশোরীরা বুঝল বন্দুক ঘাড়ে যারা মানুষ মারতে যায় তারাই যথার্থ প্রেমাস্পদ। শিল্পীকে দিয়ে গবর্ণমেণ্ট ছবি আঁকিয়ে নিলেন, বিজয়ী সৈনিকরা তোরণের নীচ দিয়ে নিজ নগরে ফিরছে, পথের পাশে তরুণীরা মহোল্লাসে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে আর সেই ছবি দেখে তরুণদেহে পুলকের রোমাঞ্চ খেলল। যুদ্ধের বীভৎস নগ্ন অঙ্গে গাম্ভীর্য্যময় প্রশান্তির পোষাক পরিয়ে দিয়ে কবিতা রচিত হ'ল এবং তার ভীষণ সৌন্দর্য্যের মহিমা পাঠকচিত্তকে অভিভূত করল। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও লোকে পূর্ব্বস্মৃতি ভোলেনি। দিকে দিকে প্রচারের অভিযান চালিয়েও লোক যে খুব বেশী প্রভাবান্বিত হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উক্ত স্কুল বোর্ডের রেকর্ড থেকে,—মনে রাখতে হবে, যারা পরীক্ষা দিতে বসেছিল তাদের সবাই বালক-বালিকা, কারুরই বয়স বারর বেশী নয় এবং এদেরই প্রভাবান্বিত করা সবচেয়ে সোজা —সিনেমার সাহায্যে, গল্পের বইয়ে সৈন্যদের বীরত্ব কথা খুব ফলাও করে লিখে এবং আরও নানা উপায়ে। কিন্তু তবুও এরাও যে বুঝতে শিখেছে এবং এই বোঝাটা যে যুদ্ধের অনুকূলে নয়, তা এই প্রশ্নোত্তর থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে।—

পরীক্ষার্থীদের সবশুদ্ধ পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিভিন্ন প্রশ্নের যা উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, সংখ্যানুসারে তা এই ঃ—

১। যুদ্ধকে তুমি সমর্থন কর কি?

হ্যাঁ—১ জন

না—৩৮১ জন

২। ভবিষ্যতে আর একটা যুদ্ধ হোক, তুমি কি তাই চাও?

হ্যাঁ—১ জন

না—৩৮১ জন

এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে একই ব্যক্তি "হ্যাঁ" লিখেছিল এবং সে একটি বালিকা।

৩। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে কি কি করা উচিত বলে তোমার মনে হয়? কতকগুলি উত্তরের নমুনা—

অস্ত্র ত্যাগ ও অস্ত্র সংবরণ করা—১২৩ জন

"লীগ অফ্ নেশনস্"-এ মিলিত হওয়া—১২২ জন

সমস্ত দেশকে নিয়ে সন্ধি ও সর্ত্ত করা—৮৫ জন

বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচার করা—৩৯ জন

যুদ্ধ বাধবেই; সুতরাং কিছু করবার নেই—১০ জন

ডিক্টেটরশিপ্ ধ্বংস করা—২ জন

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা—১ জন

৩৮২ জনের মধ্যে একজনও যে সাম্যবাদকে ভালবেসেছে এবং যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে সাম্যবাদকেই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে গ্রহণ করেছে, এতে ভবিষ্যতের বিশ্বজাগতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আশাবান্ হবার কারণ আছে।

৪। যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার মতামত এককথায় প্রকাশ কর ঃ প্রধান উত্তরগুলির মধ্যে কয়েকটা ঃ

যুদ্ধ একটা বিভীষিকা—৩৮০ জন

যুদ্ধ অতি কুৎসিৎ জিনিষ—৩৫৪ জন

যুদ্ধ করাটা বর্ব্বরতা—৩৩৩ জন

যুদ্ধ জিনিষটা বোকামি এবং অপ্রয়োজনীয়—২৮৩ জন

যুদ্ধ করাতে বীরত্ব আছে—১৮২ জন

যুদ্ধ ব্যাপারটা ভারী রোমাঞ্চকর—৫৯ জন

যুদ্ধ হচ্ছে একটি গৌরবময় শক্তিপরীক্ষা—৯ জন

এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৬০০ জনার মধ্যে ১৩০০ জনাই যুদ্ধ অপছন্দ করে।

৫। "অল্ কোয়ায়েট্ অন্ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট" ছবিখানা দেখে কোন্ জিনিষটা তোমার মনে সবচেয়ে বেশী ছাপ দিয়েছে?

উল্লেখযোগ্য উত্তরগুলি এই রকম ঃ—

মৃত্যুর বিভীষিকা ও আহতদের মরণ-যন্ত্রণা—১৭৫ জন

আহতদের শুশ্রূষার কাজ—৫৯ জন

সৈন্যদের দুঃখদুর্দ্দশা ও উপায়বিহীনতা—৪৩ জন

সৈন্যদের অমানুষিকতা—৩৮ জন

বৈজ্ঞানিক মিলিকান ও কালিফোর্ণিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীসুধীরকুমার বসু

সুবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ রবার্ট এন্ড্রুজ মিলিকান সম্প্রতি ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছেন। বিজ্ঞান-জগতে মিলিকানের নাম সুপরিচিত। ১৯২৩ সালে এই মার্কিন বৈজ্ঞানিক পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তকারী গবেষণা করিয়া নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আধুনিক যুগে পরমাণু-কণা যে ইলেকট্রনের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, তৎসম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করিয়া তিনিই প্রথম উহার পৃথক্ অস্তিত্ব নির্ণয় করেন। আলোকতড়িৎ-বিজ্ঞান (photo-electric) সম্পর্কেও তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন। ফলে, রঞ্জনরশ্মি ও আলোকের পার্থক্য বিজ্ঞানীদের মনকে আজ আর তেমনভাবে আলোড়িত করে না। উপরোক্ত গবেষণার পুরস্কারস্বরূপ মিলিকান 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করিলেও বিজ্ঞান-জগতে তাঁহার যে গবেষণা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সমধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯২৮ সালে ডাঃ মিলিকান পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান, সুদূর মহাকাশ হইতে যেন একপ্রকার রশ্মি অবিরত পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। শক্তিশালী এক্স-রে হইতেও এই রশ্মি বহু গুণে শক্তিশালী। কোন কিছু বাধা ইহার পথরোধ করিতে পারে না। ভূগর্ভ ভেদ করিয়া ইহা পাঁচশত হইতে ছয়শত ফুট পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। এক্স-রে সীসার সামান্য স্তরও ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু ব্যোম হইতে নির্গত এই রশ্মি ১৮ ফুট পরিমিত সীসাস্তর ভেদ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়; জাগতিক কোন বাধাকেই ইহারা বাধা বলিয়া মানিতে চাহে না। বলা বাহুল্য, মিলিকানের এই পরম আবিষ্কার বিজ্ঞানীমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যোমরশ্মি কোথা হইতে কেমন করিয়া উদ্ভব হইল, আজ বিভিন্ন দেশে তাহা নিয়া বহু বৈজ্ঞানিক নানারূপ পরীক্ষায় নিরত আছেন। আবিষ্কর্তা নিজেও তাঁহার সন্ধানে ফিরিতেছেন। তাঁহার ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যও তাহাই।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে স্থানবিশেষের উচ্চতার তারতম্য অনুসারে ব্যোমরশ্মির শক্তি পরিমাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। বায়ুমণ্ডলের স্তর অনুযায়ীও ইহার শক্তি-পরিমাণের পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাশূন্যের কোথায় এই অদ্ভুত রশ্মির উদ্ভব হইতেছে, তাহা জানিতে হইলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে এরূপ রশ্মির পরিমাণ কিরূপ তাহা জানা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের আবহ-বিভাগের সহিত ব্যবস্থা করিয়া গত কয়েক বৎসর যাবতই ডাঃ মিলিকান এরূপ তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় আবহ-বিভাগের সহযোগিতাও তিনি লাভ করিয়াছেন। সুদূর আকাশে বেলুন প্রেরণ করিয়া বেলুন-মধ্যস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির 'রেকর্ড' হইতে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা ব্যোমরশ্মির রহস্য উদ্ঘাটনে কম সহায়তা করে না! ভারতীয় আবহ-বিভাগও এভাবে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। 'ব্যোমরশ্মির' রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে কত উচ্চে ইহার শক্তি-পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী, তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। ডাঃ মিলিকান গত দুই বৎসর যাবৎ এ সমস্ত বিষয়ে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত রশ্মির রহস্য উদ্ঘাটনে প্রাচ্যদেশে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা-কার্য তাঁহাকে আরও অধিক সহায়তা করিতে পারিবে, এই বিবেচনায় তিনি সুদূর আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছেন।

ডাঃ মিলিকানের বয়স এখন ৭১ বৎসর। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তারিখে ইলিনয়েস প্রদেশের অন্তর্গত মরিসনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯১ সালে ওহিওর অন্তর্গত ওবারলিন কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইবার পর ১৮৯৫ সালে মিলিকান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার্থ ইউরোপে গমন করেন। বার্লিন ও গটিংগেনে শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৯০২ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন।

১৯২১ সালে ডাঃ মিলিকানের জীবনে যে আহ্বান আসে, তাহা শুধু তাঁহাকেই গৌরবান্বিত করে নাই, পরন্তু তাহা দ্বারা বিজ্ঞানও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে জেম লিক নামে একজন মার্কিন ধনী বহু অর্থব্যয়ে কালিফোর্নিয়াতে একটি শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা করিয়া ডাঃ মিলিকানকে তাহার ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর ন্যায়ই মিলিকান এই দুরূহ ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সুপরিচালনায় কালিফোর্নিয়ায় যে শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সুনাম আজ শুধু আমেরিকা মহাদেশেই সীমাবদ্ধ নহে, যেখানে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর আলোচনা হয়, এরূপ প্রত্যেক দেশেই 'কালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট্ অব টেকনোকোলজী'র বা

সংক্ষেপে 'Caltech'-এর নাম পরিচিত। 'Caltech' কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিজ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন দুরূহ বিষয়গুলি নিপুণভাবে সমাধান করিতে পারে, এরূপ একদল গবেষককে নূতনভাবে গড়িয়া তোলার আদর্শ নিয়াই 'ক্যালটেক্' প্রথম হইতে কার্যারম্ভ করে। ডাঃ মিলিকান কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা আসিয়া বহুবাজার 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেসন অব সায়েন্স'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে "কালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট্ অব টেকনোলোজী"র যে ইতিহাস বর্ণনা করেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, সুযোগ্য পরিচালকের হাতে ধনীর অর্থব্যয় কিরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং বে-সরকারী দানে জগতে কি এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ডাঃ মিলিকান উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। তাঁহার পরিচালনাধীনে এখানে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়াছে, তাহা হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের বিরাট কর্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সুদূরে আকাশের বহু-দূরবর্তী জ্যোতিষ্কের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অভাব বহুদিন যাবতই অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এরূপ দূরবীক্ষণ-যন্ত্র নির্মাণ করা সহজসাধ্য নহে। কালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউটের কর্মিগণ কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ বহুতর কর্মীর সম্মিলিত চেষ্টায় তাঁহারা যে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ-যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, আধুনিক যুগেও তাহা কম আশ্চর্যের নহে। পালোমার পর্বতে এই বিরাট দূরবীক্ষণ-যন্ত্রটি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। বলা বাহুল্য, জ্যোতির্বিদগণের হাতে 'ক্যালটেক্' এইভাবে যে শক্তিশালী যন্ত্র তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা দ্বারা অনন্ত আকাশের অনন্ত রহস্য উদ্ঘাটনে ভবিষ্যতে কম সহায়তা হইবে না!

কালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউটের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ভূকম্প সম্পর্কে গবেষণা। কালিফোর্নিয়ায় প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে কি-ভাবে ধন-প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ তৎসম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করেন। 'ক্যালটেক' তাহার কর্মপ্রচেষ্টা শুধু গবেষণাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নাই। ভূতত্ত্ব, ভূকম্প-বিজ্ঞান, গণিত-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণের কয়েক বৎসরের সম্মিলিত পর্যবেক্ষণের ফলে আজ এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা ভূকম্প সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা দ্বারা বিজ্ঞানের জ্ঞান-ভাণ্ডার বিশেষ-ভাবেই পুষ্ট হইয়াছে। কালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউটে এভাবে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে যে সমস্ত কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা হইতেই এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, ডাঃ মিলিকানের অসাধারণ পরিচালন ক্ষমতাই এই প্রতিষ্ঠানকে এরূপ জগৎ-বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে। ডাঃ মিলিকান শুধু বিজ্ঞানের সাধক নহেন, ধনীর অর্থকে বিজ্ঞানের সেবায় কি-ভাবে নিয়োগ করিতে হয়, তাহারও তিনি পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমেরিকার বহু ধনকুবের আজ বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বহু অর্থদান করিতেছেন।

ডাঃ মিলিকান নিজের সাধনাতেই সন্তুষ্ট থাকেন নাই। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার বহু ছাত্রকেও নবভাবে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র ডাঃ এণ্ডারসন কালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট হইতেই গবেষণা করিয়া 'পজিট্রন' আবিষ্কার করেন ও ১৯৩৬ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানের সাধনায় ডাঃ মিলিকান জীবনে বহু পুরস্কারই লাভ করিয়াছেন। তবু ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেসন অব সায়েন্স এই উপলক্ষে ডাঃ মিলিকানকে যে "জয়কিষণ সুবর্ণপদক" পুরস্কার দিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই গৌরববোধ করিতে পারি।

পশ্চিম-আফ্রিকা—গাম্বিয়া

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

(৩)

পশ্চিম আফ্রিকার ভূগোল ইতিহাস আপনারা অনেক পাবেন। সে সব কথা তুলে আপনাদের সময় বৃথা নষ্ট করতে চাই নে। তবে আফ্রিকার ভিতর গাম্বিয়া হ'ল ইংরেজের সবচেয়ে প্রাচীন উপনিবেশ। আফ্রিকার উপনিবেশেরও আদি—একথা বলা চলে।

গাম্বিয়া নদীটা পূব থেকে পশ্চিমে এ'কে বে'কে বয়ে গেছে। এই নদীটার দুই তীরের কতকটা অঞ্চল হ'ল গাম্বিয়া প্রদেশ। একটা লম্বাপানা ফালি বলা যায়। এর তিন দিক বেড়ে রয়েছে ফরাসীদের মুলুক—সেনিগেল উপনিবেশ।

Finden Dailey নামক একখানা আফ্রিকান লিডারে দেখেছিলাম, বর্ষায় বেকার অবস্থায় একখানা মাত্র কামরায় দশ ব্যক্তি সমন্বিত একটি পরিবার বাস করতেও বাধ্য হয়—সে কামরার পরিমাপ আট ফুট লম্বা এবং আট ফুট চওড়া। দুই-তিন বৎসর যাবৎ বেকার রয়েছে এমন লোকও সেখানকার বস্তীতে নাকি আছে।

বিকাল বেলা শহরতলীর একটা বস্তীতে পৌ'ছে গেছি। দেখে শুনে মনে হ'ল আগেও অন্যদিন এখানে একবার এসেছিলাম উদ্দেশ্যবিহীন এদিকে ওদিকে ঘুরতে দেখে একটি লোক আমার
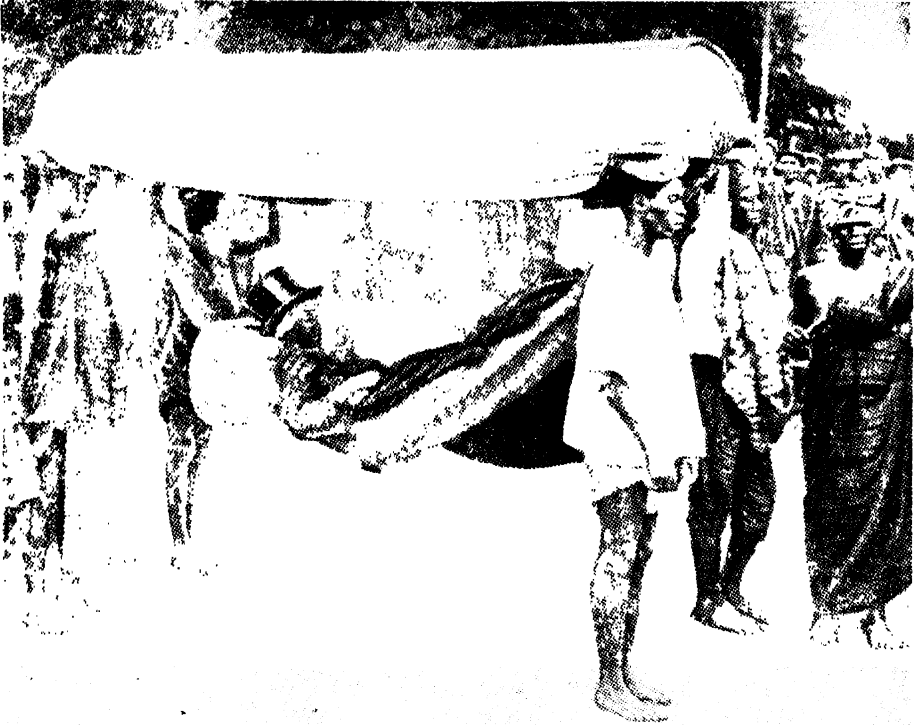
সিয়ারালিওনের পশ্চিমে মাসা নামক দ্বীপের রাণী—কুইন্ মেসীর রাজকীয় চতুর্দ্দোলা ; রাণীর মাথার টুপী হইতেই বুঝিতে পারা যায়, মাসাবাসী অভিজাতরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পছন্দ করে।

এখানকার স্বাস্থ্য যে আফ্রিকার অন্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনায় খারাপ, তাও বলা যায় না। অথচ, শুনলাম, এখানে ট্যাক্স ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কারণ রাজস্ব কমে আসছে। দুই বৎসর আগে গবর্ণমেণ্টের যে আয় ছিল, তার তিন ভাগের এক ভাগ প্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয়গণ সমগ্র প্রদেশটিতে ২৫০।৩০০ হবে। দেশীয় লোক হবে আনুমানিক লাখ দুই।

দেশীয় লোকদের অবস্থা সেই no copper, no clothes, no chop হ'তেই বেশ বোঝা যায়। তবে ওদের দুর্দ্দশার চরম হয় বর্ষাকালে। কত লোক বেকার হয়, তখন তার কোন সরকারী ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স পাই নাই। তবে মনে হয় অনেক। অপর্য্যাপ্ত আহারে, রোগে—নানা কারণেই বর্ষার সময় মৃত্যুহার ওখানে বেশী। আবার বেথার্ষ্ট শহরের একটি দেশীয় বস্তি আছে, যাকে ওদেশের লোকে বলে 'half die' বস্তী।

কাছে এসে অতি কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো—"take big house, no? Mussa, please."

আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে বোঝাতে অনেক সময় লাগল। ঘরে খাবার থাকলে লোক কেন কষ্ট করতে পরদেশে যায়, তা তার মাথায় ঢোকে না। বাড়ীভাড়া জোটাবার দালাল মনে করে তাকে তার আয়ের বিষয় প্রশ্ন করলাম। তখন বুঝতে পারলাম, লোকটি দালাল নয়। কোন্ এক সাহেবের খানসামা ছিল। সে সাহেব চলে যাবার পর হ'তে লোকটা বেকার হ'য়ে আছে। তার আয় বোধ হয় ভালই ছিল, কেননা, সে যেভাবে পুরাতন মালিককে 'big mussa' বলে গর্ব্ব বোধ করছিল, তাতে তার চাকরীটা অতি লোভনীয় বলে মনে হচ্ছিল। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যদি বাড়ী ভাড়া নেই, তবে কত টাকায় সে চাকরী করতে পারে। উত্তরে সে বললে—সে ও তাহার স্ত্রী উভয়ে মিলে রান্নাবান্না, বাসন-মাজা,

জল-তোলা, কাপড়-কাচা (ধোপার কাজ) প্রভৃতি সংসারের সকল কাজ করে দেবে। অন্য লোক রাখতে হবে না। বেতন মাসিক এক পাউণ্ড দিলেই চলবে। তা হলে আর খোরাক বা বর্খশিস্ কিছুই সে চাইবে না।

যে দেশে গড়ে পাঁচ পাউণ্ড হল বার্ষিক বেতন, সেখানে দু'জনে (স্বামী-স্ত্রী) কাজ করে মাসিক এক পাউণ্ড চাওয়া কিছু চড়া দর নয়।

কথায় কথায় অনেকদূর এসে পড়েছি। একটি মাটির ঘর দেখিয়ে লোকটি বললে—ঐ যে দোরে দাঁড়িয়ে আছে, ঐটি তার স্ত্রী আর এই তার ঘর। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলাম—ছোট্ট কামরা। মাটির মেঝে; মেঝে হ'তে ছয় ইঞ্চি উঁচু কতকগুলি মোটা বাখারীর উপর হোগলা জাতীয় কতকগুলো পাতা বুনট করা চ্যাটাই একখানা পাতা। বালিশের স্থানে দুই খণ্ড মোটা বাঁশের গোড়া রয়েছে। দুটো কালো হাঁড়ি আর খানকয়েক মাটির সরা, দুই-তিনটা টিনের কৌটা। তারই একপাশে বাখারীর খোঁয়াড় একটি—তাতে একজোড়া মুরগী।

লোকটা আমায় একটি ডিম এনে উপহার দিল। আমি তা তার স্ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। আমার পকেটে একটা দিয়েশলাই ছিল, তাই দিয়ে দিলাম। স্বামী-স্ত্রী তাতেই কত আপ্যায়িত।

শহরের বাইরে যে সব ছোট-খাট জঙ্গল পড়েছে, তাতে সাপ তো যথেষ্টই দেখেছি আর দেখেছি নানা জাতীয় মর্কট। বন্য শূকরের সাক্ষাৎ—আমার সাইকেলের পথে প্রতিদিনই মিলেছে, যখন বেথার্স্ট ছেড়ে এলব্রেডার দিকে রওনা হয়েছিলাম। তবে শুনেছি, ঐ বনে নাকি চিতাবাঘও আছে কম নয়; কিন্তু সুখের বিষয় তারা কেউ আমায় দেখা দেয় নাই, হয়ত অতিথির প্রতি মর্য্যাদা দান করেছে অলক্ষ্যে।

সারা আফ্রিকায় যে যে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, মনে হ'ল, এমন গরীব দেশ বুঝি আর দেখি নাই একটিও। এলব্রেডা যেতে দুরন্ত জানোয়ার তেমন নাকাল করে নি। কারণ, বন্য শূকর তো আমি দেখতে অভ্যস্ত জন্ম থেকে। বাঙলা দেশের যে বন-বনানী ঢাকা অঞ্চলে আমার জন্মস্থান, সেখানে আমার বাল্যকালে বন্য শূকরের হানা ছিল নিত্যকার ব্যাপার। বন্য শূকরকে কৌশলে এড়াতে বা দরকার হলে, ওটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করতে আমাদের হাতেখড়ি হয়েছিল নিতান্ত শিশুকালেই। তবে চিতাবাগ জানোয়ারটা বেজায় হিংসুটে—রয়েল বেঙ্গল মশায়ের তুলনায় ওটা নেহাৎ 'ছোটলোক' বলা চলে। কারণ, ওটার নজর বড় ছোট।

যাক, গাম্বিয়া নদীটা পার হওয়া আমার পক্ষে সমস্যা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে সমস্যা হতে উদ্ধার পাই এক দুগ্ধ-ব্যবসায়ীর দয়ায়। সে তার 'কেনু'তে' করে আমায় সাইকেল-সহ পার করে দেয়।

বেকার লোকটির বাসস্থান দেখার সময়, ওর কাছেই খবর মেলে যে, সরকার হ'তে নাকি কতকগুলি পাকা ঘর তৈরী করে ভাড়া দেওয়া হয়—সরকারের অধীনস্থ শ্রমিক-মজুরদের। খবরটা পেয়ে সে আবাসও দেখতে গিয়েছিলাম। একতলা এক সারি পাশা-পাশি কামরা। কামরাগুলির আকার নেহাৎ ছোট নয়। তবে শুনলাম তার প্রতিটি কামরার ভাড়া প্রতি সপ্তাহে পাঁচ শিলিং। তবে যে শ্রমিকদিগের উদ্দেশ্যে এগুলো তৈরী, তাদের মাহিয়ানা নাকি বার শিলিং প্রতি সপ্তাহে।

কিন্তু এই উচ্চহারের ভাড়ার জন্যই শ্রমিকেরা এই পাকা-বাড়ী পছন্দ করে না। তাদের নিকট মাটির মেঝে এবং পাতার চাল বড়ই প্রিয়। তাই গাম্বিয়া সরকার আর ভাড়ার জন্য এই জাতীয় পাকাবাড়ী তৈরী করিবে না।

এই প্রদেশটায় যেমন ইউরোপীয় পোষাকে জোলোফদের দেখেছি, (তাদের অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছে), তেমনি লুঙ্গি-পরা লোকও দেখেছি। যা নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায় বড় একটা নজরে পড়ে নাই।

আর একটি বিশেষ জাতের লোক দেখেছি, যাদের বাপ-মা অথবা পিতামহ-পিতামহীরা ছিল ক্রীতদাস-দাসী এবং মুক্তি পেয়ে এক আজব জীবে পরিণত হয়েছিল। এরাও শ্রমিকের কাজই করে, কিন্তু মস্তিষ্কের জড়তা এত বেশী যে, প্রতিশ্রুত বেতন বা মজুরী অপেক্ষা কম দিলেও তারা তা ধরতে পারে না। অনেক সময় কম পেয়েছে জেনেও প্রতিবাদ করা অসঙ্গত মনে করে। কাজেই চতুর ধনপতির শ্রেণী প্রতিনিয়ত এদের প্রতারণা করে অথবা নানা অজুহাতে চুক্তির টাকার অঙ্ক হ'তে কম দেয়। দৈহিক দাসত্ব ওদের খসে পড়লেও মানসিক দাসত্ব মোচন হয় নাই— কবে হবে তার জন্যে মাথা ব্যথাও ওদের নাই।

হাতে খড়ি

(১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

নীলিমা ছেলেকে একবার বুকে জড়াইয়া ধরিল। সে বেশ জানে, নদী কখনো সরোবর হয় না। না-ই বা হইল। তবু আজ সর্বাঙ্গ দিয়া, এই উদ্বেল মুহূর্তে, নীলিমা যেন মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার নাগালের মধ্যে ভবিষ্যতের এক বলিষ্ঠ যুবককে একটিবার বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিবার স্বপ্ন দেখিয়া লইল।..............

"খোকা, এখন থেকে ত রাতদিন তুই বই নিয়েই কাটাবি। কত বন্ধু হবে তোর।"

বাবলু মার বুকে চুপ করিয়া আছে।

"হ্যাঁরে দুষ্টু ছেলে! কথা বলছিস্ না যে?—বাড়িতে দুবেলা শুধু বই নিয়েই থাক্‌বি ত?"

"না মা," জবাব একটা না দিলে নয় তাই কথা বলে বাবলু।

"নিশ্চয় তুই বই নিয়ে পড়ে থাকবি, তারপর থাকবি বৌ নিয়ে।"

"যাঃ!"

"অ্যাঁ! বড় যে ভালমানুষি দেখান হচ্ছে! তোর পেটের কথা আমি যেন আর টের পাইনি কি না!"

খোকা অকারণ লজ্জায় মৃদু মৃদু হাসে। নীলিমা আবার ধরা গলায় বলিয়া গেল, "খোকন! তুই আর যা-ই করিস্, প্রতি হপ্তায় আমায় কিন্তু একখানা করে চিঠি দিস্—নিজের হাতে লিখ্‌বি। ভুলিস্ নি যেন। বৌ-এর উপর ভার দিয়ে দায় সারলে চলবে না কিন্তু। বুঝ্‌লি?"

—শেষ—

শ্রীহট্টে শিবের গীত

পণ্ডিত মথুরানাথ চৌধুরী কাব্যবিনোদ, সাহিত্যরত্ন

জয় বাবা ত্রিনাথ ঠাকুর! কোন শুভক্ষণে নাথ-ঠাকুরেরা (বৌদ্ধ যোগী) দিয়াছিল তোমার রূপ। তুমি শিবঠাকুর—ছিলে আপন-ভোলা সিদ্ধিদাতা উদাসী; কিন্তু নাথধর্ম্মী যোগীরা তোমার ছবি আঁকিল—সিদ্ধি অর্থাৎ বড় তামাকুদাতা পাগলা যোগীরূপে। যখন তুমি ধুতুরা, ভাঙ বা গঞ্জিকা সেবন করে আপনভোলা হয়ে সুরু কর তান্ডব নৃত্য—যেখানে সেখানে পরিয়া যাও নিদ্রা, থাকে না আপন-পর বা লজ্জা-সরমের ভেদাভেদ—তখন তুমি "আপনভোলাই" বটে। সত্যিই তুমি বিরাগী—কেননা গৌরী-ঠাকুরাণী গঞ্জিকা না দিয়ে তোমার স্বভাবের জন্য যখন দেন তোমাকে গঞ্জনা—তখন তুমি কিছুদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গাঁজায় লম্বা দম দিয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটাও। নাই স্ত্রী-পুত্রের কোনও ঝঞ্ঝাট—নাই খাওয়া-পরা বা নিদ্রা যাওয়ার কোনও বালাই! সুতরাং তোমাকে বিরাগী বলে না কে? নাথধর্ম্মী যোগীরা কখন তোমার এই ত্রিনাথের ছবি আঁকিয়া হাতে বড়-তামুকের কল্কে দিলে ঠাকুর? তুমি ছিলে শিব, হলে ত্রিনাথ, দিতে সিদ্ধি কিন্তু যোগাইতেছ ভাঙ, ধুতুরা ও গঞ্জিকা।

শ্রীহট্টে তোমার চেলা সেই নামধর্ম্মী যোগীর সংখ্যা অধিক সংখ্যক থাকিলেও বিপক্ষ দলের লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। তাই তোমার গাঁজার বিপক্ষে শুনি—

"গাঁজায় করে তিন কর্ম্ম—শুয়া, পেঁচা, কুম্ভকর্ণ।"

কিন্তু তোমার ভক্তেরা একথার বিপক্ষে গাহিল—

"ভাইরে—গাঞ্জায় কিনা মধু—
মায়াপাশ, ভেদাভেদ ত্যাগে করে সাধু।"

কিন্তু শুধু গাহিলেই ত চলে না, একথার নজির আবশ্যক। তাই ধরিল—

"গাঁজা খায় শিব গোরক্ষ—তাল আর বেতাল,
যে খায় না সিদ্ধি তার ঠনঠনি কপাল।"

তারা গাঁজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিল—

"এক ছিলিমে যেমন তেমন দুই ছিলিমে মজা,
তিন ছিলিমে উজীর নাজির, চার ছিলিমে রাজা।"
(ছিলিম—কল্কে)।

প্রতিপক্ষ দল অমনি ধরিল

"পাঁচ ছিলিমে হুক্কুর হুক্কুর, ছয় ছিলিমে কাস,
সাত ছিলিমে রক্ত-বাহ্যি, আট ছিলিমে নাশ।"

তোমার ভক্তেরা এই মস্ত বড় মন্তব্যেও দমিয়া গেল না। কেন না সৎকার্য্যে শতেক বাধা। তাই তারা গাহিল—

"বলে বলুক লোকে মন্দ আমরা 'ত্রিনাথ ঠাউক্‌রের'
(ঠাকুরের) হইছি চেলা
সিদ্ধি খাও মন আপন-ভোলা।"

বিপক্ষদল আরও প্রচার করিল—

"গাঞ্জা খাইলে পাঞ্জা বাড়ে গন্দর্না হয় দূর
বাপ দাদার নাম জাগায় সে হয় চোর।"

তোমার ভক্তেরা কিন্তু তাহার জবাব না দিয়া পারিল না। কেননা, তাহা হইলে বিপক্ষদলের কথাটাই হবে বলবতী। তাই তারাও বিপক্ষদলের সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরিল—

"সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়ে, দুঃখ যায় রে দূর,
বাপ দাদার নাম জাগায়, সে হয় ঠাকুর।"

জয় বাবা ত্রিনাথ ঠাকুর! তোমার ভক্তরূপী ঠাকুরের দল বড়-তামুকেতে দম দিয়ে যে সময় আরম্ভ করে দেয়—

"গাঞ্জার বাকল জলে ভাসে, ভাণ্ডড়ায় বলে জাহাজ আইছে,
আরেক ভাণ্ডড়া উইঠ্যা বলে—জাহাজ টাইনে তোল।"

তখন ঐ পাড়ার কচি খুকুটি পর্য্যন্ত হাসিয়া মাটিতে লুটা-পুটি খায়। যখন নেশা বেশ জমিয়া যায়—তখন তাদের গাহিতে শুনি—

"গাঞ্জা খাইয়া শুইয়া থাকি
উঠানে সমুদ দেখি
বিছানা হাতাইয়া ধরি মাছ।"

তখন তোমার চেলারা যে স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হয় নি, একথা কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু বাবা ভোলানাথ! যখন তোমার ভক্তেরা সিদ্ধির ঝোঁকে তোমার মহিমা গাথা গৌরী-ঠাকুরাণীর মুখ দিয়ে বাহির করে—তখন যে লজ্জায় মরে যাই।

গৌরী তাঁহার মায়ের কাছে বলিতেছেন—

"আচ্ছা সুন্দর তোর জামাই—এগো মাই—
আচ্ছা সুন্দর তোর জামাই।
যত দুঃখ পাই মাগো—কইয়া যাই তোমারো ঠাঁই—
ভাঙ খায়, ধুতুরা খায়, ভাঙ না খাইলে চটক পাকায়
তিলেকমাত্র সিদ্ধি ছাড়া, বাঁচে না গো মালিয়া বুড়া,
আমার মত কর্ম্মপোড়া ত্রিজগতে নাই—সোনা মাই গো মাই—
আচ্ছা সুন্দর তোর জামাই॥
যত দুঃখ পাই মাগো—কইয়া যাই তোমারো ঠাঁই—
ভাঙ খায়, ধুতুরা খায়, কুচুনি নগরে যায়
কুচের সঙ্গে কয় কথা—লাজে আমার রয় না মাথা।
মাগো জাতের বিচার নাই—সোনা মাইগো মাই—
আচ্ছা সুন্দর তোর জামাই॥
যত দুঃখ পাই মাগো—কইয়া যাই তোমারো ঠাঁই—
হাতে সাপ, গলে সাপ, ঝুলনার ভিতরে সাপ
ফতফাতি করে সাপ—কোন্ দিন খাইবে সাপ—
নির্ণয় না পাই—
আচ্ছা সুন্দর তোর জামাই॥"
(কুচ—হাঁড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতি।)
(ফতফাতি—'ফোঁস্ ফোঁস্' শব্দ।)

এইভাবে তোমার ভক্তের দল তোমার মহিমা প্রচার করে শুনায় তোমার শাশুড়ী মেনকার কাছে গৌরীর মুখ দিয়ে। তোমার যন্ত্রণায় নাকি গৌরীঠাকুরাণীর কৈলাসে তিষ্ঠা ভার! যথা—

"আমি সইতে পারি না—বুড়িয়ার যন্ত্রণা এগো মা।
শ্মশানে মশানে থাকে গো, মাগো পাগলা তোর জামাই
ক্ষণকে ডাকে প্রাণ প্রিয়সী, ক্ষণকে ডাকে 'মাই'॥
মহাদেবের একটি বলদ গো, মাগো তারে না যায় বান্ধা,
ঘর ভাঙে দরজা ভাঙে দুই চউক করে রাঙা॥
শিবের মাথায় পিঙ্গল জটা গো, মাগো জটায় ধরে ফণী
দুই হাতে চিবিয়া খায় 'গনাইর মার' বুনি॥"
[গনাই—গনেশ (গণপতি)।]
(বুনি—মাই।)

শুধু তাই নয় বাবা ঠাকুর! গঞ্জিকা সেবন করে যখন তুমি আপন-ভোলা হয়ে পার্থিব জগতে যাকে বলে 'মাতলামী' তাহা সুরু করে দেও—তখন তোমার চেলারা তোমার এই 'ত্রিনাথ রূপ' দেখাইবার জন্য তোমার শাশুড়ী মেনকাকেও এই স্থলে টেনে আনতে কসুর করে নি।
যথা—

"হর আওহে ও শিব জগৎ জটা,
কর্ণে ধুতুরা ফুল মাথায় জটা।
শিব আইলা স্নান করি, গৌরী দিলা সিদ্ধি ভরি
খাইয়া বেভোর হইল কাজল বরণ দুইটি আঁখি—
ঘোর করিয়া চায়—
তারে দেখি গৌরীর মা উল্টা পাকে ঘরে যায়
অ মাই—অ মাই—অ মাইগো, ঔনি আমার গৌরীর জামাই—
ভাণ্ডড়া বেটা। ইত্যাদি

দোহাই বাবা ভোলানাথ! আমার অপরাধ নিয়ো না। আমি যা দেখেছি বা শুনেছি, তা-ই অতিরঞ্জিত না করে লিখছি। শ্রীহট্টে তোমার ভক্ত দলের এই প্রকার যে শত শত গান দেখতে পাওয়া যায়। তাই ত তোমার জয়গাথা উচ্চারণ করিতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

মিছেকথা—গ্রন্থকার—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীপাবলিশিং কোম্পানী, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

অন্য চোদ্দটি গল্পের সাহচর্যে অন্তিম 'মিছেকথা'টি গ্রন্থের নাম ও রূপ জোগাইয়াছে। ভাব ও ভাষায় কোথাও ধোঁয়াটে হইয়া নিরাকার দিগন্তে সত্তা হারায় নাই। বরং উহার রেশ স্পন্দন রাখিয়া যায়। কয়েকটি গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'রূপী শেষেরটি।

এপারের শেষ কথাটি যখন স্মৃতিকে হত্যায় উদ্যত, তখন সত্য-মিথ্যার মর্যাদা-বিনিময় কত তৃপ্তিকর—রহস্যের এ নিষ্করুণ ছোঁয়া অজানিতেই যেন আঘাতের বিষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। বলিষ্ঠতার সহিত এ স্নিগ্ধ সৌকুমার্যের মিশ্রণ গ্রন্থকারের নিপুণতাই প্রকাশ করে। সাহিত্যক্ষেত্রে নন্দগোপাল সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার 'মিছেকথা'ও বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার মনের কোণে স্থান করিয়া লউক, ইহাই আমাদের কাম্য।

শ্রীঅরবিন্দ (জীবন ও যোগ):—প্রমোদকুমার সেন। প্রাপ্তিস্থানঃ—আর্য্য পাবলিশিং হাউস, ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

"স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি", "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" এই ভাষায় বাঙলার কবি একদিন শ্রীঅরবিন্দকে বন্দনা করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আজ গভীর যোগ সাধনায় নিমগ্ন। তাঁহার জীবন সাধনা আজ দেশের লোকের নিকট দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যময়। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও যোগের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লেখা পাকা হাতের লেখা। সুসংযত সমীহার সহিত সাধকজীবনের এমন সরস বিশ্লেষণ, সর্ব্বোপরি বিষয়বস্তু বিন্যাসের এমন পারিপাট্য আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। ভাবগর্ভ ভাষার ঠাসা বুনানীর ভিতর দিয়া নিছক রসবস্তুর নির্ব্বাচনে এবং সুসংযত সুষমায় সর্ব্বত্র পরিবেশনে লেখক যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। জীবনীর রূঢ় রাজনীতিক অংশ যেমন উপভোগ্য, গূঢ় যোগের অংশও তেমনই আকর্ষণীয়; পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে শ্রীঅরবিন্দরে সম্বন্ধে একটি অখণ্ড ধারণা পাঠক-পাঠিকারা লাভ করিতে পারিবেন। বুঝিবেন পণ্ডিচেরীর নিভৃত আশ্রমে লোকলোচন হইতে দূরে থাকিয়া যিনি আজ মহান্ যোগসাধনায় নিমগ্ন, তিনি মানুষটি কেমন এবং তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি।

তীর্থঙ্কর:—রোলাঁ, গান্ধী, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও দিলীপ সংবাদ। শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। কালচার পাবলিশার্স, ২৫এ, বকুলবাগান রো, ভবানীপুর। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

দিলীপকুমারের সঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ, মহাত্মা গান্ধী, বার্টরান্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে যে সব কথোপকথন হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠিও আছে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলিতে হয়—"দিলীপকুমারের একটি মস্ত গুণ আছে। তিনি শুনতে চান, এই জন্যেই শোনবার জিনিষ তিনি টেনে আনতে পারেন।" কবির কথা সমর্থন করিয়া আমরা বলিব, দিলীপকুমার শুধু শ্রবণের অধিকারই অর্জ্জন করেন নাই, শ্রুত বস্তুকে মননের মাধুর্য্য মাখাইয়া কীর্ত্তন করিবার মত অন্তর রসের একান্ত সাধনা তাঁহার আছে। তাঁহার কথা কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মকে স্পর্শ করে এবং রসের অনুভূতি জন্মায়, জ্ঞান-কেন্দ্রে কাজ করে। 'তীর্থঙ্করে'র তীর্থ-মাধুর্য্য চিত্তকে তৃপ্ত করে। এ বইয়ে অনেক জানিবার আছে, ভাবিবার আছে এবং সর্ব্বোপরি উপভোগ করিবার মত অনাবিল রস—তীর্থসেবার যাহা প্রধান ফল তাহাই।

ছেলেদের শ্রীগৌরাঙ্গ:—সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, এম-এ, বি-এল। লেখক শ্রীহরিলাল নন্দী, শিক্ষক, 'ইওর ওন হোম' হাই স্কুল। ইওর ওন হোম পাবলিসিটি বুরো, ৩।৯, বাহির মির্জ্জাপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পুণ্যচরিত প্রাঞ্জল ভাষায় বালকবালিকাদের উপযুক্ত করিয়া লিখিত। লেখা সুন্দর। শুধু বালকবালিকারা কেন, তাহাদের অভিভাবকেরা পড়িলেও মুগ্ধ হইবেন। বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর এই পুণ্যকথার প্রচার হউক।

শ্রীশ্রীসীতারাম চরিতামৃত:—শ্রীগণেশগোবিন্দ গোস্বামী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণলাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ, গ্রাঃ দুর্গাপুর, পোঃ কাঁঠালিয়া, জেলা ময়মনসিংহ। প্রথম খণ্ড তিন টাকা। উভয় খণ্ড ৮ অংশে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ ১৲ টাকা, শেষ বা ৮ম অংশ ॥০ আনা, অন্যান্য অংশ বার আনা।

লেখক বৈষ্ণব দর্শনে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব্বোপরি তিনি ভক্ত। প্রথম খণ্ডের অবতরণিকা ও রসতত্ত্বে লেখকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং ভক্তি রসমাধুর্য্যের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মরসপিপাসুমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন এবং নিজেদের সাধনপথে সাহায্য পাইবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর "দেশ" পত্রিকাতে সাথী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে রচনা প্রতিযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ফলাফল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

গল্পে শ্রীসুধাংশুকুমার দাস, দিনাজপুর হ'তে "শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতা" নামক গল্প লিখে একটি পুরস্কার লাভ করেছেন।

"বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা" নামক প্রবন্ধ লিখে শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কলিকাতা হ'তে প্রবন্ধে পুরস্কার পেয়েছেন।

শ্রীঅলোকনাথ ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা) "আগমনী" নামক কবিতা লিখে কবিতাতে পুরস্কার পেয়েছেন।

উপযুক্ত চিত্র না পাওয়ার জন্য চিত্রের পুরস্কার বন্ধ রহিল।

প্রবন্ধ ও গল্পের সংখ্যা বেশী হওয়াতে অতিরিক্ত আরও দুইটি পুরস্কার দিতে বাধ্য হইলাম। হস্ত-লিখিত পত্রিকা "সাথী"তে প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল রচনা মনোনীত হইয়াছে, সেই তুলনায় নিম্নলিখিত দুইজন একটি করিয়া অতিরিক্ত পদম পাইবেন।

গল্প:—"তা হোক"-এর লেখিকা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী, ভারতী সাহিত্য কুশলা, C/o. ডক্টর, গোস্বামী, রংপুর।

প্রবন্ধ:—"দরদী শরৎচন্দ্র"-এর লেখিকা শ্রীমতী গৌরী দাসগুপ্তা, C/o. ডক্টর পি কে দাসগুপ্ত, হেলথ অফিসার, ময়মনসিংহ।

দ্রষ্টব্য:—যাঁহারা ডাকে পুরস্কার নিতে ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া তাঁহারা ছয় আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

—সম্পাদক, "সাথী সম্প্রদায়" (সাহিত্য বিভাগ), ২৬-এ, আগা মেহেদী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারিখ পরিবর্ত্তন

প্রগতি সঙ্ঘের রচনা, ছোট গল্প, আবৃত্তি এবং শিল্প প্রতিযোগিতার প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠাইবার সময় বর্দ্ধিত করিয়া ৩০শে ডিসেম্বর, শনিবার শেষ তারিখ ঠিক করা হইয়াছে। আবৃত্তি প্রতিযোগিগণও উক্ত সময়ের মধ্যে নাম পাঠাইতে পারেন। আবৃত্তির দিন প্রতিযোগিগণকে পত্রযোগে জানান হইবে। —শ্রীপশুপতিনাথ দাস, সম্পাদক, প্রগতি সঙ্ঘ; কালিকাপুর, বজবজ, ২৪ পরগণা।

আলোচনা

আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, ঢাকা হইতে শ্রীযুত বাসুদেব বসাক ও শ্রীজগবন্ধু বসাক অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, দেশ ষষ্ঠ বর্ষ ৫০শ সংখ্যায় শ্রীযুত নিখিল সেন শিরোমণি-দা গল্পে বসাক সমাজকে অস্পৃশ্য প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। অভিযোগকারীদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের উপর কটাক্ষ করিবার জন্য 'বসাক পাড়া' কথাটি লেখক ব্যবহার করেন নাই, উহা তাঁহার এ বিষয়ে অজ্ঞতা হইতেই ঘটিয়াছে নিশ্চয়। কোন সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। আমরা এই বিচ্যুতির জন্য দুঃখিত।

—সম্পাদক, 'দেশ'।

ভ্রম সংশোধন

গত ২রা ডিসেম্বর 'দেশের' ৯১ পৃষ্ঠায় 'হে মেঘলতা' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির লেখক শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়; কিন্তু ভ্রমক্রমে 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই ভুলের জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

—সম্পাদক।

কল্যাণের পথরেখা

জীবনের খরস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যাহারা পরস্পরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—তাহারা চিরদিন কাছাকাছি থাকিতে পায় না। বিচ্ছেদের রাত্রি আসে—মৃত্যুর বাঁশি বাজিয়া ওঠে—আমরা কে কোথায় চলিয়া যাই। এ সংসার যেন সরাইখানা। ইহার আলোকিত কক্ষে মিলিয়াছি আমরা মুসাফিরের দল। বাহির হইতে মৃত্যুর ডাক আসে আদালতের পেয়াদার 'হাজির হায়'-এর মতো। যাহার কাছে ডাক আসে সে চলিয়া যায়—মিলাইয়া যায় বাহিরের নিঃসীম অন্ধকারে। এমনি করিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। আমরা নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া প্রিয়জনকে কত খুঁজিয়া বেড়াই। কিন্তু যে চলিয়া যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। আমরা আজ যাহারা চন্দ্র-সূর্যের দীপালোকে উজ্জ্বল এই পৃথিবীর নাট্যশালায় আনন্দের মধ্যে মিলিত হইয়াছি—আমরাও প্রত্যেকেই একদিন যাত্রী হইব সেই পথের—যে পথে সাথে চলিবার মেলে না কোনো সহযাত্রী। অন্ধকার হইতে কানে আসিবে মৃত্যুর কণ্ঠধ্বনি—অমনি কলরবমুখর মুসাফিরখানাকে পশ্চাতে রাখিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইবে সেই পথে যেখানে আছে শুধু জনহীন মেরুপ্রদেশের অন্তহীন নীরবতা। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে—কোথাও কেহ নাই। সংসারের তটভূমি পড়িয়া আছে অনেক পিছনে—সম্মুখে গৃহহারা সমুদ্রের অনন্ত নীলিমা।

দুদণ্ডের জন্য স্টেশনের যাত্রীশালায় যাহারা মিলিয়াছে—ক্ষণকাল পরেই যাহারা একে অন্যের নিকট হইতে দূরে—বহুদূরে চলিয়া যাইবে—তাহারা কেন পরস্পরের সঙ্গে কলহ করিয়া মুসাফিরখানাকে নরক করিয়া তুলে? জংসনে দুইদিক হইতে দুইখানি গাড়ী আসিয়া মিলিত হয়। দুই গাড়ীর যাত্রীদল পরস্পরের পানে কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে তাকাইয়া থাকে। কেহ কাহাকেও চেনে না—চলিতে চলিতে পথের মাঝে তাহাদের আকস্মিক দেখা। খানিক পরে গার্ডের বাঁশি বাজিয়া ওঠে—বিপরীতমুখে গাড়ী দুখানা চলিয়া যায়। যাহারা দুদণ্ডের জন্য চলার পথে অকস্মাৎ মিলিয়াছিল—তাহারা ইহজীবনে আর কি কখনো এমনি করিয়া মিলিবে? সংসারের রঙ্গভূমিতে এই যে আমাদের মিলন—এ মিলনও কি জংসনে দুই গাড়ীর আরোহীদের মিলনের মতোই ক্ষণস্থায়ী নয়? এই মুহূর্তে যাহারা কত কাছে—পর মুহূর্তে তাহারা কত দূরে! এই নিমেষে যাহার কণ্ঠ কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে—ক্ষণকাল পরে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাই না—যে পথে সন্ধ্যা-সূর্য্য চলিয়া যায় দিগন্তের পারে—সেই পথ ধরিয়া চির অন্ধকারের দেশে সে চলিয়া গিয়াছে! ইহ জীবনে আর তাহাকে দেখিব না, তাহার কণ্ঠধ্বনি কানে শুনিব না, তাহার স্পর্শ সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিব না।

যেখানে এত অল্পক্ষণের জন্য আমরা মিলিয়াছি সেখানে আমাদের রাত্রিবাসের মুসাফিরখানাটীকে কেন আমরা মল্লভূমিতে পরিণত করিয়া নিজেরা দুঃখ পাই এবং অন্যকেও দুঃখ দিই? আঘাত যদি কেহ দিয়াই থাকে—তাহার স্মৃতিকে অহির্নিশি মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিয়া লাভ কি? অতীতকে ভুলি না বলিয়াই অন্তরে প্রতিহিংসা নাগিনীর মতো ফুঁসিতে থাকে। ক্ষমা করা অসম্ভব হইয়া ওঠে। অতীতের ভূতকে ঘাড় হইতে নামাইয়া দাও, আঘাতের স্মৃতিকে নিঃশেষে ভুলিয়া যাও, যাহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলে তাহাদিগকে কাছে টানিয়া আনো—অন্তর অনির্বচনীয় শান্তিতে ভরিয়া উঠিবে।

যাহাদের মধ্যে শান্তিকে আমরা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—তাহাদের মধ্যে শান্তি নাই। রূপেই বল আর খ্যাতিই বল, ঐশ্বর্য্যই বল আর স্ত্রী-পুত্রেই বল—সব কিছুই একদিন বাসি হইয়া যায়। যাহারা একদা শিরায় শিরায় পুলকের শিহরণ তুলিত—এমন একদিন আসে যখন তাহারা আনন্দ দিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। নূতন মধুর সন্ধানে আমাদের চিত্ত-ভ্রমর তখন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া চলে। প্রথমটা লাগে ভালো। তাহার পর নূতনত্বের নেশা যখন ফিকে হইয়া আসে, আনন্দের অনুভূতিও ক্রমে ক্রমে তাহার তীব্রতা হারাইয়া ফেলে। প্রণয়ে আর কোনো মাদকতা থাকে না, রূপের শিখা রক্তে আর আগুন জ্বালে না, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে।

আমাদের দেশের ঋষিরা এই সত্যটা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বাহিরের ভোগ্য বস্তুকে তাঁহারা খুব বেশী মূল্য দান করেন নাই। ভোগ করিতে করিতে আমাদের চিত্ত যে ক্লান্ত হইয়া ওঠে—এই কথা জানিয়াই আমাদের দেশের মহাজনেরা লোভকে প্রশ্রয় দিতে বারম্বার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আনন্দের চিরন্তন উৎসকে আবিষ্কার করিলেন আপনাকে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে। বাসনার মধ্যে সুখ নাই। কামনার কীট যে মুহূর্তে বুকে আসিয়া বাসা বাঁধে—বিশ্বজগত সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অরণ্য হারাইয়া ফেলে তাহার শ্যামল সৌন্দর্য্য, নক্ষত্রখচিত আকাশ অসংখ্য তারকার দীপ্তি লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হয়, পাড়া প্রতিবেশীর কথা মনে পড়ে না, স্বদেশের কথা ভুলিয়া যাই, চোখের সামনে কে যেন এক টুকরা লাল পর্দ্দা ঝুলাইয়া দেয়, বিশ্বের সঙ্গে হারাইয়া ফেলি ঐক্যবোধ আনন্দের স্বর্গলোক হইতে মানুষ নির্ব্বাসিত হয়।

প্রাচীন ভারতের তপোবন হইতে একদা যে মন্ত্র উৎসারিত হইয়াছিল—সেই প্রেমের মন্ত্রের মধ্যেই জীবনের গভীরতম আনন্দ। চারিদিকে এই যে সংখ্যাহীন নরনারীর দল—ইহাদিগকে ভালোবাসিয়াই সুখ, ইহাদিগের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই আনন্দ। আঙিনায় প্রাচীর তুলিয়া, ঘরে খিল লাগাইয়া দিগন্তকে যাহারা চোখের আড়াল করিয়া রাখিয়াছে—তাহারা সত্যসত্যই হতভাগ্য—কারণ আনন্দ যেখানে নাই—সেখানেই তাহারা আনন্দকে বৃথাই খুঁজিয়া মরিতেছে।

পাপের মূল রহিয়াছে ভেদবুদ্ধির মধ্যে।

যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ—সেখানেই পাপ, সেখানেই অমঙ্গল। মানব-সভ্যতা আজ এই ভেদবুদ্ধির দ্বারাই অভিশপ্ত। জাতি জাতির বুকে ছুরিকা হানিতেছে, মানুষ মানুষকে হত্যা করিতেছে। আকাশ হইতে বোমা পড়িয়া ওয়ারস'র মতো কত শহর শ্মশানে পরিণত হইতেছে—কামানের গোলা লাগিয়া কত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, কত মনীষীর যুগযুগান্তের সাধনায় আজিকার এই যে মানব-সভ্যতার অভ্রভেদী মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহা রক্ত-সাগরে বিলীন হইবার উপক্রম করিতেছে। এই ভেদবুদ্ধিই বিজ্ঞান-লক্ষ্মীকে কিঙ্করী বানাইয়া সারা জগতে মৃত্যুর শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চলিয়াছে। ইম্পিরিয়ালিজমের মধ্যে, ফ্যাসিজমের মধ্যে, ক্যাপিট্যালিজমের মধ্যে, মিলিটারিজমের মধ্যে ভেদবুদ্ধিরই প্রকাশ। মানুষ মানুষকে আত্মীয় মনে না করিয়া স্বার্থসিদ্ধির উপায় মনে করিয়াছে—। এই সর্ব্বনেশে ভেদবুদ্ধি হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি।

শান্তির পথ কোথায়? নিশ্চয়ই অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রের সংঘর্ষের মধ্যে নয়। শান্তির অমৃতময় পথ ঐক্যবুদ্ধির মধ্যে—মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার উপলব্ধির মধ্যে—চেতনাকে বহুজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে। কিন্তু অহিংসা ভীরুর অহিংসা হইলে তো চলিবে না। অত্যাচার আজও লুপ্ত হয় নাই—কারণ ভীরুদের সংখ্যার অবধি নাই। কাপুরুষেরা মার মুখ বুজিয়া সহ্য করে, মানুষের মতো বাঁচিবার অধিকার সগর্ব্বে দাবী করে না—তাই পৃথিবীতে লাঠির আর রাইফেলের শাসন আজও রহিয়াছে অবিচলিত। মাটি যেখানে নরম—বেড়ালের নোংড়ামি তো সেখানেই। জগতের নিরস্ত্র জাতিগুলি স্বাধীনতার গরিমার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মৃত্যুকে যখন বরণ করিতে শিখিবে—সেইদিন অত্যাচারের তিমিররাত্রির হইবে অবসান, শান্তির শুভ্র প্রভাতের হইবে আবির্ভাব। সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা স্মৃতি-মাত্রে হইবে পর্য্যবসিত, হিটলার আর মুসোলিনীর রাজত্ব চিরকালের জন্য ফুরাইয়া যাইবে।

For peace won't come out of a clash of arms but out of justice lived and done by unarmed nations in the face of odds.*

শান্তির এই কল্যাণময় শুভ্র পথের নির্দ্দেশ দিবার জন্যই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া আছে। ইউরোপের শয়তানী সভ্যতা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। বেয়নেটের আর বারুদের পথ অকল্যাণের পথ, বর্ব্বরতার পথ। শান্তির পথ হইতেছে প্রেমের পথ—ক্লীবের প্রেম নয়, সিংহের মত নির্ভীক মরণ-জয়ী মানুষের প্রেম চাই। আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষের অহিংসা সত্ত্বেও আমরা যে আজ শৃঙ্খলিত অবস্থায় দুর্দ্দশার অন্ধকারে ক্রীতদাসের অভিশপ্ত জীবন বহন করিতেছি—তাহার কারণ আমাদের অহিংসা ছিল ভীরুর অহিংসা—অন্যায়ের সামনে আমরা ভয়ে কাঁপিয়াছি—তাহার পায়ে সসম্ভ্রমে আমাদের প্রাণের প্রণাম পেঁৗছাইয়া দিয়াছি—পৌরুষের উপরে দাঁড়াইয়া শক্তির ঔদ্ধত্যকে অকুতোভয়ে অবজ্ঞা করি নাই। জনসাধারণের মেরুদণ্ডহীন অহিংসাকে মহাবীর্য্যের পরশমণির ছোঁয়ায় শক্তিশালী করিয়া তোলার মধ্যেই গান্ধীজীর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

There indeed is what I flatter myself is going to be my contribution. I want that nonviolence of the weak to become nonviolence of the brave. It may be a dream but I have to strive for its realisation.†

বীর্য্য হারাইয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা—বীর্য্যবান হইলে তবেই আমাদের প্রেম স্বদেশকে মুক্ত করিবে—বিশ্বের মুক্তির পথকেও প্রশস্ত করিয়া তুলিবে।

* Gandhiji—Harijan.
† Gandhiji—Harijan.

এলো ভোর

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

এলো ভোর,
কৃত্তিকার পাণ্ডু আঁখি তখনো নয়নে ভাসে মোর।
পূর্ব দিকচক্রবালে
যেথায় মিলেছে স্বর্গ ধরণীর সাথে,
সেথা হতে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোকের কণা
রশ্মি তার ঢালে।
পৃথিবীর শ্যামলিমা কালো হয়ে ছিল
আবার শ্যামল হ'ল তারা
আবার পল্লবে পুষ্পে সাজাইল ধরা
বিচিত্র দেহলী তার।
পথের ওধারে
শুষ্ক রুক্ষ ধূলিরাশি পরে
শুয়েছিল, ব্যথাতুর অসহায় কে যে
না না চিনি, ওরা মোর চেনা!
শুয়েছিল চোখে মাখি ঘুমের কাজল
বুঝি ওর সুপ্ত মন, অবোধ পাগল,
চলেছিল রচে কোন অজানা স্বপন।
ধরণীর জাগরণে স্বপ্ন গেল টুটে
সে দেখিল চাহি;
প্রতারিত মন তার কহিয়া উঠিল, 'নাহি ওরে নাহি,
স্বপনের অবকাশ,'
দিবা তার দীনতারে করিল প্রকাশ!
এক মুঠি অন্ন তরে তার,
আবার হ'ল যে সুরু নগ্ন হাহাকার!!

আজ-কাল

কংগ্রেসী নেতাদের মতিগতি

কংগ্রেস নেতাদের যে গণ-আন্দোলন করবার মতলব নেই, সে কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে গত ২৮শে নবেম্বর ফরোয়ার্ড ব্লকের এক প্রস্তাবে। প্রস্তাবে বলা হ'য়েছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি বর্ত্তমান যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে যুদ্ধ বলে অভিহিত করার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা চালাবার সিদ্ধান্ত করেছেন; এ সিদ্ধান্ত অদ্ভূত, কারণ আপোষ হলেও ভারত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারে না। হরিপুরা কংগ্রেসে বর্ত্তমান অবস্থায় আন্দোলন আরম্ভের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দ্দেশ পালন করা উচিত, কিন্তু তা না ক'রে কংগ্রেস নেতৃদল এখন অহিংস প্রভৃতির ফরমাস (সুতোকাটা, হিন্দু-মুসলমান মিলন ইত্যাদি) দিয়ে জনসাধারণকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। প্রস্তাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইংরেজ যখন ভারত অধিকার করে, তখন সকলেই খাদি প'রত এবং হিন্দু-মুসলমানে গলাগলি ভাব ছিল; কিন্তু তাতে ভারতের পরাধীনতা ঠেকায় নি।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃদল যদি আন্দোলনে রাজী না থাকেন, তা'হলে যাঁরা রাজী আছেন, তাঁদের পথ ছেড়ে দিতে প্রস্তাবে বলা হ'য়েছে। "গণ-পরিষদ"-এর স্লোগানকে দক্ষিণপন্থী নেতারা যে-ভাবে বিকৃত করছেন, প্রস্তাবে তারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করে জনসাধারণ সমস্ত অধিকার না করলে গণ-পরিষদ বসতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা এমনভাবে তাকে ব্যাখ্যা করছেন, যেন গণ-পরিষদ একটা জমকালো 'সর্ব্ব দল-সম্মেলন' ছাড়া আর কিছু নয়।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করে প্রস্তাবে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ও তাঁদের পররাষ্ট্র-নীতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হয়েছে।

পাটনায় বিহার কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের যে বৈঠক হয়ে গেছে, তাতেও বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে অখন্ড নেতৃত্বের প্রয়োজন স্বীকার করে বলা হয়েছে যে, চরকার সুতো দিয়ে গণ-আন্দোলনকে বেঁধে রাখা ঠিক হবে না।

১লা ডিসেম্বর তারিখেও 'হরিজনে' এক প্রবন্ধ লিখে গান্ধীজী বলেছেন, শীগ্‌গির আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভের সম্ভাবনা নেই। তাঁর মতে চরকা চালিয়ে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তা'হলে আইন-অমান্যের কি প্রয়োজন? ভারতের সকলেই যদি সুতো কাট্‌তে থাকে, তবে তিনি মনে করেন, (কেন তা বলেন নি) 'শত্রু'র মনের এমন একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে যে, সে ভারতকে স্বরাজ দিয়ে দেবে।

বাঙলার শাসন

গত ৫ই সেপ্টেম্বর বাঙলা গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে বাঙলা দেশে জনসভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দেন। এই আদেশের প্রতিবাদে গত ২৮শে নবেম্বর বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দল এক মুলতুবী প্রস্তাব আনেন। কংগ্রেসী সদস্যেরা বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তিত হবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, অথচ ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত এ-সব বিধান এখনও জারী হয় নি। যুদ্ধের জন্যে বাঙলা দেশের বিপদ ইংলণ্ডের থেকে বেশী কি করে হ'ল? বাঙলা গবর্ণমেণ্ট মুসলিম লীগের আওতায় আছেন, অথচ মুসলীম লীগ কর্ত্তৃপক্ষের কোন নির্দ্দেশ তাঁরা এ বিষয়ে নেন নি। বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত সদস্যই এই অভিযোগ করেন যে, মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁদের বিপক্ষে সমালোচনা এবং গণ-সংগঠন বন্ধ করে দেবার জন্যে সুযোগ পেয়ে এই অর্ডিন্যান্স জারী করে দিয়েছেন।

খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব সরকারপক্ষ থেকে সমালোচনার উত্তর দেন। কংগ্রেসী প্রস্তাব ১২০—৮০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ইংরেজরা এবং দুইজন হিন্দু জমিদার ছাড়া আর কেউ সরকারীদলকে সমর্থন করেন নি।

সরকারী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিলের নানা ত্রুটি দেখিয়ে এ বিষয়ে জনমত জানবার জন্য বিলটি প্রচারের সুপারিশ করে কৃষক-প্রজা দল এবং কংগ্রেস দল গত ১লা ডিসেম্বর বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব আনেন, গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় তা অগ্রাহ্য হয় এবং বিলটি সিলেক্ট কমিটির হাতে যায়।

রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ কয়েদী থেকে পৃথক্ করতে এবং সব রাজনৈতিক বন্দীকে এক শ্রেণীভুক্ত করতে বলে কংগ্রেস পরদিন যে প্রস্তাব আনেন, ব্যবস্থা পরিষদে তাও অগ্রাহ্য হয়েছে।

ভারতের নানাস্থানে ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সে এখনও বেশ ধরপাকড় চল্‌ছে।

আসামী মন্ত্রিসভার বৈশিষ্ট্য

আসামে সাদুল্লা মন্ত্রিসভার সচিব-মনোনয়ন প্রায় শেষ হয়েছে, শুধু একজন ভাগ্যবানের খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, মিস্ মেভিস ডান নামে একজন মহিলা এই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় নারীদের মধ্যে যাঁরা বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেমেছেন, তাঁরা সকলেই সুস্থ ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে দেশসেবায় এগিয়ে গেছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, মুথুলক্ষ্মী আম্মাল, অনুসূয়াবাঈ কালে, বেগম হামিদ আলি প্রভৃতির নাম এ সম্পর্কে স্মরণীয়। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব মেয়েদের মধ্যে ব্যতিক্রম। আসামের এই ব্যতিক্রম অতি বিসদৃশ নয় কি?

শ্রমজীবীদের দাবী

রেলওয়ের অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য উপর-ওয়ালাদের মত প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ব্যবস্থা চেয়ে নিখিল ভারত রেল-কর্ম্মচারী ফেডারেশন যে আবেদন করেছিলেন, রেলওয়ে বোর্ড কার্য্যত তা অগ্রাহ্য করেছেন। গত ৩০শে

নবেম্বর লাহোরে ফেডারেশন এক বিশেষ সম্মেলনে রেলওয়ে বোর্ডের ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং শেষ শান্তিপূর্ণ উপায় হিসাবে একটা তদন্ত কোর্ট বা সালিশ বোর্ডের জন্য চেষ্টা করতে সভাপতিকে ক্ষমতা দেন।

বাঙলা ও আসাম গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করায় সম্মেলন তাঁদের কাজের নিন্দে করেন।

গত ২৮শে নবেম্বর লণ্ডনের আদালতে আদেশ অমান্যের জন্যে ১০১ জন ভারতীয় খালাসীর জেল হয়ে গেছে। খালাসীরা শতকরা ২৫৲ টাকা মজুরী বৃদ্ধির চুক্তিতে কাজে যোগ দিয়েছিল; যুদ্ধের বিপদের জন্য শতকরা ২৫৲টাকা বোনাস দেবারও একটা ব্যবস্থা হয়; কিন্তু তারা বলে যে, বেতন দ্বিগুণ না করলে তারা কাজ করবে না।

যুদ্ধের পর আরো কয়েকবার এইভাবে ভারতীয় খালাসীদের শাস্তি হয়েছে। নিখিল ভারত জাহাজী-শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারী মিঃ সুজাত আলি লণ্ডনে এক বিবৃতিতে বলেছেন, যুদ্ধের পর অধিকাংশ ইংরেজ খালাসীর বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং ভালো বোনাস দেওয়া হচ্ছে। জাহাজ-ডুবিতে বহু ভারতীয় খালাসী মারা যাচ্ছে; অথচ তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। মিঃ আলি বলেন, ৫০ হাজার ভারতীয় খালাসী তাদের দাবী আদায়ের জন্যে কারাবরণ করতে প্রস্তুত।

ইউরোপের আবর্ত্ত

সোভিয়েট-ফিনিস সঙ্ঘর্ষ

সোভিয়েট ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে প্রত্যাশিত সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হ'য়েছে। সীমান্তে ৪ জন সোভিয়েট সৈনিকের প্রাণহানির দায়িত্ব ফিনিস গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করার পর সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ২৮শে নবেম্বর তারিখে সোভিয়েট-ফিনিস অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করে দেন এবং ২৯শে তারিখে ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন। ৩০শে নবেম্বর লালফৌজ ফিনিস সীমান্ত অতিক্রম করে। কাজাণ্ডার গবর্ণমেণ্ট তখন যুদ্ধ বেধেছে বলে ঘোষণা করেন।

প্রথমে সংবাদ আসে যে, ফিনিস পার্লামেণ্ট কাজাণ্ডার মন্ত্রিসভাকে পূর্ণ আস্থা জানিয়েছেন; কিন্তু তার পরই প্রকাশ পায় যে, তাঁরা পদত্যাগ করেছেন এবং ব্যাঙ্ক অব ফিনল্যাণ্ডের কর্ত্তা মঃ রিটিকে প্রধান মন্ত্রী ও ডাঃ ট্যানারকে পররাষ্ট্র-সচিব ক'রে হেলসিঙ্কিতে একটা নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হ'য়েছে।

এদিকে সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে, সোভিয়েটবাহিনী কারেলিয়া যোজকে যে জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে, সেখানে তেরিজোকি শহরে মঃ কুসিনেন-এর নেতৃত্বে ফিনল্যাণ্ডের বামপন্থী দলগুলি ও বিদ্রোহী সৈন্যেরা মিলে এক গণ-গবর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এই মন্ত্রিসভাকে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি-মন্ত্রিসভা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে এক পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই মন্ত্রিসভা সোভিয়েটের প্রস্তাবগুলি মেনে নিয়েছেন।

সংগ্রামের গতি

এখন হেলসিঙ্কি মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করবার জন্য যুদ্ধ চলছে। সামরিক ঘাঁটির জন্যে সোভিয়েট চায় ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কয়েকটা দ্বীপ, কারেলিয়া যোজক এবং উত্তর-মেরু অঞ্চলে পেটসামো ও রিবাচি উপদ্বীপ। ইতিমধ্যেই লাল-ফৌজ ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের হগল্যাণ্ড, সেঁসকারি, লাভাসারি ও তিতেরস্তারি দ্বীপ দখল করে নিয়েছে বলে হেলসিঙ্কি-কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে। সোভিয়েট বলছে, তারা পেটসামোও দখল করে নিয়েছে; কিন্তু ফিনরা বলছে, পেটসামো তাদের হাতেই রয়েছে। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের প্রধান দ্বীপ হাঙ্গো সোভিয়েট সৈন্য দখল করেছে বলে একটা খবর পাওয়া গেছে।

এই সংগ্রাম সম্বন্ধে নানা উদ্দেশ্যে নানা পক্ষের প্রচারকার্য্যের মধ্যে সত্যি খবর বেছে নেওয়া শক্ত। কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার উপর অন্য সমস্ত রাষ্ট্রের চটে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক; চীনে এবং আবিসিনিয়া-আলবেনিয়ায় কীর্ত্তিমান জাপান আর ইতালীও সোভিয়েটের এই 'গর্হিত' আক্রমণে ভীষণ ক্ষিপ্ত। এ বিষয়ে জার্ম্মানী যাতে হস্তক্ষেপ করে, সেজন্যে ইতালী কিছু চাপ দিচ্ছে বলে মনে হয়।

যুদ্ধের খবরও এই কারণেই নানা রকম রটছে। লেনিনগ্রাড সেনাপতিমণ্ডলীর ইস্তাহারে বলা হচ্ছে, লাল-ফৌজ বাধা পরাভূত করে' এগিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু রাশিয়ার বিরোধী সংবাদদাতারা ফিনল্যাণ্ডের আশু পরাজয় অনিবার্য্য বলে' স্বীকার করেও জানাচ্ছেন যে, ফিন-সৈন্যদের কাছে রুশরা মোটেই সুবিধা করতে পারছে না। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের মতো জায়গায় যুদ্ধের গতি খানিকটা মন্থর হতে বাধ্য, কারণ এখন সেখানে নিদারুণ শীত, হ্রদ ও সাগরের জল জমতে আরম্ভ করেছে এবং তুষার-ঝড় বইছে।

তবে সংবাদদাতারা যে রকম রটাচ্ছেন, সোভিয়েট অভিযান ততখানি ঘা খাচ্ছে বলে মনে হয় না। যদি হ'ত, তাহলে ৩রা ডিসেম্বর রিটি-মন্ত্রিসভা আবার আপোষের প্রস্তাব করতেন না এবং ফিনল্যাণ্ডের সমস্ত শহর থেকে অধিবাসীদের চলে যাওয়ারও হুকুম দিতেন না। তারপর তেরিজোকি ফিনদের হাতে আছে বলে' ফিন সমর-নায়ক ব্যারন ফন মানেরহাইম প্রথমে বিবৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু ফিনিস তরফের সংবাদে বলা হচ্ছে, ফিনরা তেরিজোকি শহরটা ছাড়বার আগে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ফিনদের আক্রমণে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে সোভিয়েট ক্রুজার "কিরোভ" ডুবির যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল সে খবরও এস্তোনিয়ার ওয়াকিবহাল মহল অস্বীকার করছেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লেনিনগ্রাড সামরিক বিভাগের সৈন্যরাই এই যুদ্ধ চালাছে।

রাশিয়ার এই অভিযানে জগতের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ারই কথা, কারণ রাশিয়া তার দাবী মতো ঘাঁটিগুলি দখল করে' নিলে বল্টিকে তার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য হয়।

৪-১২-৩৯ —ওয়াকিবহাল

"চাণক্য"

কালী ফিল্মসের নবতম অবদান বাঙলা ছবি "চাণক্য" শীঘ্রই উত্তরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে।

প্রথিতযশা কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" এর বিষয়বস্তু অবলম্বনে "চাণক্য" তোলা।

ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং ইহার আলোকচিত্র গ্রহণ ও শব্দানুলেখনের কার্য্য করিয়াছেন, যথাক্রমে শ্রীসুরেশ দাস এবং শ্রীসমর বসু।

ছবিখানির চরিত্রলিপি নিম্নলিখিত রূপঃ—চাণক্য—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, কাত্যায়ন—নরেশ মিত্র, সেলুকাস—অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রগুপ্ত—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভিক্ষুক—কৃষ্ণচন্দ্র দে, বাচাল—অরুণ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রকেতু—সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী, নন্দ—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকেন্দার—ছবি বিশ্বাস, হেলেন—শ্রীমতী বীণা, মুরা—কঙ্কাবতী ও রাজলক্ষ্মী, ছায়া—রাধারাণী, আত্রেয়ী—শক্তিধারা মুখোপাধ্যায়।

"উষসী"

শ্রীদেবকী বসুর পরিচালনাধীনে নিউ থিয়েটার্স একখানি নূতন বাঙলা সামাজিক ছবির কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীমন্মথ রায়ের উপন্যাস "উষসী"র কাহিনী এই ছবিখানির বিষয়বস্তু। খুব সম্ভব শ্রীমতী লীলা দেশাই ইহার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্রের দোভাষী হিন্দী-বাঙলা ছবি "জোয়ানী-কি-রিত" ও "পরাজয়"-এর সম্পাদনার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

"কুমকুম"

বোম্বাইয়ের সাগর ফিল্ম কোম্পানীর বাঙলা নৃত্যগীতমুখর বাঙলা ছবি "কুমকুম" বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে এখানকার রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীমধু বসু ছবিখানির পরিচালক। শ্রীমতী সাধনা বসু ইহার প্রধান নায়িকার চরিত্রের রূপদান করিয়াছেন। বিশ্ববিখ্যাত সুর-সংগীতজ্ঞ শ্রীতিমিরবরণ এই ছবির সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন।

রঞ্জিত মুভিটোনের "আধুরী কাহিনী" বা "অসমাপ্ত কাহিনী" চিত্রের কয়েকটি দৃশ্যে শ্রীমতী দুর্গা খোটে, পৃথ্বিরাজ এবং মিস রোজ। নিউ সিনেমায় চলিতেছে।

নিউ সিনেমায় "আধুরী কহানী" বা "অসমাপ্ত কাহিনী"

"আধুরী কহানী" বা "অসমাপ্ত কাহিনী" বোম্বাইয়ের রণজিৎ মুভিটোনের ছবি, গত শনিবার হইতে নিউ সিনেমা চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে।

আধুনিক সমাজের এক পরিবারের ছেলে, মেয়ে, পিতা, মাতা—এই চারিটি চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতিগত ঘটনা পরম্পরায় ছবিখানির আখ্যানবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের বহু জটিল সমস্যার আলোচনা মাত্রই ইহাতে করা হইয়াছে, সমাধানের কোন প্রকার কার্য্যকরী ইঙ্গিত করা হয় নাই।

শ্রীমতী দুর্গাখোটে উন্নততর আদর্শানুপ্রাণিতা মাতার জটিল চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। [illegible]

নারী-চরিত্র অংকনে তাহার যে বিশেষ দক্ষতা আছে, তাহা শ্রীমতী খোটের অভিনয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। শেয়ার মার্কেটের দালাল অর্থগৃধ্নু পিতার চরিত্র শ্রীবটেশ্বর শাস্ত্রীর অভিনয়ে ভালভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তবে তাহার অভিনয় কয়েক স্থানে নাট্যোপযোগী হইয়া পড়ায় দর্শকের নিকট কিছুটা পীড়াদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। ছেলে ও মেয়ের চরিত্র দুটিতে পৃথ্বিরাজ ও মিস রোজের অভিনয়ও ভাল হইয়াছে। ইহার অন্যান্য ভূমিকায় ইলা, মীরা, ঈশ্বরলাল, লালা ইয়াকুব প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ইহাতে ইলা, মীরা ও রোজের কয়েকখানি গান খুবই উপভোগ্য হইয়াছে।

ছবিখানির শব্দানুলেখন ও আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ ভাল হইয়াছে।

নাট্যনিকেতনে—"মহামায়ার চর"

নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নূতন গার্হস্থ্য নাটক "মহামায়ার চর"-এর অভিনয় গত শুক্রবার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, রঞ্জিৎ রায়, শ্রীমতী লাইট, সরযূবালা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রী ইহার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ফিল্ম সেন্সরস্ বোর্ড

বঙ্গীয় ফিল্ম সেন্সরস বোর্ডের কার্য্য ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবে এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল যে, যুবক-যুবতীর নৈতিক চরিত্র হানিকর কোনও ছায়াচিত্র জনসাধারণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশের বা ঐরূপ কোনও ছায়াচিত্র সম্পর্কিত কোন ছবি খবরের কাগজে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া সম্পর্কে বঙ্গীয় সেন্সরস বোর্ডের অধিকতর কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে যাইয়া বিভিন্ন সদস্য বলেন, বঙ্গীয় ফিল্ম সেন্সরস বোর্ডে ইউরোপীয়ান সভ্যদের সংখ্যা বেশী বলিয়া

"দেবী দুর্গা" নাটকের একটি দৃশ্য। নাটকটি বর্ত্তমানে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে।

ইহার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, উৎপল সেন, গায়ক ভবানী দাস, শ্রীমতী নীহারবালা, শেফালিকা, অপর্ণা, মায়া প্রভৃতি।

শ্রীসুধীর গুহ নাটকখানির প্রযোজনা করিয়াছেন এবং ইহার আলোকসম্পাত ও বিভিন্ন সঙ্গীতের সুর-সংযোজনার কাজ করিতেছেন, যথাক্রমে সতু সেন ও অমর বসু।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "জননী জন্মভূমি"

নাট্যকার শ্রীসুধীন্দ্রনাথের নূতন দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক "জননী জন্মভূমি" বর্ত্তমানে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে।

নাটকখানির প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ এবং ইহার আনুষঙ্গিক সঙ্গীতাদিতে সুর-সংযোগ করিয়াছেন অন্ধ-গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। শ্রীপরেশচন্দ্র বসু ও সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় যথাক্রমে ইহার দৃশ্যপট পরিচালনা ও নৃত্য-শিল্পীর কাজ করিয়াছেন।

ইহার ছায়াচিত্র প্রকাশ নিয়ন্ত্রণের কাজ ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের মাপ-কাঠির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সম্পাদিত হইতেছে না। সেন্সরস বোর্ডের কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও মহত্তর আদর্শের প্রেরণা সঞ্চারের কাজে চলচ্চিত্র শিল্প খুব ভালভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা এইরূপ অভিযোগও করেন যে, আমেরিকার ফিল্ম সেন্সরস বোর্ডের অনুমতি লাভ করিতে পারে নাই এইরূপ ছায়াচিত্রও বঙ্গীয় ফিল্ম সেন্সারস বোর্ডের নিকট হইতে জনসাধারণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশের অনুমতি লাভ করিয়াছে।

প্রস্তাব সমর্থকদের বক্তৃতার উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন, বাঙলায় ছায়াচিত্র প্রকাশ নিয়ন্ত্রণের কার্য্য সুপরিচালিত হইতেছে না এবং বঙ্গীয় ফিল্ম সেন্সরস বোর্ডে ইউরোপীয়ান সদস্যগণ সংখ্যাধিক্য বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা ও অযৌক্তিক। তবে প্রস্তাবটি গ্রহণে তাহার আপত্তি নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আরও তিনটি খেলা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই তিনটি খেলার মধ্যে একটি খেলা অনুষ্ঠিত হয় সেকেন্দ্রাবাদে, দ্বিতীয়টি হয় করাচীতে ও তৃতীয়টি হয় জামসেদপুরে। সেকেন্দ্রাবাদের খেলায় হায়দরাবাদ দল মাদ্রাজ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মাদ্রাজ দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও দুই রাণে পরাজিত করে। করাচীর খেলায় পশ্চিম ভারতরাজ্য দল সিন্ধুপ্রদেশের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। তিনদিনব্যাপী খেলার নিয়মানুযায়ী পশ্চিম ভারতরাজ্য দল প্রথম ইনিংসের খেলার ফলাফলের বলে বিজয়ী সাব্যস্ত হইয়াছে। জামসেদপুরের খেলায় বাঙলা দল, বিহার দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বিহার দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ৫১ রাণে পরাজিত করিয়াছে।

বাঙলা দলের কৃতিত্ব

বাঙলা দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় বিহার দলকে এক ইনিংস ও ৫১ রাণে পরাজিত করিয়া

খেলোয়াড়গণ ফিল্ডিং করিতে যাইতেছে।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। বাঙলা দল গত তিন বৎসর রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় বিহার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিহার দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করত যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল এই বৎসরেও তাহাই অক্ষুণ্ণ রহিল। বাঙলা দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়।

পূর্ব্ব বৎসরের ফলাফল

১৯৩৫ সাল হইতে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বিহার দল প্রথম বৎসরে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে না। ১৯৩৬ সালে প্রথম বিহার দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। সেই বৎসর প্রথম বিহার দলকে বাঙলা দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিহার দল বাঙলা দলের নিকট ৮ উইকেটে পরাজিত হয়। বিহার দল সেই বৎসর আট উইকেটে পরাজিত হইলেও বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৮৯ রাণে শেষ করিয়া যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তাহাতে অনেকেরই আশা জাগে যে পরবর্ত্তী বৎসর বিহার দল বাঙলা দলকে বেগ দিবে। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে বিহার দল বাঙলা দলের নিকট এক ইনিংস ও ১৬৬ রাণে পরাজিত হয়। বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণ ৭ উইকেটে ৩৭২ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার করা সত্ত্বেও বিহার দল দুই ইনিংস খেলিয়া ঐ রাণ সংখ্যা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। ১৯৩৮ সালে পুনরায় বিহার দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় বাঙলা দলের নিকট এক ইনিংস ও ১৮৫ রাণে পরাজিত হয়। এইরূপ ভাবে পর পর ৩ বৎসর বিহার দলকে বাঙলা দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে দেখিয়া প্রথম বৎসরে বিহার দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহারা ভাল ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকল আশা ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং এই বৎসরে বিহার দলের শোচনীয় পরাজয় কাহাকেও বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত করে নাই। বাঙলা দল পূর্ব্বের তিন বৎসরের অর্জ্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং খেলায় শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই, ইহাতে সকলে আনন্দিত হইয়াছেন।

এই বৎসরের বাঙলা দল

অন্যান্য বৎসরে বাঙলা দল ইউরোপীয় খেলোয়াড়ের অধিনায়কতায় ও অধিকাংশ ইউরোপীয় খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দল লইয়া রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় যে দুর্নামের ভাগী হইয়াছিল, এই বৎসর সেই দুর্নাম একরূপ অপসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় জামসেদপুরে বিহার দলের বিরুদ্ধে বাঙালী খেলোয়াড়ের অধিনায়কতায় ও অধিকাংশ বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দল লইয়া খেলিয়া। একমাত্র এন হ্যামন্ড ছাড়া এই দলে কোন ইউরোপীয় খেলোয়াড় বর্ত্তমান ছিলেন না। এইরূপভাবে দল গঠন করায় যখন ফল ভালই হইয়াছে তখন আশা করা যায় বাঙলা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পরবর্ত্তী খেলায় এইরূপভাবে দল গঠন করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। পরীক্ষামূলক হিসাবে

এই ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় পরিচালকগণ বিশেষ অন্যায় করিবেন না।

এস ব্যানার্জ্জি ও খাম্বাটা

বিহার দল পরাজিত হইলেও এই দলের তরুণ খেলোয়াড় এস. ব্যানার্জ্জি ও খাম্বাটার খেলা প্রশংসনীয় হইয়াছে। এস ব্যানার্জ্জি বিহার দলের উভয় ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে বিশেষ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং বিহার দলের রাণ সংখ্যা তোলায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া বোলিংয়েও ৩৩ রাণে ৩টি উইকেট লইয়া তিনি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। খাম্বাটার বোলিং ভালই হইয়াছে। তাঁহার ১০৯ রাণে ৫টি উইকেট লাভ উল্লেখযোগ্য। বিহার দলের বি সেনের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে খেলাও প্রশংসনীয়।

নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি ও এস দত্ত

বাঙলা দলের বোলিং সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি ও এস দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এই দুইজন খেলোয়াড় বিহার দলের উভয় ইনিংসে বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি প্রথম ইনিংসে ২ রাণে ২টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ রাণে ৩টি উইকেট দখল করেন। এস দত্ত প্রথম ইনিংসে ৩২ রাণে ৬টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন। একরূপ বলিতে গেলে এই দুইজন বোলারের জন্য বিহার দল অধিক রাণ করিতে পারে নাই।

কার্ত্তিক বসু ও এন হ্যামণ্ড

বাঙলা দলের ব্যাটিং বিষয়ে কার্ত্তিক বসু ও এন হ্যামণ্ডের খেলা প্রকৃতই প্রশংসনীয় হইয়াছে। এক প্রকার ইঁহাদের দুই জনের জন্যই বাঙলা দলের রাণ সংখ্যা ২৯৭ হইতে পারিয়াছে।

ইঁহারা একত্রে খেলিয়া ৬০ রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কার্ত্তিক বসু ১৬১ মিনিটে ৬৭ রাণ করেন। তাঁহার রাণ সংখ্যার মধ্যে একটি ওভার বাউণ্ডারী ও আটটি বাউণ্ডারী হয়। এন হ্যামণ্ড ৫৭ মিনিট খেলিয়া ৭২ রাণ করেন। তাঁহার রাণ সংখ্যার মধ্যে তিনটি ওভার বাউণ্ডারী ও আটটি বাউণ্ডারী হয়। ইঁহাদের পরেই নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জির ৪২ রাণ, কে রায়ের ৪০ রাণ ও সুশীল বসুর ৩৩ রাণ উল্লেখযোগ্য।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিহার দল টসে জয়ী হইয়া প্রথমে ব্যাট করে। চা পানের কিছু পূর্ব্বে এই দলের সকলে ১৩৫ রাণ করিয়া আউট হয়। প্রথম খেলোয়াড়দ্বয় খেলায় বিশেষ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়া ৮১ রাণ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু পরবর্ত্তী খেলোয়াড়গণ অল্প রাণে আউট হন। পরে বাঙলা দল খেলা আরম্ভ করে। প্রথম উইকেট মাত্র আট রাণে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহার পরেই সুশীল বসু ও কে রায়ের প্রচেষ্টায় রাণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিনের শেষে বাঙলা দল ২ উইকেটে ৮৮ রাণ করিতে সক্ষম হয়। পরের দিন ৯৩ রাণে তৃতীয় ও ১৭৫ রাণে চতুর্থ উইকেট পড়িয়া যায়। এই সময় হ্যামণ্ড ও কার্ত্তিক বসু একত্রে খেলিয়া রাণ তুলেন। ২৩৫ রাণের সময় কার্ত্তিক বসু ও ২৪০ রাণের সময় হ্যামণ্ড আউট হন। বাঙলা দলের ইনিংস ২৯৭ রাণে শেষ হয়। পরে বিহার দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ৯০ রাণ সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনে মাত্র ২৭ মিনিট খেলা চলিবার পর বিহার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১১১ রাণে শেষ হয়। এন চ্যাটার্জ্জি দুই ওভার বল দিয়া ৬ রাণে ৩টি উইকেট দখল করেন। বাঙলা দল এক ইনিংস ও ৫১ রাণে জয়লাভ করে।

খেলার ফলাফল

বিহার প্রথম ইনিংসঃ—১৩৫ রাণ (এস ব্যানার্জ্জি ৩৮, বি সেন ৩০, এম দস্তুর ১২, এস দত্ত ৩২ রাণে ৬টি, এন চ্যাটার্জ্জি ২ রাণে ২টি, এস মিত্র ২০ রাণে ১টি, জে এন ব্যানার্জ্জি ২৫ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

বাঙলা প্রথম ইনিংসঃ—২৯৭ রাণ (কে বসু ৬৭ রাণ, সুশীল বসু ৩৩, কে রায় ৪০, এন চ্যাটার্জ্জি ৪২, এন হ্যামণ্ড ৭২; জে এন ব্যানার্জ্জি নট আউট ১৬ রাণ, খাম্বাটা ১০৯ রাণে ৫টি এস ব্যানার্জ্জি ৩৩ রাণে ৩টি, ব্রিয়ারলী ২৮ রাণে ১টি, এস চক্রবর্ত্তী ৬৮ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

বিহার দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১১১ রাণ (বি সেন ১৭, এস ব্যানার্জ্জি ২৬, এস রায় ২৪, এম দস্তুর ১০, এস মিত্র ১৫ রাণে ১টি, এইচ সাধু ৩১ রাণে ১টি, এন হ্যামণ্ড ১০ রাণে ১টি, এস দত্ত ২৯ রাণে ২টি, জে এন ব্যানার্জ্জি ৯ রাণে ২টি ও এন চ্যাটার্জ্জি ৬ রাণে ৩টি উইকেট পাইয়াছেন)।

(বাঙলা দল এক ইনিংস ও ৫১ রাণে বিজয়ী।)

হায়দরাবাদ দলের সাফল্য

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় হায়দরাবাদ দল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও দুই রাণে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের ন্যায় একটি শক্তিশালী দল এইরূপভাবে পরাজিত হইবে পূর্ব্বে আশা করা যায় নাই। হায়দরাবাদ দলের খেলোয়াড়গণ বোলিং ও ব্যাটিং উভয় বিষয়েই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। মাদ্রাজ দল পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু হায়দরাবাদ দলের বোলার এস মেটা ও গোলাম আমেদ তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। মাদ্রাজ দলকে 'ফলো অন' করিতে হয়। এই সময়েই মাদ্রাজ দলের ভদ্রী ও পার্থসারথী ব্যাটিংয়ে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। কিন্তু মন্দভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে না। মাদ্রাজ দলকে শেষ পর্য্যন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হয়। হায়দরাবাদ দল প্রথমে ব্যাটিং গ্রহণ করে। দ্বিতীয় দিন পর্য্যন্ত খেলা চালাইয়া প্রথম ইনিংস ৪৪৩ রাণে শেষ করে। উক্ত রাণ সংখ্যার মধ্যে এস এম হাদি ১০৬ রাণ, আসাদুল্লা ৮৯ রাণ, উষাক আমেদ ৬৬ রাণ, এস এম হোসেন ৫৪ রাণ ও বি প্যাটেল ৫০ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মাদ্রাজ দলের রামসিং ১৩৬ রাণে ৫টি ও পরাণকুসুম ৫১ রাণে দুইটি উইকেট পান। পরে মাদ্রাজ দল খেলিয়া প্রথম ইনিংসে ২৭২ রাণ করিতে সক্ষম হয়। রামসিং ৪৪ রাণ, রামস্বামী ৪১ রাণ, পার্থসারথি ৬২ ও এ ভেঙ্কটসন ৬০ রাণে নট আউট থাকিয়া ব্যাটিংয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দেন। হায়দরাবাদ দলের গোলাম আমেদ একাই ৯৫ রাণে ৫টি উইকেট দখল করেন। হায়দরাবাদ দল প্রথম ইনিংসে ১৮১ রাণে অগ্রগামী থাকায় মাদ্রাজ দলকে 'ফলো অন' করিতে বাধ্য করে। মাদ্রাজ দলের খেলোয়াড়গণ শোচনীয় পরাজয় হইতে রেহাই পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এস মেটা ও গোলাম আমেদ মারাত্মক বোলিং করিয়া মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭৯ রাণে শেষ করেন। এস মেটা ৪৯ রাণে ৬টি ও গোলাম আমেদ ৬২ রাণে ৪ টি উইকেট দখল করেন। মাদ্রাজ দলের পার্থসারথী ৩২ রাণ করিয়া আউট হন ও ভদ্রী শেষ পর্য্যন্ত ৬২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। হায়দরাবাদ দল খেলায় এক ইনিংস ও দুই রাণে জয়লাভ করে।

খেলার ফলাফলঃ—

হায়দরাবাদ প্রথম ইনিংসঃ—৪৪৩ রাণ। মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসঃ—২৭২ রাণ। মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৭৯ রাণ। (হায়দরাবাদ এক ইনিংস ও দুই রাণে বিজয়ী।)

পশ্চিম ভারতরাজ্য দল বিজয়ী

নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

পশ্চিম ভারতরাজ্য দলঃ—প্রথম ইনিংস ২৬৬ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২১০ রাণ।

সিন্ধুপ্রদেশ দলঃ—প্রথম ইনিংস ১২৭ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৯২ রাণ করেন।

(খেলায় পশ্চিম ভারতরাজ্য দল বিজয়ী।)

সমর-বার্ত্তা

২৭শে নবেম্বর—

সোভিয়েট-ফিনিশ সীমান্তে ফিনিশ গোলন্দাজ সৈন্যগণ লালফৌজের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া চারিজনকে নিহত ও নয়-জনকে আহত করিয়াছে বলিয়া সোভিয়েট সরকারের ইস্তাহারে ফিনিশদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। এই ঘটনা সম্পর্কে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটোভ ফিনিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং ক্যারোলিয়ান যোজক হইতে ফিনিশ-বাহিনীকে সীমান্তের বার মাইল দূরে কোন স্থানে সরাইয়া লওয়ার দাবী জানাইয়াছেন। ফিনিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন না।

কোপেনহেগেনের সংবাদে প্রকাশ যে, ফিনিশ বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় কয়েকটি সোভিয়েট পর্য্যবেক্ষণকারী বিমান ভূপাতিত হইয়াছে। ঐসব বিমান ক্যারেলিয়ার উপর উড়িয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

আটলাণ্টিক মহাসাগরগামী চৌদ্দ হাজার টনের পোলিশ জাহাজ "পিলসুডস্কি" বৃটেনের উত্তর-পশ্চিম উপকুলের কিঞ্চিৎ দূরে টর্পেডোর দ্বারা ঘায়েল হইয়াছে।

২৮শে নবেম্বর—

সোভিয়েট নোটের উত্তরে ফিনিশ গবর্ণমেণ্টের জবাব অদ্য রাত্রিতে মস্কো কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দেওয়া হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, সীমান্তে ফিনিশ এলাকা হইতে কোন গুলী বর্ষিত হয় নাই; কিন্তু সোভিয়েট এলাকা হইতে সাতটি গোলার আওয়াজ শোনা যায়। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে সব অভিযোগ করিয়াছেন, তৎ-সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট একটি যুক্ত কমিটি নিযুক্ত করিতে রাজী আছেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যদি অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে সীমান্ত হইতে বার মাইল দূরে সৈন্যবাহিনী অপসারণ সম্পর্কে ফিনল্যাণ্ড আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছে। ফিনিশ গবর্ণমেণ্টের নোট পাওয়ার অব্যবহিত পরেই রাশিয়া সোভিয়েট-ফিনিশ চুক্তি বাতিল করিয়াছেন। লেনিনগ্রাড জিলার সৈন্যগণকে ও বল্টিক নৌ-বহরকে অবিলম্বে প্রস্তুত হইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৯শে নবেম্বর—

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট-ফিনিশ অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করিয়া ফিনল্যাণ্ডের নিকট এক নোট দিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, "ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট নিয়মিতভাবে চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং এখন যে তাঁহারা আক্রমণাত্মক কার্য্য অস্বীকার করিতেছেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে জনমতকে বিভ্রান্ত করা।" ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট-ফিনিশ অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করিয়া সোভিয়েট নোটের উত্তর দিয়াছেন।

লেনিনগ্রাড সীমান্তে রুশ ও ফিনিশ সৈন্যদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—

সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী অদ্য প্রাতে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে। সোভিয়েট বাহিনী ক্যারেলিয়ান যোজকের নানাস্থান আক্রমণ করে। ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কির উপর দুইবার বোমাবর্ষণ করা হয়। সোভিয়েট নৌ-বহর সমুদ্রোপকূলে কয়েকটি স্থানে গোলাবর্ষণ করে। প্রকাশ, হেলসিঙ্কির উপর বিমান আক্রমণের ফলে ৮০ জন নিহত হইয়াছে।

হেলসিঙ্কির সংবাদে প্রকাশ যে, রুশরা সমগ্র ফিসকার উপদ্বীপ দখল করিয়াছে। সোভিয়েট বিমানবহর এই মর্ম্মে বহু ইস্তাহার বর্ষণ করে যে, ফিনল্যাণ্ডের কোন ক্ষতি করিবার অভিপ্রায় রুশিয়ার নাই। কিন্তু সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ এরকো, ফিল্ড মার্শাল ফন ম্যানার হেইম এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের উচ্ছেদ সাধন করিতে চায়।

সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটোভ মস্কোতে এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে।

বৃটিশ নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, পি এণ্ড ও'র "রাওলপিণ্ডি" জাহাজের ৩৯জন অফিসার ও ২২৬জন নাবিকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ফিনল্যাণ্ডের বর্ষীয়ান নেতা ফিল্ড মার্শাল ব্যারন ফন ম্যানার-হেইম ফিনিশবাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে বৃত হইয়াছেন।

১লা ডিসেম্বর—

বিমান হইতে অসামরিক অধিবাসীদের উপর বোমাবর্ষণের অমানুষিক বর্ব্বরতা হইতে বিরত থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজেভেল্ট রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করিয়াছেন এবং নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এই নব-গঠিত মন্ত্রিসভায় মঃ রাইটি প্রধান মন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ ট্যানার পররাষ্ট্র-সচিবের পদে বৃত হইয়াছেন।

লালফৌজ কর্ত্তৃক অধিকৃত ফিনিশ সীমান্তবর্ত্তী তেরিজোকি নামক শহরে অদ্য নূতন ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নব প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট হেলসিঙ্কি গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে।

২রা ডিসেম্বর—

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে একটি পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী লেনিনগ্রাডের উত্তরে ক্যারেলিয়ান যোজকে ৩৯৭০ বর্গ কিলোমিটার স্থানের বিনিময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ডকে সোভিয়েট ক্যারেলিয়ান হইতে ৭০ হাজার বর্গ কিলোমিটার স্থান ছাড়িয়া দিবে এবং বার কোটি ফিনিশ মার্ক ক্ষতিপূরণ দিবে। সোভিয়েট হাঙ্গো উপদ্বীপ ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্র ৩০ বৎসরের জন্য ইজারা পাইবে। বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের প্রবেশ-পথকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েট হাঙ্গোতে একটি সামরিক নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করিবে। এই চুক্তি পঁচিশ বৎসর যাবৎ থাকিবে। মস্কোতে মঃ ষ্ট্যালিনের উপস্থিতিতে মঃ মলোটোভ ও কুসুনেন এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

২১৮৫ টনের জার্ম্মান জাহাজ "এইলবেক" এবং ২১৫ টনের জার্ম্মান ট্রলার "সোফিবাসি" বৃটিশ নৌবহর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ৩৪টি জার্ম্মান বাণিজ্য জাহাজ (সর্ব্বসমেত ১৪৫৩০১ টন) ধৃত অথবা জলমগ্ন হইয়াছে।

বৃটিশ তৈলবাহী জাহাজ "স্যাঙ্কালিস্টো" প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে জলমগ্ন হইয়াছে।

হেলসিঙ্কিতে যে নূতন ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাহার সহিত আলোচনা চালাইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

নূতন ফিনিশ "গণ-গবর্ণমেণ্টের" প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-সচিব মঃ কুসুনেন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তিনি "গণতান্ত্রিক ফিনল্যাণ্ড" ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গণ-গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে এবং তাহার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ফিনিশ ফিল্ড মার্শাল ম্যানারহেইম ঘোষণা করিয়াছেন যে, রুশিয়ার ৩৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে। ফিনিশরা দাবী করিয়াছে যে, ১৭টি সোভিয়েট বিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক-সংবাদ

২৭শে নবেম্বর—

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদক এবং "আনন্দবাজার পত্রিকার" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাঁহাকে জামীন দেওয়া হয় নাই। গতকল্য কলিকাতা পুলিশ ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে কমরেড দেবকুমার দাসকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক বৎসরের জন্য যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিয়া চৌধুরী কৃষ্ণগোপাল দত্ত (কংগ্রেস) পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি ৬২—২৮ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স বলে রচিত নিয়মানুসারে এক নোটিশ জারী করিয়া বাঙলা গবর্ণমেণ্ট বাঙলার সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় যে অবস্থা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেস দলের রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন প্রস্তাবটি উত্থাপনে আপত্তি করেন।

২৮শে নবেম্বর—

ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স বলে রচিত নিয়ম অনুসারে এক নোটিশ জারী করিয়া বাঙলা গবর্ণমেণ্ট বাঙলার সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় যে অবস্থা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসী দলের রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী গতকল্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, অদ্য স্পীকার প্রস্তাবটি বৈধ বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত জানান। অদ্য পরিষদের অধিবেশনে প্রস্তাবটির আলোচনা হয়। প্রস্তাবটি পরিশেষে ১২০-৪০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা দল ও স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত দলের সদস্যগণ ব্যতীত কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, নরেন্দ্রনাথ দাস (স্বতন্ত্র হিন্দু), ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং হিন্দু জাতীয় দলের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন মুলতুবী প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন। কংগ্রেসপক্ষ হইতে প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ অভিযোগ করা হয় যে, পাঞ্জাবে এমনকি বর্ত্তমানে সিভিল সার্ভিস কর্ত্তৃক শাসিত কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতেও অর্ডিন্যান্সের বলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বাঙলা দেশের মত ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি নোয়াখালী ও সিরাজগঞ্জে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হইতেছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী মিঃ হককে ঐ সব অঞ্চলে তাঁহার সহিত যাইতে আহ্বান করেন। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত তাঁহাকে ভারতের বহু প্রদেশে ঘুরিতে হইবে। কাজেই ডাঃ মুখার্জ্জির সহিত যাওয়ার সময় তাঁহার হইবে না।

বঙ্গীয় মহাজনী বিলের আলোচনা সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গত সোমবারের অধিবেশন কার্য্য বাতিল করিয়া দিয়া বিলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব মুসারফ হোসেনকে বিলের আলোচনার প্রস্তাব নূতন করিয়া উত্থাপনের নির্দ্দেশ দেন। তদনুসারে প্রেসিডেণ্ট সদস্যদিগকে বিল সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাবের নোটিশ দিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় দিবার জন্য সভার অধিবেশন ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখিয়াছেন।

২৯শে নবেম্বর—

লণ্ডনের একটি জাহাজের ১০১জন ভারতীয় খালাসীকে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ অমান্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৪জনকে ১২ সপ্তাহ এবং অবশিষ্ট সকলকে ৮ সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "চাষীর কথা" নামক বাঙলা পুস্তক বাঙলা গবর্ণর কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। "যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর" নামক বাঙলা পুস্তিকাও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী করে। ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী এবং তেজেন্দ্রলাল নাগ নামক দুইজন বাঙালী যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স অনুসারে বাজেয়াপ্ত শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত এবং প্রভাত সেন কর্ত্তৃক গণবাণী পাবলিশিং হাউস (২২০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) হইতে প্রকাশিত "চাষীর কথা" নামক পুস্তকের খোঁজে গণবাণী কার্য্যালয়ে খানাতল্লাসী করে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এইবার লইয়া চারিবার গণবাণী কার্য্যালয়ে খানাতল্লাসী হইল।

৩০শে নবেম্বর

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী মৌলবী তমিজুদ্দীন খাঁ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলটি তাঁহারই প্রস্তাবক্রমে পরিষদের ১১ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়।

সুক্কুর অঞ্চলে এক ভয়াবহ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ কর্ত্তৃক ৩১ জন হিন্দু নিহত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে ৭ জন স্ত্রীলোক।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

সমাজতন্ত্রী নেতা মিঃ এম আর মাসানী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সংকল্প করিয়াছেন। তিনি সমাজতন্ত্রী দলের ও বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত হুগলী জেলার ১৮ জন বিশিষ্ট বামপন্থী কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর নোটিশ জারী ও একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তির নাম শ্রীযুক্ত কেশব সমজদার। ইনি একজন আন্দামান বন্দী।

১লা ডিসেম্বর

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার "হরিজন" পত্রে "জটিল অবস্থা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে, আইন অমান্য ঘোষণা করিবার কোন আশু সম্ভাবনা নাই। গ্রেট বৃটেনকে বিব্রত করিবার জন্য কোন আইন অমান্য আন্দোলন হইতে পারে না। ইহা (আইন অমান্য) যখন স্পষ্টভাবে অবশ্যম্ভাবী হইবে, তখনই ইহা আসিবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মোট ১০টি বে-সরকারী বিল আলোচনার্থ আসে; ৭টি বিল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সংশোধন প্রস্তাবক্রমে ঐগুলি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উপরোক্ত বিলগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিলটি হইল বঙ্গীয় রাজনৈতিক বন্দী শ্রেণী বিভাগ বিল (১৯৩৯)। এইদিন এই বিলটির অপমৃত্যু ঘটে।

২রা ডিসেম্বর

বঙ্গীয় হিন্দুসভার উদ্যোগে এলবার্ট হলে এক বিরাট জনসভা হয়। আগামী কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে হিন্দুসভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ এবং কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার আসন্ন অধিবেশনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও সদস্য সংগ্রহ এবং প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬. Saturday, 2nd. December, 1939. [৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রুদ্ধদ্বারে—

এলাহাবাদে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে নূতনের কিছুই নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, কংগ্রেস যে দাবী করিয়াছে, সে দাবী তাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতার পর একথা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব ইংরেজ বহন করিতেছে এবং যতদিন পারিবে করিবেও; সে বোঝা সে নামাইতেও রাজী নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তির দরজা বন্ধ করিয়াই দিয়াছেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি বলিতেছেন, দরজা বন্ধ হউক, আমরা তবু ছাড়িব না, দরজাতেই ধর্ণা দিয়া থাকিব। আমাদের দাবী যাহারা মানিবে না, তাহাদের নিকট হইতে দাবী আদায় করিয়া লইবার মত শক্তি না থাকে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব; কারণ সে সবল, আমরা দুর্ব্বল—এ যুক্তি বুঝা যায় এবং এই যুক্তির মধ্যে অক্ষমতার একটা স্বীকৃতি পরোক্ষভাবে থাকিলেও তাহার মধ্যে আত্মমর্য্যাদার ভাব থাকে; কিন্তু যাহারা আমাদের কথা শুনিবে না, তবু তাহাদের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিব, ইহার মধ্যে অহিংস অক্রোধের একটা আলঙ্কারিক মাধুর্য্য-মহিমা বা উদার আধ্যাত্মিকতা থাকিতে পারে; কিন্তু বাস্তব রাজনীতি নাই। আপোষ-আলোচনার দরজা খোলা রাখিয়া দাবী জানাইবার উপযুক্ত আয়োজন বা ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করার পথ কার্য্যকরী হইতে পারে, কারণ এ-পক্ষের উদ্যোগ-আয়োজনে অপরপক্ষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার সেই পথে করিবে এবং তাহার ফলে অপরপক্ষের ভ্রান্তি নিরসন বা সুবুদ্ধি উদয়ের আশা থাকে; কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কার্য্যত আত্মপক্ষের শক্তি-সংগঠনকে আমলই দেন নাই, চরকা-খাদির সূত্রে অহিংস আধ্যাত্মিকতার বাঁধন শক্ত করিবার সাবেকী সেই মামুলী যুক্তি ছাড়া। বস্তুত এগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতত্ত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু প্রতিপক্ষের মনে আশু সুবুদ্ধি সঞ্চারের জন্য ঐকান্তিকতা বা উত্তপ্ততা নাই। ওয়ার্কিং কমিটি বলিয়াছেন যে, মন্ত্রীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগিতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নীতির সংশোধন না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত অসহযোগের এই নীতি চালান হইবে। মন্ত্রিত্ব ত্যাগের দ্বারা এই যে অসহযোগ, এই অসহযোগের মধ্যে 'তোমার ধন, তোমাকে দিব, কি যাবে আমার', কার্য্যত এমন একটা ভাবের ক্রিয়া প্রতিপক্ষের মনে হইতে পারে; কিন্তু ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা ভারতের স্বাধীনতা বা মর্য্যাদার বিরুদ্ধে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিবার নীতিতে নিরুপদ্রবভাবে বাধাদানের যে সঙ্কল্প ওয়ার্কিং কমিটি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের আত্যন্তিকতার অভাব এবং অপরপক্ষের ঔদার্য্যের উপর অসম যে বিশ্বস্তির ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, স্বাধীনতার প্রেরণায় জাগ্রত জাতিকে তাহা তৃপ্ত করিতে পারিবে না।

মহাত্মার মনোভাব—

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতিকে কার্য্যকর-ভাবে কোন্ পথে প্রয়োগ করিতে চাহিতেছেন, দেশের লোকের মনে এই প্রশ্নই উঠিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে এ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা দূর হয় নাই। সেদিন গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমি জানি, ভারত আজ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত বেদনার সহিতই লিখিতেছি যে, ভারত ব্যাপকভাবে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন করিবার জন্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করিবার সময় পর্য্যন্ত যদি কংগ্রেসকে অপেক্ষা করাইতে আমি সমর্থ না হই, তবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কুকুরের ঝগড়া দেখার জন্য আমি বাঁচিতে চাই না। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, যদি অহিংস আন্দোলন করিবার

উপায় আবিষ্কার কিংবা কংগ্রেসকে থামাইয়া রাখিবার পক্ষে সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা করিতে না পারি, অথবা যদি সাম্প্রদায়িক মীমাংসা না হয়, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে শক্তি হিংসার তাণ্ডবতা বন্ধ করিতে সমর্থ হইবে। আমি জানি, ইহার মধ্য দিয়া কিছুকালের জন্য অরাজকতা ও ধ্বংস চলিতে থাকিবে। এই বিপদকে বন্ধ করা ইংরেজ এবং অন্য সকল সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। গণ-পরিষদই একমাত্র উপায়।" কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, গণ-পরিষদ অর্থ কতকগুলি ব্যক্তির সমবায় নয়, দেশ শাসনের আইন-কানুন গড়িবার ক্ষমতা। যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিটা পর্য্যন্ত দিতেছেন না এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের ধুয়োয় নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে যাঁহারা নারাজ, তাঁহারা 'গণ-পরিষদ'-ই সকল শঙ্কা এবং সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা—এই কথা শুনিলেই ভড়কাইয়া গিয়া 'গণ-পরিষদ' স্বীকার করিয়া লইবেন, ইহা মনে করা আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। 'গণ-পরিষদ' পাইতে হইলেও সেজন্য নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠায় পর্য্যাপ্ত শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। গান্ধীজীও সেকথা অস্বীকার করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, "এমন সময় আসিতে পারে যে, গণ-পরিষদের জন্যই আন্দোলন প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু সে সময় এখনও আসে নাই।" সময় কবে আসিবে, সে কথাও গান্ধীজী বলেন নাই। সেই সময় না আসা পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে ঠেকাইয়া রাখার জন্যই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে তাঁহার নিরিখমত পাকা-পোক্ত অহিংস আন্দোলনের উপায় আবিষ্কৃত হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে থামাইয়া রাখিবার চিন্তাই তাঁহার প্রধান। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নীতির পরিবর্ত্তন না করিলে বেশীদিন তিনি যে চরকা ও খদ্দরের তত্ত্ব-সূত্র সংযোগে স্বাধীনতার আবেগে উদ্দীপ্ত দেশবাসীর অন্তরকে আপোষের আশায় সঞ্জীবিত রাখিতে পারিবেন না, এ সত্যকে তিনিও অন্তরে উপলব্ধি করিতেছেন। মহাত্মাজীর এই নৈরাশ্যের মধ্যে—এই দিক হইতে স্বাধীনতার জন্য সমগ্র ভারতের আকাঙ্ক্ষার যে উত্তাপের পরোক্ষ পরিচয় রহিয়াছে, ইহাই আমদের অন্তরে এই অবসাদের দিনেও আশার সঞ্চার করিতেছে।

ঐক্যের ভিত্তি—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সংস্কার উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার কথা আছে। খান বাহাদুর ভারতের ঐতিহ্যের আলোচনা করিয়াছেন। এ দেশের সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের শক্তির কথা তিনি শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে হইলে দেশের তরুণ-তরুণীদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা সকলেই এক মহান্ জাতির উত্তরাধিকারী, ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জন্য তাঁহাদের গর্ব্ব অনুভব করা উচিত। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সমস্যা এই সমস্যারই রূপান্তর মাত্র।' ভারতের সংস্কৃতির এ-সব সত্যতা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, সংহত রাষ্ট্রীয়তার ধারণা লইয়া ভারত কোনদিন দাঁড়াইতে পারে নাই। সমন্বয়ের সংস্কৃতি রাষ্ট্রকে শক্তি দিতে পারে নাই। যদি তাহাই দিত তাহা হইলে 'এই ভারতে—খান বাহাদুরের কথাতেই—সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী জাতি গঠনের সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও ভারত পরাধীন হইত না। মীরকাশিমকে বিহার এবং বাঙলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইত না। কিন্তু শুধু ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয়ের উদার অনুভূতিই যথেষ্ট নয়, ব্যষ্টি-চেতনা ছাড়াও দরকার সমষ্টি-চেতনার, রাষ্ট্রীয়তার সূত্রে সমষ্টি স্বার্থের অনুভূতি। কংগ্রেসই এই আদর্শকে কার্য্যত আকার দান করিতেছে, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে ভারতের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে—গঠন করিতেছে শক্তিশালী ভারতীয় মহা-জাতি। সংস্কৃতিগত ঐক্যের সূত্রে ভারতের জাতীয়তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা যাঁহারা কামনা করেন, কংগ্রেসই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। সংস্কৃতি সমন্বয়ের আদর্শকে যাঁহারা জীবন্ত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার কথা ভুলিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করুন।

নারীর আহ্বান—

সম্প্রতি কলিকাতা শহরে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন বেগম হামিদ আলী। আমরা তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া আশান্বিত হইয়াছি। তিনি বলেন—'সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও সঙ্ঘর্ষের কোলাহল যে সময় আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, সেই সময় আমরা নারীরা ঐক্য ও সেবার পথে দেশের সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের একত্রে মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য করার পক্ষে প্রাদেশিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা জাতিগত পার্থক্য কোন বাধারই সৃষ্টি করে নাই। আমরা সকলেই নিজদিগকে ভারতীয় মহিলা বলিয়া জ্ঞান করি এবং সেইজন্য ভারতীয় নারী-জাতির নৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও আইনগত অধিকার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রকার উন্নতির জন্য একযোগে কার্য্য করিতেছি।' সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এবং পৃথক্ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সভানেত্রী যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—'পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথা আমাদের জাতীয়তার একটা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল অঙ্গ-স্বরূপ। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইহা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমাদের নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মনোভাবের সৃষ্টি করা, যাহাতে ইহার উচ্ছেদ হয়। আমাদের ভারতীয় নারীদের এই ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। সেদিন তামিল-নাড়ু নারী সম্মেলনের সভানেত্রী স্বরূপে শ্রীযুক্তা মুথুলক্ষ্মী রেড্ডিও এমন কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—আমরা যদি

স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি আমাদিগকে ছাড়িতে হইবে। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। দেশের স্বার্থের দিক হইতে আমরা সকলেই ভারতবাসী। বেগম হামিদ আলী এবং শ্রীযুক্তা রোস্তর এই বাণী সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথার ধ্বজাধারীদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে কি?

বাঙলা ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহ—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীযুত সুকমল দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পড়ান হইবে, এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বিভাগের জন্য মহিলাদের নিকট হইতে ২৫টি এবং ছেলেদের বিভাগ হইতে দুইশতের অধিক আবেদন পৌঁছে। স্থানাভাবে ও সময়াভাবে বর্ত্তমানে সকলকে আমরা সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পড়িবার জন্য সকলেই উৎসুক। যে সকল বাঙালী ছাত্র দূর পশ্চিমের এমন স্থানে আছেন, যেখানে ভাল করিয়া বাঙলা কথা পর্য্যন্ত শুনিতে পান না, তাঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া মাতৃভাষার চর্চ্চা করিবার সুবিধা লাভ করিতেছেন।" আমরা আশা করি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙলা ভাষা শিক্ষার যে সুবিধা দিয়াছেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও সেই সুবিধা প্রদান করিবেন এবং তাহার ফলে নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির যোগসূত্রই দৃঢ় হইবে।

পরলোকে আশালতা দেবী—

মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে আশালতা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার লেখার মধ্যে একটা দরদের পরিচয় পাওয়া যাইত, নিজস্ব একটা সুর ছিল তাঁহার। 'দেশে' তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছে। তিনি 'দেশ' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যের গুরুতর ক্ষতি ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

জাতীয় পতাকায় ভয়—

গত ২৫শে নবেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর স্যার হ্যারি হেগ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। তিনি এবারকার সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগদান করেন নাই। যোগদান না করিবার কারণ এই দেখান হইয়াছে যে, কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের পতাকার নীচে যে অনুষ্ঠান হইয়াছে, গবর্ণর তাহার সভাপতিত্ব করিতে পারেন না। ২৫শে নবেম্বর জাতীয় পতাকা উত্তোলন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নূতন হইতেছে না। ১৯৩৭ সালে একটা প্রশ্ন প্রথম উঠে, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যস্থতায় এই মীমাংসা হয় যে, ২৫শে নবেম্বর তারিখে এবং অন্যান্য জাতীয় উৎসবের দিনে সিনেট হাউসের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা একটা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণর এদিকে নজর না দিলেও পারিতেন, কারণ গবর্ণর হিসাবে তিনি সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগদান করিতেছেন না, যাইতেছেন চ্যান্সেলার হিসাবে। কংগ্রেস পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকা, রাজনৈতিক দল বিশেষের পতাকা নয়; কিন্তু ভারতের আমলাতন্ত্র মনে-প্রাণে ইহার উল্টা সুর গাহিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কংগ্রেস পতাকা জাতীয় পতাকা নয়, আমলাতান্ত্রিক সেই মনোবৃত্তিটিই স্যার হ্যারি হেগের কাজে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন অবান্তর ছিল, তবু এই প্রশ্নকে টানিয়া আনা হইয়াছে। উদার-দৃষ্টির পরিচায়ক ইহা নয় এবং এক্ষেত্রে সৌজন্যসম্মত কাজটা হয় নাই। ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যান্ড সেদিন কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং স্যার স্যামুয়েল হোর প্রভৃতি ব্রিটিশ মাতব্বর পুরুষেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় ব্রিটিশ জাতির পবিত্র দায়িত্ব বুলি কপচাইতেছেন। কংগ্রেসের দাবীকে অস্বীকার করিয়া এমন সময়ে স্যার হ্যারি হেগের এই কার্য্যের ভিতরকার সঙ্গতির সূত্র খুঁজিতে বেগ পাইতে হয় না।

ছাত্রদের সৎসাহস—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রশংসা করিতেছি। চ্যান্সেলার হিসাবে গবর্ণর জাতীয় পতাকাকে জাতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইলেও তাঁহারা কংগ্রেস পতাকার এই জাতীয় মর্য্যাদা দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করিয়াছেন। ছাত্রদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, পতাকা যথারীতি সকালবেলা উত্তোলন করা হইবে; কিন্তু বেলা একটার সময় নামাইয়া লওয়া হইবে—বোধ হয়, চ্যান্সেলারের গবর্ণরী মর্য্যাদাকে রক্ষার গরজেই। কিন্তু ছাত্র-ইউনিয়ন এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ছাত্র-ইউনিয়নের সম্পাদক সৈয়দ নুরুল হাসান উক্ত পতাকা উত্তোলনকালে বলেন, "ভারতের জাতীয়তাবাদকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না আমরা ব্রিটিশবাদের গরজে।" আমরা আশা করি, বাঙলার মুসলমান তরুণ সম্প্রদায় সৈয়দ নুরুল হাসানের এই উদ্দীপনাময়ী উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন এবং নিজেদের জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রেরণা লাভ করিবেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগওয়ালাদের আচরণের অনিষ্টকারিতা তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার নামে তৃতীয়পক্ষের স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার পাপ ব্যবসার পসার বাঙলাদেশে আর জমিয়া উঠিবে না।

ইংরেজের যুদ্ধের উদ্দেশ্য—

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সেদিন এক দীর্ঘ বক্তৃতায় কি জন্য তাঁহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কথাটা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, নূতন ইউরোপের প্রতিষ্ঠা করাই হইল আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য। আমরা বিজেতা-স্বরূপে ইউরোপের মানচিত্র নূতন করিয়া আঁকিতে চাই না, যাতে ইউরোপের জাতিসমূহ সদিচ্ছা এবং সদ্ভাবের সঙ্গে নিজেদের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে পারে, আমরা তাহাই করিতে চাই। আমরা চাই, এমন নূতন এক রকম ইউরোপ, যে ইউরোপে পরের আক্রমণের ভয় আর থাকিবে না। গোলটেবিল বৈঠকের পার্শ্বে দরকার হইলে নিঃস্বার্থপর তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় প্রতিবেশী শক্তিদের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশিত হইতে পারে, আমরা এমন ইউরোপই চাই। প্রত্যেক দেশের নিজেদের শাসনতন্ত্র গঠনের অধিকার নিজেদের থাকিবে এবং অস্ত্রসজ্জা অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইবে; অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজন শুধু ততটুকুই থাকিবে, যতটুকু নিজেদের দেশের আভ্যন্তরীণ আইন ও শান্তি রক্ষার জন্য আবশ্যক। চেম্বারলেন সাহেবের সদিচ্ছা জয়যুক্ত হউক, ইউ-রোপে প্রেমের হাট বসিয়া যাউক, কিন্তু আমরা এশিয়ার কালা আদমীরা—আমাদের গতি কি? চেম্বারলেন সাহেব এ প্রশ্নেরও কিছু জবাব দিয়াছেন মিঃ এটলীর সমালোচনার উত্তরে তাঁহার পরবর্ত্তী বক্তৃতায়। তিনি বলিতেছেন—আমরা এই কথা বলি যে, ইউরোপে এতদিন ধরিয়া এই যে আতঙ্ককর অবস্থা চলিতেছে, আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাহারই অবসান ঘটাইতে চাই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যদি আশ্বস্তির ভাব জাগে, তাহা হইলে আমরা উহা করিতে পারিব। জগতের অন্যান্য অংশের সমস্যার সমাধানের আবশ্যকতাকে আমি এতদ্দ্বারা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, সমস্যার গোড়া রহিয়াছে ইউরোপে এবং ইউরোপের সমস্যার যদি সমাধান হয়, তাহা হইলে জগতের অন্য স্থানের সমস্যার সমাধান ততটা কঠিন হইবে না। অর্থাৎ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট; বলা বাহুল্য, চেম্বারলেন সাহেবের এই পরবর্ত্তী ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণেও এশিয়ার কালা আদমী আমাদের আশ্বস্ত হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির ভগবৎ-প্রদত্ত অভিভাবকত্বের ভাগ-বাঁটোয়ারার দ্বারাও ইউ-রোপের বিভিন্ন শক্তিদের তুষ্টিসাধন হইতে পারে। নূতন ইউরোপ গঠনের মূলে চেম্বারলেন সাহেব যে-সব আদর্শের কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ 'প্রত্যেক দেশকে নিজেদের শাসন-তন্ত্র গঠনের অধিকার প্রদান করা হইবে'—সমান অধিকারের সর্ত্তে গোলটেবিলের পাশে বসিয়া, বাঞ্ছনীয় হইলে নিঃস্বার্থপর তৃতীয় পক্ষের সাহায্যে প্রতিবেশী শক্তিদের সীমা সরহদ্দ নির্দ্দিষ্ট হইবে—এশিয়াবাসীর সম্পর্কেও এই সব প্রযোজ্য কি? এই সব সর্ত্ত প্রযুক্ত হইবে কি ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও? চেম্বারলেন সাহেব সে কথা চাপিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রয়োজন হইল ইউরোপে সন্তোষ স্থাপন করা —সুতরাং আমরা এশিয়াবাসী তাঁহাদের এই উক্তিতে উল্লসিত হইবার কারণ আমাদের কিছুই নাই।

সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ?—

সাম্রাজ্যবাদকে দূর করিতে হইবে—শ্রমিক সদস্য মিঃ এটলীর এই কথায় উত্তেজিত হইয়া ব্রিটিশ মন্ত্রী বলিয়াছেন—"এটলী সাম্রাজ্যবাদের কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নাই এবং কোন দেশ বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন ইহাও এটলী বলেন নাই। তাঁহার কথার অর্থ কি বস্তুত আমি বুঝি নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বলিতে যদি জাতিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া এবং অন্য জাতির রাজনীতিক কিংবা অর্থনীতিক স্বাধীনতাকে দাবাইয়া রাখা বুঝায়, যদি সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হয় এক দেশের স্বার্থের জন্য অপর দেশের সম্পদ শোষণ তাহা হইলে আমি বলিব যে, উহা আমাদের দেশের ধর্ম্ম নয়।" ভারতবাসীরা এমন উদারচেতা গুরুদের শিক্ষানবিশীতে থাকিয়াও আজ যে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিল না; আজও যে ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পৃথিবীতে প্রধান হইয়াও জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরিদ্র এবং ভারতের অধিবাসী-দের আজও অপরিসীম অজ্ঞতা এবং আত্মরক্ষায় অসহায়ত্ব, সে কেবল ভারতবাসীদের অদৃষ্টেরই দোষ। ইহা ছাড়া আর কি বলিবার আছে?

হেমন্ত-লক্ষ্মী

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ বি-এ, বি-টি

পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রে সন্তর্পণ চরণ সঞ্চারে
মেলিয়া আয়ত-আঁখি বহুদূর দিগন্তের পারে—
কুয়াসা গুন্ঠন তুলি' সঙ্কুচিতা বধূটির মত
নীরবে দাঁড়ালে তুমি; ওই দুটি ঘনকৃষ্ণায়ত—
উজল নয়নে আজি নাহি আর চকিত বিলাস;
শারদ-প্রাতের সেই শুভ্র-কাশ-স্নিগ্ধ স্মিতহাস
কোথায় মিলায়ে গেছে; ঝলকিছে দুটি আঁখিপাতে
নীহার অশ্রুবিন্দু; শত কোটি বুভুক্ষুর সাথে
সম দুঃখভোগী মাতা! দয়াময়ী অন্নদাত্রীরূপে
হে কল্যাণি, দাঁড়াইলে সন্তর্পণে আজি চুপে চুপে।
দিগন্ত মুখরি তোলা উচ্ছ্বসিত রাখালিয়া সুরে
তোমার বন্দনা বাজে; পূজা তব হৃদি অন্তঃপুরে!

হৈমন্তিকা, হেমন্তের দয়াময়ী অপরূপা বধূ
নয়নে অভয় বহি' বক্ষে বহি নন্দনের মধু—
দ্যুলোক ত্যজিয়া এলে ভূলোকের মাটীর কুটিরে—
অসহায় আর্ত্ত যেথা—অন্নহীন কেঁদে কেঁদে ফিরে!

বুভুক্ষুর অন্নপূর্ণা, দুঃখীর জননী তুমি, অয়ি—
বরাভয় মূর্ত্তিমতী, হৈমন্তিকা, হে করুণাময়ি—!

ভয় কোথায়

দেখছি মৃত্যুর দিগন্তব্যাপী অভিযানের করালরূপ। ক্ষমতার আকাশ-স্পর্শী স্পর্ধা ন্যায়কে করছে পদাঘাত, প্রেমকে করছে বিদ্রূপ, সত্যকে করছে অবজ্ঞা। হিংসার ঝটিকা গর্জন করতে করতে চলেছে মহাবেগে। রক্তের সাগরে সভ্যতার ইমারত ডুবু ডুবু। আলো কোথায়? আশ্রয় কোথায়? আশা কোথায়?

হিংসার দুরন্ত ঝড়ের ধাক্কায় আবিসিনিয়ার মেরুদণ্ড গেল ভেঙে, মাঞ্চুকো অদৃশ্য হয়ে গেলো জাপানের উদরে, স্পেনের গণতন্ত্র হারিয়ে ফেললো আপনার অস্তিত্ব, চেকো-শ্লোভেকিয়ার স্বাতন্ত্র্য গেল নিশ্চিহ্ন হ'য়ে, পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা থেকে হোলো বঞ্চিত।

এতগুলো দেশের এই যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল—এর জন্য দায়ী করবো কাকে? সব দোষ নাজী আর ফাসিষ্টদের ঘাড়ে চাপিয়ে—অপরাধের কালিমা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। একপক্ষের আসুরিক মনোবৃত্তি যেমন গণতন্ত্রের লাঞ্ছনার জন্য দায়ী আর এক পক্ষের দৌর্ব্বল্যও এর জন্য কম দায়ী নয়। আবিসিনিয়াকে ফাসিষ্টরা যখন আক্রমণ করলো —অন্যান্য জাতি সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো যেমন ক'রে ভীষ্ম-দ্রোণ প্রমুখ মহারথীরা রাজসভায় দ্রৌপদীর কেশা-কর্ষণের দৃশ্য দেখেছিল। প্রতিবাদের সুর শোনা গেল বটে, কিন্তু কোনো জাতি এসে আবিসিনিয়ার পাশে তেমন জোরের সঙ্গে দাঁড়ালো না। পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করেছে ব'লে ফ্রান্স আর ইংলণ্ড আজ যেমন গণতন্ত্রের নিশান উড়িয়ে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সেদিন যদি কেউ এমনি ক'রে দাঁড়াতে পারতো! বেচারা আবিসিনিয়া এক একা লড়াই করতে করতে অবশেষে নিরাশ হয়ে পশুবলের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। স্প্যানিশ গণতন্ত্রকে নিম্মূল করবার জন্য নাজী ও ফাসিষ্টরা যখন ফ্রাঙ্কোকে শক্তি যোগাতে লাগলো তখন গণতন্ত্রের জয়ধ্বজাকে উড্ডীন রাখবার জন্য অন্যান্য জাতি যদি স্প্যানিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতো! আজানা আর ক্যাবেলারোর সহায় হোলো না কেউ। স্পেনে গণতন্ত্রের জয়নিশান ধূলায় লুটিয়ে পড়লো! তারপর এলো চেকোশ্লোভেকিয়ার পালা। হিটলার বিরাট মুখব্যাদান ক'রে চেকোশ্লোভেকিয়াকে চাইলো গ্রাস করতে। বকরাক্ষসের মুখের মধ্যে ম্যাজারিকের দেশ নিমিষে বিলীন হ'য়ে গেল—কেউ তাকে রক্ষা করতে পারলো না। অনেকদিন আগে ১৯৩১ সালে জাপান যখন চীন থেকে মাঞ্চুকোকে ছিনিয়ে নিলো—তখনও গণতন্ত্রের লাঞ্ছনা সবাই সহ্য করেছিলো। মাঞ্চুকোর উপরে জাপানের আক্রমণের দিন থেকে সুরু ক'রে চেকো-শ্লোভেকিয়ার উপরে জার্ম্মানীর আক্রমণের শেষ পর্য্যন্ত চলে এসেছে একটা কলঙ্কের পালা। এই পালাতে এক পক্ষ নেকড়ে বাঘের দুরন্ত ক্ষুধা নিয়ে গ্রাস করতে চেয়েছে রাজ্যের পর রাজ্য, আর এক পক্ষ নেকড়ে বাঘদের শান্ত ক'রে রাখবার জন্য তাদের লোভকে দিয়েছে প্রশ্রয়। তাদের নিষ্ঠুর অভিযানকে বাধা না দিয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয় মনে করেছে। এই ঔদাসীন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য অনেকখানি দায়ী। জাপানের মাঞ্চুকো-গ্রাস, আবিসিনিয়ার সর্ব্বনাশ, স্পেনে গণতন্ত্রের পতন, হিটলার কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভেকিয়ার ধ্বংস সাধন—প্রত্যেকটি ঘটনায় একটা প্রবল জাত আর একটা দুর্ব্বল জাতকে আক্রমণ করেছে—বাকী জাতিগুলি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষের মতো নির্লজ্জ হিংসার সেই তাণ্ডব নৃত্যকে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে কখনো শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব? গণতন্ত্রের জয় সেখানে কেমন ক'রে আমরা আশা করতে পারি? গিলবার্ট মারে ভারি একটা সত্য কথা লিখেছেন যেটা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করছি।

> জাতিগুলি বাঁচতে পারে যদি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকে। বাঁচবার অন্যপথ খোলা নেই। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য যদি না করে, তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি যদি সত্যি সত্যিই শান্তিকে কামনা করে, যাতে শান্তি আসে তার জন্য এক যোগে তারা চেষ্টা করুক, যারা যুদ্ধ ঘটাচ্ছে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলুক—যুদ্ধের অবসান ঘটবে অনতিবিলম্বে।

পরস্পরের সঙ্গে এই সহযোগিতার অভাবের সুযোগ নিয়েই নাজীবাদ আর ফ্যাসিজম্ আপনাকে পুষ্ট করেছে। জাতির সঙ্গে যদি মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ থাকতো—একের বিপদকে যদি সবাই নিজের বিপদ বলে মনে করতে পারতো—সাধ্য কি একটা জাতি আর একটা জাতিকে আক্রমণ করে। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'—এই নীতি পৃথিবীতে আপনাকে জয়ী করতে পেরেছে ব'লেই আকাশ আজও রণহুঙ্কারে মুখরিত।

কিন্তু যুদ্ধ যে আজও ঘটতে পারছে তার সবচেয়ে বড়ো কারণটা কি? জনসাধারণের অজ্ঞতা আর ভীরুতা। জার্ম্মানীতে, ইটালিতে, জাপানে স্বাধীন চিন্তা লোপ পেয়েছে অনেকদিন থেকে। মানুষ সেইসব দেশে ভুলে গিয়েছে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে, নিজের কান দিয়ে শুনতে, নিজের মন দিয়ে ভাবতে। নিজের বিবেককে সে গচ্ছিত রেখেছে ডিক্টেটরের হাতে। ইউনিফর্ম্ম-পরা বস্তুর পর্য্যায়ে সে নেমে গিয়েছে মনুষ্যত্বের সিংহাসন থেকে। হিটলার হুকুম দিলো আক্রমণ কর পোল্যাণ্ডকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইউনিফর্ম্ম-পরা ঝটিকাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো পোলিশদের উপরে। কাজটার ন্যায়-অন্যায়কে কেউ গণনার মধ্যে আনলো না। সবাই হিটলারের প্রতিধ্বনি, সবাই হিটলারের ছায়া। মানুষ নেই, সবাই বস্তু। জার্ম্মানরা যদি রাইফেল নামিয়ে রেখে বলতে পারতো, অন্য জাতির স্বাধীনতা যাতে লোপ পায় এমন কাজ আমরা করবো না, জার্ম্মানীর স্বার্থের বেদীমূলে অন্য জাতির কল্যাণকে কখনো বলি দেবো না, হিটলারের পক্ষে পোল্যাণ্ড আক্রমণ কখনই সম্ভব হোত না। ইটালির যুবকেরা যদি জোরের সঙ্গে বলতে পারত—আবিসিনিয়ার স্বাধীনতার উপরে আমরা কিছুতেই হস্তক্ষেপ করব না—হাবসীদের রাজ্যের উপরে মুক্তির নিশান আজও সগর্ব্বে দুলতে থাকত। মহাচীনের বুকে যুদ্ধের দাবানল আজ দাউ দাউ ক'রে জ্বলতো না যদি জাপানের যুবকেরা রাষ্ট্রের হুকুমকে দৃঢ়তার সঙ্গে

প্রত্যাখ্যান করতো। নিজের সিংহাসন অপরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যেই জগদ্ব্যাপী এই মহাযুদ্ধের মূল নিহিত রয়েছে। মানুষ যতদিন বস্তুর পর্য্যায় থেকে মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে আপনাকে উন্নীত করতে না পারছে—ততদিন যুদ্ধের অবসান অসম্ভব। কিন্তু মানুষ দেশে দেশে আপনাকে অপরের হাতের যন্ত্র হ'তে না দিলেই তো পারে! নিজের মন দিয়ে না ভেবে ডিক্‌টেটরদের মন দিয়ে ভাববার এই বিড়ম্বনা কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে। সাধারণ মানুষের মনে নিছক সত্যকে জানবার স্পৃহা কোনদিনই বলবতী নয়। তারা রূপকথা শুনতে ভালোবাসে, যা শুনলে তাদের আত্মাভিমান চরিতার্থ হয়, তাই শুনতেই তাদের আগ্রহ। ন্যায়ের জন্যই বা তাদের মনে অনুরাগের প্রাচুর্য্য কোথায়? অন্যায় যদি তাদের স্বার্থকে পরিপুষ্ট করে—অন্যায়কেই তারা শ্রেয় মনে করে। নিজের ঘোলকে টক না বলাই মানুষের স্বভাব। নিজের জাতির স্বর্থ, নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ—একেই মানুষ বড়ো ক'রে দেখে। এই স্বার্থবুদ্ধি আমাদের সত্যানুরাগকে আবিল ক'রে তোলে। এই জন্যই কার পক্ষে ন্যায়—এই নিয়ে যখন বাদানুবাদ আরম্ভ হয়, তখন মানুষ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হয়ে নিজের জাতির আচরণকে সব সময়ে ন্যায়ানুমোদিত ব'লে সমর্থন ক'রে থাকে। স্বজাতির অন্যায় কদাচিত মানুষের চোখে পড়ে। যারা ডিক্টেটর, তারা মানুষের চিত্তের এই সনাতন দুর্ব্বলতা সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন। সেই জন্য খবরের কাগজকে, রেডিওকে, ছায়াচিত্রকে আশ্রয় ক'রে ডিক্টেটরগণ এমন সব সংবাদ পরিবেষণ ক'রে থাকেন, যাদের মুকুরে শত্রুপক্ষের আচরণ সব সময়ে মসিলিপ্ত হ'য়ে দেখা দেয়। লোকে আগ্রহের সঙ্গে সেই সব সংবাদ পড়ে—একপক্ষের কথাই তাদের কানে এসে পৌঁছায়, ফলে সত্য তাদের কাছে দেখা দেয় বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করে। সত্যকে জানবার কোন কালেই সুযোগ পায় না তারা, ডিক্টেটরগণ যা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চান—মাত্র তারই সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। এরকম একটা অবস্থায় মানুষের পক্ষে নিজের মন দিয়ে ভাবা অসম্ভব। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে ইটালির, জার্ম্মানীর ঘরে ঘরে রেডিয়ো যন্ত্র। প্রতিদিন ঘরে বসে মানুষ সেখানে শুনছে মুসোলিনীর কথা, হিটলারের কথা, খবরের কাগজে পড়ছে হিটলারের বাণী, মুসোলিনীর বাণী। একপক্ষের কথা ক্রমাগত শুনতে শুনতে, পড়তে পড়তে মানুষ সত্যের সঙ্গে আপনার যোগ সম্পূর্ণরূপেই হারিয়ে ফেলে। আজ তাই জার্ম্মানীতে আর ইটালিতে হাজার হাজার লোক সত্য সত্যই বিশ্বাস করে—জোর যার, মুল্লুক তার এই নীতির মধ্যে বর্ব্বরতার একেবারেই কোনো দাগ নেই। জার্ম্মানীতে, ইটালিতে ইস্কুলে ইস্কুলে যে ইতিহাস পড়ানো হয়—তার সঙ্গে সত্যের যোগ অল্পই। তার লক্ষ্য প্রতি জার্ম্মানের কাছে জার্ম্মানীকে একান্ত বড় ক'রে দেখানো, ইটালিয়ান ছাত্রকে যুদ্ধপ্রিয় ক'রে তোলা।

কিন্তু মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিজেকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা ক'রে দেখবার প্রবৃত্তি রয়েছে। সে যা বিশ্বাস করে, তা সত্য এবং সে যে আচরণ করে, তা ন্যায়ানুমোদিত কি না—তা খতিয়ে দেখার একটা আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রকৃতিরই অঙ্গ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যদি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, তবে তার তীব্র আলোকে মিথ্যা ধরা পড়তে বাধ্য, মানুষের বিবেক যদি সুপ্তি থেকে জাগে—তবে অন্যায় করতে সে কখনোই সম্মত হবে না। মানুষ যদি সত্যকে জেনে ফেলে, ন্যায়কে অনুসরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে তো ডিক্টেটরদের শাসন একদিনও টিঁকবে না। অতএব মনকে কর কারারুদ্ধ, বুদ্ধিকে ক'রে দাও পঙ্গু, বিবেককে ক'রে দাও অসাড়। ইটালিতে, জার্ম্মানীতে মানুষের মনের চারিদিকে খাড়া করা হয়েছে অদৃশ্য প্রাকার। সেখানে সত্যকে জানবার মানুষের কোনো অধিকার নেই। মানবাত্মার উপরে এই যে অত্যাচার—এই অত্যাচারের তুলনায় বড়ো শহর পুড়িয়ে দেওয়ার অপরাধ তুচ্ছ। গণতন্ত্রকে যদি আজ জয়ী করতে হয়—মানুষের মনকে সব আগে রাখতে হবে মুক্ত। মানুষকে বস্তুর পর্য্যায় থেকে উন্নীত করতে হবে মনুষ্যত্বের স্তরে যেখানে সত্যকে জেনে তাকে অনুসরণ করবার মতো সাহসের অধিকারী হয়েছে সে। নাজীবাদ আর ফ্যাসিজমকে নষ্ট করবার সব আগে প্রয়োজন হয়েছে এই জন্য—যে ওরা মানুষের মনের কাছে সত্যকে পৌঁছে দেবার সব পথকে আজ রুদ্ধ করেছে। মানুষের মন যেখানে কাররুদ্ধ, সেখানে গণতন্ত্রের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

পাণ্ডুবর্ণ চাঁদ

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ওগো কামবতী পান্ডুবর্ণ চাঁদ,
আকাশে বিছায়ে নিতি কামনার ফাঁদ—
রাত্রিরে তুমি ক'রে তোল মোহময়ী!
নভ-অঙ্গনে গৃহ-বারান্দা ধ'রে—
দাঁড়াইয়া থাক বাসরসজ্জা ক'রে,
ইঙ্গিতে তব আমি হই পরাজয়ী!
হে বরাঙ্গনা, তব হাসি ইসারায়—
আকাশে তারার দীপশিখা নিভে যায়,
মোর তনুমনে জাগে বাসনার ঢেউ।
তোমার নয়নে আমার নয়ন রাখি'—
সারাটি রজনী জাগিয়া বসিয়া থাকি—
তুমি জান শুধু,—একথা জানে না কেউ।
ওগো কামবতী, ওগো কলঙ্কী চাঁদ
আকাশে বিছাও নিতি কামনার ফাঁদ।

জার্ম্মানীর মাইন-সংগ্রাম

এবারকার যুদ্ধের প্রধান ব্যাপার ঘটিতেছে বলা যাইতে পারে স্থলপথে অপেক্ষা জলপথে বেশী। যুদ্ধ বাধিবার পর জার্ম্মানীর ডুবো জাহাজের খুব একচোট উৎপাত আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ নৌ-বিভাগের হিসাবে দেখা যাইতেছে জার্ম্মান ডুবো-জাহাজের চোরা-গোপ্তা লড়াইয়ের ফলে ইংরেজ পক্ষের ১,৫২৬ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে। বিলাতের সওদাগরী জাহাজী সমিতি বলিতেছেন যে, জার্ম্মান ডুবো জাহাজের আক্রমণে তাঁহাদের ১৭০ জন লোক মারা গিয়াছে এবং ৮০ জন মারা গিয়াছে মাইনের আঘাতজনিত দুর্ব্বিপাকে। কিছুদিন হইল জার্ম্মান ডুবো জাহাজের দৌরাত্ম্য কিছুটা যেন কমিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন জার্ম্মানীর বেতার বিভাগ হইতে এই কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, উত্তর মহাসাগরে জার্ম্মানীর সমর বিভাগ হইতে মাইন ফেলা হইতেছে। এই ঘোষণায় বলা হয়, ব্রিটিশের সমুদ্রে অধিকারের মধ্যে নিজেদের সওদাগরী জাহাজ রক্ষার ক্ষমতা ইংরেজের এখন আর নাই। নিরপেক্ষ শক্তির গোপন চালে নিজেদের কাজ বাগাইবার জন্য সে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া চলিতেছিল, জার্ম্মানী তাহাও নষ্ট করিয়া ছাড়িবে। ঐ ঘোষণায় আরো আছে, ইংরেজের সওদাগরী স্বার্থের জন্য চিন্তা জার্ম্মানীর নাই, লড়াই বাধাইয়া সেদিক হইতে বিপদের ঝুঁকি সে নিজেই লইয়াছে, নিরপেক্ষ দেশের সওদাগরী স্বার্থের যে ক্ষতি হইতেছে, সেজন্য জার্ম্মানীর সরকারী বিভাগ দুঃখিত; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় জার্ম্মানীর ইহা না করিয়া উপায় নাই।

জার্ম্মানীর এই চুম্বক মাইনের কথা উল্লেখ করিয়া গত ২৬শে নবেম্বর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বেতারযোগে বলিয়াছেন—"আমাদের দেশের দরিয়ায় নির্ব্বিকারে এক ধরণের নূতন মাইন পাতা হইতেছে। জার্ম্মানরা তাহাদের আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করিয়াই এইরূপ করিতেছে। প্রত্যহ নিরপেক্ষ ও ব্রিটিশ উভয় প্রকার জাহাজই তাহারা এই উপায়ে জলমগ্ন করিতেছে এবং নিরপেক্ষ দেশের বহু নরনারীর প্রাণ ও অঙ্গহানি ঘটাইতেছে। ইহাতে জার্ম্মানদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহারা আশা করিতেছে যে, এই বর্ব্বর অস্ত্র প্রয়োগে তাহারা সমুদ্রপার হইতে আমাদের পণ্য সরবরাহ বন্ধ করিতে পারিবে এবং চাপিয়া ধরিয়া বা অনশনে রাখিয়া আমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিবে। এই চেষ্টা সফল হইবার আশঙ্কা আপনারা করিবেন না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই চুম্বক-মাইনের গুপ্ত-তথ্য জানিতে পারিয়াছি। আমরা যেমন ডুবো-জাহাজকে আয়ত্তে আনিয়াছি, তেমনই চুম্বক-মাইনকেও আয়ত্তে আনিব।"

ব্রিটিশ নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চুম্বক-মাইন ধ্বংসের অভিযানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। মাইন ধ্বংস করিবার জন্য দুইশতাধিক জাহাজ নিযুক্ত করা হইবে, এই সব জাহাজে কাজ করিবার জন্য দুই সহস্র ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ হইতেছে।

সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জার্ম্মানীর মাইনের উপদ্রব বিশেষভাবে আতঙ্ককর হইয়া উঠিয়াছে। হিটলার হুমকি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এবার তাঁহারা এমন এক নূতন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা হইতে আত্মরক্ষার কোন ক্ষমতা শত্রুপক্ষের নাই। এই নূতন অস্ত্র কি হইতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল; কিন্তু প্রথমত এই হুমকীকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এখন বুঝা যাইতেছে, জার্ম্মানীর এই নূতন ধরণের মাইনই হয়ত সেই মারাত্মক অস্ত্র। এই মাইনকে চুম্বক মাইন বলা হইয়া থাকে; এই মাইন কিছুদূরে দিয়া যে-সব জাহাজ যায়, সেগুলিকে টানিয়া কাছে লইয়া থাকে এবং সঙ্ঘাতে বিস্ফুরিত হয়। ইংরেজ পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, এই ধরণের মাইনের কৌশল যে তাঁহাদের না জানা ছিল এমন নয়, কিন্তু মাইন সংগ্রামে যে আন্তর্জ্জাতিক বিধান আছে, সেগুলি পাছে ভঙ্গ হয়, সেজন্য তাঁহারা এদিকে জোর দেন নাই। বিগত মহাসমরে দুই ধরণের মাইন ব্যবহার করা হইয়াছিল। এক রকম মাইন আবিষ্কার করিয়াছিল মার্কিনেরা, এই মাইনের ক্রিয়া-শক্তি নিবদ্ধ ছিল ৩৫ ফুটের মধ্যে, এই ৩৫ ফুটের মধ্যে ধাতু-নির্ম্মিত কোন জাহাজ গেলে মাইন ফাটিত। ইহা ছাড়া 'অসিলেটিং মাইন' বলিয়া এক রকম মাইনও বিগত মহাসমরের সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই মাইনগুলি খোলা সমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, জলের কতকটা গভীর দেশে এই মাইনগুলি ভাসিতে থাকে। এই মাইনের বিশেষত্ব এই যে, এগুলিকে সহজে নষ্ট করা যায় না।

উত্তর মহাসাগরের যে-সব অঞ্চল দিয়া সওদাগরী জাহাজ চলাফেরা করিত এবং যে-সব পথ নিরাপদ বলিয়া ঘোষিত ছিল, জার্ম্মানীর এই নূতন ধরণের মাইনের দৌরাত্ম্যে সে-সব স্থান আর নিরাপদ নাই। ডুবো-জাহাজের যোগে এই সব মাইন ছড়ান হইয়া থাকে, এখন আবার উড়োজাহাজ হইতেও নাকি এই সব মাইন ছড়ান হইতেছে। রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া আসিয়া উড়োজাহাজগুলি নীচে নামিয়া টেমস নদীতেও মাইন ফেলিয়াছিল জানা গিয়াছে। এই সব মাইনের আঘাতে এ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ দেশসমূহেরও কম ক্ষতি হয় নাই। 'সাইমন বলিভিয়ার' নামক ওলন্দাজ জাহাজখানা ডুবিয়া যাওয়ায় বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে; 'তেরুকুনীমারু' নামক একখানা জাপানী জাহাজ ডুবিতেও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। জার্ম্মানীর এই দৌরাত্ম্যের প্রতিকারস্বরূপে ইংরেজ পক্ষ হইতে এই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অতঃপর তাঁহারা জার্ম্মানী হইতে রপ্তানি যত মাল সব আটক করিবেন।

জার্ম্মানী অন্য সর্ব্বত্র যেমন আন্তর্জ্জাতিক কোন বিধি-বিধানের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই, এই মাইন সংগ্রামের ব্যাপারেও সেই পন্থাই অবলম্বন করিতেছে। গত ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জার্ম্মানী এই ঘোষণা করে যে, গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়র্লণ্ডের উপকূল ভাগ সামরিক অঞ্চল

বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং ঐ অঞ্চলের মধ্যে শত্রুপক্ষের যত সওদাগরী জাহাজ দেখা যাইবে, লোকজনের প্রাণ-হানির কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া সেগুলি ডুবাইয়া দেওয়া হইবে, ঐ সব অঞ্চলের মধ্যে যে-সব নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ থাকিবে, সেগুলিরও বিপদের কারণ থাকিবে। জার্ম্মানীর এই হুমকি কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায় 'লুসেটোনিয়া' জাহাজ ডুবিতে। অসামরিক একখানা জাহাজ ডুবাইয়া বহুসংখ্যক নির্দ্দোষী নরনারীর হত্যার কারণ ঘটানতে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তখন সমগ্র সভ্যজগতে ক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তখনও ইংরেজ এবং ফরাসী পক্ষ হইতে প্রতিশোধ ব্যবস্থাস্বরূপে বর্ত্তমান নীতি অবলম্বন করা হয়।

মাইন সংগ্রামের কতকগুলি আন্তর্জ্জাতিক বিধান আছে। একটি বিধান এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া শত্রুপক্ষের সমুদ্র উপকূলে বিক্ষিপ্তভাবে মাইন ছড়ান নিষিদ্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে জাহাজ চলাচলের জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার জন্য উপকূল ভাগে মাইন পাতিতে পারেন, কিন্তু ঐ সব অঞ্চলের উপর কড়া নজর রাখিতে হইবে এবং যে সব অঞ্চলে কড়া নজর রাখা সম্ভব হইবে না, সে সব অঞ্চলের বিপজ্জনকতার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দেশসমূহকে তাহাদের রাজদূতদের মারফতে সুনির্দ্দিষ্ট রকমে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। জার্ম্মানী বর্ত্তমানে এই সব সর্ত্তের কোনটিই রক্ষা করিতেছে না। জার্ম্মানীর নৌ-বিভাগ দুই মাস পূর্ব্বেও এই কথা ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা মাইন প্রয়োগের ব্যাপারে আন্তর্জ্জাতিক বিধি-বিধান মান্য করিয়া চলিবেন। কয়েকদিন আগেও জার্ম্মানীর প্রচার বিভাগ এই কথা বলে যে, 'সাইমন বলিভিয়ার' ডুবির জন্য তাঁহারা দায়ী নয়, দায়ী হইল ইংরেজ; অথচ এখন তাহারা স্পষ্ট বলিতেছে যে, মাইন তাহারাই পাতিতেছে।

জার্ম্মানীর এই মাইন-সংগ্রামের ফলে শুধু যে ইংরেজেরই ক্ষতি হইবে ইহা নয়, নিরপেক্ষ শক্তিরও ক্ষতি হইবে। জার্ম্মানী সে ঝুঁকি লইয়াই কাজ করিতেছে। এই ঝুঁকি লইবার মূল কারণ কি? বুঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মানী এই উপায়ে ইংরেজের সঙ্গে নিরপেক্ষ শক্তিসমূহ যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য না করে সেই চেষ্টা করিতেছে এবং এইভাবে শুধু জার্ম্মানীর সঙ্গেই ইউরোপের নিরপেক্ষ শক্তিগুলি যাহাতে ব্যবসা চালায় সেই পথে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার চেষ্টায় আছে। হিটলার ইংরেজকে এইভাবে ঘরবন্দী করিতে চাহিতেছেন। জার্ম্মানীর প্রচার-বিভাগ হইতে কিছুদিন হইল নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশকে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে--বর্ত্তমান সময়ে দূর সমুদ্রপথে ব্যবসা চালান বিপজ্জনক; পক্ষান্তরে জার্ম্মানীর সঙ্গে ব্যবসা চালাইবার পথ তাহাদের পক্ষে খোলা আছে। এরূপ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দেশগুলির পক্ষে সঙ্কট কম নয়। জার্ম্মানীর ক্ষমতা যাহাতে বাড়ে, কি নরওয়ে, কি সুইডেন, ইউরোপের কোন দেশই মনেপ্রাণে তাহা কামনা করিতে পারে না; কারণ জার্ম্মানীর জোর বৃদ্ধির অর্থই হইল তাহাদের ভবিষ্যতের আতঙ্ক। ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা করিতে না পারিলে আর্থিক দিক হইতেও তাহাদের অনেক ক্ষতির কারণ রহিয়াছে। সুতরাং জার্ম্মানীর মতিগতি যেমন তাহাতে অন্ততপক্ষে ইউরোপের কোন শক্তি জার্ম্মানীর দিকে টলিবে না। একমাত্র ভিন্ন সুর ধরিয়াছে দেখা যাইতেছে ইতিমধ্যে কতকটা জাপান। জাপান বলিয়াছে যে, জার্ম্মানী হইতে জাপানে মাল রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য ইংরেজ যে ব্যবস্থা করিতেছে তাহাতে সে সায় দিতে পারে না; ইংরেজপক্ষ হইতে যদি তেমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য জাপানীদিগকে পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। জাপানীদের এই ঘোষণা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মানীর দিকে জাপানের টান এখনও রহিয়াছে এবং সে-বাঁধন একান্ত আধ্যাত্মিক নয়, নিতান্ত রাষ্ট্রনৈতিক কারণও রহিয়াছে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তলে তলে একটা আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ধারা ধরিয়া গোষ্ঠী-গঠনের কাজ চলিতেছে। চীনের লড়াইয়ের সঙ্গে জাপানের ভবিষ্যৎ নীতির যোগ রহিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের গতি যে-কোন মুহূর্ত্তে নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। মার্কিন-প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেদিন এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আগামী বসন্তকালে যুদ্ধের অবসান ঘটিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। এই আশার অন্তর্নিহিত কারণ কি, বুঝিয়া উঠা যায় না; কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধের মূল কারণ সাম্রাজ্য-লিপ্সার অবসান সত্বরই হইবে না এবং সেজন্য আন্তর্জ্জাতিক বিধি-বিধানের মর্য্যাদার স্থানও অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য। জার্ম্মানীর এই মাইন-সংগ্রাম সেই সত্যকেই উন্মুক্ত করিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মানীর এই যে নূতন ধরণের অস্ত্র, ইহার প্রতীকার-পন্থা তাঁহাদের জানা আছে এবং অতি সত্বরেই তাঁহারা তাহা প্রয়োগ করিয়া আতঙ্ক দূর করিবেন।

ডুবোজাহাজের উপদ্রব বন্ধের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে এবং তাহার ফলে ডুবোজাহাজের উপদ্রব কমিয়াছে, গ্রেট ব্রিটেন কর্ত্তৃপক্ষ এই কথা বলিতেছেন। এবার তাঁহারা চুম্বক মাইনের উপদ্রব প্রশমনে অবতীর্ণ হইবেন, খুবই ভাল কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ঘোষণা করা উচিত,--রুষিয়া এবং জাপানের মতিগতি এখনও যখন বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না, তখন এ সম্বন্ধে ভারতের জনমতকে সন্দিগ্ধ রাখা বৃটিশ জাতির পক্ষে কিছুতেই রাজনীতিক দূরদর্শিতার পরিচয় হইবে না।

শিশুশিক্ষার মূলনীতি ও শিক্ষার ধারা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি-টি বিদ্যাবিনোদ

আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যদেশসমূহে শিশুদিগের শিক্ষার নীতি নানাপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত অভিনব প্রণালী সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে। দেশের মনীষীবৃন্দ শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন। গতানুগতিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া অধুনা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীসমূহ প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা যে, উক্ত দেশসমূহে অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা কাহারও অজানা নাই। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে গলদ রহিয়াছে তাহা দূর করিতে গেলে প্রথমেই প্রাথমিক স্তরের ভিত্তি পাকা করা প্রয়োজন। দেশের নেতৃবৃন্দের ও শিক্ষাবিদদের এই দিকে বর্তমানে একটু লক্ষ্য পড়িলেও একমাত্র বুনিয়াদী পরিকল্পনা ব্যতীত শিক্ষা বিষয়ক অন্য তেমন কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জন্মলাভ করে নাই।

গ্রীক সভ্যতার যুগে সমাজ ও নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ শুধু সাধনের উদ্দেশ্যে সমস্ত উদ্দেশ্য করিয়া তেমন শিক্ষার প্রচলিত হইয়াছিল। স্পার্টাতে শিশুকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। এথেন্সে আইনে অপটু ও অযোগ্য শিশুর বাঁচিবার প্রয়োজন ছিল না। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যযুগে সন্ন্যাসীগণ শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ধর্মমূলক করিয়া তুলিয়াছিলেন, পার্থিব জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া ইহা দ্বারা একমাত্র পারলৌকিক কল্যাণলাভের পথ প্রশস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রাচ্যদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাও আধ্যাত্মিক প্রভাব হইতে মুক্তি পায় নাই। পরিপূর্ণ অধ্যাত্মজ্ঞানলাভই শিক্ষা সাধনা বলিয়া বিবেচিত হইত।

অধুনা সভ্যতার উৎকর্ষ বিস্তারের ফলে মানব-জীবনের জটিলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই আজ দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষের অজস্র চিন্তায় যোগ্যতার আদর্শ নূতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছে; শিক্ষার জন্য নব নব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি (Ground Schools) এমন শিক্ষাদান করে, যাহার সাহায্যে জটিল ও দুর্গম জীবন পথেও সাফল্যের সহিত অগ্রসর হওয়া যায়। তবে প্রত্যেক রাষ্ট্র ও জাতি তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া শিক্ষার ধারা সৃষ্টি করিতে যত্নবান। প্রত্যেক সমাজের একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ আছে এবং ঐ আদর্শ অনুযায়ী ইহা নিজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গঠন করিয়া লয়। শিক্ষা যাহাতে সামাজিক তথা জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী না হইতে পারে সেদিকে সতত লক্ষ্য থাকে। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া থাকে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিশুকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান। অথচ অতীতে শিশু সম্পূর্ণ অবহেলার পাত্র ছিল। শিশুকে তাড়না করাই শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব বলিয়া গণ্য হইত। বেত্রশাসনের মধ্যে শিশুর ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। (spare the rod and spoil the child) ইহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। গণতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণের হাতে আসিয়া পড়িল। এই যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের খবর লইতে যাইয়া শিশুকে আর অবহেলা করা চলিল না। শিশুর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার ও বিচার-হীন বেত্রশাসন অন্তর্ধান করিল। অতীত পাঠশালার কঠোর গুরুগিরি নরম হইয়া বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষাপ্রনালীর জন্মদান করিল। অধুনা শিশু-মনোবিজ্ঞান বা সম্যক্‌ভাবে শিশুকে জানাই শিক্ষাদান কৌশলের মূল ভিত্তি।

শিশু কে? শিক্ষককে কিরূপ বস্তু লইয়া কারবার করিতে হইবে? কুম্ভকার যে কাদামাটি লইয়া পুতুল গড়িয়া থাকে, ইহা কি তদ্রূপ? অথবা ইহা চিত্রকরের নবীন পটতুলা যে অভিজ্ঞ তার তুলিকা ইহার উপর যথেচ্ছ রেখাপাত করিতে পারে? মহামতি রুসো বলেন, শিশুর প্রকৃতি অনেকটা চারা গাছের মতন। শিশু জীবন্ত কতকগুলি শক্তির সমষ্টি, কেহই যদৃচ্ছাক্রমে কোন চারাগাছকে বা শিশুকে গড়িয়া তুলিতে পারে না। ইহারা আপন আপন ভাবে বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষক শুধু শিশুর সহজ পরি-পুষ্টিকে যথাযোগ্যভাবে পরিণতিলাভের জন্য উপযুক্ত পারি-পার্শ্বিক সৃষ্টি করিবেন এবং তাহাকে আঘাত ও অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রধানত এই দুইটি। কিন্তু এতো শুধু চারাগাছের উপমা দ্বারা শিশুর কথা বলা হইল। বস্তুত মানুষ এবং গাছ প্রভৃতির মৌলিক গঠনে বিরাট পার্থক্য বর্ত্তমান। গাছ তো দূরের কথা, মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যেও সাদৃশ্য অপেক্ষা বিভিন্নতাই অধিক। আবার দুইটি মানব শিশুর ভিতরেও পার্থক্য কম নয়। দুইটি কুকুরছানার মধ্যে বিভিন্নতা অপেক্ষা দুইটি মানব শিশুর ভিতর বিভিন্নতা যে অধিক তাহা অতি সহজে ধরা পড়ে। এই জন্যই নিপুণ শিক্ষক শ্রেণীর সকলকে একত্র শিক্ষাদানকে শিশুর পক্ষে ক্ষতি-জনক বলিয়া মনে করেন। একটা কুকুরছানার সহিত শিশুর তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কুকুরছানা অনেকগুলি পরিণত বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে নিজকে চালিত করিবার সুনির্দ্দিষ্ট সহজাত জ্ঞান তাহার বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু শিশুর ইহার কোনটি থাকে না। বস্তুত পৃথিবীতে মানব-শিশুর মত এমন অপরিণত এবং অসহায় আর কেহ নাই। পশুর জীবনযাত্রা সরল এবং একটানা ও তাহাদিগকে অনবরতই গড়িয়া নূতন করিয়া তজ্জন্য নিজকে উপযোগী করিয়া তুলিতে হয় না। পশুর জগৎ সীমাবদ্ধ এবং তাহার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট। জীবনপথে কিভাবে চলিতে হইবে তৎসম্বন্ধে সহজাত সংস্কার ও জ্ঞান লইয়াই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং অল্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু মানুষ কোন নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে গড়া জীব নহে এবং তাহার ব্যবহারের কোন স্থিরতা থাকিতে পারে না। মানুষ বহুবিধ সুপ্তশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাতে জীবনে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী হইতে পারে, সেজন্য সে শৈশবে গঠনক্ষম ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। এই কারণেই মানুষের নাবালকত্বের কাল এত দীর্ঘ এবং উহাই তাহার শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পর সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথমত শিশু যে অন্তর্নিহিত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারই উপর তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে। দ্বিতীয়ত কোন শিশুকেই আমরা আপন ইচ্ছানুযায়ী গঠন করিতে পারি না; আমরা শুধু তাহার সুপ্ত শক্তিসমূহকে বিকাশলাভের সহায়তা করিতে পারি, প্রয়োজন হইলে তাহাকে সংযত এবং আঘাত ও অনিষ্টের হাত হইতে যে কোনপ্রকার বাধা ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারি।

যাহা কিছু শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করিবে তাহাকেই বাধা, বিপদ বা আঘাত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইহা দুই প্রকারে শিশুকে আক্রমণ করিতে পারে। প্রথমত গৃহ-পরিবার বিশেষের প্রথা রক্ষা দ্বারা, বিদ্যালয় শ্রেণীর সকল ছাত্রকে সমান বুদ্ধিমান করিবার চেষ্টায়, অথবা অপর কোন প্রতিষ্ঠান শিশুকে স্ব স্ব আবহাওয়ার উপযোগী করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলে শিশুর স্বাভাবিক শক্তি ব্যাহত হয় এবং বিকাশলাভেরও অন্তরায় ঘটে। অনেক সময়েই দেখা যায় কোন কাজ বা বিষয় শিশুর শিখিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বেই তাহাকে শিখান হয়। আবার কখন বা সময় অতিক্রম করিয়া গেলেও উহা শিখান হয় না। দ্বিতীয়ত অনেক প্রকার অস্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করিয়া শিশুর শারীরিক ক্ষতি হইয়া থাকে।

অই বিদ্যালয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া চাই, যাহাতে শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশলাভের সুযোগ হইতে পারে। এই বিকাশ ও পুষ্টি সাধারণত দুইটি নিয়মে ঘটিয়া থাকে ঃ—(১) স্বত উৎসরণ। (২) সংযম। প্রথম নিয়মে শিশুকে তাহার স্বভাবগত স্বাধীনভাবে ও আপনগতিতে চলিতে দিতে হইবে কিন্তু তৎসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, একজনের স্বাভাবিক বিকাশ অপর কাহারও বিকাশের পথে বাধা না জন্মায়। সমাজের তথা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বৈশিষ্ট্যগত আদর্শের অনুকূল করিয়া শিশুশক্তির বিকাশ ও পুষ্টিসাধন করিতে হইবে।

সংযমের কথা বলিতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে উভয়নীতি পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আধুনিক শিক্ষাদান প্রণালী এই বিরোধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃত সংযম শক্তিকে ব্যাহত না করিয়া প্রেরণা যোগায়। সংযমের দুইটি প্রধান উপায়—স্নেহ ও ভীতি; উভয় উপায়ই বিশেষ বিবেচনা সহকারে প্রয়োগ বিধেয়। শিশুর শক্তিকে যোগ্য পথে চালিত করিতে প্রবীণকে তাহার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে।

শিশুর শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সে কোন সহজাত সংস্কার বা জ্ঞানের অধিকারী নয়, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে শিশুর কতকগুলি মনের বেগ বা ঝোঁক বর্ত্তমান থাকে। এই ঝোঁক বা মানসিক বেগসমূহ সাধারণ এবং অনির্দ্দিষ্টভাবে থাকিতে দেখা যায়। এই মানসিক বেগকে অভিপ্রায়ে পরিণত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে উপায়েই হোক শিশুকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দিতে হইবে। প্রকৃতি সর্ব্বদাই এই সুযোগ দিয়া থাকে। ইচ্ছা যখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখনই আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনা দেখা দেয়।

খেলাধূলা শিশুর সুপ্তশক্তি বিকাশের এক অতি প্রধান উপায়। শিশুর শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে একমাত্র খেলাই তৃপ্তিদান করিতে পারে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, (১) ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইবার বাসনা; (২) অন্য বস্তু বা ব্যক্তির উপর ক্ষমতা প্রয়োগের ইচ্ছা; (৩) নৈপুণ্য, সামর্থ্য, সহিষ্ণুতা অথবা বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নিজেকে অপরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করার ঝোঁক; (৪) অপরের সমকক্ষ হইবার প্রবৃত্তি এবং অনুকরণ-বৃত্তি প্রভৃতি খেলা-ধূলার মধ্য দিয়াই তৃপ্তিলাভ করে। শিশু-জীবনে খেলার প্রভাব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীদ্বয় রুসো ও ফ্রোবেল যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেকেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "খেলার ভিতর দিয়াই শিশু-শক্তির প্রথম বিকাশ আরম্ভ হয়; জন্ম হইতে শিশুর তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার সমগ্র জীবন শুধু খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর এই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা তার উত্তর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান। পরবর্ত্তী জীবনের অভিজ্ঞতা তার শৈশবের অভিজ্ঞতা ভাণ্ডারে কথঞ্চিৎ নূতন সঞ্চয় মাত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

শিক্ষা দ্বারা শিশুর আচরণ নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। গৃহ, বিদ্যালয় এবং লোক সাহচর্য্য শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। শিক্ষা দ্বারা শিশুর ব্যবহার এমন পরিণতি লাভ করে যদ্দ্বারা শিশু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রকার ভেদে স্বাভাবিক ও সামাজিক বলা যায়। প্রত্যেকের জীবনে তার অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিস্থ পারিপার্শ্বিকের নিয়ত সামঞ্জস্য বিধানের একটা চেষ্টা চলিতেছে। অন্তঃপ্রকৃতির নির্দ্দেশের সঙ্গে বাহিরের কৃতকার্য্যসমূহের সম্পূর্ণ মিল সংঘটিত হইলেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রত্যেক বস্তুর কাল্পনিক ও কার্য্যকরী উভয় দিক হইতে জানিবার কৌতূহল শিশুর মধ্যে জন্মাইতে পারিলে, এই সামঞ্জস্য বিধানের সাহায্য হইতে পারে। কৌতূহল কাহাকে বলিব? মানসিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য মনের যে ঔৎসুক্য তাহাকে কৌতূহল বলা যায়। সুস্থকায় শিশু যেমন আহার্য্যের জন্য ব্যগ্র হয়, তেমন সুস্থমনা শিশুও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রত্যেক দ্রব্যই নিজের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিতে সর্ব্বদা প্রয়াস পায় এবং ঐ চেষ্টা প্রাথমিক অবস্থায় দ্রব্যসমূহের ব্যবহারের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহাকে শারীর কৌতূহল আখ্যা দেওয়া যায়। ইহা শিশুর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচায়ক। শিশু শরীরে অতিশয় চাঞ্চল্য আসিয়া দেখা দেয় এবং সে সব কিছুই সম্পাদন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। শিশুর অস্থিরতা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সে নূতন দ্রব্যের ব্যবহারের ভিতর দিয়া নূতন কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চায়; ঐ কায়িক কৌতূহল তার ভবিষ্যৎ জীবনের বুদ্ধি চালিত কর্ম্মসমূহের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেয়।

সামাজিক চেতনা শিশু মনে জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর স্তরের কৌতূহল ধীরে ধীরে উন্মেষলাভ করিয়া থাকে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে শুধু নিজের চেষ্টায় সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; উহার জন্য তাহার জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগিনী ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। তখন সে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে। এই জিজ্ঞাসা কৌতূহলের দ্বিতীয় স্তর। শিশুর জিজ্ঞাসা কোন বস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দাবী রাখে না, এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য শুধু নূতনের সহিত পরিচয় লাভ ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি। শিশুর এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যগ্রতার অভ্যন্তরেই বুদ্ধিজনিত কৌতূহলের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইহাই তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ স্তরের কৌতূহল। নানা বস্তুর পর্য্যবেক্ষণের ভিতর দিয়া যখন কৌতূহলের উৎস কৌতুকপ্রদ ঘটনা হইতে কৌতুকপ্রদ সমস্যায় রূপান্তরিত, তখনই ইহা বুদ্ধিজনিত কৌতূহল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই স্তরের কৌতূহল উদ্দীপিত হইলে শিশু যখন অপরকে প্রশ্ন করিয়া উত্তরে পরিতৃপ্ত হয় না, তখন সে উহা হইতে বিরত হয় না, বরং উহার মীমাংসার পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। এই কৌতূহল ক্রমশ নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিশক্তিতে পরিণত হয়।

যাহারা শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, প্রথমত তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে যথা সময়ে অঙ্কুরিত শক্তির অনুশীলন না হইলে উহা ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বিনাশের পথে যাইবে। শিশুর যথাযোগ্য যত্নের ত্রুটি হইলে তাহার কৌতূহল নষ্ট হইবে, একেবারে নষ্ট না হইলেও উহার তীব্রতার যে অনেকাংশে হ্রাস হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কোন কোন স্থলে অনবধানতাপ্রযুক্ত, আবার কোন স্থলে বা জবরদস্তির ফলে কৌতূহল বিনষ্ট হয়। কৌতূহল কোন প্রকারে বিনষ্ট না হয়, কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে নিয়ত অবহিত থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, কৌতূহলকে সর্ব্বদা সজীব রাখিতে হইবে এবং যেখানে উহা নিষ্প্রভ সেখানে উহাকে প্রদীপ্ত করিতে হইবে। শিশুর মনে কৌতূহলের সঞ্চার করিয়া ঐ সামান্য স্ফুলিঙ্গকে অনুকূল বায়ু সঞ্চালনে অগ্নি-শিখায় পরিণত করিতে হইবে। অনুসন্ধিৎসার সঞ্চার ও রক্ষণ শিক্ষক তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক অতি গুরুতর সমস্যা। অত্যধিক উত্তেজনায়, কঠোর বিধি-নিষেধের চাপে অথবা গতানুগতিকতা ও উপদেশের অত্যাচারে অনুসন্ধিৎসার মূল শুষ্ক না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা এই সমস্যা সমাধানের উপায়।

উপসংহারে শিশুর শরীর, বুদ্ধি, নীতিজ্ঞান, সামাজিকতা এবং রুচির বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। এই প্রসঙ্গসমূহ বর্জন করিয়া শিক্ষানীতির ব্যাখ্যা করার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না।

শিক্ষার কথা বলিতে গেলে শরীরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়, কেন না মানুষের কর্ম্মক্ষমতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাহার দৈহিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। শারীরিক সুস্থতা মনের উপর বিশেষ ক্রিয়া করে। স্বাস্থ্যবানের পর্য্যবেক্ষণে প্রখরতা, স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হইবার ক্ষিপ্রতা, বিচারে স্থৈর্য্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জন্মিয়া থাকে। যে স্বাস্থ্যহীন তাহার মধ্যে এই সমস্ত গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। চরিত্রের উপরও স্বাস্থ্যের প্রভাব যথেষ্ট। আত্মনির্ভরতা ও সামাজিকতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। অতএব শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উদাসীন হইলে চলিবে না। শিশুর শরীর চর্চা খেলার সাহায্যে উত্তমরূপে হইয়া থাকে। খেলা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

মানসিক শিক্ষা দ্বারা নানাবিধ তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে এবং স্বাধীন বিচার বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। শিশু অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাকে আদর্শের মিল রাখিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে তথ্যসমূহ উপলব্ধি করিতে তাহাকে সাহায্য করে। পরে উপলব্ধি হইতে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। অভিজ্ঞতা হইতে বিচারবুদ্ধির বিকাশ মানুষের মনে সাধারণত নিম্নোক্ত শৃংখল অনুসরণ করে। মানসিক উত্তেজনা—অনুভূতি —কল্পনা—ধারণা—যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি। প্রথম দুইটি লইয়া অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় দুইটি লইয়া উপলব্ধি এবং পরিণতিতে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি বিকাশ ঘটিয়া থাকে। যাহাতে অন্যায় হইতে ন্যায়কে পৃথক করিতে পারে, সর্ব্বদা অন্যায় হইতে বিরত থাকে এবং ন্যায় কার্য অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় সেজন্য নীতিজ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন। নীতিজ্ঞান জন্মিলে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হয় এবং আত্মসম্মান রক্ষা করিবার একটা আগ্রহ আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ শিশুর মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিশু শিক্ষকের মতি প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য নীতিজ্ঞান জন্মাইতে শিক্ষককে গুরু দায়িত্ব বহন করিতে হয়। তিনটি স্তরে ক্রমশ নীতিজ্ঞান জন্মিয়া থাকেঃ—(১) বিধি, নিষেধ; (২) সমষ্টির অনুমোদন; (৩) স্বাধীন বিচারবুদ্ধি। স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইবার যোগ্য হইলেই নীতিজ্ঞান লাভের সার্থকতা হয়।

বিদ্যালয় ক্ষুদ্র সমাজ বিশেষ। শিশুর মধ্যে পূর্ণশক্তি মানব ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে ধীরে জাগ্রত করিয়া পূর্ণ মানবে পরিণত করিতে হইবে। যদ্দ্বারা ভবিষ্যতের পূর্ণতার অঙ্গহানি না হয় এবং ভবিষ্যৎ সমাজের যোগ্য অংশরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষার সূচনা হইতেই শিশুদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশের এবং প্রতিযোগিতার সুযোগ দিতে হইবে। স্বার্থপরতাকে হীন, পরার্থপরতা ও সেবা ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিয়া শিশুর সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে।

অবসর সময় কর্ত্তনের যে একটা সুব্যবস্থা প্রয়োজন তৎপ্রতি অনেক স্থলেই লক্ষ্য থাকে না। অবকাশ ও সৌন্দর্য্য পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট। গ্রীক্ জাতি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ তাহাদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে ক্ষেপণ করিবার সময় ক্রমশ বাড়িতেছে। এই অবকাশ ও অবসর সময়ে শূন্য মনে শয়তান প্রবেশ না করিতে পারে, তাহা কি কর্ত্তব্য নয়? শিশুদিগের সৌন্দর্য্য বোধ জন্মাইতে হইবে। সৌন্দর্য্যে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করে, ইহা মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। সাহিত্য, চিত্র ও গীত বাদ্যের মধ্যদিয়া সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জন্মে। বিদ্যালয়ে সাহিত্যের প্রাধান্য। চিত্তাকর্ষণ শক্তি, শব্দের ঝঙ্কার, কল্পনার সৌষ্ঠব, উপমাকৌশল, চরিত্র ও দৃশ্যের মনোরম বর্ণনা প্রভৃতি সুন্দর সমাবেশের দরুণ সাহিত্য শিশুর মনে সুন্দরের ধারণা উৎপাদন করিতে উৎকৃষ্ট উপায়স্বরূপ। সুন্দরের ধারণা ও উপলব্ধি শুধু মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকৃষ্টরূপে জন্মিয়া থাকে। উল্লিখিত উপায়ে শিশু সুরুচি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে আলোচিত নীতিসমূহকে ভিত্তি করিয়া ব্যাখ্যাত ধারানুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হইলে সুস্থ, সবল ও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট নাগরিক সৃজন সম্ভব হইবে। শিক্ষার মূলনীতিসমূহে অবহেলা করিয়া ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত আদর্শানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হইলে কোনদিনই শিক্ষার বনিয়াদ সুদৃঢ় হইতে পারিবে না।

হে মেঘলতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দীরঘ রাত দীরঘ দিন নীরবে মোর কাটে,
হে মেঘলতা বুঝেছি বুঝি ভুল,
তখনো আমি ভাবিনি মনে এমনি মাঠে বাটে
ভাসিবে চোখে তোমারি এলো চুল!

কত যে দিন কত যে রাত গুঁড়ায়ে গেল ধীরে
কাজল মেঘে ঢাকিল সারাদিক,
বুঝেছি আজ উদাসী মন কেন যে চাহে ফিরে
রাতের তারা তাকায় অনিমিখ্।

তাই ত ভাবি চলিতে পথে কী গান এল ভেসে,
স্বপন-ধারা নামিল সারা চোখে,
কী গান এল—কী গান এল—কী গান এল শেষে,
চলেছি যেন অরূপ মায়ালোকে!

দীরঘ রাত দীরঘ দিন এমনি মোর কাটে
হে মেঘলতা বুঝেছি আজি ভুল,
তখনো আমি ভাবিনি মনে এমনি মাঠে বাটে
ভাসিবে চোখে তোমারি এলো চুল!

সারাটি বেলা বসিয়া থাকি উদাস মনে একা,
ভাসিয়া আসে ঘুঘুর শুধু ডাক্,
বসিয়া ভাবি জীবনে যত হিসাব হ'ল লেখা
আজিকে সব তেমনি তোলা থাক্!

আজিকে শুধু রঙীন ভোরে বাহিরে ছুটে যাওয়া
আজিকে শুধু পথে চলার গান,
আজিকে শুধু ঘোরালো স্রোতে একলা তরী বাওয়া
তোমার সাথে দুস্তর অভিযান!

চলিতে পথে দু'পাশ থেকে করবী কুঁড়িগুলি
দুলায়ে মাথা হাসিবে অভিনব,
স্রোতের বেগে ঢেউয়ের বেগে চলিব দুলি দুলি
"আসিব ফের" হাসিয়া মোরা কব।

চাহিয়া দেখি দীরঘ রাত—দীরঘ দিন কাটে
হে মেঘলতা সকলি ভাবা ভুল,
বুঝি না কেন ভাসে যে চোখে তবুও মাঠে বাটে
তোমার যত এখনো এলোচুল!

আমরণ

(ছোট গল্প)

শ্রীসুবোধ ঘোষ

কথাটা শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল!

দেবেন্দ্র ঘোষ রোডের একটি গলিতে পাশাপাশি কয়েকখানা ঘর। এক সারিতে প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি কামরা হইবে। তাহাকে কামরা বলা চলে না; বড়লোকদের সখের হরিণ, ময়ূর রাখিবার ঘরও বোধকরি ইহা হইতে বড়! সবগুলি ঘরই একতলা। সামনে কোন্ এক লাখ্‌পতির প্রাসাদ; একটা প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচীলে সকালের সূর্যকে ও মুক্ত বায়ুকে বড়লোকের সামগ্রীই করিয়া রাখে। বৈকালে ও সকালে কোথা হইতে যেন কুণ্ডলী পাকান ধুঁয়া একতলা বাসীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে!

ইহারই একটি কামরায় থাকে শিবু। সমস্ত ঘরগুলির মধ্যে শিবুর ঘরটাই একটু পরিষ্কার। ঘরে ঢুকিলেই দেওয়ালে টাঙান বিবেকানন্দের ছবিখানার উপর সকলের দৃষ্টি পড়ে; যদিও আরও দুইখানা ছোট ছবি আছে। একটা ছোট কেরোসিন কাঠের টেবিল, একখানা ছোট লোহার চেয়ার, তাহার উপরে আবার খবরের কাগজ পাতা! তাহা না হইলে যে কাপড়ে দাগ লাগে। ছোট তক্তপোষ; তাহার নীচে মাটির কলসীতে জল। ইহাই ঘরের সমস্ত আসবাব—একটা কাঠের র‍্যাকেটে অবশ্য কয়েকখানা কাপড় আছে। চারিদিকে দারিদ্র্যের চিহ্নই বর্তমান, তবুও কেমন একটা শান্ত-শ্রী যেন ঘরখানিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

শিবু চেয়ারে বসিয়া কি একটা বই পড়িতেছিল। পাশের ঘরে মণিদা সেতারে সুর ভাঁজিতেছিল। আর এক ঘরে এক কেরাণীবাবু যৎসামান্য প্রাতরাশ সমাপন করিয়া বিড়ি টানিতেছিল। এমন সময় ঝড়ের বেগে অরুণ শিবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "Congratulation শিবুদা! পাশ ক'রেছেন আপনি কি খাওয়াবেন বলুন?"

খবরটা শুনিয়া শিবু যেন চমকাইয়া উঠিল! বই হইতে মুখ তুলিয়া অরুণের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল!

"ওকি, অমন ক'রে চেয়ে রইলেন যে বড়! ফার্ষ্ট-ক্লাশই আপনি পেয়েছেন—ভয় নেই। এখন কি খাওয়াবেন বলুন? ইন্দুভূষণ না ভীমনাগ? যান—আপনি ভারি ইয়ে........" অরুণ অভিমান করে ওর ছোট ভাইয়ের মত। অরুণ আই-এ ক্লাসে পড়ে। পাশের ঘরেই থাকে; একদিন লজিক্ বুঝিতে আসিয়া শিবুর পরিচয় পায়। তারপর হইতে একেবারে তাহার আপন হইয়া যায়।

শিবু চেয়ার হইতে উঠিয়া অরুণের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, "খাওয়াব, ভাই খাওয়াব, আচ্ছা আজ কত তারিখ বল্‌তে পার?"

"পনের। কেন আপনার সামনেই ত ক্যালেণ্ডার রয়েছে; আপনি কি হ'লেন বলুন ত'? পাশ করেছেন কোথায় খাওয়াবেন—আনন্দ ক'রবেন, না কেমনধারা সব প্রশ্ন!"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া শিবু বলিল, "আনন্দ যাদের করবার তারা ক'রছে ভাই। আমার সুখের দিন এইবার শেষ হ'ল! সেইজন্যই ত আমাকে অমন ধারা দেখ্‌ছিস। আর পনেরদিন পরে সব চোখে দেখ্‌তে পাবি। ভাল কথা, আমার জন্য একখানা খাম নিয়ে আয় না চট্ ক'রে; লিখব বৌদিকে।"

অরুণ চলিয়া গেল।

শিবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ম্যাট্রিক হইতে আই-এ পর্যন্ত সে জলপানি পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বি-এ-তে পায় নাই। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলে সে। দেশের বাড়ীতে আছেন তাঁহার দাদা, বৌদি আর একটি ছোট্ট ভাইপো। দাদা বাত-ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, দেশের জমির যৎকিঞ্চিৎ আয়; কোন রকমে সংসার চলিয়া যায়। দাদা শয্যায় পড়িয়া থাকিলে সংসার অচল হইয়া হইয়া উঠে। দাদার কাছ হইতে সে কোন অর্থ সাহায্য পায় না, পায় শুধু বৌদির উৎসাহ-বাণী। জলপানির টাকা দিয়া ও ছেলে পড়াইয়া সে বি-এ পাশ করিয়াছে। তারপর বৌদিই তাহাকে এম-এ পড়িবার উৎসাহ দিয়াছে। অনেক দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া দুইটি বছর কাটিয়া গেল। এখন?

শিবু শুইয়া শুইয়া বৌদির কথাই ভাবিতেছিল। কি করুণাময়ী মূর্তি তাঁহার। শহরের শিক্ষিতা মেয়ে সে; বিবাহের পর গ্রামকেই আপন করিয়া লইয়াছে। তার চাইতে আপন করিয়া লইয়াছিল তাহাকে। একটা কথা এখনও ওর মনে আছে। ম্যাট্রিক পাশের পর দাদা বলিয়াছিলেন, "ওগো! শিবুকে আর কোথাও যেয়ে কাজ নেই, গ্রামেই একটা পাঠশালা করে বসুক- ওকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারব না আমি!"

বৌদি রাগিয়া উত্তর দিয়াছিল, "হ্যাঁ, ঘর ছেড়ে যেতে দেবেন না—থাকবে কুণো হ'য়ে, কি দরদীরে আমার—! তার চাইতে আস্ত মাথাটা চিবিয়ে খেলেই পার, সব একবারে চুকে যায়—"

দাদা আর কোন কথা বলেন নাই। তখন কথাটা ও ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। এখন শুধু মনে হয় 'পদে পদে ছোটখাট নিষেধের ডোরে'। বৌদির জন্য মনটা আন্‌চান করিতে থাকে। শিবু চিঠি লিখিতে বসে।

"বৌদি ভাই,

সব শেষ। এবার কঠিন বাস্তব। ফার্ষ্ট ক্লাশই পেয়েছি। কিন্তু জীবন-পথের কতটুকু রাস্তা তাতে এগুবে তা' জানি নে। চারদিকে শুধু অন্নহারার ক্রন্দনই শুনতে পাই। এক্‌জামিনের পর কয়েকটা অফিসে ঘুরেছিলাম, কিন্তু কিছুই হ'ল না। ফিলজফির ফার্ষ্ট ক্লাস কেউ চায় না। আবার কিছুদিন ঘুরব। দাদার অসুখটা কেমন এখন? সামর্থ্য থাকলে একবার বাড়ী যেতাম। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হয়। ইন্দু কেমন পড়াশুনা করছে......।

'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি-ই'
...... পাশের ঘর হইতে একটা গানের সুর ভাসিয়া আসিল! শিবু পত্র লেখা রাখিয়া বাহিরে আসিল, বলিল, "আচ্ছা মণিদা, এ সব ছাই ভস্ম গান ছাড়া কি তুমি থাকতে পার না? কি বল ত?"

টাইপিষ্ট মণি বসাক একটু আমুদে লোক। চুপ করিয়া রহিল। শিবু পত্র শেষ করিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিল।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যার সময় শিবু নানা অফিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিল, অরুণ ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি শিবুদা কিছু হ'ল মহাকোশল ব্যাঙ্কে?

বিরক্তি-ভরা মুখে শিবু উত্তর দিল, "হবে আর কি ছাই! এক হাজার টাকা সিকিউরিটি চায়। পাব কোথায় এত টাকা। এক টাকার সন্ধান নেই এক হাজার টাকা হুঁ...। ম্যানেজার ছটুলাল কি বল্লে জানিস্, 'বাবু-সাব ফার্ষ্ট ক্লাশ থার্ড ক্লাশ বুঝি না, হাজার টাকা দিতে পারেন ত' বলুন!' নমস্কার ঠুকে চলে এলুম!"

ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলাইয়া দিয়া শিবু কতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল কলেজ-জীবনের কথা। বি-এ ক্লাসে সেক্সপিয়রের একটা ক্লাসের কথা এখনও ওর মনে আছে। লেডি ম্যাকবেথের স্লিপ ওয়াকিং সিনটা ডাঃ গুহ কি চমৎকারই না বুঝাইয়াছিলেন। সমস্ত ক্লাশ নীরব নিস্তব্ধ! যেন তারা অন্য জগতের মানুষ। শিবু ভাবে, এই শিবু—আর সেই শিবুর মধ্যে কত ব্যবধান! ওর মন আবার ফিরিয়া যাইতে চায় সেই রাজ্যে! একটা করুণ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে!

পরদিন সকালে সে বৌদির একখানা চিঠি পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। বৌদি লিখিয়াছে,—

'শিবু-ভাই,

তুমি বড় দুঃখবাদী। ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েও তোমার ছেলেমানুষী যায়নি। আশাহত হবার কোন কারণ নেই। একটা উপায় হবেই।

ভেবেছিলাম তোমাকে জানিয়ে কাজ নেই; কিন্তু না জানিয়ে পারলাম কই? জান বোধ হয়, আমাদের চড়াই-ডাঙ্গা থেকেই বেশী টাকা আস্ত। সেটা এবার নীলামে উঠেছে—সাত দিনের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা জোগাড় হবে না, তাই আশা ছেড়ে দিয়েছি। ওঁর ব্যামোটা এখন আবার বেড়ে গেছে। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। কি করে টাকার যোগাড় হবে বল? এ বিষয়ে কোন কিছু করা তোমার সামর্থ্যের বাইরে। তবুও জানালাম। আর এক কথা, ইন্দুটার আবার এ ক'দিন ধরে জ্বর—সে ভাঙ্গা পায়গাটা আবার ফুলে উঠেছে। কিছুই খেতে চায় না—দুধ ছাড়া। পাগলা ছেলে কিছু বোঝে না! ভাল আছি—ইতি

বৌদি।'

শেষের অক্ষরগুলি পড়িতে পড়িতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। 'পাগলা ছেলে কিছু বোঝে না' এলোমেলো কতকগুলি কথা তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত দিল। মাথাটা যেন বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। যেমন করিয়াই হউক সে সাত দিনের মধ্যে টাকা জোগাড় করিবে। সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া সকালবেলা পাগলের মত বাহির হইয়া পড়িল।

সারা সকালটা ঘুরিয়াও কিছু হইল না। সেদিন গেল—তার পরদিনও গেল। গরীব হইলেও সে কাহারও কাছে মাথা নোয়ায় নাই, কিন্তু আর পারিল না; বালিগঞ্জের বড়লোক বন্ধু অশোক মিত্রের কাছে শিবু আসিয়া হাত পাতিল। বিশেষ কিছু ফল হইল না। কি করিবে শিবু? যদি একটা কেরাণীগিরিও পাইত সে—তাহা হইলে চাকুরীর জামিন লইয়া কোন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইত বা প্রভিডেণ্ড ফণ্ড হইতে কিছু অগ্রিম নিত হ্যাণ্ডনোট দিয়া,—এই সব কল্পনা করিতে করিতে সে দিশেহারা হইয়া পড়িল! বৈকাল বেলা অরুণ আসিয়া খবর দিল যে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে এক সওদাগরী অফিসে একজন কেরাণীর দরকার; সে খবরের কাগজে দেখিয়া আসিয়াছে। সকালবেলা শিবু সেণ্ট্রাল এভিনিউর দিকে রওনা হইল।

ভবানীপুর হইতে এত দূর আসিতে সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অফিসের সামনে আসিয়া সে কিন্তু দেরী করিল না লাফাইয়া লাফাইয়া তিনতলায় উঠিয়া পড়িল! সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে সে হাঁপাইয়া পড়িল—তার সাদা মুখখানা লাল টকটকে হইয়া গেল।

অফিসের বড়বাবু বাঙালী। প্রবীণ লোক। শিবু আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আপনাদের এখানে লোক......'
বড়বাবু শিবুর দিকে একটা সন্ধানী দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আপনার নাম?"

ঝুলিয়া পড়া কতকগুলি চুল কপাল হইতে সরাইয়া শিবু কহিল—"শিবপ্রিয় বসু।"

বড়বাবু যেন একটু খুশি হইয়া বলিলেন, "কি পর্য্যন্ত পড়েছ—?" আপনি হইতে তুমিতে নামিল।

"এম-এ ফিলজফি"—তারপর বড়বাবুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"জানি স্যার এম-এ আপনাদের দরকার নাই কিন্তু আমাকে নিতে হবেই বড়বাবু—আর তিন দিনের মধ্যে আমার পঞ্চাশ টাকা চাই—যেমন করে হোক যোগাড় করতেই হবে!" সে আপন মনে বকিয়া চলে!

বড়বাবুর মুখে একটা বক্রহাসি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া মিলাইয়া যায়। অপাঙ্গে শিবুর পেশীবহুল দেহের দিকে চাহিয়া বলে, "হ্যাঁ চাকুরি তোমাকে দিতে পারি কিন্তু একটা কথা..." সে কাশিতে সুরু করে।

"বলুন না কি কথা?" শিবু ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠে। তারপর বড়বাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কথাটি শিবুকে শুনায়!

কথাটা শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল!

বড়বাবু মৃদু হাসির জের টানিয়া আবার বলে—"তা ও পঞ্চাশ টাকার জন্য আর ভাবনা কি! তারপর হ্যাঁ এবার ও আই-এ পাশ করেছে। একখানা বাড়ীও আছে ওর নামে বালিগঞ্জে। রং? তোমার চাইতে ফর্সা। কিহে অমন করছ কেন?"

শিবু থপ্ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছে।

লোকটা বলে কি? দাদা, বৌদি ও ইন্দুর কথা মনে পড়িল। তাহার আর অন্য উপায় আছে কি? মন্ত্র মুগ্ধের মত বলিয়া ফেলিল—'হ্যাঁ রাজি'!

এইবার বড়বাবুর মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল, বলিল, "বেশ, বেশ কাল তোমার নিয়োগ-পত্র পাবে—আর সব লেখা পড়া! হ্যাঁ তোমার আর কে আছে এখানে বা দেশে বাবা? মা? দাদা? কেউ নেই...!"

"না, না কেউ নেই, কেউ নেই আমার—আমি একা একা!" বলিয়া সে চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল এবং তড়িৎ বেগে আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল! বড়বাবু চশমার ফাঁক দিয়া ঐ ভাবপ্রবণ যুবকের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবিলেন 'খোঁড়া মেয়ে নিয়েত' আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেছে!"

জীবনে এমন আঘাত শিবু আর পায় নাই! দর্শন পড়িয়াও সে ঘোর আদর্শবাদী। ছাত্র-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই সে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের পূজারী। স্বামীজীর আদর্শেই জীবনকে পিটাইয়া পিটাইয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। শিক্ষাব্রত ও সেবাই তাহার উত্তর জীবনের কাম্য। দর্শনের শত শত যুক্তি তর্কের ফাঁকে এই সত্যটাই কেমন করিয়া যে তাহার হৃদয়ের মণিকোঠায় বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা সে নিজেই জ্ঞাত নয়।

শিবু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। জীবনে তাহার সব আশাই নির্মূলে হইল—তাহার কুমার জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে কতটুকুই বা দেরি? একদিকে দাদা—বৌদি অন্য-দিকে আদর্শ! কি করিবে সে?

"বড়বাবুর মেয়ে—তার উপর আবার চাকুরি—হেঁ-হেঁ-হেঁ!" শিবু হাসিয়া উঠিল! পাশের ভদ্রলোক তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "লোকটা পাগল হে—গেল মাথাটা অকালেই!"

পরের দিন সকালে বড়বাবুর সঙ্গে সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া বৌদিকে টাকা পাঠাইয়া দিল।

তারপর বিবাহ!

মেয়েটির নাম লতিকা। সুন্দরী তাঁহাকে বলা চলে। মুখখানার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কলেজের বন্ধুরা বলিত ওর মুখে নাকি কেমন একটা আভিজাত্যের ভাব আছে। চূর্ণকুন্তলে কান দুইটি ঢাকা থাকে সব সময়। দাঁড়াইবার ভঙ্গিটা একটু অসাধারণ কারণ ওর বাঁ পাটা ডান পা হইতে কয়েক ইঞ্চি ছোট। হ্যাঁ বেশ একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়াই চলে!

বালিগঞ্জের ছোট একখানা একতলা বাড়ীতে থাকে লতা আর শিবু। সেদিন সকাল বেলায় আফিসে যাইবার জন্য শিবু পোষাক পরিতেছিল—বলিল, "লতিকা আমার চাদরটা দাও ত' ও ঘর থেকে।"

লতিকা একটা আরাম কেদারায় বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া একটা সুর ভাঁজিতে ছিল, উত্তর দিল, "আমাকে কেন আবার? রামতারণ-ই ত' আছে। একটু বসবারও জো নেই অমনি আরম্ভ হয় চেঁচামেচি!"—

ভৃত্য রামতারণ চাদর দিয়া আসিল। ছোট একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল শিবুর বুক হইতে! এমন এক ঘেয়ে জীবনের গতি আর সে অনুভব করে নাই। সব যেন নীরস—প্রাণহীন, পঙ্গু! আফিস আর বাড়ী—বাড়ী আর আফিস!

রবিবার সকাল বেলা শিবু চেয়ারে বসিয়া পত্রিকা পড়িতেছিল, ভৃত্য আসিয়া খাবার দিয়া গেল। শিবু মুখ তুলিয়া খাবার দেখিয়া একটু হাসিল; রামতারণকে ডাকিয়া বলিল, "এ কিরে চারটে গোল আলু দিয়ে কি হবে?"

"মা দিলেন, বল্লেন, 'দিয়ে আয় বাবুকে সকালকার খাবার।"

"ডাক তোর মাকে।" ভৃত্য চলিয়া গেল। শিবু ভাবিল বোধ করি কোন রসিকতা করিতেছে লতিকা। তাহার সঙ্গে এমন কৌতুক করিবে সে? তাহাকে ত' লতা দূরেই রাখিয়াছে!

ঝড়ের বেগে লতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"হয়েছে কি শুনি? আলু রুচলে না বুঝি? রুচবে কি করে, সেরে সেরে পিণ্ডি না গিল্লে কি উদর তৃপ্তি হয়। মেশান ত' কোন বড় লোকের সঙ্গে, জানবে কি করে।" বলিয়া মূর্ত্তি-মান ক্রোধের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল! শিবু একটা কথাও বলিবার সুযোগ পাইল না। মনে করিল—সে ত' অশোক মিত্রের বাসায়ও কয়দিন খাইয়াছে, এমন সৃষ্টি ছাড়া খাবার ত' দেখে নাই কোন দিন। লজ্জায় অপমানে সে যেন মাটির সহিত মিশিয়া গেল!

পিয়ন আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল। বৌদির পত্র; সে পড়িল। চড়াই তালুক রক্ষা পাইয়াছে, ইন্দু অনেকটা ভাল—দাদাও অনেকটা ভালর দিকে। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যে ব্যাপার হইয়া গেল তাহাতে শিবু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। লতা তাহার এক কলেজের বন্ধুর সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় শিবু অফিস হইতে বাড়ী ফিরিল। বান্ধবী বলিল, "তোর বরটি ত' বেশ।"

"মাকাল ফল রে, যত জ্বালা বাইরে থেকে কি বুঝবি!"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের গল্প চলিল। শিবুর আর দেরি সহ্য হইল না। কতক্ষণ আর সুট পরিয়া বসিয়া থাকিবে। এক্ষুণি আবার তাহাকে বাহির হইতে হইবে। রামতারণকে বলিল, "ওরে অনেকক্ষণ ত' হ'ল তোর মাকে ডাক আর তা না হ'লে তার কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে আয়—কাপড় বের করতে হ'বে।"

রামতরণ লতিকার কাছে আসিয়া বলিল, "মা—বাবু'—

"যা এখান থেকে—দেরি আছে আমার।"

কথা শেষ হইয়াছিল বান্ধবী বিদায় হইল। লতিকা শিবুকে লইয়া পড়িল—"কি আক্কেল তোমার—দেখলে এক-জনার সঙ্গে কথা বলছি তবুও হাঁক-ডাক—ছিঃ—ছিঃ লজ্জায় মরে যাই" বলিয়া চাবির গোছাটা শিবুর গায়ে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "যত সব ছোটলোকামি"।

শিবুর মেজাজও ভাল ছিল না সারা দিন খাটুনির পর।

(শেষাংশ ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আসামের রূপ

(ভ্রমণ-কাহিনী)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

জয়সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, দীঘির দক্ষিণ ও পশ্চিম তীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব তীর ধরিয়া সাধারণের চলিবার জন্য একটি রাস্তা চলিয়াছে, তাই সেদিকে জঙ্গল তত আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই, উত্তর তীরের পূর্ব্বাংশে জয়দেউল ও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, পশ্চিমাংশের কতক জঙ্গলাকীর্ণ, কতক এখনও পরিষ্কারই আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য জয়সাগরের জল এখনও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বিশাল দীঘির কোথাও পানা-আগাছা দেখিলাম না।

আমি উত্তর তীরের ছোট কাঠের বাঁধান ঘাটে গিয়া বসিলাম, তখন মেঘের অন্তরাল হইতে সূর্য্যদেব অতি সন্তর্পণে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছেন, দক্ষিণের মৃদু বাতাসে বিরাট জলাশয়ের সারা বক্ষ জুড়িয়া চলিয়াছে অসংখ্য ঢেউ-শিশুর চঞ্চল ক্রীড়া, ইহাদেরই কতকগুলি অসাবধান সাথী টুলু টুলু রবে ঘাটের শেষ-ধাপটিতে আছড়াইয়া পড়িয়া যেন অকালেই প্রাণ হারাইতেছে। আমি বসিয়া প্রকৃতির এ খেলা দেখিতে লাগিলাম, আর মনের মধ্যে জাগিতেছিল এ স্থানের অতীতের কত অদেখা চিত্র।

সম্রাট সাজাহান পত্নী মমতাজের সুখের দিনের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহার অমর কীর্ত্তি তাজমহলের ভিতর দিয়া কিন্তু জয়মতীর এই করুণ আত্মদানের স্মৃতিচিহ্নটি যেন তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, তার চেয়েও মহৎ। পাষণ্ড রাজা চুলিকফার পৈশাচিক কীর্ত্তিতে মাতার এই কঠোর আত্মত্যাগ স্থানে বুঝি ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিহ্ন, ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পুরস্কার সম্ভবে না, বিরাট দীঘিপূর্ণ এই স্বচ্ছ সলিল যেন শুধু সলিল নহে, সতী মায়ের নাড়ী ছেঁড়া ধন রুদ্রসিংহের পুঞ্জীভূত অশ্রুধারা।

জয়সাগর হইতে উঠিয়া জয়দেউলে আসিলাম। প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির, এক সময়ে এ মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এখন দেবতাশূন্য। মন্দিরের বহির্গাত্রে লতাপাতা, নানাপ্রকার জীবজন্তু, যুদ্ধের চিত্র, বীণাহস্তে শঙ্করাচার্য্য এবং মধ্যে মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

মেঘলা দিনের ম্লান আলোতে আসাম ইতিহাসের একটি মেঘাচ্ছন্ন পৃষ্ঠার অমর স্মৃতিক্ষেত্র এই জয়সাগর দর্শন শেষ করিয়া নিকটবর্ত্তী রুদ্রসিংহের ভগ্ন প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলাম।

জয়সাগর হইতে উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজা রুদ্রসিংহ কর্তৃক নির্ম্মিত রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দাঁড়াইয়া আছে। এখানে একজন সরকার নিযুক্ত চৌকিদারকে পাইলম, তাহাকেই আমার প্রদর্শক নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া দক্ষিণমুখী প্রাসাদের সম্মুখস্থ কয়েকটি প্রশস্ত সিঁড়ি বাহিয়া একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে গিয়া উঠিলাম। এই প্রাঙ্গণটি উত্তর দিকে প্রাসাদের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণটি এক সময়ে রাজার দরবার কক্ষ ছিল বলিয়া চৌকিদার বলিল। দরবার কক্ষের দুই পার্শ্ব দিয়া প্রাসাদ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সীমা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে পর পর নানা মহল, নানা কুঠরী, কোনটি আবার দুইতলা, কোনটি তিনতলা, তবে কোনটিরই সম্পূর্ণ ছাদ বা দেওয়াল আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া নাই। তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ বা চৌকিদার কথিত দরবার কক্ষে উঠিয়া প্রথমেই বামপার্শ্বে একটি ছোট মন্দির পাইলাম, ইহাতে নাকি এক সময়ে রুদ্রসিংহের ইষ্টদেবী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। দেখিলাম, প্রাসাদের অন্য কোন অংশ এখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও এই মন্দিরটি আজও পূর্ণাবয়বেই দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা কালীমন্দির অতিক্রম করিয়া বামদিকের মহলগুলিতে একে একে ঢুকিয়া দেখিতে লাগিলাম, অধিকাংশ ঘরই অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও সঙ্কীর্ণ মনে হইল। সঙ্গী কোনটিকে বসিবার গৃহ, কোনটি বিশ্রাম-গৃহ, আবার কোনটি পাশা খেলার গৃহ ছিল বলিয়া প্রত্যেক ঘরেরই এক একটি পরিচয় দিয়া যাইতে লাগিল, সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে শুধু দেখিয়া আর শুনিয়াই যাইতে লাগিলাম।

অবশেষে একটানা কতকগুলি অর্দ্ধভগ্ন সিঁড়ি বাহিয়া আমরা দরবার প্রাঙ্গণ হইতে তিনতলা উপরে প্রাসাদের শীর্ষস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেখানেও কোন ছাদ নাই, ভগ্ন দেওয়ালের অপ্রশস্ত মাথায়ই কোনরূপে দুইজনে বসিলাম। সঙ্গী বলিল, এই ছাদের উপরে একটি সুন্দর খোলা গৃহ ছিল, এখানে বসিয়া মহারাজা রুদ্রসিংহ হাওয়া খাইতেন আর প্রত্যহ ভোরে একবার এখানে আসিয়া দক্ষিণে জয়সাগরের দিকে চাহিয়া মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইতেন। চৌকিদারের এ উক্তিতে কতটুকু সত্য নিহিত আছে জানি না, তবে এ স্থান হইতে চারিদিকের খোলা প্রান্তর মধ্যে জয়সাগরের শান্ত, স্নিগ্ধ রূপটি স্বাভাবিকই অতি মনোরম দেখায়। জানি না যদি সত্যই কোনদিন রাজা রুদ্রসিংহ ক্ষণিকের জন্যও এখানে বসিয়া থাকেন, তবে তখন জয়সাগরের স্নিগ্ধ, শীতল রূপ অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি লইয়া তাঁহার কানে কি কথা শুনাইয়াছে, তাঁহার প্রাণে কি বন্যা বহাইয়াছে।

প্রাসাদ শীর্ষ হইতে যে শুধু জয়সাগরই দেখা যায় তাহা নহে, জঙ্গলাকীর্ণ প্রশস্ত প্রাচীরবেষ্টিত সমগ্র রাজপুরীটিই এস্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, অবশ্য আজ সব জনশূন্য, কতক জঙ্গলময়, আর কতক কৃষকের ধানজমিতে পূর্ণ।

আমরা প্রথম মহলটি ছাড়িয়া দরবার প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে অবস্থিত আর একটি অনুরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট মহলে প্রবেশ করিলাম, এখানেও নানা কুঠরী, নানা ভাগ। শুনিলাম ইহা নাকি 'মহিলা মহল' সেস্থান হইতে সিঁড়ি বাহিয়া দরবার প্রাঙ্গণের নিম্নস্থ ভূমির সমান্তরালে অবস্থিত ইষ্টক-স্তম্ভবহুল সারা প্রাসাদ জোড়া এক প্রকাণ্ড খোলা বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গী বলিল, সিপাহী, শান্ত্রীদের জন্য এ বাড়ী নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই বৃহৎ সৈন্যাগার হইতে সিঁড়ি বাহিয়া আমরা ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম, এ কক্ষের এক পার্শ্বে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া তাহার ক্ষীণ আলোতে একটি স্থান দেখাইয়া চৌকিদার বলিল— এখানে ছিল আর একটি সিঁড়ি মুখ, এভাবে একে একে আরও ছয়টা তলা নামিয়া গিয়াছে, শেষ মহলটি ভূপৃষ্ঠ হইতে সাত-তলা নীচে অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি নানাকারণে [illegible]রূপ ভূগর্ভের একটি তলা রাখিয়া দ্বিতীয়টির মুখ সরকার বাহাদুর নাকি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। একে একে প্রাসাদের সবগুলি কক্ষ, সবগুলি অংশ ঘুরিয়া ক্লান্তদেহে আবার দরবার প্রাঙ্গণে আসিয়া বসিলাম।

সঙ্গী চৌকিদার কৌতূহলী শ্রোতা পাইয়া এ রাজ্যের নানা গল্প বলিয়া যাইতে লাগিল, কতক জানা, কতক অজানা, হয়ত বা রূপকথা। আমি সুবোধ ছেলের মত নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু বলিতে পারি না কয়টি বর্ণ আমার কর্ণগোচর হইতেছিল। আমি তখন ভাবিতেছিলাম, এই রংপুর নগর, এই রংপুর রাজপ্রাসাদ, এখানে বসিয়াই একদিন মহারাজা রুদ্রসিংহ সমগ্র আসামে রাম-রাজত্ব আনিয়াছিলেন, এখানে বসিয়াই একদিন তিনি সমগ্র বাঙলাকেও আসামে টানিয়া আনিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, আর সে প্রাসাদ আজ জনশূন্য, জীর্ণ কঙ্কালবৎ পড়িয়া আছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িল, বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে।

জপ্রাসাদ হইতে বিদায় লইয়া রাজপুরীর বাহিরে অবস্থিত রং-ঘর বা প্রমোদ ভবনটি দেখিতে ছুটিলাম।

রুদ্রসিংহের প্রাসাদ হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড দুইতলা প্রমোদ ভবনটি দাঁড়াইয়া আছে। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রং-ঘরটি রুদ্রসিংহের প্রাসাদের মতই ইষ্টকনির্ম্মিত হইলেও এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ দেহেই দণ্ডায়মান আছে, তবে স্থানে স্থানে এ যুগের মেরামত চিহ্নও বর্ত্তমান।

আসামী ভাষায় 'ক্রীড়া'কে রং বলা হয়। উক্ত রং-ঘরে তখনকার দিনের রাজারা সপরিবারে বসিয়া বন্য জন্তু ও ষাঁড়-মহিষের যুদ্ধ ও অন্যান্য নানা ক্রীড়াকৌতুক দর্শন করিতেন বলিয়া কথিত আছে।

সমুচ্চ অট্টালিকার মাথার দিকের প্রশস্ত সোপান বাহিয়া আমি দোতলায় উঠিলাম। উপরের নৌকাকৃতি সুবৃহৎ ছাদের নীচে তিনটি প্রকোষ্ঠ, মধ্যস্থলের কক্ষটিই বৃহৎ। সমগ্র অট্টালিকার দুই পার্শ্বে কয়েকটি স্তম্ভ ছাড়া অন্য কোন আভরণ নাই, কাজেই কক্ষগুলির পার্শ্ব দুইটি সম্পূর্ণ উন্মুক্তই বলা চলে। নীচের মহলটিকেও ঠিক উপরেরই মত তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এ অট্টালিকারও বহির্গাত্রে এবং প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে লতাপাতা, ফুল, নানা জীব-জন্তু ও শিকার চিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। আমি নির্জ্জন রং-ঘরের সবগুলি কক্ষে ও চারিপার্শ্বে একবার পায়চারি করিয়া আবার রাস্তায় উঠিলাম।

দুইদিনেই আমার আসাম গৌরব সতী জয়মতীর দেশ দেখা হইয়া গেল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অতীত স্বাধীনতার স্মৃতি মাখান এই দেশটির মায়া কাটাইয়া নূতনের উদ্দেশ্যে ছুটিতে পারিলাম না। আরও দুইদিন শিবসাগর টাউন আর টাউনের গা-ঘেঁসা আসামী পল্লীগুলিতে বেড়াইয়া কাটাইলাম। গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষ বিশেষভাবে যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকারা তখন 'বিহু' উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। নববর্ষের এই আবাহন উৎসবটি আসামীদের প্রধান জাতীয় উৎসব; ইহা চৈত্র সংক্রান্তির দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখের সপ্তাহকাল পর্যন্ত চলিয়া থাকে। পল্লীবাসীদের পরিধানে নূতন রঙীন পোষাক, ঘরে ঘরে আহার-বিহার, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের ঘটা আর নৃত্য সঙ্গীতে মুখর সারা গ্রাম।

শিবসাগর বাসের ষষ্ঠদিনে দুপুরবেলা আমি আসামের এই পুরান রাজ্যটি ছাড়িয়া 'আসাম মেইলে' চাপিয়া ছুটিলাম নূতন পথে আরও পুরাতন একটি দেশের উদ্দেশ্যে।

আমরণ

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

বলিয়া উঠিল—"এ রকম করে কথা বলা বুঝি তোমাদের তথাকথিত য়্যারিষ্টোক্রেসির নমুনা? বেশ। একটা লোক সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর বাড়ী এলে তাকে অমন ধারা আদর করাই বুঝি তোমাদের রেওয়াজ?" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। লতিকা হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

"তা তুমি বুঝবে কি গেঁয়ো ভূত, মেশো নি ত' কোনদিন তাঁদের সঙ্গে।..." তারপর একটু কান্নার সুর করিয়া বলিতে লাগিল "বাবা কি একটা আস্ত গাড়োলকে ধরে এনে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে মা গো..."

শিবুর আর সহ্য হইল না বলিল—"কি বল্লে—আবার বল ত' শুনি? ও কথা তোমার মুখে শোভা পায় না, আমার ভার তোমার ঘাড়ে? না—আসলে তা নয়। তোমার বাবা জানতেন যে, এ গেঁয়ো ভূতের ঘাড় ভাঙ্গবে না সহজে—অটুট থাকবে চিরকাল। তাই এ খোঁড়া পেত্নী তার ঘাড়ে চাপিয়েছে—কৌড়ী দিয়ে চাকরি দিয়ে" বলিয়া চাবির গোছাটা আরাম কেদারায় ফেলিয়া দিয়া স্যুট পরা অবস্থায়ই বাহির হইয়া গেল।

শিবু বাসায় ফিরিল রাত্রি নয়টায়। তাহার ব্যবহারের জন্য সে অনুতপ্ত হইয়াছিল—তাহারও ত' রক্তমাংসের শরীর। ভাবিল বাসায় যাইয়া আজ লতাকে অজস্র আদরে ভরিয়া দিবে। ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু বাসায় আসিয়া শুনিল লতিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এত সকালে? আশ্চর্য্য। শিবু একটু দমিয়া গেল।

যাহা হউক যথা সম্ভব নিঃশব্দে আহারাদি শেষ করিয়া সে লতিকার শুইবার ঘরে উপস্থিত হইল। তাহাদের দুইজনের পৃথক দুইটি ঘর। নীল স্নিগ্ধ আলো ঘরটাতে লুটোপুটি খাইতেছিল। খাটের উপর লতিকা ঘুমাইতেছিল; তাহার মুখে-চোখে নীলাভ আলো পড়াতে শিবুর মনে হইল কি সরল মধুর ও মুখখানা। কতকগুলি অবিন্যস্ত চুল মুখের চারিদিকে খেলা করিতেছিল। সন্ধ্যার অপ্রীতিকর ব্যাপারটার জন্য সে লজ্জায় মরিয়া গেল! বড় রূঢ় কথা বলিয়াছে সে! সহসা লতিকার বাঁ পাটার দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। খোঁড়া বলিয়াইত তাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে—তাহা না হইল......সে আর ভাবিতে পারে না একটা অপূর্ব্ব সহানুভূতি ও করুণায় তাহার মন অবশ হইয়া আসে!

আস্তে আস্তে খাটের কাছে গিয়া লতিকার হাতটা নিজের কোলে টানিয়া লয়। ঘুমের ঘোরে পার্শ্বে উপবিষ্ট শিবুকে লতা অনুভব করিতে পারে না। শিবুর অন্তর-তলের আদিমতা যেন মাথা খাড়া করিয়া উঠে,—সে অনুভব করে অসংখ্য রক্ত-কণিকার ছুটাছুটি! মৃদু স্বরে ডাকিল—"লত—"

লাফ দিয়া উঠিয়া বসিয়া লতিকা চীৎকার করিয়া বলিল, "চোরের মত আমার ঘরে ঢোকা হয়েছে—বেরোও বলছি! বেরোও এক্ষণি—লজ্জা করে না......"

শিবু ম্লান মুখে বলিল—"লতা ক্ষমা"......।

"কিছু না কিছু না—বেরোও বলছি নইলে লোক ডাকবো।"

"লোক ডাকতে হবে না লতিকা—যাচ্ছি আমি—কিন্তু যাবার আগে তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি যে আমি তোমার স্বামী।" বলিয়া নিঃশব্দে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সারা রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। উন্মত্তের মত বাড়ীময় পায়চারী করিতে লাগিল। এক সময় বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর আর কতকাল, আর যে পারি নে"।

কোথা হতে ভেসে এল উত্তর—"আমরণ!"

লতিকা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

গাঙ্গুলী গৃহিণীর হুঙ্কারের রেশ ইভা আর শুনিল না। দ্রুতপদে সে বাড়ীর সীমানা পার হইয়া আসিল। প্রথমে অভিমানে অপমানে তাহার সমস্ত মনটা টন টন করিয়া উঠিল। একবার ভাবিল, কি দরকার এইসব লোকের মাঝে তাহাদের সারাজীবন কাটাইয়া। আজ যখন স্বামীর পত্রের উত্তর দিতে বসিবে তখন তাঁহাকে লিখিবে, এসব অসম্ভব অসঙ্গত কল্পনা তুমি ছাড়িয়া দাও। ব্যবসা যদি করিতেই হয় কলিকাতায় ক'রো। যে গ্রামে যে জন্মভূমিতে অসীম মমতার বশে তুমি সকল অসুবিধা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে চাও, তাহারা তো তোমায় চায় না। তোমাকে তাড়াইবার জন্যই তাহারা লালায়িত। প্রতিমার উপরও সে রাগ করিল। যদি বাড়ীর লোকজনের এই ধারণা তবে কেন সে তাহার সহিত মেশে !

কিন্তু সন্ধ্যার স্তব্ধ অন্ধকারে বিরল গ্রাম্য পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহার মনে আর একটা সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ঐ মৃত্যু-পথযাত্রিণী মেয়েটির বঞ্চিত অন্ধকার জীবনের জন্য দায়ী কে? এ দায়িত্বের অংশ অভিমান বশে এড়াইয়া চলিবার সাধ্য কি তাহার আছে?

আলো নাই, আশা নাই, শ্রদ্ধা নাই—কোন দিকে কোন আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই, তবু প্রতিদিন উদয়াস্ত সংসারের যূপ-কাষ্ঠে কঠিন পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইবে। কোনদিকে চাহিবার এতটুকু অবসর অবধি নাই। প্রতিমার এই তো দৈনন্দিন জীবন। তাহার নিজের এই তুচ্ছ অভিমান ঐ অভ্রভেদী বেদনার কাছে কোথায় মুখ লুকাইল।

রাত্রিতে আহারের সময় গাঙ্গুলী বাড়ীর কথাই আলোচনা হইতেছিল। ক্ষেমি ঝি কাছে বসিয়া পান সাজিতেছিল, সে ওষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে একটা আক্ষে-পোক্তি করিয়া কহিল, সোয়ামীর জ্বালাতেই জ্বলেছেন চিরটাকাল। শরীরে আর ওঁর কি আছে বল বৌদি, চিতার দিকে এক পা বাড়িয়েই রয়েছেন। স্বামী দিনরাত একটা ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। মনের কষ্টে ওঁর ভিতরটা জ্বলে পুড়ে গেল।

ইভার শাশুড়ী চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া কহিলেন, যা যা, তোর পান সাজা শেষ হ'লো তো নিজের কাজে যা। বসে বসে গল্প করতে হবে না।

উমা খাওয়া শেষ হইয়া গেলে উঠিয়া তাহার নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তখন গৃহিণী কহিলেন, তোর আক্কেলটা কি রকম শুনি লা ক্ষেমি? উমি বসে রয়েছে সামনে, অতবড় আইবুড়ো মেয়ে তার কাছে তুই যা মুখে আসে গল্প করিস এ'ও আমাকে বলে দিতে হয়। ক্ষেমি লেশমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া সবিস্তারে এতক্ষণে সুযোগ পাইয়া শুনাইতে লাগিল প্রতিমার স্বামী সাত আটটি সন্তানের জনক হইয়াও কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করিতেছে।

ইভা শ্লেষ করিয়া কহিল, ভদ্রলোক বাইরে ছুটে বেড়িয়ে যদি স্ত্রীকে রেহাই দিতেন তবু সে বেচারা আরও ক'টাদিন বেঁচে থাকতে পারত। ছেলেমেয়ে কয়েকটাও হয়তো এত অসহায়—এমন সর্ব্বহারা হ'তো না। কিন্তু সেটুকু দয়া বা বিবেচনাও তাঁর নেই দেখছি!

ক্ষেমি তাহার কথার মানে বুঝিতে না পারিয়া আপন উৎসাহে অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল, সেদিন বড় বৌ বলেছিল তেনার সোয়ামীকে, আমার শরীরটা বড্ডই খারাপ হয়ে গেল। একবার ডাক্তার এনে দেখাও। কোলের ছেলেটার মুখ চেয়ে অন্তত আমার এমন বিনা চিকিৎসায় মরতে ইচ্ছে করে না।

তিনি জবাব দিলেন, মরবে না তুমি সে ঠিক। রোগ রোগ করা তোমার নিত্যিকার এক বাই। গেরস্থ ঘরে অত টাকা কার আছে যে, বড় ডাক্তার এনে দিনই পরিবারের রোগ দেখায় ! ও সব সখ আমার ঘরে পোষাবে না বাপু।

সেই থেকে ওনাদের বৌ আর ওষুধ পত্তর খান না। গাঁয়ের ডাক্তার একদিন দেখে কি ওষুধ দিয়েছিল সে ওষুধ জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়েছেন। এসব খবরই ওদের বাগ্‌দিকামিন বিধুর কাছে শুনতে পাই। ঘাটে নিত্যি তার সঙ্গে দেখা হয়।

উপরের ছাদ হইতে উমা অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, বৌদি কত আর সেই মান্ধাতার আমলের পচা পুরোন একঘেয়ে গল্প শুনবে? উপরে এসোনা বাপু। কী সুন্দর চাঁদের আলো উঠেছে।

ইভা হাত ধুইয়া একটা পান লইয়া উপরে ছাদে উমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় সব মলিনতা সমস্ত কলঙ্ক ছাপাইয়া শুক্লরাতের স্নিগ্ধ সুন্দর শুভ্র জ্যোৎস্নায় দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছে। খড়ের কুটিরের চালে, ঘুমন্ত বিসর্পিত পায়ে চলার পথে, পথের পাশে রাখা গরুর গাড়ীর ছইয়ের উপর সেই আলো পড়িয়া সেইসব সামান্য জিনিষকে রূপময় করিয়া তুলিয়াছে। উমার পিঠের উপর একটা হাত রাখিয়া ইভা কহিল, উমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তার দাদা ফিরে এলেই বিয়ের দিন হবে। এখন উমারাণীর চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে থাকতেই ভালো লাগে। এখন কি ওর ভালো লাগে দুঃখের গল্প শুনবার? কিন্তু সারা জীবন পাড়াগাঁয়ে থেকে তুমি এইবার কলকাতার বাসিন্দা হবে। ক'লকাতার সম্বন্ধটাই ঠিক হ'লো শেষ পর্য্যন্ত। আর আমরা ক'লকাতার মেয়ে হয়ে বাস করতে এলাম এই বন-গাঁয়ে। বিধাতার কী অবিচার বলো তো ভাই ! উমা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত দূর পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি তো নিজেই স্বইচ্ছায় এই বন-গাঁয়ে থাকতে চাও চিরকাল। তুমি যদি আপত্তি করো দাদার সাধ্য কি যে এখানে থাকেন। তোমরা এখানে কি যে করবে আমি ভেবে পাইনে ভাই। তোমাদের যোগ্য এদেশ নয়।

ইভা কহিল, তুমি একথা কেমন করে বলতে পারছ উমা আমি বুঝতে পারিনে। যে দাদার বোন তুমি তাঁর সারা

অন্তর জুড়ে এই অভাগা দেশ আসন পেতেছে। কিন্তু তুমি এতই সহজে একে উপেক্ষা করে ঠেলে ফেলতে চাও !

উমা নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল, যা মরে গেছে তাকে কি জোর করে শুধু সেণ্টিমেণ্টের খাতিরে বাঁচানো যায় বৌদি ? পল্লী-সমাজ মরে গেছে। এই দেশব্যাপী শবের উপর তোমরা দু'একজন বসে কিসের সাধনা করবে ? তোমাদেরও পালাতে হবে এর পচাগন্ধে। তুমিও প্রথমে তো এমন ছিলে না। দাদার সর্বনেশে নেশায় দেখছি এখন তোমাকেও পেয়ে বসেছে। কিন্তু একটা কথা তখনও আমি দাদাকে বোঝাতে পারি নি, এখনও পারছিনে, একটা জিনিসের পরমায়ু ফুরিয়ে গেলে তাকে জোর করে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। পাড়া গাঁ পাড়া গাঁ করে তোমরা ক্ষেপেছ, কিন্তু তার প্রাণ গেছে নিঃশেষ হয়ে, শুধু মৃত শরীরটা পড়ে রয়েছে, একে যতই যত্ন ক'রো এ আর বেঁচে উঠবে না। ইভা চিন্তিত সুরে কহিল, এক সময় আমিও তোমার মত করে ভাবতুম কিন্তু প্রাণ এখনও আছে উমা। আমাদের গ্রাম মরে নি, এখনও চেষ্টা স্নেহ যত্ন পেলে সে বেঁচে উঠতে পারে ও আমাদের বাঁচাতে পারে সেই সঙ্গে। আর অন্য উপায় নেই। যতই শক্ত মনে হোক এ আমাদের পারতেই হবে। একথাটা তর্ক করে বোঝান যায় না, অনুভব করতে হয়। উমা আর কিছু বলিল না। চুপ করিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নাবিধুর প্রকৃতির দিকে চাহিয়া রহিল।

ইভা গুন গুন করিয়া একটা গান গাহিতে লাগিলঃ

"ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র

মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র..."

উমা কহিল, এমন সুন্দর চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে এই গানই তোমার মনে পড়লো এত গান থাকতে।

ইভা কহিল, হ্যাঁ, এই গানই মনে পড়লো। ভারতবর্ষ যখন এশিয়ার তীর্থস্বরূপ ছিল, যখন জ্ঞানে গরিমায় আমাদের এই দেশ সকল দেশের অগ্রদূত স্বরূপ ছিল তখন এর নগর নয় গ্রামেরও অপূর্ব রূপ ছিল। ভারতবর্ষের নব্বইভাগ লোক যেখানে থাকে সেখানেই তখন আনন্দের দীপটি জ্বালা ছিল। সেই ছবি কি মনের মধ্যে আনতে পারো না উমা ?

উমা বলিল, পারলেও তেমন আনন্দ পাইনে বৌদি। এক সময় অতীত সভ্যতার যুগে যার প্রয়োজন ছিল আজ হয়তো তার তেমন প্রয়োজন নেই, তাই স্বাভাবিক নিয়মেই সে লুপ্তির দিকে ধ্বংসের দিকে চলেছে। ইভা কহিল, তুমি কেমন করে জানলে এর দরকার ফুরিয়েছে। আমি তো আজ দেখছি এর দরকারের শেষ নেই। বড় বড় শহরে কল-কারখানা অনেক হ'লো, বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় কত অসম্ভব অসাধ্য বস্তুই না সম্ভব হ'লো কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকলো কি? শেষ পর্য্যন্ত তাদের বাঁচিয়ে দেবে এমন কোন জিনিষের দেখা তো তারা পেলে না। এই মহাযুদ্ধের ভিতর সেই সর্বনেশে কথাটা কি তুমি ধরতে পারছ না ? ভারতবর্ষের গ্রামে নিস্তব্ধ তপস্যামগ্ন কর্মানুষ্ঠানের মাঝে এর উত্তর আছে। কিন্তু সে উত্তরের লেখা আজ হতাদরে ম্লান হয়ে গেছে। আমাদের চেষ্টায় আমাদের নিষ্ঠায় তাকে আবার উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। একাজ কিছুতেই সামান্য নয় ভাই।

উমা বলিল, যুদ্ধের যে কথা চলছে সেইটে মনে পড়াতেই তুমি বুঝি আধুনিক নগর-সভ্যতার নিন্দে করছ ?......

তাহাদের তর্কালাপের মাঝে ক্ষেমি ঝি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, বৌদি এইমাত্র গাঙ্গুলী বাড়ী থেকে ছুটে আসছি। তেনাদের বৌয়ের ধনুষ্টঙ্কার হয়েছে, খিঁচতে লেগেছে। ওঝা ডাকতে পাঠিয়েছে গিন্নীমা—ঝাড়বার জন্যে। যাবে না একবার দেখতে ?

উমা ম্লান হাসিয়া কহিল, দেখলে তো বৌদি ভারতবর্ষের গ্রামের অত্যুজ্জ্বল আদর্শের আলো যা নাকি সে পৃথিবীর সবাইকে বিলিয়ে সবাইকে আলো করে তুলবে। সেপ্টিক হয়ে টিটেনাস্ হয়েছে, গিন্নী পাঠিয়েছেন ওঝা ডাকতে ঝাড় ফুঁক করবে। ইভা কহিল, সে আমিও জানি গো মশায়। কিন্তু আমার যেখানে ব্যথা সে আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি, কেবল হেসে সমালোচনা করে ক্ষান্ত থাকতে পারছিনে। এখন ওসব কথা থাক, যাবে একবার বৌটিকে দেখতে ? বাঁচবার বোধ হয় তার আর আশা নেই। উমা উত্তর দিল, এত রাত্রিতে মা যেতে দেবেন না কিছুতেই। আর তুমি বা আমি যেয়েও যে বিশেষ কিছু করতে পারব তা বলে মনে হয় না। ওঝা আসবেই ঝাড় ফুঁক চলবেই মাঝখান থেকে তোমাকে আমাকে হয়তো অনেকগুলো অপ্রীতিকর কথা শুনতে হবে। অপমানও করতে পারে। ইভা কহিল, কিছু না করতে পারি তবু তো দাঁড়িয়ে দেখব।

উমা বিস্মিত হইয়া বলিল, শুধু দাঁড়িয়ে দেখে লাভ !

ইভা ছাদ হইতে যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া কহিল, এইটুকু লাভ যে বুঝতে পারব আমরা কী হয়েছি ! দুর্গতির কত চরমসোপানে নেমে এসেছি। এরও প্রয়োজন ছিল। বেদনা বোধ যখন দুঃসহ হয় তখনই মুক্তির জন্যে ব্যাকুলতা জাগে।

ভোরবেলায় তখনও সূর্য্য ওঠে নাই। পূর্বাকাশ ঈষৎ রক্তিম হইয়াছে মাত্র। ইভা গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকজন আনাগোনা করিতেছে। বাড়ীতে একটা বিপদের পূর্বাভাস। প্রতিমার মেজ জা একটা কেৎলীতে গরম জল করিতেছিল, কহিল, দিদির কাল রাত থেকে খিঁচুনি আরম্ভ হয়েছে। যান না দেখুন গিয়ে। আর তো আঁতুড়ের নিয়ম মানামানি নেই। মা ভালো ব্যবস্থাই করেছিলেন, নগাঁয়ের হীরু ওঝা বিখ্যাত ওঝা। আঁতুড়ের যতরকম রোগ-বাই ভালো করতে আজও তার জোড়া দেখলুম না। কিন্তু আজকাল দিন সময় কেমন পড়েছে দেখুন না, ভালোর কাল নেই। কোথা থেকে খবর পেয়ে ও পাড়ার দীনু ঠাকুরপো তার দলবল নিয়ে রাত্তিরেই হাজির। তারা যা নয় তাই বলে গালাগালি করে হীরুকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজেরাই ডাক্তার ডেকে এনেছে। সারারাত্রি ধরে জেগে রয়েছে। ওদের জন্যেই এই চা করতে বসেছি।

ইভা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল, ডাক্তার কি বলছেন ?

প্রতিমার জা' বলিল, কি বলছেন তা তো জানিনে, কাল থেকে দেখছি অনবরত ইঞ্জেকসন ফোঁড়া ফুঁড়ি চলছে। যদি বা একটু বাঁচবার আশা ছিল বিঁধে বিঁধে সেটুকুও আর থাকবে না। সবই বরাত।

ইভা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রোগিণীর কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া যন্ত্রণায় বিস্ফারিত নিদ্রাবিহীন আরক্ত দুই চক্ষু মেলিয়া প্রতিমা চাহিয়া রহিল। শিয়রের কাছে ইভা আসিয়া বসিতে সে কেমন একরকম অদ্ভুত হাসিয়া কহিল, এক রাত, আর একটা গোটা দিন। এক রাত কেটেছে, না? রাত কেটেছে না? ঐ যে আলো? পর-মুহূর্তেই রোগের আক্রমণে তাহার হাত-পায়ের খিঁচুনি আরম্ভ হইল। কথা বলিবার আর কোন সামর্থ্যই রহিল না, জ্ঞান যে আছে তাহাও মনে হইল না।

ইভা আর দেখিতে পারিল না। শুশ্রূষা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু চোখের উপর এ-দৃশ্য না দেখিতে পারিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল। প্রতিমার মেজো জা' চায়ের কেৎলী হাতে ঘরে ঢুকিবার পথে তাহার পালাইয়া যাইবার ভংগী দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার মুখে গাঙ্গুলী বাড়ীর উচ্চ ক্রন্দন রোলের শব্দ গগনভেদী হইয়া উঠিল। ক্ষেমি ঝি খবর আনিয়া দিল—বড় বৌ এইমাত্র মারা পড়িয়াছে। তখন সূর্য অস্ত যাইতেছে। সেই রক্তরাঙা আভার দিকে চাহিয়া ইভা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল প্রতিমার যন্ত্রণা-বিস্ফারিত অর্দ্ধজ্ঞানশূন্য চোখের উন্মাদ দৃষ্টি দিয়া বলা সেই কথা: একটা গোটারাত একটা গোটাদিন। সেই অভাগিনী একটা রাত্রি ও একটা সমস্ত দিন ধনুষ্টংকারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন হারাইল। হয়তো এ ভালোই হইয়াছে যে, সেই অপমান সেই গ্লানি ও দুঃখ-ভোগের জীবন হইতে সে অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু এই মরণকে আশ্রয় করিয়া যে সব কথা ইভার মনে আনাগোনা করিতে লাগিল তাহাদের রক্তরূপে এই অস্তগামী আলো আরও করুণ আরও রক্তরঙ্গীন হইয়া উঠিল।

মনশ্চক্ষে সে দেখিতে পাইল এখনই প্রতিমার জা' তাহার ভাগ্যবতী সধবা দিদিকে আলতা সিঁদুরে সাজাইয়া দিবে। পাড়ার মেয়েরা একবাক্যে কহিবে: আহা এমন ভাগ্যমানি বৌ গো, সোয়ামী পুত্তুর, মেয়ে-জামাই সবাইকে রেখে স্বর্গে গেল!

প্রতিমার শাশুড়ি আর একদফা কাঁদিয়া ছেলেমেয়ের মা ঘরের লক্ষ্মী বৌকে শেষ বিদায় দিবেন। কিন্তু এই সব উক্তির অন্তরালে যে কঙ্কালটা লুকাইয়া আছে তাহার রূপ চোখে ভাসিয়া উঠিতেই ইভা শিহরিয়া উঠিল। এই শাশুড়িই একজন নোংরা অশিক্ষিত দাইয়ের হাতে ফুল টানিয়া বাহির করিয়া দিবার ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে এমন যন্ত্রণাকর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। স্বামী যে সে ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ করিবে এমন দুঃসাহসের কথা পল্লীসমাজের কেহ কল্পনাও করিতে পারে না।

ডাক্তার বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ কিছুদিন বিশ্রাম চাই।

কিন্তু ওসব সৌখীনতা ওসব বীভৎস পাশ্চাত্যবুলি শুনিলে আজও ধর্ম্মভীরু এখানকার লোক কানে আঙ্গুল দেয়।

ওমা সে কি কথা! ছেলেমেয়ে দেবার মালিক যে ভগবান, তিনি যে ক'টি ফল মাপিয়া রাখিয়াছেন তাহা রোধ করে কার সাধ্য! প্রতিমা আপন একান্ত অসুস্থ দেহের কথা বলিলে তাঁহারা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, গৃহস্থঘরে যে বৌ দিবারাত্রি রোগ রোগ করিয়া বাতিক করে তাহার হাড়ে লক্ষ্মী হয় না এবং বোধকরি তাহারই পাপে গৃহস্থবাড়ীর চঞ্চলা কমলা নিতান্ত অতিষ্ঠ হইয়া পালাই পালাই করেন।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—যে দেশের মেয়েদের সর্ব-শ্রেষ্ঠ সম্মান সে দেশে সাত আট ছেলের মা বৌটা মারা গেলে পুত্র উৎপাদনের প্রয়োজনে না হোক পুত্র প্রতিপালনের অজুহাতেও দুমাসের মধ্যে আর একটা স্ত্রী জুটাইয়া লইতে ইহাদের দ্বিধা হয় না—মেয়েরও অভাব হয় না, অবলীলাক্রমে ঠিকই আর একটা আসিয়া জুটে। চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, ক্রন্দনের শব্দ বাড়িয়া উঠিল। পাড়ার পরোপকারী উৎসাহী ছেলেরা সৎকারের জন্য শব বাহির করিল। ইভা চোখ মুদিয়া সেই ছাদের আলিসা ধরিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। আকাশে, বাতাসে, ঘরে বাইরে এই ক্লিষ্ট ক্রন্দনে মুখরিত জীবনের পটভূমিকাতেই সে তার সারা জীবন কাটাইয়া দিবে মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করিল। স্বামী এবং শিক্ষা পাইয়া বিলাতী ডিগ্রী অর্জন করিয়াও যে, প্রকাণ্ড কোন এক শহরে প্রভূত অর্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনে আপনাকে নিয়োজিত করিবেন না—তাঁহার এ সংকল্পে সায় দিলেও কখনও কখনও মনে যে দ্বিধার আন্দোলন ইভা অনুভব করিত আজ তাহা একেবারে ঘুচিয়া গেল। সে মনে মনে কহিল, প্রকাণ্ড কিছু আমরা না'ও করিতে পারি। ভালো ভালো সংস্কার-সাধন আমাদের দিয়া নাইবা হইল, কিন্তু এই ক্রন্দসী অন্তরীক্ষের গায়ে একটি স্নিগ্ধতারার মত আমরা ফুটিয়া থাকিব। কেবল প্রতিদিনের জীবন ইহাদের মধ্যে যাপন করিয়া যাইয়া আবর্জনারাশির মধ্যে একটি সরস সুন্দর বিকচ ফুলের মত বিকশিত হইয়া থাকিব। এইটুকু যে কত, একদিন তাহার মূল্য নিরূপণ হইবে, সেদিন আর আমার ক্ষোভ করিবার কিছু থাকিবে না।

—শেষ—

বিরাট রথচক্র

য়্যাডমিরাল বায়ার্ডের পরিচালনে ১০০ জন সঙ্গীসহ যে দক্ষিণ মেরু অভিযান ব্যবস্থা হালে মার্কিন গবর্ণমেন্ট করিয়াছেন, তাহাতে ৫৫ ফুট লম্বা অভিনব বৃহদাকার এক মোটর-যান ব্যবহৃত হইবে—উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'স্নো-ক্রুইজার'। 'স্নো-ক্রুইজার' আকারে যেমন বিরাট, গড়নেও তেমনিই মজবুত, তাই উহার ছাদে বহন করিবে একখানি অতি ক্ষিপ্রগতি এয়ার-প্লেন। স্থলপথে তুষার ঝঞ্ঝার সংকট সময়ে এয়ারপ্লেন কাজে
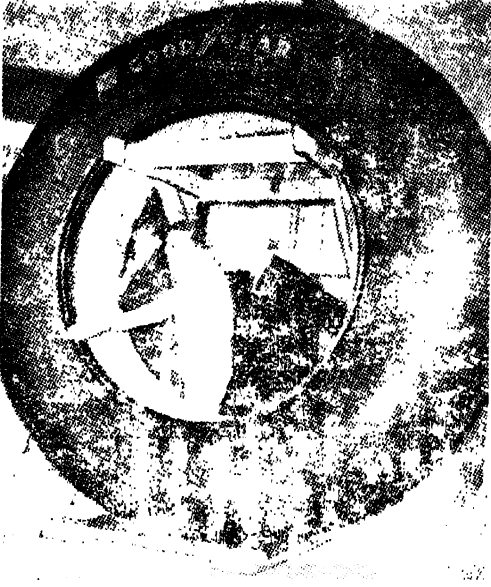
দশ ফুট টায়ারের একটি; ইহা এমন রবারে প্রস্তুত যাহাতে মেরু অঞ্চলের তীব্র হিমেও উহা অবিকৃত থাকে।

লাগান হইবে। যে ডিজেল ইঞ্জিনগুচ্ছ মোটরে সংযুক্ত, তাহার একুন শক্তি—৪০০ অশ্বশক্তির সমান। বরফ, তুষার আস্তরণ ও স্তূপ ভাঙ্গিয়া পিষিয়া সমতল সুগম পথ করিয়া লইবার উপযুক্ত সামর্থ্যই এই মোটরের রহিয়াছে। উহার চারিটি দশ ফুট আকারের চাকার প্রতিটির ওজন ৭০০ পাউন্ড এবং এমন বিশেষ প্রকারের রবারে তৈরী যে মেরু অঞ্চলের অতিরিক্ত হিমেও উহা সমভাবেই নমনীয় থাকিবে—কোন প্রকারে বিকৃত হইবে না। অভিযানকারী দল দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে তিনটি স্থায়ী আড্ডা গাড়িবে এবং প্রতি বৎসর দেশ হইতে নূতন একদল করিয়া লোক প্রেরিত হইবে ঐ তিন আড্ডায়, পূর্ব্ব প্রেরিতদের অবসর দান করিবার জন্য।

উড়োজাহাজের আতঙ্ক

বর্ত্তমানে সমরের প্রধান অভিশাপই হইল উড়োজাহাজ হইতে বোমাবর্ষণ। সাধারণ জনগণের ভিতর তাই যুদ্ধ বাধিলে উড়োজাহাজের আতঙ্কটাই হয় প্রবল। অনেক সময় তেমন সাহসিককেও এই আতঙ্কে একেবারে দিশাহারা হইতে দেখা যায়। কেন্টশায়ারের সেভেনওক্স্-এর নিকটস্থ অটফোর্ড শহরে হঠাৎ একটি পাহারা-ওয়ালা শিটি বাজাইয়া দেয় শত্রুপক্ষের বিমান অভিযানের সংকেত-স্বরূপ। অধিবাসী সকলে দ্রুত বোমা-নিরোধক কক্ষে আত্মগোপন করে। কিন্তু উড়োজাহাজ আর আসিয়া হাজির হয় না—কোনও শব্দও শোনা যায় না। পাহারাওয়ালা নিজেও একটু হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, নিজের এমন ত্রুটিতে। সহসা তাহার মনে পড়ে এতক্ষণ সে ঘুমাইতেছিল, খুব সম্ভবত স্বপ্নেই এ আর পি'র সংকেত-ধ্বনি তাহার কানে যাইয়া থাকিবে, এবং তাহারই প্রেরণায় সে শিটি বাজাইয়া ফেলিয়াছে।

ফ্যাসানের জয়যাত্রা

আমেরিকায় বর্ত্তমানে মহিলাদের হ্যান্ডব্যাগ স্বচ্ছ হওয়াই ফ্যাসান। এমন নমনীয় কোনও স্বচ্ছ পদার্থে উহা প্রস্তুত হইবে, যাহাতে ভিতরে রক্ষিত সকল জিনিষই সর্ব্বদা চোখে পড়িতে পারে। এমন স্বচ্ছ হ্যান্ডব্যাগের বাহাদুরী হয়ত অনেক সময় অজানা দর্শকের চোখ এড়াইবে—এইজন্য আবার ব্যাগটির ধারে

স্বচ্ছ হ্যান্ড ব্যাগ — পাশ্চাত্যের হাল ফ্যাশান; শুধু সেলাইয়ের কারিগরী হইতে টের পাওয়া যায় এই অদৃশ্য ব্যাগের অস্তিত্ব।

ধারে যে সেলাই, তাহাতে নানাপ্রকার বিচিত্র কারুকার্য্য করা হয়; তাহা হইলেই উহা যে স্বচ্ছ ব্যাগ ইহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হইবে না। মহিলাদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সুযোগ-সুবিধা ঢের—কেননা, পথিমধ্যে চলিতে চলিতে অথবা যে কোন অবস্থায় ব্যাগ না খুলিয়াই ব্যাগের ভিতরের আয়নায় মুখখানি দেখা চলিবে, নাকে পাউডার দেওয়া, কিম্বা ওষ্ঠে লিপষ্টিক ঘষা—কোন কাজই আর কঠিন হইবে না। ছবিতে দেখা যাইতেছে—মহিলাটি নাকে পাউডার দিতেছে—ব্যাগের ভিতরের আয়নায় মুখ দেখিয়া—কপালে যে ফিতার 'লাভ-নট্' অর্থাৎ 'অনুরাগ গ্রন্থি' বন্ধন, উহা হইল ব্যাগটি খুলিবার মুখের সূচিশিল্প কৌশল। আর মাথার চুল হইতে ডাইনে-বাঁয়ে যে জড়ান সরু তারের মত ব্যবস্থা নজরে পড়ে—প্রকৃতপক্ষে উহাই ব্যাগটির দুই পাশের সেলাইয়ের সারি। ব্যাগের ভিতরে রক্ষিত আয়না ছাড়া অন্যান্য জিনিষও দেখা যাইতেছে। ঐ সেলাইয়ের কারুকার্য্য যদি নজরে না পড়িত, তাহা হইলে স্বচ্ছ ব্যাগটি আদপেই কেহ লক্ষ্য করিত না, ফলে ব্যাগটির স্বচ্ছতার আভিজাত্য মাঠে মারা যাইত। আর ব্যাগের অধিকারিণীর স্বচ্ছতার গর্ব্বও মাটি হইত।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

একটু দম লইয়া সতীশ বলিতে লাগিল—সভাপতি যখন যে আমাদের অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে ছিলেন টের পাইনি। সভাপতি বরণের পর অসাধারণ অভ্যাগতদের করতালির ক্ষীণ ধ্বনিতে ভেতরদিকে চেয়ে দেখলুম সঙ্গীত আরম্ভ হবার ব্যবস্থা চলেছে। সেতার-বাদক মৃদু হাসির সঙ্গে তান তুলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আর তবলচী ছোট হাতুড়ী নিয়ে তারই সঙ্গে সুরের মিল করবার জন্যে একটা কান আকুল আগ্রহে সেদিকে এগিয়ে দিয়েছেন। শ্রোতার দলের মধ্যে কিন্তু আগ্রহ নেই। সভাপতির পাশে বসে কর্ম্মকর্ত্তা ফিস্ ফিস্ করে কত কি আলোচনাই করে যাচ্ছেন বুঝলুম না। আমি দূরে বসে সব কিছুই লক্ষ্য করতে লাগলুম।

অরবিন্দ বলিলেন, চমৎকার, সমস্ত ঘরটাই আমার অন্ধ চোখের সামনেও ফুটে উঠেছে।—

বাধা দিয়া অলকা বলিল, একটু বাকী রয়ে গেছে, সেই যুবকটি কি করছিলেন তখন?

সতীশ বলিল, তিনি পকেট থেকে ছোট একটা ক্যালেণ্ডার বার করে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন তখন।—দিন পনের পরের একটা তারিখের ওপরই তার খুব নজর বলে মনে হল। পেনসিল দিয়ে অনবরত সেটার ওপর দাগ কাটছিলেন তিনি। আক্রোশ না আগ্রহ ঠিক বুঝলুম না। কিন্তু কোন প্রশ্নও করতে পারিনি আর ঐ দাগ কাটা নিয়ে প্রশ্ন করাও যায় নাঃ—

অলকা বিস্মিত হইয়া বলিল, জলসায় বসে ক্যালেণ্ডার, আশ্চর্য্য!—

সতীশ হাসিয়া বলিল, কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ওখানে বসে তিনি যদি অঙ্কও কসতেন তবু আমি আশ্চর্য্য হতুম না। এরা অন্যমনস্ক হতে পারে বলেই মন দিয়ে কাজ করতে পারে।—ওদিকে সেতার সুরু হয়ে গেলো। বাদকের হাতের চেয়ে মাথা নড়তে লাগল বেশী। মনে হল মাথাটা বুঝি খুলেই পড়ে যাবে। কিন্তু ঘাড় রোগা হলে কি হয় মাথাটাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না।—মাথাটা সমানে ঘুরতে লাগল লাটীমের মত, আমি অবাক হয়ে গেলুম—যুবক তখনও তার কাজেই ব্যস্ত। ক্যালেণ্ডারের ওই তারিখটাকে সে যেন খুবই ভালবেসে ফেলেছে। ওকি জলসায় গান শুনবে না ক্যালেণ্ডারের ব্যবসা খুলবে তা ঠিক বুঝতে পারলুম না।—ওদিকে সঙ্গীত ও সঙ্গত পুরাদমেই চলতে লাগল।—অবাক হলেও আর থাকতে না পেরে তার দিকে চেয়ে বললুম, আপনি কি গান শুনবেন না জায়গা জুড়ে বসে থেকে তারিখ দেখবেন?

ও আমার মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়েই ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করে জোরে হেসে উঠল।—

আমি চমকে গেলুম, পাশের লোকেরা চেয়ে দেখলে।

কর্ম্মকর্ত্তা বেরিয়ে এসে বললেন, কি করছেন মশায়? হাসতে যদি হয় ত এখানে নয়—ও সব নিজেদের আড্ডার জন্যে জমিয়ে রাখুন।—

অরবিন্দ বলিলেন, কর্ম্মকর্ত্তার একথা বলা উচিত হয়নি, তারই বাড়ীতে যখন সব কিছু হচ্ছে তখন তাঁর একটু ভদ্র হওয়া উচিত ছিল।—

অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া অলকা বলিল, সে যুবক কি করলে? সে নিশ্চয়ই উঠে চলে গেল আর অন্য সবাইও নিশ্চয় তার অনুসরণ করেছিল?

হাসিয়া সতীশ বলিল, না কোনটাই হয়নি।—কিন্তু যা হয়েছে তা বোধহয় আরও মজার।—

কর্ত্তার কথা শুনে যুবক বললে, আপনারা কি জেলে যেতে চান নাকি? হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী ঠিক করে রেখেছেন ত?

আমরা অবাক হয়ে গেলুম, কর্ম্মকর্ত্তা অবনীবাবু চমকে উঠে বললেন, বলছেন কি আপনি? জেল, হাসপাতাল? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।—

সঙ্গীত তখনও সমানেই চলছিল। এসব সামান্য গোলমালের প্রতি নজর দেওয়ার অবসর সেতার-বাদক অথবা তবলচীর ছিল না। তাদের মাথা আর হাত যেন যন্ত্র, আর সেগুলো চলছিল যেন মন্ত্রের জোরে।—সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যুবক বললে, ওর মাথা যদি ছিঁড়ে যায় অথবা অমনি কোন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে তখন কি করবেন আপনি? ওকে একটু স্থির হতে বলুন না। অপঘাতে মৃত্যু হলে বাড়ীটারও যে একটা বদনাম দাঁড়িয়ে যাবে।—

কথা শুনে আমরা না হেসে পারলুম না, অবনীবাবুও হেসে ফেললেন।—

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, আমরাও না হেসে পারতুম না সতীশ।—সেই ছেলেটিকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পার না? চমৎকার তার মৌলিক গবেষণা আর তার চেয়েও চমৎকার তার গাম্ভীর্য্য।—ঈশ্বরেরও সাধ্য নেই এমনি ছেলে বেশী সৃষ্টি করা।—

অলকা বলিল, ওটা আপনার খোসামোদী কথা কাকাবাবু। একটু ভাল লাগলেই আপনি ওরকম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। সত্যিকার দাম তার যা তার চেয়েও ঢের বেশী দাম তাকে আপনি দিয়ে ফেলেন—তারা যাই হ'ক আপনি যে মহৎ তাই শুধু তাতে প্রমাণ হয়।—

হাত বাড়াইয়া অলকাকে কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অরবিন্দ বলিলেন, তা নয় মা তা নয়। আমরা অনেক দেখেছি, মানুষকে চিনতে আমাদের দেরী হয় না। তাই সতীশকেও যেমন সহজে বুঝতে পেরেছিলুম ঠিক তেমনি বুঝতে পারছি সেই ছেলেটিকেও।—তুমি নিজেই বা কম কিসে মা! আমার চোখ নেই সত্যি, কিন্তু তাই বলে যে আমার বোধশক্তিও কমে গেছে এ ধারণা করা তোমার সত্যিই উচিত নয়। আর মনে থাকে যেন আজ থেকে আমি তোমার

সাপ

(D. H. Lawrence.)

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য এম-এ, বি-টি

একদা এক গ্রীষ্মের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে পিপাসার্ত হ'য়ে জল পান করতে গিয়ে দেখ্‌লাম, আমার ঘরের জলাধারে একটা সাপ প্রবেশ করল।

গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অপেক্ষা কর্‌ছি—কখন আমার বিষধর বন্ধুটি বেরিয়ে আস্‌বেন।

জলাধারের নীচে ছিল একটি গর্ত। সেই গর্তে ওর বাস। সেখান থেকে পাত্রটিতে কেমন ক'রে প্রবেশ করতে ও সক্ষম হয়েছে, সে ইতিহাসে আমার প্রয়োজন নেই।

জল পান করছে—দেখ্‌লাম। একটা তৃপ্তির নিশ্বাসে ওর দেহ স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌ল তা-ও দেখ্‌লাম। দেখে আমিও, কেন জানি না, তৃপ্ত হলাম।

আমার জলাধারে ঢুকেছে এক নূতন অতিথি। আমিই আগন্তুকের মত দাঁড়িয়ে আছি অধীর প্রতীক্ষায়।

জল পান করতে করতে সে একবার মাথাটা তুললে:—শূন্য দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালো পানরত গাভী যেমন তাকায়।

দ্বিধা বিভক্ত জিহ্বাটিকে কাঁপিয়ে, মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাব্‌লে, পরে নত হয়ে আবার জল পান করতে লেগে গেল।

আমার মধ্যে আমার সারা জীবনের শিক্ষার ঘোষণা শুনলাম, —"ওকে মারতেই হবে। হিরণ্যবরণ ভুজঙ্গ,—জান না, ও বিষাক্ত। ওকে হত্যা করতে হবে, এখুনি!"

আরও একজন গর্জন ক'রে উঠ্‌ল আমার মধ্যে,—"মানুষ যদি হও, তবে বিলম্ব কোরো না;—এই মুহূর্তে লাঠির আঘাতে ওকে শেষ ক'রে ফেল!"

কিন্তু—

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, খুবই ভাল লাগ্‌ল আমার সাপটিকে। নিঃশব্দে, গোপনে সে এসেছে অতিথির মত আমার ঘরে, আমার পাত্রে জল পান করছে;—চ'লেও যাবে নিঃশব্দে, অথচ তৃপ্ত হ'য়ে—মাটির অন্ধকার গহ্বরে।

অনাহূত অতিথি—সোনার মত তার গায়ের রং, পেলব লতার মত দেহবল্লরী, কি মহিমা, কি গৌরব তার চলনে;—তার দোলনে!

আমি ওকে হত্যা করতে সাহস করি নি,—
তাই কি আমি ভীরু?
ওর সঙ্গে আমি সৌখ্যের আলাপ করতে চেয়েছিলাম,
তাই কি আমি নীচ?
আমি নিজকে সম্মানিত বোধ করেছি ওর আগমনে,
—না, না,—আমি ঐ অতিথির শুভাগমনে পরম-গৌরবান্বিত।
আবার শুনি সেই স্বর—
"ভীরু না হ'লে, তুমি ওকে হত্যা করতে!
—তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ!"

হয়ত আমি ভীরু,
হয়ত আমার মধ্যে আছে নারীসুলভ দৌর্বল্য,—স্বীকার করি। কিন্তু তারও অধিক আজ আমার গর্ব, সম্মান।

আমার ঘরে ধরিত্রীর গুপ্ত মণিকোঠা থেকে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছে এক অনাহূত পাতালবাসী,
—এই আমার গর্ব।

অনেকটা জল পান করলে সে, তুল্‌লে মাথা,—স্বপ্নাতুর চক্ষু, মাতালের মত। জিহ্বা আবার কেঁপে উঠ্‌ল, যেন বিরাট শূন্যে রাত্রি দ্বিধা হ'য়ে গিয়েছে, চারিদিকে তার দৃষ্টি;—শূন্যে কাকে অন্বেষণ করছে, যেন জ্যোতি হীন একটি অভিশপ্ত দেবতা।

ধীরে, অতি ধীরে, মাথাটা ফিরিয়ে নিয়ে তির্যক্ ভঙ্গীতে আমার দেয়ালের ফাটল বেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগল।

দেয়ালের অন্ধকার-গর্ভ ফাটল। তারই মধ্যে যখন সে তার মাথা ঢুকিয়ে দিলে, যখন বিচিত্র ভঙ্গীতে তার শরীরের অর্ধাংশ গর্তে প্রবেশ করল, তখনই শুধু আমার মনে জাগ্‌ল এক বিচিত্র ভীতি।

তার এই ত্বরিত অন্তর্ধানের বিরুদ্ধে মনে বেজে উঠল এক বিচিত্র প্রতিবাদ।
কেন চ'লে যাবে আমার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে?
কেন ফিরে যাবে আবার পাতালের অন্ধকারে?
প্রতিবাদের সুর সত্য কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

চারিদিকে তাকিয়ে গ্লাস রেখে দিলাম। একখানা শুকনো কাঠ নিয়ে জলাধারের দিকে ছুঁড়ে দিলাম সশব্দে।

আঘাত সে পেল না।

যে অংশটা তার বাইরে ছিল, সহসা সেই অংশটা অদ্ভুতভাবে মোচড় খেয়ে বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে ঢুকে গেল।

মুগ্ধ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে, অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম—সেই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে; উপেক্ষিত অতিথি ফিরে গেল অন্ধকার পাতাল-রাজ্যে।

মনে এ'ল অনুতাপ। কত নীচ, কত ঘৃণ্য আমার এই ব্যবহার। নিজকে ক্ষুদ্র মনে হ'ল। ভর্ৎসনা করলাম আমার শিক্ষাকে, প্রতিবাদ জানালাম আমার শিক্ষার গর্জনের বিরুদ্ধে!

হায়! হায়! আবার সে ফিরে আসুক।
অনাহূত, অনাহূত অতিথি!

মনে হ'ল, সে যেন পাতালের একজন নির্বাসিত মুকুটহীন নৃপতি,—আবার মুকুট গ্রহণ করবার যোগ্যতা তার আছে;—সেই আমার দ্বার থেকে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফিরে গেল।

জীবনে একটি রাজসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলাম। এর প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।
—এই নীচতার।

পদ্মা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হে পদ্মা! করিও ক্ষমা তব অবকাশে
পূর্ণ না করিয়া চিত্ত এবার ফিরিনু
শুধু তব নীলাঞ্জন নয়নে লইনু
তব জলে স্নান করি' লভিনু আভাসে
শুধু তব ধ্যানভাষা; অবিচল আশে
নিশ্চিন্ত নির্ভর হ'তে উদ্দেশে বরিনু,
অদ্যাপি নিশ্চিহ্ন-রেখা চর-ভূমি-রেণু
ক্ষমিও বারেক প্রাণ কাঁপে যদি ত্রাসে।
হে পদ্মা, তোমার তটে আজি লভিলাম
দ্বিতীয় উপনয়ন দিবসাবসানে,
হে আমার ভুবর্ল্লোক, শত-গ্রন্থি টানে
বেঁধে রাখে হের মোরে প্রিয় ধরাধাম;
শূন্যে চরে সারাদিন বালু ঝিকিমিকি
রাত্রির আকাশে ফের সে খেলাই দেখি।

দেবতা

(গল্প)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সমস্ত আকাশটাই মেঘে মেঘে একেবারে ছেয়ে আছে। ঐ ও-পাড়ের কোল ঘেঁসে এ-পাড় পর্য্যন্ত দিগন্ত-প্রসারী মেঘের কালো ছায়াটা নদীর বুকটাকে ঢেকে ফেলেছে! ঝুপ্...ঝুপ্...ঝপাং !...ওধারে কোথায় খানিকটা পাড়ের মাটি ভেঙ্গে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।...নদীর জলে জেগে উঠল একটা আলোড়ন !

রঘুনাথের কিন্তু কিছুতেই খেয়াল নেই ! চুপটি করে একাকী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ! এখান হতে চিরজন্মের মতই চলে যেতে হবে ! মাঝে আর মাত্র দুটি দিন ! তারপর? কোথায় সে যাবে ? এই এত বড় বিশাল পৃথিবীতে কে তার আছে?...কেউ নেই ! ওগো কেউ তার নেই ! রঘুনাথের দুই চোখ ফেটে জল আসতে চায় ! নদীর বুক হতে একটা শির শিরে হাওয়া ঝির ঝির করে বয়ে যায়।...

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস রঘুনাথের বুকখানা কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে ! রঘুনাথ ধীরে ধীরে এক সময় পায়ে পায়ে মন্দিরের দিকে ফিরে চলে !

নদীর পাড় হতে শ্যামসুন্দরের মন্দির এখন একপ্রকার লাগালাগি বলতে গেলেই চলে !...নিষ্ঠুর পদ্মা দিনের পর দিন ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সবই প্রায় গ্রাস করে বসে আছে। মন্দির হতে পদ্মা এক রশিও হবে কিনা সন্দেহ।...

সামনেই প্রকান্ড নাট মন্দির !...নাট মন্দিরের পরে প্রশস্ত বাঁধান চত্বর...তারপরই শ্বেতপাথরের ধাপ মন্দিরে গিয়ে উঠেছে ! মন্দিরের দেবতা শ্যামসুন্দর—চৌধুরী বংশের দশ পুরুষ আগে স্থাপিত দেবতা !...আগে এদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল কিন্তু এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই...কীর্ত্তিনাশা একে একে সবই গ্রাস করেছে !...মাত্র মন্দিরটাই এখন অবশিষ্ট !...বর্ত্তমান জমীদার বিনয় চৌধুরী বয়সে তরুণ—কলকাতাতেই থাকেন! মন্দিরের সংলগ্ন একটি অতিথিশালা আছে ও ছোট্ট একটি কাছারী বাড়ী আছে. দুইজন লোকেই সব দেখা শুনা করে—মন্দিরের ভার পুরোহিতের উপর আর অতিথিশালা ও অন্যান্য দেখাশুনার ভার যতীশঙ্কর নামে এক বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর উপর ! আগে আগে দু'দশ মাস অন্তর কখন ক্বচিৎ জমীদারমশাই এসে দেখাশুনা করে যেতেন।...কিন্তু নূতন জমীদার একদিন এপর্য্যন্ত এদিকে আসেন নি!

রঘুনাথ আজ প্রায় দশ বছর এই মন্দিরে পৌরোহিত্য করছে !

সে আজ বহু দিনকার কথা ওর মাত্র বয়স যখন চার বছর সেই সময় হঠাৎ একদিনেই দারুণ বিসূচিকা রোগে দু'ঘণ্টার আড়াআড়ি ওর মা ও বাপ মারা যায়। তখন ওর দাদামশাই ওকে তার কাছে এনে রাখেন ! মা বাপ হারা শিশুকে দাদামশাই বুকে করেই মানুষ করতে লাগলেন ! রঘুনাথকে যে দেখতো সেই না ভালবেসে পারত না, এমনি ছিল ওর মধুর স্বভাব!...একমাথা ভর্ত্তি কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, নিটোল বলিষ্ঠ দেহখানি ! কাঁচা হলুদের মত গায়ের রং !...

সাঁঝের বেলায় শ্যামসুন্দরের আরতির বাজনা যেমনি বেজে উঠত রঘুনাথকে যেন এক অদৃশ্য শক্তি কেবলই মন্দিরের দিকে টানত...মন্দিরের কিছুটা দূরেই ছিল রঘুনাথের বাড়ী। ও ছুটে গিয়ে মন্দিরে হাজির হত! বৃদ্ধ পুরোহিত আরতির শেষে সকলকে শান্তিজল চরণামৃত বিতরণ করতেন...রঘুনাথ পরম ভক্তিভরে চরণামৃত নিয়ে গৃহে ফিরে আসত! দাদু তাঁকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে চাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ রাজী হল না। টোলে সংস্কৃত শিখবার জন্য গিয়ে হাজির হল! খুব অল্পদিনেই কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটাকে রঘুনাথ বেশ আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেললে। দুটো জিনিষ রঘুনাথের খুব বেশী প্রিয় ছিল। এক সংস্কৃত কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও বাঁশী বাজান!......কত রাত্রে ও একা একা মন্দিরের চাতালে বসে আপন মনে বাঁশী বাজিয়েছে! পূজারী ওর বাঁশী শুনতে ভারী ভালবাসতেন, প্রায়ই ডেকে আনতেন; রঘুনাথ বাঁশী বাজাও শুনি! মন্দিরের পাষাণ সিঁড়ির উপরে বসে রঘুনাথ বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে......যে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে সেও যেমনি, যে বাঁশী শুনছে সেও ঠিক তেমনি, দুজনাই সমান বিভোর;......দাদুর ডাকে রঘুনাথের খেয়াল হত; ওরে রাত যে অনেক হল দাদু, বাড়ী কি যাবি নি!......

এমনি করেই রঘুনাথের ষোলটা বছর কেটে গেল! এখন রঘুনাথ একজন বেশ বলিষ্ঠ সুন্দর যুবক!......এমন সময় মন্দিরের পুরোহিত একদিন সহসা চারদিনের জ্বরে মারা গেল! কে এখন মন্দিরের নূতন পুরোহিত হবে?......

জমীদার সংবাদ পেয়ে কলকাতা হতে এলেন!......

অনেক দিন হতেই একটা ক্ষীণ ইচ্ছা মাঝে মাঝে রঘুনাথের মনের আশে-পাশে উঁকিঝুঁকি দিত; এই শ্যামসুন্দরের পূজার ভারটা যদি সে পেত তবে এ জীবনের বাকী কটা দিন বেশ আনন্দেই কেটে যেত!......

একদিন রাত্রে সে তার গোপন ইচ্ছাটা আর মনের মাঝে চেপে রাখতে পারলে না; দাদুর কাছে প্রকাশ করে ফেলল!...

দাদু বললেনঃ বেশত শুনছি জমীদারবাবু দু'একদিনের ভিতরেই আসছেন, তার কাছে একটিবার বলে দেখ!......

রঘুনাথের সুন্দর দেবোপম চেহারা দেখে জমীদার মুগ্ধ হয়ে গেলেন......তিনি সানন্দেই রঘুনাথের প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাকেই মন্দিরের পূজারী বহাল করে কলকাতায় ফিরে গেলেন! রঘুনাথ মন্দিরে এসে পৌরোহিত্য নিল!...

কী আনন্দেই যে তার দিনগুলি কাটত!......ভোরের আলো ভাল করে না ফোটার আগেই রঘুনাথ নদীতে গিয়ে স্নান করে পট্টবস্ত্র পরিধান করে পূজার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মেতে উঠত!......সমস্তটা দুপুর তার পূজো মন্দিরেই কেটে যেত!......তারপর সেই বেলা গড়িয়ে গেলে খাওয়া দাওয়া!.....সন্ধ্যায় শ্যামসুন্দরের আরতি!......মন্দিরে একটি বহুদিনকার

পুরাতন খোঁড়া ভৃত্য ছিল, নাম তার সাধু!......আরতি শেষ হয়ে গেলে কোন কোনদিন একখানি পুঁথি নিয়ে মন্দিরের এক কোণে প্রদীপ জেলে রঘুনাথ অধ্যয়ন করত—আর সাধু অদূরে একটি পাশে চুপটি করে বসে রঘুনাথের উদাত্ত সুললিত কণ্ঠে কাব্য পাঠ শুনত। আবার কোন কোনদিন বা রঘুনাথ বাঁশের বাঁশীটি হাতে নিয়ে চাতালের উপর এসে বসত! রাত্রির স্তব্ধ আঁধারে বাঁশীর সুমধুর সুর দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ত!......সাধুও একটি পাশে চুপটি করে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত!......

একদিন রঘুনাথের দাদু মারা গেল!

রঘুনাথ আরও জোরে দেবতাকে আঁকড়ে ধরে দাদুর শোক ভুলতে চেষ্টা করল!

আজকাল রঘুনাথ পূজায় বসে মন্ত্র ভুলে যেত......কেবল শ্যামসুন্দরের নবঘনজলধর মূর্ত্তি তার দু'চোখের সমস্তটুকু জুড়ে ভেসে উঠ্‌ত!......

গভীর রাত্রে রঘুনাথের ঘুম ভেঙ্গে যায়......বহুদূরে হতে এক অস্পষ্ট বাঁশীর সুর রঘুনাথের দু'কান ভরে বাজে!

রঘুনাথের দু' চোখের কোল জলে ভরে যায়!......রঘুনাথ পায়ে পায়ে মন্দিরের বন্ধ কপাটের গোড়ায় এসে দাঁড়ায়! মন্দিরের কোণে পিলসুজের রৌপ্য প্রদীপের ক্ষীণ অলোর শিখা থির্ থির্ করে কাঁপে!......

এমনি করেই একটির পর একটি দিন যাচ্ছিল, এমন সময়—

সহসা বজ্রের মতই সংবাদ এল......মন্দিরের নূতন পুরোহিত কলকাতা হতে আসছে; নূতন জমিদার বিনয়-বাবু জানিয়েছেন!......রঘুনাথ যেন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়! রঘুনাথের দেবোপম চেহারায় মুগ্ধ জমিদার পরপারের যাত্রী হয়েছেন! নূতন জমিদারের নূতন আদেশ তাই রঘু-নাথের উপর।

চলে যেতে হবে! হ্যাঁ সত্যই চলে যেতে হবে! কিন্তু কোথায়? রঘুনাথের বুকটা কান্নায় ভরে ওঠে!......অশ্রু-সজল চক্ষু দুটি নিয়ে বার বারই ও ফিরে ফিরে শ্যামাসুন্দরের মন্দিরের দিকে তাকায়। শ্যামসুন্দরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে অশ্রুঝরাকণ্ঠে রঘুনাথ বলেঃ ওগো প্রভু! কেন! কেন আমার এ নিদারুণ শাস্তি......এমনি করেই যদি একদিন আমায় তাড়িয়ে দেবে তোমার মনে ছিল তবে, কেন? কেন? এমনি করে সেদিন আমায় তোমার পায়ের তলায় টেনে এনেছিলে!......তাড়িয়ে দিও না! ওগো আমায় তাড়িয়ে দিও না গো!...... তোমায় ছেড়ে যে একটি দিনও আমি কোথাও থাকতে পারব না!......দয়া কর! ওগো দয়া কর!......

কিন্তু হায় পাষাণ দেবতা মানুষের কান্না শুনতে বুঝি সত্যিই পায় না।

যথাসময়ে তরুণ জমিদার বিনয়বাবু ও নূতন পূজারী সদলবলে এসে হাজির হলেন! রাত থেকেই টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নেমেছে, রঘুনাথ গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে পূজার উপকরণ সব গোছাচ্ছিল, এমন সময় জমিদারের খাস-ভৃত্য এসে জানিয়ে গেল, জমিদারবাবু তলব দিয়েছেন; রঘুনাথ বলল......দুপুরের দিকে যাব!......

দ্বিপ্রহরে পূজা সেরে রঘুনাথ মন্দিরের চাবীর গোছা ও শ্যামসুন্দরের গয়নার ফর্দ্দ নিয়ে জমিদারের কাছারী বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল।

বিনয়বাবুর সঙ্গে কলকাতা হতে আরও দু'জন বন্ধু এসেছিল, তিনি তাদের সঙ্গে বসে বসে হাসিগল্প করছিলেন! রঘুনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করল! বিনয়বাবু এর আগে রঘুনাথকে আর কখনও দেখেন নি, তিনি মুখ তুলে চাইলেন।......

আমার নামই রঘুনাথ! মন্দিরের পূজারী!......এই মন্দিরের চাবী ও শ্যামসুন্দরের গয়নার ফর্দ্দটা রইল, আজই সন্ধ্যার আরতির পর আমি চলে যাব! বলে দুহাত তুলে বিনয়বাবুকে একটি ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে রঘুনাথ যেমনি এসেছিল তেমনি ঘর হতে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল!

বিনয়বাবু একটু বিস্মিতই হলেন! তিনি মনে ভেবে-ছিলেন এই ব্যাপার নিয়ে ছোটোখাটো একটা আবেদন ও কান্নাকাটির অভিনয় হবেই......কিন্তু রঘুনাথ যে নিঃশব্দে এমনি করে তার এতদিনকার অধিকার ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, এতটা যেন তিনি ভাবতেই পারেন নি!

অবিনাশ নূতন পুরোহিত তার ছোটবেলার একজন বন্ধু, সে যখন বিনয়বাবুর কাছে এসে তার অভাবের কথা জানিয়ে কেঁদে পড়ল, তখন তিনি আর উপায়ান্তর না দেখে এই মন্দিরের কাজেই তাকে বহাল করবেন ঠিক করলেন এবং সেই দিন তাই তিনি রঘুনাথকে মন্দির হতে সরিয়ে দেবার জন্য চিঠিও দিলেন! ছোটবেলাকার বন্ধুর দুঃখে যখন তিনি বিচলিত হয়ে তাকে মন্দিরের পূজারী করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন তখন তিনি রঘুনাথের কথাটা ভেবে রেখে-ছিলেন—নিশ্চয় সে মূর্খ গোঁয়ার গেঁয়ো ভূত একটা। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে রঘুনাথকে দেখলেন এবং সে একটি কথাও না বলে তার দাবী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, সহসা তাঁর মনের ভিতর যেন কিসের একটা সঙ্কোচ মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল; কাজটা যেন তত ভাল হল না!......

......সন্ধ্যার অল্প পরেই বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হল! সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় পদ্মার জল ফুলে ফেঁপে ফোঁস্ ফোঁস্ করে গর্জ্জাতে সুরু করে দিল!......

......তখন গভীর রাত্রি! দিক্ দিগন্ত মেঘে মেঘে একে-বারে ছেয়ে গেছে! মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুকখানা ফালি ফালি করে কোন এক ক্রুদ্ধ দেবতার সোনালী চাবুক লক্‌লকিয়ে জেগে উঠছে! ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি!...... ছোট্ট একটা পুঁটলীতে খান দুই কাপড় ও বাঁশীটা বেঁধে নিয়ে রঘুনাথ নিঃশব্দে মন্দিরের দুয়ারে এসে দাঁড়াল! মন্দিরের দরজায় এর মধ্যেই নূতন পূজারী তালা লাগিয়ে গেছে! রঘুনাথ সেই বন্ধ-কবাটের গোড়াতেই মাথা নুইয়ে বার বার প্রণাম করতে লাগল! নীরব অশ্রুধারায় মুখ তার ভেসে যাচ্ছিল! ওগো দেবতা! জানিনা কি পাপে এমনি করে এ দুর্য্যোগ রাতে তাড়িয়ে দিচ্ছ প্রভু!......হে ভগবান! যদি না জেনে তোমার চরণে কোন অপরাধ করে থাকি নিজগুণে

ক্ষমা কর প্রভু !......

রঘুনাথ চলে গেল !

মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করে ভিজতে ভিজতে সেই রাত্রেই সে তার চিরপ্রিয় শ্যামসুন্দরের কাছে চিরবিদায় নিয়ে আঁধার রজনীতে মিশে গেল !......

* * * * *

পরের দিন আকাশের অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর !......

সমস্ত কালো আকাশটা ছেয়ে এক অনাগত প্রলয়ের ভয়ঙ্কর অবশ্যম্ভাবী বার্ত্তা সূচিত হচ্ছে ! এক রাত্রেই পদ্মার জল অনেকটা এগিয়েই এসেছে ! তার ক্রুদ্ধ ফেনিল জল-রাশির উন্মত্ত হুঙ্কার গ্রামবাসীর মনে এক নিদারুণ আতঙ্ক সঞ্চার করতে লাগল ! যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড় ! সোঁ সোঁ সে কি গর্জ্জন !......

নায়েব চিন্তিত হয়ে উঠ্‌ল ! তাইত একরাত্রেই পদ্মা যেমন করে ভেঙ্গেছে আর একরাত্রি সময় পেলে সে যে কি করবে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে !......

নায়েবের কথা শুনে জমিদার হেসেই উড়িয়ে দিলেন !

......কিন্তু পরের দিন আকাশ বাতাস ও নদীর অবস্থা দেখে পূর্ব্বদিনকার আস্ফালনটা কেমন যেন ঝিমিয়ে এল !...... পদ্মা চব্বিশ ঘণ্টাতেই মন্দিরের কোলে এসে একেবারে হাজির হয়েছে !

উঃ পদ্মার সে কি ভীষণ রুদ্র মূর্ত্তি......কি ঝড়...... কি বৃষ্টি !......সমস্ত পৃথিবী বুঝি রসাতলে যাবে ! দুপুরের দিকেই মন্দিরের একটা দিক পদ্মাগর্ভে নেমে গেল !......

জমিদার দেখলেন আর উপায় নাই !......সব যাবে নিঃশেষে সলিল গর্ভে !......

শ্যামসুন্দরের গায়ে বহু টাকার গহনা ছিল, জমিদার ছুটে গিয়ে শ্যামসুন্দরের গা হতে সমস্ত গয়না খুলে নিয়ে, নিরাভরণ শ্যামসুন্দরকে একাকী মন্দিরে ফেলে, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে গ্রাম ছেড়ে পালালেন !......

আর সেই রাত্রেই ঝড় জলে এক ক্রোশ পথ হেঁটে রঘুনাথ আপাতত টোলের অধ্যাপক মশায়ের গৃহে গিয়ে আশ্রয় নিলে !

......গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে তার মনে হল কে যেন আর্ত্তস্বরে কেবলই ডাকছে, রঘুনাথ ! রঘুনাথ !...ফিরে আয় ওরে ফিরে আয় !......চেয়ে দেখ দরজার ওধারে যেন তার শ্যামসুন্দর এসে দাঁড়িয়েছে ! কিন্তু একি তার গায়ের গহনা সব গেল কোথায়......? কোথায় তার সোনার শিখিচূড়া? কোথায় তার কঙ্কন কেয়ূরা? রাঙা পায়ের সোনার নূপুর কে খুলে নিলে?......ঠাকুর ! ঠাকুর !... ...এমনি করে কে তোমায় নিরাভরণ করলে?

রঘুনাথ ! চীৎকার উঠ্‌ল ! আবার সে দেখলে...মন্দিরের মধ্যে এক গলা জল তার মধ্যে যেন তার শ্যামসুন্দর দাঁড়িয়ে ছোট্ট ছোট্ট দুটি বাহু বাড়িয়ে দিয়ে বলছে...রঘুনাথ ! আমি যে ডুবে গেলাম !...রঘুনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেল !...তখনও তার মনে হচ্ছে বহু দূরে হতে কেবলই কে যেন তাকে ডাকছে আর ডাকছে—রঘুনাথ ! রঘুনাথ !

সেই রাত্রেই ঝড় জল মাথায় করে রঘুনাথ পাগলের মত মন্দিরের দিকে ছুটে চলল !...অবিশ্রাম ঝড় জল বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে কতবার সে আছাড় খেল, হাত-পা, কেটে রক্ত ঝরতে লাগল !...রঘুনাথের তবু এতটুকু খেয়াল নেই, ছুট্‌ছে ত ছুট্‌ছেই !......

বৃষ্টিটা অনেকটা যেন ধরে এসেছে !...সারাটা রাস্তাই প্রায় একদমে পাগলের মত ছুট্‌তে ছুট্‌তে রঘুনাথ মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়াল !...কিন্তু একি সমস্ত চত্বরটা জলে ভেসে গেছে !...শুধু মন্দিরটা তখনও জলের বুকে জেগে আছে ! মন্দিরের সিঁড়ির গায়ে পদ্মার উন্মত্ত জলরাশি ক্রুদ্ধ আক্রোশে আছড়ে আছড়ে পড়ছে !...মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়া হাহা-কারে ছুটে যাচ্ছে !...

রঘুনাথ জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে মন্দিরের উপর এসে দাঁড়াল !...মন্দিরের দরজাটা হা হা করছে খোলা !......মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ায় ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ করে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে !......মন্দিরের ভিতরেও জল ঢুকেছে ; পায়ের পাতা ডুবে যায় !...রঘুনাথ ছুটে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল ! ঠাকুর ! শ্যামসুন্দর আমি এসেছি ! দুহাতে পাগলের মতই রঘুনাথ পাষাণ দেবতাকে বুকের মাঝে আঁকড়িয়ে ধরল ! অবিরল অশ্রুধারায় তার দু' চোখের কোল ভেসে যেতে লাগল !...

দশ পুরুষ অতীতের স্থাপিত দেবতা শ্যামসুন্দরকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে রঘুনাথ বাইরে এসে দাঁড়াল !

বৃষ্টি তখন একেবারেই থেমে গেছে !...

এলোমেলো মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা ভাঙ্গা চাঁদও উঁকি দিচ্ছে !...

কিন্তু এখন সমস্যা এই পাথরের ভারী দেবতাকে বুকে নিয়ে কেমন করে রঘুনাথ সাঁতরে ডাঙ্গায় যাবে?......

* * * * *

পরের দিন গ্রামের লোক দেখলে মন্দিরের শেষ ধাপটি পর্য্যন্ত পদ্মার জল উঠেছে !...এবং সেই আধো-জাগা সিঁড়ির উপরে রঘুনাথ শ্যামসুন্দরকে বুকের মাঝে সাপ্‌টে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ! আর পদ্মার ঢেউগুলি এসে ছল ছলাৎ শব্দে তার দুপায়ের পাতার পরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে !......দুর্য্যোগ আর এতটুকু অবশিষ্ট নেই,......সমস্ত আকাশটাই নবোদিত সূর্য্যের আলোয় ঝলমল্ করছে !......

উদ্ভিদের রোগ (২)

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রোয়া ধান গাছের রোগঃ—বাঙলাদেশের প্রায় অধিকাংশ জেলায় বিশেষ উত্তরবঙ্গে একপ্রকার রোগ রোয়া ধানের গাছে হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় সবুজ পাতার রঙ ফিকা হইয়া ক্রমে হলুদে রঙ হইয়া যায়। গাছের পাতা হইতে রোগ ক্রমশ ডাঁটা দিয়া শিকড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তখন সমুদয় গাছটি পচিয়া যায়। এই রোগের আক্রমণ হইলে বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে হলুদে দেখায় এবং রোগ যত সংক্রামিত হইতে থাকে ক্ষেত্রের সবুজ শোভা ততই অন্তর্হিত হইয়া হলুদে বর্ণ ধারণ করে।

ধানের রোগঃ—ধানে একপ্রকার ছত্রক রোগ আক্রমণ করে। ঐ রোগ ধান গাছ আক্রমণ করে না। অনেক সময় বহু ধান কালো রং-এর দেখায়, সেগুলিতে একটু চাপ দিলে সহজে ভাঙিয়া যায় এবং একপ্রকার কালো গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। ঐ কালো গুঁড়া ছত্রকের অসংখ্য স্পোর্ বা জীবাণু। এই রোগ ধানে যে কোন সময়ে লাগিতে পারে। মাঠে যখন ধানের শীষ পরিপুষ্ট হয়, তখন উহার আক্রমণ হইতে পারে, অথবা গোলায় সঞ্চিত শস্যের মধ্যেও বিস্তারলাভ করিতে পারে। সাধারণত ক্ষেত্রে যখন ধানের শীষ পরিপুষ্ট হয় সেই সময় শীষের ধানে ঐ রোগ আক্রমণ করে, ক্রমে সমুদয় শীষের ধান্যে পরিব্যাপ্ত হয়। তখন ঐ শীষটি কালো দেখায়। ছত্রকে যখন স্পোর্ বা জীবাণু জন্মে তখন উহা কালো দেখায়, কারণ ঐ স্পোর্গুলি কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণের স্পোরে ধানটি সম্পূর্ণ ভরিয়া যায়। তাহার পর বাতাসে উড়িয়া ঐ স্পোর্ ক্ষেত্রের অন্যান্য ধানের শীষে ছড়াইয়া পড়ে এবং সুস্থ শীষের ধান আক্রমণ করে। ধান মাড়াই করিবার সময় অসংখ্য সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম স্পোর্ ধানের গায়ে লাগিয়া যায়। ঐ সকল ভাল ধানের সহিত মিশ্রিত হইয়া গোলায় চলিয়া যায়। ক্রমে গোলার সমুদয় ধান ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অশেষ ক্ষতি করে।

পাট গাছের রোগঃ—ধানের পর পাট বাঙলার প্রধান এবং বিশিষ্ট অর্থকরী ফসল। পাট গাছ যে সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার মধ্যে শিকড় পচা রোগ বাঙলাদেশে প্রধান। গ্রীষ্মকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। এই রোগের জীবাণু প্রথমে পাট গাছের শিকড় আক্রমণ করে। ক্রমে শিকড় হইতে উপরের দিকে অর্থাৎ কাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। কাণ্ডে রোগের বিস্তার হইলে কাণ্ডের গায়ে স্থানে স্থানে সবুজ বর্ণের আবরণ পড়ে। ঐ আবরণগুলির মধ্যে স্পোর্ জন্মে এবং পাট গাছে যে তন্তু হয় সেই তন্তু নষ্ট করিয়া দেয়। শিকড়ে আক্রমণ অধিক হইলে শিকড় পচিয়া যায় এবং গাছটি শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে পাটের ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে পাট গাছ শুকাইয়া মরিয়া যাইতে দেখিলে ঐরূপ একটি শুষ্ক গাছের মূল উৎপাটন করিয়া পরীক্ষা করিলে যদি দেখা যায় যে ঐ মূল পচিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শিকড় পচা রোগ লাগিয়াছে। ঐ রোগের জীবাণু মাটির মধ্যে বহুকাল অবধি জীবিত থাকে।

আখ গাছের রোগঃ—বাঙলাদেশে যে সব রোগে আখ গাছ আক্রান্ত হয় তাহার মধ্যে দুইটি রোগ প্রধান। এই দুইটির মধ্যে একটি পূর্ববঙ্গে ধ্বসা রোগ নামে পরিচিত। এক জাতীয় ছত্রক আখের ভিতরের অংশ আক্রমণ করিয়া ভিতরেই বর্ধিত হয়, বাহিরে প্রকাশ পায় না। রোগের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র ডগার পাতা শুকাইয়া যায়। ডগার পাতা শুকাইলে আখে ধ্বসা রোগ লাগিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই রোগ হইলে ভিতরের অংশে লাল লম্বা লম্বা দাগ দেখা দেয় এবং মধ্যস্থল ফাঁপা এবং রসশূন্য হইয়া যায়। ফাঁপা স্থান সাদা সুতার মত সূক্ষ্ম স্পোরে ভরিয়া যায়। এইরূপ রোগাক্রান্ত আখের রস শুকাইয়া যায়, চিবাইলে লবণাক্ত ও বিস্বাদ লাগে।

দ্বিতীয় প্রকার রোগের আক্রমণ হইলে গাছের শীর্ষ হইতে একটি সরু লম্বা ডাঁটা বাহির হয়। ডাঁটাটি যখন প্রথম বহির্গত হয় তখন উহা একটি সাদা মসৃণ আবরণে ঢাকা থাকে। স্পোর্ পুষ্ট হইলে ঐ বহিরাবরণ ফাটিয়া যায় এবং অসংখ্য কালো রং-এর ধূলিবৎ জীবাণু চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এই রোগের আক্রমণ হইলে আখের রস শুকাইয়া যায়।

তামাক গাছের রোগঃ—তামাক গাছে ত বহুপ্রকার রোগের আক্রমণ হইতে দেখা যায়। কোন রোগ পাতায় ও ডাঁটায় লাগে আবার কোন রোগ শিকড় আক্রমণ করে। কয়েকটি রোগের আক্রমণে গাছ মরিয়া যায়—আবার কতকগুলি রোগের আক্রমণ হইলে গাছ মরে না বটে; কিন্তু তামাক পাতার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সাধারণত শিকড়ে যে সকল রোগ লাগে সেইগুলি গাছের পক্ষে মারাত্মক।

একপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া বা জীবাণু তামাক গাছের শিকড় আক্রমণ করে। হাপর বা বীজতলায় চারা গাছ অথবা মাঠে বড় গাছে এই রোগের আক্রমণ হয়। এই রোগ লাগিলে শিকড় নষ্ট হইয়া যায় এবং তামাক গাছ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়।

এক জাতীয় ছত্রক প্রথমে গাছের ভূমি সংলগ্ন অংশ আক্রমণ করে। পরে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। যে অংশে এই ছত্রক আক্রমণ করে সেই অংশ পচিয়া যায়। গাছের আক্রান্ত অংশের রং প্রথমে ফিকা দেখায় এবং ঐ স্থান আর্দ্র হইয়া উঠে। রোগের প্রথম অবস্থায় গাছের কতকগুলি পাতা নিস্তেজ হইয়া ঢলিয়া পড়ে। রোগ বৃদ্ধি পাইলে গাছটি মরিয়া যায়। এই রোগ ক্ষেতের সুস্থ গাছগুলির মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

আলুর রোগঃ—ভারতবর্ষের পার্বত্য অঞ্চলের যে সকল স্থানে আলুর বিস্তৃত আবাদ হয়, সেই সকল স্থানে একপ্রকার রোগে আলুর চাষের বিস্তর ক্ষতি হয়। সম্প্রতি এদেশের সমতল ভূমিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিশেষ উত্তর বঙ্গে আলু চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। এই রোগের জীবাণু প্রথমে আলু গাছের পাতা আক্রমণ করে। তখন পাতায় ছোট ছোট দাগ পড়ে। ক্রমে ঐ দাগগুলি বাড়িয়া পাতা হইতে ডাঁটা এবং তথা হইতে মাটির ভিতরকার আলুতে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় গাছটি কালো হইয়া পচিয়া যায়। বাতাসে অধিক জলীয় বাষ্প হইলে, বিশেষ আকাশ অধিকদিন মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে এবং জমি হইতে ভালরূপে জল নিকাশ না হইলে ঐ রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

আর একপ্রকার রোগ শীতের শেষে এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আলু গাছে দেখা দেয়। রোগের প্রথম অবস্থায় গাছের উপরের পাতায় ঈষৎ কালো রং-এর ছোট ছোট কতকগুলি দাগ দেখা যায়। ক্রমে ঐ দাগগুলি বড় হয় এবং গাছের পাতা শুকাইয়া কালো হইয়া যায়। এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আলু ছোট হইয়া যায় এবং আলুর ভিতরের শ্বেত অংশ কমিয়া যায় এবং আলুর ভিতর কালো কালো দাগ ধরে।

বেগুন গাছের রোগঃ—এক জাতীয় ছত্রক রোগের আক্রমণে বেগুন গাছ মরিয়া যায়। এই রোগের জীবাণু প্রথমে ঠিক মাটির উপর বেগুন গাছের কাণ্ড আক্রমণ করে। প্রথমে আক্রান্ত স্থান ফোস্কার মত দেখায়, ক্রমে ঐ স্থান শুকাইয়া সরু হইয়া যায়, পরে গাছটি নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়।

লঙ্কা গাছের রোগঃ—লঙ্কা গাছে কয়েকপ্রকার রোগ হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে নিম্ন বর্ণিত রোগগুলি এদেশে প্রধান।

শীতের প্রারম্ভে যখন লঙ্কা গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে সেই সময় এক প্রকার রোগ প্রথমে লঙ্কা গাছের ফুল আক্রমণ করে। আক্রান্ত ফুলগুলি নিস্তেজ হইয়া শুকাইয়া যায় অথবা ঝরিয়া পড়ে। দ্বিতীয় অবস্থায় ফুলের বোঁটা হইতে রোগ ডাঁটায় সঞ্চারিত

(শেষাংশ ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কস্‌বা ঢাকুরিয়ায় প্লাবন সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়

বহু বৎসর যাবৎ কলিকাতার উপকণ্ঠে টালীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে কস্‌বা, ঢাকুরিয়া, হালতু প্রভৃতি কয়েকখানি জলমগ্ন গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের দুরবস্থার করুণ ইতিহাস আজ সারা বাঙলার জনসাধারণ জানিতে পারিয়াছে, এমনকি সারা ভারতেও ইহা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও সকলে জানিতে পারে নাই যে, এ স্থান এইভাবে দুই-চার বৎসর নয়, প্রায় ১৭।১৮ বৎসর ধরিয়া নিমজ্জিত রহিয়াছে। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই উহা জলমগ্ন থাকে। শীতের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত জল সামান্য শুকাইয়া যায় এবং দূরে সরিয়া গিয়া মাঠ পর্য্যন্ত নামিয়া যায় ও পুনরায় বর্ষায় প্লাবিত হইয়া সমস্ত জনপদকে ভাসাইয়া দুর্দ্দশার চরম করিয়া ছাড়ে। বোসপুকুর নামে একখানি গ্রাম প্রায় ১৬ বৎসর ট্যাক্স বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রতি বৎসরই এই একই অবস্থা ঘটে। পথঘাট ত জলে ডুবিয়া যায়ই—লোকের গৃহাভ্যন্তর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয়। যে জনপদ একদিন স্বাস্থ্য ও সম্পদে শীর্ষস্থানীয় ছিল—তাহা আজ ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রায় ২০,০০০ লোকের সেখানে বসবাস—তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিবার কেহ নাই—গৃহহীন আর্ত্তের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিবে কে? যাঁহাদের উপর এখানকার সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত তাঁহারা নির্ব্বিকার—কে তাহাদের নিষ্কৃতি দিবে তাহারা তাহা জানে না। অসহায়তার মূর্ত্তি পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট। এই চিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন—তাঁহারা কখনও ভুলিতে পারিবেন না—কি হৃদয় বিদারক সে দৃশ্য।

শুধু যে জলের অত্যাচার তাহা নহে—দুর্গতি বাড়িয়াছে ময়লা জলের দুর্গন্ধে ও কচুরিপানার আতিশয্যে। যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ, সাল্‌তি ছাড়া গত্যন্তর নাই—অসহায় শিশু ও স্ত্রীলোকেরা গৃহে আবদ্ধ—মাঠের পর মাঠ যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, কেবল জলরাশি আর কচুরিপানা—মধ্যে মধ্যে দুই একখানি অট্টালিকা বিদ্রুপেরচ্ছলে দাঁড়াইয়া আছে। ময়লা জল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ নরককুণ্ডের মধ্যে বসবাস করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন—তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এখানকার অবস্থা কখনও এইরূপ ছিল না, তবে কেন এইরূপ হইল এবং ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে? এই অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী (১) বাঙলা গবর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ। (২) টালীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ঔদাসীন্য। (৩) কতকগুলি স্বার্থান্বেষী ভেড়ীওয়ালার চক্রান্ত। যদিও সমস্যার বিশ্লেষণ আরম্ভ করিলে দেখা যায় যে, এখানকার যে সমস্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল তাহার প্রায় সমস্তই বিদ্যাধরী নদীর দ্বারা নিষ্কাশিত হইত কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের ময়লা জলের প্রকোপে সেই বিদ্যাধরীর খাত একপ্রকার মজিয়া যাইতে বসিয়াছে। তথাপি এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, বাঙলা গবর্ণমেণ্টের সেচবিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দের গাফিলতি ও উদাসীনতার ফলে এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী ভেড়ীওয়ালার স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই প্রকার দারুণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা যদি পঞ্চান্নগ্রামের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত তাকাভি (Takavi) নামে যে বিরাট বাঁধটি লবণ হ্রদের জলকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এ অঞ্চলকে বিপন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে সেটিকে সুদৃঢ় ও কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখিতেন তাহা হইলে তাহার সুবিস্তীর্ণ জলরাশি কখনও এ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া এরূপভাবে ভাসাইতে পারিত না ও প্রায় কুড়ি বর্গমাইল-ব্যাপী জনপদের অধিবাসীবৃন্দকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে সক্ষম হইত না। এই বাঁধকে সুদৃঢ় করা ও লবণ হ্রদের জলকে অবিকৃত অবস্থায় রাখারও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা মাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য নহে—সমগ্র কলিকাতার স্বাস্থ্যের পক্ষেও নিতান্ত আবশ্যক। এই লবণ জলা এতদঞ্চলের স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম সম্পদ। কিন্তু এই পরম সম্পদই হইয়াছে আমাদের যত অনিষ্টের মূল। ভেড়ীর পর ভেড়ী এই হ্রদের চারিদিকে বিদ্যমান—মালিকেরাও কেহ কেহ ধনকুবের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কলিকাতার মত এত বড় একটি শহর নিকটবর্ত্তী থাকায়, তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর মৎস্যের আমদানী করিয়া প্রভূত লাভবান হন। তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পঞ্চান্নগ্রামের জল নিকাশের পথে অসঙ্গত উপায়ে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বিদ্যাধরী ও টালিস নালার (Tolly's Nullah) দিকে প্রবাহিত যে সকল "গই" পথ (স্বাভাবিক খাল) ছিল, সেগুলিকে একেবারে অকেজো করিয়া দিয়াছেন। এইভাবে বিদ্যাধরী ও টালিস নালার স্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাসের গতি মন্দীভূত হওয়ায় ইহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

সেচ-বিভাগের দৃষ্টি বহুদিন হইতে এই বিষয়ে আকৃষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অচল ও অটল। কিন্তু তাঁহারা যদি গনিয়াগাছি, সামুকপোতা, কাওরাপুকুর, আড়াপাঁচ প্রভৃতি জায়গার স্লুইসগেটগুলিকেও খুলিয়া রাখিতেন, তাহা হইলেও এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না—কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। এ মত শুধু আমাদের নয়, তদনীন্তন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি সি রায় মহাশয় তাঁহার ২২শে নবেম্বর, ১৯৩৬ সালে কসবা পিপলস্ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীকে লিখিত ৬৩৮৬নং পত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, "যদি এই স্লুইসগেটগুলি রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই উপ... হইবে, কিন্তু যদি টালিস নালার খাদ মজিয়া যায় তাহা হইলে এইগুলির দ্বারা স্থায়ীভাবে উপকারের আশা করা যাইতে পারে না।"

এই নিদারুণ অবিচার ও শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ১৯৩৭ সালে তদানীন্তন ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্টার কস্‌বা ঢাকুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বাঁচাইবার জন্য একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পঁচাত্তর হাজার টাকার কর্জ্জও মঞ্জুর হয়। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায়, এই বাঁধটি হইলে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রভূত উপকৃত হইত, এ প্রকার প্লাবন সমস্যা থাকিত না—এমন কি টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব স্থায়ী কোন পয়ঃপ্রণালী না থাকায় তাহারও অভাব পূরণ করিয়া দিত।

কিন্তু আজ প্রায় দুই বৎসর বিগত প্রায় এ বিষয়ে কোনও সাড়া শব্দ নাই; যাঁহার উপর এই ভার ন্যস্ত সেই টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ একেবারে উদাসীন। গবর্ণমেণ্ট মনোনীত অপর এক রায় সাহেব মহাশয় এই প্রকার ঔদাসীনতা ও গাফিলতীর জন্য কমিশনারের পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—কিন্তু ইহাতেও যে অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এরূপ কোনও প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এমন কি বাঁধ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য বর্ত্তমান ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট অজ্ঞাত। শোনা যাইতেছে, দুই-একজন ভেড়ীওয়ালা এই বাঁধ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং যেরূপ অবস্থার গতিক অনুমান হয়, তাহাতে—এ পরিকল্পনাও সমাধিস্থ হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই! অথচ প্রতীকার খুবই সম্ভব এবং অত্যন্ত অল্প ব্যয়সাধ্য যদি এই সমস্ত তুচ্ছ বাধা ও আপত্তি অপসারণ করিয়া এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ক্ষমতার প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের পক্ষে (১) জল নিকাশের ছোট ছোট পথগুলির মুখ হইতে বাধা অপসারিত করা (২) রেল লাইনের মধ্যে দুই একটি কালভার্ট (Culvert) বন্ধ করিয়া দেওয়া—(৩) বাঁধের পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করা এবং (৪) টালীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকে কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত সহযোগিতা করিয়া টালিস নালার ছাঁটাইকে আরও অগ্রগামী করার প্রস্তাব মঞ্জুর করাইয়া লওয়া (Vide Cal Corporation proceeding, dated 8-10-39) বিশেষ দুরূহ ব্যাপার প্রতীয়মান হয় না।

চলতি ভারত

দিল্লী

মুসলমান কি স্বাধীনতার বিরোধী?—

মৌলানা নুরুদ্দিন বিহারী নিখিল ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের আহ্বান করেছেন একটি সম্মেলনে মিলিত হবার জন্য। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার জন্য মৌলানা সাহেব একটা বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে আছে, "কংগ্রেসকে সাধারণের সমক্ষে ঘোষণা করতে হবে, ভারতবর্ষে দুটো মাত্র দল আছে। একটা দল হ'চ্ছে তাদের নিয়ে যাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা এবং যারা স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, আর একটা দল হচ্ছে তাদের যারা স্বাধীনতার বিরোধী এবং স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সব সময়ে ব্যস্ত। কংগ্রেসকে আরও ঘোষণা করতে হবে, ভারতের ভাবী রাষ্ট্ররূপের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না—কারণ স্বাধীন ভারতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকবে অক্ষুণ্ণ। নূতন রাষ্ট্ররূপের ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক—এই কথা ঘোষণা ক'রে দিলে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে একথাও যদি ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্ররূপ রচনায় কেবল তাদেরই অধিকার থাকবে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সিপাই, তবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকেরা আমাদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার কোনো সুযোগ পাবে না।

সৌভাগ্যবশত এইরকম মত কেবল আমার একার নয়। আমার বিশ্বাস, স্বাধীনচেতা মুসলমানগণের অধিকাংশই এই ভাবের ভাবুক। আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি—কোনো স্বাধীনচেতা মুসলমানই সংখ্যালঘিষ্ঠগণের, বিশেষত মুস্‌লিম সংখ্যালঘিষ্ঠদের সহিত আপোষের পক্ষপাতী নয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ভুলের পুনরাবৃত্তি ক'রে লাভ নেই। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যেন স্মরণ রাখেন—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুমতি দিয়েছে কেবল গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য—কোনো সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নয়।"

মৌলানা সাহেব মুসলমানগণকে অনুরোধ করেছেন, দিল্লীর সম্মেলনে সমবেত হ'য়ে জগতসমক্ষে একটা ঘোষণা করবার জন্য যে, ইসলামের সঙ্গে গোলামির চির বিরোধ আর মুসলমানগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য কৃতসংকল্প। হিন্দুরা যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের সাহায্য না করে তবুও মুসলমানগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী থাকবে।

আমরা আশা করি, মৌলানা সাহেবের এই নির্ভীক উক্তি বিফল হবে না—হাজার হাজার মুসলমান ভাই দিল্লীতে সমবেত হয়ে জগতসমক্ষে প্রচার করবেন—কংগ্রেস কেবল হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নয়, মুসলমানেরও এবং স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে হিন্দু যেমন প্রস্তুত, তেমনি মুসলমানও।

যুক্তপ্রদেশ

শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ এবং ভারতের বৈশিষ্ট্য—

শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ কানপুরের ছাত্র-সমাজের কাছে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, অতীতে যে গ্রীস এবং রোম তাদের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে বিশ্বের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিলো—তাদের মহিমা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু ভারতবর্ষ আজও বেঁচে আছে কেমন ক'রে? তার কারণ, ভারতবর্ষ বাহিরের ঐশ্বর্য্যকে কখনো বড়ো ক'রে দেখেনি—আত্মার যে সম্পদ—সেই সম্পদই ভারতবর্ষের কাছ থেকে মূল্য পেয়ে এসেছে। শ্রীযুক্ত রাধাকিষণের মতে বর্ত্তমান সভ্যতার যে দীপ্তি আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে তা উজ্জ্বল হ'লেও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। রাজনীতির এবং অর্থনীতির মূল্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতা তাদের যতখানি মূল্য দিচ্ছে ততখানি মূল্য তাদের পাওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি আজও যে অক্ষুণ্ণ আছে তার কারণ সে আত্মার কল্যাণকে কখনো অবহেলা করেনি—আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে আজও সে আঁকড়ে ধ'রে আছে। শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ ছাত্রদের অনুরোধ করেন নিজেদের মন দিয়ে ভাবতে এবং একটা আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করতে। তিনি বলেন, অপর জাতির অনুকরণ না ক'রে নিজেদের আলোয় চলতে। সমাজকে নূতন ভিত্তির উপরে গ'ড়ে তুলবার জন্য ছাত্রদের কাছে তিনি তাঁর আবেদন জানান।

বোম্বাই

ঝড় আসন্ন—

বোম্বাইয়ের কংগ্রেস ভবনে পতাকা-অভিবাদন উৎসবে সর্দ্দার প্যাটেল যে বক্তৃতা করেছেন তার মধ্যে আছে ঝটিকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্যাটেল বলেছেন, 'অতীতে কংগ্রেসকর্ম্মীরা যে দুঃখ এবং যে ত্যাগ বরণ করেছেন তার পরিমাণ একেবারেই সামান্য নয়—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আমাদের তৈরী থাকতে হবে বিপুলতর দুঃখকে বরণ করবার জন্য। দুঃখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার আহ্বান আসতে পারে যে কোনো মুহূর্ত্তে আর সেই সময় যাতে সে আহ্বানে অতীতের মতোই সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে সাড়া দিতে পারেন তার জন্য এখন থেকেই আপনারা প্রস্তুত হোন।' শ্রীযুক্ত বল্লভভায়ের বক্তৃতার সুরের সঙ্গে সীমান্ত গান্ধীর সুরের ষোলো আনা মিল আছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে যে ইস্তাহার প্রেরণ করেছেন তার মধ্যেও রয়েছে সংগ্রামের আভাস। সেখানে বলা হয়েছে, "যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের কি কি দাবী, গঠনমূলক কর্ম্ম তালিকার প্রয়োজন, গণসংসদের আদর্শ—এ সবের কথা সারা দেশের কাছে প্রচার করতে হবে। এ সব আইন অমান্যের ভিতরে পড়ে না কিন্তু যে লড়াই আসছে তাতে জয়ী হ'তে গেলে এগুলো চাই উদ্যোগ পর্ব্বের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে। সৈনিক যে তাকে সব সময়েই তৈরী থাকতে হবে।" এখানেও শুনতে পাচ্ছি, ঈশান কোণের পুঞ্জীভূত মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন। যাঁরা ভেবেছেন, গাছের পাকা ফলের মতো স্বাধীনতা অকস্মাৎ একদিন হাতে এসে টুপ ক'রে পড়বে—তাকে পাওয়ার জন্য উপযুক্ত মূল্য দেবার দরকার নেই—তাঁদের স্বপ্নালু মনের কল্পনার বিলাস কাব্য সৃষ্টির উপাদান সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার পথে ঘোর অন্তরায়। ইতিহাস কখনো আপনি তৈরী হয় না—মানুষের দুর্জ্জয় সংকল্পকে আশ্রয় ক'রে ইতিহাসে বারম্বার এসেছে যুগান্তর। যেখানে সেই সংকল্পের অভাব, ত্যাগের দৈন্য—সেখানে দুঃখের রাত্রি চিরন্তন এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল শাশ্বত হ'য়ে থাকে। আমরা স্বাধীন হবো অথবা চির পদানত থাকবো—তা নির্ভর করে আমাদেরই ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার উপরে।

পঞ্চনদ

শিখধর্ম্ম এবং মার্ক্সবাদ—

শ্রীযুক্ত বলবন্ত সিং 'ট্রিবিউন' কাগজে গুরু নানক এবং শিখধর্ম্মের উপরে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে ভাববার খোরাক আছে যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন, বাস্তব জগতে মার্ক্সের যে স্থান

(শেষাংশ ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

• দেশের কথা—ভারতের পণ্য—

কফি (COFFEE)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

আজ কফি গাছের আদি কথা অনুসন্ধান করিতে গেলে বিফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আবিসিনিয়া বা আরব, সুদান, মোজাম্বিক, নিউগিনি, এই সকল দেশের সহিত কফি গাছের উৎপত্তি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে আবিসিনিয়াকে এই সম্মানের স্থান দিতেই তাঁহারা ইচ্ছুক। অপর-পক্ষ বলেন আরব হইতেই আবিসিনিয়ায় নীত হইয়া সেখানকার জল-হাওয়ার গুণে স্বীয় নাম প্রচারের সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। অপর দেশগুলি সম্বন্ধে এরূপ মতামত তত প্রবল নহে।

কফি পানের সূত্রপাত

মিসর ও আরবের নানাস্থানে কফি ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান কালে পানের রীতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা তখন জানা ছিল না। কেহ কেহ বলেন সেঁকা বা ভাজা কফি চূর্ণের ক্বাথ পান করা এদেশে সুরু হয়; পরে ঐ স্থান হইতে মক্কা, মদিনা, কায়রো, কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

ভারতে আগমন

১৬৭৬ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে কফি আসিয়া পেঁৗছে নাই, অন্ততঃ বিশেষ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ১৬৯০ সাল পর্যন্ত জগতের সমস্ত কফিই আরব ও আবিসিনিয়া হইতে সরবরাহ হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাবা বুদন নামে কোনও ফকির মক্কা হইতে ফিরিবার পথে ভারতবর্ষে প্রথম কফির দানা লইয়া আসে এবং মহীশূরের কাদুর জেলায় ঐ বীজ রোপণ করেন, ইহাই কিম্বদন্তী। ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে নিয়মিত কফির আবাদ হয় নাই এবং চিকমুগলুরে ক্যানন (Mr. Cannon) সাহেবের আবাদই হিসাব মত প্রথম বলা চলে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে অন্যান্য আবাদ গড়িয়া উঠে এবং ১৮৪৬ সালে নীলগিরিতে বহু আবাদ স্থাপিত হয়।

পরের ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মহীশূর, কুর্গ, নীলগিরি ও সেভারয় পাহাড় (সালেম), ওয়াইনাদ (মলবার জেলা) ও ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচুর কফির আবাদ সৃষ্টি হয়। ১৮৬২ সালে দক্ষিণ ভারতে কফি আবাদের চূড়ান্ত প্রসারলাভ ঘটে। ১৮৬৫ সালে গাছের কাণ্ড ছিদ্রকারী কীট ওয়াইনাদ ও কুর্গে আসিয়া দেখা দেয় এবং তাহার পরই পাতার পোকা আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৮৭৭ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল স্থানের বহু আবাদ পরিত্যক্ত হয়। তাহা হইলেও অন্য স্থানের আবাদগুলি ভারতে উৎপন্ন কফির পরিমাণ বহুলাংশে বজায় রাখে।

এই স্থানে সিংহলের কফি আবাদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যখন ভারতে কফির আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং রপ্তানির সম্ভাবনা, তখন সিংহলে দ্রুত কফির আবাদ প্রবর্ত্তিত হয়। হিসাবমত ভারতবর্ষ হইতে কফির বীজ স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই আরবেরা সিংহলে কফির বীজ লইয়া আসে। পরে ওলন্দাজদিগের অধিকারকালে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে নূতন করিয়া আধুনিক প্রথা অনুযায়ী আবাদের পত্তন হয়।

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে চা আবাদ বিশেষ প্রসারলাভ করে এবং বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। অবস্থার গতিকে সিংহল আসিয়া এখানে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়া যায়। ১৮৬৯ সালে সিংহলের কফির আবাদে গাছের প্রবল রোগ দেখা দেয়। ১৮৭৪ সাল নাগাদ কফি আবাদের ভীষণ ক্ষতি করে এবং ১৮৮৭ সালে কফি আবাদ একেবারে উৎসন্ন বা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তখন সিংহল চা আবাদ করিতে উৎসাহসহকারে লাগিয়া যায় এবং বর্ত্তমানে উহাই এখন জাভার সহিত মিলিয়া ভারতীয় বাণিজ্যের বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চাষ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে কফি গাছকে নানাভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আরব্য (Arabian) এবং লাইবিরীয় (Liberian) এই দুইটি প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গাছগুলি বহু পরিমাণে অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে, কিন্তু লাইবিরীয় জাতিতে সেচের প্রয়োজন অত্যধিক বেশী।

কফির চারা আতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অন্য বৃহত্তর বৃক্ষের ছায়ার প্রয়োজন আছে। সুতরাং কফির আবাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় অন্য গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়। বীজতলার জন্য জমি গভীরভাবে খুঁড়িয়া ফেলা দরকার। চারার জন্য খুব ভাল বীজ রোপণ করিতে হয়; কাহারও কাহারও মতে মূলবৃক্ষ হইতে খুব পাকা ফল তুলিয়া আনিয়া কয়েক দিনের মধ্যে বীজতলায় রোপণ করিলে চারা ভাল হয়।

চারা অন্ততঃ এক বৎসরের হইলে তুলিয়া লইয়া কোনও মেঘলা বা বর্ষণোন্মুখ দিনে স্থায়ী আবাদে রোপণ করে। প্রতি চারা হইতে অপর প্রত্যেকটি চারা সকল দিক হইতে অন্ততঃ সাত আট ফুট পৃথক করিতে হয়। গাছ বেশী ঘেঁস হইলে আবাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। চারাগুলি বসাইবার জন্য গভীর গর্ত্ত করে পরে তাহার মধ্যে শিকড়সমেত গাছ বসাইয়া দেয়। গাছের সারের মধ্যে সেচের জল দিবার ব্যবস্থা করা দরকার; তাহা না হইলে শীঘ্র গাছের গোড়া শুকাইয়া উঠিলে আবাদের ক্ষতি হয়। এই সময় নানাপ্রকারে জমিতে সার দিয়া উর্ব্বর করিয়া লয়; কাহারও বা জমিতে কোনও প্রকার বৃক্ষাদি বসাইয়া বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া জমিতে স্থিতিবান্ করিতে চেষ্টা করে। গাছগুলি দুই তিন বৎসরের হইলে তাহার শীর্ষভাগ ছাঁটিয়া দেওয়া (Topping) প্রয়োজন; ঐ ছিন্নস্থান হইতে আবার ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া উপর দিকে উঠিতে থাকে। এইভাবে আন্দাজ দুই ফুট উঠিলে আবার ডগা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; কখনও কখনও বৃক্ষটি কমবেশ চার হাত লম্বা হওয়া পর্য্যন্ত আরও একবার ভাঙ্গিয়া দেয়; এবং গাছের শীর্ষভাগে একটি টেবিল বা গাইটের মত হইয়া যায়। উহারই নীচের শাখাগুলি রৌদ্র ও আলোকের সহায়তা পাইয়া বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং উহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল ধরে। সময় সময় ফলের ভারে গাছের অগ্রভাগ চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং নীচের দিকে ঐ কাটা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় সমস্ত গাছটিকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

গাছগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার এবং বিশেষ ফলদায়ক করিবার জন্য অপ্রয়োজনীয় সমস্ত ডালপালা কাটিয়া দেয় (handling) আবার পুরাতন শাখা প্রভৃতি দূর করিয়া নূতন ফল দিবার উপযুক্ত প্রশাখাগুলির বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেয় (pruning)। এইভাবে গাছ ছাঁটিয়া দিবার কাজ ফুল আসিবার পূর্ব্বেই শেষ করিতে হয়। বলা বাহুল্য কফি গাছের pruning বা ছাঁটাই চা গাছের ছাঁটাই হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় ডালপালাগুলি দ্বিতীয়বার ছাঁটাই দেওয়া হয়। যাহাতে বৃক্ষত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

কফি প্রস্তুত প্রণালী

কফি ফলের প্রতি অংশের এক একটি নাম আছে এবং

ব্যবহারের যোগ্য কফি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইলে, ঐ অংশগুলি স্বতন্ত্র করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

সুপক্ক কফি ফলকে "চেরী" (Chery) এবং তন্মধ্যস্থিত দুইটি বীজকে "বেরী" (Berries) বলে। যদি দুইটির পরিবর্ত্তে একটি মাত্র ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে "পি-বেরী" (Pea berry) বলে। বীজ বা দানার উপরের নরম শাঁসযুক্ত আবরণীকে "পাল্প" (Pulp) এবং অন্তর্ভাগের বা শাঁসের নিম্নভাগের দৃঢ়সংযুক্ত ছদ বা ছালের নাম "পার্চ্চমেণ্ট" (Pearchment). পার্চ্চমেণ্টের মধ্যে বীজের গাত্রে সংযুক্ত আবরণী "সিলভার স্কিন" (Silver skin) নামে পরিচিত। নরম শাঁস বা Pulp প্রায়ই আবাদে (plantation) দূর করে, কিন্তু পার্চ্চমেণ্ট বীজের উপর থাকিয়া যায়। সাধারণত এই পার্চ্চমেণ্ট আচ্ছাদিত কফি বীজ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

মার্চ্চ মাসে গাছে ফুল দেখা যায় এবং অক্টোবর মাস নাগাদ ফল পাকিতে আরম্ভ করে এবং জানুয়ারী পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। ভারতবর্ষে গাছ হইতে হাতে করিয়া ফল তুলিয়া আনে। আরবে বৃক্ষ-নিম্নে মাটি হইতে উপরে কাপড় পাতিয়া ধরে এবং গাছ নাড়া দিয়া ঐ কাপড়ে ফল সংগ্রহ করে। মাটিতে ঝরিয়া পড়া ফলকে "Jackal Coffee" (শৃগাল কফি) বলে।

ব্যবহারোপযোগী কফি প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে যন্ত্র সাহায্যে বীজের উপরের শাঁসগুলি দূর করে। কোথাও বা পরিমাণ অল্প হইলে, জলে ভিজাইয়া গাজাইয়া লয় এবং আঘাত দ্বারা বীজ হইতে পৃথক করে। পরে বীজগুলি খুব ভাল করিয়া জলে ধুইয়া সমস্ত আঠাল অংশ দূর করে এবং ভাল করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেয়।

তাহার পর "পার্চ্চমেণ্ট" ও "সিলভার স্কিন" বা বীজগাত্রের পাতলা আবরণীগুলি দূর করিবার পালা (hulling). তাহার পর মাপ হিসাবে সমস্ত বীজগুলি বিশেষভাবে পৃথক করিয়া সেঁকিয়া ফেলে। যদি ক্ষুদ্রাকারের বীজ থাকায়, সেগুলি পুড়িয়া কয়লার মত হয়, তাহা হইলে সঙ্গের সমস্ত কফির গুণ নষ্ট করে। পোড়া, কটু গন্ধ সমস্ত কফিতে গিয়া তাহার দাম হ্রাস করিয়া ফেলে।

এখন খুব যত্ন সহকারে, পাত্রের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলে। বাক্সের কাঠে যদি কোনও গন্ধ থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কফিতে ঐ গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং এই আধার নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

ক্রমশ

চলতি ভারত

১১০ পৃষ্ঠার পর

ধর্ম্মজগতে নানকের সেই স্থান। মার্ক্স প্রচার করেছেন সাম্যের এবং ঐক্যের বাণী ধনী আর দরিদ্র ব'লে দুটো পৃথক পৃথক শ্রেণী থাকা উচিত নয়—পৃথিবীতে পত্তন করতে হবে একটা নয়া সমাজের আর এই নয়া সমাজ হবে শ্রেণীহীন সমাজ—দরিদ্র্যের অভিশাপ এবং ঐশ্বর্য্যের অত্যাচার থেকে মুক্ত অভিনব আদর্শ সমাজ। গুরু নানকও যে বাণী বিতরণ ক'রে গেছেন তারও মর্ম্ম হচ্ছে ঐক্য আর সাম্য। জাতির গণ্ডী ভেঙে, সম্প্রদায়ের গণ্ডী ভেঙে তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে সবাইকে মিলিয়ে দিতে। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়গত যে গভীর ঐক্য—সেই ঐক্যের মহামন্ত্র উৎসারিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে। নানক ধর্ম্মরাজ্যের কার্ল মার্ক্স। মার্ক্স ধর্ম্মজগতের সাম্যের মহামন্ত্র, শ্রেণীহীন সমাজের রূপকে যখন তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন, তখন কেউ তাঁকে বিশ্বাস করেনি পাগল ব'লে সবাই তাঁকে উপহাস করেছিল। নানকও যখন এসে প্রচার করলেন মুক্তির বাণী—অজ্ঞতা থেকে মুক্তি, কুসংস্কার থেকে মুক্তি, আচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি—তখনও তিনি সমাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন শুধু বিদ্রূপ আর অবহেলা। কালক্রমে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হোলেন লেনিন আর তাঁর দুর্জ্জয় কর্ম্মশক্তিকে অবলম্বন ক'রে মার্ক্সের মতবাদ থিয়োরির ছায়ালোক পরিত্যাগ ক'রে বাস্তবে কায়া পরিগ্রহ করলো। নানকের চিত্তে সমস্ত মানুষকে প্রেমের সূত্রে গাঁথবার যে স্বপ্ন বাসা নিয়েছিলো সেই স্বপ্নও একদা বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলো কর্ম্মবীর গুরু গোবিন্দের সাধনাকে আশ্রয় ক'রে। স্বপ্ন দিয়ে যায় একজন তাকে রূপ দেয় আর একজন। বঙ্কিম দিলেন ভাবী ভারতের স্বপ্ন তাকে রূপ দিচ্ছেন গান্ধী। রুসো আর ভলটেয়ার দিলেন স্বপ্ন, ড্যান্টন আর ম্যারাট আর রোবেসপীয়ার দিলেন তাকে রূপ। ঋষির জ্ঞান আর কবির স্বপ্ন কর্ম্মবীরের সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে ইতিহাসে আনে যুগান্তর। রামকৃষ্ণ দেয় স্বপ্ন বিবেকানন্দ করে তাকে সফল। বুদ্ধ দেয় বাণী—অশোকের কর্ম্মশক্তি সেই বাণীকে দেয় রূপ।

মাদ্রাজ

কোপণ-স্বভাব ছেলেমেয়ে—

শ্রীমতী রত্নাবাই একগুঁয়ে ছেলেদের স্বভাবে কেমন ক'রে পরিবর্ত্তন আনা যায়—সে সম্পর্কে 'হিন্দু' কাগজে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। অনেক বাড়ীতে ছেলেরা অন্যায় রকমের প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। একবার যদি সে কোনো বায়না ধরলো তবে তাকে থামানো মুস্কিল। কেঁদে, হাত-পা ছুড়ে, চেঁচিয়ে, জিনিষপত্র ভেঙে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড আরম্ভ ক'রে দেয়। বাপ-মা ছেলের হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাবার জন্য যা সে চায় তাকে দিয়ে দেন। এর পরিণাম ছেলের পক্ষে বিষময়। সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ ক'রে দেয়, জীবনে যা কিছু সে চাইবে—তা সে পাবেই। বড়ো হ'য়ে সে মনে করে, সুখ-সুবিধার উপরে তার দাবী অন্যের চেয়ে অনেক বেশী। যা সে দাবী করে কিছুতেই তা পরিত্যাগ করে না। ফলে সে হ'য়ে যায় ঘোর স্বার্থপর এবং অন্যের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়। শ্রীযুক্তা রত্নাবাই বলছেন, ছেলেবেলা থেকেই মানুষকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, কান্নাকাটি করলেই কামনার বস্তু পাওয়া যাবে না। পরিবারের সকলের অসুবিধা ক'রে নিজের সুবিধা চাইলে সে চাওয়া কখনো তৃপ্ত করা হবে না। অবশ্য ক্রুদ্ধ ছেলেকে তারস্বরে ভর্ৎসনা বা প্রহার করা ঠিক নয়। কেন তার অন্যায় আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করা উচিত নয় সে কথা কোমল স্বরে তাকে বুঝিয়ে বলা দরকার। তাতেও যদি সুফল না হয় ছেলের দাবীকে উপেক্ষা করতে হবে। ঔদাসীন্য ছেলেকে তার দাবীর অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতন করবে।

আজ-কাল

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

বর্ত্তমান ভারতীয় পরিস্থিতি এবং কংগ্রেসের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি ২৩শে নবেম্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে' ছিল। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আগের অবস্থার কিছুই পরিবর্ত্তন হ'ল না। গণ আন্দোলনের পথে যে কংগ্রেস নেতৃদল এখন যাবেন না এ কথা আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম। তাঁদের প্রস্তাব বিশ্লেষণ করলে এই আন্দোলন এড়াবার চেষ্টাটাই ধরা পড়ে।

প্রস্তাবে পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তিতে বলা হয়েছে যে ভারতের স্বাধীনতা এবং গণ-পরিষদের দ্বারা ভারতীয়দের শাসনতন্ত্র নিরূপণের অধিকার বৃটেন স্বীকার না করলে তার সাম্রাজ্যবাদী রূপ যায় না এবং কংগ্রেসও সহযোগিতা করতে পারে না; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ঘোষণা অসন্তোষজনক হওয়ায় কংগ্রেস বৃটিশ নীতি ও যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দরজা বন্ধ করে দিলেও কংগ্রেসী নেতারা 'সত্যাগ্রহী' হিসেবে সম্মানজনক আপোষের জন্যে আরও চেষ্টা করবেন।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভের জন্যে কংগ্রেসীকর্ম্মীরা প্রস্তুত জেনে আনন্দ প্রকাশ করার পরই ওয়ার্কিং কমিটি বলেছেন যে, অহিংস সৈন্য বাহিনীর ঠিকমত প্রস্তুতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক হচ্ছে সুতা কাটা, খাদি প্রচার, সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা এবং হরিজন-প্রীতি সঞ্চার। অতএব এখন সকলে ঐ কাজগুলো করতে থাকুন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিজে এবং "ফরোয়ার্ড ব্লক"এর কার্যকরী সমিতি তাঁর ভাষায় ওয়ার্কিং কমিটির আপোষ-লোভী মনোবৃত্তি এবং গণ-আন্দোলন এড়িয়ে যাবার চেষ্টাকে নিন্দে করেছেন। গত ২৫শে নবেম্বর কলকাতায় ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কিষাণ সভা, "ন্যাশনাল ফ্রণ্ট" দল ও অন্যান্য বামপন্থী দল আমন্ত্রিত হয়ে এই বৈঠকে উপস্থিত হন। ২৬শে ও ২৭শে তারিখে এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের অভিমতের প্রতিবাদ করতে মুসলমানদের বলা হয়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানের মুসলমানদের এবং মজলিস-ই-অহ্‌রারের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়, বাঙলা ও পাঞ্জাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলোপের এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কৃষক দমনের প্রতিবাদ করা হয়, দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন চালাবার পরিকল্পনা করা হয়, ভারতীয় খালাসীদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার চাওয়া হয় এবং পাটকল মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি দাবী করা হয়।

প্রতিষ্ঠানগত কর্ত্তৃত্ব

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগত কতকগুলি ব্যাপারেও ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মধ্যপ্রদেশের পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের নামে অভিযোগ করার জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা না চাওয়ায় শ্রীকেদার, জাকতদার ও সুবেদারের বিরুদ্ধে শাস্তি-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে। ৯ই জুলাই-এর ঘটনা সম্পর্কে দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিম্নলিখিত ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটি হস্তক্ষেপ করেছেনঃ—(১) ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের সদস্য মনোনয়ন; (২) টাকার বিলি-ব্যবস্থা ও হিসাব-নিকাশ; (৩) নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতির আচরণ। এই সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ উপেক্ষা করার জন্য শাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির এই সকল কার্য্যকলাপকে অন্যায় ও প্রতিশোধমূলক বলে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানান হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা

কংগ্রেসের কাজে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় পাঞ্জাব ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু গত ২৫শে নবেম্বর লাহোরে যাবার পথে তাঁকে পাঞ্জাবে ঢুকতে বারণ করে' এক সরকারী আদেশ দেওয়া হয়। এই নিয়ে চৌধুরী কৃষ্ণগোপাল দত্ত পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে এক মুলতুবী প্রস্তাব তোলেন। স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ তার উত্তরে যা বলেন তার মর্ম্ম এই যে, মানবেন্দ্রনাথের মত একজন সাংঘাতিক লোককে আসতে দিলে পাঞ্জাবে একটা ভীষণ কাণ্ড বেধে যেতে পারে, সুতরাং অসুখ হবার আগেই তিনি প্রতিষেধের ব্যবস্থা করেছেন।

বক্তৃতাদি সম্পর্কে নানা জায়গায় ধর-পাকড় চলছে। যাঁদের ধরা হচ্ছে তাঁরা প্রায় সকলেই বামপন্থী কর্ম্মী। খানাতল্লাসীও কোথাও কোথাও হচ্ছে।

সিন্ধুর অভিজ্ঞতা

মঞ্জিলগড়ের ব্যাপার নিয়ে সিন্ধুতে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে, প্রচুর ধন-প্রাণ হানিতে তার সমাপ্তি ঘটেছে। হিন্দুদের উপরই চোট গেছে বেশী। শহর থেকে দাঙ্গা গ্রামে ছড়িয়েছিল, হিন্দুরা যেখানে সংখ্যায় অল্প। তার উপর বাইরে থেকে বেলুচি দল এসে খুন-জখম ও লুঠতরাজ সুরু করে। তাদের হাতে বহু লোকের প্রাণ গেছে। সিন্ধুর মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকলদাস ভাজিরাণী ২৫শে নবেম্বর তারিখে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, প্রায় ১০০ লোক এই দাঙ্গায় মারা গেছে এবং হিন্দুদের যে অবস্থা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। তিনি বলেন যে, সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ফলেই এই কাণ্ড ঘটেছে। যাক, সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট ব্যাপক সামরিক ও পুলিশ ব্যবস্থা করায় রক্তপাতের এখন অবসান হয়েছে।

গত ২৫শে নবেম্বর নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কলকাতা শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রী বেগম শরীফা হামিদ আলী তাঁর অভিভাষণে পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনমণ্ডলীকেই দেশের প্রধান অনিষ্টের মূল বলে বর্ণনা করেন। যারা আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা আওড়ায় তাদের তিনি তীব্র নিন্দা করেন।

ইউরোপের আবর্ত্ত

জল-যুদ্ধের গতি

জার্ম্মান চুম্বক মাইনের আঘাতে ইংলণ্ডের উপকূলের কাছে জাহাজ ডুবি সমানভাবে চলেছে। গত ৭ দিনে নিম্নলিখিত বৃটিশ

জাহাজগর্লির জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে—ম্যাষ্টিফ, সী-স্ইপার, টমাস হ্যাঙ্কিন্স, আর্লিংটন কোর্ট, ডেলফিন, জিপসী (ডেষ্ট্রয়ার), জেরাল্ডাস, ডারিনো, স্লবি, আর্গোনাইট, ম্যাঙ্গালোর, লোল্যান্ড, রাওলপিন্ডি, পিলস্ড্স্কি (জাহাজটি পোলিশ, বৃটেন ভাড়া করেছিল), রয়ষ্টন গ্রেঞ্জ, উইলিয়াম হাম্ফ্রিজ, হ্রকউড। এ ছাড়া বৃটিশ ক্রুজার "বেলফাষ্ট" ও বাণিজ্য জাহাজ "সাসেক্স" জখম হয়েছে। ফ্রান্সের ২টা জাহাজ ডুবেছে। নিরপেক্ষ দেশের মধ্যে জাপানের ১টা, ইটালীর ১টা, গ্রীসের ১টা, হল্যান্ডের ২টা এবং স্ইডেনের ১টা জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে।

এর মধ্যে কয়েকটা জাহাজ সাবমেরিনের আক্রমণে ঘায়েল হয়েছে।

জার্ম্মানীর এই রকম মাইন আক্রমণের প্রতিশোধে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মান রপ্তানি মাঝ দরিয়ায় আটক করবার সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ দেশগ্রলি নিজেদের বাণিজ্যের ক্ষতি হবে আশঙ্কা করে এই ইঙ্গ-ফরাসী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

জার্ম্মানী তার নতুন মারণাস্ত্র চুম্বক মাইন শ্ধ্ সমুদ্রেই পাত্ছে না, সী-প্লেনে করে নিয়ে এসে টেম্স নদীর মোহনাতেও ছেড়ে যাচ্ছে। ২৬শে তারিখে মিঃ চেম্বারলেন এক বেতার বক্তৃতায় বলেছেন যে, তাঁরা চুম্বক মাইনের প্রকৃতি ব্ঝতে পেরেছেন, এখন শীগ্গীরই তাকে আয়ত্তে আন্তে পারবেন বলে আশা করেন। তিনি এই সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, নতুন ইউরোপ প্রতিষ্ঠাই তাঁদের যুদ্ধের লক্ষ্য। ইউরোপের বাইরের পরাধীন দেশগ্রলি (তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম) সম্বন্ধে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

পশ্চিম সীমান্তে গত সপ্তাহে কিছ্ব বিমান সংঘর্ষ হয়ে গেছে। মিত্রশক্তি অনেকগর্লি জার্ম্মান বিমান ঘায়েল করেছে বলে' দাবী কর্ছে। তবে জার্ম্মানীর আক্রমণের লক্ষ্য এখন ইংলন্ড। জাহাজ-ডুবি এবং গত সপ্তাহে শেটল্যান্ড দ্বীপ ও টেম্স-এর মোহনায় জার্ম্মান বিমানের হানা তার পরিচয়।

ভেন্লোর রহস্য

কিছ্বদিন আগে জার্ম্মান সীমান্তের কাছে হল্যান্ডের ভেন্লো বলে' একটা জায়গায় কয়েকজন জার্ম্মান এক হাঙ্গামা বাধিয়ে চারজন লোককে হরণ করে' নিয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে দ্ইজন ইংরেজ। জার্ম্মানরা বলছিল, ইংরেজরা গ্প্তচর, মিউনিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাদের যোগ আছে। এ সম্পর্কে গত সপ্তাহে খ্ব রহস্যজনক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ২৪শে নবেম্বর এক আধা-সরকারী বিবৃতিতে ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, ঐ দ্'জন ইংরেজ (মিঃ বেষ্ট ও মিঃ ষ্টিভেন্স) তাঁদের কাছে সরকারী পরিচয়-পত্র দেখিয়ে বলেছিল যে, জার্ম্মানদের সঙ্গে শান্তি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাবার অন্মতি তাঁদের আছে। ভেন্লো ঘটনার আগে তাঁরা আর একবার সেখানে গিয়ে জার্ম্মানদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে-ছিলেন; ঐ ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিনও তাঁরা ঐ উদ্দেশ্যে সেখানে যান। বৃটিশ মহল বল্ছে, জার্ম্মানরাই শান্তির প্রস্তাব করেছিল, ইংরেজ দ্'জন সেই প্রস্তাব শ্ধ্ নিয়ে এসেছিলেন এবং আরও প্রস্তাব আন্বার জন্যে যাচ্ছিলেন। জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ শান্তি প্রস্তাবের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। মিঃ ষ্টিভেন্স হল্যান্ডে বৃটিশ দৌত্যবিভাগের ছাড়পত্র নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা ছিলেন।

মোট কথা, ব্যাপারটা বাইরে থেকে কিছ্ব বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্ট বল্ছেন, বসন্তকালের মধ্যে শান্তি হতে পারে বলে তিনি আশা করেন। জলযুদ্ধ দেখে সে আশা আমরা কি করে' করি?

সোভিয়েট-ফিনিশ সংঘাত

সোভিয়েট-ফিনিশ মনোমালিন্য আবার কঠিন হয়ে উঠেছে। ২৭শে তারিখে এক সংবাদ আসে যে, ফিনিশ-সোভিয়েট সীমান্তে ফিনিশদের গোলার আঘাতে চারজন সোভিয়েট সৈনিক নিহত হয়েছে ও নয়জন আহত হয়েছে। মঃ মলোটোভ ফিনিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন এবং কারেলিয়া যোজকে অবস্থিত ফিনিশ সৈন্যদের সীমান্ত থেকে ১২ মাইল হটিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। ফিনিশ কর্ত্তৃপক্ষ বল্ছেন, তাঁদের দিক থেকে গোলা ছোড়া হয় নি।

এই ঘটনার আগেই সোভিয়েট কাগজে ফিনিশ কর্ত্তৃপক্ষকে ভীষণ গালি-গালাজ করা হচ্ছিল। ফিনিশ উপসাগরে সোভিয়েটের ঘাঁটি দাবীতে ফিন গবর্ণমেণ্টের অসম্মতি সম্পর্কে "প্রাভ্দা" লিখেছিলেন, "ফিনল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে এক ভাঁড় বসে আছে। পোলিশ ভাঁড় বেক এবং মোসিকি, যারা চিরকালের মত তাদের কর্ত্তৃত্ব হারিয়েছে, তাদের এখন কেমন বোধ হচ্ছে সে কথা এই লোকটা জেনে নিক। আমরা আশা করি, ফিনিশ জনসাধারণ মঃ কাজাণ্ডারের মত এক সাক্ষীগোপালকে বেক ও মোসিকির পথে ফিনল্যান্ডকে পরিচালনা কর্তে দেবে না।"

একটা সংঘর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যাবে বলে মনে হয়।

২৭-১১-৩৯

ওয়াকিব্হাল

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা ও এমেচার ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতা

তরুণ সঙ্ঘের (হাওড়া) উদ্যোগে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল স্ত্রী পুরুষ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। ২৫শে ডিসেম্বরের (১৯৩৯) মধ্যে রচনাদি-সহ নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ফটোগ্রাফার প্রতিযোগিতার বিচারক থাকিবেন। ১লা জানুয়ারী (১৯৪০) প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প, প্রবন্ধ ও ফটো কোন বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ হইবে।

১। ছোট গল্প, (এক পৃষ্ঠায়, ১২ পৃষ্ঠার অনধিক)—পুরস্কার ১ম রৌপ্য কাপ; ২য় রৌপ্য পদক; ৩য় 'বনফুলের আরও গল্প'।

২। বনফুল প্রতিভা বা সত্যেন্দ্র প্রতিভা—পুরস্কার ১ম রৌপ্য কাপ; ২য় রৌপ্য পদক; ৩য় বিদ্রোহী—নজরুল ইসলাম।

৩। এমেচার ফটোগ্রাফী—পুরস্কার ১ম রৌপ্য কাপ; ২য় কোডাক ক্যামেরা; ৩য় রৌপ্য পদক; ৪র্থ ফটো শিক্ষা।

এস মল্লিক,
৫, কোমেদানবাগান লেন, কলিকাতা।

প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা

মানশ্রী তরুণ সঙ্ঘ পরিচালিত হস্তলিখিত "তরুণ" পত্রিকার উন্নতিকল্পে শ্রীমান গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান বরেণকুমার পাত্রের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। কোন প্রবেশ মূল্য নাই; কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই; প্রত্যেক বিভাগে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীকে "তরুণ" নামাঙ্কিত রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহাতে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী নূতন লেখক-লেখিকা সকলেই যোগ দিতে পারেন। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ পাঠাবার শেষ তারিখ।

ঠিকানাঃ—"সম্পাদক তরুণ" শ্রীমহাদেব ধারী; গ্রাঃ মানশ্রী, পোঃ চিত্রসেনপুর, হাওড়া।

গল্প, চিত্র ও কবিতা প্রতিযোগিতা

বহিরগাছি "কিশোর-কার্য্যালয়" হইতে গল্প, চিত্র ও কবিতা প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রত্যেক লেখক-লেখিকার গল্প ও কবিতা এবং প্রত্যেক চিত্র-শিল্পীর চিত্র সাদরে গৃহীত হইবে। যাঁহাদের গল্প, চিত্র ও কবিতা বিচারকের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাদের রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। গল্প, চিত্র ও কবিতা যে কোন বিষয়ের হইলেই চলিবে। কোন প্রবেশ মূল্য নাই। সময় ২৫শে মাঘ ১৩৪৬ সাল পর্য্যন্ত। যাঁহারা ছবি পাঠাইবেন তাঁহারা যেন 'এক্সার্সাইজ' বুকের মাপে আঁকেন।

পাঠাইবার ঠিকানাঃ—শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, "কিশোর-কার্য্যালয়"; বহিরগাছি, নদীয়া।

মহিলাদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

হ্যানিমান গার্লস স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বর মাসে যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীমতী কল্যাণী মুখার্জ্জী প্রথম স্থান এবং শ্রীমতী রেখা ব্যানার্জ্জী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া জ্ঞানেন্দ্র স্মৃতি পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

বর্ত্তমানে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ আর একটি নূতন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ঘোষণা করিতেছেন।

বিষয়ঃ—আধুনিক পরিচ্ছদে মহিলাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় কি?

প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য কোনও প্রবেশ মূল্য দিতে হইবে না। ফুলস্কেপ্ সাইজের কাগজে তিন পৃষ্ঠার মধ্যে কালীতে লিখিয়া নাম, ঠিকানা সহ ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রথম পুরস্কার—পঙ্কজিনী স্মৃতি পদক; দ্বিতীয় পুরস্কার—মহেন্দ্রলাল স্মৃতি পদক। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধদ্বয় সংবাদপত্রে ও হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্রিকাসমূহে কর্ত্তৃপক্ষের প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিবে। ডাঃ চন্দ্রনাথ, ডাঃ হৃষীকেশ হালদার, শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী, ডাঃ মিসেস্ কমলা নন্দী ও কুমারী মঞ্জু গোস্বামী বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বিচারক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানাঃ—পি ৫৭ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সেক্রেটারী, হ্যানিমান গার্লস স্কুল।

কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল

যশোহর জেলার "মাইজপাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতি" কর্ত্তৃক ঘোষিত কবিতা প্রতিযোগিতায় বর্দ্ধমান জেলার আদ্রাহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাশ বি-এ মহাশয়ের "প্রতিদান" শীর্ষক কবিতা প্রথম হওয়ায় তিনি পদক লাভের অধিকারী হইয়াছেন। C. P.র Jhagurkhand Collieryর শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত "ঝড়ের রাতে" এবং বেনারস সিটির গায়ত্রী দেবী লিখিত "অভিসারিকা"ও সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সহঃ সম্পাদক, মাইজপাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতি, মধ্যপল্লী পোঃ, (যশোহর)।

চন্দননগর গোন্দলপাড়া সম্মেলন

"দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'গোন্দলপাড়া সম্মেলন' কর্ত্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) আবৃত্তি—(ক) "বন্দীর বেদনা" (সর্ব্বসাধারণের), ১ম—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (ন্যাশানাল ক্লাব), ২য়—কুমারী সন্ধ্যা চ্যাটার্জ্জী (চন্দননগর মহিলা সমিতি)। (খ) "বুদ্ধিমান ছেলে" (ছোটদের), ১ম—কুমারী মিনতি মুখার্জ্জী (কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির), ২য়—কুমারী প্রতিমা ব্যানার্জ্জী (সুলেখা মাতৃ মন্দির), ৩য়—কুমারী নীরা মুখার্জ্জী (সুলেখা মাতৃ মন্দির), বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত—শ্রীসুবোধ ব্যানার্জ্জী (শ্রমিক বিদ্যালয়)। (২) প্রবন্ধ—"চন্দননগরের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও ছাত্র ও যুবকদের কর্ত্তব্য।" ১ম—শ্রীদীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় (গোন্দলপাড়া), ২য়—শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় (ন্যাশানাল ক্লাব)। (৩) সূচীশিল্প—১ম—কুমারী মঞ্জুলা মিত্র (কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির); ২য়—কুমারী আরতী ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির) ৩য়—কুমারী গৌরী চ্যাটার্জ্জী (গোন্দলপাড়া)। সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে কমরেড রেবতী বর্ম্মনের সভাপতিত্বে সমস্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হইয়া গিয়াছে।"

—তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, গোন্দলপাড়া সম্মেলন (অম্বিকা স্মৃতি মন্দির)।

উদ্ভিদের রোগ

(১০৮ পৃষ্ঠার পর)

হয়, ক্রমে গাছের সকল অংশে ছড়াইয়া পড়ে। গাছের ডাঁটায় রোগ প্রকাশ পাইলে ডাঁটার রং বাদামী হইয়া যায়। ডালগুলি আক্রান্ত হইলে শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ডাঁটায় রোগ লাগিলে উহা শীঘ্র উপর এবং নীচের দিকে বিস্তৃত হয় এবং গাছটি শীঘ্র শুকাইয়া মরিয়া যায়। রোগের বিস্তার ফলেও হয়। তাহাতে লঙ্কা পচিয়া যায়। এই রোগে এদেশে লঙ্কা গাছের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয়।

লঙ্কা গাছে ফুল ফুটিবার সময়—আর একপ্রকার ছত্রক রোগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণ হইলে ফুলগুলি কালো হইয়া পড়িয়া যায়। গাছের ডগাও পচিয়া যায় এবং তাহাতে একপ্রকার সাদা ছাতা ফুটিয়া উঠে।

আর একপ্রকার রোগের আক্রমণ হইতে দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণ হইলে ডগার পাতাগুলি ক্ষুদ্র ও কুঞ্চিত হইয়া গাছের বৃদ্ধি হ্রাস করিয়া দেয়। এই রোগ মারাত্মক নয়, তবে ইহাতে গাছের তেজ কমিয়া যাওয়ায় ফলন কমিয়া যায়। এই রোগের উৎপত্তি এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া বা জীবাণু হইতে হয়।

গাছের রোগ চেনা কঠিন নয়। গাছে রোগ দেখা দিলে পূর্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া রোগ অনুযায়ী প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলে রোগ দমন করা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ক্ষতি হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে।

প্যারাডাইসে "আদমী" বা "মানুষ"

প্রভাত পিক্‌চারের হিন্দী ছবি "আদমী" বা "মানুষ" আগামী ২রা ডিসেম্বর হইতে প্যারাডাইস চিত্রগৃহে দেখান হইবে। ছবিখানির পরিচালনা করিয়াছেন, শ্রীভি শান্তারাম এবং ইহার বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন, শ্রীসাধু মোদক, রাম মারাঠা, শ্রীমতী শান্তা হুবলিকার, সুন্দরা বাঈ প্রভৃতি।

ছবিখানির আখ্যানবস্তু নিম্নলিখিত-রূপঃ—এক পুলিশ কনষ্টেবল ঘটনাচক্রে এক পরানুগ্রহজীবিকা নর্ত্তকীর সংস্পর্শে আসে এবং তাহার জীবনযাত্রার সহিত অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়াইয়া পড়ে। নর্ত্তকীর চরিত্র সাধারণ বারবনিতার চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ছিল। সমাজের দশজনের পাশে একটু স্থান করিয়া লইয়া সদ্ভাবে জীবনাতিবাহিত করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে নিয়তই পীড়া দিত। পুলিশ কনষ্টেবল মতি ক্লেদপঙ্কিল আবহাওয়া ও আবেষ্টনী হইতে নর্ত্তকীকে উদ্ধার করিল; কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে তাহাকে বিবাহ করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। একমাত্র সন্তানের চরিত্রবল ও রুচিতে আস্থাবতী মায়ের অনুমতি লাভ করিয়া মতি পরে নর্ত্তকীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে রাজী হইল; কিন্তু নর্ত্তকীর বিবেক ইহাতে সায় দিল না, তাহার পূর্ব্বপাপ কলুষিত মন তাহাকে বলিয়া দিল দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় পবিত্র ও নিষ্কলুষ সংসারের সে অনুপযুক্ত। তাই সে মতির নিকট হইতে নিজেকে সরাইয়া লইল। মতি ইহাতে নিদারুণ শোকাহত হইয়া আত্মহত্যা করিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর হইল। শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে সে নিরস্ত হইল, কারণ সে বুঝিতে পারিল প্রেমের চেয়ে জীবন সত্য, প্রেমেই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ বা সার্থকতা নহে, তাই প্রেমের জন্য আত্মবিনাশ মহাপাপ। সে আরও বুঝিল যে, জীবনের সার্থকতা কর্ত্তব্য সম্পাদনে।

কালী ফিল্মসের 'চাণক্য' ছবিতে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। চিত্রখানি শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

প্রেমই মানব জীবনের সবখানি নহে, ইহার চেয়ে আরও মহত্তর উদ্দেশ্যে মানুষের সৃষ্টি,—আলোচ্য ছবিখানিতে এই বিরাট সত্যের রূপ দিবার চেষ্টা যেভাবে করা হইয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ব্যর্থ প্রেমের পরিণাম প্রেমিকপ্রেমিকার আত্মহত্যা—ইহাই সাধারণত আমরা দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু "আদমী" চিত্রে ইহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে। অবশ্য এই ব্যতিক্রমের জন্য ছবিখানির বিষয়বস্তুর পরিসমাপ্তি কিছুমাত্র বেমানান হয় নাই বরং স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। মানুষের জীবনের বিরাট সম্ভাবনাকে সামান্য ভাবপ্রবণতার ক্ষণিক মোহের বশবর্ত্তী হইয়া কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিবার যে নৃশংস মনোবৃত্তি সমাজের বিভিন্ন স্তরে দেখা দিয়াছে, ইহা দূরীকরণের দিকে ছবিখানির অনেকখানি অবদান আছে সন্দেহ নাই। সমাজের সামান্য স্তরের সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া ইহার আখ্যানবস্তু গড়িয়া উঠায়, ইহার স্বাভাবিক আবেদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণভাবে পরিচালনার দিক দিয়া ছবিখানি ভালই। তবে দর্শকদিগকে সস্তাদরের রস পরিবেশন করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালক এরূপ দু'একটি দৃশ্যের অবতারণা ইহাতে করিয়াছেন যাহার জন্য ছবির আখ্যানবস্তুর মান কয়েকস্থানে খুবই নামিয়া পড়িয়াছে।

অভিনয়ের দিক দিয়া ছবিখানি মোটামুটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বারবনিতাও মানুষ, মায়া-দয়া প্রভৃতি অনুভূতি তাহাদের মধ্যেও আকণ্ঠ, সুযোগ সুবিধা পাইলে সদ্ভাবে জীবনাতিবাহিত করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনেও জাগে,—নর্ত্তকীর ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তা হুবলিকারের অভিনয়ে ইহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দোষগুণসমন্বিত সমাজ-শাসনভীত পরোপকারী সাধারণ পুলিশ কনেষ্টবলের চরিত্ররূপ সৃষ্টিতে সাধু মোদক খুবই অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। রাম মারাঠার অভিনয়ও ভাল হইয়াছে। অন্যান্যের অভিনয়ে দোষ-ত্রুটি না থাকিলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। শান্তা, সাধু ও রাম মারাঠার গান কয়খানি ছবির বিশেষ সম্পদ।

পেণ্টাঙ্গ্যুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

গত ২৭শে নভেম্বর বোম্বাইয়ের পেণ্টাঙ্গ্যুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। হিন্দু দল ফাইনাল খেলায় মুসলীম দলকে পাঁচ উইকেটে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। গত দুই বৎসর পর পর পেণ্টাঙ্গ্যুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়া মুসলীম দল যে সম্মানলাভ করিয়াছিল, এই বৎসর তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। তৃতীয় বৎসরে মুসলীম দল পেণ্টাঙ্গ্যুলার বিজয়ী হইলে, কোয়াড্রাঙ্গ্যুলার ও পেণ্টাঙ্গ্যুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিতে পারিত। এই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিমূলক খেলার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গত ৩৫ বৎসরের মধ্যে কোন দলেরই পক্ষে এইরূপ পর পর তিন বৎসর বিজয়ীর সম্মান লাভ করা সম্ভব হয় নাই—মুসলীম দলের পক্ষেও সম্ভব হইল না। ১৯৩৬ সালেও মুসলীম দলকে এইরূপ সম্মানলাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। ইউরোপীয় দল সেইবার মুসলীম দলকে পরাজিত করে, কিন্তু ইউরোপীয় দলকে তাহার পরবর্তী খেলায় ফাইনালে হিন্দু দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। একরূপ মন্দ ভাগ্যবশতঃই এই বৎসর মুসলীম দল পর পর তিন বৎসরের বিজয়ীর সম্মানলাভ করিতে পারিল না ইহা বলাই বাহুল্য।

মুসলীম দলের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

মুসলীম দল ফাইনাল খেলায় হিন্দু দলের নিকট পরাজিত হইলেও তৃতীয় বৎসরের বিজয়ী হইবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মুসলীম দল ফাইনাল খেলার সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত হিন্দু দলের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪০ রাণে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮০ রাণ করিলে হিন্দু দল ২২০ রাণ পশ্চাতে পড়ে। ইহাতে হিন্দু দলের বড় সমর্থনকারীদেরও পর্য্যন্ত হিন্দু দলের পরাজয়ের কল্পনা করিতে হয়। মুসলীম দলের শ্রেষ্ঠ বোলার মহম্মদ নিশার ও আমীর ইলাহির মারাত্মক বোলিংই সমর্থনকারীদের মনে এইরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি করে। এই দুইজন বোলার হিন্দু দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় কৃতিত্বপূর্ণ বোলিং করিয়া বিপর্যয়ের কারণ সৃষ্টি করেন এবং হিন্দু দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫৯ রাণে শেষ হয়। সুতরাং নিশার ও আমীর ইলাহির বোলিংয়ের বিরুদ্ধে হিন্দু দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২২১ রাণ সংগ্রহ করিয়া বিজয়ী হইবে ইহা ধারণা করা পর্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। হিন্দু দলের প্রথম ইনিংসে নিশারের ৫২ রাণে ৬টি উইকেট লাভ বিশেষ ভীতি সঞ্চার করে। কিন্তু হিন্দু দলের সৌভাগ্য যে, নিশার খেলার শেষ পর্য্যন্ত বোলিং করিতে পারেন নাই। তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে তাঁহার কাঁধের মাংস পেশীতে টান লাগে এবং তিনি মধ্যাহ্ন ভোজের পর বোলিং হইতে বিরত থাকেন। ফলে হিন্দু দলের খেলোয়াড়দের পক্ষে সহজেই জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

বিজয় মার্চেণ্ট ও মানকড়ের খেলা

নিশারের অবর্তমানই যে হিন্দু দলের জয় লাভের প্রধান কারণ ইহা ধারণা করিলে অন্যায় করা হইবে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে বিজয় মার্চেণ্ট ও বিনু মানকড়ের নির্ভুল দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা হিন্দু দলের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে। হিন্দু দল মুসলীম দলের ২২০ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া মাত্র ২৯ রাণে অমরনাথ ও হিন্দেলকারের ন্যায় দুইজন বিশিষ্ট ব্যাটস্‌ম্যানকে হারায়। এই সময় বিজয় মার্চেণ্ট বিনু মানকড়ের সহিত যোগদান করেন। মুসলীম দল দুই উইকেট অল্প রাণে লাভ করায় বিজয়ের আশায় বিপুল উদ্যমে এই দুইজন হিন্দু খেলোয়াড়কেও কম রাণে আউট করিবার চেষ্টা করে। ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন করিয়া ব্যাট্‌সম্যানদের রাণ তোলায় বাধা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিনু মানকড় ও বিজয় মার্চেণ্ট মুসলীমদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। রাণ প্রথমে ধীরে ধীরে পরে দ্রুত উঠিতে আরম্ভ করে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর নিশার বোলিং না করায় তাঁহাদের দ্রুত রাণ তোলা খুবই সহজ হয়। মুসলীম অধিনায়ক নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হন। হিন্দু দলের ১৫০ মিনিটে ১৫০ রাণ হয়। বিজয় মার্চেণ্ট ও বিনু মানকড় একত্রে ১২১ রাণ সংগ্রহ করেন। ইহার পরেই মানকড়কে ৭৩ রাণ করিয়া আমীর ইলাহির বলে আউট হইতে হয়। বিনু মানকড়ের মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে জঙ্ঘার মাংসপেশীতে টান লাগে এবং সেইজন্য তিনি শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দতার সহিত খেলিতে পারেন নাই। নতুবা আউট হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি যেরূপ নির্ভুল খেলার অবতারণা করিয়াছিলেন এবং যেরূপভাবে বিজয় মার্চেণ্ট তাঁহাকে যোগ্য সমর্থন দান করিতেছিলেন, তাহাতে সকলেরই মনে ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, বিজয় ও মানকড়ই হিন্দু দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। মানকড় আউট হইলে বিজয় মার্চেণ্ট কোনরূপ বিচলিত না হইয়া খেলিতে থাকেন। বিনু মানকড়ের পরে সি কে নাইডু ও সি এস নাইডু খেলিতে নামিয়া আউট হইলেও মার্চেণ্টের খেলায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। তিনি পরবর্তী খেলোয়াড় এস ব্যানার্জ্জির সহযোগিতায় হিন্দু দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া ৮৮ রাণে নট আউট থাকেন। বিজয় মার্চেণ্ট শত রাণ সংগ্রহ করিতে না পারিলেও খেলার শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকিয়া ৮৮ রাণ করিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পেণ্টাঙ্গ্যুলার ক্রিকেট ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করিবে। তিনি বিনু মানকড়ের সহযোগিতায় হিন্দু দলের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

নাইডু ভ্রাতৃদ্বয়ের সাফল্য

পেণ্টাঙ্গ্যুলার ক্রিকেট ফাইনাল খেলায় বিজয় মার্চেণ্ট ও বিনু মানকড়ের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং যেরূপভাবে হিন্দুদলের জয়লাভে সাহায্য করিয়াছিল, নাইডু ভ্রাতৃদ্বয়ের বোলিংও সেইরূপভাবে সাহায্য করিয়াছে। এই দুই নাইডু ভ্রাতাই মুসলীম দলের প্রথম ইনিংস ১৯৯ রাণে পতন সম্ভব করেন। এই ইনিংসে সি এস নাইডু ৭৮ রাণে ৭টি ও সি কে নাইডু ১৩ রাণে ২টি উইকেট পান। মুসলীম দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সি এস নাইডু পুনরায় ৬৪ রাণে ৪টি উইকেট দখল করেন। সি এস নাইডু যে হিন্দুদলের শ্রেষ্ঠ বোলার ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তিনি এই বৎসরের পেণ্টাঙ্গ্যুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ছয় ইনিংসের খেলায় ৩১টি উইকেট পাইয়াছেন।

উজীর ও দিলওয়ার

বোলিং বিষয়ে মুসলীম দলের নিশার ও আমীর ইলাহির ন্যায় ব্যাটিং বিষয়ে উজীর ও দিলওয়ার হোসেন অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা দুইজনেই মুসলীম দলের প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসের পতনমুখে ব্যাটিংয়ের যে অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা মুসলীম দলের পরাজয়ের গ্লানি অনেকখানি মোচন করিবে।

হিন্দুদলের সাফল্য

বহু রাণ পশ্চাতে পড়িয়া হতাশ না হইয়া হিন্দুদলের খেলোয়াড়গণ খেলিয়া যে জয়লাভ করিয়াছেন তাহা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। দলের সকল খেলোয়াড়গণের মধ্যে সহ-

(শেষাংশ ১২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমর-বার্ত্তা

১৯শে নবেম্বর—

উত্তর সাগরে চারিটি বৃটিশ ক্রুজার ও দশটি জার্ম্মান বোমারু বিমানের মধ্যে সংগ্রাম হয়। বৃটিশ ক্রুজারসমূহ হইতে প্রচণ্ডভাবে বিমানধ্বংসী কামানের গোলা বর্ষিত হয়। গোলার আঘাতে একটি বিমান সমুদ্রবক্ষে পতিত হয়।

হল্যাণ্ডের উপর একটি জার্ম্মান বোমারু বিমান দৃষ্টিগোচর হয় এবং এই সময় ডাচ-জার্ম্মান বিমানের মধ্যে মেসিনগানের গুলী বিনিময় হয়।

বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ায় এ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ সহস্র লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ডাচ জাহাজ 'সাইমন বলিভার' গতকল্য উত্তর সাগরে মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। নৌ-বিভাগ বলেন, "আন্তর্জ্জাতিক আইন এবং মনুষ্য জীবনের প্রতি বর্ত্তমান জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের অবজ্ঞা আর একবার প্রমাণিত হইল।"

২০শে নবেম্বর—

জার্ম্মান মাইনের আঘাতে আরও নয়টি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ১৫৮৬ টন ওজনের সুইডিস জাহাজ "বোরজেসন", ২৪৯২ টন ওজনের বৃটিশ জাহাজ "ব্ল্যাকহিল" এবং ৫৮৫৭ টন ওজনের ইটালীয়ান জাহাজ "গ্রেজিয়া" পূর্ব্ব উপকূলের কিছু-দূরে জার্ম্মান মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে। ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে যুগোশ্লাভ জাহাজ "কারিকামিলিকা"ও মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে। 'উইগমুর' নামক জাহাজ মাইনের আঘাতে উত্তর সাগরে জলমগ্ন হইয়াছে। "পেনসিলভা" (৪২৫৮ টন) বৃটিশ জাহাজ শত্রুপক্ষের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলের নিকট "টর্চ্চবেয়ারার" নামক একটি জাহাজ এবং আর একটি ফরাসী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। লিথুনিয়ার 'কাউনাস' নামক একটি জাহাজও জলমগ্ন হইয়াছে। কতজনের প্রাণহানি হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। শেষ হিসাবে প্রকাশ, সাইমন "বলিভার"-এর মোট একশত যাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

২১শে নবেম্বর—

কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে, জার্ম্মানীর মাইন আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সমুদ্র পথে জার্ম্মানীর রপ্তানি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃটেন অভিযোগ করিয়াছেন যে, জার্ম্মানীর সমুদ্র-যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিরোধী।

২২শে নবেম্বর—

বেলজিয়াম-ডাচ শান্তি প্রস্তাবের উত্তরে জার্ম্মান বেতারে শান্তির সর্ত্ত হিসাবে নিম্নলিখিত সর্ত্ত ঘোষণা করা হইয়াছেঃ— (১) ভারত ও আয়র্ল্যাণ্ডকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, (২) মিশরের অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিতে হইবে, (৩) প্যালেষ্টাইনের "ম্যাণ্ডেট" ত্যাগ করিয়া আরবদের উপর তাহাদের নিজেদের গৃহ ব্যবস্থার ভার দিতে হইবে, (৪) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, সাইপ্রাস ও অকল্যাণ্ড দ্বীপে গণ-ভোটের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৫) বুয়রদের স্বাধীনতা দান করিতে হইবে এবং (৬) ফ্রান্সের হাতে কানাডা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

"যুদ্ধের ব্যয়ভার" সম্বন্ধে এক বেতার বক্তৃতায় বৃটিশ রাজস্ব সচিব স্যার জন সাইমন ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের জন্য এখন প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড (৮ কোটি টাকারও বেশী) খরচ হইতেছে।

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্রিকাসমূহের বার্লিনস্থ প্রতিনিধিগণকে জার্ম্মানীর পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে, "বৃটেন সম্প্রতি যে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা আরও প্রবলভাবে মাইন আক্রমণ চালাইব। এক্ষণে জার্ম্মানী বৃটেনের উপকূলের অদূরে মাইন পাতিবে।"

২৩শে নবেম্বর—

রুমানিয়ার আর্গেসিয়ান্ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মঃ টাটারেস্কু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সমুদ্র পথে জার্ম্মান রপ্তানি বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "জিপ্সি" নামক একটি ডেষ্ট্রয়ার পূর্ব্ব উপকূলের কিছুদূরে একটি মাইনের সহিত আঘাত লাগিয়া ঘায়েল হয়। আরও তিনটি বৃটিশ জাহাজ (সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৩২ টন) সাবমেরিনের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে। এই জাহাজ তিনটির মধ্যে বৃহত্তমটির নাম 'গিরালডাস্', উহা পূর্ব্ব উপকূলে জলমগ্ন হয়। উহার সমস্ত নাবিক মোট ২৬ জনকে একটি বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্র বক্ষ হইতে উদ্ধার করে। "ড্যারিনো" নামক অপর জাহাজটি ১৯শে নবেম্বর তারিখে জলমগ্ন হয়। উহার ১৬ জন নাবিক নিহত বা জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। 'সার্লবি' নামক তৃতীয় জাহাজটি স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে জলমগ্ন হয়। জাহাজে সর্ব্বসমেত ১২ জন নাবিক ছিল, তন্মধ্যে সাতজনকে উদ্ধার করা হয়। অবশিষ্ট নাবিকদের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

২৪শে নবেম্বর—

বৃটিশ নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২১শে নবেম্বর ফার্থ অব ফোর্থ-এ "বেলফাষ্ট" নামক ক্রুজারটি টর্পেডোর আঘাতে জখম হইয়াছে।

ওয়াশিংটনে সাংবাদিকগণের এক সম্মেলনে দেশের ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন, যে, আগামী বসন্তকালে যুদ্ধের অবসান হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। কিন্তু এইরূপ আশা করার কারণ সম্পর্কে তিনি কোন আভাষ দেন না।

২৫শে নবেম্বর—

লণ্ডনে নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত ১৫২৬ জন নিহত এবং ২৫০টি বাণিজ্য-জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৭০টি জাহাজ সাবমেরিন এবং ৮০টি জাহাজ মাইন আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

মিউনিক বিস্ফোরণের পূর্ব্বে আরও দুইবার হিটলারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হয়—এই সংবাদ সুইডিস পত্রিকা "গোটেবর্গ হাণ্ডেল্স্ টিডনিঙ্গেল"-এ প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্যারিস রেডিও উহা প্রচার করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, একটি ষড়যন্ত্র জানুয়ারী মাসে ধরা পড়ে এবং সতর জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় আগষ্ট মাসের শেষে এবং এ সম্পর্কে যে একশত জন গ্রেপ্তার হয়, তাহাদের মধ্যে "কৃষ্ণবাহিনী", "বাদামী কোর্ত্তা" ও হিটলার যুব দলের লোক ছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণবাহিনী ও গেষ্টাপোর কয়েকজন লোক রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। কৃষ্ণবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে রহস্যজনক সংঘর্ষের ফলে কয়েকটি খুন ও আত্মহত্যা হইয়াছে।

২৬শে নবেম্বর—

গত সপ্তাহে ১১টি বৃটিশ জাহাজ (২৫৭৮৭ টন), নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ৪টি জাহাজ (২৩৯৪৯ টন) এবং ২টি ফরাসী জাহাজ (তিন হাজার টনের উপর) জলমগ্ন হইয়াছে। বৃটিশ নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, জার্ম্মানীর চুম্বক-মাইনের বিরুদ্ধে অভিযানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। মাইন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত দুই শতাধিক জাহাজে কাজ করিবার জন্য দুই সহস্র ভলাণ্টিয়ার আহ্বান করা হইয়াছে। এই সব জাহাজ ট্রলার রিজার্ভ হিসাবে নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২০শে নবেম্বর—

সাহিত্যাচার্য ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বেহালার বাস-ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। গত এক সপ্তাহকাল যাবৎ তিনি আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন।

সক্কুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অবস্থা অতি গুরুতর আকার ধারণ করে। সক্কুরের প্রায় সর্ব্বত্র দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে—উত্তেজিত জনতা লুটপাট ও দোকান-পাটে অগ্নিসংযোগ করে। হিন্দু ও মুসলমান জনতার মধ্যে দাঙ্গায় আজ দশ জন মারা গিয়াছে।

এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা হয়।

জব্বলপুরে ঠাকুর ছেদীলালের সভাপতিত্বে মহাকোশল রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করা হয় এবং অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস ও উহার ওয়ার্কিং কমিটি বাতিল করিয়া 'সমর-পরিষদ' গঠন করা হয়। মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন আরম্ভ করিলে, এই পরিষদ এই প্রদেশে আন্দোলন পরিচালনা করিবেন।

২১শে নবেম্বর—

এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তৃতীয় দিবসের অধিবেশন হয়। এই বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার এক পরিকল্পনা দাখিল করেন। মহাত্মা নাকি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে, কংগ্রেসকর্ম্মীরা পূর্ণ অহিংস থাকিতে পারিবেন এবং কোনরূপ অশান্তি দেখা দিবে না—এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের পক্ষপাতী নহেন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ট্যাংরা সাউথ রোডের চীনা পল্লীতে এক ভীষণ অগ্নিকান্ড হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ৩৫টি চামড়ার কারখানা এবং সমগ্র চীনা পল্লীটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ আড়াই লক্ষ টাকা বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এত বড় অগ্নিকান্ড গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আর হয় নাই।

সক্কুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবস্থা কিছুটা শান্ত হইয়াছে। দুই দিনের দাঙ্গায় ২৯ জন লোকের মৃত্যু এবং ২৬ জন আহত হইয়াছে।

পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ আগরওয়ালা, ব্যাজালগেট হত্যা মামলা সম্পর্কিত প্রথম আপীলের মামলার রায় দিয়াছেন। আসামী চিন্তা নায়কের মৃত্যুদন্ড বাতিল করিয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে: চক্র রাউত, রঘু প্রভৃতি, ভুবনী প্রভৃতি এবং কালী রাউত নামক যে চারি ব্যক্তির প্রতি দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট আসামীদের দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হইয়াছে।

২২শে নবেম্বর—

ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী রচিত প্রস্তাবের খসড়া লইয়া এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চতুর্থ দিবসের অধিবেশনে সাত ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। মহাত্মা গান্ধী অনুমান দুই ঘণ্টাকাল প্রস্তাবটি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ ডি পি মিশ্রের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করিয়া পরে তাঁহার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করায়, মধ্যপ্রদেশ পরিষদের কংগ্রেসী দলের সদস্য মিঃ টি জে কেদার, মিঃ জাকাতদার ও মিঃ সুবেদার—এই তিনজন তিন বৎসরের জন্য কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতিতে থাকিতে পারিবেন না, কোন নির্ব্বাচনযোগ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে থাকিতে পারিবেন না বা কোন আইন-সভা, মিউনিসিপ্যালিটি বা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক কোন প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন না। এতদ্ব্যতীত এক বৎসরকালের জন্য তাঁহারা কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতেও পারিবেন না।

৯ই জুলাইয়ের বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগদানে দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্য সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহাদের কার্য্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলার অনিষ্টকর হইয়াছে, কাজেই উহা নিন্দার্হ। কমিটি দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া ছাড়া উহাদের বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত অমূল্যরতন গুহ ২০—১২ ভোটে মিঃ সৈয়দ আবদুল সেলিমকে পরাজিত করিয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সক্কুরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত দুইশত জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মঞ্জিলগড় কমিটির প্রেসিডেণ্ট খাঁ বাহাদুর খুরোকে অন্তরীণ করা হইয়াছে। সক্কুর, শিকারপুর ও রোড়ি—এই তিনটি শহর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে।

২৩শে নবেম্বর—

ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর আজ এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পাঁচ দিবসব্যাপী অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনা চালাইবার পথ খোলা রাখা হইয়াছে এবং কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার জন্য সমুদয় কংগ্রেসকর্ম্মী ও কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে অসহযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কংগ্রেসের দাবী মানিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত উহা চলিতে থাকিবে। এই সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক সত্যাগ্রহ সংগ্রামেরই মূলনীতি এই যে, শত্রুপক্ষের সহিত সম্মানজনক আপোষ-নিষ্পত্তির কোন প্রচেষ্টাকেই উপেক্ষা করা হইবে না। এই জন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের মুখের উপর আপোষ-নিষ্পত্তির দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটি এখনও সর্ব্বতোভাবে সম্মানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠায় যত্নবান থাকিবেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলার কংগ্রেসের ব্যাপার সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ৩০শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের ভাষায় এবং উহাতে ব্যক্ত মনোবৃত্তিতে ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখপ্রকাশ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা আপত্তিজনক। ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির হিসাব পরীক্ষার জন্য অডিটর নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদা যে ফন্ডে রাখা হইয়াছে, তাহা মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে দিতে কংগ্রেস দলের নেতৃবর্গকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা অনুমোদন করেন নাই। বরং ইলেকশন ট্রাইব্যুনালের সহিত সহযোগিতা করিতে এবং উহার আদেশ পালন করিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

গত রাত্রিতে সক্কুরের অবস্থা শান্ত ছিল। বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃদ্বয় মুখী ভীরুমল বেগরাজ ও ভোজরাজ জবানীর উপর অবিলম্বে সক্কুর জেলা পরিত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। সক্কুরের এক গ্রামে আর একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ ডাকাতদের উপর গুলীবর্ষণ করে। ফলে ৮ জন ডাকাত নিহত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী আশালতা দেবী টাইফয়েড রোগে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার হৈমন্তিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—

এই বৎসর বাঙলা ও সুরমা উপত্যকায় বিভিন্ন স্থানে যে ৪,৬৪,১৬৭ জন প্রাথমিক কংগ্রেস সভ্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩৩,১৮২ জন মুসলমান এবং ৩৫,৩২১ জন মহিলা। ময়মনসিংহ জেলায় এই বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মুসলমান কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছেন; তাঁহাদের সংখ্যা হইতেছে ৫৫৫২। মহিলা সভ্য সংগ্রহে বরিশাল জেলার স্থান সর্ব্বাগ্রে; এই জেলায় মোট ৫৪২৭ জন মহিলা কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাসের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, ৮৭ জন রাজনৈতিক বন্দী এখনও জেলে আছেন।

কলিকাতায় ৩৮।২ এলগিন রোডে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

২৫শে নবেম্বর—

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার হরিজন পত্রে লিখিয়াছেন,—"গণ-পরিষদই একমাত্র উপায়।" গণ-পরিষদই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সুমীমাংসার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়—এই মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়া মহাত্মাজী বলেন যে, গণ-পরিষদের জন-সংগ্রাম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অন্য সমস্ত চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, "একটা সময় আসিতে পারে, যখন গণ-পরিষদের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিবার আবশ্যক হইবে। কিন্তু সেই সময় এখনও আসে নাই।"

মেদিনীপুরের বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্য কাহাকেও দায়ী না করিয়া একখানা কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের সেবায় আজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে সর্ব্বপ্রথম গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন এবং অন্তরীণে বহুদিন কাটাইয়াছিলেন।

৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ফরোয়ার্ড ব্লকের নূতন অফিস গৃহের উদ্বোধন উৎসব হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন,—"মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে অক্ষম হন, তাহা হইলে ফরোয়ার্ড ব্লক স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়া সমস্ত শক্তির সহিত এই দুর্দ্দিনে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে।"

২৬শে নবেম্বর—

এক বৎসরের জন্য পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উপর পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সং ফৌঃ আইন অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। গতকল্য শ্রীযুত এম এন রায়কে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য লাহোরে বিপুল আয়োজন করা হয়; ট্রেনে সাহারাণপুর পেঁাছিবার পথে তাঁহার উপর উক্ত মর্ম্মে এক আদেশ জারী করা হয়।

খেলা-ধূলা

(১১৭ পৃষ্ঠার পর)

যোগিতার মনোভাব বর্ত্তমান থাকিলে দল যে পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়া বিপর্যস্ত হয় না ও জয়লাভে সমর্থ হয় তাহার প্রমাণ হিন্দু খেলোয়াড়গণ পাইলেন। আশা করি, তাঁহারা এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া পরবর্ত্তী খেলায় এইরূপ মনোভাবেরই পরিচয় দিবেন। খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

পেণ্টাংগুলার ফাইনালের ফলাফল

মুসলীম দলঃ—প্রথম ইনিংস ১৯৯ রাণ (মুস্তাক আলী ৩৪, এস এম কাদ্রি ২৬, দিলওয়ার হোসেন ৪৫, উজীর আলী ৩৩, নাজির আলী ১৮, আব্বাস খাঁ নট আউট ১৯ রাণ; অমর সিং ৫০ রাণে ১টি, সি এস নাইডু ৭৪ রাণে ৭টি, সি কে নাইডু ১৩ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন)।

হিন্দু দলঃ—প্রথম ইনিংস ১৫৯ রাণ (বিনু মানকড় ১৯, অমরনাথ ২৮, বিজয় মার্চেণ্ট ৩২, জাগন্দেল ১৭, অমর সিং ২২, রঙ্গ নেকার ১৪, এস ব্যানার্জি ১৭; নিশার ৫২ রাণে ৬টি, সৈয়দ আমেদ ৩৭ রাণে ১টি, আমীর এলাহি ৩৬ রাণে ৩টি উইকেট পাইয়াছেন)।

মুসলীম দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ১৮০ রাণ (এস এম কাদ্রি ৩৩, উজীর আলী ৫২, দিলওয়ার হোসেন ৪৫, আমীর ইলাহি ১৯; এস ব্যানার্জ্জি ৫৭ রাণে ৪টি, সি এস নাইডু ৬৪ রাণে ৪টি, অমর সিং ২৮ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

হিন্দু দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস (৫ উইঃ) ২২১ রাণ (হিন্দেলকার ১৩, মানকড় ৭৩, সি কে নাইডু ১৮, সি এস নাইডু ১৪, বিজয় মার্চেণ্ট নট আউট ৮৮ রাণ; নিশার ৩৮ রাণে ১টি, সৈয়দ আমেদ ২৫ রাণে ১টি, নাজির আলী ২১ রাণে ১টি, আমীর ইলাহি ৮০ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন)।

হিন্দু দল খেলায় ৫ উইকেটে বিজয়ী।

পূর্ব্ববর্ত্তী খেলার ফলাফল

হিন্দু ও মুসলীম দলের পূর্ব্ববর্ত্তী খেলার ফলাফলঃ—হিন্দু দল ইতিপূর্ব্বে ছয়বার মুসলীম দলের সহিত ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। তাহার মধ্যে একবার খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। হিন্দু দল একবার ও মুসলীম দল চারবার জয়লাভ করে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

১৯১৩ সালেঃ—হিন্দু দলের ১৬৭ রাণ ও ৮ উইকেটে ২৫৪ রাণ। মুসলীম দল ১৬২ রাণ ও ৫ উইকেটে ১৭৪ রাণ। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

১৯১৯ সালেঃ—হিন্দু দল ২৫২ রাণ। মুসলীম দল ১৪৯ ও ৯৫ রাণ। মুসলীম এক ইনিংস ও ৬ রাণে পরাজিত।

১৯২৪ সালেঃ—মুসলীম ৩৬৮ রাণ, ৫ উইকেটে ১২৮ রাণ। হিন্দু দল ১২০ রাণ ও ৩৭৩ রাণ। মুসলীম দল ৫ উইকেটে বিজয়ী।

১৯৩৪ সালেঃ—মুসলীম ২০৯ রাণ ও ১৯৮ রাণ। হিন্দু দল ১৮৯ ও ১২৭ রাণ। হিন্দু দল ৯১ রাণে পরাজিত।

১৯৩৫ সালেঃ—মুসলীম ২৯৭ রাণ ও ৭ উইকেটে ৩৫৭ রাণ। হিন্দু ২৮৮ রাণ ও ১৪৫ রাণ। মুসলীম দল ২২১ রাণে বিজয়ী।

১৯৩৮ সালেঃ—হিন্দু ৯১ রাণ ও ৩৭৭ রাণ, মুসলীম ৩৪০ রাণ ও ৪ উইকেটে ১০৭ রাণ। মুসলীম ৬ উইকেটে বিজয়ী।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬, Saturday, 25th November, 1939 [২য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত—

এলাহাবাদ শহরে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়া গেল। কমিটি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর জোর দিবেন ইহা অনুমান করাই গিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর মত কি, ইহাও জানা ছিল। কংগ্রেসকর্ম্মীরা পূর্ণ অহিংস থাকিতে পারিবেন, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভের পক্ষপাতী নহেন। প্রতিপক্ষকে আপোষ-নিষ্পত্তির যতদূর সম্ভব সুযোগ দেওয়াই মহাত্মাজীর নীতি। ইতিপূর্ব্বেও তিনি সেই নীতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে নেহেরু-জিন্না আলোচনার ফল যে কংগ্রেসের আশানুরূপ হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। কারণ দুইয়ের মধ্যে আদর্শের তফাৎ—স্বাধীনতার জন্য যে দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, প্রয়োজন যে মৃত্যুঞ্জয়ী নিষ্ঠা ও আবেগের, মুসলিম লীগওয়ালাদের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণই অভাব রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সে কথা এই যে, জিন্না সাহেবের মতিগতির উপরই নির্ভর করিলে চলিবে না। কংগ্রেসের নিজেদের একটা নীতি স্থির করিয়া লইতে হইবে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উচ্চ একটা ত্যাগমূলক ভাবাদর্শের প্লাবনই নিজেদের ভিতরকার এই সব তুচ্ছ বিভেদকে ভাসাইয়া দিতে পারে, তাহা হইতে কংগ্রেসের নীতিকে যতই দূরে রাখা যাইবে, তাহার ফলে বিপদ এড়ান যাইবে না, বরং বাড়িয়াই উঠিবে।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সঙ্কট—

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—"আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন দলের মুরুব্বী হিসাবে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সংশোধন করিতে অনুরোধ করিব না। বিভিন্ন দল সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে অদ্ভুত অসঙ্গতি-পূর্ণ বিষয়সমূহ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সিদ্ধান্ত বহাল থাকিবে।" বিভিন্ন দলের সর্ব্ব-সম্মত সংশোধন শুনিতে খুব ভাল কথা বটে, কিন্তু কার্য্যত উহা আমরা অসম্ভব বলিয়া মনে করি। বিভিন্ন দলের একেবারে সম্মতি লইয়া কোন দেশেই শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, এদেশেও তাহা হইবে না। এক মণ তেল পুড়াইয়া রাধার নাচ দেখিবার আকাশ কুসুম কল্পনাতেই উহা পর্য্যবসিত হইবে। দেশের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকিবেই যাহারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না, সাম্প্রদায়িক স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিবে এবং সেই স্বার্থের প্রয়োজন বশংবদভাবে তৃতীয় পক্ষের প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হইল দেশের বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতিতে সংহত এবং জাগ্রত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শক্তিকেই জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য গঠনে কার্য্যকরী করিয়া তোলা এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ-বাদীদিগকে একেবারে উপেক্ষা করা। অকেজো সদিচ্ছা এবং অসম্ভব আদর্শের কল্পনা-বিলাসে কাল কাটাইবার অবসর দেশের এখন আর নাই। সদিচ্ছা বা শুভবুদ্ধির ভ্রান্ত নামের মোহের ঐ জালে এখনও যদি আমরা পড়িয়া থাকি, ভারতের স্বাধীনতার যাহারা বিরোধী, সুবিধা হইবে তাহাদেরই। আমাদের ঐ ধরণের যুক্তিবুদ্ধির জোর বাড়াইয়া নানা ফন্দী-বাজীতে ভালমানুষী ফলাইয়া তাহারা আমাদের পরাধীনতাকে পাকা করিতেই চেষ্টা করিবে। ভারতের রাজনৈতিক অনু-ভূতিতে জাগ্রত জনগণের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল চায় দেশের স্বাধীনতা, কংগ্রেস তাহাদের মুখপাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই ভারতের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত, ইহার উপরই জোর

দিতে হইবে। এইদিক হইতে কংগ্রেসের দাবীকে কার্যকর রূপে প্রদান করা আমরা বর্ত্তমানে প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিতে তৎপরদের তাঁবেদারী করিবার ভ্রান্তি হইতে যতদিন পর্য্যন্ত অসংশয়িতভাবে আমরা মুক্ত হইতে না পারিতেছি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তি নাই। এই সত্যটি সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিবার সময় এখন আসিয়াছে।

আসামের নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডল—

আবার সাদুল্লা মন্ত্রিমণ্ডলের অভিনয় আসামের রঙ্গমঞ্চে আরম্ভ হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কোয়ালিশন দল হইতে ৫৯ দফা অনাস্থার প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ পড়িয়াছে। আসামের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১০৮ জন এবং কোয়ালিশন দলের সদস্যসংখ্যা ৫৯ জন। সুতরাং ফল সহজেই অনুমেয়। অবস্থা এইরূপ অসম বুঝিয়াই স্যার মহম্মদ সাদুল্লা ৩০শে নবেম্বরের অধিবেশন পিছাইয়া দিবার জন্য হুজুরে দরবার করেন, তাঁহার আরজী মঞ্জুর হইয়াছে। তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোয়ালিশন দল হইতে কয়েকজনকে ভাগাইয়া আনিয়া ভোটের জোর বাড়ান যায় কিনা এই চেষ্টা চলিবে, তারিখ পিছাইয়া দিবার প্রয়োজনের মূল কারণ যে ইহাই তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। মোটা মাহিয়ানার লোভ মন্ত্রিগিরির পদ প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এ সকলের লোভে পড়িবার লোকের অভাব ঘটে না, প্রতিবেশী বাঙলা মুল্লুকের ব্যাপার দেখিয়া এমন আশা অন্তরে জাগা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু বাঙলা এবং আসামের অবস্থা যে সমান নয়, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় দলের মনস্তুষ্টি করিয়া ভোটের জোর বজায় রাখিতে হইলে যে নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন সে সব নীতির জন-স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সমর্থন আসামে যোগাড় করা ততটা সহজ হইবে না বাঙলা দেশে যতটা সহজ। সুতরাং পরিণামে পস্তাইবার ভয় ষোল আনাই আছে, তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মন্ত্রিগিরির তালিকায় নাম উঠার ঐতিহাসিক সৌভাগ্যও তো কম নয়। সে নাম যে ভাবেই হউক না কেন?

রাজনীতি ও যুবক সম্প্রদায়—

ধুবড়ী ছাত্র-সঙ্ঘের অধিবেশনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—'যে সকল যুবক রাজনীতির স্বাস্থ্যকর ও উত্তেজনাময় আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, তাহারা তাহাদের দৃঢ়তা এবং যুবকের যে গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই কর্ম্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। আমি চাই না, আমাদের যুবকগণ সীমাহীন বিধিনিষেধের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকিয়া ক্ষীণবল হউক। যৌবনের আদর্শবাদ, নিষ্ঠা, এমন কি উদ্দামতার সংস্পর্শে আসিয়া রাজনীতি অনেক বিষয়ে লাভবান হয়। বাস্তব রাজনীতির কূটচক্রে রাজনীতিকগণ প্রায়শঃ আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তার বিচারবোধ হারাইয়া ফেলেন এবং অনেক সময়ে কার্য্য ও কারণের মধ্যে জট পাকাইয়া ফেলেন।' যুবকদের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত কি অনুচিত, পরাধীন এই হতভাগ্য দেশেই শুধু এইরূপ প্রশ্ন দেখা দেয়। স্বদেশ-প্রেম এদেশে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং স্বদেশ-প্রেমের সংশ্লিষ্ট রাজনীতির সঙ্গে দুঃখ-কষ্ট বরণ এবং ত্যাগ—স্বীকার একটা ঝুঁকি এদেশের অতি বুদ্ধিমানদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলে বলিয়াই যুবকদিগকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবার উপদেশ তাঁহাদের মুখে সদা-সর্ব্বদা আওড়াইতে দেখা যায়। যুবকদিগকে রাজনীতির জীবন্ত ধারা হইতে দূরে রাখিয়া তাহাদিগকে নিরাপদে রাখা যাইতে পারে, ইহা ঠিক, কিন্তু এই তথাকথিত নিরাপত্তার মূল্যস্বরূপে দিতে হয় যুবকদের মনুষ্যত্বকে। অতি বুদ্ধিমানদের মায়াকাঁদুনীর ঊর্দ্ধে মনুষ্যত্বের প্রকৃত স্পন্দন এদেশের যুবকদের চিত্তকে যেদিন দুশ্চর কর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মানবতার উচ্ছ্বাস উঠিবে সেই দিন। সে উচ্ছ্বাস, সঙ্কীর্ণ বিচারের সব বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

অনাগতের আহ্বান—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 'কোন পথ, কি উপায়', এই নাম দিয়া 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "আমরা আবার বিরাট ঘটনা-প্রবাহের সম্মুখীন হইয়াছি। আবার আমাদের ধমনী দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, আমাদের চরণাগ্র গতি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং আমরা পরিচিত আহ্বান ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। আমাদের ছোট খাট দুঃখ আমরা উপেক্ষা করিতেছি, আমাদের সাংসারিক চিন্তাক্লেশ সরাইয়া দিতেছি। এ আহ্বান যখন আসে তখন ঐ সব দুঃখ চিন্তা ভুলিয়া যাইতে হয়। যে ভারতকে আমরা ভালবাসিয়াছি, এবং সেবা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি, সে যখন কানের কাছে ডাকে এবং ত্যাগের মন্ত্রজাল আমাদের ক্ষুদ্র সত্তার উপর ছড়াইয়া দেয় তখন ছোট ছোট দুঃখ ক্লেশে কি আসে যায়? তবুও কেহ কেহ অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে, যৌবনের গৌরবে তাহারা অভিযোগ করে, কেন এ বিলম্ব? যখন আমাদের শিরায় শিরায় রক্তস্রোতের শিহরণ এবং আমাদের কানে জীবনের আহ্বান ধ্বনি, তখন কেন আমাদের এত ধীর গতি? হে ভারতের যুবক-যুবতি, তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমরা চঞ্চল বা অসহিষ্ণু হইও না। সে সময় আসিবে, খুব শীঘ্রই আসিবে যখন এই গুরুভার তোমাদের স্কন্ধে লইতে হইবে, তালে তালে যাত্রা করিবার আহ্বানও আসিবে, আর সে যাত্রায় গতি এত দ্রুত হইতে পারে যে, তোমরা তাহা কল্পনাও করিতেছ না।"

ব্যক্তির জীবনে, জাতির জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন অন্তর ক্ষুদ্র স্বার্থের বিচার-বিবেচনা ভুলিয়া উদার আনন্দের ছন্দে নাচিয়া উঠে, সেই আনন্দের টানে সে আত্যন্তিক ত্যাগের পথে আপনার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সাময়িক উত্তেজনার জোরে এই পথে বেশী দূরে আগাইয়া যাওয়া যায় না, প্রতিকূলতার প্রথম আঘাতেই মুসড়াইয়া পড়িতে হয়; সুতরাং আদর্শ-নিষ্ঠা এবং পন্থার সুনিশ্চয়তার উপ-

লক্ষ্যে একেবারে অসংযত এবং অসংশয়িত হইতেই হয়। সুতরাং বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে, না আছে এমন নয়; কিন্তু বিচার-বিবেচনার নামে স্বার্থপর দুর্ব্বলতা আসিয়া আনন্দের সংযোগ সূত্রটি ছিন্ন করিয়া না দেয়, ভয় হইতেছে ইহাই। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে চিত্তের সংস্কার এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, যুক্তিবুদ্ধির নামে সে সঙ্কীর্ণতার জালেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া জড়াইয়া পড়ে। বিচার-বিবেচনার বাড়াবাড়িতে আমরা যেন এই সত্যটি বিস্মৃত না হই।

অন্তর্দ্দাহের কারণ—

কলিকাতা পুলিশের ১৯৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বারের পুলিশ রিপোর্টের ন্যায় আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টখানাও নানা রসের আকরস্বরূপ যে হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। এই রিপোর্টে শহর এবং শহরতলীতে ১২৪ (ক) ধারা অর্থাৎ রাজদ্রোহ প্রচার বিধির প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লেখা হইয়াছে "বৎসরের শেষভাগে বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তে ইহা সুনিশ্চিত হয় যে, ১২৪ (ক) ধারা এবং ১৫৩ (ক) ধারার (জাতি বিদ্বেষ প্রচার) বিধানগুলির ফাঁকে বক্তারা এতটা সুবিধা পাইয়াছে, যাহা তাহারা নিজেরাও কল্পনা করিতে পারে না।" হাইকোর্টে কয়েকটি মামলার সিদ্ধান্ত পুলিশের মতলব মত না হওয়াতেই এই আপশোষ, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। রিপোর্টে বক্তাদের কথাই শুধু উল্লেখ করা হইল, সংবাদপত্রের কথা বাদ পড়িল কেন? সে দিক দিয়াও আপশোষের কারণ তো কম হয় নাই। পর পর সংবাদপত্রের নামে রাজদ্রোহ প্রচারের কয়েকটি অভিযোগই তো ফাঁসিয়া গিয়াছে। ১২৪ (ক) ধারাকে হাতিয়ার স্বরূপে অবলম্বন করিয়া বাঙলার মন্ত্রীরা নিজেদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকারী সমালোচকদিগকে সায়েস্তা করিবার যে চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টার ব্যর্থতা-জনিত বিক্ষোভই পুলিশ রিপোর্টের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠকদিগকে ইহার বক্র মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করাইবার জন্যই আমাদিগকে কথা কয়েকটি বলিতে হইল।

কমলা নেহেরু হাসপাতাল—

গত ১৯শে নবেম্বর মহাত্মা গান্ধী এলাহাবাদে কমলা নেহেরু হাসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই হাস-পাতালটি পূর্ণাঙ্গ করিতে ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে, তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় সওয়া দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। মহাত্মাজী অবশিষ্ট অর্থের জন্য সাধারণের নিকট আবেদন করেন। যেসব অসামান্যা মহীয়সী নারীর স্মৃতিতে ভারতের ইতিহাস সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, কমলা তেমনই একজন অসামান্যা রমণী ছিলেন। ত্যাগব্রতে তাঁহার জীবন উদ্দীপ্ত ছিল। পাতিব্রত্যের প্রখর মহিমায় তিনি ছিলেন সমুজ্জ্বল। দেশ এবং জাতির সেবার জন্য কমলার ত্যাগস্বীকারের তুলনা নাই। তাঁহার মাতৃ-হৃদয় কোমল-মধুর ছিল; কিন্তু স্বদেশের সেবাব্রতে তাহা বজ্র-কঠোর হইয়া উঠিত। মাতৃভূমির সেবার জন্য কমলা তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের পুণ্যশ্লোকা বীরাঙ্গনাদের ন্যায় তিনি তাঁহার স্বামী জওহরলালের অন্তরে স্বদেশ সেবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, স্বামীকে নিজ হাতে সাজাইয়া স্বাধীনতার সংগ্রামক্ষেত্রে বীরব্রত উদ্‌যাপনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় অম্লান বদনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন যত দুঃখ কষ্ট। কমলার আত্মদান ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্দীপনাময় অধ্যায়কে উন্মুক্ত করিয়াছেন। সতী-শিরোমণির অন্তরের অভিলাষ বৃথা যাইবে না। "কমলা নেহেরু হাসপাতাল" তাঁহার সেবাপূত জীবনের সাক্ষ্যস্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া জাতিকে শক্তিদান করিবে।

মঞ্জিলগড়ের ব্যাপার—

সুক্কুরের নিকটবর্ত্তী মঞ্জিলগড়ের দাঙ্গায় ২৯জন লোক নিহত এবং ২৬জন আহত হইয়াছে। মঞ্জিলগড় একটা বাড়ীর নাম, কিছুদিন হইল মুসলমানেরা দাবী করে যে, এই বাড়ীটি একটি মসজিদ; কিন্তু প্রায় ৭৫ বৎসরকাল হইল এই বাড়ীটি গবর্ণমেণ্টের দখলে ছিল এবং নানা অফিসের কাজ চলিত ঐ বাড়ীতে। মুসলমান জজেরা পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বাড়ীটি মসজিদ নয়; কিন্তু সে কথা বলিলে কি হইবে? গোলযোগের সূত্রপাত হয় তাহা হইতে; কিন্তু যে বিরোধটা ছিল, এক পক্ষে গবর্ণমেণ্ট এবং অপর পক্ষে মুসলমান, সেই গোলযোগ ঘটনাচক্রে হিন্দু-মুসলমান বিরোধে পরিণত হয়। মঞ্জিলগড়ের কাছে সিন্ধু নদের একটি দ্বীপের মধ্যে হিন্দুদের সাধেবেল্লা নামে একটি তীর্থ আছে, এই তীর্থের সান্নিকট্য বিরোধের কারণটা বাড়াইয়া তুলে। মঞ্জিলগড়কে মসজিদ বলিয়া দাবী করিয়া যখন আন্দোলন উস্কাইয়া তোলা হয়, লীগওয়ালারা তখন কিছু বলেন না, আজ তাঁহারা বলিতেছেন, এমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বড়ই দুঃখের বিষয়। সাম্প্রদায়িকতা-বাদী নেতাদের এই সুবুদ্ধিটা যদি আগে দেখা দেয়, তবে এমন সব ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব ক্ষেত্রেই আপশোষের অভিনয়টা আসে পরে। বাড়তি বুদ্ধির ইহাই লক্ষণ!

জার্ম্মান সাবমেরিণের উপদ্রব—

জার্ম্মান ডুবো জাহাজের উপদ্রবই বলিতে গেলে বর্ত্তমান যুদ্ধের বিশেষ খবর। এতদিন পর্য্যন্ত উত্তর মহাসাগরে ঐ জার্ম্মান ডুবো জাহাজের গতিবিধি এবং তৎপরতার খবর পাওয়া যাইত। সম্প্রতি পূর্ব্ব আফ্রিকার কাছে 'এডমিরাল শের' নামক একখানা জার্ম্মান রণতরীর আবির্ভাবের কথা শোনা যায়। ইহার পরে জাপান হইতে খবর আসিয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে একখানা অজ্ঞাতনামা সাদা ক্রুজার এবং বড় একখানা ডুবো জাহাজ দেখা গিয়াছে।

জার্ম্মানীরা একখানা সংবাদপত্র বলিয়াছে যে, জার্ম্মানেরা ইংরাজদের ৫৮ খানা এবং ফরাসীদের আটখানা যাত্রী জাহাজের নাম লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ঐ যাত্রী জাহাজগুলি জার্ম্মান ডুবো জাহাজ ডুবাইবার জন্য ঘুরিতেছে, সুতরাং ঐগুলিকে দেখিবামাত্র ডুবান হইবে। অবাধ উন্মুক্ত সাগর বক্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের যাত্রী জাহাজ ডুবাইয়া ইংরাজকে কাবু করা জার্ম্মানীর পক্ষে সম্ভব নয় এবং ঐভাবে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেও বহুদিন লাগিবে—যুদ্ধ যতই দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইবে জার্ম্মানীকে ততই কাবু হইয়া পড়িতে হইবে।

পরলোকে দীনেশচন্দ্র সেন—

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় সাহিত্যাচার্য্য ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী বেহালার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাক্তার দীনেশচন্দ্রের পরলোক গমনে বাঙলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি ঘটিল। বঙ্গবাণীর সেবায় দীনেশচন্দ্র

ছিলেন ব্রতপরায়ণ। তিনি যেভাবে বাঙলা সাহিত্যের সেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন খুব কম লোকেই করিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে তাঁহার খ্যাতি ভারতের বাহিরে বিদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। কি গভীর নিষ্ঠা, জ্বলন্ত অনুরাগ ও কঠোর তপস্যার বলে তিনি এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত অনেকে অববত নহেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গবাণীর সেবা করিয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র আলোচনার সঙ্গে বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি অপূর্ব্ব একটা প্রগাঢ় মমত্ব বোধ দীনেশচন্দ্রকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে। প্রকৃতভাবে বাঙলার ভাবে তিনি ছিলেন বিভোর এবং সেই বঙ্গ ভাব-সম্পুট স্বরূপ যে বৈষ্ণব সাহিত্য, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি বৈষ্ণব-ভাবের ভাবুক ছিলেন। পূজাসংখ্যার 'বাতায়ন' পত্রে তিনি সেদিনও বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-মাধুর্য্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"ভক্তিবিহ্বল গদগদ কণ্ঠে শিবু গভীরভাবে উচ্চ গ্রামে সুর টানিয়া লইয়া চন্দ্রাবতীর কৃষ্ণের দৈহিক লাঞ্ছনার কথা যখন গাহিতে লাগিল, তখন সেই সকল গানে যাহা শ্লীলতায় হানিকর মনে হইয়াছিল, তাহাদের রূপ যেন বদলাইয়া গেল। খণ্ডিতার পালাটি আদ্যন্ত একটি স্তোত্রের মত শুনাইল—ভক্তি ও বিশুদ্ধ প্রেমের সেই বিবৃতিতে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে তরুণ-তরুণীদের চক্ষের জলে সেই পালাটি আসরে প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিল। এখন আপনারা চৈতন্যদেবকে কোথায় পাইবেন? তবুও এই সকল মহাজনের পদ যে কি প্রকার গভীর রসাত্মক, তাহা ভাল কীর্ত্তনিয়াদের গান না শুনিলে কেহ বুঝিবেন না।" এই বিশুদ্ধ ও গাঢ় রস-মাধুর্য্যের আকর্ষণ দীনেশচন্দ্রের সাধনায় আকার ধরিয়া উঠিল তাঁহার 'মৈমনসিং গীতিকায়'। নিভৃত বঙ্গ পল্লীর অনাবৃত মাধুর্য্য সাহিত্যে আবার স্বচ্ছন্দ হইয়া স্ফুরিত হইল। বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইল দীনেশচন্দ্রের সাধনায়। দীনেশচন্দ্রের এই যে অবদান ইহা অসামান্য এবং অনবদ্য। বাঙালীকে তিনি ঘরের বিবিধ রত্ন দেখাইলেন, বাঙলার জল, বায়ু এবং মাটির সঙ্গে সাহিত্যের সত্যকার যোগ-সূত্রের তিনি সন্ধান দিলেন।

বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহার গভীর মমত্ববোধ ছিল। তাঁহার এই নিষ্ঠার তীব্রতাকে তিনি 'প্রাদেশিক' বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বাঙালী বলিয়া তাঁহার ছিল একটা আত্যন্তিক গর্ব্ব, তাঁহার শেষ লেখার ভিতরেও আমরা তাঁহার এমনই একটা সবল স্বাজাত্য-প্রীতির পরিচয় পাই। তাঁহার এই স্বাজাত্য-প্রেমের পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার 'বৃহৎ বঙ্গের' পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, তাঁহার এই প্রেম-রস-মধু তাঁহার কথা-গ্রন্থগুলির অক্ষরে অক্ষরে মুক্তাবিন্দুর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দীনেশচন্দ্র সরলপ্রাণ এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অমায়িক এবং মধুর ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতি গভীর শোক অনুভব করিবে। তাঁহার স্মৃতি তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া অমর হইয়া থাকিবে, শাশ্বত বঙ্গবাণীর দেউলে তাঁহার অবদানের কুসুমার্ঘ্য অপরি-ম্লান মহিমা বিস্তার করিবে, এই হিসাবে মৃত্যুর ভিতর দিয়াও আজ তিনি অমরত্বে অধিষ্ঠিত।

চলতি ভারত

সীমান্ত প্রদেশ

সীমান্ত-গান্ধীর বাণী

পেশোয়ার জেলার টুঙ্গী গ্রামে সীমান্ত-গান্ধী বলেছেন, "দিগন্তব্যাপী যে বিপ্লব আসছে—কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদ-ত্যাগ তারই পূর্ব্বাভাস। বন্যা যখন আসে কেউ তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। কংগ্রেসের বন্যার সম্মুখেও মুসলিম লীগ অথবা হিন্দু মহাসভা—কোন প্রতিষ্ঠানই টিঁকিবে না—কংগ্রেস যে দাঁড়িয়ে আছে জনসাধারণের শুভ ইচ্ছার ভিত্তির উপরে! মুসলিম লীগের বালির পাহাড় কংগ্রেস-বন্যার প্রচণ্ড বেগে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। স্বাধীনতার যুদ্ধ আসন্ন। অহিংসা আর শৃঙ্খলাকে মজ্জাগত ক'রে প্রস্তুত হও মহাসমরের জন্য।"

সিন্ধু

মুসলিম লীগে অনাস্থা

করাচীর এক জনসভায় শ্রীযুক্ত হাফিজ নাসির আহম্মদ বলেছেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন ব্যগ্র, মুসলমানেরাও তেমনি ব্যগ্র। শ্রীযুক্ত জিন্না যদি ভেবে থাকেন ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনকে কায়েম রাখার কাজে মুসলমানেরা তাঁর সহযোগী হবেন—তবে তাঁর ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক।" যাঁরা কথায় কথায় প্রমাণ করতে চান—কংগ্রেস হিন্দুর প্রতিষ্ঠান এবং মুসলমানেরা সকলেই জিন্নার ছায়া ও প্রতিধ্বনি—তাঁহাদের জানা উচিত ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতাকামী মুসলমানের সংখ্যা একেবারেই অল্প নয়।

বোম্বাই

ডাঃ জাকির হোসেন ও ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থা

ডাঃ জাকির হোসেন ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে সে দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন, সাংবাদিকদের কাছে তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, জার্ম্মানীতে শিক্ষালয়গুলি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। ছাত্রগণকে রাষ্ট্রের ছাঁচে ঢালাই করবার কাজে শিক্ষকেরা সেখানে ব্রতী। স্বাধীন চিন্তার সেখানে কোন স্থান নাই। ইটালীতেও অনুরূপ অবস্থা। সেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের কি শেখায়—তা জানবার জন্য রাষ্ট্রের কর্ত্তারা এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। ইস্কুলের যিনি ডিরেক্টর তিনি নিজের ঘরে ব'সে পাঁচটি ক্লাসে শিক্ষকেরা কি শেখাচ্ছেন তা শুনতে পান। শুনবার জন্য শুধু একটা ঘণ্টা টিপিতে হয়। ডাঃ জাকির হোসেনের মন্তব্য শুনে একটা কথা বোঝা যায়। ইউরোপে শিক্ষালয়গুলি গুণ্ডা তৈরীর কারখানা ছাড়া আর কিছু নয়। যতদিন বিদ্যালয়গুলি ফাসিস্তদের হাতে থাকবে ততদিন ইটালীতে অথবা জার্ম্মানীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা

বোম্বাইয়ের আর্কবিশপ রেভারেণ্ড টমাস রবার্টস বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে সমাজের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য পালন করতে হ'লে মানুষকে অপরের প্রতিধ্বনি হ'লে চলবে না—তাকে হ'তে হবে চিন্তাশীল—তাকে সমাজের সমস্যা-গুলির কথা ভাবতে হবে নিজের মন নিয়ে। নিজের মন দিয়ে চিন্তা করবার শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে কি করতে হবে—বক্তা তার চমৎকার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বাধীন-ভাবে যারা চিন্তা করতে চায় তাদের প্রথম প্রয়োজন সত্যকে জানবার ব্যাকুলতা, নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আন্তরিক আগ্রহ; দ্বিতীয় প্রয়োজন যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন—কারণ ভালো ক'রে না জানলে সিদ্ধান্ত ভুল হ'তে বাধ্য। ভালো ক'রে জানবার কৌতূহল আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে ম্লান হ'য়ে আসছে; বিদেশী স্লোগানের প্রতিধ্বনি তাই স্বাধীন চিন্তার স্থান গ্রহণ করেছে। সংসার যে আজ বিশ্বব্যাপী সমরানলের মধ্যে ছারখারে যেতে বসেছে তার মূলে তো নির্ব্বুদ্ধিতা। মানুষ নিজের মন দিয়ে ভাবছে না—ভাবছে ডিক্‌টেটরদের মন দিয়ে। ইটালির, জাপানের, জার্ম্মানীর যুবকেরা আজ রক্তপাগল কতকগুলো নেতার প্রতিধ্বনি। যে পর্য্যন্ত না মানুষ দেশে দেশে নিজের মন দিয়ে ভাবতে শিখবে সে পর্য্যন্ত সংসার হয়ে থাকবে কুস্তীর আখড়া।

যুক্তপ্রদেশ

জনশিক্ষা

শ্রীযুক্ত চতুর্ব্বেদীর পরিচালনায় গত ডিসেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশে জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে অভিযান সুরু করা হয়েছে তা জয় থেকে জয়ের পথে চলেছে দুর্ব্বার গতিতে। জনশিক্ষার বিরাট পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করবার জন্য সাত লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে আর পাঁচ হাজার নরনারী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, প্রত্যেকে এক বছরের মধ্যে অন্তত একজনকে লিখতে পড়তে শেখাবে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হচ্ছে—গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, চলচ্চিত্রের সাহায্যে জ্ঞানের প্রসার, রামায়ণের মত পুস্তকের প্রচার যার মধ্যে জনসাধারণ আনন্দ খুঁজে পাবে। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে যারা মুক্তি পেয়েছে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতি মাসে গড়ে দেড় লক্ষ বই। আশার কথা সন্দেহ নেই। জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা সমীচীন হবে না। স্বরাজের যখন প্রতিষ্ঠা হবে তখনও জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তুলবার সমস্ত ভার রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া সম্ভব হবে না। যারা শিক্ষার আলোক পেয়েছে তারা যদি স্বেচ্ছায় তাদের

অবসর সময় নিয়োজিত না করে অশিক্ষিতগণকে শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্য—তবে স্বরাজেও সব লোককে শিক্ষিত ক'রে তুলতে অনেক দিন কেটে যাবে। যুক্তপ্রদেশ যা করছে তার নাম স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন। এই ভিত্তি স্থাপনের কাছে অন্যান্য প্রদেশকে যুক্তপ্রদেশের সহযোগী হ'তে হবে।

যুক্তপ্রদেশ অনুন্নত সম্প্রদায় ও কংগ্রেস

যুক্তপ্রদেশের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুত তোতারাম এক বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "দুবৎসর ধরে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব যেভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেছেন—তার ফলে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রভুত উপকার হয়েছে। কংগ্রেস হোল একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার লক্ষ্য হচ্ছে সকলের মঙ্গল এবং যার বাণী হচ্ছে জনসাধারণের বাণী। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির সমস্যার সন্তোষজনক নিরাকরণ করতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। এই সঙ্কটকালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমাদের বিশ্বাস অবিচলিত। কংগ্রেসকে যাঁরা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিষ্ঠান বলতে অভ্যস্ত তাঁরা শ্রীযুক্ত তোতারামের কথাগুলি তলিয়ে দেখবেন কি?

ভারতের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হবে ২৭—৩০শে ডিসেম্বর। সভাপতি হবে শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ। এ সম্মেলনে আলোচিত হবার জন্য ভারতের জাতীয় শিক্ষার একটা পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। এই পরিকল্পনায় আছে ঃ—

(১) ভারতের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রতিটি মানুষের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ আর সেই আত্মপ্রকাশের সামনে থাকবে পরস্পরের সহযোগিতা ও মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের সংকল্প।

(২) এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষার প্রতি স্তরে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলিকে জাগ্রত রাখতে হবে ঃ (ক) শরীরের উন্নতি, (খ) জাতীয় সংহতি, (গ) অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা, (ঘ) সংস্কৃতির বিকাশ, (ঙ) নৈতিক বুদ্ধির উদ্বোধন।

(৩) শিক্ষার স্তর থাকবে তিনটি ঃ (ক) বিদ্যালয় প্রবেশের পূর্ব্বের শিক্ষা, (খ) বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষা, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

(৪) বিদ্যালয়ের শিক্ষায় দুটি স্তর থাকবে ঃ (ক) প্রাথমিক শিক্ষা, (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার কাল হবে সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত। মাধ্যমিক শিক্ষার কাল হবে চৌদ্দ থেকে সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত। তারপর সুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে কোনো হাতের কাজ যার মধ্য দিয়ে ছাত্র আপনার সৃজনী শক্তিকে প্রকাশ করতে পারবে। মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গ হবে হাতের কাজের সঙ্গে চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য, স্থাপত্য শিল্প, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গ থাকবে বিজ্ঞান, আর্ট, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান। মোটের উপর শিক্ষার পরিকল্পনার যে খসড়া তৈরী হয়েছে তার কেন্দ্রে আছে বৃত্তিকরী শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার সমন্বয়।

কলিকাতার শহরতলীর ট্যাংরা অঞ্চলে চীনা টাউনে ২১শে নবেম্বর অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভীষণ দুরবস্থা

বঙ্গসাহিত্যে নব দৃষ্টিভঙ্গি

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাঙলা সাহিত্য অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে উঠেছে উন্নতির এক উচ্চ শিখরে। এটা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলা সাহিত্য যখন ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের অলিন্দে হামাগুড়ি দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তখন কে আশা করেছিল যে, দেড়শত বছরের মধ্যে এই সাহিত্য এমন পূর্ণ গরিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে? অন্য অনেক দেশের সাহিত্যের বয়েস এর অনেক গুণ হলেও, প্রসারে ও গভীরতায় বঙ্গসাহিত্যের সমকক্ষ হ'তে পারে নি। সুতরাং আমরা গৌরব করে' বলতে পারি যে, জননী বীণাপাণি আমাদের সাহিত্যের উপর তাঁর কৃপানির্মাল্য বর্ষণ করতে একটুও কৃপণতা করেন নি।

এই চমকপ্রদ উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই বঙ্গ সাহিত্যে মুক্তির হাওয়া বয়েছে। এই সাহিত্যের অতীত যুগে যে সকল ভাবধারা আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, হঠাৎ তার সমস্ত বাঁধনগুলি একদিন খুলে পড়ল; মুক্তির বেণী বেজে উঠল বঙ্গ সাহিত্য হ'ল স্বাধীন। বাইরে পরাধীন আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে'ও আমরা সাহিত্যে পেলাম এক অপূর্ব স্বাধীনতার সন্ধান। যেমন মুক্তি পাওয়া আর অমনি সাহিত্য ছুটল অশ্বমেধের অশ্বের মত বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দিকে দিকে। মানুষের মনের যত আকাঙ্ক্ষা যত বেদনা ব্যথা যত কল্পনা সাধনা সব সাহিত্যের মধ্যে পেল পরম আশ্রয়। বাইরের জগতের বিধি-নিষেধ ঘাত-প্রতিঘাত যতই কঠোর হ'ক না, আমরা এতদিন স্বাধীন আনন্দে সাহিত্যের স্ফটিক প্রাসাদের নব নব দ্বার উদ্‌ঘাটন করে' ফিরেছি।

আগে সাহিত্য কোনও প্রয়োজন বিশেষের সাধনে নিয়োজিত ছিল। কোনও কাব্য হয়ত কোনও আদর্শ সৃষ্টির জন্য রচিত হ'ত, কোনটি বা সম্প্রদায় বিশেষের হয়ে অনুরূপ মতবাদ প্রচারের জন্য গঠিত হ'ত। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের অনুবর্তন এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে' সে যুগে বঙ্গ সাহিত্য কাব্যপ্রধান হতে বাধ্য হয়েছিল। মঙ্গল কাব্য, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি এমনকি বৈষ্ণব কবিতাও মুক্তির স্বাদ হতে বঞ্চিত ছিল। এর মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার এইটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এই কাব্যের আভ্যন্তরীণ বা esoteric মর্মস্থলে একটি সাম্প্রদায়িক মতবাদ থাকলেও, সে সাম্প্রদায়িক ভাবের ধারা এসে পড়েছিল মানবিকতার প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে। স্নেহ, প্রেম, মমতা, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অতি পরিচিত মানবিক চিত্তবৃত্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বৈষ্ণব সাহিত্য অনেকটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল এ কথা বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার অবসরে কোনও জাতির চিন্তাস্রোতে কেমন বান ডাকে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। রাশিয়ার জনমণ্ডলী জারীয় প্রভাবে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, কিন্তু লেনিন যখন তাদের স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন, তখন এমনই এক জাগরণ এল রাশিয়ার জাতীয় জীবনে যে, ইউরোপের রাষ্ট্রীয় দাবা খেলায় তারা ইতিমধ্যেই অনেকগুলি সাংঘাতিক কিস্তী দিয়ে ফেলেছে। তুরস্ক চিরদিন ইউরোপের 'রুগ্ন বেচারী' বলে উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। কামাল আতাতুর্ক সংস্কারের মোহপাশ ছিঁড়ে তাকে এমনই এক সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া দিলেন যে, আজ তার রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবার জন্যে রাশিয়া থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সমস্ত দেশ লালায়িত। গ্রীস প্রভৃতি বলকান রাজ্যসমূহের নেতৃপদ অধিকার করতে তার বিলম্ব হবে বলে' বোধ হচ্ছে না।

স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লাগলে কি অঘটন ঘটতে পারে, তার বেশী উদাহরণ আহরণ করবার প্রয়োজন নেই। যে দিকে আমাদের প্রকৃতি একটু মুক্তিলাভ করবে, সেই দিকেই তার শক্তি সার্থকতা, পরিপূর্ণতা ও বিস্ময়কর পরিণতির সন্ধানে ছুটবে। সাহিত্যেও আমরা সেই মুক্তিপথ দেখতে পেয়েছি বলে' আমার মনে হয়। সেই জন্য আমরা এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে প্রতিভা, যে মনীষার সমাবেশ দেখতে পাই, কোনও দেশের তুলনায় তা মলিন নয়। আমাদের কবি, আমাদের বক্তারা সকল দেশের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। একটু প্রণিধান করে' দেখলেই আপনারা স্বীকার করবেন যে, এই হতভাগ্য জাতি অন্য সকল বিষয়ে বহু পশ্চাতে থেকেও সাহিত্যে বিশ্বের দরবারে একটি গণনীয় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। অন্য বিষয়ে আমরা দীন দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু সাহিত্যে আমরা ধনী, আমরা ধনীর সন্তান—একথা গর্ব করেই বলব।

রাজকীয় অনুগ্রহের আতপত্রতলে যে সকল সাহিত্যের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়, আমাদের সাহিত্য সে দলের নয়। যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রনীতিক কার্যকারণ পরম্পরায় গুরুতর পরিবর্তন না ঘটবে, ততদিন অবশ্য আমাদের এই বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু আমরা নিজের চেষ্টায় নিরপেক্ষভাবে যে এতদূর এগিয়ে আসতে পেরেছি, তার জন্যেও আমরা কৃতজ্ঞ। অনেক সময় ইংরেজদের অনেক দোষ আমরা দেখিয়ে থাকি; দেশ জয় অপেক্ষা মন জয় করাতেই (intellectual conquest) তাদের অপরাধের মাত্রা যে চরমপূর্ণ এ কথা আমরা সব সময়েই শুনতে পাই। কিন্তু এই মন জয় করার মধ্যে একটুখানি রহস্য আছে। ইংরেজ জাতির সাহিত্য বিশ্বের ইতিহাসে প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন বললেও চলে। এক অতি অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে আমরা যুগপৎ ইংরেজের কামান ও ইংরেজের সাহিত্যের সম্মুখীন হতে বাধ্য হ'লাম। কামানের গোলা উড়িয়ে দিলে আমাদের শৌর্য-বীর্য, পিষে দিলে আমাদের অস্থিপঞ্জর কিন্তু মনের উপর ছড়িয়ে দিলে তাদের চিন্তার আবির। সেই থেকে আমাদের সাহিত্য অনুরঞ্জিত হয়ে উঠল পশ্চিমের ভাব-ধারায়; খুলে দিলে আমাদের মনের কপাট। ইংরেজের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা সন্ধান পেলাম বাইরের বিশ্বের। এতদিন বাইরের বিশ্ব আমাদের কাছে এক রকম বন্ধ কেতাবের মত পড়ে ছিল। হঠাৎ খুলে গেল তার পাতা আমাদের চোখের সামনে। আমরা দেখলাম বিরাট বিশ্ব তার নব নব ভাবসমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে খুলে রেখেছে। আমাদের চোখ যেন খুলে গেল—আমরা সে বিরাট ভাব-সাম্রাজ্য দেখে স্তম্ভিত হ'লাম। আধুনিক ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও ঘটে নি। এর দ্বারা আমি এমন কথা বলছি না যে, ইংরেজদের আসবার পূর্বে আমাদের কোনও সাহিত্য ছিল না অথবা বিশ্বসাহিত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না হলে আমাদের আর কোনও মতে চলছিল না। আমার বলবার তাৎপর্য এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমনই একটা আকস্মিক ব্যাপার ঘটে গেল যা আমাদের জীবনের অনেক দিকে হঠাৎ ওলট-পালট বাধিয়ে দিলে। এর ফল যে সবটা অত্যন্ত কল্যাণকর হ'ল তা নয়। যেটা গর্হিত, যেটা অনিষ্টকর, তার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে আমরা যে চেষ্টা করেছি, তার ইতিহাস সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু সেই সঙ্গে

যে উপকার লাভ করেছি তাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধা নেই। ঋণ স্বীকার না করবার মধ্যে যে পরম দৈন্য আছে, তা যেন আমাদের মনে কখনও না আসে। প্রত্যেক বর্ধমান জাতির একটি জাতীয় ঋণ (National Debt) আছে, যাহা লক্ষের দ্বারা নয় কোটী সংখ্যার দ্বারা গণনা করতে হয়, কিন্তু তাহাতে সে জাতির অগৌরব নেই, যত অগৌরব সেই জাতীয় ঋণ অস্বীকার করবার মধ্যে।

আমার বোধ হয় সাহিত্যে আমরা যে শ্রেয় লাভ করেছি, তার তুলনা নেই। সেই লাভকে 'মুক্তি' বলা যেতে পারে। আমাদের সাহিত্য মুক্তি লাভ করেছে শুধু যুগধর্মের ফলে নয়, প্রধানত পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে এসেই আমরা এই মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছি। আধুনিক সাহিত্যে এই মুক্তির বাণী যে কত প্রকারে প্রচারিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা প্রাচীন-পন্থী, তাঁরা আধুনিক সাহিত্যের এই নূতনত্বকে উচ্ছৃংখলতা বলে' ঘোষণা করছেন। উচ্ছৃংখলতা যে নেই, তা নয়, সে সব যে বেদনা দেয় না, তাও নয়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য বলতে আমরা সেই সব অনার্য নিবন্ধগুলিকেই বা কেন বুঝব? যেখানে মানব চরিত্র অবনমিত অবমানিত হয়েছে, যেখানে জাতীয় চরিত্রের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়েছে, সর্বোপরি যেখানে আত্মসম্মান আহত হয়েছে, সেখানে আমাদের মন নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সেই সকল মসীলিপ্ত রচনা আধুনিক সাহিত্যের কতটুকু? প্রাচীনেরা দুর্নীতির ভয়ে যখন সংকুচিত হন, তখন আমরা তাঁদের সে সঙ্কোচ-কুণ্ঠাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অনেক নবাভাব-ভাবিত লেখকও যখন সেগুলিকে স্তূপীকৃত করে' আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে প্রস্তুত হন, তখন আমরা তাকে কোনওক্রমে প্রশ্রয় দিতে পারিনে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে 'আধুনিক' প্রগতি প্রভৃতি কতকগুলি শ্রুতিকটু শব্দ আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় প্রবেশ করেছে। 'শ্রুতিকটু' বলি এই জন্যে যে বন্দুকের উপরে সংগীনের মত ঐ শব্দগুলি যেন খোঁচা মারবার জন্যই অভিপ্রেত। কিন্তু বস্তুত আধুনিক বলে কোনও জিনিষ আছে কি? কারণ আজ যা আধুনিক, কাল তা সাবেকের কোঠায় পড়বে। 'প্রগতি' কাকে বলে? নামের মোহে অবশ্য আমরা চিরদিনই মুগ্ধ। 'শতনাম' 'সহস্রনাম' প্রভাতে যাদের নিত্য পাঠ্য, তাদের পক্ষে নামের একটু প্রয়োজন আছে বই কি? কিন্তু নিত্য নূতন আবিষ্কারের বহরে যখন মানুষের মন দিশেহারা হয়ে পড়ছে, তখন প্রগতিবাদীদের বলিহারি যাই যে তাঁরা এই নাম দিয়ে সাহিত্যকে চিরস্থির করে রাখবার চেষ্টা করছেন! প্রগতির পতাকা নিয়ে যাঁরা ছুটছেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, পৃথিবী তাঁদের গতিকে লজ্জা দিয়ে আরও দ্রুত ছুটেছে। সুতরাং এই মহাগতিশীল প্রপঞ্চে প্র পরা সমন্বয় কিছুরই কোনও মানে নেই।

কিন্তু এই আধুনিকতা বা প্রগতি যাই বলুন এর মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত রয়েছে। সেটি এই যে, সাহিত্য অত্যন্ত সজীব ও সবল পদার্থ। সে বাঁধাবাঁধির সমস্ত নাগপাশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অগ্রসর হবেই। এর মধ্যে শাশ্বত, সনাতন কিছু যে নেই, তা আমার বলবার উদ্দেশ্য নয়। প্রাণ জিনিষটাই নিত্য নূতন হয়েও চিরপুরাতন। প্রাণের স্পন্দন চিরদিনই একভাবে চলে তথাপি প্রাণ আয়তনে ও গভীরতায়, আবেগে ও প্রসারে সময়ে সময়ে চমক লাগিয়ে দেয়। বর্তমান জগতের দিকে একবার দৃক্‌পাত করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, এতটুকু স্থিতিশীলতা কোথায়ও নেই। সাহিত্য মানব-মনের সেই অস্থির আবেগের প্রতিচ্ছবি।

পশ্চিমের জগতে যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া বাজবার আগেও যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার প্রতিটি ঢেউ কি আমাদের এপারে এসে লাগে নি? চারিদিকে যে অসন্তোষের আগুন লেগে গেছে, তা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করবেই ত। আমরা চশমার মধ্য দিয়ে সব জিনিষ ছোট দেখি, ভুলে যাই যে, আমাদের বয়েসে বড় জিনিষ ছোট হয়ে যায় এবং ছোট জিনিষ দেখবার মত দৃষ্টিপ্রখরতা আমরা হারিয়েছি। কিন্তু তা বলে জগৎ ত আর আমাদের ছাঁদে গঠিত হবে না। বিদ্রোহের সুর আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, সাহিত্যের বীণায় তার কতটুকু ধরা পড়বে তা নির্ভর করছে আমাদের স্থিতি-স্থাপকতার উপর। এই যে ধনিক ও শ্রমিকের কলহ এতদিন ধরে পশ্চিমের বার আনা জগৎখানাকে অলোড়িত, চঞ্চল করে তুলেছে, এর কি কিছুই আমাদের মনে রঙ ধরায়নি? তা কি কখনও হতে পারে? একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের সাহিত্যের সুর বদলে গেছে। ধনীর প্রতি, উচ্চ বর্ণের প্রতি, জমিদারের প্রতি, রাজপুরুষের প্রতি সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা আর সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বুর্জোয়া মনোবৃত্তি হয়ত বা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। এখন তা বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? প্রকৃতি তার ফুল বাগানে নানা রঙের ফুল ফোটাচ্ছে, তোমার যদি তার মধ্যে কতকগুলি পছন্দ না হয়, কি করা যাবে? উপায় নেই! বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা, সীতার বনবাস থেকে মুক্ত হয়ে' সাহিত্য-ভ্রমর শ্রীকুন্দ-নন্দিনীরোহিণীর বিলাসকুঞ্জে গিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্য এমন কি রবীন্দ্রনাথেও আমরা বুর্জোয়া মনোভাবের আবহ থেকে মুক্ত হতে পারি নি। অচলায়তনের অনেকগুলি দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে বটে, কিন্তু এখনও মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে হরিজন কোলাহল করছে। শরৎচন্দ্র আরও কয়েক ধাপ তাদের তুলে মন্দিরের গোপুরম অতিক্রম করে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিতে পতিতা মাথা তুলে' দাঁড়িয়েছে, অশিক্ষিত দীন দরিদ্র এমন কি অসৎ চরিত্র বলে' যাদের দিকে আমরা এতদিন ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে' এসেছি তাদের তিনি যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন, সে আসনখানি এতদিন তারা সাহিত্যে পায় নি। দিল্লী-শ্বরের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা, রাজপুত শিবিরের অসি ঝনঝনা ত্যাগ করে' সাহিত্য বাঁশ বনের অন্তরালে, আঁশশেওড়ার তলায়, পল্লীপথের ছায়ায় ঘুরে তৃপ্তি লাভ করছে।

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ যে বদলে গেছে, তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আজকালকার লেখক- বিশেষত উদীয়মান তরুণ লেখকদের—কলমের ডগায় যে আগুন জ্বলছে, তাকে তুচ্ছ করবার মত দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের কখনও না হয়। যে বিশ্ব-গ্রাসী অসন্তোষের ক্ষুধা চারিদিকে তার লেলিহান রসনা বিস্তার করে দিচ্ছে তাকে সত্য বলে মেনে নিতেই হবে। সত্যকে রূপদান করা যদি সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হয়, তবে সেই সত্যকে বরণ করে নেবার সৎসাহসের অভাব যেন কোনও দিন আমাদের না হয়। যে মুক্তির হাওয়ায় আমাদের সাহিত্যের কুঞ্জে কুঞ্জে বিবিধ ফুল ফুটেছে, সেই হাওয়াকে প্রবীণের সমালোচনার সার্সি খড়খড়ি দিয়ে রোধ করবার চেষ্টাকে সমীচীন বলে' মনে করবার কোনও হেতু নেই।

সত্য সন্ধানী সাহিত্যই অমরতার দাবী করতে পারে। যা অসত্য, যা কৃত্রিম তা কখনও কালের নিকষে টিকতে পারে না। যদি প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন ধারা, প্রাচীন জড়ত্বকে আঁকড়ে ধরে আমরা চিরদিন চলতে যাই, তা হলে কতকগুলি নীতিকথাপূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের সৃষ্টি হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সত্যের প্রকৃতি কখনও সীমাবদ্ধ নয়, শাসনের দ্বারা তার হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না, এই জন্যই সত্য মহান্‌, উদার, মনোহর। সে সত্য প্রকাশিত হলে সহস্রকণ্ঠে তার জয়গান ধ্বনিত হয়, দেশে দেশে তার ভেরী বেজে উঠে। কোনও কৃত্রিম, কাল্পনিক মনগড়া সাহিত্যের দ্বারা তা হয় না।

আমি এই কথাটি বলতে একটু কুণ্ঠিত হচ্ছি। কিন্তু না বল্লে আমার বক্তব্য বলা হবে না। আপনারা অদোষদর্শী; দোষ-গুণের বিচারক আপনারা; আমার স্পষ্ট কথায় যদি ক্ষুন্ন হন, তবে আমি নাচার। আমার বক্তব্য এই যে, রাষ্ট্রভাষার যে ধুয়ো উঠেছে, তাতে যেন সত্যের প্রতি জুলুম করবার আশঙ্কা

হচ্চে। লোকের প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে কত শতাব্দী ধরে' যে ভাষা যে দেশে আত্মলাভ করেছে তার দাবী অগ্রাহ্য করবার কথা উঠলেই মনে খট্‌কা বাধে। যদি বলেন যে প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃভাষার অনুরাগ বজায় রেখেও একটি রাষ্ট্রভাষা গঠিত হতে পারে, তা হলে সে কথা সত্য হবে না। কারণ আমরা এখন যেমন করে' ইংরেজী শিখে থাকি, তেমনিভাবে যদি হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার চর্চা করি, তা হলে রাষ্ট্রভাষা তাকে বলা চলবে না। কেননা এখনও ভেবে দেখলে বুঝা যায় যে যারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা একটা রাষ্ট্রভাষার চলন হতে পারে না। প্রাদেশিক ভাষাকে ডুবিয়ে, তলিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে যদি কোনও ভাষাকে ভারতের একতম ভাষারূপে পরিণত করা যায়, তা হলে অবশ্য 'রাষ্ট্রভাষা' নাম সার্থক হতে পারে। কিন্তু প্রথমত এমন শক্তি কার আছে যে এই অসাধ্য সাধন করতে পারবে? রাজশক্তি পশ্চাতে থাকলেও একাজ সহজ হবে না। অশোকের মত একচ্ছত্র নৃপতিও তা করতে পারেন নি। তাঁর বিভিন্ন দেশের শিলা ও স্তম্ভলিপি দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, তিনিও সমস্ত দেশে এক ভাষা চালাতে পারেন নি। শুধু শুধু আত্ম প্রতারণার দ্বারা আমরা বলক্ষয় করতে উদ্যত হয়েছি।

হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে কি বাংলাভাষা, তার বিচারে আমি প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা করি নে। কেন না তাতে বিশেষ ফল হবে না। আমি সব দিক্ বিচার করে' বলবোই ত যে বাংলাভাষা ভারতীয় সকল ভাষা অপেক্ষা উন্নতিশীল, অতএব বাংলাভাষার দাবী অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। আমি এ কথা বললেই আমাদের হিন্দুস্থানী বন্ধুরা বলবেন যে যেহেতু বক্তা বাঙ্গালী, সেই হেতু তিনি বাংলাভাষার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করছেন! তাঁরা ভুলে যান যে আমরাও তাঁদের ঐ একই দোষে দোষী সাব্যস্ত করে' রেখেছি। সুতরাং বিচার অগ্রসর হয় না, যার যার সওদা সে তাই বেশী করে' বিজ্ঞাপিত করে। এতে বাংলা হিন্দী সাহিত্যের বিশেষ কিছু যায় আসে না। লাভে হতে কলহের সৃষ্টি হয়।

আমাদের হিন্দুস্থানী বন্ধুগণ চিরদিন আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন। আমরা বাঙ্গালীরাও তাঁদের নানাপ্রকারে সাধ্যমত সেবা করে' এসেছি। তাঁদের শিক্ষাপ্রচারে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে, সমাজ—সংস্কারে আমরা এতদিন যথাসাধ্য সহযোগিতা করে এসেছি। কিন্তু এখন আর আমাদের সেদিন নেই। আমাদের প্রতি তাঁরা ক্রমেই শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছেন। যা অবশিষ্ট ছিল, তা এই বাংলা-হিন্দীভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ বিষাক্ত গ্যাসে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে বলে' মনে হয়। কিন্তু কেন? প্রত্যেকেই যে নিজের মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হবে এ ত স্বাভাবিক। তাঁরা হিন্দীভাষার মহিমা কীর্তন করুন আমরা কান পেতে শুন্‌তে রাজী আছি। যে ভাষায় সুরদাস, তুলসীদাস, নন্দদাস প্রভৃতি অমরকাব্য রচনা করেছেন, তার প্রশংসায় কে কৃপণতা করবে? কিন্তু ওঁরা অত চঞ্চল হলেন কেন, তা আমি বুঝতে পারিনে। আমি ওঁদের এক অখিল ভারত হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সে সম্মেলনে দেখলাম যেন ওঁরা আগে থেকেই লঙ্কা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে' ফেলেছেন। যাঁরা রাষ্ট্রভাষার পৃষ্ঠপোষক তাঁদের ফতোয়া কিন্তু অন্যরূপ। তাঁরা হিন্দীভাষা ত চান না। তাঁরা চান এমন একটি ভাষা যার অর্ধেক হবে উর্দু আর অর্ধেক হবে হিন্দী। এই নরসিংহ মূর্তি ভারতীয় সাহিত্যের স্ফটিক স্তম্ভ বিদীর্ণ করে' কবে আবির্ভূত হবে তা জানিনে। কার বিনাশের জন্য, সেটাও কালই প্রমাণ করবে।

আমাদের হিন্দীভাষী বন্ধুদের মধ্যে অনেকের বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রীতি আছে শুনেছি! তাঁদের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার আছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যরস-পিপাসুর মধ্যে অনেকে বাংলা-ভাষা শিখেছেন—মেয়েরা পর্য্যন্ত বাংলা বই পড়তে ও বুঝতে পারেন। যাঁরা পারেন না, তাঁদের জন্য বাংলা বইয়ের হিন্দী তর্জ্জমা হয়। ইংরেজীর মারফতেও অনেকে বাংলা সাহিত্যের রস আস্বাদন করেন। আমি দেখছি ভাষার কলহে আমাদের সাহিত্যের প্রতি এই যে স্বাভাবিক প্রীতি আছে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে, সেই প্রীতি আর থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে। প্রতিবেশীজনোচিত প্রীতির পক্ষে এটা যে খুবই পরিতাপের বিষয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

আর একটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পূর্বেই বলেছি সে সত্যের আবহাওয়ার মধ্যেই সাহিত্যের ফুল ফোটে এবং সেই ফুলের শোভা দেখেই জগতের লোকের চক্ষু জুড়ায়। যা কৃত্রিম, কষ্ট-কল্পিত বা অসত্য-প্রসূত তা সাহিত্যের উদ্যানে শিয়াকুল কাঁটার মত কেবল উপদ্রবের সৃষ্টি করে। এই উপদ্রব হতে সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে একমাত্র উপায় সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজকাল যে মিথ্যার চাষ করা হচ্ছে, আমি শুধু তার ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হবো। আপনারা জানেন যে কোন এক দুষ্ট বিধাতার অভিসম্পাতে আমরা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে' নিয়েছি যে মন খুলে' কথা বলা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের এই আধ্যাত্মিক কৃপণতা দুর্দৈবের ফেরে ঘটেছে, আগে এমনটি ছিল না। প্রাণের কথা সরল ভাষায় সহজ আবেগে আমরা বলে' শান্তি পেতাম। শুধু এক জায়গায় এর ব্যতিক্রম হতো—রাজনীতি-ক্ষেত্রে। কিন্তু সেখানেও আমরা ১২৪ এ-ধারা অগ্রাহ্য করে' কারাগার বরণ করতেও কুণ্ঠিত হই নি। এখন সব দিক থেকেই আমাদের কোণ-ঠেসা করবার চেষ্টা হচ্ছে। 'বন্দে মাতরম্' গান এখন আঁধারে পড়তে চলেছে, ইতিহাস ফরমাস মাফিক পড়তে হচ্ছে এবং আনন্দ-মঠ, সীতারাম, রাজসিংহ বর্জনীয় হয়ে পড়েছে। নাটক নভেল প্রবন্ধ নিবন্ধ সর্বত্র আমাদের গতি সীমাবদ্ধ। কি জানি কোথায় কোন সম্প্রদায়ের পায়ের আঙ্গুল মাড়িয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করি। একটি উদাহরণ মনে পড়ছে—রবীন্দ্র মৈত্রের অপূর্ব সৃষ্টি 'মানময়ী গার্লস স্কুলে' একটি চাকরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সে মাঝে মাঝে গান করত 'ভজমন নন্দ ঘোষের নন্দনে'। গৃহকর্ত্রী খৃষ্টান, তিনি বল্‌লেন 'ও আবার কি গান? আমার এখানে ও গান চলবে না বাপু।' তখন সে চাকরটি অনুরোধে গান ধরলো 'ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে।' এই ব্যাপারে একটু হাস্যরসের সৃষ্টি করাই লেখকের অভিপ্রেত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একজন খৃষ্টান সভ্য সত্যই এ দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এরূপ গান যাতে আর না হয়, তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন! এর উপর টীপ্পনী অনাবশ্যক। সান্ত্বনার বিষয় এই যে প্রতিভাশালী লেখক বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তাঁর মরতে ইচ্ছা হতো, যে আমাদের বিধি-বিধান-প্রণেতাদের কি এতটুকু রসবোধও নেই।

এরূপ কড়াকড়িতে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, হিন্দু মুসলমান, জৈন বৌদ্ধ, বাঙ্গালী উড়িয়া, পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ, ব্রাহ্ম খৃষ্টান—এই সব দ্বৈত নিয়েই ত আমাদের সংসার। এ সব দ্বৈত যে আমাদের জীবনে অপরিহার্য। এই দ্বৈত বাঁচিয়ে লিখতে হলে, হয় প্রত্নতত্ত্ব করতে হয় অর্থাৎ প্রাচীনের জীর্ণ কঙ্কাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, আর নয়ত লিখতে হয়, বড় গাছ, লাল ফুল, শালপাতা তাল গাছ ইত্যাদি। আমার মনে হয় যে হিসেব করে' যেমন প্রেম করা চলে না, তেমনি সব দিক বজায় করে' মেপে জুকে সাহিত্যও হয় না।

আসল কথা এই যে, এখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের তেমন মিল নেই। যারা ছিল নিতান্ত আপনার জন, তারা দূরে গিয়ে পড়েছে। সব কিছুতে দোষ অনুসন্ধানের স্পৃহা দেখা দিয়েছে। কাজেই কিছু কেউ বললে চারিদিক থেকে তার নিন্দা ওঠে শতমুখে হয়ে'। সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ করে' অভিমন্যু যে

(শেষাংশ ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিচিত পথ দিয়া ঘোড়ার গাড়ীর একঘেয়ে শব্দ শুনিতে শুনিতে তাহারা শহরের নির্জ্জনতম অংশের ছোট একখানি বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। ইহাই তাহাদের নূতন আশ্রয়, যেখানে কোন প্রশ্ন আসিয়া তাহাদের বিপদগ্রস্ত করিবে না, মানুষের ঘৃণা তাহাদের স্পর্শ না করিয়া দূরেই সরিয়া যাইবে। সঙ্গের বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া তাহাদের মনে একটা সংশয় জাগিলেও, তাহা বেশীক্ষণ টিঁকিয়া থাকিল না। যাহার চক্ষু নাই, তাহার সমস্তই গিয়াছে—তাহার নিকট হইতে সমস্ত কিছুই লুকাইয়া রাখা সম্ভব। কিন্তু গোপন করার যে লজ্জা, তাহা হইতে তাহারা মুক্তই বা হয় কেমন করিয়া! কেন যে গোপন করিতে হইবে, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কি গোপন করিতে হইবে, তাহা মনে হইলেই অলকার বুকের সমস্ত রক্ত জল হইয়া যাইতে চায়। এমন করিয়া থাকা যায় না, অথচ কি ভাবেই যে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। কেবলমাত্র একটা লোক সমস্ত কিছু মিটাইয়া ফেলিতে পারে, কোথায় সে এবং কেই বা সেই লোকটি, তাহা সে জানে না, অথচ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাহার এতটুকু সন্দেহ নাই। কি করিয়া তাহাকে আনা যাইতে পারে তাহা এতদিন ভাবিয়াও সে পায় নাই, আর কোনদিন পাইবেও না বোধ হয়, অথচ পাওয়া যে একান্তই দরকার, তাহা কি সেই লোকটিও বুঝিতে পারিতেছে না?

পরদিন শহরটাতে প্রাথমিক দেখা দেখিয়া লইবার জন্য সতীশ বাহির হইয়া পড়িল। অলকা আসিয়া অরবিন্দবাবুর সম্মুখে দুধের বাটী রাখিয়া বলিল, একটু খেয়ে নিন দেখি।

অরবিন্দ বলিলেন, সতীশ বেরিয়েছে বুঝি? কিন্তু তুমিও গেলে না কেন মা? একটু না বেড়ালে স্বাস্থ্য ভাল হবে কি করে?

অলকা বলিল, স্বাস্থ্য আর ভাল হয়ে কাজ নেই আমার। যা আছে, তার ধাক্কা সামলানই দায়।

হাসিয়া অরবিন্দ বলিলেন, আজও হয়ত তা আছে, কিন্তু তাই বলে অহঙ্কার ক'র না—ভবিষ্যৎ ত এখনও পড়ে আছে। বাঙালীর মেয়েরা কুড়ি পার হলেই বুড়ি তা জান ত'?

বাটী তুলিয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে লইয়া অলকা বলিল, থাক সে-সব কথা এখন এটুকু খেয়ে নিন, নইলে ঠান্ডা হয়ে গেলে কাজ একটু বেড়ে যাবে আর তাতে স্বাস্থ্যও খারাপ হতে পারে।

অরবিন্দ বলিলেন, আমি নিজেই খেতে পারব মা। এ বুড়োর চোখ নেই বলে এতটা অক্ষম মনে করে লজ্জা দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তুমি এসব কাজের ছুতো করে সতীশের সঙ্গে না বেরোও ত আমাকে কিছুতেই খাওয়াতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি। আমি মাঝে পড়ে তোমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে চাই না। এ জীবনের বাকী দিনগুলো আমার শান্তিতে কাটবে, তা আমি জানি, কিন্তু আমার মনের শান্তিও যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে।

অলকা বলিল, সকালে কি আমাদের আর কোন কাজই থাকে না, যে বেড়াতে গেলেই হ'ল। এসেছি যখন, তখন দেখবই ত' সব, কিন্তু আজ সকাল থেকেই কি যেতে হবে নাকি?

অরবিন্দ বলিলেন, না মা আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। ওরা সাহিত্যিক, ওরা মস্ত বড়। এদের সঙ্গে থাকতে পাওয়াও মহা পুণ্য। আমাদেরই মনের দুঃখ, মনের সমস্ত কথা আমরা প্রকাশ করতে না পারলেও এরা প্রকাশ করে দেয়। আমাদের দুঃখ বুঝবার অনুভূতি না থাকলেও এরাই সে-সব বুঝিয়ে দেয় আমাদের। এদের এতটুকু ক্ষতি হ'লে আমাদের হয় মস্ত ক্ষতি। ওরা আমাদের জন্যে পাগল—আমরা কি ওদের না দেখে পারি। তুমি ঠিক বুঝছ না মা, ওর সঙ্গে সব সময়েই তোমার থাকা একান্তই উচিত। কতরকম প্রয়োজনই ত' মানুষের হতে পারে, ওকে কখনও একলা বেরোতে দিও না, সঙ্গে থেকে ওর মনে সব সময়েই আনন্দ জাগিয়ে রেখ।

অলকার হাত কাঁপিয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা কে যেন নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইল। এ সমস্ত কথার অর্থ সে বোঝে। তাহাকে উহারই স্ত্রী মনে করিয়াই না আজ বৃদ্ধের এত উপদেশ। স্ত্রী কথাটা মনে হইলেই তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া যায়। সে স্ত্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণে যাহাকে তাহার স্বামী বলিয়া মনে করে, সে তাহার কেহই নহে এবং সে যে তাহার কেহই নহে, একথা বলিবারও পথ অনেক সময় খোলা থাকে না। অন্য কোন মেয়েকে এমনি বিপদে পড়িতে হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না, হয়ত এমনি করিয়াই তাহাকে ডুবিতে হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোথায় যে তল মিলিবে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।—কিন্তু যাহাই হউক, এ বৃদ্ধকে আর কিছুই বলা যায় না। ইহার বাকী জীবনের শান্তির কোন বিঘ্ন ঘটিতে দিতে আর সে চাহে না। তাহার নিজের জীবনের সমাপ্তি কোথায়, তাহা সে জানে না, কিন্তু উহার সমাপ্তি যে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই নীরব থাকিতে চায়।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অরবিন্দ বলিলেন, আমার একটা ছেলেকে আমি হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে যাকে পেয়েছি, তার এতটুকু অসুবিধেও আমি সইতে পারব না। আমি অন্ধ বলে যে আমাকে ফাঁকি দেবে, তাও চলবে না। ওকে অবহেলা করে কেউ আমার ক্ষমা পাবে না, বউ বলে তুমিও নও।

ধীরে ধীরে অলকা বলিল, অবহেলা তাঁর কোনদিনও হবে না, এ ভরসা আমি আপনাকে দিতে পারি। অন্ততঃ আমি যতদিন আছি সে ভয় আপনাকে করতে হবে না।

মহা খুশী হইয়া হাসিয়া হাত বাড়াইয়া অলকার মস্তক স্পর্শ করিয়া অরবিন্দ বলিলেন, সে আমি জানি মা।

তুমি আছ বলেই ত' আমি তার জন্যে এতটুকু ভয়ও করি না। সে যেখানেই থাক, তোমার স্নেহচ্ছায়া যে সেখানেও তাকে ঘিরে থাকবে, এ আমি জানি। অনেক কষ্টে এ জ্ঞান আমার হয়েছে। আজ মণির মাও নেই, মণিও নেই, আমি কি সে-সব না বুঝে পারি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অলকা বলিল, আগে খেয়ে নিন, ঠান্ডা হয়ে গেলে খেতে ভারী অসুবিধা হবে যে।

বৃদ্ধের সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আর কোন কথা না বলিয়া তিনি নিঃশব্দে সমস্তটা পান করিয়া ফেলিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অলকা বলিল, এবার একটু শান্ত ছেলের মত চুপ করে থাকুন, আমি ও দিককার কাজগুলো শেষ করে নি।

অরবিন্দ বলিলেন, ছেলে নয় বুড়ো।

হাসিয়া অলকা বলিল, ও দুই-ই এক।

অপরাহ্নে সতীশকে আহারে বসাইয়া অলকা একটু দূরে বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে অরবিন্দ আগাইয়া আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, আমাকে ত' আগেই খাইয়ে দিয়েছে, বুড়োকে সবাই করুণা করে, সে আমি জানি। কিন্তু দেরী হয়ে গেলে বলে ভয় দেখান আমাকে কেন! আমি কি সময়টা ঠিক বুঝতেই পারি যে, আমাকে ও-সব মনে করিয়ে দেওয়া? কদিনেই অকেজো হয়ে যাব দেখছি। এর আগে কেই বা খাইয়ে দিত, আর কেই বা এমন করে ব্যস্ত হয়ে উঠত। অবাক হয়ে যাই মানুষের ভাগ্য দেখে!

সতীশ মাথা তুলিয়া বলিল, ভালই করেছেন। আমার জন্যে এতক্ষণ বসে থাকা আপনার পক্ষে মোটেই উচিত হ'ত না, আর তাহলে সত্যি আমার নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হ'ত। এই ত' বেশ হয়েছে—কাছাকাছি বসে থাকাটাই ত' আসল কথা।

হাসিয়া অরবিন্দ বলিলেন, তা ঠিক, আর যা কড়া প্রহরী আছে, তাতে কোনদিকেই অনিয়ম হবার ভয় নেই। তবে তোমার বেলা যেন একটু বেশীরকম ছাড়পত্র আছে দেখছি। এতক্ষণ ছিলে কোথায়!

সতীশ বলিল, গিয়েছিলুম কাছেই একটা মাঠে বেড়াতে। কয়েকটা বড় বড় পাথরও দেখতে পেলুম। কে একজন নাকি অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন সেখানে। সুর-অসুরের সমরে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল নাকি ওখানেই। বাসুকী, শঙ্খ, চক্র, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা পর্য্যন্ত আছে সেখানে, অবশ্য আজ সবই পাথর। দেখলুম সব, নিজেও একটা আবিষ্কার করে ফেললুম—সেই ঐরাবত। ভাবছি সেই আবিষ্কারকদের ধরে সেটাও দেখিয়ে একটু বাহাদুরী নেব। কয়েকটা ফুলও দেখলুম সেই সব ভগবানের মাথায় আর পায়ে। কথা শেষ করিয়া সতীশ হাসিয়া উঠিল।

অরবিন্দ বলিলেন, আমরা বুড়ো মানুষ, এসব নিয়ে তামাশা করবার ভরসা এখন আর আমাদের নেই, তবে শুধু ঐরাবতেই ত' হবে না উচ্চৈঃশ্রবাকেও খুঁজে বার করা চাই। কিন্তু ওই মাঠেই এতক্ষণ এসব আবিষ্কার করা হচ্ছিল বুঝি?

সতীশ হাসিয়া বলিল, না, ওখান থেকে গিয়েছিলুম আর এক জায়গায়। এ জায়গাটার গুণ আছে বলতে হবে—সমস্ত কিছুতেই একটা নূতনত্বের ভাব আছে, আর মজাও আছে বেশ। ওই মাঠেই আর কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁদের কাছে শুনলুম, কাছেই একজনের বাড়ীতে একটা গানের জলসা হবে। গেলুম সেখানে—সাধারণের প্রবেশ নিষেধ না হলেও, অসাধারণ নিমন্ত্রিতও ছিলেন সেখানে। আসর বসেছিল ঘরের মধ্যে আর আমরা, যাঁরা সাধারণ, বসেছিলুম বারান্দায়। মনে হচ্ছিল চলে আসি, কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে বলেই বসে রইলুম।

অলকা আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, সাধারণ অসাধারণ ত' বুঝলুম, কিন্তু সে-সব এখন একটু থামবে কি? থালার ওপর যে-সব জিনিষ আছে, সে-সব যে শক্ত হয়ে উঠবে। যারা লেখে তারাও যে এত কথা বলে তা' আমি ভাবিনি কোনদিন।

অরবিন্দ বলিলেন, ঠিক বলেছ মা, আমার খেয়ালই ছিল না। না আর কথা নয়, তুমি চুপ করে খেয়ে ওঠ তারপর সব-কিছু শোনা যাবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া মনোযোগের সহিত আহার করিয়া মাথা তুলিয়া সতীশ বলিল, বসে থেকে কিন্তু ভালই করেছিলুম। বেশ একটা নূতন অভিজ্ঞতা হ'ল। কতকগুলো লোক থাকেই যাদের ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের কোথাও কোন মিল নেই। আমরা যদি ভগবানের কারখানায় মিস্ত্রীর হাতে তৈরী হয়ে থাকি ত' তারা যে ভগবানের নিজের হাতের তৈরী তা আমি জোর করেই বলতে পারি। কেমন করে শুধু কয়েকটা কাজের দ্বারা মানুষের গর্ব্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া যায়, তা এরা যেন বেশ সহজভাবেই জানতে পেরেছে, আর তাই নিতান্ত সহজভাবেই সে কাজ এরা করতে পারে। আজ যদি নিজের সম্মানটাকে বড় মনে করেই ওখান থেকে চলে আসতুম ত' আমার অভিজ্ঞতার ইতিহাসে মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যেত। সম্মান জিনিষটাকে আমি নেহাৎ তুচ্ছ করতে চাইনে কিন্তু ওটাকে কতকটা খর্ব্ব না করলে সত্যিকার অভিজ্ঞতা হয় না।

অলকা বলিল, আমি যে কথাটা বললুম, সেটা কি একেবারেই গ্রাহ্য হতে পারে না? একটা জিনিষ মানুষকে কতবার মনে করিয়ে দিতে হয়? সবাই এমন কিছু বিরাট পুরুষ নয় যে, একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারবে। কথা বেশী বললে খাওয়া আর হয় না।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া অরবিন্দ বলিলেন, বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধি যে সত্যিই কমে যায়, তা এতদিন বিশ্বাস করতুম না। আজ কিন্তু আর অবিশ্বাস করবার কোন উপায়ই নেই। নিজেদের পেট ভরা থাকলে বুড়োরা অন্যের কথা ভুলে যায়। আমি উঠে যাচ্ছি, খাওয়া শেষ হলে সমস্ত কথা শুনব।

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, না আপনি উঠবেন না, আমি আর কোন কথাই বলব না। মাথা নীচু করিয়া সে আহারে মন দিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মাথা তুলিয়া অলকার

মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আর কিন্তু খেতে পারছি না। পেটটা ভয়ানক ভরে গেছে—আর এতটুকু খেলেই, উ। হাত তুলিয়া সে অলকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অলকা বলিল, না পেট যে ভরেনি, তা বেশ বুঝতে পারছি। কথাগুলোই পেটের মধ্যে ভর্ত্তি হয়ে আছে। কিছুক্ষণ ও-সব ভুলে গিয়ে একটু মন দিয়ে খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অরবিন্দ বলিলেন, না খেয়ে নিলে আমিও আর কিছু শুনব না।

আরও দুই এক গ্রাস মুখে তুলিয়া অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ ভাবে অলকার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, সত্যি আর হবে না। পেট আমার অনেকক্ষণই ভরে গেছে।

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, আচ্ছা কথা বলতে বলতে খেলেও এবার আমি আপত্তি করব না। যা মনে আসে, তা না বলতে দিলে যে খাওয়াও বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তা আমি ভাবিনি।

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, এরা পাগল মা, একেবারেই পাগল। খাওয়া-পরাই কি এদের কাছে খুব বেশী বড় নাকি? আর সাধারণের মত এদের হ'তেও বলি না আমি। ওরাও যদি বিশেষত্বহীন হয়ে পড়ে, তবে আমাদের মত লোকদের দেখবে কে?

কথাটা অলকাকেও কি জানি কেন আঘাত করিল। একবার মাত্র সতীশের দিকে চাহিয়াই সে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। অরবিন্দ নিজের জন্য যে কথা বলিলেন, তাহাই যে কতখানি সত্য হইয়া অলকার জীবনেই প্রকটিত হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। এ সত্য সে সারা দেহ-মনকে একত্রিত করিয়া অতি শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়াছে। এমনি স্বেচ্ছায়ই যদি উহারা পরকে বহিয়া না বেড়াইত, তাহা হইলে তাহার নিজের যে কি হইত, তাহা ভাবিতেও সে চাহে না। এমনি নিঃস্বার্থ উপকারকেও যে কেমন করিয়া কুটীলতাপূর্ণ মনে করিয়া মানুষ মানুষকে ঘৃণিত মনে করিয়া দূরে সরিয়া যায়, কেমন করিয়া যে তাহার অন্তরকে দলিত-মথিত করিয়া ধূলোয় মিশাইয়া দিতে চাহে, তাহা সে ভাবিয়াও পায় না।

সতীশ বলিল, না খাওয়ার আর কোন উপায়ই রইল না। এবার মহাত্মা উপাধিটার জন্যে একটা দরখাস্ত করে দেব! আপনি আমার পৃষ্ঠপোষক হবেন আশা করি।

অরবিন্দ বলিলেন, এর জন্যে দরখাস্ত করতে হয় না, এ-সব আপনি এসে কখন যে কাঁধে ভর করে, তা' কেউ জানতেও পারে না, আর একবার কাঁধে চেপে বসলে মুক্তি পাবারও কোন উপায় থাকে না।

হাসিয়া সতীশ বলিল, আপনার সোজা মতটা বেশ সহজভাবেই পাওয়া গেল, এবার আর একজনেরটা পেলেই কাগজে নাম ছাপাবার ব্যবস্থা করা যাবে। সতীশ অলকার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া আগাইয়া আসিয়া থালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, খাওয়া ত' হয়েছে, এবার উঠলেই ত' হয়। বসে বসে বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে প্রচার না করলেও চলবে।

সতীশ বলিল, আরও একটু খাব ভেবেছিলুম যে, কি মুস্কিল।

অলকা বলিল, আর না খেলেও চলবে। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আর দেরী করতে আমি পারব না।

সতীশ বলিল, থালাটা ত' তোমার নিয়ে যাবার কথা নয়। লোক ত' আছেই, তবে—।

অলকা বলিল, থালা সামনে থাকলে কথাও সমানে চলবে। থালাটা নামাইয়া রাখিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ অরবিন্দবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনি বসুন গিয়ে, আমি এখনি আসছি—গল্পটা শেষ করতে হবে ত'। অবশ্য গল্প না বলে ঘটনা বলাই ভাল।

অরবিন্দ ঘরে যাইতে যাইতে বলিলেন, সে হবে না বাবা, বৌমাকেও আসতে দিতে হবে। আমরা দু'জনেই তোমার শ্রোতা ছিলুম, একজনকে বঞ্চিত করতে আমি চাই না।—

সতীশ আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

দুপুরে ইজিচেয়ারে শায়িত অরবিন্দবাবুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অলকা বলিল, এবার সেই গল্পটা ত' হতে পারে।

অরবিন্দ বলিলেন, গল্প নয় মা,—ঘটনা। গল্প বললে সতীশ রাগ করতে পারে।

সতীশ বলিল, রাগ করতে পারে নয়—রাগ করবেই, হয়ত এতক্ষণ করেই বসেছি। আর হবে না-ই বা কেন, আমার সব কিছুই বুঝি গল্প হয়ে দাঁড়ায়? অন্যে যা বলবে, তাই সত্যি, আর আমার গুলোই কেবল—।

অরবিন্দ বলিলেন, উত্তেজিত হবার কিন্তু সত্যিকার কিছুই নেই এতে। সাধারণভাবে এমনি অনেক কিছুই আমরা ব্যবহার করে থাকি, যার সত্যিকার মানেই হয়ত অন্যরূপ। এই যে তোমার রাগ হচ্ছে, সেই রাগ কথাটার চলতি অর্থ ছেড়ে দিয়ে আসল অর্থে চলে গেলে কি অবস্থা হয় বল ত'? ঠিক উল্টো। অবশ্য এক্ষেত্রে সে অর্থেও রাগ হতে পারে, নয় মা? অলকার হাতটা তিনি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

অলকা তাঁহারই চেয়ারের আড়ালে নিজের মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল। কথাটা যেন একটা বিশেষ অর্থ লইয়া তাহাকে এবং তাহারই সম্মুখে উপবিষ্ট আর একটি লোককে কেন্দ্র করিয়া সেই কক্ষেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে না পারিল কথা কহিতে, না পারিল মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিতে। নিজের মুখের স্পষ্ট রূপ তাহার নিজের কাছেই তখন ধরা পড়িয়া গিয়াছিল।

অরবিন্দ বলিলেন, এবার তোমার সেই ঘটনা সুরু হ'ক তবে।

অলকার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সতীশ আরম্ভ করিল, ওখান থেকে উঠে আসব ভেবেও ব'সে রইলুম, কারণ আমারই মত সবিশেষ অভ্যাগত আরও কয়েকজন ছিলেন সেখানে। তাঁদের সঙ্গেই নিজেকে জুড়ে দিয়ে নিস্তব্ধ মালগাড়ীর মতই একপাশে প'ড়ে রইলুম। ঘরের ভেতরে একটু জায়গা

ছিল, বাইরের কয়েকজন আমাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন,—ভেতরে যাওয়া যেতে পারে কি? ও আসরের নিয়ম আমার জানা ছিল না, ব'ললুম, ঠিক ব'লতে পারিনে, তবে জায়গা যখন আছে, তখন গিয়ে দখল ক'রলে এমন কিছু আপত্তি হওয়া ত উচিত নয়। এ যখন বিয়ের বাসর নয়, অন্দর-মহলও নয়, বরং বাইরের লোকই এখানে প্রায় সব, তখন ওটুকু ভেতরে ঢুকলে কোন পক্ষেরই কোন বিপদ না ঘটাই সম্ভব।

ওদের একজন ব'ললেন, ব্যাপারটা আপনি আরও একটু গুরুতর ক'রে তুললেন দেখছি। সোজা যদি সাহস দিতেন ত যাওয়া যেত, কিন্তু এ অবস্থায়।—

আর একজন ব'ললেন, চলই না চাই, কি এমন আর হ'তে পারে, মার ত আর দিতে পারবে না।

হেসে ব'ললুম, না, মার দেবে না নিশ্চয়, তবে একটু অপমানিত হ'তে পারেন। গিয়েই দেখুন না কি হয়, ওদের কৌলীন্যের সঙ্গে ভদ্রতাও আছে কি-না, সেটাও ত জানতে পারবেন অন্তত।

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ এবার তুমি তাদের সোজাভাবে সাহস দিলে। গল্প শুনিতে শুনিতে অলকা কখন যে সহজ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা জানিতেও পারে নাই। অরবিন্দবাবুর কথা শুনিয়া সেও না হাসিয়া পারিল না।

সতীশ মৃদু হাসিয়া বলিল, কি ক'রব একটু সাহস ওঁদের দিতেই হ'ল। ব'লেছি ত অভিজ্ঞতার জন্যে সম্মানকে কিছুটা বিসর্জ্জন দিতেই হয়। আমার কথা শুনে তাঁরা ভেতরে ঢুকতে গেলেন। কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ গৃহকর্ত্তা বাধা দিয়ে ব'ললেন, আপনারা বাইরেই বসুন, এখানটায় আমাদের সভাপতি ব'সবেন। ভদ্রলোকেরা ভেতরে ঢুকতে না পেরে দরজার সামনে ব'সে প'ড়লেন। আমার পাশে একটি বছর চব্বিশের যুবক ব'সে ছিলণ সে তাঁদের দিকে চেয়ে খুব জোরে হেসে উঠল। তাঁরা অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়লেন।

আমি ব'ললুম, লজ্জার কিছু নেই এতে, আর হাসবারও কিছু নেই। অপমান যদি ওঁদের হ'য়ে থাকে ত আমরাও বাদ পড়ি নি। কিন্তু আমার মনে হয়, এ অপমান আমাদের নয়, যিনি নিষেধ ক'রলেন তাঁরই।

যুবক আমার মুখের দিকে চেয়ে তেমনি হাসি হেসেই ব'ললে, আপনি লেখেন বুঝি?

আমি অবাক হ'য়ে গেলুম, তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললুম, কেন একথা মনে হ'ল আপনার ব'লতে পারেন?

যুবক ব'ললে, আপনার ব্যাখ্যা শুনে। অপমান যদি আপনার সত্যি হ'য়েই থাকে ত তার শোধ নিন। কিছু যদি নাই পারেন ত অসহযোগ ত প'ড়েই আছে। তবে আমার মনে হয়, থেকে যান শেষ পর্য্যন্ত, মজা আরও বেশ খানিকটা হ'তে পারে। বেড়াতে এসেছেন, একটু আমোদ না ক'রলে কি শরীর ভাল হয়?

ব'ললুম, তাই বুঝি মজা ক'রতে ব'সেছেন? নিজেদের অপমান দেখে আমোদও হ'চ্ছে, কি বলুন?

যুবক ব'ললে, চটেছেন দেখছি। কিছু রক্ত আপনার মধ্যে আছে তা'হলে। কিন্তু ওদিকে চেয়ে দেখুন, ও'রা আর এসব কথায় কানই দিতে চাইছেন না। অপমান হ'য়েছে কার বলুন ত?

আর কোন কথাই ব'লতে পারলুম না। কিন্তু ওই শেষ কথাগুলোও মন থেকে তাড়াতে পারলুম না। প্রত্যেকটা কথাই সত্য, যেন ওজন ক'রে বলা, অনুভূতি দিয়ে জানা। অপমান ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্বই যে আমাদের জানা নেই, তা কেউ কেউ বিশ্বাস ক'রতে না চাইলেও এরা যেন অতি সহজেই জানতে পেরেছে। কেবল কতকগুলো কথা দিয়েই আমরা আমাদের ভুলিয়ে রাখি, মনের দুর্ব্বলতা স্পষ্ট বুঝতে পেরে সবাইকে ক্ষমা করাই আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস। চ'লে আসব ভাবছিলুম, কিন্তু তার কথাতেই চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হ'ল। (ক্রমশ)

হিন্দু সাহিত্য-সম্মেলন

(৫১ পৃষ্ঠার পর)

বেরুবে, তার সম্ভাবনা কোথায়? মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ যে পূর্ব্ব বঙ্গকে ঘৃণার চোখে দেখতেন না, বঙ্কিম যে মুসলমান ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করতেন না, শরৎচন্দ্র যে ব্রাহ্মদের ঘৃণা করতেন না, একথা এখন কারেই বা বলি আর কেই বা শোনে? এখনকার সাহিত্য যদি সকলের মন হরণ করতে সক্ষম হয়, তবে তা মিথ্যার জাল রচনা করে'। আমি বলতে চাই যে এভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে সাহিত্যের স্বাধীনতা খর্ব হবে, স্বাভাবিকতা লুপ্ত হবে, ভাবের অভাব ঘটবে। আমি হিন্দু, আপনি মুসলমান, অন্যজন ব্রাহ্ম—আমাদের লেখায় নিজ নিজ আবেষ্টনীর ছাপ ত পড়বেই। তাতে আপত্তি করবার কি থাকতে পারে? আমার লেখা 'প্রেমের ঠাকুর' আমারই জন্মজন্মান্তরের সংস্কার নিয়ে গড়ে উঠেছে। আপনার লেখা মহর্ষি মনসুর বা বিষাদ সিন্ধু আপনার মানসিক সমস্ত বিভব মন্থন করে' জন্মলাভ করেছে, আর ব্রাহ্ম বন্ধু যখন আমার পৌত্তলিকতার উপর কটাক্ষ করছেন, তখন তাঁর সমস্ত আন্তরিকতা ও ভিতরের প্রেরণা তার মধ্যে ফুটে উঠছে। এতে যদি কলহের সৃষ্টি হয়, রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে এগুলিকে বন্ধ করতে হয়, তবে সেটা সাহিত্যের পক্ষে পরম দুর্দিন বলে, আমি মনে না করে' পারি না।

যে গুণে আমাদের সাহিত্য বিশ্বের মধ্যে অতুলনীয় রূপে লাভ করেছে, তার থেকে ভ্রষ্ট হলে আমাদের অভীষ্ট-লাভ দূরে সরে' যাবে। আজ যে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য সে কেবল তার সাহিত্যের জন্য। রাষ্ট্রনীতিক গর্ব আমরা হারিয়েছি। 'বাংলা দেশ আজ যা ভাববে, সারা ভারত তাই পরদিন ভাববে'—এখন আর এ প্রচলন অচল হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দিকে, বাংলার জ্ঞান বৈভবের দিকে আমরা এখনও গর্বের সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারি। সে অধিকারটুকু থেকেও যেন বঞ্চিত না হই, এই আমার পরম কামনা।

* হিন্দু সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

লৌহ-শৃংখলে ঝুলান সেতু

পাহাড়িয়া নদী অপ্রশস্ত হইলেও খরস্রোতা হয় অতিশয়। এইজন্য ঐ সকল নদী পার হইতে পার্ব্বত্য জাতিরা প্রায়শ নৌকার সাহায্য গ্রহণ করে না—বিষম স্রোতে উল্টাইয়া যাইবার ভয়ে; তাহারা তাই মোটা মোটা পার্ব্বত্য লতা বুনট করিয়া সেতু প্রস্তুত করে। তাহা নদীর উভয় তীরে বৃক্ষ অথবা বৃহৎ পাথরের চাংড়ায় আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু উহা নিরাপদ নয়। অনেক সময় জীর্ণ বা ছিন্ন হইয়া দুর্ঘটনার সৃষ্টি করে। আধুনিক কালে সেজন্য ঐ সকল প্রবল স্রোতস্বতীতে লোহার শিকলে ঝুলান সেতু নির্ম্মাণ

লোহার শিকলে ঝুলান পার্ব্বত্য নদীর সেতু

করা হইয়া থাকে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে সর্ব্ববৃহৎ যে নদী অতিক্রম করিতে হয়, তাহার নাম মেকং। কুনমিং হইতে যে নূতন রাস্তা ব্রহ্ম সীমান্ত পর্য্যন্ত তৈরী হইয়াছে, উহাতে যেস্থানে মেকং নদী অতিক্রম করিতে হয়, সেখানে লোহার শিকলে ঝুলান একটি দৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সেতু অন্যূন ২০০ মণ ভার সহিতে পারে। মেকং নদী পার হইবার এমন দৃঢ় সেতু ঐ অঞ্চলের ধারে পাশেও আর নাই একটি। এই পথে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, শান্ ষ্টেটের কালো টুপী ও রঙিন লুঙ্গি পরিহিত শ্রমিক রমণীদের বাঁকে করিয়া তরি-তরকারি বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতে।

পদোন্নতির সংকট

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে লণ্ডনে ডাক্তার একটি ছিল, নাম তাহার সার রিচার্ড কোয়েইন্। মহারাণীর অতিশয় প্রিয়পাত্র বলিয়া উক্ত ডাক্তারকে ভিক্টোরিয়া ব্যারনেট্ পদবী দানে সম্মানিত করেন। পদবীর সঙ্গে সঙ্গে সার রিচার্ড কোয়েইন্ প্রাপ্ত হইলেন মোটা টাকার একটা বিল যাহাতে লম্বা ফর্দ ছিল বিবিধ 'ফি'য়ের। এই 'ফি' সকল পদবী প্রাপককেই মিটাইতে হয়। দরিদ্র ডাক্তার মহা বিপদে পড়িয়া ঐ বিল মহারাণীর নিকট পাঠাইয়া দিল, এই বলিয়া যে—যদি রাণী তাহাকে ব্যারনেট্ পদবী গ্রহণ করিতে বলেন, তবে বিলের মোটা অংকটাও রাণীরই পরিশোধ করিতে হইবে, কেন না, ডাক্তারের এমন সম্পদ বা সামর্থ্য নাই যে সে বিলের টাকা প্রদান করিতে পারে। মহারাণী তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া সৌজন্যের অভাবের জন্য ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু বিলের টাকাটা প্রদান করিয়া ডাক্তারকে সংকট মুক্ত করিলেন।

জন্ রিজ্‌লি কার্টার ছিলেন লণ্ডনস্থ মার্কিন রাজদূতের একজন বিখ্যাত সেক্রেটারী। তাঁহার কর্ম্মপটুতার জন্য প্রথমত তাঁহাকে রুমেনিয়ার মিনিষ্টার এবং পরে আর্জেণ্টিনার মিনিষ্টারের পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত পদ একেবারেই হয় তাঁহার পক্ষে আত্মঘাতী, কারণ তাঁহার পদোচিত জাঁকজমকের কোনও একখানা বাড়ী ঐ দেশে ভাড়া করিতে তাঁহার বাৎসরিক ২০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। অথচ তাঁহার ঐ পদের বেতন ছিল মাসিক দুই-শত পাউণ্ড অর্থাৎ বার্ষিক মাত্র ২৪০০ পাউণ্ড। নিরুপায় হইয়া মিঃ কার্টারকে উভয় পদ গ্রহণ করিতেই অসম্মতি জানাইতে হয়। এবং উচ্চাশার সংকটজনক আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া জন্ রিজ্‌লি কার্টারকে রাজদূতের সেক্রেটারীর পদেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

কাংরার প্রাচীনতম তাপস

কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের এই দেশেই এক সময়ে মানুষ ছিল অতি দীর্ঘায়ু। যেমন দেহ ছিল দীর্ঘতর ও বলিষ্ঠতর, তেমনই আয়ুও তাহাদের হইত দীর্ঘতর—দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। বর্তমানে এই প্রকার সংবাদ অলীক বলিয়াই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু কাংরা

উপত্যকার একটি প্রবীণ তাপস, যাঁহার প্রতিকৃতি এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল, ইনি না কি অধুনা ২০৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সাধনারত জীবনের অধিককালই তিনি ধওলাধরের নিভৃত গুহায় ধ্যান-ধারণায় কাটাইয়া দিয়াছেন। ধওলাধর হইল বহিঃ-হিমালয়ের পর্বতগাত্র। দুই শতাব্দীর যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ এই অঞ্চলে পরিচালিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। এই বয়সেও তিনি যথেষ্ট শক্তিধর—আধিব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। মনে হয় তিনি আরও দীর্ঘকাল স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন।

পতি পরম গুরু

(গল্প)

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সুরেনের যখন বিয়ে হয় তখন সে স্কুলের ছাত্র। একটি ছোট্ট সলজ্জ কিশোরীর সঙ্গে পরিণয় তাহার ভারি মজার বলিয়া মনে হইয়াছিল। এতদিন যখনি যেখানে খেলার সাথীর সঙ্গে মারধোর করিয়াছে, তাহারা কেহই নীরবে সহ্য করে নাই, কড়ায় গণ্ডায় ফিরাইয়া দিয়াছে। এতদিন পরে সুরেন এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইল যে, এমন একটি জায়গা পাওয়া গিয়াছে যেখানে বনিবনাও না হইলে মারধোর করা চলিবে, অথচ প্রতিদান পাওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই।

সুধার মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া বলিল, আমি তোমার পতি পরম গুরু, জানত?

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। বলিল, খুব জানি। আমার মাথার চিরুণিতে ত ঐ কথাই লেখা আছে।

তুমি ত বেশ তড়বড় ক'রে কথা বলতে জান। বেশ, বেশ। মাথার চিরুণিতে ত লেখা আছে কিন্তু কথাটার মানে কিছু বোঝ?

সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে মানে বোঝে।

কি মানে বলত? তুমি কোন্ ক্লাস অবধি পড়েছ?

সুধা বলিল, মনে হচ্ছে এই যে, তুমি আমার সব চেয়ে বড় গুরু।

সুরেন খুশী হইয়া বলিল, বেশ বেশ। এই ত কথার মত কথা। সব চেয়ে বড় গুরু মানে বোঝ ত? অর্থাৎ আমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই তোমার। আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে। ভাঁড়ার ঘর থেকে আমসত্ব নিয়ে এসে লুকিয়ে আমাকে দেবে, মা জিজ্ঞেস করলে আমার নাম বলবে না। অম্বল হলে এরা আমাকে খেতে দেয় না শুকিয়ে মারে। এইবার আর তা চলবে না। তুমি কুলের আচার নিয়ে এসে আমাকে খাওয়াবে। কেমন?

সুধা বলিল, হাঁ।

আমি যখন চিলেকোঠার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে সিগারেট টানব তখন তুমি দরজায় দাঁড়িয়ে চৌকি দেবে। কাউকে সেদিকে আসতে দেখলেই আমাকে সতর্ক ক'রে দেবে। আমি তাড়াতাড়ি সিগারেটটা জানলা গলিয়ে ফেলে দেব আর মুখে লবঙ্গ চিবিয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করব। তা হ'লে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। কেমন রাজী?

সুধা বলিল, রাজী।

সুরেন ভাবিয়া বলিল, হাঁ, আর একটা কথা। রাত্রে যখন মাঠে রস খাওয়ার জন্যে নিতাই আমাকে ডাকতে আসবে তখন আমাকে চুপি চুপি জাগিয়ে দেবে, আর যখন রস খেয়ে ফিরে আসবো তখন চুপি চুপি দরজা খুলে দেবে—মা বাবা কেউ যেন জানতে না পারেন। কেমন রাজী আছ?

. সুধা তৎক্ষণাৎ তেমনিভাবেই জবাব দিল, রাজী আছি।

সুরেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এতদিন যে সমস্ত অসুবিধায় ভুগিয়াছে তার এত সহজে এমন নির্ঝঞ্ঝাট সমাধান হইয়া যাইবে আশা করে নাই। স্ত্রীর বিশ্বস্ততা পরখ করার উদ্দেশ্যে বলিল, আচ্ছা, যাও ত সুধা, ভাঁড়ার ঘর থেকে আমার জন্যে একটু আমসত্ব নিয়ে এস গে।

এত শীঘ্র নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার আহ্বান আসিবে সুধা মনে ভাবিতে পারে নাই। শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, এখন? ওরে বাবা, সেখানে যে মা বসে দিদির চুল বেঁধে দিচ্ছেন।

সুরেন চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল। তবে না তুমি বললে, আমার কথা শুনবে? এই তোমার কথা শোনা? বলিয়া হাতের একটা সেফটি পিন সুধার হাতে বিঁধাইয়া দিল। বধূ যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া পাশের ঘর হইতে শাশুড়ী, ননদ ছুটিয়া আসিল। শাশুড়ী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, কি, হয়েছে মা? ইতিমধ্যেই সুরেন পাশের খোলা দরজা দিয়া চম্পট দিয়াছে। সেইদিকে তাকাইয়া বধূ জবাব দিল, হাতে যেন কিসে কামড়ে দিলে, মা। ননদিনী শরৎশশী চারিদিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই এক্ষুণি সুরেন এখানে ছিল না? বধূ কোন প্রত্যুত্তর দিল না।

ইহার পর কয়েক বছর গত হইয়াছে। সুরেন এখন কলেজের ছাত্র। সুধা পিত্রালয়ে। সুরেন মাঝে মাঝে এক একখানি বই কিনিয়া সুধাকে পড়িবার জন্য পাঠায়। নিরুপমা দেবীর "অন্ন-পূর্ণার মন্দির" পাঠাইয়াছে, জলধর সেনের "অভাগী" পাঠাইয়াছে, অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তি" পাঠাইয়াছে। সেদিন শরৎবাবুর "চন্দ্রনাথ" পাঠাইতেছিল। বেশ যত্ন করিয়া বড় বড় অক্ষরে সুধার উদ্দেশে বইখানির প্রথম পাতায় লিখিল, 'সুধা, আমাদের সমাজ সরযূর উপর যে অত্যাচার করেছে, আশীর্ব্বাদ করি, তার অন্তর্নিহিত বেদনা তুমি সমস্ত বুক দিয়ে বুঝতে পার। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মায়ের অপরাধ কখন মেয়ের উপর বর্ত্তায় না। তবু আমাদের নিষ্করুণ সমাজ নিরপরাধ সরযূকে অন্ধতার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে গৃহছাড়া করলে। সন্তান-সম্ভাবিকা হত-ভাগিনীর সেদিনকার দুঃখ তোমরা যদি না বোঝ ত কে বুঝবে? হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য এই সমাজকে তোমরা যদি ধ্বংস করার ভার না নেও ত কে নেবে? আর একটা কথা। কৈলাস খুড়োর মত লোক জীবনে বেশি দেখতে পাবে এমন আশা করি নে। কিন্তু যদি দেখতে পাও ত শ্রদ্ধা করতে শিখ।

সুধার উদ্দেশে এতগুলি কথা বলিতে পারিয়া সুরেনের মন স্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই মনে করিয়া সে তৃপ্তিলাভ করিল যে, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে নারীজাতিকে দিয়া 'জেহাদ' ঘোষণা করাইয়াছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে উভয়ের দেখা হইল। পাড়াগাঁয়ের বাড়ী—সেখানে প্রাচীন কালের আচার-পদ্ধতি বর্ত্তমান। প্রকাণ্ড বাড়ী-খানি নানা আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। দিনের বেলায় পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়।

সকলের খাওয়া দাওয়া চুকিয়া গেলে অধিক রাত্রে সুধা আসিয়া সুরেনের কপাট নিদ্রা ভাঙাইল। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কেমন আছ? আমার চিঠি পেয়েছিলে?

সুরেন রাগ করিয়া সে কথার কোন জবাব দিল না। ঝাঁজাল স্বরে বলিল, তবু ভাল যে এতক্ষণে ফুরসৎ পেলে! একেবারে রাত কাবার ক'রে এলেই পারতে।

সুধা তেমনি হাসিমুখেই বলিল, কি করি বলত! এই একটু আগেই সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল। তারপর মায়ের পায়ে একটু তেল মালিশ করেই চলে এসেছি।

উৎসাহের আতিশয্যে সুরেন বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বলিল, দেখ, এই তোমাদের জন্যেই আমাদের সমাজের খারাপ নিয়মগুলো কিছুতে বদ্‌লাচ্ছে না। তোমরাই সেগুলোকে মাথায় ক'রে নিয়ে আছ।

সুধা সুরেনের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, খারাপ নিয়ম তুমি কোনগুলোকে বলছ—মায়ের পায়ে তেল মালিশ করা?

সুরেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, না তা' ঠিক নয়। তবে কিনা এই মনে কর যেমন সমস্ত দিন আমাদের দেখাশুনা হ'ল না সেই কোন দুপুরে আমি কলকাতা থেকে এসেছি। কেন স্বামীর সঙ্গে দেখাশুনাও কি পাড়াগাঁয়ের সমাজে অচল নাকি?

সুধা গম্ভীর হইয়া বলিল, পাড়াগাঁয়ের সমাজ আর শহরের সমাজ ব'লে আলাদা কিছু নেই। সব সমাজেরই এক নিয়ম। তারপর মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কেন, তুমি আজ কয় বছর কলকাতায় বাস ক'রে শহরের নিয়ম-কানুন খুব শিখেছ নাকি? সুরেন কোন উত্তর দিল না। সুধা পুনরায় বলিল, কলকাতা থেকে তুমি এলে, ভাল আছ, খেয়েছ দেয়েছ, আমি সবই দেখেছি। সমস্ত কাজের মধ্যে একটা চোখ এবং একটা কান যে আমাদের এই দিকে পড়ে থাকে তা কি জান না? আস্‌তে আমাকে কেউ বারণ করেছিল তা-ও নয়; তবে দেখ্‌তে পাচ্ছি সব ঠিক হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে আর আসিনি। জানি ত রাতটা সমস্তই আমাদের।

সুরেন গুম হইয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, না সুধা, আমার বল্‌বার কথা শুধু তাই নয়। আমি বল্‌তে চাই যে আমরা অর্থাৎ পুরুষেরা সমাজের খারাপ নিয়মের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করি নে কেন, তোমরা অর্থাৎ মেয়েরা তাতে কোনমতেই যোগ দাও না। তোমাদের প্রশ্রয় পেয়েই বদ্‌ সংস্কারগুলো বদ্‌লোচ্ছে না।

সুধা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ, তুমি মিথ্যে উত্তেজিত হ'য়ো না। বদ সংস্কার কোন্‌গুলো তা আমি অবশ্য জানি নে। কিন্তু এই যেমন দিনের বেলায় আমাদের দেখাশুনো। সমাজ ত ব'লে দেয়নি যে, আমাদের দেখাশুনো হ'তে পারবে না। ওটা ব্যক্তিগত রুচি আর শোভনতাবোধ। কেউ পাবে, কেউ পারে না। তুমি যদি চাও তবে ভবিষ্যতে তাই হবে।

সুধার সন্ধির পতাকার নিদর্শন দেখিয়া সুরেন পুলকিত হইয়া উঠিল। বলিল, হাঁ, আমি তাই চাই সুধা। আমি চাইনে যে, আমি যদি বেলা দুপুরে কলকাতা থেকে আসি তবে রাত দুপুরে আমাদের প্রথম দেখা হবে। এই বলিয়া সে সুধাকে আলিংগনে আবদ্ধ করিল। একটু পরে কহিল, কিন্তু এবার আমি তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ।

উঠিয়া গিয়া সুটকেস হইতে সযত্নে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" বাহির করিয়া আনিল। সুধার বিস্ফারিত চোখের সামনে প্রথম পাতাটি সকৌতুকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। সেখানে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়াছে, আশীর্বাদ করি, ভারতীর মত হও।

হাসিয়া কহিল, যার জিনিষ তার নিজের হাতে দিতে পেরে আজ আমার ভারি আনন্দ, সুধা। এতদিন কেবল ডাকেই পাঠিয়েছি—হাতে দেওয়ার আনন্দ পাইনি।

কি মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমার আগেকার বইগুলো সব পড়েছ ত?

সুধা বলিল, পড়েছি। রোজই পড়ি। এই দেখ।

সুধা নিজের তোরংগটি খুলিয়া দেখাইল। তার এক পাশে সুরেনের প্রেরিত বইগুলি পুষ্পমাল্যে এবং চন্দনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে। তাজা ফুলের এবং চন্দনের সৌরভে ঘরখানি এক মুহূর্তে মুগ্ধ হইয়া উঠিল।

ভারতীর চরিত্র সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে এক সময়ে দুই-জনেই ঘুমাইয়া পড়িল। সুরেন বলিতেছিল, এখন আমাদের ভারতীর মত মেয়ের বড্ড দরকার, সুধা। যে মেয়ে স্বামীকে শুধু ঘরের মধ্যেই টেনে রাখবে না, বাইরের বৃহত্তর কাজে, জীবন-মরণের সমস্যায়ও তার সংগী হবে।

আরও কয়েক বৎসর পরের ঘটনার যবনিকা উত্তোলন করিতেছি। সুরেন এখন কলিকাতার কোন আফিসে চাকরি করে। সুরেনের শ্বশুর বরাবরই বড় চাকরি করিতেন—এখন পেন্সান লইবার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিয়াছেন।

বছরখানেক হইল সুধার একটি ছেলে হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতেই সুধার শরীর যেন ভাঙিয়া গিয়াছে। শরীরটা প্রায় ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করে, ভাল ক্ষুধা হয় না, খাইলেও ভাল হজম হয় না। দিন দিন শীর্ণও হইয়া যাইতেছে।

সুধার পিতা হরকান্তবাবু মেয়ের স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইয়া বড় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। স্ত্রী জ্যোতির্ম্ময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, কাল ছুটি আছে—একবার স্যার নীলরতনকে একটা কল্‌ দেব মনে কর্‌ছি। অনেক দিন হ'য়ে গেল, মেয়েটার শরীর সারছে না—রোগও হ'য়ে যাচ্ছে। আর বেশী দিন এ রকম ফেলে রাখ্‌লে শেষে হয়ত একটা শক্ত ব্যারামে দাঁড়াবে।

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, বেশ ত, কাল একবার দেখিয়ে দাও।

হরকান্তবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, সুরেনের খবর কি? সুরেন প্রায়ই আসে নাকি?

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, হাঁ, আসে বৈ কি। এইটেই ত তার আপিসে যাতায়াতের পথ। শিয়ালদায় ট্রেন থেকে নেমে যদি সময় থাকে তবে আমাদের বাসা হ'য়ে পান জল খেয়ে যায়। আবার ফেরার পথে এখানে এসে চা জলখাবার খেয়ে তবে ট্রেন ধরে। মাঝে মাঝে খুব ক্লান্ত বোধ করলে রাত্রিটা এখানে থেকেও যায়।

হরকান্তবাবুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর হস্তস্থিত পেন্‌সিলের আঘাত করিয়া বলিলেন, না, এটা ত ভাল নয়, এটা ত ভাল নয়।

কয়েকদিন পরে সুরেন আপিসে একখানি চিঠি পাইল। এ কথা সে কথার পর শ্বশুর মহাশয় লিখিয়াছেন, সুধার শরীর আজকাল ভাল যাইতেছে না তুমি জান। গতকল্য স্যার নীল-রতনকে ডাকিয়া পরীক্ষা করাইয়াছিলাম। তাঁহার মতে সুধার এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক—তাহার শরীর এবং মনের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয় তৎপ্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। সেই কারণে আপাতত তোমাদের উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করিতেছি। বলা বাহুল্য, তোমাদের উভয়ের মংগলের জন্যই এই ব্যবস্থা করিলাম। সুস্থ দেহ মন লইয়া সুধা তোমার ঘরণী হয় ইহাই আমার একান্ত কামনা। তোমার বয়স এখনো কম—স্বাস্থ্য-হীনা নারীর দায়িত্ব কত বেশী তাহা তুমি জান না। সেই গুরু-ভার হইতে তোমাকে মুক্তি দিবার জন্যই এই চেষ্টা—আশা করি সেই কথাটা মনে রাখিয়া তুমি এই ব্যবস্থা মানিয়া চলিবে। ইত্যাদি।

পত্রখানি পড়িয়া অবধি সুরেনের মন খারাপ হইয়া গেল। বাকি সময়টা আফিসের কাজ একটুও অগ্রসর হইল না এবং নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই আফিস হইতে বাহির হইয়া সোজা ডিক্‌সন্‌ লেনে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া হাজির হইল।

শ্বশুর তখনও আফিস হইতে ফেরেন নাই—সদর দরজায় শাশুড়ীর সহিত দেখা হইল।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বাবা আজ এত সকাল সকাল এলে যে—শরীর ভাল আছে ত?

সুরেন বলিল, হাঁ, মা, শরীর ভালই আছে আজ সকাল সকাল আসার একটু কারণ আছে, চলুন বল্‌ছি।

ভিতরে আসিয়া শ্বশুরের চিঠিখানি শাশুড়ীর হাতে ফেলিয়া দিল। বলিল, অসুখ ত মা অনেক লোকেরই হয়, তাই বলে স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ কোথায় নিষিদ্ধ হয় বলুন ত?

জ্যোতির্ম্ময়ী স্বামীর চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল—হাঁকিয়া ডাক দিলেন, সুধা।

সুধা তখনি দ্বিপ্রহরের নিদ্রা হইতে উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি জবাব দিল, যাই মা,

সুধার ঘোমটাবৃত মুখের দিকে চাহিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, সুধা, তুই সতী মায়ের পেটে জন্মেছিস্‌ না?

সুধা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, তাই যদি হয়, তুই যদি সতী মায়ের মেয়ে হোস তবে এখুনি একবস্ত্রে যেমন আছিস্‌ তেমনি

(শেষাংশ ৬৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

উদ্ভিদের রোগ

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পোকা-মাকড় ফসলের যেমন প্রভূত ক্ষতি করে, তাহা অপেক্ষা রোগের আক্রমণেও ফসলের বড় কম ক্ষতি হয় না। মানুষ এবং জন্তু-জানোয়ার যেমন নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয় উদ্ভিদেরও তেমনি নানাপ্রকার রোগ হয়। অধিকাংশ রোগ উদ্ভিদের পক্ষে মারাত্মক। এমন কি মানুষ এবং জন্তু-জানোয়ারদিগের মধ্যে কোন কোন রোগ যেমন দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া মড়কের সৃষ্টি করে, উদ্ভিদের মধ্যেও সেইরূপ বহু রোগের মড়ক লাগিয়া মাঠের সমুদয় ফসল এককালীন বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে। মাঠের ফসলে, গোলাজাত শস্যে, ফলে, ফুলে, সর্বত্রই নানাবিধ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। কোন কোন বৎসর এক একটি রোগের এমন প্রাদুর্ভাব হয় যে, তাহাতে কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ খুব অধিক হয়। সাধারণত জন্তু-জানোয়ারের অত্যাচার দমন করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। পোকা-মাকড়ের উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য অনেক স্থানে কিছু না কিছু চেষ্টা করিতে দেখা যায়, কিন্তু ফসলে রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে উহার প্রতীকার করিতে এ দেশের কোথাও বিশেষ কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। উদ্ভিদ, ফল, ফুল এবং শস্যের যে কোন রকম রোগ আবার হইতে পারে ইহা এদেশের কৃষকদিগের ধারণার অতীত। অথচ প্রতি বৎসর এদেশে ক্ষেতের ফসল এবং গোলাজাত শস্য নানাবিধ রোগের আক্রমণে বিশেষভাবে নষ্ট হয়, তজ্জন্য কৃষকদিগের ক্ষতির পরিমাণও যথেষ্ট হয়।

উদ্ভিদের নানারকম রোগ হয়। রোগ অনুযায়ী রোগের লক্ষণ বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। অধিকাংশ রোগ এক জাতীয় অথবা একই শ্রেণীর উদ্ভিদ আক্রমণ করে। একই রোগ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদে আক্রমণ করিতে দেখা যায় না। সমুদয় গাছ অথবা উহার যে কোন অংশ রোগাক্রান্ত হইতে পারে, যেমন শিকড়, কান্ড, ডাল-পালা, পাতা, ফুল, ফল অথবা বীজ। উদ্ভিদের কিরূপে রোগ হয় প্রথমে তাহা বুঝা আবশ্যক।

উদ্ভিদের রোগ কি এবং কি করিয়া হয়ঃ—ছত্রকে (ফাংগাস্) অথবা জীবাণু (ব্যাক্টিরিয়া) উদ্ভিদ দেহ আক্রমণ করিয়া উহার ভিতর হইতে রস শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় এবং উদ্ভিদ দেহ মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। উহারা উদ্ভিদ দেহের মধ্যে যতই বিস্তার লাভ করিয়া রস শোষণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই উদ্ভিদের জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে উদ্ভিদ মরিয়া যায়। এই পরভোজী উদ্ভিদ বা পরগাছা দুই রকম উপায়ে দেহ আক্রমণ করে। এক শ্রেণীর পরগাছা অতি সূক্ষ্ম-সূত্রের মত লম্বাকৃতি হয়, ইহাদের ফাংগাস্ বা ছত্রক বলে। ছত্রক অনেক জাতিতে বিভক্ত। গাছের পাতার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহার মধ্য দিয়া অথবা গাছের বহিরাবরণের ত্বক্ যে কোষ দ্বারা গঠিত তাহার দেওয়াল ভেদ করিয়া ফাংগাস্ জাতীয় পরগাছার সূক্ষ্ম সূত্র ভিতরে প্রবেশ করে। গাছের ত্বক্ পুরু অথবা কাষ্ঠময় হইলে ফাটলের মধ্য দিয়া অথবা কোষের দেওয়াল ভেদ করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরগাছায় অতি সূক্ষ্ম ধূলিবৎ বীজের মত এক প্রকার দ্রব্য জন্মে, উহাকে স্পোর্ বলা হয়। এই স্পোর্ এই জাতীয় ছত্রকদিগের বংশ বিস্তার করে। উচ্চতর উদ্ভিদের যেরূপ বীজ জন্মে এই নিম্ন জাতীয় উদ্ভিদদিগের ঠিক সেই প্রণালীতে বীজ জন্মে না বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের বীজাণুকে স্পোর্ আখ্যা দিয়া থাকেন। স্পোর্ বা বীজাণু গাছের যে কোন অংশ আশ্রয় করিয়া প্রথমে একটি অতি সূক্ষ্ম গোলাকার সূত্র নির্মাণ করে। ঐ সূত্র গাছের ত্বক্ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং গাছের দেহ হইতে খাদ্য শোষণ করিয়া বর্ধিত হয় এবং অতি দ্রুতগতিতে বংশ বিস্তার করে। স্পোর্ বা বীজাণু অতি ক্ষুদ্র, অনেক জাতীয় পরগাছার স্পোর্ এত ক্ষুদ্র যে চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সহজেই বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় এবং বাতাসের সাহায্যে অতি সহজেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের জীবনী-শক্তি বহুকাল অবাধ সতেজ থাকে। দারুণ শীত অথবা প্রখর তাপে উহাদের ক্ষতি হয় না। বৃক্ষের অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি এই জাতীয় পরগাছা হইতে অর্থাৎ স্পোর্ উৎপাদক ছত্রক হইতে হয়। ইহারা বহু জাতিতে বিভক্ত। এক এক জাতি এক এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। প্রথমে যে জাতীয় ফাংগাস্ বা ছত্রকের বিষয় বলা হইয়াছে উহাদের স্পোর্ হয় না, উহাদের সূক্ষ্ম সূত্র হইতে উহাদের বংশ বিস্তার হয়, সেই জন্য এই প্রকার ছত্রক সংখ্যা কম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ছত্রক যাহাদের স্পোর্ হয়, তাহারা সহজে ছড়াইয়া পড়ে এবং অসংখ্য রোগের সৃষ্টি করে এবং তাহাদের দ্বারা রোগের বিস্তৃতিও শীঘ্র ঘটে। বৈজ্ঞানিকেরা ছত্রককে এইরূপ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যাহাদের স্পোর্ হয় আর যাহাদের স্পোর হয় না।

আবার কতকগুলি রোগ জীবাণু দ্বারা উৎপাদিত হয়। তামাকের ক্ষেতে অনেক সময় দেখা যায়, তামাক গাছ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যাইতেছে। যেমন কোন গাছ মাটি হইতে উপড়াইয়া পুনরায় মাটিতে লাগাইলে যদি পুনরুজ্জীবিত না হইয়া মরিয়া যায় তাহা হইলে ঐ গাছের যেরূপ অবস্থা হয়, তামাক গাছেরও অনুরূপ অবস্থা হইতে দেখা যায়। তামাক গাছের এইরূপ অবস্থা হয় রোগে। এই রোগ উৎপাদন করে এক জাতীয় জীবাণু বা ব্যাক্টিরিয়া। লঙ্কা গাছে একপ্রকার জীবাণু আক্রমণ করে। এই জীবাণু আক্রমণ করিলে লঙ্কা গাছের ডগা কুঁকড়াইয়া যায় এবং গাছের তেজ হ্রাস পায়। জীবাণু জিনিষটি কি, দুই একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলে সহজে বুঝা যাইবে। ইহা এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে কখনও দেখা যায় না। তাল অথবা খেজুর গাছের রস কিছুক্ষণ পরেই গাঁজিয়া যায়। এই গাঁজিয়া যাওয়া এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার কীর্তি। দুধ হইতে যে দধি প্রস্তুত হয়, উহাও এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার কার্য। অনেক সময় গুড় পুরাতন হইলে বিশেষ বর্ষাকালে গাঁজিয়া যায়, উহাও একপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। এইরূপ কত অসংখ্য জাতি ব্যাক্টিরিয়া যে আছে, মানুষ আজও তাহা সম্পূর্ণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। ইহাদের অনেক জাতি জীব-জন্তুর উপকার করে, আবার বহু জাতি জীবের অপকার করে, অনেক মারাত্মকভাবে। ব্যাক্টিরিয়া একটি মাত্র কোষ বিশিষ্ট জীব। এই কোষের বহির্ভাগ একটি শক্ত দেওয়াল দ্বারা গঠিত। এই এক কোষ বিশিষ্ট ব্যাক্টিরিয়া তাহার (Host) খাদ্যের মধ্যে পতিত হইলে নিজের দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন নূতন দেহ ধারণ করিয়া অতি দ্রুত বাড়িতে থাকে। এইরূপে এক কোষ বিশিষ্ট একটি ব্যাক্টিরিয়া হইতে অতি অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ ব্যাক্টিরিয়া জন্মলাভ করে এবং Host বা খাদ্য দেহময় পরিব্যাপ্ত হয়। গাছের রোগ দুইটি কারণে হয়, ছত্রক অথবা ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা।

গাছের রোগ চিনিবার সাধারণ উপায়ঃ—এখন দেখা যাক, কিরূপে সহজে গাছের রোগ চিনা যায়। গাছের কোনরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পাইলে অনুমান করা যাইতে পারে ঐরূপ অবস্থার কারণ পোকা-মাকড়ের আক্রমণ অথবা রোগের উৎপত্তি। গাছটি পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হইলে সহজেই উহা ধরা পড়ে। পরীক্ষায় পোকার অস্তিত্ব পাওয়া না যাইলে উহা রোগের আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফসলের রোগ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় থাকিলে বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয় না। অবশ্য ইহা খুব সাধারণ নিয়ম। নিশ্চিতভাবে জানিতে হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণের পক্ষে গাছের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া অনুমান করিয়া লইলে চলিতে পারে। কয়েকটি রোগের পরিচয় পরে দিতেছি।

সেইগুলি অনুধাবন করিলে ফসলের রোগ নির্ণয় করা কঠিন হইবে না। ফসলের কয়েকটি রোগের পরিচয় দিবার পূর্বে ফসলের রোগের সাধারণ প্রতীকার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব। কারণ, ফসলের রোগ বহু প্রকার এবং তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা সামান্য প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কিন্তু যে সকল রোগে সাধারণত ফসলের ক্ষতি হয়, সেই সকল রোগের প্রতীকার কতকগুলি সাধারণ উপায়ে করা যায়। এই সাধারণ উপায়গুলির সহিত পরিচিত হইলে রোগের অবস্থা বুঝিয়া রোগ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সহজে করা যায়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহাই।

রোগের প্রতিকারঃ—রোগের প্রতিকার তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া করা যাইতে পারে। প্রথমে গাছের রোগ প্রতিরোধ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া; দ্বিতীয় যে অনুকূল অবস্থায় রোগের আক্রমণ হয় পূর্ব হইতে সেই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া; তৃতীয় রোগ দেখা দিলে রোগ বীজাণু ধ্বংস করিয়া রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করিয়া।

প্রথম উপায়ঃ—গাছ সুস্থ, সবল এবং সতেজ হইলে সাধারণত সহজে রোগাক্রান্ত হয় না অথবা রোগাক্রান্ত হইলে কতক পরিমাণে রোগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং গাছ যাহাতে সতেজ হয় তাহার জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহা করিতে হয়। একই ফসলের কোন কোন জাতির সেই ফসলের সাধারণ রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা থাকিতে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা এইরূপ অনেক শস্যের জাতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ডাক্তার হাওয়ার্ড এইরূপে এক প্রকার গম আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত গম রাষ্ট নামক নিরোধক (Rust resisting variety)।

দ্বিতীয় উপায়ঃ—(১) অধিকাংশ রোগের বীজাণু বা স্পোর্ মাটিতে বহুকাল অবধি জীবিত অবস্থায় থাকে। শীততাপে সহজে বিনষ্ট হয় না। যে জমির ফসলে একবার রোগ দেখা দেয়, সেই জমি দুই তিন বৎসর পতিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে ঐ রোগ বীজাণু মরিয়া যায়, পরে উহাতে পূর্বোক্ত ফসলের আবাদ করিলে রোগ লাগে না অথবা জমি পতিত না রাখিয়া উহাতে অন্য ফসল লাগাইলে ঐ বীজাণু খাদ্যাভাবে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কারণ, এক জাতীয় রোগ সাধারণত একই জাতীয় ফসল আক্রমণ করে। তিন বৎসর পর পুনরায় ঐ জমিতে পূর্বেকার ফসল লাগাইলে ঐ রোগের আক্রমণ হয় না। তিন বৎসরের অধিক সাধারণত স্পোর্গুলি মাটিতে জীবিত থাকে না। ধানের উফ্রা রোগ ধানেই লাগে; গম, যব, ছোলা বা মটরে লাগে না। তবে কতকগুলি রোগ আছে তাহারা একই শ্রেণীর বিভিন্ন ফসলে লাগিতে দেখা যায়। যেমন উইল্ট্ রোগ অড়হর গাছের শিকড়ে লাগিয়া অড়হর গাছকে শুকাইয়া মারিয়া ফেলে, এই রোগ ছোলা এবং মুসুর গাছেও লাগে। ছোলা, অড়হর, মুসুর একই শ্রেণীর উদ্ভিদ।

(২) জমি হইতে ফসল কাটিয়া লইবার পর অনেক ফসলের গোড়া জমিতে থাকিয়া যায়। বহু রোগের বীজাণু ঐ পরিত্যক্ত গোড়ায় থাকিয়া যায়। যেমন ধান গাছের উফ্রা রোগের বীজাণু ধান গাছ কাটিবার পর গাছের গোড়া আশ্রয় করিয়া জমিতে থাকিয়া যায়। পর বৎসর ধান রোপণ করিলে উপযুক্ত সময়ে নূতন ধানের গাছ আক্রমণ করে। সুতরাং জমি হইতে ফসল কাটিবার পর গাছের গোড়া জমিতে থাকিয়া না যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(৩) কাঁচা গোবর কখন জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিতে নাই। কারণ, ইহা বহু রোগের বীজ বহন করিয়া আনিতে পারে অথবা ইহা অনেক রোগের বীজ জন্মাইবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে।

(৪) রাসায়নিক সার যেমন সুপার্ফস্ফেট্ এ্যামোনিয়াম্ সাল্ফেট্ প্রভৃতি চূর্ণ, কচুরিপানার ছাই প্রভৃতি জমিতে প্রয়োগ করিলে যদি জমিতে কোনরূপ রোগ বীজাণু থাকে তাহা মরিয়া যায়।

(৫) গাছের ডাল কাটিলে অথবা কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে সেই স্থানে আল্কাত্রা লাগাইলে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া রোগ বীজাণু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। গাছের ত্বক শক্ত হইলে অধিকাংশ রোগ-বীজাণু গাছের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু ছিন্ন অংশ দিয়া সহজেই ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়।

(৬) ক্ষেতের মধ্যে কোন গাছ রোগাক্রান্ত হইলেই উহা তৎক্ষণাৎ মাটি হইতে উপড়াইয়া পুঁতিয়া অথবা পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(৭) বায়ুর আর্দ্রতা অথবা উত্তাপ বৃদ্ধি ফলের পচন রোগের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। এইরূপ অবস্থায় পচন রোগের বীজাণু সক্রিয় হয়। সুতরাং শুষ্ক এবং শীতল স্থান যেখানে অবাধে বায়ু চলাচল করে, পচন রোগকারী বীজাণুর পক্ষে উহা প্রতিকূল।

(৮) রোগাক্রান্ত গাছের বীজ অথবা কলম ব্যবহার করা উচিত নয়। কিম্বা যে ক্ষেত্রে ফসলে রোগ লাগে, সেই ক্ষেত হইতে বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়।

(৯) সন্দিগ্ধ বীজ ব্যবহার না করাই ভাল। একান্ত ব্যবহার করিতে হইলে শোধন করিয়া লইলে ভাল হয়। যে সব রোগের বীজাণু ফসলের বীজে সংক্রামিত হয় সেই সকল বীজ শোধন করিয়া লইলে রোগ-বীজাণু বিনষ্ট হয়।

বীজ সংশোধন প্রণালী বীজের পরিমাণ অল্প হইলে শোধক ঔষধে বীজ ডুবাইয়া তৎপর শুষ্ক করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বীজের পরিমাণ অধিক হইলে এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা সুবিধাজনক হয় না। এই অবস্থায় বীজের উপর ঔষধ ছিটাইয়া বীজগুলি কয়েকবার উল্টাইয়া ঔষধ সিক্ত করিয়া লওয়াই সুবিধাজনক।

বীজ শোধন করিবার জন্য নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হয়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং অতি অল্প ব্যয়ে যে সকল ঔষধ ব্যবহার করা যায়, কেবল সেই গুলির বিষয় বর্ণনা করা হইল। একটি মাটির পাত্রে ১২½ সের জলের সহিত এক পোয়া তুঁতে গুলিয়া ঐ জলে বীজ ডুবাইয়া, অধিক বীজ হইলে ঐ জল বীজে ছিটাইয়া বার বার উল্টাইয়া ঐ জলে সিক্ত করিতে হয়। বীজগুলি তুঁতের জলে ভালরূপ সিক্ত হইলে ছায়ায় ঐগুলিকে পাতলা ভাবে ছড়াইয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। বীজ এইরূপে শুষ্ক করিবার পর বপন করিতে হয়। তুঁতের জলের পরিমাণ কম অথবা বেশী প্রয়োজন হইলে এই অনুপাতে (সাড়েবার সের জলে এক পোয়া তুঁতে) প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

(১০) মাটি শোধন—কোন ফসলে রোগের আক্রমণ হইলে ঐ ফসল কাটিয়া লইবার পর ক্ষেতের উপরের মাটি আগুন দিয়া পোড়াইয়া লইলে রোগের বীজাণু, পোকা-মাকড় প্রভৃতি পুড়িয়া মরিয়া যায়। বিশেষ যদি পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া জমিতে থাকে, তাহা হইলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। কারণ, এই গোড়াগুলি রোগ-বীজাণু এবং পোকা-মাকড়ের আশ্রয়স্থল।

মাটি শোধন দুই রকমে উপায়ে করা হয়। পূর্ব বর্ণিত উপায়ে মাটি পোড়াইয়া অথবা চূর্ণ কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্য জলে গুলিয়া ঐ জল মাটিতে প্রয়োগ করিয়া। সাধারণত দশ সের জলের সহিত এক আউন্স বাজার প্রচলিত ফর্ম্যালিন্ মিশাইয়া মাটিতে ছিটাইয়া মাটি শোধন করা হয়। কেরল নামক রাসায়নিক পদার্থ একভাগ, চারিশত ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া উত্তম শোধক দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। প্রতি ঘন ফুট জমিতে এইরূপ কেরল মিশ্রিত পাঁচ সের পরিমাণ জল দিলেই যথেষ্ট। মাটি শোধন করিবার ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাসায়নিকদিগের নিকট কেরল

অতি অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।

তৃতীয় উপায়ঃ উপরে বর্ণিত বিভিন্ন উপায় অবস্থা অনুযায়ী অবলম্বন করিলে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু গাছে রোগ দেখা দিলে সেই রোগ বিনষ্ট করিবার জন্য কতকগুলি ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। গাছের রোগে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে যেগুলি সাধারণের পক্ষে যৎসামান্য খরচে সহজে ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব কেবল সেইগুলির বিবরণ দেওয়া হইল। গাছের জন্য যে সকল তরল ঔষধ ব্যবহার করা হয় সেই ঔষধ গাছে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত সাধারণ জলের ঝারি অথবা পিচ্‌কারি দিয়া ঔষধ ছিটান হইয়া থাকে। ফসল বিস্তৃত হইলে স্প্রে নামক যন্ত্র দ্বারা ঔষধ ছিটান সুবিধাজনক। যে সকল রোগনাশক ঔষধ ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঔষধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ ঃ

রোগ নিবারক ঔষধ—(১) তুঁতে ও পাথুরিয়া চূণ মিশ্র। একটি মাটির পাত্রে আধ মণ বা এক টিন জল রাখিয়া একটি কাপড়ের টুকরায় ৬ ছটাক বা ২ তোলা পরিমাণ তুঁতে বাঁধিয়া ঐ জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কিছুক্ষণ ডুবিয়া থাকিলে তুঁতে গলিয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। আর একটি পাত্রে সম-পরিমাণ পাথুরিয়া চূণ রাখিয়া অল্প অল্প করিয়া জল এমনভাবে ঢালিতে হয় যাহাতে ঐ চূণ ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে গলিয়া যায়। এইরূপে ঐ চূণের সহিত আধ মণ অর্থাৎ যে পরিমাণ জল তুঁতের সহিত মিশান হইয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণ জল চূণের সহিত মিশাইতে হয় এবং একটি কাঠি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া ভালরূপে ঐ দুইটি পদার্থ মিশাইতে হয়। তাহার পর উহা এক টুকরা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইলে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহাকে বোর্দো মিক্‌শ্চার বলে। ঔষধটি প্রস্তুত করিবার পর একবার পরীক্ষা করিয়া লওয়া ভাল। কারণ ঔষধে তুঁতের পরিমাণ অধিক হইলে গাছের ক্ষতি করিতে পারে। একটি ছুরির ফলক ঐ ঔষধে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া পরীক্ষা করিলে যদি দেখা যায় যে, ফলকের গায়ে তামার গুঁড়া লাগিয়া আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ঔষধ গাছে প্রয়োগ করা নিরাপদ নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে আরও কিছু চূণের জল উহার সহিত মিশান আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত ছুরির ফলার উপর তামার দাগ লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত অল্প অল্প করিয়া চূণের জল মিশাইতে হয়। সর্ববিধ রোগ নিবারক ঔষধের মধ্যে এই ঔষধটি সর্বোৎকৃষ্ট এবং যৎসামান্য খরচে অনায়াসে ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়।

(২) সোডা ও রজন মিশ্র—বর্ষার সময় বোর্দো মিক্‌শ্চার অর্থাৎ চূণ ও তুঁতে মিশ্র ব্যবহার করিলে সবিশেষ ফল পাওয়া নাও যাইতে পারে, কারণ বর্ষার জলে উহা শীঘ্রই ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বর্ষাকালে বোর্দো মিক্‌শ্চারের সহিত সোডা ও রজন মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। কারণ এই ঔষধ বর্ষার জলে গাছ হইতে সহজে ধুইয়া যায় না। সওয়া সের ফুটন্ত জলে তিন ছটাক তিন তোলা সাধারণ কাপড়কাচা সোডা গুলিতে হয় এবং উহার সহিত সমপরিমাণ রজন মিশাইয়া আধ ঘণ্টা যাবৎ ফুটাইতে হয়। ফুটাইবার সময় একটি কাঠি দিয়া সর্বক্ষণ উহা নাড়িতে হয়। তাহার পর উহা ঠাণ্ডা করিয়া পূর্ব বর্ণিত এক মণ বোর্দো মিক্‌শ্চারের সহিত মিশাইতে হয়।

(৩) পাথুরিয়া চূণ এবং গন্ধক মিশ্র—গাছের পাতা যদি খুব নরম অথবা কাঁচ হয় তাহাতে বোর্দো মিক্‌শ্চার প্রয়োগ করিলে জ্বলিয়া যাইতে পারে এবং গাছের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় বোর্দো মিক্‌শ্চার ব্যবহার না করিয়া গন্ধক ও চূণ মিশ্র ব্যবহার করিতে হয়।

একটি মাটির গামলায় আড়াই পোয়া পাথুরিয়া চূণ রাখিয়া কিছু জল মিশাইতে হয়। জলের সংযোগে যখন চূণ ফুটিতে থাকে তখন অল্প অল্প করিয়া সমপরিমাণ গন্ধকের গুঁড়া মিশাইয়া একটি কাঠি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হয়। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে জলের অভাবে গন্ধক ও চূণ মিশিয়া জমাট বাঁধিয়া না যায়। এইরূপে এক মণ জল মিশাইতে হয়। তাহার পর এক টুকরা কাপড় দিয়া উহা ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই ঔষধ গাছে প্রয়োগ করিলে কেবল যে গাছের রোগ বিনষ্ট হয় তাহা নহে উহাতে গাছের পোকাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

(৪) গন্ধকের গুঁড়া—অনেক গাছের পাতা বিশেষ গোলাপ ফুলের গাছের পাতায় একপ্রকার সাদা ছত্রক রোগ হয়। এই রোগ অধিক হইলে গাছের বিশেষ ক্ষতি করে। এই ছত্রক রোগ দেখা দিলে সূক্ষ্ম গন্ধকের গুঁড়া পাতার উপর ছড়াইয়া দিলে ঐ রোগ দমন হয়। পাতার উপর গন্ধকের গুঁড়া ছিটাইবার পূর্বে গাছটিতে জল ছিটাইয়া সিক্ত করিলে গন্ধকের গুঁড়া পাতায় লাগিয়া যায়, বাতাসে উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ফসলের সাধারণ কয়েকটি রোগ—এদেশে সচরাচর যে সকল রোগের আক্রমণে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় সেই সকল রোগের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ফসলের রোগ চিনিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। প্রথমে ধানের সাধারণ রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। কারণ ধান বাঙলাদেশের সর্বপ্রধান ফসল। প্রতি বৎসর রোগের আক্রমণে বাঙলাদেশে ধানের প্রভূত ক্ষতি হয়।

বপন করা ধান গাছের রোগ—ধান গাছে যে সব রোগ আক্রমণ করে তাহার মধ্যে উফ্‌রা বা থোড়মরা রোগ প্রধান। সচরাচর জলে ডোবা আমন ধানের গাছে ঐ রোগের আক্রমণ হয়। সময় সময় রোয়া ধানেও এই রোগ লাগে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে যখন ধানে থোড় বা শীষ জন্মিতে থাকে, তখন এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই রোগের বীজাণু প্রথমে গাছের কোমল অংশ এবং কাঁচ ধানের শীষ আক্রমণ করে। গাছের এই সকল কোমল অংশ হইতে রস শোষণ করিয়া ছত্রক বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশ গাছের সমস্ত অংশে ছড়াইয়া পড়ে। গাছের যে অংশে এই রোগের আক্রমণ হয় সেই অংশ প্রথমে ঈষৎ লাল পরে ঈষৎ কালো দেখায়। সাধারণত ধানের শীষ বাহির হইবার পূর্বে অর্থাৎ যে সময়কে ধানের থোড়মুখ অবস্থা বলে সেই সময় এই রোগ ধান গাছ আক্রমণ করে। এই রোগের আক্রমণ হইলে ধানের শীষ বাহির না হইয়া থোড় ফুলিয়া শীষ নষ্ট হইয়া যায়। যদি থোড় হইতে শীষ বাহির হয়, তাহা হইলে ঐ শীষে যে ধান থাকে তাহার মধ্যে শস্য জন্মে না, ধান চিটা হইয়া যায়। এই রোগ প্রথমে ধানক্ষেতের স্থানে স্থানে দেখা দেয় কিন্তু শীঘ্রই ক্ষেতের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পশ্চিম-বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব-বঙ্গে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। প্রতি বৎসর এই রোগের আক্রমণে বহু টাকার ধান বাঙলাদেশে নষ্ট হইয়া যায়। (ক্রমশ)

হামবাগ

(গল্প)

শ্রীসুধীরকৃষ্ণ বসু, বি-কম

অনেকদিন পরে হঠাৎ সেদিন রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা..............

ওর গতিরোধ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিরে বগলা, কেমন আছিস? ঊর্ধ্বদৃষ্টি আমার প্রতি টেনে এনে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ঠোঁটের উপর ভাসিয়ে ও বলে উঠল,—আরে মলয় যে! বেশ নামটি কিন্তু তোর ভাই।.........বগলা আবার হি হি করে হেসে ওঠে। ....হঠাৎ তার এই অহেতুক টিপ্পনীতে আশ্চর্যান্বিত হ'লাম। ওর স্বভাব অনেকদিন থেকেই জানি, তাই সে ভাব মুহূর্তে মধ্যে কাটিয়ে নিয়ে বললাম,—কেন তোর নামটি কি খারাপ? ....মুখ-চোখের একটা বিকৃতভাব দেখিয়ে ও উত্তর করলে—আরে রাম 'ইডিয়ট' যাদের মা-বাবা, তাদের কি জীবনে সুখ-শান্তি কিছু আছে? সামান্য একটা নাম পর্যন্ত 'চয়েস্' করবার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা.........তারা......... কি ব'লব আর তোকে মলয়.........। বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করলাম,—তারপর অনেকদিন পরে দেখা, কি করছিস আজ-কাল। নিঃসন্দেহে ও বললে,—'জার্নালিজ্‌ম্ টেক-আপ' করেছি ভাই। তোরা ত জানিস-ই বগলা মিত্তির কোনওদিনই পরের তাঁবেদারী সইতে পারে না। এই ধর না—এম-এটা আস্‌ছেবারে হ'য়ে গেলেই একটা প্রোফেসারী, আর তার সঙ্গে এই জার্নালিজ্‌ম্।—কি বলিস.........?

বগলাকে ভাল রকমই জানি। বাজে কথার আড়ম্বর দেখিয়ে যারা অর্থহীন আত্মসম্মান বজায় রাখতে সচেষ্ট, বগলা তাদেরই একজন। স্কুলে পড়ার সময় বই বিক্রী ক'রে ওর সিগারেট খাওয়ার কথা আজও বেশ মনে আছে। সুতরাং ওর বাকচাতুর্য কর্ণপাত না করে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় আছিস্ আজকাল? কাঁধে একটা চাপড় মেরে বগলা উত্তর করলে,—'কসমোপলিটন্', ভাই 'কসমোপলিটন্' চাংওয়া, ব্রডোয়ে আভেন্যু বার—যেখানে খুসী আমার কথা জিজ্ঞেস ক'রলেই খোঁজ পাবে। বললাম—ওদিকে ত আমার যাতায়াত নেই ভাই, এদিকে কোন আস্তানা থাকে ত বল। চট ক'রে ও উত্তর করলে—মহৎ আশ্রম। কথাটা বলেই কি জানি কেন মাথা নীচু ক'রে মুহূর্তখানেক ও কি ভাবলে, তারপর আবার বললে,—আচ্ছা 'য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরী' চিনিস ত। বললাম,—না ভাই, 'য়ুনিভার্সিটি'র 'থ্রেসহোল্ড' পর্যন্ত ত পৌঁছাই নি, সে ত তুই জানিস-ই। ....ডান হাতখানা একবার ঘুরিয়ে কলাকুশল কায়দায় ও বললে,—'চণ্ডাল'—'চণ্ডাল' অফিসে, যে কোনদিন ন'টা থেকে তিনটা পর্যন্ত।......জিজ্ঞাসা করলাম, চণ্ডাল!—মানে? কি বল্‌ছিস্ তুই?—ও যেন আমার এই প্রশ্নে একটু বিরক্ত হয়। তাই ঠোঁট দুটি বেঁকিয়ে বলে ওঠে—'ডিস্‌গাষ্টিং', কি করে যে তোদের বোঝাব মলয়? 'উইক্লি, উইক্লি ম্যাগাজিন্'—চণ্ডাল, সম্প্রতি 'পাবলিশড্' হয়েছে। আরে, তার প্রথম সংখ্যাতেই যে আমার লেখা আছে, বল্‌তে বল্‌তে বগলার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে; উচ্ছ্বসিতভাবে ও ব'লে ওঠে,—শুনুবি, বলেই পয়সায় দুখানাগোছের একটা সাপ্তাহিক ওর ঢিলেহাতা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বের করে বেশ নাটকীয়-ভঙ্গিতেই ও প'ড়তে আরম্ভ করে,—

জাগ, জাগ সব দেশের তরুণ নিদারুণ মোহ ছাড়ি,
বন্ধ্যা তরুণী তোমরাও জাগ,—ভাল করে পর শাড়ী
সম্মুখেতে হের প্রবল দ্বন্দ্ব—অহিংস সমর ঘোর ......

বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করলাম, তুই বুঝি এর সম্পাদক........ বললে, মোটেই নয়। লেখা ভাল হ'লে সবাই 'এপ্রিশিয়েট' করে হে........তোমরা ত বুঝ্‌লে না আমাকে,—দেখ্‌বে একদিন এই বগলা মিত্তিরই...........ই কি বিচ্ছিরি নামটা বল ত! 'রাসকেল' বাবা, 'ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট'টাতেও যদি নামটা 'চেঞ্জ' করে দিত......। বললাম, তাতে আর ক্ষতিটা কি এমন হ'য়েছে তোমার?.........উত্তেজিত ও বলে উঠল, ক্ষতি নয়? এ-সব লাইনের ত মর্ম বোঝ না? পছন্দ করে না ভাই, ওর সুর নরম হ'য়ে আসে—নাম দেখেই বলে, যা, এ আবার কি লিখ্‌বে—বিশেষত ঐ মহিলা সম্পাদকগুলি। জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন, লেখা দিতে গেলে কি 'ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট' দেখাতে হয়?.........একটু ইতস্তত ক'রে বগলা উত্তর করে,—জানিস কি, দেখালে ওরা একটু খাতির করে.........।

—মানে তুই দেখাস,—

—হ্যাঁ,—আরও নরম সুরে ও বলে। আমি ব্যবসায়ী লোক, পেটের চিন্তাতেই প্রায় দিনরাত্রি ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই অহেতুক বিলম্ব নিষ্ফল জেনে নিজের প্রয়োজনটা আগে সমাপ্ত করবার আশায় ওকে বললাম,—আমার টাকা-ক'টির কি ক'রলি,—বল্ ত?

ও বেশ অমায়িক স্বরে টেনে টেনে উত্তর করলে,—আরে, টাকার জন্যে তোর ভাবনা নেই। জেনে রাখিস্, বগলা মিত্তিরের চা-সিগারেটের বিলই মাসে পাঁচের কোঠায় পৌঁছায়........। ব'লে ও হি হি ক'রে হাস্‌লে।

বললাম,—কিন্তু আমি ত তোর মত বড়লোক নই......

বাধা দিয়ে ও ব'লে উঠল, আবার সেই এক কথা। সবুর কর না, এম-এতে একটা 'ফার্ষ্টক্লাশ' ত পাবই,—তারপর...... হি......হি......। ওর কথার রেশ টেনে বললাম,—আমাদের বাড়ীতে 'স্লিপ' পাঠিয়ে তোর সাথে দেখা করতে হবে,—এই ত......! চেয়ে দেখি ও আঙুলের ওপর আর একটা আঙুলের ডগাটি রেখে কি গুনে যাচ্ছে আর মুখে কি বলছে। আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি বিড়বিড় করে বকছিস রে?—আমার কথা ও যেন শুনতেই পায়নি এ-রকম ভাব দেখিয়ে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে ও বলে উঠলো,—হয়েছে, এর মধ্যে একটা প্রোফেসারী নিশ্চয়ই, কি বলিস মলয়। এই ধরনা—পনের হাজার, মাসে পাঁচশো করে যদি খরচ করা যায়, তাহ'লে আড়াই বছর যায় তো......। ওর কথা আমি কিছুই অনুধাবন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম,—তার মানে? সস্মিতমুখে ও বললে,—কাউকে বলিসনে ভাই,—

একটা 'গ্র্যান্ড চান্স্' পাচ্ছি। আমি বিমূঢ়দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। —এই 'খৃষ্টম্যাসে'—ও আবার বলতে লাগলো,—আমাদের 'সিভিল ম্যারেজ' হবে। একটা 'উইডো' বুঝলি মলয়,—পনের হাজার টাকা আছে ভাই, 'পেপার দেখে একটা 'এপ্লাই' করেছিলাম। 'ইন্টারভিউ-টিউ' সব হয়ে গেছে, মাত্র 'খৃষ্টম্যাসের' যা দেরী। তারপর...... আয় আয় সিগারেট খাবি।—পাশের দোকান থেকে দুটি সিগারেট কিনে বগলা একটা আমাকে 'অফার' করলে। সিগারেটটি টানতে টানতে বললাম,—দ্যাখ্, আমাদের দেশে 'জার্নালিজম্'-এ টাকা নেই, বিশেষত ঐ চণ্ডাল-ফণ্ডালে লিখে কি-ই বা করবি। তার চেয়ে এম-এ'টা ভাল করে পাশ করতে চেষ্টা কর্।—দম্ভভরে ও উত্তর করলে,—এটা জেনে রাখিস মলয়, বগলা মিত্তির একমাস পড়েই 'ফার্ষ্টক্লাশ' পায়, কিন্তু অন্য ছাত্রেরা দুবচ্ছর পড়েও তা পায় না,—ওখানেই ত অন্যের সাথে আমার তফাৎ। বললাম,—ভালই ত।

তারপর দিনদশেক কেটে গেছে। বড় টানাটানি চলছিল,— তাই বগলার সম্বন্ধে একদিন দুপুরে সত্যিই 'য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে' গিয়ে হাজির হ'লাম। দেখি,—অনেকের মতই বগলা কয়েকখানা মোটা মোটা ইংরেজী বই আর হাতে একখানা "ষ্টেটস্ম্যান" নিয়ে বসে নিবিষ্ট মনে পড়ছে। সশঙ্কিত পদে ধীরে ওর পেছনে গিয়ে ডাকলাম, —বগলা। ব্রস্তভাবে ও ফিরে চেয়ে বললে,—আরে মলয় যে! আর ভাই পারা যায় না। 'লাইট হাউসে' কাল 'ম্যাড মিস্ ম্যানটন'-এর 'ট্রেড-শো' আছে বুঝলি, আমাদের 'চণ্ডালের' তরফ থেকে আমাকেই যেতে হবে কিনা—তাই...। আচ্ছা ফ্যাসাদ ভাই, একে মোটেই সময় নেই।......সেইজন্যে এই 'সিনেমা পেজ'টি দেখছি কে কে আছে এতে।—ভাবলাম,—কি দৈন্য, স্পষ্টই আমি দেখলাম বগলা 'ওয়ান্টেড' কলম থেকে নিবিষ্ট মনে কি ওর 'নোটবুকে' লিখে নিচ্ছিল। মনে মনে একটু হেসে বললাম,—বাইরে যাবি কি এখন। ও উত্তর করলে,—দেখ 'ভার্গব কেবিনে' আমার নাম করে কিছু নিয়ে বস্ গিয়ে যা—আমি এখনি যাচ্ছি,—কিছু মনে করিস নি ভাই। বললাম,—না, না—তার দরকার নেই, আমি বাইরে আছি, তুই আয়।......

বগলা সেদিন এসেছিল কিনা জানি না,—তবে আমার সাথে তার আর এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা হয় নি।......

দিনের পর দিন বগলার এই চাতুরী ভাল লাগছিল না। তাই ওর আসল রূপটি উদ্ঘাটিত করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলাম। 'সিকসথ্ ক্লাস' থেকে এই 'সিকথ্ ইয়ার' পর্যন্ত —দীর্ঘ বারটি বৎসর ধরে ওযে আমাদের বোকা করে রেখেছে —এর বোঝাপড়া একদিন করতেই হবে। তাই—অকুণ্ঠিত চিত্তে একদিন সোজা 'ষ্টেটস্ম্যান' অফিসে গিয়ে আমার জুতার দোকানের জন্য একজন গ্রাজুয়েট সেল্স্ম্যান চাই—এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে এলাম। দুটি টাকা আমার খরচ হ'লো বটে, তবু মনকে সান্ত্বনা দিলাম,—'হাম্বাগ্'টি যদি আসে।

পরের দিন একরাশি দরখাস্ত কাগজের অফিস থেকে দিয়ে গেল। ঔৎসুক্যভরে দরখাস্তের নীচে দরখাস্তকারীর নামটি কেবল দেখতে লাগলাম। এবং অবশেষে বন্ধুবর বগলার স্বাক্ষরযুক্ত কাতর প্রার্থনাপূর্ণ 'পত্রখানা'ও হাতে পড়লো, ছোট ভাই'য়ের সাথে পরদিন অফিসে দেখা করতে জানিয়ে সেইদিনই ওর কাছে পত্র পাঠালাম।......

তারপর আরও দিন সাতেক কেটে গেছে।—

'চিত্রা'র সামনে বেলা দুইটার সময় বগলার সাথে দেখা। ও-ই আমাকে আগে অভ্যর্থনা করলে, বললে—মলয়ে যে!—বললাম, হ্যাঁ ভাই—কোত্থেকে? উত্তর করলে,—আর বল কেন,—'অধিকারে'র 'ট্রেড-শো' ছিল। কি যে ছাই মাথা-মুণ্ডু লিখি—অথচ লিখতেই হবে। জিজ্ঞাসা করলাম,—কেমন লাগলো?—হাত নেড়ে ও উত্তর করলে,—'ফরেন্ পিকচারের' কাছে এ-সব? হুঁ—বিদ্রূপভরে ও বলে চলল,—কি যে বলিস মলয়!—আকাশ-পাতাল তফাৎ,—'হেভেন এ্যান্ড হেল্ ডিফরেন্স'! তবে হ্যাঁ 'নিউ থিয়েটার্স'কে প্রশংসা করতেই হবে—।—কারণ? জিজ্ঞাসা করলাম।—একমাত্র এবং প্রধান কারণ হচ্ছে—প্রশংসা না করে উপায় নেই—। বললাম,—উপযোগী না হ'লেও।—নিশ্চয়ই,—ও উত্তর করলে,—সাপ্তাহিক, মাসিক আর দৈনিকগুলি তো ওদেরই অনুগ্রহে বেঁচে আছে।—হঠাৎ ওধারের 'ফুটপাতের' দিকে ও ব্যগ্র দৃষ্টিপাত করে বলে ওঠে,—আর দেরী করতে পারবো না ভাই,—'একস্কিউজ' করিস্। মিস্ দে'কে আমার বিশেষ প্রয়োজন আজ। জানিস্ তো উনি হচ্ছেন,—'উন্মাদের' 'চীফ এডিটর'। ঐ যে ঐ ফুটে যাচ্ছেন।—চেয়ে দেখলাম,—ক্ষীণ কালো একটা 'ষ্ট্রেট লাইনে'র মত একজন মহিলা বাঁ-হাতে একটি ছাতা ধরে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছেন। বগলা সেদিকে চেয়ে আর একবার বললে,—দেখছিস্,—'টপ্ টু টো' 'মডার্ন', সত্যিই মলয়—ওরাই মেয়ে বটে!—পুরুষদের 'চার্ম' করতে......

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—কেন, প্রেমে পড়েছ নাকি?—

সলজ্জভাবে ও উত্তর করলে,—সম্পূর্ণ নয়। তবে কি জানিস্—ওকে আমার বড্ড ভাল লাগে।

আর একবার মহিলাটির দিকে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিতেই আমার মন ভরে উঠ্লো বেশী। বগলা যেতে উদ্যত দেখে বল্লাম,—বড্ড টানাটানি চলছে ভাই,—কিছু যদি আমায় দিস্ আজ।......

পকেট থেকে 'মণিব্যাগ' বের করে একখানি পাঁচ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে ও বললে,—কালকেই ভাই, 'উন্মাদ' থেকে চেকটা পাঠিয়েছিল। 'উন্মাদ' আফিস জানিস তো কোথায়,—১৩ নম্বর রায়প্রসাদ ষ্ট্রীটেরে। সেখানে খোঁজ করলেই আমাকে পাবি।—বলতে বলতে বগলা একরকম ছুটেই মিস্ দে'র পশ্চাদ্গামী হ'লো।......

নোটখানি হাতে নিয়ে ভাবলাম,—এই তো ওর জার্নালিজম্। ১৩ নম্বর রায়প্রসাদ ষ্ট্রীটে আমারই জুতার কারখানার অফিস। আর বগলা সেখানকারই সেল্স্ম্যানের চাকুরী নিয়েছে! হায় রে মূর্খ! মনে মনে হাসি পেলো।

একটী ছোট গ্রামের কথা

হুগলী জেলার হরিপাল থানার এলেকায় চন্দনপুর একটি ছোট গ্রাম। চন্দনপুরে রেলষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে গ্রাম্য যোগাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। শ্যামাপূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা এই আশ্রমে গিয়াছিলাম। আশ্রমটিতে ছোট একখানা আটচালাঘর, এই ঘরটি খেলাঘর, সম্মুখে একটু মণ্ডপ, পিছনে একখানা ছোট চালাঘর, খড়, বিচালী এবং পাটকাঠিতে ঘরগুলি ছাওয়া। চারিদিকে খোলা মাঠ। কিছু দূরে গ্রাম। আশ্রমের দিকে গ্রামের যে অংশ, সেই অংশে কয়েক ঘর ক্ষত্রিয়ের বাস। ইঁহারাই এখানকার জমিদার। আর কয়েক ঘর গরীব লোকের বসতি, ইহারই আশেপাশে। ইহাদিগকে এই অঞ্চলে কুলী বলা হয়, উহারা বাউরী প্রভৃতি শ্রেণীর লোক।

এই ক্ষুদ্র গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণী সমাজে যাহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত এবং অধিকাংশ স্থলে অস্পৃশ্যরূপে পরিগণিত, তাহাদের প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য, দীন-নারায়ণের সেবা। ব্রহ্মচারীজী তিন দফা এম-এ পাশ করিয়া এবং বিলাতে ঘুরিয়া আসিয়া দরিদ্রের সেবার মহানব্রতে এখানে আত্মনিয়োগে উদ্যত হইয়াছেন। স্থানীয় ক্ষত্রিয় বাবুরা তাঁহার এই উদ্যমে সহায়তা করিতেছেন দেখিয়া সত্যই অন্তরে আনন্দলাভ করিলাম।

বক্তৃতার সময় সেই আনন্দই প্রকাশ করিলাম, বলিলাম এই কথাটি যে, বাঙলার অন্তর দীন-নারায়ণের এই সেবা রসের আস্বাদনই চাহিতেছে। এই সেবার রসে বাঙলার মাটী যেই একটু ভিজিবে, অমনিই এখানে মহাশক্তির স্ফুরণ হইবে। প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে এই সেবার প্রবৃত্তির মধ্যে। যাহারা দরিদ্র, যাহারা উপেক্ষিত, যাহারা অশিক্ষিত, যাহারা অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সেবায় আত্মনিবেদন করিয়া দিতে পারিলে, সেই আত্মনিবেদনের একান্ত রসকে জীবনে সত্যকার সম্বল করিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে, বাঙলা দেশে আজ চাই তেমন লোকের। আবশ্যক তেমন শক্ত মানুষের, যাহারা মান, যশ, প্রতিষ্ঠাকে তুচ্ছ করিয়া নীরবে এবং নিভৃতে সেবা-ধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিতে পারিবে। এ দেশের রাজনীতির মর্ম্ম কথা হইল এই সেবা এবং এইখানে রাজনীতি আধ্যাত্মিকতার সাধনাঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যটি একদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তিনি চাহিয়াছিলেন, এমন একদল সন্ন্যাসী, যাহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া এই সেবা-ব্রতে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। ত্যাগের শক্তি বড় শক্তি—বড় শক্তি এই সেবার। এ দেশের তত্ত্বদর্শীরা বলিয়াছেন, সর্ব্ব জীবে যিনি নারায়ণ দর্শন করিয়াছেন এবং সেই দৃষ্টিতে পরকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া নয়, নিজে সেবা-রসের আস্বাদনে কৃতার্থ হইবার জন্য যিনি উদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার বশ হয়। শক্তি শক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া। সমগ্র জাতিকে নাড়াচাড়া দিতে পারেন তাঁহারাই, নতুবা শুষ্ক রাজনীতিক সূত্র আওড়াইয়া কিছুই করা যায় না।

চন্দনপুরের আশ্রমের আকার আজ সামান্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকৃত শক্তির বীজ রহিয়াছে। সেবা রসের সিঞ্চন লাভ করিলে, এইখানকার উপ্ত বীজ হইতে মহীরুহের উদ্ভব হইতে পারে। এই ভাবের বীজ বাঙলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়া দরকার। সাধক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—মূর্খ দরিদ্রের দেখি সুজন যে হাসে, কুম্ভীপাকে পড়ে সেই নিজ কর্ম্ম দোষে। এই কর্ম্মদোষেই যে আমরা পরাধীনতার কুম্ভীপাকে পচিতেছি, এ অনুভব আমাদের কয়জনের আছে? মূর্খ দরিদ্রেরে দেখিয়া আমরা কার্যতঃ না হাসিলেও জাতির ভিতরকার অপরিসীম মূর্খতা এবং দারিদ্র্যের সম্বন্ধে আমাদের যে উদাসীনতা—সেই উদাসীনতার মধ্যে নির্ম্মমতা এবং নিষ্ঠুরতা যে কতখানি, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে। মূর্খ দরিদ্রকে দেখিয়া আমরা মুখে হাসি না বটে, মনে মনে হাসি। তাহাদের জন্য বিন্দুমাত্রও বেদনা বোধ নাই আমাদের প্রাণে, সুতরাং মুখে না হাসিলে, কাজে হাসার আর বাকী কি? বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের কথাতেই বলিতে হয়,

মানুষ হইয়া যাহারা মানুষের দুঃখ-কষ্টে এমন বেদনাবিহীন—সে সব জাতির কি কল্যাণ কোনদিন হইয়াছে, হইবে, ভাবি দেখ মনে?

বহুদিন পূর্ব্বে আসামের একজন খাসিয়া নেতার কাছে এই কথাটাই শুনিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম আপনারা খাসিয়ারা বাঙলার অক্ষর না লইয়া রোমানটিকে লইলেন কেন? অসমীয়া আখর বাঙলা আখর; সে আখর লইলে আমাদের সঙ্গে ত যোগ থাকিত বেশী। উত্তরে তিনি বলিলেন, আপনারা কি আমাদিগকে সত্যই চাহেন? আমরা অশিক্ষায় কুশিক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছি, আপনারা আমাদের জন্য কি করিয়াছেন? একবার চলুন ভিতরে লইয়া আপনাকে দেখাইব, বিদেশীরা আমাদের জন্য কি করিতেছে। ওয়েলেসলিয়ান চার্চ্চের সেবাব্রতের কয়েকটি কেন্দ্র তিনি দেখাইলেন। আমার বিশেষ কিছু বলিবার থাকিল না। আমাদের দৃষ্টি এদিকে কিছু কিছু ফিরিয়াছে রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাধুদের কৃপায়। কিন্তু এখনও এদিকে কত কাজ যে বাকী আছে, সে দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে কি? যাহারা দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পায় না, যাহারা বর্ণজ্ঞান হইতে বঞ্চিত, ব্যাধি-পীড়াতে যাহারা পোকা-মাকড়ের মত মরিতেছে, তাহাদের জন্য আমাদের বেদনা বোধ কোথায়?

চন্দনপুরের আশ্রমের আড়ম্বর সামান্য হইতে পারে, কেবল তাহার অঙ্কুর অবস্থা, কিন্তু ঐ যে বেদনা, সেই বেদনা এখানে আছে; সেই বেদনার বলেই এই আশ্রম একদিন বড় হইবে, এমন আশা করা যায়। বেদনার পরিচয়, যে কয়েক ঘণ্টা সেখানে ছিলাম, তাহার মধ্যেই পাইলাম। দেখিলাম, দলে দলে নরনারী সেই আশ্রমে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। সেখানে তাহারা আপনার জনকে পাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের একটা অকুণ্ঠ ভাব, একটা আশ্বস্তির আভাষ মুখে চোখে। যাহারা জীবনে

(শেষাংশ ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

২২

রাত্রি গভীর। সুপ্ত নির্জনতা, রাশি রাশি অন্ধকার। চৌকিদার কখন হাঁক দিয়া চলিয়া গেছে। দূরে একটা শেয়াল ডাকিতেছে। ইভার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারের নিকষপটে যাহাদের মুখ ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহারা ত কেহই তাহার আজন্মের সাথী নয়। জীবনের পথে দুদণ্ডের দেখা মূঢ়, মূক, অত্যাচারিতা ইন্দিরা, ভয়ার্ত হরিদাসী, ছোট ন'বছরের অসহায় মেয়েটা তাহার মনে অন্ধকারের পিঠে আগুনের লেখার মত ফুটিয়া উঠিতেছে। বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া সে শিয়রের দিককার জানালাটা খুলিয়া দিল। চারিদিকে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। ক্রন্দসী রাত্রি কালো অবগুণ্ঠন মাথায় টানিয়া দিয়া নতমুখে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছে। শশাঙ্কের শেষ চিঠির কথাগুলো তাহার মনে পড়িতেছিল। শশাঙ্ক বড় বড় কারখানার কাজ দেখিতে জার্মানী গিয়াছে। অবাক হইয়া লিখিয়াছে, "একটা কারখানার নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী কুলী-মজুরেরা শনিবারের ছুটিতে এক জায়গায় বসে গল্প করছিল রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরের নিখিলেশ এবং বিমলার চরিত্র নিয়ে। ঐ বইটা প্রথম সংস্করণে এখানে নাকি আশি হাজার ছাপান হয়েছিল। অথচ জার্মানীর লোকসংখ্যা বাঙলাদেশের মত নেই। ভাবতে পার এমন কথা! মানি এদের সভ্যতারও মারণবুদ্ধি যথেষ্ট রয়েছে, জগতের শান্তিকে এরা যেকোন নিঃশ্বাসে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, এরা প্রবলভাবে বাঁচতে জানে বলেই মরণে এমন বেপরোয়া। জীবনমৃত্যুর এই প্রবল রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এর তুলনায় আমাদের দেশের সেই দুটো শসা-কুমড়ো নিয়ে সারাবেলা চর্চা, দুকোণা টান দিতে দিতে জীবনের প্রত্যেকের উপর কাবার করে দেওয়া অসহ্য লাগে। সুখ এবং দুঃখে এই ক্ষুদ্রতা, এই ভীরুতা একেবারে শোচনীয়। জীবন দেবতার কাছে একমনে প্রার্থনা করি, রুদ্র আহ্বানে তিনি আমাদের এই জড়তা ভেঙ্গে দেন। সুখ পাই, দুঃখ পাই, হারি-জিতি সে সমস্তই তুচ্ছ কথা, কিন্তু অন্ধকার জড়তাচ্ছন্ন ক্রন্দসী রাত্রির বার্থ বাহুপাশ থেকে তিনি আমাদের মুক্ত করে দিন।"

ইভা সেই অন্ধকারে হাতজোড় করিয়া মনে মনে জীবন-বিধাতাকে প্রণাম করিল এবং স্বামীর প্রার্থনায় নিজের প্রার্থনা যোগ করিয়া দিয়া সেই অদৃশ্য শক্তির নির্ঝরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিল, যেন সমস্ত প্রতিকূলতা সমস্ত বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াও তাহারা দুইজনে এই ক্রন্দসী নিশার অবসান সূচিত হইয়াছে চোখে দেখিয়া যাইতে পারে এবং সে সূচনার চেষ্টায় যেন তাহাদের সম্মিলিত শক্তিকেও সবলে নিয়োজিত করিতে পারে। শশাঙ্ক জার্মানী ফেরৎ হয়তো আর মাস দুইয়ের মধ্যেই দেশে ফিরিতে পারে। সেই অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের বিরুদ্ধ সমাজে, বিরূপ পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় নিজেদের সামর্থ্যে তাদের জগৎ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইভা চোখ বুজিয়া মনশ্চক্ষে যেন দেখিতে পাইল গ্রামপ্রান্তের পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড জমীতে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া একটা কাপড়ের কল বসিল। ফুলের গাছ, সামান্য সামান্য কুটীর, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, খোলা মাঠ, প্রচুর আলো-হাওয়া এই লইয়া কতকগুলি কর্মী মিলিয়া একটি নবতর স্বর্গ সৃষ্টি হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রন্দসী-রাত্রির কোলে অল্প একটু নক্ষত্রের দীপ্তি। কিন্তু ঐটুকু দীপ্তি হয়তো একদিন জ্যোতির্ময় আলোয় পূর্ণতা পাইবে। কে বলিতে পারে?

পরের দিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিতেই ইভার মনে পড়িল, গাঙ্গুলী-বাড়ীর বড়-বৌ তাহাকে একটা চিঠি দিয়াছে। একটি দশ-এগার বছরের মেয়ে এক টুকরা ছেঁড়া হলদে রঙের বিবর্ণপ্রায় কাগজ কাল সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া চোরের মত পলাইয়া গিয়াছে। কাল রাত্রিবেলায় নানা কারণে মন উত্তেজিত হইয়াছিল বলিয়া পড়া হয় নাই, আজ চিঠিখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া পড়িয়া দেখিল, সে করুণ অনুনয় করিয়া একটিবার তাহার সহিত দেখা করিতে যাইতে লিখিয়াছে। সকালবেলাকার আবশ্যক গৃহকাজ সারিয়া চা-খাওয়ার পর গাঙ্গুলী-বাড়ীতে যাইয়া ইভা দেখিল সেখানে বেশ একটু সোরগোল। গৃহিণী বলিলেন, বড়-বৌমা পাঁচমাস পোয়াতী ছিল। কখন যে পেটবেদনা আরম্ভ হয়েছিল, জানায় নি কিছু। আজ-কালকার মেয়েদের মত ত নয়, ভারি লজ্জাশীলা, প্রাণ যায় তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। কাল সারারাত্রিতে পেটের ছেলেটি নষ্ট হয়ে যায়। বৌমা এখন শয্যাগত, দাই ডাকতে গেছে।

ইভার মনে পড়িল কাল বিকালবেলাতেও সে বড়বৌকে প্রকাণ্ড এক ঘড়া লইয়া পুকুরঘাটে কাপড় কাচিয়া জল আনিতে দেখিয়াছে, এমন অবস্থাতেও এতখানি ক্লেশ স্বীকার করিবার আসল কারণটা যে কি, ইভা তাহার মানে বুঝিতে পারিল না। শুধু লজ্জাশীলতাই যদি তার কারণ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে জগতে এমন অনেক বস্তু আছে, ইভা যার মানে বোঝে না। বড়-বৌটি আটটি-নয়টি ছেলে-মেয়ের মা। তাহার বড়ছেলে কলিকাতার কলেজে আই-এ পড়িতেছে এবং কোলের আটমাসের মেয়েটি সেইখানেই তাহার সামনে রোয়াকে ছড়ান চারটি শুকনো মুড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। সেইদিক পানে চাহিয়া ইভা কহিল, কোলের মেয়েটি এই ত সবে আটমাসের, এর মধ্যেই আবার ছেলে হওয়ার কথা ছিল?

বড়-বৌয়ের শাশুড়ী গাঙ্গুলী-গিন্নী সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি করবে মা, মানুষের সাধ্যি নেই, ভগবান যটি দেবেন, বরাতে যা লেখা আছে সে ত হবেই হবে।

ইভা দেখিল, তাহারা এখন বড় ব্যস্ত। বিকালে আবার

আসিবে বলিয়া সে চলিয়া গেল। বড়-বৌয়ের সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না বলিয়া তাহার মনটা ক্ষুব্ধ হইয়া রহিল। সে বেচারা দেখা করিতে বলিয়াছিল, না জানি তাহার মনে কত ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়াছে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল, একটা মেছুনি এক চুপড়ি মাছ হাতে ও কোলে একটা মাস-ছয়েকের ছেলে লইয়া খিড়কির দুয়ারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উমা তাহাকে দেখিয়া কহিল, বৌদি, কোথা গেছিলে? তোমার জন্যে ঐ চা ক'রে ঢেকে রেখেছি, নাওগে ভাই। এখনও গরম রয়েছে খুব। আমি ততক্ষণ মাছ ক'টা ওজন করিয়ে নিই।

ইভা কহিল, এই ত চা খেয়েছি, এখন আর তেমন খাবার ইচ্ছে নেই। আজ বিকেলে আমার সঙ্গে গাঙ্গুলীদের বাড়ী যাবে উমা?

উমা লুকাইয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, যাব না কেন? কিন্তু তুমি আজ দাদার চিঠির উত্তর লিখবে না? সেই লিখতেই যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে! কাল তাঁর চিঠি এলো দেখলাম। আজ ত তোমার উত্তর দেবার দিন।

ইভা বলিল, কি লিখব উমা যত দেখছি তোমাদের দেশ, তত মনে হচ্ছে যে দিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাই। তোমার দাদা আসুন তাঁর মস্ত মন, মস্ত শিক্ষা নিয়ে এখানে এদের মধ্যে বাস ক'রতে। পারবেন না, পারবেন না কিছুতেই আমি তোমাকে বলে দিলাম।

উমা মাছের ওজন দেখিতে দেখিতে কহিল, দেশের কথা বাদ দিয়ে নিজের কথা লিখো। সে কথা ত আর ফুরোয় নি।

ইভা বলিল, এক সময় তাই ভাবতাম বটে, কিন্তু তোমার দাদার চিন্তার সঙ্গে নিজের ভাবনা এমন ক'রে মিশে যেতে ব'সেছে যে, নিজের কথা বড় একটা খুঁজে পাই না।

মেছুনি তাহার ছ'মাসের ছেলেটাকে মাটিতে বসাইয়া দিয়া মাছ ওজন করিতেছিল। ছেলেটার দু'চোখের অর্থহীন শূন্য-দৃষ্টি দেখিয়া ইভা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ও বাগ্দি বৌ, তোমার ছেলের চোখ-দুটি নষ্ট হ'ল কেমন ক'রে?

মেছুনি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কহিল, দেবতা ক'রলেন বৌদি। ছেলেটার নিত্যি চোখে জল ওঠে, চোখ বন্ধ হ'য়ে যায়, সবাই বললে কুল-কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিতে তাহলে চোখ খুলবে। কাঁটা দিয়ে খুঁচতেই চোখ অমনধারা হ'য়ে গেল। মাছের পয়সা গণিয়া লইয়া কর্দমাক্ত ভিজা কাপড়ের অঞ্চল কোমরে জড়াইয়া লইয়া সে ছেলে কোলে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবোধ শিশুর সেই চোখের দিকে চাহিয়া ইভার দুই চোখ ভরিয়া সহসা জল আসিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে কহিল, সত্যি উমা, ঐ ছেলেটার মা নিজের হাতে কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে নিজের ছেলের চোখ দুটি জন্মের মত সেরে রেখেছে? ঝি আসিয়াছিল, তথা হইতে মাছের চুপড়ি লইয়া মাছ বাছিয়া দিতে। সে কহিল, কি ব্যাপার জান বৌদি, বাগ্দি জাতে ত ছোট জাত। চোখ উঠেছিল আর কি, ওদের সবতাতেই ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক্। রোজা এসে বললে মন্ত্র আউড়িয়ে কুলের কাঁটা দিয়ে চোখ খোলাতে। তার কথা শুনেই ঐ দশা। ছোট-জাতের মুখে আগুন!!

উমা মৃদুস্বরে কহিল, তুমি মিথ্যে অত দুঃখ ক'রছ বৌদি, যার ছেলে তার ও-সব মনেও নেই। সে আঁধার রাত থেকে উঠে ছেলে কোলে বর্ষার বিল, খাল, ধানের জমিতে জালি নিয়ে মাছ ধ'রে বেড়াচ্ছে। পায়ের কাছ দিয়ে অমন কত সাপ ছপাৎ ক'রে জলে লাফিয়ে প'ড়ছে। ছেলেটাকে কাদা আর জলের মাঝে ভোরের ঠাণ্ডায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। বাড়ীতে কার কাছে রাখবে লোক নেই। চোখ গেছে, তাতে কি, প্রাণ ত যায় নি। প্রাণ গেলেই বা কি, ওদের বছরে একটা ক'রে ছেলে হয়। ছেলে সস্তা, এমন কোন দাম নেই।

ইভা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, উমা তুই থাম্। তুই কি পাষাণী!

উমা তেমন কোন উচ্ছ্বাস না দেখাইয়া কহিল, আমরা এই পাড়াগাঁয়ে অনেকদিন রয়েছি, তোমারও ক্রমশ থাক্‌তে থাক্‌তে মনে কড়া প'ড়ে যাবে। তখন সব জিনিষেই আর অত কষ্ট পাবে না।

ইভা উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, না-না, আমি তোর মত কোনদিনই হব না। আমি কষ্ট পেতেই চাই, কষ্ট যদি না পাব, তবে এত কষ্ট ক'রে এখানে রয়েছি কেন?

উমা মৃদু হাসিয়া কহিল, তা হ'তে পারে। জগতে কোন কোন খাপছাড়া লোক কষ্ট পেতে ভালবাসে। ওর একটা সর্বনেশে তীব্র আকর্ষণ আছে। তোমার আর দাদার সেই নেশাতেই পেয়েছে হয়ত। তবে এখন থেকে ব'লে রাখছি, ও নেশাটা ভাল নয়।

পুকুরঘাটের পাড়ে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া পড়িয়াছে। পল্লীপথের শান্ত দৃশ্যের উপর দিয়া বিকালবেলাকার হাওয়াটুকু ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। উমাকে না ডাকিয়া ইভা একাই দাসীর সহিত পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে গাঙ্গুলী-বাড়ীতে ঢুকিল। বাড়ীতে এবেলা জন-কোলাহল নাই। গৃহিণী বেড়াইতে গিয়াছেন। বড়-বৌ প্রতিমা একা তাহার ঘরে শুইয়া আছে। ছোট জা রান্না করিতেছে। প্রতিমা ক্ষীণস্বরে অভ্যর্থনা করিল, এস ভাই, ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমার কত সাহস দেখেছ?

ইভা দাসীকে বিদায় করিয়া দিল। ঘরে ঢুকিয়া মাটিতে একধারে বসিয়া কহিল, সাহস বই কি! আমার মত কাঠখোট্টা নীরস লোককেও সাহস ক'রে তুমি ডাক্‌তে পার।

প্রতিমা বিদায়-বিধুর হাসিয়া কহিল, কোন দরকারে তোমাকে ডাকিনি ভাই। কোন দুঃখ, কোন ক্লেশের কথা ব'লতেও নয়। যাবার আগে তোমাকে দেখ্‌তে কেমন যেন মন হ'ল।

ইভা চমকিয়া উঠিয়া কহিল, ও সব কথার মানে? অসুখ হ'য়েছে, সেরে যাবে। ছোট ছোট কত ছেলে মেয়ে তোমার, তোমার মুখে ও কথা সাজে না।

প্রতিমা প্রত্যুত্তরে আবার একটুখানি হাসিয়া কহিল,

তোমাকে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে কেন মন হয় জান ইভা? আমার জীবনটাকে বাঁধা দিয়েছি। বে'চে থাক্‌তে হয় তাই বে'চে থাকা। এই অন্ধকূপের মাঝ থেকে যখন হঠাৎ চোখে পড়ে তোমাকে, তখন বুঝ্‌তে পারি বাঁচা জিনিষটা কি। প্রতিমার মুখ-চোখ কেমন অস্বাভাবিক দেখাইতেছে, জ্বরের দমকে সে হাঁপাইতেছিল।

ইভা কহিল, তুমি অসুস্থ, এখন ও-সব কথা থাক্ ভাই।

আভাহীন পাণ্ডুর মুখে মৃদু হাসিয়া প্রতিমা বলিল, আর কি আমার কথা বলার সময় হবে? আমার কত কাজ জান না? সমস্ত কাজের বোঝা এইবার নেমে যাবে, তাই না?

ইভার মনটা সমবেদনায় দুলিয়া উঠিল। মৃদুস্বরে সে কহিল, আচ্ছা প্রতিমা, সত্যি ক'রে বল বাঁচতে তোমার একটুও ইচ্ছা নেই? জীবনে কোন আকর্ষণ কি খুঁজে পাচ্ছ না। ছেলে-মেয়ে তাদের মুখ মনে পড়ছে না?

প্রতিমা আস্তে আস্তে কহিল, ওদের জন্যেই বাঁচতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আমি বে'চে থেকেও তাদের একতিল ভাল কখন ক'রতে পারিনি, ভবিষ্যতেও পারব না। আমারই চোখের উপরে অল্প কয়েকটা টাকার জন্যে বড় মেয়েটার তেজপক্ষে বিয়ে হ'য়ে গেল। বুক ফেটে হাহাকার বেরিয়ে এল, কিন্তু আমি যে মা, শুভদিনে চোখের জল ফেললে অকল্যাণ হবে। তাই চোখের জল চেপে রেখে মেয়েকে আমার কনে-চন্দনে সাজাতে বসলুম। জান আমার কি হ'য়েছে ইভা? পেটের ছেলেটা নষ্ট হ'য়ে যাবার পরে দাই এসে অর্দ্ধেকটা ফুল ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়ে এসেছে। আর আমি বাঁচব না এইবার আমার জুড়বার সময় হয়ে এ'ল ভাই।

ইভা ব্যথিত হইল, যদি তাই হ'য়ে থাকে, তবু এখনও তার উপায় আছে। আমাকে জানালে ভালই হ'ল। আমার শ্বশুরকে ব'লে আমি এখনই শহর থেকে বড় ডাক্তার আনাবার বন্দোবস্ত ক'রছি।

প্রতিমা উত্তেজিত হইয়া কহিল, না, না, কক্ষণ তা ক'র না, তাহলে এরা আর আমায় বাকী কিছু রাখবে না। ছেলেদের মুখ চেয়ে মনের ভিতরটা একবার টন্ টন্ ক'রে ওঠে। না জানি বাছাদের ওরা কত কষ্টই দেবে। কিন্তু কাল রাত্তিরে আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জান, এ যাত্রা আর আমার বাঁচবার আশা নেই। উঃ, কিন্তু কি কষ্ট! একটা গোটা দিন, একটা গোটা রাত!

ইভা তাহার ললাটে হাত দিয়া দেখিল, গা আগুনের মত গরম। ভয় পাইয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া গাঙ্গুলী-গৃহিণীর সহিত দেখা করিয়া বলিল, আপনারা একটু ভালমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। একজন কেউ কাছে সর্বদা থাকুন। আমার মনে হয়, প্রতিমা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী তসরের কাপড় পরিয়া তখন ঠাকুরঘরে শীতলের আয়োজন করিতেছিলেন, মুখটা একটু বাঁকাইয়া কহিলেন, দাইকে ডেকে পাঠাই, সে এসে বসুক কাছে। বাড়ীর লোকে কে আর এই ভর-সন্ধ্যেবেলা আঁতুড়ে যেয়ে বসবে বল বাছা?

ইভা বিব্রতের মত কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ ধরিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, বাড়ীতে শ্বশুরকে বলিয়া কাল সকালেই শহর হইতে একজন বড় ডাক্তার আনাইবার ব্যবস্থা করিবে। দুয়ারের এপারে আসিতেই গাঙ্গুলী গৃহিণীর ঝঙ্কার তাহার কানে গেল, তিনি মেজ-বৌকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, ঐ ছুঁড়িটাকে এখানে ডাক্‌লে কে মেজ-বৌমা? যত লম্বা লম্বা বোলচাল, আর খেরেস্তানি কাণ্ড উনি আমার ঘরে চালাবেন মনে করেছেন। শুনেছি আবার শশাঙ্ক ছোঁড়া বিলাত থেকে এসে এই গাঁ-বাইরেই কিসের না কিসের ব্যবসা খুলবে নাকি। কেমন ক'রে এখানে টিক্‌তে পারে দেখব। বাপের টাকার জোরে ধরাকে সরা দেখ্‌ছে বুঝি, অমন টাকার মুখে মার লাথি। পাঁচ ছেলের মায়ের যুগ্যি একটা ধেড়ে মেয়েকে বেটার বৌ ক'রে নিয়ে এয়েছেন। ভীমরতি ধ'রেছে বুড়োর! বিলাত থেকে বিদ্যার ধুচুনি হ'য়ে এসে ছেলে ক'রবেন ব্যবসা!

মেজ-বৌ টানিয়া টানিয়া মিহিসুরে বলিতেছে, কি জানি মা, আমরা ত ভয়ে ও'র কাছ দিয়েও যাই না। ক'লকাতার মেয়ে, আবার কলেজে পড়া। দরকার কি আমাদের গেরস্ত-বাড়ীর ঝি-বৌদের ও-সব মেয়ের সঙ্গে মাখামাখি করবার। তবে দিদির কথা আলাদা। উনি ত ইভা ব'ল্‌তে অজ্ঞান। কতবার দেখেছি, ঘাটের পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পই হচ্ছে। গল্প আর ফুরোয় না। অত কি কথা তা উনিই জানেন।

গৃহিণী হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, সেইকালেই ব'লে দাও নি কেন মেজ-বৌমা? আচ্ছা দাঁড়াও বিছানা ছেড়ে উঠুন একবার, তারপর আমি মজা টের পাওয়াচ্ছি.........।

ইভা আর শুনিল না, দ্রুতপদে তাহাদের বাড়ীর সীমানা পার হইয়া চলিয়া আসিল।

—ক্রমশ

গাম্বিয়ার প্রধান ফসল

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

নানা কারণে গাম্বিয়াতে আর থাকতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যাই যাই করেও এক সপ্তাহ দেরী হয়ে গেল। শরীরটাও একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাতে অবশ্য রওনা হওয়া বন্ধ হত না, যদি বেরিয়ে পড়তাম। দেশীয় লোকগুলো বিশেষ করে জোলোফ জাতটার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না করে ফিরে যেতে মন চাইছিল না।

একদিন সাইকেলে চেপে তাই বেরিয়ে পড়লাম—মনে মনে সঙ্কল্প তিনদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হব জোলোফদের পল্লীতে। শহরের রেস্তোরাঁতে ওরা যে রকম শঙ্কাই করুক, গ্রামের বস্তীতে নিশ্চয়ই সে রকম শহুরে আবহাওয়া হবে না। কতকগুলি ম্যাচ্-বক্স কিনে নিলাম—কারণ ওদের কাছে এর চেয়ে মূল্যবান উপহার আর খুব কমই আছে।

আওকেন্দা জাতের সমর-সজ্জা; ইহারা বান্টু জাতেরই শাখা; বৃটিশের দেশ অধিকারের পূর্বে ইহারাই নিজ অঞ্চল শাসন করিত।

এবারে চললাম যে অঞ্চলে, শুনেছি চাষ-আবাদের ছড়াছড়ি। ৩।৪ মাইল পথ নিবিড় বনের ভিতর দিয়া পার হ'তে হ'ল। কিন্তু সে যে কি সতর্কতার সঙ্গে তা বলে শেষ করা যায় না। সে এক বিপুল বিরাট সমস্যা—নীচের ঘাস আর ঝোপ-ঝাড়ের দিকে নজর রাখব কখন কোথা হতে ফস্ করে একটা সাপ বেরোয়, না উপরে গাছের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরব পাছে একটা চিতা ওৎ পেতে লাফিয়ে পড়ে উঁচু ডাল থেকে—এর মীমাংসা করা আর শেষ হ'ল না সারা রাস্তা পেরিয়েও। খেলনা পুতুলের চোখের মত আমার চোখ জোড়াকে কেবল ঘুরাতেই লাগলাম ডাইনে-বাঁয়ে আর উপরে-নীচে—সুবিধা ছিল আমার এইটুকু যে পুতুলটার মত আমার বুকে টিপে টিপে ধরতে হয় নি চোখ ঘুরাতে।

একটা বড় মাঠের ধারে বোধ হয় কাঠের ছাউনীর ঘর সেখানা—ফ্যাশান তার দেশীয়দের কুঁড়ের মত, কিন্তু দোর-জানালা যথেষ্ট আছে। সাহেবী পোষাকে মিশ কালো একটি বৃদ্ধের দেখা পাওয়া গেল। সে কতকটা ইংরেজী-ফরাসী মিশ্র ভাষায় কতকটা দেশীয় বুলিতে আমায় বুঝিয়ে দিল—এখানকার চাষের জমির মালিক কেউ নিজেরা চাষ করে না, হয় ভাড়া দেয়, নয় ফসলের বখরায় ইজারা দেয়। বৃদ্ধ কোনও ইজারাদারের অধীন চাকুরী করে। চাষের প্রধান সামগ্রী Shea-nut (বাদাম), Kola-nut (কাফি জাতীয় ফল), বৃহদাকার শসা, নেশপাতি, রাঙা আলু, আম আর লাইম।

তবে বাদামই হল গাম্বিয়ার প্রধান আয়ের পথ। কেন না, বিদেশে প্রচুর পরিমাণে এ জিনিষটিই প্রেরিত হয়, কাজেই এটার চাষ এখানে ব্যাপক। এই বাদামের জন্য ধান-গম ক্ষেতের মত চাষের জমি তৈরী করতে হয় না। এগুলো হল মূলজাতীয় পদার্থ—থোকায় থোকায় ধরে মাটির নীচে, যেমন বড় এলাচ হয় আমাদের দেশে।

কথায় কথায় বৃদ্ধের সঙ্গে খুব ভাব হল, সে আর সেদিন আমায় ছেড়ে দিল না। খাবার আয়োজনে দেখলাম বেশ নূতনত্ব। রুটি মাংস ত ছিলই, রুটির সঙ্গে মাখন ছিল যেমন প্রচুর, তেমনই পরে কোলা-নাটের পানীয় ও নেশপাতি। লাল কোলা-নাটগুলি অতিশয় শক্ত, উত্তেজক বলে অনেকে চিবিয়ে খায় বিশেষ করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে যখন খাদ্য প্রাপ্তির আশা সুদূরে থাকে। ঐ শক্ত নাটগুলি রোদে শুকিয়ে চূর্ণ করে তারই পানীয় তৈরী হয়েছে। খেতে তিক্ত, কিন্তু আমার মনে হ'ল বেশ পিপারমেণ্ট। নেশপাতি খাবার প্রণালীটিও বেশ। বৃদ্ধ একে একে তিনটি নেশপাতির খোসা ছাড়িয়ে চাক চাক করে কেটে ফেল্‌ল। তারপর নুন আর লঙ্কার গুঁড়া মাখিয়ে প্লেটখানি এগিয়ে দিল। সে নিজে খেল অতি সামান্য।

বিশ্রামের পর চাষের জমি দেখতে গেলাম। মেয়েরা কাজ করছে মাঠে। মনে হ'ল শতকরা নব্বুইটি মজুরই মেয়ে। আর একটা ব্যাপার দেখে অনেক কাল পরে আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেল। অপেক্ষাকৃত নীচু জমি সেটা, তার স্থানে স্থানে জল দাঁড়িয়ে আছে। বাকি অংশে জল না থাকলেও কাদা হয়ে আছে সেজন্য, এক একটি নারী মজুর দাঁড়িয়ে আছে—তার প্রায় হাঁটু অবধি গেড়ে গেছে কাদায়। সেই অর্দ্ধেক জলে ঢাকা আর অর্দ্ধেক কর্দমময় জমিতে মেয়েগুলো ধানের চারা পুঁতে বসাচ্ছে, ঠিক যেমন আমাদের দেশে 'রোয়া' ধানের বেলা করা হয়। ওখানে ঐ ধানের গোছা গোছা চারা বসান হচ্ছে দেখে দেশের সেই দৃশ্য মনে ফুটে উঠ্‌ল। মুহূর্তের জন্য বিমনা হ'য়ে গেলাম।

দুই একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম। আমার কথা বোঝাতে বৃদ্ধকেও বেশ বেগ পেতে হ'ল। উহাদের প্রায় সবাই বিবাহিত, স্বামী শিকার করে, মোটা কোপাক্ গাছের কাণ্ডটা খুদে খুদে কেনু তৈরী করে। কেনু তারা বিক্রয় করে, আবার কেনুতে চেপে মাছ ধরতেও যায় বিলে, কখন কখন নদীতেও যায়। ওখানে ১১টি মেয়ে ছিল, তাদের প্রত্যেককে একটি করে দেয়াশলাইপূর্ণ বাক্স দিলাম। সে জিনিষ পেয়ে তাদের মুখে নির্মল হাসি ফুটে উঠ্‌ল। আমার দিকে চেয়ে বার বার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিপাত করতে লাগ্‌ল। কেউ কেউ আকাশের দিকে হাত তুলে কি যেন বল্‌ল। বৃদ্ধ ব্যাখ্যা কর্‌ল—দেবতার আশীর্বাদ আহ্বান করছে। আমি বল্‌লাম—ভগবান পদার্থটা যখন ওদের এতই হাত ধরা, তখন আশীর্বাদটা নিজেদের জন্যই আবাহন করে না কেন। ভগবান বলে যদি কোন একটা জীব থেকেও থাকে, তবু তার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার আস্থা খুব কম।

তারপর ঢুকলাম পল্লীতে। এখানেও সেই পুরাতন দৃশ্য।

ছেলে-মেয়েগুলো অধিকাংশ নগ্ন, কেহ বা পাতার একটা লুঙ্গির মত বেড় দিয়েছে কোমরে। আমায় দূর থেকে দেখে ভূতের ভয়ে যেমন পাড়া-গাঁয়ের লোক দৌড়ে পালায়, তেমনি প্রাণপণে [illegible] করলে। একটা ছেলে দুপা সরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে আমায় নিরীক্ষণ করছে। ডাকলাম তাকে হাতছানি
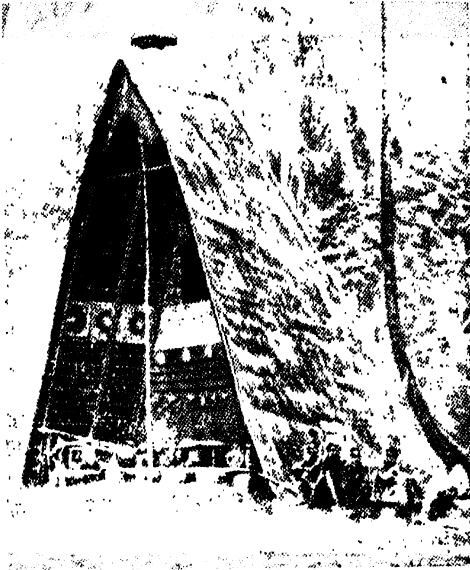
[illegible] তৈরী করে জঙ্গলের ভিতর গোপন স্থানে, যাহাতে সহজে কাহারও নজরে না পড়ে, কিন্তু মৃতের সমাধি হয় প্রকাশ্য স্থানে, [illegible] সমাধির উপর ছাতা একটি রাখা হয়, মৃতব্যক্তি যদি [illegible] অথবা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়।

দিলে। সে নড়েও না। বৃদ্ধ হাঁক দিল, তবুও আসে না, শেষটায় [illegible] একটা কাঠি জ্বালালাম আর তাকে বাক্সটা [illegible] ইসারা করলাম। এবার সে শঙ্কায় শঙ্কায় এসে দাঁড়াল কাছে। ম্যাচটা দিয়ে দিলাম। সে একটা কাঠি জ্বালিয়ে দেখল। তাকে অনেক প্রশ্ন করলাম, পিঠ চাপড়ালাম, কোন সাড়া পেলাম না। কেবল ডাগর ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার মুখ-পানে। বেলা পড়ে এসেছে, বৃদ্ধ বল্‌লো—এবার বন্য শূকর বেরোবে। লাঠি ফেলে এসেছে, তাই শীঘ্র আস্তানায় ফেরা দরকার।

চল্‌লাম ফিরে। চারিদিকে চাষ করা মাটির একটা বোট্‌কা গন্ধ। আমাদের দেশের মাটির গন্ধ ত এমন বিদ্‌ঘুটে নয়। এ যেন কেমন। আস্তানায় ফিরলে দেখলাম, সেখানে ৮।১০টি মজুর-মজুরণীর ভিড়। কি যেন তারা লোলুপ দৃষ্টিতে দেখ্‌ছে। কাছে যেতে দেখলাম একটা কি জানোয়ারের মৃতদেহ! বুঝলাম সদ্য শিকার করা। বৃদ্ধের সঙ্গে মজুরদের কি কথা হ'ল তারপর জানোয়ারটার ছাল ছাড়ান হতে লাগল। আমার মনে হ'ল ওটা যেন মহিষের বাচ্চা। কিন্তু বৃদ্ধ বল্‌লে এক জাতীয় বন্য হরিণ। তারপর মাংস সব ভাগ-বাঁটোয়ারা হ'ল। শিকারী ক'জন আর নারীর দল চলে গেল। রইল শুধু একজন মজুর, সে-ই আমাদের রাতের রান্নার কাজ করবে। সে কাজ করে যেতে লাগল আর মুখে ফোয়ারা ছুটাল। সব কথা বুঝলাম না। তবে শিকারের শফরে যে কুমীরের আক্রমণে নাকাল হয়েছে, তা বুঝ্‌লাম। শিকারের অস্ত্র দেখলাম ওদের তীর-ধনু আর বল্লম। তীরগুলো না কি মৃদু বিষাক্ত—কোন্ এক গাছের পাতার রসে জব্‌জবে।

পরদিন ভোরে বৃদ্ধ আমার সঙ্গে কোলাকুলি করে তবে বিদায় দিল। ফির্‌তি বেলায় এ পথে আস্‌তে অনুরোধ জানাল। পথ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিল আমায়।

এবার চল্‌লাম এমন মুলুকে যেখানে পথ-ঘাট বলে কোন কিছু নাই। সময়ে পল্লীর ভিতর দিয়া গিয়াছি—কারু কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে জিরিয়ে নিয়েছি দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদ্রের সময়। নর-মুণ্ড শিকারী বলে যে অপবাদ, তার চিহ্নও দেখলাম না কোথাও। কিন্তু একটা ব্যাপারে বিস্ময় মানলাম, এই জন্য যে, নদী পার হবার কথা বল্‌লে কেউ সাড়া দেয় না। পার হতে মানা করে। কারণ নদীতে শয়তান-দেবতা কুমীররূপে বাস করে। সেই দেবতাটির পূজা তিন দিন নদীতীরে যেয়ে না দিয়ে কেউ কেনতে করেও নদীতে যাবে না।

এমনি করে তিন দিনের প্রতিজ্ঞার স্থানে চার দিন কাটিয়ে বেথাণ্ডে ফিরে এসেছি। সেখানে ভারতীয় বন্ধুটি ত আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েই বসে আছেন। আমায় দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। চোখের কোণেও যেন মুক্তাবিন্দু দেখা গেল। এমনি চোখের ভাব দেখেছিলাম—নারী মজুরদের, যখন তারা আমায় বিদায় দিয়েছিল সেই ধান ক্ষেত হতে অপরিসর শাড়ীর এক আঁচল দুলিয়ে।

পতি পরম গুরু

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

খোকাকে কোলে নিয়ে সুরেনের হাত ধরে বেরিয়ে যা। যে বাড়ীতে তোর স্বামীর অপমান হয়, সেখানে তোর স্থান নেই। আমি রাম সিংকে দিয়ে গাড়ী ডাকিয়ে দিচ্ছি।

তাহাই হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে রোরুদ্যমান শিশুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া সুধা সুরেনের সঙ্গে শিয়ালদা ষ্টেশনে রওনা হইয়া গেল। তাহার বাক্স, কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র সবই কলিকাতায় পড়িয়া রহিল।

ট্রেনে দুইজনেই অভিভূতের মত বসিয়াছিল—কোন কথা হয় নাই। যেন কোথা দিয়া কি একটা হইয়া গেল—ইহার জন্য তাহারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

রাণাঘাট ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইবে। সেখানে নামিয়া উভয়ে যেন আবার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। ঘোমটা খুলিয়া হাসিমুখে সুধা বলিল, ছোট বেলায় খুব শিখিয়েছিলে যা হোক্ পতি পরম গুরু, আজ সেই পরম গুরুর হাত ধরে এক বস্ত্রে পথে বেরুতে হ'ল।

সুরেন আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, ঠিকই ত শিখিয়ে-ছিলাম। আজ সেটা কাজে ফল্‌ল কি না দেখলে ত?

হাসিমুখে সুধা জবাব দিল, তা ফল্‌ল সত্যি। কিন্তু তুমি আর একদিন আর একটা কথা বলেছিলে—সেটা আজ মিথ্যে প্রমাণ হ'য়ে গেল।

সে কথাটা কি?

তুমি বলেছিলে, আমরা মেয়েরাই সমাজের কুসংস্কারগুলো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—তোমরা পুরুষেরা সুবিধা পেলেই সে-গুলো ভেঙে ফেল্‌তে চাও। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল, পুরুষেরাও প্রয়োজন মত তার সুবিধা নিতে কসুর করেন না। না হ'লে বাবা যে কথাটা বলেছিলেন, সেটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। সে সত্যের ত কই জয় হ'ল না। জয়ী হ'ল সেই অনাদিকালের সংস্কার—পতি পরম গুরু।

উত্তর দিবার সুবিধা করিতে না পারিয়া সুরেন মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

রাস্কিনের রাজনীতি

গান্ধীজীর আত্মজীবনীতে এই কয়েকটি লাইন লেখা আছে—

> Three moderns have left a deep impress on my life, and captivated me: Rai Chand Bhai by his living contact; Tolstoy by his book The Kingdom Of God Is Within You and Ruskin by his Unto This Last.

আধুনিক যুগের তিনজন মানুষ আমার জীবনের উপরে রেখে গেছেন গভীর ছাপ এবং আমার হৃদয়কে করেছেন মুগ্ধঃ রায়চাঁদভাই তাঁর প্রাণভরা সাহচর্য্য দিয়ে, টলস্টয় তাঁর "ভগবানের রাজ্য তোমাদের ভিতরে"—এই গ্রন্থ দিয়ে আর রাস্কিন তাঁর Unto This Last দিয়ে। রাস্কিনের সঙ্গে তাহ'লে ভারতবর্ষের নবজাগরণের একটা গভীর সম্পর্ক আছে—তাঁর আগুন-ভরা আইডিয়ার স্পর্শ গান্ধীজীর মনকে করেছে বিপ্লবী আর বিদ্রোহী গান্ধী যে নব্য ভারতবর্ষের কানে দিয়েছেন এক নূতন মন্ত্র এবং চোখে দিয়েছেন নূতন দৃষ্টি—এতে কি কোনো সন্দেহ আছে? রাস্কিনের চিন্তাধারার সংস্পর্শে না এলে গান্ধীজীর জীবনের ধারা আজ কোন্ খাতে বইতো কে জানে? হয়তো তিনি আজও আইন-ব্যবসাতেই লিপ্ত থাকতেন বিলাত-ফেরৎ আরও অনেক ব্যারিস্টারের মতো নয়তো ভগবানকে পাওয়ার দুর্ব্বার কামনা তাঁকে নিয়ে যেতো হিমালয়ের গুহায়। গান্ধীজী ব্যারিস্টারিও করলেন না, হিমাচলেও গেলেন না—তিনি হাতে তুলে নিলেন সাম্যের আর স্বাধীনতার জয়ধ্বজা, আসন পাতলেন সবহারাদের মাঝে, আপনাকে উৎসর্গ করলেন নতুন মানব-সমাজ-সৃষ্টির কাজে। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন—আগে প্রতিটি মানুষের পেট ভ'রে খাওয়ার ব্যবস্থা করা চাই। অর্থ-নীতিকে বাদ দিয়ে যে রাজনীতি—তার কোনো মূল্য নেই। প্রতিটি মানুষকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করণীয়—এই বিরাট সত্যকে উপেক্ষা ক'রে আমরা যা কিছু গড়তে যাবো তার অনিবার্য্য পরিণতি ব্যর্থতায়। গান্ধীজী রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গিমা। তিনি আমাদের চোখে যে স্বরাজের স্বপ্ন জাগালেন তার ভিত্তি হ'চ্ছে ভারতবর্ষের প্রতিটি গৃহে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্য। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক মঙ্গলের সঙ্গে স্বরাজকে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেখলেন গান্ধীজী।

রাস্কিনের লেখা গান্ধীজী যদি নাও পড়তেন তবুও তাঁর পক্ষে বিপ্লবী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সে বিপ্লবের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বহারা নরনারীদের স্থান হোতো কোথায়, বলা সহজ নয়। হয়তো সে বিপ্লব সৃষ্টির উন্মাদনা শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বিপর্যায় ঘটিয়েই অবসান লাভ করতো—অর্থনীতির ক্ষেত্রে ওলোট-পালোট ঘটানো পর্য্যন্ত বলবতী থাকতো না। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজীর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কোনখানে? তিনি গণতন্ত্রের আদর্শকে যেমন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জয়যুক্ত করতে কৃতসঙ্কল্প—তেমনি সে আদর্শকে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও জয়ী করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শাসনতন্ত্রের হাল ভারতবাসীদের হাতে এলেই যথেষ্ট হোলো না—স্বরাজ হবে দরিদ্রের স্বরাজ। স্বরাজে সম্পদের মালিক হবে সবাই—নিঃসম্বল থাকবে না কেউ। স্বরাজ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত ক'রে দেবে ধনী দরিদ্রের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান। আর দশজন উদয়াস্ত হাড়-ভাঙা পরিশ্রম ক'রে যাবে আর তুমি আমি নৈবেদ্যের উপরকার নাড়ুটির মতো ব'সে ব'সে শুধু খাবো আর মুক্তির আনন্দ লুটে বেড়াব—এমন একটা শয়তানী ব্যবস্থাকে স্বরাজ যদি স্বীকার ক'রে নেয়—তবে সে স্বরাজ গান্ধীজীর নিকট বিষের মতোই পরিত্যাজ্য। সমাজের সর্ব্বসাধারণকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যা-কিছুর প্রয়োজন তার সৃষ্টি মানুষের পরিশ্রম থেকে। স্বরাজে সবাইকে শ্রমের অংশ বহন করতে হবে- অবসরের উপরে যে অধিকার—স্বরাজে সে অধিকারও সবাই সমভাবে ভোগ করবে।

এই যে যুগান্তকারী চিন্তার অগ্নিশিখা গান্ধীর মনে এই অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছে রাস্কিনের Unto This Last. বিপ্লবী বলতে রুসো আর ভলটেয়ার, মার্ক্স আর লেনিন—এঁদের কথাটাই আমাদের মনে পড়ে সকলের আগে। এ যুগের তরুণদের কাছে রাস্কিনের লেখা অতীতের সামগ্রী—আকবরের আমলের মুদ্রার মতো—বিংশ শতাব্দীতে অচল। কিন্তু সত্যই কি তাই? রাস্কিনের লেখা ভালো ক'রে পড়েছেন যাঁরা—তাঁদের ধারণা, রাস্কিন মার্ক্সের মতোই কমিউনিজমের অন্যতম প্রফেট্। বার্নাড শ'এর ভালো সমালোচক ব'লে জগত-জোড়া খ্যাতি আছে। রাস্কিনের সম্পর্কে তাঁর একখানি চটি বই আছে। বইখানির নাম Ruskin's Politics. ছোট্ট বইখানির এক জায়গায় শ' লিখেছেন,—

> It goes without saying of course that he was a Communist.

আর একজায়গায় লিখেছেন,

> So it comes to this that when we look for a party which could logically claim Ruskin to-day as one of its prophets we find it in the Bolshevist Party.

বার্নাড শ'এর এই মন্তব্য প'ড়ে অনেকেই বিস্মিত হবেন, সন্দেহ নেই—। রাস্কিনকে মার্কসের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত করবার দুঃসাহস শ'এর আগে আর কেউ দেখিয়েছেন ব'লে জানি নে—কিন্তু শ' যা বলেছেন—আসলে তা' সত্য। রাস্কিনের The Crown of the Wild Olive একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 'যুদ্ধ' (War) শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় রাস্কিন লিখছেন,—

> "And from the earliest incipient civilisation until now, the population of the earth divides itself, when you look at it widely, into two races; one of workers and the other of players—one tilling the ground

manufacturing, building, and otherwise providing the necessities of life;—the other part proudly idle, and continually therefore needing recreation, in which they use the productive and laborious orders partly as their cattle, and partly as their puppets or pieces in the game of death.''

"সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মানুষগুলি দুটি জাতিতে বিভক্ত হ'য়ে আছে—একটা হ'চ্ছে যারা কাজ করে তাদের আর একটা হচ্ছে যারা খেলা করে তাদের জাত। একটা জাত জমি চষ্‌ছে, ঘর-বাড়ী বানাচ্ছে, জিনিষপত্র তৈরী করছে—জীবনধারণ করতে গেলে যা-কিছুর প্রয়োজন তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে। আর একটা জাত শারীরিক মেহনত করতে ঘৃণা বোধ করে—তাদের বিরামহীন ছুটি। অবসর সময়টায় তারা শ্রমিকদের ব্যবহার করে খানিকটা গরু-ঘোড়ার মতো এবং খানিকটা মৃত্যুর খেলায় তাদের পুত্তলিকা অথবা পাশা বোড়ের মতো।"

রাস্কিনের এই লেখার সুর কি মার্ক্সের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? যারা কাজ করে না—কেবল খেলে বেড়ায় তাদের তিনি রক্তশোষী মাছি আর মশার সঙ্গে তুলনা করতে একেবারেই দ্বিধা করেন নি। টাকা জমানো যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—তাদের তিনি বলেছেন শয়তানের অনুচর। তবুও যে তাঁর সমসাময়িক সমাজের লোকেরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলায় নি অথবা কারাগারে পচায় নি তার কারণ তারা ভাবতে পারে নি রাস্কিন যা বলেছেন তাতে তিনি বিশ্বাস করতেন। তারা মনে করতো—ভাবের উচ্ছ্বাসে লোকটা যা বলছে—তা সত্যি সত্যি তার প্রাণের কথা নয়। রাস্কিনের শিষ্যদের সম্পর্কে শ' একটা মন্তব্য করেছেন যার সত্যতায় বিশ্বাস হয় গান্ধীজীকে দেখে।

Generally the Ruskinite is the most thorough-going of the opponents of our existings state of society.

রাস্কিন কমিউনিস্টদের মতোই ডিক্টেটরশিপে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজকে নতুন ভিত্তির উপরে দাঁড় করানোর কাজে জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা বাতুলতা। সে কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিতে হবে মুষ্টিমেয় মানুষকে যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, অন্তর নির্ম্মল এবং সঙ্কল্প বজ্রকঠোর। সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাবার জন্য যদি জনসাধারণের সম্মতির অপেক্ষা করতে হয় —তবে সে পরিবর্ত্তন অনন্তকালেও ঘটানো সম্ভব হবে না। সাধারণ লোকের কাছ থেকে উচ্চস্তরের নাটক সৃষ্টির আশা করা যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়—তেমনি যুগান্তকারী আইন তৈরীর কাজেও তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা সমীচীন হবে না। সাধারণ লোক জানে না কি তারা চায় এবং কোন্ পথে তা পাওয়া সম্ভব। নাটক ভালো কি মন্দ—তা বিচার করবার ক্ষমতা অবশ্যই সাধারণ লোকের আছে—আইন ভালো কি মন্দ—তারও বিচারক জনসাধারণ। সৃষ্টির কাজ সমালোচনার কাজের চেয়ে অনেক কঠিন—। যদি মুষ্টিমেয় জ্ঞানীর দল ব্যালট্ বক্সের দিকে চেয়ে নিজেদের মতবাদকে জোরের সঙ্গে সমাজে রূপ দিতে অগ্রসর না হয়—তবে আর এক দল মাইনরিটি (হিটলারের তার ফ্রাঙ্কোর আর মুসোলিনীর মতো) আগিয়ে এসে শাসনদণ্ড নিজেদের হাতে তুলে নেবে এবং জগতকে একশো বছর পিছিয়ে দেবে। সিংহাসন কখনো খালি থাকবে না—সে সিংহাসনে যদি স্টালিন না বসে —হিটলার বসবে,—যদি আজানা না বসে, ফ্রাঙ্কো বসবে— লেনিন না বসে—মুসোলিনী বসবে। আজকের দিনে যখন মহাকালের বুকে সর্ব্বনাশের ঝড় জেগেছে—আমাদের পায়ের নীচে মাটি যখন থরোথরো করে কাঁপছে—পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা স্থায়ী হবে, না নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে—এই প্রশ্ন যখন অত্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে তখন রাস্কিনকে স্মরণ করা নির্ব্বোধের কাজ হবে না।

একটী ছোট গ্রামের কথা

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

কোনদিন উচ্চ শ্রেণীর মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়াছে কি না সন্দেহ, আশ্রমে আসিয়া তাহারাই 'ভাই' ডাক শুনিতেছে, মেয়েরা শুনিতেছে 'মা' ডাক। শ্যামাপূজার ত এই প্রকরণ, মহাশক্তির আরাধনা ত এইভাবেই সত্য সত্য সার্থক হয়।

বাঙলার কবি গাহিয়াছেন—'এই সব মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'; কিন্তু ভাব না জাগাইলে ভাষা ফুটে না। সেবা ভিতর দিয়াই ভাবের সঙ্গে যোগ হয়—ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার লইয়া মূক মুখে ভাষা দেওয়া যায় না, ভরসা জাগান যায় না। ভরসা নাই ইহাদের মধ্যে। ইহারা কেবল গোণা দিন কয়েকটা কাটাইয়া যাইতেছে। গতর খাটইয়া পরিশ্রম করে—পয়সা রোজগার করে—পচুই খাইয়া নেশায় বিভোর থাকে। আদর্শ নাই ইহাদের কিছুই, একেবারে ভরসাবিহীন হইবে। ইহাদের বুঝি ইহাও বুঝিবার অবসর নাই যে, উচ্চ শ্রেণীর মত ইহারাও মানুষ।

চন্দনপুর আশ্রমে ইহাদের ভরসার বীজ উপ্ত রহিয়াছে, ভালবাসার ভিতর দিয়া সেই ভরসা এই সব ভরসাবিহীনদের মধ্যে সঞ্চারিত হইবে, যদি এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। আশ্রমের ক্ষুদ্র আটচালা ঘরের হোমকুণ্ড আমাদের অন্তর হোম স্বীকারের উদ্দীপনায় উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। মূক যজ্ঞকুণ্ড হইল মুখর, তাহার ভাষা শুনিলাম। মূর্খ, দরিদ্র, অবজ্ঞাত এবং উপেক্ষিতের সেবার প্রবৃত্তি বাঙলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবে—প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে অন্তরে অন্তরে যজ্ঞানল, আর সেই যজ্ঞানলে জাতির সকল অবীর্য্য ভস্ম হইয়া যাইবে, আমরা সেই স্বপ্নে অভিভূত হইলাম। সাগ্নিক সাধকের অগ্নিময়ী বাণী আমাদের মনোবীণায় ঝংকৃত হইয়া উঠিল—

অহন্তাপাত্রভরিতং ইদন্তাপরমাহতং
পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকার লক্ষণম্

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীময়ী ঃ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; মূল্য ১৸৹ টাকা।

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি, তাহা হইতে তিনি আমাদের বঞ্চিত করেন নাই। 'রঞ্জন', তাহার সাহিত্যিক বন্ধু 'অমিতাভ' এবং রঞ্জনের আর এক বন্ধু 'প্রিয়ো'র দিদি শ্রীময়ীকে লইয়া গল্প। গল্পের কেন্দ্র শ্রীময়ী ও অমিতাভ। শ্রীময়ীর স্বামী সন্ন্যাসী, নির্লিপ্ত মহাপুরুষ। শ্রীময়ীর নারীত্বের কোনও দাবীই তাঁহার নিকট হইতে পূর্ণ হইতে পারে না। জীবনের সরসতা ও প্রাচুর্যে উদ্বেলিয়া নিত্য কৌতুকময়ী শ্রীময়ী কবি যুবক অমিতাভকে পাইয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিল। অমিতাভের ছন্নছাড়া নিরবলম্ব জীবন তাহার সহানুভূতি আকর্ষণ করিল এবং এই সহানুভূতি অমিতাভের রুগ্নাবস্থায় অনুকম্পা-কোমল সেবা ও পরে প্রেমে পরিণতি লাভ করিল। কিন্তু সম্মুখে সামাজিক বিধি নিষেধের অচলায়তন। সে বিধি নিষেধকে প্রাণ দিয়া কেহই স্বীকার করে না, অথচ নির্ম্মম পদ বিক্ষেপে তাহাকে দলিত ও চূর্ণ করিয়া ব্যক্তিত্বের সহিত মিলিতেও তাহারা পারিল না। —ইহাই হইল গল্পের বিষয়বস্তু। লেখক গল্পটি যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা মোটামুটি প্রশংসনীয়।

লেখকের ইংরেজী কথার বাংলায় আক্ষরিক পরিবর্ত্তন একটু অদ্ভুত ঠেকিল। যেমন ট্রেইন (train) ডিরেইলমেণ্ট (derailment) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির মধ্যে ই (i) কারে স্থানচ্যুতি ধ্বনি বিজ্ঞানের (phonetics) অপিনিহিত (Epinthesis) এর অজুহাতে সিদ্ধ ধরিয়া লইলেও 'গেইট" (gate), 'প্লেইট' (plate) ও 'টু লেইট' (too late) প্রভৃতির সম্বন্ধে আমরা কি বলিব?

কথা-সাহিত্যের ভাষাকে একান্তভাবে অনুসরণ করিতে যাইয়া মাঝে মাঝে দুই একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন। তাঁহার "শেষ ওবধি" কে সহজে কেহই চিনিতে পারিবে না। "শেষ পর্য্যন্ত" কিংবা "শেষে" হইলে অনেক সুখবোধ্য ও সহজবোধ্য হইত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী—বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য সমস্ত লেখা খণ্ডে খণ্ডে ছাপাইবার সংকল্প করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার বিশালবক্ষে সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রকৃতির পরিশোধ, বউঠাকুরাণীর হাট, রাজা ও রাণী, বাল্মীকি প্রতিভা, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র এবং আরও দু'একটি প্রথম বয়সের রচনা লইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথমখণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রচনাগুলিকে চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছেঃ—(১) কবিতা ও গান, (২) উপন্যাস ও গল্প, (৩) নাটক ও প্রহসন, (৪) প্রবন্ধ। প্রত্যেক খণ্ডেই এইরূপ চারিটি ভাগ থাকিবে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ৪৸৹; প্রকাশক—বিশ্ব-ভারতী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে—তাঁহাদের পরিকল্পনা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য সমস্ত রচনা আপনাদের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য লইয়া বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে আলো ঝলমল কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রভেদী মহিমায় বিরাজ করিতেছে। তাঁহার প্রতিভার জ্যোতি উল্কাপিণ্ডের মতো ক্ষণস্থায়ী নয় সূর্য্যের মতো উহার দীপ্তি চিরন্তন। সূর্য্যের আলো যেমন প্রাণকে বিকশিত করিয়া তোলে—রবীন্দ্রনাথের রচনা তেমনি করিয়াই আমাদের ব্যক্তিত্বকে পরিপুষ্ট করে। এহেন প্রতিভাশালী লেখকের রচনাবলীকে একসঙ্গে জড়ো করিয়া বিশেষভাবে সাজাইয়া যাঁহারা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবার বিরাট দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন—বাঙালী মাত্রেরই তাঁহারা কৃতজ্ঞতার পাত্র। একথা খুবই সত্য যে, জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবিকে জানিলে অন্যান্য কবিকে জানার পথ প্রশস্ত হয়। রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা ভালো করিয়া জানিতে পারি—বিশ্ব সাহিত্যের মর্ম্মকোষে প্রবেশ করিয়া দেশ বিদেশের মনীষিগণের চিন্তাধারাকে বুঝিবার পথ সহজ হইবে। অন্যান্য খণ্ডগুলি একে একে প্রকাশিত হইয়া রবীন্দ্র প্রতিভার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া দিক—ইহাই আমরা কামনা করি। কাগজ, ছাপা সবই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের ছবি, তাঁহার হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আলেখ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়া ইহার মূল্য অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে।

হাল্কা-হাসির খাতা—লেখক শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়। প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য সন্স এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছোটদের জন্য হাসির গল্পের বই। ইহাতে মেসের মরীচিকা, দিন হ'য়ে যায় রাত প্রভৃতি ছয়টি গল্প আছে। শিশু সাহিত্যে হাসির গল্প লেখকরূপে যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন রবীন্দ্রলাল তাঁহাদেরই অন্যতম। লেখার ভঙ্গিমা অতি সুন্দর। ছেলেরা বইখানি পড়িয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিবে ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

সাহিত্য-সংবাদ

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী বড়দিনের সময় শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভার উৎসব উপলক্ষে বাংলা কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে।

আবৃত্তির বিষয়ঃ—১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর "সিংহগড়"। ১ম লাইন "উমরাটিপুরে সবেদার গড়ে সেদিন বাজিছে বাঁশী"।

বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের জন্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শাজাহান" ১ম লাইন "একথা জানিতে তুমি, ভারত ঈশ্বর শাজাহান।"

এই দুই বিভাগেই ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীর প্রত্যেককে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রতিযোগীদের নাম, ঠিকানা ও বয়স, আগামী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে পাঠাইতে হইবে।

অমলেশ মুখোপাধ্যায়, আণ্ডার সেক্রেটারী,
খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদ বিভাগ।

শ্রীরামপুর মহকুমা ছাত্র-ছাত্রী সংস্কৃতি সম্মেলনে
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

শ্রীরামপুর মহকুমা ছাত্র-ছাত্রী সংস্কৃতি সম্মেলন নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীরামপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হইবে। উহা পাঠাইবার শেষ তারিখ—সকল স্কুল কলেজ না খোলার জন্য পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ই নবেম্বর পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮ই নবেম্বর করা হইল।

সমস্ত প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানাঃ—অনাথনাথ সান্যাল, শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১নং কুইন ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর।

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

প্রগতি সঙ্ঘের (শোভাবাজার) পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে রচনা আহ্বান করা যাইতেছেঃ—

১। **গল্প** (হাসির), ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার অনধিক। ১ম পুরস্কার—১টি রৌপ্যপদক। দাতা—শ্রীবসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। **প্রবন্ধ** (বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস), ফুলস্কেপ কাগজের ৭ পৃষ্ঠার অনধিক। ১ম পুরস্কার—১টি রৌপ্যপদক। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ—৩০শে অগ্রহায়ণ। ঠিকানাঃ—শ্রীধীরু চট্টোপাধ্যায়, সচিব, প্রগতি সঙ্ঘ, ৩নং ওয়াজিদ মির ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

জয়নগর-মজিলপুরের সন্নিকটস্থ ফটীগোদা মিলন সঙ্ঘের সাংবৎসরিক সম্মেলন উপলক্ষে আগামী ১৯শে নবেম্বর বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। বিষয়ঃ—(ক) সাধারণের জন্য—বিংশ শতাব্দী—সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৬), (খ) কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—জাগো—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (শারদীয়া দেশ, ১৩৪৬) (গ) স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—ঝড়—কুমুদরঞ্জন মল্লিক (শারদীয়া দেশ, ১৩৪৬)। আবেদন করুন,—সাধারণ সম্পাদক, ফটীগোদা মিলন সঙ্ঘ, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর পোঃ আঃ, জেলা ২৪-পরগণা।

রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল
হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্মৃতি-সঙ্ঘ

এইবারে সর্ব্বসাধারণ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) ও শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষাল (কলিকাতা), যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (বি কে পাল ইনষ্টিটিউশন, হাওড়া), অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (বি কে পাল ইনষ্টিটিউশন, হাওড়া), যথাক্রমে ও শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার সেন (বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউন, হাওড়া) যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সুবিমল দে সরকার, সম্পাদক (রচনা বিভাগ)

আজ-কাল

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

এ সপ্তাহের সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক ব্যাপার হচ্ছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। বৈঠক আরম্ভ হয়েছে ১৯শে নবেম্বর তারিখে, এখনও শেষ হয় নি; সুতরাং সিদ্ধান্তও জানা যায় নি। তবে বাইরের খবর থেকে জানা যায়, প্রথম দু'দিনের আলোচনায় ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় নি। শুধু গণ-আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথা আলোচিত হয়েছে। নেতাদের মতে নাকি আইন অমান্য আন্দোলনের পথে তিনটি অসুবিধা এখন রয়েছেঃ—(১) অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী অহিংস নন; (২) আন্দোলন আরম্ভ হলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধবার সম্ভাবনা; (৩) দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা কি করবে?—তারা কংগ্রেসী আন্দোলনে এসে যোগ দেবে, না, নিজের নিজের রাজ্যে অনুরূপ গণ-আন্দোলন সুরু করবে?

গান্ধীজী ও তাঁর পার্শ্বচরদের কথাবার্ত্তায় মনে হয়, গণ-আন্দোলন আরম্ভ করবার সিদ্ধান্ত এখন কংগ্রেস করবে না। ১৮ই নবেম্বর শ্রীমানবেন্দ্র রায়ের এক চিঠির উত্তরে গান্ধীজী বলেছেন যে, মন্ত্রিত্ব বর্জ্জনের পরেই আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ অপরিহার্য্য নয়; সক্রিয়তার চেয়ে নিষ্ক্রিয়তায় অনেক সময় বেশী ফল পাওয়া যায়। তিনি ঐ দিনই আর এক প্রবন্ধে কর্ম্মীদের ধৈর্য্য ধরতে উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আইন অমান্য ছাড়াও অন্য অনেক কাজ এখন করা যেতে পারে। ১৯শে তারিখে এলাহাবাদে পেঁছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একরকম নিরুত্তর থেকে আইন অমান্যের কথা এড়িয়ে গেছেন। ১৯শে তারিখে পন্ডিত জওহরলাল একটি প্রবন্ধ ও একটি বিবৃতিতে যদিও আন্দোলনের জন্যে সকলকে প্রস্তুত হতে বলেছেন, তবু আন্দোলনের কোন সময়-নির্দ্দেশ দিতে পারেন নি।

কংগ্রেস কি করবে?

তা হলে কংগ্রেস এখন কি করবে? শোনা যাচ্ছে, দুই বিষয়ে সে আপাতত মনোনিবেশ করবে—প্রথমত, সাম্প্রদায়িক মিলন সাধন; দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের যে সব আভ্যন্তরীণ গলদ (দৌর্ব্বল্য) আছে তা দূর করা।

সাম্প্রদায়িক মিলন মানে মনে হয় মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা মিটমাট। ১৬ই তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, শীগ্গিরই জিন্না সাহেবের সঙ্গে পন্ডিত জওহরলাল আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করবেন। পরে মিঃ ব্রেলভির এক বিবৃতিতে ঐ সংবাদ সমর্থিত হয়েছে। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক পরিকল্পনা পেশ করেছেন।

গান্ধী-নীতির সমালোচনা

গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে কংগ্রেসী নেতৃদলের এই টাল-বাহানার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একাধিক বক্তৃতায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এক সপ্তাহ শ্রীহট্ট, শিলচর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং ও ঢাকায় সফর করে' ১৩ই তারিখে কলকাতায় ফিরে আসেন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, গান্ধীজী কিছুকাল যাবৎ বলছেন, কংগ্রেস তথা দেশ আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত নয়, কারণ কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি ও হিংসার মনোভাব রয়েছে। এখন আবার তিনি তৃতীয় যুক্তি দেখাচ্ছেন—হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামা। কিন্তু দেশকে আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত করবার কি ব্যবস্থা এতদিন কংগ্রেসী নেতারা করেছেন—এই প্রশ্ন সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন। জব্বলপুরে এক বক্তৃতায় এবং ১৯শে নবেম্বর ধুবড়ী ছাত্রসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, চারিদিক থেকে একটা নিখুঁত অবস্থা দেখা দিলে তবে আন্দোলন আরম্ভ করব, এরকম মনোভাব অবাস্তব এবং কার্য্যত আন্দোলন-বিরোধী। গত ১৭ই নবেম্বরের এক বিবৃতিতে কৃষক-নেতা স্বামী সহজানন্দও এই অভিমতের প্রতিধ্বনি করেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব বর্জ্জনে যে আশা জেগেছিল, গান্ধীজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে তা নষ্ট হয়েছে। কোন ব্যক্তির (সে তিনি যত বড়ই হোন) অভিপ্রায়ের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করে না থেকে দেশবাসীর উচিত এখন উচিত ও যুক্তিসঙ্গত পথে এগিয়ে চলা।

কংগ্রেস যতই গড়িমসি করুক গবর্ণমেণ্ট কিন্তু যথারীতি প্রস্তুত হচ্ছেন। ১৮ই নবেম্বরে নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষগণ আন্দোলন প্রতিরোধের জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হয়েছেন; বে-সরকারী মহলের বিশ্বাস, কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ করা মাত্রই জারী করে' দেবার জন্যে অনেকগুলো অর্ডিনান্স তৈরী করা হয়েছে।

বিলাতে গান্ধীজীর বিবৃতি—

১৪ই তারিখে গান্ধীজী বিলাতের "নিউজ ক্রনিকল্"-এর কাছে একটা বিবৃতি পাঠান। ইদানীং কালে গান্ধীজীর সমস্ত বিবৃতির মধ্যে এটি সব চেয়ে জোরালো। কংগ্রেসের দাবী চাপা দেবার জন্যে বৃটেন যত যুক্তি দেখিয়েছে এতে তিনি তা অমোঘভাবে খন্ডন করে বলেছেন যে, ভারতের ১১টা প্রদেশের মধ্যে ৮টা প্রদেশ দৃঢ় ভাষায় জানিয়েছে, যে যুদ্ধের ফলে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হবে না সে

যুদ্ধে তারা অংশ নিতে পারে না। তিনি আরও বলেন, ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁদের আন্তরিকতা প্রমাণ করুন বলে' হের হিটলার যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিসংগত।

'বরদলৈ মন্ত্রিসভা গঠন কথা'

গত সাতদিনের আর একটা বড় ঘটনা—বরদলৈ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নতুন মন্ত্রিসভা গঠন। আসামের কংগ্রেস কোয়ালিশনী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন ১৫ই নবেম্বর। তারপর গবর্ণর অন্য দলের নেতাদের ডাকেন। কংগ্রেসের সহযোগী মিঃ নিকল্‌স্‌ রায় তাঁর নবগঠিত দলের কথা গবর্ণরকে জানান—তাঁর দলের সদস্য-সংখ্যা ২৩ আর কংগ্রেসের ৩৪ ; সুতরাং কংগ্রেসের সমর্থন পেলে তাঁর পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য থাকে। কিন্তু বরদলৈ মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সংগে সংগে আসামের চা-কর সাহেবদের তরফ থেকে এক ফতোয়ায় বলা হয় যে, তাঁরা কোন তাঁবেদার মন্ত্রিসভা চান না। অর্থাৎ কংগ্রেসের সমর্থনে মিঃ নিকল্‌স্‌ রায় মন্ত্রিসভা গঠন করলে তাঁরা চটে' যাবেন। এর পরেই দেখা গেল গবর্ণর স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিয়েছেন। ১৭ই তারিখে সাদুল্লা মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

এ ব্যাপারটা যে কোন্‌ গণতন্ত্রের নীতিতে হ'ল তাই জিজ্ঞাস্য। বাইরের হিসেবে দেখা যায় সাদুল্লার পক্ষে সংখ্যাধিক্য নেই। ৩০শে নবেম্বর আসাম ব্যবস্থা পরিষদের এবং ১৫ই ডিসেম্বর দুই আইন সভার যুক্ত অধিবেশন হবার কথা ; ইতিমধ্যেই মোট ১০৮ জন সদস্যের ব্যবস্থা পরিষদে নতুন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নাকি ৫৯টি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ পেশ হয়েছে। তবে স্যার মহম্মদ সাদুল্লা বলেছেন যে, তিনি কয়েকটি সর্ত্তে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন ; একটা সর্ত্ত তো নিশ্চয়ই এই হবে যে, গবর্ণর এখন আইন-সভার কোন অধিবেশন হতে দেবেন না। সময় পেলে যদি ভোট ভাগানো যায়। আসামে কংগ্রেসকে জব্দ করে' বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রিয় 'গণতন্ত্র' চমৎকার চল্‌ছে তাহলে !

* * * * *

বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে ৪০ জনকে দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হবার আগে কিছুতেই ছাড়া হবে না বলে' বাঙলা গবর্ণমেণ্ট তাঁদের সিদ্ধান্ত গত ১৬ই নবেম্বর প্রকাশ করেছেন। এইসব বন্দীর অপরাধের গুরুত্ব দেখাবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁদের পূর্ব্ব কার্য্যের বিবরণ প্রকাশিত করেছেন।

* * * * *

গত সপ্তাহে অনেক শ্রমিক কর্ম্মীর উপর ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স অনুসারে নোটিশ জারী করে' হাওড়া ও হুগলীর পাটকল অঞ্চলে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১২ই তারিখের পর থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার পাটকল শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির জন্যে ধর্ম্মঘট করে। মালিক সমিতি শতকরা দশ টাকা হারে মজুরী বাড়াতে সম্মত হওয়ায় তারা ১৬ই তারিখে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে।

সিন্ধুর সুক্কুরে মঞ্জিলগড় আন্দোলনের পরিণতি হয়েছে শোচনীয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়। মঞ্জিলগড়কে মুসলমানরা মসজিদ বলে' দাবী করছিল এবং গবর্ণমেণ্ট তদন্ত করে' আইনসম্মত একটা ব্যাবস্থা করবেন বলা সত্ত্বেও দাবী পূরণের জন্যে সত্যাগ্রহ করছিল। সত্যাগ্রহীদের মঞ্জিলগড় ছেড়ে দেবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেন ; কিন্তু তারা সে আদেশ অমান্য করায় তাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তারপরই হঠাৎ দাঙ্গা বেধে গেছে। দাঙ্গা এখনও থামে নি। ইতিমধ্যে অনেক হিন্দু মুসলমান হতাহত হয়েছে।

ইউরোপের আবর্ত্ত—

জাহাজ ডুবির হিড়িক

ইউরোপে গত কয়েকদিনে যুদ্ধরত দুই পক্ষের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বিশেষ কিছু হয় নি। তবে ১৮ই তারিখ থেকে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলের কাছে উত্তর সাগরে জাহাজ ডুবির হিড়িক লেগেছে। প্রথমে ডোবে ডাচ যাত্রী-জাহাজ "সাইমন বলিভার।" তারপর ডোবে আরও নয়টি জাহাজ—যথা, "ব্ল্যাকহিল" (বৃটিশ) ; "টর্চ্চ-বেয়ারার" (বৃটিশ) ; "উইগমোর" (বৃটিশ) ; "পেনসিলভা" (বৃটিশ) ; "গ্রাৎসিয়া" (ইতালী) ; "বোরজেসন" (সুইডিশ) ; "কারিকা মিলিসিয়া" (যুগোশ্লাভ) ; "কাউনাস" (লিথুয়েনীয়া) ; এবং একটি ফরাসী জাহাজ। বলা বাহুল্য এইসব ঘটনার ফলে বহু প্রাণহানি হয়েছে।

* * * * *

বৃটিশ ও ফরাসী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, জার্ম্মানীর নবাবিষ্কৃত চুম্বক-মাইনের আঘাতে ঐ সব জাহাজ ঘায়েল হয়েছে। জার্ম্মানী বল্‌ছে "সাইমন বলিভার" ডুবেছে বৃটিশ মাইনের আঘাতে।

* * * * *

শান্তির কথা এখন চাপা পড়েছে। গত ১৫ই নবেম্বর ফন রিবেণ্ট্রপ ডাচ ও বেলজিয়ান দূতদের জানিয়ে দেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স তাঁদের শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে বলেছে জার্ম্মানী তার আর কোন মূল্য আছে বলে' মনে করে না।

জার্ম্মানীতে আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ—

জার্ম্মানীর মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানারকম খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর কতটা যে সত্যি আর কতটা মিথ্যে বোঝবার উপায় নেই। তবে জার্ম্মান সরকারী এজেন্সীর খবর থেকে অনুমান করা যায় যে, চেকোস্লোভাকিয়ায় বেশ গোলমাল চল্‌ছে। ছাত্রেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় প্রাগ ও অন্যান্য শহরে কঠোর পীড়ন সুরু হয়েছে। ১৮ই তারিখে বার্লিনে ঘোষণা করা হয় যে, বিভিন্ন চেক শহরে সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। ছাত্র ও অন্য অনেক লোককে গুলি করে মারার সংবাদ পাওয়া গেছে।

হাজার হাজার লোককে বন্দী করা হয়েছে। মার্শাল রোমবার্গকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে একটা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

সোভিয়েট-ফিনিশ পরিণতি—

সোভিয়েট-ফিনিশ আলোচনা এক রকম খতম হয়েছে। গত ১৫ই তারিখে এই মর্ম্মে এক সোভিয়েট ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়েছে যে, ফিনিশ শাসক শ্রেণী সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করতে চায় না; ফিনিশ জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্যেই তারা বলছে যে, তারা মিটমাট চায় এবং আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকল। বৃটেন ফিনিশ শাসকশ্রেণীকে উস্কানি দিচ্ছে বলে মস্কো-রেডিওতে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়।

ইটালীর নিরপেক্ষতা !

ইটালীর মনোভাব এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একদিকে সে সোভিয়েটকে চোখ রাঙাচ্ছে, অন্যদিকে পরোক্ষে মিত্রশক্তিকে চাপ দিচ্ছে। ১৫ই নবেম্বর মুসোলিনী এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, অস্ত্রসজ্জিত থাকাই ইটালীর শান্তির নীতি। এই সভায় শ্রোতৃমণ্ডলী হঠাৎ 'কর্সিকা, টিউনিস' বলে চেঁচাতে আরম্ভ করে। ফরাসী অধিকৃত কর্সিকা ও টিউনিসএর আগেও ইটালী দাবী করেছিল। পরদিন এক প্রবন্ধে সিনর গায়দা লেখেন যে, ভের্সাই সন্ধিতে ইটালীকে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। এখন ইটালী উপনিবেশ চায়। ইটালীয় কাগজে বলা হচ্ছে যে, ইটালী বল্কান অঞ্চলে সোভিয়েটকে প্রভাব বিস্তার করতে দেবে না।

জার্ম্মান বিমান—

কয়েকদিন ধরে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডের উপর বিমানপোত ঘোরাফেরা করছে। ঐ তিনটি দেশ-ই এ সম্বন্ধে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। হল্যাণ্ডে জার্ম্মান বিমানের সঙ্গে ডাচ রক্ষীদের একটা সঙ্ঘর্ষও হয়ে গেছে।

২০—১১—৩৯ —ওয়াকিবহাল

'হিয়া মোর তোমার দর্পণ'

সবিতারাণী চৌধুরী

জীবনের গতি মোর বহিছে নিয়ত
কোন্ এক অজানিত পথে,
শত চেষ্টা যত্ন মোর ব্যর্থ হয় নিতি
ফিরাইতে নারি কোনমতে!
কৌমার্য্যের অবিশ্রান্ত চঞ্চলতা যত
বাধাহীন উচ্চ-কলহাসি
কোথায় মিলায়ে গেল, কি জানি কখন
তার স্থান জুড়ে নিল আসি
বধূর সলাজ-নত কম্পিত হৃদয়,
শঙ্কা-ভরা মৃদু-মন্দ ভাষ,
ধীর শান্ত হ'য়ে গেল সমস্ত জীবন,
মুছে ফেলে সকল উচ্ছ্বাস!
যেদিন তুলিয়া নিলে মোর দুটি কর
তোমার অভয় দুটি হাতে,
জীবন পূরিয়া গেল কী মাধুর্য্য-রসে,
অপার্থিব কি আনন্দ সাথে!
সেইদিন হ'তে মোর জীবনের ভার
তোমারেই করেছি অর্পণ,
জীবন-ফলকে হেরি তব প্রতিচ্ছবি
হিয়া মোর তোমার দর্পণ!

দেশীয় ছবিতে গতানুগাতকতার ধারায় বিরক্ত হইয়া দেশীয় ছায়াছবির দর্শক চিত্র-নির্ম্মাতাদের দরবারে নূতনত্বের দাবী জানাইয়াও বিশেষ কোন ফল লাভ করেন নাই। আমাদের দেশীয় ষ্টুডিওগুলির মালিক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের অধিকাংশেরই চিত্র-নির্ম্মাণ ব্যাপারে যে কোন রকম উচ্চ আদর্শ আছে, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তবে দর্শকের দাবী উপেক্ষা করা চলে না—কারণ শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই চিত্র-নির্ম্মাতাদের প্রধান অবলম্বন।

দর্শকসাধারণের "নূতনত্ব" দাবীর চাপে এদেশের কোন কোন ষ্টুডিও বর্ত্তমানে সোজা-সুজি প্রেমোপাখ্যান বা দস্যুদলের দুর্দ্ধর্ষ কাহিনী কিম্বা ভক্তিরসবহুল ধর্ম্মমূলক ছবি না তুলিয়া আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সকল সমস্যা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই চিত্রাকারে দেখাইবার এবং সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন। ইহা ভারতীয় সিনেমার পক্ষে একান্তই কল্যাণজনক।

* * *

শ্রীশান্তারামের পরিচালনায় গৃহীত প্রভাত ফিল্ম কোম্পানীর নূতনতম সামাজিক চিত্র "আদমী" বা "মানুষ" শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবিতে নায়ক এবং নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন, যথাক্রমে শ্রীমতী শান্তা হুবলিকার এবং শ্রীসাহু মোদক। মানুষের জীবনের চরম পরিণতি কি এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার সার্থকতাই বা কিরূপে আসে, তাহা শ্রীশান্তা-রাম "আদমী" ছবিতে আলোচনা করিয়াছেন।

* * *

রাধা ফিল্মসের পরবর্ত্তী পৌরাণিক ছবি "বামন-অবতার" শীঘ্রই উত্তর কলিকাতার কোন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। এই চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়াছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শীতল পাল, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী রেণুকা, ছায়া, পূর্ণিমা, সাবিত্রী, নিভাননী এবং বালক অভিনেতা মুকুল রায় চৌধুরী।

রাধা ফিল্মস কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর "সুভদ্রা-হরণের" কার্য্যে মনোযোগ দিবেন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীমতী রাণীবালা এই ছবির দুটি বিশিষ্ট ভূমিকার রূপ দিবেন।

* * * * *

পরিচালক শ্রীহেমচন্দ্রের প্রথম বাঙলা ছবি "পরাজয়"-এর কাজ শেষ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ইহা মুক্তিলাভ করিবে। বলা বাহুল্য ইহার প্রধান দুটি চরিত্রে দেখা যাইবে শ্রীমতী কাননবালা এবং শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শ্রীরাইচাঁদ বড়াল ইহার সঙ্গীত পরিচালক।

* * * * *

শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া সম্প্রতি তাঁহার নবতম হিন্দি ছবি "জিন্দাগী"র কাজ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। সায়গল এবং শ্রীমতী যমুনা এই ছবির প্রধান দুটি ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিবেন।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশনের প্রথম চিত্রাবদান "আলো-ছায়া"র খেলায় নিউ থিয়েটার্সের দুনম্বর ষ্টুডিওর কর্ণধার শ্রীযতীন মিত্র সর্ব্বান্তকরণে মনোযোগী হইয়াছেন। শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস অবশ্য ছবিখানির পরিচালক এবং বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে অভিনয়

কালী ফিল্মসের ঐতিহাসিক চিত্র "চাণক্য"-এর একটি দৃশ্যে শ্রীমতী রাধারাণী (ছায়ার ভূমিকায়) এবং শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী (চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায়)

করিতেছেন শ্রীপঙ্কজ মল্লিক, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং শ্রীমতী মলিনা, মঞ্জরী, শ্রীলেখা প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

* * * * *

কালী ফিল্মস লিমিটেডের "চাণক্য" ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই উত্তরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক অবলম্বনে ইহার চিত্র-নাট্য রচিত এবং চিত্র-পরিচালনা করিতেছেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, পরলোকগতা শ্রীমতী কঙ্কাবতী, রাধারাণী প্রভৃতি।

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট

গত সপ্তাহ হইতে বোম্বাইতে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে দুইটি খেলা শেষ হইয়াছে। প্রথম খেলায় হিন্দুদল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ৩১৭ রাণে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করিয়াছে। দ্বিতীয় খেলায় মুসলীম দল অবশিষ্ট দলের সহিত খেলিয়া এক ইনিংস ও ১১ রাণে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছে। এই দুইটি খেলার মধ্যে হিন্দু বনাম ইউরোপীয় দলের খেলাটিই সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। এই খেলায় বিজয় মার্চ্চেণ্ট ১৯২ রাণ ও বিনু মানকড় ১৩৩ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অমরনাথের ৫৭ রাণ, মেজর সি কে নাইডুর ৪৫ রাণ ও এল পি জয়ের ৬৪ রাণও উল্লেখযোগ্য। হিন্দু দল প্রথম দিন হইতে খেলা আরম্ভ করিয়া তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত খেলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক ইনিংসে ৫৯১ রাণ করিয়া পেণ্টাঙ্গুলার ও কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এক ইনিংসের রাণ সংখ্যার নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পেণ্টাঙ্গুলার বা কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কোন দল এক ইনিংসে এত অধিক রাণ করিতে সমর্থ হন নাই।

ইউরোপীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় সি এস নাইডু ৩১ রাণে ৫টি উইকেট পাইলেও এস ব্যানার্জ্জির এই ইনিংসে ৪১ রাণে ৪টি উইকেট লাভের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। এস ব্যানার্জ্জি প্রকৃতপক্ষে ইনিংসের বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করেন। তিনি ইউরোপীয় দলের প্রথম দুইজন খেলোয়াড়কে অল্প রাণে আউট করেন। পরে মস ও ওয়েন্সলীর ন্যায় দুইজন ধুরন্ধর খেলোয়াড় ইউরোপীয় দলের উইকেট পতন বন্ধ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া খেলিতে আরম্ভ করিলে ব্যানার্জ্জির বোলিং তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ও তাঁহারা আউট হন। ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে সি এস নাইডুর পক্ষে পরবর্ত্তী পাঁচজন খেলোয়াড়কে আউট করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। তবে সি এস নাইডুর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩ রাণে ৭টি উইকেট দখল বোলিংয়ের অসাধারণ কৃতিত্বে পরিচায়ক। সি এস নাইডুর "গুগ্লী" বোলিং প্রকৃতপক্ষেই এই ইনিংসে ইউরোপীয় দলের সকল খেলোয়াড়কে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিয়াছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ইউরোপীয় দলের সকলে যে মাত্র ১০৬ রাণে আউট হইয়াছিলেন এবং তাহা যে কেবল সি এস নাইডুর মারাত্মক বোলিংয়ের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল ইহা কোন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই অস্বীকার করিতে পারেন না। নিম্নে হিন্দু ও ইউরোপীয় দলের খেলাব ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

ইউরোপীয় দলের প্রথম ইনিংস:—১৬৮ রাণ (আর মস ৫৪, এফ ওয়েন্সলী ৩৬, ব্রাউন ১৫; এস ব্যানার্জ্জি ৪১ রাণে ৪টি, সি এস নাইডু ৩১ রাণে ৫টি, অমর সিং ৪৯ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)

হিন্দু দলের প্রথম ইনিংস:—৫৯১ রাণ (ভি মানকড় ১৩৩, বিজয় মার্চ্চেণ্ট ১৯২, সি কে নাইডু ৪৫, এল পি জয় ৬৪, অমরনাথ ৫৭, উদয় মার্চ্চেণ্ট ২৯, রঙ্গনেকার ২৫ নট আউট; এ্যাসলী ১৩৫ রাণে ৩টি, ওয়েন্সলী ২০০ রাণে ৪টি, ব্রাউন ১২১ রাণে তিনটি উইকেট পাইয়াছেন)।

ইউরোপীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—১০৬ রাণ (বি গ্রিয়ার ২৭, জি ব্রাউন ২২, ডি রাইমার ১৭; মানকড় ২০ রাণে ২টি, সি এস নাইডু ৩৩ রাণে ৭টি উইকেট পাইয়াছেন)।

(হিন্দু দল এক ইনিংস ও ৩১৭ রাণে বিজয়ী)

মুসলীম বনাম অবশিষ্ট দল

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যাল খেলায় মুসলীম দল অবশিষ্ট দলকে এক ইনিংস ও ১১ রাণে পরাজিত করিয়াছে। গত বৎসরও অবশিষ্ট দল হিন্দু দলের নিকট এই প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউণ্ডের খেলায় এক ইনিংস ও ১৬ রাণে পরাজিত হইয়াছিল। এই বৎসরের অবশিষ্ট দল মুসলীম দলের তুলনায় অনেক কম শক্তিসম্পন্ন ছিল। সুতরাং তাহাদের এই শোচনীয় পরাজয় আশ্চর্য্যের কিছুই নহে। তাহা ছাড়া অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক যেরূপ শোচনীয় খেলার নিদর্শন দিয়াছেন ও যেরূপ ত্রুটিপূর্ণভাবে খেলা পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে অবশিষ্ট দলের আরও অধিক রাণে পরাজিত হওয়া উচিত ছিল। মুসলীম দলের খেলোয়াড়গণ আশানুরূপ না খেলিতে পারায় খেলার ফলাফল শেষ পর্য্যন্ত উপরোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত শক্তিশালী মুসলীম দল প্রকৃত পক্ষেই উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ব্যাটিং ও বোলিং বিষয় মুসলীম দলের নিকট ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী আশা করা গিয়াছিল। এক ইনিংসে ২৯০ রাণ লাভ মুসলীম দলের খেলোয়াড়গণের হিসাবে খুব বেশী রাণ বলা চলে না। একমাত্র মুস্তাক আলীর ৬১ রাণ ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড়ই [illegible] শত রাণ করিতে সমর্থ হন নাই। অবশিষ্ট দলের হ্যারিস [illegible] শেষ পর্য্যন্ত বল করিতে পারিতেন তাহা হইলে উক্ত ২৯০ রাণ করা মুসলীম দলের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হ্যারিস হাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে মুসলীম দলের শেষ খেলোয়াড়গণ রাণ তুলিতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় হ্যারিসের বলে উজীর আলী, নাজির আলী, মুস্তাক আলী প্রভৃতি বি[illegible]ষ্ট খেলোয়াড়গণকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল। বোলিং [illegible]য়েও মুসলীম দলের কৃতিত্বের প্রশংসা করা যায় না। বিশেষ [illegible]রিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে হাজারীর ৫৭ রাণ নট আউট মুসলীম দলের শ্রেষ্ঠ বোলারদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। হাজারীর ন্যায় আর একটি খেলোয়াড় অবশিষ্ট দলে বর্ত্তমান থাকিলে মুসলীম বোলারদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ লাভ করিত। মুসলীম দলের সৌভাগ্য যে অবশিষ্ট দলের নির্ব্বাচকমণ্ডলী ঠিক মত দলের খেলোয়াড়গণ মনোনীত করিতে পারেন নাই। মিঃ ডিমেলোর ন্যায় ক্রীড়া পরিচালনা করিবার অনুপযুক্ত একজন খেলোয়াড় অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ইহাও কম ভাগ্যের কথা নহে। মিঃ ডিমেলো বিশিষ্ট খেলায় যোগদানের যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহা তাঁহার এক ওভারে ১৯টি রাণ হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। মুসলীম দল যদি ফাইনালে এইরূপ ক্রীড়ার অবতারণা করেন, তবে তাহাদের পেণ্টাঙ্গুলার বিজয়ী হইবার কোনই আশা নাই। মুসলীম ও অবশিষ্ট দলের খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

অবশিষ্ট প্রথম ইনিংস:—১৫৩ রাণ (রিচার্ডস ৪৩, ভি হাজারী ২১; আমীর ইলাহি ২২ রাণে ৩টি, জাহাঙ্গীর খাঁ ৫২ রাণে ৪টি উইকেট পাইয়াছেন)।

মুসলীম প্রথম ইনিংস:—২৯০ রাণ (মুস্তাক আলী ৬১, দিলওয়ার হোসেন ৩৮, নাজির আলী ৩৪, উজীর আলী ৩৩, নিশার ২২, আমীর ইলাহি ২২, এস কাদ্রি ২২; আলেকজাণ্ডার ৪৫ রাণে ৪টি, হ্যারিস ৩০ রাণে ৩টি উইকেট পাইয়াছেন)।

অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—১২৬ রাণ (ভি হাজারী ৫৭ রাণ নট আউট, রিচার্ডস ২৯; জাহাঙ্গীর খাঁ ২৯ রাণে ৩টি, নিশার ২৯ রাণে ৫টি উইকেট পাইয়াছেন)।

১৯শে নবেম্বর—

এলাহাবাদে "আনন্দ ভবনে" রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধী বিশেষ আমন্ত্রণে বৈঠকে যোগদান করেন। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

এলাহাবাদে মহাত্মা গান্ধী কমলা নেহরু স্মৃতি হাসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহাত্মা গান্ধী এই হাসপাতালের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা চাহিয়া দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন।

সুক্কুরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গার ফলে পাঁচজন হিন্দু ও ছয়জন মুসলমান নিহত এবং ২৩ জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, দাঙ্গার পূর্ব্বে মঞ্জিলগড় দখল কমিটির ছয়জন মুসলিম নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ধুবড়ীতে ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

ভূতপূর্ব্ব কাকোরী বন্দী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত এলাহাবাদে ১২৪(ক) ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কলিকাতার সাংবাদিকদের সহিত বৈঠকী আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সাংবাদিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

তোমাদেরই গান গাই

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

তোমরা কেবলি ঘৃণা করিয়াছ' হীন ভেবে আমাদেরে,
জিজ্ঞাসি শুধু—সে হীন ক'রেছে কারা?
শত নিপীড়নে তোমরা মোদের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে
বাঁচিয়ে রেখেছ সমাজের চিরধারা।
আমরা নীরবে কেঁদেছি অঝোরে পর্ণ-কুটির-ছায়ে,
প্রাসাদে বসিয়া তোমরা হেসেছ' খালি;
মন্দির ছুঁতে দাওনি মোদের, দাওনি পূজিতে মায়ে,
ললাটে আঁকিয়া দিয়াছ' ব্যথার কালি।
শুধাই আজিকে তোমরা কি শুধু সমাজের অধিকারী?
—সেথা কি মোদের তিলটুকু ঠাঁই নাই?
তোমরা হাসিবে, তোমরা গাহিবে, বাঁচিবে অহঙ্কারী;
আমরা কেবলি কাঁদিয়া মরিয়া যাই।
তোমরা করিছ' শাসন দেশেরে নীতির দোহাই দিয়ে,
সে নীতি নিজেরা মেনেছ' কি কোনদিন?
পুতুল খেলিছ' নিত্য সকলে মোদের জীবন নিয়ে
ধর্ম্মের নামে রহি' চির উদাসীন।
তোমাদের ভয়ে বক্ষে মোদের রক্ত কাঁপিয়া ওঠে,
তবু বল'—মোরা সমাজের বিপ্লবী;
শত লাঞ্ছনা নিত্য মোদের ভাগ্যে আসিয়া জোটে,
তোমাদের নভে হেসে যায় শশি-রবি।
নিজেরা করিয়া শত অপরাধ দোষ' শুধু আমাদেরে,
তবু সে সকল নীরবে সহিয়া যাই;
বর্ব্বরতায় তোমরা কেবলি সাজায়েছ' সমাজেরে,
তবুও আমরা তোমাদেরি গান গাই॥

৭ম বর্ষ] শনিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ Saturday, 18th November, 1939 [১ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের নববর্ষ—

'দেশ' তাহার ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষের প্রারম্ভে সে তাহার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। প্রথম যেদিন সে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল সেদিন তাহার সহায় ছিল অল্প, সম্বল ছিল অকিঞ্চিৎকর। সত্য এবং স্বাধীনতাকে যাত্রাপথের ধ্রুবতারা করিয়া অনিশ্চিতের পথে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে তাহার শৈশবের দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিয়া যৌবনের শক্তি এবং আত্ম-বিশ্বাস লাভ করিয়াছে। তাহার পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার জন্য গৌরবের অধিকারী দেশের স্বদেশবৎসল নর-নারী যাঁহাদের মুক্তি-পিপাসু অন্তর 'দেশে'-এর মধ্যে শুনিতে পাইয়াছে সত্যের অকম্পিত মেঘমন্দ্র স্বর, খুঁজিয়া পাইয়াছে কল্যাণের শুভ্র-রেখা। তাঁহাদেরই শুভকামনা 'দেশের' যাত্রাপথের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পাথেয়—তাঁহাদেরই আশীর্ব্বাদ 'দেশের' রক্ষাকবচ। তাঁহাদের সস্নেহ দৃষ্টি 'দেশে'র অঙ্গে সঞ্চারিত করিয়াছে নূতন রক্তধারা—তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াই 'দেশ' আপনার অস্তিত্বকে সগৌরবে বহন করিয়া আসিয়াছে। আমরা 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকগণকে পুনরায় অমাদের অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। এদেশে সংবাদপত্র-পরিচালনার পথে পদে পদে কণ্টকের অভ্যর্থনা। বাধা বিপত্তির অন্ত নাই। সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত গুপ্ত পাহাড়-গুলির ধাক্কা পদে পদে বাঁচাইয়া তবে আমাদিগকে তরঙ্গ-সঙ্কুল জলপথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হইতে হয়। পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদিগকে যখন বিচার করিবেন তখন অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন আমাদের বিপদসঙ্কুল যাত্রা-পথের কথা। তবে ইহা ধ্রুবসত্য যে 'দেশ' কোন লোভে চঞ্চল এবং কোনো ভয়ে অভিভূত হইয়া সত্যের এবং স্বাধীনতার পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। সে জানে, সত্যের এবং মুক্তির জন্য যাহারা সংগ্রাম করিতে বাহির হয় লাঞ্ছনাই তাহাদের অঙ্গের ভূষণ, শত্রুর দেওয়া আঘাতের চিহ্নই তাহাদের ললাটের জয়তিলক। ভগবান 'দেশ'কে সেই শক্তি দান করুন যাহা তাহাকে সত্যের এবং স্বাধীনতার পথে অবিচলিত রাখিবে।

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—

ধর্ম্মের সঙ্গে জাতীয়তার সম্পর্ক কি, ইহা লইয়া প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। মিঃ জিন্না এবং তাঁহার অনুরাগী দল ধর্ম্ম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাকেই বলিয়া বুঝাইতে চাহেন জাতীয়তা। তাঁহাদের এই যুক্তি আমরা সমর্থন করিয়া লইতে পারি না। সাম্প্রদায়িকতাগত ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সংস্কৃতি একটা একত্বের অনুভূতি দিতে পারে এবং সেই একত্বের অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতিতে বিধৃত এমন সংস্কৃতি যেখানে নাই, সেখানে জাতীয়তাও নাই, সমাজ নাই, নাই সেখানে সংহতি। সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দেওয়ার অর্থ এই সংস্কৃতিকে অস্বীকার, বিরোধকে বাড়ান, ভেদকে প্রশ্রয় দেওয়া। এই পথে কোন দেশেই জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে না। বৃটিশ রাজনীতিকেরা সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের নামে এই সাম্প্রদায়িকতাকে জিয়াইয়া রাখিতেছেন। তাঁহাদের সেই মনোবৃত্তি যতদিন এদেশের আবহাওয়ায় অনুকূলতা লাভ করিবে, ততদিন ভারতের উদ্ধার নাই। মিঃ হোরেস জি আলেকজেন্ডার 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে ভারতের অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'গোল-টেবিল বৈঠকে যে ভুল করা হইয়াছিল, পুনরায় সেই ভুল করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এই সকল বৈঠকে ক্ষুদ্র শ্রেণীগত স্বার্থকে উস্কাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া শ্রেণী-বিভেদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বাহির হইতে কোন শক্তি আসিয়া কোন দেশের ঝগড়া বিবাদ মিটাইতে পারে না—তাহা ইংলণ্ড কি আজও প্যালেষ্টাইন, ভারতবর্ষ হইতে শিখিতে পারে নাই? বিবাদ-বিসম্বাদকারী বিভিন্ন দল স্ব স্ব দাবী দাবাইয়া রাখিয়া যে আপোষ-মীমাংসার জন্য অগ্রসর হইবে, ইহাও

কি কখন সম্ভব?' অথচ ভারতের ব্রিটিশ অভিভাবকগণ এই অসম্ভবকে সম্ভব না করিয়া ছাড়িবেন না। ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধ মিটাইবার ভাবনা ভারতবাসীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ব্রিটিশ অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত হউন, কংগ্রেস এই কথাই বলিয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভারতবাসীদের ঐক্যের জন্য উদ্বেগের উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইতে অভিভাবকের দল নারাজ। ভারত-সেবার এই আত্যন্তিকতার টান হইতে কবে তাঁহারা মুক্তি পাইবেন, আমাদের শুধু সেই চিন্তাই মনে জাগিতেছে। ভেদ-বিরোধ আমাদের মধ্যে, আমরা হতভাগ্য; কিন্তু আমাদের জন্য অপর একটা একান্ত সদিচ্ছাপরায়ণ জাতি অনন্তকাল উদ্বেগ ভোগ করিবে, এই চিন্তায় আমাদের মন অধীর হইয়া পড়িতেছে; কারণ, হাজার হইলেও আমরাও ত মানুষ।

মুসলীম লীগের দাবীর মূল্য—

মুসলীম লীগই ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস মুসলমানদের কেহ নয়, ছত্তরীর নবাব সেদিনও এই কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ইহা যে কত বড় একটা ধাপ্পাবাজী, দিন দিনই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলমান প্রধান স্থান, ভারতের কোন প্রদেশেই এত মুসলমান নাই। এই প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগের পর মুসলীম লীগওয়ালাদের সাহসে কুলায় নাই যে, তাঁহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আগাইয়া যান। সিন্ধু প্রদেশেও মুসলীম লীগের অবস্থা ইহার অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নয়। মহম্মদ বিন-কাশিমের জিগীর ছাড়িয়াও মুসলীম লীগওয়ালারা কংগ্রেসের নীতি সমর্থক আল্লাবক্স মন্ত্রিমণ্ডলকে সিন্ধুতে কাবু করিতে পারেন নাই। আল্লাবক্স মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেসের নীতি অনুসারে পদত্যাগ করুন না করুন, সে কথা স্বতন্ত্র; ইহা সত্য যে, মুসলীম লীগের বিরোধী দল সেখানে প্রতাপান্বিত—লীগ সেখানে পাত্তা পায় নাই। তারপর আসামের কথা। আসামের প্রগতি-বিরোধী চা-কর সাহেবদের লস্কর দল সেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গড়িবে বলিয়া লাফালাফি করিতেছে, ভারত-সচিব স্বয়ং সেজন্য সুখস্বপ্ন দেখিয়াছেন; কিন্ত চা-কর সাহেবদের লস্করের দল, আসামের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কতটা বেহায়াপনার সুবিধা সেখানে হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সে শিক্ষা কি লাভ করিতে পারে নাই?

বাঙলার নূতন লাট—

বাঙলার নূতন গবর্ণর স্যার জন আর্থার হার্বার্ট ১৮ই নবেম্বর হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন। অস্থায়ী গবর্ণর স্যার জন উডহেড বিদায় গ্রহণ করিলেন। একদিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীসমূহের পদত্যাগ, ইহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বাঙলার নূতন লাটের নীতি কোন্ আকার ধারণ করিবে, এ চিন্তার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। স্যার জন এণ্ডারসনের একান্ত অনুরাগী মন্ত্রিমণ্ডল বহাল তবিয়তে যতদিন বিদ্যমান আছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মত লোকের এজন্য মাথা ঘামাইবার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে হয় না।

মাইনরিটির মর্ম্ম কথা—

যুক্তপ্রদেশের ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলনের সভাপতিরূপে মিঃ এ ধরমদাস যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ ধরমদাস বলেন,—"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহযোগিতার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন।" ভারতবর্ষের নিজের স্বাধীনতা যখন দেওয়া হইতেছে না, তখন সে স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণা আন্তরিকভাবে কিরূপে উপলব্ধি করিবে! সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দোহাই দিয়া যাঁহারা কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধতা করিতেছেন, আমরা সেই লীগওয়ালাদিগকে মিঃ ধরমদাসের বক্তৃতাটা পড়িয়া দেখিতে বলি। আশা করি, তাতে তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে। দেশের স্বাধীনতা—সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলেও যে প্রথমে প্রয়োজন, অন্ততঃ এটুকু তাঁহারা বুঝিবেন। পরের গোলামগিরিতে পড়িয়া থাকিবার দুর্ম্মতি তাঁহাদের দূর হইবে।

পদত্যাগের পর—

আগামী রবিবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ণীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী একে একে পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহার পর কি? শুধু পদত্যাগ পর্য্যন্তই, না ইহার পরে কিছু আছে, যদি থাকে তবে তাহা কি? মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কি হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের মতিগতির উপর নির্ভর করিতেছে। দেশের লোকের পক্ষে এই উক্তি হইতে আলোক পাওয়া কিছু দুরূহ। মন্ত্রিমণ্ডল যখন পদত্যাগ করিলেন, কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কর্ম্মতালিকা স্থগিত হইল। এখন কি তবে কোন কাজ থাকিবে না? জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগে জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হইবেই, না হইয়া যায় না। এক্ষেত্রে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একটি কর্ম্মপন্থাও থাকা আবশ্যক। আমরা বুঝিতেছি, হিন্দু-মুসলমানের মিলনকেই এই কর্ম্মপন্থায় খুব সম্ভব প্রথম স্থান দেওয়া হইবে; তাহা যে অপ্রয়োজন আমরাও ইহা মনে করি না; কিন্তু আমাদের মতে, সাম্প্রদায়িক পথে না গিয়া বৃহত্তর জাতীয়তার অনুভূতির ভিত্তিতেই এই মিলনের পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মনস্তুষ্টির জন্য সাধ্য সাধনা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে এবং ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী ভেদনীতিবাদীরা যাহা চাহিতেছে, কার্য্যত তাহাই ঘটিবে। মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা যাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে, মিলনমূলক কার্য্যপদ্ধতি, তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত মর্য্যাদাবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানের অভাব এদেশে নাই—কংগ্রেস তাঁহাদের আদর্শ এবং প্রেরণাকেই দেশময় প্রসারলাভ করিতে দিন, ইহাই আমরা চাই। বিহার

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুসলিম দলের সভাপতি মৌলানা আবুল মহসীন মহম্মদ সাজ্জাদ সেদিন একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে সব মুসলমানেরা আজও নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে, তাহাদের লজ্জা বোধ করা উচিত। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবার মত ক্ষমতা ভারতের মুসলমানদের নিজেদেরই আছে। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন, তবে মুসলমানেরা ধ্বংস হইয়া যাইবে না, সেজন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন চিন্তা নাই। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা এমন আত্মমর্য্যাদাবুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত এবং পরপদলেহনে ঘৃণার ভাব-সম্পন্ন তাঁহাদিগকে লইয়াই জাতির সংহতিশক্তিকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। পদত্যাগের প্রতিক্রিয়া যখন অনিবার্য তখন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উদাসীনবৎ অবস্থানও অযৌক্তিক; শুধু অযৌক্তিকই নয় অনিষ্টকর। আগাইয়া যাইতে হইবেই; গতি যখন আরম্ভ হইয়াছে বসিয়া ভাবিবার উপায় নাই।

বন্দিমুক্তি ও বাঙলা সরকার--

বাঙলা সরকার ৪০জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবৃতির মূল কথা হইল এই যে, বন্দীমুক্তি পরামর্শ-দাতা কমিটির সুপারিশই তাঁহারা এক্ষেত্রে মানিয়া লইয়াছেন। বন্দীমুক্তি পরামর্শ কমিটির সুপারিশের এক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্যক্তিগতভাবে বন্দীদের প্রত্যেকের অপরাধের বিচার না করিয়া উদার নীতি অনুসরণের দিক হইতে ব্যাপকভাবে মুক্তি দেওয়াই এক্ষেত্রে উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। সকল দেশেই উদার নীতির আদর্শের দিক হইতে এরূপ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ব্যাপকভাবে মুক্তিই দেওয়া হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের অন্যতম রাষ্ট্র-ব্যবস্থাবিদ হেরল্ড ল্যাস্কিও সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কারণ সেরূপ উদার নীতি গ্রহণের ফল আইন ও শান্তিরক্ষার পক্ষে সহায়কই হইয়া থাকে। উদারতার একটা অমোঘ প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাহাতে অসন্তোষের মূল কারণ দূর হয়। রাজনৈতিক বন্দীরা এখন বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশের অবস্থার এখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; দেশের জনমত অধিকতর জাগ্রত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ব্যাপকভাবে সকলকে মুক্তি দান করিলে ফল ভাল হইত। যাহাদিগকে মুক্তিদান করা হইয়াছে তাহাদের মুক্তির ফলে আইন ও শান্তিরক্ষার পথে কোথায়ও কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই, অবশিষ্ট ৪০জন বন্দীকে মুক্তি দিলে সে বিঘ্ন তো ঘটিতই না, বরং উদারনীতির প্রতি স্বতঃ সহানুভূতির শক্তিতে বাঙলা সরকারই লাভবান হইতেন। রাজনৈতিক অনুভূতিতে জাগ্রত বাঙলার অন্তরের সঙ্গে যোগের এই সুবিধা পরিত্যাগ করা বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

পরিবর্ত্তন কোথায়—

স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান পাঞ্জাবের গবর্ণর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের মুখপত্র 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রে বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছেন। স্যার এডওয়ার্ড বলেন,—"এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, ১৯১৪ সালের ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমানের ভারতবর্ষ এই দুইয়ে পার্থক্য আছে। ১৯২১ সালে এবং পুনরায় ১৯৩৫ সালে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে গুরুতর রকমের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শাসনের ভার দেশের লোকের হাতে গিয়াছে, ১৯১৪ সালে ইহা কল্পনারও অতীত ছিল। স্বতন্ত্র ভাবে নিজের বিবেচনা মত চলিবার ইচ্ছা ভারতবাসীদের মধ্যে এখন যতটা জাগিয়াছে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা ছিল না।" ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, স্যার এডওয়ার্ড তাহা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মতিগতির তদনুযায়ী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে কংগ্রেসের একটা বড় দল এখনও কেন সন্দিগ্ধচেতা, লেখকের মনে এ প্রশ্ন উঠিবার কারণ থাকিত না।

আধুনিকতার বাণী—

গত ২৫শে কার্ত্তিক রাঁচীর নিকটবর্ত্তী হিনু ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। মিত্র মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'পশ্চিম জগতে যুদ্ধের কাড়া নাকাড়া বাজার আগেও যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার প্রতিটি ঢেউ কি আমাদের এপারে এসে লাগে নি? চারিদিকে যে অসন্তোষের আগুন লেগেছে, তা সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করবেই তো? * * দিল্লীশ্বরের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা, রাজপুত শিবিরের অসি ঝনঝনা ত্যাগ করে সাহিত্য বাঁশবনের অন্তরালে আঁশ সেওড়ার তলায় পল্লীপথের ছায়ায় ঘুরে তৃপ্তি লাভ করছে। সাহিত্যের দৃষ্টিকেন্দ্র যে বদলে গেছে, তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আজকালকার লেখা—বিশেষত উদীয়মান তরুণ লেখকদের কলমের ডগায় যে আগুন জ্বলছে, তাকে তুচ্ছ করবার মত দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমাদের কখনও না হয়। যে বিশ্বগ্রাসী অসন্তোষের ক্ষুধা চারিদিকে তার লেলিহান রসনা বিস্তার করে দিচ্ছে, তাকে সত্য বলে মেনে নিতেই হবে। সত্যকে রূপদান করা যদি সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হয়, তবে সেই অভাব যেন কোনও দিন আমাদের না হয়।'

যে লেখকের কলমের ডগায় আগুন জ্বলে তাকে আমরা অভিনন্দন করিতেছি। তিনিই সত্য সাহিত্যিক, তিনি দেশ ও কালের অতীত। মানব মনের অস্থির আবেগের প্রতিচ্ছবির ভিতর দিয়া সনাতন যে জ্যোতির্ম্ময় সত্য, তাহারই তিনি সন্ধান দিতেছেন।

যুদ্ধের গতি—

আমাদের কোন দৈনিক সহযোগীর লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন,—

"যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এই মন্তব্য সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ লড়াই, একটা অদ্ভুত ধরণের লড়াই। মনে হয় না যে, এখনও লড়াই আরম্ভ হইয়াছে, সাধারণত লড়াই বাধিলে যে ধরণের বিপর্য্যয়কর ব্যাপার ঘটে, আমরা মনে করি, তেমন কিছু যে ঘটিতেছে, ইহা মনেই আসে না।" আমরা ভারতবাসীরা লড়াইয়ের ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে রহিয়াছি, সুতরাং সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে যাইবার ঝোঁক আমাদের আরও বেশী কিছু বাড়িবার অবসর রহিয়াছে। গত সোমবার সকাল বেলাকার কাগজে দেখা গেল, রবিবার দিন সন্ধ্যা ছয়টায় কলিকাতার কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একখানা উড়োজাহাজ দেখা যায়। উড়োজাহাজখানা নিষিদ্ধ অঞ্চলের দিকে যাইতেছিল। তখনই উড়োজাহাজের আক্রমণের বিপদসূচক সঙ্কেত সাড়া দিয়া উঠে, পাঁচ মিনিট পরে দেখা যায়, উড়োজাহাজখানা শত্রুপক্ষের নয় মিত্রপক্ষের, তখন অবার 'পথ-পরিষ্কারের' সঙ্কেতে নিরাপত্তা ঘোষণা করা হয়। শহরের উপরে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটিল, ট্রাম বন্ধ হইল, ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই কর্পোরেশন সতর্কতার ব্যবস্থা অবলম্বন করিল, এম্বুলেন্স ও দমকল দম বন্ধ করিয়া উদ্গ্রীব হইয়া থাকিল, অথচ আমাদের মনের অবচেতন স্তরেও আঘাত লাগিবার কোন অবকাশ হইল না। ব্রিটিশ অভিভাবকদের আওতায় থাকিয়া আমাদের উন্নতি আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের দিকে কতটা অগ্রসর হইতেছে, ইহা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় বলা যায়।

ভারতীয় নাবিকদের ধর্ম্মঘট—

ভারতীয় জাহাজী শ্রমিক সঙ্ঘের সেক্রেটারী মিঃ আলী লণ্ডন হইতে রয়টারের প্রতিনিধির নিকট একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় এ পর্যন্ত কেপটাউনে ২০জন, ডারবানে ৬০ হইতে ৭০জন, বেইরায় ৮জন, লণ্ডনে ১২০জন এবং গ্লাসগো ও লিভারপুলে তিনশতের অধিক ভারতীয় নাবিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর শত্রুপক্ষের আক্রমণে অন্তত দেড়শত ভারতীয় নাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর নাবিকদের বেতন বৃদ্ধি এবং যুদ্ধে মৃত্যু হইলে ক্ষতিপূরণ ও আহত হইলে অক্ষমতার অনুপাতে ক্ষতিপূরণের টাকার হার বৃদ্ধির দাবীর ফলে নাবিকেরা কাজ করিতে অসম্মত হওয়াতেই তাহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। নাবিকদের দাবীতে দেখা যায়, ইংরেজ নাবিকদিগের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা যে হারে যুদ্ধের পর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ভারতীয় নাবিকদের তাহা দেওয়া হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে ভিন্ন ভিন্ন হারে বেতন দেওয়া হয়। ভারতীয় জাহাজী শ্রমিক-সঙ্ঘ নাবিকদের পক্ষ হইতে তিনটি দাবী উত্থাপন করেন—(১) শতকরা ৫০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি, (২) একটি নিয়োগ কমিটি প্রতিষ্ঠা এবং (৩) ভারতের সমস্ত বন্দর হইতে আগত নাবিকদের মধ্যে একটা বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া। এইসব দাবীর কোনটি পূরণ করা হয় নাই। জাহাজের নাবিকের কাজে সাদায়-কালায় পার্থক্যের জন্য সমস্যা বহুদিন হইতেই চলিতেছে এবং বেতনের হারেও পার্থক্য করা হইতেছে। ভারতের কালা আদমীরা এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এখন আর মানিয়া চলিবে না, যুদ্ধের এই সঙ্কটের সময়ে জাহাজওয়ালাদের অন্তত সেটুকু বুঝা উচিত। সাম্য, মৈত্রীর বড় বড় কথা মুখে বলার চেয়ে কাজে দেখাইলে ভাল হয়। কিন্তু বরাবরকার ত্রুটি কেবল সেইদিকে।

স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির মূল্য—

মিঃ ভার্নন বার্টলেট ইংলণ্ডের একজন বড় সাংবাদিক। ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সত্য এই যে, স্বায়ত্তশাসন না পাওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ অন্তহীন গোলযোগের কেন্দ্র হইয়াই থাকিবে। আধুনিক জগতে ভারতবর্ষ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ এমন একটি স্তরে সে পৌঁছিয়াছে, যেখানে আত্মশাসনের দ্বারা বরং সে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে, তথাপি অপরের সুশাসনকে স্বীকার করিবে না। এই স্তরে উপনীত যে কোন জাতির পক্ষেই সহানুভূতির প্রয়োজন, এবং সে সহানুভূতির জন্য তাহারা কৃতজ্ঞই থাকে। আমাদের সরকার যদি ভারতবর্ষের শাসনকাল সংক্ষিপ্ত করেন, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবে।"

জটিল কথা কিছুই নয়। সেদিন শ্রীহট্টের একটি বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্রও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ধুয়া তুলিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যার অজুহাতে ব্রিটিশ জাতির ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বিলম্ব করিবার মূলে যৌক্তিকতা নাই। প্রত্যেক দেশে, এমন কি, ইংলণ্ডেও মতবিরোধ আছে; কিন্তু এই সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোন দেশের লোকই বাহির হইতে লোক ডাকিয়া আনে না। এই তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। এই সকলের সমাধান যে কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা আমরা জানি। স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না।

অধিকাংশ লোকের মতের দ্বারাই সব দেশে শাসনতন্ত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও তাহাই হইবে। এজন্য দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, ভুগিবে ভারতবাসীরাই এবং সেইরূপ অন্তরায়ের ভিতর দিয়াই তাহারা নিজের পথ করিয়া লইবে সব দেশই তাহাই লইয়াছে। ইংরেজের শত সদিচ্ছাতেও যীশুর অকৈতব প্রেমের স্বর্গরাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইংরেজের অভিভাবকত্বের আওতায় থাকিয়া সেই স্বর্গরাজ্য আসিলে ভারতবাসীরা স্বাধীনতা পাইবে, এমন কল্পনার মূলে বাস্তব কিছুই নাই। ত্যাগমূলক কর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়া তেমন অলস কল্পনার গোলকধাঁধা কাটাইয়া ভারতবাসীকে আজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মুক্ত আকাশের তলে আসিতে হইবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার সত্যকা গরজের মূলে এটুকু ঝুঁকি থাকিবেই, ভারতবাসীরা ইহা সা বুঝিয়াছে।

নববর্ষের আশীর্ব্বাণী

শ্রীযুক্ত "দেশ" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

"দেশে"র নব জন্মতিথিকে আমি আশীর্ব্বাদ করি, এ পত্রের যেন দিনের পর দিন কান্তি পুষ্ট হয়। কিন্তু এ আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হতে পারে এ-ভয় আমার আছে।

যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে কোনও পত্র বা পত্রিকার যে আশু শ্রীবৃদ্ধি হবে এরূপ আশা করা যায় না।

যুদ্ধ শুনেছি বেধেছে, কিন্তু যুদ্ধ হচ্ছে কি হচ্ছে না, তার কোনও খবর নেই—আর খবরের অভাবে খবরের কাগজ চলে না। এ যুদ্ধ শুনেছি আর পাঁচ বৎসর এইভাবে চলবে অর্থাৎ আরও পাঁচ বৎসর বেমালুম যুদ্ধ চলবে; ইতিমধ্যে দৈনিক পত্রের খোরাক জুটবে কোথা থেকে। আজকাল শুনতে পাই যে, গল্প হচ্ছে সেই জাতীয় সাহিত্য যার ভিতর কোন ঘটনা নেই। যুদ্ধও কি সেই জাতীয় বস্তু যার ভিতর কোনও ঘটনা নেই?

আর সাপ্তাহিক পত্রের উন্নতিও সম্ভব নয়—Ordinanceএর ভয়ে নয়। আমাদের কিছু বলবার নেই বলে। আমাদের মাথা কি এখন ideaয় ভরা? না, কেননা যে সব idea নিয়ে আমরা লেখার কারবার করছিলুম, সে সব idea এখন বাতিল হয়ে গিয়েছে, সে ideaর জন্মভূমি ইংলণ্ডই হোক—আর রুশিয়াই হোক।

যুদ্ধ যে সুরু হয়েছে তার প্রমাণ আমাদের দেশের আমদানী ও রপ্তানির হিসেব থেকে পাওয়া যায়। বিলেত থেকে যে খবর আসছে না, শুধু তাই নয়, কাগজও আসছে না; বলা বাহুল্য যে, এ দু-ই হচ্ছে খবরের কাগজের গোড়ার কথা।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

* *

দীপালীর মায়াপুরী

বিখ্যাত রাজা রণজিৎ সিংজীর অনুপম কীর্ত্তি—অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির সরোবর-মধ্যে দ্বীপের ন্যায় গঠিত। সান-বাঁধান সরোবরের চার চত্বরের এক পার্শ্ব হইতে সেতু নির্ম্মিত—মন্দিরে প্রবেশ জন্য। সরোবরের অকম্পিত স্বচ্ছ বক্ষে মন্দিরের প্রতিচ্ছবি অহরহ অপরূপ মায়া বিস্তার করে। তদুপরি দীপালী রজনীতে মন্দির-সজ্জার অগণিত আলোক-তারকা নিম্নের জলের সংগে লুকোচুরি খেলিয়া দর্শকের চক্ষে রহস্য -কাজল বুলাইয়া দেয়। শুধু দর্শনের পুলক শিহরণই একমাত্র পারিতোষিক নয়—বৃহৎ লোহ কটাহ হইতে কাঠের তাড়ুর পূর্ণাঞ্জলি হালুয়া প্রসাদও মিলিয়া থাকে।

* *
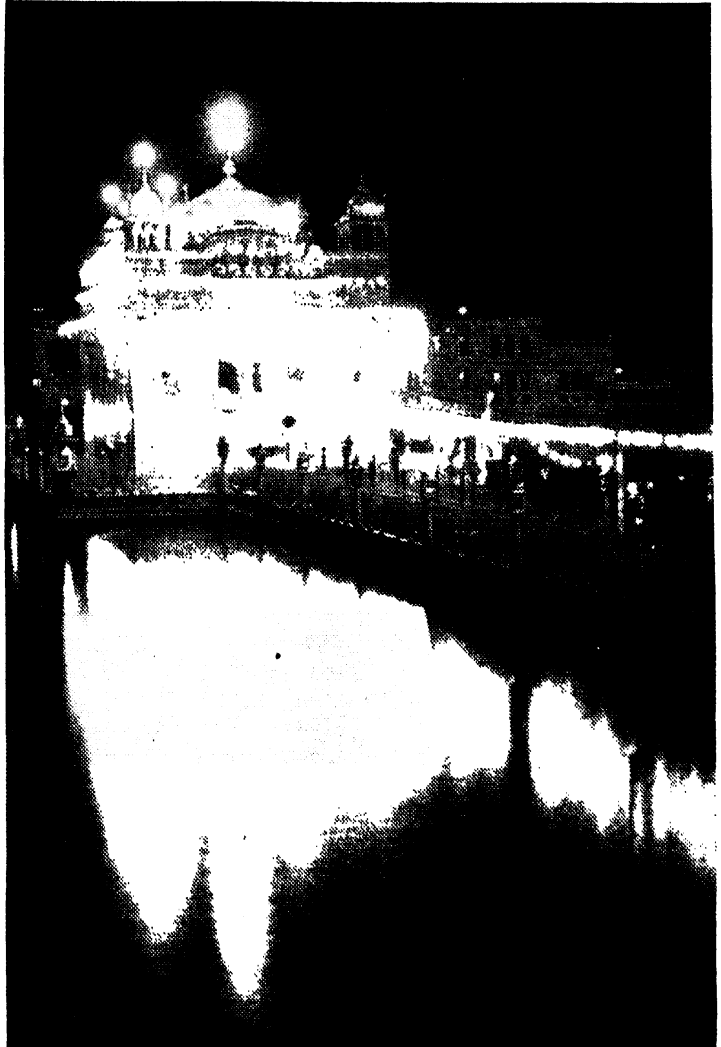
ধাঁধার উত্তর

(ছোট গল্প)

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

বাড়ী হইতে এ পথটুকু, এক রকম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বাসে চড়িয়া বসিয়া জগদীশ নিশ্বাস ফেলেন; ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় লইয়া।

নিশ্বাস ফেলেন—অবসাদের নয়, ঔদাস্যের। নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন

—আর নয়, আগামী মাস হইতে কাজটা ছাড়িয়া দিয়া তবে আর কথা। এই মাসের এই কয়টা দিন—ব্যস্, ভাবেন নয়, দৃঢ়সঙ্কল্পই করেন মনে মনে।

যথেষ্ট হইয়াছে আর কেন—কাহার জন্যই বা খাটিয়া মরা? তা'ছাড়া এ বয়সে খাটিয়া খায় কে? বিশ্রামের দাবী তিনি করিতে পারেন।

ভুল করিবেন—যদি মনে করেন, বয়সের ভারে ঝুঁকিয়া পড়া বৃদ্ধ জগদীশ সাবধানে আর ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছেন শ্রান্তি মোচনের—অথবা এই সামান্য পথটুকু দ্রুত তালে অতিক্রম করিয়া আসিতে হাঁফাইতে হইতেছে তাঁহাকে।

শালের খুঁটির মত মজবুত শরীর জগদীশের সত্তরটি শীত, গ্রীষ্ম, হিম-জল সহিয়াও সোজা আর সতেজ। 'কাল' এই দীর্ঘকালের সাধনাতেও তাঁহার মেরুদণ্ডে ঘুন ধরাইতে সক্ষম হয় নাই।

ভুল করিবেন যদি মনে করেন, আজীবন অবিশ্রান্ত খাটিয়া খাটিয়া মনে আসিয়াছে ক্লান্তি আর বৈরাগ্য; কর্ম্ম-বিমুখ চিত্ত শেষ জীবনটায় বিশ্রামের জন্য লালায়িত।

খাটিবার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য তাঁহার যুবক পুত্রদের অপেক্ষা বেশী বৈ কম নয়।

"জনসন এণ্ড কোম্পানীর" ঘানিতে আট দশ ঘণ্টা অক্লান্ত ঘুরিয়া আসার পর, অবলীলাক্রমে প্রত্যহ দুই মাইল পথ হাঁটিয়া বাড়ী আসেন জগদীশ।

আসেন অবশ্য সখের খাতিরেই; পথ-খরচার ওই পয়সা কয়টি বাঁচাইয়া সংসারের কোন মহৎ উপকার সাধিত হইবে—এমন দুরবস্থা জগদীশের নয়।

পঞ্চাশটি টাকার বিনিময়ে একদা যে দাসত্বের সুরু হইয়াছিল, উনপঞ্চাশ বৎসরের নিখুঁত কর্ম্মকুশলতা ও নিরীহ বশ্যতার গুণে ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে তাহা পদমর্য্যাদায় ও অর্থ-গৌরবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে অনেক দূর।

তা' সখের খাতিরে করিতে হয় অনেক কিছু; নয়টা বেলায় 'জনসন' কোম্পানীর হাজিরা খাতায় সই দিবার আগেই বাজারে হাজিরা দিতে হয় প্রত্যহ।

প্রত্যে[illegible] জিনিষ নিজের হাতে নাড়িয়া-চাড়িয়া, বাছিয়া বাছিয়া কেনা—এক দুর্দ্দান্ত সখ।

তাহারও আগে—

ছোট ছোট নাতি-নাতনীগুলিকে লইয়া পার্কে চরাইয়া আনা আর এক সখের কাজ।

আলস্য জগদীশের কোনখানেই নাই, না শরীরে—না মনে।

মনে করিতে পারেন, বৃদ্ধ জগদীশের অর্থোপার্জ্জনের দায়িত্ব আর প্রয়োজন মিটিয়াছে।

কৃতী পুত্রদের ভরসায়—অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারেন প্রতি ত্রিশটি দিন অন্তর গোছাকতক করিয়া নোটের মায়া। মনে করিলে ভুলই করিবেন—

কারণ পাঁচটি পুত্র জগদীশের কৃতবিদ্য বটে, তবে কৃতী কেহই নহে।

লোকের কাছে বলিতে মুখোজ্জ্বল বাহির হইতে শুনিতেও ভাল; বড় ছেলে ওকালতী করে, মেজ ডাক্তার, সেজ (দেশের একটা বড় অভাব দূর করিতে) সাবানের ফ্যাক্টরী খুলিয়াছে এবং ন' আর ছোট যেদিক হইতে যতগুলা পাশ করা সম্ভব সব গুলা করিয়া রাখিয়া, একজন খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেছে ও একজন য়্যাষ্ট্রলজি শিখিতেছে।

বিরাট সংসারটি কিন্তু খাড়া হইয়া আছে, ওই শালের খুঁটির ঠেকোয়।

চাকুরী ছাড়িয়া দিবার সাধু সংকল্প জগদীশের সংসারের উপর অভিমানে ও রাগে।

জব্দ করিয়া দিবেন জগদীশ সকলকে।

আশ্চর্য্য কাণ্ড! অথর্ব্ব অনড় বসিয়া খাওয়া বাপ নয় যে সংসারের বাড়তি আবর্জ্জনার সামিল হইয়া যাইবেন। এখনও ছেলেদের ট্রাম-বাসের ভাড়ার জন্য বাপের কাছে হাত পাতিতে হয়, তবু জগদীশ মর্ম্মাহত হইয়া দেখেন বাপের উপর যেন উহাদের স্পষ্ট অবজ্ঞা।

কথা কয় বাঁকাইয়া, হাসে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে, অর্দ্ধেক সময় উহাদের হাসি-কথার অর্থই বোধগম্য হয় না। আত্মজ বলিয়া, একান্ত আপন বলিয়া চিনিবার জো নাই, কে যেন উহারা কোথা হইতে মানুষ হইয়া আসিয়াছে পরিণত বয়স ও মন লইয়া—আপনাদের বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া।

আসিয়াছে এবং দয়া করিয়া যে জগদীশের বাড়ীতে রহিয়া দুইবেলা অন্ন গ্রহণ করিতেছে, সেও শুধু তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে এমনিতরো ভাবখানা উহাদের।

ডাকিলে সাড়া দেয় না। কথা কহিলে উত্তর দেয় বিরক্তি-পূর্ণ; তাহাদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ক[illegible] চটিয়া উঠে, উপদেশের উত্তরে চোখ গরম করিয়া কড়া কথা শুনাইয়া দেয়।

যেন উহাদের কথায় কথা কহা জগদীশের অনধিকার চর্চ্চা, ধৃষ্টতা।

অপমানিত জগদীশের চোখে জল আসিয়া পড়ে। তবু ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন কৈ, তাহাদের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের চিন্তা?

বার্দ্ধক্যের চিহ্ন শুধু এইখানেই ধরা পড়ে। কথার মূল্য যেখানে কাণা-কড়াও নয়, সেখানেও কথা কহা চাই—মতামতের তোয়াক্কা কেহ না রাখিলেও জাহির করিতে হইবে।

মেয়েকে কলেজে পড়ানর দারুণ অনিচ্ছা জগদীশের ছেলেদের ইচ্ছার কাছে হার মানিল।

বুড়া ধাড়ী মেয়ে ভাইদের প্রশ্রয়ে আহ্লাদে আটখানা

হইয়া জগদীশের মুখের উপর দিয়া কলেজে পড়িতে যাইতেছে।

কিন্তু কেন?

প্রতিনিয়ত জগদীশ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়া করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকেন।

কেন তাঁহার মূল্য কমিয়া গেল? কবে কোন সূত্রে? কেমন করিয়া হারাইয়া গেল মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তি? মূর্খ বলিয়াই কি এত অবহেলা! কিন্তু জগদীশের বিদ্যা-বুদ্ধির অল্পতায় উহাদের ক্ষতি হইয়াছে কিছু? কি ত্রুটি করিয়াছেন তাঁহার পিতৃ কর্ত্তব্যের! যে শিক্ষার অহংকারে তাঁহাকে তুচ্ছ করিতেছে—তাহার রসদ যোগাইল কে?

শুধু ছেলেরা বলিয়া নয় অনেক চিন্তা মনের ভিতর পাক দিতে থাকে জগদীশের মেয়েরা, বৌরা পর্যন্ত এখন আর আগের মত তাঁহার সুখ-সুবিধার জন্য ত্রস্ত-সন্ত্রস্ত নয়; ঢল নামিয়াছে অন্যদিকে। কেবলমাত্র জগদীশের জন্যই ন'টার মধ্যে অফিসের ভাতের দরকার হয়, সেও একপ্রকার অপরাধের সামিল।

গৃহিণীর কথা বাদ দেওয়াই ভাল, সে আর বলিয়া কাজ নাই।

বাড়ীতে একটা ভালমন্দ জিনিষ আসিলে তিনি চাকর-বাকরদের জন্য পর্যন্ত টুকিয়া টুকিয়া ভাগ করেন, মনে থাকে না শুধু কর্ত্তার কথা।

এই ত সেদিনের ল্যাংড়া আমগুলো অসময়ের জিনিষ চড়া দাম দিয়া বাছিয়া বাছিয়া কেনা—সকালে তাড়াতাড়িতে ত খাইবার সময় নয়। রাত্রে আহারে বসিয়া খোঁজ করিতেই গৃহিণী অম্লান-বদনে জবাব দিলেন—সে আবার এখনও বসে আছে, ওবেলাই উঠে গেছে।

দোষ জগদীশের—অথবা তাঁহার বয়সের, বার্দ্ধক্য না ধরুক তবু বয়স হইলে এটা-সেটা খাইবার ইচ্ছাটা একটু বাড়ে বৈকি।

চুপ করিয়া যাওয়ার বদলে জগদীশ সক্ষোভ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন—আট আটটা বড় বড় আম সব উঠে গেল? কে খেলে এত?

আঃ গৃহিণী কি ঝঙ্কারটাই দিলেন সেদিন বড় হচ্ছে না বুদ্ধি-সুদ্ধির মাথা খাচ্ছ পাঁচটা ছেলেপুলের ঘরে ও-ক'টা আবার কতক্ষণেরই?

ওই কি বাছারা প্রাণ ভরে খেতে পেয়েছে, কুটি কুটি ভাগ করতে করতে আধখানা বই আস্ত কুলয় না।

তোমার যেন বয়স হয়ে নোলা বাড়ছে দিন দিন।

নিতান্তই না কি দৃষ্টিকটু, আর কেলেঙ্কারী কান্ড হয় তাই ভাত ফেলিয়া উঠিতে পারেন না জগদীশ, কিন্তু আহার্যবস্তু গলা দিয়া নামিতে চাহে না।

গত জীবনটা কি স্বপ্ন? খাইবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিয়া মাথার দিব্য দিত অন্য কেহ?

পরে অবশ্য গৃহিণী এক সময় বুঝাইয়া দিয়া দোষস্খালন করিতে আসিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—কি করি বল পষ্ট দেখলাম তোমার কথা শুনে মেজ বৌমা মুখটিপে হেসে সরে গেলেন—আমারও কেমন মেজাজটা গেল চড়ে। এতখানি বয়সে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছ দিনরাত্তির, এখন একটু [illegible]-আত্তি, ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়ার দরকার বুঝি না কি?

কিন্তু ছোটলোকের [illegible]রা আপনারা ত হুঁস করবেই না—আমি করতে গেলে উল্টে উপহাস্য।

কুলিতে সবই উল্টো কি না পুঁটে পুঁটে বৌ সব এখুনি আমার নাকের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা বরেদের হাতে হাতে, মুখে মুখে ঘুরছেন; অথচ—

আরও বিস্তর কথা গৃহিণী বলিয়া থাকিবেন, জগদীশ কান দিবার প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই।

ক্রোধে সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল তাঁহার।

"সব ব্যাটা বেটীদের জব্দ করে ছাড়ব"—জগদীশ ভাবেন। কাহার দৌলতে এত নবাবী একবার খেয়াল হয় না? গলায় পড়া শ্বশুর হইলে বোধকরি গলাধাক্কা দিত।

'মরিয়া' হইয়া একদিন সাধ মিটাইয়া উচিত কথা শুনাইয়া দিবার সাধ হয়; কিন্তু উহাদের মুখোমুখি দাঁড়াইলেই যেন সাহস লোপ পায়।

রুদ্ধ আক্রোশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, চাকুরী ছাড়িয়া দিবার সাধু সংকল্প করেন জগদীশ প্রত্যহ দুই বেলা। যতক্ষণ বাড়ীতে—

"জনসন" কোম্পানীর চৌকাঠ ডিঙাইলেই, প্রতিজ্ঞা আপনি শিথিল হইয়া আসে, অস্পষ্ট হইয়া আসে স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার; কোম্পানীর বড়বাবু ছাড়া তাঁহার যে আর কোনও সত্তা আছে তাহা স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নিবিয়া যায় মনের জ্বালা। দেখেন কোথাও কিছুই ত ব্যতিক্রম ঘটে নাই এখনও ব্যস্ত কেরাণীকুল ঘাড় হেঁট করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, সাহেবেরা পর্যন্ত পরামর্শ চায়। "আগামী মাস" সুদূর অনিশ্চয়ে গড়াইয়া পড়ে, চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া আর হয় না।

মনটা আবার হালকা ঠেকে, ভারী ভাল লাগে ছোট ছোট শিশুগুলিকে লইয়া খেলা দিতে আদর করিতে। মনে পড়িয়া যায় আপনার ছেলেদের শৈশবকাল।

অবিকল 'বাচ্চু'র মত দেখিতে ছিল বিনয়, রং, গড়ন, মুখ।

বিন্তুর চেহারায় আদল আসে বিজয়ের।

অকস্মাৎ নূতন করিয়া বাৎসল্য রসে মন ভরিয়া উঠে।

পাঁচটি ভাই একত্রে আহারে বসে, মুখ দেখিলে বুক জুড়াইয়া যায় স্নেহবিগলিত জগদীশ ব্যস্ত হইয়া বলেন—ও কি হল বিনয়! এখুনি খাওয়া হয়ে গেল তোমার? ক'খানাই বা খেলে? ঠাকুর বড় দাদাবাবুকে আর দু'খানা লুচি দিয়ে যাও—গরম দেখে এন।

বিনয় প্রতিবাদ করে না শুধু ঠাকুরের পানে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে।

লেখা পড়া শিখিয়াছে বিস্তর, বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল নয়, গুরুজনের মান বাঁচাইয়া অপমান করিবার আর্ট উহাদের আয়ত্ত।

আহত হন জগদীশ, কিন্তু প্রকাশ করেন না। ঠাকুরকে তাড়া দিয়া বলেন—সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন ঠাকুর, পাতে ফেলে দাও না! কেমন সব ফ্যাসান হয়েছে যে তোমাদের—কম খাওয়া, আরে এই ত খাবার বয়স—তোমাদের বয়সে আমরা

দশ-বারো গণ্ডা লুচি হাসতে হাসতে খেয়েছি—

সে হয়ত আপনি এখনও পারেন—তাই বলে সেটা এমন কিছু বাহাদুরী নয় যে সকলকেই পারতে হবে—বলিয়া জলের গ্লাশে হাত ডুবাইয়া উঠিয়া পড়ে বিনয়, গরম লুচি দুইখানা পাতে ফেলিয়া।

অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকেন জগদীশ খাইতে ভুলিয়া। উদ্যত ফণা সর্প লইয়া ঘর করা কি এর চাইতে বেশী কঠিন! সর্ব্বদা যাহারা ছোবল মারিবার জন্য উদ্‌গ্রীব!

কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়, এখনও জগদীশ খাইতে দাইতে ভালই পারেন; জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে খাইতে বসিয়া অনেক সময় লজ্জায় পড়িতে হয় তাহার জন্য।

অল্পাহার যেন এখনকার এক ফ্যাসানে দাঁড়াইয়াছে, মোটা হইয়া পড়িবার ভয়ে ভাবিয়া ভাবিয়াই শুকাইয়া উঠে বেচারারা।

ডাক্তার বিমল যখন তখন অধিক ভোজনের অপকারিতা লইয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়! অসুখ করিতেই জানেনা জগদীশের তবু সেদিন সামান্য কি পেটের গোলমালের ছুতায় অনায়াসে মুখের উপর বলিয়া বসিল—অসুখ করা বিচিত্র কি বুঝে সমঝে খাওয়া দাওয়া ত করবেন না? কি বলব বলুন? অথচ—বুঝিয়া সমঝাইয়া চলিয়াও বাবুদের দুই বেলা—ইসবগুল আর পাতিলেবুর প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ওসব যুক্তি-তর্কে কান দিবার ফুরসৎ কাহার আছে?

হঠাৎ প্রত্যেকেই চমকাইয়া উঠে বিজয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে, ঠাকুর—আবার আমাকে একগাদা আলু দিয়েছ, সরিয়ে নিয়ে যাও বাটী, কতদিন বলেছি আলু বাদ দিয়ে দেবে! আলু বাদ দিয়া আলুর দম দেওয়া কতদূর সম্ভব ঠাকুর বেচারা বোধকরি তাহারই উত্তর খুঁজিতে থাকে। জিনিষটা—জগদীশের বিশেষ প্রিয়।

মৃদুস্বরে বলেন—দিয়ে ফেলেছে—আজকের মতন খেয়ে নাও—ভাল হয়েছে রান্নাটা, ফেলা যাবে!

ফেলা যাবার ভয়ে খেয়ে ফেলতে হবে! পেটটা কি ডাষ্ট-বিন্! বলিয়া বিরক্ত বিজয় বাটীটা বাম হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঠেলিয়া দেয় খানিক দূরে।—নিয়ে যাও ঠাকুর এঁটো হয়নি, বসে বসে—কতকগুলা আলু খেতে হবে—কোন মানে হয় না।

জগদীশ আর কথা খুঁজিয়া পায় না এবং অন্য কোন কাজের অভাবে অন্যমনস্কভাবে এমন একটা কাজ করিতে থাকেন যাহার কোন মানে হয় না—বসিয়া বসিয়া কতকগুলা আলুই খাইতে থাকেন, বোকার মত।

কারণ ঠাকুরটা আলুর দমের বাটীর আর কোন সদ্‌গতি খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহারই পাতের গোড়ায় বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। বাবুর প্রিয়বস্তু বলিয়া।

সকালবেলা পার্ক ফেরৎ আসিয়া বসিতেই গৃহিণী আসিয়া কহিলেন—দেখ বাজারে আজ আর যেও না—ক্ষেতুর শ্বশুর-বাড়ী থেকে বড় বড় ইলিশ দিয়ে গেল দুটো—আনাজ-পাতিও রয়েছে চারটি।

মনের জন্য শরীরটাতেও তেমন 'জুত' ছিল না—গায়ের জামা খুলিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে জগদীশ উত্তর দেন—যাকগে ভালই হয়েছে, আমারও বেরুতে ইচ্ছে হচ্ছিল না—বেলাও হয়ে গেছে। নীচে যাচ্ছ—বিন্তুকে বল ত একখানা খবরের কাগজ দিয়ে যেতে।

গৃহিণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলেন—খবরের কাগজ! সে ত আর নেয় না, বন্ধ করে দিয়েছে—

নেয় না কি আবার! দুখানা করে কাগজ আসে বাড়ীতে দেখতে পাই।

আসত বটে—গৃহিণী স্বর নামাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলেন কি না কি বলেছ তুমি খবরের কাগজের কথা তাই অভিমান করে ছেড়ে দিয়েছে।

কি বলিয়াছেন জগদীশ! কাগজের কথা! আকাশ হইতে পড়িতে হয় যে।

আমি আবার কখন কি বললাম! বলবার হুকুম আছে আমার কিছু?

জানিনে বাবু—বৌমারা কি যেন বলাবলি করছিল দু'খানা ক'রে কাগজ নেয় ব'লে কি খোঁটা দিয়েছ তুমি। ছেলেপুলের বয়স হ'লে একটু সমীহ ক'রে কথা কওয়াই উচিত।

কি আশ্চর্য! বলে কি ইহারা? খোঁটা দেওয়া মানে কি? অপরাধের মধ্যে সেদিন বলিয়াছিলেন—হ্যাঁরে কাগজগুলো ভাঁজশুদ্ধু অমনি ঝাড়ুর আগায় যায়—পড়িস্ কই?

বিদ্রূপ-হাস্যে উত্তর দিয়েছিল বিভাস—কেন, হেয়ার অয়েলের অ্যাডভার্টিসমেণ্টগুলো পর্য্যন্ত পড়ে দাম উসুল ক'রে নিতে হবে?

সুবিধামত উত্তরের অভাবেই জগদীশ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—তা নয়, সে কথা হচ্ছে না দু'খানা করে নেবার দরকার কি, তাই বলছি।

এই ত কথা! ইহাকে যদি খোঁটা দেওয়া বলে, মুখ সেলাই করিয়া ফেলাই উচিত জগদীশের। কথা কহিলেই দোষের দাঁড়ায় যখন। ছেলেদের বয়স হইলে সমীহ করিয়া চলা উচিত—উচিত নাই শুধু বাপের বেলায়।

আর একদিন অমনি অযথা ফ্যান ঘুরানর কথায় কি বলিতে গিয়া কি বিপদ; বড়-বৌমা চাকর ডাকিয়া পাখার ব্লেড খুলিয়া রাখিলেন।

হঠাৎ জগদীশ মেজাজের ওজন হারাইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন—

—বটে সমীহ ক'রে চলতে হবে? কে শুনি? বলি পেটের ছেলে না জ্ঞাতি শত্তুর সব? মন থেকে বিষ তুলে বদনাম দিচ্ছে শুধু শুধু? কি আমি ব'লেছি কবে?

রাশ রাশ পাশ করে বিদ্যে হয়েছে অনেক—একটা বাহাত্তুরে বুড়োর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে চলছে, তা হুঁস্ নেই—এতটুকু উনিশ-বিশে ষোল আনা রাগ।

কেন আমি তোয়াক্কা ক'রব ওদের? জব্দ করে দিতে পারি তা জান?

গৃহিণী সদ্যকাচা কাপড়ের শুচিতা ভুলিয়া কর্ত্তার মুখে হাতচাপা দিয়া বসেন—চুপ চুপ সর্ব্বনাশ, কর কি?

রোষে-ক্ষোভে কাঁদ কাঁদ হইয়া যান জগদীশ—মুখ সরাইয়া ভাঙা গলায় বলেন—কেবল চুপ চুপ, কি চোর দায়ে

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'অতিআধুনিক কবিতার গতি

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাঙলা কবিতার আধুনিকতম পরিণতি লক্ষ্য করলে, একটা জিনিষ অতি সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না—অধিকাংশ কবিতারই গতি অবোধ্যতার দিকে। মনে হয় যেন লেখকরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে কতখানি উদ্ভট ও অবোধ্য হতে পারেন, তাই পরীক্ষা করবার জন্যেই কলম ধরেছেন। কবিতার সঙ্গে গদ্যের একটা স্পষ্ট তফাৎ অবশ্য চিরদিনই আছে—গদ্যে যা স্পষ্ট, কাব্যে তা প্রচ্ছন্ন, অনেক সময় ইঙ্গিতগত, কিন্তু সে হচ্ছে অনুভূতি বা ব্যঞ্জনার কথা। প্রাণ-বস্তুর গভীরতা ভাষার বহিরঙ্গিক আবরণে বাঁধতে গেলে যে অস্বচ্ছতা স্বভাবতই আসতে পারে, কবিতার প্রসঙ্গে সেই দুর্বোধ্যতাই এতদিন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু অতি-আধুনিক কবিতার যে অবোধ্যতা, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের। তাতে ভাষা নিয়েই হয়েছে বিপদ।

এ'রা যে ভাষায় লেখেন, দেখতে তা বাঙলার মতই—কিন্তু আসলে তা বাঙলাও নয়, ইংরেজীও নয়, কোন দেশ-বিদেশের ভাষাও নয়—তাতে দুরূহ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দুষ্পাচ্য গ্রীক-ল্যাটিন ইংরেজী-ফরাসী শব্দের ছড়াছড়ি আছে আর আছে বক্তব্যকে অযথা ধোঁয়াটে করে তোলার প্রয়োজনে দুনিয়ার অপ্রচলিত বস্তু-পুঞ্জের একত্র সমাবেশ। কিন্তু একটি জিনিষ নেই, তা হচ্ছে শব্দের সঙ্গে শব্দ-যোজনার দ্বারা অর্থ বা ভাবোপলব্ধির কোন বিধি-সঙ্গত উপায়। ব্যাকরণের যে সাধারণ আইন না মানলে, একের বাক-বিন্যাস অন্যের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়, ভাষার যে শৃঙ্খলা না স্বীকার করলে, বক্তব্য বিষয় কখনই পরিস্ফুট হতে পারে না, সর্ব্বাগ্রে তা অস্বীকার করে এই যে একশ্রেণীর সন্ধ্যা ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর পেছনে সাপ আছে, না ব্যাঙ আছে, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই দুস্তর অবোধ্যতার সমুদ্রে যে সমস্ত দুরুচ্চার্য্য কথাগুলো দ্বীপের মত চোখের ওপর ভেসে ওঠে, অনুসন্ধানে জানা যায়, তার কোনটা মিশরীয়, কোনটা গ্রীক, কোনটা চৈনিক, কোনটা সেমিটিক। কিন্তু এই ভাসমান পদার্থগুলির সঙ্গে বহমান ভাষা-স্রোতের সম্বন্ধ কি, সে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর বলিষ্ঠতম বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকেও আদায় করতে পারি নি।

একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় এখনকার যাঁরা কবি, আগেকার কবিদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী পড়াশুনো করেছেন,—তাঁদের অধীত বিদ্যার প্রচুরায়ত প্রভাব তাঁদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীকে স্বভাবধর্ম্মে দুরধিগম্য করে তুলেছে, প্রাকৃত জন পাণ্ডিত্যের অভাব বশতই তার নাগাল পায় না এবং সেই কারণেই সাধারণ পাঠকের কাছে এই সকল কবিতা অবোধ্য ঠেকে—কিন্তু আসলে এরা অবোধ্য নয়। এই সকল কবিদের অনুরূপ বিদ্যা বুদ্ধি যাঁদের আছে, তাঁরা এই অব্যাকরণ সম্মত, সংলগ্নতা রহিত এবং সার্ব্বজগতিক allusion কণ্টকিত বাক-বৈদগ্ধ্যের ব্যূহ ভেদ করে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে থাকেন—যেখানে এই সকল অবোধ্য কবিতার প্রাণময় কোষ অবস্থিত সেটা রস-লোক, কি প্রজ্ঞা-লোক, গো-লোক কি ব্রহ্ম-লোক তাও তাঁরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করেন। বলা বাহুল্য প্রাকৃত জন এই শ্রেণীর সদম্ভ ঘোষণায় ভয় পাবেই এবং বাধ্য হয়েই বলবে, হবেও বা। হয়ত ভীরু-প্রাণ কলেজের ছেলে-মেয়ে কবিযশ প্রার্থী হয়ে প্রাণের দায়ে এই মহাজন প্রদর্শিত পথের অনুসরণও করবে। কিন্তু প্রশ্নটার সন্তোষজনক কোন সমাধান তাতে হবে না।

আধুনিকতার এই আতিশয্য দেশের অধ্যাপক ও বিদ্বৎ-সমাজে মৌলিকতার নামে করতালি পাচ্ছে—এর প্রাণধর্ম্ম (credo) বোঝাবার নাম করে তাঁরা প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় বার বার এই পর্যায়-ভুক্ত কবিদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি এবং এ'দের বহির্ভূত কবিদের নামে দুয়ো দিয়েছেন। এসব জিনিষ প্রজ্ঞাজীবীদের হাত দিয়ে এলেও, এদের অর্থ কিন্তু জলের মত পরিষ্কার—সেইজন্যেই এই সশব্দ ঘোষণা সত্ত্বেও আমরা ভীত হই নি। বুঝেছি নূতন কাব্যধারা প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য করে, তাঁরা ছোটখাটো গোছের একটি 'কোটারী' বাঁধতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁরা ঠিক করেছেন, অনেক বড় জিনিষ প্রাকৃত জনে বোঝে না, সুতরাং প্রাকৃত জনে যা বোঝে না তাই বড় জিনিষ......অতএব যত বেশী অবোধ্য হতে পারবেন, তাঁদের আভিজাত্যও বাড়বে তত বেশী এবং দলের সঙ্ঘশক্তিও ততই দানা বাঁধবে। আর দেশের নাবালক ছাত্র-ছাত্রী এবং নির্ব্বিচার জন-সাধারণ ততই ভয়ে বিস্ময়ে না বুঝেই তাঁদের তারিফ করতে সুরু করে দেবে। এইভাবে দেশের সাহিত্য রাজ্যে তাঁরা কায়েমি স্বার্থ এবং আত্মকেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। প্রজ্ঞাজীবীদের সম্পর্কে আমি উদ্দেশ্যের আরোপ করেছি—যে যুক্তিপরম্পরার ওপর তাঁদের এই আন্দোলনের স্থিতি, তা খণ্ডনের দ্বারাই আমি আমার অভিযোগ সপ্রমাণ করব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখা দরকার।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ইউরোপ-আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতিতে যে বিপর্যয় এনেছিল, তাতে তারা উদভ্রান্ত না হয়ে পারে নি। যন্ত্র-বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি ও মনো-বিজ্ঞানের নবীনতম পরিণতি তাদের পূর্ব্বতন বিশ্বাস এবং আস্তিক্য-বুদ্ধির ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল, সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাপক প্রসার তাদের রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠী-জীবনেও ভাঙনের বন্যা এনেছিল। বোঝা যাচ্ছিল, ওদের জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতিধারা একটা পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হ'তে চলেছে—এই ওলট-পালটের ভেতর ওদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, শিল্পীক, সর্ব্ববিধ ঐতিহ্যেরই ভাঙা-চোরা সুরু হয়ে যায়—নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানা সঙ্গত-অসঙ্গত আন্দোলন-আলোড়নে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই ভাঙনের যুগে যে সাহিত্য ও শিল্প দেখা দেয়, তা কোন সুনিয়ন্ত্রিত জীবনবেদকে রূপ দিতে পারে নি, কোন সুনিশ্চিত এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য রসাদর্শের নির্দ্দেশও সঙ্গে নিয়ে আসে নি। প্রত্যেক জীবনের ভিত্তি যেখানে শ্লথ এবং পরিবর্ত্তনসঙ্কুল, সেখানে তা হওয়াও সম্ভবপর ছিল না। তবু এই বিপর্যায়ের ভেতর সত্যিকার প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে যথেষ্ট এবং তাঁরা অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে সংযুক্ত করে ভবিষ্যতের পথকে ক্রমিক ধারাতেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের আশেপাশেই আর এক দল কৌশলী বুদ্ধিজীবী এই সুযোগে মাথা খাড়া করে উঠেছেন, যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ, অবচেতন-বাদ, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবাদ......নানা মতের নামে নানা শ্রেণীর উদ্ভট সৃষ্টি করে বিপর্য্যস্ত ও বিভ্রান্ত জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়েছেন। এ'দের মধ্যে কয়েকটি মাত্র নাম উল্লেখ করলো—কাব্যে এজরা পাউণ্ড, কাম্মিংস্, গদ্যে জেমস জয়েস্, ভাস্কর্য্যে জেকব এপিষ্টিন এবং চিত্রে রোমবার্গ এই ধোঁকাবাজী-সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ। এ'দের সৃষ্টি কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি—কিন্তু যেহেতু এ'রা প্রজ্ঞাবাদী এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী, সেই হেতু এ'দের ক্রিয়াকলাপের সারবত্তা নিয়ে স্ফুটকণ্ঠে প্রতিবাদও করতে সাহস পান নি। সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে এ'রা স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করে আপন আপন দল গড়ে তুলেছেন—এবং দলীয় প্রচার-প্রপাগ্যাণ্ডায় দুনিয়া মাৎ করে ফেলেছেন। এই সব প্রভাব-শালী ব্যক্তির মতলবপ্রসূত ধাপ্পাকে কোন বৃহত্তর এবং দুর্নিরীক্ষ্য প্রজ্ঞাদৃষ্টির ফলস্বরূপ ভেবে সরলবুদ্ধি সাধারণ ঘাড় হেঁট করেই এ'দের মেনে নিয়েছেন—আর বিদ্বৎ-সমাজ যথেষ্ট পরিমাণ আধুনিক এবং প্রজ্ঞাশীল বলে বিবেচিত না হবার ভয়ে আত্ম-প্রতারণার বাঁকা পথে এ'দের গুণগান করেছেন। আমাদের দেশের পণ্ডিত-সমাজ ইউরো-এমেরিকার পণ্ডিত মহলের প্রতিধ্বনি করেই এ'দের গুণগান করেছেন, করছেন—তাঁদের সেই অতিআধুনিক বিদ্যা বৈদগ্ধ্যের আবর্ত্তে পড়ে বাঙালী কবিরাও বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং তার ফলেই বাঙলা কবিতার এই অতি আধুনিক দশান্তর

প্রাপ্তি ঘটেছে। বস্তুত, 'হিং টিং ছটের' ব্যাখ্যার মতো অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন, পারম্পর্য্যহীন, প্রলাপোক্তির প্যাঁচে হাবুডুবু খেতে খেতেই সবাই চলেছেন। লেখকরাও বুঝছেন, স্রেফ ফাঁকিকে তাঁরা বাজারে চালু করেছেন—পাঠকরাও বুঝছেন, স্রেফ ফাঁকিকে তাঁরা তারিফ করছেন। কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ঠকিয়ে চলেছেন, হ্যান্স্ এন্ডারসনের রূপকথার সেই রাজ-পোষাক ও তার নির্ম্মাতাদের মতো!

এমন দিনে এই অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কিছু বললে, অল্প-বুদ্ধি কলেজের ছাত্রেরা প্রতিক্রিয়াশীল বা ফিউডাল মনোভাবাপন্ন বা বুর্জ্জোয়া বলে দন্তরুচিকৌমুদী বিকাশ করবে ভেবে নিঃশব্দ থাকা সংগত নয়—এই মারাত্মক দুর্ব্বুদ্ধি সাহিত্যে সর্ব্বনাশের সূচনা করেছে, এখনি এর গতি রোধ না করলে, অচিরে প্রকৃতিস্থতা এবং বিচারবুদ্ধিই বাঙলা দেশে অসংগত বলে বিবেচিত হতে থাকবে। বাঙালী তোতা পাখীর জাত—তাকে যে বুলি ধরিয়ে দেওয়া যায়, সে তাই বলে, শুধু বলেই না, আসলে তোতা পাখী নয় বলে, মনে মনে তাতে বিশ্বাসও করে। এ যে দল বেঁধে, মৎলব করে, তৈরীকরা একটা আন্দোলন এবং এর আসল লক্ষ্য যে জন-সাধারণের অজ্ঞতাকে exploit করে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর প্রাধান্য বিস্তার করা, সে কথা স্পষ্ট করে খুলে বলার সময় এসেছে। নইলে দিনের পর দিন এই সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপকই হয়ে চলবে...... এবং এজন্য প্রচুর পরিমাণ অকান্ডজ্ঞান এবং অসংলগ্নতা ছাড়া আর কিছুই দরকার হয় না বলে অপরিণতবুদ্ধি ছেলে-মেয়ের জনতা এই পথে বেড়েই চলবে। তারপর বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে তা 'কোটারী' ভুক্ত একটা কপট বাক-বিলাসে দাঁড়াবে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—অতিআধুনিক কবিতার বেশীর ভাগই লেখা হয় গদ্যে, কিন্তু গদ্যেই হক, আর পদ্যেই হক, বোধ্যতা কুত্রাপি সুলভ নয়। কিন্তু কেন এই অবোধ্যতা? এঁরা, মানে এঁদের ইউরোপ-আমেরিকার গুরুরা বলেন যে, কথার যে একটা অর্থ থাকতেই হবে, তার কি যুক্তি আছে? পরের পর হ্রস্ব-দীর্ঘ, মিঠেকড়া, স্বদেশী-বিদেশী, শব্দ সাজিয়ে গেলে শব্দের পারস্পরিক সঙ্ঘাত থেকে আপনিই একটা সংগীত জন্মায়—সেই সংগীত মনের তারে ঘা দিলে যে অস্ফুট বা অপ্রবুদ্ধ অনুভূতি জাগে, তাই হচ্ছে খাঁটি জাতের কবিতার কাজ। এই অনুভূতি পাঠকের ব্যক্তিগত মনের উপাদান অনুযায়ী এক একটা রূপ নেয় এবং এইখানেই হল, এই সব কবিতার সার্ব্বভৌম আবেদন। বেশ কথা, কিন্তু ভাষা কি জন্যে? একটা কোন বক্তব্য বা অনুভূতি বা চিন্তা একের মন থেকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করার জন্যেই ভাষা এবং ভাষার সঙ্গে বস্তু-বোধ যেহেতু অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেই-জন্যে ভাষার মধ্যে বস্তুকেন্দ্রিক সংগতি না থাকলে, পরস্পরের ভেতর ভাবিক যোগাযোগ হওয়াও অসম্ভব। অর্থাৎ ভাষার শৃঙ্খলা এবং পারম্পর্য্য হরণ করলে ভাবিত বস্তু নিরুপাধিক হয়ে পড়ে এবং তা কোন লক্ষ্যেই পৌঁছুতে পারে না—ভাষার সার্থকতাই তাতে যায় লুপ্ত হয়ে।

এঁরা এই যুক্তি এড়াবার জন্যে অবচেতন মনের দোহাই দেন এবং বলেন, মনের গহনে পরস্পর-বিরোধী অগণ্য, অসংলগ্ন বস্তু-পিন্ড জটলা করে আছে—তথাকথিত যুক্তিসিদ্ধ ভাষায় যখন আমরা কোন কিছু প্রকাশ করি, তখন আসল মনটা নকল ভাষার আড়ালে চাপা পড়ে যায়—তাতে আসে অর্থ, আসে সংগতি, আসে চাতুর্য্য, মাধুর্য্য, অনেক কিছু বাইরের জিনিষ—কিন্তু ভেতরকার জিনিষটা আগাগোড়াই যায় বাদ পড়ে। সুতরাং ছন্দ ত চলতে পারে না, এমন কি, অর্থটাও মনকে প্রকাশ করার পক্ষে একটা প্রচন্ড বাধা। তাই অর্থহীন গদ্যকেই এঁরা কবিতার প্রকৃষ্টতম বাহন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন—ঠিক এই মতই কাম্মিংস প্রমুখ কবি এবং সুর-রিয়ালিষ্ট চিত্রকরদের মুখেও আমরা একাধিকবার শুনেছি।

সুর-রিয়ালিষ্ট শিল্পীরা এই মতের পোষকতা করেই ছবিকে দুর্ব্বোধ্য করে তুলেছেন এবং বলেছেন যে, সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিকৃতিতে মানুষের বহিরঙ্গিক যে আদলটা পাওয়া যায়, তা আদৌ সঠিক নয়। দর্শনীয় বস্তু এক একজন দর্শকের মনোদৃষ্টিতে এক এক রকম। সুতরাং শিল্পী তাঁর মনে যেটা যেভাবে দেখেন, তাকে আর্টের অভ্যস্ত প্রসিদ্ধি দিয়ে বাইরে রূপায়িত করতেই পারেন না—সেই জন্যে প্রসিদ্ধিকে সংহার করে, আবয়বিক সংগতির সোজা রাস্তা ছেড়ে, তাঁরা এই মানস-অঙ্কনের পথে পা দিয়েছেন। এতে সাধারণ দৃষ্টিতে যা বিকট, কিম্ভূত বা অর্থহীন বলে ঠেকছে, আসলে তা হচ্ছে নাকি অবচেতন মনের রূপ! কাব্যেই হক, আর চিত্রেই হক, অবচেতনার এই দোহাই সাধারণকে যথেষ্ট ঘাবড়ে দিয়েছে—তারা বিজ্ঞানের সূত্র ধরে সাহিত্য বা শিল্পকে বোঝে না, সাহিত্য বা শিল্পের ভেতর থেকেই বিজ্ঞানকে বুঝতে চেষ্টা করে—সুতরাং তাদের পক্ষে মনোবিজ্ঞানের এত বড় একটা দোহাই শুধু সম্ভ্রমেরই নয়, রীতিমতো ভয়েরও বিষয়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের নামে এই যে আন্দোলন চলছে, এর ভেতরও ফাঁকি রয়েছে। সত্যি সত্যিই কি অবচেতন মনে কোন চিন্তা-শৃঙ্খলা নেই? পরস্পর-বিরোধী বস্তুপুঞ্জের স্থান অবশ্যই মনে আছে, কিন্তু তারা একে অন্যের সঙ্গে তাল-গোল পাকিয়ে নেই—সভ্য মানুষের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব, তার মননক্রিয়াকে কখনই অসংলগ্ন হতে দেয় না এক মাত্র ব্যাধি, নিদ্রা বা কোন রিপুতাড়িত মুহূর্ত্ত ছাড়া। এই জন্যেই Stream of Consciousness বা 'চেতনা-প্রবাহ' বলে যে কথাটি মানব-মন সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তা নিরর্থক নয়। সুতরাং অবচেতন মনের দোহাই দিয়ে বক্তব্যকে ধোঁয়াটে করে তোলা অযৌক্তিক—তাছাড়া, অবচেতন মনে যাই থাক, তাকে চেতনের পর্দ্দায় যখন আনি, তখন তা কোন মতেই বিশৃঙ্খল থাকতে পারে না, যদি না সম্বিৎ আগে থেকেই কেন্দ্রচ্যুত হয়ে থাকে। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার খাতিরেই বাঙলা কবিতায় এই অবোধ্যতা আমদানী হয় নি—হয়েছে মুষ্টিমেয় ইউরোপ-আমেরিকার লেখকের অনুকরণে। তারপর সেই নির্জ্জলা ফাঁকিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার জীবনে যে বিপর্য্যয় যুগধর্ম্মে দেখা দিয়েছে, সাহিত্যের কতকাংশও তার প্রভাবে বিপর্য্যস্ত না হয়ে পারে নি—আমাদের দেশে হাট নেই, কিন্তু হট্টগোল আছে এবং অত্যুক্তির উঁচু দামে তাকেই বিকাবার উদ্যোগ চলছে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে আধুনিকতা এবং পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞামুখিতা!

আমাদের সামাজিক উৎসব

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

আমাদের এই হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার বয়স পাঁচ হাজার বৎসরের কম নয়। এই সুদীর্ঘকালে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে কত যে ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে,--শিক্ষা দীক্ষা, আচার অনুষ্ঠান, রীতি নীতি, ভাষা ও পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নাই। আর এইসব নানা বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়েই হিন্দু সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করেছে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার হিন্দু সমাজ আর এখনকার হিন্দু সমাজের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ; সেকালের কোন লোক যদি ইন্দ্রজাল বলে একালে ফিরে আসতেন, তবে এখনকার সমাজের চেহারা ও কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। বলা বাহুল্য এই পরিবর্ত্তন কোন যুগেই একান্ত আকস্মিকভাবে হয় নাই। বহু শতাব্দীর ভাব সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ ও সভ্যতা ক্রমশঃ এই পরিণতি লাভ করেছে। এর মধ্যে আর্য্য-পূর্ব্ব, আর্য্য ও অনার্য্য ধর্ম্ম ও সভ্যতার ছাপ আছে, বাহিরের আঘাত সংঘাতের চিহ্ন আছে,—অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ক্ষত লুক্কায়িত আছে। হিন্দু সমাজের একটা আশ্চর্য্য শক্তি ছিল সামঞ্জস্য করবার--সমন্বয় করবার। সেই শক্তি-বলে, সে অনেক বিরোধী বস্তুকেও নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। কোনটা বা রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। হিন্দু ধর্ম্ম বিশাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে কিভাবে আত্মসাৎ করে ফেলেছে, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বহু অনার্য্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিও ঐ ভাবে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজদেহে মিশে গিয়েছে।

কিন্তু একটু ভাল করে তলিয়ে দেখলেই অতীতের এই-সব সঙ্ঘর্ষের চিহ্ন, লুপ্ত ভাব ও সংস্কৃতির নিদর্শন আমাদের সমাজদেহে ধরা পড়ে। তারা অতীতের গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু নিজেদের পদচিহ্ন রেখে যেতে ভুল করে নাই। ভূতত্ত্ববিদ্যার একটা উপমা দিলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হবে। আদিমকাল থেকে আমাদের এই পৃথিবীর বহু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কত সাগর মরুভূমি হ'য়ে গেছে, কত নদ-নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কত পাহাড়-পর্ব্বত সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েছে। প্রাচীনকালের অনেক অতিকায় জীব বিলুপ্ত হ'য়েছে, নূতন নূতন জীবের আবির্ভাব হয়েছে; প্রাণী-জগতের ন্যায় উদ্ভিদ-জগতেও এমনি কত বিচিত্র রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু এই যে-সব রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন, তার ইতিহাস ভূপৃষ্ঠের স্তরে স্তরে লেখা আছে, যেন প্রকৃতি নিজের হাতে সেইসব অতীত কাহিনী সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তর খনন করে সৃষ্টির বিপুল ইতিহাস উদ্ঘাটিত করেছেন। হিমালয়ের কন্দরে সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, মরুভূমি খনন করে গভীর অরণ্যচারী অতিকায় জীবের চিহ্ন মিলেছে।

ভূপৃষ্ঠের স্তরে স্তরে পৃথিবী-সৃষ্টির ইতিহাস যেমন লিখিত আছে, আমাদের এই সমাজদেহের মধ্যেও তেমনি অতীতের যুগ-পরিবর্ত্তনের বহু নিদর্শন আছে। আমাদের ধর্ম্ম-উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান, আচার প্রথা প্রভৃতির মধ্যে অনুসন্ধান ক'রলে এমন কত যে লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান মিলে, তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা এখনও ভাল করে আরম্ভ হয় নাই, নতুবা হিন্দু-সমাজের এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার প্রথা প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করলে বহু লুপ্ত-রত্নের সন্ধান পাওয়া যেত। ভবিষ্যতে এদেশে এমন অনেক শক্তিশালী পণ্ডিতের আবির্ভাব হবে, যাঁরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, মাত্র এইটুকু আশা নিয়ে আমরা সান্ত্বনালাভ করতে পারি।

দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হতে পারে। আমাদের দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসবের একটা নাম শারদীয়া পূজা বা উৎসব। কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে এই পূজা করেছিলেন বলে সেই থেকে দুর্গোৎসব শারদীয়া পূজা বা উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিম্বদন্তীর মূলে যাই হোক, দুর্গোৎসব এবং শারদীয় উৎসব এই দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ। শারদীয় ঋতু-উৎসব বহু প্রাচীনকাল থেকে এই বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল; দুর্গোৎসব তার পরে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু অবশেষে দুটি উৎসব ও অনুষ্ঠান মিলে এক হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন শারদোৎসবের নিদর্শন বা স্মৃতি-চিহ্ন এখনও কিন্তু "নব-পত্রিকার" মধ্যে জাজ্বল্যমান রয়েছে। বোধন বা ঘট-স্থাপনের সময় এই "নব-পত্রিকা" উৎসব হয়। প্রাচীন শারদীয় উৎসবের স্বতন্ত্র সত্তা আমরা ভুলে গিয়ে দুর্গোৎসবের মধ্যে তাকে মিশিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাকে এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারি নাই। প্রাচীন চণ্ডিকার পূজা যে বাঙালীর হাতে পড়ে, কি-ভাবে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিক-গণেশ সমন্বিত দশভুজা দুর্গাপূজায় পরিণত হয়েছে, তার মূলেও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 'রামলীলা' উৎসবের সঙ্গে আমাদের এই দুর্গোৎসবের সম্বন্ধও রহস্যময়, এর মধ্যেও সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, আমাদের দোললীলা ও হোলি উৎসব। এর মূলে অনুসন্ধান করলে যেতে হবে প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসব ও মদনোৎসবের কাছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, মদনোৎসব বা বসন্তোৎসবের কথা তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন। সমস্ত উত্তর ভারতে এই উৎসব হ'ত, আবীর, কুঙ্কুম নিয়ে রঙের পিচকারী খেলা, পুষ্পোদ্যানে দোলায় চ'ড়ে দোলা, দলবেঁধে গ্রাম-নৃত্য ও সঙ্গীত এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে বৃন্দাবনের দোললীলা এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল, যা ছিল নিছক সামাজিক ঋতু-উৎসব তা ধর্ম্মোৎসবের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ মিশ খায় নি,—হোলি-উৎসব ও দোললীলা এখনও কতকটা পৃথক আছে, অন্তত এ দুটির স্বাতন্ত্র্য বুঝতে পারা যায়। বাঙলাদেশে

ল্যান্‌য়িং বই যে কি তাই কোনও দিন চোখে দেখেনি, সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে—

আচ্ছা মা, তুমি যখন ছোট ছিলে এ সব পড়েছ কোনও দিন?

মা জোর গলায় বললে, ও গো, না,—এ সব বাজে কাজ করবার সময় কোথায় আমার! কাজ করতে হয়েছে না আমার! যারা কুড়ে—শহুরে লোক যাদের কাজ করবার নেই, তারাই কেবল স্কুলে যায়। আমার বাবা অবশ্য আমার বড় ভাইকে স্কুলে দিবার যোগাড় করেছিলেন। মানী লোক তিনি—ভাবলেন, বংশের মাঝে যদি একটি ছেলে লেখাপড়া শেখে ত মন্দ হয় না। ভাই স্কুলে গেল, কিন্তু তিনদিন গিয়ে আর যেতে চায় না,—অতক্ষণ বসে থাকতে পারে না সে। বাবার কাছে কেঁদে-কেটে মিনতি করে বললে, বাবা ওখানে আর আমায় পাঠিও না। বাবা তার রকম-সকম দেখে শেষে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

ল্যান্‌য়িং এই সব শুনে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলে, তারপর বললে, আচ্ছা, মা শহরের সবাই কি বই পড়ে? মেয়েরা!

মা তার চরকায় কাটা সুতার বোঝা মেলাতে বিক্রী করতে এনেছিল। মেয়ের কথা শুনে সেটা মাটিতে নামিয়ে ধীরে ধীরে মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, হাঁ শুনেছি আজকালকার রীতি হয়েছে এই বটে, কিন্তু আমি ত বুঝতে পারি না—মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কি করবে! করতে হবে ত তাদের সেই রাঁধাবাড়া, সেলাই ফোঁড়ন, সুতোকাটা, জাল নিয়ে মাছধরা। বিয়ের পরও সেই একই কাজ—বাড়তি শুধু মা হওয়া, ছেলে-পিলে মানুষ করা। বই পড়ে মেয়েদের হবে কি আমি বুঝি না।

—এর পর মা একটু দ্রুত চলতে সুরু করে দিল,—কারণ, পিঠের উপরকার বোঝার ভার আর সে বেশীক্ষণ সইতে পারছে না,—ল্যান্‌য়িংও তার মায়ের চলার সঙ্গে তাল রেখে চলতে লাগল। ল্যান্‌য়িং দেখলে তার নতুন জুতার উপর ধুলো জমে উঠেছে, সে-গুলি ঝাড়তে গিয়ে জুতার উপর নত হয়ে সে বইয়ের কথা ভুলে গেল।

মেলা থেকে ফিরে নদীর ধারে এসেও সে আর বইয়ের কথা ভাবেনি। এমন সুন্দর নদীর ধারে যখন সে থাকতে পায়—তখন বই দিয়ে কি হবে? একবার সে জাল ওঠাবে—তারপর নাবাবে,—ওঠাবে আর নামাবে,—তারপর সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরে গিয়ে মাটির উনানে সে খড়-কুটা দিয়ে জ্বাল দিয়ে দুটো কড়াইয়ে সে ভাত রাঁধবে, নদী যদি দয়া করে সেদিন কিছু মাছ দিয়ে থাকে, তবে তাই দিয়ে সে সবার সাথে সেই ভাত খাবে, এর পর এ'টো বাসন-গুলি নিয়ে নদীতে গিয়ে ধুয়ে-মেজে আনবে,—তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়বে। তীরের নলখাগড়ার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদী কুল কুল করে বয়ে যায়,—তারই মিঠা শব্দ শুনতে শুনতে সে ক্রমে ঘুমিয়ে পড়বে। —এই তার দৈনন্দিন জীবন। কোন কিছু উৎসবের দিনে বা কোন মেলার দিনে শুধু এর ব্যতিক্রম হয়,—তা' ছাড়া নয়।

এ জীবন বড়ই সাদাসিদে বটে, কিন্তু নিরাপদ। ল্যান্‌য়িং-এর বাবা বাঁধাকপি আর শস্য বিক্রী করতে প্রায়ই বাজারে যায়, সেখানে থেকে সে শুনে এসেছে—উত্তরে নাকি ভারি আকাল সুরু হয়েছে—সারা বছর এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি সে দিক। সেই প্রসঙ্গেই সে বলতে সুরু করেঃ—

দেখলে ত তোমরা—নদীর ধারে বাস করার সুবিধে কত! বৃষ্টি হ'ক চাই না হ'ক, আমাদের কিছুই এসে যায় না,—নদীর জলে বালতী ডুবাও আর ক্ষেতে ঢাল,—বাস! আমাদের এই লক্ষ্মী নদী শত শত উপত্যকা থেকে জল এনে দিচ্ছে, বৃষ্টির জল দিয়ে আমাদের কি কাজ!

বাপের মুখের এই কথা শুনে ল্যান্‌য়িং ভাবে,—সত্যিই ত আমরা যে জীবন যাপন করি—এই হচ্ছে সবার সেরা,—জগতের মাঝে এমন জীবনও কা'দের নাই,—এমন জায়গাও কা'দের নেই; জমিতে চিরকাল সোনার ফসল দেয়, এমন সবুজ গাছ-পালা, খড়-কুটা জ্বালানীর কাঠ—কোথায় আর এমন পাওয়া যায়! মা-নদীই তাদের সব দেয়। না যতদিন সে বাঁচে—এ নদী ছেড়ে আর কোথায়ও যাবে না সে।

একবার বসন্তে কিন্তু নদীর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কে আগে জানত যে, নদীর স্বভাব হঠাৎ এমন পাল্‌টে যাবে। বছরের পর বছর নদী একই ধারায় চলেছে,—এ বছরই শুধু ব্যতিক্রম হ'ল। ল্যান্‌য়িং জালের ধারে বসে এর এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলে। প্রতি বৎসরই অবশ্য বসন্তকাল এলে নদীতে বন্যা আসে। বন্যার জল নদীর কিনারায় গিয়ে পৌঁছিল, প্রতি বৎসরই ত এমনি হয়। বড় বড় আবর্ত্তের সৃষ্টি করে—পাক খেয়ে খেয়ে—বর্ষার ঘোলা জলের স্রোত নদীর দুই তীরের মাটিতে আঘাতের পর আঘাত করে চলল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে মাঝে মাঝে মাটির বড় বড় চাঙড়া সব ধ্বসে পড়তে লাগল। যেই একটা স্তূপ ভেঙ্গে পড়ে—অমনি নদী যেন তাকে বিজয়োল্লাসে লেহন করে নেয়। ল্যান্‌য়িং-এর বাপ এসে তাদের জালটা সরিয়ে খোঁড়লের মুখে নিয়ে গেল, কারণ নদীর যেমন রীতি তাতে যে কোন মুহূর্ত্তে জাল সমেত ল্যান্‌য়িংকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। জীবনে এই প্রথম ল্যান্‌য়িং নদীকে একটু ভয় করতে আরম্ভ করলে।

যে সময় নদীর জল সরে যাবার কথা—সে সময় এসে গেল, কিন্তু জল সরবার নাম নেই। তাহ'লে নিশ্চয়ই উপরের বরফ গলতে সুরু করেছে, নইলে গ্রীষ্মকাল এসে গেল—গরম বাতাস বইছে—নীল আকাশের নীচে নদীর এখন শান্ত হয়ে বইবার কথা। কিন্তু তার কোন লক্ষণই নেই। কোন গুপ্ত অফুরন্ত সমুদ্রের কাছ থেকে আমদানী জল পেয়ে যেন তার বেগ বেড়ে গেছে। নদীর উজানের পাহাড়ে দেশ থেকে যে সব মাঝিরা স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়ে এল, তারা বললে, ওদিকে কেবল বৃষ্টিই হচ্ছে,—দিনের পর দিন হপ্তার পর হপ্তা শুধু বৃষ্টিই হচ্ছে,—বৃষ্টির কাল শেষ হয়ে গেল তবু বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ে নদী আর অন্যান্য ছোট ছোট নদী থেকে প্রবলবেগে জল এসে বড় নদীতে পড়ছে, বড় নদীর তাই জলও কমছে না বেগও কমছে না।

ল্যান্‌য়িং-এর বাপ জালটাকে আরও খানিকটা উপরের দিকে তুলে নিয়ে গেল। ল্যান্‌য়িং একা একা বসে আর নদীর দিকে চেয়ে থাকে না। এখন সে নদীর দিকে পিছন ফিরে মাঠের দিকে চেয়ে থাকে। এখন সে নদীকে রীতিমত ভয় করতে আরম্ভ করেছে।

নদী এইবার নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মকালের মাসগুলির প্রতিদিনই নদীর জল বাড়তে লাগল—কোনও দিন এক ফুট, কোনও দিন দু' ফুট। ক্ষেতের ফসলগুলি প্রায় পরিপক্ক হয়ে এসেছিল—নদীর জল সেখানে এসে সে সব নষ্ট করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লোকের আর ফসল পাবার আশা রইল না। নদীর জল খালে গিয়ে তারও দুই কুল ভাসিয়ে দিলে। শোনা গেল—সব জায়গাতেই নাকি মাটীর উঁচু উঁচু বাঁধ সব ভেঙ্গে জলের তোড় শস্য-ভরা-উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—কত মেয়ে-পুরুষ ছেলে-পিলে সব জলের স্রোতে কোথায় ভেসে ডুবে চিরদিনের মত হারিয়ে যাচ্ছে।

ল্যান্‌য়িংএর বাপ জালটাকে আরও অনেক অনেক দূর পিছিয়ে নিয়ে গেল এবার, কারণ নদীর খোঁড়লও জলে ভর্ত্তি হয়ে গেল, তারও দু' কূল ছাপিয়ে উঠছে এবার। বার বার করে সে জালটা পেছিয়ে নিতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে রাগে বিরক্তিতে সে নদীকে অভিশাপ দিতে লাগল।

—আমাদের এ নদীটা একেবারে ক্ষেপে গেছে!

বাড়ীর বাইরের যে দিকটা শস্য মাড়াই হয় তারই শেষপ্রান্তে রয়েছে কয়েকটা লম্বা লম্বা 'উইলো'-গাছ। ল্যান্‌য়িং-এর বাপ অবশেষে একদিন জালটা এনে তার একটার সঙ্গে বাঁধলে। জল এখন এত উঁচুতে উঠে এসেছে যে ছ'খানা খড়ো-ঘরওয়ালা ছোট গ্রামটাকে এখন একটা দ্বীপের মত দেখাচ্ছে আর চারিদিকে তার

হলদে ঘোলাটে জলের সমুদ্র। আর চাষ করা চলবে না,—সবারই মাছ ধরতে হবে এবার। আর কোন উপায় নেই।

নদী যে এর বেশী কিছু করতে পারে—একথা কারই মনে হয়নি। যে বিছানায় ল্যান য়িং শুয়ে ঘুমায় নদী তার এত কাছ দিয়ে বওয়া সুরু করলে যে রাত্রে আর তার ঘুম হয় না। এর চেয়ে আরও কাছে যে নদী আসতে পারে ল্যান য়িং কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারে নি। বাপের মুখ-চোখ দেখে বুঝলে—বাপ বড় ভয় পেয়ে গেছে। জল সত্যি সত্যিই বড় কাছে এগিয়ে আসছে। মাড়াই করবার উঠানের অর্দ্ধেকটা পর্যান্ত কাল জল ছিল না? জল তাহ'লে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আর দিন তিনেকের মাঝে ঘর অবধি এসে পৌঁছুবে।

ল্যান য়িং-এর বাবা বললে, আমরা তাহ'লে ভিতরের সব চেয়ে উঁচু ঢিবিটাতে গিয়ে থাকি, - চল।......শুনেছি আমার বাবা বেঁচে থাকতে নদী একবার ঠিক এমনিধারা করেছিল; সবাই তখন ভিতরকার সবচেয়ে উঁচু ঢিবিটাতে গিয়ে উঠেছিল। সেটা এত উঁচু যে পাঁচ পুরুষেও একবার সেখানে জল যেতে পারে না। আমাদের অতি বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের সময়েই এমন দুর্দ্দিন এল।

সবার ছোট ছেলেটি বাপের কথা শুনে ভয় পেয়ে কাঁদতে সুরু করে দিল। চারিদিকে শুধু জল, তবু তাদের মাথার উপরে ছাদ —চারিদিকে ঘরের দেওয়াল—দেখে মনে হয় যেন তারা একটা জাহাজের মাঝে বসে রয়েছে। কিন্তু যখন শুনলে এ-ঘর ছেড়ে তাদের একটা ঢিবিতে যেতে হবে, তখন ছোট্ট ছেলেটা এটা তার মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারলে না। ছোট ভাইটিকে কাঁদতে দেখে ল্যান য়িং-এরও কেমন কান্না পেতে লাগল। সান্ত্বনা দিবার জন্য সে ভাইটির মুখখানা নিজের বুকে টেনে নিল।

ছোট ভাইটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার কালো ছাগলটা নিয়ে যেতে পারব ত?

বাপের তিন চারটে ছাগল ছিল, তাদের বাচ্চা হ'লে একটিকে সে নিজের বলে চেয়ে নিয়ে পালন করছিল। সেই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

বাপ বেশ জোর গলায় বলে উঠল, আমাদের যত ছাগল আছে সব নিয়ে যাব, একটিকেও রেখে যাব না আমরা।

তার স্ত্রী বললে, সে কেমন ক'রে হবে? এই জলের মাঝ দিয়ে কেমন করে নিয়ে যাব ওদের?

যেমন করে হ'ক নিয়ে যেতেই হবে। ওদের মাংস খেয়েই বাঁচতে হবে আমাদের।

সেইদিনই ল্যান য়িং এর বাপ কাঠের কব্জা থেকে দরজা খুলে নিলে, তারপর তাকে কাঠের বিছানা আর টেবিলের সঙ্গে বেঁধে একটা ভেলা তৈরী করলে। বাড়ীতে একখানা ছোট নৌকা ছিল— ভেলাটা আবার তার সঙ্গে বাঁধা হ'ল। সব গোছগাছ শেষ হ'লে ল্যান য়িং, তার বাপ-মা আর বাড়ীর ছোট ছেলেরা গিয়ে সেই ভেলায় গিয়ে চাপলে। মোষটাকে একটা দড়ি দিয়ে ভেলার সঙ্গে বাঁধা হ'ল, তার সাথে পাতিহাঁসগুলি আর চারটে রাজহংসীও বাঁধা হ'ল। ছাগলগুলি শুধু ভেলার উপরে তুলে নেওয়া হ'ল। ভেলায় চড়ে তারা বাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হলদে কুকুরটাও সাঁতরে তাদের পিছু পিছু এগোতে লাগল। ল্যান-য়িং অমনি চীৎকার ক'রে বলে উঠল,—বাবা, দ্যাখ—দ্যাখ, লোবোও আসতে চাইছে।

বৈঠা দিয়ে ভেলা চালাতে চালাতে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে তার বাপ বললে, না, সেটি হচ্ছে না; লোবো এখন নিজের চেষ্টা নিজে দেখুক, বেঁচে থাকতে হলে ওর নিজের খাবার এবার নিজে যোগাড় করে নিতে হবে।

কথাটা ল্যান য়িং-এর কানে বড় নিষ্ঠুরের মত শোনাল। বড় ছেলেটি বলে উঠল, আমার এক বাটি ভাতের অর্দ্ধেকটা ওকে আমি দেব।

বাপ রেগে চীৎকার করে উঠলে, ভাত? কোন ভাত বন্যায় ভাত কোথা পাবে শুনি?

ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করলে বটে, কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। ভাত-না-খেয়ে থাকা যে কেমন তা তারা জানে না। নদী অন্তত প্রতি বৎসর তাদের ভাত জুগিয়ে এসেছে। ভেলায় চড়ে যেতে যেতে তারা দেখতে পেলে—লোবো সাঁতরে সাঁতরে ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, গতি তার ক্রমে মন্থর হয়ে এল। আরও কিছুক্ষণ পর তার মাথাটা একটা বিন্দুর মত জলের উপর ভাসতে দেখা গেল; তারপর তাও আর দেখা গেল না।

মাইলের পর মাইল বৈঠা মেরে মেরে অবশেষে তারা একেবারে ভিতরকার ঢিবিতে এসে হাজির হ'ল। ঢিবি ত নয় যেন একটা পাহাড় আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যাক বাঁচা গেল ঃ অবশেষে তারা ডাঙ্গায় এসে পৌঁছেছে। ডাঙ্গা একেবারে শুকনা ডাঙ্গা। ল্যান য়িং-এর বাবা তাড়াতাড়ি ভেলার দড়িটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললে; তারপর তারা ডাঙ্গায় নামল।

দেখা গেল তাদের আগেই অনেকে এসে গেছে।

দেখা গেল তাদের আগেই অনেকে এসে গেছে। ঢিবির পাশে পাশে সবাই মাদুর আসবাবপত্র, টেবিল, বেঞ্চ, বিছানা সব স্তূপ করে রেখেছে। ঢিবির সব জায়গাটুকই লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেছে ঃ এতটুক জায়গা আর পড়ে নেই। সবার উঁচু এই ঢিবিটা পর্য্যন্ত এবার জলের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় নি। শতাবধি বছর হ'ল নদী এমন সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধারণ করে না, নদী যে এমনি করে আক্রমণ করতে পারে লোকে সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাই একে আর মেরামত করে শক্ত করে রাখা হয় নি। যে সব জায়গা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল—নদী আঘাতে আঘাতে সে সব ভেঙে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা করে ভাল জায়গাও ধ্বসে গেছে। অনেকখানি খুইয়েও ঢিবিটা এই সীমাহীন জলরাশির মাঝে একটা দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর চারিদিক থেকে যত লোক এসে তাতে জুটেছে।

আর শুধু লোকই বা কেন—বনের যত জীবজন্তু—মেঠো ইঁদুর থেকে আরম্ভ করে সাপ পর্য্যন্ত সবাই এসে এই ডাঙ্গা-টুকুতে আশ্রয় নিয়েছে। জলের মাঝে মাঝে যে গাছগুলি সব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে— সাপগুলি এসে তাতে জড়িয়ে জড়িয়ে ঝুলে ঝুলে আছে। প্রথম প্রথম লোকেরা সব তাদের সঙ্গে যুঝতো ঃ তাদের মেরে মেরে জলে ফেলে দিত। কিন্তু কত মারবে! নতুন নতুন এসে আবার গাছ ভর্ত্তি হয়ে যেত। শেষে আর তাদের মারা হত না ঃ ওরা আসে আসুক। যেটি বিষাক্ত, সবার চেয়ে ভয়ংকর যেটি তাকেই শুধু মেরে ফেলা হ'ত।

সারা গ্রীষ্ম আর বর্ষা ল্যান য়িং তার বাড়ীর লোকজন নিয়ে এখানেই কাটালো। বাড়ী থেকে যে বস্তা ভর্ত্তি চা'ল আনা হয়েছিল—সে কবে ফুরিয়ে গেছে। বাড়ীর যে মোষটা তারা সঙ্গে করে এনেছিল তাকেও মেরে খেয়ে ফেলেছে। ল্যানয়িং দেখে— মোষটা মারবার পর তার বাবা কেবল জলের ধারে গিয়ে একা একা বসে থাকে, সে যদি কখনও বাপের কাছে এগিয়ে যায় ত বাপ অমনি রেগে চীৎকার করে ওঠে। মা তাকে ডেকে চুপি চুপি তার কানে কানে বলে,—

ওর কাছে যেওনা এখন। মোষটা নেই,—এখন ও ভাবছে কি করে আর চাষবাস চলবে!

ল্যানয়িং একটুখানি ভেবে মাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মা,— সত্যি বাবা কি করে চাষ করবে?

মাংস কাটতে কাটতে মা গম্ভীর হয়ে বলে, সেই ত ভাবনার কথা!

তাদের সেই লক্ষ্মী নদী যে তাদের এমন দশা করে ফেলবে— এ কথা তারা কোনও দিন ভাবে নি। মোষটা মারবার আগেই তারা ছাগলগুলি খেয়ে ফেলেছে। ছোট ছেলেটীর সেই আদুরে

ছাগলটাকে যখন মারা হ'ল—তখনও ছোট ছেলেটা ভয়ে কিছু বলতে পারে নিঃ চারিদিকে যে জল! থৈ থৈ করছে জল।

তারপর এমন একদিন এল,—যখন আর কোনই খাবার নেই। এমন একদিন যে আসবে—এ কথা তারা আগে থেকেই জানত। এর পর কি হ'বে?......এর পর রইলো শুধু তাদের জাল। কিন্তু এ বদ্ধ জলে নদী থেকে কোন বড় মাছ আসে না। এখানে আছে শুধু গুঁড়ো চিংড়ী আর কাঁকড়া। এখানে যারা সব বাস করছে তাদের কারোই খাবার নেই। দুই এক ঘরের লোক অবশ্য বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে দুই এক টুকরা খাবার রেখেছে ঃ কিন্তু কার যে কি রয়েছে তা জানবার উপায় নেই। কেউ কারো কাছে বলে না—পাছে ভাগ দিতে হয়। দু'এক ঘরের যে সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে—তা তারা রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। কিন্তু সেই বা ক'দিন? তাও ক্রমে ফুরিয়ে গেল। তারপর তাদেরও রইলো শুধু ঐ কুচো চিংড়ী আর কাঁকড়া। আবার তাও যে সিদ্ধ করে খাওয়া হ'বে তার কাঠ নেই। খেতে হ'লে ওগুলি কাঁচাই খেতে হ'বে। ল্যানয়িং প্রথমে ভেবেছিল, এসব পারবে না সে,—সে বরং না খেয়ে থাকবে সেও ভাল কিন্তু এমনি করে কাঁচা খেতে পারবে না। বাপ তার কথা শুনে চুপ করে রইলো, ল্যানয়িংএর দিকে চেয়ে শুধু সে একটু মুচকি হাসলে। একদিন উপোষ করবার পরই ল্যানয়িং কতকগুলি গুঁড়ো চিংড়ীর ভিতর থেকে বেছে বেছে এমন একটা বের করলে যে একেবারেই নড়াচড়া করছে না।

সে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে যেতে লাগলো,— খেতে হ'লেও এদের কোনও দিন তাজা খাব না আমি। এমনি করেই দিন যেতে লাগল। ক্রমে শীতকাল এল ঃ যেমনি ঠান্ডা হাওয়া—রাত্রে তেমনি কুয়াশা। যেদিন বৃষ্টি হ'ত তারা ভিজে একসা হয়ে যেত, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে একসঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে মেষ পালের মত ভিড় পাকাতো। বৃষ্টি অবশ্য রোজ হ'ত না—তাই পরের দিন রৌদ্রে তারা আবার নিজেদের জামা কাপড় শুকিয়ে নিত। ল্যানয়িং বড্ডই রোগা হয়ে গেল,— শুকিয়ে সে একেবারে কাঠি হয়ে উঠলো ; তাই তার সব সময়ই প্রায় শীত করতো। তবুও সে সকলকেই দেখাশুনা করতো। ছোট ভাইয়েরাও সব একেবারে শুকিয়ে উঠেছে, কেউ কথা বলে না। খেলাও তারা করে না। শুধু বাপ যখন জলের কিনারায় বসে চিংড়ী মাছ ধরে ল্যানয়িংএর বড় ভাই কেবল তাদের ডাকে কখনও কখনও কাছে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে। ল্যানয়িং দেখে—তার মাকেও আর চেনা যায় না ঃ তার গোলগাল মুখখানা শুকিয়ে চোয়াল বেরিয়ে পড়েছে। রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই নিটোল রাঙা হাত দুখানা শুকিয়ে কঙ্কালের মত হয়ে উঠেছে। মা কিন্তু তবু কখনও মুখ ভার করে না, সবার সাহস দিবার জন্য সে মধ্যে মাঝে বলে,—আমাদের ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে ঃ আমরা চিংড়ী মাছ খেতে পাচ্ছি,—তা' ছাড়া বেঁচে থাকবার মত ক্ষমতা এখনও আমাদের আছে।

এ ঢিবিতে যারা আগে এসেছিল তাদের অনেকেই মারা গেছে, সুতরাং আগেকার মত লোকের ভিড় তার নেই। এখন যারা আছে তাদের চলে ফিরে বেড়াবার মত জায়গার আর অভাব নেই।

এখন কিন্তু এ পথ দিয়ে একখানা নৌকাও আর যায় না। ল্যানয়িং আগেকার অভ্যাস মত কিনারায় বসে জলের দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে আগে যখন সে নদীর ধারে বসে মাছ ধরতো, তখন কত নৌকা যেত,—এখন একখানাও যায় না। সে যেন অন্য এক রকম জীবন ছিল। সে যেন এক স্বপ্নের কথা। মাঝে মাঝে মনে হয় তারা ছাড়া জগতে বুঝি আর লোক নেই। চারিদিকে ঘোলা জলের সমুদ্রের মাঝে তারাই গুটিকয়েক প্রাণী দ্বীপের মত ছোট্ট এই জায়গাটিতে বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে পুরুষগুলি সব একসঙ্গে বসে ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলে। আগেকার মত সেই জোরালো কণ্ঠস্বর আর কারো নেই। প্রত্যেকেরই গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় যেন কতদিন ধরে তারা অসুখে ভুগছে। তারা বলাবলি করে কতদিনে এই বন্যা সরে যাবে, নতুন করে চাষ করতে তারা আবার মোষই বা কোথা পাবে, ল্যানয়িংএর বাবা শুধু গম্ভীর ভাবে বলে ঃ

আমি নিজে না হয় লাঙ্গলের জোয়ালের নীচে কাঁধ দেব, আমার মুখ চেয়ে আমার বউও কাঁধ দিয়ে আমাকে জিরান দিতে পারে, কিন্তু আসল কথা—বীজ কই? বীজ যদি না থাকে ত চাষ করে লাভ কি? একটা মাত্র শস্যের দানা যখন নেই—তখন বীজ কোত্থেকে আসবে?

ল্যানয়িং কেবল বসে বসে ভাবে—কবে নৌকা আসবে। নিশ্চয়ই জগতে এমন কোন জায়গা আছে—যেখানকার লোকজনের কাছে শস্যের বীজ মজুত আছে। যদি নৌকা আসতো! প্রতিদিন সে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে! সে ভাবে যদি কোনও দিন নৌকা আসে তাতে নিশ্চয়ই কোন জীবন্ত মানুষ থাকবে,—তার কাছে তারা মিনতি করে বলবেঃ

আমাদের বাঁচাও, আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছি, আমাদের বাঁচাও। এই কতদিন আমরা এক গুঁড়ো চিংড়ী ছাড়া আর কিছুই খেতে পাই নি।

সে যদি কিছু নাও করতে পারে, সে গিয়ে অপর কাউকে বলবে যেমন করে হ'ক একখানা নৌকা এলেই তাদের রক্ষে। ল্যানয়িং নদীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো, একখানা নৌকা পাঠাও, একখানা নৌকা পাঠাও। প্রতিদিন সে প্রার্থনা করে কিন্তু নৌকা আর আসে না। কোন কোনও দিন সে অবশ্য দেখতে পায় দূরে—অতিদূরে চক্রবাল রেখার কাছে ঘোলা জল যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে—সেখানে ছোট্ট একখানা নৌকার মত কি যেন দেখা যায়, কিন্তু সে ধীরে ধীরে আকাশে মিলিয়ে যায়—আর দেখা যায় না।

দূরে—নৌকা দেখেও তার মনে অনেক ভরসা হয়। একখানা নৌকা না হয় দূর থেকে চলেই গেল—আরও নৌকা ত এমনি করে আসতে পারে। সে তার বাপের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বলে, বাবা, একখানা নৌকা যদি আসে—

বাপ তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বিষণ্ণমুখে বলে, মা, কে জানে বল দেখি আমরা এখানে আছি। আমাদের সব কিছুই এখন নদীর মর্জির উপর নির্ভর করছে।

মেয়ে আর কোন কথা বলে না, তবুও একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ একদিন ল্যানয়িং আবার দেখে আকাশের গায়ে কালো নৌকার মত কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। কাউকে কিছু না ব'লে সে এর দিকে চেয়ে রইল। তার ভয় হ'তে লাগল—আর একদিন একখানা নৌকা যেমন ক'রে চলে গিয়েছিল এও বুঝি তেমনি ক'রে চলে যায়। না—এখানা তেমনি ক'রে আর গেল না। এখানা ক্রমেই বড়, আর স্পষ্ট হ'তে লাগল,—ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। ল্যানয়িং অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে নৌকাখানা এত কাছে এসে পৌঁছিল যে, সে তার মাঝে দুইজন লোক দেখতে পেল। এইবার সে তার বাপের কাছে ছুটে গেল। বাপ তখন ঘুমুচ্ছিল— পেটের জ্বালা ভুলতে সবাই ঘুমিয়ে থাকতে চায় ঃ যতক্ষণ ভুলে থাকা যায়। ল্যানয়িং হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বাপকে একটু ধাক্কা দিয়ে মাথাটায় একটু নাড়াচাড়া দিয়ে জানাতে চেষ্টা করতে লাগল। গলায় তার একেবারে জোর নেই যে চীৎকার করে। অবশেষে বাপ চোখ মেলল।

বাবা, একখানা নৌকা আসছে।

বাপ দৌর্বল্যে কাঁপতে কাঁপতে হাতড়াতে হাতড়াতে উঠে জলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে ঃ হাঁ, নৌকাই বটে। নৌকাটা কাছেই আসছে। নিজের গা থেকে নীল জামাটা খুলে সে ধীরে ধীরে নাড়তে লাগল,—আর খোলা গায়ে দেখাতে লাগল তাকে

একটা কঙ্কালের মত। নৌকার লোকগুলি উচ্চকণ্ঠে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, কিন্তু ঢিবির লোকগুলি এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে, উত্তর দিতে তাদের মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না।

নৌকা কাছে এসে পৌঁছল। নৌকাটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে লোকগুলি লাফিয়ে তীরে নামল। ল্যানয়িং আড়চোখে তাদের তাকিয়ে দেখতে লাগল ঃ এমন লোক সে জন্মে দেখে নি, এমন হৃষ্টপুষ্ট, এমন সুস্থ। তারা উৎফুল্ল হয়ে কি যেন বলাবলি করছে ঃ কি বলে এরা?

হাঁ খাবার এনেছি আমরা, সবার জন্যেই এনেছি। তোমাদের মত অবস্থায় যারা পড়েছে, তাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। ক'দিন আছ তোমরা এখানে? চার মাস আহা! এই যে তোমাদের জন্য আমরা একেবারে ভাত বেঁধে এনেছি, খাও। হাঁ হাঁ,—আরও দেব, আরও আছে। এই যে ময়দাও এনেছি—উঁহু—অত তাড়াতাড়ি নয়, প্রথমে অল্প একটু খাও, তারপর আর একটু—এমনি করে।

ল্যানয়িং আড়চোখে দেখতে লাগল—অতি দ্রুত তারা নৌকায় ছুটে গিয়ে ভাতের ফেন আর শাদা ময়দার রুটী নিয়ে এল।। কোন কিছু চিন্তা না করেই ল্যানয়িং তার হাত বাড়িয়ে দিল—একটা মর্ম্মস্পর্শী পশুর মত তার নিশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল। কি যে সে করলে তা নিজেই বুঝলে না, শুধু এইটুকু বুঝলে সে খাবার চায়। আগন্তুকের একজন একটুখানি রুটী ছিঁড়ে তার হাতে দিল, ল্যানয়িং অমনি মাটীতে বসে তাতে কামড় বসিয়ে দিলে,—ঐ এক টুকরা রুটীর কথাই তখন তার মনে ছিল—আর কিছু সে ভাবতেই পারলে না। সবাই এমনি করে খেতে আরম্ভ করল। নবাগত লোক দুটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল ঃ এই ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর উৎকট আহার যেন চোখে দেখা যায় না। একটি লোকও কথা বলে না।

কিছুক্ষণ কারোই মুখে কথা সরল না, তারপর কিছুটা খেয়ে একটু বল হ'লে একজন বললে, রুটীগুলি কেমন শাদা দেখেছ? এত শাদা রুটি হতে পারে এমন গমই আমি জন্মে দেখিনি।

সবাই তখন তাকিয়ে দেখলে। সত্যিই রুটীগুলি যেন বরফের মত শাদা। নবাগত লোকের একজন তখন বললে, বিদেশের ভূঁইয়ে যে গম তৈরী হয় তাই দিয়ে এ রুটী তৈরী হয়েছে। নদী তোমাদের কি ক্ষতি করেছে তারা তা জানতে পেরেছে, তাই তারা আমাদের এই ময়দা পাঠিয়ে দিয়েছে।

তখন সবাই অভুক্ত বাকী রুটীগুলির দিকে তাকিয়ে তাদের তারিফ করতে লাগল ঃ কত শাদা এই রুটীগুলি—কেমন শাদা, এর চেয়ে ভাল রুটী তারা কোনও দিন চোখেই দেখে নি। ল্যানয়িংএর বাবা হঠাৎ উপরে তাকিয়ে ব'লে উঠল,—বন্যা সরে গেলে এই গম আমি আমার জমিতে কিছু বুনতে চাই—বীজ আমার একেবারে নেই।

লোকটা খুব খুশী হয়েই জবাব দিলে,—বেশ ত, তুমি পাবে, বীজ তোমায় আমরা দেব।

এত দরদের সঙ্গে লোকটা এই কথাগুলি উচ্চারণ করলে যে, শুনে মনে হয়, সে যেন কতকগুলি শিশুর সঙ্গে কথা কইছে। লোকটা হয়ত বুঝতে পারে নি—এই কৃষক লোকগুলির কাছে এবার জমিতে বুনবার বীজ পাওয়ার অর্থ কি। ল্যানয়িং চাষার মেয়ে, সে কিন্তু বুঝলে। সে অপরের অলক্ষ্যে তার বাপের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, বাপ তার স্থির দৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করছে—কিন্তু চোখ দু'টি তার জলে ভরে গেছে। ল্যানয়িং নিজেও কান্না চাপতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি উঠে সে এই নবাগত লোকের একটির কাছে গিয়ে তার জামার আস্তিন ধরে টানতে লাগল। লোকটা তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ কি খুকী?

সে মৃদুস্বরে লোকটার কানে কানে বললে, নাম কি? যে দেশ আমাদের এই রুটী আর বীজের জন্য সুন্দর গম পাঠিয়েছে তার নাম কি?

ও—নাম! নাম তার আমেরিকা।

এইবার সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গেল। আর সে খেতে পারছে না—তাই রুটীর টুকরাটা দৃঢ় করে হাতের মুঠোর মাঝে ধরে সে নদীর দিকে চেয়ে রইল। লোকগুলি তাকে আরও রুটী দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে—তবু সে রুটীটা কিছুতে হাত-ছাড়া করবে না। হঠাৎ তার মনে হ'ল তার মাথাটা যেন ক্রমেই ঘুলিয়ে আসছে—এটাকে কিছুতেই সে আর ঠিক রাখতে পারছে না।......যখনই সে খেতে পারবে, তখনই সে আরও রুটী পাবে।... রুটী যদিও খুব ভাল রুটী, খেতে হবে তাকে অল্প অল্প করে—আস্তে আস্তে।......সে আবার নদীর দিকে তাকাল, এবার আর তার নদী দেখে ভয় করে না। ভাল হ'ক মন্দ হ'ক তারা রুটী ত পেয়েছে। সে মনে মনে বার বার আবৃত্তি করতে লাগল,—নামটা আমি কিছুতেই ভুলব না—আমেরিকা। *

* মিসেস্ এস্ পার্লবাকের—"The Good River" নামক গল্পের অনুবাদ।

বিচিত্র-বার্ত্তা

উত্তর চীনে লবণ প্রস্তুত

চীনে শিল্পাদিতে নানাপ্রকার যন্ত্র-ব্যবস্থা প্রচলিত হইলেও, এখনও তেমন ব্যাপক হইতে পারে নাই। বিশেষত উত্তর চীন এই হিসাবে কতকটা অনুন্নতই রহিয়া গিয়াছে। সেখানে সাগরতীরের সন্নিকটস্থ জনপূর্ণ অঞ্চলে লবণের ব্যবসায় ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও, আধুনিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আজিও প্রচুর ব্যবহৃত
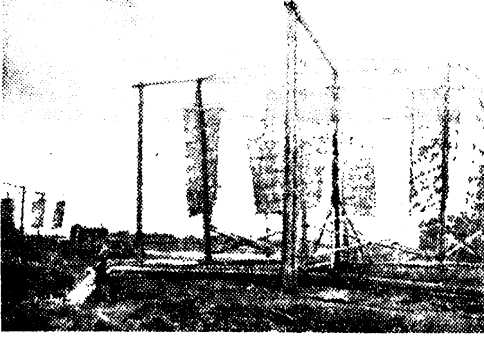
উইণ্ডমিল সাহায্যে আনীত সাগর-জল হইতে লবণ প্রস্তুত—উত্তর চীন

হইতে পারে নাই। সেই অঞ্চলে বহুদিন যাবৎ 'উইণ্ড মিল' সাহায্যে সাগরের লবণাক্ত জল নালা-পথে আনিবার যে কৌশল প্রচলিত, তাহাই আজিও চলিতেছে। 'উইণ্ড মিল' সাহায্যে আনীত সাগরের জল ফুটাইয়া অতি অনুন্নত উপায়েই লবণ তৈরী হয়। পাশাপাশি তীরের নিকটে অনেকগুলি 'উইণ্ড মিল' রহিয়াছে—প্রতিটি 'উইণ্ড মিলের' সাহায্যে বিভিন্ন খাল-নালার পথে জল সঞ্চয়ের খাতে বহন করিয়া আনিবার ব্যবস্থা। গরীব দেশের জন্য পণ্য প্রস্তুতে প্রথমেই নজর রাখিতে হয় ব্যয়-স্বল্পতার দিকে। প্রস্তুত-ব্যয় বেশী পড়িলে, লবণের দর উচ্চ হইবে, দরিদ্র অধিবাসীর স্কন্ধে তাহা অতিরিক্ত বোঝাস্বরূপে পরিণত হইবে। সেইজন্য এই ব্যবসায়ে 'উইণ্ড মিলের' ব্যবস্থা দূর করিয়া উন্নত যন্ত্রপাতির প্রতিষ্ঠা অদ্যাবধি করা হয় নাই।

আদিম জাতির যুদ্ধ মীমাংসা

যেমন সকল আদিম জাতীয়ের ভিতর হয়, নিউগিনির কামান্ জাতির ভিতরও সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিরল নয়। এই যুদ্ধটা কিন্তু দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই পরিচালিত হয়। তবে ইহাতে হামেশা নিহতের সংখ্যা থাকে অত্যল্প, যদিও আহত প্রায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকেই হইতে হয় কমবেশী। যে পক্ষেই যোদ্ধা একটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অমনি সেই পক্ষের জনদশেক লোক এক সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ কাঁসর (যাহাকে তাহারা বলে 'গান্সা') বাজাইয়া এবং উচ্চ চীৎকারে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে। উহাদের রীতি এই প্রকার যে, ঐ ভাবে যোদ্ধা একটির মরণের খবর ঘোষিত হওয়া মাত্র যুদ্ধ আপনি থামিয়া যায়। তখন উভয়পক্ষীয় লোকই শবটি সমাহিত বা অগ্নি-সংস্কার করিবার অনুষ্ঠানে যোগদান করে। নারীগণ গায়ে কাদামাটি মাখিয়া তাহাদের শোক প্রকাশ করে। শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পরে আবার দুইপক্ষ প্রস্তুত হইয়া রীতিমত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অনেক স্থলে যোদ্ধা একটির মৃত্যুতে যুদ্ধ শেষ হয়। মৃতের পক্ষ পরাজিত বলিয়া সাব্যস্ত হয় কিন্তু সে পরাজয় একটা নৈতিক নামেমাত্র পরাভব। কারণ, যে পক্ষের যোদ্ধা মৃত, সে পক্ষ মৃতের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে। তখন উভয়পক্ষের নেতৃস্থানীয় সালিশগণ বিচার করিয়া ন্যায্য ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করে। এই ক্ষতিপূরণ একটি মৃতের জন্য সাধারণত হয়- প্রস্তরের কুঠার, বল্লম, গাঁইতি, বিডের (Beads) মালা কয়েক ছড়া, শাঁখ-ঝিনুক প্রভৃতির অলঙ্কার ও এক জোড়া শূকর। যে পক্ষের মৃতের সংখ্যা বেশী, সে পক্ষ ক্ষতিপূরণ পায় সেই অনুপাতে। তথাপি তাহাদের ভিতর মৃতের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা অপেক্ষা তাহা প্রদান করাই অধিকতর গৌরবের বলিয়া প্রচলিত।

নিউ গিনির কামান্ জাতের ভিতর সংগ্রামে নিহত যোদ্ধার ক্ষতিপূরণ দাবী—২টি শূকর প্রস্তর কুঠার, বিড্ ও শাঁখের অলঙ্কার

বন্ধনহীন গ্রন্থি

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

নবম পরিচ্ছেদ

সতীশের চক্ষের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে বলিয়া অলকার বেশী দূরে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। তাই অনেক তর্ক-বিতর্কের পর যখন দেওঘর যাওয়াই ঠিক হইল, তখন অলকা কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। লোকালয় হইতে দূরে তাহারা বাস করিবে, কেহ আসিয়া বিরক্ত করিবে না আর সতীশের চক্ষু যদি নূতন কোন বিপদ বাধায় ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসাও, বিশেষ কোন অসুবিধাজনক হইবে না।

পরের দিনই তাহারা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়িল। অসুবিধা না হইলে সেও যে উহাদের সঙ্গী হইয়া সমস্ত দিক দেখিয়া শুনিয়া মস্ত বড় সুবিধা করিয়া দিতে পারিত—এই কথাই বার বার বলিয়া জগদীশ যাইবার সময় অলকাকে প্রয়োজনের সময় তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে যশীডি আসিয়া গেল। এতখানি সময় যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা অলকা ভাবিয়াও পাইল না। ওদিকের বেঞ্চে সতীশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অলকা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু অমন সুন্দর ঘুম হইতে অকস্মাৎ তাহাকে উঠাইতে সে কিছুতেই পারিল না। কুলী ডাকিয়া সমস্ত মালপত্র তাহাদের মাথায় চাপাইয়া দিয়া অলকা ফিরিয়া দেখিল গোলমালে সতীশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সতীশ উঠিয়া বসিয়াছে বটে, কিন্তু ঘুমের ভাব তখনও তাহার যায় নাই।

মৃদু হাসিয়া অলকা বলিল, উঠুন, পোলটা পার হয়ে ওদিকে যেতে হবে ত। এ গাড়ী আপনাকে নিয়ে দেওঘর যেতে ত আর রাজী হবে না।

হাসিয়া সতীশ বলিল, যশীডি এসে গেছে তাহলে, ভালই হ'ল।

অলকা বলিল, না এলে বোধ হয় আপনার পক্ষে আরও ভাল হ'ত, ঘুমটা অমনভাবে মারা যেত না। কিন্তু নামবেন কি? ওরা কতক্ষণ আর মোট ঘাড়ে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে?

সতীশ নামিয়া পড়িয়া বলিল, মোট-ঘাট সব চালান দেওয়ার বাবস্থা হয়ে গেছে? সেকথা আগে বলতে হয় সেই ভয়েই ত' নামতে চাইছিলুম না। কিন্তু এখনও ঘুম পাচ্ছে, গাড়ীতে ত' বসে থাকতে হবে অনেকক্ষণ, আমি আরও একটু ঘুম দিতে চাই—সেকথা আগে থেকেই ব'লে রাখছি।

অলকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বেশ তাই হবে, উঠেই সে ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে। এখন দয়া ক'রে একটু কথা থামালে কোন ক্ষতিই হবে না।

দেওঘরের গাড়ীতে উঠিয়াই অলকা বিছানা পাতিয়া দিল এবং তাহা শেষ হইবামাত্রই সতীশ টান হইয়া শুইয়া পড়িল। ঘুমাইবার জন্যই যেন সে গাড়ীতে উঠিয়াছে, হাতের খবরের কাগজটা মুখের উপর চাপা দিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে এতটুকু না নড়িয়া শুইয়া রহিল।

অলকা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ঠোঁটের উপর একটা মৃদু হাসি ভাসিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল মুখের উপর হইতে কাগজটা টানিয়া লইয়া জোর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া দেয়—পুরুষ মানুষের এত ঘুম ভাল নয়, মেয়েরা তাহা সহ্য করিতে পারে না।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। দূরে এবং নিকটে অসংখ্য পক্ষী নানা জাতির শব্দ করিতে করিতে কুলায় ফিরিতেছিল। ঘরের আহ্বান তাহাদের কানে আসিয়াছে, সকলের কানেই সেই আহ্বান পৌঁছিয়াছে। অলকা উৎসুক হইয়া উঠিল—দেওঘরে কোন এক নূতন বাড়ীতে চলিয়াছে তাহারা, কেমন সে বাড়ী তাহা সে জানে না, কাহার তাহাও জানে না জানিবার আগ্রহও নাই; কিন্তু সেই গৃহকেই আপনার করিয়া লইতে হইবে। যদি ওই লোকটির চক্ষুর প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ফিরিবার প্রয়োজনও সহজে হইবে না। একা উহার সঙ্গে থাকিতে আর তাহার এতটুকু আপত্তিও নাই। এক-দিনের ঘটনায়ই সে তাহাকে চিনিয়া লইয়াছে, চক্ষে বিষাদের চিহ্ন দেখিলেই যে নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারে, ক্ষমার জন্য যাহার মন আকুল হইয়া উঠে তাহাকে আর যে যাহাই বলুক মামার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সে কিছুতেই ছোট মনে করিতে পারে না। সতীশ রামহরিকে লইয়া আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে নিজেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। প্রতুলের জন্যই সে তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। সেই যে সে গিয়াছে আজিও ত আসে নাই, কিন্তু আসিবামাত্রই তাহার খবর পাইবার আগ্রহ ত অলকার কম নহে। আসিবামাত্রই রামহরি তাহাকে খবর দিবে তারপর সে দেখিবে দিদিকে ফেলিয়া সে আবার কেমন করিয়া দূরে চলিয়া যায়। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কথা তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া ঘা দিতে লাগিল, সতীশ কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত মনেই মুখে কাগজ চাপা দিয়া শুইয়া-ছিল। জানালার বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইয়া অলকা দূরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অকস্মাৎ কে যেন দরজার বাহিরে আসিয়া ডাকিল, মণি এসেছিস্, আমার মণি? অলকা দৃষ্টি ফিরাইয়া সেইদিকে চাহিল, লাঠি-ভর করিয়া একটি বৃদ্ধ তাহাদেরই কামরার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অলকা বলিল, কই না মণি ব'লে ত এ গাড়ীতে কেউ নেই।

বৃদ্ধ বলিল, নেই? তবে সে কোন্ গাড়ীতে আছে?

অলকা বলিল, তা-ত' ব'লতে পারি না, এগিয়ে গিয়ে দেখুন।

বৃদ্ধ লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে আগাইয়া গেল, অলকা আবার জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ বৃদ্ধের কাতর ক্রন্দন ভাসিয়া আসিল। অলকা চমকাইয়া উঠিল, সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হ'ল, এ সেই বুড়োরই গলা না—যে মণিকে খুঁজতে এসেছিল?

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, খুব ঘুমোচ্ছিলেন ত'?

সতীশও হাসিয়া বলিল, আমি একটু দেখে আসি অলকা—তোমার ভয় করবে না ত?

অলকা বলিল, না, ভয় আমার করে না, কিন্তু আপনি যাবেন কি ক'রে? অন্ধকারে ভাল দেখতে পাবেন না যে।

মৃদু হাসিয়া সতীশ বলিল, সে ঠিক অলকা, দৃষ্টিশক্তি ফুরিয়ে যেতে আর বেশী দেরী নেই আমার, কিন্তু আজও যে আমি কিছু কিছু দেখতে পাই। তুমি একটু ব'স, আমার দেরী হবে না।

সতীশ নামিয়া গেল, দরজা বন্ধ করিয়া মাথা বাড়াইয়া দিয়া অলকা তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া এই অন্ধকারের মধ্যেও উহাকে ঘিরিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রতুলকে সে জানে, বহুদূরের ক্রন্দন ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহারই বন্ধু হইয়া সতীশ কেমন করিয়া বৃদ্ধের ক্রন্দন শুনিয়াও অলকার মত চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারে?

সতীশ নামিয়া গিয়া দেখিল নিকটেই বৃদ্ধকে ঘিরিয়া কয়েকজন লোক জটলা করিতেছে। ঘটনা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, মণিকে খুঁজিবার সময় অন্ধকারে কাহার ধাক্কা খাইয়া বৃদ্ধ পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে।

রেলের একজন কর্ম্মচারী নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধকে দেখিয়াই সে আস্তে আস্তে বলিল, তাইত, এ-যে অরবিন্দ-বাবু দেখছি, বেচারা!

সতীশ তাহার কথা শুনিতে পাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আপনি ওঁকে চিনেন নাকি?

কর্ম্মচারী বলিল, চিনি এবং ভাল ক'রেই চিনি। উনি এখানকারই কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু অবসর নেবার আগেই তিনি অন্ধ হয়ে যান।

সতীশ বলিল, অন্ধ হ'য়েও কি ক'রে তবে উনি মণিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন? আর মণিই বা কে?

কর্ম্মচারী বলিল, মণি ছিল ওর একমাত্র সন্তান। ছেলেটি খুবই ভাল ছিল, অন্ধ হওয়ার পর চাকরী গেলেও ছেলের ভরসাতেই তিনি টিঁকে ছিলেন। ছেলেও চাকরী পায় এখানে। কিন্তু একদিন দেখা যায় যে, সে রেলে কাটা প'ড়ে আছে। তার আগের দিন রাত্রে তার ডিউটি ছিল—অনেকে সন্দেহ করে এ কুলীদের কাজ। মালগুদাম থেকে কতকগুলি কুলীকে চুরি করতে দেখে কিছুদিন আগে সে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটার কোন কিনারাই আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এখন এখানকার কর্ম্মচারীদের সাহায্যেই ওঁর দিন চলে। উনি কিন্তু ছেলের মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করেন না, ভাবেন, কাজের উন্নতির জন্যে ছেলে বিদেশে গেছে, আসবেই একদিন। রোজ প্রত্যেকটা গাড়ীতেই উনি খোঁজ করেন তার।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া সতীশ বলিল, উঠুন আর দেরী করবেন না, গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে মণি এলি?

সতীশ বলিল, উঠতে পারবেন কি? আমার কাঁধের ওপর ভর দিন। গাড়ী ছাড়বার আর কিন্তু বেশী সময় নেই।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীশের হাতে ভর দিয়া আগাইয়া চলিলেন। আনন্দে উৎসাহে তিনি তাঁহার সমস্ত বেদনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এতদিনকার সঙ্গী লাঠিটার কথাও তিনি ভুলিয়া গেলেন।

সেই বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সতীশকে আসিতে দেখিয়া অলকা বিস্মিত হইয়া উঠিল। ইহারা যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত সৃষ্টি তাহা সে বুঝিয়াছিল। এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করিয়া ইহারা সকলকেই আপনার করিয়া লইতে পারে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে সম্পূর্ণ অপরিচিতের জন্যও স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বসিতেও ইহাদের বিন্দুমাত্র দেরী হয় না। ইহাদের দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই অথচ ঠিক সাধারণ মানুষ বলিয়া কিছুতেই ভুল করা চলে না।

কোন প্রশ্ন না করিয়া অলকা দরজা খুলিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাঁহাকে উপরে উঠিতে সাহায্য করিল। উপরে উঠিয়া আসিয়া সতীশ তাঁহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অলকা বলিল, আর একটু দেরী করলেই হয়েছিল আর কি। দেওঘর ষ্টেশনে গিয়ে আমাকে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাকতে হ'ত, আর এদিকে—

তাহাকে বাধা দিয়া হাসিয়া সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাকতে হবে কেন! আর একদিনের মতই লোকের অভাব হ'ত না।

সতীশের প্রতি শ্রদ্ধায় অলকার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দৈবক্রমে আজ যাহার সঙ্গিনী সে হইয়া পড়িয়াছে সে যে মহৎ ইহা মনে করিয়া সে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, না আর কারও সাহায্য আমি চাই না। যা পেয়েছি তাই আমার যথেষ্ট আর বেশী সাহায্য সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই।

শুইয়া শুইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, কে বৌমাও সঙ্গে আছে নাকি? বেশ হ'ল, কিন্তু তুমি কে বাবা? আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে আমার মণি বেঁচে নেই। আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করিনি এতদিন, কিন্তু আজ বুঝেছি যে ভগবান তাঁর এত বড় জগতের কতকটা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই মণিকে আমার নিয়ে গেছেন। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি তার কথা, কিন্তু কেউ বড় একটা জবাব দেয়নি, একটা ভাল কথাও কেউ বলেনি—বুঝেছি মানুষের এমন একটা দিক আছে যা মানুষের প্রতি বিরূপ, মানুষ যে ভাল হতে পারে তাও ভুলে গিয়েছিলাম, তাই মনে হ'ত মণি আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু তোমার দয়া দেখে বুঝতে পারছি এ অসম্ভব—মণির পক্ষে আমাকে ফেলে যাওয়া অসম্ভব। তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দিলে আজ যে সে বেঁচে নেই। একদিক দিয়ে দুঃখ আমার বেড়ে গেল সত্যি, কিন্তু মানুষের সততা দেখে আর একদিক দিয়ে যে আমার আনন্দও না হচ্ছে তা নয়।

সতীশ বলিল, দয়ার কথা মনে ক'রে আমায় লজ্জা দেবেন না, আমাকে মণির মতই মনে করবেন।

বৃদ্ধ বলিলেন নিশ্চয়ই, তা যদি মনে করতে না পারতাম ত' তোমার সঙ্গে আসতাম কি করে? ছেলে আমার হারিয়েছিল, সুদশুদ্ধ আসল আজ আমি পেলাম। বৌমা কি রাগ ক'রে ব'সে আছে নাকি, একটা কথাও যে আর শুনছি না? আমি চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু কান দুটো ভগবান আজও আমার নিয়ে নেননি। বৃদ্ধের সারা মুখ অত্যুজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়া গেল।

সতীশ অলকার মুখের দিকে চাহিল, অলকাও একান্ত লজ্জায় সতীশের মুখের দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া গিয়া বৃদ্ধের নিকটে বসিয়া বলিল, এই ত' আমি, রাগ করে থাকব কেন? আপনি চোখে দেখতে না পেলেও আমি ত' পাই।

বৃদ্ধ হাত বাড়াইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তাই ত' সেকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার চোখ দিয়েই এবার সব কিছু আমি দেখব। তারপর উঠিয়া বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, তোমার স্বামীর কোন পরিচয়ই কিন্তু আমি পেলাম না মা। মেয়েদের কাছেই স্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে হয়, ভারী সুন্দরভাবে বলতে পারে মেয়েরা। কি করেন উনি?

অতি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া অলকা বসিয়া রহিল। মুখ তুলিয়া সতীশের মুখের দিকে অথবা ওই বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইবার মত মনের অবস্থাও তখন তাহার ছিল না।

বৃদ্ধ এইবার একটু জোরেই বলিলেন, লজ্জা কি মা, এ প্রশ্নে লজ্জা পাবার দিন ত' আর নেই। পরিচয়টা দাও, কি করেন উনি?

তেমনিভাবে বসিয়া থাকিয়াই অলকা বলিল, কি করেন তা আমি জানি না।

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, এইবার একটা শক্ত কথা বলেছ মা। এর ওপর আর কথা নেই অথচ এর চেয়ে মজার কথাও আর নেই। তারপর সম্মুখের দিকে চাহিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, তোমার পরিচয়টা ত এখনও পেলাম না। এ বুড়োর প্রতি এটুকু দয়া অন্ততঃ কর।

সতীশের যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, ব্যস্ত হইয়া সে বলিল, আমাকে ব'লছেন?

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বেশ ত, তোমরা দুজনেই দেখছি সমান। তোমাকে ছাড়া আর কাকে ব'লব বল?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ বলিল, এমনি কাজকর্ম্ম কিছুই করি না, তবে কয়েকখানা বই লিখেছি এ পর্য্যন্ত। নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত থামিয়া থামিয়া সে কথাগুলি শেষ করিল।

বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, লেখক তুমি! তাই বুঝি পরের জন্যে এত ভাবনা? বুঝেছি—ভগবানের দান তোমার মধ্যে আছে ব'লেই তোমার দান আজ ছড়িয়ে পড়েছে সবার মধ্যে। নিজেও সৃষ্টিকর্ত্তা, একাধারে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা বললেও চলে।

সতীশ হাসিয়া বলিল, না, তেমন কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আজও আমার হয়নি। সতীশ অলকার মুখের দিকে চাহিল, অলকাও তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য চারি চক্ষের মিলন হইল, অলকা দৃষ্টি নত করিল, সতীশ বাহিরের দিকে চাহিল।

ধীরে ধীরে গাড়ী ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিল। সমস্ত কথা শেষ করিয়া এবার নামিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—ক্রমশ—

আমরা কেন এত গরীব ?

ডক্টর্ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

(ক)

আমরা ভারতবাসী বড় গরীব। মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এখানকার লোকের গড়ে মাথা-পিছু আয় মাসে পাঁচ টাকার বেশী নয়। এ আয় গড়ে; এর মানে ইহা নয় যে প্রত্যেক লোকেরই মাসে পাঁচ টাকা আয় আছে; তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে যে চাষীর ঘরে বউ ও তিনটী ছেলেমেয়ে আছে তার মাসে আয় হইত পঁচিশ টাকা। এক বৎসরে দেশে যত জিনিষ জন্মায় ও যত লোক টাকা লইয়া কাজ করে তাহাদের সকলের আয় যদি যোগ করা যায় এবং উহা এই দেশের প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মাথা-পিছু পাঁচ টাকা মাসে আয় হয়। কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে সকলের আয় সমান নয়। একশ জন লোকের মধ্যে পাঁচজন দেশের আয়ের তিনভাগের একভাগ দখল করিয়া আছেন, আর পঁয়ত্রিশ জন আর এক ভাগ ভোগ করেন, ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে দেশের লোকের শতকরা ষাটজন গরীব দেশের আয়ের মাত্র তিনভাগের এক ভাগ পায়। কিন্তু দেশের যাবতীয় আয় যদি সকলের মধ্যে সমান করিয়াও ভাগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও আমাদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে না। কেননা আমাদের দেশের মাথাপিছু গড়ে আয় যেখানে পাঁচ টাকা ইংরেজদের সেখানে তিরাশি টাকা, আমেরিকার লোকদের একশ টাকা; মিশর দেশ যে এত গরীব, সেখানকার লোকদের আয়ও মাসে পঁচিশ টাকা। আমরা ইংরেজদের চেয়ে সতের গুণ, আমেরিকানদের চেয়ে বিশ গুণ, মিশরের লোকের চেয়ে পাঁচ গুণ গরীব। আমাদের মতন গরীব আর অন্য কোন সভ্যদেশের লোক নয়। আমাদের দেশে যতটা ফসল জন্মে, তাহাতে উনত্রিশ কোটির কিছু বেশী লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে; কিন্তু ঐ ফসলেই আমাদের প্রায় চল্লিশ কোটি লোককে খাইতে হইতেছে। তার ফল হইয়াছে এই যে অনেক লোকই এ দেশে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; আধপেটা খাইয়া না এক বেলা খাইয়া দিন গুজরান্ করে। পেট ভরিয়া যাহারা খাইতে না পায়, তাহারা পুরাদমে খাটিতে পারে না; আর রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতাও থাকে তাদের কম। তাই একদিকে যেমন অন্য দেশের লোকের তুলনায় আমাদের দেশের চাষী-মজুরেরা কাজ করিতে পারে কম, অন্য দিকে আমাদের ভিতর মরণের হারও বেশী। ভারতবর্ষের প্রতি হাজার লোকের মধ্যে প্রতি বৎসর পঁচিশজন মরিয়া যায়, আর ইংলণ্ডে সেই জায়গায় বারজন মাত্র মরে। এ দেশে প্রতি বৎসর যত ছেলেমেয়ে জন্মে, তাদের মধ্যে হাজারকরা দুইশ জন এক বৎসরের মধ্যেই মারা যায়, আর ইংলণ্ডের সেই জায়গায় সত্তর জন মাত্র মারা যায়। আমরা গরীব—ভাল করিয়া খাইতে পাই না; তাই এত লোক আমাদের মরিয়া যায়; আবার এত লোক অকালে মরিয়া যায় বলিয়াও আমাদের অভাব ঘুচে না।

(খ)

লোকের যদি আয় কম হয়, তাহারা যদি আয় বাড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করে এবং বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ না করে, তাহা হইলে তাহারা গরীব থাকিয়াই যায়—আমাদের দেশে এই তিনটী কারণই বর্ত্তমান আছে। কৃষি, শিল্প আর বাণিজ্য এই তিনটী হইতেছে লোকের টাকা রোজগারের প্রধান উপায়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বেশীর ভাগ লোকই শিল্প কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশে শিল্পের বেশী কিছু উন্নতি হয় নাই। সেকালে তাঁতী, জোলা, কামার, কুমার প্রভৃতি যে সব জাতি শিল্পকর্ম্ম করিয়া খাইত, সস্তা বিলাতী মালের আমদানী হওয়ায় তাহাদের তৈয়ারী জিনিষ আর বড় একটা কেহ কিনিত না। তাই তাহাদের মধ্যে অনেকেই জাত ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া পেটের দায়ে চাষ করিতে লাগিল। যদি দেশে যন্ত্র শিল্পের প্রসার হইত, তাহা হইলে তাহারা কলকারখানায় কাজ পাইত। সকলে মিলিয়া চাষের জমিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; ফলে এই হইয়াছে যে প্রত্যেক চাষীর ভাগে জমি পড়িয়াছে এক টুকরা মাত্র। বাঙলা ও বিহারে প্রতি কৃষক পরিবার পিছু গড়ে তিন একরের (বাঙলা দেশের হিসাবে তিন বিঘায় এক একর) সামান্য বেশী জমি পড়ে; কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি একসাথে এক পরিবারের অন্ততঃ পনের একর জমি থাকে তাহা হইলে খরচ খরচা বাদ দিয়া সেই পরিবারের মাসিক আয় হইতে পারে ত্রিশ টাকা। এক এক পরিবারে অন্ততঃ পাঁচ ছয়জন লোক থাকে, ত্রিশ টাকা মাসে আয় হইলে মাথাপিছু পাঁচ ছয় টাকা আয় হয়। এই আয়ের কমে আর একটা সংসারের খাওয়াপরা চলে না। কিন্তু যেমনভাবে এদেশে চাষ হয়, তেমন করিয়া চাষ করিলে পনের একর জমিতে কিছুতেই মাসে ত্রিশ টাকা আয় হইতে পারে না। ঐরূপ আয় করিতে হইলে চাই ভাল রকমের জল সরবরাহের ব্যবস্থা, সবচেয়ে ভাল বীজ বোনা, জোরালো বলদ দিয়া ভাল করিয়া জমিতে লাঙল দেওয়া, আর চাই ন্যায্য দামে ফসল বিক্রি করা। এ সবের কিছুই যে নাই এদেশের চাষীদের মধ্যে।

যেটুকু জমি এক এক চাষী চাষ করিতে পায়, তারও সবখানি এক জায়গায় নয়, নানান জায়গায় ছড়ান। এক জায়গায় সবটুকু জমি থাকলে তাহা বেড়া দিয়া ঘেরা যায়, একটা কুয়া খুঁড়িয়া জল সরবরাহ করা যায়; জমিতে ঘর তুলিয়া গরুবাছুর রাখা যায়, তাহাতে তাহাদের গোবর জমাইয়া সার দেওয়ার সুবিধা হয়, আর হয়রাণিও কম হয়। টুকরা টুকরা জমির মধ্যে আল বাঁধিয়া দেওয়ায় কত জমি বৃথা নষ্ট হয়। চাষীর সবখানি জমি যদি এক জায়গায় থাকিত তাহা হইলে চাষের কত সুবিধা হইত। পাঞ্জাবের চাষীরা সমবায় সমিতির সাহায্যে নিজেদের মধ্যে জমি বদলাবদলি করিয়া লইয়া প্রত্যেকে নিজের দখলের সবখানি জমি এক জায়গায় করিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি সে রকম করার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে যাদের জমি কাছাকাছি রহিয়াছে তাহারা সকলে মিলিয়া সমবায় করিয়া ভাল বলদ ও লাঙ্গল রাখিতে পারে; সকলের জমির মাঝখানে কুয়া খুঁড়িয়া জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিতে পারে। যাহার কয়েক কাঠা মাত্র জমি আছে, সে লাঙ্গল, বলদে শুধু খরচান্ত হয়, অথচ ওরা না রাখিলে চাষ করাও কঠিন। এরূপ ক্ষেত্রে আর দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের মধ্যে সকলের ব্যবহারের জন্য বলদ রাখাই ভাল। এর জন্য চাই শুধু প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনের মিল আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস।

এ দেশের চাষীরা অন্য যে কোন সভ্য দেশের চাষীদের অপেক্ষা অনেক কম ফসল উপজায়। এখানে এক একর জমিতে যে ফসল হয় তাহা বেচিয়া পঁচিশ টাকার বেশী সাধারণত পাওয়া যায় না, অথচ জাপানে (Japan) এক একরে এত বেশী ফসল হয় যে তাহা হইতে জাপানীরা দেড় শত টাকা পায়। আমাদের দেশের চাষীরা যে অন্য দেশের চাষীদের চেয়ে কম পরিশ্রমী বা কম বুদ্ধিমান তাহা নহে। তবে এ দেশে চাষীদের ফসল কম হওয়ার অন্য কতকগুলি কারণ আছে। এ দেশে চাষের জল সরবরাহের ভাল রকম ব্যবস্থা নাই। সরকারী খাল এবং নদী, কুয়া, পুকুর প্রভৃতি হইতে জল দিয়া চাষের সুবিধা আছে মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ চাষের জমিতে। আর বাকী চার ভাগ জমির চাষ নির্ভর করে দেবতার দয়ার উপর। যদি সময় মত ভাল বৃষ্টি হয় তাহা হইলে ফসল ভাল হয়; কিন্তু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে চাষীর দুঃখের আর সীমা থাকে না। ফসল যদিও বা ভাল রকম জন্মে কীটপতঙ্গ; গরু-মহিষ ও বন্য জন্তুর হাত হইতে তাহা রক্ষা করাও সহজ ব্যাপার নয়।

শুধু জল হইলেই ভাল ফসল হয় না। তাহার সঙ্গে চাই ভাল রকমের চাষ আর ভাল সার। ভাল রকমের লাঙ্গলের ফলা চালাইয়া দিতে হয়। যে সব লাঙ্গল আমাদের চাষীরা সাধারণত ব্যবহার করে, তাহাতে কেবলমাত্র মাটিটা উল্‌টাইয়া দেওয়া হয়; তাহাতে জমির ফসল দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে না। আর যে রকমের

গাইবলদ লইয়া আমরা চাষ করি, তাহাতেও পুরাপুরি চাষ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের গরু ও বলদগুলির দিকে তাকাইলে চোখ জুড়ায়। তাহারা কি বলিষ্ঠ, কি তেজালো! আর আমাদের দেশের গরুগুলি আকারে ছোট, শক্তিতে হীন। চাষী নিজেই খাইতে পায় না, গরুকে ভাল করিয়া খাওয়াইবে কোথা হইতে? গ্রীষ্মকালে গরুগুলি খাইতে না পাইয়া জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া যায়। তারপর মাঠে ঘাস গজাইবার পূর্বেই একবার ভাল রকম জল হইলেই, তাহাদিগকে লাঙ্গল দিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। গরুর থাকিবার জায়গারও দুরবস্থার এক শেষ। বর্ষাকালে কাদা, পাঁক, ডাঁশ, মশা তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলে। এই রকমে আমাদের গো-জাতি দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। মানুষ গো-চারণের জমি কাড়িয়া লইয়া নিজের খাবার উপজাইতেছে। গরু খাবার পাইতেছে না, তাই মানুষকেও আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইতেছে। দুধ, দই, ঘোল, ঘি, মাখন প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য জোগাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে গো-মহিষের যত্ন লওয়া। এ দেশের গরু বিলাতের ও হল্যান্ডের গরুর চেয়ে পাঁচশত গুণ কম দুধ দেয়। সেকালের লোকে গরুর যত্ন করিতে জানিত। তাই তাহারা দুধে ঘিয়ে পুষ্ট হইত, বেশীকাল বাঁচিত। আমরা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ খাইতে পাই না, আমাদের জীবনীশক্তি আসিবে কোথা হইতে? গরুর খাবার জোগাইবার জন্য খানিকটা জমি ধান ডাল প্রভৃতি জন্মাইবার জমি হইতে ছাড়িয়া দিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কেননা ডাল-ভাত যতটা খাই, তাহাতে দেহের মেদ বৃদ্ধি পায়, উহা কমাইয়া দুধ ঘির পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া দরকার।

একই জমি বারবার চাষ করিতে করিতে উহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের যেমন কাজ করিবার জন্য খাবার দরকার হয়, জমিরও তেমনি ফসল জন্মাইবার জন্য সারের দরকার হয়। অথচ আমাদের দেশের চাষীরা কতকটা পয়সার অভাবে কতকটা জ্ঞানের অভাবে জমিতে সার দেয় না। গোবরে খুব ভাল সার হয়, কিন্তু সেই গোবর আমরা ঘুঁটে করিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়া নিজেদের কপালে আগুন দেই। হাড়ের গুঁড়ার সার দিলে জমিতে ডবল, তিনগুণ ফসল হয়; অথচ হিন্দু চাষী উহা ছুঁইতে নারাজ। মানুষের বিষ্ঠা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে কিছুকাল পরে উহা হইতে অতি উত্তম সার তৈয়ারী হয়। বোম্বাই প্রদেশের নাসিক মিউনিসিপ্যালিটি বিষ্ঠা হইতে সার তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে। অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি নাসিকের রীতি অনুসরণ করিলে আমাদের জমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এ দেশের চাষীরা গরীব বলিয়া ভাল গাই, মহিষ ও বলদ পুষিতে পারে না। জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে পারে না, সার দিতে পারে না। আর এসব না দিলে জমির ফসল বাড়িবে কিরূপে? চাষী চাষের সময় মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া বীজ কিনে, লাঙ্গলের গরু মরিয়া গেলে ধার করিয়া গরু কেনে, তারপর মামলা, মোকদ্দমা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে তো ধার করেই। ধারের সুদ জোগাইতেই তাহার আয়ের অধিকাংশ চলিয়া যায়। কোথা হইতে সে চাষের উন্নতি করিবে? হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে সরকার হইতে বিনা সুদে বা খুব অল্প সুদে চাষীকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে অবশ্য সরকার হইতে টাকা ধার দিবার পূর্বে, টাকা কিভাবে খাটাইলে চাষের বেশী উন্নতি হইবে তাহা শেখানো দরকার। সে সব কোন ব্যবস্থা না করিয়া শুধু আইন করিয়া সুদের হার কমাইয়া দিলে বা পুরাতন ধার নাকচ করিয়া দিলে চাষী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। উপরন্তু সে আর চাষের জন্য ধার পাইবে না।

(গ)

কলকারখানায় ও খনিতে কাজ করিয়া বিদেশে অনেক লোক টাকা রোজগার করে। এদেশে প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ষোল লাখ লোক খনিতে কাজ করে। অন্যান্য দেশের সরকার নিজের নিজের দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য কত টাকা খরচ করিতেছেন, কত রকম উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সে রকম ব্যাপক কোন প্রচেষ্টা সরকারী মহলে দেখা যায় নাই। আমাদিগকে এখনও কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, সুতার জিনিষ, রেশম, পশম বিদেশ হইতে কিনিতে হয়। এসব জিনিষ দেশের মধ্যে যদি তৈয়ারী হইত তাহা হইলে, দেশের লোক কাজ পাইত, তাহারা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া বাঁচিত। কিন্তু সবটা দোষ শুধু সরকারের ঘাড়ে চাপাইয়া লাভ নাই। শিল্পের প্রসার যে আশানুরূপ হয় নাই, তাহার জন্য আমরাও কম দায়ী নহি। কলকারখানা স্থাপন করিতে হইলে চাই টাকা। আমাদের দেশের লোক বহু কোটি টাকার সোনা গহনা তৈয়ারী করিয়া বৃথা ফেলিয়া রাখিয়াছে। যাহারা দু'পয়সা সঞ্চয় করিতে পারে তাহারা ঐ টাকা শিল্পে না লাগাইয়া কোম্পানীর কাগজ কেনে। দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দিবার জন্য কোনও ব্যাঙ্কও দেশে নাই। তারপর আমাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী ছেলেরা সরকারী চাকুরী লইয়া গোলাম হয়; শিল্প বাণিজ্যের দিকে যায় না। তাহাদিগকে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতেও শিল্পের দিকে তাহাদের মন যায় না। দেশে যে সকল কলকারখানা হইয়াছে তাহার অনেকগুলির মালিকই বিদেশী। তাহারা লাভের টাকা লইয়া যায়, আমরা কুলি, মজুর, কেরাণীর মজুরী পাই।

বিদেশে জিনিষ বেচিয়া ও বিদেশের জিনিষ দেশে আনিয়া বিক্রয় করিয়া অনেকে রোজগার করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে আমদানী রপ্তানির বড় বড় কারবারগুলির অধিকাংশই সাহেবদের হাতে। বিদেশে আমাদের কারখানায় তৈয়ারী জিনিষ কমই বিক্রয় হয়, আমরা কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাই, আর তার বদলে কিনি সেইসব দেশের কারখানায় তৈয়ারী জিনিষপত্র। এতে আমাদের দেশের লোকের কাজ পাইবার সুবিধা অনেকটা কমিয়া যায়। ইংলণ্ড, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশের লোকের কত জাহাজ আছে। সেইসব জাহাজে করিয়া তাহারা দেশের জিনিষ বিদেশে পাঠায়, বিদেশের জিনিষ দেশে লইয়া আসে, আবার বিদেশীদের নিকট জাহাজ ভাড়া দেয়। আমাদের দেশে এ ধরণের জাহাজ নাই বলিলেই চলে। এর ফলে বিদেশী জাহাজগুলিকে আমরা বছরে গড়পড়তায় পঞ্চাশ কোটি করিয়া টাকা দিতে বাধ্য হই।

(ঘ)

পূর্বে বলিয়াছি যে লোকের অবস্থা নির্ভর করে ভাল রকমের আয়ের উপর, আর বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করার উপর। আমরা দেখিলাম যে কৃষি শিল্পে ও বাণিজ্যে আমাদের আয় খুবই কম। এর উপর আবার কতকগুলি ব্যাপারে খরচের বোঝা খুব বেশী রকমের। কতকগুলি বোঝা অপরে মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়াছে, আর কতকগুলি বোঝা আমরা বোকার মতন মাথায় করিয়া লইয়াছি। অপরের চাপানো বোঝার মধ্যে জমির খাজনা ও পৈত্রিক ঋণের বোঝাই সবচেয়ে বড়। বাঙলা ও বিহারে বোম্বাইয়ের তুলনায় খাজনার হার অনেক কম, কিন্তু আইন করিয়া খাজনা অনেক জায়গায় বন্ধ করিয়া দিলেও, উহা যে কাজে বন্ধ হইতেছে না ইহাই দুঃখের কথা। বাপ-ঠাকুরদাদা কোন কারণ বশত যে টাকা ধার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুদে সুদে বাড়িয়া অনেক হইয়াছে। তাহার খানিকটা অংশ মাপ করিয়া দিলেও, বাকীটা দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। যাহাদের দিন চলে না, তাহারা ধারের টাকা শোধ দিবে কোথা হইতে? অথচ মহাজনকে কিছু কিছু না দিলে সেও ছাড়ে না। সংসার চালাইয়া আবার ধার

শোধ দিতে হইলে বেশী করিয়া পরিশ্রম করা দরকার। কিন্তু চাষীরা বছরে গড়ে তিন চারমাস বসিয়া থাকে। ফসল কাটা হইয়া ঘরে উঠিলে তাহাদের আর কোন কিছু করিবার নাই বলিয়া তাহারা মনে করে। কিন্তু ঐ সময়ে বসিয়া না থাকিয়া তাহারা যদি চরকা কাটে, মৌমাছি পোষে, বেতের বা বাঁশের জিনিষ বুনে বা অন্য রকমের হাতের কাজ করে তাহা হইলে আয় বাড়ে। আমরা গরীব, আমাদের কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে?

মামলা মকদ্দমার দরুণ অনেক সময় আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়। তুচ্ছ বিষয় লইয়া মামলা মকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া আমরা সর্বস্বান্ত হই। খুব ছোট খাট সামান্য বিষয় লইয়াই যে আমরা আদালতে দৌড়াই তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। মামলা করিয়া সামান্য এক টুকরা জমি পাইবার জন্য হাজার হাজার টাকা উকীল, মোক্তার, সাক্ষী-সাবুদ ও আমলাদের ঘরে ঢালিয়া দিই। প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর ঝগড়া হইলে একজন আর একজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ করিলে ধনে-প্রাণে মারা যাইবার যোগাড় হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, ঘরের চাল দিয়া জল পড়িতেছে, ছেলে মেয়ে অসুখে ভুগিতেছে, তাহাদের ঔষধ-পথ্য যোগাইবার উপায় নাই, তবু তাহারা নেশা করে। নেশা করিয়া যে কত পয়সা লোকে নষ্ট করে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদেরও নেশা করিয়া পয়সা উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। ঐ পয়সা রাখিয়া দিলে দুর্দিনে কাজে লাগিবে, মহাজনের কাছে গিয়া হাত পাতিতে হইবে না।

বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে আমরা অনেক সময়ে সাধ্যের চেয়ে বেশী খরচ করিয়া বসি। সাধ্যে কুলাইলে লোকে সাধ-আহ্লাদ পূরণ করিবে বৈকি। মানুষের ভোগের জন্যই তো টাকা, টাকা রোজগারের জন্য তো আর মানুষ না। কিন্তু ধার করিয়া এ সব কাজ করিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। যার যেমন ক্ষমতা সে তেমনি করিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে। বড়লোকেরা বাজি পোড়াইয়া, হাতী নাচাইয়া, বাজনা বাজাইয়া অনেক টাকা বৃথা অপব্যয় করেন। তাঁহাদের টাকা থাকিলেও এরূপ করা উচিত নয়। কেন না ঐ টাকা দিয়া তাঁহারা দশের হিত হয়, দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, এমন অনেক কাজ করিতে পারিবেন। বড়লোকেরাও সামাজিক ব্যাপারে একটু সংযত হইয়া খরচ করিলে গরীবদের অনেক উপকার হয়। অনেক টাকা লইয়া সমারোহ করিবার রেওয়াজ তো তাঁহারাই করিয়াছেন, আর তাঁহাদের দেখাদেখি সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ঐ বিয়াতলা কুপ্রথা ঢুকিয়াছে।

(৬)

আমরা যদি খাটিয়া খাটিয়া আয় কিছু বাড়াইতেও পারি, আর বুদ্ধি-বিবেচনা করিয়া খরচ কমাই, অথচ অল্প বয়সে বিবাহ করি এবং বহু সন্তান উৎপাদন করি, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা কিছুতেই ঘুচিবে না। আমাদের দেশে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ষাট বছরে প্রায় নয় কোটি লোক বাড়িয়াছে। নয় কোটি লোক বাড়া বড় সোজা কথা নয়; কেননা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দুই দেশের সর্বসমেত লোকসংখ্যাই হইতেছে নয় কোটির কিছু বেশী। নয় কোটি বাড়িবার পূর্বেও যে আমাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল তাহা নহে। এত লোক বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্পজাত জিনিষপত্রও কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য, বিশেষ করিয়া ধান-চালের পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে বিশেষ বাড়ে নাই। বিহারে বেশ ভাল রকম ফসলই হয়, কিন্তু এখানকার ২০৫ লাখ একর জমিতে ১৭৯৫ লাখ মণ ফসল জন্মে; অথচ এখানকার লোকসংখ্যা হইতেছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি। ইহাদের সকলে যদি দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে চায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, ৪৪০ লাখ মণ ফসল নাজাই পড়িতেছে। এমনি দশা বাঙলা দেশেরও। আর আমাদের অভাব বুঝাইবার জন্য এত অঙ্ক কষারই বা কি দরকার? চোখের সামনেই তো রোজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কতকগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া কত-শত গৃহস্থ দারুণ রকম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দুধ জোগাইবার পয়সা নাই, গরম কাপড়-জামা দিবার ক্ষমতা নাই, এমন কি খাইতে দিবার ক্ষমতা নাই। পাড়াগাঁয়ে অনেক জায়গায় চাষীরা একখানি ঘরে বড় বড় ছেলে-মেয়ে লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বাস করে। বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি শহরে গরীব লোকদের কষ্ট বড় ভীষণ। স্বামী-স্ত্রীর শুইবার ঘরে কিশোর বয়সের ছেলে মেয়ে লইয়া বাস করা স্বাস্থ্য ও নীতির পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। আমরা বাড়ীতে কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে তাহাকে কোথায় বসাইব কি খাইতে দিব, তাহা আগে ভাবিয়া লই। আর কোনোর চাঁদ ছেলে মেয়েকে ঘরে আনিবার পূর্বে কথাটা ভাবিয়া দেখি না। তখন বলি যে জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনিই। ভগবান আমাদিগকে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়াছেন, আমরা যদি তাহার ব্যবহার না করি, তাহা হইলে দুঃখ পাইব; সেই দুঃখের জন্য ভগবানকে দায়ী করা অন্যায় হইবে। আমরা ছেলে মেয়ের যৌবনোদ্গম হইতে না হইতে তাহাদের বিবাহ দিই। ছেলের বৌকে খাইতে দিবার ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক ছেলের বিবাহ দিতেই হইবে, এই হইল আমাদের ধারণা। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে, অল্প বয়স হইতেই ছেলে-মেয়ে হইতে থাকে। ইহাতে একদিকে মায়ের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, অন্যদিকে বাপ সংসার লইয়া ঘোরতর দুশ্চিন্তায় পড়ে। শিশুকালেই বহু পুত্র-কন্যা প্রাণত্যাগ করে। অকাল মৃত্যুতে মনে যেমন ভীষণ দাগা লাগে জাতির আর্থিক ক্ষতিও তেমনি নিদারুণ হয়। শিশুরা কাজ করিতে পারে না, যাহারা কাজ করিয়া ধন উৎপাদন করে, তাহারা তাহাদিগকে খাওয়ায় পরায়। যে টাকাটা তাহাদের উপর খরচ করা হয়, সুস্থ সবল হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে তার চেয়ে বেশীই তারা রোজগার করিতে পারে; কিন্তু অকাল মৃত্যু ঘটিলে সে টাকাটা জলেই যায়। আমাদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিতে হইলে প্রসূতিদের স্বাস্থ্য ভাল করিতে হইলে এবং জাতিকে উন্নত করিতে হইলে বর্তমান অবস্থায় জন্মের হার কমাইতে হইবে। বিবাহের বয়স কিছু পিছাইয়া দিলে ছেলে-মেয়ের জন্মের সংখ্যা কিছু কমিতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের লোকের আয়ু একেই কম, তাহাতে আবার বেশী বয়সে ছেলে-মেয়ে হইতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার পূর্বেই অনেককে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। অনেকে বলেন, বিবাহিত জীবনে সংযম অবলম্বন করিলে সন্তান জন্মের হার কমিবে; কিন্তু অত্যন্ত সংযত থাকিলেও একদিন অসাবধানতার ফলে প্রতি বৎসর একটি করিয়া সন্তান জন্মিতে পারে। বিলাতে ও অন্যান্য দেশে বহুলোক রবারের তৈয়ারী জিনিষপত্র ব্যবহার করিয়া কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিরোধ করিয়া থাকে। এদেশেও ভাল অবস্থার শিক্ষিত লোকেরা অনেকে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এ দেশের জনসমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ইহাই। কিন্তু ঐ সব জিনিষ ব্যবহার করিতে হইলে কিছু শিক্ষা চাই, আর চাই পয়সা খরচ করা। যাহারা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহারা যে ঐ সব জিনিষ কিনিতে পয়সা খরচ করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। যদি গ্রামে গ্রামে সরকারী হাসপাতাল খুলিয়া ঐ সকল জিনিষের ব্যবহার শিখাইয়া দিয়া উহা বিতরণ করা হয়, তাহা হইলে হয়তো কিছু সুফল হইতে পারে। কিন্তু অনেকেই এসব জিনিষের ব্যবহারকে অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করেন। তাই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আপাততঃ সম্ভব নহে। সেই জন্য আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াই জনসমস্যা নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সকলে মিলিয়া সমবেত হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে। সরকার যাহাতে এ সকল বিষয়ে উদ্যোগী হন, সে দিকেও মন দিতে হইবে।

দেশের লোক যদি দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে, আমরা যদি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাকি তাহা হইলে আমাদের দুঃখ-কষ্টের অবসান হইবেই।

ক্রন্দসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(২১)

সেদিন রবিবার ছিল। সন্ধ্যার দিকে সুবোধ ও অবনীর সঙ্গে ইভা ফাঁকা মাঠের পূবের পথটায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। উমাকে সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে এ সকল চালচলন একটুখানি রীতিবিরুদ্ধ হইলেও ইভার শ্বশুর এ সকল মানিতেন না এবং তাঁহার অগাধ টাকার জোরে লোকে প্রকাশ্যে বেশী আলোচনা করিতেও সাহস পাইত না। অবশ্য ভিতরে আড়ালে যাহা খুশী বলিত। যতটা বলা উচিত তাহার চেয়ে অনেক বেশীই বলিত। বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা মাঝি পাড়ার দিকে আসিয়া পড়িল, মাঝিদের মেয়েরা তখন পুরুষদের সহিত মিলিয়া মাদলের তালে তালে নাচিতেছে। মাদল বাজিতেছে এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া গানও চলিতেছে। সস্তাদামের ধেনো মদের গন্ধে বিশগজ দূর হইতেও নাকে কাপড় দিতে হয়।

উমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—"অন্যদিকে চল বৌদি। এপথে আবার মানুষে বেড়াতে আসে!"

অবনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা চল। কিন্তু এরাই ত আমাদের নাইট স্কুলের ছাত্র! কেমন লাগছে ছাত্রদের উমা?" আর একটু দূরে সাঁওতালপাড়ার পাশ দিয়া তাহারা ঘুরিয়া চলিল। একটা আমগাছের তলায় একজন সাঁওতাল যুবক নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া কি একটা কথা তাহার পার্শ্বোপবিষ্টা তরুণী প্রিয়াকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছিল। কথাটা যে অত্যন্ত হাসির তাহাতে আর ভুল নাই। পিছন হইতে ইভারা গিয়াছে তাহারা লক্ষ্যও করে নাই। যুবকটি বলিতেছে, কলিকাতার বাবুরা কি এক নতুন হুজুগে মাতিয়া তাহাদের অ-আ-ক-খ শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সরকার বাহাদুর হইতে না কি ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে যত বেশী লোককে শিখাইতে পারিবে তাহার তত ইনাম মিলিবে। ইনামের লোভে বাবুরা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েটি হাসিয়া একেবারে গড়াইয়া পড়িতেছে, তাই না কি? তা যদি হয় তবে সে যেন আগে এক বাক্স ভাল সিগারেট আদায় করিয়া লয়। অনেকদিন সে সিগারেট খায় নাই। আগে এক বাক্স সিগারেট হাতে করিয়া লইবে, তবে বই পড়িতে রাজী হইবে। নহিলে নয়। বাবুরা ইনামের লোভে সব কিছুতেই রাজী হইবে। একথাটা যেন সে কিছুতেই না ভোলে। তাহাদের বিচিত্র সাঁওতালি বুলি হইতে এইটুকু মাত্র অর্থ উদ্ধার করিয়াই সুবোধের মুখ লাল হইয়া উঠিল, অপমানে তাহার কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

অবনী লেশমাত্র বিচলিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "যাক্ আজ আমাদের বেড়াতে আসা সার্থক হ'ল। স্বকর্ণে নিজেদের দু'টি প্রশংসা শুনতে পেলাম। বাহবা না পেলে মাঝে মাঝে কাজে কি মন লাগে!"

সুবোধ অভিভূত স্বরে কহিল, "হাসছ কেমন করে অবনী আমি ত বুঝতে পারছিনে!"

অবনী মাটির দিকে চোখ রাখিয়া কহিল, "কেন বুঝতে পারছ না সুবোধদা যে কাঁদতে পারছিনে বলেই হাসছি।"

সুবোধ হাতের ছড়িটা সজোরে ঘাসের উপর আছড়াইয়া কহিল, "এই সব নচ্ছার পাজি ছোটলোকগুলোর পিছনে খামখা সময় আর শক্তি নষ্ট করে কি হবে? কি হবে এই ভূতগুলোকে লেখাপড়া শেখাবার বৃথা চেষ্টায়। আমি আজই রাত্রির ট্রেনে ক'লকাতায় চলে যাব।"

তাহাদের কথাবার্ত্তার উচ্চস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সাঁওতাল দম্পতী ভারি আমোদ পাইল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে কলিকাতার বাবুদের নির্দ্দেশ করিয়া তাহারা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

অবনী কহিল, "আজ রাত্রির ট্রেনেই হয়ত যাবে না, কিন্তু এটা ত ঠিক যে একবার গেলে আর ফিরবে না। এমনই হয় সুবোধদা, যারা যায় তারা আর ফেরে না।"

ইভা কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে চলিতেছিল। দিগন্ত প্রসারিত মাঠের উপর সন্ধ্যার করুণ শান্তি ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, পুকুরের পাড়ে বাঁশঝাড়গুলোর আড়ালে শুক্লপক্ষের এক ফালি চাঁদ উঠিয়া পড়িয়াছে। এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় অসহায় ইন্দুর শুষ্ক নিজ্জীব মুখ, রায়েদের ন'বছরের ছোট মেয়েটা, সর্ব্বাঙ্গে খোস, কোলে সর্ব্বদা একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে.... ইহারা সবাই যেন তাহার মনে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আলো নাই ওগো আলো নাই—দিকে দিকে এই অবরুদ্ধ ক্রন্দনে আকাশের শান্তি নষ্ট হইয়া গেল। অবনীর কথায় তাহার মনটা হঠাৎ ধক্ করিয়া উঠিল: এমনই হয়, যারা যায় তারা আর ফেরে না। ফিরিতে হইলে যে টানের প্রয়োজন সে টান নাই। শশাঙ্ক কিন্তু কেমন করিয়া এমন পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছে যাহাতে সমস্ত অন্ধকার ছাপাইয়া উঠিয়া আলোর রূপটাই তাহার মনে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, তাই সে না ফিরিয়া পারে না। যেখানে যতদূরেই যাক ক্রন্দসী রাত্রির তমসা ভেদ করিয়া সে জ্যোৎস্নার আলোছায়ার খেলা দেখিতে পায়, দীঘির কালো জলের অতলতা অনুভব করিতে পারে, এমন কি নিমগাছের ডালে পত্রপুঞ্জের আড়ালে ফাল্গুনের সারা বেলা যে কোকিলটা অশ্রান্ত ডাকিয়া যায় তাহার কূজনও সে যেন চোখ বুজিয়া শুনিতে পায়। রাস্তায় আসিতে আসিতে হেডমাষ্টার-মশায়ের বাসার বাঁধান রকে বৈঠক বসিয়াছে তাহার পাশ দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। দিব্য হাওয়াটুক দিতেছে সারাদিনের গ্রীষ্মের পর হেডমাষ্টারমশায় তাই আরাম করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্শনের কথা হইতেছিল। ছেলো ব্যাটা মিত্তিরদের ওখানে দু'টি বেলা লুচিমণ্ডা মারিয়া আসিয়া শেষে ঘোষেদের তরফে কেমন করিয়া ভোট দিয়া দিল সেই কথাটা রং চড়াইয়া তিনি বর্ণনা করিতেছেন আর শ্রোতার দল হাসিয়া কুটি-পাটি হইতেছে। ভিতর হইতে এগার বছরের মেয়ে আন্নাকালী আসিয়া শুধাইল, "বাবা তোমার ঠাঁই করব কি? রান্না শেষ হয়েছে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "না না, পরাণে-কে চারটি টাটকা ঝিঙে আনতে বলেছি নিয়ে আসুক। ঝিঙে-পোস্ত আর আমে-শোলে অম্বল এই দিয়ে আজ চাট্টি খাব মনে করেছি।"

আন্নাকালী নীরবে ফিরিয়া গেল এবং রান্নাঘরের কেরোসিনের ডিবেটার সামনে বসিয়া শিল পাতিয়া পোস্ত বাটিতে বসিল।

ইভা ও উমাকে বেড়াইতে যাইতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের রোয়াকের কয়টি প্রাণী চোখটেপাটেপি করিয়া ইঙ্গিতে হাসা করিতে থাকিলেন। কিন্তু ইভাকে খিড়কির পথ দিয়া তাঁহাদেরই বাড়ীর ঢুকিতে দেখিয়া মাষ্টার মশায়ের হাসি থামিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া হাঁকিলেন, "ওরে আন্না, ওরে হরিদাসী আলোটা একবার ধর না। এঁরা বেড়াতে এসেছেন।"

বাড়ী ফিরিয়া যাইতে যাইতে ইভা সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। উমা দু'একবার ক্ষীণ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু ইভা একরকম জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া আনিল। মাষ্টার মহাশয়ের রোয়াকে সমাগত জনতার জটলা দেখিয়া সুবোধ আরও জ্বলিয়া উঠিয়া যখন বলিতেছিল, এদের জন্যে কোন ভাল কাজের উদ্যোগ করে খেটে মরায় বিন্দুমাত্র লাভ নাই এ আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি ইভা। সারাদিনের কাজ-কর্ম্মের পর যেই সন্ধ্যায় একটু অবসর পেয়েছে অমনই ভোটের দলাদলি আর ঝিঙে-পোস্তর আলোচনা!

তখন ইভা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "সুবোধদা রাগ করে দেখলে এদের দোষেরও অন্ত পাবে না আর যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার এ জীবনের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে তারও তলা পাবে না ভাই।"

সদরের রোয়াক পার হইয়া আসিবার সময় মাষ্টারমশায়ের রান্নাঘরের তার দিয়া ঘেরা ঘুলঘুলির মত ছোট জানালার ফাঁকে আন্নাকালীর মুখখানি দেখা যাইতেছিল। কেরোসিনের ডিবারির ম্লান ছটায় সে শিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাটনা বাটিতেছে। তাহার সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া ইভার মনের ভিতরটা হঠাৎ কি রকম করিয়া উঠিল। উমাকে রাজী করাইয়া সে মাষ্টারমশায়ের অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়িল। সুবোধ এবং অবনী বাড়ী ফিরিয়া গেল অগত্যা। সুবোধের মনে আজ যথেষ্ট বিরক্তি জন্মিবার অবকাশ হইয়াছিল, সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল এই সব অসুন্দর অশোভন সঙ্গ হইতে পালাইয়া গিয়া বাড়ীর ছাদে মাদুর পাতিয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মনের ঝাল মিটাইয়া বক্তৃতা দিবে। ইভার শ্বশুর বাড়ীর দেশে এমন কি মধু আছে যে জন্য সে কিছুতেই কলিকাতায় থাকিতে চাহিল না, জামাইবাবু যতদিন না ফিরিয়া আসেন ততদিনও অন্ততঃ কলিকাতার অভিজাত সমাজে সাহিত্য, গান, লেখাপড়া আর্ট চর্চ্চা করিয়া সে নিশ্চিন্তভাবে বিচ্ছেদের দিনগুলিও কাটাইতে রাজী হইল না একথার জবাব আদায় করিয়া লইবে তাহার কাছ হইতে। তাই ইভাকে বাধা দিয়া বলিল, "চল চল বাড়ী চল। আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে, আর না।"

প্রত্যুত্তরে ইভা কিছু না বলিয়া তেমনই শান্ত একটুখানি হাসিয়া উমার সঙ্গে আন্নাকালীদের বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

বাড়ীর গৃহিণী অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "ও-হরিদাসী ও-ঘর থেকে গালচেটা আন-না। ও-মা পোড়াকপাল আমার, এই ছেঁড়া মাদুরটা পেতে দিলি কেন? নতুন গালচেটা আন-না কেন। গেল কোথায় সেটা?" ইভা বিনীত হাস্যে সেই মাদুরেই বসিয়া পড়িল, "থাকনা গালিচা মাসীমা। এই মাদুরেরও ত কোন দরকার ছিল না। কি চমৎকার পরিষ্কার আপনাদের মেঝে। ঝক ঝক করছে।"

ইভার মত কলেজে পড়া চশমা পরা সৌখীন বড়লোকের বধূ অতিথি পাইয়া গৃহিণী সতাই একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মেয়েদের ডাকিয়া চা ও জলখাবারের আয়োজন করিতে বলিলেন।

নিজেও অল্প একটুখানি গল্প করিয়া কতদূর কি হইল তদারক করিবার জন্য একবার উঠিয়া গেলেন। সামনেই একটা পাতাছেঁড়া বিবর্ণ মলাট বঙ্গবোণী পড়িয়াছিল, সময় কাটাইবার জন্য ইভা সেটা টানিয়া লইল। পাতা উল্টাইতেই একটা খোলা প্রকাণ্ড চিঠি তাহার ভিতর চলান রহিয়াছে দেখিল। পরের চিঠি না পড়িয়া সে ভাঁজ করিয়া রাখিতেছিল, কিন্তু চিঠির ভিতরকার দুই-একটা শব্দ পড়িয়া সে ভয়ানক রকম চমকাইয়া উঠিল। কখন যে আপন অজ্ঞাতসারে বই পড়িতে গিয়া চিঠিটা পড়িয়া ফেলিয়াছে অন্যমনস্ক উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তাহা ধরিতে পারিল না। চিঠিখানা হরিদাসীর—মাষ্টারমশায়ের বড় মেয়ের স্বামী লিখিতেছে কৃতকর্ম্মের গদগদ বর্ণনা করিয়া। কুৎসিত অসুখে কেমন করিয়া তাহার স্বাস্থ্য গিয়াছে, চোখ দাঁত সমস্তই খারাপ হইয়া গিয়াছে। ছোট ভাই জেদাজেদি করিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনিয়াছে। এমন ভাই যে অনেক সৌভাগ্যে মেলে সে কথাটা আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া অনেক জায়গায় জানাইয়াছে। চিঠিখানা পড়িয়া ইভা গম্ভীর হইয়া বসিল। হরিদাসীর দাম্পত্য জীবনের কলুষতাময় দুর্ভাগ্যের কাহিনী বিষাক্ত বাষ্পের মত যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিল। নিশ্বাস লইবার অবকাশটুকু অবধি নাই। বন্ধ ঘরের মধ্যে অত্যন্ত গরম, মশা ভন ভন করিতেছে, সামনের নালা হইতে একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। উমা বিরক্ত হইয়া কহিল, "এত খারাপ লাগছে, বৌদির যে কি সখ বুঝতে পারিনে!"

ইভা হাসিয়া কহিল, "অত রুচিবাগীশ হসনে, খারাপ জিনিষকে উপেক্ষা করে সরে দাঁড়ালে স্বার্থপরের মত জীবনে ঠকতে হয়।" এমন সময় হরিদাসী ও আন্নাকালী দু'পেয়ালা চা ও দু'টি ডিশে কিছু হালুয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল। গৃহিণীও আসিয়া অদূরে মাটি চাপিয়া বসিলেন, "খাও বাছা, গরীবের ঘরে এই প্রথম এলে। একটু মিষ্টিমুখ করতে হয়। তা বাছা হরিদাসী ত মাঝে মাঝে তোমাদের পাড়া যায়। লালুদের ওখানে সারা দুপুর তাস খেলে। মনটা তবু একটু আনমনা হয়"—এইটুক ভূমিকা করিয়া তিনি চোখে আঁচল দিলেন, "আহা বাছার আমার পাঁচ বছরে পাঁচটি ছেলে হয়ে আঁতুড়েই গেল। ছেলে ত নয় সব সোনার-চাঁদ। কি চোখ, কি চুল, কি রঙ। ছেলে ত নয় সব শত্তুর ছলতেই এসেছে। হয় আর যায়। রোগ নেই, বালাই নেই কিছুই ধরা যায় না। অনবরত কাঁদে, দুধ পার হয় না গলা দিয়ে। কত ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্র কবচ কিছুই আর বাকী রাখি নাই। বেয়ান এবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছেন এবারেও যদি ছেলে না বাঁচে তাহলে তিনি ছেলের বিয়ে দেবেন। ওদেরও ঐ একটিই ছেলে কি না।" কথায় কথায় জানা গেল হরিদাসী অন্তঃসত্ত্বা। গৃহিণী আঁচল দিয়া চোখ দু'টি আর একবার মুছিয়া লইয়া কহিলেন, "মনে করছি একবার ক্ষেত্রনাথে নিয়ে যাব। বাবার মাদুলি পরে কত লোকের কত মড়ুঞ্চে পোয়াতির ছেলে বেঁচেছে। এখন আমার কপাল!" ইভা অবাক হইয়া হরিদাসীর দিকে চাহিয়াছিল। জীবনের পথচলায় সত্যিই কি ইহারা এত বড় অজ্ঞ! এইমাত্র ঐ ছেঁড়াবইটার ভিতর যেমন তেমন করিয়া রাখা ঐ-যে চিঠিখানা তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছিল, সে চিঠির অর্থ যে কি ভীষণ তাহার মর্ম্মার্থ কি ইহারা বোঝে না। যেখানে পিতার পুঞ্জীভূত পাপের বোঝা সন্তানের আয়ুষ্কালকে নিয়ত হত্যা করিয়া চলিয়াছে সেখানেও সন্তান না বাঁচার অপরাধ মায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া কি করিয়া পারে সে আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার ফন্দী আঁটিতে পারে!

হরিদাসীর মুখের দিকে চাহিয়া ইভা কহিল, "আপনার এবারেও ছেলে না বাঁচলে আপনার স্বামী আবার বিয়ে ক'রবেন একথা কি তিনি নিজের মুখে আপনাকে বলেছেন?"

হরিদাসী বলিল, নিজের মুখে বলুন বা নাই বলুন মায়ের কথা ত কিছুতেই ঠেলতে পারবেন না।—বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "ওঁরা মাতৃবশ বড়। মায়ের কথায় ওঠেন বসেন। ইভা চায়ের পেয়ালা স্পর্শ না করিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "এমন অন্যায় আপনি সইবেন চুপ করে? সত্যি কথা প্রকাশ করে ব'লবেন না?" হরিদাসী তাহার বড় বড় চোখ তুলিয়া কহিল, "অন্যায় যদি হয় আমি বলবার কে। আমরা ত ভাই আপনাদের মত এল-এ, বি-এ পাশ নই। আমাদের কথা শুনবে কে? তাছাড়া আমারই অদৃষ্টের দোষ বই কি। এক না হয় সে আলাদা কথা, কিন্তু এই পাঁচ বছরে পাঁচটি হ'ল আর পাঁচটিই গেল। ও-কি আপনি চা খান। জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেল।"

ইভা হয়ত আরও কিছু বলিত কিন্তু বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মেয়েরা এই সময় বেড়াইতে আসিল। বাঁড়ুয্যেদের একজন জ্ঞাতি মারা গিয়াছে। মাষ্টারমশায় এ পাড়ার একজন বিজ্ঞলোক, শ্রাদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার সহিত দুটো পরামর্শ করিতে বাড়ীর কর্ত্তারা আসিয়াছেন তাই গৃহিণীও সেই সঙ্গে একবার আসিলেন। আসিয়া সেখানে ইভাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "মায়ের আমার একেবারেই দেমাক নেই। অত বড়লোকের মেয়ে অত বড়লোকের বৌ হয়ে ছেঁড়া মাদুরে সোনামুখ করে এসে বসেছেন।"

বাঁড়ুয্যেগৃহিণীর এ কৈতববাদের হেতু ছিল। ইভার শ্বশুরের

প্রথমে ধরা যাক্ এক্স-রে। শরীরাভ্যন্তরে কোন যন্ত্রের কি অবস্থা ও অবস্থান, তা' এক্স-রে ফটোতে চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌বে। হাড়-ভাঙ্গা, মচ্‌কান, পেটের ঘা, ফুস্‌ফুসের ক্ষয়—সবই ফুটে উঠ্‌বে এক্স-রে আলোকের সাম্‌নে, যেন কাচের মডেল! এক্স-রে আবার রোগ চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হয়।

তারপরে দেখা যাক্ ইনফ্রারেড বা তাপ-কিরণ। বর্তমানে ইন্‌ফ্রারেড ফটোগ্রাফী একটি চমৎকার বিজ্ঞান। এর সাহায্যে শিরা-উপশিরা, রোগাক্রান্ত চক্ষু প্রভৃতির ফটো তোলাও সম্ভব হ'য়েছে। স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই তাপরশ্মি বিশেষ উপকারী।

রোগের জীবাণু বিনাশ, ভাইটামিন উৎপাদন প্রভৃতি ছাড়া অল্‌ট্রা-ভায়োলেট আলোকের একটি অপূর্ব কার্য বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনে লেগেছে। জীবাণু-কীটাণু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের চেয়েও ছোট জীব আছে—যা অণুবীক্ষণ দিয়েও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। দর্শনীয় বস্তু অতিরিক্ত ছোট হ'লে সাধারণ আলোকে অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আলট্রা-ভায়োলেট দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তুকে উদ্‌ভাসিত করতে হয়। কিন্তু যেহেতু এই আলোক অদৃশ্য, আলট্রা-ভায়োলেট ব্যবহারে কোন বস্তুকেই চোখে দেখা যাবে না। দেখ্‌তে হবে ফটো তুলে।

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট আল্‌ট্রা-মাইক্রস্‌কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুর (bacteria) চেয়েও ছোট [illegible]শ্রেণী ভিরাসের (virus) স্বরূপ বর্তমানে জান্‌তে পারা গেয়েছে, এবং তা থেকে জানা গিয়েছে যে, এগুলি জীবাণু শ্রেণীর, তবে অনেক ছোট। বাস্তবিক জীবাণু ও ভিরাসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কিছু দেখা যায় না।

রেডিয়াম-রশ্মি চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বল্‌লেও চল্‌বে, কারণ এর মোটামুটি গুণাবলী আজকাল কারও কাছে অবিদিত নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'চ্ছে কৃত্রিম রেডিয়াম-চিকিৎসা। মাদাম-কুরীর সুযোগ্যা কন্যা আইরিন্ কুরী কৃত্রিম উপায়ে রেডিয়াম জাতীয় স্বতঃ-বিকিরণশীল পদার্থ উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করেন। এক কণা রেডিয়াম সহস্র সহস্র বৎসর স্থায়ী। কিন্তু কৃত্রিম বিকিরক দ্রব্য ক্ষণস্থায়ী—এক-আধ মিনিট বা দু'চার ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ব'লেই চিকিৎসাক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুব সুবিধাজনক। অনেক সময় পেটের ভিতর রেডিয়াম-রশ্মি প্রয়োগের দরকার হ'লে বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কৃত্রিম বিকিরক উপযুক্ত মাত্রায় তৈয়ারী ক'রে তৎক্ষণাৎ সেবন করালে সে পেটের মধ্যে [illegible] কাজ শেষ ক'রে যথাসময়ে নিস্তেজ নির্বাপিত হ'য়ে যায়—[illegible] হিসাব ক'রে মাত্রা তৈয়ারী করা হয়।

হারায়েছি যাহা

শ্রীসুধারমণ পালিত

হারায়েছি যাহা এই জীবনের হাটে
রঙ্গিছে পরাণ মম রম তুলিকায়;
স্মৃতিটুকু বুকে লয়ে ফিরি পথেঘাটে,
অপূর্ব্ব আবেশে মোর হৃদয় লুটায়!

দলিত নগণ্য অতি ধরণীর ধূলি
সেও বহে নিশিদিন গন্ধ অনুপম,
মোহন-মুরলি বাজে আপনারে ভুলি,
বিজনে 'আলোকি' উঠে কারা অন্ধতম!

গিয়াছে কি আছে কি-না সদা ভুল হয়
অন্তরেতে নাচে কিন্তু বাহিরে না পাই;
হারানির ব্যথা এ যে জানিনু নিশ্চয়
আনন্দ-ভবন রচে এই বেদনাই!

সব কিছু যাবে মোর হ'য়ে যাবে লয়
পাইব জীবন এক মহানন্দময়!

প্রেম

শ্রীমমতা ঘোষ

সেদিন গিয়েছে কেটে যবে মোরা দোঁহে
ছিলাম একান্ত পূর্ণ দোঁহার মাঝারে,
কেটেছে দিবস রাতি কী মদির মোহে
ডুবিয়া ছিলাম শুধু চিত্ত-পারাবারে।
আজিকে শতেক কাজে দেখি আপনায়
তব লাগি' খুঁজি পন্থা সুখ সুবিধার,
কাছাকাছি থাকা আজ অসম্ভব প্রায়,
কাজের লাগিয়া ওই ডাকিছে সংসার।
কত না সময়ে হয় মনান্তর কত
তুচ্ছ কারণেতে বলি অসুন্দর বাণী
আরাম করিতে দান তখনো নিরত
আড়াল হইতে ব্যগ্র এ হাত দুখানি।
কল্পনার কিছু নাই, মোহ কেটে গেছে,
তোমার সেবার লাগি' স্নিগ্ধ প্রেম এ'যে।

পশ্চিম-আফ্রিকা—গাম্বিয়া

(ভ্রমণ-কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

দক্ষিণ আফ্রিকার মত প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় আফ্রিকার আর অন্য কোন অঞ্চলে নজরে পড়ে নাই। চাকুরে, ব্যবসাদার, ঠিকাদার কত রকম ক্রিয়া-কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং কত রকম মন-মেজাজের লোক সেখানে দেখেছি, যারা শুধু অর্থ উপার্জন করাটাই জীবনের লক্ষ্য একমাত্র জপমন্ত্র করেছে। প্রায় বেশীর ভাগই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, অন্যদিকে দৃষ্টি দিবার তাদের অবসর অবকাশ যেন নাই।

তবু আবার এমন কয়েকটি ভারতীয়ের সেখানে সাক্ষাৎ মিলেছে যারা নিজের স্বার্থ অপেক্ষা জাত হিসাবে যাতে

গাম্বিয়ার জোলোফ জাতের একটি মেয়ে—এর বাৎসরিক আয় পাঁচ পাউন্ড —শ্রমিক জীবনেও সে স্বাধীন বলিয়া মনে করে

ভারতীয়দের স্থান আফ্রিকায় সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে বিরত থাকে না।

গাম্বিয়া প্রদেশের রাজধানী বেথার্ষ্ট শহরে পা দিয়ে একটা জিনিষ বেশ ভাল করে বুঝতে পারলাম। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টুদের মত জোলোফ (Jolof) জাতটার মেয়ে-পুরুষের দেখলাম ছড়াছড়ি। তাদের কতক আবার ইউ-রোপীয়ান পোষাক-আষাক বেশ প্রবর্ত্তন করে নিয়েছে। আমার অভ্যাসমত গেলাম কালার্ড-মেনদের হোটেলে। হোটেল মালিক একজন ঐ দেশীয়। সে অনেক ইতস্ততের পর তবে আমায় চা আর খাদ্য সরবরাহ করল্। কিন্তু একটি কথাও বল্‌ল না। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দূরত্বেই তারা আমায় সরিয়ে রাখতে চায়। অন্য দুই-একজন শ্রমিক গোছের লোক যারা সেখানে বসে খাচ্ছিল, ধূমপান করছিল—তাদের কথাবার্ত্তাও আমার প্রবেশের সঙ্গেই বন্ধ হ'ল। একজন ত আমার টেবিল হতে উঠেই চলে গেল দূরে। নীরবে আহার কার্য্য সমাধা করেই বের হ'লাম। আমার উদ্দেশ্য ত খাওয়া ছিল না তেমন, যেমন ছিল দেশীয়দের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু ওরা যেন আমায় ভয়ের চোখে দেখে। কেন এমন হয়?

রাস্তায় পা দিলাম। কোন্ দিকে যাব ভাব্‌ছি। আমার কাছে ত সব দিকই সমান। রেস্তোরাঁ থেকে পান-আহার শেষ করে একটি লোক চলে এল। কালো, লম্বা, তবে মাথার চুল বান্টুদের মত এতটা কোঁকড়া নয়, ওষ্ঠও তেমন পুরু বলে মনে হ'ল না। সে এসেই যেন তাদের হোটেলের ভিতর-কার নীরবতার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলে ফেল্‌ল—

"Massa, we no got copper, we no got cloth, we no got chop, please."

কথাটায় কেমন সন্দেহ হ'ল। সত্যি যদি তাই, তা হলেও আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে তাতে বাধে কিসে? দ্বিতীয় দিনেই জানতে পারলাম—শহরে বা শহরতলীতে যে সব জোলোফ জাতীয়েরা বাস করে তাদের অধিকাংশই কুলি-মজুর অথবা ঐ ধরণের শ্রমের কাজই করে জীবিকানির্ব্বাহ করে। গড়পড়তায় বৎসরে পাঁচ পাউন্ড মাত্র উপার্জন প্রায় উহাদের প্রত্যেকের। তবে চাকরী অপেক্ষা নিজে স্বাধীনভাবে কুলি-মজুরের কাজ করাটাই ওরা মর্যাদার মনে করে।

চাষ-আবাদ-গৃহস্থালীর জীবন লুপ্ত হয়ে যে উহারা নিঃস্ব উপায়হীন হয়ে পড়েছে, এই সাড়াটা যেন ক্রমে জেগে উঠছে ওদের ভিতর, তাই আমায় ঐ লোকটা অমনভাবে জানিয়েছিল যে—"ওদের অর্থ নাই, বস্ত্র নাই, খাদ্য নাই।"

আর একদিন শুনলাম গবর্ণর স্যার টমাস সাউথর্ণ ও লেডি সাউথর্ণ একটা পার্টি দিচ্ছেন। গাম্বিয়ার ব্রিটিশ অধিবাসীরা 'পাম বিচ্' সুটে আর 'সান্ হেলমেট্' টুপিতে সেজে সেখানে যাচ্ছে দেখ্‌তে পেলাম। লনের মাঝে তাঁবু আর আধা ঘেরাও সামিয়ানা খাটান দেখ্‌তে পাওয়া গেল। শাদা আচকান পরা মুসলমান, রঙিন পোষাকে আফ্রিকান মহিলা, মিশ্‌কালো আফ্রিকান পুরুষ—ইউরোপীয় পোষাকে সেখানে আনাগোনা করছে, দূরে থেকে দেখ্‌তে পেলাম। সেখানে যে প্রকারের বাবুর্চি আর 'বয়'-য়ের ছুটাছুটি তাতে মনে হল, এখানে ত নিশ্চয় প্রচুর চপ্ রয়েছে আর প্রচুর অর্থও বোধ হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র যে রয়েছে তা জাঁকাল পোষাক দেখেই বোঝা যায়। তবে একটা ব্যাপার দেখে কিছুটা তৃপ্তি এল—ব্যান্ড বাজছে, তার বাজ্‌নাদার সব কালার্ড মেন, আর দুই-একটা দেশীয় বাদ্যযন্ত্রও রয়েছে।

কিন্তু রাত্রির দৃশ্য যা দেখ্‌লাম, তা অনেক কাল মনে থাক্‌বে, কারণ একটা শহর—বিশেষ করে রাজধানীর মত শহরে

—এমন বাণ্টু বা জোলোফ বস্তীর স্বাভাবিকতা ফুটে উঠ্‌তে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন শহরেই দেখি নাই।

রাস্তায় আলো জ্বলিয়াছে দূরে দূরে। যেন বাঙলা-দেশের মফস্বলের একটা ছোট শহর। পাশের পার্কটার এবং রাস্তার পাশের বড় বড় গাছগুলোয় ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়ছে, বস্‌ছে আর কিচির্ মিচির্ কর্‌ছে। আধা অন্ধকারে বাদুড়-গুলোও যেন বেশ বড়সড় মনে হল', এত বড় বাদুড় আমাদের দেশে অন্তত দেখি নাই।

এখানে ওখানে গাছের তলায় ৫।৭ থেকে ৮।১০জনে পৃথক পৃথক দলে জুটে আমাদের দেশের টিকারার মত এক রকম যন্ত্রে ডুম্ ডুম্ করে বাজাচ্ছে হৈ-হল্লা কর্‌ছে।

আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি একা। সঙ্গী নেইনি কাউকে। মিঃ ডাডোভাই যে পত্র দিয়েছিল তার বলে এক ভারতীয় ব্যবসাদারের ওখানে গিয়েছিলাম। তবে তার আতিথ্য শুধু থাকবার আস্তানাটুকু নিয়েছি। খাওয়া-দাওয়া সারতাম বাইরে বাইরে। রাত্রে শুতে যেতাম। তাও দুই-একদিন অন্যত্র কাটিয়ে দিয়েছি। শরীর মন—কিছুই ভাল ছিল না। তারপর দেশীয়দের সংকোচ—কুণ্ঠা। আর ওখানে থাক্‌তে ইচ্ছা হল না।

ক্যাপক্ গাছের কান্ড খুঁদিয়া কেনু তৈরী

একদিন সাইকেলে বেথার্স্ট হতে নয় মাইল দূরে কেপ্ সেণ্ট মেরী গিয়েছিলাম। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট বিল —কাদা—আর ছোট ছোট বন। দিনের বেলাই যে প্রকার মশা আর ছোট ছোট পোকার আক্রমণ—তা সময়ে অসহ্যও হয়ে পড়ছিল। দূরে দূরে বস্তী দেখা গেল। গোল গোল ঘর-গুলি—মাটির দেওয়াল আর গোলপাতার মত একপ্রকার পাতায় ছাওয়া।

রাস্তার মাঝে মাঝেই দেখা হচ্ছিল মাথায় বোঝা, পরণে শতচ্ছিন্ন নোংরা ময়লা কাপড় হাঁটু অবধি—সব কুলিদের সঙ্গে। আমার কথা কিছুতেই তাদের বুঝাতে পারি নাই। তারা ইংরেজী জানে না, দুই একটা শব্দ ছাড়া। ইসারা ইঙ্গিতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। দুই-একটা নারীকে দেখেছি পিঠে শিশুসন্তান বেঁধে হাতে বুঁচকি নিয়ে যেতে।

রাস্তার পাশের বস্তীতে দেখেছি দূর হতে দেখা যায় উলঙ্গ বালক-বালিকা খেলা কর্‌ছে বা দাওয়ায় লাফালাফি কর্‌ছে। যেমন সাইকেল কাছাকাছি পেঁছিল অমনি তারা উধাও। শত ডাকাডাকিতেও কেহ সাড়া দেয় নি।

গাম্বিয়ার প্রধান ফসল—গ্রাউণ্ড নাট; বিদেশে চালানের জন্য স্তূপীকৃত

এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর একখানা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বস্তীতে এসে সাইকেল নিয়ে দাওয়ায় উঠলাম। ভিতর হতে একটি মহিলা এল এগিয়ে। হাতের ইসারায় জল খাব জানালাম। সে মাটির খোরায় করে একটু দুধ এনে দিল। এবং পাছে আমি না খাই, তাই গাইটা দেখিয়ে দিল—সেটাকে দোয়ান হচ্ছে—এই দুধ সদ্য দোওয়া কাঁচা দুধ। দুধটুকু খেলাম। দুধের দাম দিতে চাইলে নিবে না, তাই দুই শিলিং অর্থ আমি গোপনে রেখে দিলাম—মহিলার পায়ের কাছে। কিন্তু কথা বল্‌তে গিয়ে তেমনি নিরাশ হতে হল। ইসারায় আর কয়টা প্রশ্ন করা যায়?

এর পর আর এক সপ্তাহ মাত্র ছিলাম সেখানে। ভারতীয় সেই চাকুরিয়ার নিকট বিদায় নিয়ে আমার সাইকেল যানে আবার অজানা পথে আমার ভবঘুরে জীবন আরম্ভ করি।

মুসলিম লীগের দাবী কি স্বীকৃত হইয়াছে?

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

মানুষ যখন সজ্ঞানে আত্ম-প্রতারণা করে, তখন কেহ তাহাকে শিক্ষা দিতে পারে না, অথবা তাহার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে না। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণাবাণী প্রচারের পর মুসলিম লীগ যে নির্লজ্জ তৎপরতার সহিত তাহাতে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে হয়, মুসলিম লীগ সজ্ঞানে আত্ম-প্রতারণা করিয়াছে। কারণ লীগের পূর্ব্ব-ঘোষিত নীতির উপর একটুও বিশ্বাস থাকিলে লীগ কিছুতেই বড়লাট সাহেবের ঘোষণাতে উল্লসিত হইতে পারিত না। এই কিছুদিন পূর্ব্বেই লীগ যুদ্ধ-সম্পর্কিত প্রশ্নে তিনটি বিষয় বড়লাটের গোচর করিয়াছিল এবং এই তিনটিতেই প্রতিকার চাহিয়াছিল। প্রথমত লীগ দাবী করিয়াছিল যে, যুক্ত-রাষ্ট্র পরিকল্পনা একেবারেই বর্জ্জন করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলমানের উপর যে সব অত্যাচার হইতেছে তাহার প্রতিকারের জন্য বড়লাটকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং তৃতীয়ত প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অনেকেই হয়ত মনে করিয়াছিল যে, লীগ এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ চাপ দিবে। কিন্তু এগুলি যে লোকের চক্ষে ধূলা দিবার জন্যই উত্থাপিত হয় তাহা কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিত না। ইতিমধ্যে বড়লাট সাহেবের ঘোষণাবাণী প্রকাশিত হইয়া গেল, তারপর প্রকাশিত হইল ভারত-সচিবের বিবৃতি। কিন্তু ইহাদের কেহই লীগের এই তিনটি দাবীর একটা দাবীও স্বীকার ত করেন নাই-ই, বরং এমন সব কথা বলিয়াছেন, যাহাতে লীগের দাবী সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। লাটসাহেব যুক্ত-রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন যে, উহা বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা হইল। তাহার কারণ মুসলীম লীগের আপত্তি নয়, তাহার মূল কারণ আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি। কিন্তু অবস্থা একটু পরিবর্ত্তিত হইলেই আবার যুক্ত-রাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলমানের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া লীগ যে অভিযোগ করিয়াছে, কি বড়লাট, কি ভারত-সচিব উভয়ের কেহই তাহা স্বীকারই করেন নাই। তাঁহারা উচ্ছ্বসিত ভাষায় কংগ্রেসী গবর্ণমেন্টের প্রশংসা করিয়াছেন। তারপর গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের এক অংশের কাজ যেমন কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে তাঁহারা আশা করেন যে, দ্বিতীয়ত অংশের অর্থাৎ ফেডারেশনটির কাজও সুষ্ঠু-ভাবে চলিতে থাকিবে। এত সব উক্তির দ্বারা মুসলিম লীগের প্রত্যেক দাবীই যে খণ্ডিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয়ত প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষগণ একদম নীরব ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। লীগওয়ালাদের মুখে মুখে লাটসাহেব যে জবাব দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের গর্ব্বিত হইবার কিছুই ছিল না। বরং এজন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া বলিতেছেন যে, লাটসাহেব আমাদের প্রধান দাবী স্বীকার করিয়াছেন। সে দাবীটা এই যে, মুসলিম লীগ যে ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান তাহা বৃটিশ সরকার স্বীকার করিয়াছেন। এবং সেইজন্য লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লাটসাহেবের বিবৃতি সমর্থন করিয়াছেন। আমরা ভারত-সচিব ও লাটসাহেবের দীর্ঘ বক্তৃতা দুইটি মনোযোগ সহকারে পড়িলাম। কিন্তু তাহাতে কোথাও এমন কথা পাইলাম না যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, লীগের প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। আলোচনার জন্য লাট সাহেব অনেক গণ্যমান্য লোককে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কাহাকে ডাকিয়াছিলেন ব্যক্তিগতভাবে এবং কাহাকে ডাকিয়াছিলেন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে। মহাত্মাজীর কথা না হয় বাদই দিলাম। বড়লাট কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেসের যুদ্ধ সাব-কমিটির সভাপতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, হিন্দু মহাসভার সভাপতি, মোমিন দলের নেতা এবং কতকগুলি মডারেট নেতাদের সহিতও আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা মুসলিম লীগ কি প্রমাণ করিতে চায়? কংগ্রেসকে আহ্বান করিয়া যেমন কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করেন নাই; সেইরূপ মুসলিম লীগের দাবীও স্বীকার করেন নাই। এই সব বিভিন্ন দলকে আহ্বান করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কোন দলকেই তাঁহারা দেশের বৃহৎ কোন সম্প্রদায়ের বা জাতির প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আর তাহা করেনও নাই। বড়লাট অথবা ভারত-সচিবের কোন্ উক্তি হইতে মিঃ জিন্না অনুমান করিলেন যে, তাঁহারা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিলেন? বড়লাট লীগ সম্বন্ধে সামান্য একটু কথা বলিয়াছেন, "I have had discussion with Mr. Jinnah and representative members of the Muslim League organisation." আর ভারত-সচিব মহাশয় বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের পরেই মুসলিম লীগ একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম লীগকে কেহই মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। আমাদের বড় কর্ত্তাদের আচরণ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের কোন প্রতিষ্ঠানকেই তাঁহারা প্রতিনিধিমূলক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা এরূপ স্বীকার করিতেই পারেন না। কারণ তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত তাঁহাদেরই পরাজয় হইবে। আজ মুসলিম লীগ প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতা-বিরোধী। কিন্তু এমনও দিন আসিতে পারে, যখন এই লীগই জাতীয়তা ও স্বাধীনতার পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া পড়িবে। তখন সে-প্রকার লীগকে লইয়া তাঁহাদের কাজ হইবে না। অন্য একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করিতে হইবে। এইজন্য এক সময় তাঁহারা অধুনা লুপ্ত মুসলিম কনফারেন্সকে গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে উহা যখন লোপ পাইল তখন লীগই তাহার আসন গ্রহণ করিল; তৎপর এই লীগকেই গুরুত্ব দিলেন। কিন্তু ইহাকে মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া কোনও দিন স্বীকার করেন নাই। আর আজিও করিতেছেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লাটসাহেবের ঘোষণায় উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই। জিন্না সাহেব উল্লসিত হইয়া নিজের প্রতিক্রিয়াশীল মনেরই পরিচয় দিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। সমগ্র মুসলমানের হইয়া কথা বলিবার জন্য মুসলিম লীগ যে দাবী করিয়াছে তাহা ভিত্তিহীন ত বটেই, তাছাড়া ঐ দাবী অহমিকাপূর্ণ ও মুসলমান সমাজের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। এই ভারতে লীগ ব্যতীত আরও বহু মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে যাহা লীগকে আদৌ স্বীকার করে না এবং যাহাদের আদর্শ, নীতি ও কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের দলেও লাখে লাখে মুসলমান আছে। এক কংগ্রেসেই কয়েক লক্ষ মুসলমান সদস্য আছে। তাছাড়া আহরার দল, ওলেমা দল, কৃষক দল, মোমিন দল, সিয়া দল প্রভৃতি কেহই লীগকে স্বীকার করে না। নির্ব্বাচনে দুই এক জায়গায় আশাতীত ফল লাভ করিয়া লীগপন্থিগণ মনে করিতেছে যে, তাহারাই বুঝি একমাত্র মুসলমান। চতুর্দ্দশ লুই যেমন দেশের অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "I am the state", ইঁহারাও সেইরূপ দাবী করিতেছেন। কিন্ত অতি শীঘ্রই তাঁহাদের এই ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেশের কোটি কোটি মুসলমান লীগকে অস্বীকার করিয়াছে এবং প্রকাশ্য-ভাবে ইহার বিরোধিতা করিতেছে। কারণ তাহারা জানে যে, মুসলিম লীগ মুসলমানের উপকার করিবার পরিবর্ত্তে পদে পদে অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে যতদিন ঠেকাইয়া রাখিবার দরকার বোধ করিবেন ততদিনই আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ লীগকে গুরুত্ব দিবেন। কিন্তু যখন দাবাইয়া রাখা চলিবে না তখন লীগের নাম পর্যন্ত তাঁহারা মুখে আনিবেন না।

পুস্তক-পরিচয়

যোগানন্দ-লহরী ঃ—(পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ), গ্রন্থকার—স্বামী যোগানন্দ। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানির তৃতীয় বারের মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এই জাতীয় পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিবার নরনারীর অভাব হয় নাই বঙ্গদেশে। যুগধর্ম্মে আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের প্রভাব গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি গ্রন্থকার সাধক, তিনি দূরদৃষ্টিবলে সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি এই পুস্তকে আরোপিত করায় যে ইহা সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের গানগুলি সাধারণভাবে উপভোগ্য হইলেও উহাই আবার শ্রেষ্ঠ সাধন-সোপান। নিরানন্দের দিক হইতে আনন্দের দিকে আকর্ষণই এই সকল গানের বিশিষ্টতা।

আশা করা যায়, ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসী, বিশেষত সঙ্গীত-পিপাসু নরনারী এই পুস্তকের আলোচনায় পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

মহাত্মা গান্ধী—লেখক শ্রীগোবিন্দদাস কনসাল। 'Garcon' National Publishers, Burn Bastion Road, Delhi হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। ইহা একখানি ইংরাজী পুস্তক। গান্ধীজীর বিশাল প্রতিভার বিভিন্ন দিকের উপরে এই পুস্তকখানি নূতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। লেখক ইংরাজীতে সুপণ্ডিত—গান্ধীজীর জীবন ও বাণীর মর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইলে যে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রয়োজন—লেখকের তাহা আছে। গান্ধীজীর সাধনাকে বুঝিতে হইলে এই পুস্তক যে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিবে—ইহা আমরা জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি।

ভাগবতী বিদ্যা—মাসিক-পত্র প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী। কার্য্যালয়, ৩।ই, কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর।

ভাগবতী বিদ্যা পারমার্থিক মাসিক-পত্র। এই পত্রের সম্পাদক একজন ভক্ত এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি আছে। 'ভাগবতী বিদ্যা' পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি সবই সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত, কবিতাগুলি অধ্যাত্ম-রসে অনুসিক্ত। অধ্যাত্ম-রসপিপাসু ব্যক্তিগণ 'ভাগবতী বিদ্যা' পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরতত্ত্ব—শ্রীসত্যচরণ ভদ্র (এডভোকেট) প্রণীত। হরিসভা রোড, বেহালা শঙ্করানন্দ আশ্রম।

লেখক—শ্রীনিতাইচৈতন্য দাস নামে অধুনা পরিচিত। ইনি ভক্ত এবং ভাবুক ব্যক্তি। আলোচ্য প্রবন্ধটি অধুনা-লুপ্ত 'ভক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই উহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' উপর ভিত্তি করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; আলোচনা প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী।

সাহিত্য-সংবাদ

তারিখ পরিবর্ত্তন

এতদ্দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বিশেষ কারণ বশত বেহালা যুব-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "সত্যেন্দ্র-স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতার" রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৭ই মাঘ, ১৩৪৬ (৩১-১-৪০) করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপরাপর নিয়মাবলী এবং রচনার বিষয়সমূহ বর্ত্তমান বর্ষের ৪৬ সংখ্যায় মুদ্রিত 'দেশ' পত্রিকায় পাওয়া যাইবে।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক,
বেহালা যুব-সম্প্রদায়, রায় বাহাদুর রোড,
বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা।

"দীপিকা"র চিত্র-প্রতিযোগিতার ফলাফল

চট্টগ্রামের ছাত্র-পরিচালিত হস্তলিখিত 'দীপিকা' পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিত্র প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন গত ২রা ভাদ্রের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১ম—শ্রীআরতি মজুমদার, দশম শ্রেণী, পাথরঘাটা বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। ২য়—শ্রীশ্রীপতি সেন, নবম শ্রেণী, পটিয়া হাই স্কুল, চট্টগ্রাম।

আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রথম পুরস্কার 'সুবোধ-স্মৃতি কাপ' এবং দ্বিতীয় পুরস্কার "সুবোধ স্মৃতি পদক" গত অক্টোবর মাসের ১ম সপ্তাহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগীদের মধ্যে শ্রীপরেশ সেনের (চট্টগ্রাম), শ্রীনবীন দত্তের (খুলনা), শ্রীপ্রমথ সেনের (নর্ম্মাল স্কুল) ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চট্টগ্রামের আর্টিষ্ট শ্রীযুত ব্রজেন দাশ, শ্রীযুত সুরেন রায়, শ্রীযুত কৃষ্ণপদ দাশ এবং শ্রীযুত সারদা গুহ ছবিগুলির বিচারের ভার নিয়েছিলেন। ইতি—

পরিচালকবৃন্দ, "দীপিকা", চট্টগ্রাম।

আজ-কাল

শাসনতন্ত্র বাতিল –

কংগ্রেসের দাবী অনুযায়ী ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট তাঁদের মনোভাব খুলে না বলায়, কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত করে ২২শে অক্টোবর তারিখে। তারপর থেকে সাধারণভাবে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি। কার্য্যক্ষেত্রে সাতটি কংগ্রেসী প্রদেশে – মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব বর্জ্জনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঐ সাত প্রদেশেই গবর্ণররা শাসনতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে নিজের হাতে কর্ত্তৃত্ব নিয়েছেন, কারণ কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক-ভাবে শাসন চালানো অসম্ভব।

শেষ পদত্যাগ করেছেন, যথাক্রমে ৭ই ও ৮ই নভেম্বর তারিখে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী। এঁদের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয়েছে ১০ই তারিখে। আসাম মন্ত্রিসভাও পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির নির্দ্দেশে অল্পদিনের মধ্যেই পদত্যাগ করবেন।

ব্যাপক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বর্ত্তমানে অনেকটা অচল অবস্থায় রয়েছে। গান্ধীজী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং মিঃ জিন্নার মধ্যে আলোচনা এবং তাঁদের তিনজনের সঙ্গে বড়লাটের কথাবার্ত্তা নিষ্ফল হয়। ৫ই নভেম্বর ঘোষণায় বড়লাট বলেন, তিনি কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, তাঁরা যদি প্রাদেশিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা মিটমাট করে নিতে পারেন, তবে দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের তিনি তাঁর শাসন-পরিষদে স্থান দিতে পারেন; কিন্তু যেহেতু তাঁদের মধ্যে মিটমাট হ'ল না, সেই জন্যে কেন্দ্রে কোন ব্যবস্থা করা গেল না। তবে এ সত্ত্বেও তিনি হাল ছাড়বেন না।

ভারতের দাবী অগ্রাহ্য

গান্ধীজী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং পণ্ডিত জওহরলাল বড়লাটের ঘোষণার প্রতিবাদ করে বলেন—ব্রিটেন তাহার সাবেকী ভেদ-নীতির আশ্রয় নিয়ে ভারতের দাবী এড়িয়ে চলছে এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করছে; কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বলেছে, ভারত সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব পরিষ্কার ব্যক্ত করতে, যুদ্ধ মিটলেই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে কি না, সেই কথা জানাতে। সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই; কংগ্রেস স্বাধীনতা চায় ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত জনগণের জন্য। সে স্বাধীনতা ব্রিটেন ভারতবর্ষকে দেবে কি না, তা জানতে পারলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান যেতে পারে। এখন সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা টেনে নিয়ে এসে আসল দাবীটাকে চাপা দেবার চেষ্টা দেখে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের এই অভিমত রাষ্ট্রপতি লিখিতভাবেই বড়লাটকে জানিয়ে দেন। ৬ই নবেম্বর তারিখের এক বিবৃতিতে জওহরলাল স্পষ্টই বলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার নাম করে লড়াই করছেন, অথচ ভারতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় রাজী হচ্ছেন না; এই কারণে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে ব্রিটেনের যুদ্ধের সঙ্গে সংস্রব বর্জ্জন করেছে।

এর পর ৭ই নবেম্বর ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড লর্ড-সভায় জানিয়ে দেন, কংগ্রেস যা দাবী করছে, তা মেনে নেওয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

গণ-আন্দোলন কত দূরে ?

এই সব ব্যাপারের পর স্বভাবতই মনে হওয়া উচিত যে, দেশের পক্ষ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্যে

আন্দোলন সুরু হবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব এ বিষয়ে পরিষ্কার নয়। গত ৫ই তারিখে গান্ধীজী দুটি বিবৃতি বার করেন। তাতে তিনি বলেন যে, অসহযোগ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু দেশ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে এখন তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, এই জোটের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন করা ভুল হবে। ৭ই নবেম্বর শ্রীযুক্ত

রূবি সিনেমায় "নব-জীবন"

বম্বে টকিজের নূতনতম অবদান "নব-জীবন" রূবি চিত্রগৃহে গত শুক্রবার হইতে দেখান হইতেছে।

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও পৌরুষবর্জ্জিত জনৈক যুবক এক সাধুর সর্ব্বরোগাপহারক বটিকা সেবনে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। ঘুমের ঘোরে যুবক স্বপ্ন দেখে যে তাহার প্রেমিকাকে তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বী ডাকাত সর্দ্দারের কবল হইতে উদ্ধার করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গের পর যুবকটির মানসিক সকলপ্রকার বৈক্লব্য ও দুর্ব্বলতা লোপ পায় এবং সে 'নব-জীবন' লাভ করে। ইহার পর যাহা হইবার তাহাই হয়,—সে তাহার প্রেমিকাকে লাভ করিতে সক্ষম হয়। —অতি সংক্ষেপে ছবিখানির গল্পবস্তু ইহাই। গল্পবস্তু অনেকটা আজগুবি, আরব্যোপন্যাসিকও বটে। রচয়িতার চিন্তাশক্তির দুর্ব্বলতা ও সৃজনী প্রতিভার অস্ফুরণের ইঙ্গিত ইহাতে পাওয়া যায়।

বিষয় বস্তুর পরিকল্পনা উদ্ভট হইলেও ইহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অনেকটা সফলতার জন্য ছবিখানি সহজ, সরল ও সু-উপভোগ্য হইয়াছে।

নায়ক মহেন্দ্রের চরিত্রাভিনয়ে রামসুকলার অভিনয় মাঝে মাঝে কিছুটা অস্বাভাবিক হইলেও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। নায়িকার ভূমিকায় হংস ওয়াঙ্কারের সাবলীল ও সুসংযত অভিনয় ছবিখানির একটি বিশেষ আকর্ষণ। জয়রামের ভূমিকায় দেশাইএর অভিনয়ে অতিশয়োক্তি আছে। অন্যান্যের অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য দোষত্রুটি তেমন কিছুই নাই। গীত সম্পদে ছবিখানি মাঝামাঝি রকমের। ইহার আবহ সঙ্গীত, দৃশ্যসজ্জা পরিচালনা, আলোকচিত্র ও শব্দ-গ্রহণ ভাল।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী ছবি 'পরাজয়'এ কাননবালা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible]বেন রায়

ষ্টুডিও সংবাদ

শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনাধীনে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের [illegible]-ভাষী বাঙলা ও হিন্দী ছবি "পরাজয়" ও "জোয়ানী-কি-রীত"- [illegible]চিত্রগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার সম্পাদনার কার্য্য [illegible]ছে।

শ্রীমতী কানন ইহার হিন্দী ও বাঙলা দুই সংস্করণেই নায়িকার ভূমিকা[illegible]নয় করিয়াছেন। হিন্দী সংস্করণে তাহার সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন জগদীশ, নিমু, নাজাম নন্দকিশো[illegible]ক্রম কাপুর, কলাবতী, বৈদ প্রভৃতি এবং বাঙলা সংস্করণে [illegible] ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মু[illegible], জীবেন বসু, জ্যোতি, বীরেন দাশ প্রভৃতি।

* * *

পরিচালক শ্রী[illegible] মল্লিক কিছুদিন হইল একখানি সামাজিক দো-ভাষী হিন্দী [illegible]ঙলা ছবির কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ছবি-খানির কাজ [illegible] চলিতেছে। ইহার দুটী সংস্করণেই প্রধান ভূমিকায় কানন ও [illegible]ড়ীকে দেখা যাইবে।

* * *

এসোসিয়েটেড প্র[illegible]শনস্ লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের আগামী হিন্দী ছবি "তু[illegible]ন"-এর নাম পরিবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা[illegible]কি "অন্ধী" নামে জনসাধারণের সম্মুখে আবির্ভূত হইবে।

* * * * *

দি ক্যালকাটা মুভি[illegible]ডিউসার্স লিমিটেড ম্যাডান ষ্টুডিওতে শীঘ্রই একখানি সামাজি[illegible] বাঙলা ছবির কার্য্য আরম্ভ করিবেন। শ্রীকর্ম্মযোগী রায় ইহার [illegible]রিচালনা করিবেন। পরিচালক বর্ত্তমানে ছবিখানির জন্য অভিনেত[illegible] ও অভিনেত্রী মনোনয়নে ব্যস্ত আছেন।

* * *

কালী ফিল্মসের ঐ[illegible]হাসিক চিত্র "চাণক্য" শীঘ্রই উত্তরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করি[illegible]। ছবিখানির পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী [illegible]বং ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন পরিচালক স্বয়ং, পরলোকগতা অভি[illegible]নেত্রী কঙ্কা, নরেশ মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি। শিশি[illegible] ভাদুড়ী প্রমুখ অভিনেতাদের জন্য ছবি-খানি অন্তত অভিনয়ের দিক দিয়া খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

কাতায় আন্তর্জাতি

আন্তঃপ্রা শক রণজি ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ নির্বাচিত করিবার জ বাছাই ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছি ভাবে শেষ হইতে। ... দলের পক্ষেই প্রাধান্য ... হয় নাই। তিনদিন ব্যাপী খেলাটি ... হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

খেলাটি উচ্চাঙ্গের

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ... উচ্চাঙ্গের হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ ... শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করিলে কোনরূপ ... কি ইউরোপীয় কোন পক্ষের কোন ... বোলিংয়ে খুব উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য ... নাই। ব্যাটিং ... ইউরোপীয় দলের ... রাণ ও ভারতীয় দলের জে এন ব্যান ... উল্লেখযোগ্য হইলেও, উচ্চাঙ্গ ক্রী ... তাহারা এইরূপ অধিক রাণ করিতে ... চলে না। কারণ উভয়পক্ষের বোলারদের ... হইয়াছিল। ফিল্ডিং বিষয়েও খেলো ... অভাব ছিল। এরূপ এইজনাই উভ ... বোলার পরিবর্তন করিয়াও অধিক ... নাই। এই খেলাটিতে একটি বিষয় ... লাভ করিয়াছি, সেইটি হইতেছে ভার ... য়াড়ের দলের রাণ সংখ্যা বৃদ্ধির জ ... খেলিতে নামিয়া বিচলিত না হইয়া ... পূর্বে খুব কম খেলাতেই এইরূপ ... গিয়াছে। বাঙালী খেলোয়াড়গণের ... পাইবে, ততই তাঁহারা ক্রিকেট খেলা ... করিতে পারিবেন। কি ... খেলোয়াড়গণ যদি এইরূপ দৃঢ়তাপূ ... হন, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী ... গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম ...

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

এই খেলায় উভয় দলে যে ... করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে ... যোগিতার জন্য বাঙলার দল গঠন ... বাঙলা দল যে বিশেষ সুবিধা করিতে ... আমরা বলিতে পারি। প্রথম খেলা ... করিলেও পরবর্তী খেলায় যে পরা ... নিশ্চিত। সুতরাং এই বৎসর বাঙলা ... ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বিজয়ী নাম ... ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের শক্তির উপ ... উৎসাহী খেলোয়াড়দের উন্নতের ... ব্যবস্থা না করার ফল কি দাঁড়াইতে ... ক্রিকেট পরিচালকগণ এই বৎসর বি ...

আন্তর্জাতিক খেলার ...

ভারতীয় দল টসে জয়ী হইয়া ... ২৪ রাণে প্রথম উইকেটের পতন হয় ... পড়িয়া যায়। তৃতীয় উইকেটের পতন ... ন্যে ভারতীয় দল অধিক রাণ করিতে ...

হঠাৎ পতন আরম্ভ হয়। সপ্তম উইকেট ১৬১ রাণে পড়িয়া যায়। ফলে সকলের ধারণা হয় যে, দুই শত রাণের মধ্যে ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ হইবে। কিন্তু জে এন ব্যানার্জ্জি খেলিতে নামিয়া সকলের ধারণা পরিবর্ত্তন করে। রাণ উঠিতে আরম্ভ করে। ১৯২ রাণে অষ্টম উইকেটের পতন হয়। এস দত্ত খেলিতে নামেন। ২০০ রাণ পূর্ণ হয়। ২১৩ রাণে নবম উইকেটও পড়িয়া যায়। তখন রাণ উঠার আশা সকলকেই ত্যাগ করিতে হয়। দলের শেষ খেলোয়াড় এন মিত্র খেলিতে নামেন। ৩০০ রাণে ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ হয়। জে ব্যানার্জ্জি ১২১ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ৫৯ রাণ করিয়া আউট হন। ইউরোপীয় দল পরে খেলা আরম্ভ করেন। দিনের শেষে কেহ আউট না হইয়া ১৯ রাণ করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হইলে রাণ পুনরায় উঠিতে আরম্ভ করে। ৯৭ রাণে প্রথম উইকেট পতন হয়। ১৬৭ রাণে চতুর্থ উইকেট পড়িয়া যায়। ইহার পর দ্রুত উইকেট পতন আরম্ভ হয়। ২২৩ রাণে ইউরোপীয় দলের ইনিংস শেষ হয়। একমাত্র পি এন মিলার ১৯৩ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ১০২ রাণ করিতে সক্ষম হন। তিনি তাঁহার রাণ সংখ্যার মধ্যে ১৩টি বাউণ্ডারী করেন। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া ২ উইকেটে ৬২ রাণ করিবার পর ডিক্লেয়ার্ড করে। ইউরোপীয় দল পরে খেলিয়া দিনের শেষে ২ উইকেটে ৫৩ রাণ করিতে সক্ষম হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দলের এন চ্যাটার্জ্জি ও এস দত্তের বোলিং বিশেষ কার্য্যকারী হয়।

নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

ভারতীয় দলঃ—প্রথম ইনিংস ৩০০ রাণ (কে রায় ৩৪, এন চ্যাটার্জ্জি ৪১, সুশীল বসু ৪৮, জে ব্যানার্জ্জি ৫৯, এন মিত্র নট আউট ২০, ডি দে ১৮; এন কেনড্রু ৩০ রাণে ২টি, এন হ্যামণ্ড ৪৫ রাণে ৩টি, এ স্কিনার ৩২ রাণে ১টি, ডবলিউ স্কট ৫২ রাণে ১টি, ডবলিউ কার্টার ৬১ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ইউরোপীয় দলঃ—প্রথম ইনিংস ২২৩ রাণ (পি এন মিলার ১০২, এফ হার্কার ৩২, এ জি স্কিনার ২৭, ডবলিউ স্কট ১২; এস দত্ত ৪৭ রাণে ৩টি, এন চ্যাটার্জ্জি ৩৩ রাণে ৩টি, এন মিত্র ৪৩ রাণে ২টি, সুশীল বসু ১২ রাণে ১টি, জে এন ব্যানার্জ্জি ৪৩ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ভারতীয় দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ২ উইকেটে ৬২ রাণ (এ দেব নট আউট ২৪, এ কামাল নট আউট ১৪; সি হজেস ১৫ রাণে ১টি, এন হ্যামণ্ড ২৩ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ইউরোপীয় দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ২ উইঃ ৫৩ রাণ (ই পেজ ৩০, ডবলিউ কার্টার নট আউট ১৫; এ কামাল ১৬ রাণে ১টি, এ জব্বর ৮ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

আগামী ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর জামসেদপুরে বিহার প্রদেশের বিরুদ্ধে রণজি প্রতিযোগিতায় খেলিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করা হয়। ২১শে নবেম্বর উক্ত এসোসিয়েশনের এক অধিবেশন হইবে, সেই সভায় বাঙলার প্রকৃত দল নির্ব্বাচিত হইবে। মনোনীত খেলোয়াড়গণঃ—কার্ত্তিক বসু (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) অধিনায়ক, জে এন ব্যানার্জ্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), সুশীল বসু (এরিয়ান্স), এম দত্ত (এরিয়ান্স), কে রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), এন চ্যাটার্জ্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), বাপী বসু (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), ডবলিউ স্কট (বালীগঞ্জ), এ জি স্কিনার (ক্যালকাটা), এফ হার্কার (বালীগঞ্জ), ডবলিউ কার্টার (বালীগঞ্জ), এন হ্যামণ্ড (রেঞ্জার্স), এইচ সাধু (এরিয়ান্স), এ রহমান (মহমেডান স্পোর্টিং), এন মিত্র (কুমারটুলী)। পি এন মিলার জামসেদপুরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।